

দ্বিতীয় বর্ষের সূচী

প্রতিভা, ১৩১৯

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

শ্রী অঘোরনাথ ঘোষ

| | |
|--|-----|
| ১। আচার্য্য হরিনাথ | ৩২৬ |
| ২। আদর্শ ধনপতি (গল্প) | ৩৮৮ |
| ৩। একটি ঘড়ির কাহিনী (গল্প) | ৪৫৩ |
| ৪। প্রহতস্বেব একপৃষ্ঠা (ইংরেজীর অনুবরণে) | ১৫৫ |

শ্রী অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

| | |
|----------------------|-----|
| ১। অর্ধকালী | ২৪৬ |
| ২। সাধক মৃত্যুশয্য | ৪২৩ |
| ৩। সোনারান্দার দুর্গ | ৬৫৩ |

শ্রী অনাথবন্ধু সেন

| | |
|------------|-----|
| বাঁধবকুণ্ড | ৭১৬ |
|------------|-----|

শ্রী অনুকূলচন্দ্র সরকার, এম, এ, এফ্‌ সি, এন্‌, পি, আর, এন্‌,

| | |
|--------------------|-----|
| ১। গোমেষের ব্যবহার | ১২২ |
| ২। হস্ত ও বীজাণু | ৩৬৯ |

শ্রী অবিলাশ চন্দ্র মজুমদার এন্‌, এ, বি, এল

| | |
|-----------------------|-----|
| চুঁচু সাহিত্য সম্মেলন | ৪৭২ |
|-----------------------|-----|

শ্রী অশ্বিনীকুমার সেন

| | |
|------------------------|-----|
| খাজবালি মসজিদ (ঢাকা) | ২৪৪ |
|------------------------|-----|

শ্রী আমোদিনী ঘোষ

| | |
|---------------------|-----|
| শুভদৃষ্টি (কবিতা) | ১৩৯ |
|---------------------|-----|

শ্রী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এন্‌, এ,

| | |
|-------------------|-----|
| সারমাধ (সচিত্র) | ১৩৪ |
|-------------------|-----|

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম্, এ, বি, এল্,

ইতিহাস বিজ্ঞান এবং মানব জাতির আশা... ২২৫

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি

চন্দ্র সিংহ ত্রিপুর বা চন্দ্রসেন ... ৬০১

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১। অদ্বৈতাচার্য্য বিরচিত রামায়ণ—সুন্দর কাণ্ড ... ১১৪

২। বিজয় মুকুন্দ ও তদীয় গ্রন্থ চতুর্ভুজ ... ২১৬

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আলোক, বায়ু ও স্বাস্থ্য ... ৬২৭, ৭১৬

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,

হাঙ্গদার আলি খাঁ বাহাদুরের দৈনিক জীবন ... ৩৬১

শ্রীকালিদাস রায় বি, এ,

১। চ'য়ে এক (কবিতা) ... ৪০৮

২। প্রতীকা (কবিতা) ... ১০২

৩। প্রেমের স্মৃতি (কবিতা) ... ৫১৫

৪। মান ও অপমান (কবিতা) ... ২২২

৫। ফুলশয্যা (কবিতা) ... ৬৬০

৬। পাহাড়িয়া (কবিতা) ... ৬২৫

শ্রীকালীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাব (কবিতা) ... ১৭৮

শ্রীকুলচন্দ্র দে

১। পদেল্য আবাড় (কবিতা) ... ১৭২

২। বিক্রমপুরে বর্ষা (কবিতা) ... ২০১

৩। মা (কবিতা) ... ৪৭০

৪। শরদ মঙ্গল (কবিতা) ... ৩৪৬

৫। মাতৃ স্মৃতি (কবিতা) ... ৭২৬

শ্রীগণপতি রায়

বাগ্মত্বের মসজিদ (পুস্তক) ... ২৪৩

ଶ୍ରୀଗିରୀଜ ନାଥ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ ଏମ, ଏ, ବି, ଏଲ

| | | |
|---------------------------|-----|-----|
| ୧ । ଉତ୍ତରାଢ଼ି (ଗଳ୍ପ) | ... | ୨୧୦ |
| ୨ । ପୂର୍ବାର ଛୁଟି (ଗଳ୍ପ) | ... | ୩୨୮ |

ଶ୍ରୀଗିରିନାଥ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଦାନ୍ତତୀର୍ଥ

| | | |
|-------------|-----|-----|
| ସଂସ୍କୃତକବ୍ୟ | ... | ୫୮୮ |
|-------------|-----|-----|

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି, ଏ,

| | | |
|--|-----|-----|
| ୧ । କାହାଣୀ କାବି | ... | ୩୮ |
| ୨ । କାହାଣୀ କାବିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ, ସମାଜ ଓ ପରିବାର | ... | ୧୫୦ |
| ୩ । କାହାଣୀର ବିବାହ ଓ ବିବାହଛେଦ | ... | ୨୦୦ |
| ୪ । କାହାଣୀର ଧର୍ମ | ... | ୨୨୫ |
| ୫ । କାହାଣୀରେ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା | ... | ୩୫୧ |
| ୬ । ପରୀ-ରାମୀ (କାବ୍ୟ ଗଳ୍ପ) | ... | ୧୨ |
| ୭ । ପ୍ରତ୍ୟାଧ୍ୟାତା (ଗଳ୍ପ) | ... | ୧୦୫ |
| ୮ । ପ୍ରତିଶୋଧ (ଗଳ୍ପ) | ... | ୨୦୨ |
| ୯ । ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ | ... | ୫୦୫ |
| ୧୦ । ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମେ ଭିକ୍ଷୁବ୍ରତ | ... | ୫୬୦ |
| ୧୧ । ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମେ ପରିତ୍ରାବଶେଷାଦି | ... | ୫୧୧ |
| ୧୨ । ଶକ୍ତ ବ୍ରତ | ... | ୬୧୩ |
| ୧୩ । ସୋନା ବାରହର ଗାନ | ... | ୫୦୫ |
| ୧୪ । ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହସ୍ରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ | ... | ୬୩୫ |
| ୧୫ । ଗାଁଢ଼ ବ୍ରତ | ... | ୭୨୫ |

ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ

| | | |
|-------------------|-----|----|
| ସମ୍ଭାଷଣ (କବିତା) | ... | ୭୫ |
|-------------------|-----|----|

ଶ୍ରୀଚାରୁବାଳା ଶୁକ୍ଳ

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| ୧ । ନିବେଦନ (କବିତା) | ... | ୨୫୫ |
| ୨ । କେ ତୁମି (ଐ) | ... | ୧୦୫ |

ଶ୍ରୀଚାରୁହାସିନୀ ଦେବୀ

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| ବର୍ଷ ବିହାର (କବିତା) | ... | ୧୫୫ |
|----------------------|-----|-----|

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦତ୍ତ

| | | |
|---------------------------|-----|-----|
| ୧ । ଅମର ଶ୍ରେଣିକ (କବିତା) | ... | ୫୫୫ |
| ୨ । କଳ୍ପନା (କବିତା) | ... | ୫୫୫ |
| ୩ । ସୁସ୍ମାଧୀ (କବିତା) | ... | ୫୫୫ |
| ୪ । ନେକାଳିକା (କବିତା) | ... | ୫୫୫ |
| ୫ । ନାରୀକ ବିଳନ (କବିତା) | ... | ୫୫୫ |

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগ্‌চি এল, এম, এস,

| | | |
|---------------------------------|-----|----------|
| ১। গভীর স্বাস্থ্য | ... | ৪৩৬ |
| ২। প্রহৃতি ও হৃতিকাগৃহ | ... | ৪৪২ |
| ৩। সন্তান পালন | ... | ১০৩, ৫১০ |
| ৪। শিশুর খাঞ্জে বিশেষ ব্যাংস্থা | ... | ৬৪৬ |
| ৫। শিশু চিকিৎসা | ... | ৭২৩ |

শ্রীতারক নাথ দেব

| | | |
|-----|-----|-----|
| শাক | ... | ৫২৭ |
|-----|-----|-----|

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী

| | | |
|--------------------------|-----|-----|
| ১। বর্ষা আবাহন (কবিতা) | ... | ১৮৮ |
| ২। শেষ কথা (কবিতা) | ... | ২২২ |

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

| | | |
|-----------------------|-----|-----|
| ১। পরিজ্ঞান (কবিতা) | ... | ৫৭৭ |
| ২। বখাইয়া | ... | ৪৪৭ |
| ৩। আশ্রয় (কবিতা) | ... | ৬৩৩ |

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর

| | | |
|-------------------|-----|-----|
| নমস্কার (কবিতা) | ... | ৩৫০ |
|-------------------|-----|-----|

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মহিস্তা

| | | |
|----------------------------|-----|-----|
| ১। গিলগিটদিগের বিনাহোৎসব | ... | ৮২ |
| ২। জামী ও অভ্যাস (কবিতা) | ... | ১৬২ |

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

| | | |
|---------------|-----|-----|
| দীর্ঘায়ুস্তব | ... | ৬৮২ |
|---------------|-----|-----|

শ্রীনকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| বাঙ্গালা ভাষার প্রসার বৃদ্ধি | ... | ৩১৩ |
|------------------------------|-----|-----|

শ্রীনগেন্দ্র নাথ চৌধুরী

| | | |
|-------------------|-----|-----|
| পল্লীমা (কবিতা) | ... | ২২৮ |
|-------------------|-----|-----|

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| রাজা চিত্র সেন রায় | ... | ৩১১ |
|---------------------|-----|-----|

শ্রীনরেন্দ্র নাথ মজুমদার

| | | |
|----------------|-----|-----|
| ✓ একাচোরা ব্রত | ... | ৪৩৩ |
|----------------|-----|-----|

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ,

| | | |
|------------------------------------|-----|-----|
| রবীন্দ্র নাথের কাব্যে মৃত্যুকল্পনা | ... | ৩০২ |
|------------------------------------|-----|-----|

ত্রীনলিনী রঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীমদ্ রবীনাথ দাস গোস্বামী ও তাঁহার শ্রীপাঠ

... ৫২৩

ত্রীনরুপমা দেবী

✓ রাজকুমার ও রাজকুমারী

...

৭০৫

ত্রিনিশিকান্ত বিশ্বাস

বাঙ্গালী বচন

...

...

৪৬৬

ত্রীপরিমল কুমার ঘোষ

১। লগ্নজাবা (কবিতা)

...

৩০৬

২। স্মৃতি (কবিতা)

...

৪০৮

ত্রীপুষ্পকুন্তলা দত্ত

উমা (কবিতা)

...

...

২৬৯

ত্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১। অলিবাঁজ বা হল্‌দে পাণী (২)

...

...

৪৩৫

২। গৃহপাণী

...

...

৪২৬

৩। পাপিয়া

...

...

১৫

৪। বাবুট

...

...

১১২

৫। মধুকব

...

...

২১৩

৬। সহদেব

...

...

৩০২

৭। হল্‌দে পাণী

...

...

৩৬৬

৮। খোকা হ'ক

...

...

৬৬৫

৯। দ্বিজ রামপ্রসাদ

...

...

৬২৬

ত্রীপ্রতিভাময়ী দেবী

কবিতার প্রতি (কবিতা)

...

...

৪০৫

ত্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

মেঘ রাজ্যের সংবাদ (কবিতা)

...

...

৬৬০

প্রাপ্তি স্বীকার

✓ কতিপয় পুস্তক

...

...

৬৬০

ত্রীপ্রিয়দা রঞ্জন রায় এম, এ,

অড অগন্তের অস্তিম উপাদান ও

রাসায়নিক পদার্থ নিচয়ের উৎপত্তি }

...

...

১২৫

শ্রীবনমালি বেদাস্ততীর্থ এম, এ,

সনাতনী (সমালোচনা) ... ৬৭৪

শ্রীবাণীনাথ নন্দী

বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐশ্বর্য ও উন্নতি ... ২৬১

শ্রীবিজয় কুমার রায় বি, এ,

সাতারের প্রাচীন কীর্তি ... ৪০২

শ্রীবিজয়া কান্ত লাহিড়ী চৌধুরী

স্বতি (কবিতা) ... ৬২

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ

সত্যমোহনীর ব্রত ... ১২০

শ্রীদিনয় কুমার সরকার এম, এ, ও শ্রীযোগেন্দ্র কুমার ঝাংখ্যতীর্থ

রাজ ভরঙ্গিনী ... ১, ৮৪

শ্রীবিপিন বিহারী চক্রবর্তী

ভগবতী ডাঙ্গা ... ৩০৭

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বসু

পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ ... ৪৭৮, ৫২০

পূর্ববঙ্গে পালরাজগণের প্রতিবাদের উত্তর ... ৬৭৬

শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত

সরনামতির গান ... ৬১৭

শ্রীজয়কুমার সেন

পৃথিবী ও সৌররাস ... ৬৮১

শ্রীমহিম চন্দ্র নন্দী

পল্লীগ্রামে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি ... ৬৭৮

শ্রীমেঘনাদ সাহা

ধানরাই গ্রামস্থ বনোবাগব ... ২০৭

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালা ও জাভিঙ্গী ভাষা ... ৬৬

শ্রীযতীন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত

| | | |
|--------------------------------|-----|-----|
| ১। নবনিদ্রাধ (কবিতা) | ... | ১৭৩ |
| ২। প্রবাসী (কবিতা) | ... | ১০২ |
| ৩। মিনির ঘটকালী (গল্প) | ... | ২৩৪ |
| ৪। বখাওয়ানে সংস্কার (কবিতা) | ... | ৬০১ |

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়

| | | |
|----------------------------------|-----|----------|
| ১। জিজিগা | ... | ২৮৮ |
| ২। ঢাকার বস্ত্রশিল্প | ... | ১১০, ১৭৩ |
| ৩। পূর্ববঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গি দস্য | ... | ৩৩১ |

শ্রীযশোদালাল বণিক্ বি, এল

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| ১। বঙ্গা (কবিতা) | ... | ৪২২ |
| ২। নববর্ষ (কবিতা) | ... | ১৪ |
| ৩। বর্ষশেষ (কবিতা) | ... | ১৪ |

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, এক, আর, হিফ্ এস্

| | | |
|--------------------------------|-----|-----|
| ১। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং | ... | ৩৭৯ |
| ২। সি-ইউ-কি | ... | ৫১০ |

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত

| | | |
|---------------|-----|----------|
| ✓ তাটিরাল গান | ... | ১৪১, ১৪২ |
|---------------|-----|----------|

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| ১। ঘন ঘোর বরিষায় (কবিতা) | ... | ১৭৯ |
| ২। সে আজ কোঁথার (কবিতা) | ... | ৩২৮ |

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

| | | |
|----------------|-----|-----|
| ১। আমার ভ্রমণ | ... | ১৮১ |
| ২। রৈবতক পর্বত | ... | ৭৩৪ |

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এল্

| | | |
|------------------|-----|-----|
| সন্ধান (কবিতা) | ... | ১৪৮ |
|------------------|-----|-----|

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

| | | |
|------------------|-----|-----|
| বৃষ্টি (কবিতা) | ... | ৩০৬ |
|------------------|-----|-----|

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ

| | | |
|----------------------------|-----|-----|
| বিভাদিন্দ্রের অঙ্গপ্রাঙ্গণ | ... | ৩৩২ |
|----------------------------|-----|-----|

শ্রীশশাকমোহন সেন বি, এল

| | | | |
|--|-----|-----|----------|
| ১। পরমার্থ (কবিতা) | ... | ... | ৩৭৯ |
| ২। প্রকাশে (কবিতা) | ... | ... | ৪৯১ |
| ৩। বাণীপদ্য | ... | ... | ৪১, ৯৭ |
| ৪। বেদের উৎস-কবি (কবিতা) | ... | ... | ২৮৪ |
| ৫। ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি | ... | ... | ৫৬৫, ৬৮৪ |
| ৬। ভারতীয় সাহিত্যে বৌদ্ধ আদর্শের প্রভাব | ... | ... | ২৫৩, ৩৫০ |
| ৭। মধুবাসরে (কবিতা) | ... | ... | ১৩৩ |
| ৮। সংস্কৃত সাহিত্যে নবজীবন | ... | ... | ৪৪১ |
| ৯। কবি ও ঋষি (কবিতা) | ... | ... | ৬৪৬ |

শ্রীশিবশশী সাম্যাল এম, এ

| | | | |
|-------------------------|-----|-----|----|
| ভক্ততা ও ভগিনী (গল্প) | ... | ... | ৫১ |
|-------------------------|-----|-----|----|

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী এম, এ

| | | | |
|-------------------------------|-----|-----|---------------|
| ১। দীর্ঘজীবনের রহস্য | ... | ... | ৬২ |
| ২। পূর্বপুরুষীয় স্মৃতি | ... | ... | ১৬৯ |
| ৩। ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষাদর্শ | ... | ... | ২২২, ২৭৪, ৩৩১ |

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

| | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|
| ১। কবি (কবিতা) | ... | ... | ৭ |
| ২। ছায়াছন্দ (কবিতা) | ... | ... | ৩৫৬ |

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার সেন

| | | | |
|-------|-----|-----|----|
| প্রেম | ... | ... | ৭৪ |
|-------|-----|-----|----|

শ্রীসুখরঞ্জন রায় বি, এ

| | | | |
|----------------------------|-----|-----|-------------|
| ১। কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ | ... | ... | ১৭, ৭৫, ১৫৩ |
| ২। প্রবাসে (কবিতা) | ... | ... | ৫৭৬ |
| ৩। হাসি কান্না (গল্প) | ... | ... | ৫৪২ |

শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস

| | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|
| পূর্ববঙ্গে পালরাজ্যগণ (প্রতিবাদ) | ... | ... | ৬৭৪ |
|------------------------------------|-----|-----|-----|

শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়

| | | | |
|-------------|-----|-----|-----|
| ফতেঙ্গড়পুর | ... | ... | ২৩৪ |
|-------------|-----|-----|-----|

শ্রীসুন্দরমাসুন্দরী ঘোষ

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|
| ১। চুনারের স্মৃতি (কবিতা) | ... | ... | ৪৬০ |
| ২। বয়না (কবিতা) | ... | ... | ১৮০ |
| ৩। স সাহা স সাহা (কবিতা) | ... | ... | ৪৬২ |

শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| ভাগ | ... | ... | ৩২ |
|-----|-----|-----|----|

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

| | | | |
|------------------------|-----|-----------------|-----|
| ১। গাছাড়ে ঘেরে (গল্প) | ... | ... | ২২৫ |
| ২। পুরী | ... | .. | ৭ |
| ৩। প্রাচীন জাপান | . | ..২৬৬, ৩৪৪, ৫৫৫ | |
| ৪। স্বপ্ন (গল্প) | .. | .. | ১৫০ |

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্মা বি, এ

| | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| ১। দর্পহারী ভগবান (গল্প) | . | ... | ৩০৬ |
| ২। নৃতন ও পুরাতন (কবিতা) | ... | ... | ৪৬ |
| ৩। মরীচিকা (গল্প) | . | ... | ২৩২ |
| ৪। ভিখারীর দান (গল্প) | .. | ... | ৪৬০ |
| ৫। শ্মশানের পাশে (কবিতা) | .. | .. | ৩৬৮ |
| ৬। কবি কাহিনী (গল্প) | ... | ... | ৬৬৬ |
| ৭। চিত্রাঙ্গিতা (গল্প) | .. | ... | ৭২৭ |

শ্রীসৈয়দ এমদাদ আলী

| | | | |
|--------------------|----|-----|----|
| ঘুছে ফেল (কবিতা) | .. | ... | ৩৫ |
|--------------------|----|-----|----|

শ্রীহরিন্দ্রাস পালিত

| | | | |
|-------------------|-----|-----|----|
| শৈব ধর্মের ইতিহাস | ... | ... | ২৫ |
|-------------------|-----|-----|----|

শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত, এম, এ

| | | | |
|-----------|----|-----|-----|
| কবিস্মৃতি | .. | ... | ১৮৬ |
|-----------|----|-----|-----|

শ্রীহেমললিতা রায়

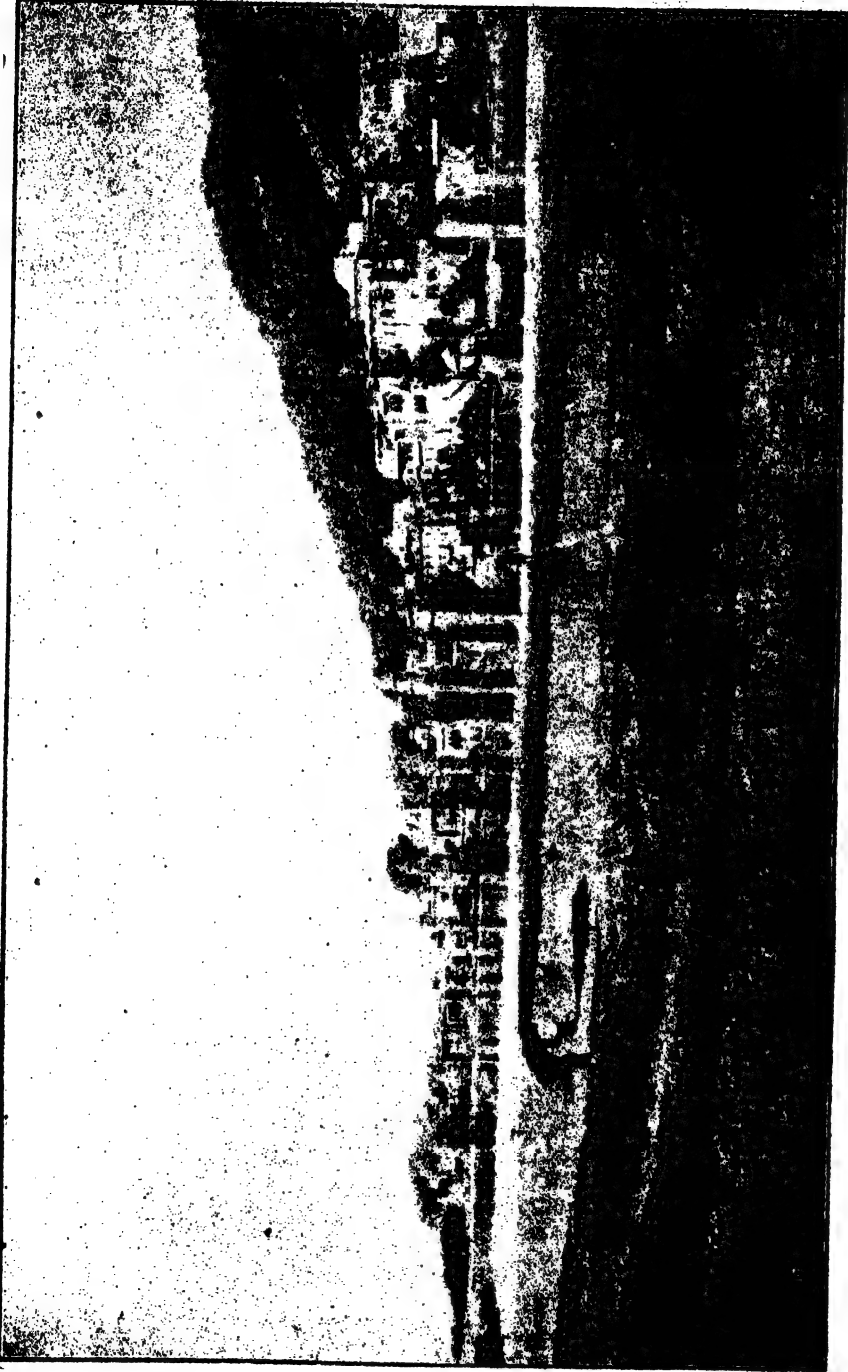
| | | | |
|---------------------------|----|--|--|
| মারিকো (জাপানী উপন্যাস) | .. | ২৮, ৩১, ১৮০, ২৪১, ২৮৫, ৩৫৭, ৪২৭, ৪৩২, ৫৮১, ৬০৫ | |
|---------------------------|----|--|--|

শ্রীহেমেন্দ্র কিশোর রক্ষিত ।

| | | | |
|---|----|-----|-----|
| মধ্যযুগে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউরোপীয় ছাত্রজীবন | .. | ... | ৫৫০ |
|---|----|-----|-----|

অজ্ঞাত

| | | | |
|---------------|-----|--|--|
| গ্রন্থমালোচনা | ... | ৬০, ১২২, ১৮৬, ২৪০, ৩০৮, ৩৬৮, ৪৬৯, ৫০৩, ৫৫৯, ৬১৬, ৬৬৬ | |
|---------------|-----|--|--|



Pl. B. P. & P. House Dacca.

উন্নয়ন।

প্রতিভা

২য় বর্ষ

বৈশাখ ১৩১৯

১ম সংখ্যা।

রাজতরঙ্গিনী ।

পঞ্চম ভরঙ্গ ।

মঙ্গলাচরণ—

দেহার্দ্ধঘটিত হরপার্কীতী অভিনব শরীরে প্রকাশ-
মান, অর্দ্ধাংশ পার্কীতী ও অর্দ্ধাংশ মহেশ্বর। উভয়ের
উক্তি প্রভূত্বজিতে বিহ্বা একভাবে স্পন্দিত হইয়া একটি
বাক্যই উচ্চারণ করিতেছে, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিভিন্ন
প্রকার। মহাদেব বলিতেছেন, “পার্কীতী। তোমার
কেশকলাপে কণীর স্তায় কুটিলতা ও কৃষ্ণকান্তি; কোকিল-
কণ্ঠ উচ্চারিত বচনাবলী চক্ষুঃশ্রবা কণীর চক্ষুর তৃপ্তিসাধন
করিতেছে।” পার্কীতী বলিতেছেন, “হে মহেশ্বর, তোমার
জটাজাল কণিমণ্ডিত, ও কণ্ঠতটে কোকিলকালিমা চক্ষুঃ-
শ্রবা কণিকুলের নয়ন পরিভূষ করিতেছে।” হরপার্কীতীর
এই উক্তি প্রভূত্বজি শ্রোতৃ-মণ্ডলের রক্ষা বিধান করুন।

মহারাজ অবস্থিবার্মা :—

শত্রুকুলারাতি অবস্থিবার্মার রাজ্যলাভে সজ্জনেরা আন-
ন্দিত হইলেন। রাজমন্ত্রী যেমন সঙ্গুণ বিভূষিত
ছিলেন, রাজাও তদনুরূপ। ইঁহার উভয়েই ক্রমাশীল,
নিরহঙ্কার, ও পরস্পর অনুরক্ত ছিলেন। বিবেকী অবস্থিবার্মা
রাজ্যলাভ করিয়া রাজসম্পদে বীতম্প্রহ হন, রাজত্রীর
চাকল্যের বিষয় চিন্তা করিয়া ব্যথিত অস্তঃকরণে পূর্ব

রাজগণ কর্তৃক সঞ্চিত রৌপ্য সুবর্ণ প্রভৃতি ধনরাশি ব্রাহ্মণ
গণকে বিতরণ করেন। রাজা একপ ভাবে স্বীয় ধনরাশি
বিতরণ করিয়াছিলেন যে, রাজচিহ্নস্বরূপ তীহার ছত্র
ও চামর মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ইনি রাজ্যলাভ করিয়া
প্রথমতঃ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই কারণ অসমৃদ্ধ
জাতিবর্গ ইঁহার প্রতিকূলতা করিতে আরম্ভ
করেন। কিন্তু যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়া
ইনি শেষে রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন। ইনি অভিনব
বাৎসল্যসম্পন্ন ছিলেন। বন্ধু ও ভৃত্যগণকে সম্পদের
অংশভাগী করিবাছিলেন। বৈষায়েয় ভ্রাতা ধীমান
শূরবর্মাকে সুবরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুবরাজ
বাণ্য ও হস্তকর্ণ নামক দুইটি স্থান অগ্রহার প্রদান করেন,
শূরবর্মাব্রাহ্মী নামে বিষ্ণুর মন্দির ও একটি গোকুল
নির্মাণ করেন, “মর্ত্য মাহাত্ম্য মন্দির” নামক ষষ্ঠ স্থাপন
করেন। রাজভ্রাতা ‘সম্বর’ চতুর্ভূহসম্বিত বিষ্ণু স্থাপন
করেন। শূরবর্মার অপর দুই ভ্রাতৃপুত্র (‘১’ শুরাবরজো
শ্লোক ২৬) দীর ও বিম্ব কর্তৃক স্ব স্ব নামে দুইটি দেবালয়
প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজদৌবারিক মহোদয় মহোদয়ব্রাহ্মী
নামক বিষ্ণুমূর্তির স্থাপনিত। বৈষাকরণ রামকোপাধ্যায়
ব্যাকরণ অধ্যাপনার লভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মন্ত্রী প্রভাকরবর্মী “প্রভাকর ব্রাহ্মী” নামক বিষ্ণু
মূর্তি স্থাপন করেন। মন্ত্রীর একটা শুক পক্ষী ছিল। এ
পক্ষী যুক্তা সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রীকে প্রদান করিত।

প্রভাকর তকের স্বর্ণার্থ ‘শুকাবলী’ রচনা করেন।

এই সময়ে কাশ্মীরে বিদ্যাচর্চা বিলুপ্ত হইয়াছিল। বন্থী শূর নানা স্থান হইতে পণ্ডিতগণকে আনয়ন করেন ও রাজসোপায়ে সম্মানে সম্মানিত করেন। অবন্তিবর্ম্মার রাজত্বকালে মুক্তাকর্ণ, শিবস্বামী, আনন্দবর্দ্ধন ও রত্নাকর এই চারি জন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শূরবর্ম্মা বহুসংখ্যক দেবালয় ও মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

অবন্তিবর্ম্মা নির্ম্মলসর ছিলেন। তিনি সহোদরদিগের প্রতি বৈরূপ ব্যবহার করিতেন, শূরবর্ম্মা ও তাহার পুত্র গণের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। রাজা বিক্ষুব্ধ ছিলেন। শূরবর্ম্মা শৈব ছিলেন। অবন্তিবর্ম্মা অবন্তি-পুর নামক নগর স্থাপন করিয়া তাহাতে অবন্তিস্বামী নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

শূরবর্ম্মা রাজার প্রতি অতিশয় অশ্রুজ্ঞ ছিলেন। এমন কি তিনি রাজার প্রীতির জন্য জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিতেন।

অবন্তি বর্ম্মার রাজত্বকালে “ভট্টকল্লট” প্রভৃতি সিদ্ধগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাপদ্ম হ্রদের জল নদীর জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া এ দেশ জলপ্লাবিত করিত ; সেই জন্য অতি অল্প পরিমাণ শস্ত উৎপন্ন হইত ; ললিতাদিত্যের চেষ্টায় জলপ্লাবনের গতি কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়াছিল। কিন্তু জয়্যাপীড়ের পরবর্ত্তী রাজগণ বীনবীৰ্য্য হওয়ারাতে দেশ পুনর্বার জলপ্লাবিত হইলে প্রবল দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই সময়ে অসাধারণকর্ম্মা ‘সুখা’ অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে রাজ-সাহায্য গ্রহণ করিয়া দেশে জলপ্লাবন নিবৃত্ত করেন। তাহার কলে দেশে প্রচুর শস্ত হইয়াছিল। তিনি কোথাও প্রস্তরসেতু কোথাও বা বহু সংখ্যক খাল কাটিয়া প্লাবনের গতি মন্দীভূত করেন ও নদীমুখ পরিষ্কৃত করিয়া জননির্গমের সুবন্দোবস্ত করেন। সুখ্য এইরূপে বহু জলমগ্ন স্থানের উদ্ধার সাধন করেন। নদীমাতৃক স্থানসমূহ পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ নদীজল গমনের ব্যবস্থা করেন। নানা স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া যতখানি সময়ে যে ভূমিতে যে পরিমাণ

জল শোষিত হইতে পারে, তথায় সেই পরিমাণ জল সেকের ব্যবস্থা করেন। চানুলা* প্রভৃতি নদীর জল চতুর্দিকে প্রবাহিত করিয়া সর্বত্র শস্তোৎপত্তির সুব্যবস্থা করেন।

সুখা বিত্তস্তা নদীতীরে স্বনামাখ্যাত এক সুসমৃদ্ধ নগর স্থাপন করেন ও মহাপদ্ম সরোবরে মৎস্য ও পক্ষীকুলের হিংসানিবারক মর্যাদা নিরূপণ করেন। জলপ্লাবন হইতে দেশ উদ্ধার হইলে অবন্তিবর্ম্মা কর্তৃক জয়স্থল প্রভৃতি বহু গ্রাম স্থাপিত হয়। যখন রাজা রোগগ্রস্ত হইয়া আপনার আয়ুঃশেষ বুঝিতে পারিলেন তখন ত্রিপুরেশ পর্ত্তস্থিত জ্যোতিষ্বর ক্ষেত্রে গমন পূর্বক ভগবদ্গীতা শ্রবণ ও বিষ্ণুস্মরণ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অবন্তিবর্ম্মা ৫০ বৎসর বয়সে আষাঢ় শুক্ল পক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

মহারাজ শঙ্কর বর্ম্মা :—

মহারাজ অবন্তিবর্ম্মার পুত্র শঙ্করবর্ম্মা রাজ্য গ্রহণ করেন। বিদ্যাপ্রাপ্য কৰ্ম্মক কৰ্ত্তক শূরবর্ম্মার পুত্র সুখবর্ম্মা যুবরাজপদে অভিষিক্ত হন। যুবরাজের সহিত রাজার মনোমালিন্য উপস্থিত হয় ; পরিশেষে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইলে বহু কষ্টে সুখবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া শঙ্করবর্ম্মা বিজয়ী হন। অনন্তর শঙ্করবর্ম্মা দিগ্বিজয় অভিলাষী হইয়া নয় লক্ষ সৈন্তের সহিত কাশ্মীর হইতে যাত্রা করেন। অনন্তিভক্ত সৈন্তগণকে স্বীয় বুদ্ধি-কৌশলে সুশিক্ষিত করিয়া লন। অস্ত্রাস্ত্র নৃপতিগণের সাহায্য পাইয়া শঙ্করবর্ম্মার সৈন্তসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। দার্কীভিসার-রাজ শঙ্করবর্ম্মার আগমনে ভীত হইয়া পলায়ন করেন। তাহার অবসমূহ শঙ্করবর্ম্মার হস্তগত হইল। এই সময়ে শঙ্করবর্ম্মার সৈন্ত-সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়া নয় লক্ষ পদাতি, তিন শত হস্তী, ও একলক্ষ অশারোহী সৈন্তে পরিণত হইল।

* অন্য মতে নামটি আনুলা ; ‘চকার চানুলাভিঃ’ ইত্যাদি, শ্লোক ১১২]

ত্রিগুপ্তরাজ ভীত হইয়া পলায়ন করেন, গুর্জররাজ অলম্বান যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শঙ্করবর্মাকে টকদেশ প্রদান করেন।

ভোজরাজ কর্তৃক হৃত থাকিয়ক রাজ্য গ্রহণ করিয়া থাকিয়রংশীয় নৃপতিগণকে প্রদান করেন। প্রবল প্রতাপাবিত লল্লীয়াশাহি শঙ্করবর্মাকে বিভাড়িত করিতে গিয়া পরাজিত হন।

এইরূপে দিগ্বিজয় সমাপ্ত করিয়া শঙ্করবর্মার কাশ্মীরে প্রত্যাগত হইলেন ও নানাবিধ সংকার্যের অনুষ্ঠান করিলেন।

অনন্তর রাজা অত্যন্ত লোভ-পরবশ হইয়া প্রজাপীড়নে উদ্যুক্ত হন। নৃপতি বাসনাসক্ত হওয়াতে রাজকোষ ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। তখন তিনি দেবতাদি অপহরণ করিয়া কৃতিপূরণ করিতে লাগিলেন। রাজা মাত্র ৬৪টী দেবালয়ের তত্ত্বাবধান-ভার স্বীয় হস্তে করিয়া অল্প দেবালয়সমূহ পরিত্যাগ করিলেন, কর্মচারিগণের বেতন কমাইয়া দিলেন ও প্রজাপুঞ্জের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিবার সুবিধা করিলেন।

প্রজাপুঞ্জের অসাধারণ ক্রোধ প্রত্যক্ষ করিয়া রাজপুত্র গোপালবর্মার অত্যন্ত মর্মান্বিত হন ও প্রজাগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে পিতার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই।

রাজা দ্রুত হইলেও ভল্লট প্রভৃতি কবিরুদ্ধ রাজভয়ে ভীত হইয়া রাজ-সংস্রব পরিত্যাগ করেন নাই। রাজা অতিশয় বাসনাসক্ত ছিলেন। দ্রোহ আশঙ্কা করিয়া দার্ষাভিসার-রাজ নরবাহনকে অনুচরগণের সহিত নিহত করিয়াছিলেন। উত্তরাপথে সিন্ধুতীরস্থ নৃপতিবৃন্দকে পরাজিত করিয়া প্রত্যাঘর্ষন করিতেছিলেন, পথে উরশা নামক স্থানে রাজপৈশঙ্গগণের সহিত উরশাবাসিগণের কলহ উপস্থিত হয়। এই সময় একজন ব্যাধ পর্ত্তশৃঙ্গে আরোহণ পূর্বক রাজাকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করে। ঐ তীর রাজার গলদেশে বিদ্ধ হওয়ায় শঙ্করবর্মার মৃত্যু হন

বিধ্বস্ত সেনাপতির হাতে সৈন্ত রক্ষার ভার প্রদান করিয়া কর্ণীরথে আরোহণ করিয়া তথা হইতে বহির্গত হন। আসন্নমৃত্যু রাজা রাজ্ঞী সুগন্ধার প্রতি স্বীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র গোপালবর্মার রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন ও পশ্চিমমুখেই ৭৭ বৎসরে ফাল্গুনের কৃষ্ণা শুক্লরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সুখরাজ প্রভৃতি সেনাপতিগণ সৈন্ত লইয়া গমন করিতে লাগিলেন; পররাজ্যে বাস করিতে-ছিলেন বলিয়া রাজার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ করিলেন না। রাজার মৃত্যুর ছয় দিন পরে স্বীয় অধিকারে উপস্থিত হইলে বোল্লাসক নামক স্থানে রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সুরেন্দ্রবতী প্রভৃতি তিনজন রাজ্ঞী রাজার অনুগমন করিলেন। জয়সিংহ লাড় ও ব্রজসার নামক ভৃত্যদ্বয়ও রাজার অনুগমন করিলেন।

মহারাজ গোপালবর্মা :—

গোপালবর্মার মাতার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি ধার্মিক ও সত্যবাদী ছিলেন। দ্রবর্ত্তগণের মধ্যে বাস করিয়াও কুসংস্কারা-পন্ন হন নাই। রাজমাতা সুগন্ধা মন্ত্রী প্রভাকরের প্রতি আসক্ত হইলেন। মন্ত্রী প্রভাকর নির্ভয়ে কোষাগার লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ভাণ্ডাপুরের (১২০১ শ্লোক) শাহি আজ্ঞাতিক্রম করাতে প্রভাকর সসৈন্তে তথায় উপস্থিত হইয়া শাহিকে রাজ্যচ্যুত করিলেন ও তত্রত্য লল্লিয়পুত্র তোমরাণকে কমলক নাম প্রদান করিয়া তাহার হস্তে রাজ্য অর্পণ করিয়া কাশ্মীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও অত্যন্ত গর্ভিত হইয়া উঠিলেন। গোপালবর্মার সমস্ত অবগত হইয়া কোষগণনায়া উত্তত হইলে প্রভাকর “যুদ্ধে সমস্ত ব্যয়িত হইয়াছে” বলিয়া রাজাকে নিরস্ত করিলেন ও স্বীয় অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া অভিচারবিৎ রামদেব দ্বারা অভিচার করাইয়া রাজাকে নিহত করিলেন। ইহার রাজ্যকাল মাত্র দুই বৎসর।

মহারাজ শঙ্কট :—

গোপাল বর্মার ভ্রাতা। ইনি দশ দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া গতাস্থ হন।

রাজ্ঞী সুগন্ধা :—

প্রজাবৃন্দের প্রার্থনামুদারে রাজ্ঞী সুগন্ধা স্বহস্তে রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন। ইনি গোপালপুর, গোপালমঠ ও গোপালকেশব স্থাপন করেন। স্বীয় নামে একটি নগরীও প্রতিষ্ঠিত করেন। গোপালবর্ম্মার পত্নী নন্দা মঠ ও বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন। গোপালবর্ম্মার মৃত্যুকালে তদীয় অপর পত্নী জয়লক্ষ্মী অস্থব্রতী ছিলেন। কালক্রমে তিনি একটি পুত্র প্রসব করেন। ঐ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাজ্ঞী সুগন্ধা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া এই বংশীয় অল্প এক ব্যক্তিকে রাজ্যপ্রদান করিতে উদ্ভত হন। এই সময় কাশ্মীরে তন্ত্রী ও একাদ্র নামে দুই সম্প্রদায় অত্যধিক প্রবল হইয়া উঠে। ইহারা রাচার প্রতিও অল্পগ্রহণিগ্রহ করিতে সমর্থ ছিল। ইহাদের অল্পগ্রহে রাজ্ঞী সুগন্ধা দুই বৎসর রাজত্ব করেন। [২০৭-৮]

রাজ্ঞী শুরবর্ম্মার পৌত্র সুধবর্ম্মার পুত্র নির্জিত-বর্ম্মাকে রাজ্যপ্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু নির্জিতবর্ম্মা অকর্ম্মণ্য বলিয়া তন্ত্রী ও একাদ্র সম্প্রদায় অসম্মতি প্রকাশ করেন। অনন্তর তন্ত্রী সম্প্রদায় মিলিত হইয়া নির্জিত বর্ম্মার দশ বৎসর বয়স পূত্র পার্থকে রাজ্য প্রদান করিলেন।

মহারাজ পার্থ :—

তন্ত্রী সম্প্রদায়ের অল্পগ্রহে নির্জিতবর্ম্মার পুত্র পার্থ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাজ্ঞী সুগন্ধা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন। একাদ্রী সৈনিক-বৃন্দ মিলিত হইয়া '৮০ লৌকিক অঙ্গে হরুপুর হইতে সু-গন্ধাকে আনিয়ন করিল। ইহাতে তন্ত্রী দলের সহিত একাদ্র সম্প্রদায়ের সজর্ষ উপস্থিত হয়। একাদ্র সৈনিকগণ পরাজিত হইল। রাজ্ঞী তন্ত্রীদিগের হস্তে বন্দিনী হইয়া এক নির্জন বিহারে নীতা হইলেন এবং সেই বিহারেই রুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া গতানু হইলেন। নির্জিতবর্ম্মা পুত্র পার্থবর্ম্মার রক্ষকরূপে থাকিয়া দুই অমাত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া উৎকোচ গ্রহণ করিতে

আরম্ভ করিলেন। তন্ত্রীদিগকে হস্তিকাপ্রদানই পরা-ক্রান্ত সামন্ত নৃপতিগণের জীবিকা হইয়াছিল। মেরু-বর্দ্ধনের পুত্রগণ রাজ্যলাভেচ্ছ হইয়া প্রজাপীড়ন দ্বারা অর্থার্জন করিতে লাগিল। কাশ্মীরের এই দুঃবস্থার সময় জলপ্লাবনে শরৎকালীন শালিধাত্ত বিনষ্ট হইয়া ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষে বহুলোক ক্ষয় হয়। এই সময় তন্ত্রীগণের চক্রান্তে কখন পার্থকে পরাজিত করিয়া পিতা নির্জিতবর্ম্মা রাজ্য গ্রহণ করিতেন, কখনও বা নির্জিতবর্ম্মাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পার্থ রাজ্য গ্রহণ করিতেন।

মহারাজ নির্জিতবর্ম্মা (পঙ্গু) :—

তন্ত্রিগণের সাহায্যে নির্জিত বর্ম্মা পার্থকে রাজ্যচ্যুত করিয়া '৯৭ অঙ্গে পৌষ মাসে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পঙ্গুর পত্নীগণ অতিশয় দুষ্টরিত্রা ছিলেন। রাজ্ঞী বগ্নট দেবী ও মৃগাবতী মন্ত্রী সুগন্ধাদিত্যের সহিত অবৈধ প্রণয় পাশে বদ্ধ হইয়া স্বীয়পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য মন্ত্রী সুগন্ধাদিত্যকে বহু অর্থ প্রদান করেন। '৯৮ অঙ্গে মাঘ মাসে স্বীয় পুত্র শিশু চক্রবর্ম্মাকে রাজ্য প্রদান করিয়া রাজা পরলোকগত হন।

মহারাজ চক্রবর্ম্মা :—

ইহার পিতার নাম নির্জিতবর্ম্মা, মাতার নাম বগ্নট দেবী। পিতার মৃত্যুর পর দশ বৎসর চক্রবর্ম্মা মাতা ও মাতামহী ক্ষিত্তিকদেবীর তত্ত্বাবধানে অবস্থান করেন। পিতৃরাজ্যলাভেচ্ছ পার্থের অল্পচর তন্ত্রিগণের সহিত একাদ্র সম্প্রদায়ের যুদ্ধ হয়। ১ম (লৌকিক ৪০০৯) অঙ্গে মস্ত্রিবৃন্দ চক্রবর্ম্মাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজ্ঞী মৃগাবতীর গর্ভজাত নির্জিতবর্ম্মার অপর পুত্র শুরবর্ম্মাকে অভিষিক্ত করেন।

মহারাজ শুরবর্ম্মা :—

নির্জিতবর্ম্মার পুত্র, মৃগাবতীর গর্ভজাত। রাজমাতা মৃগাবতী মন্ত্রী মেরুবর্দ্ধনের দ্বিহিতা ছিলেন। মেরুবর্দ্ধনের পুত্রগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্বীয় ভগিনীকে পঙ্গু নির্জিতবর্ম্মার

সহিত বিবাহ প্রদান করিয়াছিল। মাতুলগণের স্বেচ্ছা-চারিতায় তন্ত্রী সম্প্রদায় উপযুক্ত অর্থ প্রাপ্ত না হইয়া শ্রবণার্থকে সিংহাসনচ্যুত করিল ও বহুঅর্থপ্রদ পার্থকে পুনর্বার রাজ্য প্রদান করিল।

মহারাজ পার্শ্ব (২য় বার) :—

মহারাজ পার্শ্ব তন্ত্রীগণের সাহায্যে পুনর্বার রাজ্য লাভ করিয়া সাম্বতী নাম্নী এক বেণীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইলেন। এই বেণী তন্ত্রীগণের সমস্ত চক্রান্ত অবগত ছিল। তজ্জন্ম তন্ত্রী সম্প্রদায় পার্শ্বের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। এই অবসরে চক্রবর্তী তন্ত্রীদিগকে বহুল অর্থ প্রদানে সম্মত হইয়া তাহাদিগের সাহায্যে, ১১ অব্দে আষাঢ় মাসে সিংহাসন আরোহণ করেন।

মহারাজ চক্রবর্তী (২য় বার) :—

চক্রবর্তী রাজ্য লাভ করিয়া মেরুবর্জনের পুত্রগণকে প্রধান প্রধান রাজকার্যে নিযুক্ত করেন। শঙ্করবর্জনে অক্ষপটলাবীশ হইলেন, শম্ভুবর্তী গৃহকার্যে নিযুক্ত হইলেন। চক্রবর্তী রাজ্যপ্রাপ্তির বৎসরেই তন্ত্রীগণের কথিত হুতিকা প্রদানে অসমর্থ হন ও রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া মড়ব রাজ্যে গমন করেন।

মহারাজ শম্ভুবর্জনে :—

মহারাজ চক্রবর্তীর পলায়নের পর শঙ্করবর্জনে রাজ্যার্থী হইয়া তন্ত্রীদিগের নিকট শম্ভুবর্জনে দূতরূপে প্রেরণ করেন ; শম্ভুবর্জনে তন্ত্রীদিগকে অধিক উৎকোচ প্রদানে সম্মত হইয়া তাহাদিগের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করেন।

মহারাজ চক্রবর্তীর রাজ্যপ্রাপ্তি :—

একদা রাজ্যভ্রষ্ট চক্রবর্তী চক্রবাসী ডামরাধিপতি সংগ্রামের গৃহে গমন করিয়া তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ডামরাধিপতির সহিত রাজার বহু কথোপকথনের পর ডামরপতি সংগ্রাম রাজার সাহায্য করিতে সম্মত হন। অনন্তর অসংখ্য ডামর সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া চক্রবর্তী রাজধানী অভিযুগে

গমন করেন। শঙ্করবর্জনে তন্ত্রীদিগের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হন। চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে পদ্মপুরের বহির্ভাগে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শঙ্করবর্জনে মহারাজ চক্রবর্তনের হস্তে নিহত হইলেন। তন্ত্রীসৈন্য ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই যুদ্ধে ৫১৬ সহস্র তন্ত্রী সৈন্য নিহত হয়। এদিকে মন্ত্রীবর্গ ও একান্ত সম্প্রদায় চক্রবর্তীর সহিত মিলিত হইল। শম্ভুবর্জনে হতাবশিষ্ট তন্ত্রী সৈন্যগণের সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে মহারাজ চক্রবর্তী মহা সমারোহে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনারোহণ করিলেন। রাজার সিংহাসারোহণের পর ভূতট কর্তৃক শম্ভুবর্জনে ধৃত হইয়া রাজসমীপে আনীত হইয়া চণ্ডাল কর্তৃক নিহত হইলেন। চক্রবর্তী রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে গর্ভিত হইয়া উঠিলেন। এই সময় রঙ্গ নামক একজন বৈদেশিক প্রসিদ্ধ গায়ক রাজধানীতে আগমন করে। এই গায়ক জাতিতে ডোম। এই গায়কের হংসী ও নাগলতা নাম্নী অসাধারণ রূপবতী দুইটি কন্যা ছিল। রাজা কন্যাদ্বয়ের সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের প্রণয় পাশে আবদ্ধ হন। রাজা অমুরাগাক্ত হইয়া হংসীকে পটুমহিষী করেন। ডোমগণ রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অত্যধিক ক্ষমতালালী হইয়া উঠে। রাজা চক্রবর্তী বহু অসৎ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া নৃপাসন কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব উপকার বিস্মৃত হইয়া নিরপরাধ ডামরগণকে গোপনে নিহত করিতে লাগিলেন। ডামরগণও অবসর ক্রমে একদা শৌচগৃহে একাকী দেখিতে পাইয়া ১৩ অব্দে জৈষ্ঠ শুক্লাষ্টমী রাত্রিতে তাহাকে নিহত করিল।

মহারাজ উদ্যতাবন্তি :—

শরীট প্রভৃতি মন্ত্রীগণ পার্শ্বের হুশাসয় পুত্র উদ্যতাবন্তীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। ইনি চক্রবর্তী হইতেও পাপিষ্ঠ ছিলেন। ইনি স্বীয় পিতৃ-পুরুষের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। পরকণ্ঠ নামক এক ধৃত রাজ্য আত্মসাৎ করিবার মানসে শরীট, ছোজ, কুমুদ, ও অন্ততাকার এই পাঁচ জন মন্ত্রীর সহিত বন্ধুত্বস্থলে

আবদ্ধ হয় ও রাজাকে কুপরামর্শ প্রদান করিয়া কুলঙ্কয়ে প্রবর্তিত করে। উন্নতাবস্তি স্বীয় পিতা পার্শ্বের সর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া লইলে পার্শ্ব নিক্রপায় হইয়া পত্নীর সহিত ত্রিজয়েষু বিহারে আশ্রয় লইয়া অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতে থাকেন। একদা উন্নতাবস্তি সামন্ত ও সৈনিকগণের সহিত মিলিত হইয়া জয়েষু-বিহার আক্রমণ করেন ও শঙ্করবর্মার প্রভৃতি শিশু সম্ভানগণের সহিত পার্শ্ব ও পার্শ্বপত্নীকে বীভৎস ভাবে নিহত করেন। এই সময় ডা'মর ও কায়স্থগণ দেশভূতনে প্রবৃত্ত হয়। উন্নতাবস্তি যুবতীগণের স্তনচ্ছেদ, গর্ভবতীর উদরবিদারণ প্রভৃতি অতি নৃশংস ব্যাপারের অমুষ্ঠান করিতেন। এই রাজার চৌদ্দ জন পত্নী ছিল। উন্নতাবস্তি বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ক্ষয়রোগে প্রাণত্যাগ করেন। রাজার মৃত্যুকালে পরিচারিকাগণ কোথা হইতে এক শিশুকে আনিয়া রাজপুত্র বলিয়া মিথ্যা প্রকাশ করে। উন্নতাবস্তি এই শিশুকে শূরবর্মার নামে অভিহিত করিয়া সিংহাসন প্রদান করেন ও অমাত্য একাজ ও তন্ত্রীদিগের হস্তে রক্ষার ভার প্রদান করিয়া '১৫ অব্দে আষাঢ় মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কম্পনাধিপতি (সেনাপতি) কমলবর্দ্ধনের সহিত উন্নতাবস্তির শত্রুতা ছিল। কমলবর্দ্ধন মৃড়ব রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন।

মহারাজ শূরবর্মার :—

পিতৃঘাতীর পুত্র শিশুরাজা শূরবর্মার আষাঢ় শুক্ল সপ্তমীতে “জয়স্বামী বিরোচন” দর্শন করিবার জন্ত যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে চরমুখে কমলবর্দ্ধনের সৈন্তে নগরগমন বার্তা প্রবণ করিয়া একাজ তন্ত্রী ও অঝাদোহী সৈন্তের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন। পথিমধ্যে কমলবর্দ্ধনের সহিত রাজসৈন্তের যুদ্ধ হয়। কমলবর্দ্ধন বিজয়ী হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। শিশু রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া তদীয় সৈন্তগণ পলায়ন করিল। রাজমাতা শিশুরাজাকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিলেন।

কমলবর্দ্ধন বৃত্তান্ত :—

মৃত কমলবর্দ্ধন রাজ্য লাভ করিয়াও সিংহাসনারোহণ করেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণগণকে একত্র করিয়া কহিলেন, “আপনারা স্বদেশজাত কোনও সমর্থ ব্যক্তিকে রাজ-সিংহাসন প্রদান করুন।” কমলবর্দ্ধনের ধারণা ছিল, ব্রাহ্মণেরা তাহাকেই মনোনীত করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের পরস্পর মতের অনৈক্য হওয়াতে তাঁহার কাহাকেও নির্দিষ্ট করিতে পারিলেন না। এ দিকে পিতৃঘাতীর পত্নী শিশু শূরবর্মার রাজ্য প্রাপ্তির জন্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট রাজকর্মচারিগণকে প্রেরণ করিলেন। কর্মচারিবৃন্দ যশস্কর নামক এক বাগ্মী ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণগণ যশস্করকে দেখিতে পাইবামাত্রই তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিতে সম্মত হইলেন ও তাঁহার সত্তর হইয়া বিধান যশস্করকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।

যশস্করের পরিচয়—পিশাচকপুরে বীরদেব নামক এক গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহার কামদেব নামক এক পুত্র ছিলেন। কামদেব শিক্ষিত সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি মন্ত্রী মেরুবর্দ্ধনের গৃহে বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। ক্রমে ইনি শঙ্করবর্মার কোবাধ্যক হন। কামদেবের পুত্র প্রভাকর। ইনি মুর্থ ছিলেন। রাজ্যী দুগন্ধার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া প্রচুর অর্থশালী হন। দেশ বিপ্লবে সমস্ত ধনরাশি বিনষ্ট হয়। প্রভাকরের পুত্র যশস্কর। ইনি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। কল্কনক নামক এক বজ্রর সহিত দেশান্তরে গমন করেন। একদা স্বপ্ন দর্শন করিয়া যশস্কর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন।

পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম তরঙ্গের নৃপতিগণের নাম।

- ১। মহারাজ অবন্তিবর্মার।
- ২। মহারাজ শঙ্করবর্মার।
- ৩। গোপাল বর্মার।
- ৪। মহারাজ শকট।
- ৫। রাজ্যী দুগন্ধা।

৬। মহারাজ পার্শ্ব ।

৭। মহারাজ নির্জিতবর্ণা ।

৮। মহারাজ চক্রবর্ণা ।

৯। মহারাজ শূরবর্ণা ।

১০। মহারাজ পার্শ্ব ২য় বার ।

১১। মহারাজ চক্রবর্ণা ২য় বার ।

১২। মহারাজ শঙ্কুবর্ণা ।

১৩। মহারাজ উদ্যোতবন্তী ।

১৪। ২য় মহারাজ শূরবর্ণা ।

১৫। মহারাজ যশস্কর ।

তার কটাক্ষে চিতার ভঙ্গ

নবীন জীবনে উঠে গো জীয়ে !

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দত্ত

পুরী ।

অরণ্যভীত কাল হইতে হিন্দুর দেশে তীর্থযাত্রীর অভাব কখনো হয় নাই। যখন রেল ছিল না, ষ্টীমার ছিল না; পথ যখন দুর্গম বিপদ সম্বল ছিল; যখন তীর্থে যাওয়া আর প্রাণ হাতে করিয়া লইয়া যাওয়া এক কথা ছিল, তখনো কত সহস্র, লক্ষ পুরুষ ও রমণী তীর্থে গিয়াছে। ক্রান্ত চরণ যখন আর চলিতে চাহে নাই, শ্রান্ত অবসর দেহ যখন ভূমিতে লুটাইতে চাহিয়াছে, তখনো তাহারা ভগ্নমনোরথ হয় নাই। আত্মীয় কুটুম্ব বা প্রিয়জন রোগে কাতর হইয়াছে, তাহাকে পাছনিবাসে রাখিয়া যাত্রীর দণ ছুটিয়া চলিয়াছে; কত লোক, যে পথে গিয়াছে সে পথে আর ফিরে নাই, তাদের দেহান্তি তীর্থপথের ধুলির সহিত মিশিয়াছে! তার পর যেদিন দীর্ঘ পথের অবসানে রৌদ্রদগ্ধ ধূলিধূসরিত যাত্রীদের চোখের সামনে মন্দিরের চূড়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, তখন তাদের অন্তর হইতে যে পুলকিত জয়ধ্বনি উখিত হইত, তাহা যে জগন্নাথের কর্ণে পৌছিত তাহাতে সন্দেহ কি!

পুরী হিন্দুর একটা প্রধান তীর্থ—বলিলে বোধ হয় অত্যাক্তি হয় না, ইহাই হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। কারণ জগন্নাথের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, শূদ্র চামারে ভেদ নাই—এখানে সব এক। ভারতবর্ষের অন্ত্র তথাকথিত উচ্চ জাতীয়েরা যে সব লোকের স্পর্শিত জল পর্যাস্ত গ্রহণ করেন না, এখানে তাঁহারা ইহা সেই সব লোকের দ্বারা বিক্রীত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণেও বিধা করেন না! বিবেচকের নিকট তাঁর সকল সম্মানই সমান; সর্বাঙ্গ চিত্ত মানব তাঁহাকে অবমাননা করিয়া পরম্পরের মধ্যে দেওয়াল তুলিয়াছে, গভী দিয়াছে। যেদিন আমরা বৃষ্টিব জগন্নাথ

কবি ।

(একটি জাগানী কবিতার ইংরাজি হইতে)

আঁধার অতল হ'তে সে এসেছে

উজল মুকুতা মূঠায় ভরি',

বেকত-গোপন সত্য-সপন

নব জাগরণে জাগিল, মরি!

নিশ্বাসে তার ফুল-সৌরভ

বিহরিছে নিতি দিবস নিশা,

পপহারা যত গগনের তারা

তার ইন্দ্ৰিতে পায় গো দিশা!

সম্মুখে তার দধিন পবন,

পশ্চাতে তার আলোক-ছটা,

স্বপন আবেশে ফিরে দেশে দেশে

নিরবলম্ব নীরদ-বটী!

হৃদয় তাহার নৃত্য করিছে

হৃৎকম্পিত অনাদি তালে,

সে বেঁধেছে নীড় স্বর্গ্য-কিরণে

সকলের আগে আদিম কালে।

কণ্ঠ তাহার মধুর হয়েছে

নিশীথ শশীর অন্ত গিরে

কেবল পুরীতে বিরাজিত নহেন, তিনি সারা ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া বিরাজিত, সেদিন আর আমাদের একতা প্রমাণিত করিবার জ্ঞাত কংগ্রেস-কন্কারেন্স আহ্বানের প্রয়োজন হইবে না, এবং আমাদের সকল অমুষ্ঠান লজ্জাকর ব্যর্থতার শেষ হইবে না। কিন্তু আমরা বাড়ী ফিরিয়া আবার ‘পুনর্মুর্ষিক’ হই, তাই আমাদের আহ্বান কারো কানে পৌছায় না, তাই আমাদের ‘একতা’ আলেয়ার মতো কেবল দূরেই সরিয়া যায়, কোনো ক্রমে ধরা দেয় না।

আজকাল পথ সুগম হইয়াছে সপ্তাহ মধ্যে দূর ভীর্ষে গিয়া ফিরা যায়, আর সেই জগুই যাত্রীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু আজকাল যারা পুরী যান তাদের মধ্যে সকলে তীর্থদর্শনে যান না। কেহ যান ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান, কেহ যান স্বাস্থ্যের জ্ঞাত, আর কেহ যান বেড়াইতে। রেল, ষ্টীমার স্থাপিত হওয়ায় অনেক সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সঙ্গে হিন্দুর কষ্টসহিষ্ণুতা, ও দীর্ঘপথ পদব্রজে যাইবার সময় বিধাতার মুক্ত আকাশ ও বাতাস ও প্রকৃতির নিত্য নূতন অভিনব সৌন্দর্যের সহিত পরিচয়ের সুবিধা যে অনেকাংশে লোপ হইয়াছে সে কথা কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু যেখানেই সুবিধা সেখানেই কতক অসুবিধা, সকল সুবিধা এক সঙ্গে হয় না।

জগন্নাথ মন্দিরের

চারিটি প্রবেশপথ আছে। পূর্বে সিংহদ্বার, উত্তরে হস্তিদ্বার, পশ্চিমে খাজাঘার, দক্ষিণে অশ্বদ্বার।

বাহিরের প্রাচীর ২৪ ফীট বা ১৬ হাত উঁচু। উত্তর হইতে দক্ষিণের দৈর্ঘ্য ৬৭৬ ফীট, ও পূর্ক হইতে পশ্চিমে ৬৮৭ ফীট। বাহিরের প্রাচীরে পশ্চিম দিকে যে ফটক তাহার সামনাসামনি ভিতরের প্রাচীরেও একটা ফটক। এই ফটকের মধ্য দিয়া যে প্রান্ত্রে প্রধান মন্দির সেখানে প্রবেশ লাভ করা যায়।

পশ্চিমের ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণে ফুলের

বাগান। বেল, মল্লিকা, ঝুঁই, গোলাপ প্রভৃতির গাছ। তুলসী গাছও বিস্তারিত; উজানটির একেবারেই যত্ন করা হয় না। উজানের দক্ষিণপূর্ব কোণে ফুল গাছে জল দিবার জন্য সম্প্রতি একটি কুপ খনিত হইয়াছিল ও ম্যানেজার একটি ‘পম্প’ বসাইয়া জল তুলিবার সুবিধা করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু পাণ্ডারা ‘পম্প’ বসাইতে একান্ত নারাজ। কারণ ওটি বিলাতী জিনিষ। অথচ পূজার জন্য বিলাতী কাপড় গ্রহণে বাধা নাই।

ভিতরকার প্রাচীরের অংশ ঠিক বিমলা-মন্দিরের পশ্চাতে, সেই অংশটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

দক্ষিণদিকের ভিতরকার প্রাচীরের ঠিক পশ্চাতে, ১২ হাত চওড়া ও ২৪ হাত লম্বা একটি চাতাল। চাতালটি দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার উপর জগন্নাথের প্রসাদ, ভাত শুকানো হয়। এবং পরে এই ভাত যাত্রীদের জন্য আনন্দ বাগার ও অন্যান্য বাজারে বিক্রীত হয়।

পশ্চিমের ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়া বামদিকে বাহিরের প্রাচীর ও ভিতরের প্রাচীরের মাঝে (১) একটি নবনির্মিত কাঠের দোতারা গোলা বাড়ী, আন্দাজ ৭৫ ফীট লম্বা ও ২০ ফীট চওড়া। গোলাবাড়ীটি কয়েকটি ঘরে বিভক্ত। দরজাগুলি কাঠের, খুব মজবুত ও তালাবদ্ধ।

(২) একটি অপরিচ্ছন্ন চালাঘর। এটি টেকিশাল। গোলাবাড়ীর ধান ‘কুটিয়া’ এখানে চাউল প্রস্তুত করা হয়। এ ঘরটিরও কাঠের দরজা।

(৩) একটি মাঝারি আকারের পাকা চাতাল। ইহার উপর ধান শুকান হয়।

পুরী হইতে ১২-১৪ কোশ দূরে গনেশ ভারতী নামক এক সাধু বাস করিতেন। তাঁহার একটি ঘর ছিল ও ধানী জমিও অনেক ছিল। প্রায় ৪ বৎসর পূর্বে মৃত্যু-কালে তিনি সম্পত্তি জগন্নাথকে দিয়া যান। সেই ধান রাখিবার ও কুটিবার জ্ঞাত মন্দিরের ম্যানেজার গোলাবাড়ী ও টেকিঘর প্রস্তুত করাইয়াছেন।

উত্তরের ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়া ভিতরের ফটকের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই দক্ষিণে দেখিবেন একটি পাকা দেওয়ালের গায়ে তালাবদ্ধ একটি ছোট কাঠের দরজা, একটি কুপারের গায়ে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র, এবং সেই ছিদ্র দিয়া লোকেরা উঁকি দিয়া দেখিতেছে। এই ছিদ্র দিয়া দেখিলে দেখিবেন একটি কূপ। কূপের মুখ কয়েকখানা পুরাণো তক্তা দিয়া ঢাকা ; কূপের পশ্চাতে উচ্চভূমি।

এই কূপের জলে স্নানযাত্রার দিন জগন্নাথ, তাঁর ভগ্নী স্নতজা, ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম স্নান করেন। বৎসরে কেবলমাত্র সেই এক দিন দরজা খোলা হয়, কূপের মুখ-হইতে তক্তাগুলি সরান হয় ; দৈতাপতি পাণ্ডারা তিন ঘড়া জল তুলে ও স্নানমণ্ডপে—যেখানে বিগ্রহ কটিকে আনা হইয়াছে—লইয়া যায়। জলতোলা হইলেই তক্তাগুলি স্থানে স্থাপিত হয়, ও আর এক বৎসরের জন্য দ্বার বদ্ধ করা হয়।

স্নানযাত্রার পর নিয়মিতরূপে জগন্নাথ ও তাঁর ভ্রাতা-ভগ্নীর চতুর্দশ দিবস ব্যাপী জর হয়।

এই কূপের বন্ধ, দূষিত জলে স্নান করিয়াই যে এরূপ হয় তাহাতে সন্দেহ কি !

উত্তরে দুই প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানটি খুব উচ্চভূমি। এই অংশের বিস্তৃতি প্রায় ২০০ ফুট। এই উচ্চভূমিতে উঠিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেই একটি দোতারা বাড়ী। বাড়ীর যে অংশটি ভিতরের প্রাচীরের দিকে এবং পূর্ব-মুখে তাহা পড়িয়া গিয়াছিল। সেই হেতু নূতন দালান ও বাগানাদি নির্মিত হইতেছে। এই বাড়ীটিই বৈকুণ্ঠধাম, যেখানে বিগ্রহেরা ফলেবর ত্যাগ করিলে নোচেকার ঘরে তাহাদিগকে সমাহিত করা হয়। স্থানটি সেই হেতু পবিত্র।

যাত্রীরা স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে পাণ্ডার হাতে অর্থ দিয়া যায়। সেই অর্থের আর হইতে প্রত্যহ জগন্নাথের ভোগ দিয়া, সেই ভোগে এক জন দুই জন বা ততোধিক ভ্রাম্যমাণ ভোজন করাইতে বলে। বৈকুণ্ঠধামেই টাকা দেওয়ার নিয়ম, ইহার নাম 'আটকে বাঁধা'। বলা বাহুল্য, টাকাগুলো

পাণ্ডা ও তাহার পরিবারবর্গের উদরপোষণে ব্যয়িত হয়। পাণ্ডারা বৈকুণ্ঠধামে বাইরা টাকা লইতে নারাজ, কারণ তাহা হইলে সেখানকার পাণ্ডাদিগকে ভাগ দিতে হয়। নিরঙ্কর যাত্রীদিগের নিকট টাকা লইয়া পাণ্ডারা প্রতিজ্ঞা করে "এই অর্থে অমুক পাণ্ডা ভোজন করিবে।" বৈকুণ্ঠধামের পর ঠিক পশ্চিম দিকে শিয়াললতার বন। পাণ্ডারা বলে, সগর রাজা এই লতাদ্বারা একটি ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করেন ও সেই ধনুনিষ্কিপ্ত বাণে শ্রীকৃষ্ণ বা জগবন্ধুর মৃত্যু হয়। সেই হেতু জগবন্ধুর শেব বিশ্রামের স্থান বৈকুণ্ঠধামের সন্নিগটেই শিয়াললতার বন।

এই লতাবনের পশ্চিমের ভূমিটি তাড়া খোলায় পরি-পূর্ণ, একান্ত অযত্নে পড়িয়া আছে। লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরের রন্ধনশালাটি এই উত্তরের ভিতরকার প্রাচীরের উপর। রন্ধনশালার পশ্চাতের দেওয়ালে ধূম নির্গমের জন্য কয়েকটি ছিদ্র আছে।

উত্তরের ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়া বাম দিকে বাইলে উচ্চভূমি। আনন্দবাজার,—বাহা পূর্বে পূর্বদিকের ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রধান পথের ডান দিকে, স্নানমণ্ডপের দক্ষিণে ছিল—এই ভূমির উপর অবস্থিত।

উত্তর দিকের বাহিরের প্রাচীরের সহিত লম্বালম্বিতাবে একটি লম্বা ঘর, কয়েকটি ছোট ঘরে বিভক্ত। প্রত্যেক ঘরের ভিন্ন ভিন্ন দরজা। ছাতটি ঢালু, রাণীগঞ্জ টার্মি দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহার নিকট আর একটি চার চালা-বিশিষ্ট বাড়ী। পাকা ভিত, চারিদিক খোলা, দেওয়াল নাই। এই বাড়ীটি পূর্বমুখে, উত্তরের বাহির ও ভিতরের প্রাচীরের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত।

এই দুটি বাড়ী আনন্দবাজার। এ বাজারে যারা খাত্ত ক্রয় করে তাদের জন্য নিকটেই একটি কূপ খনন করা হইয়াছে। এই সব ঘরের সামনে অনেকটা খালি জমি। এখানে বহু লোক ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে।

আনন্দবাজার বোধ হয় সর্বমুহুৎ হিন্দু হোটেল, যেখানে হিন্দুরা যার তার বস্তু হইতে পাক করা খাত্ত ক্রয় করে। হিন্দু বিধবা এখানে অন্ন ক্রয় করিয়া আহার

করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, এমন কি পুরীতে তাঁহাকে একাদশীর উপবাস করিতে হয় না! একাদশী দেবী মন্দিরের পশ্চাতে বাঁধা আছেন।

ইহাই ত সত্যকার বিবেচনের মন্দির, যেখানে আসিলে হিন্দুকে আর পাঞ্জি-পুঁধি দেখিয়া চলিতে হয় না। নির্মম জাতিবিচার ও অর্থহীন সামাজিক নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না।

প্রভূব হইতে অনেক রাজি পর্য্যন্ত এ স্থানটি বাল্য, যুবা, বৃদ্ধ, 'ব্রাহ্মণে' পরিপূর্ণ থাকে। তারা প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে এক পয়সার প্রসাদ ভিক্ষা করে। পুরীর আসেপাশে তিন ক্রোশের মধ্যে প্রায় তিন সহস্র এরূপ ব্রাহ্মণের বাস, যারা পুরুষাত্মক পরদত্ত অন্ন জীবন ধারণ করিয়া আছে। কোনো যাত্রী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে ইচ্ছুক হইলে পাণ্ডাকে বলে কয় জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পাণ্ডাও তত জন লোকের উপযুক্ত অন্নব্যঞ্জনাদি (প্রসাদ) কিনিয়া সেই সঙ্গে উপরিউক্ত ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দেয়। যাত্রীর বাড়ীতে শান্ত ও খাদক একই সময়ে উপস্থিত হয়।

একদিন নৃপতি যে ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া ৭৮ হইতেন, সে ব্রাহ্মণের কি শোচনীয় অধঃপতন!

পূর্ব প্রাচীরের সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া, আঠারোটি পাথরের সিঁড়ি উঠিয়া ডানদিকের একটি দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। তারপর আগে যেখানে আনন্দবাজার ছিল সেই উচ্চ সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া উত্তর পূর্ব দিকে কয়েকটি ধাপ উঠিলেই—

স্নানমণ্ডপ।

ইহা একটি সমুচ্চ বেদী, চারিদিক লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা। এই বেদী হইতে কয়েকটি ধাপ উঠিলে আর একটি বেদী। এই বেদীর উপর তিনটি গোল বৈঠক, দক্ষিণের বৈঠক বলরামের, মধ্যেরটি স্মৃতজ্ঞার ও উত্তরেরটি জগন্নাথের।

আবার পূর্ণিবার দিন স্নানবাণী। ঐ দিন প্রাতঃ-

কালে বিগ্রহ তিনটিকে স্নানমণ্ডপে আনিয়া বসান হয় ও সহস্র সহস্র যাত্রীর সিন্ময়বিস্ফারিত নেত্রসমূখে তাহা-দিগকে স্নান করাইয়া পোষাক পরাইয়া দেওয়া হয়। তারপর যাত্রীরা বেদী-স্পর্শ করিবার জন্য ধাবিত হয়।

তার পর বেদীর উপর পূজা এবং ভোগ। সন্ধ্যারতির পর ঠাকুরেরা ভিতরে যান; কিন্তু রত্নবেদীতে না যাইয়া নাটমন্দিরের চাতালে, বিছানায় শয়ন করেন। এই সময় হইতেই ঠাকুরদের জ্বর আরম্ভ। এ জ্বর পনের দিন থাকে। ঐ সময় মন্দিরের দ্বারগুলি বন্ধ থাকে এবং জগন্নাথের ভৃত্য 'দৈত্যপতি' পাণ্ডা ব্যতীত কেহ মন্দিরে প্রবেশ করিতে পায় না। জ্বরপীড়িত ঠাকুরদের যত্নের ক্রটি হয় না, বৈদ্যেরা তাহাদিগকে নিরামিতরূপে জ্বালাপ ও ঔষধাদি দিবা ধাকেন।

পনের দিনের পূর্ব মন্দিরের দ্বাব খোলা হয় এবং সূর্য ঠাকুরেরা "নটবব বেশে" সাধারণেব সমক্ষে প্রকাশিত হন। বলা বাহুল্য, এ সময় তাঁরা রত্নবেদীর উপর উপবিষ্ট থাকেন।

তার পর লোকবিশ্রুত

রথযাত্রা।

সর্বসময়েত স্নানস্থানি বধ। প্রতিবৎসর নূতন রথ নিম্মিত হয়। সিংহদ্বারের সামনে রথযাত্রার দুই মাস বা ততোধিক কাল পূর্ব হইতেই নৃপগুলি সহস্র বা ততোধিক কারিগরদিগের দ্বারা নিম্মিত হয়। রথগুলি টানিবার জন্য নূতন রজ্জু ব্যবহৃত হয়।

জগন্নাথের রথ গরুড়ধ্বজ, বলরামের তালধ্বজ, ও স্মৃতজ্ঞার পদ্মধ্বজ।

সর্বপ্রথম বলরামের রথ, তারপর গয়ী স্মৃতজ্ঞার রথ, ও সর্বশেষে জগন্নাথদেবের রথ। জগন্নাথদেব যে বেশ বিনয়ী, ও নারীর মর্যাদা রক্ষা করেন, ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

রথগুলি পতাকা ও সালু কাপড় দিয়া সজ্জিত করা হয়। যাত্রীরা জগন্নাথমন্দির হইতে গুণ্ডিচা বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তার উত্তর পার্শ্বে হাজারে হাজারে কাতার দিয়া পাড়ায়। তাহাদের জরখমির মধ্যে ঠাকুরদিগকে বাহিরে আনিয়া

রথমধ্যে স্থাপন করা হয়, ও সেই সঙ্গে সহস্র সহস্র স্ত্রীপুরুষ রথ ও রথের রজ্জু স্পর্শ করিবার জন্ত থাকিত হয় ।

রথ টানিবার ঠিক পূর্বেই পুরীর রাজা, জনসাধারণ বাহাকে নারায়ণের অবতার জ্ঞানে ভক্তিপ্রদা করে, পাখি চড়িয়া আসেন । তিনি মন্দিরের নিকটেই তাঁর সাধা-সিধে বাড়ীতে থাকেন । তিনি আসিয়া রথ স্পর্শ করেন ও রথ টানিবার আজ্ঞা দেন ।

লোকে এই রাজাকে “চলন্তি বিষ্ণু” বলে । ভিড়ের মধ্য দিয়া যখন ইঁহার পাখী যায়, স্ত্রী পুরুষ পাখী স্পর্শ করিবার জন্ত উদ্গীব হইয়া উঠে ।

কথিত আছে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলাচল পর্বতের পাদদেশে একটি মন্দির (এখন আর নাই) নির্মাণ করান ও এই তিনটি বিগ্রহ স্থাপনা করেন । তিনি আজ্ঞা প্রচার করেন যে, মেঘর, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবদর্শন করিতে পারিবে না । দেবদর্শনেই মুক্তি, রাজা তাঁর নিষ্ঠুর আজ্ঞা দ্বারা তাদের মুক্তির পথ বন্ধ করিয়া দিলেন । রাজমহিষী ‘গুণ্ডিচার’ মাতৃহৃদয় এই অবিচারে ব্যথিত হইয়া উঠিল । তিনি স্বামীকে অমুরোধ করিলেন যে, যখন এত লোকের মন্দির প্রবেশের অধিকার রহিল না, তখন নিয়ম করা হোক যে কোনো এক নির্দিষ্ট দিনে দেবতা নিজেই বাহিরে আসিবেন, বাহাতে উচ্চ নীচ সকলেই দেবদর্শন লাভ করে ও মুক্তি প্রাপ্ত হয় । উনারহৃদয় মহিষীর অমুরোধ রাজা রক্ষা করিয়াছিলেন । এই রূপেই রথযাত্রার উৎপত্তি ।

ঠাকুন্দেরা ‘গুণ্ডিচা’ বাড়ীতে সাত দিন থাকেন ও অষ্টম দিনে প্রত্যাবর্তন করেন ।

জগন্নাথের মন্দির হইতে ‘গুণ্ডিচা’ বাড়ীর ফটক প্রায় দেড় মাইল রাস্তা । ‘গুণ্ডিচা’ বাড়ীর প্রধান ফটকটি দক্ষিণ দিকে । ‘গুণ্ডিচা’ বাড়ী জগন্নাথমন্দিরের ক্ষুদ্র সংস্করণ । এখানে সাত দিন ধরিয়৷ নিয়মিতরূপে পূজা, দর্শন, ভোগ প্রভৃতি হইয়া থাকে । যাত্রীরা একটা দিন আসেপাশে থাকিয়া দেবদর্শন ও প্রসাদ-ভক্ষণ করে ।

লক্ষ্মীর অভিমান ।

পূর্বপ্রাচীরের ঠিক উপরে সিংহ দ্বারের অন্ন দক্ষিণে একটি ঘর, সেটিকে ‘চাহনি কোঠা’ বলে । এই ঘরের দ্বারে দাঁড়াইলে সিংহদ্বারের সমুখস্থ ভূমিটি সমস্ত দৃষ্টিগোচর হয় । ‘গুণ্ডিচা’ বাড়ী হইতে রথ কিরিয়া আসিলে এখানে গবাক্ষে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী জগন্নাথকে দেখেন ও ক্রোধপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ মন্দিরের প্রধান দরজা বন্ধ করিয়া দিতে আজ্ঞা করেন । ‘দৈত্যপতি’ পাণ্ডারা জগন্নাথের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দ্বার খুলিবার জন্ত অনেক অমুনয় বিনয় করে, ও মন্দিরের সেবাদাসীরা লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া বধাযথ উত্তর প্রদান করে । উভয় পক্ষে প্রচুর বাকবিতণ্ডার পর লক্ষ্মীর ক্রোধের কিছু উপশম হয় ও দ্বার খুলিয়া দেওয় হয় । এখান হইতে দ্রুত পদে গিয়া লক্ষ্মী মণিকোঠার (যে ঘরে জগন্নাথ থাকেন) দ্বার বন্ধ করিয়া দেন । আবার বাকবুদ্ধ আরম্ভ হয়; * ও অনেক সাধাসাধনার পর জগন্নাথ স্বহানে প্রতিষ্ঠিত হন । শোনা, রথের সময় পুরাণো উনানগুলি ভাঙ্গিয়া নুতন করিয়া গড়া হয় । পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে বলে লক্ষ্মীঠাকুরাণ রাগ করিয়া উনান ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন ।

দক্ষিণের ফটকের ডান দিকে বাহির প্রাচীরের বহির্ভাগে মহাবীর হনুমানের কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত প্রকাণ্ড মূর্তি । এই দণ্ডায়মান মূর্তিটি ভীষণ-দর্শন; পুচ্ছটি পশ্চাত্তাপে ঝাড়া হইয়া উঠিয়া মাথার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে ।

* নমুনা স্বরূপ নিম্নে লক্ষ্মীর পক্ষ হইতে কথিত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল ।

জমাদিন্মমাপতো ন তব গুণ্ডিচামণ্ডপঃ
সনাকমুখভাবতো বিবিধমৃত্যুগীতোৎসবঃ
ইমং বিমহিষী-গৃহং নয়নবীর পুরাঙ্কতং
ন চন্দনমুখানিতং নপদি তত্র বাহি প্রভো ॥

“এখানে আপনি ভুল করিয়া আসিয়াছেন । এ ত চন্দন গৃহে আবাসিত সুবতী নর্তকীর মৃত্যুগীতমুখরিত গুণ্ডিচামণ্ডপ নর । এ বিমহিষীর গৃহ, এখানে আছে কেবল নয়নের জল ।

রন্ধনশালা।

আরো কিছু পূর্বে, প্রাচীরের ভিতরের রন্ধনশালায় মাঝামাঝি একটি পাকা নর্দায়া, প্রায় ১৫ হাত লম্বা, ৩—৪ হাত চওড়া ও প্রায় ৭ হাত গভীর। রন্ধনশালা হইতে অষ্টান্ত নর্দায়ার মধ্য দিয়া সমস্ত ভাতের ক্যান এখানে আসিয়া পড়ে। রন্ধনশালায় ৭৫০টি উনান। রন্ধনশালা হইতে ছাত্রভোগ মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত একটি চালাছাত্রবিশিষ্ট গলিপথ। এই খানেই ‘কুটনা কোটা’ বাটনা বাটা’ প্রভৃতি কাজ হইয়া থাকে।

গলিপথের পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ কুপ; প্রান্তরে রাখানো এই কুপ ও গলিপথের পূর্ব দিকে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট কুপের জলে চাউল ও তরিতরকারি ধোয়া ও রন্ধনকার্য সম্পন্ন হয়। এক সারি খোঁড়ো চাল ও ছোট পাকা ঘর ভাণ্ডার স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। এ ঘরগুলির মধ্যে চাউল, ডাল হাঁড়ি, কুমড়া, কচু খটি প্রভৃতি জিনিস রাখা হয়। কতকগুলি ঘরে দৈনিক রাজভোগের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখা হয়।

রন্ধনশালায় লম্বা ও সরিষার তৈল লইয়া বাইবার নিয়ম নাই। ডালের মধ্যে অড়হর, মুগ ও মসুর; ‘কণিক’ বা দী-ভাত, বিচুড়ি, মালপো, খাজা, সর প্রভৃতি ভোগ দেওয়া হয়।

দক্ষিণের ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দেয়ালের গায়ে “কৃষ্ণের অনন্তশব্দা” অঙ্কিত আছে। ইহার চারি দিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, প্রভৃতি ধ্যানমগ্ন, অপর দিকে ধনুসধারী রামচন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধে চলিয়াছেন। ফটক পার হইয়া নিম্নভূমিতে নামিলে ডান-দিকে একটি ছোট পাকা বাড়ীতে বড়ভুজ চৈতন্তের মূর্তি, ও বাম দিকে আর একটি পাকা বাড়ীতে মহাবীর অঙ্গদ, নল, নীল প্রভৃতির মূর্তি। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই ভিতরের ফটক ও প্রাচীর। এ ফটকটি পার হইলেই বাম দিকে ভিতরের প্রাচীরের গায়ে এক সারি ছোট ঘর। প্রত্যেক ঘরের ভিন্ন ভিন্ন দরজা। পাণ্ডা ও সেবকেরা এই ঘরগুলিতে তাদের জিনিসপত্র রাখে।

মুক্তিমণ্ডপ ও স্নানমণ্ডপ।

মুক্তিমণ্ডপ, পাথরের ধামের উপর একটি ছাত্রবিশিষ্ট চতুর্দিক খোলা ঘর। এই ঘরের মেঝে প্রায় ৪ হাত উঁচু। এই মেঝের উপর ও ধারে ধারে বহু লোক প্রত্যাষ হইতে অনেক রাত পর্যন্ত বসিয়া থাকে ও বার্তাগণকে এই মুক্তি-মণ্ডপ স্পর্শ করিতে বলে ও তাদের নিকট আহ্বার প্রার্থনা করে। নিকটে একটি প্রকাণ্ড বট গাছ। ইহার গুঁড়ির চারিদিক স্নানবাথানো। পাণ্ডারা বলে এটি অক্ষয় বট! অক্ষয়বট যে কোন্ তীর্থে নাই তা জানা দুঃসাধ্য।

মুক্তিমণ্ডপের পশ্চিম দিকে একটি ছোট চারিদিক-খোলা পাকাছাত্রবিশিষ্ট স্থান। ইহার মেঝে সমুচ্চ ও মেঝের উপর একটা উঁচু বৈঠক। ইহাই স্নান-মণ্ডপ। কথিত আছে স্নানমণ্ডপে প্রতিনিধি দেবভাগকে আনিয়া স্নান করান হয়।

অক্ষয়তৃতীয়ার দিন চন্দনযাত্রা উৎসবের আরম্ভ। প্রতিনিধি দেবভাগের স্নানের পর, গোপাল, সত্যভামা, রুক্মিণী প্রভৃতির ছোট ছোট মূর্তি নরেন্দ্রসরোবরের মধ্য-বর্তী মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাকেই চন্দনযাত্রা বলে। নরেন্দ্রসরোবর একটি বৃহৎ পুকুরিণী। ইহার পশ্চিমে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি।

ভিতরকার বেটনীর মধ্যে জগন্নাথ ব্যতীত বিমলা-দেবীর ও লক্ষ্মীর মন্দির আছে।

ইহা ব্যতীত হর্যাদারায়ণ, সত্যনারায়ণ, সত্যভামা, সরস্বতী, শীতলাদেবী, কালী, মাখনচোয়, গোপীমাধব, বড় গণেশ, রাধাকৃষ্ণ, বদরিনারায়ণ, ভূবিত্ত্বাক প্রভৃতির মন্দির আছে।

বারান্দা দিয়া দেবতা দর্শনে বাইবার গমর লকলকে গরুড় স্তম্ভ স্পর্শ করিয়া বাইতে হয়।

জগন্নাথমন্দিরের পশ্চাত্তের দেয়ালে কৃষ্ণের “অনন্ত-শব্দা” খোদিত আছে। বিস্তারিতকণা ভূরূপের উপর কৃষ্ণ অর্জুনসহ অবস্থার রহিয়াছেন, তাঁর বড়ক ও বুখ

কণাগুলির নীচে। ত্রিকোণের মূর্তিটি প্রিয়দর্শন, সর্পটি
মুন্দর, সমস্ত কারুকার্য অতি চমৎকার।

অরুণভক্ত চারিটি ভিন্ন ভিন্ন আকারের পাদভূমির
উপর অবস্থিত। সকলের নীচে চতুষ্কোণ পাদভূমি।
এইটি সূর্য্যাপেক্ষা বৃহৎ। উপরের পাদ-ভূমিগুলি ক্রম-
সমুচিত ও বৃত্তাকার। সমস্ত পাদ-ভূমিটি পাথরের
রেলিং দিয়া ঘেরা। রাজীদের স্পর্শ হইতে কারু-কার্য
গুলিকে রক্ষা করিবার জন্য এরূপ করা হইয়াছে।

সিংহঘাসের 'ডোমে'র ডানদিকে বাহির প্রাচীরের ঠিক
পশ্চাতে পাকা ঢালুছাদবিশিষ্ট নহবতখানা। নহবত-
খানার বসিবার মঞ্চটি প্রাচীরের খাড়াইয়েরও উপরে।
স্নানযাত্রার দিন এখানে নহবত বাজে।

কার্তিকমাসে রাজীরা রত্নবেদী স্পর্শ করিতে বা
মণিকোঠা হইতে ঠাকুর দর্শন করিতে পারে না। অবশ্য
নাটমন্দির হইতে দর্শনে বাধা নাই।

পূর্ণিমার দিন মন্দিরপ্রাঙ্গণে সঙ্কীৰ্ত্তন হয়।

রত্নবেদীর উপর জগন্নাথের ডানদিকে লক্ষ্মীর ক্ষুদ্র
মূর্তি, বামদিকে সত্যভামা; নীলমাধব (প্রায় অদৃশ্য)
জগন্নাথের পশ্চাতে।

দৈনিক পূজার নিয়ম।

প্রত্যুষ ৫ টায়—মঙ্গল আরতি।

তৎপরে,

জগন্নাথের বেশভূষা; দত্তধোয়া প্রভৃতি।

প্রাতে সাড়ে আটটা হইতে দর্শন।

দশটার সময় ছোঁয়া মহাস্নান। বিভিন্ন জাতির
লোকেরা মণিকোঠায় প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া স্নানের
এয়োজন। এ স্নানটি একটু বিচিত্র ধরণের। তিনখানি
দর্শন তিন ঠাকুরের সামনে ধরা হয় ও সেই দর্শন তিন-
খানি ধুইয়া ফেলা হয়।

তৎপরে রাজবেশ পরিধান।

তৎপরে বরষা বৃষ্টি ভোগ।

১১ টা বা ১২ টার সময় রাজভোগ।

বৈকালে ২ টার সময় ছত্রভোগ।

বৈকালে ৪ টার সময় মধ্যাহ্ন ভোগ।

তারপর পছড় বা আহারের পর একটু তন্দ্রা।

তন্দ্রাবসানে আবার দর্শন।

সন্ধ্যা ৬ টা হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত মণিকোঠার মধ্যে
বাইবার নিয়ম নাই।

সাড়ে ৬ টা বা ৭ টার সময় সন্ধ্যারতি।

রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় সন্ধ্যাপূর্ণ বা সন্ধ্যার আহার।

এই আহারে ডাল, ভাত প্রভৃতি দেওয়া হয়। তারপর
মণিকোঠা দর্শন।

রাত্রি ১১ টার সময় মহাস্নান, অর্থাৎ ঠাকুরকে মস্ত ঘারা
স্নান করান হয়। রাত্রিকালে নীতল জলে স্নান করিয়া
পাছে ঠাকুরের ঠাণ্ডা লাগে।

রাত্রি ১ টার সময় বড় শিঙার বেশ। তারপর
অগুরু চন্দন লেপ; আলট লাগি—ঠাকুরকে বাতাস বাই-
বার জন্ত পাখা দেওয়া হয় ও চামর ছলান হয়। বন্দা-
পনা—একটি পাত্রে কর্পূর জ্বালাইয়া ঠাকুরের সামনে ধরা
হয় ও পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। পুষ্পাঞ্জলির পর ডাব ও
পান অর্পিত হয়।

তারপর ঠাকুরদের শরন। তিন খানি খাট মণি-
কোঠায় আনা হয় ও তার উপর সুকোমল রেশমী বিছানা
পাতা হয়। মশারি টাঙানো হয় না।

পাণ্ডা।

আজ কাল প্রায় ১৪৭০ পরিবার পাণ্ডা আছে। পাণ্ডা
অনেক রকম :—

পূজারি পাণ্ডা, শিকারী পাণ্ডা, রত্নইন্দার পাণ্ডা,
হাজুরি পাণ্ডা, দৈত্যপতি পাণ্ডা, নিকাব পাণ্ডা (ইহাদের
হাতে ভাণ্ডারের চাবি ও জগবল্লুর সোনার হাত, পোষাক
পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি থাকে), খুঁড়িয়া পাণ্ডা ও প্রতি-
হারী পাণ্ডা (ইহারা মন্দিরের মধ্যে ঘরের নিকট ছড়ি
হস্তে দাঁড়ায় ও রাজীদের গিঠের উপর এক এক বা প্রহার
করে), গোরাবারী পাণ্ডা (ইহারা পূজার সময় পূজারি
পাণ্ডাদিগকে জল আনিয়া দেয়), নিমোপ পাণ্ডা।

অবিবাহিত পাণ্ডা পূজারি হইতে পারে না। যে ব্যক্তি জেল খাটিয়াছে সে পাণ্ডা হইতে পারে না। মন্দির সংক্রান্ত কোনো কাজ সে করিতে পারে না।

দৈত্যপতি পাণ্ডা ব্যতীত আর সমস্ত পাণ্ডা ব্রাহ্মণ। পাণ্ডারা মৎস্ত ভক্ষণ করে, অনেকে পেরায় ভক্ষণ করে। ইহারা ইংরাজি পড়ে না, কারণ যে ব্যক্তি ইংরাজী পড়ে তাহার পাণ্ডা হইবার অধিকার নাই।

পুরুষ পাণ্ডারাই মন্দিরের সমস্ত কাজ করে। পূজা করে, ঠাঁহুর সাধায়, রন্ধন করে, ভোগ বহন করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ প্রথা মন্দ নয়, কর্মকর্তা ভারত রমণী একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

পাণ্ডা পরিবারের জীলোকেরা তিনটি কাজ করে না। (১) কূপ হইতে জলের কলস কাঁকালে আনে না (২) টেকেতে ধান কুটে না (৩) দিগাভাগে রাস্তা দিয়া যায় না।

ভোগের ভগ্ন শাক সবজির মধ্যে কুমড়া, কচু, ধোর, তেঁতুল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত ২০০ পাচক ভোগ রন্ধন করে। দোল, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি দিনে যাত্রীর ভিড় খুব বেশী হয়, তখন সময়ে সময়ে ৭৫০ পাচক নিযুক্ত হয়।

ক্রিষ্টিয়ান, মুসলমান, বাওরি, শবর, পান, হাড়ী, চামার, ডোম, চণ্ডাল, পাকযারা, গুঁড়ি, ধীবর, মুলিয়া, কাণ্ডার, সাধারণ বারবণিতা, রজক, কুস্তকার প্রভৃতির মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নাই। এ নিয়ম বিদেশী যাত্রীর প্রতি প্রযোজ্য হয় না, কারণ তাদের মধ্যে কে কি তাহা জানিবার উপায় নাই।

মন্দিরে ১২০ জন নর্তকী আছে। তারা ভোগের সময় ও অস্তান্ত সময়ে নৃত্য করে।

ইন্দ্রহ্যর সরোবরে অনেক বৃহৎকার কচ্ছপ বাস করে। মুড়কি বা অন্ত কোন আহাৰ্য্য দ্রব্য প্রদত্ত হইলে তারা উঠিয়া আসে। নরেন্দ্রসরোবর একটি বৃহৎ পুষ্করিণী।

পুরীর পূর্ব দিকে লোকালয়ের বাহিরে দুইটি মহাবীর মূর্তি আছে। ইহাদের মধ্যে একটি “সমুজের মহাবীর”—ইনি সমুদ্রে পাহারা দেন। উড়িষ্যার লোকেরা পুরীতে আসিলেই এই স্থানে আসেন। পুরীতে ছোট বড় সর্বসমেত ৭৫২টি মঠ আছে। সর্কাপেক্ষা বৃহৎ মঠটির আয় বৎসরে তিন লক্ষ টাকা। এই মঠের নাম এমা মঠ।

স্বর্ণ দ্বারে ঘাইবার পথের পূর্ব দিকে রাধাকান্ত মঠ। এটি কালী মিশ্রের বাটী। এখানে চৈতন্যদেবের ষড়ম ও কমণ্ডলু আছে। কৃষ্ণের একটি প্রস্তরমূর্তি আছে। কালী মিশ্রের বাগান বাড়ীতে সেই সিদ্ধ বকুল গাছ, বার ভলে বসিয়া শ্রী-চৈতন্যের প্রিয়-শিষ্য হরিদাস (যিনি প্রথমে মুসলমান ছিলেন,) পরে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ধ্যান করিতেন। শঙ্করাচার্য্য-মঠ সমুজের তীরে অবস্থিত। এখানে শঙ্করাচার্য্যের মার্কেল পাথরের মূর্তি আছে। সংস্কৃত পুস্তক ও হস্তলিখিত পুঁথির একটি ছোট লাইব্রেরি আছে।

সমুদ্রতীরে একটি ছোট বাটীতে হরিদাসের সমাধি। সেই বাটীতেই বলরামের খেতপ্রস্তর মূর্তি। তাঁর হাতে শাশী।

টোটা গোপীনাথ, প্রস্তরমূর্তি। সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। রঙীন-কাপড়-পরা। কথিত আছে চৈতন্য গোপীনাথের উরুদেশ দিয়া তার প্রস্তরময় দেহে প্রবেশ করেন। সেই হেতু উরুদেশ দেহের অস্তান্ত অংশ অপেক্ষা শাদা! উহা দেখিতে হইলে পাণ্ডাকে এক টাকা চারি আনা দিতে হয়।

দোকানে জিনিস কিনিলে তাহা কাগজে মুড়িয়া সন্তরা গাছের সূতা বা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেয়। সন্তরা গাছ আঙ্গুরের মতো মোটা হয়। ইহা চিরিয়া গিড়া দিয়া বাঁধিয়া লম্বা করা হয়। এই সূতার বাঁধিল দোকানে বিক্রীত হয়।

পুরীতে জীলোকের কাপড়কে রংপুরী সাড়ী বলে।

প্রমাণ মাপের হইলে ইহা প্রস্তুত দুই হাত ও লম্বার বারো
হাত হয়। লাল রঙে কাজ করা খুব চওড়া পাড়, অঞ্চলও
প্রায় দুই হাত চওড়া, মক্কা-করা। মূল্য ৭-৮ টাকা।

হাতে খড়ির সময় যে প্রকার খড়ি ব্যবহৃত হয়
সেইরূপ (stick) খড়ি পুরীর সর্বত্র বিক্রয় হয়। উহা
গজগাট লম্বা মহল হইতে আসে। সেখানে খড়ির
ছোট ছোট পাহাড় আছে।

পুরীতে ধাতু, তিসি, সরিষা, তিল ধনে, গম, ইক্ষু
তামাক, পেঁয়াজ, অরুণ, মুগ ও মাষকলাই উৎপন্ন হয়।

উপসংহার

পুরীতে দেখিবার জিনিস, উপভোগ করিবার জিনিসের
মধ্যে সাগর-দৃশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। সকাল সন্ধ্যাব
আবীর-রাজ্য জল-স্থল-আকাশের মাধুরী, সদাচঞ্চল
চেউষের উপর বসিয়া গাজচীলের দোল ধাওয়া, সফেন
বারিরাশির অবিশ্রাম গর্জন—এসমস্ত উপভোগ্য। কিন্তু
অবর্ণনীয়। বিবেচনায় বিরাট উপলব্ধি করিতে হইলে
সাগর দেখা প্রয়োজন।

সুবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বর্ষশেষ

৩১শে চৈত্র, ১৩১৮ সন।

কোন্ দূর তমসার গর্ভ বিদারিবা
নির্দয়া নিষাতি দেবী হইলা বাহির ;
পরে ভীতগামী কাল সন্দনে চড়িয়া
ছুটিলা সৃষ্টির কোন্ অন্ধকার তীর ।
চক্রসংকলনে বেগে বহিল সে রথ :—
আজি শেষ তার এক চক্র আবর্তন ;
সম্মুখে সৃজনগর্ভে অন্ধকার পথ
উজলি আঘাতি পুনঃ ছুটিল সন্দন !
এই আবর্তনে নিরশারী কত জন
অকৃষ্টের উচ্চ চুড়ে উঠিল বসিয়া ;

উচ্চ হ'তে নিয়ে কত হইল পতন,
নিশ্চেষ্টে কত গেল বিচূর্ণ হইয়া !
পাসরিল কত আশি অশ্রু বরিষণ—
ছুটিল নিষ্কর কত নয়ন বহিয়া !

নববর্ষ

১লা বৈশাখ, ১৩১৯ সন।

সম্মুখে সৃজন-গর্ভে অন্ধকার পথ—
উজলি আশাভাদীপ ছুটিল সন্দন :
সে আলোকে কত দুঃখী ভুলিল ক্রন্দন,
গড়িল নূতন করি কত মনোরথ !
ভূজবলে ফিরাইবে নিষতির বথ
দর্পে কত জন হেন করিল মনন ;
নিশ্চেষ্ট বন্ধ দিয়া, পুনঃ কত জন
ভাবিল, ঠেলিবে চক্র স্বীয় শক্তিমত !
কত পুষ্পবাশি গেছে বরষে করিয়া,
পানপ মুকুল-গুচ্ছ ধরিল আবার :
হৃদয়েব কত আশা গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
ত্বিতে পরাণে তাই পেতে শাস্তিবার,
কি ঔৎসুক্যে উর্জপানে নমি আরবার,
দাঁড়াইল বিশ্ব খুলে আশার ভাণ্ডার !
শ্রীশোদালাল বণিক ।

পাপিয়া ।*

পাপিয়াকে কোনও কোনও স্থানে 'চোখ-গেল' আব
'চেঁচাকর' পক্ষী বলে।

পাপিয়া কোকিলেরই মত বড় হয়। ইহাদের পাল-
ধেব রং ধূসর ; লেজটা কোকিলের লেজের চেয়ে একটু
বিষুতাগ্রবিশিষ্ট : লেজের নীচের দিকটার সাদা রঙ-

*লেখকের অপ্রকাশিত "গায়ক পাখী" হইতে
গৃহীত। প্রঃ সঃ

বৈশাখ ১৩১১

টানা ; বুকের ও গলার পালখ ঘোট সাদা ! পাপিয়ার ডানা অভ্যস্ত মজবুত নহে, তাহাকে অনেক সময় পর্য্যন্ত শুল্লে রাখিবার পক্ষে ডানা একটু দুর্বল । দেহের তুলনায় ডানা একটু ধর্ম ও বটে ।

পাপিয়ার চক্ষু দুটির চারিদিকে কিঁকে সাদা বর্ণের অতি পাতলা চর্মের একখানি বেষ্টনী আছে (এই বেষ্টনী সকল পাখীরই আছে) । চক্ষু বর্ষ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ । ঠোঁট সরু ও পাতলা—ছাইএর রং । পা দুটি বোঁ-কথা ক'র পা'রই মতন ।

পাপিয়া কোকিলেরই মত নির্জনতা-প্রিয় ! ঘন পাতার আড়ালে আশ্রয়-গোপন করিয়া থাকার অভ্যাস পাপিয়ার নাই, কিন্তু ঐ ঘন পাতার নিকট একটু ষোলা জায়গায় বসিয়া পাপিয়া গান গায় । পাপিয়ার গান সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত । কেহ বলেন পাপিয়া “চোক্ গেল” বলে—কেহ বলেন “চেষ্টা কর্” বলে, আর কেহ বা বলেন পাপিয়া “পি—পি—পিয়—হো—পিয় হো” বলে ! মোট কথা পাপিয়া যাহাই বলুক, তাহার স্বর অতি মিষ্ট, চড়া এবং মিহি ; প্রথমে কোমল নিখাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সুর অনেক উচ্চে চড়াইয়া তোলে । আমাদের মনে হয় পাপিয়ার গান কোকিলের গান অপেক্ষাও মনোহর ! বৎসরের উৎকৃষ্ট সময় বসন্ত কালে যখন কবির কল্পনা খুব উধাও হইয়া এক স্বপ্ন রাজ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে, সেই সময় কোকিলের গানে প্রকৃতির বাহু সৌন্দর্য্যের সহিত কেমন একটা অস্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের চিত্র ফুটিয়া উঠে ; সেই সময় বাহু জগতের বহির্ভূত কবি আগল তুলিকার কোকিলকে অঙ্কিত করিয়াছেন । কোকিল মহাকবির কাব্যে আশ্রয় পাইয়া রাজ-সন্মান লাভ করিয়াছে,—পাপিয়া পেছনে পড়িয়াছে ।

মহাকবির আমলেই ইহার সূত্রপাত, নতুবা পাপিয়ার তুলনায় কোকিলকে অত উপরে তুলিবার কোনও সম্ভব কারণ দেখা যায় না ! পাপিয়ার স্বর-লহরী যেমন মিষ্ট, তেমন আনন্দদায়ক ! সকালে সন্ধ্যার ও গভীর নিশীথে পাপিয়া যখন স্বরসুধাশ্রুতি

করে, তখন হৃদয়ে অপরিমিত সুখের আবাদ লাভ করা যায় ! পল্লী-জননীর নীরব স্নিগ্ধ শ্রামল শোভার মধ্য হইতে যখন প্রকৃতি-রাণীর এই সাধা বীণা চারিদিক ছাপাইয়া বাজিয়া উঠে তখন আশ্চর্য্য হইয়া বাইতে হয় ! মধ্য রাত্রিতে যখন চন্দ্রকিরণমালা ধরণীর উপর এক স্নেহাবরণ বিস্তার করিয়া দেয় তখন চারি দিকে পাপিয়ার “পি—পিহো পিওহো” ধ্বনি কর্ণে যেন মদিরা ঢালিয়া হৃদয়ে এক অনন্তভূতপূর্ব শান্তির ধারা প্রবাহিত করে । শেষ রাত্রিতে পাপিয়ার সঙ্গীত বড়ই মনোরম । পাপিয়া অন্ধকার রাত্রিতে গান করে না ! অন্ধকারকে বুঝি সৌখিন কেহই ভালবাসে না ! বৃষ্টির সময় পাপিয়া চুপ করিয়া থাকে, বৃষ্টির পরেও আকাশ যতক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন থাকে ততক্ষণ ইহার অস্তিত্বই অনুভূত হয় না । কিন্তু বর্ষাের পর যখন পশ্চিমাকাশের প্রান্তে রবির স্বর্ণকিরণে বৃক্ষপত্রের শেষ জলকণা করিয়া পড়ে, তখন পাপিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া রাগিনী আলাপ করে ! যখন মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কিরণে পৃথিবীর জীবগ্রাম নীরবে ছায়াতলে আশ্রয় লয়—তখনও কদাচিত্ পাপিয়া ভৈরবীতে তান ধরিয়া থাকে ! রাগরাগিনীর ধরাধাধা নিয়মের অনুসরণ না করিলেও—হুপ্রহরে পাপিয়ার ভৈরবী নিতান্তই অভূতপূর্ব মনে হয় না ।

পাপিয়া ভারমাস এদেশে অবস্থান করে না । শীতের অবসানের সময় সে এ দেশে আসে, হেমন্তে প্রস্থান করে । বর্ষারন্তেই দেশে পাপিয়ার আমদানী খুব কমিয়া যায় ! তবে এ কথা ঠিক যে, পাপিয়া ক্রমে এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে ! সারা বৎসরই কিন্তু দু চারিটি পাপিয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়া থাকে ।

আমি বহু অনুসন্ধানও পাপিয়ার বাসা বাহির করিতে পারি নাই । কেহ কেহ বলেন ইহারও কোকিলের মত অস্ত-পুষ্ট ! ইহাদের ছানা যখন উড়িতে শিখে, তখন ছানাগুলির চেহারা প্রায় কোকিলের ছানা-রই মত দেখা যায় । পাপিয়ার ছানা প্রাপ্তপালনের

আগ্রহ বহু লোকেরই আছে, কিন্তু কাহাকেও ছানা সংগ্রহে কৃতকার্য হইতে দেখি নাই।

পাপিয়া কদাচিত্ লোকচক্ষুর সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করে। গাছের উচ্চ শাখায় বসিয়া গান করাই তাহার প্রধান ব্যবসায়। গান করিবার সময় ইহারা মুখ ঈষৎ উদ্ধদিকে তুলিয়া লয়। তখন গলার নীচের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকগুলি একটু বিস্তৃত হওয়ায় অতি সুন্দর দেখায়।

পাপিয়া পোকা, পতঙ্গ প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করে; কিন্তু খাওয়া অমুসন্ধানের জন্য তাহাকে ভূতলে পদার্পণ করিতে দেখা যায় না! সে নমেও কোথায়ও লোকালয়ে আগমন করে না! এই কারণে দেশীয় সাধারণ লোক পাপিয়াকে ‘আসল জঙ্গলী পাগী’ বলে।

অনেকে বলেন পাপিয়া পাহাড়ে ডিম পাড়ে এবং সেই খানেই উহার ছানা হয়। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে! পাপিয়া ডিম পাড়িবার সময় আমাদের দেশেই অবস্থান করে! তবে অত্যন্ত নির্জন স্থানে ডিম পাড়ে বলিয়াই ধোঁজ করা দ্রুত হইয়া ওঠে! ছানাও একটু সক্ষম না হইলে পাপিয়া তাহাকে গভীর জঙ্গল হইতে বাহির করে না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

নৌকাডুবি

(পূর্বানুস্মৃতি)

অন্নদা ও চক্রবর্তী খুঁড়া এই দুইটি প্রবীণের উপন্যাসিক জীবন জুড়িয়া যে তিনটি নবীনা বিরাজ করিতেছেন, এখন তাঁহাদের কথা কিছু বলিব। হেমনলিনী, কমলা ও শৈল-বালা বাংলার সমাজ-জীবনের তিনটি নবীনার মূর্তি,—একটি, শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মেয়ে, একটি জটিলজীবনসমস্তাগ্রস্তা

উপন্যাসের নায়িকা এবং আদর্শ হিন্দু পত্নী, আর একটি বরাণো, দাম্পত্যের ছবি—দ্বিতীয়া নৌকাডুবির হর্যামুখী, তৃতীয়া কমলমণি, প্রথমার কোনো প্রতিরূপ বিষয়ক্ষে নাই!

হেমনলিনী শান্ত, শিষ্ট; তাহার অল্পভূতি তীক্ষ্ণ এবং প্রবল; উচ্চ চিন্তায় তাহার অধিকার আছে হেমনলিনী। অক্ষরের শাণিত ব্যঙ্গের প্রত্নোস্তর করিতে সে জানে, কিন্তু তাতে কখনো

সে অশোভন কিস্বা প্রগল্ভ নয়। রমেশের মত হৃদয়-বিশিষ্ট প্রাণীকেই ভালবাসা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, বস্তাবচারকতা অক্ষয়কে নয়। তাহার প্রেমে একটা বিশ্বাসের দৃঢ়তা আছে। যোগেন্দ্র-অক্ষয় রমেশকে চোখ দিয়া দেখে বলিয়াই তাহার ভুল দেখে, হেমনলিনী হৃদয় দিয়া দেখে বলিয়াই তাহাকে নির্দোষ বলিয়া জানে। যোগেন্দ্র-অক্ষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও রমেশের নিজের মূখের একটা কথার মূল্য তাহার নিকট বেশী; চারি দিকের সন্দেহ-গুঞ্জনের নিবিড়তার সময়ও রমেশের নিকট হইতে কৌফিয়ৎ গ্রহণ করিবার সে কোনো দরকার বোধ করে না। উদ্দীপ্ত তেজে সে অবিখ্যাসী অক্ষয়কে “বাইরের লোক” বলিয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে কোনো পরামর্শ গ্রহণ করিতে তাহার প্রবল বিমুখতা জানায়। দুই এক বার বাহিরের প্রবল আঘাতে তাহার এই উদ্দীপ্ততার পারচয় আমরা পাইয়াছি; কিন্তু সাধারণতঃ তাহার অন্ত-নিহিত দৃঢ়তার আশ্রয়ের বাহিরে তাহার প্রেমের প্রকাশ বরাবর শান্ত এবং সংযত। হেমনলিনীর সুখের দিনে এই প্রেম শিষ্ট-কোতূকে এবং আনন্দে, অথবা অবিদ্রোহী অভিমানে কুটিয়া উঠিয়াছে; এবং “দুঃখ-দিনের ঝড়েও” যখন সে ব্যক্তিগত চিন্তায় অন্নদার চিন্তা তথা সমাজ-চিন্তাকে হারািয়া ফেলিতেছিল, তখন তাহার স্বভাবসুলভ সংযম অন্নদার সঙ্গ এবং সেবার তাহাকে কিরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ অবলম্বন যখন ভিতর হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, তখন অক্ষয়-যোগেন্দ্ররূপ বহিঃ-সমাজের সহিত তাহার এবং সকলেরই

বৈশাখ ১৩১৯

সহজ সঙ্গতি রক্ষা করা অসম্ভব। এই মানসিক শূন্যতার সময়ই নলিনাক্ষকে হেমনলিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন। নিরামিষ আহার, শুচিশুদ্ধতা এবং সকল প্রকার বাহ্য কলঙ্কসাধনের মধ্যে তাহার বেদনাতুর নিরবলম্ব চিত্ত একটা বলিষ্ঠ আশ্রয় পাইল,—বেদনার তীব্রতা কমিয়া গেল; এখন তাহার গম্ভীর মুখে স্নিক করুণ হাসি ফুটিয়া উঠা এবং অক্ষয়কেও স্বহস্তে চায়ের পেয়ালা দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। নলিনাক্ষ তাহার গুরু; নলিনাক্ষের মুখের প্রসন্ন দীপ্তিই তাহার চিত্তের একমাত্র বল। তাই নলিনাক্ষ যখন কাশী চলিয়া গেলেন, তখন হেমনলিনীদেরও কাশী যাত্রা ছাড়া কোন উপায় রহিল না। চক্রবর্তী-অক্ষয় আসিয়া রমেশের বিবাহ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়া গেলেন,—হেমনলিনী রমেশের চিন্তাকে লজ্জাকর বলিয়া নিজের চিত্ত হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল, পারিল কি? নলিনাক্ষের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব উঠিল। এইরূপ আশ্রয়হীন অবস্থায় আর কত দিন থাকা যায়! তাহার চিত্তের দৃঢ়তার পক্ষে নলিনাক্ষের সঙ্গ অবগুস্তাবী। না থাকুক তীব্র সুখঃখময় প্রেমের উত্তাপ, সে নলিনাক্ষকে সেবা এবং ভক্তি করিয়াই জীবন কাটাইয়া দিবে। আর পিতা! এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার হেমসম্বন্ধায় নিদারুণ ক্লেশ এবং তজ্জনিত রোগ-যন্ত্রণার সময় হেমের গৃহ-প্রতিষ্ঠা তাঁহার পক্ষে কত মূল্যবান! হেমনলিনী হৃদয়ের দৌর্য্যালোর উপর আবরণ টানিয়া দিয়া দৃঢ়তার বুক বাধিয়া বিবাহে সঙ্গতি দিল। কিন্তু হঠাৎ রমেশ স্রোতের মত বহিয়া আসিয়া এই দৃঢ়তার বাধের উপর আঘাত করিল, হেমনলিনী ক্ষণকালের জন্য আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া মরণাহত সর্বশেষ প্রচেষ্টা দ্বারা সেই স্রোতকে ঠেলিয়া দিল; প্রত্যাগত স্রোত পাশ কাটাইয়া আপনার গতিবেগে অগ্র দিকে বাহিয়া গেল। ততক্ষণে দৃঢ়তার বাধ কাঁপিয়া কাঁপিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া গিয়াছে। ক্ষেমকর্তীর উপদ্রুত বালাজোড়ার ক্ষীণ ভগ্নাবশেষ-টুকুতে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ অপেক্ষা বেশীর ভাগ যুদ্ধ না

করিয়াই আত্মসমর্পণের জ্ঞাত যখন হেম সমরাজ্যে আসিয়া নামিল তখন সেই স্রোত আর নাই! তাহাকে জয় করিয়াও তাহার নিকট সে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হইয়া গেল—যদিও নিজের এই পরাজয়ের বেদনাটা রমেশের শেষ চিঠি পাইয়াই হেমের নিকট পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। কমলাকে হেম কমলা অথবা নলিনাক্ষের স্ত্রী বলিয়া জানিল, তাহার নিকট শেষ বিদায় লইল। “আজ হেমনলিনীর জ্ঞাত কমলা মনের মধ্যে বড় একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিল।” পাঠকের হৃদয়ও বেদনায় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। “হেমনলিনীর প্রশান্ত মুখে কি একটা ভাব ছিল, যাহা দেখিয়া কমলার চোখে যেন জল ভরিয়া আসিতে চাহিতেছিল,” এবং পাঠকের চোখেও অশ্রুহীন ছিল না। “কিন্তু হেমনলিনীর কেমন একটা দূরত্ব আছে—তাহাকে কোনো কথা বলা যেন চলে না, তাহাকে প্রগ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যেন বাধে। আজ কমলার সকল কথাই হেমনলিনীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সে আপনার সুগভীর নিশ্চিন্ততার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া চলিয়া গেল, কেবল একটা কি রাখিয়া গেল, যাহা দিলীপমান গোপুত্রের মত অপরিমেয় বিষাদের বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ।”

মা-বাপ-মরা কমলা বাল্যকালে মামার বাড়িতে দীনতা এবং স্নেহহীন কঠোরতার কমলা। মধ্যে পালিত হইয়াছিল। বিবাহ লইয়া গোলমাল, এবং বিবাহ হইলেও পথে নৌকাডুবি, ইত্যাদি কারণে কমলা নিজেকে অপরমন্ত মনে করিত। এক সময়ে তাহার চরিত্রে একটা দীনতার সঙ্কোচ ছিল, কিন্তু রমেশের আদরে তাহা কাটিয়া গেল। ঘরে রমেশের পিতামাতা নাই। বধুসুলভ সঙ্কোচ শিখাইবার মত আর কেহ ছিলেন কিনা প্রথমে তাহার উল্লেখ নাই। দেখিলাম, প্রথম পরিচয়ের পর কমলা-রমেশে ছাদের উপর দিবা এবং সান্ধ্য সান্ধ্য চলে। নৌকাডুবির পর এমন ভাবে, এমন জীবন-যরণের সন্ধিক্ষণের মিলনে, যাহাকে নিকটতম আত্মীয়

করিয়া দিয়াছে, যাহাকে কমলা সর্বাঙ্গকরণে আপন স্বামী বলিয়া জানে, তাহার কাছে ধীরে ধীরে সে হৃদয় খুলিয়া দিতে লাগিল—জন্মের ধর্ম এবং হিন্দু-পত্নীর স্বভাবসুলভ সংস্কার বশে। রমেশের কাছে এখন আর তাহার লজ্জা সন্ধ্যা নাই, সহজ-সরল ভাবে কথা কহিতেও তাহার কিছু মাত্র বাধে না। রমেশ তাহার একমাত্র আপন, একমাত্র নির্ভর—রমেশকে ছাড়িয়া বোর্ডিঙে সে একা থাকিবে, এ কথা তাহার মনেই আসে না। ছুটিতেও তাহাকে আপনার কাছে ডাকিয়া লইবে না, ইহা জানিয়া কমলার কষ্ট হইল, একটু অভিমান হইল,—বিরহ-বিচ্ছেদের পর পালিকার গোলগাল মূর্তির মধ্যে যুবতীর যান লাগিয়া কুটাইয়া কমলা রমেশের কাছে আসিল। অভিমানে এবং মাঝ-খানকার বিচ্ছেদের লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া রহিল,—দাম্পত্য প্রেমের মুকল তাহাতে ইতিমধ্যে আরো একটু বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এই খবরটি তখন আর আমাদের নিকট গোপন থাকে না। রমেশ সহজ স্নেহের সুরে এটা ওটা ধরিয়া কথা কহিয়া বসিল, অভিমান কাটিয়া গেল। কমলা হৃদয় খুলিয়া কথার উত্তর দিতে লাগিল, উৎসাহ সহকারে তাহার নবলক ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়া রমেশকে বিস্মিত করিয়া দিতে চাহিল। রমেশের আপেল কাটা দেখিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিল, এবং নিজ হাতে নিপুণভাবে আপেল কাটিয়া রমেশকে খাওয়াইয়া তাহার গৃহিণী-জীবনের সূচনা করিল।

তারপর পশ্চিম যাত্রা। কলিকাতা যাইবার পথে অক্ষ-য়ের চাদর টামাটুনি দেখিয়া আবার কমলায় সন্ধ্যার এবং সর্বাঙ্গকরণের খিল্ খিল্ হাসি,—চিন্তাভারগ্রস্ত সুগভীর রমেশের পাশেই একটি পতিনিভরশীলা হিন্দু বালিকাপত্নীর নিশ্চিন্ত সরল হাস্যশীলা—বিরুদ্ধতার একত্র সমাবেশের সুন্দর ছবি। ষ্টামারে আমরা কমলাকে পরিখুট গৃহিণী রূপে দেখিতে পাই,—কমলা রমেশের সাংসারিক অনভিজ্ঞতায় হাসে, রমেশের মত একটি গভীর লোককে মানা কালের অল্প নির্দেশ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র ঘরকন্না

পাতে এবং রমেশকে খালের পরিবর্তে একটি সরায় ভূপ্তিপূর্ণক আহার করাইয়া রমেশের বিস্তর আপত্তি সত্ত্বেও সেই পরিত্যক্ত সরায় আপনার আহার কার্য সমাপন করে। দাম্পত্য জীবনের ‘আম ও খাস’ হাত ধরাধরি করিয়া চলে। গার্হস্থ্য চিত্রের ভিতর দিয়া বাহিরের দিকটা যখন পূর্ণতায় প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহারি প্রতিফলিত আলোকে ভিতরের দিক হইতেও কমলা দ্বাগিয়া উঠিল, কিন্তু দেখিল সে সেখানে সম্পূর্ণ একা, স্বাধারের যবনিকা টানিয়া দিয়া তাহা হইতে বিশ্ব-সাংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং “মাথের দরজা খোলা” থাকা সত্ত্বেও সেই অবলম্বন-হীন নিঃসঙ্গতার কিছুমাত্র বাতায় ঘটিতেছে না। রজনীর পুঞ্জমেষ সকালে দুই একটা অভিমানের অভিনয় করিয়া কাটিয়া গেল, দিবসের জীবন সহজ হইয়া আসিল ; কিন্তু নির্দোষে আবার সেই মর্শ্মান্তঃপুরের নিগূঢ় বেদনা-মহন, বাহিরের অবিরাম ধরাপাত এবং প্রলয় রুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে অস্তরের ওয়ারি-ক্রন্দন এবং আকুল বিদ্রোহ! কমলার এ বিদ্রোহ একটা মিথ্যার কুহকজালকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া সত্যে উপনীত হইবার জন্য উত্তম, মায়া-নিগড়রুদ্ধা প্রকৃতির বজ্রবিজুক বক্ষোদেশ হইতে উথিত আকাজক্ষারই মত অন্ধ এবং অপরিখুট। এই বিদ্রোহের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ একটু mystic হইয়াছেন, কিন্তু তীক্ষ্ণ অনুভবশক্তি ব্যাকগণের জীবনভিত্তিহাসে আসন্ন ভাবী ঘটনার চায়াপাতের এই রহস্যময়তা পরীক্ষিত বস্তু-সত্য না হইলেও, অস্বাভাবিক কিম্বা মিথ্যা নহে। কমলার এই নৈশিধ বিদ্রোহ ধীরে ধীরে দিবসের মর্ম্মের মাঝেও যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিত তাহা নিশ্চিত, কিন্তু চক্রবর্তীর সহিত ঘরকন্নার কাজ করিয়া এবং উন্মেষকে স্নেহ করিয়া কমলা একটি দিবস-রাজ্য গড়িয়া তুলিল, যেখান হইতে রমেশ নির্বাসিত এবং যেখানে “লাউ-ডগা” “টক-পালং” ও “সজ্জনে-খাড়া”র ভিতর দিয়া রমেশের চিন্তা কখনো উঁকি মারিয়াছে বলিয়া আমাদের মনেই হয় না। সব বিষয়ে রমেশের

অনুগত। রূপেই কমলাকে এ পর্যন্ত আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এখন দেখি রমেশের উপর নির্ভরসে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই কাটাওয়া উঠিয়াছে, এবং রমেশের ইচ্ছা বিক্রমে উমেশকে সঙ্গে নিতে এবং চক্রবর্তীর সঙ্গে গাজিপুরে যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করায় তাহার বিজ্ঞোহের সংঘত প্রকাশে আমরা তাহার চিত্তে একটা স্বাধীনতার বিকাশ উপলব্ধি করি।

ঈমারে গৃহিণী কমলারই প্রাণাচ্ছ। গাজিপুরে চক্রবর্তীর বাড়ীতে কমলাকে যরকরার কোনো কাজ করিতে হইত না, এখানে আমরা প্রেমিকা কমলাকেই পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাই। ঈমারে নিম্নোক্তরূপে যে মুকুলটি পালিত হইয়াছিল, গাজিপুরের দিনসে তাহা পূর্ণ বিকশিত গোলাপ হইয়া দেখা দিয়াছে—এ গোলাপের প্রত্যেকটি পাপড়ি গন্ধে এবং কোমলতায় মনোহর, বেদনায় “শোণিত-রাগা।”

কমলার এই চিত্তবিকাশে তিনটি জিনিষ তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল,—গার্হস্থ্য অবলম্বনের অভাব, রমেশের বহির্বাটিতে অবস্থান-জনিত তাহার সহিত কমলার পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ, এবং সর্বোপরি শৈলর প্রভাব। শৈলর পরিস্ফুট আত্মনিবিড় দাম্পত্য-প্রেমের অভিনয়টা তাহার চোখের সামনে যখন নিয়তই অভিনীত হইতে লাগিল, তখন কমলা তাহাতেও একটা ক্রিয়াচঞ্চল প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিল। শৈলর উজ্জ্বল দাম্পত্য-চিত্র হইতে একটা প্রতিফলিত আলোক-উত্তাপে কমলা অন্তরে অন্তরে এক মুহূর্তে বিকশিত হইয়া উঠিয়া তাহার নব-জাগ্রত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষারাজির নিকট হইতে খবর পাইল যে, তাহাদের দাম্পত্য জীবন কেমন দীন এবং অসংলগ্ন, রমেশের সহিত তাহার অন্তরহম পরিচয়ের পথে কেমন একটা বাধা আছে, রমেশের প্রেম-ব্যবহারে কেমন একটা বিশেষ সীমা আছে, যাহা সে কিছুতেই ছাড়াইয়া আসিতেছে না। গাজিপুরের এই কয়টা দিন কমলার রুদ্ধ অভিমান এবং অশ্রুগর্ভ বেদনার ইতিহাস। এই রুদ্ধ অভিমান-বেদনাকে আমরা এক দিন রমেশের

প্রত্যাখ্যানে উদ্দীপ্ত বিজ্ঞোহে এবং পর ক্ষণেই বাধা-নিষ্পত্তি অশ্রুবেগে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম। রমেশের সহিত সহজ মিলনের কোনো উপায় না থাকায় এ অবস্থাটা কমলাতে অনেক দিন ব্যাপিয়া ছিল। এই অবস্থায়ই কমলা তাহার মা নাই, বাপ নাই, তাহার খণ্ডর শাওড়ী নাই, এই কথা মনে করিয়া মন্দিরপীড়া অনুভব করিয়াছিল। রমেশকে আত্ম-পরীক্ষা হইতে কিছু অবসর দিবার ক্ষমতা যেমনই হউক, কমলাকে পৃথক করিয়া ফুটিয়া তাহাতে অভিমান জাগাইয়া তুলিবার ক্ষমতা চক্রবর্তীর বাড়ীতে রমেশকে কমলা হইতে অবচ্ছিন্ন রাখার দরকার ছিল। রমেশ যখন সংযমের দৃঢ়তাকে একটু শিথিল করিয়া ভিতর বাটীতে কমলার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, তখন কমলার পক্ষ হইতে এই অভিমান-বাতের খুব প্রয়োজন ছিল। ঈমারে প্রেমিকা কমলা যখন রমেশকে আহ্বান করিয়াছিল তখন রমেশ তাহাকে আপন জীবন জানিয়া প্রত্যাখ্যান করে, আজ রমেশ যখন দ্বার-প্রান্তে অতিথি তখন কমলা তাহাকে স্বামী জানিয়া অভিমান চাড়া আর কিছু দ্বারা ফিরাইয়া দিতে পারে না;—অভিমানের প্রয়োজন, কারণ ফিরাণো চাই-ই। স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় এই দুটি চরিত্রকে পাশাপাশি রাখিয়াও এমন পাপম্পর্শ-শূন্য রাখার নিপুণতায় আমরা দিগকে মুগ্ধ হইতে হয়।

প্রেমিকা কমলা প্রেমিক রমেশের নিকট হইতে ফিরিয়া আসে, প্রেমিকা কমলা প্রেমিক রমেশকে ফিরাইয়া দেয়,—এক দিকে রমেশের মহত্বের বাধা, আর এক দিকে তাহার নিজের অভিমানের বাধা—প্রেমের ক্ষেত্রে তাহাদের মিলনের উপর বিধাতা এবং সমাজ বজ্র উত্তত করিয়া রাখিয়াছেন, এখানে তাহাদের মিলন নাই। গৃহিণী কমলার সহিত গৃহস্বামী রমেশের মিলন সহজ এবং বাধামুক্ত, এখানে এক দিকে অভিমানের আঘাত এবং অল্প দিকে মহত্বের পরীক্ষা নাই;—তাই তাহাদের জন্ত নূতন গৃহরচনায় প্রবৃত্ত কমলার সহিত রমেশের স্নিগ্ধ-সরস কথোপকথন চলে; এই ক্ষেত্রে

তাহাদের পরস্পর আদর-যত্ন এবং স্নেহজ্ঞাপন, এইখানেই তাহাদের মিলন। এই মিলনে প্রেম নাই তাহা বলা যায় না, তবে প্রেম এখানে গৃহকে অবলম্বন করিয়া একটা সঙ্কোচহীন ভিন্ন মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে,—এই ভিন্নতাকে “গৃহিণী” কপার মধ্যে ধরিতে চেষ্টা করা গেল।

গাজিপুরে বাংলায় গৃহরচনায় কমলা আবার গৃহিণী-রূপে ফুটিয়া উঠিল, কর্মের আনন্দের ভিতর দিয়া তাহার প্রেম প্রকাশের কোনো প্রতিবন্ধক রহিল না। রমেশও গৃহকর্মের মধ্যে কমলার বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিশেষভাবে মুগ্ধ হইল এবং প্র্যাক্টিসের সমস্ত আয়োজনের জন্ত এলাহাবাদ গিয়া কমলাকে স্ত্রীরূপে স্বীকার করিয়াই গাজিপুরে অবস্থান করিবে স্থির করিয়া কমলাকে চিঠি লিখিল। সব দিক দিয়া সব বাধা সরিয়া গিয়াছে—গৃহ এবং প্রেম-জীবনের জন্ত পরিপূর্ণ আয়োজন, এমন সময় কমলার নিকট চিঠির একটি ছিন্ন অংশ তাহার জীবনের সমস্ত রহস্তকে ফাঁশ করিয়া দিল। এক মুহূর্তে তাহার অতীত জীবন একটা তীব্র আঘাতে আগাগোড়া নড়িয়া উঠিল, এক মুহূর্তে ছাদের উপরের সন্ধ্যালাপ হইতে এই নূতন গৃহসজ্জা পর্য্যন্ত উজ্জ্বল পরমাণুদমষ্টির মত সমস্ত এলোমেলো ঘটনাবলী যেন একটা বাজীকরের মায়াম্পর্শে আপন আপন স্থানে সজ্জিত হইয়া রহস্তহীন প্রত্যক্ষতায় প্রকাশ পাইয়া উঠিল—সে প্রত্যক্ষতা কি বীভৎস! কি লজ্জাকর! সেখানে বরাবর একটা অনধিকারী পরপুরুষের কাছে সে প্রেম নিবেদন করিয়া আসিয়াছে, আর সেই ব্যক্তি তাহার প্রতি রূপাপরবশ হইয়া শুধু মৌখিক আদরে তাহার প্রতিদান করিয়াছে! এ লজ্জা, এ অপমান সে কি করিয়া ধুইয়া—মুছিয়া ফেলিবে! রমেশ-সম্পর্কিত তাহার সমস্ত অতীত জীবনটা এক মুহূর্তে একটা ভিত্তিহীন মায়ার প্রাসাদের মত শূণ্যে মিলাইয়া গেল, জীবনের সেই অতীত অংশ একটা আগন্তকের মত তাহার অন্তিম হইতে বসিয়া পড়িল। কমলা চক্রবর্তীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, পর দিন

বাংলাগৃহে গেল না। শৈল জিজ্ঞাসা করিল—“তোমার ঘর সাকানো শেষ হইয়া গিয়াছে?” কমলা উত্তর করিল “হাঁ, ভাই, শেষ হইয়া গিয়াছে।” “প্রিয়তমা” সম্বোধন এবং প্রেম-জ্ঞাপন লইয়া রমেশের চিঠি আসিয়া কমলার হাতে পৌঁছিলে কমলা তাহা পড়িয়া বিষের মত দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। চক্রবর্তী বাড়ীতে নাই, যাহাকে তাহার স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিয়াছে সে তাহার স্বামী নয় শৈলকে এ কথা সে কিছুতেই খুলিয়া বলিতে পারিল না; এদিকে আবার পর দিন সকালেই রমেশ দাম্পত্য গৃহবাসের বিভীষিকা লইয়া উপস্থিত হইবে। কমলা শৈলর মেয়ে উমিকে আদর করিয়া ব্রেসলেট দিল, উমেশকে টাকা-কাপড় উপহার দিল, শৈলকে প্রণাম করিল এবং বলিল “তোমাদের নিকট বড় সুখে ছিলাম”—তারপর বাংলাগৃহ-যাত্রার ছলে যে গঙ্গা হইতে তাহার জীবনে মিথ্যার জাল জড়াইয়া গিয়াছিল সেই গঙ্গাতেই রমেশের উপহারদত্ত হারের সঙ্গে সঙ্গে রমেশ-সম্পর্কিত মিথ্যা জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিল, এবং নৌকা-ডুবির পূর্ববর্তী জীবনের স্মৃতি ধরিয়া সেখানকার অন্তিম পরিচয়ের অভাবে শুধু একটু নাম ও ঠিকানাকে পাথেয় করিয়া সত্যের অন্ধারনে বাহির হইয়া পড়িল।

কমলার গৃহত্যাগকে তাহার বিশেষ অবস্থার কথা অরণ করিয়া আদর্শ হিন্দু পত্নীর পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক বলা যায় না, বরং উদ্ভট। এই গৃহত্যাগই তাহার আদর্শ হিন্দু পত্নীর দাবীকেই সপ্রমাণ করিয়া দেয়। কমলার গৃহত্যাগ পাঠকসাধারণের মনের অগ্নি-পরীক্ষা পার হইয়া আসিতে পারিলেও কমলার হঠাৎ রমেশ হইতে মন তুলিয়া লওয়ার ব্যাপারটা তাহা পারে না। কেহ কেহ ইহা হইতেই সমস্ত বইটাকেই অস্বাভাবিক আখ্যা দিয়া থাকেন, কেহ বা এই ব্যাপারটাকে একটা মন্ত মনো-বৈজ্ঞানিক সমস্যা। ঠাওরাইয়া গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে বসেন,—কিন্তু খটকা খটকাই থাকিয়া যায়। আসল কথা, খটকা লাগিলেই তাহা বুঝানো মুক্লিল। কিন্তু খটকা লাগিবেই বা কেন? হিন্দু রমণী স্বামীকে স্বামী বলিয়াই

ভালবাসে, খেলাও রমেশকে সেই ভাবে ভালবাসিয়াছিল। হিন্দু-পত্নীর স্বভাব-সংস্কার কেমন দৃঢ় এবং ২জ্জাগত, সেই সংস্কারে আঘাত পড়িলে তাহার অস্তিত্বের মূলদেশেই কেমন নাড়া পড়িয়া যায়, তাহা আমি বোঝে জানি। রমেশের স্বামিত্বের ভিত্তির উপরই কমলার ভালবাসা দাঁড়াইয়া ছিল। সেই ভিত্তিই যখন শূন্যে মিলাইয়া গেল, তখন হঠাৎ তাহার ভালবাসাকে কমলার ফিরাইয়া আনিতে হইল। হিন্দু পত্নীর পক্ষে এত বড় একটা দ্বিতীয় মানসিক বিপ্লব অসম্ভব। রমেশকে কমলা স্বামীর মত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে—এই অজ্ঞানামূল অবস্থার সুগভীর লজ্জায় এবং রমেশ তাহাকে অন্তরের সহিত ভাল না বাসিয়া তাহার নিরাশ্রয় দুঃস্থ অবস্থার জন্য ক্রতজ্ঞতা-পরবশ হইয়া এত দিন শুধু মৌখিক আদর দেখাইয়া আসিয়াছে, কমলার এইরূপ মনে করায় তাহার রমেশ-প্রত্যাখ্যানের নিকটতম কারণ নিহিত আছে। হিন্দু রমণীর পত্নীজীবনে এই বৃহৎ ঘটনার আকস্মিকতায় তাহার চিত্তবেগ যে প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ পাইয়া উঠিবে তাহা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। কমলাও যে রমেশ হইতে শুধু তাহার প্রেম ফিরাইয়া নিয়াছিল তাহা নহে, সে প্রথমে যে রমেশকে একটু বিরুদ্ধভাবে দেখিয়াছিল, একথাও ঠিক।

কিন্তু এ বিরুদ্ধতা তাহার গৃহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত, কারণ তখনও তাহার রমেশ সম্পর্কিত জীবনের ভের টুকু ফুরাইয়া যায় নাই। গৃহত্যাগের পর যে জীবন সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা হইয়া গেল, তাহার প্রতি বিরুদ্ধতার ভাবটাই তখন টিকিবে কি করিয়া? মিথ্যার বর্ণচ্ছটা গাজিপুরের সন্ধ্যায় এদিকে বিলীন হইয়া গেল, ওদিকে কাশীর নিম্নীথে নবীনকালীর গৃহে কমলার সত্য জীবনের দুঃখস্পর্শ অন্ধকারের মত তাহার চারি দিকে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। পথে গৃহে তখন অন্ধকার, চোখেও অন্ধকার জড়াইয়া আসিয়াছে—তবুও কমলা তাহার অন্তরের নিভৃত কোণে যে নামের প্রদীপটি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল, তাহারই আলোক বাহিরের একরাশ অন্ধকারকে একেবারে অসহ হইতে দেয় নাই। নবীন-

কালীদের বাড়ীতে এক দিন নলিনাক্ষ কমলার নিকটে অরুণের আভাস লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—কমলা হাতের লঠন কাঁপিয়া উঠিল, তাহার অন্তরের দীপটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া নিবিয়া গেল—অরুণের সন্ধান পাওয়া গেল, তখন দীপের আর কোনো প্রয়োজন রহিল না। কিন্তু বাধা তখনও রহিয়া গিয়াছে, অন্ধকার তখনও কাটে নাই। ধীরে ধীরে উমেশ, চক্রবর্তী, শৈল প্রভৃতি ভোজের পাখীরা পক্ষতাড়নায় বাকী অন্ধকারটুকু তাড়াইয়া দিয়া কলকণ্ঠে আকাশকে মুখর করিয়া তুলিয়া অরুণকে আবাহন করিয়া লইল,—“নলিনী” তখন “আগ্নি খুলিয়া” দেখে তাহারি “রবি” তাহারই দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রেম-সন্নত আয়তোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাহারই পানে চাহিয়া আছে। আমাদের জগৎপুত্রলক্ষী কমলাটির সহিত পদপলাশলোচন নলিনাক্ষের মিলন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

স্বামী কমলার ঈশ্বিত। এই ঈশ্বিতলাভের পথে নবীন-কালীর গৃহে আমরা কমলার কষ্টসহিষ্ণুতা এবং শত নির্যাতনের মধ্যেও তাহার অবিদ্রোহীভাব দেখিতে পাই; দেখিতে পাই, সেই বাড়ীর ততোরাও কঠা-গৃহীণীর বিরুদ্ধে গিয়া এই বায়ুনঠাকুরণ কমলার কেমন বশ। নিরুদ্দষ্ট অপরিচিত স্বামীর প্রতি হিন্দু পত্নী কমলার পূর্বেই ‘ভক্তিপ্রেম’ ছিল, তবে নবীনকালীদের বাড়ীতে নলিনাক্ষের মত এমন “সৌম্যাসুন্দর দেবতার মত” স্বামীকে দেখিয়াই কমলার প্রথম ‘অমুরাগ’ হইয়াছিল এ কথা ঠিক। হরিদাসীরূপে নলিনাক্ষদের বাড়ীতে আসিয়াই কমলা তাহার লক্ষীর মত মুখ ও লক্ষীর মত সেবা ও গল্পপনা দ্বারা নলিনাক্ষের মাতা কেমঙ্গরীকে বশ করিয়া লইল। বশ করিবার মন্ত্র তাহার বেশ জানা আছে, তাহার সংস্পর্শে যে আসে সেই তাহার পরিচয় না পাইয়া যায় না; ঈমারে খুড়ো চক্রবর্তী পাইয়াছিলেন ও উমেশ পাইয়াছিল, গাজিপুরে সখী এবং দিদি শৈলজা ও উমি পাইয়াছিল, হেমনলিনীর মত এত বড় একটা প্রতিদ্বন্দ্বিনীর স্বতির কবচ আঁটিয়াও

রমেশ সেই মন্ত্রবাণ হইতে রক্ষা পায় নাই; এই মন্ত্রে শিক্ষিতা হেমনলিনী তাহার চিত্তকে কমলার স্নেহে ধরিয়া দিয়াছিল, আর স্বয়ং ওঝা স্বামী নলিনাক্ষের সাহিত্যিকতা ভেদ করিয়া তাহার ভিতরেও এ মন্ত্র কেমন কাজ করিয়াছিল, তাহা আমরা নলিনাক্ষের চরিত্র-বিশ্লেষণে দেখিতে পাইব। কমলার এত বড় শক্তি, সে ইচ্ছা করিয়া কখনো শক্তি খাটায় না। তাহার আজন্ম দুঃখকষ্টের গুণে সে তাহার আকাঙ্ক্ষাকে ধর্ম করিতে শিখিয়াছে, মিলনের প্রধান সহায় দীনতা তাহার অন্তরের চির অলঙ্কার : বহুদিনব্যাপী দুর্ভিক্ষের পর আসন্ন ভোজের কাছেও তাহার সংযম অসাধারণ, নলিনাক্ষকে শুধু দেখা এবং সেবার অধিকারেই তাহার সন্তোষ অপরিমিত। দুঃখের ভিতর দিয়া কমলা আসিয়াছে, অতের দুঃখকে আপনার বলিয়া অনুভব করিতে সে জানে,—বিদায়ের বেলা হেমনলিনীর বিষন্ন-মলিনতার জ্ঞাত তাহার প্রতি কমলার তীব্র সহানুভূতির ভিতর দিয়াই আমরা বেদনা অনুভব করি। রমেশের সহিত কমলার শেষ-বিদায়ে রমেশের জ্ঞাত কমলার কোনো দুঃখপ্রকাশ আমরা দেখি না। কিন্তু নলিনাক্ষের সহিত কমলার মিলনের অন্তরায় রমেশ যখন সীমাহীনতায় নিঃশেষে হারাইয়া গিয়াছে, নলিনাক্ষ ও কমলার মিলন যখন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন কমলার দাম্পত্য জীবনের সেই গোপন অধ্যায়ের মর্ম্মদেশে হেমনলিনীর সহিত এই পিতৃ-মাতৃহীন নিরাশ্রয়া যুগকটিরও সাক্ষর স্মৃতি, ভক্তি ও স্নেহ-অশ্রুর সজলতায় চিরদিন অভিসিক্ত আছে, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে আমরা অনুভব করিতে পারি।

হেমনলিনী আচারে, ব্যবহারে এবং কথায় কতকটা প্রচ্ছন্ন। রমণী সমাজের সহিত যথেষ্ট হেমনলিনী ও মেলামেশার অভাব, তাহার উন্নত কমলা। দৃঢ় হৃদয়, এবং উচ্চ শিক্ষাই তাহার প্রধান কারণ। কমলার মধ্যে যে একটু প্রচ্ছন্নতা নাই তাহা নহে, এই প্রচ্ছন্নতা তাহার জটিল জীবন-সমস্তা হইতে উদ্ভূত। তবে যুলে কমলা-চরিত্র

সরল এবং প্রকাশপর্য্য; তাহার অশিক্ষিত সারল্য দোষের নহে বরং সুন্দর এবং মধুর। শিক্ষিতা হেমের সহিত অল্প পরিচয়েই তাহাকে আমরা দৃঢ়চিত্তা বলিয়া অনুভব করিতে পারি; অশিক্ষিতা কমলার দৃঢ়চিত্ততা বাহিরে সচরাচর প্রকাশ পায় না, কিন্তু বড় প্রয়োজনের ডাকে দেখা দেয়। হেমের হাস্যলাপ এবং তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আমরা উপভোগ করি, কমলার হাসি এবং সরল প্রয়োজনের আলাপও কিছুমাত্র কম উপভোগ করি না। ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিত স্বাধীন প্রেম এবং হিন্দু সমাজের নির্ভরশীল দাম্পত্য প্রেম, ব্রাহ্ম হেমনলিনী ও হিন্দু কমলা স্ব স্ব স্থানে উভয়ই প্রধান, বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য মণ্ডিত। তবু সব দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে কমলাকেই আমরা বেশী পরিণত বলিতে বাধ্য। কমলা-চরিত্রের বিচিত্রতা হেম নাই। কমলার হৃদয় হীরকখণ্ডের মত তার বিভিন্ন দিক দিয়া সরল ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ লাভ করিয়াছে। হেমনলিনী অনেক দিক দিয়া প্রচ্ছন্ন, ফুটিয়াছে শুধু কণ্ঠ এবং প্রেমিকা রূপে। কমলা কণ্ঠরূপে ফুটিয়াছে চক্রবর্তী এবং ক্ষেমঙ্গরীর কাছে। হেমের পূর্সরাগ কমলাতেও আছে, কমলার দাম্পত্য চিত্র হেম নাই অথবা অঙ্কিত হইবার অবকাশ ঘটে নাই। চা বিতরণে হেমের সেবা-পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ক্রহিত-মুড়োর সেবাপরায়ণতার কাছে তাহা টিকিতে পারে না। হেম সংসারের ভারের কথা ভাবিলে ভয় পায়, কমলা পাকা গৃহিণী। উমেশ এবং উমিতে মিলিয়া কমলার মাতৃহের দিক বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে, চাকরদের সঙ্গে তাহার ব্যবহারে অনুগতবাসুলোর পরিচয় পাওয়া যায়; হেম এসব দিক আদৌ নাই। হেম সজ্ঞানে উচ্চ চিন্তা করে, অনেকটা শিক্ষার ভিতর দিয়াই জীবনের অভিজ্ঞতা আদায় করিয়া লয়; কমলা অজ্ঞান ভাবেই সমস্ত হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে। হেমনলিনী বাহিরের শিক্ষার ভিতর দিয়া পরিণতির পথে অগ্রসর হইতেছে বলিয়াই তাহাকে ধীরে ধীরে পথ কাটিয়া লইতে হয়, এবং প্রেমিকারূপেই এই পুস্তকে অথবা এই জীবনে তাহাকে ধামিতে হইয়াছে;

আর কমলা আপন অন্তরের ধ্রুবতায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই এক মুহূর্তে প্রেমিকা, পত্নী, এবং মাতারূপে ফুটিয়া উঠিতে পারিয়াছে। তবে কমলাকে কমলার এবং হেমললিনীকে হেমললিনীর পথ দিয়াই আসিতে হইবে।

হিন্দু পত্নীর আদর্শ চিত্রণে এবং তাহাদের গৃহত্যাগে সূর্যামুখী ও কমলার সাদৃশ্য আছে। তবে কমলাতে অভিনব জীবন-সমস্তা এবং নিপুণ মনস্তত্ত্ব-সূর্যামুখী ও বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া হিন্দু দাম্পত্য-কমলা। প্রেমের আদর্শটা এমনই সুন্দর ভাবে

প্রকাশিত হইয়াছে যে, সূর্যামুখীতে কিম্বা অল্প কোনো চরিত্রে তাহা হয় নাই, হইবার সুযোগ ঘটে নাই, অথবা ঘটানো হয় নাই। অসামান্য সরলতা ও উন্নত সহজ জ্ঞান, হিন্দু বালিকাপত্নীর স্বভাব-দুর্কলতা ও অসাধারণ দৃঢ়তা, ব্রীড়াসমুচিত্তা বালিকার প্রথম প্রেমস্কুরণ ও বয়স্কা গৃহিনীর সেবাপরায়ণতা, কস্তার ভক্তিস্নেহ, এবং মাতার মাতৃত্ব, ইত্যাদি বিরুদ্ধ এবং বিচিত্র সৌন্দর্যের সংমিশ্রণে কমলা-চরিত্রে যেমন মধুর এবং মন্থস্পর্শী, সূর্যামুখী সেরূপ নহে। আদর্শ হিসাবে সূর্যামুখী কমলা-চরিত্রের সমকক্ষ হইলেও প্রাত্যহিক জীবনচিত্রণে সূর্যামুখী অনেক খাটো। কমলা-চরিত্রে প্রতিদিন এবং চিরদিন, সংসার এবং আদর্শ এ দু'টা দিকই এমন সুন্দর ভাবে মিশিয়াছে যে, তাহা আমাদের বেশী সহানুভূতি আকর্ষণ করে। কমলাতে বিচিত্রতার মধ্য দিয়া আদর্শের এককে পাই বলিয়াই আমরা দিগকে বেশী মুগ্ধ হইতে হয়।

প্রথম জীবনে আশা ও কমলার পিতৃমাতৃহীন পর-গৃহবাস, সারল্য, দ্বিগতা এবং সত্যমাহাত্ম্যে তাহাদের সাদৃশ্য আছে। তবে কমলার আশার আশা ও কমলা। পরিণতি। আশা অন্তর্ভুক্তের ভিতর দিয়া গৃহিণীরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল, কমলাতে জন্মিয়া তাই প্রথমই সে গৃহিণীরূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব জন্মে তাহার মুখে কথা নাই, পরজন্মে বেশ ফুটিয়াছে পূর্বজন্মে

ঘোমটার মুখ ঢাকা, পরজন্মে ঘোমটা মাথার উঠিয়াছে, লজ্জা সঙ্কোচও অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে; পূর্ব জন্মে সে সংকীর্ণতায় সরল, পর জন্মে বিরুদ্ধতা ও বিচিত্রতার সম্মিলনে সরল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমুখরজ্ঞান্যায়।

সন্ধ্যামালতী

শৈশবে গুরিত যবে হে শঙ্খ, তোমার ভীরে ভীরে
বাতুল বালক এক মনাবেগে অজানা খুঁজিয়া,
গুরিতে বনানী-পথে, মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সমীরে
গহনের দেশ হতে গন্ধ এক আসিত বহিয়া!

অজানা ফুলের গন্ধ, অজানা নিকুঞ্জতল হ'তে!
কত খুঁজি কত গুরি পাইত না বাহার সন্ধান!
ভুলে' ভুলে' ভাবিত সে, আশে গন্ধ তব বন্ধ হ'তে—
'আছে' শুধু এই মাত্র প্রাণে যার আভাসে প্রমাণ।

কোথায় নিকুঞ্জ-বন্ধে ক্ষুদ্র ফুল আঁধার আগারে
বিন্দু হতে তুলিয়াছে পরিব্যাপ্ত গন্ধের ফোয়ারা—
খুঁজিত আকুল হয়ে তন্ন তন্ন গোধুলি আঁধারে—
প্রাণেরে জাগা'তে চাহে, ব্যক্তরূপে নাহি দিত ধরা।

খুঁজিত বৃক্ষের বাহে—জাগে যারা নিদ্রার মাঝারে;
নির্ঝরক নিশ্চল, তবু অশ্রুপূরে আছে যার প্রাণ!
খুঁজিত পল্লব-কুঞ্জে—চিরকাল নিযুক্ত যেন রে
দীর্ঘ নিশ্বাসিতে যারা, জন্মোনি করিতে কভু গান।

খুঁজিত শিখরে, শৈলে, পাষাণের স্তূপে সমুচ্চরে,
অচেতন্ত মাঝে তবু দেয় যারা চিত্ত-পরিচয়,
অচল বাড়িতে থাকে—কত মধু শিশুর বিন্ময়ে!
কি মিষ্ট সে ধোঁয়ায়ুগি পুরী যার নিত্য ঘুরে রয়।

আজি এই এত দূরে যৌবনের মধ্যাহ্ন-প্রকাশে
 হিয়া শুধু দহে যাহে, বিন্দুমাত্র করে না উজ্জল !
 কোথা হ'তে আসে ভাসি—বাতাসে, কি ভাবের আবেশে!
 পুরাণ সে পরিচিত মনোমথ গুপ্ত পরিমল।

মনে হয়, শঙ্খ-ভীরে সে শৈশবে মজিতাম যাতে
 বস্তু সে ছিল না কভু—স্বপনের অমৃত-আভাস !
 মনে হয়, ওতপ্রোত মিশে গেছে শৈশবের সাথে !
 শৈশবেরি গন্ধ তাহা, আত্মা-পুরে উৎসব উচ্ছ্বাস !

সে সন্ধ্যামালতী যম, নিবাসিনী সন্ধ্যার অন্তরে !
 ছায়া আর আলো যবে পরস্পরে মজি' একাকার !
 ছুরাশার দাব-দক্ষ এ জীবন-মরুর প্রান্তরে
 সন্ধ্যামালতীয়ে যম পাব কোথা—পাইব কি আর !
 ত্রিশশাক্ষমোহন সেন।

শৈব ধর্মের ইতিহাস

বৈদিক যুগের শেষাবস্থায় পৌরাণিক যুগারম্ভ-কাল ধরা হয়, কিন্তু এই উভয় যুগের মধ্যে বিভাগ-সূচক রেখা-পাতের সম্ভাবনা নাই। বৈদিক বৈদিক যুগে শৈব প্রভাব। যুগের শেষ ভাগে ধীরপদবিক্ষেপে পৌরাণিক শিল্পের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং ক্রমে বর্দ্ধিত ও পৌরাণিক বুদ্ধিতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতে শিব-পূজা ও শৈবগণের আবির্ভাব এই প্রকার বৈদিক যুগাবসানের পূর্ব হইতেই হইয়াছে। প্রথমে যে ভাবে শিব মানব-হৃদয় অধিকার করেন, পরবর্তী কালে তাহার আয়ুল পরিবর্তন সাধিত হয়।

পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত বৈদিকগণ শিব-দেবতাকে
 রামায়ণে শৈবধর্মের প্রভাব। প্রথমে রুদ্ররূপে এবং মরুদ-
 গণের পিতা বলিয়া স্থির করেন। ক্রমে কালী, করালী, দুর্গা নামক

অগ্নিশিখাগুলি রুদ্রপত্নী বা শিব-ভার্য্যার পদ প্রাপ্ত হন। ক্রমে রামায়ণী যুগের আবির্ভাব-কাল উপস্থিত হইলে শিব মুর্তিমান সংসারী মানবের জ্ঞান কল্পিত হন। মধু ও লবণ দৈত্য হইলেও পরম শৈব। লঙ্কেশ্বর রাবণ শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং শক্তির উপাসনা করিতেন। 'রামেশ্বর' শিব প্রতিষ্ঠা এবং ত্রিরাম কর্তৃক শক্তি-আরাধনা যদি সত্য হয়, তবে শৈব ধর্ম যে কত পুরাতন তাহা উপলব্ধি হইবে। *

শৈব-ধর্মের ও শিব-শক্তির প্রসঙ্গ রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতে অধিক। কংস, জরাসন্ধ ইত্যাদি মহাভারতে শৈব প্রভাব। শৈব ছিলেন। পাণ্ডব-শিবির-রক্ষা এবং কিরাত-বেশধারী শিবের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ ও পাণ্ডপাতাস্থলাত শৈব ধর্মের পরিচায়ক।

মিলিন্ডের (Menander) প্রত্যাবর্তনকালে পুষ্পমিত্র

যুগবংশ ও শৈব ধর্ম।
 (১৮৪ খৃঃ পূঃ)

বিজ্ঞান ছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন। 'মালবি-কাগ্নিমিত্রে' ইহার বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে।

সেই সময়ে শৈব ধর্ম বর্তমান ছিল। ২৭ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত কাশ্য বংশের নিদর্শন বিজ্ঞান ছিল।

কদপাস শিবপূজা

কদপীস (Kadphises).
 ২০ খৃঃ।

বুড়ি অঙ্কিত ছিল।

শিব স্ত্রী (মৎস্ত পুরাণ) ১৫০ খৃষ্টাব্দে এবং শিবস্কন্দ শতকর্ণা (২৭৩) ১১৭ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়া ছিলেন। তাহার শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

* রামায়ণে রামের শক্তি-আরাধনার প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু পুরাণাদিতে শক্তি-পূজার প্রসঙ্গ আছে।

শক রাজগণ পরম মাহেশ্বর বলিয়া শিলাদিপিতে উল্লিখিত আছে। সেই সময়ে শৈব ধর্মের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

গুপ্তরাজগণ পরম মাহেশ্বর ও বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহাদের সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সাত-শয় হীনভাব ধারণ করে।
৪৫৫-৬০১ খৃ।

চন্দ্রগুপ্ত (২য়) বিক্রমাদিত্যের সময়ে শৈব ধর্মের প্রবলতা পরিলক্ষিত হয়। ক্ষন্দগুপ্তের সময় বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তিনি সৌর ও শৈব ধর্মোৎসব অমুলাগী ছিলেন। গুপ্তরাজগণের সময়ে শৈব ও বিষ্ণুপূজকগণের একতা সম্পাদিত হয়। হরি-হর মূর্তির পূজা সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পুণ্ড্রদেশে ক্ষন্দ-গোবিন্দের পূজার প্রচলন এই সময়ে আরম্ভ হইয়াছে।

“ক্ষন্দগুপ্ত প্রভৃতি কোন কোন গুপ্তরাজবংশধর মাতৃকা বা শক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের যত্নে শক্তি ভিন্ন কেহ শিব পূজা করিতে পারিবেন না, ইত্যাদি পৌরাণিক মত প্রচারিত হয়।

গৌড়মণ্ডলে গুপ্তরাজ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ।

গুপ্তরাজগণের সময়ে কণোজাধিপতি পরম মাহেশ্বর হর্ষদেবের যত্নে মথুরা মণ্ডলে বহুতর শিব-মন্দির নির্মিত হইয়াছিল।”

বর্তমান মালদহের পাণ্ডুরা নামক প্রাচীন স্থানে গুপ্তরাজগণের বহু নিদর্শন ও হরপোরা (বাব্রবীকায়) মূর্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্তমান কালে মালদহের প্রাচীন চিত্রে চিত্রিত বনভূমে যে সমুদায় দেবদেবীর মূর্তি (বিষ্ণু, ভবানী, কালী) বিদ্যমান রহিয়াছে, উহার উপরিস্থ “শ্রীমুখ” চিত্র দর্শনে কোনওলি গুপ্তরাজগণের সময়ে প্রতিষ্ঠিত, তাহা অবগত হওয়া যায়।

‘তোরামন’ মহারাজের সহিত বঙ্গের বিশেষ কোন

সম্বন্ধ বর্তমান না থাকিলেও তিনি শৈবধর্মের সবিশেষ আস্থামান ছিলেন বলিয়া এ

স্থলে তাহার নামোল্লেখ করা হইল।

শ্রীহর্ষদেবের সময় শৈব প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে অনেকে শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া শিব মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং বৌদ্ধ-উৎসবের সহিত উৎসব আমোদের অমুষ্ঠান হইয়াছিল।

গৌড়ের দক্ষিণস্থ উত্তর রাঢ়ে শশাঙ্কনরেন্দ্রগুপ্ত নামে এক জন শৈবধর্মাবলম্বী নরপতি ছিলেন। সেই সময়ে গৌড়ের কিয়দংশ ও রাঢ় মণ্ডলে শৈব প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই শশাঙ্ক গয়াস্থ বোধি-তরু কর্তন এবং তথায় শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নম্বর গ্রামে শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। *

শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য কেবল যে শৈব ধর্ম পুনঃ প্রচার ও বৌদ্ধধর্ম বিনাশার্থ শঙ্করাচার্য্যের কোশল।

বৌদ্ধ ধর্মের আমূল উৎপাটনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহা তাহার জীবনী পাঠে বোধ হয় না। তিনি বুঝিয়াছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম বিনাশ করিতে হইলে কেবল শৈব ধর্ম প্রচার করিলে চলিবে না। তৎকালে ভারতে বিষ্ণু ও শিবাদি দেবতার আরাধনাও প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন হিন্দু ধর্মোপাসকগণের মধ্যে বিকল্প ভাব দূরীকরণাভিপ্রায়ে তাহার শিষ্যগণের মধ্যে তিনি শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারার্থ আজ্ঞা প্রদান করেন।

মাধবাচার্যের শঙ্কর-দিগ্বিজয় অনুসারে, শঙ্করাচার্য্য অঙ্গ, বঙ্গ ও গোড়দেশীর নাস্তিক (গৌড় : মণ্ডলীকে বাকবুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অনেকে শৈব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং গোড় নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে গোড় দেশে শৈব ধর্ম প্রবল হয়। শঙ্করাচার্য্য বিপক্ষগণের মতবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন, এবং বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচার ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচলনের উদ্দেশে বৌদ্ধ-প্রধান স্থানে শঙ্করাচার্য্যের মঠ প্রতিষ্ঠা।

ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচলনের উদ্দেশে
এবং বৌদ্ধধর্মের ধ্বংস বাসনায়া
শৃঙ্গগিরিতে শৃঙ্গগিরি মঠ।

দ্বারকায় সারদা মঠ, ত্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ ও বদরিকাশ্রমে জ্যোতিষ মঠ সংস্থাপন করেন। যেখানে বৌদ্ধ মতের প্রাচুর্য্য এবং প্রচার-কেন্দ্র ছিল, তিনি সেই সেই স্থলেই মঠ স্থাপন করিয়া আপন নব মতের প্রচলন করেন। তিনি আত্মজ্ঞানে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শিবাদির উপাসনা প্রচারে উত্তত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যেরা তদীয় আদেশানুসারে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া ও তত্রতা পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া শিবাদি সাকার দেব-দেবীর উপাসনা প্রচার করেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য 'পরমত কালানল' অশেষরূপে দিগ্বিজয় করিয়া সেই সেই দেশের অনেক লোককে পক্ষাঙ্কর মন্ত্রের উপদেশ

ত্রিপুরকুমার শাক্ত মত ও
বটুকনাথ ভৈরব উপাসনা
প্রচার করেন।

দ্বারা শৈব মতাবলম্বী করিতে
পারেন। ত্রিপুরকুমার দ্বারা
শাক্ত মত ও বটুকনাথ দ্বারা
ভৈরব উপাসনা প্রচারিত হয়।

শঙ্করাচার্য্য কাকী, কর্ণাট, কান্ধী, কামরূপ প্রভৃতি ভারত-বর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি কাশ্মীর রাজ্যে গমন করেন এবং তথায় প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সরস্বতী পাঠে অধিষ্ঠিত হন। শঙ্কর তথা হইতে বদরিকাশ্রমে চলিয়া যান ও অবশেষে কেদারনাথে গিয়া বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে প্রাণত্যাগ করেন।

বৌদ্ধগণের সহিত শঙ্কর-শিষ্যগণের ঘোর যুদ্ধ হইত।

বেদান্তানুসৃত তত্ত্বজ্ঞানের অমূল্যলীন শঙ্কর-শিষ্যগণের মূল ধর্ম হইলে ইহারা তদ্ব্যতিক্রম যোগশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শৈব শৈবপন্থী নাগা।

মতানুবর্তী বহু শাখা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে নাগা সন্ন্যাসীরা (দিগম্বর) বড়ই ভীষণ। তাহারা গৃহত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াও প্রকৃত যোদ্ধা। ইহারা বিভূতিরাশিকে একত্র করিয়া জমাইয়া রাখে এবং গিরিমুদ্রিকায় চিত্রিত ও চন্দনাদি দ্বারা বিলেপিত করিয়া থাকে।†

পুণ্ড্র, গোড় বঙ্গাদি দেশে শৈব ধর্ম অতিশয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বর্তমান ধর্মাদিত্য ও শৈব প্রভাব।

কালে প্রাচীন শিবলিঙ্গ, বিবিধ শিবশক্তির পায়ণ ও ধাতু ময় মূর্তিসমূহ তাহার প্রমাণ প্রদানার্থ বর্তমান রহিয়াছে। গোড়ের শৈব ধর্ম অতীব প্রবল ছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই। +

ব্রহ্মপুরাণানুসারে বর্তমান ভুবনেশ্বর তীর্থের নাম একান্ত কানন। উৎকলরাজ ৬০৭ খৃষ্টাব্দে গোড়ের শৈব প্রভাব। ললিত কেশরী ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে তথায় একটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোড় ও উৎকলে তখন শৈব প্রভাব বিস্তারিত ছিল। *

কাম্মীররাজ জয়াপীড় যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গোড়ের আগমন করেন, ৭৫৫ ৭৬৮ খৃঃ শৈব প্রভাব— তখন পুণ্ড্র রাজধানীতে কাক্তিকের নিকেতন দেখিয়া

ইতিহাসে এই নাগা সন্ন্যাসীগণ বৈষ্ণবগণের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণবধ করে।—ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়, শৈবধর্ম।

+ করিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্মাদিত্যের তাম্রশাসন দেখিয়া বুঝা যায় এই সময়ে (খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে) গোড়ের শৈব ধর্মের সবিশেষ বিস্তার ছিল। Indian Antiquary, Vol. XXI, P. 43.

* Account of Orissa proper, or Cuttack.

ছিলেন। স্বন্দগোবিন্দ ইত্যাদি শৈব প্রভাবের পরিণতি
বাত্র।

শ্রবণশ্রী নৃপতিগণের সময় পৌণ্ড্র-গৌড়ে পৌরাণিক
মতবাদের সহিত বৈদিক প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়া
ছিল। কর্ণোজাগত ব্রাহ্মণগণ গৌড়-ভূমে বাস করিতেন,
এবং পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা প্রচার করিয়া বৌদ্ধ
ধর্ম বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎপরে-পালরাজ-
গণ বৌদ্ধ হইলেও শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মোচরণ করিয়া
নাম মাত্র বৌদ্ধ ছিলেন। বাস্তবিক সেই সময়ে বৌদ্ধ
ধর্ম হিন্দু শৈবাদি ধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল।

শ্রীহরিদাস পালিত।

নামি-কো

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

‘ফার্ণ’ সংগ্রহ

ইকাও হইতে মিড্‌সোয়া যাইবার পথ দীর্ঘে প্রায় তিন
মাইল হইবে। তৃণশূন্যহীন পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া রাস্তাটি
সাপের মত আঁকিয়া থাকিয়া গিয়াছে : কেবল এক
স্থানে উহা একটা উপত্যকার মধ্যে ডুব দিয়াছে। অল্প স্থানে
একটা কন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অপর পার্শ্বে বাহির
হইয়াছে। নিম্নে ও পশ্চাতে ঘোমোর সমতল ভূমি
প্রসারিত। পথের দক্ষিণে ও বামে তৃণাক্ষাদিত ভূমি।
যখন বিগত বৎসরের পোড়া ঘাস ও আগাছার ভস্মে
কৃষ্ণবর্ণ ভূমি উপর বসন্তসমাগমে কচি ঘাস ও বিচিত্রবর্ণ
পত্রপুষ্প মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, মনে হয় যেন স্বন্দ কারুকার্য-
খচিত একখানা পালিচা বিছান রহিয়াছে। প্রকৃতি-
প্রেমিকের নিকট এমন স্থানে দীর্ঘ বসন্তের দিনও নিতান্ত
ছোট বলিয়া বোধ হয়।

রৌদ্রালোকিত বৈকাল বেলায় এক দিন তাকেও ও
নামি ইহু ও অল্প একটি পরিচারিকা সমভিষাধারে কচি
‘ফার্ণ’ সংগ্রহ মানসে এখানে আসিয়াছিল। কিঞ্চিৎ

ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্ত তাহার। একটি সুন্দর স্থান
নির্বাচিত করিল। পরিচারিকা সেখানে একখানি কম্বল
বিছাইলে তাকেও ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। নামি
কিন্তু খড়ের চটি খুলিয়া রাখিয়া গোলাপী রঙের ক্রমাল
দিয়া ‘কিমোনো’ আস্তে আস্তে ঝাড়িয়া ধীরে ধীরে বসিল
ও কহিল, “কেমন নরম! এমন শয্যা রাজার উপযুক্ত।”

“কুমারী—মাপ করুন—গিন্নী, তোমায় আজ বড়
সুন্দর দেখাচ্ছে। অনেক দিন তোমায় এমন গান গাইতে
শুনি নি।” এই কথা বলিয়া পুলকোজ্জ্বল চোখে ইহু
তাহার মুখ পানে চাহিল।

“আজ অনেক গান গেয়েচি, বড় তৃষ্ণা পেয়েচে।”
পরিচারিকা কহিল, “চা আনা হয় নি, বড় অজায় হয়ে
গেছে।” একটি পুঁটুলি খুলিয়া সে কমলা লেবু, কেক্.
‘স্ববি’ প্রভৃতি বাহির করিল।

“কমলা লেবুতেই হবে।” এই বলিয়া একটি লেবু
ছাড়াইয়া তাকেও কহিল, “নামি-সান্,* তুমি এমন
ছাড়াতে পার না, পার কি?”

“পারি না ত কি? নিশ্চয়ই পারি।”

পরিচারিকা কহিল, “কর্তা আপনি যা ‘ফার্ণ’ তুলেচেন
তাতে যে অনেক আগাছা।”

“সাবধান! অস্ত্রের দোষ দেখিয়ে নিস্ত্রের দোষ ঢাক-
বার চেষ্টা করো,” তাকেও কহিল। “কি সুন্দর দিন!
ভারি আনন্দ হচ্ছে।”

“বাস্তবিকই বড় সুন্দর আকাশ! যেন মেয়েদের
পোষাকের জন্ত সুন্দর একখানা কাপড় রয়েছে” নামি
কহিল, “হয়ত নাবিকের কোর্তা তার চেয়েও ভাল হয়,
কেমন?”

* ‘সান্’, ‘সামা’, ‘কুন’ একই অর্থবাচক। ইহাদের
অর্থ ‘মহাশয়’ ‘মহাশয়া’ ‘কুমারী’ ইত্যাদি। ‘কুন’ কে লে
মাত্র সমবয়সী বন্ধুদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। তৃত্য প্রভুকে
সম্বোধন করিবার সময় ‘সামা’ বলে। ইহা সর্বাঙ্গিক
শিষ্ট সম্বোধন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সম্বোধন করিবার
সময় অনেক সময় ‘সান্’ ব্যবহার করেন।

“সমস্ত জিনিসে কেমন সুন্দর গন্ধ ! ঐ শোন, ভরত পাখী ডাক্চে ।”

“আমার খুব খাওয়া হয়েছে । আবার কাজ আরম্ভ করা যাক, কি বল মাংসু ?” বুদ্ধা শাত্রী পরিচারিকাকে বলিল । তার পর উভয়ে আরও ‘ফার্ন’ সংগ্রহ করিবার জন্ত প্রস্থান করিল ।

“কতকগুলো ‘ফার্ন’ রেখে দাও, ভুলো না । নামি-সান্ তার বয়সের পক্ষে খুব চঞ্চল, না ?”

“ঠিক কথা ।”

“নামি-সান্, ক্লান্তিবোধ কর্চ না ?”

“না আজকে একেবারেই না । আমার মনে হচ্ছে এত আনন্দ কখন পাই’নি ।”

“সমুদ্রে সুন্দর দৃশ্য অনেক সময় দেখা যায়, কিন্তু উঁচু পাহাড় থেকে এই যে ভূতল-দৃশ্য এ বড় সুন্দর । বেশ তোমার আরাম হচ্ছে, না ? নীচে বা দিকে শাদা উজ্জল একটা দেওয়াল দেখতে পাচ্ছ ? ঐটে বিবুকাওয়া ওঠবার সময় যেখানে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন করেছিলুম । আর এই দিকে নীল ফিতের মত একটা কি দেখতে পাচ্ছ ? ওটা হচ্ছে তোনে নদী । দেখতে পাচ্ছ, কেমন ? তার পর আকাঙি পাহাড়ের ঢালু পার্শ্বদেশের ওধারে দেখ, ঐ যেখানে ধোঁয়া উঠ্চে—নীচে কারা যেন বসবাস কর্চে বলে বোধ হচ্ছে । ঐটি হচ্ছে মায়েবাসী নগর । ঐ দূরে রূপার সূতার মত ওটা কি ? ওটিও তোনে নদী । আরো দূরে তুমি দেখতে পাচ্ছ না : ভারী ধোঁয়াটে । আমাদের একটা দূরবীন্ আনা উচিত ছিল, কি বল নামি-সান্ ? হয়ত ঐ অস্পষ্ট ধোঁয়াটে পিছনের দৃশ্যটাই বেশী সুন্দর ।”

তাকেওর হাঁটুর উপর হস্ত স্থাপন করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নামি কহিল, “তোমার সঙ্গে যদি এখানে চিরকাল থাকতে পারতুম !”

হুইটা সোনালী প্রজাপতি দেখা দিল ; তারা নামির কম্পিত অঞ্চল স্পর্শ করিয়া উড়িয়া গেল । সেই ক্ষণে

ঘাসের উপরে পদশব্দের মত একটা থস্ থস্ শব্দ শুনা গেল এবং হঠাৎ প্রেমিক যুগলের সম্মুখে বক্রভাবে একটা ছায়া পড়িল ।

“তাকেও-সান্ !”

“এই যে চিজিওয়া-কুন ! এখানে আমাদের খুঁজে পেলে কেমন করে ?”

নবাগতের বয়স প্রায় ছাব্বিশ হইবে, লেফটেন্যান্টের পোষাকে সজ্জিত । যুবকের আকৃতি অতি সুদর্শন, এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার মুখ রৌদ্রদগ্ধ নয় । কিন্তু যুবকের মুখে এমন একটা কিছু ছিল যাহাতে তাহার মুখ শ্রীভ্রষ্ট বোধ হইতেছিল । তাহার মুখে একটা কেমন-ধারা বিদ্রূপের ভাব, আর গাঢ়-রূক্ষ চক্ষুর একটা অস্বাভাবিক চাহনি । যুবকের নাম য়াসুহিকো চিজিওয়া, সম্পর্কে তাকেওর ভ্রাতা ; এবং তাহার অপেক্ষা নিয়মদস্থ হইলেও সে সদরের এক জন যোগাত্মক কর্মচারী ।

“তুমি এখানে আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছ, কেমন ? তাকাশাকিতে একটু কাজ ছিল । সেখানেই কাল রাত কাটিয়েছি । আজ সকালে বিবুকাওয়া গিয়েছিলুম সেখানে শুনলুম ইকাও বেশী দূর নয় । তাই এই পথে এসে হোটেলের খোঁজ করে জানলুম তোমরা ফার্ন সংগ্রহে বোড়িয়েছ । এই প্রকারে এখানে এসে হাজির হয়েছি । কালকেই কিন্তু আমাদের ফিরতে হবে । তোমাদের বিরক্ত করচি না ত ?”

“না, না কিছু না । মার সঙ্গে দেখা করেছিলে না কি ?”

“হ্যাঁ, কাল সকালে করেছিলুম । তাঁকে বেশ ভালোই দেখলুম । কিন্তু তোমার ফেরার জন্ত তিনি খুব ভাবচেন বলে বোধ হল ।” নামির মুখের উপর গাঢ়-রূক্ষ চক্ষুর একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চিজিওয়া কহিল, “আকাশাকার তোমাদের বাড়ীর সকলেও ভাল আছেন ।”

কিছুক্ষণ হইতে নামির মুখ রক্তিম হইতেছিল, এবার তাহার মুখ আরো রক্তিম হইয়া উঠিল ; সে মুখ নত করিল ।

তাকেও কহিল, “দেখ, এই বার আমার বলবৃদ্ধি হয়েছে, আর আমার হারায় কে? নৌ-সেনা আর স্থল-সেনার সংযোগ। হাজার বীর রমণী এলেও আমাদের এখন হারাতে পারবে না।” সেইক্ষণে প্রত্যাগত খাত্তা ও পরিচারিকাকে নির্দেশ করিয়া কহিল, “এই এরা, আমি যখন একলা ছিলুম, আমার দোষ দিচ্ছিল : বলছিল আমি ওদের মত অধিক পরিমাণ ‘ফার্ম’ সংগ্রহ করতে পারি নি, আমি ফার্মের বদলে আগাছা সংগ্রহ করছিলাম।”

বুদ্ধা চমকিয়া উঠিল, ক্রয়গুল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, “চিজিওয়া-সামা, তুমি এখানে? কি আশ্চর্য্য?”

“কিছুকণ আগে নূতন সৈন্যের জন্ত ঠাঁর কাছে তার পাঠিয়েছিলাম”, তাকেও কহিল।

“আপনি ঠাট্টা করছেন” ইকু কহিল। “সত্যি পাঠিয়েছিলেন না কি? আপনি তা হলে কাল ফিরছেন?”

“হ্যাঁ, ফেরবার কথায় মনে পড়ে গেল, খাবারের জোগাড় করবার জন্ত আমাদের আপনাদের আগেই ফিরতে হবে।”

“হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। তাই কর। চিজিওয়া-কুন্ আমাদের সঙ্গে রাতে আহাৰ করবেন, ভালো কিছু তৈরি করে রাখবে। দেখতে পাবে আমাদের নেকড়ে বাঘের মত ক্ষিদে পেয়েছে। কি, তুমিও বাচ্ছ নাকি নামিসান? তুমি আমাদের সঙ্গে থাক। তোমার দলবলের সঙ্গে যাবার চেষ্টা নাকি? চিন্তা নেই। আমরা তোমাকে বিরক্ত করব না।”

নামি ‘না’ বলিতে পারিল না। ইকু ও পরিচারিকা সব জিনিসপত্রগুলি একটা পুঁটলিতে বাধিয়া রওয়ানা হইল।

তিন জনে আবার ‘ফার্ম’ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিল। তখনো বেলা ছিল, তাই তাহারা পাহাড় হইতে অবতরণ করিবার পূর্বে মিছুয়াওয়া পর্যন্ত গেল।

মোনোকিকি পাহাড়ের ধার সন্ধ্যা-স্বর্ধ্য-দীপ্ত

উজ্জল কিরণে বল্মল্ করিতে লাগিল। পথের বামে দক্ষিণে তৃণাচ্ছাদিত ভূমি সেই সোনার কিরণ বৃকে ধরিয়া একখানা আগুনের চাঁদরের মত জ্বলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে সঙ্গীহীন দেবদারু তার দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করিয়াছে। দূরে, বহু দূরে পালাড়গুলি আলোক-বন্ধ্যাভাসিতেছিল; তাহাদের পাদদেশস্থিত গ্রামের বহু উনান হইতে ধূম নির্গত হইতেছিল। গুরুগুলি মহরগাষী চালকের তাড়নে ডাকিতেছে; তাহাদের হাষারবে শব্দহীন সন্ধ্যা মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

কথোপকথন করিতে করিতে তাকেও ও চিজিওয়া আগে আগে চলিয়াছে, নামি তাহাদের পশ্চাতে যাইতেছে। তিন জনে ধীর পদ-বিক্ষেপে চলিয়া নিম্ন ভূমি অতিক্রম করিয়া, স্বর্ধ্যালোকিত উর্দ্ধগামী পথের নিকটবর্তী হইল।

ইহাও তাকেও থামিল।

“বাঃ চ’লে। ছড়িগাছা ফেলে এসেচি। ফেরবার সময় যেখানে খানিক ক্ষণ জিরিয়েছিলাম, সেখানে। একটু দাঁড়াও, নিয়ে আস্চি।”

“আমিও তোমার সঙ্গে যাব,” নামি কহিল।

“না তুমি দাঁড়াও। বেশী দূর নয়, দৌড়ে যাচ্ছি।”

তাকেওর কথায় নামি থাকিতে বাধ্য হইল বলিলেই হয়; ফার্মের গোছা ভূমিতে ফেলিয়া তাকেও দ্রুতপদে নিম্ন ভূমিতে নামিয়া গেল।

তাকেও চলিয়া গেলে নামি চিজিওয়ার নিকট হইতে কয়েক পদ দূরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিম্নভূমির পর পারে পাহাড়ের উপর তাকেওর চেহারা অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। মোড় ফিরিলে তাহাও অবিলম্বে অদৃশ্য হইল।

“নামিযো-সান্!”

নামি মুখ ফিরাইয়া ছিল, এক্রপ পরিচিতভাবে আহুত হইয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

নিকটে আসিয়া চিজিওয়া পুনরায় ডাকিল, “নামিকো-সান্!”

নামি ছ' এক পদ পিছাইয়া গেল; কিন্তু বাধা হইয়া মুখ তুলিয়া সেই গাঢ়-রক্ত চক্ষু দ্বয়ের একদৃষ্টে চাহনি দেখিয়া আবার মুখ ফিরাইল।

“আমি তোমায় অভিনন্দন কর্চি!”

সে ধীরব রহিল; তাহার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল।

“আমি তোমায় অভিনন্দন কর্চি! তুমি নিশ্চয়ই খুব সুখী।” “কিন্তু” ঘৃণার স্বরে সে কহিল, “তুমি জান, এক জন সুখী নয়।”

ভূমির উপর চক্ষু তুল্য করিয়া নামি দাঁড়াইয়া রহিল, ও ছাতার অগ্রভাগ দিয়া বাস গোঁচাইতে লাগিল।

“নামিকো-সান্!”

বিষয়ের অবিচলিত পশ্চাদ্ধাবনে ত্রস্ত কাঠবিড়ালীর মত নামি এই বার শত্রুর সম্মুখীন হইল।

“কি?”

“ব্যারণের পদ আর টাকা—এ মন্দ নয়, কি ব? আমি তোমায় অভিনন্দন কর্চি!”

“কি তুমি বলছ?”

“মুখ হলেও ধনী সম্ভ্রান্তবংশীয়কে বে' করা এবং যে ভালবাসে, সে অর্থহীন হলে তাকে ঘৃণা করা—আজ-কালকার উঁচু ঘরের মেয়ের এই হল নিয়ম—অবশ্য, তুমি বাদ।”

ধীরপ্রকৃতি হইলেও নামি বিষম ক্রুপিত হইয়া উঠিল, চিজিওয়ার পানে সে অতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল।

“কি বলছ তুমি? কাপুরুষ! তাকেওর সাম্নে ঐ কথা বোলো। আমার বাবাকে মানুষের মত জিজ্ঞাসা না করে আমাকে ঐ রকম চিঠি পাঠান! আমি আর এ সহ্য করব না।”

“কি?”

চিজিওয়ার মূর্তি ভীষণ দেখাইতেছিল। দন্তে অথরোষ্ঠ চাপিয়া সে নামির নিকটবর্তী হইবার উপক্রম করিল।

হঠাৎ নিরে অথের হেঁচকনি শুনা গেল, অস্থগৃষ্ঠে এক বৃদ্ধ কৃষকের মস্তক পাহাড়ের উপরে প্রকাশিত

হইল। সাংকালীন নমস্কারার্থে অর্থরোহী টুপি উঠাইয়া তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল; অগ্রে যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া সে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল ও সুবকসুবতী কে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

চিজিওয়া নড়িল না; তাহার মুখের কঠিনভাব কথঞ্চিৎ অপগত হইল বটে, কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত ওষ্ঠাধরে একটা বিদ্রূপের ভাব প্রকট হইয়া উঠিল।

“হঁ, ওখানা রাখতে ইচ্ছা না হয় আমাকে ফেরত পাঠিও।”

“কি ফেরত পাঠাব?”

“যার কপা এখুনি বল্লে। যা তুমি ঘৃণা কর।”

“সেখানা আমার কাছে নেই।”

“কোথায় তবে?”

“আগুনে ফেলে দিয়েচি।”

“নিশ্চয়? কেউ দেখে নিত?”

“নিশ্চয়ই না।”

“ঠিক ত?”

“কথা কোয়ো না আমার সঙ্গে।”

নামির ক্রুপিত দৃষ্টি চিজিওয়ার রক্ত চক্ষুর ভয়ানক অপ্রীতিকর চাহনি দ্বারা প্রতিহত হইল। সে চাহনি তাহার শরীরের মধ্যে একটা গীতাত্ত কম্পন জাগাইয়া তুলিল ও তাহাকে মুখ ফিরাইতে বাধ্য করিল। ঠিক সেই সময়ে নিম্ন ভূমির পর পারে পাহাড়ের মাথায় তাকেও আবিস্কৃত হইল। তাহার মুখ সাক্ষ্য স্বর্য্যের কিরণাহুরঞ্জিত চেরী ফুলের মত রক্তিম দেখাইতেছিল।

নামি একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

“নামিকো-সান্!”

চিজিওয়া পুনঃ পুনঃ নামির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নামির চক্ষু তাহার দৃষ্টি এড়াইল। অবশেষে সে কহিল, “নামিকো-সান্, তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার আগে একটা কথা বলি। ভেবে চিন্তে কাজ কোরো। যেমন করে পারো, এ বিষয় তাকেও-সান্ ও তোমার মাতাপিতার কাছে গোপন

রেখা। যদি না রাখ ত অল্পতাপ কর্তে হবে, নিশ্চয়।”

ভীতিগ্রস্ত একটা চাহনির দ্বারা কথাগুলোর গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়া চিঞ্জিওয়া সরিয়া গেল, ও কয়েকটা বস্ত্র ফুল তুলিবার জন্য নত হইল।

‘দ্রুতপদবিক্ষেপে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাকেও পাহাড়ে উঠিয়া আসিল, কহিল, “আমি কি তোমাদের অনেককণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি? দম বেরিয়ে গেছে; সমস্ত রাস্তাটা ছুটেছি। ছড়িটা ঠিক পেয়েছি। কি, নামি-সান কি হয়েছে? তোমাকে ভালো দেখাচ্ছে না ত।”

সেইমাত্র যে ভায়োলেট-গুলো তুলিয়াছিল, সে গুলো গুলু বাঁধিয়া বৃকে আটকাইয়া চিঞ্জিওয়া কহিল, “তোমার ফিরতে এত দেরী হয়েছে যে, তুমি পথ ভুলে গেছ মনে করে উনি চিন্তিত হয়ে উঠেছেন।” এই কথা বলিয়া সে হাস্ত করিল।

উত্তরে তাকেও হাসিল। “তাই নাকি? এইবার এস, বাড়ী যাওয়া যাক।”

ভূমির উপর দিয়া পাশাপাশি তিনটি ছায়া ইকাও অতিমুখে চলিল।

শ্রীহেমলিনী রায়।

তাপ *

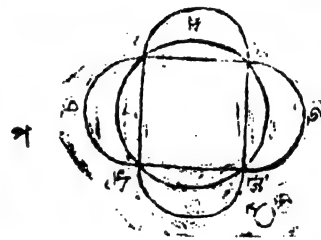
২

তাপ শক্তিরই একটা রূপ; কিন্তু রূপটা কি রকম তাহা এখন ঠিক বুঝতে হইবে তাপের প্রকৃত রূপ লইয়া পণ্ডিত সমাজে আজিও বিতণ্ডা চলিতেছে। হোমরা-চোমরাদের মত কতকটা এই রকমের।

শক্তির প্রধান মূর্তি দুইটি, প্রথম শক্তি ও গতি শক্তি। তাপ এই গতি-শক্তিরই একটা বিশিষ্ট আকৃতি। গতি নানা রকমের হইতে পারে। কামানের গোলার গতির মত

* মাঘ মাসের প্রতিভাস্থ এই প্রবন্ধের প্রথমংশ প্রকাশিত হইয়াছে।

সরল রেখায় হইতে পারে, লাটিমের গতির মত ঘূর্ণন গতি হইতে পারে, পেণ্ডুলামের আন্দোলনের জায় আন্দোলন বা কম্পন-গতি হইতে পারে। গতিশীল পদার্থ মাত্রই শক্তিসম্পন্ন, সে গতি সরল গতিই হউক ঘূর্ণন-গতিই হউক, কিংবা কম্পন-গতিই হউক। এই কম্পন গতিই তাপের মূর্তি। কেবল কম্পন বলিলে চলিবে না, কম্পনের মধ্যে আবার একটা বিশিষ্ট রকমের কম্পনই তাপের প্রকৃত মূর্তি। জড় পদার্থের অণুসমূহ স্থিতিস্থাপক। আবার পাইলে ইহাদের আকৃতি বদলাইয়া যায়, চেপ্টা হইয়া যায়; পুনরায় ইহারা পূর্ণাকৃতি ধারণ করে বটে, কিন্তু একবারেই পারে না। ষানিককণ ধরিয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে আকৃতি দ্রুত আন্দোলিত হইতে থাকে।



ম চিত্র।

ক খ গ ঘ একটা জড়ের অই, একটা স্থিতিস্থাপক গোলাকার পদার্থ (ম চিত্র,)। বা দিক হইতে আর একটা পদার্থ ‘প’, আর একটা অণুই হউক

বা বাহরের কোনও পদার্থই হোক, উহাকে একটা শাক দিল। তাহার ফলে ইহা ডান দিকে ছুটিয়া চলিবে। কিন্তু কেবল তাহাই নহে; এই স্থিতিস্থাপক গোলাকটার আকৃতিও পুনঃ পুনঃ বদলাইতে থাকিবে। শাকার ফলে গোলাকটা চেপ্টা হইয়া চ ছ আকার ধারণ করিবে। স্থিতিস্থাপকত্বগুণবশতঃই উহা পুনরায় চেপ্টা হইয়া জ ঝ আকার ধারণ করিবে। এইরূপে গোলাকের আকৃতি চ ছ হইতে জ ঝ, ও জ ঝ হইতে চ ছ তে অতি দ্রুত পরিবর্তিত হইতে থাকিবে। এই আন্দোলন-গতিই তাপের প্রকৃত মূর্তি। এই আন্দোলন-গতিবিশিষ্ট গোলাক স্পর্শ করিলে বা উহার নিকটে হাত রাখিলে হাতে বেদনা বোধ হইবে, গরমের অস্বভূতি হইবে। শাক দিবার পূর্বে শক্তি ছিল ‘প’তে। উহা তখন ছিল

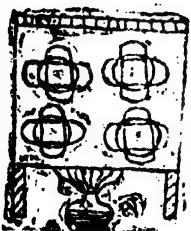
দৃশ্য জড়ের দৃশ্য আকৃতিতে ; ধাক্কার পরে শক্তি আসিল ক' খ' গ' গোলাকে । উহা তখন ধারণ করিল অদৃশ্য অণুর অদৃশ্য আন্দোলনের আকার । দৃশ্য গতিশক্তি অদৃশ্য তাপশক্তিতে পরিণত হইল । অণুটার গোলাকৃতি ব্যাস যতখানি, চ' ছ' বা ক' য' আকৃতিতে এক দিককার ব্যাস তাহা অপেক্ষা বড় । এই ব্যাসের পার্শ্বকোর নাম আন্দোলনের দৈর্ঘ্য । আন্দোলনের দৈর্ঘ্য যতই বাড়িয়া যাবে অণুগুলি ততই গরম বোধ হইবে ।



যদি 'ক' অণুর আন্দোলন 'খ' অণুর আন্দোলন অপেক্ষা দীর্ঘ হয় তবে 'ক' কে 'খ' অপেক্ষা

২য় চিত্র ।

উষ্ণতর বোধ হইবে (২য় চিত্র) । 'ক' 'খ' কাছাকাছি থাকিলে আন্দোলনশক্তি একটা হইতে অণুটায় যাইবে । কিন্তু 'ক' দিবে বেশী, পাইবে কম, 'খ' পাইবে বেশী দিবে কম । মোটের উপর 'ক' এর হিসাবে খরচের ঘরে অঙ্ক বসিবে, 'খ' এর হিসাবে অঙ্ক বসিবে জমার ঘরে ; অর্থাৎ তাপ মোটের উপর গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে যাইবে । ফলে 'ক' ঠাণ্ডা হইতে থাকিবে, উহার আন্দোলন কমিতে থাকিবে, 'খ' গরম হইতে থাকিবে, উহার আন্দোলন বাড়িতে থাকিবে । শেষে উভয়ের আন্দোলন-গতি সমান হইবে—দুইটা সমান গরম বা সমান ঠাণ্ডা হইবে । তখন 'ক' যত দিবে ততই নিবে, এবং 'খ' যত নিবে তত দিবে । আদানপ্রদান চলিবে বটে কিন্তু উভয় হিসাবেই মোটের উপর জমার ঘরে শূন্য, ও খরচের ঘরে শূন্য বসিবে ।

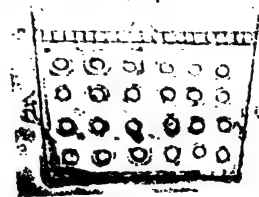


৩য় চিত্র ।

একটা পাত্রে যদি খানিকটা বায়ু আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, আর যদি ঐ পাত্রের নীচে একটা ল্যাম্প রাখা যায় তাহা হইলে ল্যাম্প হইতে খানিকটা তাপ পাত্রের ভিতর দিয়া বায়ুতে

প্রবেশ করিবে (৩য় চিত্র) । বায়ুর অণুগুলির আন্দোলন ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অধিক হইতে অধিকতর বেগে ছুটছুটি করিতে থাকিবে । ল্যাম্প হইতে যে শক্তি পাত্রের ভিতর ঢুকিল, তাহা দুই ভাগ হইয়া গেল । খানিকটা শক্তি অণুর আন্দোলনের আকারে ধারণ করিল, আর খানিকটা ধারণ করিল ছুটছুটির আকারে । এই আন্দোলনের আকারই তাপের আকার । এই আন্দোলনের বৃদ্ধিতেই বায়ু ক্রমে গরম হইয়া উঠি-
তেছে, আর এই ছুটছুটি করিয়া অণুগুলি আধার-পাত্রের গায়ে যে ধাক্কা দিতেছে, এই ধাক্কা হইল এই বায়ুর তাপ ।

আন্দোলন বাড়িবার সঙ্গে ছুটিবার বেগও বাড়িয়া যায় । ফলে, গরম হইলে বায়ুর চাপ বাড়িয়া যায় । যে অণুপাতে গরম হইতে থাকে সেই অণুপাতে উহার চাপও বাড়িতে থাকে । এই নিয়ম 'গে লুসাক' পরীক্ষা দ্বারা প্রথম সাব্যস্ত করেন । চার্লস সাহেব নিয়মটা বিধিবদ্ধ করেন । নিয়মটা চার্লস সাহেবের নিয়ম বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে । যদি পাত্রের ঢাকনিটা উপরে উঠিতে পারে এইরূপ বন্দোবস্ত করা যায়, তবে ধাক্কার ফলে উহা উপরে উঠিতে থাকিবে, অর্থাৎ গরম হইলে আয়তন বাড়িয়া যাইবে । এখন কিন্তু চাপ আর পূর্বের স্থায় বাড়িতে পারিবে না, কেন না, পাত্রের গায়ে এক বর্গ ইঞ্চি জায়গায় পূর্বে যতগুলি অণু ধাক্কা দিতেছিল, আয়তন বাড়িবার ফলে এখন তাহা অপেক্ষা অল্পসংখ্যক অণু ধাক্কা দিতে পারিবে ।



৪র্থ চিত্র ।

উপরে যে চাপ পড়িতেছে তাহার বিরুদ্ধে খানিকটা কার্য

মুখঢাকা পাত্রে খানিকটা বায়ু থাকিলে উহা পাত্রের প্রান্ত অংশে চাপ প্রয়োগ করিবে (৪র্থ চিত্র) । ঢাকনিটা যদি ঠেলিয়া নামান যায়, তবে ঢাকনির

বৈশাখ ১৩১১

করিতে হয়—ধানিকটা শক্তি ব্যয় করিতে হয়। এখানে শক্তি যোগাইবার জন্য ল্যাম্প নাই, কিন্তু ঢাকনি যে ঠেলিয়া নামাইতেছে সে শক্তি যোগাইতেছে। ফল একই হইবে। বায়ুটা গরম হইতে থাকিবে ও তাহার চাপও বাড়িতে থাকিবে। বায়ুকে সঙ্কুচিত করিলে উহা গরম হইয়া উঠিবে ও উহার চাপ বাড়িয়া যাইবে।

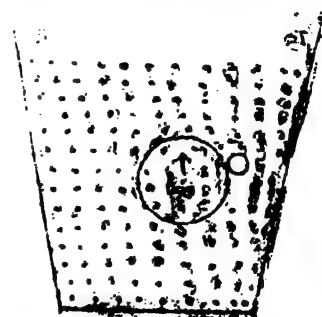
যে শক্তি ব্যয় করা যায় উহা পায় হইতে বাহির করিয়া লইলে বায়ু আর গরম হইতে পারিবে না; কিন্তু সঙ্কুচিত অবস্থায় উহার চাপ পূর্বাপেক্ষা বেশী হইবে। আয়তন যে অনুপাতে কমবে, চাপ সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে। যদি ঢাকনিটা ক' স্থানে হইতে পাত্রটার মধ্যখানে অর্থাৎ গ' স্থানে আনিয়া দাড়ায়, তাহা হইলে আয়তন অর্ধেক হইয়া যাইবে। কিন্তু পাত্রের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এখন দ্বিগুণ সংখ্যক অণুরাশি চাপ দিবে, অর্থাৎ বায়ুর চাপ দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। শক্তি কমিতে না দেওয়ার অণুগুলির আন্দোলনগতি বাড়িতে পারিল না, গরম হইতে পারিল না। উহাদের চুটিবার বেগ বাড়িতে পারিল না, কিন্তু অল্প আয়তনের মধ্যে চুকিবার ফলে পাত্রের গায়ে উহাদের সমবেত ধাক্কার পরিমাণ বাড়িয়া গেল। অর্থাৎ বায়ুকে যদি সঙ্কুচিত করা যায়, কিন্তু গরম হইতে না দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহার চাপ বাড়িয়া যায়। যে অনুপাতে আয়তন কমে সেই অনুপাতে চাপ বাড়িবে। ইহাকে বয়েল সাহেবের নিয়ম বোলে। এই নিয়ম আবিষ্কার করিয়া ইংলণ্ডের রবার্ট বয়েল খ্যাতনামা হইয়াছেন।

বায়ুর আয়তন কমাইতে গেলেই উহার চাপ বাড়িয়া যায়, কিন্তু ব্যয়িত শক্তিটা ভিতরে আবদ্ধ থাকিলে যতখানি বাড়িবে, বাহির করিয়া লইলে ওতখানি বাড়িতে পারিবে না; অর্থাৎ তাপ আটকাইয়া রাখিয়া বায়ুকে গরম হইতে দিলে উহা যতখানি স্থিতিস্থাপক হইবে, তাপ বাহিরে যাইতে দিয়া বায়ুটাকে গরম না হইতে দিলে উহা তদপেক্ষা কম স্থিতিস্থাপক হইবে।

ঢাকনিটা 'ক' স্থানে ধরিয়া রাখিয়া পাত্রের নীচে একটা ল্যাম্প জ্বালাইলে বায়ুতে তাপ প্রবেশ করিবে,

উহা গরম হইতে থাকিবে। যখন এক ডিগ্রি পরিমাণে গরম হইল তখন ঢাকনিটা ছাড়িয়া দিলে, বায়ুর চাপে উহাকে উপরে ঠেলিয়া তুলিবে, উহা চ' স্থানে যাইবে। ভারী ঢাকনিটা ঠেলিয়া তুলিতে বায়ুকে ধানিকটা কাজ করিতে হইবে। উহার অনেকটা শক্তি ব্যয়িত হইয়া যাইবে। ফলে, উহা একটু ঠাণ্ডা হইয়া পড়িবে। ধানিকটা কার্য্য পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু ধানিকটা তাপের লোপ হইবে। অতএব বায়ুটা আর এক ডিগ্রি পরিমাণ গরম থাকিবে না। আরও ধানিকটা তাপ ল্যাম্প হইতে আসিলে তবে উহা এক ডিগ্রি পরিমাণ গরম হইবে। আয়তন বাড়িতে না দিয়া এক ডিগ্রি পরিমাণ গরম করিতে হইলে বায়ুতে যতখানি তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে, আয়তন বাড়িতে দিয়া উহা দ্বারা কাজ করাইয়া লইলে ঐ এক ডিগ্রি পরিমাণ গরম করিতে উহাতে তা' চেয়ে বেশী তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে। যতখানি শক্তি মোটের উপর লাভ হইবে, তাপও ঠিক সেই পরিমাণে বেশী খরচ করিতে হইবে।

কেবল বায়বীয় পদার্থের নহে তরল পদার্থের অণুগুলিও আন্দোলিত হইতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, পার্থক্য এই যে, বায়বীয় পদার্থের অণুসমূহের পরস্পর আকর্ষণ অতি সামান্য, এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। তরল পদার্থের অণুসমূহের অল্পবিস্তর আকর্ষণ আছে। এই আণবিক আকর্ষণের বিষয় এই যে, যদি অণু খুব কাছাকাছি থাকে তবেই তাহাদের আকর্ষণ দুইটা কিঞ্চিৎ প্রবল থাকে, একটু দূরে দূরে সরাইলেই আকর্ষণ এক প্রকার শূন্য হয়।



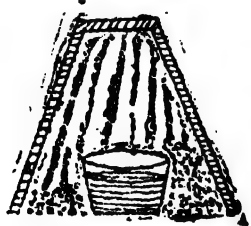
৫ম চিত্র

একটা - পাত্রের ভিতর জল আছে। জলের অণুগুলি ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।

'ক' একটা অণু। ছুটিয়া উপরে

যাইতেছে। “ক”কে কেন্দ্র করিয়া একটা অতি ক্ষুদ্র গোলক আঁকা গেল (চ)। ইহার ব্যাস এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগেরও কম। এই গোলকের ভিতর যতগুলি অণু আছে তাহারাই কেবল ‘ক’কে নিজের নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ‘চ’ গোলকের বাহিরের কোটি কোটি অণুর ‘ক’ এর উপর কোনও ক্রিয়া নাই। ‘ক’ এর উপর আকর্ষণ মোটের উপর শূন্য। কারণ চারিদিক হইতে সমান টান পড়ায় ‘ক’ কোনও টানেরই বশীভূত নহে। ‘ক’ অক্লেশে উপরে ছুটিয়া চলিতেছে। ‘ক’ তথ্য রেখা পর্য্যন্ত উঠিল, অর্থাৎ জলের পৃষ্ঠে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন উপর হইতে ‘ক’ এর উপর টান দিবার মত অণু নাই, কিন্তু নীচ দিকে টান দিবার মত অণু আছে। মোটের উপর ‘ক’ এর উপর টান পড়িল নীচ দিকে। একটু আগে হইতেই নীচ দিকে টান পড়িতেছিল, ক্রমে উহার বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। ‘ক’ এর বেগ খুব বেশী হইলে উহা মন্দীভূত হইয়াও জনভাগের পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া উপরে উঠিবে। সবগুলি অণুর বেগ সমান নয়, কোনটার বেশী, কোনটার কম। ধীরগতি অণুগুলি পলাইতে পারিবে না, জলের পৃষ্ঠে আসিতেই আটকা পড়িয়া যাইবে বেগবান অণুগুলি জল ছাড়িয়া পলাইবে। ইহার নাম জলের বাষ্পে পরিণতি।

পাত্রটা গভীর ও মুখটা সরু হইলে এই পরিণতি আশ্রিত হইবে, অগভীর ও ছড়ান হইলে পরিণতি দ্রুততর হইবে।



৬ষ্ঠ চিত্র।

জলের পাত্রটা আর একটা পাত্রে ঢাকা দিলে (৬ষ্ঠ চিত্র) বাষ্পের অণুগুলি ঢাকিবার পাত্রের

বেগবান অণুগুলি পলাইবার ফলে জলটা ঠাণ্ডা হইয়া পড়িবে। জল বাষ্পে পরিণত হইবার কালে জল ঠাণ্ডা হয়।

মধ্যে মধ্যে আটকা পড়িবে, পলাইতে পারিবে না। এই বন্ধাবস্থার উপরে বাষ্পের অণু নীচে জলের অণু ছুটছুটি করিতে থাকিবে। কতগুলি জলের অণু বাষ্পের ভিতর প্রবেশ করিলে, আবার কতগুলি বাষ্পের অণু জলের পৃষ্ঠে আসিয়া নীচের অণুগুলির আকর্ষণে জলের ভিতর ঢুকিবে। যতই বাষ্পের অণু বাড়িয়া যাইবে, ততই উহার আদিমসংখ্যক অণু জলের ভিতর ঢুকিতে থাকিবে। শেষে উঠা নামার সংখ্যা সমান হইয়া যাইবে। তখন হইতে জলের পরিমাণ ঠিক রহিয়া যাইবে। বাষ্পের পরিমাণ ঠিক রহিয়া যাইবে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাষ্পের চাপ বাড়িতেছিল, এখন হইতে আর বাড়িবে না। বাষ্পের এই চাপটিকে পরিমাণের গরম জলের পক্ষে বৃহত্তম চাপ। ইহার নাম দওয়া উটক ‘চ’। উপরের ঢাকনিটা যদি বড় হইতে থাকে তবে বাষ্পের আয়তনও বাড়িয়া যাইবে, আরও বাষ্প উঠিবে। ফলে চাপের পরিমাণ দাঁড়াইবে ‘চ’। ঢাকনিটা যদি ছোট হইতে থাকে, তবে বাষ্পের আয়তন কমিয়া যাইবে; কিন্তু উহার চাপ বাড়িতে পারিবে না। আয়তন যতখানি কমিবে, ততখানি স্থানে যে পরিমাণ বাষ্প ছিড়, তাহা জলে পরিণত হইয়া যাইবে; চাপ থাকিয়া যাইবে ‘চ’।

জলের নীচে ল্যাম্প রাখিয়া জলটা যদি গরম করা যায়, তাহা হইলে জলের অণুর বেগ বাড়িয়া যাইবে, বাষ্পাভবন দ্রুততর হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পের চাপও বাড়িয়া যাইবে। জল এক ডিগ্রি গরম অবস্থায় বাষ্পের বৃহত্তম চাপের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকিবে ‘চ’। দুই ডিগ্রি গরম অবস্থায় বাষ্পের বৃহত্তম চাপের আর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকিবে, ‘হ’—‘চ’ হইতে বেশী। শেষে জলটা এত গরম হইবে যে, উহার বাষ্পের চাপ বাহরের বায়ুর চাপের সমান হইবে। যতটা গরম হইলে চাপটা এত বড় হয়—তাহার পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১০০ ডিগ্রী। এই অবস্থার ঢাকনিটা ফুলিয়া লইলে বাষ্পটা অতি দ্রুত পলাইয়া যাইবে, অতি দ্রুত পুনরায় বাষ্প উৎপন্ন হইবে। জলটার উপর আর অন্য পাত্র ঢাকা না দিলে অতি

ক্রম পলায়ন ও অতি ক্রম পশ্চাদ্ধরন সমানে চলিতে থাকিবে। ইহার নাম ফুটন। ফুটন কালে জল গরম হইবে ১০০ ডিগ্রী পরিমাণ। তাহার পর আর গরম হইবে না। অণুগুলির আন্দোলন গতি ১০০ ডিগ্রী অণুমায়ী গতি বেশী হইবার আগেই উহার বায়ুর বাধা অতিক্রম করিয়া জল ছাড়িয়া পলাইবে। ল্যাম্প হইতে যে তাপ আসিতেছিল ফুটনের পূর্বে তাহার কতকটা জল গরম করিতে ব্যয়িত হইয়াছিল, আর কতকটা বায়ু হইতোছিল অণুগুলিকে তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণের বিরুদ্ধে ঠেলিয়া নিতে। অর্থাৎ এই তাপকে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এই ভাগটা তাপমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া প্রচ্ছন্ন শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। এই প্রচ্ছন্ন শক্তির অপর নাম বাষ্পীভবনের প্রচ্ছন্ন তাপ। এই প্রচ্ছন্ন শক্তি তাপ নহে। ফুটন আরম্ভ হইবার পরে ল্যাম্প হইতে যে তাপ জলে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার সবটাই প্রচ্ছন্ন শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। এই প্রচ্ছন্ন শক্তির অপর নাম ফুটনের প্রচ্ছন্ন তাপ।

কঠিন পদার্থের অণুসমূহেও স্পন্দন চলিতেছে। তাই তাহার গরমের অনুভূতি জন্মাইতে পারে। কিন্তু বায়বীয় বা তরল পদার্থের অণুসমূহের জায় উহার অতি ক্রম ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে না। জলে দাগ বসে না কিন্তু কাচের গায়ে আঁচর দিলে তাহা অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া যায়। এ পাড়ার অণু গুলি এ পাড়ায় ও পাড়ার অণুগুলি ও পাড়ায়ই রহিয়া যায়। কিন্তু চালচলন যে এক স্থানেই সীমাবদ্ধ, সকল কঠিন পদার্থের পক্ষে বোধ হয় এক কথা খাটে না। কপূর কঠিন, আইওডিন কঠিন, কিন্তু ইহার বাষ্পাকারে উঠিয়া যায়।

একটা পদার্থের একপ্রান্তে তাপ প্রয়োগ করিলে ঐ প্রান্তের অণুগুলি আন্দোলিত হইতে থাকিবে। ঐ প্রান্ত গরম হইয়া উঠিবে। এই আন্দোলন-গতি অণু হইতে অণুতে প্রবেশ

করিয়া ক্রমে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছড়াইয়া যাইবে। এই ক্রিয়ার নাম তাপ পরিচালন। অণু-সমূহ কি প্রকৃতির, তাহার কল্পণে বিন্যস্ত ইহার উপর এই পরিচালন-ক্রিয়া নির্ভর করিবে। যে অংশটা অপেক্ষাকৃত গরম উহা অপেক্ষাকৃত হাল্কা হইবে। পদার্থটাতরল কি বায়বীয় পদার্থ হইলে, যে স্থানে তাপ প্রয়োগ করা যায় সেই স্থানের অণুগুলি উপরে উঠিয়া যাইবে। উঠিবার কালে তাহার আসেপাশে আন্দোলন গতি ছড়াইতে ছড়াইতে যাইবে। এই প্রক্রিয়াকে তাপের পরিবাহন বলে। গরম তরল অংশ উঠিয়া যায় ঠাণ্ডা ভারী অংশ নামিয়া আসে। যেটা গরম ছিল সেটা ঠাণ্ডা হয়, যেটা ঠাণ্ডা ছিল সেটা গরম হয়। পরিচালন ক্রিয়ার তাপ অণু হইতে অণুতে ছড়াইয়া পড়ে, পরিবাহনক্রিয়া ছড়াইবার পক্ষে সহায়তা করে। তরল ও বায়বীয় পদার্থে প্রাণতঃ এই পরিবাহন দ্বারাই তাপের আদানপ্রদান হইতে থাকে। ইহারই ফলে Gulf Stream, Tornado, Trade winds, Land-breeze ও Sea-breeze.

কিন্তু পদার্থ কঠিন হউক, তরল হউক বা বায়বীয় হউক, আন্দোলনগতি এই জড়পদার্থেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কেন না পদার্থমাত্রই ঈধরে ঘেরা। প্রকাণ্ড ঈধর-সাগরের এক একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ অধিকার করিয়া এক একটি জড় তাহার অণুগুলি লইয়া ঘর করিতেছে। ঈধর-সাগরের ক্ষুদ্র এক প্রদেশে যে আন্দোলন উৎপন্ন করা যায় তরঙ্গের আকারে তাহা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। যে বেগে ছড়াইয়া পড়ে তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে—বেগ সেকণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। পরিচালন ও পারবাহন ক্রিয়া এ বেগের নিকট ঠাই পায় না। এই প্রক্রিয়ায় তাপ প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে অতি ক্রম ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই প্রক্রিয়ার নাম বিকীর্ণণ। গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে, এক নক্ষত্র জগৎ হইতে অন্য নক্ষত্র জগতে তাপ ছড়াইয়া পড়িতেছে। মানুষ দেখিল না, বুঝিল না, নিবারণের চেষ্টা করিল না।



জড় প্রভৃতি অটুহাসে বলিতেছে, “হাঃ হাঃ দিন
আসিতেছে।”

শ্রীমুরজনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

মুছে ফেল

মুছে ফেল হৃদয়ের শোণিতের দাগ,
ভুলে যাও শোক যাহা আছে.
অতীতের স্মৃতি টুকু থাক্ পিছে পড়ে.
তারে আর ডাকিও না কাছে ।

বিদায়ের শেষ বাণী প্রকাশিয়া ধীরে
অতীত বরষ অই যার,
তারি সনে যাক্ চলি বিষাদ বেদনা.
মুছে যাক্ স্বপ্ন-ঘোর-ছায় !

পাপ-তাপ-শোক-দুঃখ সকলেরে আশি
পূর্ণ প্রাণে দেও গো বিদায়,
ধর্মের পবিত্র আলো থাক্ হৃদি ভরি,
উঠুক মঙ্গল-গীতি তায় ।

যাক্ দূরে ধনী-দীনে যে প্রভেদ আছে.
সাম্য ভাব উঠুক জাগিয়া,
হৃদয়ের তন্ত্রী মাঝে স্মমহান্ স্বরে
নব তান উঠুক বাজিয়া ।

নব গানে নব তানে পুরিখা অস্তর
কর্ম-ভূমে হও অগমর.
হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা করি পরিহার
বিশ্বপ্রেমে মাতাও অন্তর ।

এ জগতে যাহা কিছু মহান্, উদার.
তাহারাই লও সাথী করে ;
যাহা কিছু পবিত্রতা মাখানো হেথায়.
লও তারে তুলি নিজ ক্রোড়ে ।

ভাবিও না অতীতের সহস্র আঘাত,
যাহে হৃদি হয়েছিল ক্ষত ;
মুছে ফেল সেই স্মৃতি, ভুলে যাও ধীরে
কি বিষাদে হিয়া অমনত ।

এ জীবন নহে শুধু বিষাদ লাগিয়া,
এ জীবনে কত কাজ আছে,
বিষাদ ত কার্য্য-পথ রহে আগুলিয়া,
চাই তারে ফেলা চাই পাছে ।

কর্মের গভীর মধ্যে আকাশ-অবনী
উজ্জ্বলিত হতেছে যখন,
তারি মাঝে আপনারে ডুবায় রাখিতে
করা চাই সহস্র যতন ।

তাই বলি. মুছে ফেল হৃদয় হইতে
পাপ-তাপ অন্ধকার রাশি,
সহস্র সঙ্গীত-রব মহতী সাধনা
উঠিবেক হৃদয়ে প্রকাশি ।

তখন সে নব বর্ষে হৃদয় মাঝারে
উঠিবে সে সঙ্গীতের রব ;
তাহাতে প্রাণিয়া যাবে এ বিশ্ব সংসার.
হেথায় নুতন হবে সব ।

নয়নের, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা রাশি
নিমিষেতে যাইবে টুটিয়া.—
কি আপন কিবা পর এক হয়ে যাবে
সম ভাব উঠিবে জাগিয়া ।

সৈয়দ এমদাদ আলী ।

কাছাড়ী জাতি *

কাছাড় আসাম প্রদেশের একটা জেলা। পার্শ্বত্যা
প্রদেশের সন্নিহিত স্থানকে
অবস্থান।

ত্রিপুরার অনেকাংশে ‘কাছাড়’
বলে। বোধ হয়, কাছাড় জেলা পার্শ্বত্যা আসাম প্রদেশের
প্রান্তে অবস্থিত বলিয়া লোকে পার্শ্বতের সন্নিহিত
স্থানকেও ‘কাছাড়’ নাম দিয়া থাকে। অতি প্রাচীন
কালে ভারতের উত্তরপূর্ব প্রান্তে বসতি স্থাপন কবে
এমন কয়েকটা পার্শ্বত্যা জাতির নাম কাছাড়ী।

কাছাড়ী জাতির উৎপত্তি-বিসরণের কোনও বিশ্বাস্ত
ঐতিহাস অস্ত্যাপি আবিষ্কৃত হয়
উৎপত্তি। নাট। সুতরাং এই বিষয়ে
আমাদিগকে অনেকটা অসুস্থান ও সিদ্ধান্তের আশ্রা
লইতে হয়। এই জাতিব সহিত মঙ্গ্রাসী বংশব
বনিষ্ট সম্পর্ক আছে। অতএব এই হিসাবে তিব্বৎ
ও চীন এই জাতির আদিম বাসভূমি বলা যাইতে পারে।
পারো জাতিকেও নেপালীর জায় কাছাড়ী বলা
যায়, এবং পারো জাতির উৎপত্তি-বিষয়ে একটা
সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত আছে।

ঐতিহাসিক যুগের বহু শতাব্দী পূর্বে জৈনক
হিন্দু সন্ন্যাসীর নয়টি পুত্র ও একটি তিস্তী ব্রহ্মণী
হিমালয় হইতে কোচবিহারে আসে। সেখানে কিছু
দিন থাকিয়া স্রোঙ্গী স্রোঙ্গী উপস্থিত হয় তৎপরে
ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়া ডাল্লিগোয়া হইয়া পারো
পার্শ্বতে প্রবেশ করে। ইহারাই পারোজাতির পূর্ব-
পুরুষ। এই সকল জনশ্রুতি বিচার করিয়া দেখা যায়
যে, পার্শ্বত্যা জাতির উৎপত্তির ইতিহাস অনেকটা প্রবাদ-
মূলক ; এবং এই সকল প্রবাদের কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি
বা মূল আছে কি না তাহা পাঠকগণেরই বিচার্য্য।

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত “কাছাড়
কাছাড়ী” প্রবন্ধের এক অংশ।

ইতিহাস আলোচনা করিলে এই বোধ হয় যে,
তুইটি প্রবল জাতি উত্তর ও উত্তরপূর্ব হইতে ভারতে
প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উর্ব্বর উপকূল ভাগে বসতি
নিষ্ঠার করে। ইহাদের মধ্যে এক জাতি তিস্তা, ধরলা,
সঙ্গ্রা পদ্ম নদীর উপকূল বাহিয়া উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ও
পশ্চিম অসামে প্রবেশ কবে, এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন
কামরূপ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। অপর জাতি
সুন্দরসিবি, ডিবং ও ডিহং প্রভৃতি নদীর উপকূল
বাহিয়া পূর্ব অসামে প্রবেশ কবে। এই প্রদেশই
বহু শতাব্দী ধরিয়া চুটিয়া নামক একটা কাছাড়ী উপ-
জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। পূর্বভারতের অনেক
স্থলে এই চুটিয়া জাতিব নিষ্ঠান হইয়াছে। বর্তমান
সদিমান অনতিদূরে চুটিয়া জাতিব রাজধানী ছিল।
সেখানে প্রাচীন ক’র্ত্তির বহু ধ্বংসাবশেষ ও একটি প্রাচীন
মন্দির বা মন্দির অস্ত্যাপি দৃষ্ট হয়। এই যুগের ছাত্ত
তাম্রনির্মিত স্বর্ণাং ইহাকে “তাম্র গৃহ” বলা হইয়া
থাকে। ধ্বংসাবশেষগুলিও তত্ত্বাধেবী ঐতিহাসিক ও
প্রত্নতাত্ত্বিকগণের আদর্শের সমগ্রী। এই সকল বিষয়
বিচার করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে
পারি যে, যে জাতি আমাদের নিকট কাছাড়ী বলিয়া
পরিচিত প্রাচীন কালে সেই জাতিই অসামে প্রবল
প্রভাপন্নিত ছিল। ইহাদের কথিত ভাষাব চিহ্ন
অস্ত্যাপি অসামেব অনেক নৈসর্গিক পদার্থের নামকরণে
বিদ্যমান রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রধান প্রধান
নদীর নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল
নামের প্রথমংশটি জলবাচক কাছাড়ী শব্দ—বধা,
ডি-ক্র, ডি-হং, ডি-বং প্রভৃতি। ‘ডি’ বা ‘ডৈ’ কাছাড়ী
শব্দ জল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমস্তই সদিমান
নিকটবর্তী, এবং সদিমান প্রাচীন কালে চুটিয়া বা কাছাড়ীর
প্রভাব ও সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া পূর্বেই উল্লিখিত
হইয়াছে। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক
যে, কাছাড়ীর অপর নাম কাছাড়ী এবং তাহার এই নামে
পরিচিত হইতেই ভালবাসে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে কাছাড়ী বা চুটিয়া জাতি
ভারতের পূর্বাংশে বেশ বিস্তার
বিস্তৃতি।

পূর্বেও বড়া জাতির বহুল বিস্তার হয় নাই বলিয়া
অনেকের ধারণা ছিল। এখন কিন্তু এই ভ্রম দূর
হইয়াছে। উত্তরপূর্ব বঙ্গে, কোচবিহারে এবং পার্শ্বত্যা
ত্রিপুরায়ও অনেক বড়া জাতীয় লোক দেখিতে
পাওয়া যায়। এই সকল স্থান আসামের বাহিরে ইহা
সকলেই জানেন। একমাত্র আসামেই ইহাদের সংখ্যা
দশ লক্ষের অধিক বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তা ছাড়া
সম্প্রতি বহু কাছাড়ী হিন্দু সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া
হিন্দুর আচার ও ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে, এবং এমন
কি আপন মাতৃভাষা পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে। এই বড়া
জাতিকে কাছাড়ী তত্ত্ববিদেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত
করিয়াছেন। তদনুসারে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাশ্চাত্য
কাছাড়ীদিগকে “উত্তর কাছাড়ী” ও দক্ষিণপাশ্চাত্য
কাছাড়ীদিগকে “দক্ষিণ কাছাড়ী” বলা হয়। সুতরাং
বড়া (কাছাড়ী), রাভা, মেচ, টিমল, কোচ, সোলা-
নিমিয়া প্রভৃতি শাখা উত্তর কাছাড়ীর অন্তর্ভুক্ত, এবং
ডিমাসা, হোজাই, লালুঙ, গারো, হৈজং, পার্শ্বত্যা
ত্রিপুরা জাতি প্রভৃতি দক্ষিণ কাছাড়ীর অন্তর্গত। উত্তর
কাছাড়ী বড়া জাতি দরং, দুয়ার ও উত্তর কামরূপে,
রাভা ও মেচেরা গোয়ালপাড়ায়, টিমলেরা উত্তরপূর্ব
বঙ্গে, কোচেরা জলপাইগুড়ি ও উত্তরপশ্চিম দারাজের
মধ্যবর্তী প্রদেশে ও সোলানিমিয়ারা মঙ্গলদই মহকুমায়
বাস করিতেছে। দক্ষিণ কাছাড়ী ডিমাসাগণ উত্তর
কাছাড় পর্বতে, হোজাইগণ উত্তর কাছাড় পর্বতে ও
নওগাঙ্গে, লালুঙেরা দক্ষিণপশ্চিম নওগাঙ্গে ও তন্নিকট-
বর্তী প্রদেশে, গারোরা গারো পর্বতের অধিকাংশ
এবং উপত্যকাতায়, হৈজংদেরা গারো পর্বতের দক্ষিণ
পার্শ্ব সমতল প্রদেশে, এবং পার্শ্বত্যা ত্রিপুরা জাতি
পার্শ্বত্যা ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছে।
এই সকল জাতি ব্যতীত আসাম উপত্যকাবাসী মোরান

এবং চুটিয়াগণও কাছাড়ী বংশের শাখা। কিন্তু এই
দুই জাতি ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে।

বর্তমান সময়ে হিন্দু মুসলমান ও কাছাড়ী আসামের
ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে একত্র বাস
দেহ ও গঠন বিশেষত্ব করে। কিন্তু শারীরিক গঠনে

এবং পারিবারিক ও নৈতিক ব্যাপারে কাছাড়ী তাহাদের
হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃবর্গ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কাছাড়ী
গৌরবাস্তি বা দীর্ঘাকার নহে, বরং অনেকটা উত্তর
ভারতীয় তাহাদের নেপালী জাতিবর্গের স্থায়
খর্বাকার ও বলিষ্ঠ। কিন্তু তাহারা এই উভয় জাতিকে
জানেন তাহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন কাছাড়ী
নেপালী অপেক্ষা সমধিক শ্রমপরায়ণ এবং কষ্ট ও নীতাতপ-
সহিষ্ণু। শারীরিক গঠন লইয়া বিচার করিলে কাছা-
ড়ীকে নেপালীয় জাতীয় না বলিয়া উপায় নাই। ইহাদের
মুখ চেপ্টা, নাসিকা অস্বাভাবিক ও স্থল, চক্ষু দুটি বাদামের
মত, গণ্ডদেশের অস্থি উন্নত, মুখে শব্দ বিসর্জন, বা একে-
বারেই নাই এবং বর্ণটা অনেকটা তামার মত। কারখানা
বা মাঠের যে সকল কাজে শুধু শারীরিক সামর্থ্য ব্যতীত
অন্য কোনও কৌশল বা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, কাছাড়ী
ব্যতীত অন্য কোনও জাতিই সেই সকল কাজ করিতে
এতটা পারিয়া উঠে না।

কাছাড়ীরা হিন্দুর তুলনায় জড়-মস্তিষ্ক; তাহাদের
স্মৃতি বা কোনও বিষয় লক্ষ্য-
মানসিক শক্তি।

কর্ম করিবার শক্তি আদর্শেই
তীক্ষ্ণ নয়। ইহারা বুদ্ধিচালনায় একেবারে অক্ষম,
এবং ইহাদের উদ্ভাবনী শক্তিরও একান্ত অভাব পরি-
লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও বিষয় অধিগত
হইলে ইহা তাহাদের মজাগত হইয়া যায়।
আবার দুটি গুণ কাছাড়ীর প্রায় প্রকৃতিগত বলিয়াই
বোধ হয়। প্রথমতঃ কাছাড়ীরা মনে করে ব্যক্তি এবং
ইহারা যে সমাজ বা সম্প্রদায়ভুক্ত এই দুই অভিন্ন ও
এক। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার গ্রাম্য সমিতির সহিত
অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। ব্যক্তি বিশেষের অর্থদণ্ড

হইলে অনেক সময় সমস্ত গ্রাম তাহাকে অর্বসাহায্য করিয়া থাকে। কারখানার কাছে কোনও কাছাড়ী যদি তাহার সহকর্মিগণের মনে এমন একটা ধারণা জন্মাইতে পারে যে, ইহার প্রতি কর্তৃপক্ষ একটা অস্ত্র করিয়াছেন তাহা হইলে কারখানার সমস্ত কাছাড়ী কুসি মাদাধিকের বেতন পর্যন্ত ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। অভিযোগের সত্য বিখ্যা সম্বন্ধেও কোনও বিচার করে না।

দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সকল অটল। এই গুণকে কেহ কেহ একগুয়েমি বলিয়া নিন্দা আবার কেহ কেহ মানসিক দৃঢ়তা বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। এই জাতি একবার কোনও কার্য করিতে কৃতশঙ্ক হইলে যুক্তি বা তর্কবারা তাহাদিগকে সেই শঙ্ক হইতে বিচলিত করা অসম্ভব। তবে বল প্রয়োগের ব্যবস্থা হইলে কিঞ্চিৎ কল-লাভ হইয়া থাকে।

মোটের উপর কাছাড়ীর নৈতিক চরিত্র নিম্নলিখিত নহে। হিমালয়ের প্রান্তদেশে-
চরিত্র।

বাসী অত্যন্ত পার্শ্বত্যা জাতির জ্ঞান এই জাতিরও পান-প্রিয়তা দেখা যায়। এটাকে আনন্দ মনে করিলে জাতীয় দোষ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। বদ বা 'জু' কাছাড়ীর জাতীয় পানীয়দ্রব্য। 'জু'র প্রস্তুতপ্রণালী বড় অদ্ভুত। নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁলের সহিত কাঠাল পাতা এবং 'ভেটাই' নামক এক প্রকার আগাছার পাতা বিশাইয়া স্নানরূপে গুঁড়া করা হয়। এই গুঁড়া এক চিকণ চালুনের সাহায্যে চালিয়া বেচুর্প পাওয়া যায় সেই চূর্ণের সহিত জল মিশ্রিত করিলে এক প্রকার পিঠালীর মত পদার্থ প্রস্তুত হয়। এই পদার্থে বধ্যভাগ পুরু এবং ধারের দিকে ক্রমে পাতলা এরূপ চক্রাকার পিঠক প্রস্তুত হয়। ইহাদিগকে 'বাথর' বা 'এমো' বলে। তিন কি চার সের গুটনা তাতে সহিত গুটি দুই বাথর মিশ্রিত করিয়া গুড় কলসী পূর্ণ করা হয়, এবং এই কলসী চার পাঁচ দিন মধ্য আঙনের আলোর তিন চার হাত উপরে বসাইয়া রাখিতে হয় তৎপরে মাদাইয়া এবং জল মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে

মাড়িয়া বড়নির্মিত অতি অকর্মণ্য এক প্রকার ছাফুর সাহায্যে ছাকিয়া লইলেই 'জু' প্রস্তুত হইল।

শ্রাদ্ধে, বিহতে ও নবান্ন (নুতন ভাত খাওয়া) পর্বাদিতে এই যন্ত্রের অপরিমিত ব্যবহার হইয়া থাকে, এবং কাছাড়ী গ্রামের দ্বী পুরুষ "জু" সেবন করিয়া জ্ঞান, বুদ্ধি, লজ্জা, সন্ন্য প্রভৃতি জলাঞ্জলি দেয়। 'ফটিক' নামক এক প্রকার মত্তও কাছাড়ীরা ব্যবহার করে। 'জু' চুয়াইয়া ফটিক পাওয়া যায়। ইহা অনেকটা অপরিষ্কৃত অবস্থায় হইন্ধির মত একটা তীব্র স্পিরিট। কিন্তু পান-দোষ কাছাড়ীর চরিত্রগত নহে, এবং এই হিসাবে প্রতীচ্য দেশীয় শ্রমজীবী অপেক্ষা কাছাড়ী হীন নহে। পরন্তু ইহারা সরল, সত্যবাদী, অকপট ও বিশ্বাসযোগ্য। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে ক্ষেত্রে স্বীয় দোষ স্বয়ং স্বীকার না করিলে অবোধে অব্যাহতি পাইতে পারে সেই ক্ষেত্রে সরলমতাব কাছাড়ী যেচ্ছার স্ব-কৃত হত্যাপরোধ নিজ মুখে স্বীকার করিয়া দণ্ডিত হয়।

বিবাহের পূর্বে কাছাড়ী যুবতীর চরিত্র কলঙ্কিত হয় না, এবং বিবাহের পরেও বিবাহ-বন্ধনের পবিত্রতা অব্যাহত থাকে। যে সকল কাছাড়ী আজিও সত্যতার আলোকের পথবর্তী হয় নাই, এবং আদিম অবস্থায় সাদাসিধা ভাবে গ্রামে বাস করিতেছে এই প্রশংসার অনেকটা তাহাদেরই প্রাপ্য। এইরূপ পবিত্রতা তাহাদের বহুদর্শিতার অভাবজনিত অজ্ঞতার ফল বলিতে হইবে, কারণ অনেক কাছাড়ী এখনও সত্যতার গম্বীতে আসিয়া প্রলোভনের প্রভাবের অধীন হয় নাই। সত্যের অমুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই জাতি মতই সত্যতার সংস্পর্শে আসিতেছে ততই চ্যুতির পথে স্থগিত হইয়া চরিত্রগত পবিত্রতা ও সারল্যা দি হারাইতেছে। ইহা পরিভ্রাণের বিষয় কি না বিচার্য।

শ্রীগুরুব্রহ্ম তট্টাচার্য্য।

বাণী-পদ্মঃ (১০)

সাহিত্য-আত্মার অভিব্যক্তি

ভারতীয় সমাজে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

এক উঠিয়াছে, সাহিত্যের বিচার করিতে হইয়া।
তন্মধ্যে সমাজ-গতি-নির্ণয়ের আবশ্যক কি? সাহিত্য
মহুশ-মনের সৃষ্টি; উহাকে অজ-নিরপেক্ষভাবে, কেবল
মহুশ-মনের স্বতন্ত্র ক্রিয়াকল রূপে দৃষ্টি করিলেই ত চুকিয়া

যায়! এই প্রশ্নের উত্তরে,
সমাজের সহিত প্রাচীন
সাহিত্যের অপরিহার্য
সম্বন্ধ।

সৃষ্টি—সমাজবদ্ধ মহুশ-মনের
সৃষ্টি; সুতরাং মহুশ-সমাজের বা সমাজবিশেষের
সমস্ত দোষগুণের লক্ষণ উহার মধ্যে সংক্রামিত না হইয়া
পারে না; এই কারণে সমাজ-সঙ্গত বিচার প্রণালীই
সাহিত্য-বিচারের আধুনিক প্রণালী। পরন্তু জাতি-
বিশেষের সাহিত্য, জাতি-বিশেষের ধর্ম এবং সমাজের
ধাবতীয় দোষ ও গুণে সুগপৎ প্রসারিত এবং সীমাবদ্ধ
না হইয়া পারে না। জাতীয় জীবনের (তাহার সমাজ-
সত্যতা এবং ধর্মের) পরমদর্পণরূপী এই সাহিত্য!
তাহার ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের নিয়ামক! কোন
প্রাচীন সাহিত্যই তাহার সমাজ-সত্যতার ভূমিকা
সবিশেষ অতিক্রম করিয়া ক্ষুণ্ণ লাভ করিতে পারে নাই।
সমস্তই ন্যূনাধিক দেশকালের, বিশেষতঃ ধর্মের আদর্শ-
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। এই কালে উহাদের বিচার
করিতে হইলে, কিম্বা উহাদের রস ভোগ করিতে হইলে
প্রত্যেকটাকে বিশেষভাবে নিজ নিজ অবস্থার সঙ্গতি-
সামঞ্জস্যে আনয়ন পূর্বক বিচার না করিলেই অবিচার
হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে মানব-সত্যতা, মানবত্ব
বা মানব-ধর্ম বলিয়া একটা পরিব্যাপক, আদর্শ-সংজ্ঞা
কোন দেশেই সন্নিবেশিত হইয়া লভ্য লাভ করে নাই। “বিশ্ব-

সাহিত্য” বলিয়া একটা সংজ্ঞাদর্শও সাহিত্যিকগণের
মনকে পরিচালিত করিতে পারে নাই। তৎপূর্বে
“বিশ্ব”-আদর্শ-সঙ্গত কোন সাহিত্য গ্রন্থের রচিত হয় নাই
তাহা নহে, কিন্তু ন্যূনাধিক অতর্কিতভাবে। প্রকৃত
কবিমাত্রেরই জগতের মূলপ্রকৃতিস্থ হইয়াই রচনা করেন;
এই কারণে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসারিত ‘বিশ্ব’-
আদর্শের ‘কাঁক’ সকল সাহিত্যেই কিছু-না-কিছু আশ্রিত
গিয়াছে। বাস্তবিক বা ব্যাপ, হোমর বা স্কোপাস, এই
কালে এত দূরান্তরিত হইয়াও আমাদের হৃদয়ের এত
নিকটবর্তী হইয়া আছেন।/ তথাপি, তাঁহাদের গ্রন্থে
দেশকালের বিশেষ লক্ষণগুলিই বিশেষভাবে মুদ্রিত;
এবং ওই বিশেষ গুণগুলিকে তত্তৎভাবে গ্রহণ করিতে না
জানিলেই তাঁহাদের প্রতি আবিচার হইতে থাকিবে।
সুতরাং এই পরিবেশ-সঙ্গত বিচার-প্রণালীই আধুনিক
সমালোচনার একটা বিশেষ প্রণালী, এবং উহা সকল
দিকে ঐতিহাসিক প্রণালীর অন্তর্গত। প্রাচীন সাহিত্যের,
বিশেষতঃ জাতীয় সাহিত্য-মাত্রের উহাই প্রধান দাবী।
ওহ দাবী চুকাইতে না পারিলে আলোচনামাত্রেরই
বিড়ম্বনা বহু নহে। আগে জাতীয় সাহিত্য, এবং তাহার
পরেই বিশ্ব সাহিত্যের আদর্শ; উভয়েই ঐতিহাসিক
বিচারপ্রণালীর সঙ্গে অপরিহার্যভাবে সম্বন্ধ।* এই
প্রাচীন সাহিত্য-আদর্শ কিরূপে ধীরে ধীরে বিকশিত
হইয়া বর্তমান সাহিত্য-সংজ্ঞার সৃষ্টি করিতেছে—মহুশের
মনঃ-সমক্ষে সন্নিবেশিত হইয়া দাঁড়াইতেছে;
তাহাই সাহিত্য-আত্মার অভিব্যক্তি শীর্ষক এই বৃহৎ অধ্যায়
মধ্যে আমাদের বিচারা। এই অধ্যায়ের উপসংহার
করিতে পারিলেই আমরা বিশ্ব-সাহিত্য-সংজ্ঞার নির্দেশ

* ভারতীয় সমাজের ইতিহাস-বুদ্ধি (Historical Sense) চিত্রকাল
হরল। অর্থাৎ এই ইতিহাস (এবং সমাজ-শাস্ত্র) মহুশ-সত্যতার
প্রধান শাস্ত্র। এই দুইটি মহুশমাত্রের প্রধান ধর্মশাস্ত্র বলিয়া
পারম্পরিক-বৈজ্ঞানিক উচিত, বলিলে কথটা অত্যুক্তি হইবে না। আমরা
দেখিব ভারতীয় সমাজের প্রকৃতি মধ্যে এই ধোঁব অপরিহার্য ছিল।

—লেখক।

বৈশাখ ১৩১১

করিতে চেষ্টা করিব ; এবং উহার পরেই বিভিন্ন কলা-সাহিত্যের আদর্শ এবং কল চিন্তা করিতে পারিব ।†

আমরা প্রাচীন আৰ্য্য-জন্মের স্বভাবজাত মহাকাব্য-ধর চিন্তা করিয়া আসিয়াছি । উত্তরের মধ্যেই প্রাচীন আৰ্য্য সভ্যতার যাবতীর সুহু সবল বলিষ্ঠ ভাবের অকৃত্রিম ছবি মুদ্রিত হইয়াছে । উহার দোষ গুণ বা সংকীর্ণতার সীমাটাও আভাসিত করিয়াছি ।

প্রাচীন আৰ্য্য-মাহাত্ম্য এখন দেখিবেন সবল এবং হইতে ক্রমাগত চলন ।

প্রকৃতিহু আৰ্য্য জাতি যাত্রেয়ই এই লক্ষণ । যাহারা স্বল্প-পরিমিত হইয়াও পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, পৃথিবী-মধ্যে উন্নত সভ্যতা-সমাচার প্রচারিত করিয়াছিলেন, এবং এখনও যেই জাতি পৃথিবী মধ্যে প্রধান হইয়া আছেন, ওই দুই গ্রন্থে সেই মহা-জাতিরই জন্ম মুদ্রিত হইয়াছে । কিন্তু, এই অবস্থা চিরদিন থাকিতে পারে নাই । ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, পরিবর্তিত দেশ এবং পরিবর্তনশীল কালের হস্তে পড়িয়া বিজিত অনাৰ্য্য বা জাতিজ্ঞ জাতির সংশ্রবে নিপীড়িত হইয়া, এই জাতি আৰ্য্য-রক্তের মাহাত্ম্য সকল দিকে রক্ষা করিতে পারে নাই ।

আৰ্য্য-রক্তের প্রবল অভিমান এবং অনন্ত অনাৰ্য্য-বিষেব সবেও নানা দিকে আপনার জালে পড়িয়া আপনাই লক্ষ্যকরিত হইয়া এবং ব্রিয়মাণ হইয়া আসিয়াছে । উহার পর হইতেই, তাহার সমাজ-সভ্যতার যাহা ইতিহাস, তাহা ওই আদিম বলিষ্ঠতা হইতে ক্রম-শ্ল-নের ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে । উহার পরেই

ভারতীয় আৰ্য্য-সভ্যতার ‘কলিযুগের’ আরম্ভ ইহা স্বীকার করিতে হয় । জগতের অপর আৰ্য্য-শাখা-সমূহ, বহু পরবর্তী কালে নিজের মূগ্ধ মাহাত্ম্যে জাগরিত হইয়া থাকিলেও, তাহারা এখন যাবৎ বিশ্ব-সভ্যতা-মধ্যে ওই মাহাত্ম্যকে নানা দিকে নব নব ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া এবং উন্নতি প্রদর্শন করিয়াই চলিতেছে । কিন্তু মধ্য এশিয়ার আৰ্য্য-সমূহ নিজের অল্পমম মাহাত্ম্য হইতে শ্লথিত হইয়া, এখন যাবৎ ব্যাপকভাবে নিম্নতাই রহিয়াছেন ; ইহাদের পুনর্জাগরণের অধ্যায় এখনও আরম্ভ হইয়াছে কি না, বিধাতাই জানেন ।

আমরা অতঃপর, ভারতীয় জাতির এই ক্রম-গতি অনুসরণ করিব । বেদের নাম শ্রুতি । আৰ্য্য জাতি কে এই শ্রুতির অনেক অংশ সন্দেহ নইয়াই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তাহা পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিতেছেন ।

ভারতীয় আৰ্য্য জাতি পরম জ্যোতিষী ছিলেন ; কেবল জ্যোতিষী নহে, তাহারা মনুষ্য

প্রাচীন সমাজে জাতির শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ । এই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যে মাহাত্ম্যের কি করিয়া অব-ও অপরিহার্য্যতা । কাশ হইল, তাহা চিন্তা

করিলেই, ভারতীয় আৰ্য্য-

সমাজ-গতির একটা বিশেষ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইবে । উহাও প্রাচীন গোত্র কুল এবং সম্প্রদায় প্রধারই কল । এই জাতির মধ্যে একমাত্র বিস্তা ছিল—উহা, ওই কুল-ক্রমাগত শ্রুতি বা অপৌরুষেয়-স্বত্বের বেদ । কালক্রমে এই বেদের ভাষা এবং অর্থই অপ্রচলিত হইয়া এবং দুর্বোধ্য হইয়া পড়িতেছিল ; এবং উহার সত্য-রক্ষাকল্পে আৰ্য্য-মন সহজেই চেষ্টিত হইতেছিল । উহার গতিকেই বেদানের উৎপত্তি—“শিক্ষাকল্পে ব্যাকরণং নিকৃৎসং হ্রস্বোজ্যোতিষ-” মিতি । এই বড়দের প্রত্যেকটাই শ্রুতিবিচার রক্ষা-কল্পে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে । উহার দরপাই একান্ত তাবে বেদ-শ্রমী, বেদ-পাঠব্যবসায়ী এবং বহুদলীল ‘ব্রাহ্মণের’, বৈয়াকরণ এবং জ্যোতিষীর অপরিহার্য্যতা সিদ্ধ হয় ; সুতরাং পৌরোহিত্যের মাহাত্ম্যও সর্ব-সম্মতি

† আমরা বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবীগণ নিজ নিজ কার্য্যাবিকারে প্রতিনিরন্ত ওভই ভুল করিতেছি যে, উহা চিন্তা করিলে হতাশ হইতে হয় । সাহিত্যের দেশকাল-সঙ্গত পূর্ণাপর অবস্থা এবং উহার কলাবিভাগের বিভিন্ন বরূপ, অবিকৃত আপনাদের নক্তি এবং কর্তব্যের অধিকার বিষয়ে “গোড়ার ভুল” বলিয়াই আমরা প্রতিপদে বিভ্রান্ত ভোগ করিতেছি । আরজাশাস্ত্রের কিকিঞ্চ মাহাত্ম্য করিতে আশা করিয়াই, সুহুবার সাহিত্যের দর্শন মধ্যে এই বীরল অধ্যায়টির সম্বন্ধারণা, এবং এই আলোচনার হৃদয়কেন্দ্র ।

লাভ করে ; অধ্যাপন, অধ্যয়ন, শ্রম, বাজন, এবং দান-প্রতিগ্রহণীল ত্রাঙ্গণের সাহায্যে আৰ্য্য-সম্প্রদায় মধ্যে হির প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে থাকে। প্রাচীন গৌত্র, কুল এবং সম্প্রদায় প্রধার মধ্য স্থলে পূর্বপুরুষের বিজ্ঞা এবং পৌরোহিত্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা অতি সহজে অন্তর্গত হইয়া যায় ; সুতরাং আৰ্য্যমাত্রেই (ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) ত্রাঙ্গণ থাকিলেও, কথিতরূপে বিশেষ কার্যের দরুণ বিশেষ জীবন (‘ভট্ট’ পণ্ডিত এবং বিপ্রের জীবন) অপরিহার্য্য হইয়া যায়। এই অবস্থা হইতেই যেমন এক দিকে ত্রাঙ্গণ-শাখার উৎপত্তি হইতে থাকে, তেমন অত্র দিকে (ন্যূনাধিক বেদাচার-বিরোধ) উপনিষৎ এবং আরণ্যক সমূহের রচনাও আরম্ভ হয়।

এই সমস্ত কথা ন্যূনাধিক ইতিহাসগত, এবং প্রত্যক্ষ-ভাবে আমাদের বিচার্য্য নহে। ত্রাঙ্গণ্য হইতে কিন্তু এই বিপ্র এবং পৌরোহিত্যের উৎপত্তি। হিত্যের বিশেষ জীবন এবং অধিকার হইতেই, পরকালে ভারতীয় সমাজে আর একটা মহাবিস্তারিত অথচ সাম্প্রদায়িক সাহিত্য-চেষ্টা উদ্ভূত হইয়াছিল। এই সমাজের বিদগ্ধগণের মস্তিষ্ক বহু ৩০ বৎসর ধরিয়া এই চেষ্টার নিরত থাকিয়া বিপুল ক্ষতি লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন গৃহস্থত্রাদির আদর্শে বর্তমানের উনবিংশতি ‘ধর্ম’-সংহিতাও এই সূত্রেই গ্রথিত হইয়াছিল ; এবং একটা বহু-পরিকর মতবাদ এবং সীমাবদ্ধ ‘ধর্ম’-কার্যের আদর্শে পর্কতাকার গ্রহ সমূহ বিরচিত এবং সমস্ত প্রাচীনতর গ্রন্থাবলীও নানা দিকে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এই বিস্তারিত সাহিত্য-চেষ্টার নাম ‘পুরাণ’। এই সংজ্ঞার মধ্যে সমস্ত প্রাচীন এবং আধুনিক পুরাণ, এবং আগম, নিগম, তন্ত্রাদিকেও ভুক্ত করিতেছি।

যুগাধিভাবের বহু পূর্ব হইতে, পরবর্তী সার্ব্ব সাহস ৩০ বৎসর গইয়াই পুরাণ-রচনা চলিয়াছিল। পুরাণ-সমূহের আভ্যন্তরীণ সাহিত্য-শাস্ত্রা-বিষয়ে ইতিপূর্বে আভাস

দিয়াছি ; সুতরাং এই ক্ষেত্রে উহাদের সামাজিক লক্ষণটাই চিত্তা করিয়া অগ্রসর হইব। হিন্দু সমাজ-গঠনে পুরাণগুলিও পরবর্তী ভারতীয় পুরাণের কার্য্য। আৰ্য্য-সমাজের মজ্জা-অনিত হুটি। পরিবার এবং গ্রাম সমূহের

আদিম অকৃত্রিমতা এবং বলিষ্ঠতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া পৌরোহিত্য এবং বিশেষ বিশেষ সাম্প্রদায়িকতাকে মূল-উদ্দীপনা রূপে সমুখে রাখিয়াই পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্নতার প্রধান কারণই কেবল ভারতীয় আৰ্য্য-সমূহের আদি এবং শেষ সাম্প্রদায়িকতা * । বেদের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং শাখাসমূহের সূত্র-সঙ্গতি-বশেই এই শৈব, শাক্ত, এবং বৈষ্ণবতন্ত্রীয় পুরাণাদির উদ্ভব। ভারতীয় আৰ্য্য-মন যত আঘাত পাইয়াছে, তাহার প্রাচীন ঋতি-বিজ্ঞার বিরুদ্ধবাদিগণ হইতে, অথবা বিধর্মী ‘অনার্য্য’-গণ হইতে যত বিরোধ বা প্রতিবেদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সর্বত্র প্রতিঘাতস্বরূপে সমাজের এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষাকল্পে বিপুল সাহিত্য-চেষ্টা করিয়া তত স্থিতিবান হইবার চেষ্টা করিয়াছে : সাহিত্য বা সারস্বত যন্ত্রটাকেই মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়াছে। সর্বস্বতী-মাতার নীরক্ত প্রণালীই ভারতীয় ত্রাঙ্গণমস্তিষ্ককে চিরকাল অস্থস্থত ! পরিবার এবং গৌত্র প্রধানে অথচ রাখিয়া, অত্র দিকে গ্রাম-সমাজের সর্গীয়তাকে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া এবং সকলের উপর ‘ত্রাঙ্গণের’ সাহায্য-মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া, এই পুরাণগুলিই ভারতীয় নরসমাজে ‘ত্রাঙ্গণ্য-ধর্ম’-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে। উহাদের সাহায্যেই ‘ত্রাঙ্গণ্য ধর্ম’ কুত্রাপি ‘প্রচারক-ধর্ম’ না হইয়াও ফলে আত্ম-প্রচার এবং আত্ম-বিস্তার করিয়াছিল ; প্রকৃত সম্মিলনের কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া ফলতঃ অনন্ত ভেদবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার ঘটনা করিয়াও, পৌরাণিক আদর্শ এইরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পরস্পরাশ্রয়ী ক্রিয়া-বোগ এবং স্বার্থের সাম্য আনয়ন করিয়াছিল ;

* বেদাবিভিন্দাঃ সূত্ৰো বিভিন্দাঃ

নাসৌ মুনির্ধর্ম মতং ন তিদ্দৎ । মহাতারত ।

বৈশাখ ১৩১১

সুতরাং পুরাণসমূহ নানা দিকে ব্রাহ্মণ-মনের এক অপকল্প প্রচারাদর্শই খ্যাপিত করিতেছে। উহাদের সাহায্যেই প্রাচীন পুরোহিতগণ, বেদাচারের সহিত কোন মতে সঙ্গতি এবং সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, বিপুল ভারতবর্ষের বিভিন্ন নর-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনন্ত জাতিভেদ বলবান রাখিয়াও, সমস্তকেই নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং পুরাণের মধ্যে সাহিত্য-লক্ষণ বা সাহিত্য চেষ্টা মুখ্য নহে। ভারতবর্ষীয় আদিম অধিবাসীগণের পূজা-পদ্ধতিকে নিজের ছায়ার আনয়ন পূর্বক বিস্তারিত ভাবে আৰ্য্য আদর্শের দ্বারা অধিকার : ব্রাহ্মণ্যের রক্ষা এবং পরিপোষণ এবং ও-উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ্যের মাহাত্ম্য-প্রচার; বেদের বহু দেবীয় যজ্ঞকাণ্ডকে বহু-পূজা এবং

নিত্য-নৈমিত্তিক ব্রত-নিয়ম ও পূজা পার্বণের মধ্যে বিস্তারিত করিয়া সমগ্র ভারত জাতিটাকে ব্রাহ্মণ্যের প্রভাবে আনয়ন পূর্বক 'হিন্দু সমাজের' সৃষ্টি; আৰ্য্য এবং অনার্য্য আদর্শের অশেষ ভেদ-বাদের মধ্যে একটা স্বার্থ-সাম্যের প্রচলন; এই সমস্তই পুরাণ-চেষ্টার প্রধান লক্ষ্য ছিল। সুতরাং ওই লক্ষ্য যে কেবল ব্রাহ্মণ্যের স্বার্থেই নিয়ন্ত্রিত তাহা নহে; সমগ্র আৰ্য্য জাতির, হিন্দু-আদর্শের, এবং হিন্দু সমাজের স্বার্থ উহার মধ্যে বিজড়িত ছিল। এই সাম্প্রদায়িক সাহিত্য-চেষ্টার সাহায্যেই ভারত-ভূমে হিন্দু-আদর্শ বিস্তৃত হইয়া তাহার হিন্দু-স্থান নাম সার্থক করে; আৰ্য্য এবং অনার্য্য উভয়েই হিন্দু-সমাজে শিরোগার্য্য করিয়া, এবং আপনাকে অনন্ত পার্থক্য-বিশিষ্ট জাতি-নামে বিভক্ত করিয়া, ওই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। সমস্ত সামাজিকতার অন্তর্কর্তা বিশেষ লক্ষণটাই কেবল উহার অশেষ সাম্প্রদায়িকতা। উহার লক্ষণ যেমন চাতুর্য্য আদর্শ নির্মল ভাবে ক্ষুণ্ণ লাভ করিতে পারে নাই, তেমনি, ইংলও কিংবা ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিম জাতীয় কায়, বিভিন্ন সম্প্রদায় বা জাতি মধ্যে

নির্জিবেশ সন্মিলন ঘটনা করিয়া রাষ্ট্র বা 'নেশনে'র আদর্শ বিকাশিত করিতে পারে নাই।

এই সমাজ-ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতার গতিকেই পৌরাণিক ভারতের সমাজে বা পুরাণে ব্যক্তির অভাব।

পুণ্যে ব্যক্তির সাহিত্যে, কোথাও ব্যক্তির বিশেষত্ব স্পষ্ট হইতে পারে নাই। পুরাণেও নানা দিকে কেবল পরিবার এবং গ্রাম-সমাজের স্বার্থ-আদর্শই পরিফুট; সর্বোপরি উহার ব্রাহ্মণ্য। সময় সময় হরত পরিবারের উপরেও ব্যক্তির আদর্শ বলবান হইয়াছে—যেমন ধ্রুবপ্রজ্ঞাদির দৃষ্টান্তে। কিন্তু উহার সংখ্যা সামান্য; এবং এই সমস্ত ব্যক্তি-ক্রমও কেবল বিশেষ বিশেষ সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠা করিয়াই পরিকল্পিত। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের চরিত্রাদর্শও নানা দিকে ব্রাহ্মণ্যের স্বার্থেই নিয়ন্ত্রিত, হরিশ্চন্দ্রের উপা-ধ্যান, দাতা কর্ণের উপাধ্যান প্রভৃতি এইরূপে কেবল দান-ধর্মের (ব্রাহ্মণ্যের উদ্দেশ্যে দানের) আদর্শই বহন করিতেছে। একটা অতি স্বচ্ছ পর্দার অভ্যন্তরে বিপ্রতর্নীয় পূজা-পদ্ধতি এবং পূজা-প্রচারের জন্ত ব্যাকুলতাই সরল ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। গ্রাম-সমাজ অথবা পরিবার অথবা ব্রাহ্মণ্যের স্বার্থলক্ষণহীন নিখুঁত অনুশাসনের আদর্শ পুরাণাদিতে কদাচিত্ মিলিবে। প্রাচীন রামায়ণ এবং মহাভারত গ্রন্থও যে পৌরাণিক রূপে ওইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আদর্শে স্থানে স্থানে সংশোধিত হইয়াছিল, রামযুগিষ্ঠিরাদির বিপ্রপ্রিয়তা এবং 'ধার্মিকতার' লক্ষণাদি তাহাই খ্যাপিত করিতেছে। সুতরাং পুরাণে ব্যক্তি-চিত্র মাত্রই নূনাধিক অলৌকিক লাভ করিয়াছিল। ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রকে উপাধ্যান-বিষয়-রূপে গ্রহণ করা হইলেও উহাকে একটা বিশেষ ভাবের 'সাজের' মধ্যে ফেলিয়া কেবল অনুকল্প বিশেষ লক্ষণগুলিই পরিফুট করা হইত। প্রাকৃত 'মানব-চরিত্র' বা 'মানবতা'র আদর্শ পুরাণের ছিলনা। বিশেষ ভাব হইতেই পৌরাণিক ব্যক্তি-চরিত্রের সৃষ্টি; সুতরাং সাহিত্যের হিসাবে তাহুকতাই পুরাণের প্রধান লক্ষণ। আদর্শ দেখি, এই 'ভাবুকতাই'

পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যের, প্রাচ্য সাহিত্যের, যুরোপের মধ্যযুগীয় সাহিত্যমাত্রের প্রধান ধর্ম। পৌরাণিকতা হইতেই উহার মূলপাত। পৌরাণিক ভাবুকতা যেমন হিন্দু সমাজকে, তেমন হিন্দু সাহিত্যকেও চিরকালের জন্য বণিত করিয়া গিয়াছে। এত কাল পরেও, উহা বরং অত্যন্ত-ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। ভারতীয় সমাজ বা সাহিত্য শত চেষ্টা সত্ত্বেও উহাকে কাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছে না।

এইরূপে পুরাণাদিতে সাম্প্রদায়িক লক্ষণাদি যেই পরিমাণে মুখ্যতা লাভ করিয়াছে, সেই পরিমাণেই উহা নির্মল সাহিত্যাদর্শ হইতে অত্যাচারী হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই পৌরাণিক আদর্শ ভারতবর্ষে যেমন সংস্কৃত ভাষাটাকে দেশের প্রাকৃত জীবন হইতে দূরে আনয়ন করিয়া পরিপোষণ এবং প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল সেইরূপ, প্রাদেশিক ভাষাগুলিতেও ইংরাজের প্রভাব কাল পর্যন্তই প্রবল ছিল। * এখনও যে উহার প্রভাব সম্পূর্ণ অক্ষত হইয়াছে, তাহা নহে। সুতরাং বর্তমান কালের সাহিত্য-রসিক পাঠক পুরাণ-গুলিকে এই সাম্প্রদায়িকতার ছায়া হইতে নিষ্কাশিত করিয়া পরিদর্শন করিতে না জানিলেই, উহার। নানা অনর্থের উপস্থাপন পূর্বক নিতান্ত ক্লেশকর হইয়াই আত্ম-পরিচয় করিতে থাকিবে। বিশেষ ভাবের সহায়ত্ব এবং অধিকার লাভ না করিয়া পুরাণারণ্যে প্রবেশ করাই বিড়ম্বনা বই নহে।

এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা এবং ভাবুকতার পটিকেই পৌরাণিক ভারতের সাহিত্যে বা শিল্পে যেমন ব্যক্তি-চরিত্র কল্পাপি পরিষ্কৃত নহে, তেমন অঙ্গদিকে উহাদের

মধ্যে ব্যক্তি-কর্তৃ বা ব্যক্তি-দায়িত্বও পরিষ্কৃত নহে।
আমরা দেখিব, এই সমস্ত ব্যক্তি-
লক্ষণের উপরেই আধুনিক সভ্যতা
এবং সাহিত্যের বিশেষত্ব নির্ভর
করিতেছে। পৌরাণিক সমাজে
ব্যক্তির কোথাও আধিপত্য নাই।

তাহার ধর্ম যেমন খ্রীঃ কিংবা মহম্মদের জ্ঞান কোন বিশেষ উপদেষ্টা বা প্রবর্তকের নামে প্রচলিত নহে; তাহার সাহিত্যও তেমনি অকর্তৃ বা সমূহ-কর্তৃষেই প্রচারিত হইয়াছে;—পুরাণ-কর্তা ব্যাস বাম্বীকি প্রভৃতি সমূহাধিক (generic) নাম মাত্র। লেখকগণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থে গ্রন্থ রচনা করিয়া, নিজের নাম-মুদ্রা এবং “সারস্বত” যশোলাভের লোভটাকে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিয়া, ব্যাসাদির নাম-কর্তৃষেই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।† আপাত-দর্শনে এই নিম্নোক্ত ভাব প্রথম গৌরবাবহ বলিয়াই প্রতীত হইতে থাকে; কিন্তু উহাদের মধ্যে রচয়িতার কোনরূপ সাহিত্য-স্বার্থ নাই, সাম্প্রদায়িকতাই প্রধান।

কেবল সাহিত্য কেন, এই যুগের শিল্পাদিও যেন কেমন অকর্তৃষের অথবা সমূহ-স্বার্থের আদর্শই বিজ্ঞাপিত করিতেছে। যেই শিল্পী ভুবনেশ্বর পৌরাণিক শিল্পাদিতেও অথবা কণারকের মন্দির নির্মাণ ব্যক্তির বা কর্তৃষের করিয়াছিল, কিংবা অম্বতা উহা খোদিত করিয়াছিল, যেই হিন্দু ভারত-সমুদ্রের বীপ বন্ধে ব্রহ্মদেশে

বা শ্রামদেশে হিন্দু-সভ্যতার বিজয়পতাকা পরিচালিত করিয়াছে, যব-বীপের মন্দির-গায়ে যেই ভারতবাসী অমুগম স্থাপত্য-মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহাদের নাম কিংবা মহোদ্য অরণ রাধা আবৃত্তক মনে

† বঙ্গভাষার মধ্যেও চণ্ডীকাব্য প্রভৃতির ‘ব্রহ্মাদেশ’ বা দেবতার আদেশ প্রভৃতি এইরূপ পৌরাণিক আদর্শের পরিচয় দিতেছে। অনেক আধুনিক লেখক ওই আদর্শ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

* বাঙ্গালার ত্রীধর্মমঙ্গল, মনসা কাব্য, চণ্ডী কাব্য, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি পৌরাণিক আদর্শেই বিরচিত। মবীনচন্দ্রের প্রভাস, বক্রিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী ও শীতারাম প্রভৃতি নামা দিকে এই পৌরাণিক আদর্শের ভাবুকতা-প্রভাবই বহন করিতেছে।

করে নাই। অস্তিত্বঃ স্বাভাবিক হস্তে লেখনীর ব্যবসায় ছিল, তাঁহারা উহার দরকার অনুভব করেন নাই। এই সকল শক্তিশ্বর ব্যক্তি প্রাচীন-সমাজ-তত্ত্বের মধ্যে দৈব ঘটনা বা বিশেষ ঘটনা বই নহেন। তাঁহারা সামাজিক সমতল-নিষ্ঠার মধ্যে এক একটা ঐক্যের দৃষ্টান্ত! প্রাচীন সমাজ-তত্ত্বের মধ্যে ওইরূপ দৃষ্টান্ত-স্থান নাই। এই জাতীয় দিগ্‌বিজয়গণের পদতলে সমাজ কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অগত্যা নতশির হইত! কিন্তু দিগ্‌বিজয় তাহার হৃদয়ঙ্গম আদর্শ নহে। গ্রাম-সমাজের চক্ষে গ্রাম-সীমার বাহিরে কোথাও স্পর্শ-যোগ্য পবিত্র-স্থান নাই। ওইরূপ আদর্শের গতিকেই প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস নাই; রাজা কিংবা রাজত্বের ইতিহাস, সমাজ-সভ্যতার বা ধর্মগতির ইতিহাস কিংবা ব্যক্তিগত জীবনী গ্রহণ নাই—খাকিতেই পারিত না! ব্যক্তি-গত উন্নতিমাত্রকে এই সমাজ নানাবিধ ঐক্যতা বলিয়া (abnormal বলিয়া) গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিল! তাহার চক্ষে স্বাস্থ্য লক্ষণ যাত্রাই একটা নেমি-বৃত্তি বা দশাশুক্রযায় লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রাচীন কালের কোন মহাপুরুষ ‘হংস’ হইলেই বা কি? তিনি বক-সমাজে পরম অনিষ্ট পদার্থ! প্রাচীন সমাজ ব্যক্তিগত ঐক্যতাটাকে কেবল এক দিকে মাত্র সন্মত করিতে পারিয়াছিল—উহা ওই আধ্যাত্মিকতার দিক। এই ক্ষেত্রেও, ভাল হউক বা মন্দ হউক সমাজ কোন কালে অভিনবতা পছন্দ করে নাই, বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। * (ক্রমশঃ)

শ্রীশশীকমোহন সেন।

* বলা বাহুল্য সকল প্রাচীন সমাজের এবং সামাজিক সংঘ-মাত্রের বেশী কম ইহাই রীতি। সংঘ যাত্রাই নানাবিধ স্থিতিশীল না হইয়া পারে না। পরি-বর্তনমাত্রকেই সে ‘বাধ্য হইয়াই’ গ্রহণ করে, অপরিহার্য্য বস্তুটাকেই স্বীকার করিতে চায়। মনুষ্য-সভ্যতার স্বাস্থ্য ও স্থিতি নানা দিকে এই পরাচীনতার উপরেই নির্ভর করে। দুর্ভাগ্যগতিকে ভারতীয় সমাজে, সংসারে ও অধ্যাত্মগতে উহার অনুপাতটাই অত্যধিক হইয়াছে বলিয়াই বর্তমানে আমাদের দুর্দশা। লেখক

নূতন ও পুরাতন

মরণ-রথের নিশান উড়ানে, দাঁড়ানে বিদায়-সাজে
গত বরষের জীবন আমার, মরীচিকা সম রাখে।

কিবা স্কন্ধে বশ!

ফুল-কাননের প্রান্ত উজলি সোনালি হাসির শেষ!

সাঁঝের ছায়ায় ডুবায়ে কামনা, সাধনা ডুবায়ে জলে
কণ্টক-মুখে হিয়ার শোণিত মাধিয়া যাবে কি চলে—
পলবে দলিয়া পায়?

হের ছল ছল করে কত আশি, কি যে যায় উধায়া!

আশার মুকুল ঝরে পদ-তলে ‘যেয়ো না, যেয়ো না’ বলি,
সারা বরষের মমতা চরণে রেখেছে অমিয়া ঢালি।

যৌবনের ফুল বুকে,—

কোকিলা নীরব শুক তরু-শাখে, পাপিয়া গিয়াছে উড়ে।

বনের হরিণী সঁপে তব পায়, দুখতরা অকুরাণ
আয়ত আখির জলতরা দিঠি,—দিবার মতন দান!

ফিরিলে তুমি তখনি!

পুরবের তটে উঠিল ফুটিয়া নব আলোকের ধনি।

নবীন মঞ্জরী ফোটে গো পাষাণে, পুলক নিকর-বুকে,
অরুণ-রাজ্য বন মন-লোভা কিবা নব অকুরাণে!

চাহিলে যেমনি হেসে,

পুরাণ ঢাকিল মুখ কিশলয়ে স্নমধুর ছদ্মবেশে।

মুকুলের মুখে নীহারের জাল তাহে অরুণিত আশা,
তরুণ তারার মুকুতা-সঁচনি, সে তো গো তোমারি নেণা,
নূতনের সমাচার!

ফুল ঝরে তাই, কুড়ি উঠে হাসি, তাক-গড়া অনিবার।

তাই পুরাতনে লাগ পাই আজ হিয়ার নবীন বেশে;
তাই না শুকাতে চোখের সলিল, আর চোখ উঠে হেসে,

মুখ দুখ একাকার।

যে রাত পোহায়, আসে যে নূতন, জীবন নদীর পার।

দেখা তাহে পাই, মরণ-দেবতা গলে নব ফুল-হার।

পুরাতন মম, হে চিরনবীন, লহ মোর নমস্কার।

মরণ বুটায় পার,

চির জীবনের ফুল ফুটি উঠে, ঘ্রাণে প্রাণ মূরছায়।

শ্রীশুরেশ চন্দ্র সিংহ শর্মা।

চুঁচুড়া সাহিত্য সম্মিলন

অতি প্রভাতে গোয়ালন্দ মেলে নৈহাটি আসিয়া পৌঁছলাম। প্রাটফরমে স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের দর্শন প্রত্যাশায় মুখ বাড়াইতেই, একটি মুসলমান যুবক সম্মিলনে যাইব শুনিয়া সঙ্গীদের ডাকিলেন ও নিজেরাই আমার জিনিসপত্র নামাইয়া কুলীর মাধ্যমে তুলিয়া দিলেন। নিকটে গঙ্গার ঘাট, সেখানে নৌকায় পার হইতে হইবে।

প্রাটফরমে আরও কয় জন প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তায় প্রভাতের গঙ্গাবারি-বিশোধিত নির্মল বায়ু সেবন করিতে করিতে স্বল্প পথ আরামে অতিবাহিত হইল। পরিপার্শ্বস্থ দোকান-সমূহে দিবসের কার্য্য-কোলাহল তখনও জাগিয়া উঠে নাই। নৈহাটির সেই পরিচিত গঙ্গার ঘাটে আমাদের একখানি নৌকায় তুলিয়া দিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ টেসনে ফিরিয়া গেলেন। এত আদরের পর তাঁহারা আমাদেরকে গঙ্গাবক্ষে নির্ভরহীন অবস্থায় ছাড়িয়া দিবেন এরূপ প্রত্যাশা করি নাই বলিয়া, একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল; সঙ্গীরা কেহ কেহ এই ব্যবস্থার একটু নিকরূপ সমালোচনাও করিলেন। পরে বুঝিয়াছিলাম যে, কোন কারণবশতঃ সম্মিলনের স্বেচ্ছাসেবকগণের সংখ্যার অভাৱ ঘটাতো এরূপ হইয়াছিল।

মুদ্রপন-সঞ্চালিত গঙ্গাবক্ষে চারিদিকের উজ্জ্বলতা অশ্রুতবে সকলেরই মনে একটু আনন্দ উপস্থিত হইল। পরপারের দৃশ্যপট নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। ভাগীরথীর শীতল জলে হাত মুখ ধুইয়া লইলাম। সঙ্গে এক অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন। ইনি একজন অবসরপ্রাপ্ত পত্রিকা-সম্পাদক। অত্যাধুনিকতার সম্পাদক স্বয়ং শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বিশেষ নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহার বাড়ীতেই থাকিবেন। বোধ হইল ইনি স্থানের নামগত ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণায় আমোদ অশ্রুতব করেন। নদী পার হইতে হইতে ‘চুঁচুড়া’ ও ‘চিন্‌মুরা’ এই নাম দুটি সম্বন্ধে সম্ভব্য প্রকাশ করিয়া মৌলিকত্বের প্রকট পরিচয় দিলেন। পরে দেখিয়াছিলাম, প্রবন্ধরচনারও ইহার চিন্তা-প্রবাহ গগনবিহারী।

প্রাতঃস্নানার্থ নদীতীরে সমাগত জনৈক প্রতিনিধির সঙ্গে বাঁড়েশ্বর তলায় ট্রেনীং একাডেমিতে উপস্থিত হইলাম। যে সকল ব্যক্তি নৈহাটি হইতে আসিবেন তাঁহাদের জন্য ট্রেনীং একাডেমি, ও বাঁড়ারা হাওড়া হইতে আসিবেন তাঁহাদের জন্য ‘ডাচ্‌ তিলা’ বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এ স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, আমাদের পূর্বে বড় বেশী প্রতিনিধি আসেন নাই। কেবল সশিষ্ট প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় পূর্বদিন আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি শিষ্য সঙ্গে ফুলগুড়ার মধ্যে পাদচারণা করিতেছিলেন। কিন্তু কিয়ৎকণ পরেই অক্ষয় বাবুর পুত্র অজয় বাবু ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা উভয়েই সম্মিলনের সহকারী সম্পাদক। ট্রেনীং একাডেমির অধ্যক্ষ হেমশশী বাবু পূর্ব হইতেই উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, সমরোচিত সম্ভাষণ পূর্বক ইঁহারা অভ্যাগত-গণের নানারূপ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অতি অল্পবয়স্ক বালকেরা চা ও মিঠাই আনিয়া প্রাতঃরাশের যোগাড় করিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে পরিচিত অপরিচিত বহু সাহিত্যিক-

রাগী পৌছিতে লাগিলেন। স্থল ঘরের প্রশস্ত কক্ষগুলিতে আমাদের বিছানা বিস্তৃত হইল। দস্তুর মত একটা সাহিত্যিক সাধারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। এই রাজ্যের সভাপতি স্বরূপ প্রফুল্লচন্দ্র ও শশধর রায় মহাশয়ের স্থান একটু দূরে একাডেমীর প্রবেশদ্বারের উপরিস্থ দোতালায় নির্দিষ্ট হওয়াতে একটু সুব্যবস্থা মনে করিলাম। কিন্তু শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয় গল্পগুচ্ছবে এমন আসন্ন জমাইয়া দিলেন যে তাঁহাকে ছাড়া হইল না।

স্নানাহার সারিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। কারণ, বহু দিন পরে ভাগীরথীবক্ষে অবগাহন করিতে পাইয়া সেই পুত-স্নিগ্ধ সলিলরাশি ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। আমাদের বিলম্ব দেখিয়া অজর বাবু আমাদের সত্যমুখে আহ্বান করিতে আসিলেন। সকলে একসঙ্গে অভিযান করিয়া প্রায় এক মাইল দূরস্থিত মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সভার কার্য্য সবে আরম্ভ হইয়াছে।

সভার লোকসংখ্যা প্রথম অধিক ছিল না। মধ্য-যোগে কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্যিক সেই মাত্র আসিয়া লোকসংখ্যার বৃদ্ধি করিলেন। আবার সভার কার্য্য শেষ হইবার পূর্বেই ইঁহারা চলিয়া গেলেন। কলিকাতার একরূপ নিকটবর্তী হওয়াতে সন্মিলনের কর্তৃপক্ষ দিগকে বোধ হয় অনুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কারণ এইরূপ অভ্যাগতগণ অনেকেই নির্দিষ্ট কোন বাসস্থানে উপস্থিত হন নাই; সন্মিলনে আসিবেন কি না, বা কখন আসিবেন এরূপ সংবাদও বোধ হয় দেন নাই। কলিকাতা হইতে নৈহাটি ও চুঁচুড়ায় দিনে বহুসংখ্যক গাড়ী আসে। এরূপ অবস্থায় অভ্যাগতগণ স্বয়ং অনুবিধামতে রোজ যাতায়াত করিলে অভ্যর্থনার সুবন্দোবস্ত হওয়া সম্ভবপর নহে।

কার্য্যের আরম্ভে প্রেরিত কবিতা পাঠের পৌরোপার্থ্য লইয়া একটু গোলমাল সভাপতির অমান্বিততার উপক্রমেই নিরাকৃত হয়। অজর বাবুর বিঠে-কড়া রকমের অভিভাষণ ও সভাপতির অভিভাষণ পঠিত হইবার পর,

সভার উপস্থিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহাশয় সন্মিলন-কার্য্য সম্বন্ধে একটি সুবোধ্য হিন্দী বক্তৃতা দেন।

অতঃপর যথাবিধিত প্রবন্ধাদি পাঠের পর বিষয়-নির্বাচন-সমিতি গঠিত হইল। কোন বিশেষ নিয়ম না থাকায় সভাস্থ সকল প্রতিনিধিই ঐ সমিতির সত্য গণ্য হইলেন এবং স্থির হইল যে, ইঁহাদের মধ্যে কয়জন রাষ্ট্রে সভাপতি মহারাজ বাহাদুরের বাস ভগনে সমবেত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সভায় আরও স্থির হইল যে, সাধারণ সভার কার্য্যে ক্রটি না হয় এরূপ ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞের আলোচনা-যোগ্য প্রবন্ধগুলি অল্প সময়ে স্বতন্ত্র সভায় পঠিত ও আলোচিত হইবে।

বাসায় ফিরিয়া জলযোগ সমাধা করিয়া কয়েক জন প্রতিনিধি মহারাজের বাসস্থানে গমন করিলেন। রাস্তায় গাড়ীতে পরিপার্শ্বস্থ বালক নিক্কিষ্ট এক মুষ্টি ধূলি গায়ে পড়িয়া, দোলপূর্ণিমায় পথচারীর বিপদের কথা শ্রবণ করাইয়া সাবধান করিয়া দিল। বিষয় নির্বাচন সমিতিতে যথেষ্ট কালক্ষয় করিয়া প্রবন্ধ নির্বাচন মাত্র করা হইল। পঠিতব্য, পঠিত বলিয়া গৃহীত, একেবারে নিগৃহীত এই রূপ তিন শ্রেণীতে প্রবন্ধগুলি বিভক্ত হইল; আর বৈজ্ঞানিকগণ কতকগুলি প্রবন্ধ স্বতন্ত্র সভার যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই নির্বাচনে কোন বিশেষ নিয়ম বোধ হয় অনুস্থত হয় নাই, পরন্তু সভাস্থলে নির্ধারিত ব্যবস্থার ব্যতিক্রমও ঘটয়াছিল।

সাহিত্য সন্মিলনে বঙ্গের প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবীগণের আসিবার কথা। এখানে প্রবন্ধ-নির্বাচন সম্বন্ধে একটু সতর্কতার প্রয়োজন। কেবল দূরাগত অথবা নবীন লেখক বলিয়া প্রবন্ধকারকে উৎসাহ প্রদান জন্য প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা হইলে সমস্ত ব্যাপারটিকে লঘু করিয়া দেওয়া হয়।

পরদিন প্রাতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক অধিবেশন হইল। সাধারণের বোধগম্য কয়েকটি শুল্লিখিত ও সুপঠিত প্রবন্ধ শুনিয়া সকলে ভূগু হইলেন। পরিভাষা বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞগণ

কল্পিত পঠিত ও আলোচিত হইল। প্রাপ্ত কয়েকটি প্রবন্ধ যদি মূল সভায় পঠিত হইত তবে আরও বহু লোক উপভোগ করিতেন, এবং সর্বসাধারণ সম্মিলনের প্রবন্ধ-সম্পদ এত দীন জ্ঞান করিতেন না। নির্বাচন-সময়ে পঠিত না হইয়া শ্রেণীভুক্ত হওয়ার এরূপ ঘটয়াছিল।

আমাদের বিজ্ঞানবিদগণ যদি যশাকাজ্ঞা কথঞ্চিৎ উপেক্ষা করিয়া স্ব স্ব গবেষণার বিষয় যুরোপীয় পত্রিকা ছাড়িয়া বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত করেন তবে তাঁহাদের মহত্বের পরিচয় পাইব, ও বঙ্গ ভাষার উপকার হইবে।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত দ্রব্যভাতের ঐতিহাসিক বিবরণও যদি সম্মিলনের বিশেষ বৈজ্ঞানিক অধিবেশনেরই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে যাহারা বিজ্ঞান-সম্পদে মাতৃভাষার উপকার করিতে চাহেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য আত্মঘাতী হইবে। বিশেষজ্ঞগণ গবেষণা-মূলক আলোচনার সময় পাইবেন না, আর সাহিত্য-সেবক বিজ্ঞানকে সাহিত্য হইতে দূর জ্ঞান করিবেন।

এই দিন বিপ্রহরের অধিবেশনে লোকসংখ্যা পূর্বদিন অপেক্ষাও কম হয়। মধ্যে ঝড় বৃষ্টিতে সকলেই সভা-মণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দিকের চাণার নীচে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। এই আকস্মিক দৈব ঘটনা জমিদার ও সামান্য দর্শককে এক ছত্রের তলে আনিয়া একত্র করিয়া দিল। ঝড়ের অবসান হইলে সভার কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইল। প্রবন্ধের পরে প্রবন্ধ কবন্ধ রূপে পঠিত হইতে লাগিল। উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে এই ঘটিল যে, পূর্বদিনের বৈঠকে যে একটি প্রবন্ধে ব্রাহ্মণের অবমাননা সূচক দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল তাহার প্রতিবাদ হইল। এই প্রতিবাদের পালা এই খানেই শেষ হয় নাই।

সভা ভঙ্গ হইলে সম্মিলনের সম্পাদক রায় বাহাদুরের নিমন্ত্রণে তাঁহার স্নেহভর্য্য ভবনে অভ্যাগতগণ সাক্ষা সম্মিলনে যোগদান করেন। সমস্তাভাবে রায় বাহাদুরের আয়োজনের পূর্ণ সদ্যবহার হইল না, কারণ তারপরই সভামণ্ডপে আলোক-চিত্র প্রদর্শিত হইবে।

এই চিত্র প্রদর্শন বড়ই মনোরম হইয়াছিল। কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত ভারতীয় প্রস্তর-শিল্পের নিদর্শন, বরেন্দ্র-অম্বুসন্ধান সমিতির কার্য্যফলক ঐতিহাসিক নিদর্শন, পাথর কয়লার প্রকার-ভেদ ও ভূগর্ভে সংস্থান-পর্যায়, বিহারে আধুনিক নীলকুঠির কার্য্য-প্রণালী ইত্যাদি সুন্দর চিত্র দর্শনে সকলে সম্মিলনের বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, শেখোক্ত বিষয়ের প্রদর্শক স্বয়ং উপস্থিত না থাকায় চিত্রগুলি বুঝাইয়া দেওয়ার সুব্যবস্থা হয় নাই। সম্মিলনের এই অতি প্রয়োজনীয় অংশটি অতি অল্প সময়ে শেষ করিবার জন্য অনাবশ্যক ত্বর করিতে হইয়াছিল কারণ, তাহা না হইলে কলিকাতায় ফিরিবার গাড়ীর সময় চলিয়া যাইত।

রাত্রিতে বাসায় ফিরিয়া দেখি জলধাবার ও অতি গুরুতর নৈশ আহারের আয়োজন হইয়াছে। সদ্য-ব্যবহারের ক্রটি হইল না, তারপর রাত জাগিয়া কীরোদ প্রসাদের গল্পের আসর বসিল।

কিছু পরে তিনজন অপরিচিত ভ্রাতৃলোক আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা 'ডাচ ভিলার' অনেকের মত লইয়া আসিয়াছেন, আজ যে ব্রাহ্মণগণের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ হইয়াছে উহাতে প্রবন্ধপাঠক ও—বাবুর প্রতি আক্রোশ আছে, তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে। এই প্রতিবাদ প্রসঙ্গে ঘোর তর্ক দেখিয়া শয়ন করিব বলিয়া রণে ভঙ্গ দিলাম। কিন্তু অনেক ক্ষণ নিত্ৰাহীন অবস্থায় কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, আগন্তুক তিনটি চলিয়া গিয়াছেন। প্রায় ৩০ ঘটিকার সময় আবার শয্যাগ্রহণ করিয়া নিদ্রিত হইলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়া শুনিলাম যে, বারান্দার টেবিলে অভ্যাগতগণের যে তালিকা ছিল, তাহা পাওয়া বাইতেছে না। অতঃপর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া কয়েক জন টুচুড়ায় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিতে বাহির হইলেন, আমরা কয়েক জন ত্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাটীতে তাহার সঙ্গে নিকট পরিচয় করিতে গেলাম।

কয়েক জন সাহিত্যিক সেখানেই অতিথি ছিলেন। পরস্পর আলাপ ও নানা বিষয়ে গল্পের পর ফিরিয়া আসিয়া দানাহারান্তে আবার সভাঘণ্টে গেলাম।

প্রবন্ধদি পাঠের পর নানা বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত হইল। বহু বিতর্কের পর আবশ্যিক অনাবশ্যক অনেক প্রস্তাব গৃহীত হইল। সম্মিলন পরিচালন সমিতির সভা-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। বোধ হয় ক্ষেত্রান্তরে অল্পহৃত নীতির অনুকরণেই এক জন মুসলমান ও এক জন হিন্দু এই সমিতির সম্পাদকের সহকারী নিযুক্ত হইলেন।

অতঃপর ধর্মবাদের পালায় পাগলতা চলিল। এই পরস্পর প্রশংসা ব্যাপারের মধ্যেও একটি দৃষ্টান্তর ভাব ল্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল। প্রথমে সম্মিলনের পক্ষপাতী না থাকিয়াও মাতার স্বপ্নাদেশে শেষে কি প্রকারে সম্পাদক পর্যন্ত হইয়া দাঁড়াইলেন মহেঞ্জ বাবুর মুখে সেই মর্শ্বোখিত সরল স্বপ্নাতান্ত শুনিয়া সকলে সম্মিলন ব্যাপারে অতিমানবীয় মঙ্গল প্রস্তাব স্বীকার করিলেন।

তারপর বাসায় ফিরিয়া সন্তঃ প্রস্তুত আহাৰ্য্যে উদর পূর্ণ করিয়া প্রত্যাগমনের উদ্ভোগ করিতে লাগিলাম। বিদায় গ্রহণ সর্বত্রই নিরানন্দময়। বিশেষতঃ এই কয়দিন বহু দূরবাসী সকলে এক সঙ্গে বিশেষ আমোদেই ছিলাম। অধ্যক্ষ হেমশশী বাবু ও তাহার সহকারী স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রগণসহ এ কয় দিনে আমাদের বড় আশ্রয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহারা কেহই আমরা শয়ন না করিলে আহাৰ্য্যাদি করিতে বাড়ী বাইতেন না, ও আবার আমাদের নিজান্তরের পূর্বেই হাজির হইতেন। ইহাদের ও ছাদশ বর্ষের অনধিক বয়সের বালকগণের এই সহনয় পরিচর্যা এ জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে। যাত্রার কালে ভাড়া ভাড়িতে কুলী কুটিল না দেওয়া ইহারা নিজেরাই আমাদের জিনিস পত্র বহিয়া আনিয়া গলাবন্ধে দুইপানা নৌকায় তুলিয়া দিয়া যেন-করুণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তারপর কৌমুদী প্রাপ্তি পলাবন্ধের শান্ত সুখ উপভোগ করিতে করিতে নৈহাটির তীরে পৌঁছিয়া পাড়ীর দৃষ্ট প্রতীক করিতে লাগিলাম।

উপসংহারে দু একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

তুনিলাম এ ব্যারে সম্মিলনকে প্রকৃত সাহিত্যিকের সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সমস্ত সত্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই সাহিত্যিক না হইলেও সাহিত্য-প্রেমিক বটে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সমিতি বিশেষের সমস্ত সভাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেলে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নিমন্ত্রণ-কঠোর ভীতি উৎপাদন করিবে না ?

তুনিলাম, চুচুড়া সম্মিলনে আর একটি সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছিল। বঙ্গ ভাষার যাবতীয় পত্রিকার লেখকগণকে ও গ্রন্থকারগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। অবশ্য উদ্ভাগ কালীন অবশ্যস্তাবী ক্রটিতে হয় ত বহু লেখকের এই সৌভাগ্য ঘটে নাই। কিন্তু এই রীতি পরিগৃহীত হইয়া ক্রমশঃ সম্পূর্ণতা লাভ করিলে অতিশয় আনন্দের কথা হইবে সন্দেহ নাই।

যে সম্মিলন সম্পর্কে এক জন মহিলার সভাপতিত্বের কথা উঠিয়াছিল, যে স্থান কলিকাতার এত নিকটবর্তী সে স্থানে সভা-স্থলে মহিলা দর্শকের অভাব লক্ষিত হইয়াছিল। সুতরাং এরূপ প্রতীতি হওয়া বিচিত্র নহে যে, মহিলাগণ ইচ্ছা করিয়াই সম্মিলনে যোগদান পরিহার করিয়াছিলেন।

সম্মিলনের পরিচালন-সমিতি থাকা সত্ত্বেও কার্য-সম্পাদনে শৃঙ্খলা ও মৌলিকের যোরতর অভাবে অভ্যাগতের বিরাগ জন্মে।

প্রবন্ধ নির্বাচনে উপযুক্ত সময় প্রদত্ত হয় না বলিয়া অনেক নির্বাচিত প্রবন্ধ সভার অনুপস্থিত হয়।

কেবল বৈজ্ঞানিক নূতন তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের অভাবে বৈঠকের বন্দোবস্ত করিয়া লাভ না থাকিয়া সকল প্রবন্ধই যথা সম্ভব বিবরণভেদে পর পর পাঠের ব্যবস্থা করিলে অনেক সুবিধা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রস্তুত কালের বিচার সাধারণ সম্মিলনে না করিয়া তন্মত বৈজ্ঞানিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা উচিত কিনা ইহা সাধারণের বিবেচ্য।

সম্মিলনের অধিবেশনের কার্য-প্রণালী পূর্ষ হইতে স্থিরীকৃত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদৃচ্ছাক্রমে পূর্ষ নির্দিষ্ট কার্য-প্রণালীর পরিবর্তন করিলে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত না হইয়া পারে না, এবং ব্যক্তি-বিশেষের সুবিধার অনুরোধে সাধারণের বিরক্তিকর বা অনসুবিধা জনক ব্যবস্থা করা পরিতাপের বিষয় হয়।

কর্মচারীগণের অভাব না থাকিলেও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হইয়া বিষম অনসুবিধা ঘটাইয়াছে। অনেক প্রবন্ধলেখক সভাপতি কর্তৃক আহূত হইবার পূর্বে তাহাদের প্রবন্ধ পঠিত হইবে কি না, বা কত সময়ের মধ্যে পড়িতে হইবে ইত্যাদি বিষয় জানিতেই পারেন না।

সম্মিলন-পরিচালনার বৈধ শাসন-প্রণালী বর্তমান ব্যবস্থায় কতকগুলি অনসুবিধার কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়। সম্মিলন-সমিতি ও স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতির মধ্যে কার্য বিভাগ রেখাঙ্কিত না থাকাতে কে কোন কার্য করিবেন স্থির হয় না। সম্মিলনের অধিবেশনের সমস্ত ব্যবস্থা স্থানীয় সমিতির হস্তে না থাকিলে সুবন্দোবস্তের অভাবের জন্য দায়িত্ব কাহার তাহা অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। সাধারণে অবগত প্রত্যক্ষতঃ তাহার দায়িত্ব, তাহাকেই দোষী করিবে। যে স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হয় তত্রত্য অধিবেশন-কার্যের ব্যবস্থা তাহার। করিতে পারিবেন বলিয়াই তাহার। সম্মিলন আহ্বান করিয়া থাকে। পরিচালন-সমিতির কর্তৃপক্ষ সাহায্য করিতে গেলেও সাধারণের নেত্রপথে তাহাদের অত্যন্ত উপস্থিতি ও অগ্রণীপদগ্রহণ সামান্য সতর্কতার অভাবেই কেবল অতিথি-প্রকৃতি-বিকৃত হয় তাহা নহে, অভ্যাগতগণ এক বার অগ্রসর হইলেই স্থানীয় কর্মকর্তাগণ আন্তরিকতা ও সৌজন্য ক্ষুদ্র হইবে তবে ক্রমেই অগ্রভূমি হইতে সরিয়া আসিতে বাধ্য হন। ফলে কোন রূপ ক্রটি ঘটিলে সমস্ত সাহায্যকারীগণ কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে অবধা অপ্রীতিকর সমালোচনা প্রাপ্ত হন, এবং লোকলোচনসমক্ষে তাহাদের অস্তিত্ব প্রবল না থাকায় সকলেই স্থানীয়

কর্মীগণের আন্তরিকতা ও কর্ম-কুশলতা সম্বন্ধে সন্দেহ ধারণা করেন। স্থানীয় শক্তিকে দায়িত্ব বুঝিয়া লইয়া কার্য করিবার অবসর দেওয়া হইলে সার্থকতা বৃদ্ধি পাইবে।

সম্মিলনের দিন কয়েকটি এরূপ ব্যাপারবহুল হইবে, সমাগত সাহিত্যসেবীগণের পরস্পরের পরিচয়ের সুযোগ ও অবসর একেবারেই থাকে না। এমন কি আরাধের সহিত স্নানাহার করিবার সময়েরই অগ্রতুল ঘটয়া থাকে। শৃঙ্খলার সহিত বিধান করিলে এ বিষয়ে অনেক সুবন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। সম্মিলনের দৈনিক অধিবেশনের সময় স্থির নিয়মিত করিয়া দিলে অবশিষ্ট কালে আগন্তুগণ নিজের। পরিচয়াদির ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন। নিমন্ত্রিতগণের নিবাসস্থান দূরে দূরে অবস্থিত হইলে এ বিষয়ে আরও অনসুবিধা হয়। সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া যদি পরস্পর পরিচয়ে প্রকৃত সম্মিলনের সুযোগ না ঘটে তাহা হইলে দূরস্থ বহু সাহিত্যিক ভবিষ্যতে সংবাদপত্রের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিবেন, সম্মিলনে সশরীরে যোগদান করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

ভ্রাতা ও ভগিনী

১

চারিদিকে পূর্ববঙ্গের বিশাল নদীতে বেষ্টিত একটি দ্বীপের প্রধান সহরে তারানাথ এক জন সজ্জন ব্যবসায়ী। অতি স্পষ্টবক্তা লোক। কাহারও সহিত ভুল বাধিলে মুখে যা আসে তাই বলিত। তবু সহরের ইতর ভদ্র সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

গোপীনাথ নন্দী সেখানকার শ্রেষ্ঠ মোক্তার। কুপন বলিয়া তাহার বেশ খ্যাতি ছিল, এবং তাহার প্রসঙ্গ উঠিলে কেহ মন খুলিয়া কথা বলিত না। মানহানির বোকদ্বারা এক ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশ্য আদালতে কথাপ্রাৰ্ণ

বৈশাখ ১৩১২

করাইয়া সে নিজের মান বজায় রাখিয়াছিল। সহরবাসী গোপীনাথকে সেজ্ঞ সন্দেশে ভর করিত ও সন্দেশের চোখে দেখিত।

তারানাথের পুত্র বীরেন গোপীনাথের একমাত্র পুত্র বিপিনকে খেলিবার জন্য ডাকিয়া আনিয়াছে।

অল্প পরিসর খালে ভাটার জল তবু তরু করিয়া চলিতেছে। অল্প ছোট কাঠের পুলের উপর বসিয়া বীরেন ও বিপিন গাছের পাতায় নৌকা তৈয়ার করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। বিপিনের নৌকা বায়ে বায়েই আগে যাইতে লাগিল। বীরেন চটিয়া বলিল, “আরগার দোষ।”

দুজনে পরস্পর স্থান পরিবর্তন করিয়া আবার নৌকা ছাড়িল। এবার বীরেনের নৌকা খালের বাঁকে পাড়ের ভূমিখেণ্ডে আটকাইয়া গেল।

একটি গৌরবর্ণা ছয় বৎসরের মেয়ে বীরেনকে ডাকিয়া বলিল “দাদা” এই দেখ, সন্দেশ আনিয়াছি।” বালিকার পরিধানে একখানি নীলাঙ্গুরী সাজী, ঘনকৃষ্ণ অলকনাম তাহার মাথার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে বিপিনকে দেখিয়া “আর একটা নিয়া আসি” বলিয়া চকলা বালিকা দৌড়িয়া গেল; ফিরিয়া আসিয়া ছোটটি নিজে রাখিয়া বড় দুটি বীরেন ও বিপিনকে দিল।

বিপিন বলিল, “দেখ, ছলি,” বীরেন নিজে সাধিয়া আমার সঙ্গে খেলিতে আসিয়া হারিয়া গেল।”

বীরেন বলিল, “এখনই কি? শেষ হইলে কে জিতবে দেখিব।”

আরও দুই চারি বার নৌকা ছাড়া হইল। বীরেনের দুর্ভাগ্য, তার সব কখানি পাড়ে লাগিয়া রহিল। বিপিনের নৌকা বাতাসে অল্প হেলিয়া ছলিয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

এ উপহাস বীরেনের আর সহ হয় না। সে বিপিনের নৌকা লক্ষ্য করিয়া টিল ছুড়িল। টিল নৌকা ছাড়াইয়া পড়িল, পাতা ছিঁড়িল না। কতক জল ছিটিয়া উঠিয়া বিপিন ও হুলালীর হাসির সঙ্গে সঙ্গে বীরেনের গারে পড়িল। রাগে কেপিয়া বীরেন আর একটা টিল ছুড়িল। বীরেনের নৌকা জলের আন্দোলনে বন্ধনহীন

হইয়া বিপিনের নৌকার সমকক্ষ হইয়াছিল, এই টিলে উত্তরের নৌকাই ছিঁড়িয়া গেল।

বিপিন বলিল, “আমি আর খেলিব না।”

খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। বালকবালিকারা বাড়ীতে চলিয়া গেল।

পরিপার্শ্ব কাউগাছগুলি পূর্বের মত সোঁ সোঁ করিতে লাগিল।

২

তিন চারি বৎসর অতীত হইয়াছে। তারানাথের ব্যবসায় পূর্ববৎ চলিতেছে। গোপীনাথের পসার পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ আছে।

হঠাৎ এক দিন গোপীনাথ আসিয়া তারানাথের কণ্ঠার সহিত বিপিনের বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিল। তারানাথ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, “বলেন কি, মহাশয়! আমার হুলালী অপূর্ব রূপসী।”

গোপীনাথ বলিল, “বিপিন আমার একমাত্র পুত্র। আমার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইবে।”

“সম্পত্তিই ত সংসারে সমস্ত নয়।”

“সরকার মহাশয়, বিবেচনা করিয়া দেখুন। আপনার বৃদ্ধ বয়স, তা’তে ব্যবসারে তেমন হইতেছে না। কোথায় পাত্র খুঁজিবেন। এমন ভাল বর পাইবেন না।”

“নন্দী মহাশয়, আপনি ছেলের বাপ, বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছেন, মেয়ের বাপ তাহা প্রত্যাখান করিয়াছে। ইহা যদি যথেষ্ট মনে না করেন, তা’ হলে বলিতে হয় যে, আমার বৈবাহিক বা পারিবারিক বন্দোবস্তে আপনার পরামর্শ চাই না। আপনি যাহাদের মোক্তার তাহা-দিগকে পরামর্শ দিলে বরং কিছু লাভ হইতে পারে।”

“লাভ কিছু আপনারই হইত। সকলের দৃষ্টি ভুলাইলেও আমার কাছে আপনার কারবারের লোকসানের কথা অজানা নাই। তাবিয়াছিলাম, পালেদের যে ডিক্রীটা কিনিয়াছি, আমার পুত্রবধু হইলে আপনার মেয়েকে সেই থানা দিয়া মুখ দেখিব—”

“মহাশয়, আগে সেখানাই আবার বেচিয়া ছেলের

পিঠের কুঁজটি ঘেরাঘত করাইয়া লইবেন। আমার মেয়ে অদহীনা নয়।”

গোপীনাথ আর কথা বলিল না, তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিল।

৩

ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তারানাথের বাড়ীতে ডিক্রিফারি করাইতে গোপীনাথ স্বয়ং আসিয়াছিলেন। কোণ্ডে ও অপমানে জর্জর হইয়া তারানাথ এক লাঠিতে তাহার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে।

সকলে তাহার চিকিৎসায় ব্যতিব্যস্ত। ধান্য পুলিশ হয় নাই।

পিতা একটু সারিয়া উঠিলে, বিপিন শুনিল। কয়েক দিনের প্রবল জ্বরে তারানাথের মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে।

আজ তারানাথের অবস্থা একটু ভাল, জ্বরের প্রকোপ কমিয়াছে, মানসিক অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক। সকলকে ঘর হইতে সরাইয়া দিয়া কেবল বীরেনকে কাছে ডাকিয়া তারানাথ বলিল, “বীরেন, আমার অবস্থা আজ কিরূপ দেখিতেছ?”

“বাবা, তুমি শীঘ্রই সারিয়া উঠিবে।”

“না, বাবা এই আমার নির্কারণের পূর্বের সম্ভাব্য অবস্থা। শীঘ্রই তুমি পিতৃহীন হইবে। তোমার বয়স এখন সত্তেরো কিন্তু আমার জানে তুমি সাবালক। তোমার পিতার শেষ কথা রাখিও। যে কর্তব্য পালন করিতে আমার প্রাণ গেল সে কর্তব্য এখন হইতে তোমার হাতে দিয়া গেলাম।”

কতক্ষণ গৃহে নীরবতা ব্যাপিয়া রহিল। বীরেনের নেত্রদ্বয় অতি কষ্টে অশ্রুশি পল্লবের অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তারানাথ বলিতে লাগিল, “কয়েক মাস পূর্বে গোপী শোভার আমার পিতৃস্নেহ কিনিতে আসিয়াছিল। আমি স্বীকার করিলে তা’র মাথা ফাটিত না, আমার এ অবস্থা হইত না, তোমাকে আর ক’দিন পরে ভিটা

ছাড়া হইতে হইত না। কিন্তু দুলালী তাহার অপকৃপ রূপলাবণ্য লইয়া গোপীনাথের মর্কট পুত্র বিপিনের পত্নী হইত। আমি তাহাতে রাজি হই নাই—কল এই।”

বীরেনের অশ্রুধারা আর বাহিরে আসিল না, চোখের মধ্যেই শুকাইয়া গেল। এক হাতে পালকের মশারি খাটাইবার কাষ্ঠধণ্ড দৃঢ় রূপে ধরিয়া সে নিশ্চল দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। দুই গণ্ডের মাংস কঠিন হইয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধ মনের আবেগ দৈহিক লক্ষণে কথঞ্চিৎ ফুটিয়া বাহির হইল।

তারানাথ বলিতে লাগিল, “আমার নিজের হাতে করা বাড়ী ঘর, ব্যবসায়, নিলাম হইয়া যাইবে, আর ধৃত গোপীনাথ তাহার মালিক হইয়া আমার অপমানে উল্লাস করিবে। ইহার পূর্বে আমার মরণই বর। হুঃ এই যে, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও ভিটা ছাড়া হইতে হইল। কিন্তু পুত্র, ধনসম্পত্তি চিরস্থায়ী নয়। দেখিও যেন স্বপ্নের প্রলোভনে আমার দুলালীকে সেই কুরুপের অবতারের হাতে দিও না। আর পার ত আমাদের পৈতৃক বাড়ীখানি আবার উদ্ধার করিও।”

মানসিক উত্তেজনায় শ্রান্ত হইয়া তারানাথ নিরন্তর হইল। কিছুক্ষণ পরে বীরেন দেখিল, পিতার তল্লার আবেশ হইয়াছে। নিঃশ্বাসিত দীর্ঘ বায়ু প্রবাহে একবার তাহার বক্ষঃ ক্ষীত হইয়া উঠিল, আবার শৈশবভাঙা সুখভোগের বৃত্তিগুলি অন্তরের মধ্য হইতে তুলিয়া লইয়া সেই বায়ুরাশি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, দীর্ঘ শ্বাসের শব্দ হইল না। ধীর পদে বীরেন পিতার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিল।

নিশাশেষে তারানাথের অন্তিম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। রোক্তমান্য পত্নী ও কন্যাকে আশ্রয় করিয়া তারানাথ বলিল, “বীরেন আমার উপযুক্ত পুত্র রহিল। আজ হইতে সে-ই সংসারের কর্তা। সে থাকিতে তোমাদের কোন চিন্তা নাই।”

৪

তারানাতের অভ্যুত্থি-ক্রিয়াদি হইয়া গিয়াছে। তাহার বাড়ী ও ব্যবসায়ের স্থান সমস্ত নীলাম হইয়া পিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে গোপীনাথের মৃত্যু হওয়াতে নীলাম থরিত করিয়াছে, প্রতিবাসী উষাচরণ। বিপিন আর প্রায় বাহিরের কোন কাজের মধ্যে থাকে না।

তিন ক্রোশ দূরে রূপগঞ্জে পিসামহাশয় নবীনচন্দ্রের তামাকের ব্যবসারে বীরেন সামান্য বেতনে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। দিনান্তে আসিয়া মা ও ভগ্নীসহ ক্ষুদ্র কুটারে নিশা যাপন করিত।

এক দিন দীর্ঘ দিবসের প্রম্বে ক্লান্ত বীরেন বাড়ী ফিরিয়া দেখিল যে, বাহিরে বিপিনের ছুতা দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, “বাবু বাড়ীর ভিতরে আছেন।”

বীরেনের ব্রহ্মরক্ষু পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিল। যে দুর্দিনে তারানাতের লাঠিতে গোপীনাথ আহত হয়, তাহার পরে আর এই দুই বাণ্যসঙ্গীর পক্ষপাত সাক্ষাৎ ছিল না।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বীরেন দেখিল, বিপিন বারান্দায় বসিয়া মার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছে, ছালালী ঘরের দ্বারে বসিয়া আছে।

“বিপিন, তোমার ও আমার পিতার মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে তোমার এখানে আসা আমরা প্রত্যাশা করি না।”

“না হয় অপ্রত্যাশিত ভাবেই আসিয়াছি। তা বলিয়া আমাকে কি তাড়াইয়া দিতে চাও।”

“তুমি নিজেই যদি আসা কান্ত কর, তবে আর সেরূপ করার প্রয়োজন হইবে না।”

বিপিনের রক্তহীন মুখে একটু চমক লাগিল। মা সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। ছালালী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, “দাদা, ভদ্রলোকের ছেলেকে নিজের বাড়ীতে অপমান করা ভদ্রতা নয়।”

বীরেন ক্রোধবদ্ধ হয়ে বলিল, “তোমার নিকট আমি

ভদ্রতা শিখিব না। ভদ্রলোকের ছেলে আমাদের দুঃস্বপ্নের রূপা দেখাইতে আসিয়াছেন।

“বিপিন, তুমি আর এখানে আসিও না, আর এখানে থাকিও না। আমি আর আমাকে ধামাইয়া রাখিতে পারিতেছি না। আমার তোমাকে এখানে দেখিলে তোমার দেহের বিকলতাও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।”

বীরেনের মা আন্তে আন্তে বিপিনকে টানিয়া লইয়া বাড়ীর দ্বারে দিয়া আসিলেন।

বিপিন চলিয়া গেলে ভাইভগ্নীতে বিবম কগড়া হইয়া গেল। ছালালী রাগ করিয়া বলিল, “তোমার অপ্রিয় থাকি হইতে মরাও ভাল।”

বীরেন বলিল “বেশ, কাল হইতে আমি পিসির বাড়ীতে তোমাকে রাখিয়া দিব।”

পরে বীরেন মাকে বুঝাইয়া দিল যে, বিপিনের সঙ্গে ছালালীর বিবাহ হইতেই পারে না। পিতার শেষ আদেশের কথা বলিল। বীরেনের তাব দেখিয়া মা ক্রমশঃ দৃঢ় বিপিনের অতুল ঐশ্বর্যের আশা আর রাখিলেন না।

(৫)

বড় নদীর ওপারে চরে একটা হাট বসিত। পিসিমার অজ্ঞাতে পিসামহাশয়ের কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়া বীরেন নিজের সঞ্চিত ধনে সেখানে সামান্য কারবার আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাতে বেশ লাভ হইতেছে শুনিয়া পিসিমা ছালালী ও তাহার মাতাকে আশ্রয় দিলেন বটে, কিন্তু প্রত্যহ কথায় কথায় গুনাইয়া দিতে লাগিলেন, তিনি বহু পূর্বেই জানিতেন যে এরূপ হইবে।

অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যুর ক্রোড়ে জননীর দুঃখ-বহুগার শান্তি হইল; কিন্তু ছালালীর জীবন বড়ই দুঃখকর হইয়া উঠিল।

পিসিমা ও পিসা মহাশয়ের সঙ্গে তাহার বসিত না। পরিবারের মধ্যে পিতাই তাহার পক্ষে ছিল; অথচ সেই পিতার অবর্তমানে তাহার একমাত্র সম্বল

দাদার সঙ্গে তাহার সত্যাব ছিল না, বহু দিন হইতে বাক্যালাপ পর্যন্ত রহিত হইয়াছিল। তাহার এই সহানুভূতিহীন গোড়া অগ্রহের ব্যবহার তাহাকে বিমোহী করিয়া তুলিয়াছিল।

দাদা আশৈশব তাহার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছে সেগুলির স্বতি পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল।

হুলালীর উপরে তাহার টিয়া পাখীটিকে খাওয়ারিবার ভার দিয়া বীরেন এক বার দুই মাসের জন্ত মামার বাড়ী গিয়াছিল। কেমন করিয়া তাহার ভুলক্রমে অনাহারে পাখীটির প্রাণ যায়। বাপ মার কাছে প্রাপ্ত পরবীর সমস্ত পয়সা দিয়া আর একটি টিয়া পাখী কিনিয়া দিয়া হুলালী তাহার অহুতাপ ও অহুশোচনা লাঘব করিতে চাহিয়াছিল। বীরেন স্থগা-দৃষ্টিতে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং হুলালীর জন্ত যে মাছ ধরিবার ছিপটি তৈয়ার করিয়াছিল, সেটি মানুভূত বোনকে দিল। তাহার দিকে ক্রক্ষেপ মাত্র না করিয়া শৈলকেই মাছ ধরিবার সাথী করিয়া হুলালীর প্রতি সে ভ্রাতৃস্নেহহীনতার যে তীব্র অরোপ করিয়াছিল, হুলালী তাহার বিরুদ্ধে কোন গ্রাহ্য প্রতিবাদ প্রকাশ্য ভাবে দাখিল করিতে পারে নাই।

হুলালী বাহিরের কোন কাজে দেখাইতে পারে নাই যে, সেহে তাহার হৃদয় পূর্ণ। বরং এই নির্মমতার প্রতিশোধ ল'তে নিরুপরামিতি শৈলকে খালে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহার পরিধেয় কর্মমলিপ্ত করিবার ফলে বাড়ীর সকলের কাছে হুলালী একরাশি গজনা লাভ করিয়াছিল।

এইরূপ দাদার শৈশবের ব্যবহারের এক দিক আজ রূপান্তরিত হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, দাদা তাহার মন কখনও বুঝিবেন না। হুলালী স্নেহের বশে বাহা করিয়াছে, তাহাই দৃষ্টতঃ স্নেহের অভাব সূচনা করিয়া দিয়া তাহাকে লাজনা-ভাজন করিয়াছে।

এই দৃঢ়প্রকৃতি দাদাকে সে চিরকাল সর্দাপেক্ষা বেশী ভয় করিয়া আসিয়াছে। সে জানিত তাহার

প্রতিজ্ঞা দৃঢ়, প্রবৃত্তি অপরিবর্তনীয়। তাহার মনের ভাবের সঙ্গে হুলালীর মন কখনও খাপ খায় নাই। কিন্তু রক্তের টান ত ছুলিবার নহে! সে ত তাহার সম্পর্ক ভুলিতে পারিবে না। ক্ষুদ্র বৃহৎ সহস্র ঘটনার তাহার নিকট হইতে স্নেহের পরিবর্তে অটল কর্কশ ব্যবহার পাইয়াছে। কিন্তু তবু সে যে সহোদর!

৬

ভোগেজ্ঞাগুলি সম্যক দমন করিয়া দূর নদী-তীরে রাত্রি দিন সন্ধ্যাহীন বীরেন ব্যবসা দেখিতেছে। সমবয়স্ক যুবকদের আয়োদপ্রমোদ তাহাকে কর্মের গভীর বাহিরে লইয়া যাইতে পারে নাই। এই কর্মপ্রিয়তা তাহার শৈশব-চাপল্যের স্বাভাবিক পরিণতি নহে। কিন্তু একটা ঘটনার নিষ্পেষণে বাল্যের প্রবৃত্তিগুলি আনুল বদলাইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ কর্মরাস্ত্র দিবসের অবসানে নির্জন কক্ষে সে যখন সমুখের বেড়াখানির দিকে চাহিয়া থাকিত তখন তাহার তরুণ বদনমণ্ডলে চিন্তার বার্ককারেখাগুলি অপরিচিত সহদয় জনকেও সহানুভূতি-কাতর করিয়া দিত।

কিন্তু আজ বীরেনের মুখের স্বাভাবিক কঠোরতার মধ্যে হর্ষ-চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আশ্রয় চেষ্টার সঞ্চিত মনে সে তাহার পৈতৃক বাসস্থান ফিরিয়া পাইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর হইতে যে আকাজকা অশেষ সংসার-ক্লেশ, বিপদ আপদ ও অভাবের মধ্যে তাহাকে অবিচলিত রাখিয়াছে আজ তাহার সেই আকাজকা সফল হইয়াছে। তাহার পিসা মহাশয়ের প্রেরিত লোক ক্রয়পত্রখানি আজ তাহার হস্তে আনিয়া দিয়াছে। এই সফলতার দিনে একটি অস্তিম দৃষ্টের স্বতি তাহার মনে আসিয়া এক বিন্দু অশ্রুজলের সহিত নয়নে প্রতিফলিত হইল।

রাত্রিতে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আগন্তককে খাওয়ারিয়া নিজে খাইয়া সে দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। নানা কথার পরে লোকটি বলিল যে, এখন বীরেন বাবুর একটি কাজ বাকী, ভবীকে বিগিনের সঙ্গে বিবাহ দিয়া লোকের মুখ বন্ধ করা।

কিছুকণ ধামিরা বীরেন প্রসন্ন করিয়া জানিল যে, এক দিন হুলালী বিপিনের বাড়ী গিয়াছিল। কি হইয়াছিল লোকটি জানে না। তবে সকলেই বলে যে, বিপিন যদি রাজি থাকে, তবে বীরেনের উচিত যে—
“বীরেন বলিল, “হরনাথ, তুমি শোও, আমি কালী বণিকের নিকট একটা কথা বলিয়া আসি, দেৱী করিলে সে হয় ত ঘুমাইরা পড়িবে।”

৭

“ভাবিয়াছিলাম তোমাকে কোনও পত্র আমার লিখিতে হইবে না। আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক বোধ না থাকিতে পারে, আখার ইচ্ছা তোমার কাছে কিছুই না হইতে পারে, কিন্তু তুমি না বাবাকে বড়ই ভাল বাসিতে! তুমি জান, বিপিনের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইতে পারে না। এখন তুমি ছোট নও। আমাদেরও তাহাদের দুই পরিবারের মধ্যে ঐ ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে তাহা তুমি বুঝিতে পার। তথাপি তুমি আমার কথা অমান্য করিয়া পিতৃ-স্মৃতির অমর্যাদা করিতে কুণ্ঠিত হও নাই।

যে আমার পিতাকে অবমাননা করে তাহার সহিত আমি সম্পর্ক রাখিব না,—আমার এ কর্তব্য কঠোর হইলেও আমি পালন করিব। তোমার অগ্রবস্ত্রের অভাব দূর করিব, কিন্তু তোমাকে আমা হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

“আর মনে রাখিও যে, পিতার যে অতিপ্রায় রক্ষা করিতে আমার সমস্ত প্রবৃত্তি আমি অকাতরে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি, আমার প্রাণ থাকিতে তাহা লজ্জিত হইতে দিব না। গোপীনাথের প্রেতাত্মা নরকে বসিয়াও আমার পিতার স্বর্ণময় আত্মাকে উপহাস করিবে, এ আমি সহ করিব না—খুন করিতে হইলেও না।

‘যদি হীন ইচ্ছা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা না থাকে তবে মৃত্যু বরণ বাছনীয়’—

দাদার চিঠি হুলালীর হৃদয়ে বজ্রের মত বাজিল।

সে কি করিয়াছে যে, তাহাকে এইরূপ লজ্জাকর অভিযোগ সহ্য করিতে হইবে?

বীরেনের নিবেদনের পরে বিপিনের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। কেবল এক বার বিপিনের যখন ঘোরতর অরবিকার হয় তখন পাড়ার সকলের সঙ্গে হুলালীও তাহাকে দেখিতে যায়। সংজ্ঞা থাকিলে বিপিন যন্ত্রণায় চটকট করিত, কাহারও ঔষধ খাইত না, কিন্তু হুলালী ঔষধ দিলে আপত্তি করিত না। সংসারের সহনশীলতার অনভিজ্ঞা হুলালী জানিত না যে, লোকস্বখে পীড়িতের সেবা কতদূর পল্লবিত হইয়াছে।

হুলালী ভাবিতে লাগিল, পীড়িতের সেবা করিয়া সে ত কোন অপরাধ করে নাই। বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গী বিপিনের করুণাপন্ন অবস্থায় তাহার যন্ত্রণার লাঘব করা কি কর্তব্য কথা? বিপিনকে ত সে অগ্র চোখে দেখে নাই।

তাহার দেহের বিকলতার সকলের করুণা-দৃষ্টি অরণ করিয়া বিপিন যখন দীন সঙ্কুচিত ভাব ধারণ করিত, তখন বালিকার হৃদয়ের দয়া শত ধারায় তাহার নীরব বেদনার আলা উপশম করিত বটে, কিন্তু সে ত মানবের প্রতি মানবের কর্তব্য।

এই সুন্দর পৃথিবীতে যে কেবল প্রয়োজনের অধীন হইয়া সর্বদা আত্মপরপ্রভেদের স্পষ্ট ব্যবধান রচনা করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হুলালী বুঝিতে পারে নাই। দুঃখতাপদম্ব মানবমাত্রকে সে তাহার রমণী-হৃদয়ের দয়ার উচ্ছ্বাসে সাস্থনা মাত্র দিতে চাহিয়াছে, কিন্তু লোকে অতরূপ বুঝিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়াছে।

হুলালীর অত্যন্ত ক্ষোভ এই হইল যে, পৃথিবীতে সকল কার্যে গণনাই তার লাভ হইল। সমস্ত আত্মীয় বন্ধুকে সে আকুল উৎসাহে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু তাহার ভাল বাসাজনিত ক্রটিটুকুও কেহ মার্জনা করে নাই। হুলালীর নিজের প্রাণ পরিচিত বন্ধু সকলের ভালবাসা তিক্ত করিত। কাহাকেও ক্ষুণ্ণ বা বিগ্ন দেখিলে তাহার হৃদয়ের করুণা তাহার দিকে উদ্ভূত হইয়া উঠিত। তাই

বিকলাঙ্গ বিপিনের প্রতি সে মেহ-করণ ব্যবহার করিত ।

বীরেন আরও লিখিরাছিল যে, আগামী ভাদ্র মাসে পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ-তিথিতে সে পুনরায় পৈতৃক আবাসে প্রবেশ করিবে । সেখানে হুলালী উপস্থিত থাকিলে তাহার পিতৃকৃত্য পণ্ড হইবে । সে যেন বুঝিয়া কায করে ।

পিতার স্মৃতি যে তাহার কাছে কি দেবত্বমণ্ডিত তাহা সে বাহিরে কি করিয়া দেখাইবে ! আশ্রয়বিহীন বালিকার যে প্রধান আশ্রয় সে-ই তাহাকে একরূপ নির্মম ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতেছে । তবে এখন সকল আলার অবসান মৃত্যু বাতীত তাহার আশ্রয় কোথায় !

কিন্তু তাহার বান্ধবকুল আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তাহার দুঃখিনীর মত প্রতিবাসীর অস্বাচিত করুণার পথে দাঁড়াইতে হইবে না । এমন দিনটি সে ত না দোঁষিয়া যাইতে পারিবে না !—হুলালী স্থির করিল যে, সে দূরে থাকিয়া তাহাদের পৈতৃক ভিটায় আবার তাহাদের বংশের প্রবেশ দেখিবে, তারপর মৃত্যুর পরপারে আশ্রয়ের জন্ত অনুসন্ধান করিবে ।

৮

কয় মাস কটিয়া গেল । আজ বীরেন আসিয়া পৈতৃক আবাসে পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতেছে । অসম্ভাবিত কল্প সাধনার বলে বীরেন যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে বাস্তবিকই সে অতি মহৎ । দৃঢ় অবিচলিত প্রতিষ্ঠায় পৈতৃক তদ্রাসন পুনরুদ্ধার করিয়া সে আজ পিতার মুখোজ্জলকারী অনুসন্ধান, আজ সে হুলালীর নিশ্চেষ্টতার ঘৃণা কাটতে পারে । তাই আজ বীরেনের বিগত নিষ্ঠুর ব্যবহার-গুলির স্মৃতি স্বাভাবিক হুলালীর হৃদয়ে ক্ষণ হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি বিরূপতা কমিয়া গিয়াছে ।

তথাপি হুলালীর এক অভিমান পূর্ণ কাণ্ড থাকিয়া তাহাকে মানসিক শাস্তি দিতেছে না । অদূরে তাহার পৈতৃক বাসস্থানে শ্রাদ্ধ বাসরে কত লোক বাতায়ত

করিতেছে । আজ নিতান্ত যে পর সেও তাহার পৈতৃক বাড়ীতে গিয়া তারানাথের উপযুক্ত পুত্রের সফলতায় সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে । কিন্তু সে সেই তারানাথের কণ্ঠা বীরেনের সহোদরা, তাহাকে কেহ মেহের আহ্বানে সে গৃহে ডাকিতেছে না, অদূরে পিতৃহত্যার আনন্দের বাটীতে থাকিয়া আজ সে এই ব্যাপারের দর্শক মাত্র ! তাই আকাশের ধ্বংস মেঘগুলির মত নৈরাশ্র ও বান্ধবহীনতার ভরে তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল ।

বিকাল বেলায় দিঘাগুল আরও মেঘাচ্ছন্ন হইল । মাঝে এক একটা বাতাস শেঁ শেঁ শব্দ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল । পরক্ষণে নিস্তব্ধতার মধ্যে বৃক্ষশ্রেণীর উপরে পক্ষীকুল উড়িতে ছিল ।

দেখিতে দেখিতে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল । জীব জন্ত যে বাহার আশ্রয় স্থানে ফিরিয়া যাইতে লাগিল । কিন্তু কি এক দুর্দ্দমনীয় মনোবেগ হুলালীকে এই অবসরে তাহার পৈতৃক আবাসের দিকে লইয়া চলিল ।

মাত্র দুই খানা খড়ের ঘর তোলা হইয়াছে, তাহারও এক খানিতে বেড়া দেওয়া হয় নাই ।

বাড়ীর দরজায় বকুল গাছের তলায় দাঁড়াইয়া হুলালী দেখিল যে, অপর গৃহের বারান্দার বাঁশের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া বীরেন কি চিন্তা করিতেছে । আকাশের অবস্থা দেখিয়া চাকরেরা সব স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গিয়াছে ।

বাড়ীর দ্বারদেশে ভগ্না, নিকটে গৃহমধ্যে ভ্রাতা । প্রকৃতরূপে এই দুর্বোধ্য জ্ঞান প্রাণীর আর সাড়া নাই, কেবল অবিশ্রান্ত রুষ্টি-পতন, আর মধ্যে মধ্যে বাতাসের শব্দ । কিন্তু এই দুটি নিকটাত্মীয় মানবসত্ত্বানের মধ্যে মানবসমাজ যে ব্যবধান স্থাপিত করিয়াছে, তাহার দুই প্রান্তে ভ্রাতা ও ভগিনী—শত শৈশব স্মৃতি হুলালীর মনে পড়িতে লাগিল ।

মনে পড়িল, তাহার ঝাকড়া চুলগুলি লইয়া সকলে কত উপহাস করত, মনে পড়িল, বাড়ীর সকলে তাহাকে বোকা বলিলেও তাহার বাপ তাহার

চালাক মেয়েটির পক্ষ লইতেন ; আরও মনে পড়িল যে, এক দিন দাদা বীরেন তাহার পূজার মেলা হইতে ছুলালীর জন্ত একটা পুতুল কিনিয়া আনিয়াছিল, সেটা লইয়া বিপিনের জন্ত ভ্রাতা ভগিনীতে কি ঝগড়া হইয়াছিল। তারপর সুখ-স্বস্তি মুছিয়া গিয়া আবার সে বর্তমান অবস্থার বিবাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিল।

ছুলালী এক বার ভাবিল সে গিয়া দাদার পায়ে ধরিয়া কমা ভিক্ষা করিয়া সমস্ত বুঝাইয়া বলিবে। হঠাৎ দেখিল যে, তাহার পায়ের কাছে গাছের তলায় জল আসিয়াছে। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বৃষ্টির ধারাগুলি আরও ঘন হইয়া পড়িতেছে। দ্রব্য চমকিত হইয়া বিদ্যাতালোকে ছুলালী দেখিল মাঠের মাঝ বৃষ্টির জলে ভরিয়া গিয়াছে। এই জল পার হইয়া রাস্তা দিয়া আনন্দের বাড়ী যাইতে তাহার ভরসা হইল না।

বাতাস এখন আর দম্কা হাওয়ায় আসিতেছিল না। রীতিমত ঝড় বেগে শেঁ। শেঁ। শব্দে একটানা বহিতেছিল। ঘন ঘন মেঘগজ্জনের সহিত বিদ্যুৎ চমকিতে ছিল।

ছুলালীর পদতল জলে ডুবিয়া গেল।

ছুলালী ভয়ে ভয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, প্রাঙ্গণ জলে পরিপূর্ণ। যে ঘরখানিতে বেড়া নাই সে উঠিয়া দেই ঘরে পাড়াইল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল, বায়ুর বেগ বৃদ্ধি পাইল, বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের প্রবল ঝাপটা ঘরখানিকে কাঁপাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। জলরাশি চক্ষুর পলকে বৃদ্ধি পাইয়া ঘরের অনতিউচ্চ ভিটার উপরে উঠিল।

অপর গৃহে বীরেন কি করে দেখা যাইতেছিল না। ছুলালী ভীত চিত্তে ভাবিল, বৃষ্টির এত জল! বাহিরের দিকে তাকাইলে অবিশ্রান্ত বিদ্যাতালোকে বোধ হইল প্রাঙ্গণ, দ্বারদেশস্থ রাস্তা, পুকুর, মাঠ, বড় রাস্তা সমস্তই জলে ভাসিয়া গিয়াছে। ছুলালী ভাবিল, এ বৃষ্টির জল, না বানের জল? তখনই বৃষ্টি-বাতাসের শব্দে মিলিত বিপন্ন জীব-সংঘের আর্ত কলরোল তাহার সন্দেহ বুচাইয়া দিল।

২

একটা মেঘগজ্জন গুরু গভীর উঠিয়া যেন ভীষণ শব্দে আকাশ ফাটাইয়া দিল। ছুলালী আপনাব্য অজ্ঞাতসারে ডাকিয়া উঠিল, “দাদা!” সহসা প্রাঙ্গণে জলমধ্য হইতে কে ডাকিয়া বলিল, “ভয় নাই ছুলালী!” ছুলালী দেখিল দাদা। সেই প্রকৃতির সংহার-লীলার অভিনয়ের মধ্যে ভাই বোন হাত ধরা ধরি করিয়া পুনবায় দক্ষিণের গৃহে ফিরিয়া গেল।

ঘরের মেঝেতে জল। “তক্তপোষের উপর বস” বলিয়া বীরেন ঝড়ের সঙ্গে যুঝিয়া, দরজা আটিতে লাগিল। ছুলালী বলিল, “দাদা, এ তক্তপোষও ডুবিয়া গেল।”

বীরেন দেখিল, দরজা বন্ধ করা বুধা। দুই জনে ধরিয়া গৃহস্থ অপর তক্তপোষখানি ঞ খানির উপরে রাখিল। উঠিয়া বসিতে বসিতে সে খানিও ডুবিয়া যায়! ছুলালী বলিল ‘চাল কাটিয়া না ফেলিলে যে দাদা জলে বন্ধ হইয়া মরিব।’

বীরেন বলিল, “আমি থাকিতে কিছু ভয় নাই।” বীরেন চালের বাঁশ ধরিয়া উঠিয়া যেখানে তিনখানি চালা একত্র হয় সেখানকার বন্ধন ছিঁড়িতে চেষ্টা করিল। ঝড়ের বেগে ঘরখানি ভয়ানক কাঁপিয়া উঠিল। বীরেন পড়িয়া গেল, ছুলালী কাঁদিয়া উঠিল। “ভয় নাই ছুলালী কিছুক্ষণ বাঁশ ধরিয়া ভাসিয়া থাক.” বলিয়া বীরেন আবার উঠিয়া কেমন করিয়া দুই তিনটা বাঁশ ছিঁড়িল। তারপর ছোট চালখানিতে উঠিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল। প্রচণ্ড বেগে ঝড়া বহিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল ভাই ভগ্নী ধরাধরি করিয়া একখানি চালার উপর বসিয়া আছে, চালা জল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে।

উপরে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি, ঝড়ের প্রচণ্ড বেগে বাহিত হইয়া বৃষ্টিবিন্দুগুলি বড় বড় শিলাধণ্ডের ভায় পৃষ্ঠে পড়িতেছে, চারিদিকে বিপন্ন জীবের মৃত্যু-আর্তনাদ। প্রকৃতির রুদ্র শক্তিগুলির এই প্রচণ্ড আহবের সম্মুখে ভাইভগিনীর পরস্পর বিরূপতা অতলে লুপ্তায়িত হইল। সংসারও সমাজের অস্তিত্ব ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিয়ম-

বন্ধনছিন্ন প্রকৃতির প্রলয়ক্ষেত্রে ভ্রাতাভগিনী পরস্পরকে ফিরিয়া পাইয়াছে ।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল তাহার নিশ্চয় নাই, কোথায় যাইতেছে বা চারিদিকে কি হইতেছে তাহা ভাবিবার অবসর নাই, ভ্রাতা ভগিনীকে লইয়া চালাখানি বারিবক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছে । দূর হইতে কে ডাকিয়া বলিল, “এ-এ-এই চালের উপরের মানুষ. কোন গাছের ডাল ধর—নদী সামনে ।”

বীরেন চারিদিকের অন্ধকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল । হঠাৎ পাতার মত একটা কি পিঠে লাগিল । বীরেন হাতে সাঁপটীয়া ধরিল, কিন্তু একখানি নারিকেলের শুষ্ক শাখা হাতে আসিল. আশ্রয় মিলিল না । গতিবেগ হইতে বীরেন বুঝিল, তাহার। নদীপ্রান্তে নামিয়াছে, শীঘ্র কিছুতে না বাধিলে আর নিস্তার নাই,—একেবারে সাগরমুখে যাইয়া পড়িতে হইবে ।

সহসা সম্মুখে পুঞ্জীভূত একরাশি অন্ধকার দেখা গেল । বীরেন ভাবিল, ইহাতে আবদ্ধ হইলে তাহার। রক্ষা পাইবে ; আর চালাখানি ঠিক ওদিকেই যাইতেছে । ছালালা কিন্তু এই অন্ধকারে ভয় পাইয়াছিল । দুই জনে একই সময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল. “এই বারে রক্ষা”—“এই বারে মৃত্যু !”

আকাশে তীব্র বিদ্যুৎ খেলিল । দেখা গেল. জন পরিপূর্ণ একখানি নোকা দাঁড় বাহিয়া আসিতেছে । ছালালা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, “নিশ্চয় বিপিনের নোকা, আমাদিগকে নিতে আসিয়াছে ; দাদা, ডাক ।” বীরেন বজ্র-মুষ্টিতে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “প্রাণ থাকিতে নয় ।”

ভীষণ শব্দে মেঘগর্জনের মধ্যে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, নোকারোহীণ সন্মুখস্থ চালাখানা দেখিল, কিন্তু তখন সময় নাই ! আরোহীরা চোঁচাইল, “সামাল, সামাল.” ছালালা চোঁচাইল, “মারা গেলাম, মারা গেলাম ।” চালাখানি নোকার তলে পড়িয়া গেল, সকলে হা হা করিয়া উঠিল এবং সকলে মিলিয়া এক জন

ধর্ম্মাকৃতি লোককে ধরিয়া রাখিল, ও অন্ধকারে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল । চালাখানি ভাঙিয়া গিয়া পশ্চাৎ দিকে আবার ভাসিয়া উঠিল । কিন্তু তখন তাহার উপরে কেহ নাই !

(১০)

নিশাপগমে জলরাশি কমিয়া গেল । দিবসাগমে পথ ঘাট শুষ্ক হইল । মৃতাবশিষ্ট জনগণ দেখিল, লোক পরিপূর্ণ সমৃদ্ধ জনপদ স্থান হইয়া গিয়াছে ! পুত্র, পক্ষী ও মানবের মৃতদেহ ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে । চালায় চড়িয়া অনেকে বাঁচিয়াছে । কতগুলি চালা জল কনি-বার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ শাখার উপর আশ্রয়্য ভাবে আবদ্ধ আছে । ছালালা ও বীরেনের মৃতদেহ পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া তাহাদের পৈতৃক বাড়ীর দ্বারদেশস্থ বৃক্ষের শাখার আটকাইয়া রহিয়াছে ।

মানবের কার্য্য-কৌশল ও সহনশীলতা আসিয়া স্বাস্থ্য-বিধান ও নবপল্লাসংগঠন করিতে লাগিল । প্রকৃতির স্বজন-শক্তি আবার হত-শ্রীর পুনর্গঠনে নিয়োজিত হইল । কিন্তু ভাবকের চক্ষে অনেক পুরাতন জিনিস আর ঠিক পূর্ব্বের মত হইল না ।

ভীষণ জলপ্লাবনের পরে সহর পূর্ব্বের মত বড় রহিল না । কিন্তু সেই জনপদে গেলে আজিও দেখা যাইবে যে, কুজ-দেহ করুণ মুখচ্ছবিসম্পন্ন এক বৃদ্ধ সারাহুয় পূর্ব্বের কি ঝুঁজিতে ঝুঁজিতে এক ছায়াশীতল বকুল তলে হুইটি মঠের পাদ-দেশে আসিয়া যেন বিশ্রাম লাভ করে ।

ত্রিবিংশতী সাত্তাল ।

গ্রন্থ সমালোচনা ।

“তর্কবিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্রসিংহ ত্রায়বাগীশ বি, এ, প্রণীত। আমাদের বিশ্বাস বঙ্গ ভাষায় তর্ক-বিজ্ঞানের প্রকাশ এই প্রথম। আমরা সেই জন্ত গ্রন্থখানি প্রায় আন্তোপাস্ত যত্ন সহকারে পাঠ করিলাম।

আমাদের মনে হয় যে, গ্রন্থকার যদি ইংরাজি চিন্তা ও পদ্ধতির এরূপ অনুবাদ না করিয়া ইংরাজি চিন্তা আমাদের দেশী ছাঁচে ঢালিতে চেষ্টা করিতেন এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় চিন্তার আরও সামঞ্জস্য বিধানে প্রয়াস পাইতেন তাহা হইলে গ্রন্থখানির উপযোগিতা বর্দ্ধিত হইতে পারিত।

গ্রন্থে Induction (ব্যাপ্তিগ্রহ) এর আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রয়োজনানুসারে তর্ক-গ্রন্থে আজ কাল induction এরই সমধিক আদর।

আমরা আরও লক্ষ্য করিতেছি, এই প্রকরণটি প্রায়শঃ ‘মিলের’ (Mill) সংক্ষিপ্ত কিন্তু অতি সুন্দর অনুবাদ স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। পরমর্ভী কার্জন ও ইংরাজ নৈয়ামিকগণের মত-সাহায্যে বিষয়টি আরও বিস্তৃত ও স্বাভাবিক ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা না করিলে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিবে।

পারিতোষিক শব্দ সম্বন্ধে সর্বত্র গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতের ঐক্য না থাকিলেও আমরা তাঁহার উত্তমের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। মোটের উপর তাহার পরিভাষা সংগ্রহ ও গঠন উত্তম হইয়াছে।

‘তর্কবিজ্ঞান’ নামটির প্রথমার্শ আধুনিক পাঠকের মনে বিষয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা আনয়ন করিতে পারে। ‘তর্ক’ শব্দের প্রয়োগ ও ব্যাপ্তিগ্রহ শব্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাতে বর্তমান বঙ্গভাষাভ্যাস পাঠক মনে করিতে পারেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানালোচনার প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞানের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা এই গ্রন্থে যথোচিত স্বীকৃত হয় নাই।

গ্রন্থকারের Deduction অর্থে ‘অনুমান’ শব্দের ব্যবহার সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

Uniformity of Nature এর পরিভাষা “প্রকৃতির একরূপতা” আমাদের নিকট ভাল বোধ হইল না। Uniformity of Nature বলিলে আমরা বুঝি যে, অবস্থার সমষ্টি একরূপ থাকিলে প্রকৃতি একই ভাবে কার্য্য করিবে। প্রকৃতির একরূপতার অর্থও কি এই? “একরূপতা” বলিলে আমরা Identity, sameness বুঝি।

গ্রন্থের প্রথমার্শে সংস্কৃত ত্রায়বাদের গ্রন্থপাঠের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের ভাষা সাধারণতঃ সহজবোধ্য ও সুলিখিত। তবে স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ততা নিবন্ধন প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কষ্টবোধ্য হইবে।

গ্রন্থখানি আধুনিক ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকের উপযোগী করিতে হইলে ‘তর্ক’ ‘অনুমান’ ‘সিদ্ধান্ত’ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দব্যবহারে বঙ্গভাষার প্রচলিত শব্দার্থের সহিত আরও মিল রাখিতে হইবে।

‘Syllogism’ এর পরিচ্ছদ পড়িয়া আমরা প্রীত হইলাম। এ বিষয়ে যা কিছু বলিবার আছে গ্রন্থকার প্রাঙ্গল ভাষায় তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

পুস্তকখানি পড়িয়া মোটের উপর আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। পুস্তকখানি যে আমাদের ছাত্র দিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ও উপযোগী হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই; আশাকরি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার যথোচিত পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি করিবেন।

২। কুলবোধিনী—প্রথম ভাগ, শ্রীকামিনী

কুমার ঘটক কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত, মূল্য ১০/০ ছয় আনা। আকারে ৬৬ পৃষ্ঠা মাত্র। কাগজ ভাল; ছাপা কদর্য। পুস্তকখানির মূল্য অনেক বেশী বলিয়া বোধ হইতেছে।

কামিনী বাবু ঘটকের সম্মান বিলুপ্তির নিমিত্ত সমাজকে দোষী সাব্যস্ত করিতেছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার

এই “সওয়াল জবাব” আইন সঙ্গত মনে করি না। ফলতঃ ঘটকগণ এখন প্রায়শই অঘটন-ঘটন পরীক্ষা, নিত্যানবো-
ম্বিণী বুদ্ধির অন্তঃস্বামী প্রতিভার পরিচয়প্রদান, পক্ষান্তরে
ব্রাহ্মণ সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে অমনোযোগ প্রদর্শন
করিতেছেন বলিয়াই তাঁহাদিগের প্রচলিত ব্যবসারেরও
আজি এতাদৃশী অবনতি সংঘটিত হইতেছে! বাহা হউক
কুলজবর্গের অবজ্ঞাদর্শনে বাগিত হইয়া বংশাবলীর ধারা-
বাহিক তালিকা (Genealogical table) সংরক্ষণের এই
প্রয়াস সর্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রথম ভাগে কেবল
ঘটকবংশের বিবরণী প্রকাশে সংগ্রাহকের পক্ষে কিঞ্চিৎ
স্বার্থপরতা লক্ষিত হয় না কি? ভরসা করি, কামিনী
বাবু অধিকতর উদয় সহকারে অতি সম্ভব কুলীন ও
শ্রেণীয় প্রভৃতি সমুদয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বর্তমান সময়
পর্যন্ত বংশাবলী প্রকাশিত করিয়া ব্রাহ্মণ মাত্রেই ধন্য-
বাদ ভাজন হইবেন।

সদানন্দ।

৩। রাণী দুর্গাদেবী, কানীভূষণ মুখোপাধ্যায়
বিরচিত, কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, গুরুদাস
নাইত্রোই হইতে শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত,
মূল্য ৬০ আনা। বাণান সুন্দর, কাগজ ভাল, মুদ্রণ উত্তম।

মাইকেল প্রবর্তিত ছন্দের অমুকরণ সহজ নহে।
গ্রন্থকার এই অমুকরণে কৃতকার্য হইয়াছেন বলিতে
পারি না। বাক্য-বিজ্ঞান, ভাষা-মাধুর্য্য ও অলঙ্কার-সন্নি-
বেশ কোন কোন স্থলে পাঠকের চিত্ত বিনোদন করিতে
পারে। কিন্তু অনেক স্থলের রচনা পদ্ধতি সেকেলে।
উদারের সহিত অমুদারের একত্র সমাবেশ কোনও কোনও
স্থলে কাব্যের গুরুত্ব ও সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে। “কবি-
ত্বের” পাশে “ফোয়ারা” উঠিতেছে, “জুয়ারের ঢল ঢলায়”
“বিজলী চমক” পড়িয়াছে, সংসারে ‘সং’ দেখা দিয়াছে।
কাব্যে চলিত কথার সমাবেশ বড় সাবধানে করিতে হয়।
“একছত্রী” “হিংসুক” “নীরোগী” “প্রফুল্লিত” “শ্রোতঃ-

বেগ” রজনীর বিশেষণ রূপে “ছোয়াংগী” শব্দের প্রয়োগ
ব্যাকরণ ভ্রষ্ট। মুদ্রাকর প্রমাদও যথেষ্ট রহিয়াছে। দুই
একটি স্থলের ভাব সংগ্রহের জন্য গ্রন্থকার প্রাচীন
কবিগণের শরণ লইয়াছেন :—

(১) “কাটিয়া খনিব মাটি কে কোথায় ভবে
রত্ন তাজি চলি যায় মাটি মাখি গায়?”

(২) “ধরাতেলে অকলঙ্ক রাণী-মুখচন্দ্র,
আর নতে চাঁদ চির কলঙ্কী জগতে ;
তাই সে বদন চন্দ্র হেরি সৌধ তলে
কণেক লুকায় চাঁদ মেঘের আরাতে।”

“করর” “নিবেদর” প্রভৃতি অপপ্রচলিত প্রয়োগের
চড়াছড়ি কেন? গ্রন্থকারের চন্দ-জ্ঞান নাই বলিলেই
হয়।

৪। শ্যামলা সিন্ধু, শ্রীমতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কৃত, ঢাকা থানবার্ট নাইত্রোই হইতে শ্রী মদানচন্দ্র বসাক
কর্তৃক প্রকাশিত; আকার ডবল ক্রাউন, অষ্টাংশিত,
১৪০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। কাগজ উত্তম, সোনার রঙ্গের রেশমী
মলাট ও সোনার জলে নাম লেখা—এক কথায় গঠন
পারিপাট্য চমৎকার। গ্রীষ্ম কালির ছাপা, লাল রঙ্গের
বড়ার, কিন্তু শেষার্ধ্বে ছাপা প্রথমার্ধ্বে তায় সুন্দর হয়
নাই। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহো-
পাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়
ভূমিকার বৌদ্ধ ধর্ম্মের কয়েকটি তত্ত্বের আলোচনা
করিয়াছেন।

গ্রন্থখানিতে সর্বদাকলো এগারটি চিত্র ও কপিলাবস্তুর
একখান প্রাচীন মানচিত্র সংযোজিত হইয়াছে, তন্মধ্যে
তিন রঙ্গের ছবি চারিটি। প্রায়গুলিই বেশ মনোরম।
দুই একখানা ছবির পরিকল্পনায় শিল্প-সৌষ্ঠবের অভাব
পরিলক্ষিত হইল।

এখানি গ্রন্থকারের রচিত ভক্তি গ্রন্থাবলীর অন্ততম।
পুস্তকের ভাষা সরল। ধর্ম্মগ্রন্থ হইলেও ইহার একটা
ঐতিহাসিক বিশেষত্ব আছে। সুতরাং উপহাসের জন্য
এইরূপ পুস্তকের উপযোগিতা সন্দেহ মত-বৈধ নাই।

বৈশাখ ১৩১৯।

ভগবান বুদ্ধের জীবন-কাহিনী নিরুত্তি ও অহিংসার
পুণ্যস্পর্শ প্রতি হিন্দুগৃহকে কল্যাণময় করিবে।

গ্রন্থকার আমাদের বালকবর্গের সমুখে জীবনগঠনের
যে সুন্দর আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা সফল
হউক। আমরাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বালক বালিকা-
দিগকে বলি,—“স্বামীলো ভব ধর্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে
রতঃ।” এইরূপ গ্রন্থের প্রসার হইলে দেশের মঙ্গল
হইবে।

৫। বন তুলসী, শ্রীযুক্ত কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, বি. এ.
প্রণীত, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ১৯৩৩ চাটাজি
এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। আকার রয়েল বোডশাংশিত,
৪৭ পৃষ্ঠা; মূল্য ১/০ আনা। কাগজ উত্তম, ছাপা পরিপাটি।
সুন্দর রঙ্গিন মোটা কাগজের মলাট। লাল “রিসিফে”
নাম লেখা।

এখানি ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ। বনতুলসী পত্রে পত্রে
পবিত্রতার দিব্য গন্ধ লইয়া দেব-ভোগের যোগ্য হইয়াছে।

শান্তিময়।

স্মৃতি

তোমারি ও-স্মৃতি মনে পড়ে যবে

ভঁরে উঠে যেন প্রাণ।

তোমার আমার মাঝে কত দূর

তবু নহে ব্যবধান।

মনে পড়ে ক্ষণে স্মৃতির সে দিন,

পলকের মাঝে বরষা বিলীন

আগে সময় আজি রে সময় পাইয়া—

হয় না যে অবসান!

হৃদয়ের মাঝে যবে দেখা পাই,
মনে হয় না ত তুমি কাছে নাই,
কভু দাও ধরা প্রেমের বাঁধনে
কভু কর অভিমান।

আকুল বোদন কাঁপায় সুদূর
ফিরে আসে যবে আমারি সে সুর—
মনে ভাবি সুধু চির মিলনের
তোমারি এ প্রতিদান।

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

দীর্ঘ জীবনের রহস্য

আহারের দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করিতেছি টহাই
আমরা ক্রম সত্য বলিয়া এ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিয়াছি।
কিন্তু সম্প্রতি ফরাসি বৈজ্ঞানিক মেক্সিকফ প্রচার করিয়া-
ছেন যে, এই আহারেই আমাদের জীবন নাশের বীজ
নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার মতে অগ্রে আহাৰ্য্যের পচন
ক্রিয়া হইতে এক প্রকার কীটাত্মক উদ্ভব হয়, এই কীটাত্মক
হইতে আবার এক প্রকার বিষের উৎপত্তি হইয়া থাকে।
এই বিষের দ্বারা জর্জরিত হইয়াই আমাদের অকাল বার্কক্য
উপস্থিত হয়। ইহা যথার্থ হইলে রাবণের মৃত্যু-বাণ যেমন
তাঁহার নিজেরই ঘরে ছিল তদ্রূপ আমাদের মৃত্যুর কারণও
আমাদের নিজ দেহমাত্রেই বর্তমান আছে বলিতে হইবে।
যাণ্ড দ্রব্য অল্পে যত বেশী কাল বদ্ধ থাকে ততই তাহা
অধিক পচিয়া যায়, এবং ততই তাহা হইতে অধিক
কীটাত্মক জন্মিয়া বিষ উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহাতে
নানা প্রকারের ব্যাধি জন্মিবার যেমন আশঙ্কা অকাল
বার্ককোর আক্রমণেরও তেমনই আশঙ্কা। সুতরাং
বুঝিতে পারা যায় যে, অল্প যত দীর্ঘ হইবে মগও তত দীর্ঘ

কাল তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। অতএব ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, অল্প বয়সে সংক্লিষ্ট হইবে বার্ক্যা-চিহ্নও ততই কম হইবে।

যদি আমরা একটি বৃদ্ধ স্ত্রীপায়ী জীবকে একটি বৃদ্ধ পাখীর সহিত তুলনা করিয়া দেখি, তবে আমরা ইহাদের বাহ্য আকৃতির পার্থক্য দেখিয়া বিস্মিত হইব। কুংসিং-আকৃতি, অলসগতি, ক্ষয় প্রাপ্তদন্ত, শরীরের স্থলবিশেষের পলিত অশুষ্ক রোম প্রভৃতি দ্বারা আমরা একটি কুকুরকে অনায়াসেই বৃদ্ধ বলিয়া বুঝিতে পারি। একটি ১২ কি ১৫ বৎসরের কুকুরে অতি সুস্পষ্টভাবে পূর্ণোক্ত জরালক্ষণ সকল দেখা দেয়। কিন্তু পক্ষীসকল স্ত্রীপায়ী দিগের অপেক্ষা ভালরূপে ও বহু কাল আপনাদের বয়স রক্ষা করিয়া থাকে। একটি হাঁস বিশ বছরের হইলেও উহার গতি দ্রুত থাকে এবং বাহ্যতঃ ইহার বার্ক্যের কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ততো ও টিয়া পাখী বহু কাল যৌবন রক্ষা করিয়া থাকে।

অধ্যাপক মেক্সিকফ একটি টিয়া পাখী পুষ্টিতেছেন; বিধস্ত যত্নে জানা গিয়াছে যে, ইহার ৭০ কি ৭৫ বৎসর বয়স হইবে। কিন্তু ইহার অরুত একরূপই স্বাভাবিক, ও ইহার গতি একরূপই অনায়াসসাধ্য যে, ইহাকে একরূপ বর্ষীয়ান বলিয়া মনে করা সম্ভবপর নহে। যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল তাহাতে এই সাধারণ নিয়মেরই সমর্থন হয় যে, পক্ষীসকল অধিকাংশ স্ত্রীপায়ী অপেক্ষাই অত্যধিক দীর্ঘজীবী। কারণ পক্ষী দিগের অন্ত্রে স্ত্রীপায়ী দিগের অল্প অপেক্ষা অনেক কম কীটাণু জন্মিয়া থাকে।

স্ত্রীপায়ীদিগের বৃহৎ অস্ত্রে মল সঞ্চয়ের প্রশস্ত আধার থাকায় তাহাতে সর্বপ্রকার কীটাণু প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পক্ষীদিগের তাদৃশ বৃহৎ অস্ত্র না থাকায় একরূপ কীটাণু জন্মিবারও কারণ নাই। অতএব ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, একরূপ অবস্থায় অল্প হইতে যে বিধ সজাত হয় তাহা ইন্দুর বা অপর প্রাণী অপেক্ষা পক্ষী জাতিতে কম হইবে। তাহাতেই আমরা দেখি যে, ইন্দুর

যে স্থলে কয়েক বৎসর পরেই বৃদ্ধ হইয়া পরে এবং উর্দ্ধ পক্ষে কদাচিৎ পাঁচ বৎসর বাঁচিয়া থাকে কেনেবী (canary) পক্ষী এতদপেক্ষায় অনেক অধিক কাল সবল থাকে এবং ১৫২০ বৎসর পর্যন্ত আয়ু পাইয়া থাকে।

অমৃত্যুপাশীল মেরুদণ্ডী জন্তু সকল—যেমন কচ্ছপ কুম্ভীর প্রভৃতি—কোন বিশিষ্ট বার্ক্যা-লক্ষণ প্রকাশ না করিয়াও সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকে। ইহাদের অতিরিক্ত মাত্রায় দৈহিক তাপ সংরক্ষণ প্রয়োজন নহে বলিয়া ইহারা অল্প মাত্রায় খাদ্য গ্রহণ করে, সুতরাং তাহা সংগ্রহ করিতেও ইহাদের অধিক শক্তি ব্যয় করিতে হয় না। যদিও কচ্ছপ কুম্ভীর প্রভৃতির জীবন এবং পক্ষী জীবনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান তথাপি ইহাদের মধ্যে এই বিষয়টি সাধারণ যে, ইহাদের মধ্যে বৃহৎ অল্প অতি সামান্য মাত্র বিকশিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের অল্প কীটাণুও স্বল্প পরিমাণ।

জরা ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মেক্সিকফ ঘোলের বহুল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্প্রতি পাশ্চাত্য জগতে এই সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলনই চলিতেছে অধ্যাপক মেক্সিকফ জরা-ব্যাধির কারণ নির্ণয় ও তাহার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে আমরা এই কয়েকটি কথাই বিশেষরূপে লক্ষণীয় মনে করি। প্রথমতঃ পাকাশয়ে অধিক ক্ষণ মন বদ্ধ হইয়া থাকিলে তাহা হইতে ব্যানিকীট জন্মিয়া শরীর আক্রমণ করে। দ্বিতীয়তঃ পক্ষী প্রভৃতির অল্প ক্ষুদ্র বলিয়া মল বদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকতে উহার বৃহৎ অল্পবিশিষ্ট জন্তু হইতে অধিক দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ যাহাদের আহাৰের পরিমাণ কম তজ্জন্ম তাহাদের চেষ্ঠাও কম করিতে হয়, সুতরাং তাহাতে শক্তি হ্রাস কম হয় বলিয়া এবং অন্নাহার হেতু কীটাণুর উৎপত্তিও কম হয় বলিয়া ইহাদেরও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ অল্প কীটাণুই জরা ব্যাধির বীজ বলিয়া এই কীটাণুর ধ্বংসেই জরা ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল হইতে পারে। তজ্জন্ম বা ঘোলই সেই কীটাণু-বিধ্বংসী মহৌষধ।

এই পাশ্চাত্য দীর্ঘ জীবন-রহস্য যে হিন্দুদিগের একে-বারে অজ্ঞাত ছিল তাহা আমাদের নিকট বোধ হয় না। প্রথমতঃ বন্ধ মল হইতে রোগোৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের একটি পন্থিকার ক্ষিই প্রচলিত দেখিতে পাই। যথা—“জায়ন্তে বিবিধা রোগঃ প্রারম্ভঃ মল-সঞ্চয়াৎ”। দ্বিতীয়তঃ পক্ষীজাতি দীর্ঘজীবী বলিয়া যে হিন্দুগণ প্রমাণ পাইয়াছিলেন কাকের চিরজীবী নামেই যেন আমরা তাহার স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হই। যোগেতে নিরাহারে থাকিবার যে নিয়ম ঋতু-বর্জন দ্বারা পাকাশয়ের বিষ-সঞ্চয়ের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি করাই তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং যোগিগণ যে এই উপায়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হইতে পারিবেন তাহা সম্ভবপর বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। চতুর্থতঃ তক্র বা ঘোলের সমস্ত গুণ আয়ুর্বেদে বর্ণিত আছে। তাহাতে ইহাকে যেমন বিবিধ রোগসংহারক বলিয়া জানা যায় তেমনই কুমিল্ল বলিয়াও জানা যায়, যথা—“তন্তুহন্তি গরুড়দ্বিপ্রসেক বিষমজ্বরান্। পাণ্ডুমেদো গ্রহণ্যর্শো মূত্রগ্রহভগন্দরান্। মেহং গুল্মমণ্ডীসারং শূল-দ্রৌহোদরাক্রমীঃ। শিথ্র কোষ্ঠদুঃখাধীন কুষ্ঠশোথতৃশা-ক্ৰমী” ॥ ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতো ভাবপ্রকাশঃ ॥ শব্দ কল্পদ্রুমে কাট ‘কুমিজাতি’ বলিয়াই অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং ঘোলকে কুমিল্ল বলাতে তাহা যে কাটাগুণও নশক তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। বিশেষতঃ ঘোলের রোগনাশক শক্তিপ্রসঙ্গে যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা আমাদের পূর্ণোক্ত কথাকে বিশেষ রূপেই সমর্থন করে—যথা, “ন তক্র-সেবা ব্যথতে কদা চরতক্রদ্রব্যঃ প্রভ-বন্তি রোগা। ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতো ভাবপ্রকাশঃ। ‘তক্রসেবা কখনও কষ্ট পায় না। এবং রোগ সকল তদ্বারা তন্মাত্ত হইয়া প্রবল হইতে পারে না।’ এখানে রোগ-বাজাণু সকল তক্রদ্বারা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াতেই যে রোগের আক্রমণ হইতে পারে না, তাহাই কি পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না? আয়ুর্বেদ তক্রের বাহমা এই পথ্যস্ত কীটন কারিয়াই কাজ হয় নাই, পরন্তু ইহাতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র

এরূপই সঞ্জীবনী শক্তি দেখিতে পাইয়াছে যে, ইহাকে অগ্নিমান্দ্য অরুচি প্রভৃতি পাচাশয় সম্বন্ধীয় রোগে অমৃত-কল্প বলিয়া বর্ণিত করিয়াছে—যথা “শীতকালে ইগ্নিমান্দ্যে তথাবাতাময়েষুচ। অরুচৌ শ্রোতনাং রোধে তক্রং স্রাদ্ধতোপম” ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতো ভাবপ্রকাশঃ।

এই প্রকারে তক্রকে সর্বরোগের ধ্বংসের মূলীভূত জানিয়া হিন্দুর চিকিৎসা বিজ্ঞান ইহাকে মুক্তকণ্ঠে পৃথিবীতে মনুষ্যের “অমৃত” বলিয়া আখ্যাত করিয়াছে যথা—“সুরাণা-মমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভূবিতক্রমাতঃ ॥” ইতি শব্দ-কল্পদ্রুমধৃতো ভাবপ্রকাশঃ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বাজাণুনাশের পরীক্ষাদ্বারা ইহা যেমন ঘোল দীর্ঘ জীবনের কারণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তক্রপ হিন্দু বিজ্ঞানেও কুমিনাশের পরীক্ষা দ্বারা ইহা জীবনের পক্ষে অমৃত বলিয়া বিবেচিত হওয়া অসম্ভব নহে। হিন্দুগণ জীবন-রক্ষার পক্ষে যেমন ঘোলের উপযোগিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন তেমনই ইহার সাধ-ঘূতেরও উপযোগিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের ‘আয়ুর্ভূতম্’ এই প্রসিদ্ধ বাক্যে ঘৃত জীবন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহারা যেমন বিশেষ ঔষে ঘোল ও ঘূতের আয়ুষ্কর গুণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তেমনই সাধারণ ভাবে সমস্ত গব্যকেই আয়ুষ্ক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহাতেই যেখানে এই সমস্ত উপ-করণের অভাব তাহা নিকট বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—“গবাহীনং কুভোজনম্ ॥” ইহা হইতে ঘোলে রোগ কীটনাশক শক্তি আছে অপর সমস্ত গব্যেরও নুগ্রাহক মাত্রায় তক্রপ শক্তি আছে ইহা মনে করা বোধ হয় অসম্ভব হইবে না, এবং তাহাতেই “হবিষ্য আহার” বিশেষরূপে সাত্বিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ইহা বলাও অসম্ভব হইবে না।

শ্রীশান্তলচন্দ্র চক্রবর্তী।

প্রতিভা

২য় বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

২য় সংখ্যা।

সন্ন্যাসী।

১

আমার, সংসারেতে নাই আসক্তি,
প্রাণে কেবল সেবা ভক্তি,
জীবনে আর নাই বাসনা
কেবল, চরণ সেবার অভিলাষী,
আমি সন্ন্যাসী!

২

আমার, আছে বটে পুত্র দারা,
আমি তাদের মায়া ছাড়া,
ধাক্ক শত ভাই ভগিনী
ধাক্ক না মাসী!
আমি একজন কর্ণ দাতা,
কেটে দেই যে ছেলের মাথা,
আশায় এসে নিরাশ হয় না,
কেহ আমার বাড়ী আসি!
আমি সন্ন্যাসী!

৩

আমার বাড়ীর অতিথানা,
বিশ্ব ব্যক্ত—জগৎ জানা,
করে, নিত্য নিত্য আনাগোনা,
কত দেশের অধিবাসী,
তাদের, দিবে আমার গৃহ অন্ন,
জীবন করি সফল-ধন্য,
গাছ তলাতে রাত্ পোহাই, আর
হরিবাসর করি হাসি,
আমি সন্ন্যাসী!

৪

আমার, নাই প্রয়োজন সিংহাসনে,
নাই প্রয়োজন রাজ্য ধনে,
জটা বাকল সার করেছি,
অঙ্গে মাখি ভস্মরাশি,
আমার, কৃষি শিল্পে নাই যে মতি,
অপ্রীতি বানিজ্যের প্রতি,
কর্মহীন ধর্ম আমার,
চিৎ আনন্দে সদাভাসি!
আমি সন্ন্যাসী!

এই পাশ্চাত্য দীর্ঘ জীবন-রহস্য যে হিন্দুদিগের একে-
বারে অজ্ঞাত ছিল তাহা আমাদের নিকট বোধ হয় না।
প্রথমতঃ বন্ধ মল হইতে রোগোৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের একটি পন্থিকার প্রকৃতিই প্রচলিত
দেখিতে পাই। যথা “জায়ন্তে বিবিধা রোগাঃ প্রায়শঃ মল-
সঞ্চয়াৎ”। দ্বিতীয়তঃ পক্ষীজাতি দীর্ঘজীবী বলিয়া যে
হিন্দুগণ প্রমাণ পাইয়াছিলেন কাকের চিরজীবী নামেই
যেন আমরা তাহার স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হই। যোগেতে
নিরাহারে থাকিবার যে নিয়ম খাচ্চ-বর্জন দ্বারা পাকাশয়ের
বিষ সঞ্চারের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি করাই তাহার
উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং যোগিগণ
যে এই উপায়ে মূহ্যকরী হইতে পারিবেন তাহা
সম্ভবপর বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে।
চতুর্থতঃ তক্র বা ঘোলের সমস্ত গুণ আয়ুর্বেদে বর্ণিত
আছে। তাহাতে ইহাকে যেমন বিবিধ রোগসংহারক
বলিয়া জানা যায় তেমনই কুমির বলিয়াও জানা যায়, যথা
“তত্ত্বান্তি গরুড়দ্বিপ্রসেক বিষমজ্ঞরান্। পাণ্ডুমেদো
গ্রহণার্শো মূত্রগ্রহভগন্দরান্। মেহং গুল্মমণ্ডীসারং শূল-
প্লীহোদরারুচীঃ। ঋত্র কোষ্ঠধৃত্যাদীন কুষ্ঠশোথতৃষা-
ক্মান্ ॥” ইতি শব্দকল্পদ্রুমমুতো ভাবপ্রকাশঃ ॥ শব্দ
কল্পদ্রুমে কাট কুমিজাতি বলিয়াই অভিহিত হইয়াছে।
সুতরাং ঘোলকে কুমির বলাতে তাহা যে কাটাগুরও
নাশক তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। বিশেষতঃ
ঘোলের রোগনাশক শক্তিপ্রসঙ্গে ধেরূপ বর্ণনা পাওয়া
যায় তাহা আমাদের পুণ্যোক্ত কথাকে বিশেষ রূপেই সপ্রমাণ
করে—যথা, “ন তক্র-সেবা ব্যথতে কদা চন্নওক্রদক্কাঃ প্রভ-
বান্তি রোগা। ইতি শব্দকল্পদ্রুমমুতো ভাবপ্রকাশঃ।
“তক্রসেবা কখনও কষ্ট পাশ না। এবং রোগ সকল তদ্বারা
ভস্মভূত হইয়া প্রবল হইতে পারে না।” এখানে রোগ-
বাজাণু সকল তক্রদ্বারা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াতেই যে
রোগের আক্রমণ হইতে পারে না, তাহাই কি পারিষ্কার বুঝা
যাইতেছে না? আয়ুর্বেদ তক্রের সাহমা এই পদ্যান্ত কীর্তন
কার্য্যই ক্ষান্ত হয় নাই, পরন্তু ইহাতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র

এরূপই সম্ভাবনীয় শক্তি দেখিতে পাইয়াছে যে, ইহাকে
অগ্নিমান্দ্য অরুচি প্রভৃতি পাচায় সম্বন্ধীয় রোগে অমৃত-
কল্প বলিয়া বর্ণিত করিয়াছে—যথা “শীতকালে হৃদিমান্দ্যো
তথাবাতাময়েষুচ। অরুচৌ শ্রোতনাং রোধে তক্রং-
শ্রাদ্ধতোপম” ইতি শব্দকল্পদ্রুমমুতো ভাবপ্রকাশঃ।

এই প্রকারে তক্রকে সর্বরোগের ধ্বংসের মূলীভূত জানিয়া
হিন্দুর চিকিৎসা বিজ্ঞান ইহাকে মুক্তকণ্ঠে পৃথিবীতে
মনুষ্যের “অমৃত” বলিয়া আখ্যাত করিয়াছে যথা—“সুরাণা-
মমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভূবিতক্রমাহুঃ ॥” ইতি শব্দ-
কল্পদ্রুমমুতো ভাবপ্রকাশঃ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বীজাণুনাশের পরীক্ষাদ্বারাই যেমন
ঘোল দীর্ঘ জীবনের কারণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে
তক্রপ হিন্দু বিজ্ঞানেও কুমিনাশের পরীক্ষা দ্বারাই ইহা
জীবনের পক্ষে অমৃত বলিয়া বিবেচিত হওয়া অসম্ভব
নহে। হিন্দুগণ জীবন-রক্ষার পক্ষে যেমন ঘোলের
উপযোগিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন তেমনই ইহার
সার-স্বতেরও উপযোগিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাই
ঋগ্বেদের “আয়ুর্য়তন” এই প্রসিদ্ধ বাক্যে যুত জীবন বলিয়া
উক্ত হইয়াছে। ইহা যেমন বিশেষ ভাবে ঘোল ও
স্বতের আয়ুষ্কর গুণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তেমনই
সাধারণ ভাবে সমস্ত গব্যকেই আয়ুষ্কর বলিয়া বুঝিতে
পারিয়াছিলেন। তাহাতেই যেখানে এই সমস্ত উপ-
করণের অভাব তাহা নিকট বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।
যথা—“গব্যহীনং কুতোজনম্ ॥” ইহা হইতে ঘোলে
রোগ কীটাণুনাশক শক্তি আছে অপর সমস্ত গব্যেরও
নুত্বাধিক মাত্রায় তক্রপ শক্তি আছে ইহা মনে করা
বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না, এবং তাহাতেই “হবিষ্য
আহার” বিশেষরূপে সাধিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া
পাকে ইহা বলাও অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী।

প্রতিভা

২য় বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

২য় সংখ্যা।

সন্ন্যাসী।

১

আমার, সংসারেতে নাই আসক্তি,
প্রাণে কেবল সেবা ভক্তি,
জীবণে আর নাই বাসনা
কেবল, চরণ সেবার অভিলাষী,
আমি সন্ন্যাসী!

২

আমার, আছে বটে পুত্র দারা,
আমি তাদের মায়া ছাড়া,
থাকুক শত ভাই ভগিনী
থাকুক মা মাসী!
আমি একজন কর্ণ দাতা,
কেটে দেই যে ছেলের মাথা,
আশায় এসে নিরাশ হয় না,
কেহ আমার বাড়ী আসি!
আমি সন্ন্যাসী!

৩

আমার বাড়ীর অতিথানা,
বিশ্ব ব্যক্ত—জগৎ জানা,
করে, নিত্য নিত্য আনাগোনা,
কত দেশের অধিবাসী,
তাদের, দিয়ে আমার গৃহ অন্ন,
জীবন করি সফল-ধন,
গাছ ওলাতে রাত পোহাই, আর
হরিবাসর করি' হাসি,
আমি সন্ন্যাসী!

৪

আমার, নাই প্রয়োজন সিংহাসনে,
নাই প্রয়োজন রাজ্য ধনে,
জটা বাকল সার করেছি,
অঙ্গে মাখি শুশ্রূষাশি,
আমার, কৃষি শিল্পে নাই যে মতি,
অপ্রীতি বানিজ্যের প্রতি,
কণ্ঠহীন ধর্ম আমার,
চিৎ আনন্দে সদাতাসি!
আমি সন্ন্যাসী!

যে আমারে মার্কি জুতা,
মার্কি মোরে ঠেসা শুতা,
এলি আমার সহিষ্ণুতা,
তারেই আমি ভালবাসি.
এলি আমার শম দম,
ক্ষমা ধৈর্য্য এলি মন,
এক গালে মারিলে চাপড়
আরেক গাল ফিরায়ে হাসি !
আমি সন্ন্যাসী !

৬

আমি, বিষ্ণুচরণ ধরি মাঝে,
রসাতলে বাই নিপাতে,
গদাধরের পদ্মপাশে
লভি সজ মোক্ষ অবিনাশী.
আমি, গয়ের মত চিরন্তন,
তিন গুরুয়ের অনুরক্ত,
চরণ তলে শরণ নিছি
চরণ ছাড়লে মরণ বাসি !
আমি সন্ন্যাসী !

৭

নাইক আমার হিংসা, ক্রোধ,
নাইক স্ত্রী লজ্জা বোধ.
আমি, সেবার্ত্ত বিশ্বহৃত্ত
আমার বংশে জন্মে দাস দাসী.
শালগেরাম যে,
হাত পা শূন্য গোলগম্বুজা,
তারে করি সেবা পূজা,
জগত্তের, মুদ্ব জুতা ঝাড়্ব মূজা
কেবল, চরণ সেবার অভিলষী,
আমি সন্ন্যাসী !
ত্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস ।

বাক্সালা ও দ্রাবিড়ী ভাষা । *

লক্ষ্মায় রাবণের অশোক কাননে সীতাকে সর্বপ্রথম
দর্শন করিয়া মহাবীর হনুমান একদিন ভাবিয়াছিলেন,
“অহং হতিতমু শৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ ।
বাচং যোদাহরিষ্যামি মানুযীমিহ সংস্কৃতাম্ ।
যদি বাচং প্রদাত্তামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্ ।
রাবণং মন্ত্র্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি ॥
অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুযং বাক্যমর্থবৎ ।
ময়া সাঙ্ঘ্যিতুং শক্যা নাচথেষমনিন্দিতাঃ”

বাক্সীকীয় রামায়ণের এই তিনটি শ্লোকের অভ্যন্তরে
দুইটি তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে;—সেই দুইটি তত্ত্ব
জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব। যদি কেহ রামায়ণোক্ত ঘটনা
সমূহ কবিকল্পনাসম্মত অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া উপেক্ষা
করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অস্বতঃ এই অনুরোধটা
করিতে পারি যে, আদি কবি বাক্সীকীয় অভিপ্রায়টা
একবার বুঝিয়া দেখিলে ভাল হয় । হনুমান কোন
জাতির অন্তর্গত ছিলেন, আর্য্য না অনার্য্য, অথবা ইরাণীয়
বা তুরাণীয়, কিংবা হামাইত্ বা শামাইত্, আজিকার
মধ্যম আমার তাহা আলোচ্য নহে। আমি বাক্সালা ও
দ্রাবিড়ী ভাষার পরস্পর সম্বন্ধ সংক্ষেপে নির্ণীত করিতে
চেষ্টা করিব ।

হনুমানের উপরি-উদ্ধৃত বাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝা
যাইতেছে যে, সীতার ও হনুমানের এবং বাক্সগণের
ভাষা এক নহে । তাহাদের পরস্পরের ভাষা ভিন্ন,
আচার বিভিন্ন । হনুমানের তিনটি ভাষাতেই অভিজ্ঞতা
ছিল। তিনি অনার্য্যকুলসম্মত হইয়াও আর্য্যকুলললনা
সীতাকে সীতারই ভাষায় স্বীয় মনোভাব জানাইয়াছি-

* গতবর্ষে ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনে এই প্রবন্ধ
পঠিত হইয়াছিল। পাঠের দিবস হইতে নানা কারণে
এতদিন ইহা লেখকের করতলগত না হওয়াতে প্রকাশে
বিলম্ব হইল।—

লেন । হনুমান অনার্য্য, সূতরাং তাঁহার ভাষা ও অনার্য্য । ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কপি কুলের সেই অনার্য্য ভাষাকে দ্রাবিড় ভাষা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । এস্থলে তাঁহাদের সেই মত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে । এই দ্রাবিড় ভাষা কতদিনের আজিও তাহা অজ্ঞাতরূপে নির্ণীত হয় নাই । বিদ্যাগিরির দক্ষিণাংশ হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ এক সময়ে মোটামুটি দ্রাবিড় দেশ বলিয়া বর্ণিত হইত । রামায়ণ বর্ণিত দণ্ডকারণ্যের কিয়দংশ এবং জনস্থান ও পঞ্চবটী এই দেশের অন্তর্গত ছিল । বিদ্যাচলের দক্ষিণস্থ প্রদেশ সংস্কৃত গ্রন্থ সমুদয়ে দক্ষিণারণ্য বা দক্ষিণাপথ কিংবা দাক্ষিণাত্য দেশ নামে বর্ণিত হইয়া থাকে । এই সমগ্র দক্ষিণাপথট যে দ্রাবিড় দেশ তাহা কিছতেই অনাস্ত্র বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না । চিত্রপতিকরণ, মণি মেকলাই, পুরণাশ্লোক, মেন তামিল প্রভৃতি প্রাচীন তামিল গ্রন্থে দ্রাবিড় দেশ তামিলক নামে বর্ণিত হইয়াছে । বর্ত্তমান মান্দ্রাজের ১০০ মাইল উত্তরস্থিত ব্যাক্ট গিরিকে উক্ত গ্রন্থ সমূহের লেখকগণ তামিলক ভূমির উত্তর সীমা এবং কুমারিকা দক্ষিণসীমা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । কিন্তু এই সীমা অনাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না । কারণ ব্যাক্ট গিরিকে দ্রাবিড় দেশের সমোত্তর সীমা রূপে স্বীকার করিলে বৈষ্ণব দেশ তাহার বাহিরে যাইয়া পড়ে । কিন্তু বোধ হয় সকলেই জানেন বৈষ্ণব অর্থাৎ তেলুগু ভাষা দ্রাবিড়ী ভাষার একটী প্রধান শাখা । সে যাহা হউক, ভৌগোলিক সীমা লইয়া অধিক আলোচনা অনাবশ্যক ।

উত্তর ভারতের কয়েকজন সংস্কৃত বৈয়াকরণ ভারত বর্ষের অপভ্রাংশলিক দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । যথা পঞ্চ গোড়ী ও পঞ্চ দ্রাবিড়ী । কিন্তু তাঁহারা মহারাষ্ট্রী ও গুজরাতী ভাষাকে পঞ্চ দ্রাবিড়ের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া এক বিষয় গোলযোগের সূচনা করিয়াছেন । দ্রাবিড়ী ভাষার সহিত মরাঠী ও গুজরাতী ভাষার যে তিল মাত্র সম্পর্ক নাই, তাহা ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অবিদিত

নহে । প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে, তামিল, তেলুগু, মলয়ালম্, কর্ণাটী ও টুলু এই পাঁচটীই প্রধান পঞ্চ দ্রাবিড়ী ভাষারূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে । কেহ কেহ টুড়া, কোটা, গণ্ড ও কু এই চারিটী ভাষাকেও পঞ্চ দ্রাবিড়ে সংযুক্ত করিয়া সর্বসমেত নয়টী দ্রাবিড়ী ভাষার উল্লেখ করিয়া থাকেন । কিন্তু এ সম্বন্ধে সম্প্রদায় বিশেষ মতভেদ দেখা যায় । এক সময়ে দ্রাবিড়ী ভাষা উত্তর ভারতের সংস্কৃতজ পণ্ডিতগণের দারুণ অবজ্ঞারবিশয় বলিয়া উপেক্ষিত হইত । ইহাতে ট-বর্ণের বাহুল্য দর্শনে দংশ্ট্রা বিখ্যতি করিয়া তাঁহারা ইহাকে টান্দ্ৰা, ডান্দ্ৰা—টান্দ্ৰা ড় টান্দ্ৰা, অসম্ভবতা বলিয়া কতই অশাস্ত্র ভাবে শিষ্টাচারের প্রকাশ্য সীমা অতিক্রম করিতেন । তাঁহাদের সেই অজ্ঞায় উপেক্ষা ও অবহেলার কারণ কি তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে । যে অনার্য্য-বিদেশ আর্য্য ঋষি ও কবিগণের অস্বিমন্ত্র্যের সহিত বিকল্পিত ছিল ; বৈদিক কাল হইতে যুগযুগান্তর পরিবর্ত্তে দানব, দানব, দাক্ষস ও বাহুমানদিগের দূর ছায়া দর্শনেও যাহা বিস্ময় করিয়া উঠিত, দ্রাবিড়বংশে দৈত্যের কায়া ও মার্য্য নিপুণিত ভাবিয়া তাহা আর কিছুতেই প্রণয়িত হয় নাই । যেন সেই হীরণ্যাক ও হিরণ্যাকশিপু, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, দন্তবক ও শিশুপাল, কংস ও জরাসন্ধের প্রেতাঙ্ক্য কালের গভীর সন্নিহিত ভেদ করিয়া আবার শত শত শত বক্তবীজরূপে দ্রাবিড় দেশের সর্বত্র বিচরণ করিতেছে । তাই তাহাদের ভাষা ও ভাববিভবে এত স্বর্ণা ও বিদ্রোহ !

এক্ষণে এই প্রশ্ন উপস্থাপিত হইতে পারে যে, দ্রাবিড়ী ভাষা কতদিনের ?—উত্তরে বলা যাইতে পারে, দ্রাবিড় জাতি যত দিনের । ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে দ্রাবিড় জাতির উল্লেখ আছে ; তদ্ব্যবধান নহে যে জাতিকে পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া দৈত্যদানবের নাকারজনক নির্য্য নিধন হইতে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন ; মহাবীর মগরের কঠোর শাসন বাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত টিন-হুন দরাদ পারদদিগকে ভারত হইতে বিতারিত করিয়াছিলঃ—

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

ওরালেস, হিকেল, স্লেটার র‍্যাঞ্জন ওল্ডহেম প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহাসাগর গ্রন্থ লেমুরিয়ার ধুময়ী মূর্তি জগতের সমুখে স্থাপিত করিয়া আজিকার ছিন্নভিন্ন শতঃ যোজন দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত, দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকা, মদগাস্কার, সিংহল, বোর্নিয়ো, সুন্দ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপ সমূহকে এক স্ত্রে গ্রথিত করিয়া ত্রিবিড়, ত্রিমিল, ত্রিইড় (ত্রিমিল,) প্রভৃতির জীর্ণ চিত্র ইতিহাসের কাটদষ্ট পত্রে প্রকাশ করিতেছেন ; সে জ্ঞাত কত দিনের তাহা কে বলিতে পারে ? চিলদ্রাতি করণ, মণিমেকলাই প্রভৃতি প্রাচীন তামিল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, রাবণ স্বয়ং তামিল ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তৈলঙ্গ বা তেলুগু ভাষার প্রথম ব্যাকরণকর্তা মহর্ষি কথ্য বলেন, “ভগবান্ অঙ্কু বিষ্ণু নিমিত্ত দৈত্যের বধসাধন করিয়া আমাকে তৈলঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিতে বলিয়াছিলেন। সেই ভগবান্ বিষ্ণুরই আদেশে আমি এই অঙ্কু ব্যাকরণ রচনা করিয়াছি।” আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রকটিত করা অনাবশ্যক। উক্ত বাধ্যবাধার স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ত্রিবিড়ী ভাষা অতি প্রাচীন।

ত্রিবিড়ী ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার কোন্ কোন্ অংশে সাদৃশ্য আছে তাহা প্রদর্শন করা আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষার সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ আমি এক্ষণে সংক্ষেপে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। কতকগুলি কথা ত্রিবিড়ী ও বাঙ্গালা ভাষায় দেখা যায় ; নিম্নে তন্মধ্য হইতে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল :—

(ক) দাড়ি, দোপাড়ী, পড়ন (পতন) প্রভৃতি ।

(খ) কতকগুলি সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা শব্দের সহিত অতি সামান্য পার্থক্য দেখা যায় ; নিম্নে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে :—

বাঙ্গালা ।

ত্রিবিড়ী ।

আন্ন

মাঙ্গরম্

কষ্ট

কষ্টম্

কুমারী

কুমারিটি

তি

তিরি

বাঙ্গালা ।

দিন

দূর

নষ্ট

নিন্দা

নিশ্চয়

পেটিকা

পেটরা

পুত্রী

মঞ্জরী

মৎস্য

মৌন

মলয়

মহিমা

মাংস

মান

মাস

মিত্র

মুখ

মূঢ়

মূচ্ছা

মৃগ (জীব)

মেঘ

যথাধ

মৃগ

মৌন

যাচক

ভিক্ষা

শৌধ্য

ত্রিবিড়ী ।

দিনম্

দূরম্

নষ্টম্

নিন্দম্

নিশ্চয়ম্

পেটি

পুট্রী

মঞ্জরী

মচ ছম্

মৌনম্

মলয়

মহিমৈ

মাংসম্

মানম্

মাস

মিট্রক

মুখম্

মূঢ়ম্

মূচ্ছ

মিরুগম্

মেগম্

যথাধম্

মৃগম্

মৌনম্

যাচগম্

পিট্র

শৌরীয়ম্

ঐরূপ আরও অনেকগুলি কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু সমালোচ্য প্রবন্ধে তাহা নিম্নয়োজন। শব্দের সাহায্য ব্যতীত কোন কোন ক্রিয়ার সহিতও সামান্য মিল দেখা যায় ; যথা :—

| বাঙ্গালা | তামিল |
|--|------------|
| পড়িব | পড়িগ্নেন |
| পড়িয়াছি | পড়িগ্নেন |
| পড়িতে | পড়িক্ক |
| পড়িয়া | পড়িক্কম |
| (তুই) পড়্ | পাড় |
| (তুমি) পড় | পড়িয়ুগল্ |
| (আপনি) পড়ুন | পড়িয়ুম |
| (গ) পার্শ্ব ও উর্দ্ধ হইতে অনেকগুলি শব্দ বাঙ্গালা ও তামিল উভয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়াছে। এস্থলে তদ্ব্যবহৃত হইতে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে :— | |

| বাঙ্গালা | তামিল |
|----------|-----------|
| আসল | অসল |
| আগে | আগে |
| আবুজি | আবুজি |
| ইলফা | ইলফা |
| ইনাম | ইনাম |
| ইজারা | ইজারা |
| ইস্তাহার | ইস্তিয়ার |
| উকুম | উকুম |
| একুন | এগুন |
| কবুল | কবুল |
| কাছারি | কাচেরী |
| কড়ার | কড়ার |
| কিল্লি | কিল্লি |
| কিল্টি | কিল্টি |
| কাজনা | কজানা |
| জমা | জমা |
| জমি | জমিন |
| জরিমানা | জল্‌মানা |
| জরুর | জরুর |
| জারি | জারি |
| জেলা | জিলা |

| বাঙ্গালা | তামিল |
|-------------------------|----------|
| জোর | জোর |
| তকরার (প্রতিবাদ ও তর্ক) | তকরার |
| তহশিলদার | তাসিলদার |
| তালুক | তালুক |
| নকল | নকল |
| নয়না | নয়না |
| পেশ্কার | পেশ্কার |
| মাণ্ডল | মাণ্ডল |
| মকুপ | মাগু |
| বেস্ উত্তম) | বেস্ |
| মোহর | মোহর |
| রাজি | রাজি |
| রুজ্ | রুজ্ |
| সহর | সহর |

উপরি-উদ্ধৃত শব্দগুলি দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, বঙ্গ ও দ্রাবিড়দেশে মুসলমান শাসনকালে বৈষয়িক ব্যাপার সংসাধনের নিমিত্ত পার্শ্ব ও উর্দ্ধ হইতে ঐ গুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। অধুনা সেইরূপ desk, box, court, Judge, school, college প্রভৃতি শব্দ ইংরেজী হইতে ভারতের প্রায় সকল ভাষাতেই প্রচলিত হইয়াছে। জাতি নিবহের পরস্পরের সংঘর্ষে বা সম্মিলনে ভাবের ও ভাষার ঐরূপ আদান প্রদান জগতের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে যে ভাষা শব্দ-সম্পদে অধিক সমৃদ্ধ সেই ভাষাই অধিকতর গৌরবান্বিত।

প্রাচীন ভাষা সমূহের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা গরীয়সী। তথাপি কেহ কেহ বলেন, দেবভাষা সংস্কৃত সর্বাঙ্গমুন্দর হইলেও ইহারোমীয় ভাষা হইতে দিনার * এবং তামিল ভাষা হতে নীর, শর, মলয়, লক্ষা প্রভৃতি শব্দ পরিগ্রহ

* The Origin of the Tamil Velalas, pp.

জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

কৰিয়াছে। † তাঁহাদের ঐক্য উক্তি কতদূৰ সমীচীন, এহুলে তাহাৰ আলোচনা হইতে পারে না। জাভিড ভাষা যে পাঁচটা প্রধান শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে তামিল সৰ্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ; অপর চ. তিটা ভাষাৰ অপেক্ষা ইহাতে সংস্কৃতের প্ৰভাব অনেক কম দেখা যায়। ইহাৰ কাৰণ তামিল ভাষাৰ সৃষ্টি ও পুষ্ট সাধনে দাক্ষিণাত্য আৰ্য্যগণের অধিক কৃতিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহারা সৰ্ববিষয়ে অযথাভাবে ব্ৰাহ্মণ্য প্ৰভাব পৰিহাৰ কৰিতে চেষ্টা কৰিয়াছে এবং স্থলবিশেষে নিৰূপায় হইয়াই সংস্কৃত শব্দ পৰিগ্ৰহ কৰিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত ও তামিল সমৃদ্ধ শব্দসমূহের তুলনায় সবালোচনা বৰ্ত্তমান প্ৰবন্ধের বিষয়ভূত নহে; দাড়ি, দোপাট্টা, ফোটা, কুটীৰ, পড়ন প্ৰভৃতি শব্দ তামিল হইতে কিৰূপে বাঙ্গালা ভাষাৰ সপ্নে বিস্তৃত হইল, সংক্ষেপে তাহাৰ আলোচনা আবশ্যক। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তিনটি কাৰণ দেখাইয়া থাকেন:—

(১) কনকমঠে পিলে প্ৰমুখ কতকগুলি তামিল পণ্ডিত বলেন, প্ৰাচীন যুগের প্ৰসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত জাতি খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূৰ্বে দক্ষিণ ভাৰতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তদানন্তন চলিত বাঙ্গালায় তাম্রলিপ্তি, তাম-লিপ্তি এবং পালি ভাষাৰ তামলিটি নামে বিদিত ছিল। ‡ তামিল শব্দ উক্ত তামলিটি শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পিলে মহাশয়ের অনুমান যদি ভ্ৰান্ত না হয়, তাহা হইলে এই একটা যুক্তি প্ৰদৰ্শিত হইতে পারে যে, তাম্রলিপ্তি হইতে দক্ষিণ ভাৰতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন কৰিলে তামিলেরা যে সকল বাঙ্গালা শব্দ সচরাচর ব্যৱহাৰ কৰিত, দাড়ী, নাড়ী, হাড়ী, ভুঁড়ি প্ৰভৃতি তৎসমূহের অবলম্বন।

(২) সিংহপুৰ ৰাজ্যের স্থাপনকৰ্ত্তা মহাৰাজ

সিংহৰাজের পুত্র বিজয়সিংহ পূঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ মহাসাগরের অভিমুখে যাত্রা কৰিলে কৃষ্ণা নদীর তীরে কিছুকাল বিশ্রাম কৰিয়া-ছিলেন। কথিত আছে, তত্ৰতা বিজয়বাটীকা নগর তাঁহাৰ একটা প্ৰধান কীৰ্ত্তি। বিজয়বাটীকা এক্ষণে বেংগালোড়া নামে পৰিচিত। ইহা ইষ্টকোষ্ট্ৰে বেলগুৱে লাটনের একটা প্ৰসিদ্ধ ষ্টেশন। তথায় বিস্তৰ বৌদ্ধ-স্তূপ ও বিহাৰের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বিজয় সিংহ দক্ষিণ ভাৰতে ও সিংহলে যে বাঙ্গালা ভাষা প্ৰচলিত কৰিয়া-ছিলেন, তাহা স্তম্ভদেশে বহুদিন অধিক শহীৰে সজীব ছিল। ক্ৰমে তাহাৰ বিস্তৰ ৰূপান্তর হইয়াছে।

(৩) অন্ধ্ৰভাগপ্ৰদেশ বঙ্গবিভব একটা প্ৰসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। উক্ত বাপানে ক্ষেত্ৰা ও দিক্ৰিভেন মধ্যে ভান ও ভাঙ্গা সম্পৰ্কে বিস্তৰ আদান প্ৰদান হইয়া-ছিল তদাতীত যোড. ও বঙ্গালগণের প্ৰাচীন প্ৰভাব বন্ধে বেঙ্গুড়, কেন্দুন প্ৰভৃতি গ্ৰামনামে আজিও দেখা যাইতেছে। *

উপরি-উদ্ধৃত কাৰণবয়ের মধ্যে প্ৰথম দুইটিতে তামিলক দেশে প্ৰাচীন বঙ্গীয় ভাষাৰ, এবং তৃতীয়টিতে বন্ধে তামিল ভাষাৰ প্ৰভাব স্পষ্ট প্ৰতীত হইতেছে। যদি তামিল জাতি যথার্থই প্ৰাচীন তাম্রলিপ্তগণের বংশে উদ্ভূত এবং তাম্রলিপ্ত হইতে দক্ষিণ সাগরতীরে উপনিবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে তামিল ভাষাৰ উপর প্ৰাচীন বাঙ্গালা ভাষাৰ যথেষ্ট স্বয় ও স্বামিত্ব অবাধে সাব্যস্ত হইতে পারে। অতীত জাতি গৌৰৱের ছায়াময়ী চিন্তায় স্পৰ্দ্ধিত না হইয়া বাঙ্গালী ৰাজ্যের পণ্ডিত কনকমঠ পিলের উক্ত মতের নিৰপেক্ষ আলোচনা দ্বাৰা প্ৰকৃত তথ্যনিৰূপণে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

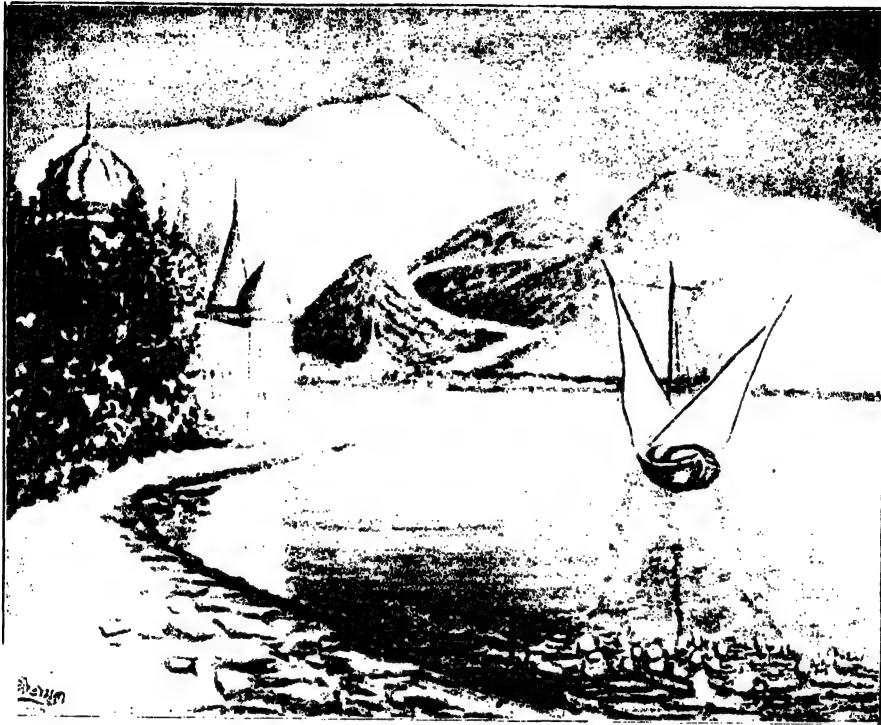
শ্ৰীযজ্ঞেশ্বৰ বন্দ্যোপাধ্যায়।

† Caldwell's Comparative Grammar of the Pravidian Languages, pp 439-447.

‡ Tamils Eighteen Hundred years Ago.

pp 46, 532

* Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature, pp. 245-249.



নাগেশ্বরে বাঁপা নদী পূর্ণ নিবল্লব,
 ফল টেনে ক'ত নেয়ে যায় দারে তব বেয়ে
 বেশ্মের পালে চলে যেন বাগেশ্বর।

প্রতিভা, দৈহাট, ১৩১৯।

পরী রাণী ।

কাব্য গল্প ।

(রাজকবি টেনিসনের “লেডি অব্ সেলট্”

কাব্যের অনুকরণে) ।

ছ’ধারে শরিষা-ক্ষেত, নদী ব’য়ে যায় ।

পাড়ে পাহাড়ের সারি

উঠেছে আকাশ ছাড়ি’

কোথা যেন মিশে গেছে ! আশি হেসে যায়—

ছ’ধারে শরিষা-ক্ষেত, নদী ব’য়ে যায় ।

ঢালু পাহাড়ের গায়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া

কন্দরে প্রবেশ করি

উপত্যকা ভেদ করি

দূরে চলে গেছে পথ পর্কত বাহিয়া,

ঢালু পাহাড়ের গায়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া ।

অনন্ত অকূল সিদ্ধ ক্ষুদ্র দ্বীপ তায়,

সুন্দর সোণার ঘরে

পরীরাণী বাস করে

ওর তব নদী-জল পুলকিয়া যায়,

অনন্ত অকূল সিদ্ধ ক্ষুদ্র দ্বীপ তায় ।

নাগেশ্বরে কাঁপা নদী পূর্ণ নিরন্তর,

গুণ টেনে ৫ত নেয়ে

যায় ধীরে ভরী বেয়ে ;—

রেশমের পাশে চলে যেন খগেশ্বর !

নাগেশ্বরে কাঁপা নদী পূর্ণ নিরন্তর ।

নিরুন্ম সন্ধ্যায় নদী করি জাগরিত

মদির বন্ধার ল’য়ে

যেত বাহু-ভরে ব’য়ে

মধুর কণ্ঠ শুনি চিত

নিরুন্ম সন্ধ্যায় নদী

নাচিয়া উঠিত !

করি জাগরিত ।

লক্ষী হেমাঞ্চলাশ্রিত

শ্রান্ত কুবী বল

পুলকিত কলেবর

শুনি সে সঙ্গীত স্বর

তরঙ্গিত ক্ষেত্রে হ’ত

বিশ্বয় বিহ্বল ;

লক্ষী হেমাঞ্চলাশ্রিত

শ্রান্ত কুবী বল ।

উবার আলোক ছায়ে,

গোধূলি সন্ধ্যায়,

রবি-দীপ্ত দ্বিপ্রহরে,

কিংবা রাত্রে চন্দ্রকরে,

ব্যক্ত রূপে কেহ কভু দেখিত না তায় ।—

উবার আলোক-ছায়ে গোধূলি সন্ধ্যায় ।

যাহু হুচী-শিল্প রত

ধাকি অনুক্ষণ

পূর্ব জনমের পাপ

ভোগিত সে অভিশাপ—

“প্রত্যক্ষ দেখিলে কিছু ঘটিবে মরণ !”

যাহু হুচী-শিল্প রত ধাকি অনুক্ষণ ।

পরোক্ষে হেরিত কক্ষে

বিশাল দর্পণে—

মায়াময় সে দর্পণ,—

প্রতিবিম্ব অগণন

পাণিনি দেখার সাধ

জাগাইত মনে ;

পরোক্ষে হেরিত কক্ষে

বিশাল দর্পণে ।

ছিল তার প্রাণভরা

গুপ্ত পরিমল ;

অজরূপে ঢল্ ঢল্

যেন নব শতদল ;

শূন্য মন শূন্য প্রাণ

যন্ত্রণা কেবল ।

ছিল তার প্রাণ ভরা

গুপ্ত পরিমল ।

আত্মার অন্তরে লয়ে

উৎসব-উচ্ছ্বাস

কত যুবরাজ এল

কত রাজা ফিরে গেল

সাধী হল, অপনের - অমৃত আভাস !
আত্মার অন্তরে লয়ে উৎসব উচ্ছ্বাস !

কন্দর্প-সুন্দর যুবা সদা দলে দলে
অশ্বপুর্থে বীর সাজে
রণবেশে প্রাতে সাঁঝে

নদী তীর-পথে যেত রাণী-জাঁধি-তলে,
কন্দর্প-সুন্দর যুবা সদা দলে দলে ।

যায়া মুকুরের' পরে প্রতিবিম্ব পড়ি
রাণীর হৃদয় তার
কাঁপাউত বার বার,

চঞ্চল হইত মন পুলকে শিহরি
যায়া মুকুরের' পরে প্রতিবিম্ব পড়ি ।

বিবাহিত বর-কণে ফুল সাজ গায়ে—
আকাশে চাঁদের কর,
ঝরে ধারা ঝর ঝর,

মৃগ হ'ত পরীরাণী হেরি প্রেম ছায়ে ।
বিবাহিত বরকণে ফুল সাজ গায়ে ।

এইরূপ ছায়া হেরি - অতৃপ্ত অন্তর,
একদিন মনে মনে
ভাবে রাণী সঙ্কোপনে

“ধরার আনন্দ-স্বাদ করিব সহর ।”
হেরি সংসারের ছায়া অতৃপ্ত অন্তর ।

সোনালি শরিষা-ক্ষেতে নদী তীর দিয়া
মাণিক-হীরার সাজ
পরি এক যুবরাজ

একদিন যেতে ছিল ঘোড়ায় চড়িয়া ।
সোণালি শরিষা-ক্ষেতে নদীতীর দিয়া ।

তরুণ অরুণ-কর গড়ে ঝিক্ ঝিক্,
গায়ে, পায়, পাঙ্ককায়
বিদ্যায় খেলিয়া বার,

“চালে” চিত্র মনোরম আলো চিক্ ঝিক্ ।
তরুণ অরুণ-কর গড়ে ঝিক্ ঝিক্ ।

সুন্দর সে “চালে” চিত্র নয়ন-রঞ্জন—
অপূর্ব রূপসী নারী
নতশির পদে তারি

বীর এক রণ-বেশ, প্রিয় দরশন !
সুন্দর সে “চালে” চিত্র নয়ন-রঞ্জন ।

শরতে সুন্দর শুভ্র দূর ছায়া-পথে
হীরকের খণ্ড প্রায়
কত মণি শোভা পায় !

অখের রশ্মিটি ঢাকা পান্না-মরকতে ।
শরতে সুন্দর শুভ্র দূর ছায়া-পথে ।

রুণু রুণু রুণু বাজে রশ্মিতে নুপুর,—
কটিবন্ধ হ'তে কুলি
রূপার শিল্পার “খুলি”,

ঝন ঝন লাজে ঘন শশ্বর মধুর
রুণু রুণু কণু বাজে রশ্মিতে নুপুর ।

মেঘ শূণ্য নীলবর্ণ আকাশের তলে
“জিন” জালে—ঝক্ ঝক্ ;
হীরা-গায়ে—চক্ চক্,

কত শত মণি তার কিরণে উছলে !
মেঘ শূণ্য নীলবর্ণ আকাশের তলে ।

মুকুটে পালঙ্ক চূড়া শোভে উচ্চ প্রায়,
যেন আলোকের রেখা
নীলাকাশে যায় দেখা,

রাজার দুলাল অখে তীর বেগে যায় ।
মুকুটে পালঙ্ক-চূড়া শোভে উচ্চ প্রায় ।

নদী-নীরে ছায়া গড়ে মুকুরের' পর—
প্রতিবিম্ব মনোহর,
কেশরাশি সঙ্কোপন



সানি ল ব বয়া খে •

নদী নদ নদ

বাণিক ভাব মাঝ

পরি এক যুবক

কেন দল যো • চিলা

দাড়াই চড়িয়া

প্রতিভা, জৈষ্ঠ ১৩১৯

রাজপুত্র অস্বাভূত মুরতি সুন্দর ।
নদী-নীরে ছায়া পড়ে মুকুয়ের' পর ।

যাহু হুচী-শিল্প ছাড়ি মুক্ত পরীরাগী
ছুই তিন পদ যেয়ে
গবাকের পথে চেয়ে

অনন্দের অঙ্গ সম দেখে মূর্তিখানি ।
যাহু হুচী-শিল্প ছাড়ি মুক্ত পরীরাগী ।

দেখা যাত্র তন্তুগুলো হ'লো এলো মেলো
উড়ে গেল নদী-পাড় ;
ভেঙ্গে গেল চুরমার

সুন্দর মুকুর খানি, হায় ! সব গেল !
দেখা যাত্র তন্তুগুলো হ'লো এলো মেলো ।

“অভিশাপ এই এল আমার উপর”
পরীরাগী মুহুরে
বলি অতি দুঃখ-ভরে

নদী-ভীরে ছুটে গেল দ্রুত, দ্রুততর ।
“অভিশাপ এই এল আমার উপর ।”

শরৎ সমীর বহি পীত পত্র কত
তরু হতে ফেলে ছিঁড়ে
নদী কাঁদে ভীরে ভীরে ;

ধরা চুমি ঘন মেঘ ঢালে জল যত ।
শরৎ সমীর বহি পীত পত্র কত ।

নদীভীরে এসে রাণী নাগেশ্বর তলে
ক্ষুদ্র এক বাধা তরী
ক্ষিপ্প্রপদে গেল চাড়ি,

গলু'য়ে লিখিল নাম পরীরাগী ব'লে ।
নদীভীরে এসে রাণী নাগেশ্বর তলে ।

নদীর ভাটীর দিকে অতৃপ্ত পরাণে
সুন্দর মলিন আঁধি
রাজধানী পামে রাধি

ভাসাইয়া দিল তরী শেষ দিন বানে ।
নদীর ভাটীর দিকে অতৃপ্ত পরাণে ।

শরিষার ক্ষেতে ক্ষেতে নাগেশ্বর-বনে,
নিশার তরনী যায়
পাতা ক'ড়ে পড়ে গায়

মুকুতার পরিচ্ছদ উড়ায় পবনে ।
শরিষার ক্ষেতে ক্ষেতে নাগেশ্বর-বনে ।

নিশার আলস ভাঙ্গি ভাঙ্গি নীরবতা
রাণীর অন্তিম গান,
করুণ কোমল তান.

চেয়ে গেল ক্ষেত বন.— শুধু মধুরতা ।
নিশার আলস ভাঙ্গি ভাঙ্গি নীরবতা ।

একপে সঙ্গীত-সুধা ঢালি পূণ্যময়
পদ্ম সম দুটি আঁধি
মুদিল, মানসে আঁধি

প্রাণের দেবতা সেই মূর্তি প্রেমময় ।
একপে সঙ্গীত-সুধা ঢালি পূণ্যময় ।

প্রাসাদের পাশে কভু, অলিন্দের তলে,
প্রাচীরের গায় গায়
তরীখানি ভেসে যায়,

শান্ত নীরবতা ভাঙ্গি বায়ু নাহি চলে ।
প্রাসাদের পাশে কভু অলিন্দের তলে ।

ভাসিতে ভাসিতে তরী এল রাজপুরে,
রজনীর মহোৎসব
হঠাৎ ধামিল সব

লোক জন এসে ভয়ে পলাইল দূরে ।
ভাসিতে ভাসিতে তরী এল রাজপুরে ।

তরীতে রাণীর দেহ মরণে' সুন্দর
আঁধি-পাতে মেঘ করে,
সুধামাধা সে অধরে,

কি সাধ্য ভুলিবে দেখি অঙ্গর অমর।
তরীতে রাণীর দেহ মরণে' সুন্দর।

তরুণ যৌবন রূপে রতি-পতি প্রায়
কুমারের সমবীর
নির্ভয় হৃদয় স্থির
রাজার কুমার এসে তরীপানে চায়।
তরুণ যৌবন রূপে রতি-পতি প্রায়।

“মিশিলে সরিৎ সিদ্ধ না ছিঁড়ে বন্ধন,
মরণে দেহের নাশ,
না কাটে প্রেমের পাশ,
প্রেম নাহি ভরে কভু যমের শাসন,
নহে হেথা হবে সেথা
মোদের মিলন।”

শ্রী গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

প্রেম।

যদি এ কঠোর সুসারে রসময়, সুখকর, তৃপ্তিকর,
কোন কিছু থাকে তবে তাহা প্রেম। প্রেম কথাটি
পর্যন্ত সরস। এই প্রেমের জন্ম, এই ভালবাসার জন্ম,
কত শত মানবের জীবন-গতি বিভিন্ন পথাবলম্বী হইয়া
থাকে। প্রেম সুধাময়—যখন নিজ হৃদয় প্রেম-পূর্ণ হইয়া
যায়, যখন স্নেহিতের, বাঞ্ছিতের পদে আপন হতে কাগমন
সমাপ্ত হইয়া যায়, তখন সে প্রেমের স্পর্শে জগৎ সুধাময়
হইয়া উঠে। যখন পাত্র বিশেষে প্রেম লক্ষীকৃত হয়,
অমৃতরসিকতাও বিশেষ পরিপূর্ণ করে, তাও যখন তরপুর
হইয়া যায়, সে প্রেমশ্রোত তখন জগৎ সংসার প্রাবিত
করে। পবিত্র প্রেম অনন্তের অংশ, সামান্য বিষয়ে তাহা
সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেনা। ভালবাসাই ভালবাসার
চরম উদ্দেশ্য, অতীত কোন লক্ষ্য তাহার নাই। স্বকীয়
পরিভূক্তি, আপনার বাসনার চরিতার্থতা ভালবাসার

উদ্দেশ্য নহে। ভালবাসাই ভালবাসার মুখ্য উদ্দেশ্য,
গৌণ নহে।

যে ভালবাসায় নিজের অর্থাৎ স্বার্থের জ্ঞান আছে
তাহা অতীব হেয়। শারদ নিশায় চন্দ্রিকা শোভা পায়,
বসন্তে কুইম প্রফুটিত হয়, ইহাদের কি কোন স্বার্থ
আছে? পয়োদসংঘাতে সুনির্মল বারিধারা আছে
তাহার কি নিজের কোন প্রয়োজন আছে? অনেকে
বলিয়া থাকেন নিঃস্বার্থ প্রেম পৃথিবীতে নাই; উহা কাক;
কথা—আকাশ কুসুমের জায় অলীক। এ কথা সত্য নয়।
ক্রোড়স্থিত সরল শিশুর মুখপানে তাকাইয়া জননীর হৃদয়ে
যে সরল ভাবের উদয় হয়, বাহাতে স্বার্থের সংস্পর্শ নাই,
প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা নাই—তাহা কি এই পৃথিবীরই
বিষয় নহে? মাতৃহৃদয়ে কি তখন সম্ভান কর্তব্য প্রতি-
দানের কথা মনে হয়? শিশুকে ভাল বাসিয়াই মায়ের
সুখ। এইরূপ অগুণ্ড। ইহাই পবিত্র প্রেম। যে ভাল-
বাসিয়াছে সে নিজ হৃদয় সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত করাই
একমাত্র কর্তব্য ও ধর্ম বলিয়া মনে করে। যে প্রেমিক
“অবসর মত” ভালবাসিতে বলে এবং প্রিয়তমের ভাল-
বাসা চাহে সে কখনও নিঃস্বার্থ প্রেমিক নহে। তাহার
ভালবাসা বর্ষার জলের জায় আবেগবহুল হইতে
পারে কিন্তু নির্মল বা ঠিক পবিত্র নহে। আকাঙ্ক্ষা কলু-
ষিত বটে। আমার আমিহ না ভুলিলে এই স্বার্থের
নিরাপন করা অসাধ্য। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম বাবু তাহার
বিষয়কে ভালবাসা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “চতুর যে
অবস্থায় অন্তের স্বার্থের জ্ঞান আমরা আত্মসুখ বিপজ্জন
কারণে বতঃহ প্রস্তুত তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা
বলা যায়।” ইহাই ভালবাসার প্রকৃত স্বরূপ। বিষয়কে
হরদেব ঘোষালের পত্র খানা উল্লেখ ঘোষ্য। সাতার
প্রেম, দময়ন্তীর প্রেম পর্যালোচনার বিষয়। প্রেম
অনন্তের অংশ, ক্ষুদ্র স্বার্থাচিন্তা তাহাতে স্থান পায় না।

প্রকৃত ভালবাসা অতীতের বস্ত। বাহিরের উপকরণ
তাহাতে কেন? আর বাহিরের উপকরণ ত ক্ষণস্থায়ী।
যদি প্রেম অবিদ্যময় হয় তবে এ সংসারের বাহিরে, এ

মরণোন্মত্তের অপর পারে তাহার স্থিতি। তবে কেন অস্তর ছাড়িয়া বাহিরের বস্ত, বাহ্যিক উপকরণে, মানসিক ছাড়িয়া স্থল ভৌতিক বিষয়ে স্পৃহা! বাহিরের স্থল বিষয়ে যাহা লক্ষ্যকৃত, সীমাবদ্ধ, তাহা স্বতঃই নখর। যে রূপ, যে স্পর্শ, যে আভাষ ভাবিয়া মানব উন্নত হয়, যে চক্ষু, যে ক্র, যে কম কান্ধি, যে মুগ্ধবির আকর্ষণে মানব মুগ্ধ হয়। যাহার সংযোগ ভাবিয়া ভাবিয়া মুখ অমুভব করে। তাহা কি ক্ষণভঙ্গুর নহে? কিন্তু প্রেয় কি উহারই সহিত শেষ হয়? চিত্তভঙ্গুর সহিত কি প্রেম নষ্ট হইতে পারে? রূপজ মোহ ও প্রকৃত প্রেমে এই প্রভেদ।

কবি বলিয়াছেন, হিংস ভিন্ন পদার্থকে প্রীতি-বন্ধনে যে আবদ্ধ করে সে আত্মস্বরূপ কোনও কারণ। বাহিরের কারণ অবলম্বন করিয়া কখনও প্রীতি (বা প্রেম) জন্মে না। প্রথম সূর্য্যের কিরণে কমল বিকশিত হয়, কমলীয় চন্দ্রমা উদিত হইলে কঠিন প্রস্তর চন্দ্রকান্ত দ্রব হইয়া যায়, ইহার মধ্যে কোনও গূঢ় (আন্তরিক) কারণ আছে। এত দূরে সূর্য্য, এত দূরে চন্দ্র, তথাপি পুণ্ডরীক প্রস্ফুটিত হয়, চন্দ্রকান্ত গলিয়া যায়! হৃদয়ের সংযোগে যে শক্তির উদ্ভব হয় তাহা অতি কম লোকের অদৃষ্টেই ঘটিয়া পাকে। সীতা হইতে রাম অভিন্নহৃদয়; রাম সীতাকে জানিতেন, সীতাও রামকে জানিতেন। “জ্ঞনয়ং তে'ব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরং” ইহাই প্রেমের প্রকৃত অভিব্যক্তি। দুটি দেহে এক আত্মা, একের সেবায় অন্নের স্বচ্ছাকৃত আত্মবলিদান, অস্ত্র আকাজক্ষা নাই কামনা নাই। এ পবিত্র সংযোগে অভিমান নাই, অহঙ্কার নাই, বিচার নাই, দোষাত্মসন্ধিৎসা নাই, আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নাই, কঠোরতা নাই, শুধু কামলত। শুধু শান্তি, শুধু ত্যাগ, শুধু প্রীতি।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার সেন।

কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ।

(পূর্ক প্রকাশিতের পর)

শৈল নোকাডুবির কমলমণি। সূর্য্যমুখী অথবা কমলার আদর্শের দাবী সে করিতে পারে না। শৈলজা।

শৈলতেও উজ্জল দাম্পত্য প্রেমের চিত্র আছে। সূর্য্যমুখী ও কমলার দাম্পত্য প্রেম “স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবান্তিরিক্ত”, জীবন ও আদর্শ মিলাইয়া গঠিত করা হইয়াছে—সূর্য্যমুখী ও কমলা সৃষ্টি। শৈল ও কমলমণির দাম্পত্য প্রেম নিছক ঘরাণো জিনিষ : এদের ভিতর হইতে কল্পনায় নিঃসৃত হইয়া আদর্শকে কুটাইয়া তুলান হয় নাই—এই চরিত্র দুইটি স্নান পর্য্যবেক্ষণের ফল।

কমলমণি ও শৈল, এই দুই জনের দাম্পত্য প্রেমেও যথেষ্ট উজ্জল ও মধুরতা আছে। তবে কমলমণির দাম্পত্য চিত্র বেশী পরিষ্কৃত এবং খোলাখোলা—শ্রীশ-কমলের আলাপে আমরা তাহার পরিচয় পাই। শৈল-চরিত্রের দাম্পত্য চিত্র লুকোচুরির ভিতর দিয়া আত্মসে দৃষ্টিয়া উঠিয়াছে—শৈল-বিপিনের দেখাশোনা আমাদের সাক্ষাতে কখনো হয় নাই। “শৈলজা শ্রামবর্ণ, তাহার নুংখানি ছোট, মুষ্টিমেক্স চোখ-দুটি উজ্জল, ললাট-প্রশস্ত মুখ দেখিলেই হির বুদ্ধি এবং একটি শান্ত পরিতৃপ্তির ভাব চোখে পড়ে।”

শৈল শরীরে ও মনে সব দিক দিয়াই একটি ছোট সংস্করণের মেয়ে,—কিন্তু ছোট পরিধির মধ্যেও তাহার দাম্পত্য প্রেমের চিত্র-নবীনতা আছে। কণ্ঠ-প্রত্যাগত বিপিনের পায়ের শব্দ শুনি, তরঙ্গিত বুক নিয়া শত প্রয়োজন ফেলিয়াও সে বানো সে ছুটিয়া যায় এবং এমনকি নবপরিণীত সঙ্গ-সঙ্গত্যাগের অভ্যস্ততা পর্য্যন্ত তাহাকে সেই আহ্বান হইতে ফিরাইতে পারে না। স্বামী তাহার গর্ভ। সে বেচারীর উপর শৈল একটু মধুর শাসন চালাইতে পর্য্যন্ত ছাড়ে না। স্বামীই তাহার একমাত্র গল্পের বিষয়; দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য্য যখন তাহার হৃদয়ে ভরিয়া

জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

উঠিয়াছে, সেই সময়ে গল্প করিবার এত উপকরণ যখন তাহাতে পুঞ্জীভূত হইয়া আসিয়াছে, তখন সখী কমলাকে পাইয়া সে এক মুহূর্তে তাহার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিল। ওষ্ঠ পর্যন্ত স্বামীর কথার ভরিয়া আসিয়া প্রবাস-প্রত্যাগত সখীতে সখীতে যখন মিলন হয়, তখন প্রথমটা ওষ্ঠ চাপিয়া দুই একটা কুশল প্রশ্ন হওয়া সম্ভবপর হইলেও, পরমুহূর্তেই পেটের কথাটি বাহির হইয়া পড়ে। নূতন সখী করিবার বেলাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না,—শৈশব ব্যবহারে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সে আশ্চর্য্য অল্প সময়ের মধ্যে তাহার স্বামীর কথা ফাঁদিয়া বসিল,— তাহাদের মধ্যে দিবা-সাক্ষাতের জন্ত কেমন লুকোচুরি চলে, বিদেশে কর্মের জন্ত গিয়া বিপিন কেমন দুদিনও শৈশবে ছাড়িয়া থাকিতে পারে নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রূপে দুই সখীতে, দুই বোনে মিলন পাকিয়া উঠিল। তারপর কমলার সর্বপ্রয়োজনে তাহার মঙ্গল এবং মেহ হস্ত, কমলার পলায়নে তাহার গভীর দুঃখ আমরা দেখিতে পাই। শেষে কমলাকে খুঁজিবার জন্ত জীবনে এই প্রথম বিপিনকে এত দিনের জন্ত ছাড়িয়া কাণী ষাটার এবং শেষ পর্যন্ত কমলার স্থিতি দেখিয়া যাইবার জন্ত জীবনের নানাবিধ চেষ্টার-তাহার মেহপূর্ণ হৃদয়টির পূর্ণ পরিচয় পাইয়া আমাদেরগকে মুগ্ধ হইতে হয়।

শৈশব মেয়ে উমিকে আমরা ভুলিতে পারি না।

কমলার মেহের ভিতর দিয়া তাহার উমি।

বেশ একটা মূল্য আছে। সে তাহার “মাসী-প-প গেছে”, কলম দিয়া

আঁচর কাটা এবং নানাবিধ অফুট বাকচেষ্টা লইয়া আমাদের সহিত বেশ একটু মধুর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা বসে।

মৌকিঁড়ির দুইটি শিশু; একটি অফুটবাক, আর একটির কথা ফুটিলেও কমলার উমেশ।

মেহের সামনে তাহার শব্দহীন

“আকর্ণ-বিশ্রাও হাসিটিই” তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ বাকসম্পত্তি। উমেশের বয়স কত তাহার ঠিক ধারণা করা যায় না। কোনো কোনো কথায় তাহাকে

কিছু ইঁচড়ে পাকা বলিয়াই মনে হয়,—অর্থাৎ যে বয়সে ভক্ত এবং শিক্ষিত পরিবারের ছেলেদের সাংসারিক জ্ঞান মোটেই হয় না সেই বয়সে তাহার তাহা অনেকটা হইয়াছিল। সে বাজারের পয়সা হইতে চুরি করিতে শিখিয়াছে, রাস্তার আয়োজনের বুদ্ধি এবং তদনুরূপ কর্ম সে জোগায়, স্টেশনে টিকিট কিনিয়া কমলাকে মেয়েশাড়ীতে বসাইয়া নিজে “পাশের গাড়ীতে” বসিবার অভিজ্ঞতাও তাহার আছে। ভোজনের আনন্দ তাহার খুব আছে, খাইতে খাইতে সে কমলার চচ্চড়ির প্রাণ নিঃশ্বাস করিয়া দিতে পারে। তাহাকে আমরা বড় একটা দেখি না এবং দেখিতে চাইও না। সে তাহাকে মেহসর্বস্ব প্রাণে তাহার “মা” কমলার প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাসা লইয়াই আমাদের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। সে তাহার এক আত্মীয়ের নিকট যাইতেছিল, পথে সীমারে কমলাকে দেখিয়া তাহার নিকট তক্তি এবং ভালবাসায় চিত্ত নিবেদন করিয়া দিল এবং এক মুহূর্তে তাহার সহিত অকাটা চিরহীন গ্রহি বন্ধন হইয়া গেল। সে কমলাকে খুঁসি করিবার জন্ত শাক চুরি করিয়া আনে এবং বোধ হয় অগ্নিনিধি হৃদয় করিতেও কুণ্ঠিত নয়,—এর জন্ত সীমার একরূপ ‘ফেলু’ করিয়াও তার জন্ত তাহার কোনো পশ্চাত্তাপ হয় না। অনাদরক্লিষ্ট বিনিত্র কমলাকে দেখিয়া সে হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে এবং তাহাকে সাধনা দিতে ইচ্ছা করিয়া কোনো কথা খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে পূর্ব দিনে যে বাজারের টাকাটি হইতে কিছুই বাচেনা হই বলিয়াছিল আজ ঝাপছাড়া ভাবে সেই সময়ে বলিয়া বসে—“মা কালকের টাকা হইতে সাত আনা বাঁচিয়াছে,” কমলা দুঃখের মধ্যেও মেহমিশ্রিত হাসি হাসিয়া তাহাকে ঘুরাইতে বলে, উমেশ এই মেহের হাসিটি মনে লইয়া ঘুরাইতে যায়।

গভীর রমেশের সহিত তাহার কিছুমাত্র মিল হয় নাই। কমলার মেহে ভাগ বসাইতে আসিয়াছেন মনে করিয়া চক্রবর্তী, খুড়ার প্রতি প্রথমে তাহার কথা হইয়াছিল

তবে ভাত খাইতে বেশী দেয়ী হয় নাই । খুন্তীর প্রেম লইয়া বালকে বৃদ্ধে দীর্ঘা বেশীকণ থাকিতে পারে না । তবে অবশ্য তাহার সমবয়স্ক কোনো বালক হইলে উমেশ ; তাহাকে কখনই রেহাই দিত না । গাজিপুরে কমলার পলায়নের দিন কমলার নিকট হইতে পাঁচটি টাকা এবং কাপড় উপহার পাইয়া তাহার কত আনন্দ ! অবশ্য এগুলির প্রতি যে তাহার আন্তরিক লোভ ছিল না তাহা নহে, তবে “মা দিয়াছে” এই মনে করিয়াই তাহার আনন্দ । পরদিন সকালে যখন কমলার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না এবং সমস্ত সন্ধ্যাই যখন গঙ্গার জলের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিল, তখন উমেশ আর থাকিতে পারিল না—“মা, মাগো”—বলিয়া চীৎকার করিয়া জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল । জল সেখানে বেশী ছিল না—উমেশ বারংবার পাগলের মত ডুব দিয়া দিয়া তলা হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল—জল বোলা করিয়া তুলিল । তারপর কিছুদিন পর যোগলসরাইয়ে উমেশ কমলাকে দেখিতে পাইল এবং কোনো রকম অভিমান, দুঃখ কিম্বা কমলার ব্যবহারের জ্ঞান কোনো কিছু প্রাপ্ত না করিয়া তাহার পরিচিত কণ্ঠে ডাকিল “মা” এবং কমলাকে প্রণাম করিয়া তাহার হৃদয়ের পরিপূর্ণতা এবং অপার সন্তোষ এবং উন্মাদের চিত্তস্বরূপ তাহার আকর্ষণ-প্রসারিত হাসিটি বিকশিত করিয়া দিল । কমলার সহিত তাহার গ্রন্থি কিছু দিনের জ্ঞান ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখন হইতে আবার চিরদিনের জ্ঞান তাহা দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হইল । এই গৃহস্থ “লক্ষীছাড়” ছোড়াটার অভাবে নলিনাক্ষের সহিত কমলার মিলন সম্পূর্ণ হইত না, আর উমেশ সারাজীবন কমলাকে পূজা করিয়া এবং ভালবাসিয়া না কাটাইয়া দিলে তাহার জীবনের কোনো সার্থকতাই থাকিত না ।

নৌকাডুবিতে তিনটি বয়সী গৃহিনী আছেন—বাজালী

গৃহিনীর তিনটি উজ্জল ছবি !

হরিভাবিনী,

নিজের সন্তানাদি লইয়া গর্ভকরা,

নবীনকালী ও

শুধু বাজালী গৃহিনীর কেন, বোধ

কেমঙ্গরী

হয় পৃথিবী জুড়িয়া সমস্ত গৃহিনী-

রই সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব । হরি-

ভাবিনী তাঁহার অনুপস্থিত কণ্ঠ। বিধুর রূপ কমলার নিকট যাহাতে খাটো হইয়া না যায় এইজন্য কমলার সহিত তাহার মুখাবয়বের সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়া বসেন । নবীনকালী তাঁহার অনুপস্থিত হাকিম-পুত্রের রাজ সন্মানের কথা উল্লেখ করেন । কেমঙ্গরীও তাঁহার নলিনাক্ষটিকে লইয়া গর্ভ অনুভব করেন এবং তাহা প্রকাশ করিতেও ছাড়েন না । তবে হরিভাবিনী-নবীনকালীর তাঁহাদের সন্তানদের স্বয়ংক্রিয় লোক-দেখানোর প্ররুতিটাই বেশী, আর কেমঙ্গরীর গর্ভের প্রধান হেতুই হইয়াছে তাঁহার মেহ । এই লোক-দেখানোর প্ররুতিতেই হরিভাবিনী-নবীনকালী মিথ্যার আশ্রয় নিয়া থাকেন, আর এই প্ররুতির অভাবে এবং তাঁহার নলিনাক্ষটি গর্ভ করিবার জিনিষও বটে এর জ্ঞাতও কেমঙ্গরীর তাহা করিতে হয় না । এই প্ররুতির জ্ঞানই হরিভাবিনী-নবীনকালী যার-তার-কাছে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহাদের ‘বড়লোক’ সন্তানদের গল্প কাঁদিয়া বসেন, আর ইহার অভাবেই কেমঙ্গরী আপন এবং নিতান্ত পরিচিত লোকের নিকট ভিন্ন তাঁহার নলিনাক্ষের উল্লেখ করেন না । তাঁহাদের গর্ভের বিষয় তাঁহাদের কণ্ঠার বহুমূল্য গহনা, জামাতা ও পুত্রের চাকুরী ও রাজ সন্মান, তাঁহার গর্ভের বিষয় তাঁহার পুত্রের পূত নির্মল চরিত্র সাহসাত্ম্য । হরিভাবিনী-নবীনকালীর এই ‘বড়লোকি’ দেখানোর প্ররুতি যে শুধু তাঁহাদের সন্তানদিগকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশ পায় তাহা নহে, “নূতন বাড়ী ঘেরামত,” “চৌদ্দ টাকা বেতনের বামুন,” “মধ্যমল কিংখাবের গৃহ আস্বাব,” “সোণারপায় শোজন পায়” ইত্যাদি অস্তিত্বহীন জিনিষের মিথ্যা গর্ভেও ফুটিয়া উঠে । এই গর্ভাটো ও পুরাতন বাজালী গৃহিনীদের একটা বড় বিশেষত্ব । কেমঙ্গরীর এই ‘বড়লোকি’ হীনতা আদৌ নাই ।

এই লোক-দেখানোর প্ররুতিতে হৃদয়ের সাদৃশ্য থাকি-

লেও মূলে হরিভাবিনী নবীন-

হরিভাবিনী

কালীতে তফাৎ অনেক । হরিভা-

ও

নবীনকালী

বিনীর আত্মগর্ভ ব্যাখ্যানে আমরা

একটু আঘাত অনুভব করি এবং

মনে মনে হাসি ; তাঁহার লোক

জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

দেখানো কাহাকেও আঘাত করে না, কারণ তাঁহার হৃদয়টি সরল এবং স্নেহপরায়ণ, কমলার আদর তিনি করিতে জানেন। আর নবীনকালীই যে করিতে জানেন না তাহা নহে, তবে নবীনকালীর আদর বিনা বেতনে বায়নাঙ্কুরণ পাউবার স্বার্থে। হরিভাবিনীর আশ্রয়গর্ভে যথেষ্ট স্নেহ এবং সত্যের সংস্পর্শ আছে, নবীনকালীর আশ্রয়গর্ভে স্নেহের অংশ খুব কম এবং সত্য নাই বলিলেই চলে, কাজেই আমাদের কাছে তাহা আঘাত করে এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্রোধের সঞ্চার করে। অতঃপর এই ক্রোধের হেতু কমলার প্রতি তাঁহার নির্ধাতনের পূর্ণাভাসেই অনেকটা নিহিত। কমলার প্রতি তাঁহার অত্যাচারে এবং চুরি অপরাধ ও অন্ত্রবিধ অপমানে আমাদের হৃদয়ে যুগপৎ করুণা, ক্রোধ এবং হাত্তের উদ্বেক করে। নবীনকালী নিজে যাহা হৃদয় আদর্শ গিল্পিনা মনে করেন তাহা তাঁহার সংকীর্ণ চিন্তা বৈ আর কিছুই নহে। নবীনকালীর হৃদয় আছে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হয় থাকিলেও তাহা তাঁহার করুণ রসনা এবং বিরুদ্ধ বাহিরের নীচে এতই চাপা পড়িয়াছে যে কিছুতেই প্রকাশ পাইতে পারে না।

বাহিরের একটা বড় রকমের আঘাত পাইলে এত সূপ্ত হৃদয় তাহার গোপন আগুন হইতে সাড়া দিয়া উঠিত কি না ঠিক বলিতে পারি না, কারণ সে আঘাত উপস্থিত হয় নাই। মোগলসরাইয়ে যখন তাঁহার নিষ্ঠুর কবল হতে কমলা মুক্তি পাইল তখন বায়নাঙ্কুরণ কমলার জন্ত স্বার্থের দুঃখ ছাড়া আর কোনো রকম দুঃখ তাঁহার হইয়াছিল কি না সেই খবর লইতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। কমলার চারিদিকে যে আর একটি ভাল জড়াইয়া উঠিতেছিল দৈব তাহা এমন করিয়া কাটিয়া দিলে তাহারি আনন্দে আমরা কমলার জীবন অনুসরণ করিয়া চলি, সেই জীবনোত্তীর্ণ হই দ্বিদিনের আগন্তকের কথা আর আমাদের মনেই থাকে না।

কেমকরী নৌকাডুবির একটি প্রেট সৃষ্টি। তিনি

সকলের শেষে এই উপজ্ঞাস গগনে আসিয়া উদ্ভিত হইয়াছেন,—তবু এই অল্প পরিসর এবং ততোধিক অল্প সময়ের মধ্যে এই ছবিটি আশ্চর্য্য অগ্নান ঔজ্জ্বল্যের সহিত পরিষ্কৃত রেখাসীমার প্রবৃত্তায় আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। কেমকরী নলিনাক্ষের মাতা, তাঁহার প্রতি কাজে এবং কথায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পার্শ্বিক ব্যাপারে এবং জিনিষে প্রকাশিত-প্রতিফলিত-অথবা-সুপ্ত স্বরূপের মত নলিনাক্ষের প্রতি তাঁহার স্নেহের সাক্ষাৎ আমরা পাইয়া থাকি। মাতা কেমকরী রূপে যদিও তিনি উজ্জ্বল ভাবে পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছেন, তবুও শুধু মাতৃস্নেহ এই চরিত্র নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। তাঁহার অনোরত্তি সজ্ঞা এবং সজ্ঞান, তাঁহার হৃদয়ের অধ্যাত্মবৃত্তির উন্মুখতার পরিচয় ও আমরা পাইয়া থাকি। চোপের বালির মাতা রাজলক্ষ্মী এবং সাত্ত্বিকা অন্নপূর্ণা নৌকাডুবির কেমকরীতে আসিয়া নিশিখা গিয়াছেন, তবু এই রাসায়নিক সংযোগক্রিয়ায় এই মানবীতিতে রাজলক্ষ্মীর মাতৃস্নাত্ত্বিমান লয় পাইয়া গিয়াছে এবং তৎপরিবর্তে অন্নপূর্ণার সাত্ত্বিকতা ছাড়াও কতকগুলি নূতন গুণাবলীর সমাবেশ ঘটয়াছে।

কেমকরীতে মাতৃস্নাত্ত্বিমান নাই, তাহার কারণ মাতৃস্বর্গবিচ্যুত মহেশ্বরের মত সন্তান-নলিনাক্ষ এই অভিমানের কোনো সুযোগই দেয় না, সন্তান হিসাবে নলিনাক্ষ এত খাঁটি এবং পরিণত; তাহা না হইলে কেমকরীতেও এই অভিমানের আমরা সাক্ষাৎ পাইতাম, কারণ অভিমানের মূল হেতু যে স্বাস্থ্যভাব অথবা অল্পেই আঘাত পাইবার ক্ষমতা, তাহা অনেক দিক দিয়া কেমকরীতে যে আরো স্বাস্থ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নিশ্চিত; স্নেহহীন সেবা তিনি সহ করিতে পারেন না, এজন্য কোনো মাহিনাকরা দাসী চাকর তিনি রাখেন না। নলিনাক্ষের গুণে মুগ্ধ হইয়া নয়, শুধু অল্পরোধে পড়িয়া হেমনলিনী তাহাকে বিবাহ করিতে যাইতেছে, হেমনলিনীর মুখে এই অল্পসাহের কাষ্টতাবটা কেমকরীর

চক্ষু এড়াইতে পারে না এবং শুধু এই নীরব স্থল ভাব পরিচয়ের জোরেই প্রস্তাবিত বিবাহকে ভাবিয়া দিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন।

মানস গুণিতে অন্নপূর্ণা ও ক্ষেমকরীর সাদৃশ্য আছে,— দু'জনই তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং মানবচরিত্রাভিজ্ঞা, তবে বাংলা মাসিকের রচনা পাঠ শুনিতে আনন্দ এবং সেগুলি সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তাঁহার আলোচনা করার ক্ষমতায় ক্ষেমকরীর মানসশক্তিকে আমরা কিছু বেশী উজ্জল এবং প্রস্তুত বলিয়া দেখিতে পাই। দু'জনই স্বতঃপ্ৰসঙ্গ, তবে অন্নপূর্ণার সাবিত্রিকতা সরল এবং একমুখী, আর ক্ষেমকরীর সাবিত্রিকতা বিরুদ্ধ এবং বিচিত্র উপকরণের সমাবেশে একটু ওটিল। অন্নপূর্ণায় আচার নিষ্ঠার প্রকাশ নাই; কিন্তু অস্থির লইয়া প্রাতঃস্নান, আহার ইত্যাদি লইয়া অত্যাধিক কষ্টসাধন, ব্রাহ্ম হেমবালিনী এবং এমন কি ব্রাহ্ম স্বামীপুত্রের নিকট হইতে কলুষ-স্পর্শশূন্য থাকিবার চেষ্টায় ক্ষেমকরীতে এই আচারনিষ্ঠার প্রকাশ খুব বেশী; অথচ এই আচারের অত্যাচারেও হিন্দুবিধবার সংকীর্ণচিত্ততার ভাগটা তাঁহাতে আদৌ নাই। তাঁহার পর-সহিষ্ণুতা (toleration) অসামান্য, তিনি যে অত্ৰকে লইয়া “ছুঁই ছুঁই করেন” ইহা তাঁহার ‘স্বপ্ন’ নহে, শুধু একটা ‘অভ্যাস,’ ইহা তাঁহার পিতামাতা ব্রাহ্মভাষ্যীর নিকট হইতে পাইয়াছেন, এই অবলম্বনকে তিনি ছাড়িতে পারেন না; তবে যেভাবে যে পালত সেই ভাবেই তাহার সত্যোপলক্ষের পথে কোনো বাধা নাই ইহাই তাঁহার মত। সৌন্দর্য্যচর্চা তাঁহার আর একটা বিশেষত্ব। স্পর্শ বাগাইয়া চলা, অথচ যেম রাধিয়া সেলাই কার্য্য শিক্ষা; নিজস্বক্কে যথাসম্ভব কষ্টসাধন, অথচ অত্ৰকে মনের মত করিয়া সাজাহবার ইচ্ছা, অত্ৰে অলঙ্কার ভূষণ এবং সুসজ্জা, ফুল এবং সুন্দর মুখ ভালবাসা; নিষ্ঠা কঠোর আচারপরায়ণতা, অথচ অসাধারণ পরসাহিষ্ণুতা; পুণ্ডকের শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব, অথচ স্বাধীনভাবে মানসশক্তি পরিচালনার ক্ষমতা, এতাদৃশ বিরুদ্ধতার সাম্মিলনে ক্ষেমকরী-চরিত্র অপরূক।

অন্নপূর্ণা তাঁহার আধ্যাত্মিকতায় সরলতা এবং একমুখিতার ফলে বেশী গাঢ় এবং একাগ্রচিত্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্ষেমকরীর ভগবৎপরায়ণতা কিছু ভরল হইলেও বিচিত্রতার মাধ্যমে এই চরিত্র-সৃষ্টি অভিনব এবং নিপুণতর ইহা নিশ্চিত।

নারীভক্ত কবির “সর্বশেষের গানটি” “কল্যাণী”র জন্তই, এই চরিত্র-পুঙ্ককের সর্বশেষ চরিত্রালোচনাটি ও কল্যাণমঃ নলিনাক্ষকে লইয়াই।

নলিনাক্ষ নলিনাক্ষ * এই গ্রন্থের একজন নায়ক। রমেশের প্রভাব যদিও

সারা গ্রন্থ জুড়িয়াই বস্তুমান, আর নলিনাক্ষ যদিও গ্রন্থের মাঝামাঝি জায়গায় আসিয়া উদিত হইয়াছেন, তবুও নলিনাক্ষই গ্রন্থের শেষ অংশের রাজা,—সেখানে রমেশের প্রভাবও কতকটা ধর হইয়া গিয়াছে।

* রবীন্দ্রনাথের নামকরণের বিরুদ্ধে আমরা এখানে একটি নালস রুজু করিয়া রাখিতেছি। বিনোদিনী এবং পরেশ এই দুইটি নাম তাঁহার পূর্ববর্তী অল্প দুই দুই জনের দুই উপন্যাসে আছে, একটু সতর্ক হইলে এই দুইটি নাম তিন নিকের উপন্যাসে না ঢুকাইয়াও পারিতেন। এটা তত দোষের নী হইলেও, নিকের রচনাতেই নামের পুনরাবৃত্তি নিশ্চয়ই দোষাবহ। “চরকুমার নন্দ”র অক্ষয়ের সাক্ষাৎ পাইয়া আসিয়া “চোখের বালি”তে অক্ষয়নামধারী আর কাহাকেও আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি নাই। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাকার লিখিত “ভগ্নদ্বারে”র নালনাকে আমরা তাঁহার “নালিনী”-নাম্না ক্ষুদ্র নাটিকাতেও দেখিয়াছিলাম। সেই নালিনী বহাদুর পরে “নৌকাডুবি”তে আসিয়া ‘হেম’-জন্ম লাভ করিয়াছেন তাহাতে স্মৃত নাই, কিন্তু তিনি যে “গোড়ায় গলদ” এবং “নৌকাডুবি” দুই পুস্তকেই দুইটি পুরুষের ‘আক্ষ’তে আসিয়া আসন পাতিয়া বাসিয়াছেন তাহা অসম্ভব। “গোড়ায় গলদ”ের নলিনাক্ষটি ‘নালিনাক্ষ’র মত হইলেও, এহ নারী-বাস্তবায়ই তাঁহার একটা চারিত্র্য ব্যক্ত হইয়াছে; আর আমাদের এই নালিনাক্ষটির ত কী নাই। এক নামে দুই ব্যক্তিত্বের নামকরণ করা অজ্ঞান।

কিন্তু রাজা হইলেও সিংহাসন, রাজপরিচ্ছদ কিম্বা রাজদণ্ড তাঁহার কিছুই নাই,—তিনি নিতান্তই প্রজাতন্ত্রের রাজা, দেশের কর্মকোলাহলে তিনি আপনাকে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। বাহিরের কোনো পরিচায়ক চিহ্নের অভাবে এষ্ট বর্ণচোরা রাজাটিকে আমরা অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার করিয়া উঠিতে পারি নাই, কিন্তু অবশেষে তিনি ধরা পড়িয়াছেন,—তখন দেখিয়াছি দেশের কর্ম তাঁহারই কর্ম, দেশের শক্তি সৌন্দর্য্য তাঁহারই শক্তি সৌন্দর্য্য। গ্রন্থ-শেষেও জীবন-কল্পোন্মেষে তিনিই গোপন উৎস।

নলিনাক্ষ প্রথম জীবনে কেজ্জহীন ছিলেন এবং শাস্ত্র ও ধর্ম্মের কথাই মার মুণ্ডে ধরিতেন, মাতা ক্ষেমকরীর নিকট হইতে আমরা এই ধর ভূমি পাইয়াছি, কিন্তু সেই জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই নাই। ব্রাহ্ম-পিতা মার গেলে হিন্দু আচারপরায়ণ মাতাকে সম্বলিত করিবার জন্য ব্রাহ্ম নলিনাক্ষ প্রথম আচার অনুষ্ঠান পালন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অন্তরের উড়ে-চলা ভক্তিপ্ৰাণতা এতাদন অবলম্বনের অভাবে বাহরে এবং নিজের কাছেও প্রকাশিত হইতে পারে না,—আচার অনুষ্ঠানের স্বত্র ফেলিয়া যখন হৃদয়ের পারপূর্ণতাকে আধ্যাত্মিক দান-বাধা পাইলেন তখনই যথার্থভাবে তিনি আপন হৃদয়ের পরিচয়টি লাভ করিলেন, তখন নিয়ম-সংঘের আর কোনো তত্ত্বতা রহিল না, অন্তরের রসে তাহাও মধুর হইয়া উঠিল।

নলিনাক্ষ ছাত্রদের অনুরোধে মাঝে মাঝে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। সোনা যেমন বানানো যায় না, বড় বড় আধ্যাত্মিক কথাগুলিও তেমনি কাহারো আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হইতে ছাড়া সৃষ্ট হইতে পারে না। আধ্যাত্মজীবন ভিত্তিহীন সুখের ফাকা কথাগুলি হাওয়ায় মিলাইয়া যায়, বাহার হৃদয়তরী হৃদয়দেবের ছুটি “সোনা-করা চরণপাশে” সোনা হইয়া যায় নাই, তাহার প্রকাশকে পায়ে সোনার রং বাধিয়া আসিলেও, নকল অনুকরণ এবং গিন্ধিকরা বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। নলিনাক্ষের

বক্তৃতা তেমন নয়, সেই বক্তৃতা হইতেই তাঁহাকে আমরা প্রকৃত আধ্যাত্মিক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি।

সভায় নলিনাক্ষ বক্তৃতা করেন, দশজনে নলিনাক্ষকে লইয়া টানাটানি করে—এর জন্যই নলিনাক্ষ সভায় এবং দশ জনের মাঝে নছেন। তিনি দশ জনের মধ্যে আপনাকে ছড়াইয়া দিতে পারেন বটে, কিন্তু অন্তরেও ডুবিতে পারেন, এবং অন্তরে ডুবায় একতায়ই নলিনাক্ষ চরিত্রের বিশেষত্ব। এমন কি তিনি যখন দশজনের সহিত মিশেন তখনও যেন তিনি তাঁহার নিষ্ঠা-নিয়মের পবিত্রতা গায় মাধিয়া আসেন, তখনো একটি ধ্যানপরায়ণ গভীরতার প্রোতির্গোচকে তাঁহাকে দশজন হইতে পৃথক করিয়া রাখে।

অন্নদা হেমের লিখিত তাঁহার প্রথম পরিচয়ে তাঁহাকে আমরা বেশ আলাপী এবং রসিক বলিয়াই দেখি। কিন্তু বেশী কথা কহাটা তাঁহার মোটেই প্রকৃতিগত নহে, প্রথম জানাশোনার সমস্ত তাঁহার অন্তরতম গভীরতাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য ইহা শুধু কৃত্রিম বাক্জাল। এই প্রথম সাক্ষাতের পর তাঁহাকে আর আমরা বড় বাক্যব্যয় করিতে দেখি নাই। ব্রাহ্ম সমাজ তাঁহাকে আচার পরায়ণতার জন্য নিষ্পন্ন করেন, মাতা ক্ষেমকরী তাঁহার এই যৌবন ভ্রমশ্রমকে ছাড়িতে অনুরোধ করেন, যোগেন্দ্র তাহার মানব চরিত্রানভিজ্ঞ স্থূলতা দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করে, কিন্তু নলিনাক্ষ শুধু নীরবে হাসেন—কোনো প্রতিবাদ নাই, তর্ক নাই, কোমর বাধিয়া বুদ্ধ করিবার লেশ-মাত্র প্রয়াস নাই। বাহিরের কোনো বিরুদ্ধতা তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, বিরোধ-বিক্ষেপ তাঁহার গা হইতে যেন পিছলাইয়া যায়।

মুখে কথা নাই, হাতে কাজ নাই, নায়কতার সাধারণ কোনো লক্ষণই নাই,—অথচ তিনি গ্রন্থের শেষাংশের নায়ক, তাঁহার নায়কত্বের দাবী শুধু তাঁহার নীরব প্রশান্তি এবং স্নিগ্ধ হাসিটির মধ্যেই আছে। প্রত্যক্ষ ঘটনা দিয়া বিচার করিতে গেলে কমলার স্বামী হুড়া নলিনাক্ষের আর কোনো ব্যাধি থাকে না, কিন্তু সেই

ভাবে বিচার করা সব চরিত্র সম্বন্ধে ঠিক বিচার নয় । অপ্রকাশমান নলিনাক্ষ-স্বর্ঘ্যের আলোক-সাহচর্য্য লাভ করিবার জন্য অল্প চরিত্রের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত আলোকের দিকেই আমরা দিগকে তাকাইতে হইবে—অল্প চরিত্রের উপর নলিনাক্ষের প্রভাবের ভিতর দিয়াই আমরা দিগকে নলিনাক্ষকে বুঝিতে হইবে । সেই ভাবে বিচার করিলে দুই নৌকাডুবির শেষাংশ নলিনাক্ষ দিয়াই নিয়ন্ত্রিত,—তাহার প্রভাবে শোক-ত্রিয়মাণ হেমনলিনী বাহিরের নিষ্ঠার মধ্যে দৃঢ়তার অবলম্বন লাভ করিয়াছে এবং বিরুদ্ধতার আঘাতে মুহ্যমান হওয়ার পরিবর্তে প্রশান্ত ভাবে হাসিতে শিখিয়াছে, তাহারি চরিত্রপ্রভাব অল্পদার মনে ধ্যানন্দ ঘণাইয়া তুলে এবং তাহাকে জামতুপদে পাইবার আশায় অল্পদা নিজেকে বার পর নাই সৌভাগ্য বান বলিয়া মনে করেন, যাতা ক্ষেমঙ্গরী তাহারই চরিত্র মহাত্ম্যের ব্যাখ্যায় আপনাকে প্রকাশ করিয়া তুলেন—এবং কমলা এই সৌম্যসুন্দর বেতনার মত স্বামীটির উদ্দেশেই দূর হইতে আপন জীবনযাত্রা চালায় এবং নিকটে আসিয়া সেবাকর্মে পূজার ফুলটুকুর মত তাহারি চরণে পাঙ্ডে আপনাকে নিবেদন করিয়া দেয় । নলিনাক্ষ হেমের গুরু, অল্পদার ভক্তির পাত্র, ক্ষেমঙ্গরীর ‘বাপ’ এবং কমলার স্বামী,—চারিটি ভক্তের দেবতা এই নলিনাক্ষ ;—সেও আবার কেমন ভক্ত,—একটি শিক্ষা সংঘমে অতুল, একটি প্রশান্ত মেহে পরিণত, একটি মানসতা ও সান্ত্বিকতার পূজনীয়া এবং অল্পটি সরল পাণ্ডিত্যের আদর্শ ।

কিন্তু যিনি প্রকৃত দেবতা তিনি আবার তাঁর ভক্ত-গণের ভক্ত-না হইয়া ছাড়েন না । নলিনাক্ষ হেমনলিনীকে সম্মান করেন, অল্পদাকে ভক্তি করেন, তাহার নিত্য-জাগ্রৎ অবিচলিত সেবাহস্ত যাতা ক্ষেমঙ্গরীর ক্ষুদ্র-তম প্রয়োজনে খাটান, কমলার হৃদয়নিহিত সত্য-বাহ্য্যাকে বিধাবর্জিত হৃদয়ে পূজা করেন ।

কমলা-ঘটিত ব্যাপারে নলিনাক্ষ চরিত্রের সুন্দর প্রকাশ হুটিয়া উঠিয়াছে । মা-বাপ-মরা হুহা কমলাকে তিনি না দেখিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন ।

নৌকাডুবিতে কমলা হারািয়া গেলে তিনি বহুকাল পর্য্যন্তও কমলার আশাকে ছাড়েন নাই এবং দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে ক্ষেমঙ্গরীর বিস্তর অনুরোধ সত্ত্বেও কমলার মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় নহেন বলিয়া তিনি শুধু সময় লইয়াছেন । কমলাকে হরিদাসীস্বরূপে দেখিয়া একটা-কি অল্পটিকে স্পষ্ট করিয়া লইবার জন্য তাহার মনের চেষ্টা দেখিতে পাই, রমেশের চিঠি পড়িয়া হরিদাসীই যে কমলা এ সম্বন্ধে তাহার কোনো সন্দেহ থাকে নাই, রমেশের চিঠি যে কথার সাক্ষ্য দিল, নলিনাক্ষের নিজের অন্তরদর্শী দৃষ্টির কাছেও কমলা-হৃদয়ের সেই সত্যতীর্থতার খবরটি গোপন রহিল না । রমেশের সহিত এতদিন বাস করিয়া আসা সত্ত্বেও কমলাকে কোনো প্রশ্ন না করিয়াই এমন বিধাবিহান ভাবে গ্রহণ করায় নলিনাক্ষের খুব মহত্ব প্রকাশ পাইয়াছে ।

কিন্তু মহৎ নলিনাক্ষের চেয়েও আধ্যাত্মিক নলিনাক্ষকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলিতে বাধ্য । এই আধ্যাত্মিকতায়ও আবার নলিনাক্ষের একটু বেশ বিশেষত্ব আছে । রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে একমাত্র নলিনাক্ষই সুবক—নবীন তপস্বী তিনি আর সৃষ্টি করেন নাই । নলিনাক্ষের এ নবীনতা যে সুধু বয়সে তাহা নহে, তাহার চিন্তের সুবভাবেও বটে । আমরা এতদিন শুধু নলিনাক্ষের ধ্যান-অধ্যয়নের গভীরতাই দেখিয়া আসিয়াছি, আজ সহসা সেই শান্ত গুহ্যতার মধ্যে রাবর রক্তিম আলো তাহার রোমকূপ ভেদ করিয়া তাহার হৃদয়কে রাঙাইয়া দিল এবং কমলার রূপায় সেখানে নানাস্বরের নহবৎ বাজিয়া উঠিল । এই পবিত্র প্রেমে নলিনাক্ষের আধ্যাত্মিকতা কিছুমাত্র কমে নাই, বরং তাহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বাড়িয়াছে । পরিণতিকে শুধু যে “Passionless perfection” হইতে হইবে তাহার কোনো মানে নাই “The low Sun that makes the colour” এই বধা মনে করিয়া নলিনাক্ষের আধ্যাত্মিকতাকে খাটো করা

যাইবে না, কারণ নলিনাক এই প্রেমকে আধ্যাত্মিকতার
স্থানে বাধিয়া দিতে পারিয়াছেন, কমলাকে লইয়া
তাঁহার উপাসনায় আমরা তাঁর পরিচয় পাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

সার্থক মিলন।

প্রকৃতি সজনী মোর ! বসন্তের প্রথম উষায়
পুরাত্নে ভক্তের সাধ—ধানাইতে ভালবাসা তায়—
আজ তুমি দেখা দিলে আশ্র-হার্য উন্মাদিনী-সাথে
বহিল অমৃত-বন্তা পিপাসিত অন্তরের মাঝে !

সংসার-অভীতা অগ্নি ! কত শঙ্কা ভাগে মনে মনে
পড়ে পাছে দেবী-মূর্তি সংসারের সন্তপ্ত নয়নে !
উৎকর্ষ-ব্যাকুল অঁধি—লজ্জা-নম্র সূচক আনন
করেছিল তোমা সখী, আরো যেন সুন্দর শোভন !

গাঢ় আলিঙ্গনে বাধি, শুধাইছ তুভিত হিয়ায়
জন্মান্তরে পাব তোম : ? সুখী হবে লাভিয়ে আমায় ?
আশাতীত প্রেমময়ী ! সুখভরা একটি চুপন
সকল উত্তর মোরে দিয়ে গেল নিঃশব্দে কেমন !

বিশ্বের তরুণ আলো, পিত-কণ্ঠ, মৃদল মলয়
জানাইল দেবালীষে এ মিলন সার্থক নিশ্চয়।

১লা ফাল্গুন।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

গিলগিট্‌দিগের বিবাহোৎসব।

গতচৈত্রসংখ্যা “ভারতীতে” আমার লিখিত ‘গিলগিট্’
দিগের আশোদ প্রমোদ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠক পাঠিকাগণ
পাঠ করিয়াছেন, গতবারে আমি গিলগিট্‌দিগের
আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি এবং তাহাদের সর্বপ্রধান
“গিনোবাজনো” উৎসবের বিবরণ প্রদান করিয়াছি।
গত তাহাদের বিবাহ উৎসবের একখানি চিত্র “প্রতি-
ভা” পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম।

শ্রীনগরের উত্তর পশ্চিমাংশে ২২৮ মাইল দূরে
“গিলগিট্” অবস্থিত। স্থানটী ‘কাস্মীর মহারাজের’
অধীনে হইলেও ইংরাজ গভর্নমেন্টের একজন রাজ
নৈতিক কর্মচারী তথায় অবস্থান করিতেছেন। *

‘গিলগিট্’ দিগের বিবাহ প্রণালী অত্যন্ত আশোদ
জনক এবং তাহাতে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে, বালক
গণ ষোড়শ কি সপ্তদশ বর্ষে পদার্পন করিলে পিতা
মাতারা পাত্রী অন্বেষণে ব্যস্ত হয়। কোন পাত্রীর
সন্ধান পাইলে গ্রামের প্রধান গণকে সংবাদ দেওয়া
হয় এবং পাণ্ডাদিগকে ভোজ্য দ্রব্যে পরিভূষ্ট করাইয়া
কন্যার পিতামাতার নিকট বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন
করিতে অনুরোধ করে, প্রধান মহাশয়েরা এই প্রীতিকর
সংবাদ লইয়া কন্যার পিতার নিকট উপস্থিত হয়।
কন্যার পিতা তাহাদিগকে যত পূর্বক ২৩দিন ভোজন
করান এবং স্বীয় গ্রামের প্রধানগণ ও আত্মীয় স্বজনকে
আহ্বান করিয়া একটি মজলিসে এই বিষয় সীমাংসা
করে। কন্যার পিতার সম্মতি পাইলে উভয় পক্ষ তাহাদের
রীতি অনুসারে একখানি প্রার্থনা পত্র পাঠ করে এবং
এইরূপে বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। এই নূতন
আত্মীয়তার নিদর্শন স্বরূপ বরের পিতা কন্যার পিতাকে
নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি উপঢৌকন প্রদান করে...

ধুতি—৫ গজ

হুচি (Needle) ১টা

ছুরি—১খানা

দড়ি—১গাছি

তৎপর বিবাহ উৎসবের দিন স্থির হইলে বরের পিতা
গৃহে কিরিয়া আইসে। বিবাহের নির্দ্ধারিত দিবসের এক
পক্ষ পূর্বে বরের পিতা বা অভিভাবক ৩ ভুলু (১ ভুলু
৮মাসার সমান) স্বর্ণ লইয়া পাত্রীগণের বাটীতে উপস্থিত
হয়। এই স্বর্ণ কন্যার পিতাকে দেওয়া হয় এবং শোভা-
যাত্রায় কত জন লোক সঙ্গে করিয়া, কোন দিন আসিয়া

* গতচৈত্রের ভারতীতে আমার “গিলগিট্” প্রবন্ধ
উল্লেখ্য।

উপস্থিত হইতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আইসে। বাড়ী আসিয়া বরের পিতা আবশ্যকীয় সাজ সংগ্রাম সংগ্রহ করিয়া চারি সের পরিমিত স্নাত পাঠাইয়া দেয়। 'খ'কে "ভাওয়াই—বৃত্ত" বলে। (ভাওয়া—pan) এই বৃত্ত না পৌঁছা পর্যন্ত বিবাহের এক অঙ্গ "ভাও" উৎসব সম্পন্ন হইতে পারে না; এবং বিলম্বে পৌঁছিলে বরপক্ষকে ১ডুল্ল স্বর্ণ দণ্ড স্বরূপ দিতে হয়। বিবাহের পূর্ব দিবস রজনীতে সমস্ত গ্রামবাসী গণের সম্মুখে ৮টার সময় এই উৎসব সম্পন্ন হয়। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যস্থলে একটী সুরহুং লৌহ কটাহ স্থাপন করিয়া "কাছারী" কিস্মা "বাবুসী" বংশীয় কোন ব্যক্তি স্নাত, আটা, এবং চিনি, বৃক্ষের বীজ ও পাতা লইয়া ছুটীয়া আইসে এবং দ্রব্যগুলি কটাহে রাখিয়া অল্প অগ্নিধারা উত্তাপ দিতে থাকে, কটাহস্থ দ্রব্যগুলি হইতে ধূম নির্গত হইলে পর, লোকটী উভয় হস্তে কটাহের হাতনি ধরিয়া কটাহটি মন্তকোপরি উত্তোলন করে, এই সময় তাহাদের বাজ্ঞও অদ্ভুত রবে বাজিয়া উঠে এবং বাজনার তালে তালে নৃত্য করিয়া কটাহধারী ধরময় ঘুরিয়া বেড়ায়। নৃত্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত লোক সকল করতালি দিয়া সমস্তেরে নিয়লিখিত গানটী গাহিতে থাকে—

(ক) ইহা 'বইর গুলের' 'তাও'
দিবনা রাখিতে মাটিতে কাউকে
নিজেই রাখিব 'তাও' (pan)।

(খ) ইহা 'মালীক' প্রধানের 'তাও'
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।

(গ) ইহা রাজোপযুক্ত তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।

(ঘ) ইহা সংসার উপযোগী তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।

(ঙ) ইহা 'শামীর' প্রধানের তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।

(ক) (খ) Bairgul of Malik—Chief of Kashmir.

(ঙ) Sha Mir—The Chief of Kashmir.

(চ) ইহা 'ম্যাকপান' প্রধানের তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।

(ছ) ইহা মাঘলট প্রধানের তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।

(জ) ইহা 'খানা' রাজার তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।

(ঝ) ইহা খান্নি 'গীরখির' তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।

(ঞ) ইহা 'মারিও' প্রধানের তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।

(ট) যদিও 'নীল' তাওয়ার কর্তা
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।

পুরুষগণ যখন এই অপূর্ব সঙ্গীতে মত্ত থাকে, সেই সময় স্ত্রীলোকগণ নিম্ন লিখিত গানটী গাহিয়া থাকে—

(ক) এই 'রক্ত প্রবাল' 'বইর গুলের'
দিবনা রাখিতে অন্য কাউকে
নিজেই গাণিব আমি।

(খ) এই 'প্রবাল-ভাওয়ার' 'মালিক' প্রধানের
দিবনা রাখিতে অন্য কাউকে
নিজেই গাণিব আমি।

(গ-ট) কেবল মাত্র উপরের নামগুলি
উল্লেখ করিয়া এই কথা বার বার
গাহিতে থাকে।

এই গানটী শেষ হইলে 'কাছাড়া' একমুহূর্তের জন্য কটাহ ধানি চুল্লির উপর স্থাপন করে, এবং পুনরায় তাহা দুই হস্তে মাথার উপর উচু করিয়া তুলিয়া নৃত্য গীতে মত্ত

(চ) Maqpan—The Chief of Skardu.

(ছ) Mughlot—The Chief of Nagir.

(জ) Khana—The Raja of Yasin.

(ঝ) Girkhit—The Ruler of Hunza.

(ঞ) Maryo—The Son of Machat

(a celebrated person of 'Rono' Family.)

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

হয়। তৎপর জীলোক দিগের মধ্যহইতে একজন কুমারীকে বাহির করিয়া আনিয়া, সেই কটাহটীর ভার অর্পণ করিয়া, অন্য কাহারও সাহায্য ব্যতীত ৫ ধানি পিষ্টক ভাজিতে অল্পরোধ করা হয়। পাঁচ ধানি পিষ্টক প্রস্তুত হইলে, কুমারী অন্যান্য জীলোকগণের উপর সমবেত লোকগণের আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিবার ভার অর্পণ করে; এবং তাহারও আত্মাদের সহিত সেই ভার গ্রহণ করে। জীলোকগণ রন্ধনের কার্য আরম্ভ করিয়া দিলে পর, তাহার অন্য একটি গৃহে গমন করিয়া সমস্ত রাত্রি নৃত্য, গীত ও আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করে। এই রাত্রিকে “ভারওয়াই রাত” অর্থাৎ “ভাওয়ার রজনী” বলে।

যদি বরকে কোন দূরত্বের গ্রামে কত্তার বাড়ী বাইতে হয়, তাহা হইলে শোভা যাত্রার দিবস প্রত্যুষে বর স্নান করিয়া যতদূর সম্ভব তাহাদের ভাল পোষাক পরিধান করে এবং নিরলিখিত গীতটী বর একবার উচ্চারণ করিলে পর, তাহার অনুচরগণ সম্মুখে সেই পংক্তিটী পুনরাবৃত্তি করে—

“প্রনমিব আগে মায়ের চরণে

স্তন্য দিয়াছেন যিনি”

তৎপর বর তাহার মাতার চরণে প্রণাম করিয়া ফিরি-
য়া আসিলে, বরযাত্রীগণ নিম্ন লিখিত কবিতাটী আবৃত্তি করে—

“ওরে পাথর ভূই ভারী হ,

অতি শুভ দিন আজ এসেছে;

ওরে পাথর ভূই ভারী হ

সোনার সঙ্গে তোর ওজন হবে,

সন্ধ্যার সময় যখন বরযাত্রীগণ তাহাদের গন্তব্য স্থানে-
র নিকটবর্তী হয়, তখন তাহাদের আগমন বার্তা জ্ঞাপন
করিবার অভিলাষে, অতি নিকট দূরে উল্লাস ধ্বনি করি-
য়া থাকে, কত্তাপক্ষও সেই রাস্তা-বিনিম্বিত আনন্দ
ধ্বনীর একটি অনুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া, বর পক্ষ-
ক সন্ধ্যা করিবার মানসে, বাহির হইয়া আইসে; উভয়

পক্ষ কত্তার বাটীতে উপস্থিত হইয়া ছড়া, কবিতা ও সঙ্গী-
ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। সেই সকল গানে, কেবল মাত্র
তাহাদের পূর্ব পুরুষগণের এবং গ্রামের প্রধান গণের
মহত্ত্ব ও বীৰ্য্য কাহিনী থাকে; এবং অতি গর্বের সহিত
একে অত্ৰকে পরাজিত করিবার অভিলাষে, কত্তা কত্তার
বাড়ী ধানি মুখরিত করিয়া তোলে; তৎপর আহাৰ্য্যাদি
সম্পন্ন হইলে নৃগীতাধিতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কাটায়।
একজন মল্ল শোভাযাত্রার সময় বরের সঙ্গে সঙ্গে থাকে,
পরদিন প্রাতঃকালে সেই মল্ল বিবাহের মন্ত্র পাঠ করে।
কত্তার পিতা সেই সময় কত্তার জন্ত গহনা, কাপড় চোপার
এবং থালা বাসন ইত্যাদি লইয়া আইসে। কত্তার পিতা
সন্ধ্যাপন্ন হইলে কত্তাকে এই সকল বস্তু প্রদান করিবার
জন্ত বরের নিকট হইতে কৃত্য আদায় করে না। কিন্তু
মূল্য না লইলে স্বামীর আত্ম স্বীয় সম্পত্তির উপর কোন
প্রকার দাবী থাকে না, তৎপরে স্বামীর সম্পত্তি জীর বলিয়া
গণ্য হয়; এবং স্বামীর মৃত্যুর পর, জী ইচ্ছামুসারে পর
পুরুষের অংশগ্রহণী হইতে পারে।

কত্তার পিতা দরিদ্র হইলে বিবাহের উপকরণাদি
অর্থাৎ থালা, বাটি, বাটি ইত্যাদি কত্তার সহিত প্রদান
করিতে অসমর্থ হইলে, বরের পিতা কত্তাপক্ষের নির্দেশ
মত, সেই মূল্যের কোন জিনিষ, কত্তার পিতাকে দান
করে; এবং এই দানের জন্ত স্বামীর মৃত্যুর পর, জী
স্বামীর আত্মীয় স্বজনদের সম্মতিভিন্ন পুরুষান্তর গ্রহণ
করিতে পারে না। এই প্রথা কে “কালক মালক”
বলে।

উৎসব সমাপনান্তে বরযাত্রীগণ গৃহে ফিরিবার জন্ত
প্রস্তুত হয় এবং পাত্রীকে বরের ঘরে বাইতে উৎসাহিত
করিবার নিমিত্ত নিম্ন লিখিত সঙ্গীতটী সকলে গাহিয়া
থাকে—

ওগো মায়ের জন্ম নন্দা

বাহির হয়ে এসগো,

ওগো জলের অধিবরী

কেন দেবী করগো,

এস ওগো স্বর্ণ কুণ্ডলা

কেন দেবী করগো,

মুক্ত-দণ্ড-নিধাননী

কেন দেবী করগো।

গান শেষ হইলে কস্তাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনে, এবং কস্তা তাহার পরিজন বর্গের বিরহে উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন সকলে মিলিয়া পুনরায় নিম্ন লিখিত গানটি কস্তাকে সাহুনা দিবার জন্য গাহিতে থাকে,

কৈদোনা কৈদোনা

ফুল কুমারী,

গায়ের বরণ মলিন হবে;

পাহাড়ের উপর

ঘাইবে তুমি

গায়ের বরণ মলিন হবে।

কাঁদিলে তোমার

পুড়িবে হৃদয়

গায়ের বরণ মলিন হবে।

গিলগিটে ‘সিনাকি’ নামক স্থানে ‘কাস্ত’ প্রথা প্রচলিত আছে। কোন যুবক কোন যুবতীর প্রেমে পরিলে, যদি যুবকের পিতা মাতা সেই যুবতীর সহিত বিবাহ দিতে অসম্মত হয়, তবে যুবক গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া বলে “যদি আমার সহিত অমুক বালিকার বিবাহ দেওয়া না হয়, তবে আমি ‘কাস্ত’ করিব।” সকলকে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবার অভিলাষে সে গ্রামের বাহিরে গিয়া, একটা বালুকের আওয়াঙ্গ করে; তৎপর সকলে সেই স্থানে সমবেত হইলে, পুনরায় সেই “কাস্ত” করিবার কথা বলে, কিম্বা সুযোগ পাইলে কয়েক জন লোকের সম্মুখে, সেই কস্তাটিকে ধরিয়া তাহার ভাষার বা কাপড়ের একটু অংশ ছিঁড়িয়া দিয়া বলে—“তুমি আমার।”

এই “কাস্ত” করিতে পারিলে যুবকের পিতা মাতা বালিকার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু

এখানে কস্তার পিতা বরের অবস্থানসারে ইচ্ছানুসারে অর্থ আদায় করিয়া লইতে পারে। এই “কাস্ত” হইয়া গেলে পর যদি সেই কস্তার কাহারও সহিত বিবাহ হয় তবে যুবক সেই বালিকার ও তাহার স্বামীর প্রাণ বধ করিতে সতত চেষ্টিত থাকে এবং অনেক সময়েই কৃতকার্য হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিত্তা।

রাজ তরঙ্গিণী

৬ষ্ঠ তরঙ্গ।

মঙ্গলাচরণ—পার্কীতী স্তুতি :—

সুরবধূগণ বলিতেছেন—“দেবী অপর্ণা প্রেম বাহা-
ছোই চণ্ডাচরণের মহেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়াছেন,
রুক্মপত্র অথবা বায়ু ভরণ পূর্বক যে কঠোর তপস্তা
করিয়াছিলেন সেই তপস্তার প্রভাব ইহার কারণ নহে।”

সুরবধূগণের মুখে এই কৃতিসুধাবহ স্তুতি শ্রবণ
করিয়া হর্ষাশ্রিত পার্কীতী শ্রোতৃবৃন্দের রুক্ষা বিধান করিল।
মহারাজ যশস্কর (১৩৯-৪৮ খ্রীঃ)—

মহারাজ যশস্কর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যে
নানাবিধ সুব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহার
সুশাসনে চোরের উপদ্রব সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছিল।
রাজিকালে পশুশালায় দ্বার রুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইত
না। পথিকগণ নিরুপদ্রবে গমনাগমন করিতে পারিত।
ইনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত রাজকাৰ্য্য পর্য্যবেক্ষন করিতেন।
সর্বপ্রাপহারি পূর্বতন কর্মচারিবৃন্দ সামান্য কৃষিকার্য্যের
অধ্যাক্ষতা বাতীত অন্য কার্য্য পাইত না। গ্রাম্য প্রজাবৃন্দ
কৃষিকার্য্যে রত থাকিত সুতরাং রাজধানী তাহাদের নেত্র
পথে পতিত হইত না। ব্রাহ্মণগণ স্বধ্যায় নিরত ছিলেন,
অন্নধারণ পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিতেন না, বিপ্র
গুরুগণ সাম গান করিতেন কখনও মত্ত পান করিতেন না,
তাপসগণ তপস্তা নিরত ছিলেন—পুত্রদ্বার তরনার্থ পত
বাস্ত সংগ্রহ করিতেন না। রক্ষণগণ বিনীত ছিলেন।

দৈবজ্ঞ, বৈজ্ঞ, সভ্য, গুরু, মন্ত্রী, পুরোহিত, দূত, বিচার-পতি বা লেখক কেহই অপণ্ডিত ছিলেন না।

মহারাজ যশস্কর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সুবিচারক ছিলেন। একদা একব্যক্তি প্রায়োপবেশন করিয়াছিল। রাজা তাহার নিকট প্রায়োপবেশনের কারণ অবগত হইয়া তাহার প্রার্থনা অনুসারে স্বয়ং বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ও অতি আশ্চর্য্য কৌশলে তাহার সুমীমাংসা করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

ইহার বুদ্ধিমত্তাশ্রুত্রে দেশে অশৃঙ্খলা সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ইনি এইরূপ সদৃশ্য সম্পন্ন হইয়াও স্বীয় দুর্নীতি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ইনি চারিজন অল্পমত নগরপাল দ্বারা বণ্টিত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং কপটতা অবলম্বন পূর্বক পদাতিগণকে নিহত করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুর পর ইনি অধিকতর দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া উঠিয়া ছিলেন। ইনি বেলাবিত্ত নামক এক ব্যক্তিকে মণ্ডলেশ্বর করিয়াছিলেন এবং রাজমহিলীগণ বেলাবিত্তের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন জানিতে পারিয়াও কোন প্রতিবিধান করেন নাই। ললা নারী এক বেগার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া ইনি তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। “পূর্ব জন্মের সংকার্য্যের ফলে সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছি, ইহ জন্মে সংকার্য্য করিলে পর জন্মেও রাজত্ব লাভ করিতে পারিব” এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজ সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। পৈতৃক ভূমিতে আর্ঘ্যদেশাগত বিদ্বার্ধিগণের জন্ত ইনি ষষ্ঠ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন ও ষষ্ঠাধিপত্যকে রাজ চিহ্ন ছত্র চামর প্রদান করিয়াছিলেন এবং বিত্ততা নদীতীরে ব্রাহ্মণগণকে ৫৫টা অগ্রহার প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি উদর ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু আসন্ন বৃত্তিতে পারিয়া ছিলেন কিন্তু স্বীয়পুত্র সংগ্রাম দেবকে রাজ্য প্রদান না করিয়া পিতৃব্য (Paternal Grand-uncle) রাঘবদেব পুত্র বর্ষটকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। বর্ষট রাজ্য লাভ করিয়া পণ্ডিত যশস্করের কিছুকাল তত্ত্বাবধান না করায় ব্রহ্মিণের পরামর্শে বর্ষ-

টকে একরাত্রি অষ্টভুজ মণ্ডপে বন্দী রাখিয়া পর দিন নির্দাসিত করিয়া স্বীয়পুত্র সংগ্রামদেবকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। পৌড়া ক্রমে বর্ধিত হওয়ায় ইনি মৃত্যুর দৃঢ় রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ২৫০০ শত স্বর্ণ মুদ্রা সঙ্গে লইয়া নিজ ঘাটে গমন করেন। কিন্তু পূর্বপুত্র প্রভৃতি মন্ত্রিগণ মিলিত হইয়া ঐ মুদ্রা আত্মসাৎ করায় মহারাজ যশস্কর ঐ ঘাটের অন্ধকারময় কুটার মধ্যে ব্যাধির বহনায় লুপ্ত হইতে লাগিলেন। প্রদান অনুগ্রহভাজন বেলাবিত্ত-গণ তাহার মৃত্যুর বিলম্ব দেখিয়া বিধিপ্রয়োগে প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল। সাম্রাজ্যী রাজ্যে ত্রৈলোক্য দেবী পতির অনু-গমন করিয়াছিলেন।

মহারাজ যশস্করের মৃত্যু লক্ষ্যে এইরূপ জন ঐতিহ্য আছে যে মহারাজ বর্ষাশ্রম শর্ম্মের তত্ত্বাবধানার্থ বহুপরি-কর হইয়া চক্রভাসু নামক এক ব্রাহ্মণ তাপসের সহিত মিলিত হন এবং তাহার অস্ত্রের আচরণ দেখিয়া তাহাকে অপমানিত করায় চক্রভাসু মাতুল ইন্দ্রজালবিজ্ঞাবিহারদ বীরনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন।

মহারাজ যশস্কর ২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ২৪ অঙ্গে কৃষ্ণ তৃতীয়াতে মহারাজ যশস্কর মৃত্যুশ্রুতি পতিত হইয়াছিলেন।

মহারাজ সংগ্রামদেব (১৪৮—৪৯ খ্রীঃ) :—

মহারাজ সংগ্রামদেব মহারাজ যশস্করের পুত্র ছিলেন। যশস্কর ইহাকে শৈশব সময়েই সিংহাসন প্রদান করিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। শিশুর পিতামহী শিশুর অভিভাবিকা স্বরূপ হইয়াছিলেন। পূর্বপুত্র, ভূভট প্রভৃতি পাঁচজন মন্ত্রী রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন। ক্রমে পূর্বপুত্র পিতামহীর সহিত অস্ত্রান্ত মন্ত্রীবর্গের বিনাশ সাধন করিয়া স্বয়ং সর্ব্বব্যয় কর্তা হইয়া ছিলেন। পূর্বপুত্র শিশু রাজা সংগ্রামদেবকে বহুস্ত্র আহার্য্য জব্যাদি প্রদান করিয়া নিজের হ্রোহশূন্যতা প্রকাশ করিতেন এবং একাদ্য সামন্তগণের ভয়ে রাজাকে একান্ত ভাবে বিনাশ করিতে না পারিয়া অভিচার ক্রিয়া দ্বারা সংগ্রামদেবকে বিনষ্ট করিতে প্রয়াসী হন কিন্তু তাহাতে বিফল মনোরথ

হইয়া শক্তি হইয়াছিলেন। এমন সময় একদিন অত্যধিক তুষার পাত হইয়া জন স্ফার রুদ্ধ প্রায় হইয়াছিল এই সুযোগে পর্কণ্ডপ্ত বহু সৈন্যসহ রাজধানী অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে প্রভুতর মন্ত্রী রামবর্দ্ধন পুত্র বুদ্ধের সহিত নিহত হইয়াছিলেন। বক্রাজিৎ সংগ্রামদেবও পর্কণ্ডপ্ত বর্জক নিহত হইয়া বিতস্তা নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজ পর্কণ্ডপ্ত (৯৪৯—৫০ খ্রীঃ)।—

২৪ অঙ্কে ফাস্তন মাসের কৃষ্ণদশমী তিথিতে পাপাত্মা পর্কণ্ডপ্ত সিংহাসনা-রোহন করিয়াছিলেন। ইহার পিতার নাম ছিল সংগ্রাম গুপ্ত। বিশোকের সমীপবর্তী অভিনব নামক শিবিরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাঁহারা পূর্বে পর্কণ্ডপ্তের বিরোধী ছিলেন তাঁহারাও পর্কণ্ডপ্তের ভয়ে নিবৃত্ত হইয়া ছিলেন।

স্বর্ষ্যবংশীয় জনৈক একাদী মদনাদিত্য পর্কণ্ডপ্তের নিকট অপমানিত হইয়া নির্ভিন্ন মনে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক ত্রিপুরেধরে বাস করিয়াছিলেন। অতাপি ত্রিপুরে-ধরে তাঁহার বংশীয়গণ বাস করিতেছেন।

পর্কণ্ডপ্ত প্রজাপীড়ন করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করিয়া ছিলেন। ইনি পর্কণ্ডপ্তেশ্বর শিব স্থাপন করেন।

মহারাজ যশস্করের পরম সাক্ষী এক মহিষীর প্রতি ইনি আসক্ত হইয়া তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। রাজ্ঞী, কোশলক্রমে ইহার দ্বারা স্বামীর অর্দ্ধ সমাপ্ত যশ-স্কর স্বামিন্দ্রের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া লইয়া সেই মন্দিরে যজ্ঞার্থ বহু প্রজ্জলিত হইলে সেই যজ্ঞকুণ্ডে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পর্কণ্ডপ্ত রাজ্ঞীর অসম্ভব সাহসের বিষয় চিন্তা করিয়া ক্ষণ হইয়া পড়িয়া ছিলেন এবং আবাচের কৃষ্ণাভ্রয়োদশীতে স্নেহেরী ভার্ণে (dropsy রোগে) মানব লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ ক্ষেমগুপ্ত (৯৫০—৫৮ খ্রীঃ)।—

ইনি মহারাজ পর্কণ্ডপ্তের পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি পৈতৃক সিংহাসনে আরোহন করিয়া

ছিলেন। ক্ষেমগুপ্ত অতিশয় মত্তপায়ী, বৌবন-গর্ষিত ও বাসনী ছিলেন। ফলন প্রভৃতি চাটুকারগণ ইহার দুর্ভার্য্যে সহায়তা করিত। ইনি পরাক্রমানাগুপ্ত ছিলেন স্ত্রতর্য্য ধূর্তগণ ইহার সহিত মিলিত হইয়া দক্ষদা রাজ-ধন লুণ্ঠন করিত। এই সময় রাজ সভা মনোবিগণের অগম্য হইয়া-ছিল। ধূর্ত জিহ্মপুত্রগণ ক্ষেমগুপ্তকে কক্ষণবর্ণনামে অভিহিত করিয়া তাহাদ্বারা বহুবার কক্ষণ বর্ষন করা-ইয়া ছিলেন। পাপিষ্ট লালিতক (মোসাহেব, গণ রাজার উপভোগার্থ স্বীয় পত্নী প্রদান করিতে ও কুষ্টিত হয় নাই। মহারাজ যশস্করের মন্ত্রী ভট্টকল্লনও ক্ষেম গুপ্তের অনুজীবী হইয়াছিলেন। ফলন ভট্ট কল্লন স্বামী প্রভৃতি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

একদা কম্পনেশ রক্ত ডামর (পতি) সংগ্রামের বিনা-শার্থ রাজার সাহায্য প্রার্থনা করেন। নির্দয় রাজা জয়েজ বিহারের সহিত বুদ্ধ রক্তকে ভক্ষীভূত করেন ও জয়েজ বিহারের সুগতের প্রতিমা দগ্ধ করিয়া ঐ প্রতি-মার পিতৃগ রাশি ও অত্যান্য পুরাতন দেবালয় সমূহ হইতে প্রস্তরাদি সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা রাজধানীতে স্বীয় যশপ্রতিষ্ঠার্থ ক্ষেমগৌরীধর নামক শিব স্থাপন করিয়া ছিলেন।

ক্ষেমগুপ্ত দক্ষ বিহারান্তর্গত ৩৬টী গ্রাম অধিকার করিয়া খস নৃপতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। লোহরাদি দুর্গের অধিপতি প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতি সিংহরাজ স্বীয় তনয়া দিদাকে ক্ষেমগুপ্তের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। রাজ্ঞী দিদা শাহির দৌহিত্রী ছিলেন। রাজা দিদার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন বলিয়া অপমান হচক “দিদা-ক্ষেম” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। মহারাজ ক্ষেমগুপ্ত শাহ রাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়া ভীমকেশব স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি দ্বারপতি ফল্লনদ্বিত্য চন্দ্রলেখাকে বিবাহ করায় ফল্লনের সহিত রাজ্ঞী দিদার মনোমালিন্য স্বাভাবিক। ক্ষেমগুপ্ত গুরুপদেশ ও অংবিদ্যা লাভ করিয়াও তাহার কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই। ইনি শৃগাল শীকার করিতে বড় ভাল বাসিতেন। ব্যাধি

ও কুকুর সমূহে পরিবৃত্ত হইয়া দামোদরারণ্য, ললাণ, শিমিকা প্রভৃতি স্থানে শৃগাল খোকার করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একদা কৃষ্ণাচতুর্দশীতে এক শৃগালীর মুখ হইতে বহু শিখা নির্গত হইতে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন ও দ্বার বৃদ্ধ লুতা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর জন্য বরাহ ক্ষেত্রে গমন করেন। এইস্থানে ত্রীকর্ণ ও কেশ নামক দুইটা মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। এইস্থান হরুপুরের নিকটবর্তী ছিল। মহারাজ কেশগুপ্ত বরাহ ক্ষেত্রে ৩৪ অব্দে পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের নবম দিনে জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ অভিমত্মা ' ১৫৮—৭২খ্রীঃ)

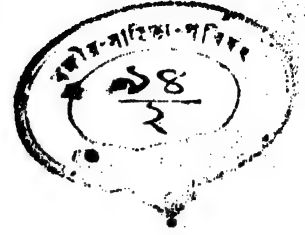
মহারাজ অভিমত্মা মহারাজ কেশগুপ্তের পুত্র ছিলেন। ইহার মাতার নাম ছিল দিদ্ধা। অভিমত্মা পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তখনও শিশু বলিয়া তাঁহার মাতা দিদ্ধার কর্তৃত্বাধীনেই চলিতেন। রাজ্ঞী দিদ্ধা অতিশয় দুষ্টরিত্রা ছিলেন এবং অল্প কালের মধ্যেই প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

অভিমত্মার রাজত্ব সময়ে ভূদেবের ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া মহাগৃহ সকল ভস্মভূত হইয়াছিল। রাজ্ঞী দিদ্ধা ন্যায় অন্যায় বিচারে অসমর্থ ও চপলবনী ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী ফল্গুনের প্রতি দিদ্ধা প্রথম হইতেই বিরক্তা ছিলেন। কেশগুপ্তের মৃত্যুর পর সপত্নীগণকে অনুমতি হইতে দেখিয়া দিদ্ধাও দম্ভ প্রকাশ পূর্বক অনুমতি হইতে ইচ্ছা করিলে মন্ত্রী ফল্গুনও তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন, পরে দিদ্ধা চিতা সমীপে উপস্থিত হইয়া ভীত চিত্তে রোদন করিতেছিলেন দেখিয়া কৃপালু মন্ত্রী নরবাহন অনুমতি হইতে নিবেদন করিয়াছিলেন। অতঃপর পিণ্ডন বতাব রক বিরক্তচিত্তা দিদ্ধাকে ফল্গুন হইতে রাজ্যস্বরণের আশঙ্কা আছে এইরূপ বুঝাইয়াছিলেন। ফল্গুনও রাজ্ঞীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শঙ্কিত চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। কেশগুপ্তের অস্থি গদ্যায় নিক্ষেপ করিবার জন্য ফল্গুনের পুত্র কর্দ্দমরাজ গলাভীয়ে গমন

করিলে মন্ত্রী শঙ্কিত চিত্তে বহু সৈন্য লইয়া স্বীয় তনয়ের আগমন পর্য্যন্ত পণোৎসে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হইয়া ছিলেন। ফল্গুন সৈন্যে নগর হইতে কাঠবাট পর্য্যন্ত গমন করিলে দিদ্ধা ধ্বজদণ্ডধারী পুরুষদিগকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মন্ত্রী এই নুতন অপমানে ধিক্ত হইয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রত্যাঘর্ষণ পূর্বক বরাহ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্বীয় প্রভুর জন্ত বহু বিলাপ করত ভগবান বরাহ দেবের পদপ্রান্তে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজমাতা দিদ্ধাও ফল্গুনের অস্ত্র পরিত্যাগের বিষয় অবগত হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর ফল্গুন সৈন্যে পণোৎসে গমন করিলে অস্ত্র মস্তিষ্কগর্গ নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে দিদ্ধাও রাজ্যের কটক হ্রস্ব করিবার উপায় চিন্তা করিতে ছিলেন। পূর্বে রাজ্য প্রাপ্তির জন্ত পর্শগুপ্ত ছোজ ও ভূতট নামক মন্ত্রিবরের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্বীয় তনয়া দ্বয়কে তাঁহাদের সহিত বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ দুই তনয়ার গর্ত্বজাত মহিমন্ ও পাটল নামক দুইটা পুত্র রাজগৃহে পালিত হইতেছিল। ক্রমে উভারা রাজ্য প্রার্থী হইয়া উদ্দাম প্রকৃতি হিংস্র প্রকৃতির সহিত মিলিত হইলে দিদ্ধা উভয় মন্ত্রীকেই রাজধানী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ ভ্রাতৃত্ব হিংস্র প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়াছে অবগত হইয়া দিদ্ধা মহিমের নিকটসমীপে ধ্বজদণ্ডধারী পুরুষ নিযুক্ত করিলে মহিম স্বীয় স্বত্ত্ব শক্তি সেনার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। উভয় পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইলে হিংস্র, মুকুল, এর-মন্তক প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মহিমের সহিত মিলিত হইয়া কান্দীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। এই বিপৎসময় সময়ে একমাত্র প্রভুহস্ত : দ্বী নরবাহন দিদ্ধার পক্ষ ত্যাগ করেন নাই। শত্রুপক্ষ সম্মিত হ পদ্মবাহীর নিকট উপস্থিত হইলে দিদ্ধা বহু উৎকোচ প্রদান করিয়া শত্রুগণের মধ্যে তেঁদ উৎপাদন করিয়া ছিলেন। ইহাতে উভয় পক্ষে যে সন্ধি হয় তাহাতে নির্ণীত হইয়াছিল যে দিদ্ধা যদি তাহাদের মধ্যে কাহাকেও

প্রতিভা

সচিত্র
মাসিক পত্রিকা



শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার সেন
প্রকাশিত

দ্বিতীয় বর্ষ

১৩১৯

ঢাকা

প্রতিভা কার্যালয় হইতে প্রকাশিত

সম্পাদক

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি, এল

দ্বিতীয় বর্ষের সূচী

প্রতিভা, ১৩১৯

বর্ণানুক্রমিক সূচী

| | | | | |
|--|-----|--|-----|-------------|
| অর্ধকালী | ... | শ্রীমতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ... | ২৪৬ |
| অঙ্কুতাচার্য-বিরচিত রামায়ণ—সুন্দরকাণ্ড— | ... | শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ... | ১১৪ |
| অমর প্রেমিক (কবিতা) | ... | শ্রীকীবেন্দ্রকুমার দত্ত | ... | ৬৫০ |
| অনিরাজ বা হলুদে পাখী (২) | ... | শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য | ... | ৪০৫ |
| আচার্য হরিনাথ | ... | শ্রীঅম্বোরনাথ ঘোষ | ... | ৩২৫ |
| আদর্শ ধনপতি (গল্প) | ... | শ্রীঅম্বোরনাথ ঘোষ | ... | ৩৬৪ |
| আমরণ (কবিতা) | ... | শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী | ... | ৬০০ |
| আমার ভ্রমণ | ... | শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন | ... | ২৮১ |
| আলোক, বায়ু ও স্বাস্থ্য | ... | শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | ... | ৬২৭, ৭১৬ |
| ইতিহাস বিজ্ঞান এবং মানবজাতির আশা | ... | শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, এম, এ, বি, এল, | ... | ২২৫ |
| উবা (কবিতা) | ... | শ্রীপূর্ণকুমার দত্ত | ... | ২৬৩ |
| একটি ঘড়ির কাহিনী (গল্প) | ... | শ্রীঅম্বোরনাথ ঘোষ | ... | ৪৫৩ |
| একাচোরা ব্রত | ... | শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার | ... | ৪৩৩ |
| কল্পনা (কবিতা) | ... | শ্রীকীবেন্দ্রকুমার দত্ত | ... | ২১৫ |
| কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ | ... | শ্রীসুধরঞ্জন রায় বি, এ, | ... | ১৭, ৭৫, ১৫০ |
| কবি (কবিতা) | ... | শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | ... | ১ |
| কবি ও শব্দ (কবিতা) | ... | শ্রীশশীকমোহন সেন বি, এল, | ... | ৬৪৬ |
| কবিতার প্রতি (কবিতা) | ... | শ্রীপ্রতিভাময়ী দেবী | ... | ৪০৫ |
| কবিস্বপ্ন | ... | শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ | ... | ১৮৩ |
| কবিকাহিনী (গল্প) | ... | শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ শর্মা বি, এ | ... | ৬৬৬ |
| কাহাড়ী জাতি | ... | শ্রীগুরুবল্লভ ভট্টাচার্য বি, এ, | ... | ৩৭ |
| কাহাড়ী জাতির প্রাচীন ইতিহাস, | } | শ্রীগুরুবল্লভ ভট্টাচার্য বি, এ, | ... | ১৫৩ |
| সমাজ ও পরিবার | | শ্রীগুরুবল্লভ ভট্টাচার্য, বি, এ, | ... | ২৬০ |
| কাহাড়ীর বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ | ... | শ্রীগুরুবল্লভ ভট্টাচার্য, বি, এ, | ... | ২৩২ |
| কাহাড়ীর ধর্ম | ... | শ্রীগুরুবল্লভ ভট্টাচার্য, বি, এ, | ... | ৩৪৭ |
| কাহাড়ীতে হিন্দু প্রভাব | ... | শ্রীচারুশালা গুপ্ত | ... | ৭০৪ |
| কে ছুঁনি (কবিতা) | ... | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|--|----------|
| বাংলালির মসজিদ (ঢাকা) | ... | শ্রীঅম্বিনীকুমার সেন | ... | ২৪৯ |
| বাংলালির মসজিদ (খুলনা) | ... | শ্রীগণপতি রায় | ... | ২৪৯ |
| ধোকা হুক | ... | শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য | ... | ৬৬৫ |
| পাতিগীর ঝাড় | ... | শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাপচি, এম্. এম্. এস্ | ... | ৪০৬ |
| পাটু ব্রত | ... | শ্রীশুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য, বি, এ, | ... | ৭২২ |
| দিলগিটুদিগের বিবাহোৎসব | ... | শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মহিষা | ... | ৮২ |
| গোময়ের ব্যবহার | ... | শ্রীঅম্বকুলচন্দ্র সরকার এম, এ; এফ্. সি, এস; পি, আর, এস্ | ১২২ | |
| গ্রন্থমালোচনা | ... | | ৬০, ১২২, ১৮৬, ২৪০, ৩০৮, ৩৬৮, ৪৩২, ৫০৩, ৫৫২, ৬১৬, ৬৬৪ | |
| ঘন ঘোর বরিষার (কবিতা) | | শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম, এ, বি, এল, | | ১৭২ |
| ঘুমু পাখী (কবিতা) | ... | শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত | ... | ৩৬৫ |
| ঘুমু পাখী | ... | শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য | ... | ৪২৬ |
| চন্দ্রসিংহ ত্রিপুর বা চন্দ্র সেন | ... | শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি, টি, | ... | ৬০১ |
| চিহ্নাংগিতা | ... | শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ শর্মা, বি, এ, | ... | ৭২৭ |
| চুনালের স্বতি (কবিতা) | ... | শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ | ... | ৪৬০ |
| চুচুকা সাহিত্য সম্মিলন | ... | শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মহম্মদার, এম, এ, বি, এল, | ... | ৪৭ |
| চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাং | ... | শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদার বি, এ, এফ্. আর, হিট্. এস্ | ... | ৩৭২ |
| ছায়াছায়া (কবিতা) | ... | শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | ... | ৩৫৬ |
| জড়-জগতের অস্তিম উপাদান ও | } | শ্রীপ্রিয়দারঙ্গন রায় এম, এ, | ... | ১২৫ |
| রাসায়নিক পদার্থ নিচয়ের উৎপত্তি | | | | |
| জানী ও অজান (কবিতা) | | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিষা | ... | ১৬২ |
| জিঞ্জিরা | ... | শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় | ... | ২৮৮ |
| ঝড়া (কবিতা) | ... | শ্রীযশোদালাল বণিক বি, এল | ... | ৪২২ |
| টাকার বস্ত্র শিল্প | ... | শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় | ... | ১১০, ১৭০ |
| তাপ | ... | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, | ... | ৩২ |
| দর্পহারী ভগবান (পদ্য) | ... | শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ শর্মা বি, এ, | ... | ৩০৬ |
| বিজ মুহুম্ব ও তদীয় গ্রন্থ চতুষ্টয় | ... | শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ... | ২১৬ |
| বিজ রাম প্রসাদ | ... | শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য | ... | ৬২৬ |
| দীর্ঘজীবনের রহস্য | ... | শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী এম, এ | ... | ৬২ |
| দীর্ঘায়ুতত্ত্ব | ... | শ্রীহর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী | ... | ৬৮২ |
| হুক ও বীজাহু | ... | শ্রীঅম্বকুলচন্দ্র সরকার এম, এ, এফ্. সি, এস, পি, আর, এস্ | ৩৬২ | |
| হুয়ে এক (কবিতা) | ... | শ্রীকান্দিদাস রায় বি, এ, | ... | ৪০৮ |
| ধামরাই প্রাচীন বংশোদ্ভাব | ... | শ্রীদেবেন্দ্র নাথ | ... | ২০৭ |

| | | | | |
|---|-----|--|-----------------------------------|-----|
| নব নিদাশ (কবিতা) | ... | শ্রীবতীজনাথ সেন গুপ্ত | ... | ১৭৩ |
| নববর্ষ | ... | শ্রীবশোদাশীল বণিক বি এল | ... | ১৫ |
| নবমাস (কবিতা) | ... | শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর | ... | ৩৫০ |
| নামি-কো (জাপানী উপভাস) | ... | শ্রীহেমললিনী রায় | ২৮, ২১, ১৮০, | |
| | | | ২৪১, ২৮৫, ৩৫৭, ৪২৭, ৪২২, ৫৮১, ৬৩৮ | |
| নিবেদন (কবিতা) | ... | শ্রীগুরুবালা গুপ্ত | ... | ২৪৫ |
| নূতন ও পুরাতন (কাব্য) | ... | শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ শর্মা বি, এ, | ... | ৪৬ |
| পরমার্থ (কবিতা) | ... | শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন বি, এল, | ... | ৩৭৯ |
| পরিভ্রাণ (কবিতা) | ... | শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী | ... | ৫৭৭ |
| পরী-রাণী (কাব্য গল্প) | ... | শ্রীগুরুবল্লভ ভট্টাচার্য্য বি, এ, | ... | ৭১ |
| পল্লী-মা (কবিতা) | ... | শ্রীনগেন্দ্র নাথ চৌধুরী | ... | ২২৮ |
| পল্লীগ্রামে উত্তরাধ্ব সংক্রান্তি | ... | শ্রীমহিম চন্দ্র নন্দী | ... | ৬৭৮ |
| পহেলা আবার (কবিতা) | ... | শ্রীকুলচন্দ্র দে | ... | ১৭৯ |
| পাপিয়া | ... | শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য | ... | ১৫ |
| পাহাড়ের মেয়ে (গল্প) | ... | শ্রীসুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ২২৫ |
| পাহাড়িয়া (কবিতা) | ... | শ্রীকালিদাস রায় বি, এ, | ... | ৬২৫ |
| পুরী | ... | শ্রীসুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৭ |
| পুজার ছুটি (গল্প) | ... | শ্রীগিরীজ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল | ... | ৬২৮ |
| পূর্বপুরুষের স্মৃতি | ... | শ্রীশীতল চন্দ্র চক্রবর্তী এম্, এ, | ... | ১৬৯ |
| (ক)পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ(খ)প্রতিবাদের উত্তর শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বসু | ... | | ৪৭৮, ৫২০, ৬৭৬ | |
| এ প্রতিবাদ | ... | শ্রীসুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস | ... | ৬৭৬ |
| পূর্ববঙ্গে যগ ও ফিরিঙ্গি দস্যু | ... | শ্রীবতীজ মোহন রায় | ... | ৩৯১ |
| প্রকৃতবের একপুষ্ঠা (ইংরেজীর অনুকরণে) | ... | শ্রীঅশোক নাথ বোষ | ... | ১৫৮ |
| প্রকাশে (কবিতা) | ... | শ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন বি, এল | ... | ৪২১ |
| প্রত্যাখ্যাতা (গল্প) | ... | শ্রীগুরুবল্লভ ভট্টাচার্য্য বি, এ, | ... | ১০৪ |
| প্রবাসী (কবিতা) | ... | শ্রীবতীজ নাথ সেন গুপ্ত | ... | ৫০২ |
| প্রবাসে (কবিতা) | ... | শ্রীসুখরঞ্জন রায় বি, এ, | ... | ৫৭৬ |
| প্রতিশোধ (গল্প) | ... | শ্রীগুরুবল্লভ ভট্টাচার্য্য বি, এ, | ... | ২০২ |
| প্রতীক্ষা (কবিতা) | ... | শ্রীকালিদাস রায় বি, এ, | ... | ১০২ |
| প্রসূতি ও স্তম্ভিকাগৃহ | ... | শ্রীজাবেন্দ্র নারায়ণ বাগ্‌চি এল, জম, এস, | ... | ৪৪৯ |
| প্রাচীন জাপান | ... | শ্রীসুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৬৬, ৩৪৪, ৫৫৫ | |
| প্রাণি স্বীকার | ... | ... | ... | ৬৮০ |
| প্রেম | ... | শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার সেন | ... | ৭৪ |
| প্রেমের স্মৃতি (কবিতা) | ... | শ্রীকালিদাস রায় বি, এ, | ... | ৫১৫ |

| | | | | |
|--|-----|--------------------------------------|---------------|----------|
| পুষ্কিণী ও সৌররাস | ... | ৮ ব্রহ্মসেন | ... | ৬৫১ |
| কন্তেকল্পপুর | ... | শ্রীধ্বংসেশ্বর ব্রহ্মোপাধ্যায় | ... | ২০৪ |
| কুলশয্যা (কবিতা) | ... | শ্রীকান্দিবাস রায় বি এ | ... | ৬৮০ |
| বর্ষশেষ | ... | শ্রীশোভালাল বণিক্ বি এল | ... | ১৫ |
| বর্ষবিদ্যার (কবিতা) | ... | শ্রীচাক্কাগিনি দেবী | ... | ১৩৬ |
| বর্ষ আবাহান (কবিতা) | ... | শ্রীহুগোবিন্দ কুশারী | ... | ১৮৮ |
| বাঙ্গালা ভাষার প্রসার বৃদ্ধি | ... | শ্রীনকুলেশ্বর ভট্টাচার্য বিভাভূষণ | ... | ৩১৩ |
| বাঙ্গালা ও প্রাবলী ভাষা | ... | শ্রীবজ্জেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৬৬ |
| বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতি | ... | শ্রীবালীনাথ নন্দী | ... | ২৬১ |
| বাঙ্গালা বচন | ... | শ্রীনিশিকান্ত বিশ্বাস | ... | ৪৬৬ |
| বাড়বকুণ্ড | ... | শ্রীঅনাথ বসু সেন | ... | ১১৬ |
| বাগ্মীপদ্য | ... | শ্রীশশাক মোহন সেন বি, এল, | ... | ৪১, ২৭ |
| বাবুই | ... | শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য | ... | ১১২ |
| বিক্রমপুরে বর্ষা (কবিতা) | ... | শ্রীকুলচন্দ্র দে | ... | ২০১ |
| বিজ্ঞানবিদ্যে অজ্ঞপ্রাণ | ... | শ্রীললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ | ... | ৩৮২ |
| ব্রহ্মচর্য ও বৌদ্ধধর্ম | ... | শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য বি, এ, | ... | ৪০৫ |
| বেঙ্গের উষা-কবি (কবিতা) | ... | শ্রীশশাক মোহন সেন বি, এল, | ... | ২৮৪ |
| বৌদ্ধধর্মে পবিত্রাবশেষবাদি | ... | শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য বি, এ, | ... | ৫৭৭ |
| বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষুব্রত | ... | শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য বি, এ, | ... | ৪৬০ |
| বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বৎকিঞ্চিৎ | ... | শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য বি, এ, | ... | ৬৩৩ |
| ভগবতী ভাষা | ... | শ্রীবিপিন বিহারী চক্রবর্তী | ... | ৩০৭ |
| ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষাদর্শ | ... | শ্রীনীতল চন্দ্র চক্রবর্তী এম, এ, | ২২২, ২৭৪, ৩৩১ | |
| ভারতীয় সাহিত্যে | } | শ্রীশশাক মোহন সেন বি, এল, | ... | ২৫৩, ৩৫০ |
| বৌদ্ধ আদর্শের প্রভাব | | শ্রীশশাক মোহন সেন বি, এল, | ... | ৫৬১, ৬৮৪ |
| ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি | ... | শ্রীবোপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত | ... | ১৪১, ৪২২ |
| ভাষ্কর্য্য পান | ... | শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ শর্মা বি, এ, | ... | ৪৬০ |
| ভিখারীর দান (গল্প) | ... | শ্রীশিবশশী সাত্তাল এম, এ, | ... | ৫১ |
| জাঁতা ও ভগিনী (গল্প) | ... | শ্রীগিরীশ চন্দ্র বেন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৫৮৮ |
| মৎস্য ভক্ষণ | ... | শ্রীহেমেন্দ্র কিশোর রক্ষিত | ... | ৫৫০ |
| মধ্য যুগে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউরোপীয় ছাত্র জীবন | } | শ্রীবৈকুণ্ঠ মাধব দত্ত | ... | ৬১৭ |
| মরনাশতির পান | | শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ শর্মা বি, এ, | ... | ২২২ |
| মরীচিকা (গল্প) | ... | শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য | ... | ২১৭ |
| মধুকর | ... | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|-----|----------|
| মধুসূদন (কবিতা) | ... | শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন বি, এল, | ... | ১৩৩ |
| ম। (কবিতা) | ... | শ্রীকুলচন্দ্র দে | ... | ৩৭৬ |
| মাতৃ-বৃত্তি (কবিতা) | ... | শ্রীকুলচন্দ্র দে | ... | ৭২৬ |
| মান ও অগমান (কবিতা) | ... | শ্রীকালিদাস রায় বি, এ | ... | ২২৮ |
| মিনির ঘটকালী (গল্প) | ... | শ্রীবতীজনাথ সেন শুভ | ... | ২৩৫ |
| মুছে ফৈল (কবিতা) | ... | শ্রীসৈয়দ এমদাদ আলী | ... | ৩৭ |
| মৃৎ (কবিতা) | ... | শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৩০৬ |
| মেঘ রাজ্যের সংবাদ (কবিতা) | ... | শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী | ... | ৬৬০ |
| মধাইরা | ... | শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী | ... | ৪৪৭ |
| মধাহানে সংস্কার (কবিতা) | ... | শ্রীবতীজনাথ সেন শুভ | ... | ৬০১ |
| ময়ূনা (কবিতা) | ... | শ্রীমুরমাদুল্লারী ঘোষ | ... | ১৮০ |
| মরীচনাথের কাব্যে মৃত্যু কল্পনা | ... | শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টাচার্য এম্, এ | ... | ৩০২ |
| রাজ তরঙ্গিণী | ... | { শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ ও শ্রীবোপেন্দ্রকুমার সাংখ্যাতীর্থ | ... | ১৮৫ |
| রাজকুমার ও রাজকুমারী | ... | শ্রীনিরুপমা দেবী | ... | ৭০৫ |
| রাজা চিত্রসেন রায় | ... | শ্রীননীগোপাল মজুমদার | ... | ৩১১ |
| রৈবতক পর্বত | ... | শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন | ... | ৭৩৪ |
| লগ্নহারী (কবিতা) | ... | শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ | ... | ৩০৬ |
| শঙ্কু ব্রত | ... | শ্রীশুক্রবল্লভ ভট্টাচার্য বি, এ | ... | ৬১৩ |
| শ্মশানের পাশে (কবিতা) | ... | শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ শর্মা বি, এ | ... | ৬৮৬ |
| শাক | ... | শ্রীতারকনাথ দেব | ... | ৫২৭ |
| শারদ মঙ্গল (কবিতা) | ... | শ্রীকুলচন্দ্র দে | ... | ৩৪৬ |
| শিশু চিকিৎসা | ... | শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চি, এল, এম, এস | ... | ৭২৩ |
| শিশুর খাত | ... | শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চি, এল, এম, এস, | ... | ৫৬৯ |
| শিশুর খাতে বিশেষ ব্যবস্থা | ... | ঐ | ... | ৬৪৬ |
| শুভ বৃষ্টি (কবিতা) | ... | শ্রীমামোদিনী ঘোষ | ... | ২৩৩ |
| শুভ বৃষ্টি (গল্প) | ... | শ্রীসিরীজনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ | ... | ২৭০ |
| শ্রীমদ্-রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও তাঁহার শ্রীপাঠ—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত | ... | | ... | ৫৯৩ |
| শোকালিকা (কবিতা) | ... | শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত | ... | ৪৪৬ |
| শেষ কথা (কবিতা) | ... | শ্রীহর্নামোহন কুমারী | ... | ২২২ |
| শৈব ধর্মের ইতিহাস | ... | শ্রীহরিন্দাস পালিত | ... | ২৫ |
| সন্ধান পালন | ... | শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চি এল্, এম্, এস্ | ... | ১০৩, ৫১০ |
| সন্ধান (কবিতা) | ... | শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, বি, এল, | ... | ১৫৮ |
| সন্ধ্যামালতী (কবিতা) | ... | শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন বি, এল, | ... | ২৪ |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-----|-----|
| সন্ধ্যামোহিনীর ত্রুত | ... | শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ | ... | ১২০ |
| সনাতনী (সমালোচনা) | ... | শ্রীবনমালি বেদান্তভীষ্ম এম, এ | ... | ৬৫৪ |
| সন্ন্যাসী | ... | শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস | ... | ৬৫ |
| স্বপ্ন (গল্প) | ... | শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ১৫০ |
| সংসার অসার (কবিতা) | ... | শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ | ... | ৪৩২ |
| সংস্কৃত সাহিত্যে নবজীবন | ... | শ্রীশশীকুমোহন সেন বি এল | ... | ৪৪১ |
| সহদেব | ... | শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য | ... | ৩০২ |
| সার্থক মিলন (কবিতা) | ... | শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত | ... | ৮২ |
| সাধ (কবিতা) | ... | শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ১৭৮ |
| সাধক মৃত্যুঞ্জয় | ... | শ্রীঅতুলচন্দ্র যুগোপাধ্যায় | ... | ৪২৩ |
| সায়নাথ (সচিত্র) | ... | শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, | ... | ১৩৬ |
| সান্তারে প্রাচীন কীর্তি | ... | শ্রীবিজয়কুমার রায় বি, এ, | ... | ৪০২ |
| সি-ইউকি | .. | শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদার বি, এ, এফ, আর, হিষ্ট, এস্ | ... | ৫১৫ |
| স্মৃতি (কবিতা) | ... | শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী | ... | ৬২ |
| স্মৃতি (কবিতা) | ... | শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ | ... | ৪০৮ |
| সে আজ কোথায় (কবিতা) | ... | শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ, বি, এল | ... | ৩২৮ |
| সোনাকান্দার হুর্গ | ... | শ্রীঅতুলচন্দ্র যুগোপাধ্যায় | ... | ৬৫৩ |
| সোনাবারইর গান | ... | শ্রীগুরুবল্লভ ভট্টাচার্য্য বি, এ, | ... | ৫০৫ |
| হলদে পাখী | ... | শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য | ... | ৩৬৬ |
| হাসি কারা (গল্প) | ... | শ্রীসুধরঞ্জন রায় বি, এ | ... | ৫৪২ |
| হায়দর আলি খাঁ বাহাদুরের দৈনিক জীবন | ... | শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ | ... | ৩৬১ |

অপমানিত করেন তবে আবার বিরোধ উপস্থিত হইবে। এই বিপৎসময়ে রাজ মাতা দিদা অসাম শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ও যশোধর প্রভৃতির প্রতি সম্ভ্রষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কল্পনপতি (সেনাপতি) পদ প্রদান করিয়াছিলেন। একদা শাহিরাজ ঠাকনের সহিত সেনাপতির যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল ; সেই যুদ্ধে সেনাপতি জয় লাভ করিয়া ঠাকনকে বন্দী করিয়াছিলেন। এ দিকে কুমন্ত্রিগণের পরামর্শে দিদা সেনাপতির প্রতি সন্দেহান হইয়া একান্ত ভাবে তাহার নির্দাসন আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। এই ব্যবহারে হিংস্র প্রভৃতিরা শক্তির সর্ব অঙ্গসারে পুনর্বার বিজোহী হইয়া উঠিলে, দিদা পুত্রকে ভট্টারক মঠে প্রেরণ করিয়া রাজ-ভবনের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন। শত্রু পক্ষীয়েরাও রাজ-পুত্র রাজধানীতে উপস্থিত নাই জানিয়া দিদার কোন অনিষ্ট করে নাই।

পর দিবসেই রাজ্যের সৈন্তদল আসিয়া উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছিল। শত্রু পক্ষীয়েরা জয়ভট্টারিকা হইতে শূর মঠ পর্যন্ত স্থান সমূহে অবস্থান করিতেছিল ; ইহাদের ভয়ে ভীত হইয়া রাজসৈন্ত রাজ-ধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সময় রণকুশল একান্ত সৈনিক দল রাজ-সৈন্তের সহিত মিলিত হইয়াছিল। মিলিত রাজসৈন্ত উৎসাহের সহিত শত্রুসৈন্য আক্রমণ করায় শত্রুসৈন্য কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল। এমন সময় রাজকুলভট্ট সৈন্যে রাজসৈন্যের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। ভীমপরাক্রম হিংস্র রাজকুলভট্টের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে শত্রু-সৈন্য হতোত্তম হইয়া পড়িল। এই যুদ্ধে মহাবল হিংস্র নিহত ও যশোধর বন্দী হইয়া-ছিলেন। এরমন্তক কিছুকণ যুদ্ধ করিয়া তরবারি ভগ্ন ও অৰ্ধ হইতে পতিত হওয়ার রাজ সৈন্যের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। উদয়গুপ্ত পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। রাজা দিদা ক্রোধে অন্ধ হইয়া শত্রুপক্ষীয় যশোধর, ভট্টারক ও মুকুলকে সবাক্ষে নিহত করিয়া

ছিলেন; মহাবীর এরমন্তকের গলায় শিলাবদ্ধ করিয়া বিতস্তাঙ্গে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এরমন্তক কাশ্মীরী-দিগকে গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ শুদ্ধ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছিলেন।

এই বিষমযাতক যন্ত্রীর দল ৭৭ অঙ্গে গোপালবর্মা নৃপতির সময় হইতে মহারাজ অভিষেক পর্যন্ত ৬০ বৎসরে ১৬ জন নৃপতির সর্বনাশ করিয়াছিল। রাজা দিদা ইহা-দিগকে সবাক্ষে নিহত করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাজা রক প্রভৃতিকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই রূপে নির্ভরযোগ্য যন্ত্রী নরবাহন দিদার একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। নরবাহন রাজনক আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। নরবাহনের শারীরিক মানসিক সমস্ত বিষয়েই রাজা দিদার লক্ষ্য ছিল।

কুয়ানামক এক গাড়োয়ানের সিংহ নাবীর এক পুত্র দিদার কোবাধ্যাক হইয়াছিল। এই চুরাশয়ের কুমন্ত্রণায় রাজা নরবাহনের প্রতি সন্দেহ হইয়া উঠেন। ক্রমে কুমন্ত্রণাকারিগণের পরামর্শে নরবাহনের প্রতি সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যন্ত্রী নরবাহন রাজা কর্তৃক উদ্বেজিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। যন্ত্রীর মৃত্যুতে রাজ্য ত্রীহীন হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা ডামর সম্প্রদায়ভুক্ত সংগ্রামের পরাক্রান্ত পুত্রগণকে নিহত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহারাও রাজ্যের অতিপ্রায় বৃদ্ধিতে পারিয়া উত্তর দেশস্থ ঘোষে (উত্তর ঘোষে) অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং রাজপক্ষীয় কথাক প্রভৃতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজা ভীতা হইয়া স্বীয় নানতা স্বীকার করিয়াও ডামরগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

ডামরগণ রাজ্যের সহিত মিলিত হইয়া অধিকতর পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে রকাও মানব-লীলা সম্বরণ করেন। অনন্যোপায় হইয়া দিদা পূর্ব যন্ত্রী কন্তনকে আনয়ন করেন। কন্তন পূর্বে অন্ধ

মার্চ ১৯১১

পরিভ্রমণ করিলেন পুনরায় রাজকাৰ্য্যের ভার এবং অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ অভিমন্যু রাজ-কর্মচারিগণের দৌরাগ্র্যে ও মাতার দুঃশীলতার ক্ষয়-রোগগ্রস্ত হইয়া ৪৮ অব্দে কার্তিকের শুক্লা তৃতীয়াতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ অভিমন্যু স্বয়ং সুপণ্ডিত, সুশ্রী ও নির্মলচরিত্র ছিলেন।

মহারাজ নন্দিশঙ্কর (১৭২-১৩ খ্রী:) :-

ইনি মহারাজ অভিমন্যুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন এবং শৈশবেই পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দিদ্ধা পুত্র-শোকে অত্যধিক ব্যথিত হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম প্রবৃত্তি উদ্বেগ হইয়াছিল। সিদ্ধুর অপর ভ্রাতা ভূজ্য রাজ্যের ধর্ম প্রাপ্তির সহায় হইয়াছিলেন। মৃত পুত্র অভিমন্যুর কল্যাণার্থ দিদ্ধা অভিমন্যুস্বামী ও অভিমন্যুপুর স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বীয় নামে দিদ্ধাপুর ও দিদ্ধাস্বামী নির্মাণ করাইয়াছিলেন, মধ্যদেশ, লাট ও শৌড়োত্র (৭) হইতে আগত জনগণের নিবাসার্থ মঠ স্থাপন ও স্বামীর পুণ্যবৃদ্ধির জন্য ককণপুর স্থাপন করিয়াছিলেন ; খেত প্রস্তর দ্বারা দিদ্ধা-স্বামী নামক বিষ্ণু মূর্তি ও কাশ্মীরীয় এবং বিদেশীয়গণের নিবাসার্থ চতুঃখালা সমন্বিত এক অভূচ্চ বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পিতার কল্যাণার্থ ও দেশীয় ব্রাহ্মণগণের নিবাসার্থ সিংহস্বামী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, মঠপ্রতিষ্ঠা ও বিষ্ণু-মূর্তি প্রতিষ্ঠা দ্বারা বিতস্তা-সিদ্ধ সম্রাট অধিকতর পবিত্র করিয়াছিলেন, নানা স্থানে ৬৪টা দেবালয় স্থাপন ও পুরাতন দেবালয় সমূহের জীর্ণোদ্ধার করিয়াছিলেন। গজু রাজ্যের বরানামা এক বৈবধিকী বরামঠ স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজ্যের ভোগ-বাসনা পুনর্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় অভি-চার করাইয়া ৪৯ অব্দে অগ্রহায়ণের শুক্লা চাদনী তিথিতে শিশু নগ্নানন্দিশঙ্করের জীবন সংহার করিয়াছিলেন।

মহারাজ ত্রিভুবন (২৩০-৭৫ খ্রী:) :-

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর অভিমন্যুর দ্বিতীয় পুত্র ত্রিভুবনশঙ্কর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহাকেও দিদ্ধা অতিষ্ঠার দ্বারা ৫১ অব্দে অগ্রহায়ণের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে নিহত করিয়াছিলেন।

মহারাজ ভীমশঙ্কর (২৭৫-৮০১ খ্রী) :-

ইনি মহারাজ অভিমন্যুর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। দ্বিতীয় ভ্রাতার মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মন্ত্রী ফল্গুন ইহলোক পরিভ্রমণ করেন। ক্রমে দিদ্ধারও দুর্ভাগ্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দিদ্ধা এত নীচ স্বভাবা ছিলেন যে, একদা ভূজ্যনামক এক যুবক মহিবপালকের প্রণয় প্রার্থনা করেন এবং ভূজের প্রতি অমুরাগিনী হইয়া অসৎ প্রস্তাবে অসন্তুষ্ট ভূজ্যকে বিব প্রদানে নিহত করিয়াছিলেন। রক্ত-পুত্র দেবকলস ভূজের পদে বেলাবিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কর্দমরাজ প্রভৃতি বীরবৃন্দও দিদ্ধার বিরোধী হইয়া উঠেন। এদিকে শিশু ভীমশঙ্করও ৪১৫ বৎসর রাজগৃহে বাস করিয়া ক্রিষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠিলেন, এক তাঁহার মাতার নিকট দিদ্ধার দুঃশীলতা ও রাজ্যের অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া প্রতীকারপরায়ণ হইলেন। দিদ্ধা শক্তিহীন হইয়া দেবকলসের পরামর্শে ভীমশঙ্করকে বন্দী করিয়া বহু যাতনা দিয়া নিহত করিলেন।

রাজ্যন্তী দিদ্ধা :-

ইনি মহারাজ ক্ষেমশঙ্করের পত্নী ও মহারাজ অভিমন্যুর মাতা ছিলেন। ভীমশঙ্করের মৃত্যুর পর ৫৬ অব্দে দিদ্ধা স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যের প্রণয়পাত্র ভূজ ক্রমে সমস্ত বিষয়ে ঐক্যধিপত্য লাভ করায় মন্ত্রিবৃন্দ অসন্তুষ্ট হইয়া রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া ক্রুরকর্মী দিদ্ধার ভ্রাতৃপুত্র নৃপতি বিগ্রহরাজকে কাশ্মীরে আনয়ন করিয়াছিলেন। বিগ্রহরাজ কাশ্মীরে আসিয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষ অবলম্বন পূর্বক ভূজকে বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন। দিদ্ধা ভূজকে শুণ্ড গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া কিছু দিন শক্তিত-ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, ও সুমনোমত্তক প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে বহু স্বর্ণ উৎকোচ প্রদান করিয়া

স্বপক্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। বিগ্রহরাজ বিকল-
মোরগ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অনন্তর তুঙ্গ প্রভৃতি মন্ত্রিবৃন্দ কর্দ্দমরাজ প্রমুখ প্রধান
বীরগণকে নিহত করিল, ও রক্ত প্রভৃতি নির্কাসিত
মন্ত্রীগণকে পুনর্বার আনয়ন করিল। মন্ত্রী কন্ডনের
মৃত্যুতে রাজপুরীরাজ পৃথীপাল গর্কিত হইয়া স্বাবীনতা
অবলম্বন করিয়াছিলেন। তুঙ্গ সহোদরগণের সহিত
মিলিত হইয়া বহু কষ্টে ঐ রাজ্য অধিকার করিয়াছিল ও
ত্রীনগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেনাপতি পদ লাভ
করিয়াছিল; এবং ডামর সমূহকে নিশ্চুল করিয়া রাজ্য
নিষ্কটক করিল। দিদা স্বীয় ভ্রাতা উদয়রাজের পুত্র
সংগ্রামরাজকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিলেন।
সংগ্রামরাজ সূচতুর ছিলেন। ৭৯ অব্দে ভাদ্রের শুক্লা
অষ্টমীতে রাজা দিদা পরলোকগমন করেন।

ত্রীবিনয়কুমার সরকার ও

ত্রীবোগেন্দ্রনাথ সাংখ্যভাষ্য

নামি-কো

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্যামাকির বাড়ী।

ঐকাল তিনটার সময় তাকাশাকি হইতে যে গাড়ী
ছাড়ে তাহার দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার এক কোণে বেকির
উপর পা ছড়াইয়া দিয়া কেবল মাত্র এক জন আরোহী
বসিয়াছিল। সিগ্রেট টানিতে টানিতে সে এক খানা
কাগজ পড়িতেছিল। লোকটি আর কেহ নয়, গ্যামাকি
চিজিওয়া।

“দূর হোক।” বলিয়া কাগজ খানা সে পার্শ্বে নিক্ষেপ
করিল। কথাটা বলিবার সময় মুখ হইতে সিগ্রেটটা
পড়িয়া গিয়াছিল। রাগত ভাবে সেটাকে পা দিয়া ঝুঁড়া
করিয়া, জানালার বাহিরে ধু ধু ফেলিল; তারপর একটু
ইতস্তত করিল। তারপর অনিশ্চিত ভাবে কামরার

সমস্তটা এক বার পারচারি করিয়া আসিয়া পুনর্বার আসন
গ্রহণ করিল। দুই হাত বন্ধ করিয়া সে চকু মুদ্রিত করিল;
কালো জুগল কুক্ষিত হইয়া খুব কাছাকাছি হইয়া
আসিল।

গ্যামাকি চিজিওয়া পিতৃমাতৃহীন। তাহার পিতা
কাণ্ডোবিমা-গণান্তর্গত এক জন সাধুরাই ছিলেন। ‘রেটো-
রেসনের’ যুদ্ধে তিনি নিহত হন। যখন সে মাত্র ছয়
বৎসরের বালক তখন তাহার মাতা মহামারীর দ্বারা
অক্রান্ত হইয়া স্বর্গ লাভ করেন। তাহার মাসী, তাকেও
কাণ্ডোবিমার মাতা, তাহাকে লালনপালন করিয়া
ছিলেন। মাসী তাহার প্রতি সদয় ছিলেন, কিন্তু মেনোর
ব্যবহারে দয়ার লেশমাত্র ছিল না। উৎসবদিয় সময়
তাকেও রেশম পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া উচ্চ আসনে
বসিত; চিজিওয়ার প্রতি অগ্র ব্যবস্থা,—স্বতির পোশাক
ও নিয় আসন। এইরূপে শৈশবেই সে নিজের অবস্থা
বুঝিয়াছিল; তাকেওর মাতা পিতা, পদমর্যাদা, অর্থ,
সবই আছে। তাহাকে স্বীয় হস্ত ও মস্তিষ্ক পরিচালনা
করিয়া নিজের পথ করিয়া লইতে হইবে। স্বতাবতই
সে তাকেওকে দেখিতে পারিত না; যেসোকে সে স্বপ্না
করিতে শিখিয়াছিল।

সে দেখিল জীবনে কৃতকার্য হইবার দুই পন্থা বিদ্যমান—
একটি প্রশস্ত, অপরটি তাহার বিপরীত। যা থাকে
কপালে, সহজ পন্থাই অবলম্বন করিবে ইহাই সে মনে
মনে প্রতিজ্ঞা করিল। তাই মিলিটারি ইন্সুলে পাঠের
সময়—যেসো তাহাকে সেখানে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন—
যখন তাহার সহপাঠীরা পরীক্ষা ও নম্বর লইয়া বিশেষ
বাস্তব থাকিত, চিজিওয়া তখন স্বপ্রদেহস্থ ক্রমতাপন্ন
লোকদিগের সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করিত।
সাবধানতার সহিত এমন সব লোকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন
করিতেছিল, যাহারা ভবিষ্যতে তাহার সাহায্য আসিবে।
ইন্সুল হইতে বাহির হইবার পর তাহার তৎপরতার প্রধান
পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অন্যান্য সকলে যখন পরীক্ষার
উচ্চহান অধিকার করিবার আশঙ্কায় অস্থির, সে তখন

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

মিলিটারি হেড কোয়ার্টারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহার সহপাঠীরা যখন হেথায় হোথায় পদাতিক সৈন্য-দলে প্রেরিত হইতেছিল, যখন তাহার অসুরঙ্গ 'ড্রিল' ও 'মাচ' এর ভাঙনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, চিজিওয়ার তখন সেই বাহিনীর স্থানে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ধূমপানের আড্ডায় অনেক গুরুতর সামরিক গুপ্ত তথ্যের কথা কর্ণ-গোচর হওয়া অসম্ভব নয়।

অতঃপর প্রয়োজনীয় বিষয় হইল বিবাহ। সে বৃদ্ধিত জীবনে কৃতকার্য হওয়া কেবল মাত্র ভাল রকম বৈবাহিক সম্বন্ধের উপরই নির্ভর করে। সে বিবাহের ক্ষেত্রেটা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল অমুক মার্কুইসের কন্ডার সহিত অমুক ব্যারনের বিবাহ হইবে; কাউন্টের কন্ডার সহিত অমুক উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীর বিবাহ হইবে; এই ক্রোড়পতির কন্ডার সহিত অমুক মার্কুইসের বিবাহ হইবে। অবশেষে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জেনার্ল কাতাওকার পরিবারের উপর নিপতিত হইল। রক্ষিত সৈন্তদলভুক্ত হইলেও জেনার্ল কাতাওকা সুবিখ্যাত ও রাজদরবারে বিশেষ অঙ্গুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন। প্রচ্ছন্ন হইলেও তাঁহার প্রবল প্রতিপত্তির কথা বৃদ্ধিতে চিজিওয়ার বিলম্ব হইল না। সে ছল করিয়া ধীরে ধীরে জেনার্ল এর প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং তাঁহার পরিবারে পরিচিত হইবার জন্য কৌশলে চাল চালাতে লাগিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা নামির উপরেই তাহার দৃষ্টি ছিল। একরূপ করার কারণ, সে দেখিয়াছিল নামি জেনার্ল এর প্রিয়পাত্রী, এবং তাহার বিমাতা তাহাকে দেখিতে পারিত না ও প্রথম স্মরণেই তাহার একটা বিবাহ দিয়া দিবার চেষ্টায় ছিল।

নামির শাস্ত, ভদ্র ব্যবহারও যে তাহার নির্বাচনের অন্য কারণ নয় তা বলা যায় না। সে স্মরণের অপেক্ষায় রহিল। জেনার্ল মনের ভাব কখনো প্রকাশিত হইতে দিতেন না, তাই নিজ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কি চিজিওয়া তাহা সহজে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু সে যে কাতাওকা-গৃহিণীর প্রিয়পাত্র হইয়াছে সে বিষয়ে নিশ্চিত

ছিল। পঞ্চদশবর্ষীয়া দ্বিতীয়া কন্যা প্রগল্ভা কোমাও-তাহার বিশেষ বন্ধু ছিল। দ্বিতীয়া কন্ডার গর্ভজাত আরো দুইটি সন্তান ছিল; কিন্তু ইহাদের সহিত তাহার কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। নামির মাতার সময়ের ইকুনারী এক বৃদ্ধা ধাত্রী ছিল। বর্তমান গৃহিণীর আগমন কালে যখন আর সব ভৃত্যারা জবাব পাইল তখন কেবল ইকুই নেনার্ল এর বিশেষ অমুরোধে বিতাড়িত হয় নাই। এই ধাত্রীটি সর্বদাই নামির সঙ্গে থাকিত ও চিজিওয়ার প্রতি কিছু সম্মান প্রদর্শন করিত না। এই হেতু সে একটু চিন্তিত ছিল; কিন্তু সে নিজেই নামির চিত্ত জয় করিবে সংকল্প করিয়াছিল, তাই বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় নাই। স্মরণের জন্য সে এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া রহিল। অবশেষে অধীর হইয়া প্রেম-লিপি পুরু ঋষির মধ্যে ভরিয়া মেয়েলি হাতে ঠিকানা লিখিয়া ডাকযোগে নামির নিকট পাঠাইল।

সেই দিন হঠাৎ সে অন্যত্র যাইতে আদিষ্ট হইল। তিন মাস পরে যখন সে প্রত্যাবর্তন করিল, তখন শুনিয়া অবাক হইয়া গেল যে, তাহার অল্পপস্থিতিতে লর্ডস মহা-সভায় সভ্য ভায়কাউন্ট কাতোর ঘটকতায় তাহার মাসভূতো ভাই তাকেও—কাওয়াষিমার সহিত নামির বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

এই অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতায় কুপিত হইয়া চিজিওয়া নামিকে উপহার দিবার জন্য কিওতো হইতে আনৌত 'ক্রেপ' খানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। হায়, সে আশা করিয়াছিল, ইহার উজ্জল বর্ণ তাহার সফলতার কারণ হইবে!

কিন্তু চিজিওয়া ব্যর্থতায় একেবারে দমিবার লোক নয়; শীঘ্রই আশা-ভঙ্গের বেদনা তাহার মন হইতে তিরোহিত হইল।

তাহার কিন্তু আশঙ্কা হইত যে, যদি নামি তাহার পিতা বা স্বামীকে সেই প্রেম-পত্রের কথা বলে ত তাহার আর একটি ক্ষতি হইবে, সে এক জন প্রতিপত্তিশালী মুরসি হারাইবে। সাবধান হইলেও তাহার প্রতি নামির মনের ভাব কি তাহা সে জানিত না; তাই তাকাশাকি

ইকাওতে সে নব দম্পতির সহিত সাক্ষাৎ করিল ও সতর্কতার সহিত খোঁজখবর করিল। তাকেওর প্রতি ঘৃণাটাই তাহার মনে এখন প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিল।

কে এক জন “তাকেও, তাকেও” বলিয়া ডাকিতেছে ভাবিয়া চিজিওয়া হঠাৎ তার দিবা-স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সে দেখিতে পাইল গাড়ীখানা সেই মাত্র একটা ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছে ও কুলি ইাকিতেছে, “আগেও, আগেও।”

“আ, মোলো!”

নিজের উপর বিরক্ত হইয়া চিজিওয়া দাঁড়াইল, কামরাটা এক বার ঘুরিয়া আসিল। বিরক্তিকর কিছু যেন বাড়িয়া ফেলিবার জন্য স্কন্ধোত্তোলন করিয়া সে পুনরায় আসন গ্রহণ করিল। তাহার চোখে মুখে ঘণার চিহ্ন প্রকট হইয়া উঠিল।

গাড়ী ‘আগেও’ ছাড়িয়া বায়ু বেগে কয়েকটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ‘ওজি’ পৌঁছিল। পাঁচ ছয় জন আরোহী প্লাটফর্মের কঁকরে শব্দ করিতে করিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিল। তাদের মধ্যে একটি পুরুষ, বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইবে, বোর লাল মুখ, বাম চোখের নিম্নে মটরের মত একটি লাল আঁচিল দ্বিগুণিত ইচিরাকু রেশমের মূল্যমান পরিচ্ছন্ন সজ্জা, ক্রেপের কোমর বন্ধে মোটা সোনার চেন জড়ান ও ডান হাতের আঙুলে ভারি সোনার আংটি।

বসিবার সময় হঠাৎ তাহার দৃষ্টি চিজিওয়ার উপর পড়িল।

“ও, চিজিওয়া-সান!”

“এই যে, ভাল ত?”

“কোথা গিয়েছিলে?” এই কথা বলিতে বলিতে লাল আঁচিল বিশিষ্ট লোকটি চিজিওয়ার পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

“তাকাশাকি।”

“তাকাশাকি?” কিছু ক্ষণ চিজিওয়ার মুখের দিকে ঠহার নিম্ন স্বরে লোকটি বলিল, “তুমি কি ব্যস্ত আছ?”

না থাক ত সাক্ষ্য ভোজনটা একসঙ্গে করা যাবে।” চিজিওয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

হাষিবার খেয়াঘাটের নিকট, জলের খুব কাছে এক খানি বাড়ী। বাড়ীর উপর “হ্যোজো গ্যামাকির ভিলা” লেখা না থাকিলে ইহা একটা বাবু-লোকদের আড্ডা বলিয়া বোধ হইত। দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠে, —খাহার কাগজের দেয়ালের উপর চিত্তহারী সজ্জাভের সুরের মাঝে সৌখীন বিমাদারের * ছায়া-পাত অসদ্বৃতি হইত না; কিংবা যাহার ঈষৎ সবুজ মাচুরের উপর রক্ত বর্ণ আস্তরণ বিছাইয়া তাসের মজলিস বসিতে পারিত, নেহাৎ সাধারণ বৈদ্যুতিক আলোকের পরিবর্তে আবরিত দীপে আলোকিত এমন একটি প্রকোষ্ঠে, চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত গেলাশ ও প্লেটের মাঝে, চিজিওয়া ও “লাল-আঁচিল” দিব্য আরামে বসিয়াছিল। এই লাল-আঁচিল আর কেহ নয়, এই বাটার মালিক “হ্যোজো গ্যামাকি।”

সেখানে সে তাহাদের আদেশের অপেক্ষায় কোনো পরিচারিক! ছিল না, এটা তাহাদের ইচ্ছানুসারেই হইয়াছিল। “লাল আঁচিলের” সম্মুখে এক খানা খোলা নোট বই, তার উপর একটা পেন্সিল। ইহার মধ্যে অনেকের নাম, ধাম ও উপাধি লিখিত ছিল। নামগুলি নানারূপে চিত্রিত; বৃত্তাকার, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ, ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি নানা প্রকারের চিহ্ন। কতকগুলি চিহ্ন কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, কতকগুলি বা পুনর্লিখিত হইয়াছে।

“যাক্ চিজিওয়া-সান, তবে তাই ঠিক; কেমন? কিন্তু এ যেই ঠিক হয়ে যাবে তখনি আমার জানানো চাই। ঠিক পারবে ত?”

“নিশ্চয়ই। এটি মধ্যে এ মস্তুর হাতে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু অপর পক্ষও খুব জবরদস্ত, তাহার

* এক প্রকার জাপানী খোঁপা। জাপানী গেইবা বা নর্তকী (এখানে তাহাই বুঝাইতেছে) ও অবিবাহিতা সুবতীরা একরূপ খোঁপা বাঁধেন।

বিশেষ মুক্ত-হস্ত হতে হবেন।” খাতায় লিখিত নামগুলো দেখাইয়া “এ লোকটা পাকা বদমাইস্-একে বেশ করে দমিয়ে রাখতে হবে।”

“এ কেমন?”

“ও সুবিধে নয়। আমি ওকে ভালো রকম জানি না, কিন্তু শোনা যায় লোকটা খেজার ধার্মিক। ওর কাছে যেতে হৈল খোলাখুলি নম্র ভাবে যেতে হবে। আর অকৃতকার্য হও ত বিশেষ গোপনযোগ।”

“সৈন্যদলে সমরদার লোক আছে অনেক, কিন্তু ঠিক তার উল্টো লোকও আছে ততঃ। তুমি ত জানই, গেল বছর যখন আমরা একটা সৈন্যদলে পোষাক যোগাবার ‘কন্ট্র্যাক্ট’ পাই—সবই কেমন ভালো রকম উত্তরে গেল। কিন্তু একটা ক্যাপ্টেন ছিল—নামটা তার কি?—ওই যে যার লাল গোঁফ। সে বেটা আমাদের জিনিষের দোষ দেখিয়ে তারী জ্বালাতন করেছিল। যখন আমাদের ম্যানেজার দস্তর মারফিক তাকে এক বাগ্ন ‘কেক’ পাঠালে সে বললে সে ঘুষ নেবে না; আর বললে যে, সৈনিকের পক্ষে উপহারের দ্বারা চালিত হওয়া বিশেষ লজ্জার কথা। ভেবে দেখ, শেষে বাগ্নটা সে মেঝের উপর ছুড়ে ফেলে দিলে। বাগ্নটা টাকায় ভর্তি ছিল ওপরে কেবল পাতলা এক খাক ‘কেক’! কি বিপদ! শরতের বৃক্ষপত্ররূপ কেকগুলো মেঝের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রৌপ্যময় তুষারকণার সহিত মিলিত হইত। এটা না দেখে লোকটা আনো রেগে গেল, বললে যেমন কখনো কখনো ন কখনো কখনো শোনে নি। আমাদের কথা সমানে প্রকাশ করে দেবে বললে। তাকে কি ধামান যায়। এই রকম লোকদের জন্যই আমরা এত কষ্ট ভোগ করেছি। কষ্ট ভোগ করার কথায় মনে পড়ে গেল তাকেও সান্ ও সেই ধরনের লোক। সে দিন—”

“তাকেও বাপের এত সম্পত্তি পেয়েছে যে, সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে—খোঁচার মত সরল ও শক্ত হতে পারে। আমার কথা তুমি ত জানই, একলা—”

“ও ভুলে গেলুম।” “লাল-অঁচিল” চিজিওয়ার মুখের দিকে মুহূর্তমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পাঁচ টাকার দশ খানা নোট বাহির করিল। “এই হচ্ছে তোমার গাড়ী ভাড়া। আসলটা পরে পাবে।”

“ধন্যবাদ, আমি এ নিলুম,” সে গুলি সে ভিতরের পকেটে শীঘ্র পুরিয়া ফেলিল। “কিন্তু য়ামাকি-সান্!”

“কি?”

“একথা সকলেই জানে যে, না বুনলে শস্ত কাটা যায় না।”

য়ামাকি কাঠহাসি হাসিল। চিজিওয়ার পিঠ ধাব-ড়াইয়া বলিল, “তুমি ভারী চালাক লোক। কি ছুঁথের কথা তুমি খুব কম করেও ‘কমিশারিয়েটের’ প্রধান হওনি।” চিজিওয়া হাসিল। “কিন্তু য়ামাকি, বীর ক্রিয়ামাসার ছোট তলোয়ার শিশুর হাতের ‘তিন ফিট তিন ইঞ্চি’* তলোয়ারের চেয়েও বেশী কাজ করে।”

“বাঃ! কিন্তু বন্ধু জোমায় এই ‘স্পেকুলেশনের’ কাজে সাবধান করে দিচ্ছি। বাইরের লোক প্রায়ই কৃতকার্য হয় না।”

“আচ্ছা, বেশ। এটা কেবল অতিরিক্ত টাকা। এই বার যেতে হবে। এ বিষয়টা জানতে পারলেই দিন কয়েকের মধ্যেই তোমার সঙ্গে এসে দেখা করব। ধন্যবাদ, দরকার নেই, রাস্তা থেকে একখানা ‘কুকুবা’ ডেকে নেব।”

“আচ্ছা, তা হলে। আমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না। তাকে আমার মেয়ের সঙ্গে থাকতে হইল।”

“ও ওতোয়া-সান্ নাকি? তার অস্থখ করেচে না কি?”

“হ্যাঁ, প্রায় মাসখানেক হল। সেই জন্তই আমার গিন্নী তাকে এখানে এনেচেন। চিজিওয়া-সান্ না ভেবে চিন্তে কখনো বিবাহ করো না, বা ছেলেপুলের জন্ম দিও

না। টাকা যদি কৰ্ত্তে হয় ত অবিবাহিত থাকার মত আর কিছু নয়।”

চিকিৎসা য়ামাকির ‘ভিলা’ হইতে চলিয়া গেল। প্রভু ও পরিচারিকা তাহাকে ফটক পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া গেল।

অতঃপর বিদায় দিয়া য়ামাকি ঘরে ফিরিল। নিঃশব্দে হড়কানিয়া দরজা খুলিয়া এক মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিল ও তাহার পার্শ্বে বসিল। সে গোরবর্ণা মাথার পাতলা চুল ও সামনের দুটি দন্ত সুপ্রকাশিত।

“চিকিৎসা-সান্ গেছে?”

“হ্যাঁ, এই মাত্র গেল। ওতোয়ো কেমন আছে? দাঁত-উঁচু স্ত্রীলোকটি মুখখান গম্ভীর করিয়া বলিল, “আমি ত আর ওর সঙ্গে পরি না, কানে।” পরিচারিকাকে কহিল, “তুমি একটু সরে যাও।” “এই আজ সে একটা বাটি আছাড় দিয়ে ঝুঁড়ো করেছে, কাপড় ছিঁড়েছে; সামান্য কারণে আরো কত কি করেছে। আর তার বয়স হোলো আঠারো।”

“যাই হোক আমরা তাকে সুঙামোর গারদে পাঠাব, কি বল? আহা বেচারী!”

“এ ঠাট্টার সময় নয়। কিন্তু সত্যি বলতে কি তার জন্যে আমার দুঃখ হয়। সে আজ বলছিল, ‘অক্লান্ত তাকেও-সান্! কি নিষ্ঠুর সে! গত বৎসর নব বর্ষের সময় আমি তাকে নিজের হাতে বোনা মোজা, রুমাল, দস্তানা আরো কত কি পাঠালুম। এই নব বর্ষে একটা লাল জামা তাকে উপহার দিলুম—সমস্ত নিজের পরসায়। কিন্তু কাণ্ডটা দেখ এক বার, আমাকে কিছু না জানিয়ে সে কি না সেই কদাকার দেমাকে নামিকো-সান্কে বে করলে। কী নিষ্ঠুর! কী নিষ্ঠুর! আশি য়ামাকির মেয়ে, নামিকো-সান্ আমার উপর টেকা দেবে? কী নিষ্ঠুর!’ সে কাঁদতে লাগলো। ওগো, ওর কি একটা উপায় করা যায়? সে ওকে বড় ভালবাসে।”

“হুয়্। কথায় আছে ‘যেমন মা তেমন মেয়ে;’ তুমি ঐ দুই মেয়েটার উপযুক্ত মা। তুমি জান কাওয়াষিমা

এক জন নূতন নোবল্, অর্থও তার যথেষ্ট; আর সে যে নির্দোষ এমন কোথাও কিছুতেই বলা যায় না। ওতোয়োর সঙ্গে তার বিবাহ দেবার জন্যে আমার যথাসাধ্য করেছি, কিন্তু সব ভেসে গেল। বিবাহ হয়ে গেছে। নামি সানের মরণ না হলে কিংবা তাকেও তাকে পরি-ত্যাগ না করলে আর ত আশা নাই। তাই এ সব আজ-শুবি খেয়াল ছেড়ে আর কোন ভালো লোকের সঙ্গে তার বিয়ে দাও। তুমি বাহাদুর মেয়ে, নও।”

“ও-সব বোকামি। আমি তোমার মত ভাবতে পারি না, তোমার মত আমি চতুর নই—যে লোক কি না পঞ্চাশ বছর বয়সেও মেয়েদের কাছে ঘোলা খায়।”

“তোমার সঙ্গে আমি ত কথায় পারব না, কিন্তু তুমি একটি মূর্থ—তার মানে তুমি সহজেই রেগে যাও। ওতোয়োকে আমিও তোমারই মত ভালবাসি। সে আমাদের মেয়ে। তাই অসম্ভব কথার স্বপ্ন না দেখে তার জন্যে এমন এক জায়গার সন্ধানে আছি যেখানে সে সারা জীবন সুখে থাকবে। এস ওসুমিতার সঙ্গে গিয়ে একটু কথা কওয়া যাক।” তাহার একত্র বারান্দা দিয়া তোয়োর ঘরে গমন করিল।

হোজো য়ামাকি হীনাবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এখন সে “ভদ্র ব্যবসায়ীর” মধ্যে পরিগণিত। ব্যবসায় আরম্ভের সময় তাকেও স্বর্গীয় পিতার নিকট সে অনেক সাহায্য পাইয়াছিল, এবং এখনো কাওয়াষিমা পরিবারের প্রতি সে সেই হেতু অমুরক্ত। ইহার কারণ, কেহ কেহ বলিত কাওয়াষিমা-পরিবার নূতন অভিজাতগণের মধ্যে বিশেষ অর্থশালী বলিয়া; কিন্তু এরূপ সমালোচনা বড় বেশী কঠিন। যিবার তাহার বাটী ছিল, এবং হাষিবা খেয়াঘাটের নিকট এক খানি ‘ভিলা’ ছিল। ইতিপূর্বে সে সুদখোর ছিল, কিন্তু এখন তাহার প্রধান কার্য্য হই-তেছে সৈন্যদলে ও গবর্ণমেন্টের আন্যান্য বিভাগে জিনিস যোগান। তাহার পুত্র এখন বাণিজ্য-বিজ্ঞান শিখিবার জন্য আমেরিকায় অবস্থান করিতেছে; কন্যা ওতোয়ো এই সে দিন পর্যন্ত ‘পীয়ারেস’ ইন্সুলে অধ্যয়ন

করিয়াছে। তাহার পত্নী—কেমন করিয়া এবং কোথায় তাহার সহিত বিবাহ হইল, এ কথা কেহ জানিত না—কিওঁতোর লোক এই মাত্র জানা ছিল। সে সাদাসিদে জ্ঞানীলোক; য্যামাকি কল্পে তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতেছে এ কথা ভাবিয়া অনেকে অবাক হইত। কিন্তু সত্য কথা হইতেছে যে, তাহার অনেকগুলি প্রেমপাত্র ছিল, যাহাদের প্রতি ‘সুন্দর’, ‘কাস্ত’ ও অন্যান্য ঐ জাতীয় বিশেষণ গুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে; ইহারা সদাই তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এ কথা তাহার জ্ঞী ভালো রকমই জানিত।

প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ ‘কুঞ্জ’ একটি বীণা, একটি ‘ম্যাণ্ডো-লিন’ ও কাচের বাসে একটি বড় পুতুল। এক কোণে একটি সুন্দর লিখিবার টেবিল, অন্য কোণে এক থানি প্রকাণ্ড আঁশি। এ সুন্দর ঘরে কোন্ ওমরাহ-নন্দিনী বাস করেন ইহা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া খরের মাঝে রেশমী বিছানার দিকে চাহিবার লোভ হয়। ইহার উপর প্রায় সপ্তদশ বর্ষীয়া এক তরুণী পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে; বহৎ বিমাদা-খোঁপা বাঁধা চুল নির্মমভাবে মর্দিত হইতেছে। গাত্রে বর্ণ গোলাপী, গোল গাল ভরাট কপোল। ইহা দেখিয়া তাহাকে সুন্দর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহার চেহারাটা একটু বেগী রকম গোলাকার। তাহার ঔষ্ঠাধর বিষুক্ত, যেন সেগুলি বন্ধ করিবার শক্তি নাই; কোমল জর নিম্নে চোখ দুটি অতিরিক্ত মাংসে পরিবেষ্টিত; বসন্তের কুয়াসায় আচ্ছাদিত সবে মাত্র সুগোষ্ঠিতের মত দেখাইতেছিল। তাহার আদেশ শ্রবণে মনে মনে হাসিতে হাসিতে সেই মাত্র ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত পরিচারিকার উদ্দেশে “বোকা” এই কথা বলিয়া তরুণী অসহিষ্ণু ভাবে গায়ের কাপড় ফেলিয়া, ও শয্যা হইতে উঠিয়া ‘কুঞ্জ’ হইতে একই প্রকার ‘হাকামা’-পরিহিত এক দল ইন্সলের মেয়েদের একখানি বড় ছবি তুলিয়া লইল। হুতার মত সরু চোখে সে ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করিল। ছবির

মধ্যে একটি চেহারার মুখের সামনে ভুড়ি দিল। অবজ্ঞাটী আরো স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য সে নখ দিয়া ছবিখানা আচড়াইতে লাগিল।

হড়কানিয়া দরজা খোলার শব্দ হইল।

“কে? তাকে নাকি?”

“হ্যাঁ, আমি তাকে,—টেকো তাকে,” এই বলিয়া তাহার পিতা য্যামাকি ও মাতা হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন, ও শয্যার নিকট উপবেশন করিলেন। তরুণী অর্কশায়িত অবস্থায় বুঁকিয়া পাড়িয়া ছবিখানি লুকাইবার চেষ্টা করিল।

“কেমন আছ ওতোয়ো?” ভাল? এইমাত্র লুকুলে কি? দেখি, দেখি। ওটা কি আমাকে দেখাও। এত নামিকো-সানের মুখ, তাই নয় কি? ওঃ! এটা কি বিশ্রী ভাবে নষ্ট করেচ! এমন অন্যায় কাজ করার চেয়ে দুপুর রাতে কোনো মন্দিরে গিয়ে অকল্যাণ কামনা করা শতগুণে ভাল।”

মুখ-বিকৃতি করিয়া তাহার পত্নী বলিল, “কথার ছিঁরি দেখ!”

“ওতোয়ো” তুমি হোজো য্যামাকির মেয়ে, কেমন? সাহস করে আবার অল্পটুকু পরীক্ষা করে দেখো। তোমার ভালবাসা যে প্রত্যাখ্যান করে, এমন একটা সামান্য লোকের প্রতি অশ্রুজল না থেকে মিঃমুই বা মিঃসুবুঝির মত ক্রোড়পতির ছেলে পাকড়াও; কিংবা কোনো মার্খ্যান বা প্রধান মন্ত্রী ছেলে; বা সব চেয়ে যা ভাল, কোনো বিদেশী রাজপুত্র। তুমি অত দমে গেলে কেন?”

গাতার সম্মুখে যতই খিটু খিটু করুক স্নায়ু কন্দন করুক না কেন পিতার সম্মুখে ওতোয়ো একেবারে নিরুপায়।

সে বিষম মুখে রহিল, কোনো উত্তর দিল না।

“উত্তর দিচ্চ না যে? তুমি তাকেও সান্কে ভুলতে পারচ না? ও তুমি এখনো তাকে ভালবাস কেমন? দেখ ওতোয়ো, কিওতো বেড়াতে যাবে? ভারী আমোদে

যাবে। দেখবার মত অনেক ভাল ভাল জায়গা আছে, আর তা ছাড়া তুমি নিবিজিনে *গিয়ে একটি সুন্দর 'ওবি' বা একছত্র পোশাক আনতে পার। কেমন? তুমি কথামো এমন সুযোগ ছাড়তে পার না।" পত্নীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "ও-সুঁমি, তুমিও ত বহু দিন ওখানে যাওনি। তুমি বরং ওতোয়োর সঙ্গে যাও।"

"তুমি বোধ হয় আমাদের সঙ্গে যাবে?" পত্নী জিজ্ঞাসা করিল।

'আমি? পাগল। আমি কত ব্যস্ত আছি তা জান!' "

"তা হলে আমিও যাব না।"

"কি রকম? তুমি আমার আদেশ অমান্য করবে?"

"হা, হা।"

"কি?"

"হা, হা, হা।"

"তোমার ও রকম হাসি আমার ভালো লাগে না।"

কেন যাবে না তা আমাকে বল।"

"আমি তোমায় চোখের আড়াল করতে পারি না," পত্নী কহিল।

"হুঁ! ওতোয়োর সামনে এমন কথা কেমন করে বল? ওতোয়ো, তোমার মা যা বলছেন ও মিছে কথা। ওকথায় কর্ণ পাত কোরো না।"

"আমার সঙ্গে চালাকি চলবে না," ওসুঁমি কহিল।

"ধাম, ধাম। ওতোয়ো ভেবো না। দৈর্ঘ্য ধর, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

* বস্ত্রবুননের জন্ত বিখ্যাত।

শ্রী হেমনলিনা রায়।

বাণী-পন্থাঃ (১১)

সাহিত্য-আজার অভিব্যক্তি ভারতায় সমাজে।

(পূর্বাহ্নরতি)

আমরা পৌরাণিক যুগে শিল্পাদিতে ব্যক্তিত্ব বা কর্তৃত্বের অভাব লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে এই স্থলে আর কয়েকটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক; কেন না, আমরা দেখিব, উহা হইতেই প্রকৃত সাহিত্যের উৎপত্তি। ভারতীয় মনুষ্যাত্মার গতি যে প্রথম হইতেই সামাজিক ও সাংসারিক ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি; তাহার পরিবার, গোত্র এবং গ্রাম-সমাজ তাহার ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা, সর্বোপরি অনন্ত জাতিভেদবাদের আদর্শ এই বন্ধন কার্য সমাধা করিয়া

আসিয়াছে। চতুরাশ্রম বা চাতুর্ভূষ্য

পৌরাণিক সমাজে আদর্শ তাহার অনন্ত ভেদবাদের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। মধ্যে যে 'খাই' পায় নাই তাহাও দেখিয়াছি। এই সমস্ত

সত্ত্বেও এই সমাজ যে মনুষ্য-মনকে তাহার আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ধর্মের দিকে প্রবল স্বাধীনতা দিয়াছে, তাহারও উল্লেখ করিতেছি। তৎসত্ত্বেও তাহার সাহিত্য যে এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হইতে সর্বিশেষ উপকৃত হইতে পারে নাই তাহার কারণ কি? আমরা জানি, এই সমাজ প্রাচীন ঋষির বর্ণাশ্রম-আদর্শকে বাস্তবিক যাত্র না করিয়া থাকিলেও, উহাকে অতিক্রমও করে নাই। কোনরূপ সীমা-গণ্ডী অতিক্রম করাই ভারতীয় মনের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিতে হইবে। জগতে সঙ্কীর্ণ হইতে পারিলে, ছোট থাকিয়া কোন মতে বাঁচিতে পারিলেই, সে যেন এক পদ অগ্রসর হইতেও প্রস্তুত নহে। তাহার ধর্মাদর্শও ক্রমে কেবল আত্মরক্ষা এবং প্রাচীন সমাজ-আদর্শের রক্ষামাত্রকেই উদ্দেশ্য করিয়া, ইহলোকীয় কল্যাণ এবং মঙ্গল যাত্রকে যেন পদ-দলিত করিয়া দিঃসংখ্যে ৩৬৭ অবিস্মৃত হুখে এই উদ্দেশ্য খ্যাপন

* বস্ত্রবুননের জন্ত বিখ্যাত।

করিয়াছে। * ভারতীয় সমাজের মনোমধ্যে এই পৌরাণিক আদর্শই কার্য্য করিয়া, তাহার সংসার-জীবনটাকে সকল দিকে সজ্জিত করিয়া আনিয়াছে। এই সমস্ত সম্বন্ধেও তাহার অন্তরাখ্যা যে নিজকে কোথাও আহত মনে

* বাহ্যিক এইরূপ ইহলোকের জীবন-সংগ্রাম-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাহু প্রদর্শন করিয়া প্রতিপদে মনুষ্যের জীবনটাকে শাস্ত্র-বচনের দ্বারা সজ্জিত করিয়া সংহিতা বা পুরাণাদি রচনা করিতোছিলেন, জীবন সংগ্রামটার সঙ্গে তাঁহাদের কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না। দেশ রক্ষা, গৃহ-রক্ষা, জীবিকা কিংবা বিত্তাভ্যাস অল্প লোকের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহারা (হয়ত সম্পূর্ণ সংসারী থাকিয়াও) কেবল অধ্যাপনাদি হইতে প্রতিগ্রহ পর্য্যন্ত এই বটু-কর্ম্ম লইয়াই জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ যে তাঁহাদের কথা সকল দিকে মানিয়া চলিডেন, তাহাও নহে। শাস্ত্রপ্রবচনের প্রত্যেক শিষ্ট বিধির দ্বারাই বরং তদ্বিপরীত ভাবের প্রাবল্য থাকাই প্রতীয়মান হয়। অল্প দিকে, পুরাণাদির প্রধান সংগ্রাম আদিম ভারতবাসীর পূজাধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই চলিয়াছিল। এই উভয় ধর্ম্মই ভারতীয় মূলিক। হইতে এবং প্রাচীন জাতির সমাজ-সভ্যতা হইতেই উদ্ভূত ছিল; সুতরাং উহাদের সঙ্গে যাহা বিরোধ তাহা কেবল প্রণালী-বিষয়ে; উহাদিগকে আত্মস্থ করিতেও কোন বিজাতীয় কিংবা মারাত্মক বিপদ-সমস্যার সম্মুখীন আদর্শ পৌরাণিক ব্রাহ্মণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। শক, হুন বা গ্রীক জাতি যেই সমাজ-ধর্ম্মাদর্শ লইয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন তাহাও কোন দিকে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ হইতে অধিক মাহাত্ম্য দেখাইতে পারে নাই। পরবর্তী কালে পরম সংসারধর্ম্ম এবং দিগ্‌বিজয়ী মুসলমানের সংঘর্ষে আসিয়াই শেষ যুগের পুরাণ এবং তন্ত্রাদির মধ্যে এক অতি প্রবল সমস্তার স্রষ্টাপাত হয়। আধুনিক শাস্ত্র তন্ত্র এবং শাস্ত্র ধর্ম্ম উহারই প্রভাবে সম্বন্ধীভূত। ঐ

করিতেছে না, কিংবা আধুনিক সভ্যতার আদর্শ দ্বারা নানা দিকে পরাজিত এবং প্রপীড়িত হইয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে জাগিয়া উঠিতেছে না তাহার রহস্য কোথায়? চিন্তা করিলেই দেখিবেন, উহার রহস্য তাহার অন্ততন কালের প্রবল ধর্ম্মাদর্শের মধ্যেই লুকায়িত আছে। বর্তমান কালের প্রত্যেক যুগ-সমস্তার সমক্ষে, এখন এই ‘ধর্ম্ম’ শব্দই তাহার প্রধান ‘মুখ্য’! এই কথাটাই সরল বা বক্রভাবে সকল সংশয়-প্রশ্নের নিকাশ করিয়া দিতেছে। এখন তপোবন নাই; বেদ উপনিষদের ঋষি কিংবা পুরাণ, তন্ত্র সংহিতাদির ধর্ম্ম-ত্রুটী ব্রাহ্মণগণও নাই; রামায়ণ-মহাভারতের সরল বলিষ্ঠ এবং কর্ম্ম-শীল আর্ধ্য-আদর্শ অন্তর্হিত; বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের লেশমাত্রও বর্তমান সমাজে প্রবল নহে।

পৌরাণিক বৈরাগ্য বলিতে দি, আরণ্যক সম্প্র-
আদর্শ ও তদ্বারা সমস্ত দায়ের এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়
সাহিত্যের স্বার্থ হানি। বিশেষের সময় হইতে
এই সমাজ স্পষ্ট-
ভাবে চতুরাশ্রমাদর্শ পরিহার করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে একান্ত
সন্ন্যাসের এবং ‘বৈরাগ্যের’ আদর্শকেই স্বীকার করিয়া
লইয়াছে। তাহার ধর্ম্ম এবং আচারের আদর্শ
প্রকৃত প্রস্তাবে বহু সাম্প্রদায়িকতার সংযোগ-সমষ্টি
হইলেও, আরণ্যকগণের এই একটা অতি সঙ্কীর্ণ
সাম্প্রদায়িক আদর্শই এখন প্রবলতম হইয়া সমগ্র হিন্দু
সমাজের অধ্যাত্মীয় আদর্শকে প্রকারান্তরে নিয়ন্ত্রিত
সময়ের ভারতীয় মহাপুরুষ নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতির
মধ্যে মুসলমানের ওই সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃত্বাব এবং সাম্য
(Communal brotherhood) একেশ্বরনিষ্ঠা এবং
সাংসারিক ক্রমনিষ্ঠার আদর্শই নানা দিকে
প্রদীপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য গভিকে মুসলমান
প্রভাবের মধ্য ভাগেই হিন্দু সমাজের মস্তিষ্ক যেন বিকল
হইয়া যায়, এবং অকালে তাত্ত্বিক সংস্কার-যুগের অবসান
হয়।

লেখক।

করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে বেদের কিংবা (অধিকাংশ) পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতার অথবা ব্রাহ্মণ্যের প্রবল বিদ্রোহী এবং বিরুদ্ধতাবী হইয়াও এই সন্ন্যাসাদর্শই বর্তমান ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-ভগতে জন্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই সমাজের মনুষ্যমাত্রেরই যেন অতিক্রিতে সাধু গৃহস্থ অপেক্ষা বরং তীক্ষ্ণ-দৈন্ত-ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী অবধূতকেই অধিকতর সম্মানের চক্ষে দর্শন করেন; এবং নিজেরা যে কেবল ‘অবিচার’ বশত। গতিকেই সমাজের জাল ছিন্ন করা উদ্ভাও হইতে পারিতেছেন না, এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রতিনিয়ত ক্ষুদ্রতা অনুভব করেন। বৈরাগ্য এবং অসামাজিকতাকেই ধর্মসাধনার শ্রেষ্ঠ প্রণালী বলিয়া একটা অসংশয়িত স্বীকার বাক্য প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

সংসার এবং ধর্ম, এই দুইটাকে পরস্পর বিরুদ্ধগতিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে, সংসার হইতে বৈরাগ্য-পলায়নই শ্রেষ্ঠ ‘ধর্ম’ বলিয়া মনে করিতে পারিলে, তদুপস্থিতে মনুষ্য-জীবনের সমস্ত সঙ্কট সমস্তার নিকাশ হইয়া যায়, জীবন-বৃদ্ধির বিষয়ে নিদারুণভাবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়; এই ক্ষেত্রে অযোগ্যতা এবং ভীকৃত্যামাত্রই পরম মাহাত্ম্য বলিয়া প্রতীত হইয়া আত্ম বঞ্চনা সম্পাদন করিতে থাকে। এই প্রকারে মনুষ্য-জীবনের প্রধান সমস্তা-গ্রন্থটিকেই সেকেন্দর সাহের জায় এক আঘাতে ছেদন করিয়া ভারতীয় সমাজ ক্রমে সংসার বিষয়ে নিশ্চিন্ত এবং উদাসীন থাকিবার সুবিধা করিয়া লইয়াছে। তাই আজ ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ অবধূত। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনোমধ্যে এই বৈরাগ্য আদর্শই প্রগতি লাভ করিতেছে। চিন্তা করিবেন, এই লক্ষলক্ষের মধ্যে সর্ব্বলই কি অযোগ্য বা সংসারভীক? ভগবৎপের কথা ছাড়িয়া দিবেন, কিংবা বাহারা সন্ন্যাসীর ভেতটাকে জীবনোপায়রূপে, অথবা লোকের চক্ষে মাহাত্ম্য কিংবা বশোলাভের জন্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের কথাও ধরিবেন না। সন্ন্যাসীর জীবনটাকে উন্নত ধর্ম সাধনার পক্ষে অপরিহার্য জানিয়া, গুরুপদে বা সরলবিশ্বাসে একমাত্র সত্য পদ্য বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়া, বতী-ব্রত

গ্রহণ করেন এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা বিরল নহে। অনেকেই সরল বিশ্বাসে অশেষ দুঃখ-দৈন্ত এবং তপঃধেদকেই বরণ করিয়া লইয়াছেন, এবং দিবানিশি অতল্লিতভাবে অন্তরাত্মাকে নানা দিকে পরম বীরবে পীড়ন করিয়াই চলিতেছেন। এই সমস্ত শক্তিবর পুরুষকে ‘অযোগ্য’ বলিলে নিতান্ত অবিচার হইবে। ইহারা ভারতবর্ষের হৃদয়-গত বর্তমান ধর্মাদর্শের কল। ভারতীয় সমাজ এখন নিজের সমস্ত মতিগতি ও কার্যো-তাহার ব্যক্তি-সমূহের মধ্যে প্রবল বৈরাগ্য উদ্ভিক্ত করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছে; গৃহজীবনে এবং সামাজিক জীবন-পথে সর্ব্বত্র যেন ইচ্ছা পূর্ব্বক কাঁটা পুতিয়া রাখিয়াছে। ব্যক্তি-মাত্রের স্বাভাব্য বাহাতে প্রতিনিয়ত সমাজের মধ্যে ছুঁচা বিছা এবং আরম্ভলার উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, তাহার বিধান ত আছেই; সর্ব্বোপরি, এই বৈরাগ্যের আদর্শ! এই অবস্থায় আধ্যাত্মিক শ্রেয়ঃ-কামী, সরল-বিশ্বাসী এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব-শক্তিমান অনেকানেক ব্যক্তিই যে তাহার সমাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ডোর-কোপীন আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলিতে কি, কোনরূপ ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য বা স্বাভাব্য লাভ করিতে হইলেই অনেক স্থলে ভারতীয় সমাজ-গৃহ পরিত্যাগ করা ভিন্ন, একান্তভাবে চতুর্থাশ্রম বা বর্তমানের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা ভিন্ন, যেন অন্য উপায় নাই। সন্ন্যাস গ্রহণ করা মাত্রই ভারতীয় মনুষ্যের জীবন হইতে পরিবার, সমাজ কিংবা সংসারের, হিন্দু ধর্ম কিংবা শাস্ত্র-সংহিতার যাবতীয় বিধি-নিবেধ যেন সর্ব-নির্মোকে ন্যায় স্থলিত হইয়া পড়ে। * কেবল ধর্ম-বিষয়ে কেন, কোন দিকেই অসামান্যতা বা অত্যাশ্রয় সাধনা করিতে হইলে, এই দেশে একান্ত অসহায় হওয়া ভিন্ন যেন অন্য উপায়

* বর্ণধর্ম্মাশ্রমচার শাস্ত্রবল্লভেণ যোজিতঃ।

নির্গতোহসি জগজ্জালাৎ পিঙ্গরাদিব কেশরী।

নিজৈঃশরণে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিবেধঃ ?

শঙ্করাচার্য্য শুকাষ্টকম্।

নাই! তাহার সমাজতন্ত্রে ওইরূপ অসঙ্গতার বা এককতার জন্য বর্তমানে কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই। আমাদের সমাজ কেবল সন্ন্যাসীর নিকটেই কোন দাবী-দাওয়া করে না; উহার বিধি-বিধান বা বাধ্য-বাধকতা কেবল সন্ন্যাসীকেই স্পর্শ করে না। সুতরাং এই সমাজেও পরম স্বাভাব্য সিদ্ধি করিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু সন্ন্যাস-অবলম্বন ভিন্ন নহে। এই কারণে প্রতিবৎসর এই সমাজের অনেক তেজীয়াস্ ব্যক্তি স্বাধীন অধ্যাত্ম সাধনার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন সত্য কিন্তু উহার শুদ্ধ-সঙ্গীর্ণ আদর্শ এবং মায়াবাদের ফেরে পড়িয়া মনুষ্য-সমাজ-বিষয়ে সকল দিকে শূন্য হইয়া যান! তাঁহার নিজের ইচ্ছিত পরমার্শ লাভ করেন কি না, তাঁহাই জানেন; দৃষ্টান্তঃ, সমাজ-বন্ধনের এবং সপরিশ্রম জীবিকাকর্জনের সমস্ত জাতিত্ব এবং ফেসাদ হইতে মুক্তি লাভ করেন। এই সমাজ পূর্বকাল হইতে, স্পষ্টতঃ বৌদ্ধ-সম্বয়ের পর হইতে, নিজের মধ্যে তাঁহাদের জীবিকা ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দু গৃহী মাত্রেই যথাসাধ্য সন্ন্যাসীর ধোরাক যোগাইতে বাধ্য। কোন প্রত্যাশা না করিয়া, বরং উহাদের সংসর্গে প্রতিপদে নিজের বিশ্বাস-ধর্মকে বিপদাপন্ন করিয়া, হিন্দু সমাজ এই সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং দেখিবেন, এই সমাজে যেই টুকু স্বাভাব্য-সিদ্ধির পন্থা অব্যবহিত আছে তাহার প্রকৃতি এবং কার্যকারিতা এই রূপ! এই সিদ্ধি হইতে ভারতীয় সমাজ বা সাহিত্য কিছুমাত্র লাভবান হয় না। বলিতে কি, বৌদ্ধ-সম্বয়ের পর হইতে এই সমাজের গ্রহণ এবং উপার্জনের ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং এখন দৈনন্দিন কেবল ধরচের অঙ্কই বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং, পরম সুযোগ

সাহিত্য ও সন্ন্যাস। সুবিধা সত্ত্বেও, এই অত্যন্ততা-বৃত্ত ত্যাগের দৃষ্টান্ত হইতে ভারতীয় সাহিত্য বা সমাজ কিছুমাত্র উপকার উপভূত করিতে পারিতেছে না। সাহিত্যের বাণী-মন্দির সংসারের মধ্য-ক্ষেত্র হইতে, সামাজিকতার বন্ধ-হুল

হইতেই উর্দ্ধ লোক লক্ষ্য করিয়া চূড়াগ্রভাগ উত্তোলন করিয়াছে! এই কথা সত্য যে, এই মন্দিরের সাধক মাত্রেই সর্বপ্রকার মাহাত্ম্য-সাধককেই প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাসী হইতে হয়, কিন্তু এই সন্ন্যাস ঐকান্তিকতার নামান্তর। সাহিত্য-সাধকও সন্ন্যাসী হইবেন; কিন্তু গীতা-তন্ত্রের, অমুরাগ তন্ত্রের সন্ন্যাসী। ভগবদ্ভক্তি নিষ্কাম জ্ঞান-কর্ম-ভাব-যোগের অকুণ্ঠিত সাধনা-রসিক সন্ন্যাসী।

বলা বাহুল্য, এইরূপ একান্ত সন্ন্যাসের আদর্শও পৌরাণিকতার বৌদ্ধ সম্বয়োদ্দেশ্য পুরাণ-তন্ত্র এবং দর্শনাদির ব্যাখ্যা এবং টীকা টিপ্পনীর সম্পত্তি। বর্তমান কালে উহাই ব্রাহ্মণের অগ্র সমস্ত ধর্ম উপদেশ হইতে বলিষ্ঠ হইয়া, তাহার অধিকারকেও উত্তরাইয়া গিয়াছে! এই সমাজ নিজের জালে জড়িত হইয়া গিয়াছে। এখন সংহিতা-শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ এবং এই সন্ন্যাসী উভয়েই হিন্দু

সমাজ-তন্ত্রের বিধাতা! অপরূপ হিন্দু-সমাজের দৈর্ঘ্য বন্ধে পড়িয়া, অপিচ, প্রত্যেকের বৈত প্রভুত্ব। তরকেই শত শত সাংপ্রদায়িক মত

ভেদের মধ্যে পড়িয়া, জিজ্ঞাসু-মাজের ন্যূন সমক্ষে অরাজকতাই প্রতীয়মান হইতে থাকে। ব্রাহ্মণ যেমন প্রাচীন কালের আদর্শে চরমপন্থিতার বশ-বর্তী হইয়া বর্তমান হিন্দু সমাজকে প্রতিনিয়ত আত্ম-সন্তোষ করিতে উপদেশ করিতেছেন, সন্ন্যাসিগণ তেমনি কার্যে এবং কথায় সকলকে সমাজ-ধর্ম এবং সমাজের সীমা হইতে দূরে পলায়ন করিতেই প্ররোচিত করিতেছেন। হিন্দুর সাহিত্যে, সমাজে এবং অধ্যাত্ম-রাজ্যে ইহার ফল নানা দিকে বিভক্ত না হইয়া পারে না।

যাহোক রামায়ণ-মহাভারতের প্রধান লক্ষণ যদি বলিষ্ঠ, সরল এবং উন্নত আর্ধ্য-জীবন হয়, বলিতে হইবে

এই পুরাণ-তন্ত্রাদির প্রধান সাহিত্য-পুরাণের সাহিত্য-লক্ষণ, উহাদের অন্তরঙ্গীয় ভাব প্রবল-লক্ষণ ভাবুকতা। গতা বা ভাবুকতা। যেমন জীবন-ক্ষেত্রে তেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সর্বপ্রকার বস্ত-গতি বা বস্ত ভিত্তিটাকে নানা দিকে

অতিক্রম করিয়া এবং উপে দা করিয়াই, উগ্রাদের বাণী-প্রকোষ্ঠে, এই ভাবুকতাই সর্বত্র প্রবল হইয়াছে। উহা-দিগকে কাব্যসাহিত্যের শ্রেণীস্থ করিয়া নামকরণ করিতে হইলে বলিতে হয়, উহার ভাবগত কাব্য। সকল দিকে ভারতীয় পরিবার এবং গ্রাম্য-সমূহ, জাতিভেদ এবং সাংপ্রদায়িকতার গোণ অথবা মুখ্য স্বার্থের সহিত সম্পর্কিত, সর্বোপরি ব্রাহ্মণ্যের প্রাবল্য-লক্ষণযুক্ত এই ভাবুকতা। স্বয়ং সন্ন্যাসাদর্শটাও প্রবল ভাবুকতাই হইতেই উৎপন্ন; সুতরাং গীক কিংবা হীক সাহিত্যের 'ক্লাসিক' লক্ষণযুক্ত দৃঢ়তা বস্তু-ভিত্তি এবং মানবিক চরিত্র-ভিত্তির দৃষ্টান্ত বাদ দিলে, এই পুরাণ সমূহের মত এমন বিশেষত্বজনী প্রাচীন সাহিত্য আর নাই। চৈনিক সাহিত্যের কথাটা এই স্থলে গণনা করিতেছি না; উহাও নানা দিকে 'ক্লাসিক' লক্ষণাক্রান্ত। ভারতীয় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ পুণ্যবীর সর্বকোষ্ঠ ভাবুক। ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যজাতি সমাজতন্ত্রে বিশেষ বিশেষ গুণ-দোষ এবং ঘটনার সম্পর্কে উদ্ভাবিত হইয়া, এই ভাবুকতা শিল্পের তৎফে যেই অপরূপ সাহিত্য-লক্ষণের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার আভাষ ইতিপূর্বে দিয়াছি (১)। এই ক্ষেত্রে উহার সামাজিক ফল মাত্র সঙ্কলিত হইতেছে। ভৃগুপ্রোক্ত মানব-ধর্ম্যশাস্ত্রে ধর্ম্যের যেট লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, উহার অল্প নাম 'ভাব' বা ভাব-প্রাণতা হিন্ন আর কিছুই নহে (২)। ভাবই জগতের ধর্ম্য : চরাচরের, জীবন্তের, মনুষ্যাত্মের গতি ধর্ম্যমুখী—ভাবমুখী—উর্দ্ধমুখী—নিরোধমুখী। মনুষ্যের সমক্ষে এই নিরোধাত্মক ভাব সাপ-নাই ধর্ম্য-সাধনরূপে প্রকটিত হইয়া, দেশ, কাল এবং পরিবেশের মধ্য দিয়া, নানা প্রকারে এবং নানা পথে তাহাকে পরম-তত্ত্ব, অনন্তের ভাবতত্ত্ব এবং ভূমার অভিমুখে পরিচালিত করিতেছে। ভারতবর্ষের বিশেষ হিন্দু-সমাজতন্ত্রে পরিবেশের মধ্যে পতিত হইয়া, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ এই ভাবুকতাকেই বিপুল

(১) প্রতিভা—১ম বর্ষ, ৩৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ধৃতি ক্রমা দমোহন্তরং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

ধীবিদ্যা সত্যমক্ৰোধো দশকং ধর্ম্যলক্ষণম্ ॥

মহুসংহিতা।

পুরাণ-সাহিত্যে অমুসরণ করিয়াছেন। পুরাণাদির ব্রহ্মজ্ঞান যপ, তপ, ব্রত-নিয়ম এবং পূজা পদ্ধতি এবং বিপ্র-প্রিন্তার প্রবপদ সমস্তই একটা বিশেষ ভাবাদর্শে নিয়ন্ত্রিত। তাহার দাম্পত্য ধর্ম্য পতিপূজা এবং সতীর আদর্শ, সতীধর্ম্য এবং সহমরণের আদর্শ, তাহার পিতৃমাতৃ-ভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, অপত্যাকামনা এবং অপত্য-বাৎসল্য, সমস্তই তাহার পারিবারিক ক্ষেমতন্ত্রীর ভাবুকতার ফল। তাহার বিবাহ-পদ্ধতির কন্যাদান-আদর্শ, স্ত্রীজাতির অধীনতা ও নিষর্নতা, তাহাদের 'সেবা-ধর্ম্য', বালা-বিবাহ, বহু বিবাহ, বৈদব্য, বিধবা-বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহের নিষেধ, গোহত্যা-নিষেধ, অশ্বেশ সাংপ্রদায়িকতা এবং অনন্য জাতিভেদ, ব্যবসায়-ভেদ, স্পর্শাস্পর্শ এবং ধাত্বাধাত্ব বিচার, তাহার ধর্ম্য-শাস্ত্রের যাবতীয় বিধি এবং নিষেধ সমস্তই তাহার বিশেষ তন্ত্রীর পরিবার এবং সমাজের অধ-গুতা কল্পেই পরিকল্পিত। সমস্তই পরম ভাবুকতার লক্ষণ-যুক্ত ও কেবল সঙ্কোচাত্মক এবং আশ্র-ব্রহ্মাত্ম-প্রায়সী কবচ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বর্তমান কালে দূর দূরান্তর হইতে প্রতাগত বিভিন্ন পরিবার, সমাজ এবং ধর্ম্যাদর্শের পরস্পর সভ্যতা সমক্ষে, সর্বোপরি সন্মিলিত এবং সর্ম-সঙ্কলন-শীল বিশ্ব সভ্যতাব আদর্শ সমক্ষে উহার উজ্জ্বলতা স্রিয়মান হইয়া গিয়াছে সত্য। কিন্তু সহস্র বৎসর পূর্বে উহার মাহাত্ম্য বা অপরিহার্য্যতা বিষয়ে কোনরূপ সংশয় পূর্বের অবকাশও ঘটে নাই। এই সমস্ত আদর্শের আতি-শয়াটুকু উগ্রাদের জেদটুকু সর্বপ্রথমে অনার্য্য, দ্রাবিড় এবং বৌদ্ধ আদর্শের বিরুদ্ধে এবং কিছুকাল মুসলমানীর বিরুদ্ধেই চলিয়াছিল। এই জেদ হইতে পরকালে সমাজ মধ্যে যে কত অভাবনীয় অনিষ্ট সঙ্গ ঘটিতে পারে তাহার দিকে কাহারও দৃষ্টি পরিচালিত হইতে পারে নাই। যাহোক পৌরাণিক ব্রাহ্মণ কত মতে কত পদ্ধতি এই ভাবুকতার অমুসরণ করিয়াছেন। সাহিত্যের হিসাবে পুরাণ সমূহের মধ্যে স্বাভাবিকতা অথবা বস্তু-ভিত্তি অপেক্ষা উহার ভাব লক্ষণই প্রধান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। এখন, অপরূপ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ভাবুকতাই জীবনা-

দর্শে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। কবিত্ত এবং কল্পনাই ভারতীয় সমাজের জীবন ক্ষেত্রে আসিয়া বস্ত-পরিণতি লাভ করিয়াছিল। চিন্তা করিবেন, পুরাণের এই ভাবুকতা সকল দিকেই প্রাকটিকেল (Practical)। পৌরাণিকের মনস্থে অথবা জীবনে কোন পার্থক্য ছিল না; পার্থক্য ছিলনা বলিয়াই হৃদয় তাঁহার প্রতি পরম ভক্তি প্রীতি অমুভব করে! ভারতীয় ব্রাহ্মণ যেমন পরের বিষয়ে, তেমন নিজের বিষয়েও চিরকাল কঠোর এবং অ-ক্ষমাণীল! তাঁহার বাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, এই সমাজের অসঙ্গ প্রতিবেশের মধ্যে, জীবন পথে তাঁহাদের চক্ষে বাহা ‘মনাতন’ বলিয়া অমুভূত হইয়াছিল, তাঁহার জীবনের অল্প সমস্ত বিবেচনা বিচার তুচ্ছ করিয়া উহারই সাধনায় অগ্নান মুখে প্রাণ পাত করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের পক্ষে বিশ্বাসান্বিত জীবনের আয় এমন সম্মানের জিনিষ আর কি হইতে পারে? এই ভাবুকতার সকল জেদ বা প্রতীয়মান দোষ সত্ত্বেও উহা হৃদয় মধ্যে পরম ভক্তি-পদবী অধিকার করিয়া বসে! এই ভাবুকতার আদর্শে ভারত বর্ষের কোটি কোটি নর-নারী আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছে! তাহার রমণী জাতি অশিকার অঙ্ককারে আচ্ছন্ন থাকিয়াও নারীত্বের অল্প সকল স্ব-স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া কেবল অপত্য-পালন এবং সেবা-ধর্মকেই সার করিয়া গিয়াছে; গঙ্গাসাগরে প্রাণ সম পুত্রের বিসর্জন দিয়া গৃহে ফিরিয়াছে, লক্ষ লক্ষ বালবিধবা আমরণ কঠোর ব্রহ্মচর্য সাধনায় দেহ ভস্ম করিয়াছে। স্বামী-দেবতার জলন্ত চিতা-বন্ধে অগ্নান মুখে চড়িয়া বসিয়াছে! এই সকল কার্যের উপ-দেষ্টা বা প্ররোচকগণের বাহাই বিচার হউক না কেন অমুর্তা-পণের অলৌকিক মহাত্মা কে অস্বীকার করিবে! কোটি কোটি সরল বিশ্বাসী মনুষ্য আমরণ ডোর-কোপীন সার করিয়া পরম কায় ক্লেশের কটক-চক্রে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে; কোটি কোটি পিতাপুত্র মাতা এবং ভ্রাতা ভগ্নী এই একাদমবর্তী পরিবার এবং শাখ-সমাজ-তন্ত্রীর ভাবুকতার সাধনায়জে নিজের সমস্ত ব্যক্তিগত স্ব-স্বার্থ

অথবা বাহ্যিকের স্পৃহা আহতি দিয়া জীবনরূপ স্বপ্নটাকে প্রতিবাহিত করিয়া যাইতছে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন।

প্রতীক্ষা

নিরুদয় নিশীথ, করে ছম ছম,
আঁধার ভিতরে, বাহিরে।
নয়নের পুটে আজিকে আমার,
নাহিক নিদ্রা নাহি রে।

সুতগুলি কোলে নয়ন নামায়ে,
ঐ যে প্রকৃতি পড়েছে ঘুমায়ে,
তুমি বুঝি আজ—ভূতলে নামিবে
ছায়া-পথে তরী বাহি রে।

মিটি মিটি অঙ্গে তৃতীয়ার চাঁদ
পিটি পিটি অঙ্গে তারা,—
ক্ষণ আলোগুলি রাখিয়াছ আলি
পাছে হও পথ হারা।

চুপি চুপি তুমি, নামিবে সহসা
টিপি টিপি পায়ে ধরিব ভরসা।
গোপনে আড়ালে গগনের পানে
তাৎ আছি আজি চাহি’ রে।

শ্রীকালিদাস রায়।

সন্তান-পালন

প্রকৃতির বিধান এইরূপ যে, পুরুষ রোগগার করিবে, আর স্ত্রী গৃহ-কর্ম ও সন্তান পালন করিবে। এই ব্যবহাটিকে দোষ দেওয়া যায় না। যে গৃহে স্ত্রী-পুরুষ সম্ভাব সহকারে নিজেদের কর্তব্য পালন করিতে থাকেন সেখানে চিরশুখ, চিরানন্দ বিরাজ করে। আর যেখানে স্ত্রী পুরুষের দায়িত্বের বিচার নাই, সেখানে সর্ব বিষয়েই বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও অপূর্ণতা থাকিতে দেখা যায়। সেকালের তুলনায়, আজ কালকার জননীরা সন্তান পালন বিষয়ে যেন কিছু বেশী মাত্রায় পরমুখাপেক্ষিনী হইয়া পড়িয়াছেন। ধনীর ঘরের ত কথাই নাই, অনেক মধ্য-বিত্ত গৃহস্থ-সংসারেও দাস দাসীর হস্তে শিশু পালনের ভার হস্ত থাকিতে দেখা যায়। কালক্রমে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নানা প্রকার পরিবর্তন ঘটিতেছে; ইহাও সেই পরিবর্তনের ফল মনে করিতে হইবে। অবশ্য আমরা এমন বলিতেছি না যে, আজ কাল-কার মাতারা সন্তানের কিসে ভাল মন্দ হয়, তাহা মোটে চিন্তা করেন না। অনেক স্থলেই মাও দিবা রাত্র সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন ইহা আমরা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু সুখ মঙ্গল কামনা করিলে ত হয় না—কি করিলে সত্যি সত্যি তাহা হইতে পারে, তাহাও জানা আবশ্যক। এবিষয়ে এদেশের মেয়েদের যে বিশেষ জ্ঞান আছে, আমাদের তাহা মনে হয় না। সে জ্ঞান যদি থাকত তাহা হইলে বৎসর বৎসর এতগুলি করিয়া শিশু মৃত্যু-যুগ্মে পতিত হইত না। শিশুর মৃত্যু সংখ্যা তাহা হইলে, অণুতঃ বার আনা যে কমিয়া যাইত, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

সব মা-ই মনে করেন, তাহার ছেলেটি সর্ববিষয়ে যেন আদর্শ পুরুষ হয়। আদর্শ পুরুষ হওয়া যদি চ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তথাপি উচ্চ আদর্শ সামনে রাখিয়াই সন্তান পালন করিতে হয়। বিশেষ বিবেচনা

পূর্বক, শিশুর অশন, বসন, নিদ্রা, স্নান, শারীরিক ও মান-সিক শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলে, তবেই ত সে বড় হইয়া আদর্শানুযায়ী হইতে পারিবে; নচেৎ নহে। ছেলে মানুষ করিতে হইলে, মাতার পক্ষে, বিশেষ বুদ্ধি বিবেচনা, শ্রম স্বীকার, আত্মত্যাগ, ধীরতা, ভবিষ্যৎ জ্ঞান ও প্রত্যুৎপন্নমতির আবশ্যক। এ সকল যাহার আছে তিনিই কেবল কর্ণেলিয়ার (Cornelia) মত আপনার ছেলেদের দেখাইয়া গর্ব ভরে কহিতে পারেন—“ইহারাই আমার রত্নালঙ্কার—ইহারাই আমার মণি মুক্তা—সর্বস্ব ধন।”

মানুষের শৈশবটাকে এক ভাল কাদার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইহা হইতে দেবতা গড়ান যায়, আবার বাদর না হয় এমন নয়। দক্ষ শিল্পী মনে করিলে ইহা হইতে অনায়াসেই দেবতা গড়াইতে পারে; আর যাহার দক্ষতার অভাব—যে কি করিয়া ঠাকুর গড়াইতে হয় তাহা ঠিক জানে না—সে যত চেষ্টাই করুক না কেন, তাহার হস্তে দেবতা না হইয়া অপর কিছু হইয়া পড়ে। ছেলেটিকে মানুষ করিব, সুখ এই ইচ্ছা থাকিলে হয় না—মানুষ হয় কি করিয়া, তাহাও জানা আবশ্যক। আমাদের জননীগণ তাহা জানেন না বলিয়াই, আজ আমাদের এই দুর্দশা।

পালনপালন ও শিক্ষার দোষেই ত আমাদের মধ্যে অনেকেই শিশুকাল হইতে স্বাস্থ্য-সুখ হইতে বঞ্চিত। ঐ যে বনের ধারে, অপারগত দেহ, বিকৃতগঠন, বক্রগদ ব্যক্তি পথিকের রূপা ভিক্ষা করিতেছে,—উহার এদশা কি করিয়া হইল? ভূমিষ্ঠ হইবার কালে, উহার কোনরূপই দৈহিক বিকৃতি ছিল না। শিশুর উপযোগী খাদ্য হইতে বঞ্চিত হওয়াতেই ত দেড় বৎসর বয়স হইতে, উহার হাড়গুলির এইরূপ বিকৃতি আরম্ভ। শৈশবের পালনের দোষেই ত আজ আমরা এরূপ থকা-কার, দুর্বল ও অস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছি।

মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি আছে, যাহার দ্বারা সে রোগের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে

সমর্থ হয়। শৈশবে পালনের দোষে, এ শক্তিটি ভালরূপ পরিষ্কৃত হইতে পায় না। মাতার বুদ্ধি বিবেচনার উপর আমাদের দৈহিক উন্নতি যেমন নির্ভর করে—আমাদের ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠন ও মানসিক উন্নতিও সেইরূপ তাঁহার উপরই একান্ত ভাবে নির্ভর করে। মাতা যদি সাহসী না হন, সন্তানের পক্ষে সাহসী হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিতে হইবে। শিশু কৈশোর বয়স হইতে শিখিতে থাকে, তাহা ঠিক বলা যায় না, তথাপি মাতৃকোড়েই যে উহার শিক্ষা আরম্ভ একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। শিক্ষা বিষয়ে দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় যেরূপ সহায়তা করে এমন অল্প কোন ইন্দ্রিয় নহে। শিশু আপনার মাকে যাহা বলিতে শুনে অথবা করিতে দেখে, তাহাই অভ্যাস করিতে আরম্ভ করে। মাতা যদি বিরসবদনা ও কর্কশ-ভাষিনী হন সন্তানের চরিত্রে রুচতা ও অপ্রসন্নতা নিতান্তই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। আর তিনি যদি মিতবদনা, মিষ্টভাষিনী হন, প্রফুল্লতা ও মিষ্টবাদিতা সন্তানের পক্ষে যেন স্বভাবজাত হইয়া পড়ে। আমরা এমন অনেক ঘটনা জানি, যে সকল স্থলে, কেবল দাত্রীর পরি-বর্তন দ্বারা শিশুর স্বভাব বদলাইয়া গিয়াছে। মাতৃ-ঘরে কোন গুণই পূরা পূর বংশগত বা দৈবলব্ধ নহে। সকল গুণই অতুর্গীলন দ্বারা পারণাত ও বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় শৈশব ও বাল্যই অতুর্গীলনের উপযুক্ত সময়। এ সময় উপেক্ষা করিলে পরে আর ফল পাইতে দেখা যায় না। ছেলেটির যেমন শিক্ষা হইতেছে ইহা যেমন তাহার রোগের সময় টের পাওয়া যায় এমন সুস্থ অবস্থায় নহে। এমন অনেক ছেলে মেয়ে থাকে, যাহারা ব্যারামের সময় কটু তিক্ত ঔষধ এবং রোগোচ্চত পথ্য কোন মতেই খাইতে চাহে না। একটু অস্থিস্থান করিলে দেখা যাইবে বাহাত্তা কাহাকে বলে,—ইহাদের পিতা মাতা এক দিনও ইহাদের তাহা শিখান নাই। ইহারা যখন যাহা চাহিয়াছে অবাধে তাহা পূর্ণ করিয়া আসিয়াছেন। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয় যে, স্ত্রী শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। সন্তান-পালন-বিজ্ঞা-শিক্ষাও ততোধিক

আবশ্যক। কি প্রকারে রাখিলে শিশুর সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব—রোগ কালেই বা কি কি নিয়ম অবলম্বন করা উচিত এ সকল বিষয়ে যতই আলোচনা হয় আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল বলিতে হইবে।

আমরা ধারাবাহিক রূপে সন্তান পালন সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি প্রকাশ করিতে থাকিব। আশা করি বঙ্গ জননীগণ ইহা পাঠ করিয়া তত্ত্বসারে কার্যা করিতে প্রয়াসী হইবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগ্গিচি, এল, এম, এস।

প্রত্যাখ্যাতা

যাত্রা

উত্তরে যত দূর দৃষ্টি চলে দেখা যায় পাহাড়ের কঁাকে কঁাকে রূপার রেখার মত ইরাবতী ভাষের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আবার পূর্ব দিক হইতে দুটি ক্ষুদ্র নদী প্রস্তর শৈলের প্রেক্ষাপ্ত বহিয়া ইরাবতীতে ঢালিয়া দিতেছে। সম্মুখ স্থলে ভাষা। সুন্দর ক্ষুদ্র সহর ; চতুর্দিকে ধূস্র পাহাড়ের বেগুন স্থলে স্থলে ঢালু হইয়া নদী গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। ঢালু স্থানগুলি ঘন সবুজ ছন্দাদলে ঢাকা—যেন যত্র করিয়া কেহ গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। পাহাড়গুলি ক্রমশঃ উঁচু হইয়া উত্তরে ও পূর্বে হটিয়া গিয়া শেষে মেখে ঠেকিয়াছে। সকালে চুড়ায় চুড়ায় তাঁরের মত কিরণের আঘাতে উড়িয়া গিয়া রাশি রাশি সোনার কণা নদীর জলে, পথে, ঘাটে, লতায়, পাতায় ছড়াইয়া পড়ে এবং ব্রহ্মদেশের সুবর্ণভূমি নাম সার্থক করিয়া দেয়।

নদীর দিকে সদর দরজা এমন একটি দোতারা সুন্দর কাঠের বাংলা ঘর। সম্মুখ দিয়া ঘাসে ঢাকা সদর রাস্তা নদীর তীরে তীরে অনেক দূর চালায়া গিয়াছে। রাস্তার অপর পাশে বাংলাটির দুই দিকে মাঝে মাঝে অনেকগুলি কাঠের দাঁড় তল পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। এক একটি দাঁড়ের আট দশটি খাপ এবং এক একটি খাপ প্রায় দশ

হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া । রেশমী-লুঙ্গি-পরা, জ্যাকেটের মত লম্বা আঙিনের ঢল ঢলে রেশমী-জামা-পায়ে-দেওয়া, মাথায় রেশমী-কম্বল-বাঁধা এবং ডসনের বুট-পায়ে-দেওয়া ব্রহ্মদেশীয় বহু যুবক চুরুট মুখে দিয়া রাস্তার ধারে ও সীড়ির উপরে বসিয়া থাকে এবং সন্ধ্যা কালে ইরাবতীর সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। আকাশ হইতে ইরাবতীর জলে আবির্ভাব হইয়া পড়ে এবং লাল জলে বাংলা খানির ছায়া পড়িয়া একটি সুরম্য ভূচিত্রের মত সূটিয়া উঠে ।

এক দিন বৈকাল বেলায় অন্তগামী সূর্যের কিরণগুলি উজ্জ্বল মেঘের মাঝে মাঝে যাই যাই করিয়াও যাইতে ছিল না। প্রাসাদের মত সেই দূরের স্বর্ণ মেঘ সমূহের মধ্য দিয়া ও বৃক্ষ-শ্রেণীর ফাঁক দিয়া যেন বর্ণ পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল। তখন বাংলাটির নিম্ন তলের চন্দন কাঠের স্তম্ভগুলিতে কারু কৌশলের বিচিত্র প্রমাণ স্বরূপ খোদিত লতা ও বিহঙ্গরাজি মাণিক হীরার ঔজ্জ্বল্য লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। এমন সময় অন্ধকারের আবছায়ায় একটি ব্রহ্মদেশীয়া যুবতী দোতালার গবাক-পথে মুখ বাড়াইয়া ইরাবতীর উদ্দাম সলিলোচ্ছ্বাসের চঞ্চল সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। আকাশ লম্বা ঘোর কৃষ্ণ এক দাঁশি কেশ তাহার মাথায় জাপানী ধরণে চূড়া কবরীর আকারে বাঁধা ছিল, পরণে পীত বর্ণের বসন “কিম্বোয়ার” মত জাপানী ধরণে আঁটা ছিল, প্রশস্ত কটিবন্ধ তাহার মধ্যদেশকে জোর করিয়া স্খীণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং পরিচ্ছদে গন্ধদ্রব্যের অতিরিক্ত প্রাচুর্য্য বাতাসে ভাসিয়া যাইতেছিল। যুবতীর ওষ্ঠ ও গণ্ডদেশ তখন ‘ক্লক’-রঞ্জিত হওয়ার মুখখানি পূর্ণ বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর দেখাইতেছিল এবং তাহার মুট মুটে গৌর কাণ্ডি সর্কাজে ঠিক জ্যোৎস্নার প্রালেপের মত এক অপক্লপ সৌন্দর্য্যে সূটিয়া উঠিয়াছিল। কাল ও মোটা ক্রলতার নিম্নদেশে পায়ের মত তাহার বড় বড় চক্ষু দুটির দৃষ্টি হইতে সর্বদাই রেহ গলিয়া পড়িত ; কিন্তু তার গণ্ডের অর্ধি দুটি একটু উন্নত, চিবুকটি একটু খাট এবং ঠোঁট দুটি

একটু পুরু ছিল। ব্রহ্মদেশে এমন সুন্দরীর অভাব না থাকিলেও অল্পতা আছে ইহা সকলেই স্বীকার করিত।

সন্ধ্যা কালের এই সৌন্দর্য্য দেখিয়া কিন্তু যুবতী ভীষণ লাজ করিল না। একটা অভূত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় অক্ষুণ্ণবরে বলিয়া উঠিল, “তিন বৎসর ধরিয়া আশায় দিন কাটাইতেছি, শুধু আশায় পথ চাহিয়া আর কত কাল বসিয়া থাকিব ?” এই বলিয়া মা-ইউনৌ একটা নিঃশ্বাস ছাড়িল। সে আশায় ছিল কা-উজানের সহিত তাহার বিবাহ হইতে আর দেরী হইবে না।

দেখিতে দেখিতে পাহাড়ের কাল ছায়া বিরাট দৈত্যের মত ঘন হইয়া আসিয়া তামো নগরটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল—কেবল গন্ধভরা বাতাস অন্ধকার দৈত্যকে অগ্রাহ করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

কা-উজান এণ্ডার্সন সাহেবের কারখানার খাজাখোর কার্য্য করিত। আর অতি সামান্য ছিল বলিয়া এত দিন সে ইউনৌকে বিবাহ করিতে পারে নাই। বৎসরান্তে যখন এক এক বার বেতন হুজি হইত তখন মনে করিত সে ইউনৌর প্রেম-রাজ্যের সীমার দিকে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে ভবিষ্যৎ সুখের আলোক-পাতে তাহার হৃদয় নূতন আশায় ও নূতন উৎসাহে ভরিয়া উঠিত। দীর্ঘ দশ বৎসর এইরূপ ভাবে কাটিয়া গিয়াছে—সে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু সেই স্বপ্নের রাজ্য আলোর মত হঠাৎ পিছাইয়া গেল।

তাহার আশা ছিল যত্ন কালে এণ্ডার্সন পরিভ্রমের ও সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ এমন একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন, যাহাতে তাহার আর নিরাশার তাড়নায় কিম্ব হইতে হইবে না। কিন্তু সেই আশার বাঁধও ভাঙিয়া গেল।

“আপনি উইলের মর্শ বোধ বুঝেছেন তো ?”

“হাঁ, মর্শ বুঝিছি, কিন্তু এই সর্জের উদ্দেশ্য বা রহস্যটা বুঝিতে পারি নাই।”

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

“আরও দশ দিন সময় আছে, এখনও চিন্তা করিবার অবসর যথেষ্ট আছে।”

“আপনি কি কিছুই জানেন না?”

“জানিলেও, যাহা বলিয়াছি তার বেশী আর কিছু বলিতে পারিব না। মক্কেলের নিকট আইন ঘটিত বিষয় ছাড়া অন্য কথা জিজ্ঞাসা করার বা শোনার উকীলের অবকাশ নাই।”

এই বলিয়া এডভোকেট কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কা-উজান শব্দ মনে কত কি ভাবিতে লাগিল। উইল-রহস্য ভেদ করিবার ক্ষমতা এই ভাবনার ভিতর দিয়া তাহার মনে পাড়ল সেই সুন্দর মুখখানি ভূষিত ও আকুল, কিন্তু মিলনের আশায় উজ্জ্বল। যখন শৈশবে সংসারটা কেবল আনন্দময় ছিল তখন হইতেই ইউনী কা-উজানকে ও কা-উজান ইউনীকে ভাল বাসিয়া আসিতেছে।

সে দশ বৎসরের কথা। তখন ইউনীর বয়স ছিল আট বৎসর, এখন সে আঠারতে পড়িয়াছে।

চাকুরীর উমেদার হইয়া প্রথমে যখন সে এণ্ডার্সনের কাছে উপস্থিত হয় তখন এই গৃহেই তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ। কা-উজানের করুণ কাহিনী শুনিয়া সে সময়ে এণ্ডার্সনের মন গলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহার পর পারিবারিক কোন বিষয় লইয়া এণ্ডার্সনের সহিত কোন দিন তাহার আর কোন আলাপ হয় নাই। তবে এই অসুখরোধের কারণ কি? এই জটিল সমস্যা কিনারা করিতে গিয়া কা-উজান হস্তান্তর উইলের প্রতি আবার দৃষ্টি করিল, এবং হঠাৎ একটা স্থান পড়িয়া ক্ষোভের মধ্যেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

পরে আবার একটা বিরুদ্ধভাবে তাহার হৃদয় একটু সজাগ এবং চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যবস্থার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া সে মাকড়সার মত কেবল বন্ধনার জালে জড়াইয়া বাইতে লাগিল। তখন আর ভাবিতে পারিল না এবং স্থির করিল ইউনীকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবে এবং দুজনে পরামর্শ করিয়া কণ্ডব্য

নিষ্কারণ করিয়া লইবে। কিন্তু যদি এই কার্য্যে নির্লিপ্ত থাকাই স্থির হয় তবে এণ্ডার্সনের কারখানায় তার আর স্থান হইবে না।

আবার চিন্তার তরঙ্গ বহিল। উইলের শেষ কথাটা কেবলই গুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে আসিতে লাগিল। “প্রভু-ভক্ত, বিশ্বাসী ও সদ্বংশজাত কা-উজান তাহার মৃত প্রভুর আদেশ পালন করিয়া স্বকীয় মহৎ অক্ষুণ্ণ রাখিবে।” — এই একটি কথার চিন্তা তাহাকে হাত ধরিয়া ভাবনার আবর্ত হইতে সাশ্বনার রাজ্যে লইয়া আসিল। সেখানে সে দেখিল স্বার্থ-নিঃস্বার্থ, করুণা-কাঠিন্য, প্রেম ও ঘৃণা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রভুর প্রতি ভক্তি শতবারে আবার তাহার হৃদয় ভরিয়া দিল, সে অক্ষুণ্ণ চিতে গৃহে ফিরিয়া গেল।

শ্রাবণের মধ্যাহ্নে বর্ষাসিক্ত গাছ-পালাগুলির উপর সৌন্দর্যের কিরণ রঞ্জন যুগ্মের স্নান হাতের মত থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। দিকে দিকে মেঘের ভারে আকাশ যেন গুইয়া পড়িয়াছে। দূর হইতে চাতকের আর্ন্ত চীৎকার বায়ু-প্রবাহে ভাসিয়া আসিতেছে। ইরা-বতা কুল-স্রাবা প্রবাহ লইয়া গভীর অথচ ক্ষিপ্ৰ বেগে ছুটিয়া বাইতেছে।

যাত্রীর সংখ্যা অল্প, কারণ শ্রাবণে পারত পক্ষে কেহই সন্মুদ্র যাত্রা করে না। রেঙ্গুনের ঘাট হইতে টার্নার মরিসন কোম্পানীর “সাহাজাদা” নদী ছাড়াইয়া নাল সন্মুদ্রে আসিয়া পড়িল এবং লাঙ্গলের খাঁতের মত সন্মুদ্রে বদ্ধ অন্ধিত করিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। অদিক যাত্রী না থাকাতে কা-উজানের বেশ সুবিধা হইল। একটি গোটা ক্যাবিন সে দখল করিয়া বসিল, এবং দ্বিতীয় সেলুনের প্রায় সমগ্র ডাকটির উপরও দখলের স্বত্ব সাবাস্ত করিয়া লইল। ফল কথা এমন অসঙ্গীর্ণ ও উন্মুক্ত স্থান না হইলে তাহার চিন্তা এসার লাভ করিতে পারিত না।

জাহাজে আরোহণ করিয়াই কা-উজান এডভোকেটের দেওয়া সিল মোহর করা চিঠিটা পড়িল। বুঝিল প্রথম

সাক্ষাতে : তীক্ষ্ণবুদ্ধি এণ্ডার্সন তাহাকে এই গুরুতর কার্য সাধনের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

দেখিল ছ'এক স্থানে রক্তের মনে বিশ বৎসরের গুপ্ত যন্ত্রণার আভাষও রহিয়াছে।

“প্রেমিকার নিকট নিঃশেষে জনয়ের সর্বদা নিবেদন করিয়া দিয়া কা-উজান দীর্ঘ দশ বৎসর কাটাষ্টয়ছে—শুধু মিলনের আশায় ও স্তম্ভ যোগের প্রতীক্ষায়। যে প্রণয়িনী এত নির্ভরযোগ্য মে-ই আমার কার্য সাধনের একমাত্র যোগ্য। স্বর্গ হইতেও আমার আশীর্বাদ তাহার জীবনকে কল্যাণময় করিনে।” প্রথম পৃষ্ঠায় এই কয়টি কথা লিখিত ছিল এবং স্থলে স্থলে আইনের নীরস ভাষার অন্তরাল হইতে সঙ্গদয়তার ভাব সমগ্র চিঠিটাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছিল।

এণ্ডার্সনের চিঠি।

“সে ত্রিশ বৎসরের কথা। তখন আমার বয়স ২৪ বৎসর। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পিতা ভারত যাত্রা করিয়াছিলেন। আমরা তিন ভাই, আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। ঘুরিতে ঘুরিতে লক্ষীর জীলা-ভূমি লক্ষদেশে আসিয়া তিন কাঠের কারবার খুলিলেন। অল্প দিনেই কারবারের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইল। আমার জ্যেষ্ঠগণ কারবারে পিতার সাহায্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু শিশুর ভারত সানাতন সর্বাংশে উত্তেজনা লইয়া আমাকে সাগ্রহ প্রার্থনায় আহ্বান করিতেছিল। পূর্বে অনাশ্রয়িতা স্বাধীনতার সঙ্গ লালসা-আমাকে পিতার শাসন হইতে মুক্ত করিয়া দিল। এক দিন শীত মধ্যাহ্নে ব্রহ্ম হইতে কলিকাতার জাহাজে চড়িয়া পিতার শাসন গভীর বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।

বলিয়া আসিয়াছিলাম কলিকাতাতেই থাকিব। কিন্তু পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গের জায় এক বার শাসনের বেড়ার বাহিরে আসা মাত্র মুক্ত আকাশ সুহৃৎ মেহের বাছ দিয়া আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

পশ্চিম ভারতে এক দেশীয় রাজার গৃহচিকিৎসকের

বাড়ীতে অতিথি হইলাম। আরও দেশীয় হইলেও তিনি ভারতীয় শিক্ষা সংস্কার-পুষ্ট অধিকন্তু দেশীয় অতি-শ্রেষ্ঠ এক রাজ কৰ্মচারীর কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতীয় রীতি নীতিরই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন—এই আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলাম বলিয়া আমাকে মধ্য দেশের গোপন-অধ্যায়ে এত দিন একটা আয়ত্মানির ঘনাককার সম্মুখে রক্ষা করিতে হইয়াছে—এই আতিথ্যই আমার জীবনকে তিক্ত রহস্যে কলঙ্কিত করিয়া অতঃপর আমার উপর প্রতিহিংসা সঞ্চার করিয়াছে এবং আমার অতুল ঐশ্বর্য ও সুনাম অপরের হিংসার উদ্বেক করিলেও ইহা আমার চক্ষে একটা অসার বিভীষিকার মরুভূমি হইয়াছে।

একমাত্র যুবতী কথা ছাড়া ডাক্তারের আর কেহ ছিল না। নবীন মেঘের মত তাহার স্বচ্ছ সুনীল চক্ষু দুটি, পল্লবের মত আরক্ত কাণ্ডি লম্বা ছোটো হাদামার সর্বল মুগধানি প্রথম দর্শনেই স্বর্ণের পূর্ণা আলোকে আমার জন্মের ফটোগ্রাফের ছবির মত অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা আকিও মুছিয়া যায় নাই।

তিন মাস পাটনা গেল, আমার অর্থদল্ললও ফুটাইয়া আসিল। ডাক্তার স্বীয় কন্ঠার ও আমার উপর গৃহ রক্ষার ভার দিয়া শিকারে গিয়াছিলেন। এই সুযোগ আশ্রয় করিয়া আমরা তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। নগরের উপকণ্ঠে দুই জন পাত্রি থাকিতেন, তাঁহারাই একমাত্র ধর্ম সম্বন্ধে বিবিধভাবে আমাদের পরিণয় সম্পাদন করিতেন। দায়িত্বে প্রকণ্ড ভাবে বিবাহ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাক সঙ্গে লইয়া আসিলাম। সূতরাং বিধি, ত্রায়, ধর্ম ও আইন মত আমাদের বিবাহ পাকা হইয়া গেল।

আমার উপদেশ মত কলিকাতার ঠিকানায় আমার নামে লিখিত চিঠি স্থানীয় ডাকঘরে জমা হইয়াছিল। বাবা শেষ চিঠিতে শব্দ পাওয়া মাত্র ভায়োতে ফিরিয়া যাঁহিতে লিখিয়াছেন। বসন্ত রোগে আমার দুই সহোদরেরই মৃত্যু হইয়াছে। সূতরাং অবিলম্বে করিয়া না গেলে কারবারের বিস্তর ক্ষতি হইবে।

কি করি, সঙ্গিনীকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম দীর্ঘকাল প্রকাশ্য বিবাহের আর সময় নাই। পিতার নিকট গিয়াই তাহাকে বলিয়া বসিলাম। এবং আমার পিতা পরম আত্মদানে তাহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবেন। সঙ্গে লওয়ার জন্য প্রথমতঃ সে একটু পিড়াপিড়ি করিয়াছিল কিন্তু অতি অল্পেই তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, সঙ্গে গেলে কোন কোন বিষয়ে অনুবিধা ঘটতে পারে কিন্তু শেষে গেলে সকল বিষয়েই অনুবিধা হইবে।

পরে বিদায়ের সময় আসিল। ফাস্তনের প্রভাতে অকণ্ঠের কিরণচ্ছটা প্রাচীন কীর্তির কঙ্কালময় দিল্লীতে তখনও ছড়াইয়া পড়ে নাই। ডাক বাংলার তোরণদ্বারে একরাশি পুষ্পিত সুবর্ণলতা বসন্তের মৃদু সমীরণে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। বিদায়ের চুম্বনের চিরস্মরণীয় মুহূর্ত্তে একটি ফুল তাহার উপর ঝরিয়া পড়িলে অমনি সে ফুলটিকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। ধরিলবার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়ভার্য্য ওঠে একটু হাসির ছটাও খেলিয়া খেল। সেই হাসি শান্ত-মধুর, সন্তান বেহোজ্জ্বলিত মায়ের হাসি। আমি তখন এই হাসির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। ভাগ্যলব্ধ যে দিব্য কুসুম আমার জীবন চিরকাল সুখ-সুরভিতে নিমজ্জিত রাখিতে পারিত ঐশ্বর্য্যের কুহকে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম—এই অনুতাপ আমার জীবনের চিরসঙ্গী হইয়া রহিয়াছে।

ভাসোতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি দুঃখ-দলনে পিতার স্বয়ং নিম্পেশিত হইয়া গিয়াছে। তিনি আমার উদ্দেশ্যের আভাব পাইয়া গভীর ভাবে উত্তর করিলেন—“আমাদের বংশে ঐচ্ছিয়া আছি আমরা দুই জন—তুমি ও আমি। আমি ইচ্ছামত আমার সম্পদের বিলি বন্দোবস্ত করিতে পারি।” আমি দেখিলাম কুমারের চাকের কোমল মৃদুতার মত পিতা আমার ভাগ্য গঠন করিতে পারেন।

আমার পকাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতা জীবিত

ছিলেন। এই দীর্ঘকাল আমি কাপুরুষতায় কাটা-ইয়াছি। আমার ফিরিয়া আসার পর মাজ্জনা ভিক্ষা করিয়া তাহাকে কয়েক খানি চিঠি লিখিয়াছি—আমার সন্তানের বর্ণনা করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে কত কাতর অহুন্নয় করিয়াছি, কিন্তু সে কথা করিয়াছে কি না জানিতে পারি নাই, কারণ তাহার নিকট হইতে একখানা পত্রেরও উত্তর পাই নাই।

কয়েক মাস পর তীব্র কটু বাক্যে পূর্ণ ডাক্তারের এক পত্রের সঙ্গে সমস্ত পত্র ফিরিয়া আসিল। পত্রে লেখা ছিল আমি যাহাকে ধর্ম্মপুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম সে পুণ্যবতী একটি কন্যা এসব করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছে! সেই স্মৃতি-চিহ্ন এখন এক দিকে আমার নিকট প্রভাতের মুক্তা-বিন্দু, অপর দিকে সায়ান্তরের অশ্রু-কণা। সময়ে সময়ে এই অপরি-চিত্ত বালিকার স্মৃতি অতীতের অন্ধকারের ভিতর দিয়া প্রচ্ছন্ন শোকে মলিন অথচ আন্তরিক প্রেমে কমাণীল একটি নির্ম্মল মুখচ্ছবি আমার মনে অহুতাপের তাত্র জ্বালা লইয়া জাগিয়া উঠে।

হঠাৎ এক দিন ঋষের কাগজে ডাক্তারের মৃত্যু-সংবাদ পত্রস্থ হইয়াছে দেখিলাম। পরিচয় এসঙ্গে তাহার একমাত্র কন্যা জনৈক ইংরেজ ভ্রাতৃলোকের সঙ্গে গৃহত্যাগ কবে এই গুপ্ত কাহিনীরও আভাব ছিল।

এই ডাক্তার পরিবার তাহার মৃত্যুর পর ভারতীয় সমাজের আচার-পদ্ধতি ও সংস্কার-সত্যতা প্রকাশ্য ভাবে পালন করিতে লাগিল, এবং পিতা-পরিত্যক্তা ও মাতৃহীনা বালিকা ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়া বিলাত প্রত্যাগত এক ব্যারিষ্টারের অঙ্গলম্বী হইল।”

পত্রের শেষ ভাগে বৃদ্ধের করুণ, হৃদয়ভাঙ্গা আর্ত অকুরোধ এইরূপে লিপিবদ্ধ ছিল—

“তোমার সাহায্য ভিন্ন আমার এই পাপের প্রায়-শ্চিত্ত হইবে না। তুমি অবশ্যই এই ব্যারিষ্টারের

পত্রকে খুঁজিয়া লইতে পারিবে। আমি তোমাকে এক বৎসরের সময় দিলাম। সে আমার কণ্ঠা, আমি তাহার পিতা, আমার সমস্ত অর্থ তাহার; কিন্তু আমার মনে সংশয় হয় অর্থ দান করিলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া আমি আমার প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইব না। যাহার সহিত আমি ধর্মবন্ধনে জীবনে মরণে বদ্ধ হইয়াছিলাম তাহার পবিত্র হাসি এখনও আমার চক্ষুর সম্মুখে নিরুপলব্ধতার অভিশাপ প্রকাশ করিতেছে। তাহার কন্যার ক্রমা লাভ করিলেও আমি এই অভিশাপ হইতে মুক্ত হইব। তুমি এই সঙ্গে শিলমোহর কর যে পত্রখানা পাইবে সেখানা তাহাকে পড়িতে দিত এবং পড়া হইলে ছিঁড়িয়া ফেলিতে বলিও। ভাগ্যক্রমে যদি মাতৃহীনার সহিত তোমার দেখা হয় তবে ফিরিয়া আসিলে আমার এডভোকেট তোমাকে আরও কতকগুলি কাগজপত্র দিবেন। আমার এক জন নিকর দেশ আত্মীর অসুস্থত্বের জন্য তোমাকে বঙ্গদেশে যাইতে হইবে ইগা ভিন্ন তিনি আর কোনও কথাই জানেন না; এবং তুমিও ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট এতদতিরিক্ত অল্প কোনও রহস্য প্রকাশ করিতে পারিবে না।

যদি তুমি মাতৃহীনার সন্ধান না পাও তাহা হইলে আমার সম্যক্ অর্থ দান-কার্যে ব্যয়িত হইবে। তোমাকে আবার বলিতেছি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান তোমার সাহায্য ছাড়া হওয়ার উপায় নাই।”

সমস্ত পত্রটা কা-উজান শ্রান্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করিতে করিতে স্তম্ভিত ও বিম্বিত হইয়া গেল।

সাক্ষাৎ।

আধুনিক রীতিতে সুশিক্ষিত বর্তমান রাজার সৌজন্যে ও আন্তরিক যত্নে দুই মাসের মধ্যেই কলিকাতার উপকণ্ঠে এক সুন্দর ভবনে এণ্ডার্সন-কন্ঠার সহিত কা-উজানের সাক্ষাৎ হইল।

অল্প দিন হইল রমণীর স্বামি-বিয়োগ ঘটিয়াছে, সুতরাং

ত্রিশ বৎসর বয়সেই তাহার উপর বার্ককা ছায়া বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

তখন অপরাহ্ন। গৃহপ্রাঙ্গন-সীমায় একটা প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষের শাখায় লোহার শিকলে বাঁধা একটা পোবা হুম্মান এক জন অপরিচিত ব্যক্তির আগমনে চঞ্চল হইয়া নানাপ্রকার মুঞ্চভঙ্গি করিতেছিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে অনেকগুলি অস্পষ্ট ভাব স্পন্দনের ক্যা-উজানের মনে আসিয়া আবার বিলীন হইয়া গেল।

রমণী ধীর ও গভীর ভাবে পত্রটি পাঠ করিয়া আগন্তুককে গৃহ-প্রবেশের অনুমতি দিতে ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিলেন। কা-উজান গৃহে প্রবেশ করিয়া রমণীর পশ্চাতে দাঁড়াইল, এবং বধির ভৃত্যটি দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

“তোমার মত স্থির-প্রণয়ীর উপর এণ্ডার্সন সাহেব এই কার্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন ইহা সূত্রে বিবরণ”— বলিয়া রমণী অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন, পরে একটু কঠোর ভাবে দ্রুত বলিতে লাগিলেন, “মা তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। আমিও তাঁহাকে ক্ষমা করিলাম। কিন্তু আমি তাঁহার অর্থ গ্রহণ করিব না। এই অর্থ লইয়া আমি সুখী হইতে পারিব না! এই ঐশ্বর্য্য জনমীর দুঃখ-স্মৃতির কণ্টক হইয়া আমাকে অশুষ্ক করিবে। এই অর্থে আমার চিন্তে অশান্তি আসিবে। অতএব আমার সনির্ভর অরুরোধ তুমি প্রচার করিবে যে, এণ্ডার্সনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেহ নাই।”

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু জলিয়া উঠিল, স্বর আরও কঠোর হইল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই রমণীমূলত কোমলতা ও উদারতা ও মহত্ব আবার তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিল। তিনি পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নশব্দের নিকট এণ্ডার্সনের মৃত্যুবার শাস্তি কামনা করিলেন এবং সমস্ত মাতৃশ্রদ্ধে দিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিলেন—

“যাহার প্রেম কামনা করিয়া তুমি দীর্ঘ দশ বৎসর স্থির ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে সেই প্রেমিকা তোমার

জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

মত যোগ্য স্বামীর উপযুক্ত হউক ; আদি তোমাদিগকে আশীর্বাদ করি, ভগবান অবশ্যই তোমাদিগকে সুখী করিবেন।”

কা উজ্জান আশ্বহারা হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। তখন তাহার সম্মুখ হইতে কুহক কুজ্জটিকা ধীরে ধীরে কাটিয়া গেল। অতীত জীবনটা তাহার নিকট আবার প্রত্যক্ষতায় প্রকাশ পাইল, আবার দীননয়না ইউনীর মুখখানি তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। সে নীরবে কক্ষ ত্যাগ করিল।

উপসংহার।

কা-উজ্জান ভানোতে ফিরিয়া আসিযছে। এড-ভোকেটের সহিত কথা হইতেছিল। অনেক কথা হইলে তিনি বলিলেন—

“যখন এত চেষ্টা করিয়াও উত্তরাধিকারী আশ্বীষের সম্ভান পাওয়া গেল না তখন সিলমে হর কা কাগজগুলি না খুঁজিয়াই পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। তিন পুরুষ থেকে আমরা ওদের কাজ করি কোনও আশ্বীয় থাকিলে অবশ্যই জানিতে পারিতাম। একটা কথা আপনাকে এত দিন বলি নাই। এগার্দিন সাহেব আপনাকে রেজুন শহরের তাহার “মার্কেল-প্রাসাদ” এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট জমিদারী দান করিয়া গিয়াছেন। ইহার বার্ষিক আয় ৩০ হাজার টাকা। আপনার সৌভাগ্যে আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ করিবেন।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

ঢাকার বস্ত্রশিল্প

ঢাকার বস্ত্রশিল্প অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীনত্ব জগতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। চীনের মৃগয় বাসন এবং দামাস্কাসের ফলক ব্যতীত প্রাচ্য জগতে অত্র কোন শিল্পই ঢাকার বস্ত্রশিল্প অপেক্ষা

অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। প্রাচীন যুগে বাবেলোনিয়া এবং এসিরিয়া প্রদেশ যে সময়ে সভ্যতার চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল সেই সময়েও ঢাকার মসলিন জগতের নিকট সমাদরের পুষ্পাঞ্জলি লাভে সমর্থ হইয়াছিল; একথা মিঃ বার্ডউড প্রমুখ মনস্বিগণ এক থাকো স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অধুনা যে সকল বাইবেল যে সমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা টীকা, টিপ্পনি সংযোগে প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বাইবেলের কোনও স্থানে অতি সূক্ষ্ম মসলিনের জায় এক প্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে উহা যে ভারতীয় মসলিন হইতে অতিশয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই (১)।

তৎকালে মত শত্রু বাণিজ্য তরনী বঙ্গদেশ হইতে পেলেসটাইন নদ্বরে উপনীত হইয়া পণ্য সম্ভারে বৈদেশিকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিত। প্লিনি বলেন, “রোম-বাণিকগণের ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে রোমের সৌভাগ্য লক্ষ্যীও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। রোমের মহিলাকুল সেই সমস্ত সূচিকণ মসলিনের অন্তরাল হইতে আপনাদিগের অঙ্গরাগ প্রকাশ করিতেন” (২)

(১) Ezekiel, ch. xvi, 10-13, and Isaiah, ch. iii, 23 : see Harris's Natural History of Bible and also interpretation given by Bishop Louth, Dr. Stock, and Mr. Dodson.

(২) “Pliny when speaking of muslin, terms it a dress, under whose slight veil our women continue to shew their shapes to the publico Muslin of Dacca constituted *Seriae vestes* which were so highly prized by the ladies of Imperial Rome in the days of its luxury and refinement”——Cotton manufacture of Great Britain by Dr. Ure.

প্রফেসর উইলসন লিখিয়াছেন, “তিন সহস্র বৎসর পূর্বে হিন্দুগণ বঙ্গশিল্পে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল।” (৩)। মিঃ ইয়েটস বলেন, “খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিশতাব্দীতে ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র গ্রীস দেশে বিক্রীত হইত (৪)।

গ্রীক দার্শনিক এবং ব্যঙ্গ কাব্য লেখকগণ নানা বর্ণে রঞ্জিত চাকুচিকণ বসন-সজ্জিত বিলাস বাসনামোদী গ্রীক যুবকগণের সমালোচনার শীত কশাখাত করিয়াছেন, ঢাকার অতি সুন্দর বুনা মলমলই যে তাঁহাদিগের তীব্র সমালোচনার বিষয় তাহা তাহাদিগের লেখা হইতে পাঠ্যই প্রতীয়মান হয়। Juvenal এই ক্ষুদ্র বস্ত্রকে “multifida” নামে অভিহিত করিয়াছেন (১)।

প্রাচীন কালে ঢাকায় এক্ষণে সুন্দর মসলিন প্রস্তুত হইত যে, পিংশতি হস্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একখানা বস্ত্র পক্ষি—পালকের ন্যায় কুৎকার দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া চলিত (২)।

এরূপে তদীয় Periplus of the Erythraean sea” নামক নৌ সম্বন্ধীয় পত্রিকায় বঙ্গের মসলিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে অথবা তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকালে জীবিত ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

সংস্কৃত কার্পাস শব্দে তুলা বুঝায়। হিব্রু পারসী কারবাস, এবং হিন্দী কার্পাস কাপাস একই অর্থ ব্যঞ্জক। কাপাস শব্দ Esther গ্রন্থে উল্লিখিত আছে (৩)। কার্পাস হইতেই প্রিনির সময়ে Carpassum

(৩) See Introduction to the Rig-Veda Samhita.

(৪) Testrenum autiguorum, l. c. page 341.

(১) Juvenal sat ii. 65.

(২) History of Cotton manufacture.

(৩) Book of Esther ch. iv. 5.

or Carpassian শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই শব্দদ্বারা তৎকালে সমুদয় বস্ত্রই সূচিত হইত। ভাওয়ালের বস্ত্রগত কাপাসিয়া নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হইত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, কার্পাস শব্দ এই কাপাসিয়া হইতেই উৎপত্তি হইয়াছে (৪)।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর লিখিত মোসলমান ভ্রমণকারীদ্বয়ের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে ভারতীয় মসলিন বিশেষ প্রাতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ডাক্তার টেইলার বলেন যে, “উক্ত ভ্রমণকারীদ্বয় ঢাকার মসলিন সমুদ্রে অবস্থিৎ বাক্য প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন (৫)।”

১৫১০ খ্রীঃ অব্দে Barbosa, ডুড়িয়া ও শাদা মসলিনের যথেষ্ট প্রথসা করিয়াছেন। ১৫৬০ খ্রীঃ অব্দে “মোহিত” নামক গ্রন্থে মসলিন নির্মিত শিরদ্বাপ, ওড়না, এবং বহু মূল্য মলমল সাহির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মলমল সাহী ও মলমল খাস অভিন্ন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী রাল্ফ ফিচ লিখিয়াছেন, “সোনারগাঁও পরগণাতে ভারতবর্ষ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়।”

সম্রাজ্ঞী হুমায়ুন চাকার মসলিনের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। দিল্লীর জাহাঙ্গীর তদায় প্রিয়তমা মহিষীর মনোরঞ্জনার্থ ঢাকাই মসলিনের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন। সম্রাট সাজাহান এবং ঔরঙ্গজেবের সময়ে দিল্লীর বেগম মহম্মে চাকার মসলিন একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল। যাহাতে এই মসলিন ভারতের বাহিরে না যাইতে পারে তজ্জন্য ইহার রাজাদেশ প্রচার করিতে ও কুষ্ঠিত হন নাই।

ভ্রমণকারী টেভারনিয়ার লিখিয়াছেন, ‘পারস্তের রাজদূত মহম্মদ আলিবেগ ভারত হইতে প্রত্যাগমনকালে পারস্তের শাহকে উপহার দিবার নিমিত্ত ৬০ হাত দীর্ঘ একখানা মসলিন অতি ক্ষুদ্র একটি নারিকেলের বাগার

(৪) Dr Taylor's Topography of Dacca. page 163.

(৫) Account of India and China by two Mohomedan travellers.

মধ্যে পুরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বিংশতি হস্ত দীর্ঘ এবং অর্ধ হস্ত প্রস্থ একখানা মসলিন অঙ্গুরীয়কের ছিদ্র মধ্যদিয়া একদিক হইতে অপর দিকে টানিয়া নেওয়া যাইত (১)।

১৪০ হাত হইতে ১৬০ হাত লম্বা একখানা মলমলের ওজন ৪ তোলা মাত্র হইত। এই প্রকার মলমল দীর্ঘীর বাদসাহদিগের জন্যই প্রস্তুত হইত। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে ও এই মলমল ঢাকাতে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ঐ বৎসর সোনারগাঁয়ে ১৭৫ হাত লম্বা একখানা মলমল প্রস্তুত হয়, উহার ওজন হইয়াছিল মাত্র ৪ তোলা। পূর্বে ঢাকাতে ইহা অপেক্ষাও স্থল বস্ত্র প্রস্তুত হইত বলিয়া জানা যায়।

“ঢাকার বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস”

মসলিনের সূতা প্রণেতা অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে এক পাউণ্ড ওজনের এক দেটা সূতা তাহার সম্বন্ধে পরিমাণ করা হইলে উহা ২৫০ মাইল লম্বা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

কলের সূতা অপেক্ষা এই সূতা নরম, কিন্তু কলের প্রস্তুত মসলিন অপেক্ষা হস্ত নির্মিত মসলিন শক্ত। এক জন তত্ত্ববায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে চরকায় সূতা কাটিয়া এক মাস সময় মধ্যে মাত্র অর্ধ তোলা স্থল সূতা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইত। এই প্রকার ১ তোলা সূতার মূল্য ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে ৮ মাত্র ছিল। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে লিখিত Trigonometrical Survey গ্রন্থ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, ও মেঘনা এই নদ নদী ত্রয়ের সঙ্গম স্থলে ১২৬০ বর্গমাইল পরিমিত ভূখণ্ড ব্যাপী প্রায় সমস্ত স্থানেই মসলিন প্রস্তুত হইত (২)।

(১) Taylor's Topography of Dacca. Page 163.

(২) Vide Trigonometrical Survey of India printed by order of the House of Commons, 15th April, 1851.

ঢাকা, সোণারগাঁও, ডোমরা ও তিতবর্দি নাম স্থানে সর্বোৎকৃষ্ট মসলিন প্রস্তুত হইত। মুড়াপাড়া, বালিয়া-পাড়া, এবং লক্ষ্যা নদীর তীরস্থ নানা গ্রামেও নানা-প্রকার মসলিন সর্বদাই প্রস্তুত হইত। আবহুমাপুরের রেশম ও কার্পাস মিশ্রিত বস্ত্র তৎকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। কলাকোপা প্রভৃতি অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অপরূপ বস্ত্র প্রস্তুত হইত। হলদীয়ার ছিট ও লুঙ্গি ঢাকা জেলায় সুপরিচিত ছিল। - ক্রিস্পস;
খ্রীঃবতীজমোহন রায়।

বাবুই *

বাবুই অনেকাংশে ষাদৌ চড়ুইর মত ছোট পাখী; গড়নও তাহারই অনুরূপ। চড়ুই এখন আমাদের শরের চালে আপন স্ব স্ব শাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে; বাবুইও অনেক সময় আঙ্গিনার পার্শ্বে জাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি গাছে বাসা করিয়া থাকে।

বাবুইর ডানা বেশ শক্ত এবং হালকা। অস্ত্রাঙ্গ পাখীর মত পা দুইটি পেটের সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া আকাশে উড়িয়া যায়। উড়িবার সময় কখন কখন ডানা গুটাইয়া বায়ুরাশির মধ্যে আপনাকে খুঁজোরে ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া বাবুইর অভ্যাস। ইহাতে সে সহজেই বহু দূর যাইতে পারে।

বাবুইর পায় সম্মুখদিকে তিনটি ও পশ্চাদিকে একটি অঙ্গুলি আছে। প্রত্যেক অঙ্গুলিতে চারিটি পর্ল। অঙ্গুলির অগ্রভাগে ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ নখ আছে। চড়ুই পাখীর ঠোঁটের মত হইলেও বাবুইর ঠোঁট আর একটু সরু এবং ধারাল।

বাবুইর শরীরের বর্ণ সম্বন্ধে একটু গোলে পড়িয়াছি। আমাদের দেশে “কার্তিকেয়ের ত্রত” উপলক্ষে মেয়েরা যে গান করেন তাহাতে বাবুইর বর্ণনা এইরূপ—

* গায়ক পাখী হইতে উৎকৃত।

“এক বাবুই কালীয়া

এক বাবুই ধলীয়া (ধবল)

এক বাবুইর কপালে তিলক।” †

আমরা কালো বাবুই দেখি নাই; খাটিসাদা বাবুইও দেখি নাই। আমরা সাধারণতঃ যে বাবুই দেখিয়া থাকি তাহার শরীরের বর্ণ মেটে সাদা, ডানার বর্ণ মেটে সাদার উপর ধূস্র আভাযুক্ত, তাহাতে স্থানে স্থানে ধূস্র রেখা-গুলি একটু স্পষ্ট। মাদী চড়ুইর দেহের বর্ণের সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ চড়ুই আর বাবুই এক বংশের সম্ভান। বাবুইর কপালে হলদা রঙ্গের একটা তিলক আছে। পুখীর মধ্যে বাবুই বৈষ্ণব কি না ঠিক বলিতে পারি না, তবে তাহাকে আমরা আমিষ ভক্ষণ করিতে কখনও দেখি নাই। বাবুইর সঙ্গে বৈষ্ণবের একটু সাদৃশ্য যে না আছে তা নয়। ইহার বাসায় ছুটিয়া আসিয়া সকলে সম্মিলিত কণ্ঠে মহোল্লাসে হরিধ্বনি করিয়া উঠে।

যে গাছের পাতার অগ্রভাগ সরু এবং একটু আলগা, সেই পাতায় বাবুই তাহার বাসা ঝুলাইয়া দেয়। এজ্ঞাটাই তাল, নারিকেল, সুপারি কখন বা বাঁশের পাতায় বাবুই বাসা ঝুলায়। ইহার একাকী বাস করিতে ভালবাসে না, দলবলে বাস করাই ইহাদের স্বভাব।

বাসা তৈয়ার করিতে বাবুইর যথেষ্ট ওস্তাদী আছে; খুব ভাল দরজীও ইহার শিক্ষা নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া পারিবেন না। ধানের কাঁচা পাতা, সুপারির পাতা, কখন বা কলার পাতা ঠোটে কাটিয়া তাহা দ্বারা বাসা তৈয়ার করে। যখন তাল বা নারিকেলের পাতায় বাসা বুনিতো আরম্ভ করে তখন সেই সবুজ বর্ণের বাসাটি বড় সুন্দর দেখায়। অতি দ্রুত কাজ করিয়া শীঘ্রই বাবুই তাহার বাসার কার্য শেষ করিয়া ফেলে। ঠোটের সাহায্যে এমন তাড়াতাড়ি বাসা বুনিতে পারে যে, তাহা দেখিলে পরম্ভাবনিক পরমেশ্বরের জীব সৃষ্টির বৈচিত্র্য ভাবিয়া আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।

† লেখক এই সমুদয় গীত সংগ্রহ করিয়া “মায়ের গান” নামে প্রকাশ করিতেছেন। প্রঃ সং।

দেশে প্রবাদ আছে একগাছি কুটা ও না হিঁড়িয়া যে বাবুইর বাসাটা খুলিতে পারিবে সে ঐ বাসার মধ্যে একটা “সোনার হুঁচ পাইবে।” প্রবাদটা বড় অলীক নয়। বাবুই সোনার হুঁচ সংগ্রহ করিয়া রাখুক আর নাই রাখুক তাহার সুপ্রসিদ্ধ বাসা খুলিবার মত বৈধব্য যাহার আছে, সে এক দিন সোনার হুঁচের অধিকারী হয় বৈ কি? ছেলে বেলার অনেক বাবুইর বাসা খুলিতে কত জনে চেষ্টা করিয়াছে দুর্ভাগ্য ক্রমে কেহই সোনার হুঁচের অধিকারী হইল না।

বাবুই দুই রকম বাসা নির্মাণ করে। একটা ডিম পাড়িবার জন্য আর একটা বৈঠকখানা। প্রথমে বৈঠকখানাটা তৈয়ার করিয়া বাবুই আপনাতঃ স্বতঃ পাকা করিয়া লয়। চৈত্র মাসের শেষ ভাগে যখন বঙ্গভূমির মাঠগুলি ধানের শ্যামলতায় অপূর্ণ শোভার আধার হইয়া উঠে, তখন বাবুইর উভাগমন হয় এবং বাসা নির্মাণ আরম্ভ হয়। অগ্রহায়ণী ফসল (ধান) উঠিলেই ইহার বিদায় গ্রহণ করে। শীত কালে বাবুইর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বাসা নির্মাণ করিয়া উহার ভিতরের দিকটা ঠিক ঘিলান করা মন্দিরের মত করিয়া তোলে। নিয়ে ঐ বাস পাতা দিয়া একটা দাঁড় তৈয়ার করিয়া উহাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাই বাবুইর বৈঠকখানা। প্রবল ঝড়ও সহসা ইহাদের বাসা ধসিয়া পড়ে না। বর্ষার শেষে বাবুই ডিম পাড়ে। তাহার পূর্বেই তরুণবোণী বাসা নির্মাণ করে। সেই বাসাগুলির এক ধারে ডিম রাখিবার এবং একটি পাখী সেখানে বসিয়া ডিমে তা দিবার উপযোগী স্থান করে; ঐ স্থানটি কোমল এবং বেশ গরম। অপর পার্শ্বে দ্বার পথ। দ্বার পথ নীচের দিকে এবং উহা অভ্যন্ত লম্বা—প্রায় হাতীর ঠুঁড়ির মত করিয়া নির্মিত। যাহাতে অল্প পক্ষী সহজে ছানার অনিষ্ট করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যও আছে, এবং যাহাতে বৃষ্টি বাতাসে শাবকের গায়ে ঠাণ্ডা না লাগিতে পারে এই উদ্দেশ্যও আছে। এই শ্রেণীর গোনও বাসার পার্শ্বদেশেও দরজা দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা অতি বিয়ল। নীচের দিকে বাসার মুখ

জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

রাখাই নিরাপদজনক। ইহারা এক সময়ে ৩৪টি ডিম পাড়ে। কেহ কেহ বলেন বাবুই ফাল্গুনের প্রথম ভাগে তাহার নিজ দেশে ডিম পাড়ে, সেই ছানা উড়িতে শিখিলে তাহাদিগকে ধইয়া এদেশে নিমন্ত্রণ খাইতে আইসে। কোনও কোনও পক্ষী বৎসর দুই বার ডিম পাড়ে তবে বাবুইর সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারি না।

বাবুই ধানের সর্বনাশ করে। আশু ধাত্তের যত অনিষ্ট না করুক আমন প্রভৃতি হৈমন্তিক ধাত্তের সময় বাবুইর অত্যাচারে গৃহস্থকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। শত শত বাবুই কাঁকে কাঁকে ধান-ক্ষেতে পড়ে এবং ধানের ছড়া কাটিয়া কতক ক্ষেতে ফেলিয়া দেয়, কতক মুখে করিয়া লইয়া গিয়া শাবকদিগকে খাওয়ায়। বাবুইর অত্যাচারের প্রতিবিধান জন্ত ক্ষেতে একটা বাঁশ পুতিয়া একখানি টিন টানাইয়া রাখে; ঐ টিনের সঙ্গে দুই খানি বংশদণ্ড লম্বিত থাকে। টিনের সঙ্গে একগাছি লম্বা দড়ী বাঁধিয়া কৃষক বহু দূরে ছায়ায় কিম্বা আপন কুটীরে বসিয়া থাকে; বাবুইর কাঁক ক্ষেতে পড়িলে ঐ দড়িতে টান দেয়—টিনের শব্দে ভয় পাইয়া বাবুই পলাইয়া যায়।

বাবুইর অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া কার্তিক পূজার রাত্রিতে মহিলাগণ গান করেন—

“মরি রে—

ও আরে বাবুই রে,

তুই মোর পাক্না ধান খাইলি!”

এর পরেই আবার গায়িতেছেন—

“এক্সা পুতের বৌ সাত ক্ষেত রাখে”

ইহাতেই বেশ বুঝা যায় একটু ভয় পাইলেই বাবুই পলায়ন করে।

বাবুইর পরিত্যক্ত শুক বাসাস্থলি “পা’পোষ” রূপে ব্যবহৃত হইত। শিক্ষা সভ্যতার হৃৎগে এখন সহর হইতে পয়সায় কেনা পা’পোষ পল্লীবাসিনীদিগের ব্যবহারে আসিতেছে। হাতীর গদী নির্মাণেও বাবুইর বাসা অতি উপযোগী।

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান বাবুই ধরিয়া খায়। ডিম পাড়িলেই একটা বাবুই বাসায় থাকিয়া ডিমে তা দেয়, অপর বাবুই তাহার আহার যোগায়। শিকারিগণ লম্বা একটা বাঁশের মাথায় একখানি জাল দিয়া ঐ জাল বাবুইর বাসার মুখে ধীরে ধীরে রাখিয়া দেয়। যাতায়াত কালে ঐ জালে আটকাইয়া বাবুই সটান ভূপতিত হয় এবং শিকারীর রন্ধনশালায় যাইয়া সদগতি লাভ করে।

বাবুইর গান একটু চড়া! বাসা নির্মাণ কালে এবং বাসায় প্রবেশ কালে ইহারা সম্মিলিত কণ্ঠে যে গান গায় তাহা অতি সুমধুর। গানের শেষে ইহারা যে লম্বা রাগিণীতে ‘মান’ দেয় তাহা অতি চমৎকার।

এই বন-বিহঙ্গ আচার্য্য বা বাসা নির্মাণের উপকরণ লইয়া যখন কুটীরে আসিয়া আনন্দ সঙ্গীত আরম্ভ করে তখন মনে হয় আপন ভয় কুটীরখানি কত শক্তির আলয়, কত সুখের স্থান! ইতর প্রাণীরাও তাহা অলুভব করিতে পারে!

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অদ্ভুতাচার্য্য বিরচিত রামায়ণ-

সুন্দরাকাণ্ড।

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে গঠিত একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ।)

ভণিতাকার—কালিকাপ্রসাদ দাস।

প্রতিলিপিকার—গৌরমোহন নাথ।

প্রতিলিপির সময়—১৭০১ খ্র (১১৮৬ সাল),

২৬শে কার্তিক বুধবার। পুঁথিখানি ময়মনসিংহ জিলার জামালপুর মহকুমায় গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে সংগৃহীত। তুলট কাগজের ৮২ পাত্রে বা ১৬৪ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

শ্লোক সংখ্যা ১২৪৪ ।

[কালের অবিরাম স্রোতে পড়িয়া দেশ বিশেষের বা জাতি বিশেষের উন্নতি বা অবনতি হইতেছে সত্য, কিন্তু সমগ্র মানবজাতি যে উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহের মতদ্বৈধ নাই। অতীত বঙ্গের ভুলনার বর্তমান বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালীজাতি উন্নত কি অবনত হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে আমাদের দিগকে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত নাই বলিলেই হয়; কোন বিষয়ের অল্পপ্ৰমাণ করিতে গেলেই অন্ধকার দেখিতে হয়। এই অবস্থায় পুরাতন পুঁথি, শিলালিপি ও তাম্রফলকলিপির সাহায্য ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। পুরাতন আলোচনার লাভ অনেক। জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় জীবনের উন্নতির যতগুলি কারণ আছে তন্মধ্যে প্রকৃতব্ধের আলোচনা অন্যতম। যে দেশ, যে জাতি, প্রকৃতব্ধের আলোচনা করে না, প্রাচীনের সম্মান জানে না, প্রাচীনকে প্রজ্ঞার চক্ষে দেখে না, সে জাতির উন্নতি সুদূরপর্যন্ত, সে জাতির অভ্যুদয় অনন্ত তিমিরগর্ভে নিহিত।

আমরা যে সমুদয় গ্রন্থ পাইয়াছি তন্মধ্যে আজ এক খানির বিষয় আলোচনা করিব।]

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ড বর্তমান সনের সাহিত্য পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকারগণের যে তালিকা দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, কবি অদ্ভুতাচার্য্যের নিবাস পাবনা জিলায় সোণাবাজু পরগণাস্থিত সাতোঁল গ্রামের নিকটবর্তী বরবরিয়া গ্রামে। ইহাতে আরও জানা যায় যে, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ রংপুর সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে এবং কবি প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বের লোক। মিঃ বুকানন হামিল্টন তদীয় রংপুর বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, উত্তরবঙ্গে এই রামায়ণের বহুল প্রচার ছিল; ঐ প্রদেশের লোকে এই রামায়ণ ব্যতীত অন্য রামায়ণের নাম খুব কম জানিত।

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার ১৩১০ সনে প্রকাশিত ১ম সংখ্যা পাঠে জানা যায় যে, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের অষোধ্যা, অরণ্য ও উত্তরকাণ্ড মাত্র উক্ত পরিষদে সংগৃহীত হইয়াছে। “সুন্দরাকাণ্ড” আমার হস্তগত হইয়াছে; ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

“অথ সুন্দরাকাণ্ড লিখ্যতে” এই অবিদ্বন্ধ সংস্কৃতে এই বাঙ্গালা ঐতিহাসিক কাব্যখানা আরম্ভ হইয়াছে। ‘সুন্দরা’ পদটি ব্যাকরণ সম্মত নয়; কপি রুস্তিবাস এই পদটি প্রথমে ব্যবহার করিয়াছেন। এই পদের প্রয়োগে কবি অদ্ভুতাচার্য্য বঙ্গীয় প্রাচীন কবি রুস্তিবাসের অসম্মত অনুকরণ করিয়াছেন। বোধ হয় পূর্ববর্তী কিকিঙ্ক্যা ও পরবর্তী লঙ্কাকাণ্ডের সহিত উচ্চারণগত সামঞ্জস্য রাখিতে এই শব্দটিতে আকার সংযোজিত হইয়া থাকিবে।

কাণ্ডের নানা স্থানে “অদ্ভুত আচার্য্যের কবিত্য মধুর ভারতি।” “অদ্ভুত আচার্য্যের মুখে বোলে রামচন্দ্র।” এবং কাণ্ডের শেষভাগে “অদ্ভুতাচার্য্য বিরচিতং রামাবতারে সেতুবন্ধ প্রকরণং সমাপ্তঃ।” ইত্যাদি দৃষ্টে নিঃসংশয়িতরূপে বলা যাইতে পারে যে, এই কাণ্ড অদ্ভুতাচার্য্য বিরচিত। কাণ্ডের নানা স্থানে “নাচাড়ি,” “গুঞ্জরী,” “পাঠমঞ্জরী” প্রভৃতির প্রয়োগে বোধ হয় যে, এই কাণ্ড গীত হইত; যে ছন্দে গীত হইত তাহাকে “নাচাড়ি” বলা যাইত, এবং গুঞ্জরী, পাঠমঞ্জরী প্রভৃতি রাগে এই “সুন্দরাকাণ্ড” পালি গীত হইত। কাল ক্রমে কালিকা-প্রসাদ দাস এই পালাটি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। অনন্তর এই গ্রন্থ প্রতিলিপিকার গৌরমোহন নাথের হস্তগত হয়; তিনি ইহা ১৮০১ শকে ২৬শে কাস্তিক নকল করেন। এই কাণ্ড পাঠে বোধ হয় যে, তণিতাকার কালিকাপ্রসাদের সংস্কৃত জ্ঞান অতি সামান্য ছিল। প্রতিলিপিকার গৌরমোহনের ভাষা-জ্ঞান ততোধিক। তিনি নিজের নামটিও শুদ্ধরূপে লিখিতে পারেন নাই। শকাব্দের অষ্টটি দৃষ্টে বোধ হয় যে, তাঁহার গণিতে জ্ঞানও তত্তুল্য। বহু প্রাচীন পুঁথি আমার নিকট সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে; অনেক পুস্তকেই দেখিতে পাই যে, এক

জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

শতের পরে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা বসাইতে বাইয়া
প্রতিলিপিকারগণ দুই শত না দিয়া ছাড়েন নাই।

প্রতিলিপিকার গৌরমোহন ১৭০১ শকে বা ১১৮৬
সালে অর্থাৎ ১৩২ বৎসর পূর্বে এই কাণ্ড নকল করিয়াছেন।
ভণিতাকার কালিকাপ্রসাদ ইহার বহু পূর্বে “সুন্দরাকাণ্ড”
গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অতএব অনুমান হয়
যে, প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে কবি অদ্বুতচাৰ্য্য “সুন্দরা-
কাণ্ড” রচনা করিয়াছিলেন। অমুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন
তদীয় বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য নামক গ্রন্থে (২য় সংস্করণ) ৪৭৮
পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, নিত্যানন্দ নামক ব্রাহ্মণই অদ্বুত-
চাৰ্য্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত রামায়ণ অনুবাদ করিয়া
ছিলেন। তিনিও অনুমান করেন যে, অদ্বুতচাৰ্য্যের
রামায়ণ প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। কবি
অদ্বুতচাৰ্য্য ও ভণিতাকার কালিকাপ্রসাদ বঙ্গের কোন
জিয়ার লোক এবং তাঁহারা কোন সময়ে প্রাহুত হইয়া-
ছিলেন তাহা এই কাব্য পাঠে জানা যায় না। অদ্বুত-
চাৰ্য্য যে সময়ে “সুন্দরাকাণ্ড” রচনা করেন, সেই সময়ে
বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই; বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের
শুভ দিন সূচনা করিয়া তখনও ইংরেজ পাঞ্জি
ক্যারি সাহেব শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন নাই।
এখনকার ত্রায় তখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে এত
অল্প সময়ে সংবাদ বা গ্রন্থ প্রচারিত হইত না। সুতরাং
অদ্বুতচাৰ্য্যের “সুন্দরাকাণ্ড” প্রতিলিপিকার গৌরমোহনের
হস্তগত হইতে নিশ্চয়ই দীর্ঘ কাল লাগিয়া
থাকিবে।

গ্রন্থারম্ভের পরেই রামায়ণের কোন কাণ্ডে কি বিষয়
বর্ণিত হইয়াছে কবি তাহা লিখিতেছেনঃ—

“আগ্ন কাণ্ডে রামের জন্মসিতাদেবির বিহা।

অদ্বাধ্যা ত্যাগিলা রাম ভরতক রাজ্য দিয়া ॥

অরণ্য কাণ্ডে প্রভু রাম হারাইলা প্রাণেশ্বর।

কিঙ্করাতে বালিবধ বৃশ্চিব মিতালি ॥

সুন্দরাতে সেতুবন্ধ রাম হইল পার।

লঙ্কাকাণ্ডে রাবন বধ সিতা উদ্ধার ॥

উত্তরাকাণ্ডে রাম অদ্বাধ্যার অধিপতি।

অদ্বুত আচার্য্যের কবিত্য মধুর ভারতি ॥”

উক্ত কবিতাতে ভরতকে অর্থে “ভরতক”
পদের প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপে কাব্যের
অন্যান্য স্থলে আমাকে অর্থে “আমাক” অধমকে
অর্থে “অধমেক” সীতাকে অর্থে “সীতাক”
ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আবার রাক্ষসীকে বা
রাক্ষসীকে অর্থে “রাক্ষসির”, মুখেতে অর্থে “মুখেত”
প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যুগরাজ, ডেওয়াইলাম, কর্ণ, হৃদয়,
গুনিয়া, নিকট, ইত্যাদি শব্দের বানান নিত্য
কৌতুকবহ।

আসামী ভাষার বর্ণমালার ‘ব’ ও ‘র’ এর যেরূপ
আকার এই গ্রন্থে লিখিত উক্ত দুই বর্ণের আকারও ঠিক
তরূপ। ইহাতে বোধ হয় যে, পূর্বে বঙ্গীয় ও আসামী
বর্ণমালা একরূপ ছিল, পরবর্তী কালে বঙ্গীয় বর্ণমালার
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে কিন্তু আসামী বর্ণমালা
পূর্ববৎ রহিয়া গিয়াছে।

সংস্কৃতের “উন্দুর” বর্তমান বাঙ্গালার ‘ইন্দুর’ হইয়াছে
কিন্তু এই কবির সময় ইহা ‘এন্দুর’ ছিল। আমরা
‘ভালবাসি’ ব্যবহার করি; বরিশাল জিলায়
‘মন্দবাসি’র ও প্রয়োগ আছে, কিন্তু এই কাব্যে ভয়বাসি
পদেরও প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। দেবিলাম অর্থে ‘দেবিল’
পদের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কবির সময়ে উ বর্ণ ব্যঞ্জন
বর্ণের সহিত মিলিত হইবার কালে ‘ব’ এর আকার
ধারণ করিত। এই ‘দেখিলু’ হইতে পশ্চিম বঙ্গবাসিগণ
ক্রিয়াপদটিকে ‘দেখিলু’ করিয়া লইয়াছেন, বোধ হয়।
এই কাব্যে ভবিষ্যদর্শে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের প্রয়োগে
একটু বিশেষ দৃষ্ট হয়। মরিবে অর্থে ‘মরিব’ পাইবে
অর্থে ‘পাইব’ ত্যজিবে অর্থে ‘ত্যজিব’ আদিবে অর্থে
‘আসিব’ ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা যায়। আর এতাদৃশ
প্রয়োগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক পাঠক বর্ণের বৈধা
আলোচ্য করিব না। এখন এই কাব্যের বর্ণিত ঘটনা

সমুদ্রের সমালোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

এই কাণ্ডের প্রারম্ভেই অঙ্গদ ও সম্প্রতিষ্ঠার সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে। কুন্তিবাসী রামায়ণে এই ঘটনাটিকে কঙ্কিকাণ্ডের অন্তর্গত।

তৎপর সম্প্রতিষ্ঠার মুখে রাবণের আবাসস্থান অবগত হইয়া বানরগণ সমুদ্র তীরে গমন করিল, কিন্তু অপার সাগর ও উহার উত্তালতরঙ্গমালা দেখিয়া তাহারা ভীত হইল। তাহারা সমুদ্র পার হইবার জন্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিল এবং স্ব স্ব পরাক্রম ও গতিশক্তি বর্ণন করিতে লাগিল। আর্ষ রামায়ণেও এরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

মন্ত্রী জাম্ববান, হনুমানের জন্মাবধি অমরত্ব লাভ পর্যন্ত সমুদ্র ঘটনা বর্ণন করিলে স্থির হইল যে, হনুমানই সীতাদেবীর অশেষণে একাকী লঙ্কায় প্রবেশ করিবেন। হনুমান রামচন্দ্রের নিদর্শনস্বরূপ অঙ্গুরীয়ক লইয়া সমুদ্র পার হইবার জন্ত শরীর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

“শরীর বাড়াইল বীর শতেক প্রহর।”

কবি সময়ের পরিমাণ দ্বারা পাঠকদিগকে শরীরের আয়তন নির্ণয় করিয়া লইতে বলিতেছেন। কুন্তিবাসি কিন্তু পাঠকদিগকে এত গোলে ফেলেন নাই; তদীয় রামায়ণে হনুমানের বর্দ্ধিত শরীর দৈর্ঘ্যে ২০ ও প্রস্থে ১০ যোজন।

সর্বকালে ও সর্বদেশে কবিগণ বর্ণনার অতিরঞ্জন সুখ লাভ করেন; বর্তমান কবির বর্ণনাও এ নিয়মের ব্যতিচার দৃষ্ট হয় না। হনুমান লক্ষ দিয়া সমুদ্র-তীরবর্তী পর্বতে উঠিলেন; পর্বত কম্পিত হইল, অত্রিহিত পশু, পক্ষাতির্যক প্রভৃতি ভয়ে চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। আর্ষ রামায়ণে এপর্যন্ত কঙ্কিকাণ্ডের অন্তর্গত।

হনুমান লক্ষ দিয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন। লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াই তিনি উগ্রচণ্ডাদেবীর সম্মুখে পড়েন। উগ্রচণ্ডা রাবণের দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। এই দেবীর সহিত হনুমানের ছোট খাট একটি যুদ্ধ হয়; যুদ্ধান্তে উভয়ের পরিচয় হয় এবং পরিচয়ের পরে

দেবী শাপ মুক্ত হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্বক কৈলাসে গমন করেন। এই সমুদ্র ঘটনার সহিত কুন্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার একা আছে কিন্তু আর্ষ রামায়ণে উগ্রচণ্ডার নাম দৃষ্ট হয় না। তথায় রাক্ষসরূপধারিণী লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রীদেবীর সহিত হনুমানের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। কুন্তিবাসি ও অঙ্গুতাচার্য উভয়ের গ্রন্থেই অনেক নূতন ঘটনা সংযোজিত হইয়াছে।

উগ্রচণ্ডার প্রস্থানের পর হনুমান গবাক্ষ-পথে রাবণের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় মন্দোদরাকে দেখিয়া হনুমানের সীতা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। কুন্তিবাসী ও আর্ষ রামায়ণেও হনুমানের এতাদৃশ ভ্রমের বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

রাবণের প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া নানা স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি অবশেষে বিভীষণের পুরীতে প্রবেশ করেন। বিভীষণের পত্নী সরমাকে নিজিত দেখিয়া হনুমান তাহার কণ্ঠে গিয়া এক স্বপ্ন দেখান। সরমা স্বপ্ন বিবরণ বিভীষণকে জানাইলেন। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত কুন্তিবাসী বা আর্ষ রামায়ণে দৃষ্ট হয় না; ইহা কবির নূতন সৃষ্টি।

সরমা স্বপ্ন দেখিয়া বিভীষণকে জানাইলেন।

“সরমা রোলয়ে স্বপ্ন আত ভয়ঙ্কর।

সিতাকে চাহিতে এত আইল বানর ॥

হনুমান নাম তার পবন কোণ্ডর।

রামের কিঙ্কর সেই সূত্রিবের চর ॥ ইত্যাদি

হনুমান, বিভীষণ ও সরমার কথোপকথনেও সীতার অবস্থান সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি চিন্তিতমনে বিভীষণের পুরী ত্যাগ করিয়া রাজ পথে নামিলেন।

সীতাশেষণে হনুমান নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে রাজি দুই প্রহর অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর অদূরে অশোক বন দেখিয়া তিনি তাহাতে প্রবেশ করিলেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

এখানে তিনি পবিত্রতার প্রতিমূর্তি সীতাদেবীকে দেখিতে পাইলেন। এখানে কবি অশোকবণের বর্ণনা করিয়াছেন; বর্ণনাটি সুন্দর হইলেও একটুক অস্বাভাবিকতা দেখে দৃষ্ট হইয়াছে। কবি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে হনুমান অর্ক রাত্রে অশোকবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কবি বর্ণনা করিতেছেন,—পুষ্প লোভে অলিগণ নানা কেলি করিতেছে, তরুগণ ফলিত ও পুষ্পিত রহিয়াছে, কোকিল কলরব করিতেছে এবং ভ্রমরের মধু পান করিতেছে। অর্করাত্রে বৃক্ষগণ ফলিত থাকে থাকুক, এবং তাহারা না হয় পুষ্পিত থাকুক, তাহাতে আমাদের বলিবার বিশেষ কিছু নাই; কিন্তু অলিগণ কেলি করিতেছে, কোকিল কলরব করিতেছে এবং ভ্রমর মধু পান করিতেছে, এরূপ বর্ণনায় আমাদের আপত্তি আছে।

হনুমান সীতার শোক-মলিন দেহ-যষ্টিতেও অপূর্ণ রূপ লাভ্য নিরীক্ষণ করিয়া বিম্মিত হইলেন। এমন সময় সীতাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য রাবণ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া শোক-বিশীর্ণদেহা আলুলায়িতকুন্তলা সীতা ভয়ে অচেতনপ্রায় হইলেন। রাবণ নানা প্রকার মধুর বচনে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অবশেষে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাশ্রুত হইলেন। এখানে কবি রাবণের দশ মুখের বর্ণন করিয়াছেন। আর্ষ রামায়ণের যে যে স্থানে রাবণের দেহের বর্ণনা আছে ততঃস্থলে তাঁহার মাতৃবের তায় এক মন্তক ও দুই হস্তেরই বর্ণনা দেখা যায়। সত্য বটে কোন কোন স্থলে “দশমুখ” পদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা বল-বস্তা হৃদক মনে হয়।

সিংহিকা প্রভৃতি চেড়ীগণ সীতাকে ভয় দেখাইতে লাগিল কিন্তু তিনি ভীত না হইয়া সময়োচিত প্রত্যুত্তর দান করিলেন। সীতা নিরুপায় হইয়া ক্রোধে ও অভি-মানে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময় ত্রিজটা-নাম্নী রাক্ষসী উপস্থিত হইয়া চেড়াদিগকে নিবৃত্ত করিল। ত্রিজটা এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছে, সে সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত

চেড়ী দিগকে বলিল। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া চেড়ীরা ভীত হইল এবং অস্ত্র শস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া সীতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। ত্রিজটার স্বপ্ন কৃষ্টি-বাসী রামায়ণেও দৃষ্ট হয়, কিন্তু স্বপ্ন বৃত্তান্ত অতরূপ।

হনুমান বৃক্ষশাখায় বসিয়া ত্রিজটা-কথিত স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিলেন। সীতার দৃষ্টি হঠাৎ সেই বৃক্ষশাখায় পতিত হইল। হনুমান লক্ষ দিয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং রাম নাম উচ্চারণ পূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সীতা প্রথমে মনে করিলেন এ রাক্ষসের মায়া, বানর নহে; কিন্তু হনুমানের মুখে অতীত ঘটনা শ্রবণে এবং তাঁহার হস্তে রামের অমুরীয়ক দর্শনে সীতার প্রত্যয় জন্মিল। উভয়ে অনেক ক্ষণ বিশ্রান্তালাপ হইল। সীতার নিকট বিদায় লইয়া হনুমান মধুবন নামক রাবণের প্রমোদ উদ্যান ভ্রম্য করেন। ইহাতে রাক্ষসগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধ হয়। মকরা-ক্ষের পুত্র অজয় হনুমানের হস্তে নিহত হইলেন। কৃষ্টি-বাসী রামায়ণে এখানে অজয়ের যুদ্ধ বা মৃত্যু বর্ণিত হয় নাই।

অজয়ের মৃত্যুর পর রাবণ-নন্দন অক্ষয়কুমার হনুমানের হস্তে নিহত হন। কৃষ্টিবাসী রামায়ণে রাবণের এই পুত্রের নাম “অক্ষ”, অক্ষয়কুমার নহে।

অবশেষে হনুমান রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রজিতের হস্তে বন্দী হইয়া রাজ সভায় নীত হন। রাবণের আদেশে রাক্ষসেরা হনুমানের লাঙ্গুলে বস্ত্র জড়াইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। লেজের আগুনে হনুমান লক্ষা পোড়াইয়া ছারখার করিলেন, এবং লক্ষা দগ্ধ করিয়া সীতাদেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন। লক্ষার ঘর দর-জাই কেবল পোড়ে নাই, রাবণের মুখ, গৌর, পাড়িও পুড়িয়াছিল; তিনি কুড়ি হাতে পোড়া মুখ মুছিত মুছিতে দৌড়িয়াছিলেন। এখানে লেজ অর্থে “লেজ” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রতিলিপিকারের নিবাস ময়মনসিংহ জেলায় জামালপুর উপবিভাগের অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে; এই গ্রাম হইতেই এই গ্রন্থাধীনা সংগৃহীত হইয়াছে।

ময়মনসিংহ জিলার লেজ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রতি লিপিকার গৌরমোহন নকল করিতে যাওয়া এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কি না নির্ণয় করা কঠিন। হুমুমানের লেজের আঙুনে রাবণের নিতান্ত হৃদঙ্গা হইয়াছে। বর্ণনাটি যতই কৌতুকাবহ হউক না কেন, কাব্যের প্রতি নায়কের চরিত্রের হীনতা সাধন করা কবির পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

বানরগণের লেজের বর্ণনা যে কেবল অদ্ভুতাচার্য্যই করিয়াছেন তাহা নহে, কবি কুন্তিবাস এবং মহর্ষি বাঈকি ও স্ব স্ব রামায়ণে বানরদিগকে লাম্বুল বিশিষ্ট করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আর্ষ রামায়ণের কিক্কি-কাণ্ডে বানরগণের আবাস গৃহ ও তাহাদের আচার ব্যবহার দৃষ্টে তাহাদিগকে সুসভ্য মানব বলিয়াই মনে হয়।

হুমুমান সীতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন; সীতা তাঁহার হস্তে নিদর্শন স্বরূপ স্বীয় চূড়ামণি প্রদান করিলেন। হুমুমান পূর্ববৎ লক্ষ প্রদানে সমুদ্র পার হইয়া বানর সৈন্তের মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং অঙ্গদাদি সেনাপতি দিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি সীতা দর্শনাদি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে বানর সৈন্তগণ আহ্লাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

অনন্তর শ্রীরামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত হুমুমানাদি বানরগণ কিক্কিকাণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিক্কিকাণ্ডেও একটি সুন্দর মধুবন আছে; ইহা বানর রাজ সুগ্রীবের প্রমোদ উদ্যান। অঙ্গদ বানরদিগকে মধুবনে প্রবেশ করিয়া আনন্দে মধুপান করিতে আদেশ দিলেন। অচিরেই রাম, লক্ষণ ও সুগ্রীবের সহিত হুমুমানাদির সাক্ষাৎ হইল। হুমুমান সীতা প্রদত্ত চূড়ামণি রামের হস্তে প্রদান করিলেন এবং তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। অনন্তর লক্ষা আক্রমণের উত্তোগ হইতে লাগিল। দেবতারা চিন্তিত হইলেন, যে হেতু তাঁহারা জানিতেন পার্শ্বতীকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে লক্ষা জয় করা অসম্ভব হইবে। ব্রহ্মার পরামর্শে রাম

পার্কতীর পূজা করিতে সম্মত হইলেন; ব্রহ্মা পূজাবিধি বলিয়া দিলেন, তাঁহার আদেশে দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা প্রতিমা নির্মাণ করিলেন। হুমুমানস্বত ফলপুষ্পে শ্রীরাম পার্কতীর অর্চনা করিলেন। পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া পার্কতী লক্ষাত্যাগে সম্মত হইলেন এবং রাবণ বধে সম্মতি দিয়া অতর্কান করিলেন। আর্ষ রামায়ণে পার্কতী পূজাদি ব্যাপার দৃষ্ট হয় না; কুন্তিবাসী রামায়ণেও এই কাণ্ডে পার্কতীর পূজা বর্ণিত হয় নাই, শিবপূজার বর্ণনা আছে। কিন্তু কুন্তিবাস ও পার্কতীর পূজা বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু সুন্দরা কাণ্ডে নহে, লক্ষাকাণ্ডে—রাবণ বধের প্রকালে। কুন্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য্য উভয়ের রামায়ণেই শাক্ত ও বৈষ্ণবের প্রভাব দৃষ্ট হয়। অনন্তর বানরসৈন্ত লইয়া রাম সুগ্রীবাদি সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইলেন। আর্ষ রামায়ণে এখানেই সুন্দরকাণ্ড শেষ হইয়াছে। এদিকে লক্ষার আর একটি ঘটনা ঘটিল। হুমুমান প্রদত্ত অগ্নিতে ১৮ দিন পর্যন্ত লক্ষা পুড়িয়া ছারখার হইল। রাবণ-জননী নিকবা সীতাকে ফিরাইয়া দিতে পুত্রকে অহরোধ করিলেন; নিকবার নাম কুন্তিবাসী রামায়ণেও দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাঈকি রামায়ণে রাবণ জননীর নাম কৈকসী নিকবা নহে। বিভীষণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ তাঁহার একে পদাঘাত করিলেন। বিভীষণ অবমানিত হইয়া ৪জন সহচর সহ লক্ষা পরিত্যাগ পূর্বক কৈলাসে পার্কতী সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৪জন সহচরসহ বিভীষণের বহির্গমন ও কৈলাসে উপস্থিতির বিবরণ আর্ষ রামায়ণে নাই। কুন্তিবাসী রামায়ণে ঘটনাটি এইরূপই বটে কিন্তু “অমুচর” শব্দ স্থলে “মন্ত্রী” শব্দ দেখা যায়। পার্কতী বলিলেন যে, “যদি লক্ষার রাজা হইতে চাও তবে রামের আশ্রয় লও, এখানে থাকিয়া তোমার কোন ফল হইবে না। পার্কতীর পরামর্শে বিভীষণ রামের শ্রয় লইলেন। শ্রীরাম বিভীষণকে লক্ষারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর সুগ্রীবের আদেশে বানর গণের আহত প্রমত্ত-পর্কতে সমুদ্রের উপর ক্ষেত্র

নির্মিত হইল এবং বানরসৈন্য সহ রাম সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। এখানেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই কাণ্ডের কোন স্থলেই পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি বাঙ্গালা ছন্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সন্ধ্যামৌনীর ব্রত।

বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচলিত কি না, জানি না, যশোহর জেলার অনেক বালিকা বৈশাখ মাসে, সময়ে এই ব্রত পালন করিয়া থাকে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, দিবাকর অন্তমিত হইলে, তারা সুন্দরীগণের লঙ্কাহীনা দুই একটি স্ব স্ব অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া লোক-সমক্ষে হাজির হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে নবোচ্চা বালিকা এক ঘটা জল ও এক থানা খালায় কিছু আতপ চাউল, দুর্কা, সিন্দূর ও একটা অন্ন হাতে লইয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। প্রাঙ্গণের সেই অংশটুকু পূর্বেই যথারীতি পরিষ্কার করিয়া রাখা হয়। এই স্থানে জলপাত্রটি স্থাপন করিয়া তাহার গাত্রে ২টা ও তাহার সম্মুখে মুক্তিকায় ৩টা, মনুষ্য প্রতিকৃতি সিন্দূর দ্বারা অঙ্কিত করে। তৎপরে উক্ত ছবিগুলির উপর চাউল দুর্কা দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি মনে মনে পাঠ করে। মুখ ফুটিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবার বো নাই। পাঠকগণ মন্ত্রটি পাঠ করিলেই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন। ব্রতিনীদের সকল ব্রতের লক্ষ্যই প্রায় একরূপ,—মন্ত্র বধা,—

পূর্ব থেকে উঠলো মুণি পশ্চিমে যায়,
দেখ দেখে রাক্ষস, কে আসে, কে যায়,
সন্ধ্যামৌনী করে যে, সে আসে, সে যায়,
সন্ধ্যামৌনী করে কে? সাত ভায়ের বোন সে।
কি চায়, কি পায়? কোদাল কাটা ধন চায়।
আড়ি মাথা সিন্দূর চায়, ডোলপূর্ণ কোটা চায়।
রাজহুত্র ভাই চায়, কুলহুত্র বাপ চায়।
দশের ভাজন পুত চায়, সভা উজল জামাই চায়।

কুলবতী বৌ চায়।

মন্ত্র-পাঠ শেষ হইল। অন্নটি হাতে লইয়া বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইল, ও জল পাত্রটি বেড়িয়া ঘুরিতে লাগিল। ইত্যবসরে গগনের গায়ে দুই একটি করিয়া নক্ষত্র দেখা দিতে লাগিল। তাহার অন্ততঃ ৭টা দেখা চাই। দেখিতে পাইলেই, ঘটের নিকট আসিয়া পুনরায় মনে মনে মন্ত্রটি পাঠ করে। হাতের আঙুলি এইবার পশ্চাদ্ধিকের মন্তকের উপর দিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়।

বলা বাহুল্য এপর্যন্ত ব্রতধারিণীকে মৌনী থাকিতে হয়। কথা কহিলেই ব্রত-ভঙ্গ হয়। অতঃপর ঘটা লইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া নিজেকে বেঁধেন করিয়া ৭টি জলরেখা দেয়। তার পর যতক্ষণ না অল্প এক ব্যক্তি আসিয়া ঐ জল-গুণ্ডীর উপর অঙ্গুলী দ্বারা পথ আঁকিয়া দেয়, ততক্ষণ ব্রতিনীকে সেই বেঁধেনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। কথা কহিবারও অধিকার হয় না।

১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ ও শেষ দিন পর্যন্ত এই ভাবে ব্রত পালন করিতে হয়। বড়-বুড়ি প্রভৃতি কারণে দৈবাৎ বিঘ্ন ঘটিলে ব্রত পণ্ড হয় না। পরদিন তাহার পূরণ চলে। দ্বিগুণ করিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। আবার কোন কারণে নিজে রক্ষা করিতে না পারিলে, প্রতি--নিধির দ্বারাও উহা সম্পাদিত হইতে পারে। দৈবাৎ কোন দিন ঐ সময় আকাশে মেঘ সঞ্চার হইলে, যদি নক্ষত্র-দর্শনে বিঘ্ন ঘটে, তাহারও বিকল্প বিধি আছে। গৃহ মধ্য হইতে কেহ একটি প্রদীপ লইয়া ৭ বার দেখাইবেন, তাহাতেই নক্ষত্র-দর্শন হইবে।

চারি বর্ষ কাল এইরূপে ব্রত পালন করিতে হয়। যত দিন না ভ্রাতার বিবাহ হয়, তত দিন উহার প্রতিষ্ঠা বা শেবোদ্দাপন হইবার উপায় নাই। ভ্রাতৃ-বধু যেরূপ আসিলে, সাতটি স্বর্ণ তারকা তাহার ললাটে দিয়া মুখ দেখিয়া প্রথম কথা কহিতে হয়। ইহা হইলেই ব্রত সাক্ষ হইল।

এই ব্রত! আধুনিক কোন কোন শিক্ষান্তি-মানিনীগণ এতাদৃশ অর্থহীন কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা শুনিয়া নিঃসন্দেহ

নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু ইহা ততদূর নিরর্থক নহে। অবশ্য এই সব ত্রুটির বিধান কোন তত্ত্ব পুরাণাদিতে নাই। কত কাল বঙ্গের বালিকা মহলে ইহা আসন পাইয়া আসিতেছে তাহাও স্থির করা যায় না। তবে ভাষা ও ভাব দৃষ্টে ইহা প্রাচীন সমাজের চিত্র বলিয়াই অনুমিত হয়।

প্রাচীন হিন্দুসমাজের মহিলা-মহলে ব্রতাদির এতই প্রভাব ছিল যে, তাহাদের জীবন যেন ব্রতেরই সমষ্টি; আবাল্য এইরূপ ছাঁচেই প্রাচীন কালের লজ্জামাখা, মেহ-মাখা প্রতিমাগুলি গঠিত হইত, ফলত “কটু বাক্য কহিও না”, “চুরি করা বড় দোষ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শিশু-হৃদয়ে ধারণা জন্মাইবার যদি আশা করা যায়, তবে বালিকাদের সুকোমল চিত্ত-ক্ষেত্রে এবস্থিধ ব্রতামুঠান দ্বারা যে বোজ উৎপন্ন হয়, তাহার ভাব ফল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলা যায় না।

সর্ববিধ সুখের কামনা থাকিলেও ভ্রাতৃ-বধূকে সন্তুষ্ট করাই এই ব্রতটার প্রধান অঙ্গ। আশৈশব যদি ঐরূপ ধারণা চিত্তে বদ্ধমূল হয়, তবে বঙ্গ দেশীয়া স্বাস্থ্য-দীনদের কলঙ্ক অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে অপনীত হইতে পারে, এরূপ আশা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। এইরূপ আড়ম্বরশূন্য সরল ছাঁচে গঠিত হইয়া তখন তাঁহারা যেরূপ লক্ষী-স্বরূপিনী স্নগৃহিণী হইতে পারিতেন আধুনিক বিলাসিনী গণের সেরূপ হওয়ার প্রত্যাশা বিড়ম্বনা কি না তাহা বোধ হয় এক্ষণে অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। পাঠিকাগণ হয়ত মনে মনে আমাকে গালি দিতেছেন কিন্তু স্থির চিত্তে স্ব স্ব মাতা, মাতামহী, পিতৃস্বশ্রু প্রভৃতি প্রাচীনাগণের সরলতা, মেহ, মমতা, গৃহিণীপনা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণাবলীর সমালোচনা করিলেই তাঁহাদের সে ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাদের শিক্ষার বিরোধী নহি, তবে ঐ সমস্ত সদগুণ-ভূষিতা, পতিব্রতা রমণীকে যদি সংসারের শান্তিবিধায়িনী মনে করিতে হয়, তবে প্রাচীনাগণের আসন নবীনাগণের উপরে দিতে হয়।

ব্রতের প্রধান উদ্দেশ্য সংযম শিক্ষা। নানারূপ ব্রতের দ্বারা সে শিক্ষা বঙ্গ-ললনাগণ বাল্যাবধি পাইত। এ প্রকার ব্রতের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু বর্তমানে উল, মোজা প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে তাহা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। এখনও কতক কতক সংগ্রহ চলে। কিছু কাল পরে নামও শুনা যাইবে না।

বাচালতা স্ত্রী-চরিত্রের একটা প্রধান কলঙ্ক। স্বামী-গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে যে ভাবে অবরোধবাসিনী হইতে হয়, তাহাতে মোনো থাকার অভ্যাস বিশেষ অনুকূল। শুধু পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে আমাদের সংসার চলে না। এদেশে আজও সাধারণ অন্নশালায় সকলের অন্ন প্রস্তুত হয় না, বা ধাত্রী-স্তন্যে সন্তান লালন-পালনের প্রথা নাই। রমণী লইয়াই সংসার। দয়া, বিনয়, লজ্জাশীলতা, সহিষ্ণুতা তাহাদের গুণ হওয়া আবশ্যিক। গৃহিণীপনায় অনিগুণা, শুধু বিলাসিনী প্রমোদিনী লইয়া সংসার-যাপনের দিন দরিদ্র বঙ্গবাসীর হয় নাই। দয়া ও সত্যের আদর্শ-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ সেরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতা চায় না। অগ্রে গৃহিণী হইয়া কেহ বিহ্বল হইতে পারেন, নতমুখে তাহার গুণ কীর্তন করিব। আমরা রমণীগণের বিদ্যা-শিক্ষার অগুমাত্রও প্রতিকূল নহি, বা আধুনিক মহিলাগণের নিন্দা করিতেছি না। তাঁহারা তাঁহাদের চিত্র-পুত্র আদর্শ, মাতা, সাবিত্রী হউন, সর্বপ্রকারে বাঙ্গালীর গৃহিণী হউন, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। তাঁহাদের গৌরবই আমাদের চিরকাল সম্বল।

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ।

গ্রন্থ সমালোচনা

৬। চন্দ্রধর, ত্রিবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত, কলিকাতা, ৫নং রামধন মিত্রের লেন, গ্রামপুকুর বিশ্বকোষ-প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য : এক টাকা, আকার ডবলক্রাউন, অষ্টাংশিত। এখানি উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ। স্থানে স্থানে কল্পনা ও কবিত্ব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং মাইকেল-প্রবর্তিত ভাষা ও ছন্দের অমূল্য সফল হইয়াছে। আলোচ্য কাব্যের রচনায় গ্রন্থকার বিপুল-লক্ষীন্দরের চির-প্রচলিত উপাখ্যানের অমূল্য সুরণ করেন নাই। শৈব চন্দ্র-ধর প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তথাপি তিনি মায়ার পূজা করিবেন না—

—“ধরিতে কি কালকূট কণ্ঠে অবশেষে
মহিমু চরণ-সিদ্ধ নীলকণ্ঠ তব !
তুই যদি আশুতোষ মনসারে তুমি,
প্রচার অর্চনা তার, এ প্রাণ থাকিতে
নমিবে না ও-চরণে তোমার সেবক।”

চন্দ্রধর অলৌকের লোভে নিত্য বস্তুর প্রতি অবহেলা করিতে পারেন না, তিনি মায়ার পাশে বদ্ধ হইতে চাহেন না;—ইহাই হিন্দুর চরম লক্ষ্য। চন্দ্রধরের চরিত্রে এই লক্ষ্যের আলোক কবি উজ্জল ভাবে পাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—

“না পূজি মনসা যদি, ধন পুত্র সব
যাবে ফিরে—সে আদেশ ; বল দেখি সতি
পূজিলে কি চিরদিন রহিবে সকলি ?
তবে প্রিয়ে, এ অনিত্য অলৌক স্বপনে
কেন মুগ্ধ হব আজি ত্যজি নিত্য পদ ?”

কবি বিপুলার সত্য-পরীক্ষারও উল্লেখ করেন নাই—

—“অধোগুণে সত্য
বন্দিয়া রাণীর পদ উঠিলে তরীতে
মুহুর্তে সমস্ত তরী হ’ল আদর্শন।”

বিপুলার মনসার বরে পুনর্জীবিত পতি ও ভাস্করগণ সঙ্গে পুনরায় দেবলোকে ফিরিয়া আসিলেন : রাণী সনক।

প্রিয়তমা সতী বধু ও প্রাণ-প্রিয় পুত্রগণের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া—

“বসিলা সৈকতে—

হেরি বিশ্বময় পুত্র বিশ্বময় বধু
অন্তিম শয়নে মুগ্ধা মুদ্রিতা নয়ন।”

কিন্তু এই সকল দুর্কিপাকেও চন্দ্রধরের হৃদয় টলিল না—“ধ্যানমগ্ন চন্দ্রধর বাহ্য জ্ঞানহীন।” পরিশেষে—

“হিরণ্ময় জ্যোতিঃখণ্ড দিগন্ত উজ্জল
স্নিগ্ধ ক’রে, বহিঃগন্ধ নামিয়া চকিতে
শূন্য-পথে অন্তর্ধান হইল নিমেষে
মিশ্রায়ে চাঁদের অণু কণায় কণায়।”

কবির মতে “মহুগুহের উপর দেবত্বের প্রতিষ্ঠা।” সুতরাং এই আদর্শ লইয়া তিনি কবিগণের ক্ষুধা পূরায় না চলিয়া চন্দ্রধরের চরিত্রকে মহাত্ম্য-গৌরবে অঙ্গহীন হইতে দেন নাই। বিপুলার চরিত্র চিত্রটি আত্ম-নিষ্ঠায়, কোমলতায়, দেব-ভক্তিতে ও পতি-সেবায় সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার “প্রেম মহাজ্ঞান” মহামন্ত্রের বলে ভোলানাথও ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

গ্রন্থের ছাপা ও কাগজের উন্নতি বাঞ্ছনীয়। কাগজ ও গঠনের উন্নতি না হইলে গ্রন্থকারের এইরূপ উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব-সম্পদ অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে; কারণ আজ কাল সোনার পাতে মোড়া ভাস্কর্য্যের আদর হয়, অথচ গঠনের পারিপাট্য ও আবরণের চাকচাক্য না থাকিলে খাঁটি জিনিষও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

শান্তিময়।

৭। দীপ্তানন্দ—অর্থাৎ শ্রীমন্তগবদগীতার তাল-লয় সংযুক্ত বাঙ্গলা সঙ্গীতানুবাদ। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রণীত ; কলিকাতা, ৪৪।১ নং মল্লিকা লেন হইতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বিহারী এম, এ, কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৬০ বার আনা। আকার ডবলক্রাউন, ষোড়শাংশিত,

১৬১ পৃষ্ঠা। কাগজ ও ছাপা ভাল।

গীতা আমাদের শাস্ত্ররত্ন। “জাতো জাতো যদ্বৎকুঃ তত্রনমিতি কথ্যতে।” স্মরণ্যং আমরা যোগেন্দ্র বাবুর “গীতালহরী” প্রকাশে প্রকৃতই আনন্দ অমুভব করিতেছি। সংস্কৃত গীতা সকলের সহজবোধ্য নহে। অনুবাদে মূল্যের সম্যক্ অভিব্যক্তি না হইলেও উহা পাঠে গ্রন্থের প্রতিপাত্ত বিষয়ে অনেকটা জ্ঞান জন্মে, সন্দেহ নাই।

গান বড়ই চিত্তাকর্ষক, স্মরণ্যং সহজাধিগম্য। “গানাৎ পরতরং নহি।” গানে যেমন প্রকৃত জ্ঞানের কঠোর তত্ত্ব গুলিও অল্লায়াসে অন্তরের অন্তস্তলে অলঙ্কিতে প্রবেশ লাভ করে, তেমন আর কিছুতেই হয় না। তাই সাধন-মার্গে গানকে প্রধানতম উপায় বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থে যোগেন্দ্র বাবু তাল-লয় সংযোগে সঙ্গী-তের ভাষায় শ্রীশ্রীমদভগবদ্ গীতার অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। মূল গীতার শ্লোকাবলীর সহিত অনুবাদের প্রত্যেকটি শ্লোক মিলাইয়া পাঠ করা যাইতে পারে। অনুবাদের প্রাঞ্জলতা প্রদর্শনার্থ নিয়ে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে—

ন ভায়তে ত্রিয়তে বা কদাচিৎনাং ভূত্বা ভবিতা বান ভুয়ঃ।
অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্ততোহয়ং পুরাণো ন হনতে হন্যমানে
শরীরে ॥ ২২০ ॥

না হয় তাহার জনম মরণ
পুনর্জন্ম, আর না হয় বর্ধন,
আত্মা অজ্ঞ নিত্য শাস্ত পুরাণ

• না হয় বিনাশ দেহের পতনে ॥ ২১২০

গ্রন্থের স্থানে স্থানে দু চারিটি শব্দের পুনঃপ্রয়োগ পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, সঙ্গীতের ভাষায় উহা দৃশ্যীয় নহে। আমরা আশা করি, অচিরেই গীতালহরীর বহুল প্রচারে বক্তার প্রতি গৃহ গীতাতত্ত্বের পবিত্র সঙ্গীতে পুণ্যময় হইয়া উঠিবে।

সদানন্দ।

৮। অঞ্জলী, ত্রিগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম,এ, বি, এল প্রণীত, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট হইতে সিটি বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, আর্ট প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য আট আনা; আকার ডবলক্রাউন, অষ্টাংশিত, ১০৮ পৃষ্ঠা, এষ্টিক কাগজে অতি পরিষ্কার ছাপা, নূতন ধরণের এইরূপ বাধা বেশ রুচি সঙ্গত ও সম্পূর্ণ আধুনিক।

এখানি একখানা গল্পের বই; অনেকগুলি গল্পই প্রতিভা, ভারতী ও মুখ্যরীতে প্রকাশিত হইয়াছে—স্মরণ্যং এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা নিম্নয়োজন; তবে আমরা জানি যে, প্রতিভার অনেক গ্রাহক সাগ্রহে গিরীন্দ্র বাবুর গল্পের প্রতীক্ষা করিতেন। এই পুস্তকের একটা বিশেষত্ব এই যে, কয়েকটি গল্পে “পতিভা পুণ্য পথ ভ্রষ্টার চিত্র” অঙ্কিত হইয়াছে। যাহারা এইরূপ চিত্রাঙ্কনে আপত্তি করেন তাহাদের তুষ্টির জন্য স্বয়ং গ্রন্থকারই পূর্ব ভাবে বলিয়াছেন—

সংসারে বহুবিধ সমস্তার মধ্যে ইহাদিগকে আমি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করি না। সমাজ যাহাদিগকে কলঙ্কের ছাপ দিয়া আপনার গণ্ডীর বহির্ভূত করিয়া দিয়াছে তাহাদের অনেকেরই হয়ত মুহূর্তের উত্তেজনা বা ক্ষণিকের ভ্রান্তির বশে পদস্থলন হইয়াছে, তাহাদের অনেকেই হয়ত তাহার জন্য দারুণ অনুশোচনা করিয়াছে, এবং এমন যদি কেহ উদারহৃদয় মহামুভব থাকেন যাহারা তাহাদের অপরাধ মার্জনা করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে সংসার হয়ত তাহাদিগকে আবার সার্থক গৃহিণীরূপে, মেহময়ী সেবিকারূপে বা প্রেমময়ী নারীরূপে ফিরিয়া পাইতে পারে। পাপ দূঢ় সংস্কার-বদ্ধ হইবার পূর্বে পতনের প্রারম্ভেই যদি ক্ষমা তাহাকে উদ্ধার করে, তাহা হইলে সে উদ্ধার ব্যর্থ হয় না, কৃতজ্ঞতায়, প্রেমে, শ্রদ্ধায় তাহা পবিত্র, সুন্দর ও মঙ্গলময় হইয়া উঠে।”—ইহার উপর এসম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। সাহিত্য স্রষ্টা বিদ্যালয়ের বালকের জন্য নহে, যিনি সাহিত্যের সব দিকটাই চক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সমাজকে দেখাইতে পারেন,

জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

সংস্কার, উন্নতি ও পরিণতির পন্থার আভাস দিতে পারেন তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে লোক-হিত সাধন করেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

গ্রন্থের ভাষা সরল, এবং দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলি এমন সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, পড়িলে সেগুলি যেন আমাদের চক্ষুর উপর ঘটতেছে বলিয়া ধারণা হয়। ভাষার অন্তরে একটা বেশ তেজ ও জোর আছে। সমাজ ও পরিবার চিত্রের অঙ্কনগুলিও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার গল্পগুলির অন্তরে করুণ রসের একটা গুপ্ত স্রোত পাঠকের হৃদয়কে তাহার অজ্ঞাতে সমবেদনায় সিক্ত করিয়া তুলে। সাহিত্য ভাণ্ডারে “মঞ্জরী” একটা নূতন শ্রীর সূচনা করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

শান্তিময়।

২। **শ্রীগোলাঙ্গ**—শ্রীবিধুভূষণ সরকার বি এ, প্রণীত; আকার ডবলক্রাউন, অষ্টাংশিত, সিক্কের সুন্দর নয়নরঞ্জন বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা—ঢাকা কটন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, মূল্য বার আনা—ছাপা পরিষ্কার কাগজ ভাল। এখানি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী। মহাপুরুষের জীবনচরিত যতই প্রকাশিত হয়, ততই সমাজের, জাতির ও দেশের মঙ্গল। আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাগ্রহে আহ্বান করিয়া লইতেছি।

নিমাই চৈতন্য মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিবার জন্য পুস্তক খানিতে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও অনতিকাল পরবর্তী গ্রন্থকর্তাদিগের রচিত পুস্তকাদি হইতে এই পুস্তক সংকলন করিয়াছেন—কিন্তু তিনি নিজের বিশ্বাসকেই অগ্রাঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাই অপরকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন।

সাতখানি হাফটোন ছবি দিয়া পুস্তকের উপাদেয়তা বৃদ্ধি করা হইয়াছে—কিন্তু কোন কোন চিত্রে আর্টের অভাব দেখা গেল। “সংকীর্ণণে শ্রীগোলাঙ্গ সুন্দর” (২৮ পৃ) ছবিখানি যতদূর স্মরণ হয় কোনও আর্টষ্ট্রুডিওর ছবির প্রতিলিপি! চৈতন্যদেব স্মরণ তখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই; তাঁহার ভক্তের দল সহসা মত্তক যুগুন করিল কেন? “কটকনগরে নিমাই চাঁদ” (৩৬ পৃ) কোনও একখানি ওলিওগ্রাফ ছবির ব্যর্থ অনুকরণ! “কামালিনী বিষ্ণুপ্রিয়া” চিত্রে (৬০ পৃ) কোনটি বিষ্ণু-প্রিয়া তাহা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য।

সরস ও সহজ ভাষায় লিখিত মহাপুরুষের এই জীবনচরিতখানি সাধারণ পাঠকের পক্ষে বড় উপযোগী হইয়াছে। হিন্দু ভক্তের গৃহে এই পুস্তকের আদর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅঃ—

১০। **শেখরশাহ**—শ্রীরসিক চন্দ্র বসু প্রণীত, ঢাকা, কটন লাইব্রেরী হইতে শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। আকার—রয়েল, চতুর্ভুজাংশিত, ৮১পৃষ্ঠা; সিক্কের চক্ চকে বাঁধাই, মূল্য ১০ আনা; কাগজে বাঁধাই ১৬০ আনা, নীল কালির সুন্দর ছাপা, কাগজ মন্দ নহে।

এখানি ঐতিহাসিক চিত্র। যাহারা ইতিহাসে উপন্যাসের রস পাইতে চান গ্রন্থকার তাঁহাদের জন্য এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ভাষা আগা গোড়া সরল, আমাদের বালকবালিকারা পড়িয়া আমোদ পাইবে। আজ কাল পুস্তকে ছবি না দিলেন নয় তাই গ্রন্থকার পাঁচ খানি ছবি দিয়াছেন—কিন্তু ছবিগুলি সমস্তই চিত্র-কলার কলঙ্ক।

শান্তিময়।

ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ ।

প্রথম সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণী ।

ভগবানের অমূল্য কৃপায় ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ বর্দ্ধিত উৎসাহ ও কলেবর লইয়া নূতন বৎসরে পদার্পণ করিলেন ।

ইতিহাস :—

বিগত বৎসরের প্রথম ভাগে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার এম, এ, ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, প্রমুখ কতিপয় সাহিত্যসেবীর উৎসাহে এই পরিষদের প্রথম অনুষ্ঠান হয় : সম্যক প্রচার্য্যভাবে স্থানীয় শিক্ষিত জনমণ্ডলী এই শুভ অনুষ্ঠানের বিষয় অবগত না হওয়ার মাত্র একত্রিংশ জন সভ্য লইয়া পরিষদের কার্য্য আরম্ভ হয় । সংস্থার সংখ্যার স্বল্পতা প্রযুক্ত সভার অধিবেশন ও প্রবন্ধ পাঠ প্রথম কতক মাস হইয়া উঠে নাই ; “প্রতিভা” নামী মাসিক পত্রিকার সম্পাদন ও প্রচার এবং নিজেদের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায়ই সভার কর্ম্ম তখন পর্য্যবসিত হইত ।

পরে, অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগে, অন্য উনত্রিশ জন ঢাকাবাসী সাহিত্যসেবক পরিষদের সভ্যপদ গ্রহণ করায়, আবশ্যকীয় নিয়মাবলী প্রণয়ন, কর্ম্মে শৃঙ্খলা-স্থাপন এবং কর্ম্মচারীনির্বাচন সুসম্পন্ন হইয়া, সভার সমুদয় কার্য্য সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হয় । ঢাকার বহু তজ্জালশ্রুপ্রাপীড়িত শিক্ষিত ব্যক্তিগণमध्ये তদবধি এক সাহিত্যিক জাগরণের সূচনা পরিলক্ষিত হইয়াছে ; অযাচিত ভাবে দলেদলে সাহিত্যসেবক আসিয়া সাহিত্য জননীর পূজামণ্ডপে সম্মিলিত হইতেছেন ।

এই পরিষদের প্রতি অধিবেশনে গড়ে আঠার জন করিয়া সভ্যসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে ।

সভ্য সংখ্যা :—

বিগত পৌষ মাসের প্রারম্ভে মাত্র ৬০ জন সভ্য লইয়া ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয় ;

চৈত্রশেষে সভ্যসংখ্যা ১৪৯ হইয়াছিল । নূতন বৎসরে সভার কার্য্যে যোগদান অথবা দেয় চাঁদা প্রদানে পরাম্ভ হওয়ার ৮ জন সভ্যের নাম তালিকা হইতে অপস্থত হইয়াছে ; কিন্তু এই অধিবেশনে, তদুপরিবর্তে, ৪০ জনেরও অধিক উৎসাহী নূতন সভ্যের নাম প্রস্তাবিত হইতেছে । বর্তমান সভ্যের মধ্যে ২৫ জন ছাত্রসভ্য । ঢাকাবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃভাষার সেবার জন্ত এই পরিষদের সভ্য হওয়ার যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা বাস্তবিকই আনন্দদায়ক । তথাপিও সকল সভ্যেরই কর্তব্য সভার উদ্দেশ্য ও অভাব জানাংয়া পরিচিত শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই আমাদের মাতৃপূজার মণ্ডপে আহ্বান করিয়া আনা ।

পরিষদের অধিবেশন :—

বিগত বৎসরে এই সভার যে সকল অধিবেশন হয় তাহার তারিখ ও বিশেষ কর্ম্মের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ।—

১। প্রথম বিশেষ অধিবেশন—

তারিখ ২৪শে অগ্রহায়ণ.

বঙ্গাব্দ ১৩১৮ ।

বিষয়—

(ক) ২৯ জন নূতন সভ্য নির্বাচন ।

(খ) নিয়মাবলী প্রণয়ন ।

(গ) কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্বাহক নির্বাচন ।

(ঘ) পত্রিকা পরিচালন সমিতি গঠন ও এ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় কয়েকটি নিয়ম প্রণয়ন ।

(ঙ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখারূপে গণ্য হওয়ার জন্ত আবেদন ।

২। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—

তারিখ ২০শে মাঘ,

বঙ্গাব্দ ১৩১৮ ।

বিষয়—

(ক) প্রসিদ্ধ কবি মনোমোহন বসু ও বঙ্গের অধিতায়

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ ।

(খ) ভেরজন নূতন সভ্য নির্বাচন।

(গ) নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায়, দিনাজপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় এবং সন্তোষের জমিদার স্কববি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়দিগকে পরিষদের পরিপোষক নির্বাচন।

(ঘ) অর্থদান-প্রতিভ্রুতি-প্রদাতা ও পুস্তকোপহার দাতৃগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

(ঙ) জয়দেবীমঙ্গল, রাধাকৃষ্ণতরঙ্গ, ইন্দ্রজিৎযুদ্ধ, অশ্বরিষ-হুর্লাসা সংবাদ, বীরবাহুযুদ্ধ ও শতদ্রবধ নামে ছয়খানি পুরাতন পুঁথির আলোচনা।

(চ) কয়েকটি পুরাতন মুদ্রা এবং ঢাকা জীবনবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত কয়েকটি প্রস্তর মূর্তির ফটোগ্রাফ প্রদর্শন।

৩। প্রথম মাসিক অধিবেশন—

তারিখ ৩শে অগ্রহায়ণ,

বঙ্গাব্দ ১৩১৮।

বিষয়—

(ক) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য বি-এ কর্তৃক “সেনরাজবংশ” নামক ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ।

(খ) বারজন নূতন সভ্য নির্বাচন।

৪। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—

তারিখ ৭ই মাঘ,

বঙ্গাব্দ ১৩-৮।

বিষয়—

(ক) শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি-এ কর্তৃক “হরিপরমেশ্বরের ব্রতকথা” নামক প্রবন্ধ পাঠ।

(খ) পাঁচজন নূতন সভ্য নির্বাচন।

৫। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—

তারিখ ১৩ই ফাল্গুন,

বঙ্গাব্দ ১৩১৮।

(ক) দশজন নূতন সভ্য নির্বাচন।

(খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত কর্তৃক

গৌড়ের ইষ্টক ও লালবাগ কেল্লায় প্রাপ্ত প্রস্তর নির্মিত গোলা প্রদর্শন ও এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ।

(গ) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য বি-এ কর্তৃক ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তির অমূল্যপি প্রদর্শন ও এ সম্বন্ধে মন্তব্য পাঠ।

(ঘ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় লিখিত “নদীর প্রাচীন প্রবাহ” নামক প্রবন্ধ পাঠ।

(ঙ) এগারসিদ্ধি হুর্গের নিকটবর্তী একটি পুরাতন মসজিদে উৎকীর্ণ প্রস্তরলিপির প্রতিচ্ছায়া প্রদর্শন।

(চ) পুস্তকোপহারদাতৃ হুইজনকে ধন্যবাদ প্রদান।

৬। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—

তারিখ ১১ই চৈত্র,

বঙ্গাব্দ ১৩১৮।

বিষয়—

(ক) উনিশজন সাধারণ ও চব্বিশজন ছাত্র সভ্য নির্বাচন।

(খ) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অমৃতচাৰ্য্য প্রণীত স্মরণাকণ্ড নামক পুরাতন পুঁথি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ।

(গ) শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি-এ কর্তৃক “কাছাড় ও কাছাড়ী” নামক প্রবন্ধ পাঠ।

কার্যালয় ও পাঠগৃহঃ—

অর্থভাবে আমাদের পরিষদের অধিবেশনোপযোগী নিজ গৃহ ও আসন সংগ্রহ না হওয়ায় বিগত বৎসরে পরিষদের সকল অধিবেশনই ইম্পিরিয়াল সেমিনারী হলে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিধামাত্র না করিয়া হলটি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করায় সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক প্রক্টর শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মজুমদার বিএ মহাশয় সভাগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাঞ্জন হইয়াছেন।

পরিষদের কার্যালয় ও পাঠগৃহের উপযুক্ত স্থান অভাবে এতদিন আমাদের কর্মের বহু অসুবিধা ঘটিয়াছে। এই বৎসরের আরম্ভ হইতেই আমরা বসিবার একটু স্থান পাইয়াছি; এখন অধিবেশন ব্যতীতও

সভ্যগণ সমবেত হইয়া সাহিত্যচর্চা ও ভাব-বিনিময়ের সুবিধা পাইলেন এই একটা আনন্দের বিষয়। সভ্যগণ, অতঃপর, নিজ ব্যবসায়ের বিরাম-সময়ে এই পাঠগৃহের ব্যবহার করণ এই তাঁহাদিগের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা।

পুরাতন পুঁথি :—

ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ অল্পদিন যাবৎ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেও ইহার পুরাতন পুঁথিসম্পদ কম হয় নাই, —এই অত্যল্পকাল মধ্যেই বিভিন্ন জেলা হইতে অসুমান দেড়শত পুরাতন পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পরিষদের এন্ধ্রয় সদস্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নেই ইহার অধিকাংশ পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে; এবং, আশা করা যায়, তাঁহাব ও অত্যাচার চেষ্টার ফলে এই বৎসরের মধ্যে আমাদের পুরাতন পুঁথির সংখ্যা গত বৎসরের দ্বিগুণেরও অধিক হইয়া যাইবে। পাঠগৃহের অভাবহেতু গত বৎসর এই সকল পুঁথি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়দের নিকট রাখা হইয়াছিল; এবং তাঁহারা ই নিজেদের অবসরসময়ে এই পুঁথিগুলির মধ্যে নয় পানির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। পরিষদের পাঠগৃহে স্থাপিত হইলে আরও অনেক বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি এই সকল গ্রন্থের উপর নিপতিত হইবে; এবং সাধারণ সভ্যমণ্ডলী নিঃসন্দেহ তাঁহাদেরও গবেষণার ফল উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন।

পুস্তকালয় :—

পরিষদের পুস্তকালয়ে এপর্যন্ত “প্রতিভা” বিনিময়ে প্রাপ্ত মাসিক পত্রিকা ও সং্যালোচনার্থ প্রাপ্ত গ্রন্থ ব্যতীত মাত্র চারিখানি পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। ঢাকায় পরিষৎ সাহিত্যের যথোচিত অঙ্গীকরণ ও বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু দেশবাসী লোকের সাহায্য ও সহায়ভূতি ব্যতিরেকে এই অল্পটান সুসম্পূর্ণ হইতে পারে না।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রত্যেক গ্রন্থকার স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থের এক এক খণ্ড মাত্র পরিষৎকে উপহার প্রদান

করিলে, দেশের সাহিত্যসেবীগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা সংস্থাপন :—

আমাদের পরিষৎ প্রথম অধিবেশনেই বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের শাখারূপে গণ্য হওয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; তদনুযায়ী পরম্পরের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য কলিকাতার পরিষদের সহিত আমাদের পত্রের বিনিময় চলিয়াছে। প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে সুবিধা অসুবিধার তুলনায় প্রথমটি প্রাধান্য স্ফটিকরূপে প্রতিভাত না হওয়ায় এপর্যন্ত প্রস্তাবটি কর্মে পরিণত হইতে পারে নাই। আশা করি, বর্তমান বর্ষে আপনারা একটা মিমাংসায় উপনীত হইতে পারিবেন।

প্রতিভা পত্রিকা :—

ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের আর একটি প্রধান কর্ম—“প্রতিভা” পত্রিকার সম্পাদন ও পরিচালন বিগত বৎসরে সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা সহরের মতন মফঃস্বলে অধিক সংখ্যক শিক্ষাপ্রদ সাময়িক পত্রিকা নাই; মফঃস্বলবাসী লেখকেরাও স্থানীয় পত্র না থাকিলে লিখিবার বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত হয়েন না। বিশেষতঃ, এই অঞ্চলে এখনও একটা সাহিত্যিক আবহাওয়া চির-বিরাজিত হইয়া উঠে নাই। অতএবই, আমরা “প্রতিভার” মতন একখানি মাসিক পত্রিকার পরিচালন সাহিত্যচর্চার একটি প্রধান অঙ্গ জ্ঞান করিয়া আসিয়াছি; এখনও এই পত্রিকার বিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করি। কিন্তু, গত বৎসরের পরিচালন সমিতি বর্তমান বৎসরে এই কর্মের ভার নিতে সীকৃত হয়েন নাই। ইহার একটি প্রধান কারণ অর্থভাব।

বাঙ্গালাদেশে মাসিক পত্রিকা লাভবান হইতে কচিং পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; হইলেও মূলধন ব্যতীত কাজ চালান অসম্ভব। গতবারের পরিচালকেরা—ভবিষ্যতে পরিষৎ হইতে ফেরৎ পাঠবার ভরসা—বিগত বৎসরে যাহা ব্যয় করিয়াছেন তদুপরি বর্তমান বৎসরের জন্য

আবশ্যক তিনচারিশত টাকা মূলধন নিজেদের তহবিল হইতে ব্যয় করিতে কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন।

এদিকে পরিষদের পাওনা অপেক্ষা দেনা বেশী; পরিষদের দরকারী কৰ্ম্ম নির্বাহ করিয়া বৎসরে তিন টাকার মধ্যে “প্রতিভার” আয়তনের একখানি মাসিক পত্রিকা প্রতি সভাকে প্রদান করা কতদূর কষ্টসাধ্য কোনও কোনও সভ্য চাঁদা আদায়কারীকে বহুবার রিক্তহস্তে বিদায় দেওয়ার সময় তাহা ভাবিয়া দেখেননা। অতএব, পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদকের এই গুরু ভার স্বন্ধে লওয়া একেবারেই অসম্ভব। নানা দিক বিবেচনা করিয়া পরিষদের কার্য্য নির্বাহক সমিতি উহার গত অধিবেশনে নবপ্রতিষ্ঠিত এক প্রচার সমিতির (Publishing Company) প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীযুত সত্যেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়কে প্রতিভার লাভলোকসানের জন্য দায়ী করিয়া উহারই হস্তে পত্রিকার প্রকাশ ও পরিচালন ভার সমর্পণ করিয়াছেন। পত্রিকা প্রকাশে অল্পচিত ও ক্ষতিজনক বিলম্ব না হয় এই ক্ষুদ্র বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বেই এই বন্দোবস্ত স্থিরকৃত হইয়াছে।

সকল সভ্যগণ মিলিত হইয়া তিনচারিশত টাকা উঠাইয়া এখনও শীঘ্র একটা পত্রিকাফাণ্ড সংস্থাপন করিতে পারিলে, সত্যেন্দ্রবাবু, নিশ্চয়ই, সাহিত্য-পরিষৎকে তাঁহার গচ্ছিত ভার প্রত্যর্পণ করিতে রাজী হইবেন।

আপনারা একাজ্জটি করিতে সক্ষম হইবেন কিনা আলোচনা করিয়া সুস্থির করিতে পারেন।

উপসংহার :—

নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। সভ্যসংখ্যাই ধরুন আর কৰ্ম্মক্ষেত্রের প্রসারই ধরুন উভয়দিকেই আমরা আশাতীত সাফল্যের নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু এখনও অর্থান্ধার নিরাকরণের সুবন্দোবস্ত হইতে পারে নাই; অথচ অর্থ ভিন্ন শত ইচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের সঙ্কল্প সাধনের ভরসা নাই।

এইজন্য আমরা পত্রদ্বারা বহু দেশপ্রধান ব্যক্তিবর্গের

নিকট সহায়ত্ব ও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি এবং আরও করিব; পরে, আমরা সহরের সকল গল্প, মাগ, সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হইব,—সঙ্কল্প করিয়াছি।

উপস্থিত সকলের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে এবিষয়ে তাঁহারা যেন আমাদের সাধ্যানুযায়ী আনুকূল্য প্রদানে পরাধীন না হইয়েন।

জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন জাতীয়জীবন গঠনের প্রধান সহায়; অতএব, ভরসা করি, দেশবাসী-মাত্রেই আমাদের এই আহ্বানে অগ্রসর হইতে দ্বিধা-বোধ করিবেন না।

অবশেষে, সর্বমঙ্গলাকর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের এই মহৎ অনুষ্ঠান সম্পাদনে সহায় হউন।

ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের বন্ধু-বান্ধব, সভ্য ও কৰ্ম্মচারিবর্গের একপ্রাণতা ও নানারূপ সাহায্য ভিন্ন বর্তমান ক্ষেত্রে সাহিত্য-সাধনায় আমরা বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিতামনা; তাঁহাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আমি পরিষদের প্রথম বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী সভাসমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ কার্যালয়, } শ্রীভূপালকুমার দত্ত,
বঙ্গাব্দ ১৩১৯, তাং ১৫ই বৈশাখ। } সম্পাদক

প্রথম বিশেষ অধিবেশন।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮, তারিখ ২৪শে অগ্রহায়ণ। স্থান—ইন্সটি-
টিউট সোসাইটি, ভবন। সময়—অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা।

সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম. এ.
মহাশয় যথানিয়মে সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

সভাপতির নির্দেশক্রমে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর
রক্ষিত কর্তৃক একটি সঙ্গীত হওয়ার পর সভার কার্য আ-
রম্ভ হইল।

প্রথমে পরিষদের অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র
নাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের নিষিত বক্তব্য তাঁ-
হার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম,
এ, সভা-সমক্ষে পাঠ করিলেন; পরে নিম্নলিখিত প্রস্তাব
সমূহ অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

সভাপতির বক্তৃতা ও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানের
পর সভা ভঙ্গ হইল।

সভায় পরিগৃহীত প্রস্তাব সমূহ।—

১ম প্রস্তাব। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঢাকা-সাহিত্য-
পরিষদের সাধারণ সভ্য হইলেন।

সভ্যগণের নাম—

শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত এম, এ।

” যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ।

” বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল।

” শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি, এল।

” যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা বি, এল।

” বিভূষণ গুহ ঠাকুরতা বি, এল।

” অতুলচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল।

” কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্তী বি, এল।

” মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

” করুণাকান্ত সেন বি, এল।

” শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল।

” তরলীকান্ত পাইন বি, এল।

” আনন্দচন্দ্র নন্দী বি, এল।

” সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত-গুপ্ত বি, এল।

” সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি, এল।

” উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম, এ, বি, এল।

” পণ্ডিত রাজকুমার চক্রবর্তী।

” হীরলাল দাস-গুপ্ত।

” অবনীনাথ দাস-গুপ্ত এল, এম, এস।

” উপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বি, এল।

” নেপালচন্দ্র রায় এল, এম, এস।

” যতীন্দ্রমোহন দাস-গুপ্ত বি, এল।

” দেবেন্দ্রকুমার ভৌমিক বি, এল।

” শরচ্চন্দ্র ঘোষ বি, এল।

” দেবেন্দ্রচন্দ্র বিজ্ঞানরত্ন এম, এ।

” ভূপতিনাথ দাস বি, এস, সি (লণ্ডন)।

” শশীকুমার কর।

” যতীন্দ্রচন্দ্র সেন এম, এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম, এ।

সমর্থক—” সত্যেন্দ্রকুমার সেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—আগামী পৌষমাস হইতে ঢাকা-
সাহিত্য-পরিষৎ নিম্নোক্ত নিয়মাবলীর অধীনে পরিচালিত
হউক।

নিয়মাবলী :—গত ফাল্গুন সংখ্যার নিয়মাবলী প্রযোজ্য।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত এম, এ।

সমর্থক—” অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ।

তৃতীয় প্রস্তাব—পরিষদের পূর্ববর্তী কর্মচারিগণের
পরিবর্তে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বর্তমান বৎসরের বাকী
কয় মাসের জ্ঞাত উক্ত পরিষদের কর্মচারী ও কার্য-নির্বাহ-
কল্পে নিৰ্বাচিত হউন।

কর্মচারিগণের নাম :—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম, এ।

সহকারী সভাপতি—

শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বি. এল।

.. ভূপতিনাথ দাস বি. এস্. সি।

.. দেবেন্দ্রকুমার বিজ্ঞানরত্ন এম. এ।

সম্পাদক—

.. ভূপালকুমার দত্ত এম. এ।

সহকারী সম্পাদক—

.. যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

.. নলিনীকান্ত ভট্টশালী বি. এ।

.. ধনপতি দাস এম. এ।

পত্রিকা পরিচালন

সমিতির সম্পাদক—

.. স্বরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম. এ.

ধনরক্ষক

.. জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
এম. এ. বি. এল।

ছাত্র-সভা পরিদর্শক—

.. সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম. এ।

আয়-ব্যয় পরীক্ষক—

.. শ্রীমানন্দর দাস-গুপ্ত বি. এল।

.. কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী বি. এল।

কার্য নির্বাহক সমিতির

সভ্যগণ—

.. শশীকুমার কর।

.. যতীন্দ্রচন্দ্র সেন এম. এ।

.. উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম. এ. বি. এল।

.. যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা বি. এল।

.. পণ্ডিত রাজকুমার চক্রবর্তী।

.. অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম. এ।

.. সত্যেন্দ্রকুমার সেন।

.. শচীন্দ্রকুমার ঘোষ এম. এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি. এল।

সমর্থক—

.. অক্ষুণ্ণচন্দ্র সরকার এম. এ. পি. আর. এস।

পরবর্তী তিনটি প্রস্তাবে “প্রতিভা” পত্রিকা পরিচালনের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল এবং কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল।

সপ্তম প্রস্তাব—অজকার অধিবেশনে প্রবর্তিত নিয়মাবলী “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের” সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়া আমাদের সভা উক্ত পরিষদের শাখারূপে গণ্য হওয়ার আবেদন করা যাউক। উক্ত পরিষদের উত্তর পাইলে উহা আলোচনার জন্য এক

বিশেষ অধিবেশন আহুত হইবে এবং সেই অধিবেশনে মতামতস্বায়ী কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুত পণ্ডিত রাজকুমার চক্রবর্তী।

সমর্থক—.. যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮, ৩০শে অগ্রহায়ণ।

সময়—অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা।

স্থান—ইম্পিরিয়াল সেমিনারি ভবন।

শ্রীযুত বিধুভূষণ গোস্বামী এম. এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করার পর শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বি. এ. “সেনরাজবংশ” নামক একটি ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম. এ. বি. এল ও সভাপতি মহাশয় বক্তৃক প্রবন্ধের সমালোচনা ও প্রবন্ধ লেখককে ধন্যবাদ প্রদানের পর শ্রীযুত ভূপালকুমার দত্ত এম. এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম. এ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথানিয়মে পরিষদের সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন।

নূতন সভ্যগণের নাম :—

শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত বি. এল।

.. অমরনাথ রায় বি. এ।

.. নলিনীকান্ত দাস-গুপ্ত বিজ্ঞানভূষণ, কবিরত্ন।

.. যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বি. এ।

.. অতুলচন্দ্র যুগোপাধ্যায়।

.. নীরোদচন্দ্র সেন।

.. পূর্ণচন্দ্র রায় বি. এল।

.. সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এল।

.. সত্যীন্দ্রচন্দ্র সেন বি. এল।

.. মোহিনীমোহন দাস।

.. কেশবচন্দ্র দাস।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮, ৭ই মাঘ।

সময়—অপরাহ্ন ০ ঘটিকা।

স্থান—ইম্পিরিয়াল সেমিনারি ভবন।

শ্রীযুত বিধুভূষণ গোস্বামী এম, এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীযুত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ মহাশয় “হরিশ্চন্দ্রের ব্রত কথা”- নামক একটি কৌতুহলোদ্দীপক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুত নলিনী-কান্ত ভট্টাচার্য্য বি, এ মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে, সভাপতি মহাশয় কর্তৃক প্রবন্ধ লেখককে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। তৎপর শ্রীযুত ভূপালকুমার দত্ত এম, এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথানিয়মে পরিষদের সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন।

নূতন সভ্যগণের নাম :—

শ্রীযুত দানেশচন্দ্র সেন, কংসারাজ।

.. নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত এম. এ।

.. শচীন্দ্রচন্দ্র দাস-গুপ্ত এম, এ।

.. হরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল।

.. উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক, ট্রেইনিংস্কুল।

সর্বশেষে সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করা হইল। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮, ২০শে মাঘ।

সময়—অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা।

স্থান—ইম্পিরিয়াল সেমিনারি ভবন।

শ্রীযুত বিধুভূষণ গোস্বামী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ লেখক স্বর্গীয় মনোমোহন বসু ও বঙ্গের অধিতীয় নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষের পরলোকগমনে সভা হইতে তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করার প্রস্তাব

করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যাহা বলেন তাহার মর্ম এই :—“অত্যাচার সভার আশ্রয়ের পূর্বে আমরা অতি শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন বসু এবং গিরীশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিতেছি। তাঁহাদের পরলোক গমনে বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে কাহারও হাত নাই।

আমাদের প্রার্থনা এই যে, ভগবানের অনুকম্পায় তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার শান্তিলাভ করুক এবং তাঁহাদের মৃত্যুতে বঙ্গভাষার যে অভাব হইল তাহা তিনি পূরণ করুক।”

উল্লিখিত প্রস্তাব সভ্যকর্তৃক এক বাক্যে সমর্থিত হইয়া যথানিয়মে পরিগৃহীত হইল।

পরে গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

ঈশ্বর প্রস্তাব অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নূতন সভ্যরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

নূতন সভ্যগণের নাম :—

শ্রীযুত বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক বি. এল।

শ্রীযুত মনোমোহন দাস বি, এল।

.. মহেন্দ্রলাল রায় বি. এল।

.. অনুকম্ভচন্দ্র দোষ. উকিল।

.. সৈয়দ ইমদাদ আলী।

.. শরৎশর্মা দত্ত।

.. সত্যীন্দ্র রায় চৌধুরী।

.. সুধীরচন্দ্র সেন।

.. সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস-গুপ্ত বি, এ।

.. যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বি. এল।

.. অমলচন্দ্র চক্রবর্তী।

.. মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

.. প্রতাপচন্দ্র গুপ্ত (ছাত্রসভ্য)।

তৎপর শ্রীযুত ভূপতিনাথ দাস মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুত বিধুভূষণ গুহ ঠাকুরতার সমর্থনে এবং উপস্থিত

সভ্যগণের সম্মতিক্রমে নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায়, দিনাজপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় এবং সন্দ্বৈলের জমিদার সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী পরিষদের পরিপোষক নির্বাচিত হইলেন, এবং ইহাদিগের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত কর্তৃক উপস্থাপিত ও শ্রীযুক্ত গ্রামাশঙ্কর দাস-গুপ্ত কর্তৃক সমর্থিত পরবর্তী প্রস্তাবে নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় মহোদয়কে, ৫০ পঞ্চাশ টাকা অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতির জন্ত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার মূল্যবান গ্রন্থ চরিতাভিধানের একখণ্ড প্রদানের জন্ত, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে তালপত্রে লিখিত একখানি চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দাস ও মোহিনীমোহন দাস মহাশয় দিগকে বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি প্রদানের জন্ত সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেওয়া হইল এবং ইহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা সুস্থির হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অবিলাসচন্দ্র মহম্মদার মহাশয় উল্লিখিত পুরাতন পুঁথির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়খানির কতকংশ উদ্ধৃত করিয়া কিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন; এবং সভাপতি মহোদয়, শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ দাস, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গ্রামাশঙ্কর দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিভূচরণ গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি কতিপয় সভ্য বিষয়টির আলোচনা করিলেন। আলোচিত পুঁথি কয় খানির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

১। জয়দেবীমঙ্গল অথবা দেবীমঙ্গল—এখানি সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে তালপত্রে লিখিত একখানি পয়ার বঙ্গানুবাদ,—রচয়িতার নাম হরিশ্চন্দ্র দাস অথবা বসু।

২। রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব—এই পুঁথিখানিতে শিব ও পার্শ্বতীর পয়ারে কথোপকথন উপলক্ষে শিব রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য দেবের জীবনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতেছেন।

৩। ইন্দ্রজিৎ-যুদ্ধ—বিজয়চাঁদ কর্তৃক রামায়ণের একঘটনার বর্ণনা,—বাঙ্গালা পয়ারে লিখিত।

৪। অমরিশঙ্করীসংবাদ—ভাগবতের নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ।

৫। বীরবাহু যুদ্ধ—পুঁথিখানি ১২২৪ বঙ্গাব্দে হস্তে লিখিত; পুঁথির মধ্যে কৃষ্ণবাসকে রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

৬। শতযুদ্ধ বধ—এই পুঁথিখানির রচয়িতা কৃষ্ণবাস বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সকল আলোচনার পর শাহ আলমের নামাঙ্কিত কয়েকটি পুরাতন মুদ্রা এবং টাকা ডালবাজার জীবন বাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুরাতন তাসের বিজ্ঞান নিদর্শন কয়েকটি প্রস্তর মূর্তির ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হইল।

অবশেষে, শাখা স্থাপন সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রাপ্ত পত্র ও নিয়মাবলীর বিষয় আলোচনার পর উত্তরের পাণ্ডুলিপি সুস্থির হইল।

পরে সভাপতি মহাশয়কে বথারীতি ধন্যবাদ প্রদানের পর সভ্যগণ সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮, ১৩ই ফাল্গুন।

সময়—অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা।

স্থান—ইম্পিরিয়াল সেমিনারি ভবন।

পরিষদের স্থায়ী সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপর গত অধিবেশনের কার্য বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাবানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নূতন সভ্যরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

নূতন সভ্যগণের নাম।

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ গোস্বামী এম্. এ।

„ কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্মা বি, এ।

„ অক্ষয়কুমার দত্ত-গুপ্ত, এম্. এ।

- „ সতীশচন্দ্র সরকার এম্. এ ।
 „ উপেন্দ্রকুমার চন্দ্র বি, এ ।
 „ শরচ্চন্দ্র দত্ত ।
 „ ডাক্তার প্রবলচন্দ্র চক্রবর্তী ।
 „ গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এম্. এ ।
 „ লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার, বি, এ ।
 „ মোহিনীমোহন সরথেল বি, এ ।

অতঃপর ৩য় প্রস্তাবানুসারে নিয়মিত সভাগণ সর্ব-
 সম্মতিক্রমে বর্তমান বৎসরের চুচুড়া সম্মিলনে প্রতিনিধি
 নির্বাচিত হইলেন :—

- শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্. এ ।
 „ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বি, এ, ।
 „ বাপুকুমার চক্রবর্তী ।
 „ সুধীরচন্দ্র সেন ।
 „ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।
 „ গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, এম, এ ।
 „ অশুকচন্দ্র সরকার এম, এ, পি, আর, এস্ ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত এম্. এ ।

সমর্থক— „ যোগেন্দ্রাকিশোর রক্ষিত ।

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রাকিশোর রক্ষিত মহাশয়
 গৌড়ের ২ খানি ইষ্টক ও ঢাকা লায়বাগের কেল্লায় প্রাপ্ত
 দুইটা প্রস্তর নির্মিত কামাংগের গোলা প্রদর্শন করিয়া
 তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন ।

তৎপর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বি, এ, মহাশয়
 ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তির অমূল্যলিপি প্রদর্শন করিয়া
 তাহার কতকগুলি পাঠ বৈষম্যের উল্লেখ করেন ।

ইহার পর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়
 কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথির বিবরণ পাঠ করেন ।

তৎপর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের লিখিত
 “নদীর প্রাচীন প্রবাহ” নামক প্রবন্ধ লেখক নিজে
 উপস্থিত না থাকায় সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং পাঠ করেন ।

অতঃপর ময়মনসিংহের এগারসিদ্ধদুর্গের নিকটস্থ

একটা পুরাতন মসজিদে উৎকীর্ণ প্রস্তরলিপির প্রতি-
 ছায়া প্রদর্শন করা হয় ।

৪র্থ প্রস্তাব । শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত মহাশয়ের
 প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, বি, এল্
 মহাশয়ের সমর্থনে নিয়মিত গ্রন্থকার মহাশয়গণকে
 গ্রন্থ উপহারের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হয় ।
 গ্রন্থকারের নাম ।

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ।

„ অতুলচন্দ্র বাক্চা ।

গ্রন্থের নাম ।

১। কেদার রায় ।

২। অভিষেক সঙ্গীত ।

৩। পুষ্করিণীতে মস্ত্র চাষ ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর
 সভা ভঙ্গ হয় ।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন ।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮, ১১ই চৈত্র ।

সময়—অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা ।

স্থান—ইম্পিরিয়াল সোমনারি ভবন ।

পরিষদের স্থায়ী সভাপতি মহাশয়ের অধুপস্থিতিতে
 সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস বি, এল
 মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । তৎপর
 গত অধিবেশনের কার্য বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল ।

২য় প্রস্তাবানুসারে নিয়মিত ব্যক্তিগণ নূতন
 সভারূপে গৃহীত হইলেন :—

নূতন সভ্যের নাম ।

শ্রীযুক্ত রায় সাহেব বিধুভূষণ মজুমদার, বি, এ ।

„ নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, এম-এ ।

„ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ।

„ জিতেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী ।

„ নন্দলালচন্দ্র নন্দী ।

„ চারুচন্দ্র দাসগুপ্ত বি-এ ।

„ ডাক্তার উমাশ্রমণ বোব এল, এম, এস ।

শ্রীযুক্ত প্রশন্নকুমার পাল ।

শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় ।

শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিহারদ ।

„ নৃপতিরঞ্জন রায় ।

„ বিরাজমোহন দে ।

„ প্রাণেশ্বরনারায়ণ রায়চৌধুরী, বি, এল ।

„ অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ।

„ দীনেশচরণ রায়, এম, এ, বি, এণ ।

„ বিনয়কুমার সরকার, এম, এ ।

„ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, এম, এ ।

„ হরিদাস সাহা, এম্, এ ।

„ কৃষিকেশ রায়-।

„ শশীকুমার দাস, বি, এল ।

নূতন ছাত্রসভ্যের নাম ।

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

„ যোগেশ চন্দ্র অধিকারী ।

„ নিশিকান্ত কর্ণকার ।

„ সুরেশচন্দ্র সিংহ ।

„ যতীন্দ্রমোহন সিংহ ।

„ মধুসূদন সূত্রধর ।

„ আব্দুল হাসেম মোল্লা ।

„ মহম্মদ আবদুল হাকিম ।

„ মনিরুদ্দিন আহম্মদ ।

„ মহম্মদ ইয়াছিন ।

„ সেক মহম্মদ হোসেন ।

„ নবি মহম্মদ ।

„ মুন্সী রহেম আলী মিঞা ।

„ আব্দুল রব দার্কী ।

„ মুন্সী আব্দুল কাদের ।

„ রোহ্মত আলী মিঞা ।

„ যতুনাথ চক্রবর্তী ।

„ বনমালী ঘোষাল ।

„ যোগেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী ।

„ অম্বিনীকুমার বর ।

„ উমাচরণ চক্রবর্তী ।

„ মধুসূদন দাস ।

প্রতিভা

২য় বর্ষ

আষাঢ় ১৩১৯

৩য় সংখ্যা ।

জড় জগতের অস্তিত্ব উপাদান

ও

রাসায়নিক পদার্থ নিচয়ের

উৎপত্তি

(ছ' চুড়া সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত)

মানব হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক যখন প্রথম প্রবেশ লাভ করে তখন হইতেই এই অসীম ত্র্যক্ষণের চারিদিক-কার যাবতীয় সৃষ্টি তাহার সম্মুখে এক নূতন বিশ্ব-রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। প্রত্যেক মানব শিশুটি জ্ঞানের সোপানে প্রথম পদার্পণ করিয়া চতুর্দিকের দৃশ্য পদার্থের নাম, কারণ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া উঠে। ইহাই মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম। সমস্ত জীবন-ব্যাপী তাহার এই সত্যের অনুসন্ধান চলিতে থাকে। মানুষ যখনই এই বিরাট সত্যের কোন নূতন অংশের আভাস পায় তখন বাকী অংশ সমূহের সম্বন্ধে তাহার অজানতা তাহাকে পীড়া দিতে থাকে। এই প্রকারে সে নিত্য নূতন সত্যের পশ্চাতে অন্ধ বেগে ছুটিয়া চলিতেছে। সত্যকে পাইবার জন্য দুঃস্বপ্ন ভরিয়া সমগ্র মানব-

সমাজের অবিরত চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ইহাই মানব-জীবনের প্রধান লক্ষ্য। যিনি আঁধারের পরপারে যাঁইয়া এই বিরাট সত্যের কণামাত্র অংশ উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই মহাপুরুষ বলিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করেন।

জড় পদার্থের সৃষ্টি সম্পর্কে কোন কাল্পনিক ভয়ের দ্বারা দৃশ্য প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বিবরণ প্রদর্শন ও কারণ নির্দেশের চেষ্টা মানব যাত্রেরই মনে স্বতঃ জাগিয়া উঠে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আবহমান কাল চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

এই সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ও পুরাতন ও বর্তমান তত্ত্ব সমূহের বর্ণনা করা, বর্তমান প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।

প্রাচীন ও নবীন মত—প্রথমতঃ পুরাতন ও বর্তমান কালের বিভিন্নতা উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন মতের অধিকাংশই তৎকালীন দার্শনিকগণের কল্পনা ও চিন্তাপ্রসূত; পরন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পরিদর্শন অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত নয়।

বর্তমান কালের মত সমূহের একমাত্র লক্ষ্য সরলতা, এবং এগুলি অত্যধিক কল্পনা দোষে মুক্ত নয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও প্রমাণ আশ্রয় পূর্বক বর্তমান মত সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্তমান মত সকলের সম্যক প্রকৃতি অধ্যাপক Py-onting এর বক্তৃতায় সুন্দররূপে নির্ণীত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—“বিবিধ হস্তের ঐক্য প্রদর্শন পূর্বক উহাদের সংখ্যার অল্পতা সাধন ও পরস্পরের ঐক্য নিবন্ধন বিজ্ঞান গ্রন্থের অধ্যায়ের সংখ্যার হ্রাস সম্পাদন—বর্তমান মতসমূহের একতম উদ্দেশ্য।”

অতঃ পরে তিনি বলিয়াছেন,—“কাল্পনিক তত্ত্ব সমূহ বাস্তবিকই সাময়িক।”

সর্বপ্রথম আমরা পুরাতন তত্ত্বসমূহের আলোচনা করিব। হস্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রাচীন তত্ত্ব সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মত। এই মতে আমরা শুধু দার্শনিক কল্পনার পরিচয় পাই না—ইহা যে বিজ্ঞানের চিরন্তন হস্তের জায় শক্তির (Energy) রক্ষণ (Conservation) পরিবর্তন (transmission) ও বিকীরণের (dissipation) মত আশ্রয় পূর্বক গঠিত, ইহা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

এই মতে এই দৃশ্য জগৎ অদৃশ্য, অসীম, অবিনাশী অদম্য ও অনিষ্ট প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। ইহা এক দিকে যেমন জড় জগতের হস্তির ব্যাখ্যা করিতেছে তেমনি জীব জগতের হস্তিতত্ত্বও পরিষ্কৃতরূপে প্রকাশ করিতেছে।

প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য প্রকৃতি কি ও কিরূপ।

প্রকৃতি—স্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার (equilibrium) নাম প্রকৃতি। এই গুণত্রয় প্রকৃতিসম্পূর্ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

পুনঃ—এই গুণত্রয় কি ?

স্ব—উপাদান বীজ বা জ্ঞানাত্মক (Essence or Intelligence Stuff)

রজঃ—শক্তি (Energy)

তম—গুরুত্ব বিশিষ্ট পদার্থ (matter characterised by mass or inertia); সুতরাং এই বিশ্ব জগতের আদি কারণ—স্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, প্রকৃতি বা এই গুণত্রয়।

হস্তির পূর্বে এই গুণত্রয়ের সমন্বয় হেতু এক সাম্যাবস্থা বা প্রকৃতি বিরাজিত ছিল। পুরুষ (Absolute) তাহার বিশেষ প্রভাবে প্রকৃতির এই সাম্যাবস্থা নষ্ট করিয়া হস্তির রীতি প্রবর্তিত করে। এই তিন গুণের পরস্পরের সম-বয়ের মধ্যে যখন ঐক্যম্যাবস্থা উৎপন্ন হয় তখনই হস্তির অকুর বিকাশ হইতে আরম্ভ করে; কেন না শুধু তখনই গুণত্রয়ের মধ্যে কাহারও আধিক্য দৃষ্ট হয়; এবং গুণত্রয়ের এই নানাধিক্য হইতে কর্ণ সংযোগের শক্তি উৎপন্ন হয়।

হস্তির ভিন্ন ভিন্ন সোপান এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা সাংখ্যযোগে আমরা পাই,—

প্রকৃতিঃ সত্ত্বোত্তমোহঙ্কারঃ

তন্মাত্রাৎ পঞ্চশ্চ বোদ্ধশকঃ।

তন্মাত্রাদপি বোদ্ধশকঃ

পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি ॥

প্রকৃতি—গুটমবাস্তবলিসম।

মহৎ—লিসম।

অহঙ্কার (Empirical Ego) পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ তন্মাত্র)

জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মন পঞ্চভূত (ক্ষিত্যপতেজো মরুৎ ব্যোম)

দ্রব্য (Substance).

মহৎ হইতে হস্তির সোপান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে,—এক ভাগ অহঙ্কারের মধ্য দিয়া জীবের হস্তিতে উপস্থিত হইয়াছে; অপর ভাগ জড়ের হস্তিতে পৌঁছিয়াছে।

প্রকৃতিকে অবিনাশী বলাতে শক্তির (energy) ও বিষয়ের (matter) রক্ষণশীলতা বুঝাইতেছে।

এক কথায় বলিতে গেলে এই পঞ্চ তন্মাত্র “ভূতাদি” বা প্রকৃতির একতম গুণ “তম” হইতে উৎপন্ন। এই পঞ্চ তন্মাত্রের হস্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে, যথা—“পাতঞ্জল, পরাশর ও বিষ্ণুপুরাণে” দ্রষ্টব্য।

এক কথায় তাহারা “ভূতাদি” (Rudiment of matter) বা “তম” হইতে বিভিন্ন শক্তির বা রজোগুণের (Energy) সংযোগে উৎপন্ন। এই পঞ্চতন্ত্র হইতে “ভূতাদি” বা “তম” সংযোগে পঞ্চভূত বা পঞ্চমৌলিক পদার্থের পরমাণু সৃষ্ট হইয়াছে।

এই পঞ্চভূত হইতে পরস্পরের সংযোগ বিয়োগে নানাবিধ দ্রব্য নিচয়ের সৃষ্টি হইয়া এ দৃশ্য জগৎ গঠিত করিয়াছে।

পুনশ্চ, এই পঞ্চভূতাদি ও দ্রব্যসমূহ অক্ষুণ্ণ কোন না কোন বিশেষ শক্তি বিকীরণ করিতেছে, এবং এই গুণত্রয়ের বৈষম্যমাত্র সংযোগে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকলের আপাত সাম্যাবস্থা (unstable equilibrium) কোন না কোন প্রকারে ভঙ্গ করিয়া প্রকৃতির চিরন্তন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবার অভিনুধী হইতেছে। এই সদৃশ পরিণাম বা অক্ষলোম সর্গ (disintegration) পূর্বোক্ত বিসদৃশ পরিণাম বা বিলোম সর্গের (creation) সহিত বরাবর এক সঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। এক দিকে যেমন পদার্থ নিচয়ের গঠন প্রণালী অক্ষুণ্ণভাবে চলিতেছে, অন্য দিকে তেমন তাহাদের বিশ্লেষণও (Disintegration) অবিরত সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং দৃশ্য জগতের এই আপাত সাম্যাবস্থা একটি গতিশীল সাম্যাবস্থা (Dynamic Equilibrium)। এই গতিশীল সাম্যাবস্থা যে বিশ্বজগতে যুগ যুগান্তব্যাপী প্রবর্তিত থাকিবে তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কেন না, উদ্ভূত শক্তি (Kinetic Energy) গূঢ় শক্তিতে (Potential Energy) এবং গূঢ় শক্তি উদ্ভূত শক্তিতে অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে। যদি কখনও সমস্ত উদ্ভূত শক্তি গূঢ় শক্তিতে পরিণত হইয়া যায়, বা সদৃশ পরিণাম বিসদৃশ পরিণামের উপর আধিপত্য লাভ করে, তখন এই সৃষ্ট জগৎ প্রকৃতির সাম্যাবস্থার পুনঃ লয় প্রাপ্ত হইবে।

আমরা যখন (Radium) রেডিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করিব তখন এই বিষয় পুনরুত্থাপিত হইবে।

৪ষ্ঠ পর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে কণাদও তাঁহার

বৈশেষিক দর্শনে এই পঞ্চ তন্ত্রাত্মকে পঞ্চভূতাদি মৌলিক পদার্থের পরমাণু বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই অতি প্রাচীন কাল হইতে এক অন্তিম উপাদানের (Primordial matter) অনুভূতি চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুরা “ভূতাদি” বা “তমকে” অন্তিম উপাদান (Rudiment of matter) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কণাদের পরবর্তী বুদ্ধ ও জৈন দার্শনিকগণও এই মতের সমর্থন করিতেন।

গ্রীস দেশীয় প্রাচীন তত্ত্ব—আমরা দেখিতে পাই গ্রীসেতেও খৃঃ পূঃ ৬ ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে থেলিস্ (Thales), এনাক্সিমেন্ডার (Anaximander) ও এনাক্সিমিনিস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক অন্তিম উপাদানের তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই দৃশ্য জগতে ঐ অন্তিম উপাদান হইতে ইহার আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তনে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অন্তিম উপাদানকে তাঁহারা জীবনীশক্তিসম্বল বলিয়া মনে করিতেন, সেই হেতু তাঁহাদের প্রচারিত তত্ত্ব “হাইলোজোইজম (Hylozoism)” নামে অভিহিত হইয়াছে। গ্রীস ভাষায় “ঝো” (zoe) শব্দে জীবন বুঝায়।

শিখাগোত্রাসেন্স অতঃ—পিথাগোরাস অক্ষশাস্ত্রের সংখ্যার সাদৃশ্যে যাবতীয় মৌলিক পদার্থের সাদৃশ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, মৌলিক পদার্থের সংখ্যার অন্ত নাই, এবং এক মৌলিক পদার্থ অসংখ্য মৌলিক পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

ঐলিয়াটিকের অনুবর্তী দার্শনিকগণ দৃশ্য পদার্থের ঐক্যকে প্রথম কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের সনাতন অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

হিরাক্লিটাসের মতে পরিবর্তনই সৃষ্ট পদার্থের এক মাত্র নিয়ম, এবং তেজ এই পরিবর্তনের চিহ্ন স্বরূপ। হিরাক্লিটাসের মত সম্বন্ধে এরিস্টোটেল বলিয়াছেন,

জানুয়ারি ১৯১১

“হিরা ক্লিটাস ও তাঁহার শিখণের মতে ইঞ্জিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ এক বিরাট পরিবর্তনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে কোন সম্যক জ্ঞান লাভ অসম্ভব।”

খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে এমপিডোক্লিস ও এরিষ্টোটেলের মতন ৪টি মাত্র মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যথা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ। এই পদার্থ চতুষ্টয় সনাতন, অবিনাশী ও অপরিবর্তনীয়, এবং ইহাদের সংমিশ্রণে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

এনাক্সাগোরাসের মতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা অনেক এবং ইহাদের হৃদয়তম অংশ সমূহকে “হোমিওমেরাই” (Homeomeriae.) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহার মতে এই সব মৌলিক পদার্থ বিশ্বজগতে অতি হৃদয়ভাবে বর্তমান রহিয়াছে, এবং ইহাদের সংযোগে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি ও তাহাদের বিরোধে বিভিন্ন সৃষ্ট পদার্থের বিনাশ ঘটিতেছে। “হোমিওমেরাই” সমূহ অবিনাশী, সনাতন ও সমস্ত বিশ্বব্যাপী। জগতের গতি শক্তি (Energy) কোন বিশেষ মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে বলিয়া তাঁহার মনে করিতেন।

খৃঃ পূঃ ৪র্থ ও ৩য় শতাব্দীতে লিউকিপাস, ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাস এই তিন গ্রীক দেশীয় দার্শনিক পরমাণু তত্ত্বের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মতে—

- ১। সমস্ত পদার্থই ইহাদের অণু হইতে উৎপন্ন।
- ২। অণুসমূহ এত ক্ষুদ্র যে, ইহারা ইঞ্জিয়গ্রাহ্য নহে।
- ৩। ইহারা পদার্থ সকলের দ্বারা অবিনাশী।
- ৪। ইহারা অপরিবর্তনীয় ও অবিভাজ্য।
- ৫। শুধু একমাত্র অস্তিম উপাদান হইতে ভিন্ন ভিন্ন

অবয়বের ও আকারের অণুসমূহ উৎপন্ন হইয়া পরস্পর সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে।

৬। পদার্থের গুণাবলী ইহার আভ্যন্তরীণ অণুসমূহের গুণাবলী ও শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে।

৭। গতিশীলতা বা স্পন্দন (movement) অণুসমূহের বিশেষত্ব।

৮। ইহারা পরস্পর হইতে আবরণাতাব দেশের (Vacuum.) দ্বারা বিচ্ছিন্ন।

প্লেটোর মত—খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে প্লেটো তাঁহার মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে ইঞ্জিয়গ্রাহ্য পদার্থ ও ঘটনাসমূহ অসত্য—ইহাদের গুণাত্মক ভাবই (abstract idea.) একমাত্র সত্য। তিনিও ৪টি মাত্র মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, যথা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ। তাঁহার মতে পদার্থ সমূহ অবিনাশী ও সনাতন এবং ইহারা ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য অণু হইতে উৎপন্ন। এক মৌলিক পদার্থ অস্তিম মৌলিক পদার্থে পরিবর্তনীয় ; সুতরাং দেখিতে পাই প্লেটোও এক অস্তিম উপাদানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন।

এরিস্টোটেলের মতে (১) একমাত্র অস্তিম পদার্থ নানা গুণ সংযুক্ত হইয়া বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে।

(২) ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই ৪টি মৌলিক পদার্থ ঐ অস্তিম উপাদান হইতে উৎপন্ন, ইহারা পরস্পর পরিবর্তনীয়।

(৩) পদার্থ সমূহ সীমাহীন অংশে বিভাজ্য।

(৪) মৌলিক পদার্থ সমূহ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত।

গেবারেলের মত—আরব দেশীয় রাসায়নিক গেবার এরিস্টোটেলের চতুর্বিধ মৌলিক পদার্থের মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ধাতু সমূহের পরস্পর পরিবর্তনের মতের পক্ষপাতী ছিলেন।

ইহার পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত আর কোন বিশেষ মতের প্রচার হয় নাই। এক অস্তিম উপাদানের অস্তিত্ব সর্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাসায়নিকগণ সহজ প্রাপ্য ধাতু হইতে হুয়ুল্য স্বর্ণ প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কার করিতে মনোযোগ দিয়া ছিলেন। হিন্দু জাতির মধ্যে নাগার্জুনাদি এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ তত্ত্বের সাময়িক অভ্যাস রাসায়নিকগণের নান উল্লেখযোগ্য হইতে পারে। এই সময় হইতে প্রাচীনেরা

ঔহাদের মত সপ্রমাণ করিবার জ্ঞান বিজ্ঞানাগার ও ইঞ্জিয়গ্রাহ প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেকনের মত—তৎপর বেকন (১৫৬১—১৬২৬ খৃঃ) ঔহার মত প্রচার করেন। তিনিই প্রথম ইঞ্জিয়গ্রাহ প্রমাণ ও পরীক্ষা হইতে বৈজ্ঞানিক মত প্রচারের পথ প্রদর্শন করেন। ঔহার মতে মৌলিক পদার্থ সমূহ স্বয়ম্ভূ হইতে পারে না; উহারা এক অন্তিম উপাদান হইতে উৎপন্ন।

তিনি বলিতেন—“যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার সৃষ্টি করিবার বা বিনষ্ট হইবার শক্তি নাই।”

পদার্থ সমূহের গুরুত্ব (mass) সনাতন ও অবিনাশী। প্রত্যেক পদার্থ ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু হইতে উৎপন্ন।

ফরাসীদেশীয় বিজ্ঞানবিদ ডেসকার্টিস বেকনের মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

বাইবলের মত—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে স্যার রবার্ট বাইল ঔহার মত প্রচার করিয়াছিলেন। ঔহার মতে মৌলিক পদার্থের সংজ্ঞা এই রূপ—ইহারা অমিশ্র এবং ইহাদের সংযোগে বিভিন্ন মিশ্র পদার্থের উৎপত্তি হয়; ইহারা এক অন্তিম উপাদান হইতে উৎপন্ন; ইহাদের বাহ্যিক গুণের বিভিন্নতা এই অন্তিম উপাদানের বিভিন্ন অবয়বের ও আকারের অণু হইতে উৎপন্ন।

নিউটনের মত—নিউটন পরমাণুবাদের পক্ষবাদী ছিলেন। তিনি কোন অন্তিম উপাদানে বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না। “Optick’s” হইতে ঔহার মতের কিয়দংশ এখানে অণুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।

“ইহা এক প্রকার সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, ভগবান সৃষ্টির প্রারম্ভে ঔহার অভিপ্রায় সিদ্ধির জ্ঞান কঠিন, গুরুভার, অচ্ছিন্ন ও স্পন্দনশীল বিভিন্নাবয়বের ও গুণের অণু সমূহ হইতে পদার্থ নিচয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; এবং এই অণু সমূহ এতই কঠিন ও, ইহাদের বিনাশ বা বিভাগ হইবার সম্ভাবনা নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান যাহা গড়িয়াছেন তাহাকে ভাঙ্গিবার ক্ষমতা

সাধারণ শক্তির অধীত। এই অবিতাজ্য অণু হইতে একই রকমের ও গুণের পদার্থ সমূহ আবহমান কাল সৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। যদি অণু সমূহের বিনাশ বা বিভাগ হইত তবে পদার্থ সমূহের গুণাবলীও কালে পরিবর্তিত হইত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নিউটনের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই এই বিভিন্ন প্রকারের পরমাণুর অস্তিত্ব ও এক প্রকার নিঃসন্দেহরূপে প্রচলিত হইয়া ছিল। নিয়ে ভল্টেরার হইতে উদ্ধৃত বাক্যে ইহাই প্রমাণিত হয়—

“ইঞ্জিয়গ্রাহ পদার্থের অনন্ত বিস্তৃতি এখন অগস ব্যক্তির কল্পনাগ্রস্ত খেয়াল বলিয়া গণ্য হইয়াছে; আবরণাভাব দেশের অস্তিত্ব সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; যে সব পদার্থ অতিশয় কঠিন বলিয়া প্রতিভাত হয়, ইহা বা এখন চালুনির দ্বায় শত হিঙ্গ পূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বাস্তবিক ইহাই সত্য। অণু সমূহ অবিতাজ্য ও অপরিবর্তনীয় বলিয়া সাধারণে গৃহীত হইয়াছে; এবং ইহার উপরই বিভিন্ন জীবের ও পদার্থের সনাতন অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই তল সকল কালেই জল; তেজ (অগ্নি) সকল কালেই অগ্নি, এবং মাটি সকল কালেই মাটি রূপে অগুভূত হইতেছে। এবং যে সব অতীন্দ্রিয় বীজ-ণু হইতে মানুষের সৃষ্টি হয় ইহা হইতে বিহঙ্গের সৃষ্টি অসম্ভব।

ডল্টনের পরমাণু বাদ—ইহার পর ডল্টন যখন ঔহার জগদ্বিখ্যাত পরমাণুতত্ত্ব প্রচার করেন তখন এই অন্তিম উপাদানের অস্তিত্ব একেবারেই ভিত্তি-হীন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়; এবং এই ঐক্য তত্ত্বের আলোচনা কিছু কালের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ডল্টনের পরমাণুতত্ত্ব কিছুই নূতন নয়। এনাক্সাগোরাস, লিউ-কিপাস ও ডেমোক্রিটাস এবং বিধ পরমাণুবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন।

এই সময়ে আরও দেখা গেল যে, সাধারণ দাত্ত

আষাঢ় ১৩১২।

সমূহকে মূল্যবান স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রয়াস একে-
বারেই নিফল হইল।

ডন্টনের মতে প্রত্যেক পদার্থ উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু
হইতে সৃষ্ট। এক মৌলিক পদার্থের পরমাণু অত্র মৌলিক
পদার্থের পরমাণু হইতে বিভিন্ন। ইহাদের ওজন বা
গুরুত্ব বিভিন্ন, গুণ বিভিন্ন। কিন্তু এক পদার্থের পরমাণু
সকল একই প্রকারের; ইহাদের মধ্যে কোন বিভিন্নতা
দৃষ্ট হয় না। ডন্টনের তত্ত্ব প্রচারের পর তৎকালীন সমস্ত
মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন জলজান (Hydrogen)
বায়ুর পরমাণুর গুরুত্বের আপেক্ষিক পরিমাপে ধার্যা
করা হয়।

প্রাউটের তত্ত্ব—বিভিন্ন পরমাণুর ওজন
তালিকা নির্ণীত হইবার পর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডবাসী
প্রাউট তাঁহার বিখ্যাত তত্ত্ব প্রচার করেন; ইহা
বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁহারই নিজ নামে অভিহিত।

এই পরমাণুগুরুত্বের তালিকা হইতে তিনি দেখাইয়া-
ছিলেন যে, বিভিন্ন পরমাণুর আপেক্ষিক গুরুত্ব জলজানের
পরমাণু গুরুত্বের দ্বি. ত্রি. চতুর বা তাহার অধিক এইরূপ
পূর্ণ সংখ্যক গুণ; পরন্তু ইহার কোন ভগ্নাংশের গুণ
নহে, সুতরাং তাঁহার মতে বিভিন্ন পদার্থ এক জলজানের
অণু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু পরবর্তী রাসায়নিকগণ (বারজিলিয়াল্, পেনি
মরটাদ, মেরিগনাক, ছমা এবং বিশেষতঃ ষ্টাস্) অতি সাদ-
ধানতার সহিত পরীক্ষাপূর্বক দেখাইয়াছেন যে, প্রাউটের
তত্ত্ব গোড়াতেই ভিত্তিহীন; কেন না অনেক মৌলিক
পদার্থের পরমাণুর গুরুত্ব জলজানের গুরুত্বের কেবল
ভগ্নাংশরূপেই প্রকাশ করা যাইতে পারে। যদিও
প্রাউটের তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এক প্রকার ভিত্তিহীন
বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তথাপি তৎকালীন পণ্ডিতগণের
মনে অস্থিম উপাদানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা বদ্ধমূল
থাকিয়া যায়। নিয়ে মেরিগনাক ও লোথার মেয়ারের
উদ্ধৃত বাক্যে ইহাষ্ট সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়।

মেরিগনাক প্রাউটের তত্ত্বের অসত্যতা প্রমাণিত করিয়া

বলিয়াছিলেন—যেই অজ্ঞেয় কারণ একমাত্র অস্থিম উপা-
দানের অণুসমষ্টি হইতে বিশেষ বিশেষ গুণযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন
মৌলিক পদার্থ সমূহের পরমাণুর সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাই
আবার কোন বিশেষ প্রভাবের দ্বারা ইহাদের মাধ্য-
কর্ষণশক্তির বশবর্তিতা পথে ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে;
যাহাতে প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গুরুত্ব
ইহার আভ্যন্তরীণ অস্থিম উপাদানের অণু সমূহের ওজন
সমষ্টি হইতে বিভিন্ন বলিয়া অনুভূত হইতেছে।

১৮২৬ খৃঃ অব্দে লোথার মেয়ারও বলিয়াছেন—

“ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে, যাবতীয় মৌলিক
পদার্থের অণুসমূহ এক অস্থিম উপাদানের (সম্ভবতঃ
জলজানের) অণুসমষ্টি হইতে উৎপন্ন; এবং এই অণু-
সমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব যে জলজানের গুরুত্বের পূর্ণ
সংখ্যক গুণের সমান নহে তাহার কারণ—সৃষ্টিকালে
নানাদিক আলোকবাহী ব্যোম বা ঈধার অণুর সহিত
ঐ অস্থিম উপাদানের অণুসমষ্টির সংযোগ হইয়াছে, এবং
এই বিশ্বব্যাপী ঈধার অণুসমূহ একেবারেই গুরুত্বহীন
বলিয়া বলা যায় না।

**ডন্টনের পরমাণুর জটিলতা ও
মৌলিকত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-**

সম্ভবতঃই মানুষের মন সারল্যপ্রবণ; কোন জটিল
সমস্যাতে সহজে সে তাহার মনে স্থান দিতে চায় না।
এই ক্ষুদ্র সত্যটি ডন্টনের পরমাণু তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যখনই বিজ্ঞান এমন কোন
প্রমাণ উপস্থিত করিল যাহা ডন্টনের পরমাণুবাদের
সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, তখনই আবার অস্থিম
উপাদানের অস্তিত্বের প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক জগতে জাগিয়া
উঠিল। গত কয়েক বৎসর হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও
রসায়ন এমন প্রমাণ সকল উপস্থিত করিয়াছে যে তাহাতে
ডন্টনের পরমাণু সমূহ এখন যৌগিক ও জটিল বলিয়া
নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে; এবং উহারা যে এক অস্থিম
উপাদান হইতে সৃষ্ট সেই বিষয় একরূপ নিঃসন্দেহ
প্রমাণিত হইয়াছে।

অ্রুকের পরীক্ষা—তার উলিয়ম ক্রুক, যিনি বহুকাল হইতে অন্তিম উপাদানের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিতেছেন, প্রথমে ইট্রিয়ম ধাতুর (yttrium) ত্রিকোণ কাচে ভগ্ন ক্ষিপ্ত আলোক (Phosphorescent spectra) পরীক্ষা করিয়া ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। এই ধাতু বহু কাল হইতে মৌলিক বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু ক্রুক এই ইট্রিয়ম ধাতুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া ইহাদের পূর্বোক্ত ক্ষিপ্ত আলোক পরীক্ষা পূর্বক দেখিলেন যে, বিভিন্ন অংশের আলোক বিভিন্ন প্রকারের। অল্প পক্ষে এই বিভিন্ন অংশের রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক গুণাবলী একই প্রকারের। তিনি ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ইট্রিয়ম ধাতুর পরমাণু সমূহের মধ্যে বিভিন্নতা বর্তমান আছে; সুতরাং ডাটনের তথা কথিত একই মৌলিক পদার্থের পরমাণু সমূহ পরস্পর বিভিন্ন রকমের অর্থাৎ যৌগিক ও জটিল।

অ্রুকের অন্তিম উপাদান তত্ত্ব—এই অন্তিম উপাদানকে ক্রুক প্রোটাইল (Protyl) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে প্রোটাইল হইতে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি ক্রুক তাঁহার দোলমান দোলক (Pendulum oscillation) তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, উত্তাপের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ গুরুতর মৌলিক পদার্থ সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে।

ঝিমান পরিনাম—(Zeeman Effect) ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে ঝিমান পরীক্ষা পূর্বক দেখিলেন যে, ত্রিকোণ কাচে ভগ্ন আলোক পংক্তি শক্তিশালী চুম্বকের ক্ষেত্রে দ্বি, ত্রি ও চতুর্ গুণ হইয়া যায়, ইহা হইতেও পরমাণুর জটিলতা ও যৌগিকত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

লকিসারের পরীক্ষা—১৯০০ খৃঃ অব্দে স্যার নরমেন লকিসার বিভিন্ন উত্তাপে তপ্ত একই জিনিষের ত্রিকোণ কাচে ভগ্ন আলোক বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষা করিয়া ও বিভিন্ন উত্তাপে তপ্ত নক্ষত্রালোক একই নিয়মে পরীক্ষা

পূর্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তথা কথিত মৌলিক পরমাণু সমূহ উত্তাপের আধিক্যে বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্মতম অংশে পরিণত হয়; ইহাতে পরমাণু সকলের যৌগিকত্ব প্রমাণ পায়।

জড় জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে লকিসারের মত।

লকিসারের মত—উত্তরোত্তর উত্তাপের বৃদ্ধিতে পদার্থ সকল সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত হইয়া পরিণামে অন্তিম উপাদানের অবস্থায় পরিণত হয়। বিভিন্ন উত্তাপে তপ্ত নক্ষত্রালোকের পরীক্ষা হইতে দেখা যায় যে, অত্যধিক তাপে তপ্ত নক্ষত্র রাজ্যে মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব অতি বিরল। যতই আমরা অপেক্ষাকৃত শীতল হইতে শীতলতর নক্ষত্রালোক পরীক্ষা করি ততই তাহাদের মধ্যে রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ক্রমশঃ অধিক দেখিতে পাই। যে সব মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গুরুত্ব অত্যন্ত অল্প ইহারা অত্যন্ত নক্ষত্রালোকে বর্তমান; এবং যাহাদের পরমাণুর অপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী ইহারা তাহাদের গুরুত্বের পরিমাণানুসারে শীতল হইতে শীতলতর নক্ষত্র রাজ্যে দৃষ্ট হয়; সুতরাং দেখিতে পাই উত্তাপের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মতম পরমাণু সকল হইতে গুরুতম পরমাণু সকলের ক্রমিক সৃষ্টি হইতেছে।

টমসনের পরীক্ষা—সাধারণতঃ বায়বীয় (gas) পদার্থের মধ্য দিয়া তাড়িত শ্রোত প্রবাহিত করা যায় না; কিন্তু যখন এই বায়বীয় পদার্থের ভিতর রন্জেনের (Rontgen) আলোক রশ্মি, লেনার্ডের আলোক রশ্মি বা বেকারেলের আলোক রশ্মি নিক্ষিপ্ত হয় তখন এই বায়বীয় পদার্থ অনায়াসেই তাড়িতবাহী হইয়া উঠে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত রূপে উত্তেজিত বায়বীয় পদার্থের মধ্যে তাড়িত যুক্ত অণু সমূহের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

যখন কোন উচ্চ ক্রমের শক্তিশালী তাড়িত শ্রোত দুই ধাতব আশ্রয়পাতের (Electrodes of plates) মধ্যে প্রবাহিত করা যায় তখন বিরোগসংজ্ঞক আশ্রয়-

জানুয়ারি ১৯১৯

পাত হইতে ক্ষুদ্রতম তাড়িতাণু সকল সরল ভাবে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, ইহারা বাস্তবিকই বিয়োগসংজ্ঞক তাড়িতাণু (Corpuscles or Electrons)।

অক শাস্ত্রের সাহায্যে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই বিয়োগসংজ্ঞক তাড়িতাণুর আপেক্ষিক গুরুত্ব জলজানের পরমাণুর গুরুত্বের $\frac{1}{1836}$ সহস্রাংশের একাংশের সমান। তাঁহার মতে পদার্থ সমূহের পরমাণু বিষয় স্পন্দনশীল তাড়িতাণু (Electron) হইতে উৎপন্ন। এই তাড়িতাণু সমূহ ইহাদের চারি দিকে এক তাড়িতচুম্বকশক্তির ক্ষেত্র (Electro-magnetic field of force) রচনা করিয়া ভ্রমণোত্তাপন হয় (possesses mass or inertia). এই অবস্থায় তাড়িত ক্ষুদ্রপদার্থের সমস্ত গুণাবলী প্রদর্শন করিবে, সুতরাং এই তাড়িতাণু যে ডব্লিউ-র পরমাণুর উপাদান এ বিষয়ে প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক।

রেডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর পল্লি-বর্তনশীলতা ও পরমাণু সমূহের সদৃশ পরিণাম বা অনুনোম সর্গ (Disintegration)।

বিজ্ঞানবিদ্ সডি (Soddy) বলিয়াছেন,—রসায়ন শাস্ত্রে বিবৃত অণুসমূহ এখন আর অবিভাজ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; ইহাদের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাই এখন বৈজ্ঞানিকগণের একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দে বেকারেল প্রথম হইতে ইউরেনিয়াম্ ধাতুতে এই চিরন্তন কার্য্যকর পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তৎপর যুসেঁ। কুরী ও মাদাম কুরী রেডিয়াম আবিষ্কার করিয়া এই ধাতুতে উক্ত শক্তির প্রথম কার্য্য পরীক্ষা করিয়াছেন।

রেডিয়াম ধাতু হইত অবিরত বিয়োগসংজ্ঞক তাড়িতাণু (L. Rays) যোগসংজ্ঞক তাড়িতাণু (R. Rays) এবং দেশভেদী রশ্মি (Rays) চতুর্দিকে নির্গত হইতেছে; ইহা ব্যতীত অনেক প্রকারের বায়বীয় ও

কঠিন পদার্থ সমূহ এই ধাতুর ক্রমিক অবনতিতে সৃষ্ট হইতেছে। নিম্নের চিত্রে ইহাই দ্রষ্টব্য—

রেডিয়াম নির্গত বায়বীয় পদার্থ রেডিয়াম A ক্রমঃ

যোগসংজ্ঞক যোগসংজ্ঞক
তাড়িতাণু (D. Rays) তাড়িতাণু

সম্প্রতি পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, রেডিয়াম পরমাণুর সদৃশ পরিণামের ফল “সৌর” বা হিলিয়াম বাষ্প। ইহা দ্বারা বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুসমূহের উপাদানের একা প্রমাণিত হইতেছে। একই প্রকারের রেডিয়াম পরমাণু ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন পদার্থসমূহের পরমাণুর সৃষ্টি হইতেছে।

রেডিয়াম ধাতুর কার্য্যকরী শক্তির পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে, পরমাণু সকলের আভ্যন্তরীণ অংশ স্পন্দনশীলতা ও বৈবর্ম্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং এই স্পন্দনশক্তির বিকিরণ হেতু তাহাদের কার্য্যকরী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই শক্তির বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে রেডিয়াম ধাতুর বিনাশ ঘটতেছে ও নূন গুরুত্বের অসংখ্য পদার্থসমূহ সৃষ্ট হইতেছে।

তবে সকল প্রকার গুরুত্বের মৌলিক পদার্থ সমূহ জগতে দৃষ্ট হয় না কেন? তাহার উত্তর এই—জড় জগতে দৃষ্ট বায়বীয় মৌলিক পদার্থ রূপ অপেক্ষাকৃত সামান্যবাহার মধ্যবর্তী পথে শক্তি সঞ্চয় এতই দ্রুত যে, কোন মধ্যবর্তী জড় পদার্থের উৎপত্তির পরিমাণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। এই একই রীতি জড় জগতের পদার্থসমূহের বিনাশ কালেও প্রযুক্ত।

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া সডি বলিতেছেন,—

রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের পরমাণু স্বরূপ আপাত সামান্যবাহার মধ্যবর্তী পথে তমোগুণের সঞ্চয় এতই দ্রুত যে, মধ্যবর্তী পদার্থ সমূহের উৎপত্তির পরিমাণ সদৃশ পরিমাণাধীন পরিবর্তনশীল মধ্যবর্তী পদার্থ সমূহের উৎপত্তির পরিমাণের ত্রায় অতীব অল্প সুতরাং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে।

অসংখ্যান্তে মত—কয়েক বৎসর পূর্বে বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ্ অসওয়াল্ড ইংলেণ্ডে কেরাডের

‘দেখ্‌লো দেখ্‌লো দেখ্‌ আধি মেলি’

উথলে ভুবন ভরিয়া।

বউ কথা কহ গভীর বর্ষে,

আকুলে ডাকিয়া কহিছে কণ্ঠে

‘বউ কথা কও, কহ গো’

সাক্ষের লাঙ্কের আড়ালে বসিয়া

বধু কি কহিছে জাকামি ধরিয়া,

‘কই সে কোথায়, কোথা গো?’

“বরে নাহি শুধু দেখিলি চিনিলা

বধু তুই এই আসরে!’

নাচে কুলু-কুলু উলু-কৌতুকে

ভিৎরাজী আজি বাসরে।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

সারনাথ

ভগবান্ বুদ্ধদেব নৈরঞ্জন-তীরে বোধিচক্র-মূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া চিন্তা করিলেন, এ নূতন ধর্ম্মে কাহাকে প্রথম উপদেশ দিব। প্রত্নজ্ঞার প্রথম অবস্থায় যে সকল মহাত্মার নিকট ধর্ম্মতত্ত্বের ভিখারী হইয়াছিলেন, কিন্তু সফল-কাম হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিলেন।

“—হইল স্মরণ

রামপুত্র রুদ্রকরে। কোথায় এখন

রামপুত্র? বুদ্ধদেব বসিলেন ধ্যানে।

দেখিলেন সপ্ত দিন হইলে অতীত

রামপুত্র কালগত।”

অতএব তাঁহাকে এ নূতন লোক জ্ঞান দেওয়া সম্ভব নাহে।

“—আবাড় কালাম

তখন পড়িল মনে কোথায় সে এবে?

আবার বসিয়া ধ্যানে দেখিলা সুগত

তাহার জীবন লোলা হইয়াছে শেব তিন দিন।’

তবে এই ধর্ম্মে কাহাকে উপদেশ দিবেন?

“তখন পড়িল মনে শিষ্য পঞ্চজনে।”

অজ্ঞাত কৌণ্ডিন্য-প্রমুখ এই পঞ্চজন শিষ্য উরুবিশ্ব নগরে ভগবান্ বুদ্ধদেবকে নিকল যোগ ও দর্শন ত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি হারাইয়াছিল ও অত্যাধ ধর্ম্মতত্ত্ব লাভের চেষ্টা করিতেছিল। এখন ভগবান্ বুদ্ধদেব ভাবিলেন,

‘কোথায় তাহারা? ধ্যানে দেখিলেন দেব

আছে তারা যুগদাবে বারাণসী ধামে।

যাইবেন বারাণসী করিলেন স্থির

শিষ্য পঞ্চ নব ধর্ম্ম করিতে দীক্ষিত।

এই পুণ্য ধর্ম্মের দীক্ষাস্থল সেই যুগদাবই বর্ত্তমান কালের সারনাথ।

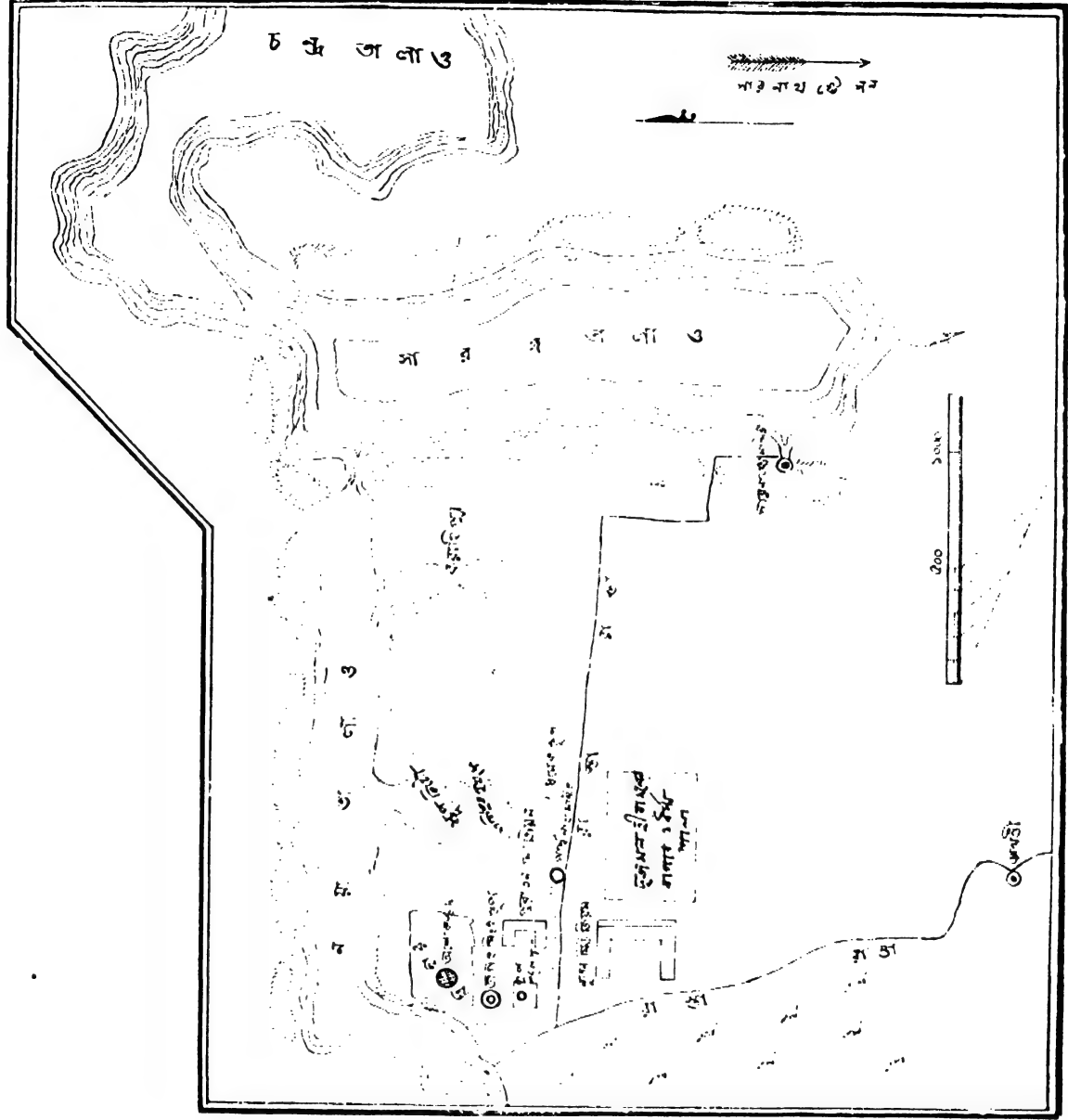
সারনাথ আধুনিক নাম। বৌদ্ধগ্রন্থে ইহা “ঋষি পত্তন যুগদাব” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই নামটি ইংরাজিতে “Deer park of the Rishi,” বলিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই স্থানে জনৈক প্রত্যেক-বুদ্ধের বাসস্থান ছিল বলিয়া এই নামের পূর্বাংশ ঋষিপত্তন হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই প্রত্যেক-বুদ্ধ যখন শুনিলেন যে, “শুদ্ধোদনের পুত্র” বুদ্ধত্ব লাভ করিবার উত্তোগ করিয়াছেন, তখন তিনি এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

স্থানটির নামের দ্বিতীয় অংশ (অর্থাৎ যুগদাব) বিষয়ে একটি সুন্দর “জাতক” কথা বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে ভগবান্ বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে যুগদিগের রাজা রূপে বর্ত্তমান ছিলেন, স্মৃতরাং স্থানটি যুগদাব অর্থাৎ যুগদিগের বন বলিয়া কথিত হওয়া

বিচিত্র নহে।

বৌদ্ধগ্রন্থে “যুগদাব” শব্দটির “যুগদার” এইরূপ রূপান্তরও দেখা যায়। ‘যুগদার’ শব্দের অর্থ—যাহা (যে বন) যুগদিগকে দান করা হইয়াছে।

জাতক কথাটি এইঃ—পূর্ব্বজন্মে ভগবান্ বুদ্ধদেব



ও দেবদত্ত * দুই মৃগদলের অধিপতি ছিলেন। তৎকালীন কানীরা রাজার আর্থেট-উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত মৃগদিগের সহিত রাজার এই ‘সময়’ হয় যে, রাজার নিমিত্ত পালাক্রমে প্রত্যেক মৃগদল হইতে এক একটি মৃগ প্রতিদিন রাজবাটীতে প্রদত্ত হইবে। কালক্রমে দেবদত্তের অধীনস্থ কোন গর্তিগী মৃগীর পালা আসিয়া উপস্থিত হইলে সে স্বকীয় রাজার নিকট গিয়া বলিল “আমার গর্তস্থ শিশুর প্রাণবধ করিবার অধিকার কাহারও নাই, অতএব প্রসব পর্যন্ত আমাকে রক্ষা করুন।” দেবদত্ত ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে অস্বীকার করিলে মৃগী দ্বিতীয় দলের রাজা বোধিসত্ত্বের শরণাপন্ন হইয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। বোধিসত্ত্ব তাহার কথার যথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া মৃগীর পরিবর্তে নিজ শরীর দান করিতে রুতসংকল্প হইলেন ও কানীরা রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা সকল শুনিয়া অতিশয় পীড়িত হইয়া বলিলেন, “আমি এইক্ষণে সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, বাস্তবিকই আমি নররূপী পশু, ও তুমি পশু হইয়াও মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ।” রাজা অতঃপর মৃগদিগকে তাহাদিগের কঠিন সত্য হইতে মুক্ত করিলেন ও ঐ বন-প্রদেশ মৃগদিগকে ‘দায়’ অর্থাৎ দান করিলেন।

কনিংহাম (Cunningham) সাহেব ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে লিখিয়াছেন যে, তখনও তথায় একটি “রমণা” অর্থাৎ মৃগ রাখিবার স্থান বর্তমান ছিল। শিকারের জন্য মৃগবন রক্ষিত হওয়ার প্রথা এখনও বর্তমান আছে ঐ স্থানটি যে মৃগসঙ্কুল ছিল তাহা কনিংহাম সাহেবের কথা হইতে প্রমাণিত হইতেছে। এখন ঐ প্রদেশ একবারে ফাঁকা, প্রায় বৃক্ষাদি পরিশূন্য। কিন্তু কনিংহামের সময়ে স্থানটি বনপ্রদেশ ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—

* বৌদ্ধশাস্ত্রে ‘দেবদত্ত’ শাক্যসিংহের ভ্রাতা ও প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

“The মৃগদাব is represented by a wood which still covers an area of about half a mile and extends from the great tower Dhamek to (‘howkhandy.’) এই দুই স্থান সংলগ্ন করিয়া গবর্ণমেন্ট এখন একটি বিস্তীর্ণ পাকা রাস্তা করিয়া দিয়াছেন। বন আর নাই।

বৌদ্ধপ্রভাবের সঙ্গে এই অধিপত্তন মৃগদাবও লুপ্ত হইয়াছিল। বিগত কীর্তির চিহ্ন স্বরূপ তিনটি শুষ্ক হৃদ-বেষ্টিত ভূত্যাগে মিশরের মরুভূমিস্থ বিখ্যাত স্ফিন্জের (Sphinx.) মত একাকী দণ্ডায়মান প্রসিদ্ধ ‘ধামেক’ স্তূপমাত্র অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। এই ধামেক হইতে অর্ধ মাইল ব্যবধানে ‘চৌখণ্ডী’ নামে অল্প একটি স্তূপের ভগ্নাবশেষ অতীতের দ্বিতীয় সাক্ষী। অতীতের সাক্ষীই বা বলি কি প্রকারে? ইহারা এত কাল অতীত স্মরণ করাইয়া দিত, বলিতে পারি না। তাহাই যদি হইবে, তবে ঐ স্থানের নামান্তর ঘটত না। বর্তমান নাম ‘সারনাথ’ সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ভগ্নাবশেষের দক্ষিণে একটি টিলার উপরস্থিত সারনাথ নামক শিবমন্দির হইতে লব্ধ। এই হিন্দু মন্দিরটি খুব পুরাতন নহে। সম্ভবতঃ যেরূপ অত্যাগ স্থানে বৌদ্ধস্তূপের উপর হিন্দু মন্দিরাদি কীর্তিচিহ্ন নির্মিত হইয়াছিল, ইহাও তাহার এক নিদর্শন। জরাসন্ধ নির্মিত মূর্তির দুর্গের প্রস্তর সমূহে বৌদ্ধ-চিহ্ন দেখিয়াছি। শুনিয়াছি পরে ইহাই শাহসুজা দুর্গরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরও বোধ হয় এই শ্রেণীর। জৈনেরাও অবসর পাইয়া ধামেক স্তূপের নিকট পার্শ্ব-নাথের এক মন্দির নির্মাণ করিয়াছিল, অত্যাগ তাহা বর্তমান রহিয়াছে। সারনাথ নামের সম্ভবতঃ এই প্রকারেই উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কনিংহাম সাহেব একটি কষ্ট কল্পনা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি বলেন “সারনাথ” শব্দটি ‘সারঙ্গনাথ’ এই শব্দের অপভ্রংশ। ‘সারঙ্গ’ মৃগের একটি নাম। অতএব উপরি লিখিত জাতক কথাটিই এই নামে স্মৃতিত

হইতেছে। বর্তমান সারনাথ মন্দিরের সম্মুখের শুষ্ক হ্রদটির নাম এখনও “সারস্ফালাও।” “ফালাও” শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র হ্রদ।

বুদ্ধদেবের সময় এই সারনাথ ধর্ম্মের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। নতুবা তিনি তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রবর্তন করিতে এখানে আসিতেন না, বা তাঁহার পঞ্চ শিষ্যও এই স্থানে আসিয়া ধর্ম্ম জীবন লাভের চেষ্টা দেখিতেন না। স্থানটি ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু ধার্ম্মিক লোকের স্থান ছিল বলিয়াই উহার অবিপত্তন নাম হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের সময় স্থানটির অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু, বুদ্ধদেবের পদরঞ্জে পবিত্রীকৃত হওয়ার পর স্থানটি বৌদ্ধ ধর্ম্মের পীঠস্থান হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উত্তর কালে এই বিস্তৃত ভূভাগ সংঘারাম, মঠ, স্তূপ, স্মৃতিস্তম্ভ, মন্দির ও বিহার ইত্যাদি নানাবিধ অট্টালিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়া সুদূর বিদেশ হইতে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকর্ষণ করিত। এই সমৃদ্ধির চিত্র এখন কল্পনাবলে মানসপটে আঁকিয়া সাযুজ্য লাভ করা ছাড়া আর গতাস্তর নাই।

সারনাথে ১৯০৫ সন হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন ক্রিয়া রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে। খনন কার্যের দ্বারা বৌদ্ধ কীর্ত্তিকাহিনী অনেক উন্মোচিত হইয়াছে কিন্তু সেই গত কালের সুস্পষ্ট চিত্র এখনও ভাল করিয়া আঁকিবার উপকরণ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় নাই। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা চেলুসিংহের দেওয়ান জগৎসিংহ বারাণসী ধামে তাঁহারই নামে প্রসিদ্ধ জগৎগঙ্গ মহাশয় নির্মাণ করিবার জন্য সারনাথের একটি বৌদ্ধ স্তূপ খনন করিয়া ইষ্টক ও প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। লোকে সারনাথের ভগ্নাবশেষকে আর ভীর্ণভূমি বলিয়া মনে করিত না। শ্রদ্ধাশূন্য না হইলে এক জন হিন্দু রাজ-মন্ত্রী এইরূপে ধর্ম্ম মন্দিরের চিহ্ন লুপ্ত করিবার প্রয়াস পাইতেন না। পরে যে খ্রীষ্টান ইংরাজ আসিয়া এই সকল ভগ্নাবশেষ হইতে কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর ও দেবমূর্ত্তি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বরুণার সেতু নির্মাণ করিবার জন্য মালমসলারূপে

ব্যবহার করিয়াছিলেন, জগৎসিংহের অপকীর্ত্তির পর তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার আর কোনই কারণ নাই। এরূপ বর্ষরতার উদাহরণ ইতিহাসে অনেক আছে; ভারতবর্ষেও থাকিবে, বিচিত্র কি?

জগৎসিংহের খনন-কার্য্যে প্রথমতঃ কর্ত্তৃপক্ষের এই স্থানে ঐতিহাসিক অন্বেষণ করিবার স্পৃহা হয়। তৎকালীন বেনারসের এজেন্ট Jonathan Duncan সাহেব এই স্থানে ঐতিহাসিক অন্বেষণের জন্য কিঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শীঘ্রই বদলী হইয়া যাওয়ার আর কিছু করা হয় নাই। যাহা হউক, সারনাথে যে বৌদ্ধকীর্ত্তি প্রোথিত আছে, তাহাতে সভ্য জগতের বিশেষ ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা এক জন ইংরেজ রমণীকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য। এই রমণী Miss Emma Roberts; ইনি ১৮৩৩ সালে এই স্থান পরিদর্শন করিয়া ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে General Cunningham গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই স্থানে কিছু খনন-কার্য্য করেন ও কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে যথাক্রমে Major Kittoe (Benares Queen's College নির্মাণ ভার প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার) E. Thomas (বেনারসের জজ) Dr. F. Hall (Queen's College-র অধ্যাপক) মাঝে মাঝে খনন করিয়া খনিত প্রদেশ হইতে লব্ধ প্রস্তরাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। প্রাপ্ত মূর্ত্তি ইত্যাদি কতক কলিকাতা মিউজিয়মে, কতক Lucknow Museum এ, কতক Queen's College-এ যেন তেন প্রকারে রক্ষিত হয়। এপর্য্যন্ত কোন বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে সারনাথের তথ্যানুসন্ধান হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। উপরি উক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মেজর কিটোর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন, এবং তিনি যে সকল তথ্যানুসন্ধান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কাগজ পত্র কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। Major Kittoe Cunningham সাহেবকে বহুবিধ সাহায্য করিয়া-ছিলেন।

প্রতিভা ।

১৩১৯ আশাঢ় ।



পুরাতন মিউজিয়াম ।



নূতন মিউজিয়াম ।

•

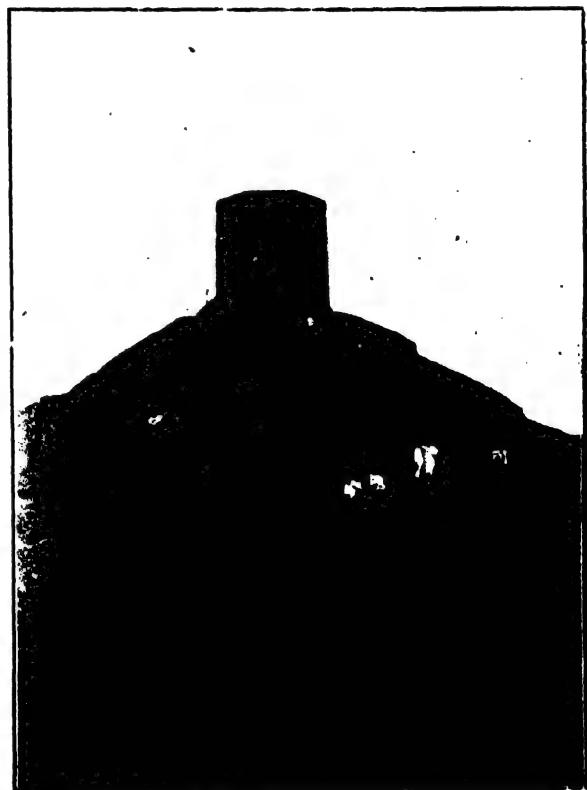
- - - - -



সারনাথ ।



ধামেকস্তূপ ।



চৌখণ্ডি ।

আমাদের ভূতপূর্ব বড়গাট লড' কার্জন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক কীর্তি স্মৃতির সংরক্ষণ ও সংস্কার করে ত্রতী হইয়া সারনাথের রীতিমত খনন-কার্যের ব্যবস্থা করেন। ১৯০১ হইতে এই কার্য রীতিমত Director General of Archaeologyর আপন তত্ত্বাবধানে চলিয়াছে। লড' কার্জনের অল্পমত্যসূত্রে একটি ছোট মিউজিয়ম তৈয়ারী হইয়াছিল। তাহাতে ইতস্ততঃ রক্ষিত সমস্ত কীর্তিচিহ্ন-গুলি একত্রিত করা হইয়াছিল। এক্ষণে প্রায় লক্ষ মূর্তি ব্যয়ে, খনিত স্থানের সন্নিকটেই, একটি বৃহৎ মিউজিয়ম নির্মিত হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে রক্ষিত সারনাথের প্রস্তর মূর্তি ইত্যাদি এখন এইখানে সুরক্ষা কক্ষচারীর সাহায্যে বিধিমত রক্ষিত হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এখনও মিউজিয়মে এই কার্য চলিতেছে। আশা করা যায় ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের জন্য শীঘ্রই এই মিউজিয়ম একটি কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে।

সারনাথের প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু বিখ্যাত ধামেক স্তূপ। B. N. W. Ry, হইয়া কালী গমন কালীন সারনাথ ষ্টেশনের নিকটবর্তী হইলে, দূর হইতে মনে হয় যেন মুণ্ডিতমস্তক একটি বিশাল জীব দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই স্তূপের উপরি ভাগ ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ইষ্টকগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহার নিম্নতলের চারি দিকের পরিধি ২২২ ফিট, উচ্চতা ১১০ ফিট, ব্যাস পরিমাণ ৯৩ ফুট। ৪৩ ফুট উচ্চ পর্যন্ত চূনার প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। প্রস্তরগুলি আবার লৌহ কড়া দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ। উপরি ভাগ ইষ্টক নির্মিত, সম্ভবতঃ কোনরূপ পলস্তর করা ছিল। সম্ভবতঃ শিখর-দেশ প্রস্তরের ছত্রের দ্বারা শোভিত ছিল। ভূমি হইতে ২৪ ফিট উচ্চে স্তূপের চারিদিকে ৫½ ফিট চওড়া কারুকার্যময় ৮টি ফলক বর্তমান রহিয়াছে। দক্ষিণদিকের কতক প্রস্তর-গ্রন্থি আর নাই। এখনও প্রস্তরে খোদিত চিত্রগুলি অবধান করিয়া দেখিলে, পুরাকালের সৌন্দর্য-জ্ঞানের অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এই ফলক তিন ভাগে বিভক্ত।

উপর দিকের প্রথম অংশে নানারূপ জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কণ আছে, যথাস্থলে যুগলসমূহ, তন্মিমে নানা প্রকার ফুলের ছবি। দক্ষিণ দিকের ছবির মধ্যে একটি চক্রবাক মিথুন খুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে। উত্তর পশ্চিম কোণে সছিদ্র দুইটি ধাপের বন্দোবস্ত দেখিয়া বোধ হয় যে, পতাকা দিয়াও এই স্তূপের শোভা বর্ধন করা হইত। প্রত্যেক ফলকের অধোদেশে একটি কুলুঙ্গী বর্তমান আছে। কাণিংহাম সাহেব ৮টি ফলক, এবং ৮টি কুলুঙ্গীই দেখিয়াছিলেন। এখন দক্ষিণ দিকের খানিকটা প্রস্তর গ্রন্থি বর্তমান না থাকায় পাঁচটি মাত্র কুলুঙ্গী দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই কুলুঙ্গীগুলিতে বৌদ্ধমূর্তি রক্ষিত হইত। উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমাংশের প্রস্তর গ্রন্থিগুলি সরকার বাহাদুর কর্তৃক সেরামত হইয়াছে। জগৎসিংহ এই ধামেক স্তূপের নিরাংশেও কিছু স্থান ভগ্ন করিয়াছিলেন।

কানিংহাম সাহেব এই ধামেক স্তূপের অভ্যন্তরে কোনরূপ ভগ্নাধার প্রাপ্তি আছে কি না দেখিবার জন্য উপরি ভাগ হইতে ইহা খনন করান। উপর হইতে ১০½ ফুট খনন করিয়া, তিনি একটি খোদিত-লিপি বিধিষ্ট প্রস্তরফলক ছাড়া আর কিছু পান নাই। ঐ প্রস্তর ফলকে “যে ধর্মহেতু প্রভবা” ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের এসিদ্ধ শ্লোকটি খোদিত ছিল। ইহা হইতে ঐতিহাসিক কোন তথ্য জানা যায় নাই।

এই ধামেক স্তূপের নির্মাণকাল সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদগণের সাধারণ মত এই যে, ইহা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে, গুপ্ত রাজাদিগের প্রাধান্য সময়ে গঠিত হইয়াছিল। হাট্টার সাহেব ধামেক সম্বন্ধে বলেন যে, এই স্তূপটি অশোক কর্তৃক নিৰ্মিত হয়। ইহা সম্ভবতঃ ভুল। তিনি আরও বলেন যে, বুদ্ধদেব যে স্থানে বসিয়া তাঁহার ধর্ম প্রথম শিক্ষা দেন, ইহারই স্মৃতিচিহ্ন এই ধামেক স্তূপ। ইহাও কোন বিশেষ প্রমাণ নাই।

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিয়ংসিয়াং ভারত ভ্রমণে আসিয়া সারনাথ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত অন্যান্য স্থানের বিবরণ মধ্যে

সাতনাথেরওবিশেষ বিবরণ আছে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, সমগ্র কাশীতে ৩০টি বিহার ও ৩০০০ শ্রমণ দেখিয়াছিলেন। মৃগদাবের বিহারগুলি প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। তন্মধ্যে ১৫০০ শ্রমণ বাস করিত। তিনি বলেন, এই মৃগদাবের বিহার সমূহের মধ্যে শত শত স্তম্ভস্তম্ভ ও স্তূপ, বর্তমান ছিল। তন্মধ্যে তিনি কয়েকটির বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি ২টি বৃহৎ অশোক স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম অশোক স্তূপটি ১০০ ফুট উচ্চ। ইহার সম্মুখেই সবুজ রংএর প্রস্তর নির্মিত কাচের মত স্বচ্ছগাত্র একটি স্তম্ভও বর্তমান ছিল। হিয়ংসিয়াংএরং বর্ণনা হইতে ঠিক বুঝা যায় না যে, মৃগদাবেই এই স্তূপ ও স্তম্ভ অবস্থিত ছিল; বরং মনে হয় কাশীর অন্য কোনও স্থানে এগুলি বর্তমান ছিল। ধামেক স্তূপটিই যে হিয়ংসিয়াং কথিত স্তূপ তাহা প্রমাণ হয় না। ধামেকের নিকট কোন স্থানে এখনও উপরি লিখিত বর্ণনামুযায়ী কোন স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয় নাই।

হিয়ংসিয়াং আর একটি স্তূপ ও স্তম্ভের কথা বলিয়াছেন। তিনি এই স্তূপটিকে জীর্ণ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তখন ভগ্নাবস্থাতেও ইহা ১০০ ফিট উচ্চ ছিল (অভগ্নাবস্থায় ৩০০ ফিট উচ্চ হইতে পারে এইরূপ তিনি অনুমান করিয়াছেন)। ইহারও নিকটে ৭০ ফিট উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভ বর্তমান ছিল। ধামেকের অতি সন্নিকটে কোন স্তম্ভ নাই পূর্বেই বলিয়াছি। ধামেক স্তূপ হইতে অনেক পশ্চিমে প্রায় ৬০০।৭০০ ফিট অন্তরে একটি অশোকস্তম্ভ বাহির হইয়াছে। ইহার বিষয় পরে লিখিতেছি। হিয়ংসিয়াং এতগুলি স্তূপের কথা বলিয়াছেন যে, বর্তমান ভগ্নাবশেষের মধ্যে তাহার স্থান নির্ণয় করা সুকঠিন। ধামেক স্তূপ কোন বিষয়ের স্মৃতিচিহ্ন তাহা জানিবার উপায় নাই। যে প্রস্তর ফলকের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতে কিছুই জানা যায় না।

‘ধামেক’ নামটির অর্থ কি? অবশ্য অজ্ঞলোকে এই নামটি প্রদান করিয়াছে। এই স্তূপের বিষয় অনেক আজওবি পত্রও প্রচলিত আছে। কানিংহাম সাহেব

নামটির আদি অনুমান করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, “ধর্মোপদেশক” এই শব্দ, অপভ্রংশ হইয়া ‘ধামেক’ এই সহজ কথার পরিণত হইয়াছে। (ধর্মোপদেশক—ধর্ম-দেশক—ধমদেক—ধামেক-)।

অশোক স্তম্ভটি সারনাথ ভগ্নাবশেষের সমস্ত ঐষ্টবোর মধ্যে প্রধান দর্শনীয় বস্তু। কারণ কালের গতিও ইহার মন্থন স্বচ্ছ গাত্র কোনরূপে মলিন করিতে পারে নাই। হৃৎকথের বিষয় এই সুন্দর স্তম্ভটি ভগ্ন হইয়া কয়েক খণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এক অংশ এখনও বধ্যস্থানে মুক্তিকাতে প্রোথিত রহিয়াছে। ভগ্ন খণ্ডগুলি পার্শ্বেই স্থাপিত রহিয়াছে। কিন্তু স্তম্ভের শিরে যে অংশে চারিটা সিংহ ছিল, তাহা এখন নূতন বৃহৎ স্মিউলিয়মে প্রস্তর বেদিকার উপর স্থাপিত হইয়াছে। ইহা দেখিবার সামগ্রী। খেতাব প্রস্তর দ্বারা নির্মিত চারিটি সিংহ একটি বেদিকার উপর চারি দিকে মুখ রাখিয়া বসিয়া আছে। বেদিকার চারি গায়ে বৃষ, অশ্ব, সিংহ ও গজ মূর্তি খোদিত রহিয়াছে, ও এক একটি প্রক্ষুটিত পুষ্প প্রত্যেক মূর্তিকে পৃথক করিয়া উহাদের সম্যক শোভা বর্ধন করিতেছে। হিয়ংসিয়াং বলেন, এই স্তম্ভের নিকটেই অজ্ঞাত কুণ্ডিন্যাদি পক্ষ শিষ্য তপস্তায় বসিয়াছিলেন। এই স্তম্ভের কাল নির্ণয় অতি সহজেই সম্পন্ন হইয়াছে; কারণ ইহার উপর অশোকের খোদিত লিপি রহিয়াছে; সুতরাং ইহার নির্মাণ সময় খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইবে।

অশোক খ্রীঃ পূঃ ২৩০ হইতে ২৩২ সন পর্যন্ত রাজত্ব করেন। খ্রীঃ পূঃ ২৪০ হইতে ২৩২ সনের মধ্যে কোন সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে তিনি পাটলিপুত্র নগরে বৌদ্ধ সম্মেলনের একটি বৃহত্তী সভা আহ্বান করেন। ইহাতে বৌদ্ধ ধর্মের স্থায়িত্ব কল্পে অনেক নিয়মাদি স্থিরীকৃত হয়। ধর্ম-সংঘের একত্র যাহাতে রক্ষিত হয় তজ্জন্ত রাজা অশোক ধর্ম একটি ঘোষণা প্রচার করেন। সারনাথের অশোক স্তম্ভে এইরূপ একটি ঘোষণাই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। লিপিটির ভাবার্থ এই যে “যদি কোন শ্রমণ বা শ্রমণী ধর্মসংঘের

মধ্যে বিবাদ বা কোনরূপ দলাদলি উপস্থিত করে, তবে তাহাকে খেত বস্ত্র পরিধান করাইয়া (অর্থাৎ তাহার সন্ন্যাস বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া) আশ্রমবহির্ভূত করিয়া দেওয়া হইবে। রাজার এই আজ্ঞা তাঁহার রাজ্যস্থ সমস্ত কর্মচারিবর্গের নিকট প্রেরিত হইল, রাজ্যস্থ সকল স্থানে এই আজ্ঞা ঘোষিত হইবার বন্দোবস্ত তাহার করিবেন।*

এই অশোকস্তম্ভ যে স্থানে বিদ্যমান, তাহার নিকটেই বৌদ্ধ বিহারটির ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছে। খনন কার্য সম্পূর্ণ হইলে পর এই বিহারের আরতন সম্বন্ধে সম্যক্ জান লাভ হইবে। এখনও খনন-ক্রিয়া চলিতেছে ও প্রত্যেক বৎসরই নূতন কিছু বাহির হইতেছে।

হিয়ংসিয়াং লিখিয়াছেন যে, সারনাথে প্রাচীর বেষ্টনের ভিতরে আট ভাগে বিভক্ত বিহার বর্তমান ছিল, এবং তথায় ২০০ ফিট উচ্চ একটি প্রস্তর নির্মিত মন্দির ছিল। উপরে ১০০ টি কুম্ভী বর্তমান ছিল। এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছে। কল্পনা করুন যে মধ্য স্থলে প্রকাণ্ড এক চত্বরভূমি, চতুঃপার্শ্বে শ্রমণদিগের বাসো-পযোগী ছোট ছোট কামরা। উত্তর দিকে উচ্চ মন্দির দণ্ডায়মান। চত্বরের এক প্রান্তে একটি কূপ এখনও দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ধামেকের পশ্চিমে অতি সন্নিকটেই কতকগুলি গৃহ-বশেষ বাহির হইয়াছে। মনে হয় যেন পূর্বোক্ত মন্দির হইতে ধমেক পর্যন্ত গৃহশ্রেণী বিস্তৃত ছিল। এই স্থানটিতে যে বৃহৎ একটি বিহার ছিল, খনিত গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হয়। ভবিষ্যতে খনন-কার্য আরও অগ্রসর হইলে স্থানটির পূর্ণ চিত্র উদ্ধার করা যাইতে পারে এরূপ আশা করা যায়।

উপরি লিখিত ভগ্নাবশেষের আরও একটু উত্তরে গুরু হদের পার্শ্বে Major Kittoe একটি স্তূপের স্থান নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উপরেই বলিয়াছি Major

Kittoe র অকাল মৃত্যুতে তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যগুলি আমরা পাই নাই।

হিয়ংসিয়াং এই হ্রদগুলির পার্শ্বে অনেক স্তূপ ও স্থতি-চিহ্নের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই সকলের কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে, আশা করা যায়। অশোক স্তম্ভের দক্ষিণে নামেক হইতে ৫২৬ ফিট পশ্চিমে, আধুনিক ফোরারার নীচে নির্মিত চৌবাচ্চার মত একটি বৃহৎ বৃত্তাকার গর্ভ দেখা যায়। ইহার উপর যে একটি স্তূপ বর্তমান ছিল তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই। এই স্তূপটিই জগৎসিংহ কর্তৃক ভগ্ন হইয়াছিল।

কানিংহাম সাহেব এই স্তূপের ভগ্নাবশেষের ভিতরও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি ইহার মধ্য হইতে একটি প্রস্তর পেটিকা ভিন্ন আর কিছুই পান নাই। এই পেটিকার ভিতর মার্কেল প্রস্তর নির্মিত দ্বিতীয় আর একটি পেটিকা ছিল। তন্মধ্যে ৪০।৪৫টি মুক্তা, ১০টি চুনী, ৮টি রোপের ও ৯টি স্বর্ণের কুণ্ডল ও তিন খণ্ড বাহ প্রদেশের অস্থি পাওয়া গিয়াছিল। জগৎসিংহ দ্বারা খনিত হইবার সময় একটি বৃহৎ মূর্তিও অন্যান্য প্রস্তর সহ জগৎগঞ্জে নীত হইয়া ছিল।

মেজর Kittoe পরে বহু আরামে ইহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। মূর্তিটিতে একটি খোদিত লিপি ছিল, ও এই খোদিত লিপি হইতে একটি ঐতিহাসিক সময় নিরূপণের সহায়তা হইয়াছে।

লিপিটির মর্মার্থ এই যে, “গৌড়ের রাজা মহীপাল ভগবান্ বুদ্ধদেবের চরণ কমল পূজা করিয়া বারাণসীতে শত শত ধর্মমন্দির স্থাপিত করিয়াছেন। ত্রিহিরপাল এবং তাহার অন্তঃকৃত্রিম সন্তপাল ধর্মের পুনঃ স্থাপন করিয়া এই স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিলেন।” তারিখ দেওয়া আছে ১০৮৩ সংবৎ। অতএব ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে মহীপাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং বারাণসী পর্যন্ত তাঁহার ক্রমতা বিস্তৃত হইয়াছিল।

কানিংহাম সাহেব এই স্থানের ভিত্তিভূমি পরীক্ষা করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন

* সঁচি ও এলাহাবাদস্থ অশোক স্তম্ভেও এই ঘোষণা লিপি মুদ্রিত রহিয়াছে।

যে হিরণ্যপাল ও বসন্তপাল নূতন কোন স্তূপ স্থাপন করেন নাই, বরং পুরাতন জীর্ণ স্তূপের সংস্কার সাধন করিয়া নিজের ধর্মপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ধর্মেক স্তূপের দক্ষিণ দিকে প্রায় অর্ধ মাইল ব্যবধানে “চৌখণ্ডী” বর্তমান। এই চৌখণ্ডী একটি অষ্ট কোণাকৃতি স্তূতিগৃহ। ইহা আকবর কর্তৃক ১৫৮৮ খ্রিঃ নির্মিত হইয়াছিল। গৃহগাত্র খোদিত আরবী লিপি হইতে ইহা জানা গিয়াছে। হুমায়ুন কোন সময়ে এখানে আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। পিতৃতত্ত্ব পুত্র আকবর তাহারই স্তূতিচিত্তুরূপ এই স্তূতিগৃহ নির্মাণ করাইয়া গিয়াছেন। অষ্টকোণ সমন্বিত হইয়াও ইহা অজ লোক কর্তৃক চৌখণ্ডী অর্থাৎ চতুষ্কোণ গৃহ নামে অভিহিত হইয়াছে।

এই স্তূতিগৃহটিই চৌখণ্ডীর প্রধান আকর্ষণ নহে। আমাদের নিকট ইহার বিশেষত্ব এই যে এই স্তূতিগৃহ একটি বৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষের উপর নির্মিত। রাশীকৃত জীর্ণ ইষ্টকের একটি ক্ষুদ্র পাহাড় কল্পনা করুন। উচ্চতা ৭৪ ফুট; তদুপরি আকবর নির্মিত গৃহটি উচ্চতা আরও ২৬ ফুট ৮ ইঞ্চি বাড়াইয়া দিয়াছে। কানিংহাম সাহেব এই ভগ্নাবশেষের ভিতরও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই পান নাই।

এই স্তূপটি ধামেক হইতেও বহু পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। একবার সারনাথভীর্থকাসী জনৈক সংহলা শ্রমণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনিও এই কথা বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ হিরণ্যসিঙ্গ অশোক নির্মিত ৩০০ ফুট উচ্চ যে বৃহৎ স্তূপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই এই। Sherring সাহেবেরও এই মত।

এই চৌখণ্ডী স্তূপের আর একটি নামান্তর তৎপ্রদেশে প্রচলিত আছে। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে “লোরি কা কুদান” বলে। লোরি নামে একজন আত্মীয় ছিল। এই আত্মীয় পুত্রব চৌখণ্ডিতে বাস করিতেন ও আকাশপথে ধামেক পর্যন্ত বিচরণ করিতেন, ইত্যাদি। “কুদান” শব্দের অর্থ লক্ষ।

এবং দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। এখন সার নাথের ধ্বংস সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ষাটশ শতাব্দী পর্যন্ত সারনাথে বৌদ্ধদিগের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। উপরে বলা হইয়াছে, একাদশ শতাব্দীতে মহীপালের সময়ে সারনাথের কোন স্তূপ সংস্কৃত হইয়াছিল। তখনও ইহা বৌদ্ধদিগের কেন্দ্রস্থল ছিল। হিরণ্যসিঙ্গের বর্ণনা পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, তখন এই স্থান অতিশয় সমৃদ্ধ ছিল। ফা হিয়ান সাংনাথ দর্শন করিয়া যে, বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও এই ভীর্থস্থানের বিশেষ মহিমা অবগত হওয়া যায়। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষাটশ শতাব্দীর পর এই বহুজনসঙ্কুল বহু মঠমন্দিরসম্বলিত পুণ্যভূমির আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। একবারে যেন পৃথিবী হইতে ইহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই পুণ্যভূমির অকাললোপসাধন সম্ভবতঃ অত্যন্ত বর্বরতার সহিত সাধিত হইয়াছিল। ভগ্নাবশেষের মধ্যে যে সব বস্তু পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া বোধ হয় অহঙ্কারক্ষীত বিশ্বাসী প্রবল বেগে অতর্কিত ভাবে ইহার উপর পতিত হইয়া অগ্নি ও তলবারি সহযোগে ইহার বিনাশ সাধন করিয়াছিল।

কানিংহাম সাহেব বলেন, শত শত প্রস্তর মূর্তি, পলায়নপর শ্রমণদিগের দ্বারা এক স্থানে প্রোথিত দেখা যায়। স্থানে স্থানে রাশি রাশি ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। Major Kittoe বলেন, কি শ্রমণ, কি মন্দির, কি দেবদেবীর মূর্তি সব চূর্ণিত, বিধ্বস্ত ও দগ্ধ হইয়াছিল। স্থানে স্থানে দগ্ধ অস্থি, লোহ, কাঠ ও প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। আবিষ্কৃত বিহারের কোন কোন কক্ষগুলিতে দগ্ধ ক্রটি ও ডাল, ত্র্যবীভূত ধাতুপাত্র, প্রাত্যহিক জীবনোপযোগী মৃৎপাত্র ও অজ্ঞাত বস্তু এক সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। যেন হয় যেন মঠবাসী কেবল অন্ন পাক আরুণ্ড করিয়াছে, এমন সময়ে শত্রু আগমনে প্রাণতরে পলাইতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পলায়নও সহজসাধ্য হয় না। কারণ আবিষ্কৃত দগ্ধ অস্থিও সকল পলায়নের বিকল চেষ্টা

প্রমাণ দিতেছে। অগ্নিসংযোগের অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইটকের মধ্যবর্তী সিমেন্ট দড় হইয়া ইটকের সমান কঠিনও প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপ সলৌহ কড়ি বরণার অংশও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইটক, প্রস্তর, কাঁট লৌহ-শলাকা, পাত্ৰাদি বহুবিধ বস্তু সম্বলিত রাসীকৃত মৃত্তিকার আবর্জনা ঘরের মেঝে হইতে ৬ ফিট পর্যন্ত ভূপাকারে পড়িয়া ছিল। মোট কথা, এই সকল দেখিলে ইলাই প্রমাণিত হয় যে ধর্মেশ্বরী বৈরী ভিন্ন একরূপ নিষ্ঠুর ভাবে ধর্ম মন্দির নষ্ট করা আর কাহার কার্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। উপরিলিখিত দৃষ্ট জিনিষের কিছু ২ মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। এখন ঐ সকল কক্ষ অবশ্য পরিষ্কৃত হইয়াছে। বাহারা প্রথমে ঐ সকল যথাযথ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন তাঁহাদেরই উক্তি উপরে লিখিত হইল।

কোন সময়ে এই বর্ধরতাজাপক ধ্বংসকার্য সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সঠিক অবধারিত হয় নাই। তবে ১২০২ সনের Benares Gazetteer এ যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আপাততঃ প্রামাণ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। গেজেটের সম্পাদকের মতে, ষোড়শ শতাব্দীতে এই বৌদ্ধ বিহার অতিশয় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ১১২৪ খ্রীঃ অব্দে সহাবুদীন খোরি প্রেরিত কুতুবুদ্দিন ও তাঁহার সেনাপতিদিগের বিজয় অভিযানের ফলে সারনাথ এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল।

এই অজুমান ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে পারে। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি ১১২৩ খ্রীঃ অব্দে বিহার নামক স্থানে অবস্থিত পাল রাজ্যদিগের একটি দুর্গ ধ্বংস করেন। ঐ স্থানে বৌদ্ধ মন্দিরাদি চূর্ণিত হয়, ও সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু নির্দয় রূপে হত হয়। ধ্বংস ব্যাপার একরূপ ভীষণ ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল যে, সেনাপতি মন্দিরগুলিতে প্রবেশ করিয়া রাশি রাশি গ্রন্থ দেখিয়া, সে সকল গ্রন্থ কিসের তাহা জামিনার জন্য একটি লোকও খুঁজিয়া পাইলেন না। এই ধ্বংসনিপুণ

সেনাপতি বৌদ্ধদিগের নিপাতসাধনের জন্য এতই বদ্ধপরিকর ছিলেন যে বৌদ্ধভূমি যগণের অভ্যন্তর স্থানেও তিনি এইরূপ করিয়া বেহার হইতে বৌদ্ধ ধর্ম লোপ করিয়াছিলেন। যে দুই একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিল তাহারা মেনাল বা দক্ষিণ ভারতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। এই কুতুবুদ্দিন বাহিনীই পর বৎসরে বঙ্গ জয় করে।

বঙ্গ বিজয়ের বৎসরেই অর্থাৎ ১১২৪ অব্দে কুতুবুদ্দিনের সৈন্যদল কাণ্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্র রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করে। তৎকালে বারাণসী এই জয়চন্দ্রের অধীন ছিল—তথায় তাঁহার দুর্গও ছিল। ইহাও শত্রুর হস্তগত হইয়াছিল। Meadows Taylor বলেন বারাণসী জয় করিতে স্বয়ং সাহাবুদ্দিন বোরীও উপস্থিত ছিলেন ও তাঁহার আদেশে তথাকার মন্দিরাদির ধ্বংসও এই সময়েই সংসাধিত হইয়াছিল।

ত্রিআন্তোভাব চট্টোপাধ্যায়

ভাটিয়াল গান। *

ভাটিয়াল গানগুলি পূর্ববঙ্গের নিজস্ব জিনিস। গ্রাম্য কবিরা এই ভাটিয়াল সুর অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের প্রাণের সরল কবিত্ব মাথা তাকগুলি অতি মর্মস্পর্শিনী ভাবায় প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের পথে প্রান্তরে, পল্লীতে পল্লীতে, খাল বিলে, নদী নালায় কৃষক ও নাবিকের কণ্ঠে কণ্ঠে এই গানগুলি বিচিত্র ভাবে দিবানিশি গীত হইয়া থাকে। সন্ধ্যার আগমনে প্রকৃত্তি দেবী স্বপ্নম তিমিরাবগুষ্ঠনে মুখকমল আবরিত করেন, এবং নৌকার মাঝিরা মধুর ভাবে দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে বানব হৃদয়ের বিবিধ সুখদুঃখ মাথা এই গানগুলি সুমিষ্ট ভাটিয়াল সুরে গাহিয়া গাহিয়া চলিয়া যায়, তখন নদীর উত্তর কূলে সুধাধারা বর্ষিত হইতে থাকে এবং

শ্রোতার মন কেমন এক রকম উদাস ভাবে ডুবিয়া যায়।

এই বিশেষ সুরের আবিষ্কার কে তাহা জানা যায় না। তবে সাধারণতঃ নৌকা যখন ভাটি চলিতে থাকে তখনই এই সকল গান গাওয়া হয় বলিয়া হয়ত এই সুরের “ভাটিয়াল রাগিনী” নাম হইয়াছে। ভাটি ছাড়িয়া দিলে নৌকা পরিচালনে যাবিদিগের অধঃ মনোযোগ ও বিশেষ পরিশ্রমের প্রয়োজন থাকে না। তখন তাহারাই এই ক্লাস্তিহরা রাগিনীতে মনের আনন্দে গান গাহিয়া থাকে। ভাটি অঞ্চলে—বরিশাল প্রভৃতি জেলায়—এই সুর আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া এই প্রকার নাম করণ হইয়াছে কিনা, তাহাও বিবেচ্য।

“বেহাগ,” “ভৈরবী” বা “বাগেশ্রী” বলিলে যেমন উক্ত নামধের ভিন্ন ভিন্ন রাগিনীর বোধ হয়, “ভাটিয়াল রাগিনী” বলিলেও তদ্রূপ অন্য আর একটি রাগিনী বুঝায়। তবে আধুনিক বলিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার নাম নাই।

কোন নির্দিষ্ট রাগিনীর সকল গানগুলিই যে শুনিতে অবিকল এক রকম হইবে এমন কোন কথা নাই। সা, রি, গা, মা প্রভৃতি স্বরমালাযুক্ত রাগিনীর বিভিন্ন অংশসমূহের বিভ্রাস ও ঐ সকল সুরের স্থানিষ সম্বন্ধে এমন সকল কোশল প্রয়োগ করার রীতি আছে যে, মূল রাগিনীটি বজায় রাখিয়াও উহার আকৃতিতে বহু বিভিন্নতা সম্পাদন করা যায়। এ যেন ঠিক কোন একজন লোকের শোয়া, বসা, দাঁড়ান বা অন্য কোনও অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন ‘ফটো’। পরিচিত ব্যক্তির, অঙ্গ-বিভ্রাসের ব্যতিক্রম সম্বন্ধে উহার প্রত্যেকটি ফটো দেখিবারাত্রই যেমন লোকটিকে অনায়াসে চিনিতে পারেন, সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণও সেইরূপ শ্রুতমাত্রই কোন একটি বিশেষ রাগিনীর বিভিন্ন আকারের গানগুলিকে সেই রাগিনীর বলিয়া বুঝিতে পারেন :

সুতরাং “ভাটিয়াল রাগিনীর” বাৎস্তীয় গানই যে ঠিক এক নির্দিষ্ট আকারের হয় তাহা নহে। এই

রাগিনীর সুরবিভ্রাসে যে একটি বিশেষত্ব আছে, তাহা হইতেই অভিজ্ঞ ব্যক্তির গানটি শুনিতেই ইহার বর্ণ নির্ণয় করিতে পারেন।

কিন্তু “বেহাগ” “ভৈরবী” “বাগেশ্রী” প্রভৃতি, রাগিনীর বৈরূপ আভিজাত্যের পারিপাট্য—উহার যাহাতে বর্ণসম্বন্ধ দোষে ছুটা না হয় সেদিকে কলাবৎ-দিগের যেমন কঠোর দৃষ্টি—“ভাটিয়াল” সম্বন্ধে তেমন কিছুই নাই। ইহার কারণ কলাবৎ-কুল ইহাকে আদর করেন না। ইহা হতাদরে সুরের পল্লীর মাঠে প্রান্তরেই পড়িয়া আছে। তবে আজকাল গ্রাম্যোপকোণ প্রসাদাৎ নগরেও ইহার করুণ কাকলী শুনা যায় বটে। ভাটিয়াল রাগিনীতে হয় ত অন্য রাগিনীর সুর বেমানাম মিশিয়া আছে। এরূপ মিশ্রণ সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে নিন্দনীয়। যদিও “বেহাগ-খাম্বাজ,” “সিদ্ধভৈরবী,” “ইমন-কল্যাণ” প্রভৃতি মিশ্র রাগিনীর বহু গান বিস্তারিত তবুও ইহা জটিল যে ঐ সকল স্থলে রাগিনীগুলি যেন পরস্পর কোলাকুলি, পক্ষাগলি করিয়া আছে; কোথাও উহাদের মধ্যে “রাসারম্বিক” সংযোগ হইয়া আত্মবিলোপ ঘটে নাই।

যেমন “কীর্তন” বলিলে এক শ্রেণীর অনেক রকমের গান বুঝায়, “বাউল সুরের গান” বলিলে আর এক শ্রেণীর বহু প্রকারের গান বুঝায়, সেইরূপ “ভাটিয়াল গান” বলিলেও অন্য আর একজাতীয় বিবিধ আকারের গান বুঝা যায়। কিন্তু “ভাটিয়ালে”র রাগিনী-স্বাতন্ত্র্যটুকু “কীর্তন” ও “বাউল” সুর অপেক্ষা বহুগুণে স্পষ্ট। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এই রাগিনীর প্রধান গুণ, অতি সহজে লোকের মর্ম্মস্পর্শ করিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা উদাস ভাব আগাইয়া তোলা। এই বিশেষ গুণের জন্যই এই রাগিনীটি এদেশে এত জনপ্রিয়।

ভাটিয়াল সুরের অসংখ্য গান আছে। সংগ্রহ করিলে বিরাট গ্রন্থ হইতে পারে। অন্য বিভিন্ন ভাবের ছয়টি মাত্র গানের উল্লেখ করা হইল।

প্রথম গান

বামনার লইয়া বার বৈদেশী বজুরার নার।

আরে কইও কইও কইও গো খপর খতরের আগে,—

আমারে বেন্‌ ভালাস করে গানের কূলে কুলেরে।

আরে কইও কইও কইও গো খপর শাশরীর আগে,

কোলের ছাওয়াল গুইয়া রইছে মঠের তলে রে।

আরে কইও কইও কইও গো খপর নন্দীর আগে,—

অখন যেমন কইয়া করে জলের কলসীর লগে রে।

আরে কইও কইও কইও গো খপর সোয়ামীর আগে,

পালের বলদ বেইচা বেন আরেক বিয়া করে রে।

এই গানের নারিকাতিকে কোন ব্রাহ্মণকুমার
অবৈধ ভাবে লইয়া যাইতেছিলেন। প্রণয়ীর সঙ্গে
পতিপুত্র, গৃহ স্বজন ছাড়িয়া ওরূপ ভাবে চলিয়া যাইতে
নারিকাতিরও যে বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না,
তাহা “বৈদেশী বজুরা” পদটিতে প্রকাশ। তবে সে
নিভান্ত পাবাগীও ছিল না। হৃদয়ের অভ্যন্তর প্রদেশে
সমতার একটি অতি ক্ষীণ ধারা ধীরে ধীরে প্রবাহিত
হইতেছিল; তাই হয় ত প্রথমটা তাহার গৃহে ফিরিয়া
যাইবার একটু ইচ্ছাও হইয়া থাকিবে। তাই সে
“খতরের আগে খপর” পাঠাইতেছিল যে তাহাকে বেন
“গানের কূলে কূলে ভালাস” করা হয়। গৃহে ফিরিতে
ইচ্ছা হওয়ার প্রধান কারণ, ঐ “কোলের ছাওয়াল।”
বৃদ্ধি যত্নে, আত্মবিক্রিত শিশুর করুণ মুখখানি
থাকিয়া থাকিয়া হতভাগিনীর মানসপটে কুটিয়া
উঠিতেছিল, তাই যখন সে দেখিল গৃহে ফিরিবার তাহার
আর কোন সম্ভাবনা নাই, তখন সে “শাশরীকে” সেই
অসহায় শিশুটির তত্ত্বাবধান করিতে সংবাদ পাঠাইবার
চেষ্টা করিল। ইহার পরবর্তী পদটি শুনিতে পল্লীগৃহের
একটি সর্বজনবিদিত অপ্রীতিকর চিত্র মনে পড়ে। সেটি
নন্দভাকের কলহ। এখানে নন্দভাকের উদ্দেশ্যে একটু
ঠাট্টার ভাবও বেন লুকায়িত আছে। নন্দিনী তাহার

এই ব্রাহ্মণটিকে বোধ হয় বড় বেশী আলাইত; তাই
তাহার উদ্দেশ্যে বলা হইল যে “এখন বেন কইয়া করে
জলের কলসীর লগে রে।” সর্বশেষে হতভাগ্য স্বামী
বেচারাকে একটি মূল্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।
স্বামিগৃহে অবস্থাও বোধ হয় স্বচ্ছল ছিল না,—না
হইলে “পালের বলদ বেইচা বেন আরেক বিয়া করে”
এ উপদেশ কেন? তা’ আশা করা বার স্বামীটি উক্ত
উপদেশানুযায়ী কার্য করিতে অন্তথা করে নাই।

এই অতিক্রম সহজ সরল গানটিতে অপ্রতিভানাথ
কবি একটি বিপথগামিনী রমণীর মনের বিবিধ বিরক্ত
ভাবের উত্থানপতনের সুন্দর একটি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন
করুণ উদাস ভাটিয়াল দ্বারা যখন এই গানটি
গীত হয় তখন চক্কের সম্মুখে আমরা বেন গানে বর্ণিত
আরোহী দুইটিকে একখানি ডিকি নৌকায় নদীর কূলে
কূলে ক্রম বেগে চলিয়া যাইতে দেখি।

এই গানের কয়েকটি শব্দ লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত।

যথা :—

| বিদেশী | কূলে | বৈদেশী। |
|--------|------|----------|
| খবর | ” | খপর। |
| বেন | ” | বেন্‌ |
| নদী | ” | গাজ |
| শাশরী | ” | শাশরী। |
| ছেলে | ” | ছাওয়াল। |
| মুশারি | ” | মঠের। |
| কগড়া | ” | কইয়া। |
| সঙ্গে | ” | লগে। |

দ্বিতীয় গান

জান তরে মৈবে মারবো।

মৈবাণ মৈবাণ বলি রে আমি—

মৈবাণ কাচা সোনা,

বন্দের ধনে আইলা মইব্‌

বাড়ীত্‌ বাইলা খুইও রে।

আরে আমার বাড়ী বাইতরে মৈবাণ,
বসতে দিমু রে পীড়ি,
আরে জলপান করিতে দিমু রে মৈবাণ,
শাইল ধানের মুড়ি রে।

শাইল ধানের মুড়ি না রে মৈবাণ,
বিগ্নি ধানের রে খই,—
আরে পেট মোটা সবরি কলা রে মৈবাণ,
গামছা বান্দা দইও রে

ইহা একটি প্রণয় সঙ্গীত। কোন গ্রাম্য তরুণী কোনও তরুণ মহিষপালকের দর্শনে মোহিত হইয়া তাহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিল। প্রণয়ীগীর প্রণয়পূর্ণ হৃদয়ে সদাই আশঙ্কা—কখন জানি তাহার প্রণয়ীকে মহিষে বারিয়া ফেলে! তাই সে প্রথমেই তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছে। কিন্তু ভালবাসার এমনই স্বভাব যে দয়িতকে একবার মাত্র সতর্ককরণ করিয়া তরুণী তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। সে বার বার “মৈবাণ, মৈবাণ” বলিয়া প্রণয়ীকে সতর্ককরণ করিতেছে; অর্থাৎ “মৈবাণ” বুঝক যে তাহার প্রেম পূর্ণ নয়নে “কাঁচা সোনা”রই মত কান্ত কোমল। সে কি মাঠে মাঠে মহিষ চরাইবার যোগ্য! অতএব সে তাহাকে মহিষগুলি মাঠ হইতে গৃহে আনিয়া বান্ধিয়া রাখিবার উপদেশ দিল।

তার পর প্রণয়ীটিকে সে তাহার নিজ বাড়ীতে আহ্বান করিল, এবং কেমন করিয়া আদর যত্ন করিবে তাহা জানাইতে লাগিল। তাহার “মৈবাণ” কে সে যে সকল সামগ্রী সহযোগে অভ্যর্থনা করিবে ও ভোজন করাইবে তাহারই উদ্দেশ্য করিল। গ্রামে যে সকল আড়ম্বরহীন সুন্দর খাদ্য রন্ধকরা তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করে, উহা সেই সকল জিনিষ ছাড়া আর কিছুই নহে। উহা শালি ধাত্তের মুড়ি, বিগ্নি ধানের খই, সুপক

কদলি ও উৎকৃষ্ট দধি। বসিবার আগনটিতেও কোন আড়ম্বর নাই, একখানা সামান্য পীড়ি মাত্র।

এ গানটিতে বালিকা হৃদয়ের প্রেমের স্বাভাবিক ভাবটি কেমন স্নিগ্ধ সরল ভাবে প্রসুটিত হইয়াছে।

এ গানটিতেও নিম্নলিখিত শব্দ কয়টির বিশেষত্ব আছে—

| প্রাণ | স্থলে | জান |
|-----------|-------|-----------|
| তোরে | ” | তরে। |
| মহিষ | ” | মৈব। |
| মহিষ পালক | ” | মৈবাণ। |
| কাঁচা | ” | কাচা। |
| মাঠের | ” | বন্দেয়। |
| বান্ধিয়া | ” | বাইন্দা। |
| রাখিও | ” | খুইও |
| দিব | ” | দিমু। |
| শালিধাত্ত | ” | শাইল ধান। |

“বিগ্নিধান” এক প্রকার ক্ষুদ্র ধাত্ত।

“গামছাবান্দা দই” অর্থাৎ অন্তরল শব্দ উৎকৃষ্ট দধি—গামছা দিয়া যাহা বান্ধিয়া রাখা যায়।

“শাইল ধানের মুড়ি না রে মৈবাণ” পদটিতে “না” শব্দটি বোধ হয় নিশ্চয়্যার্থ প্রকাশক। বহু ভাটিয়াল গানে এইরূপ “না”র প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু সব স্থলেই ইহার এক অর্থ নহে। ইহার পরবর্তী গানটিতেও এরূপ “না”র ব্যবহার আছে। আধুনিক কবিরাজ এরূপ প্রয়োগ করেন। স্বনামধন্য মাননীয় কবি শ্রীমুত স্বিঃস্বঃ লাল রায় মহাশয়ের “আখীর দেশ” নামক বিখ্যাত লগ্নীতটিতে “না”র এরূপ প্রয়োগ আছে। যথাঃ—

“তুই ত না মাগো তা’দের জননী,
“তুই ত না মাগো তা’দের দেশ।”

তৃতীয় গান

একদা গ্রীষ্মের অপরাহ্নে বসিয়া আছি। চারিদিক নিস্তব্ধ প্রায়। কণে কণে ঘুঘু, দয়েল প্রভৃতি নানা পাখীর

বিচিত্র কৃষ্ণনে নয়নপন্নবে নিজার আবেশ হইতেছে।
এমন সময়ে রাখালকণ্ঠে নিম্নলিখিত গানটি শুনিতে
পাইলাম :—

“হারে কোন্ না জাউলার মাছ রে খাইয়া
না দিছিলাম রে কড়ি—
হায় রে তার জন্তে হইলাম বুকি
অন্ন বইসা রাড়ী রে।”

পদ শুনিয়া আমার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল।
আমি সমস্ত গানটি শুনিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলাম। সে
গাহিতে লাগিল :—

আমার পাগল কইরা গেলা—
আমার অনাথ কইরা গেলা রে প্রাণনাথ
আমার পাগল কইরা গেলা।

আরে কোন্ না জাউলার মাছ রে খাইয়া
না দিছিলাম রে কড়ি—
হায় রে তার জন্তে হইলাম বুকি
অন্ন বইসা রাড়ী রে।

“আরে কার জানি ভরা রে ক্ষেতে
দিয়াছিলাম রে হাত,—
হা’রে তাইতে বুকি আমার মাথার—
এমন বজ্রাঘাত রে।

আরে কোন আয়তীর সিঁদীর রে সিন্দুর
আমি ফেইলাছি মুইছা,
হায় রে তার শাপে দারুণ রে বিধি
তোমার গেল লইয়া রে।”

বালক ধীরে ধীরে গানটি শেষ করিল। কিন্তু আমার
হৃদয়পটে যে একটি বিষাদমাধা প্রতিমা অঙ্কিত হইয়া
রহিল, তাহা কেমন করিয়া তাহার প্রকাশ করিব?
আমার বোধ হইল যেন গ্রীষ্মের সেই অপরাহ্নে কোনও
গৃহস্থের নিবৃত্ত গৃহে কোন শোকবিহ্বলা বালবিধবা

তাহার পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে এই বর্ণবেদনা
মাথা কণাগুলি অশ্রুসিক্ত করিয়া নিবেদন করিতেছে।
আর তাহার সেই বুকফাটা গানে মধ্যাহ্ন প্রকৃতিও যেন
চলিতে চলিতে ধমকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

গ্রাম্য কবি কেমন তীব্র অনুভূতির সহিত একটি
শোকাহতা বালবিধবার অন্তরের ব্যথা প্রকাশ করিয়া-
ছেন! নিরক্ষরা, জ্ঞানহীনা তরুণীর হৃদয়ে এই সম্মী-
তোক্ত আত্মকৃত কর্মণমূহই তাহার এই দারুণ বৈধব্যের
কারণ বলিয়া অনুভূত হওয়া অতি স্বাভাবিক।

সে এই ভোগলালসাময় যৌবনে বলের প্রধান খাত
মৎস্ত হইতে বঞ্চিত হওয়ায় সহজেই মনে করিল, হয় ত
সে কোন মৎস্তব্যবসায়ীর মৎস্ত কিনিয়া মূল্য দেয় নাই,
তাই তাহার এই দুর্দশা।

তাহার স্বামীর সঙ্গে সে সূখের সংসারটি পাতিয়াছিল
মাত্র! কিন্তু হায়! কবে যেন সে কাহার “ভরা ক্ষেতে”
হাত দিয়াছিল, তাই বুকি তাহার সে সূখের সংসার ছার
খার হইয়া গেল—সংসারের সারধন স্বামীরই সে
হারাইল!

হায়! এই সকল অপরাধগুলির কথা উল্লেখ
করিয়াও তাহার মন প্রবোধ মানিল না। সে নিশ্চরই
আরও কোন ভয়ানক পাপ করিয়াছে! কবে যেন সে
কোন “আয়তীর”—সখবার চিহ্ন সিঁদীর সিন্দুর
ফেলিয়াছে, তাই “দারুণ বিধি” তাহার ও সিঁদীর সিন্দুর
উঠিয়াছেন,—তাহার শিরে এই “বজ্রাঘাত” করিয়াছেন।
আর তাই আশু তাহার বুক ফাটিয়া বিলাপগাথা বাহির
হইয়াছে “আমার পাগল কইরা গেলা রে প্রাণনাথ।”

চতুর্থ গান

এখন যে গানটির বিষয় উল্লেখ করা হইবে তাহা সেই
চিরপূরাতন কিন্তু চিরনবীন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর
একটি সরস সুন্দর চিত্র অবলম্বনে রচিত।

বৃন্দাবনের সেই নটচূড়ামণির সঙ্গে প্রথম মিলনের
পূর্বকণ্ঠে শ্রীরাধিকা একদিন রূপবিহ্বলা গোপললনা-

দ্বিগের সহিত কানন-পথ কলহান্তে যুধিরিত ও মঞ্জীররাবে
অনুরণিত করিয়া কলসী কন্কে ধীরে ধীরে বহনাকুলে
গমন করিতেছিলেন।

এদিকে নিখিল-মনোমোহন শ্রীমন্তেশ্বর, সুবল সখার
সঙ্গে অদূরে অবস্থিত। লোকলল্যমভূতা রমণীরসকে
সখী সঙ্গে তদবহার দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ তাহাকে রাধা
বলিয়া নিঃসন্দ্বিগ্নরূপে চিনিতে পারেন নাই। তাই
সুবল সখাকে সন্ধান করিয়া বলিতেছেন :—

“প্রাণের সুবল রে
আরে কার কামিনী জলে যায়।
“সোনার নুপুর রাঙা পার
রুণু রুহু বাত শুনা যায় ;
হাউল্কা (হাল্কা) মাজা পবনে হেলার।

“উল্টা ধোপায় বান্ধা চুল,
ধোপায় শোভে নানান জাতি ফুল,
ওরে মধুর লোভে ভ্রমর আসে যায়।

“হুই সখী জলেয়ে যায়,
আরেক দখী হেইলা পড়ে গায় ;—
ওরে অল্পভবে ঘুরি রাধা যায়।”

এ গানে “মাজা” শব্দে কটিদেশকে নির্দেশ করা
হইরাছে। পূর্ববক্তার কথিত ভাবায় এই অর্থে “মাজা”
শব্দের যথেষ্ট প্রচলন দৃষ্ট হয়।

“ধোপা” কবরী অর্থে ব্যবহৃত।
“জলেয়ে যায়”—জল আহরণার্থ যায়।

এই অর্থে ঢাকা জেলার “জলে” যায় বা “জল” যায়
এরূপ প্রয়োগ আছে। “জলে যায়” ত আলোচ্য গানেই
আছে। শুনিরাছি বাঁকুড়া অঞ্চলে “জলকে চল” বলে।
কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য “মানসী”তেও পাঠ
করিরাছি :—

“বেলা যে প’ড়ে এলো
জলকে চল।”

পঞ্চম গান।

এ গানটি জীবনের অসারতা সম্বন্ধে। আত্মজীবন
সংসারমোহে মুগ্ধ হইয়া পার্শ্বভৌতিক দেহ হারী জানে
সারাটা জীবন কাটাইয়া দিলাম—বারেকের তরেও
ভগবানের কথা ভাবিলাম না! এখন জীবন-সন্ধ্যার
সুপ্তোখিতবৎ দেখিতেছি হার। যুগ এ জীবন কাটা-
ইরাছি—আর সংশোধনের সময় নাই—এ সংসারে কেবল
আসিলাম আর গেলাম। দিবসের অবসানে প্রান্ত দেহে
যখন কুবক-বুদ্ধগণ উক্ত রূপ মনোভাব করুণ কর্তে
গাহিতে থাকে—

“জীবনের নাই রে আশা,
কর শ্রীগুরু চরণ ভরসা।”

তখন যেন সমগ্র পল্লীটিও সন্ধ্যার তিমিরাবরণে আবৃত
হইয়া ধীরে ধীরে বিবাদ-সাগরে নিমগ্ন হয়। তাহার
গাহিতে থাকে—

“দেহের গুমান কর নিছে,
নিখরসের কি বিশ্বাস আছে?
কঙ্কি শমনে জাল পেতেছে,—
ভাকবে রে তোর সুখের বাসা।

“ভাই, বন্ধু, দারা, সুত
সকল পথের পরিচিত।
যখন প্রাণ তোর হ’বে হত
কেউনা রে করবে জিজ্ঞাসা।

“আপন আপন বল যারে
কেউত সঙ্গে যাবে না রে।
গুরু ভজন হইল না রে
কেবল তবে যাওয়া আসা।

“হুমারের হাড়ি দড়ি,
আর অষ্ট কড়া কড়ি,
চাইর জনাতে কান্ধে করি’
পানের কুলে দিবে বাসা।”

এ গানটিতে “গুহান” শব্দটি মাত্র লক্ষ্য করিবার
যোগ্য। ইহা অহংকার অর্থে প্রযুক্ত।

যষ্ঠ গান

এ গানটি গুরু মীননাথের উদ্দেশে তদীয় শিষ্য
গোরক্ষনাথ কর্তৃক গীত।

নিম্নে গুরু মীননাথের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দেওয়া গেল।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে “গোবিন্দ সন্তোষদায়ী” নামে এক
শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন। গুরু মীননাথের শিষ্য মহাত্মা
গোরক্ষনাথের নাম হইতেই এই সন্তোষদায়ীর উক্ত নাম
হইরাছে।

প্রবাদ যে গুরু মীননাথ জীবমুক্ত পুরুষ ছিলেন।
কিন্তু কর্মফল ভোগ শেষ না হওয়াতে একদা তিনি ও
তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য গোরক্ষনাথ কোনও রাজ-
প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন। সে
স্থানে পরম ভূগির সহিত রাজদত্ত বিবিধ সুস্বাদু খাদ্য
আহার করিয়া গুরু মীননাথ এত প্রলুব্ধ হ’ন যে ৩৪ দিন
অভীত হইয়া গেলেও তিনি তথা হইতে প্রস্থানের নাম
করেন না। এদিকে তদীয় সংসারবিরাগী শিষ্য
বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং ধ্যানবলে জানিতে পারেন যে
গুরুজীকে তাঁহার কর্মফলাভুযারী কিছু দিন সংসারপ্রমে
ধাকিয়া সংসার ভোগ করিতে হইবে। তখন তিনি
গুরুর অজুযতি লইয়া অস্ত্র চলিয়া যান, এবং গুরুজীও
বিনা বাক্যব্যয়ে শিষ্যকে বিদায় দিয়া পরম সুখে
রাজভোগে পরিতৃপ্ত হইতে থাকেন।

এ দিকে রাজা গুরু মীননাথের অসামান্য রূপলাবণ্য
দর্শনে বৌহিত হইলেন এবং তাঁহাকে রাজবেশে
সুসজ্জিত করিয়া স্বীয় পরমরূপবতী ছহিত্যরম্যকে
তাঁহার সহিত পরিগরন্থরে আনয়ন করিলেন। সন্ন্যাসী
ঠাকুর নিরতিপ্রভাবে আশ্চর্যবিশ্বত হইয়া রাজ-কামাতা
রূপে সংসারের বাবতীর তথাকথিত সুখরাজি সন্তোষ
করিতে লাগিলে। কিন্তু দিন পরে মহারাণী স্বীয়
বার্দ্ধক্যানিবন্ধন পূজাভাবে কামাতাকেই রাজ্যভার অর্পণ
করিলেন। পরে কিছু দিন পরে তাঁহার বর্ণলাভ হইল।

গুরু মীননাথ রাজা হইয়া প্রবল প্রভাবে রাজকার্য্য পরি-
চালন করিতে লাগিলেন। বহু দিন চলিয়া গেল, কিন্তু
মায়ার এমনই বিচিত্র লীলা যে কণকালের নিমিত্তও
তাঁহার পূর্বকথা স্মরণ হইল না। রূপবতী ভার্যা, পুত্র,
কন্যা ও বিপুল রাজ্য লইয়া তিক্ততখন মহা সংসারী।

এ দিকে তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথ মনে মনে চিন্তা
করিলেন যে যদিও আমি শিষ্য তথাপি গুরুদেবের
উদ্ধার সাধন করা আমার একান্ত কর্তব্য। এই ভাবিয়া
তিনি উক্ত রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু
তিনি কোন ক্রমেই রাজপুরীতে প্রবেশ লাভ করিতে
পারিলেন না। কারণ বৃদ্ধ রাজা জীবিত থাকিতেই
আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজভবনে যেন
কোন সময়ে কোন সাধু, সন্ন্যাসী, বা ভিক্ষুক প্রবেশ
করিতে না পারে। তদীয় মৃত্যুর পরেও এই আদেশ-
মুযায়ী কার্য্য হইত। ভয়, পাছে বা কোন উদাসীনকে
যেথিয়া মীননাথের পূর্বকথা স্মরণ হয় এবং তিনি রাজ্য
ছাড়িয়া চলিয়া যান।

গোরক্ষনাথ কি করেন। তিনি রাজপুরীর বাহিরে
প্রতিদিন “চেন মীননাথ! গোখাঁ আয়া!”—মীননাথ,
চৈতন্ত লাভ কর—গোরক্ষনাথ আসিয়াছে—বলিয়া—
চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একদা হঠাৎ মীননাথ উহা শুনিয়া গোরক্ষনাথকে
ডাকাইয়া নিভূতে সমস্ত বৃত্তান্ত তুলিলেন এবং কথকিৎ
চৈতন্তলাভ হওয়ার নিশীথে রাজপুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া
চলিয়া গেলেন। কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ বারা তাঁহার
কাটে নাই। তাই পুঁটলি করিয়া কিছু মণিমুক্তা
লইলেন। না হইলে পথে থাইবেন কি? গোরক্ষ-
নাথকে বার বার সাবধান করিয়া দিলেন, ওগুলি
না হারায়।

ছই জন অন্ধকারময় বনপথে চলিতেছেন, আগে
গুরুদেব পশ্চাতে শিষ্য। গোরক্ষনাথ গুরুর অলঙ্কে
একটি একটি করিয়া মণিগুলি ছুড়িয়া ফেলিতেছেন ও
অগ্রসর হইতেছেন। যখন ভোর হইরাছে, তখন মীননাথ

পেছন কিরিয়া দেখেন, গোরক্ষনাথের হাতে উক্ত পুঁটলিটি নাই। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং ঐ মণিমুক্তাগুলির জন্যে শোক করিতে লাগিলেন। শিষ্য গোরক্ষনাথ নানা উপদেশে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই ফল না হওয়াতে অবশেষে তিনি নিকটবর্তী একটি শিলাখণ্ডের উপর মৃত্যুভাগ করিয়া ঐহাকে একটি বহুমূল্য মণিখণ্ডে পরিণত করিলেন, এবং মীননাথকে দেখাইয়া বলিলেন “গুরুদেব, আপনায়ই উপদেশানুযায়ী তপস্তা করিয়া আমি এই শক্তি লাভ করিয়াছি এবং আপনারই উপদেশে জানিয়াছি যে এ শক্তিও হয়; একমাত্র আত্মোপলব্ধিই পরম পদার্থ। আর আপনি কি না এই তুচ্ছ পুরীষমৃত্তবৎ ধনের শোকে মুহ্যমান হইতেছেন? যারামোহ ত্যাগ করুন; আত্মায় ব্রহ্মপদার্থের উপলব্ধি করুন। আমি আপনাকে কি আর বেশী বলিব?”

তখন হঠাৎ মীননাথের বোহ দূর হইল। উবাগমে ভানুদয়বৎ আত্মায় নির্মল বিভা হৃদয়ে প্রতিকলিত হইল। গুরু শিষ্য দুইজনে পরমানন্দে আত্মহু হইলেন।

আমাদের সংগৃহীত গানটি গোরক্ষনাথ কর্তৃক রাজকুণী মীননাথকে আহ্বান। এ আহ্বান অতি বিচিত্র। উহা এই :—

শোন্ গুরু সেবকের বোল

ছাড় রে কামিনীর কোল।

ভূমি দিনে দিনে যাচে ভরা বোরাইলা রে

—গুরু মীননাথ রে।

১

ও গুরু হে কতু নি দেইখাছ গুরু

ইহা নি শুইনাছ রে

ভাল গাছে লাল বাঘের ছাও।

—গুরু মীননাথ রে।

খজন পক্ষী হইয়া সে আবার বোলাইল রে,

আধারে ধইয়া খাইল ছাও।

—গুরু মীননাথ রে।

২

“ও গুরু হে কতু নি দেইখাছ গুরু,

ইহা নি শুইনাছ রে

দামুয়া ছিড়া পাগার লড় দেয়

—গুরু মীননাথ রে

সাতালি পক্ষিতে গুরু সে ঘোড়া দোড়াইল রে

আসমানে ওড়ে মরা গোক।

—গুরু মীননাথ রে।

৩

ও গুরু হে বাঘে মৈবে জুইড়া হাল

বান্দার কুবাণ, পাণির কুমইরে উরা বাছে।

—গুরু মীননাথ রে।

পানির কুমইর হইয়া সে উরা বাছিল রে,

ইন্দুরে বুইনা গেল ধান।

—গুরু মীননাথ রে।

৪

ও গুরু হে উজানি নগরে গুরু

সে মচ্ছ উজাইল রে

চরঙ্গীরা পল লইয়া যায়।

—গুরু মীননাথ রে।

শৈল শৈল বইলা গুরু সেই না চাব দিল রে

আরে ডাইন্ কাইলার পল ভাইলা যায়।

—গুরু মীননাথ রে।

৫

“ও গুরু হে আটু হইল নরবীর শরীল হইল কিঙ্কর

কেশ হইল বাগুয়ার পাখী।

—গুরু মীননাথ রে

৬

ও গুরু হে অমাবস্তা বদলবার

দিতীয়া পালিও রে,

ডাইন অঙ্গে না ছোরাইও নারী।

—গুরু মীননাথ রে।

৭

ও গুরু হে উণ্ডা লাচারীর গীত

শোন ওহে পণ্ডিত,

রাধা হইয়া না কবুলা বিচার।

—গুরু মীননাথ রে।

এই গানটি বহুদিনের বলিয়া বোধ হয়। ইহার ভাষাও নিতান্ত গ্রাম্য। ইহার বহু শব্দই নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। *

এই গানের প্রত্যেক পদেই অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম আর কিছুই নহে— জীবন্ত সন্ন্যাসী মীননাথও যদি সংসারাসক্ত হইয়া কামিনীকানন উপভোগে প্রবৃত্ত হন তবে গানে বর্ণিত সমস্ত ব্যাপারগুলিও সম্ভব হইতে পারে।

প্রথমেই গোরক্ষনাথ গুরুকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—“গুরুদেব, সেবকের কথা শোন—তুমি রমণী-সঙ্গ পরিত্যাগ কর। হায়! দিনে দিনে তুমি ঘাটেই ভরা ডুবাইতেছ।—কি করিয়া এই দুস্তর সংসার-সমুদ্র পার হইবে?”

গুরু এ কথা কি কখনও শুনিয়াছে যে তাল বৃক্ষের

বে বৃক্ষ কৃষকটির নিকট হইতে এই গানটী সংগৃহীত হইয়াছে সে গুরু মীননাথের ইতিহাসটি অতি সংক্ষেপে হুঁকথায় বলিয়াছিল। ঐ সংগ্রহের কয়েক বৎসর পরেই ১৩০৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা “নব্য ভারতে” “চেৎ মীননাথ” নামক প্রবন্ধে উক্ত মহাপুরুষের বিবরণ বাহির হয়। ঐ প্রবন্ধটী ব্যারিষ্টার ঐযুক্ত চন্দ্রশেখর মেন অথবা ঐযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের লেখা। উহা হইতেই মীননাথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (নব্য ভারতের উক্ত প্রবন্ধটির পাদদেশে চন্দ্রশেখর বাবুর নাম কিন্তু বর্ধেশ্বরের স্মৃতিতে মনোরঞ্জন বাবুর নাম।) ১৩১৪ সালের কার্তিক মাসের সাহিত্য বৌদ্ধ-ভাস্কর্য বোম্বে-মতের প্রাচীন গ্রন্থ নামক প্রবন্ধে মহাত্মন ঐযুক্ত আবদুল করিম “গৌরবিলসর” নামক এক বহু পুরাতন গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মীননাথ ও গোরক্ষনাথের বিষয় একটু অল্প রকম। প্রবন্ধটি সাহিত্যের উক্ত সংখ্যার শেষ হয় নাই; পরবর্তী প্রবন্ধ আমার নয়ন গোচর হয় নাই। —লেখক

উপরে ব্যাখ্যা শব্দক রহিয়াছে, আর ধ্বজন পক্ষী তাহার খাণ্ড সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু সেই খাণ্ডই সজীব হইয়া সেই ব্যাখ্যাশব্দকে ধরিয়া ভক্ষণ করিল?

ইহাও যেমন অসম্ভব, হে গুরু মীননাথ তোমার সংসারাসক্তিও তেমনই অসম্ভব!

গুরু, এ কথা কি কখন শুনিয়াছে যে গোবৎসকে ছিন্ন করিয়া তাহার বন্ধনরজ্জু দৌড়াইয়া পালায়? পুনশ্চ “সাতালি” পর্তে গিয়া সে অঝারোহণে দ্রুত চলিয়া যায় এবং মৃত গোরু আকাশে উড়িয়া বেড়ায়?

গুরু, এ কথা কি কখন শুনিয়াছে যে ব্যাখ্যা ও মহিবকে একত্র করিয়া কৃষক তাহাদের সাহায্যে হল চালায়, আর অগাধজলসঞ্চারী কুস্তীর আসিয়া কৃষকের ক্ষেত্রের আবর্জনা বাছিয়া দেয়, এবং ইন্দুরকুল অহুকুল হইয়া তাহার ক্ষেত্রে ধান বুনিয়া দেয়?

গুরু, এ কথাও কি শুনিয়াছে যে উজ্জানি নগরে মাহ উজ্জাইয়া উঠিল, এবং চরলী নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্ত “পল” লইয়া উহা ধরিতে গেল; এবং “শোল” “শৌল” বলিয়া সে “পল” দ্বারা উহা ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু “ডাইন কাইনা” নামক অস্ত্র এক অতি ক্ষুদ্র জাতীয় মৎস্ত সেই “পল” ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেল?

গুরু, হাঁটুই নরবর রূপে পরিণত হইল এবং সমস্ত শরীর তার কিছুর হইল; মুক্ত গগনবিহারী পক্ষী বাগুরার জালে রূপান্তরিত হইল! (এই যে পদটির অর্থ তাল করিয়া বোকা গেল না।)

গুরু, এ সব অসম্ভব কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? কখনই নহে! অতএব হে গুরুদেব, তোমার এ সংসার-সক্তিও অসম্ভব, সুতরাং তুমি নিম্নলিখিত উপদেশ মত কার্য্য করিয়া পুনরায় মুক্ত হও।

তুমি অসাবিত্তা মঙ্গলবার এবং দ্বিতীয়া তিথি পালন করিও এবং তোমার দক্ষিণ অঙ্গে রমণী স্পর্শ করিও না।

এই “উণ্ডালাচারী”—বিপরীত ভাবের বাক্য পূর্ণ গানটি হে পণ্ডিত, তুমি প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। রাধা হইয়া কেন তুমি সদসংবিচারশূন্য হইলে?

জানুয়ারি ১৯১১

এই গানের “সাতালি পর্ষত” ও “উজানী নগর”
কোথার এবং ইহাদের কোনরূপ ঐতিহাসিক মূল্য আছে
কি না জানি না!

সঙ্গীতোক্ত নিম্নলিখিত শব্দগুলি প্রণিধান যোগ্য :—

গোল—কথা।

ভরা—পূর্ণ নৌকা।

বোরাইলা—ডুবাইলা।

ছাও—বাছা; ছানা।

অ'ধার—সাধারণতঃ পক্ষী ও মৎস্য জাতির খাওয়া।

দামরা—বাঁড় বাছুর।

পাপা—গোরু বাধা দড়ি।

লড়—দোড়।

আশমান—আকাশ।

জুইড়া—জুড়িয়া।

বান্দার—(অর্থ বুঝা গেল না)

কুমইরে—কুম্ভীরে।

উরা—ক্ষেত্রের আবর্জনা।

বুইনা—বুনিয়া; বপন করিয়া।

বচ্ছ—মৎস্য।

উজাইল—বর্ষার প্রারম্ভে খাল, বিল বা পুহরের মৎস্য

ভাসিয়া ওঠে, কোন কোন মাছ ডাঙ্গা

পর্যন্তও যায়। ইহাকে মাছ উজান বলে।

চরদী—ক্ষুদ্র মৎস্য বিশেষ।

পধ—বংশশলাকা দ্বারা নির্মিত এক প্রকার মৎস্য

ধরিবার যন্ত্র। ইহা দ্বারা গৃহ জব্যাদিও

ঢাকিয়া রাখা হয়।

শৈল—শোল মৎস্য।

চাঁও দিল—পল দ্বারা ঢাকিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল।

ডাইন কাইনা—ক্ষুদ্র মৎস্য বিশেষ।

আটু—হাঁটু।

উপা—উট।

লাচারী—গান।

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

স্বপ্ন

(সংকলিত)

বাগানে একটা বহু দিনকার পুরাণো প্রকাণ্ড
দেবদারু গাছ ছিল। গ্রীষ্মের অলস দিনে তার তলে
বসিয়া আকিনোমুকে হাওয়া খাইত।

বৈকালে সে দিন বড় গুমট পড়িয়াছে, তাই আকি-
নোমুকে তার দুই বন্ধু ও ‘সাকে’র পেয়াল। লইয়া গাছের
তলায় বসিয়া গিয়াছে। দু’ এক পেয়াল নিঃশেষিত
হইতে না হইতেই হঠাৎ আকিনোমুকের চক্ষু জড়াইয়া
আসিল। বন্ধুদের নিকট কমা প্রার্থনা করিয়া সে একটু
ঘুমাইয়া লইবার আশায় সেইখানে শুইয়া পড়িল।

তদ্রাস্ত্র ঘোরে সে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিল—সে যেন
তার উত্তরাংশে শুইয়া আছে। এমন সময় দেখিল নিকটবর্তী
এক পাহাড় হইতে এক মিছিল নামিতেছে—ঠিক যেন
কোনো সম্রাট দাইম্যোর মিছিল। মিছিলটি দেখিবার
জন্ত সে উঠিয়া বসিল। চমৎকার বিরাট মিছিল!
এমন মিছিল সে জন্মে কখনও দেখে নাই! আবার
একি! মিছিলটা যে তার-ই বাড়ীর দিকে আসিতেছে!
মিছিলের পশ্চাতে দেখিল সুন্দর-পোষাক-পর্য এক দল
যুগপুরুষ একখানা রাজ-শকট টানিয়া আনিতেছে।
গাড়ীখানা মন্ত, গাড়ীর জানালা ও দরজার হরিষর্ষের
উজ্জল রেশমী পর্দা। গাড়ীর গা হইতে ল্যাকার-
বার্ণিশের দীপ্তি চারি দিকে ঠিক্রাইয়া পড়িতেছে।
বাড়ীর নিকট আসিয়া মিছিল থামিল; জাঁকালো-
পোষাক-পরিহিত এক ব্যক্তি—সম্রাট ব্যক্তি তা’তে
সন্দেহ নাই—অগ্রসর হইয়া আকিনোমুকে সপজন্মে
অভিবাদন করিয়া কহিল :—

“মহাশয়, আমি স্বর্গরাজের ভৃত্য। আমার প্রভু
আপনাকে নমস্কার জানাইয়াছেন ও আপনার আজ্ঞা
পালনের জন্ত আমাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি রাজ-
বাটীতে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করেন ও আপনাকে

বহন করিয়া লইবার জন্য এই রাজ-শকট পাঠাইয়াছেন, অল্পগ্রহ করিয়া পাড়ীতে উঠুন।”

কথাগুলো শুনিয়া একটা উপযুক্ত উত্তর দিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু আকিনোশুকে বিশ্বয়ে ছতবাক্ হইয়া গিয়াছিল, আর ঠিক সেই সঙ্গে তার ইচ্ছাশক্তিও লোপ পাইল; তাই চূপচাপ রাজকৃত্যের কথামত সে পাড়ীতে উঠিল; ভৃত্য তার পাশে বসিয়া চলিবার আদেশ দিল। যুবকেরা রেশমের দড়ি ধরিয়া পাড়ী-খানা দক্ষিণ দিকে ঘুরাইল—যাত্রা শুরু হইল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, আকিনোশুকে সবিস্ময়ে দেখিল, পাড়ীখানা একটা প্রকাণ্ড দোতারা ফটকের সামনে আসিয়াছে। ভৃত্য “আপনার পৌছান সংবাদ দিয়া আসি” বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ হইল। কিছুক্ষণ পরে দুই জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিলেন। বেগুনে বস্ত্রের পোষাক ও মাথায় উঁচু টুপি তাদের উচ্চ পদের পরিচয় দিতেছিল। তারা আকিনোশুকে অভিবাদন করিয়া তাহাকে পাড়ী হইতে নামাইয়া লইল, ও পথ দেখাইয়া চলিল। সেই প্রকাণ্ড ফটকের মধ্য দিয়া একটা বিরাট উদ্যান পার হইয়া তারা রাজপ্রাসাদের প্রবেশ-পথে উপস্থিত হইল। সে প্রবেশ-পথটি পূর্বে পশ্চিমে কত ক্রোশই না বিস্তৃত হইবে! তার পর তারা যে বৈঠক-খানায় প্রবেশ করিল সেটি যেমন প্রকাণ্ড তেমন সুসজ্জিত। আকিনোশুকে সম্মানের আসনে বসাইয়া পথ প্রদর্শক দু’জন সন্ত্রমের সহিত দূরে সরিয়া বসিল। সুসজ্জিতা পরিচারিকারা জলধাবার লইয়া আসিল। জলযোগ শেষ হইলে সেই বেগুনে-পোষাক-পরিহিত লোকেরা অবনত হইয়া অভিবাদন করিল, ও রাজসভার প্রথমত একের পর অন্তে এইরূপে কহিতে লাগিল।

“এখন আমাদের কর্তব্য আপনাকে বলা..... কেন আপনাকে এখানে আনা হইয়াছে..... আমাদের প্রভু মহারাজ রাজ্যের ইচ্ছা যে, আপনি তাঁর জামাতা হন..... এবং তাঁর ইচ্ছা এবং আজ্ঞা যে, অল্পই আপনি বিবাহ করেন..... মহারাজ রাজকুমারী তাঁর কন্যাকে

.....আমরা অবিলম্বে আপনাকে রাজসম্মিধানে লইয়া যাইব..... যেখানে শ্রীলক্ষ্মীযুক্ত মহিষার্ব নৃপতি আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন..... কিন্তু প্রথমেই আপনাকে উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হইতে হইবে।”

বক্তৃতার পর তারা উভয়ে উঠিল, এবং বর্ণ ল্যাকারের একটি বহৎ দেওয়াল খুলিল। দেওয়াল হইতে নানা প্রকারের মূল্যবান পরিচ্ছদ ও একটি রাজ-টুপি লইয়া আকিনোশুকে রাজ-জামাতার উপযুক্ত সাজে সজ্জিত করিয়া রাজ-সভায় লইয়া গেল। হরিদ্রা বর্ণের রেশমী পোষাক-পরা মাথায় উঁচু কক্ষবর্ণ টুপি; দাইজা বা মহা-আসনের উপর রাজা বসিয়া আছেন। তাঁর বামে ও দক্ষিণে আমীর-ওমরাহের দল সার বাধিয়া মন্দির মধ্যস্থ বিগ্রহমূর্তির মতো স্থিতি নিশ্চল ভাবে বসিয়া রহিয়াছে। তাঁদের মাঝ দিয়া অগ্রসর হইয়া আকিনোশুকে প্রথমতঃ তিন বার ভূমিষ্ট হইয়া রাজাকে অভিবাদন করিল। তাহাকে সুমিষ্ট বচনে আপ্যায়িত করিয়া রাজা কহিলেন—

আমরা কেন তোমাকে অস্বস্তান করিয়াছি তা’ তুমি শুনিয়াছ। আমরা স্থির করিয়াছি, তুমি আমাদের গৃহ-জামাতা হইবে। এইবার বিবাহ হইবে।”

রাজার কথা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলবাণ্ড বাজিয়া উঠিল। একখানা পদীর অন্তরাল হইতে রূপসী রমণীর দল আকিনোশুকে রাজকন্যার নিকট লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল।

সুবহুৎ ঘরটি আগন্তকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সেখানে আর তিল ধারণের স্থান স্থিতি না। রাজকন্যার সামনে নির্দিষ্ট আসনে বসন আকিনোশুকে হাঁটু পাড়িয়া বসিল। তখন উপস্থিত সকলে তাহাকে সম্রাট অভিবাদন করিল। স্বর্গভট্টা অপ্সরার মতো সে রাজকন্যা! তার সঙ্গে যে বসন তা’ গ্রীষ্মকালের মতো অপরূপ সুন্দর!

বিবাহের পর প্রাসাদের অগ্র দিকে তাদের জন্য যে ঘরগুলি নির্দিষ্ট হইয়াছিল সেখানে সম্রাট ব্যক্তির আসিয়া নবদম্পতিকে অভিবাদন করিয়া গেল।

বার্ষিক ১৩১২

তার উপহার যে কত পাইল তার সংখ্যা করা যায় না।

কিছু দিন পরে আবার রাজার নিকট হঠাৎ আহ্বান আসিল। এবার রাজা অধিকতর স্নেহের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি কহিলেন—

“আমাদের রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে রাইবু নামক দ্বীপ। আমরা তোমাকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলাম। লোকেরা সেখানে বেশ রাজভক্ত ও শান্ত স্বভাব; কিন্তু তাদের রীতিনীতি ও শাসন-পদ্ধতি এখনো নিয়মিত হয় নাই। তাহাদিগকে করুণা ও বুদ্ধির সহিত শাসন করিবে ও তাদের সামাজিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হয় তাবিষয়ে সচেষ্ট থাকিবে। যাত্রার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে।”

আকিনোস্নকে জী-সমভিবাহারে রাজদত্ত জাহাজে চড়িয়া যাত্রা করিল। অল্পকাল বাতাস অবিলম্বে তাহাদিগকে দ্বীপে পৌঁছাইয়া দিল।

কমলার বর দ্বীপটিকে ফল-পুষ্প-শস্ত্রে ভরপুর করিয়াছে। শান্তিপ্রিয় লোকগুলি স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়। বুদ্ধিমান মন্ত্রীবর্গের সাহায্যে আইন প্রণয়ন করিয়া তাদের উৎসবাদিতে যোগ দিয়া আপনার জনের মতো তাদের সহিত স্নেহ ব্যবহার করিয়া আকিনোস্নকে সকলেরই শ্রদ্ধা লাভে সমর্থ হইল। দীর্ঘ ত্রয়ো-বিশতি বর্ষের মধ্যে তার জীবনে শোকের রেখা একটিও পড়ে নাই। কিন্তু পর বৎসর তার মাথায় বজ্রপাত হইল। পাঁচ পুত্র ও দুই কন্তার মাতা, তার সুন্দরী জ্যেষ্ঠা ইহসংসার ছাড়িয়া গেলেন। হানর্যোকো নামক স্থানে এক পাহাড়ের উপর তাহাকে মহা আড়ম্বরের সহিত সমাহিত করা হইল।

শোকাক্ত আকিনোস্নকের জীবন দুর্নিবহ হইয়া উঠিল। কিছুদিন গত হইলে এক দিন রাজদূত আসিয়া উপস্থিত। রাজা তাঁর বিপদে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ও বলিয়া পাঠাইয়াছেন, “তোমাকে স্বদেশে ফেরত পাঠাইতে প্রস্তুত করিয়াছি। তোমার পুত্রকন্ডাগণের যথোচিত

সেবা ও শ্রাবা হইবে, তাদের লক্ষ চিত্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। রাজার পৌত্র-পৌত্রীর মতো তারা লালিত পালিত হইবে।”

রাজাক্তা গুনিয়া বিনোদ ভাবে সে যাত্রার আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিল। সমস্ত বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিয়া অমাত্যবর্গ ও কর্মচারিবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজার প্রেরিত জাহাজে আরোহণ করিল। নীল আকাশ তলে, নীল জলের উপর দিয়া জাহাজ চলিল। রাইবু দ্বীপটাও যেন নীল দেখাইতেছিল। তারপর সেটা ক্রমশঃ ধূসর হইয়া আসিল। অবশেষে অদৃশ হইয়া গেল। আকিনোস্নকে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিল তার—বাগানের মধ্যে সেই দেবদারু গাছের তলায়।

কয়েক মুহূর্ত সে নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। দেখিল, তার দুই বন্ধু পেয়ালায় চুরুক দিতেছে ও গল্প করিতেছে। তাদের দিকে হতভম্বের মতো ফাল্ ফাল্ করিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিল—

“কী আশ্চর্য্য!”

তাদের মধ্যে এক জন হাসিয়া কহিল, “আকিনোস্নকে দিনের বেলা স্বপ্ন দেখেছিল! আশ্চর্য্য কি দেখে লে হে?”

আকিনোস্নকে তার স্বপ্ন বিবৃত করিল। তাহা গুনিয়া তার বন্ধুদ্বয় ও বিস্মিত হইল। সে ত কয়েক মিনিট মাত্র ঘুমাইয়াছে।

তাদের মধ্যে এক জন কহিল—

“আশ্চর্য্য বটে! তুমি যখন ঘুমুচ্ছিলে, আমরাও কিছু আশ্চর্য্য দেখেছি। ছোট একটি হলুদ প্রজাপতি তোমার মুখের উপর উড়ে বেড়াচ্ছিল। তার পর তোমার পাশে গাছের কাছে বসলো। যেমনি বসল, মস্ত এক পিঁপড়ে বেরিয়ে তাকে ধরুলে ও গর্তের ভিতর টেনে নিয়ে গেল। তোমার ওঠবার একটু আগেই সেই প্রজাপতি গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে তোমার মুখের উপর উড়তে লাগলো। তার পর হঠাৎ কোথায় যে চলে গেল কিছুই বোঝা গেল না।”

অপর বন্ধু কহিল, “হয়ত সেটি আকিনোস্নকের

আমরা। আমি যেন দেখলুম সে আকিনোসুকের মুখে চুকে গেল। কিন্তু প্রজাপতি যদি আকিনোসুকের আত্মাই হয়, তা হলেও ত সপ্নের কোনো বীমাংসা হয় না।”

প্রথম বন্ধু কহিল, “পিপড়েগুলো বোধ হয় কিছু সন্ধান দিতে পারে। অদ্ভুত জানোয়ার এরা—ভুত যে নয় তা-ই বা কে বলতে পারে!”...বাই হোক এই গাছ ভলায় পিপড়ের এক মস্ত বাসা আছে।”

আকিনোসুকে উত্তেজিত স্বরে কহিল, “এস, এস দেখা যাক!”

দেবদারু গাছের ভলায়, গুঁড়ির চারি দিকে হাজার হাজার পিপীলিকা খড় কুটা ও কাদা দিয়া ছোট ছোট ‘নগর’ তৈয়ারি করিয়াছে। একটা বড় গোছের ‘নগরের’ চতুর্দিকে গাদা গাদা পিপীলিকা ভরা হইয়াছে। তাদের মাঝখানে এক প্রকাণ্ড পিপীলিকা—তার ডানা হলুদ বর্ণ ও মস্তক কৃষ্ণবর্ণ।

আকিনোসুকে চীৎকার করিয়া উঠিল, “এই ত আমার সপ্নের রাজা! আর ঐ ত তোকোয়ো রাজ প্রাসাদ! কা আশ্চর্য!...তা হলে রাইবু অবশ্য এর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হবে...ঐ মোটা শিকড়টার বামদিকে ইয়া, এই যে! ভারী আশ্চর্য! এইবার বোধ হয় হানর্যোকো পাহাড় ও আমার প্রিয়ার সমাধি পাওয়া যাবে”।

পিপীলিকার বাসা খুঁড়িয়া ফেলিয়া অনেক অতুস্কানের পর একটি ছোট টিপি দেখা গেল। তার উপর একটি মস্ত ‘ছোট পাথরের হুড়ি—যৌদ্ধ সমাধির উপর যে রূপ অরণ-প্রস্তর রক্ষিত হয় অনেকটা সেইরূপ। আর সেই হুড়ির তলদেশে কাদার মধ্যে একটি জী-পিপীলিকার মৃতদেহ।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

নৌকাডুবি

আমরা যে ইচ্ছা করিয়া নলিনাক্ষকে লইয়াই এই গ্রন্থের চরিত্রালোচনা শেষ করিলাম তাহা নহে, বরং আমরা এই অবসানে রূপ করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ রবীন্দ্রনাথ কলামোব নলিনাক্ষকে দিয়াই গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন নলিনাক্ষ মানব হিসাবে রমেশের চেয়ে উন্নত সন্দেহ নাই, কিন্তু রমেশই প্রথম হইতে আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন—এজ্ঞা রমেশ ও হেমনলিনীর শেষ বিদায়ের পর কমলা-নলিনাক্ষের একটু দীর্ঘ মিলন ব্যাপার দিয়া সেই শেষ বিদায়ের কারুণ্যোৎপত্তির উপর আবরণ টানিয়া দেওয়ার নৌকাডুবি গ্রন্থের একটা কলামোব দোষ ঘটয়াছে বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের এইরূপ করার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, রমেশ ও হেম নালিনীর বিদায়ের বুক ভরা আঘাত দিয়া নিরুপায় পাঠকের নিকট তিনি বিদায় লইতে চাহেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, নলিনাক্ষকে দিয়া গ্রন্থ শেষ করাতে সমস্ত জগৎ ব্যাপারের সে “সর্ব শেষের গান” অবসানের সেই আধ্যাত্মিক স্রুতি দিয়াই গ্রন্থের একটি কলামোব পরিসমাপ্তি তিনি করিতে পারিয়াছেন।

নলিনাক্ষ শ্রেষ্ঠের মানব, কিন্তু রমেশ শ্রেষ্ঠতর নায়ক—এই হিসাবে গ্রন্থের একটু কলামোব দোষকে অস্বীকার করা যায় না। আর নলিনাক্ষকে শ্রেষ্ঠতর নায়ক বলিয়া মানিয়া নিতেও পাঠকের হৃদয় হইতে যথেষ্ট বাধা আছে। গ্রন্থের প্রথমার্ধে তাহার প্রকাশ আদৌ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলেই গ্রন্থের প্রথমার্ধে আর কয়েকটা পরিচ্ছেদ জুড়িয়া দিয়া নলিনাক্ষকে নায়ক হিসাবে আরো কিছু প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারিতেন, এবং নলিনাক্ষ-কেমকরীর প্রথম প্রকাশে তাঁহাদের গত জীবনের ঘটনা-বিবৃতিতে (narration এ) ইহার স্পষ্ট-নীয় অবসরও রবীন্দ্রনাথের ছিল; কারণ নলিনাক্ষ-কেম-

করীর আকর্ষিতাকে তিনি গ্রন্থের প্রথমার্ধে ষষ্ঠমানের কর্মক্ষুণ্ণতার (action এর) ভিতর দিয়া নাটকীয়ভাবে এবং তাঁহারি উপযুক্ত ভাবে নিরাকরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ইহাতে ষটনা-বিবৃতির বাঁদোষ তাহা ত হইয়াছেই, নলিনাক্ষকে নায়ক করিয়া দাঁড় করিতে না পারায় গ্রন্থের এই কলাগোষকেও সম্বর্জন করা যায় না। কিন্তু রমেশ-নলিনাক্ষের দিক দিয়া বাহা হয় না, কমলার দিক দিয়া চাহিলে সবই সহজ হইয়া আসে। কমলাই এই গ্রন্থের কেন্দ্র। রমেশের সহিত বিদায়ের পর আমরা কমলারই জীবন অধ্যয়ণ করিয়া চলি, এবং নলিনাক্ষের সহিত যে দিলন-ব্যাপার তাহা কমলারই দিলন-ব্যাপার। আমাদের দৃষ্টি-দূরবীনের সমস্ত আলোক কমলাতেই সংহত করিয়া দেখা আমাদের-পক্ষে স্বাভাবিক, এবং সেই ভাবে দেখিগে গ্রন্থাবসানের কোনো কলাদোষই থাকে না,—তবু গ্রন্থের নাম “কমলা” নয় এবং রমেশ কমলারও আগে আমাদের চিত্ত হরণ করিয়াছিল—সেই কথা আমরা ভুলিতে পারি না।

চোখের বালির বিরুদ্ধে যেমন অগ্নীমতীর অভিযোগ
 নৌকাজুঁতির বিরুদ্ধে তেমন
 অস্বাভাবিকতার
 অস্বাভাবিকতার অভিযোগ
 অভিযোগ
 এখানে সেখানে শোনা যায়।
 কমলার হঠাৎ রমেশ হইতে
 মন তুলিয়া-লওয়া ব্যাপাবে সাধারণ পাঠকের হয়ত সব
 চেয়ে বেশী খটক লাগা সম্ভব। কমলার চরিত্র-বিশ্লেষণে
 তাহা নিরাকৃত করার চেষ্টা করা গিয়াছে। অনেকে
 রমেশ-কমলার দীর্ঘ একত্র বাসকে অস্বাভাবিক আখ্যা
 দিয়া থাকেন,—কেহ কেহ বলেন রমেশের পাপস্পর্শমূল
 থাকাকাটাই অস্বাভাবিক, আর কেহবা কমলার নিকট
 হইতে রমেশের গোপনতটাকেই অস্বাভাবিক এবং অসু-
 চিত বলিয়া বলেন এ দুইটি আপত্তিই অর্থহীন, এত অর্থহীন
 যে, এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেই প্রযুক্তি হয় না,—
 তবু দেখা যাক। প্রথমতঃ, রমেশের পাপস্পর্শহীন থাকিতে

পারায় হই কারণ,—রমেশের মহত্ব এবং হেমলিনীর প্রতি তাহার ভালবাসা। দ্বিতীয়তঃ, কমলা হইতে রমেশের গোপনতার কারণ রমেশের স্বল্পভুক্তি, কমলাকে আঘাত দিবার ভয়। রমেশের চেয়ে উন্নততর মানব নলিনাক এই অবস্থায় পড়িলে তিনি হয়ত তাঁহার আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে এই সমস্তা সম্বন্ধে একটা কিছু সহজ মীমাংসা করিয়া লইতে পারিতেন, অথবা রমেশের চেয়ে স্থলবোধ মানব যোগেন্দ্র এই অবস্থায় পড়িলে হয়ত তাহার সবল-নির্দোষ স্পষ্টতার কমলাকে জদয়হীন ভাবে আঘাত দিতে পারিত, অথবা রমেশের চেয়ে হীন মানব অক্ষয় কিম্বা আর কেহ হইলে হয়ত কমলাকে নির্বিচারে জী বলিয়াই গ্রহণ করিয়া কেলিত,—কিন্তু এই তিন সব্বদাতেই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি অসম্ভব হইয়া উঠিত। অল্পভাব-স্বল্পতার এবং বিপরীত চিন্তবৃত্তির যে অন্তর্ভুক্ত তাহা আধ্যাত্মিক নলিনাকে নাই অথবা কমিয়া গিয়াছে, এবং অক্ষয়-যোগেন্দ্রেও তার নিতান্ত অভাব,—কিন্তু রমেশের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ বাস্তবিক। এই জন্য রমেশেই এই অবস্থার প্রয়োজন, নলিনাক কিম্বা অক্ষয়-যোগেন্দ্রে নয়,—কারণ অন্তর্ভুক্তের কলা-সৌন্দর্য্য ফুটানোই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। মহত্ব দৌর্যলা, আবার দুর্বলতাও মহত্ব; কমলাকে সমস্ত খুলিয়া বলিবার নিয়ত সচেষ্ঠতা অথচ আঘাত দিবার ভয়; হেমলিনীর ধ্যান, অথচ কমলাকেও স্নেহ না করিয়া থাকিবার অপারগতা; কমলার নিরুপায় নির্ভরতার জন্য সুগভীর বেদনামুভূতি, অথচ সেই বেদনা দূরীকরণে সমৃদ্ধির বাধা,—রমেশের ব্যবহারে এই বাস্তব বিরোধের জটিল এবং উপভোগ্য কলানৈপুণ্যে অস্বাভাবিকতা আরোপ করিবার কোনো অবসরই নাই। আবার হয়ত নলিনাকের কমলা-গ্রহণকেই কেহ অস্বাভাবিক বলিয়া বসিবেন;—আমার পক্ষে যাহা অস্বাভাবিক নলিনাকের পক্ষে যে তাহা খুবই স্বাভাবিক, এই কথা তাঁহাকে বুঝাইতে যাওয়া বুঝা। স্বল্প-সুখ্যার পেলব-শ্রামগ সাহিত্য-শব্দকে অনুসন্-সুগত স্কীতপদে বাড়াইয়া যাওয়াই বাঁহাদের স্বভাব তাঁহাদের সম্বন্ধে

“অজার শত ধোতেনর” শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াই নীরব হইতে চাহি।

অস্বাভাবিকতা নাই; তবে নৌকাডুবিতে এমন একটা
 লিনিয় আছে যাহা অনবধানা
 নৌকাডুবির এবং অনিপুণ লোকের হাতে
 ‘বোম্বাতিসিজন্’ অস্বাভাবিকতায় গড়াইয়া
 যাইতে পারিত—তাহা

‘রোম্যান্টিসিজন্’। রোমান্সের একটা লক্ষণ প্লটের
 গাঁথনিতে অতিরিক্ততা এবং জীবনব্যাপারে কবিত্বের
 অভিসিদ্ধি। স্কট এবং বাক্সের কথা গ্রহে তাহা আছে।
 জীবন চিত্রে সাধারণতঃ এই অতিরিক্ততা থাকে না।
 কবিত্ব থাকে না, কিম্বা থাকিতে পারে না—এ কথা বলা
 যায় না;—তবে রোমান্সের কবিত্ব সরল একমুখী
 (synthetic) কল্পনায়, আর জীবনচিত্রের কবিত্ব সূক্ষ্ম-
 জটিল বিশ্লেষক (analytic) কল্পনায়, রোমান্সের এই
 অতিরিক্ততা এবং প্রথমোক্ত কবি-কল্পনা (উভয়কে
 অনেক সময় পরস্পর অভিন্ন বলিয়া ধরা যাইতে পারে)
 ঘোঁঠাকুরাণীর হাতে আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষক
 প্রতিভার সঙ্গে খাপ খায় নাই; এই অতিরিক্ততা ও কবি-
 কল্পনা নৌকাডুবিতে আছে এবং খাপ খাইয়াছে।
 রমেশ ও কমলার মিলন-দৃশ্যের মত এমন কল্পনা-সৌন্দর্য্যে
 রবীন্দ্রনাথ আর কোন উপন্যাসের ভিত্তি গাঁথেন নাই।
 নৌকাডুবির এই ভিত্তিমূলেই রোমান্সের অতিরিক্ততা
 আছে, আর কমলার গৃহত্যাগে এবং গ্রন্থ শেষে সকলের
 কানীতে মিলনেই যে কিছুমাত্র নাই তাহা বলিতে পারি
 না। কিন্তু এই অস্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতা নহে,
 এই অতিরিক্ততা নৌকাডুবির বাস্তবতার কিছু মাত্র
 হানি করে নাই, বরং গায় গায় মিলিয়া গিয়াছে।
 উপন্যাস-রচনার বিবিধ প্রণালীর এই সমস্ত নৌকা-
 ডুবির একটি শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব। এই অন্য বিচকণ পাঠকগণকে
 পীড়া না দিয়াও নৌকাডুবির সর্বসাধারণের প্রিয়
 হইয়াছে আশা করা যায়, প্রকৃত পক্ষে হইয়াছে কি না
 যদিও তাহা ঠিক বলা যায় না।

নৌকাডুবির আর একটি প্রধান বিশেষত্ব বাহ্য
 নৌকাডুবির প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে না
 অবস্থা পরিকল্পনা পড়িয়া যায় না—ইহার অভিনব
 অবস্থা-পরিকল্পনা (Situation) পর-স্ত্রী এবং পর-স্বামীর
 একত্র বাস এবং পর-স্বামীকে পর-স্ত্রীর আপন স্বামী
 মনে করা। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের নবোন্মেষিণী কল্পনা-
 শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ অবস্থা-পরিকল্পনা
 আমাদের সাহিত্যে আর নাই, অথ কোথাও আছে কি
 না খবর রাখি না,—থাকিলেও হিন্দু দাম্পত্য জীবনের
 আদর্শ হইতে ইহা এমন একটা বলিষ্ঠ emphasis
 পাইয়াছে যে, বিদেশে তাহার সুযোগই নাই। কালের
 ভাল আরম্ভটাই অর্ধেক কালের সমান, এই পরিকল্পনাটাই
 সাহিত্যশিল্পি হিসাবে একটা মস্ত লাভ। বিশেষতঃ
 রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ হৃদয়বিশ্লেষণের একটা বিশিষ্ট
 অবসর দেওয়াতে ইহার কল্পনা-সৌন্দর্য্য এবং ক্রিয়া-
 নৈপুণ্য আগো বাড়িয়া গিয়াছে। পাঠকের হৃদয়কে
 সহানুভূতিতে এবং বেদনায় মগ্ন করিয়া দিবার পক্ষে
 এমন অনুকূল পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ আর করেন নাই।
 এই জন্যই নৌকাডুবি তাহার উপন্যাসের মধ্যে করুণ
 রসে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এই বড়টির ছায়ায় ছোটখাটো আরো কতগুলি অবস্থা
 পরিকল্পনা আছে,—কথায় অভিযুক্ত সে গুলি খুব কমই,
 পরন্তু চাপা রহণের ভারে এবং পবিত্রতার
 মৌনমুখ; কানের কাছে ছুটা একটা অবান্তর
 শব্দে মুগ্ধ হইয়া উঠিলেও হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে
 নীরব হাহাকারে মরিয়া যায়। কমলা-হেমলিনীর
 এবং কমলা-রমেশের বিনায় দৃশ্য দুইটি পাঠককে স্বপ্নে
 আনিতে অগ্ররোধ করি। এসম্বন্ধে আর কিছু না
 বলাই সব চেয়ে বেশী-বলার উপায়।

যুবক যুবতীকে লইয়া সংসারের কর্ম, প্রবীণ প্রবীণারা
 চোখের বালি ও শুধু দর্শক এবং নিয়ামক মাত্র।
 নৌকাডুবি উপন্যাস জীবনের ছবি,
 উপন্যাসে ও যুবকযুবতীদের প্রধাত থাকিতেই বাধ্য

চোখের বালির কর্ণবস্ত্র দুইটি বুকে বুতী লইয়াই উচ্ছৃঙ্খলিত, নৌকাডুবিতেও তাই। চোখের বালির মহেজের মহত্ব নাই, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু সে যে দুর্লভ চরিত্র এই কথাটাই আমরা বিশেষ করিয়া জানি। নৌকাডুবির রমণের দুর্লভতা নাই, তাহা নহে। কিন্তু তাহার স্বভাবের মহত্ব এবং সৌকুমার্যের (Refinement) পরিচয়টাই আমরা বিশেষ করিয়া পাই;—মহেজের দুর্লভতার একটা চরমতা আছে, রমণে তাহা নাই। চোখের বালির বিনোদিনীতে শিক্ষিত বুদ্ধির একটা তীক্ষ্ণতা আছে, তাহা অসম্পূর্ণ প্রথম শিক্ষার ফল,—এইরূপ শিক্ষার দশজনকে আশ্রিত করে, না মিলাইয়া ঠেলিয়া দেয়, না গড়িয়া তোলে। নৌকাডুবির হেমনলিনীতে শিক্ষিত বুদ্ধি ও চরিত্রের মাজিত সংযততা আছে, তাহা প্রকৃত শিক্ষার ফল; এইরূপ শিক্ষা দশজনের প্রতি স্নেহে প্রেমে মধুর হইয়া উঠে। চোখের বালিতে বিলাসাকর্ষণ ও পতনের উগ্রতা, নৌকাডুবিতে প্রতিকূলবাহ্য পড়িয়া মহতের বেদনামহন-ক্লম্ব হইলেও পূত-সংযত অন্তর্ভূতের সক্রিয় দৃষ্টিতা। চোখের বালিতে শিক্ষিতা বিধবা বিনোদিনীর যে পারিপার্শ্বিক এবং কাজ, নৌকাডুবিতে শিক্ষিতা ব্রাহ্ম হেমনলিনীর সেই পারিপার্শ্বিক এবং কাজ। চোখের বালিতে বিহারী বিনোদিনীর অসামাজিক বিবাহ হয় নাই। শিক্ষায় ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইলেও বিনোদিনী হিন্দু সমাজের, নৌকাডুবিতে ব্রাহ্ম উপকরণ নুতন। ব্রাহ্ম চরিত্র যথেষ্ট সঙ্গদয়তার সহিত অঙ্কিত হইলেও নৌকাডুবিতে হিন্দু সমাজেরই জয় ঘোষিত হইয়াছে বলিতে হইবে—রমণ হেমনলিনীর অসামাজিক বিবাহ নিষ্ফলতা দ্বারা পীড়িত, দাম্পত্য জীবনের আদর্শ কীর্তনই নৌকাডুবির প্রাণ, কমলা নলিনাক্ষের মিলনে সেই আদর্শেরই জয়, নলিনাক্ষ ব্রাহ্ম হইয়াও হিন্দু আচার-পরায়ণ, নলিনাক্ষ ও ক্ষেমকরীতে হিন্দু-আচারেরই সমর্থন নলিনাক্ষ দ্বিগত ব্যাপারে হিন্দু আচার মাত্র বিধেয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিই একটু ভীতি স্নেহ। নৌকাডুবির যুগ রবীন্দ্রনাথের হিন্দুসমাজ-সমর্থনেরই যুগ, দেশের

প্রাণের মাঝে তখন তিনি আনন্দ-নিকেতন খুঁজেন, স্বদেশের দুঃস্থতাকেও তখন তিনি স্বদেশের সহিত ভাল বাসেন। সেই সময়কার প্রবন্ধাবলীর রবীন্দ্রনাথ সে সময়ের উপস্থাপন নৌকাডুবিতেও বর্তমান।

চোখে বালির হাতা রাজলক্ষ্মীকে আমরা নৌকাডুবিতে আসিয়া মাতা ক্ষেমকরীতে পাইয়াছি, চোখের বালির সাত্বিকা অন্নপূর্ণাকেও ক্ষেমকরী চরিত্রের অন্তর্য্যামিত্য লাভ করিয়াছি; তথাপি মাতৃহৃৎ এবং সাত্বিকতার ক্ষেমকরীর সহিত রাজলক্ষ্মী এবং অন্নপূর্ণার কোন জায়গার প্রার্থন্য তাহা পূর্বেই দেখা গিয়াছে। চোখের বালির পুত্র মহেজ, আর নৌকাডুবির পুত্র নলিনাক্ষ। মহেজ বিহারীর বন্ধুত্বকে আমরা যোগেন্দ্র রমণে লাভ করিয়াছি। তবে নৌকাডুবিতে পিতা অন্নদা ও কন্যা হেমনলিনী নুতন।

চোখের বালির মহেজ বিহারী বিনোদিনীরা হস্ত এবং ব্যঙ্গবাক্যে বিশারদ সন্দেহ নাই, রাজলক্ষ্মীর অভিমানে পাঠকের ওষ্ঠ-প্রান্তে কৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠে বটে, কিন্তু চোখের বালিতে নিজ্জলা কৌতুক চরিত্র একটুও নাই। নৌকাডুবিতে নিজ্জলা কৌতুক চরিত্র অনেক আছে,—অন্নদা বাবু (একদিকে) চক্রবর্তী খুড়া, যোগেন্দ্র, অক্ষয় ও নবীনকালী। ‘পিল’ ইত্যাদি সম্পর্কে অন্নদা বাবু না জানিয়া পাঠকে হাসান, আর চক্রবর্তী খুড়া নিজে হাসিয়া পাঠকে হাসান, দু’টি চরিত্রই ব্রিঙ্ক হস্ত-কৌতুকের ভাণ্ডার। অক্ষয় ও নবীনকালী-চরিত্রের হাসিটা অল্পবিস্তর ব্যঙ্গ মিশ্রিত, তবে অক্ষয় তাহার কথায় রসিকতা মাখিয়া তাহার সম্বন্ধে ব্যঙ্গটাকে একটু তরল করিয়া দেয়, আর নবীনকালীর রসহীন সর্লীর্ণ আন্তরিকতায় তাহার সম্বন্ধে ব্যঙ্গটা ভীতই থাকিয়া যায়, ফলে দু’জনই হীন। হীনতাকে নিয়া যে কৌতুক তাহাই ব্যঙ্গ। যোগেন্দ্রের মোটাবুদ্ধি এবং স্থূল প্রকৃতিতে নিয়া যে কিছুমাত্র ব্যঙ্গ নাই তাহা নহে, তবে তাহার সরল সহাস্য সরলতার আমরা ব্রিঙ্ক হাসির কৌতুকটাই বেশী অনুভব করিয়া থাকি। প্রথম দৃষ্টিতেই দেখা যায়

নৌকাডুবি'র চরিত্রবৈচিত্র্য এবং চরিত্র-সংখ্যা চোখের বালি হইতে বেশী। চোখের বালিতে মহেন্দ্র-আশা-বিহারী-বিনোদিনীই প্রধান চরিত্র, রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা তাহাদের স্ত্রী হুঃখের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে জড়িত বলিয়াই উপন্যাসে তাঁহাদের স্থান। এ ছয়টি ছাড়া চোখের বালিতে আর কোনো চরিত্র-সৃষ্টি নাই। নৌকাডুবিতে রমেশ-হেমনলিনী-কমলা-নলিনাক্ষই প্রধান, অন্নদা ক্ষেমঙ্করীর স্থান এদের কাহারো সহিত নিগূঢ় স্নেহ-যোগেই। নৌকাডুবির অন্য চরিত্রগুলি ঘটনার সহিত তাহাদের নানা রকম যোগ থাকে সত্ত্বেও কম বেশী আগন্তুক চরিত্র। এই আগন্তুক চরিত্রের সংখ্যা নৌকাডুবিতে কম নহে, এবং ইহাতে নৌকাডুবির কলেবরও চোখের বালি হইতে বাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ হইবার একটা গুঢ় কারণ বর্তমান, নিয়ে তাহার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। হৃদয়-বিশ্লেষণ এবং মনস্তত্ত্ব প্রকাশ হই জিনিষ। পাত্রপাত্রীর হৃদয় বিশ্লেষণ করা হইলেও সব সময়ই যে তাহাতে মানসব্যাপারের বিশেষ কোনো একটা তরু ফুটিয়া উঠিবে তাহা না-ও হইতে পারে, অথবা কোনো বিশেষ পাত্রের হৃদয় বিশ্লেষণে ছোটখাটো মনস্তত্ত্ব প্রকাশ থাকিলেও সেই পাত্রের সমস্ত চরিত্র-ব্যাপারে একটা বড় মানস সত্য ফুটিয়া না উঠা অসম্ভব নহে। চোখের বালি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। ইহাতে হৃদয়বিশ্লেষণ যথেষ্ট থাকে সত্ত্বেও একটা মানসতা সমস্ত পুস্তককে আগা গোড়া বিশ্বস্ত করিয়া রাখিয়াছে। নৌকাডুবির হৃদয় বিশ্লেষণে যেখানে সেখানে কোনো মানসতা নাই, তাহা নহে। হেমনলিনী ও কমলা দুজনকেই রমেশের ভালবাসায়, রমেশের প্রতি কমলার হঠাৎ বিষমিতার এবং অন্যান্য নানা স্ত্রে আমরা এই মানসতার স্পর্শ পাইয়া থাকি। কিন্তু নৌকাডুবির সমস্তটা জুড়িয়া মনোবৃত্তিমূলক কোনো বিশেষ সত্য তেমনভাবে প্রকাশ পাইয়া উঠে না। চোখের বালি আগা গোড়া metaphysical, ইহার ঘটনাবলী হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করিলেও, ইহার সমস্ত ব্যাপারকেই

আমরা গ্রন্থকারের মনের ভিতর দিয়াই দেখি, ইহাতে যেন গ্রন্থকার নিজেকেই ভাঙিয়া চুরিয়া আনিয়া বাহিরে আঁকিয়াছেন। নৌকাডুবিতে এই স্বাক্ষর (self-painting) নাই তাহা নহে, তবে ইহাতে প্রত্যক্ষ বহির্জগতের ছবিও বিস্তর আছে। একনিষ্ঠ মানসতায় (Intellectuality) চোখের বালি শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই, হৃদয়বস্তার নৌকাডুবি শ্রেষ্ঠ তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, এখানে জীবনচিত্রাঙ্কনেও নৌকাডুবির শ্রেষ্ঠতার পরিচয় পাইলাম। বহির্জীবন বিচিত্রতার লীলাভূমি, সেখানকার ছবিকে যে এল্লাবো পূত্র যাইবে তাহাকেও বাধ্য হইয়াই বিচিত্র হইতে হইবে।

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা এই আলোচনা শেষ করিব,—সেটি অবসানেরই কথা, কারণ সেটি আধ্যাত্মিকতার কথা। চোখের বালিতে আধ্যাত্মিক চরিত্র মাত্র একটি, অন্নপূর্ণা। নৌকাডুবিতে আসিয়া তাঁহার সংহত আধ্যাত্মিকতা নলিনাক্ষে, ক্ষেমঙ্করীতে, এবং এমনকি নলিনাক্ষের জীবন এবং কথার সত্যতা মনের সহিত উপলব্ধি করিবার ক্ষমতার কতকটা অন্নদাতেও, ছড়াইয়া গিয়াছে। এই 'ছড়াইয়া যাওয়া' কথা নলিনাক্ষ সম্বন্ধে ঠিক ষাটে না, কারণ নলিনাক্ষের আধ্যাত্মিকতার গাঢ়তা কিছুমাত্র কম ছিল না। আর নলিনাক্ষের (ক্ষেমঙ্করীরও বটে), কাজেই নৌকাডুবির, আধ্যাত্মিকতার একটা বিশেষত্ব আছে। চোখের বালির অন্নপূর্ণা উপন্যাস চিত্রিত পাত্রপাত্রীর 'ministering angel,' বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে তাঁহার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই; তিনি মহেন্দ্র-বিহারীকে পরিচালনা করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু নিজে কিছুই করেন না, সংসারের সহিত বন্ধন কাটাইয়া সংসারকে ত্যাগ করাই তাঁহার লক্ষ্য। কিন্তু নৌকাডুবির নলিনাক্ষ উপন্যাস-সংসারের একটি অন্তরঙ্গ চরিত্র, তিনি সংসারের জুহুতার বন্ধনে থাকিয়া সেখানে আধ্যাত্মিকতার চিরমুক্ত বদল ছাতি বিভাসিত করিয়া তুলেন, এবং এমন কি বর্ণগন্ধময়

জানুয়ারি ১৯১৯

পার্বি পত্নীপ্রেমের মর্মকোষটির মাঝেও তাঁহার সেই
আধ্যাত্মিকতার উজ্জ্বল অমর আসন চির বিরাজমান।

শ্রীমুখরঞ্জন রায়।

বিজলীর পিতা
স্থান কলিকাতা
কাল ... বঙ্গদেশী আন্দোলনের প্রথমাবস্থা।

সন্ধান

হে সুন্দর, হেরি' তব রূপের আভাস
বিকশিত পুষ্পদলে, উষার কিরণে,
সন্ধ্যার সুবর্ণ মেঘ রঞ্জিত গগনে,
শারদ কৌমুদীজালে মিটে নাই আশ।
দেখিব মুরতি তব দুটি আঁধি ভরে'
তাই নিশিদিন কত করেছি আহ্বান—
কোথা তুমি! কোথা তুমি!—ব্যাকুল পরাণ
তোমাতে ঝুঁজেছে শুধু বিশ্ব চরাচরে।
শ্রান্ত জীবনের বেলা ক্রমে অবসান!
এত দিনে—এত শত বার্ষ চেষ্টা পরে—
মনে হয় পাইয়াছি তোমার সন্ধান;
তুমি যে রয়েছ সদা আমার অন্তরে।
আমি শুধু গন্ধমস্ত যুগের মতন
ফিরিয়াছি ঝুঁজি তোমা সারাটি ভুবন।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

প্রত্নতত্ত্বের এক পৃষ্ঠা

(বিক্রমপুরে প্রাপ্ত লক্ষ্মীমূর্তির প্রচ্ছন্ন ইতিহাস)

পাত্র পাত্রীগণ

মিঃ বামাপদ বসু ... ইতালী হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত
দরিদ্র যুবক ভাস্কর, বিজলীর প্রণয়প্রার্থী
আন্তোভোব মিত্র মিঃ বসুর বাল্য বন্ধু
বিজলী শিক্ষিতা যুবতী, মিঃ বসুর
প্রণয়িনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(বিজলীর কক্ষ—মিঃ বসু ও বিজলী)

বিজলী। বামাপদ, প্রিয়তম, বাস্তবিকই আমি
তোমাতে আপনার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি!

বামাপদ। তা জানি প্রিয়তমে, কিন্তু তোমার পিতা
অত কঠিন কেন?

বি। তাঁর উদ্দেশ্য কিছু মন্দ নয় মিঃ বসু; শিল্প বিজ্ঞা
তাঁর কাছে ছেলে মানুষী মাত্র, তিনি কেবল তাঁর নিজের
বাবসারাই ভাল বোঝেন! তাঁর বিশ্বাস আমাকে বিবাহ
করে তুমি আমাকে ভরণ পোষণ করতে পারবে না।

বা। আমার মাথা আর মুণ্ড! হায় যদি দারিদ্র্য-
দোষদম্পন্ন, অনাহার-ক্লান্ত কলা-কুশল ভাস্কর না হয়ে
এক জন অর্থলিপ্সু চতুর বাবসারী হতেন, তা হলে বেশ
হত না, বিজলী? হায়! তোমার আশায় আমি নিজে
যথা সর্ব্বত্র বিক্রয় করে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে গিয়ে-
ছিলাম, আর আজ যখন ফিরে এলাম তখন—

বি। হতাশ হয়েনা তুমি; বিশ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ
করতে পারলেই আমাদের বিবাহে বাবার আর কোনও
আপত্তি থাকবে না।

বা। বিশ হাজার! সে যে অনেক টাকা বিজলী!
সময় পেয়ে তুমিও পরিহাস করছো! জান কি বিজলী
আজ তিন মাস হল হোটেলের দেনা শোধ করতে
পারিনি!

বি। এই যে বাবা আসছেন, আমি যাই। (প্রস্থান)

(বিজলীর পিতার প্রবেশ)

বা। নমস্কার। দেখুন, আপনি বলে ছিলেন আমি
বিলাত থেকে ফিরে এলে আমার সহিত বিজলীর বিবাহ
দেবেন; আমি সেই আশাতেই নিজের বা কিছু ছিল

সমস্ত বিক্রয় করে সাংগঠনিক এসোসিয়েশনের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করে ইউরোপে গেলাম। তারপর, সেখানে ৩৪ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর আজ যখন আমি ভাস্কর বিজ্ঞান নিপুণ হয়ে এখানে ফিরে এলাম তখন আপনি—

বিঃ পিতা। থাক। তোমার বৃথা বক্তৃতায় কোন লাভ নেই, বাপু। অবশ্য তোমার বিক্রয়ে বলবার আমার কিছু নেই; কিন্তু আমি ত আমার মেয়েকে কেবল মায় বাক্য-সর্বস্ব প্রেম, শিল্প-বিজ্ঞান অনাহার ও দারিদ্র্যের হাতে তুলে দিতে পারি না! কি বল, এ ছাড়া আমার মেয়েকে দেবার মত তোমার আর কিছু আছে কি?

বা। মহাশয়, স্নোকার করি আত আমি দরিদ্র, কিন্তু মাহুকের বশ ও সুখ্যাতি কি কিছুই নয়? লাট সভার মেম্বর অনারেবল নরেন্দ্র নাথ মিত্র বলেন যে, আমার সম্প্রতি ধোদিত “ভারত মাতার” কৃষ্ণ-প্রস্তর মূর্তিটি ভাস্কর শিল্পের একটি অপূর্ণ নিদর্শন; তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস কালে আমার নাম দেশ বিখ্যাত হবেই হবে।

বিঃ পিতা। ও সব বাজে কথা। তিনি লাট সভার সভ্য হতে পারেন, কিন্তু শিল্পবিজ্ঞান তিনি কি জানেন? বাপু, বশ ও সুখ্যাতি নিয়ে কি ধুয়ে ধাবে? তোমার সেই প্রস্তর মূর্তির বাজার দর কত সেইটাই ভাববার বিষয়। ছ’মাস পরিশ্রম করে তুমি সেটা তৈয়ারী করেছ কিন্তু তার দাম বড় জোড় এক শ টাকা হবে, এই ত! না বাপু; যদি ২০০০০ টাকা দর কখন সংস্থান করতে পার তবেই আমার মেয়েকে পাবে; তা না হলে, বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মিঃ বোম্বের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দেবো। টাকা সংগ্রহের জন্য ছ’মাস তোমার সময় দিলাম। এখন এনো, নমস্কার! (প্রস্থান)

বা। হায় অদৃষ্ট! এত চেষ্টা, এত উত্তম, এত আশা, তার শেষ পরিণাম এই! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ত্রিগোপাল মল্লিক লেনস্থ একটি মেসের নিয়তনস্থ অঙ্ককার গৃহ)

বামাপদ ও আশু।

বা। আশু, তুমি আমার বাল্য বন্ধু, তোমার কাছে আমি কিছু গোপন করছি না; আমার মত অল্পবী বোধ হয় পৃথিবীতে কার কেহ নেই! আমার সমস্ত জীবনই ব্যর্থ হয়ে গেল?

আ। তুমি একটি আশু গর্ভত!

বা। এক এই প্রস্তর মূর্তিটি ছাড়া আমার ভাল বাসবার আর কেউ নেই! আজ তারও ভূবার-শীতল পাষণ মুখে আমার এই হৃৎকের সহানুভূতির চিহ্ন মাত্র নেই যেমনি সুন্দরী, তেমনি হৃদয়হীন!

আ। তুমি একটি আদম্বেকুব!

বা। হায়, আশু, তুমি যদি বুঝতে—

আ। তুমি এত উতলা হচ্ছে কেন? এই মাত্র না তুমি বললে যে, টাকা সংগ্রহের জন্য ছ’মাস সময় পেয়েছ?

ক। আমার এ হৃৎকের সময় তুমি পরিহাস করো না; ছ’মাস কেন. ছ’শতাব্দী হলেও আমার কোনও লাভ নেই আশু, আমার মত অর্থহীন, বন্ধুবান্ধবহীন, বশহীন, পথের কাঙ্গালের আর তাতে লাভ কি?

আ। মূর্খ! ভীক! কচি খোকা! ছ’মাস তোমার সময় রয়েছে, পাঁচ মাসই যথেষ্ট!

বা। তুমিও কি পাগল হলে, আশু?

আ। ওগো বাপু! ছ’মাস যথেষ্ট সময়! তুমি আমার উপর নির্ভর কর, আমি তোমার টাকা সংগ্রহ করে দেবো।

বা। তুমি কি বলছ? এতগুলো টাকা তুমি সংগ্রহ করবে কি করে. আশু; তাও আবার আমার জন্য।

আ। বলি, সেটা আমার হাতে ছেড়ে দেবে কি? বল আমার কোন বাধা দেবে না, আমি যা করবো তাতে কথাটি কবে না; সব সহ করবে; কেমন প্রতিজ্ঞা করছ ত?

বা। আমার মাথা ঘুরছে; আমি কিছু বুঝতে পারছি না; তবু আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

[কক্ষতল হইতে একটা হাতুড়ি তুলিয়া আত্ম অদূর স্থিত 'ভারত মাতার' প্রস্তর মূর্তির নাসিকার আঘাত করিল। নাসিকার অগ্রভাগ পড়িয়া গেল; আর এক আঘাতে হাতের দুটো অঙ্গুলি খসিয়া গেল। এইরূপে আঘাতের পর আঘাতে ক্রমে ক্রমে প্রস্তর মূর্তির পায়ের অঙ্গুলি, বাম কর্ণ ও দক্ষিণ পদের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া মাটিতে গড়া গড়ি দিতে লাগিল।

আত্ম বাহির হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ পরে একটা গাড়ী ডাকিয়া ভগ্ন মূর্তিটাকে তুলিয়া লইয়া দিব্য প্রশান্ত ভাবে শিব দিতে দিতে চলিয়া গেল।

বামাপদ নিবাত নিষ্কম্প ভাবে আশুর এই ধ্বংসলীলা দেখিতে লাগিল, পরে সে চলিয়া গেলে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।]

(পট ক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

[পূর্ববর্তী কক্ষ, বামাপদ একাকী বিষম মনে উপবিষ্ট]

বা। আজ ছ'মাস পূর্ণ হবে। ওঃ! সমস্ত জীবনটা আমার ব্যর্থ হয়ে গেল; হায়! হায়! এর চেয়ে মৃ'হু ছিল ভাল! কাল রাত্রে খাওয়া হয় নি, আজ সকালেও পেটে কিছু পড়ে নি, কোনও হোটেলের প্রবেশ করতে সাহস হয় না! পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই মিলে আমার বিরুদ্ধে বড়বন্দ্য করেছে! আমার জুতাওয়ালার আমাকে রাস্তা ধ'বার্টে অপমান করেছে, সে দাম পায় নি; দরজী. সে ত দু'তিনটা সূতের দাম পাবে, আদালতে নালিস করবার ভয় দেখাচ্ছে; বাড়ীওয়ালার বাড়ী ভাড়া বাকী, সেও রোজ ভাগিদ দিচ্ছে! আর আমি পারি না। এদিকে সে দিনের পর থেকে আশুর আর দেখা সাক্ষাৎ নেই। আর বিজলী! সেদিনে দৈবাৎ তাহার সহিত ইডেন গার্ডেনে দেখা হলে একটু করুণ হাসি হেসে আমার দিকে

তাকালে, কিন্তু পরক্ষণেই তার পাখাণ বাপের ভাড়নার মুখ ফিরিয়ে নিলে! (বাহিরে দরজায় করাঘাত)।

ওকি দরজায় যা দেয় কে! এ নিশ্চয়ই সেই জুতাওয়ালার। এস, ভিতরে এস! (জুতাওয়ালার প্রবেশ)।

জুঃওঃ। বড় সূতের বিষয় বাবু, বড় সূতের বিষয়। ভগবান আপনার আরো ভাল করুন।

বা। কিন্তু তোমার বাকী দামটা—

জুঃওঃ। না না, দামের কথা ভুলবেন না, তার জন্ত আমার কোমণ্ড ভাড়াভাড়া নেই, এখন সূবিধা হয় দেবেন; কিন্তু ভবিষ্যতে যেন আপনার অর্ডারগুলি পাই! আজ তবে আসি; নমস্কার। (প্রস্থান)

বা। একি! নিজে জুতাজোড়া নিয়ে এল, দাম পর্যন্ত নিলে না; যাবার সময় রাজার মত খাতির করে নমস্কার করে বিদায় নিলে! আবার তার ওপর ভবিষ্যতে তাকে কাজ কর্ত্তের অর্ডার দেবার জন্ত অনুরোধ করলে! পৃথিবীতে কি প্রলয় আসন্ন হয়েছে! (বাহিরে দরজায় করাঘাত) এস, ভিতরে এস! (দরজীর প্রবেশ)

দরজী। মহাশয় ভগবান আপনার আরো 'বাড় বাড়ন্ত' করুন। কিছু মনে করবেন না; আমি আপনার সেই সূটটা (বাহিরে দরজায় করাঘাত)

বা। এস, ভিতরে এস!!

(বাড়ী ওয়ালার প্রবেশ)

বাঃওঃ। অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম কিছু মনে করবেন না। আপনার ব্যবহারের জন্ত উপরের দক্ষিণ দিকের দুটো ঘর ঠিক করে রেখেছি; আপনার এ অবস্থায় আর এই অন্ধকার ঘরটায় কাজ করা শোভা পায় না। কালকেই আপনি—(বাহিরে দরজায় করাঘাত)

ডাঃওঃ। বাবু, একঠো চিঠি। (পত্র প্রদান)

বা। দেখি। (পত্র খুলিয়া) একি! টমাস কুক কোম্পানীর ম্যানেজার লিখছেন, “আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ ক্রমে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, সম্প্রতি আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে অর্ধাবির ‘লেন

‘দেন’ লইয়া যে গোলমাল চলিতেছিল তাহা মিটিয়া গিয়াছে। এখন হইতে আপনি আবার আমাদের সহিত পূর্ব মত কারবার করিলে কর্তৃপক্ষেরা আপনাদিগকে অনুগ্রহীত বোধ করিবেন।” এর মানে কি? আমি ত কিছুই বুঝতে—(বাহিরে দরজায় করাঘাত) এস, ভিতরে এস!!!! (বিজলীর পিটার প্রবেশ)

বিঃ পিঃ। এই যে বসে! বিজলী তোমারি, সে এখনই এখানে আসছে! আমি এগিয়ে তোমাকে সংবাদ দিতে এলাম। তাকে বিবাহ করে সুখে দীর্ঘ জীবন যাপন কর, এই আমার আশীর্বাদ। ভগবান তোমাদের সুখে রাখুন। বিজলীর আমার—(বাহিরে দরজায় করাঘাত)

বা। এস, ভিতরে এস!!!! (বেগে বিজলীর প্রবেশ—
বামাপদর গলায় পড়িয়া)

বি। বামাপদ, প্রিয়তম, আজ আমাদের কি সুখের দিন!

বা। (বিজলীকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া) বিজলী, হৃদয় সর্বস্ব, আজ আমাদের সুখের দিনই বটে! কিন্তু কি করে যে এমন সুখের দিন হ’ল, তা’ত আমি বুঝতে পারছি না; সবই যেন স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে! একি সত্য!

(পট ক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[ছারিসন রোডের মোড়—চায়ের দোকান। কয়েক জন নব্য যুবক চা খাইতে খাইতে গল্প করিতেছে—এক জন সংবাদ পত্র পাঠে রত]

১ম যুবক। ওটা কি কাগজ হে?

২য় যুবক। আজকের দৈনিক—সংবাদ প্রবেশিক।

১ম যুবক। কোনও কৌতূহল জনক সংবাদ আছে নাকি?

২য় যুবক। আছে; খুব আশ্চর্য ঘটনা।—শোন।

[সকলে স্ব স্ব চেয়ার টানিয়া দ্বিতীয় যুবকের চারি দিকে ঘেরিয়া বাঁসলে যুবক পড়িতে লাগিল]

অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার।—আজ প্রায় ছ’মাস হইল ত্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র নামক বিক্রমপুর নিবাসী একটি ভদ্রলোক বিক্রমপুরের অন্তর্গত খাঁড়গুলি গ্রামে প্রায় ২০০.৩০০ বিঘা জঙ্গলাকীর্ণ পতিত জমী ক্রয় করেন। কয়েক দিন পরে আশু বাবু জেলার বেত্তেঙ্গী আফিসে গিয়া এই ভূখণ্ড নিষ্কৃত কোনও ক্ষতির পূরণ হিসাবে বামাপদ বসু নামক (যিনি সম্প্রতি বিজ্ঞান শিক্ষা সভার ব্যয়ে ইতালী হইতে ভাস্করবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন) তাঁহার এক বাল্য বন্ধুর নামে লিখিয়া দেন এবং নিজের ব্যয়ে সে জমীর ব্যবহারোপযোগী সংস্কার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। আজ প্রায় এক মাস হইল ভূমিতে আবশ্যকীয় খননাদি করিতে করিতে আশু বাবু একটি অপূর্ণ পুরাতন প্রস্তর মূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মূর্তিটি একটি অনিন্দ্য সুন্দর রমণীর। যদিও বহু কাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকায় মূর্তিটি এখন জ্যোতিহীন তথাপি এখনও ইহাকে দেখিলে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। মূর্তিটির নাসিকার অগ্রভাগ, হাতের ও পায়ের অঙ্গুলি, বাম কর্ণ এবং দক্ষিণ পদের কিয়দংশ নাই; এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কোথাও কিছু হয় নাই।

আশু বাবু এই আবিষ্কার বার্তা গোপন রাখিয়া মূর্তিটি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির একটি বিশেষ অধিবেশনে প্রদর্শন করেন। উপস্থিত সকলে মূর্তিটির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন, এবং অনেক গবেষণার পর সকলেরই মতে ইহা অবিসংবাদিত সত্যরূপে গৃহীত হয় যে, এই মূর্তিটি ভারতীয় ভাস্কর শিল্পের একটি অত্যাঙ্গুল নিদর্শন। শুধু তাহাই নহে এই মূর্তির সহিত উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর ও কলারকের খোদিত প্রাচীন মূর্তিগুলির সহিত এত সৌসাদৃশ্য আছে যে, ইহা যে একই শিল্পীর রচিত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না, এবং যখন এই

মূর্তিটি বাংলা দেশের ভূগর্ভে পাওয়া গিয়াছে তখন উড়িষ্যার মন্দিরাদি বাঙ্গালীর রচিত নহে বলিয়া যাহারা সন্দেহ করিতেন আশা করি তাহাদের সে ভ্রান্ত ধারণা এত দিনে দূর হইবে। সভার মতে মূর্তিটি পদ্মালয়া লক্ষ্মীর। সভার মূর্তিটি ক্রয় করিয়া সোসাইটির সংগ্রহ ভবনে রাখিতে চাহিলে তাহার মূল্য নিরূপণের জন্ত বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, সরকারী আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল, গবর্ণমেন্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্টর বাহাদুর, বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়।

এত দিন পর্যন্ত সমস্ত বাপারটি গোপন রাখা হইয়াছিল; গত গল্য তাহাদের শেষ অধিবেশনে তাহারা স্থির করেন যে, এইরূপ একটি অত্যন্ত কালের শিল্পের নিদর্শনের মূল্য নূন কল্পে ২০০০০ মূদ্রা হওয়া উচিত।

ইতিমধ্যে কলিকাতার প্রসিদ্ধ শেঠবংশীয় কুমার বাহাদুর এই মূর্তির সন্ধান পাইয়া ২৫০০০ টাকা মূল্যে উহা স্বীয় পুরাতন শিল্প সংগ্রহের ভিত্তি ক্রয় করিবার অভিলাষী হন। এ দিকে আমাদের দেশের গৌরব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষেরা ধনঞ্জয় বাবুর প্রস্তাবে ও উত্তোষে এবং পরিষদের পৃষ্ঠপোষক মহারাজ-ঘরের আনুকূল্যে ৩০০০০ হাজার টাকা প্রদান করিয়া উক্ত মূর্তিটি ক্রয় করিয়া লইতে চাহেন।

বলা বাহুল্য সাহিত্য পরিষদের মূল্য সর্বোচ্চ হওয়ার আশা বাবু মূর্তিটি পরিষদকে উহা বিক্রয় করিয়াছেন; মূর্তিটি অল্প প্রাণ্ডে পরিষৎ গৃহে নীত হইবে।

যে ভূমি খণ্ডে উক্ত মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছে তাহা আইন অনুসারে বামাপদ বাবুর বলিয়া আশা বাবু উক্ত ৩০০০০ সহস্র মূদ্রা তাহাকে অর্পণ করিয়াছেন। আমরা বামাপদ বাবুর এই অসাধারণ সৌভাগ্যোদয়ে আন্তরিক সুখী।

১ম, ৩য়, ৪র্থ যুবক। (সমস্বরে) কপাল! কপাল! তা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

৫ম যুবক। বঙ্গের বিভিন্ন জেলা সমূহে এইরূপ স্থানের অভাব নাই। বহু পূর্বে যে স্থানে সমৃদ্ধিপূর্ণ নগর ছিল, সে সকল স্থান এখন পরিত্যক্ত, জঙ্গলাকীর্ণ। আশুন আমরা জন কয়েক নব্য যুবক মিলে একটি যৌথ কারবার খুলে এই সকল পতিত জমী ক্রয় করে খনন কার্য আরম্ভ করি; আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই স্বদেশী যুগে সকলে ঐকান্তিক চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই এইরূপ নানাবিধ মহারত্নের আবিষ্কার করে নিজেরাও লাভবান হব এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সমস্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হব।

যথার্থ ই বলেছেন—

যেখানে দেখিবে ছাই

উড়াইয়া দেখে তাই—

মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।

সকলে সমস্বরে। অতি সাধু প্রস্তাব। আমরা

সকলে সম্মত। বলুন বন্দে মাতরম্।

(পট ক্ষেপণ)

চতুর্থ অঙ্ক।

(৫ বৎসর পরে)

প্রথম দৃশ্য

[বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষৎ বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প প্রদর্শনী]

(জন সমাগম—পুত্র সহ মিঃ বসু ও বিজ্ঞানী, পরিষদের এক জন কর্মচারী সকলকে প্রদর্শিত জব্যাদি বুঝাইয়া দিতেছেন)

কর্মচারী। ই দেখুন, এ মূর্তিটি পদ্মালয়া লক্ষ্মীর।

যাহারা উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর ও কণারকের কারু কার্য দেখিয়াছেন তাহারা বুঝিতে পারিবেন সেখানকার মূর্তিগুলির সহিত এটির সোসাদৃশ্য কত। অথচ এটি আমরা বিক্রমপুরে মাটির তলায় পেয়েছি। এর দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, উড়িষ্যার শিল্প কলনা আমাদেরই

এক জন বাঙ্গালীর। এসময়ে যঃটুকু সন্দেহ ছিল সে সব এই মূর্তিটির আবিষ্কারে দূর হয়ে গিয়েছে। মূর্তিটি বহু কাল মাটির নীচে থাকায় মাঝে মাঝে দাগ হয়ে গিয়েছে, নাক' কান, হাত পা'র স্থানে স্থানে ভেঙ্গে গিয়েছে। পরিবৎ বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ ভাস্কর ধ্রুস্কর মহাপন্থর দ্বারা ৫০০০ টাকা ব্যয়ে সে সকল মেরামত করিয়েছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের চিরহিতৈষী বদাশ মহারাজ বাহাদুরের আত্মকুলো পরিষদ এই মূর্তিটি ৩০০০ টাকা মূল্যে ক্রয় করেছেন।

বামাপদ। (জনান্তিকে) বিজলী, এই সেই বিখ্যাত “পদ্মালয়া লক্ষ্মী”! যে যে স্থান ভাঙ্গা ছিল সব মেরামত করান হয়েছে, এবং শুদ্ধ এই মেরামত করেছেন বলেই হয় ত তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অথচ আজ যে সাহিত্য পরিষৎ এই মূর্তিটির গৌরব করছেন তার জন্য আমি কতটা দায়ী! আজ, এত দিন পরেও যেন আমার সব স্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে।

বিজলী। এই সেই সর্বজন প্রশংসিত লক্ষ্মীমূর্তি! এরি দাম ৩০০০০ হাজার টাকা?

বা। হ্যা! এখন এর দাম তাই বটে!

বি। বামাপদ, প্রিয়তম, সত্য সত্যই কি সুন্দর এই মূর্তি; আমি যেন ইহার মুখে এখনও স্বর্গীয় আভা দেখতে পাচ্ছি।

বা। হ্যা, তা বটে! কিন্তু আশু যে দিন তার হাত, পা, নাক, কান গুঁড়িয়ে দেয় সে দিন সে আরও সুন্দর ছিল। আশু, উদার, সরল, পরোপকারী বহু আমার! সেই আমার সকল উন্নতির মূল।

কৈ, ধোকা কোথা গেল? দেখ দেখি তাকে কোথায় এই ভিরে ছেড়ে ছিলে? না তুমি এখনও ছেলেপুলেকে সাবধান করতে শিখলে না। চল দেখে আসি।

যবনিকা পতন।

শ্রীঅশ্বারনাথ ঘোষ।

কাছাড়ী জাতির প্রাচীন ইতিহাস •

যেই জাতি অধুনা উত্তর পূর্ব ভারতের সুবিভূত ভূখণ্ডে বিস্তার লাভ করিয়াছে সেই জাতির যে শাখা কামরূপে উপনিবেশ স্থাপন করে মাত্র সেই শাখারই বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। এই শাখাত্ত্বক কাছাড়ীকে পশ্চিম বিভাগীয় কাছাড়ী এবং বাহারা প্রথমতঃ সদিয়ার নিকটে উপনিবেশ স্থাপন করে তাহাদিগকে পূর্ব বিভাগীয় কাছাড়ী সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। কামরূপ বা কোচ এক সময়ে পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। কোচবিহার, বিজ্‌নি, মঙ্গলদই এবং বেলতলা প্রভৃতি স্থানের রাজবংশের আদিপুরুষ সেই কামরূপের রাজবংশ; সুতরাং পশ্চিম বিভাগীয় কাছাড়ীর ইতিহাসের কোনও গোল নাই। আমি এ স্থলে পূর্ব বিভাগীয় কাছাড়ী বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

এই বংশ অতি প্রাচীনকালে চুটিয়া নাম ধারণ পূর্বক আসাম প্রদেশের উত্তর পূর্ব কোণে সদিয়ার নিকটবর্তী স্থানে এক প্রবল রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজ্যের পূর্ব বিভাগীয় কাছাড়ী স্থিতিকাল নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চিতরূপে

অবধারিত হইয়াছে যে, এই জাতি আহমগণের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী এক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। আহমেরা বিখ্যাত ‘সান’ বা ‘টাই’ বংশের শাখা। ইহারা ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ও পূর্ব দিক হইতে পাতকৈ পর্তমালা অতিক্রম করিয়া এই সকল শৈল শ্রেণীর উত্তর পার্শ্ব ভূভাগের অধিবাসী মোরান, বোরাহী প্রভৃতি কাছাড়ী জাতিকে পরাভূত করে। কিন্তু চুটিয়াগণ প্রায় দুই শতাব্দী কাল ইহাদের সহিত সমান ভাবে যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে নাগা পর্বতের পাদমূলে ধানসিড়ি নদীর তীরস্থ ডিমাপুরে

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদে গঠিত কাছাড় ও কাছাড়ী প্রবন্ধের বিভাগ। প্রথমংশ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, এবং এই প্রদেশে কিছু কাল শান্তি ভোগ করিয়া বেশ সভ্য হইয়া উঠে। কয়েকটি ইষ্টক নির্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ এই জাতির লুপ্ত সভ্যতার কঙ্কালরূপে অত্য়পি ভারতের এই সুদূর প্রান্তে বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু উহাদের প্রাচীন শত্রুগণ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আবার উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ভিমাপুর অধিকার ও লুণ্ঠন করে। কাছাড়ী বা চুটিয়া রাজা তৎপরে মইবঙ্গে পলায়ন করেন, এবং দুই শতাব্দী কাল তদীয় বংশধরেরা তথায় আপনাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে।

১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হয়। এবার জৈন্তিয়ার রাজা চুটিয়ারাজকে আক্রমণ ও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কাছাড় প্রদেশের খাসপুর নামক স্থানে তাড়াইয়া দেন। এই স্থানে চুটিয়া রাজবংশ ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে থাকেন, এবং ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে তদানীন্তন চুটিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র একান্তে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করেন।

হিন্দু হওয়ার প্রভু ইহাদিগকে এক অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা দুই ভ্রাতা ভ্রাতৃ নির্মিত একটা প্রকাণ্ড গাভীর উদরে কয়েক দণ্ড অবস্থান করেন। পরিশেষে বহির্গত হইলে ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বীররাজ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে ইহাদের পূর্ব পুরুষ বলিয়া প্রকাশ করেন। এই কারণে দরাজের কাছাড়ীরা অত্য়পি আপনাদিগকে ভীম-নি-স বা ভীমের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্ব কালে ব্রহ্ম দেশীয়েরা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে এবং হতভাগ্য রাজা নামা স্থানে আশ্রয় লইয়া অবশেষে খ্রীষ্টাব্দে পলায়ন করেন। ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি সৌভাগ্য ক্রমে ব্রিটিশ সৈন্তের সাহায্য লাভ করিয়া পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্ত হন, কিন্তু ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে শত্রু করে

নিহত হইলে তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত হইয়া যায়। মহাত্ম ডব ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট গোবিন্দচন্দ্রের সেনাপতি তুলারামকে বর্তমান উত্তর কাছাড় প্রদেশের কতিপয় অংশের শাসনভার প্রদান করেন। আসামের প্রাচীন মানচিত্রে এই প্রদেশ তুলারাম সেনাপতির রাজ্য বলিয়া চিহ্নিত রহিয়াছে। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তুলারামের স্বর্গা-রোহণের পর এই রাজ্য-খণ্ড ব্রিটিশ শাসনাধীন হইয়া নগওয়ালের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে জৈন্তিয়ারাজ কর্তৃক পরাস্ত হইলে চুটিয়ারাজ প্রথমতঃ মইবঙ্গে ও তৎপরে খাসপুরে পলায়ন করেন কিন্তু এই পলায়ন ব্যাপারের সহিত সমগ্র চুটিয়া জাতির কোনও সম্পর্ক নাই। এই জাতীয় বহুসংখ্যক লোক তখনও পার্বত্য প্রদেশে থাকিয়া যায়, যাত্রা রাজা, রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ, এবং রাজাস্বগৃহীত কতিপয় লোক মাইবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করেন। সুতরাং ক্রমশঃ হইবে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত যে সকল চুটিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দীক্ষিত হয় তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল! এবং আহম জাতির সহিত সংঘর্ষের পরেও বহুসংখ্যক চুটিয়া বিজ্ঞেতৃগণের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিয়া আদিম চুটিয়া উপনিবেশে অবস্থান করিতে থাকে, এবং তাহাদের সহিত ধীরে ধীরে মিশিয়া সেন্নন, ওল-ন্দাজ ও নরমেনগণ হেষ্টিংশের যুদ্ধের পর যে রূপে পরস্পর মিলিত হইয়া এক অভিনব জাতি গঠন করিয়াছিল তদ্রূপ ইহারও এক মিশ্রিত জাতির সৃষ্টি করিয়াছে।

একটু অভিনিবেশ সহকারে চিত্রা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, চুটিয়া জাতিই আসামের আদিম অধিবাসী, এবং ইহার হিন্দু ধর্মের প্রভাবে পড়িয়াও বহু কাল যাবৎ জাতীয় আচার পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। অত্য়পি “কাছাড়ী গাও” নামক অনেক গ্রাম আছে, অথচ সেই সকল গ্রামে এক জন চুটিয়াও দেখিতে পাওয়া যায় না। আহমের অধিকার ভুক্ত হইলেও এই সকল গ্রামে কাছাড়ী রীতি রীতি ক্রমে

বহু কাল অব্যাহত রহিল ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় ; ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইহার সুন্দর সমাধান রহিয়াছে।

ঐতিহাসিকেরা অবগত আছেন যে, রোমক জাতি ব্রিটন দ্বীপ পরিত্যাগ করিলে দলে দলে দিনেমার, সেক্সন, এঙ্গলস প্রভৃতি জাতি বন্টিক সাগর সন্নিহিত প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান ইংলণ্ডের উর্বর সমতল প্রদেশ-গুলিতে ছাইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল আদিম অধিবাসী শত্রু হস্তে নিহত পাইয়াছিল তাহারা ওয়েলসের পর্বতময় উত্তর প্রদেশে পলায়ন করিয়াছিল। সে সকল স্থান অসুবিধার এবং সুখ-বাসের অযোগ্য বলিয়া শত্রুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিল না, এবং ব্রিটনেরাও নির্ঝিলাদে সেই সকল স্থানে রহিয়া গেল। ওয়েলসের অনেক লোক আজিও চলিত কথায় তাহাদের আদিম মাতৃ ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। এইরূপে বহু কাছাড়ীও আহমগণ কর্তৃক বিভাজিত হইয়া তেরাই নামক ভূতান পর্বতের পাদদেশে আনিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তেরাই বা দুয়ার প্রদেশের জল বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ইহা বলাই বাহুল্য। গারো পর্বত এবং উত্তর কাছাড়ও এই রূপেই কাছাড়ী জাতির আবাস ভূমি হইয়া পড়িয়াছিল।

কাছাড়ী জাতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। এই সকল সম্প্রদায় সর্বদা অবিভক্ত ভাবে বাস করিতে ভালবাসে ইহার আভাসও পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এখন কথা হইতে পারে কিরূপে এই সমাজ গত বিশেষত্ব পরিত্যাগ করিয়া কাছাড়ী জাতি উত্তর ও দক্ষিণ কাছাড়ী নামক দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু “বড়া” সম্প্রদায় বা “উত্তর কাছাড়ী,” এবং “দিমাসা সম্প্রদায়” বা “দক্ষিণ কাছাড়ী” বর্তমান সময়ে একে অগ্র হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে ইহা সত্য। ইহাদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান বিভিন্ন এবং ভাষা বিভিন্ন ; কিন্তু এই উভয় সম্প্রদায়ের ভাষাতে আবার এরূপ অনেক শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ইহারা সকলেই পূর্বে একই ভাষায় কথা

কহিত। ভাষা ভিন্ন বলিয়াই বোধ হয় ইহাদের মধ্যে বিবাহের জন্ত কন্ডার আদান প্রদান হয় না। এই দুই সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদের মূলে একটা প্রবাদ বা জনশ্রুতি চলিত আছে। ইহা এই—

অতি প্রাচীন কালে চুটিয়া জাতির সহিত আর এক পরাজিত জাতির যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে চুটিয়ারাজ পরাজিত হইয়া সসৈন্তে পলায়ন করেন, এবং চলিতে চলিতে এক নদীর তীরে উপনীত হন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, নদী উত্তীর্ণ হওয়ার কোনও উপায় নাই ; আবার পশ্চাতে শত্রু অনুসরণ করিতেছে ; এই অবস্থায় কোনরূপে রাত্রি কাটাইতে পারিলে পরদিন শত্রুর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করাই স্থির হইল। রাত্রে নিজাঘোরে রাজা স্বপ্নে দেখিলেন এক দেবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে তাঁহাকে সঙ্ঘোষন করিয়া বলিতেছেন, “বৎস, ভয় নাই, আমি তোমার সহায়। রজনী প্রভাতে নদী-তীরে যে স্থলে একটি বক দেখিতে পাইবে সে স্থলে সসৈন্তে সাহসে ভর করিয়া নদী প্রবেশ করিও, অক্লেশে নদী উত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু সাবধান ! নদী অতিক্রম কালে কেহই পশ্চাৎ দিকে তাকাইও না।” পরদিন রাজা দেবীর আদেশ মত কার্য্য করিলেন। তিনি অগ্রে নদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং অনেক সৈন্ত পরপারে উপনীত হইল : কিন্তু তখনও বহু সৈন্ত নদী-গর্ভে, এবং অনেকে নদী-তীরে রহিয়া গেল। এই সময়ে হুর্ভাগ্য ক্রমে নদী-গর্ভস্থ জনৈক সৈনিক তাহার পুত্র নদী পার হইতেছে কি না ফিরিয়া দেখিল। দেবীর বাক্য অব্যর্থ—তখনই নদী অগাধ হইয়া গেল এবং যে যেক্রমে পারে প্রাণ বাঁচাইল। যাহারা কুলের সন্নিহিত হইয়াছিল তাহারা কেহ কেহ নদী-তীরান্ত্রাজাত নল ও খাগড়া আশ্রয় করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। কেহ কেহ শ্রোতে ভাসিয়া নানা স্থান দিয়া তীরে উঠিল। এবং কেহ কেহ জলমগ্ন হইল। এই রূপে যাহারা নলের সাহায্যে জীবন রক্ষা করিল তাহাদের বংশধরগণ অজ্ঞাপি নলবাড়িয়া এবং যাহারা খাগড়া আশ্রয় করিয়া প্রাণ বাঁচাইল

তাহাদের বংশধরগণ খাগড়াবাড়িয়া নামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। যাহারা পূর্বেই নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিল তাহারা ও তাহাদের বংশধরগণ ‘ডিমাঙ্গা’ বলিয়া পরিচিত হইল। “ডি” শব্দের অর্থ জল, ডিমাঙ্গা শব্দের অর্থ হইতে পারে ‘বরুণ-পুত্র’ বা ‘বরুণ জাতি’, সুতরাং ‘ডিমাঙ্গা’ শব্দ অস্বার্থ সন্দেহ নাই।

প্রাচী দেশের রূপক প্রিয়তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিখ্যাত; কিন্তু এই সকল আপাত অসম্ভাব্য ব্যাপারে অনেক সময় গুঢ় তথ্য প্রচ্ছন্ন থাকে; এবং একটু অনু-ধাবন করিলে এই প্রবাদ হইতেও কতকটা ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, যে জাতির সহিত চুটিয়া গণের যুদ্ধ ঘটে তাহারা আহম হইতে পারে, এবং যে নদীর উল্লেখ আছে সেই নদী ব্রহ্মপুত্র বলিয়াই বোধ হয়। নল, খাগড়াগুলি ভেলার উপকরণ মাত্র। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, নল-খাগড়ায় ভেলা নির্মাণ করিয়া কিংবা কোনও প্রকারে গোটা গাছ খুদিয়া ইহাদেরই সাহায্যে চুটিয়া সৈন্ত নদী অতিক্রম করিয়াছিল। অনেকেই দীর্ঘায়ু আউরঙ্গ জেবের সেনাপতি মীরজুম্মার সহিত আহমগণের সংঘর্ষের কথা অবগত আছেন। কথিত আছে তিনি যখন আসাম অধিকারের চেষ্টা করেন তখন ব্রহ্মপুত্রে হঠাৎ জোরার আসিয়া বারুদ গোলা বোঝাই তাঁহার অনেকগুলি নৌকা জলমগ্ন করে। সেইরূপ ব্রহ্মপুত্রে হঠাৎ কুলিয়া উঠিয়া চুটিয়াগণকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল ইহা অসম্ভব নহে। যে সকল চুটিয়া শত্রু হস্তে পতিত হয় তাহারা বিজ়েতগণ কর্তৃক ভাঙিত হইয়া তেরাই প্রদেশে বা গারো পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। চুটিয়া জাতি এইরূপেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে ও দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। যাহারা নদী উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই তাহারা “বড়া” বা “কাছাড়ী” বলিয়া পরিচিত, আর যাহারা নদী অতিক্রম করে তাহারা ডি-মা-ঙ্গা বলিয়া খ্যাত। যাহাতে এই দুই সম্প্রদায় পুনর্মিলিত হইয়া প্রবল না হয় আহমেরা সেই চেষ্টা করিতেও বোধ হয় অবহেলা করে নাই, সুতরাং

তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া আর মিলিত হইতে পারে নাই।

দরাজ জেলায় কাছাড়ীরা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করে। পর্বত জাত “মুলি” নামক এক প্রকার বাঁশ খেতলাইয়া কিংবা

ইকড় দ্বারা ঘরের বেড়া বা দেওয়াল প্রস্তুত করিয়া লয়। ইকড়ের উপর মাটির সুন্দর আন্তরণ দেয়। ইচ্ছা করিলে এই আন্তরণের উপর চূণ কাম করা যাইতে পারে। ইহারা বেত দিয়া চাল বাঁধে ও খড়ের ছাউনি দেয়।

সাধারণতঃ প্রত্যেক গৃহ দুই ভাগে বিভক্ত, মধ্যে একটা বাঁশের বা ইকড়ের বেড়া থাকে মাত্র। এক অংশ খাওয়ার ও অপর অংশ শোয়ার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোনও কোনও স্থানে গ্রামের সমস্ত অবিবাহিত যুবকেরা “ডেবকা-চাঙ্গ” বা মাচায় গৃহস্থগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে রাত্রি যাপন করে। কিন্তু এই প্রথা আজ কাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

কাছাড়ী গ্রামের গায়ে গায়ে লাগা ঘরগুলি সাড়ি সাড়ি নির্মিত হয়। এইরূপ দুই তিন সারি ঘর লইয়া একটি গ্রাম হয়। গ্রামে গাছ পালা বড় থাকে না, এবং ঘরের সাড়ির মাঝে কখনও কখনও একটা সোজা প্রশস্ত রাহা দেখা যায়। প্রত্যেক বাস গৃহে এবং গোলার চতুর্দিকে প্রায় এক গজ গভীর এক একটি অপ্রশস্ত পরিধা আছে। এই পরিধার মাটি দিয়া কাছাড়ীরা বাড়ীর চতুর্দিকে প্রাচীরের মত একটা বেটন প্রস্তুত করে, এবং এই বেটনের উপর পরিধার দিকে হেলাইয়া কাঁড়া বাঁশ বা ইকড় দিয়া এরূপ ভাবে বেড়া দেয় যেন মাটির উপর এক বা দেড় গজ উচ্চ থাকে। এই বেড়াকে সাধারণ কথায় বুক বেড়া বলে। এই পরিধা ও বেড়া দুই উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রথমতঃ, বাহিরের লোক সদর দরজা ছাড়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ, গৃহপালিত পশুপক্ষী রাত্রিকালে বাড়ীর বাহির

হইয়া শস্তাদির ক্ষতি করিতে সুবিধা পায় না । কাছাড়ী-
দের বাড়ীতে হাঁস, মোরগ, ছাগল ও শূকরের ছড়াছড়ি,
বিশেষতঃ শূকরগুলি বাড়ীতে যথেষ্ট বিচরণ করিয়া
বেড়ায় বলিয়া বাড়ীগুলি ভয়ানক নোংরা হইয়া
থাকে ।

কাছাড়ীরা খাণ্ড দ্রব্যের বাছ বিচার করে না । গো-
মাংস ব্যতীত ইহাদের কোন
খাণ্ড খাওয়াই নিষিদ্ধ নহে । বরাহ-মাংস
কাছাড়ীর সর্সাপেক্ষা প্রিয় খাণ্ড,

এবং এ কারণেই শাবক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সর্ববয়সের
শূকরে কাছাড়ীর গৃহ সর্বদা পূর্ণ থাকে । মেলায় এবং
হাটে বিক্রয়ার্থ অসংখ্য শূকরের আমদানী হয় । হুঙ্ক
কাছাড়ী জাতির অস্পৃগু । গারো এবং মঙ্গোলীয় অত্যাণ্ড
অনেক জাতি হুঙ্ক ব্যবহার করে না । কিন্তু হুঙ্কের প্রতি
ইহাদের বিতৃষ্ণার কারণ অত্যাণ্ড নির্ণীত হয় নাই ।
তবে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকে বাছকে ইহার এক-
মাত্র খাণ্ড হইতে বঞ্চিত করা নিষ্ঠুরতা । এই দুণার
ভাব ধীরে ধীরে দূর হইতেছে এবং সভ্য জগতের
সংস্পর্শে আসিয়া তাহার হুঙ্কের উপাদেয়তা বৃদ্ধিতে
পারিতেছে ।

না-গ্রাণ অর্থাৎ গুন্টি বা গুন্কনা মাছ কাছাড়ীর আর
একটা উপাদেয় খাণ্ড । ব্রহ্মপুত্রের
না-গ্রাণ উপকূল ভাগ হইতে জোয়ারের
জল সরিয়া গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
অনেক মৎস্য কর্দমের গায়ে লাগিয়া থাকে । এই সকল
মৎস্য সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রের তাপে শুষ্ক করা হয়, এবং
দুয়ার প্রদেশের কাছাড়ীরা ধান ও এঁড়ি দিয়া এই সকল
মৎস্য বদলাইয়া লইয়া থাকে । ইহাদের দুর্গন্ধ অতি তীব্র এবং
আমাদের ভ্রাণেন্দ্রিয়ের পক্ষে এই গন্ধটা যতদূর অপ্রীতি-
কর কাছাড়ীর রসনেন্দ্রিয়ের পক্ষে এটা তদপেক্ষা শতগুণ
প্রীতিকর । পরন্তু এই দুর্গন্ধ মৎস্য ইহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার
পক্ষে বিন্দুমাত্রও অনুপযোগী নহে ।

কাছাড়ীরা জাল পাতিয়া বন্য হরিণ, বন্য শূকর প্রভৃতি

ভক্ষণ করিয়া থাকে । প্রথমতঃ
পশু ও মৎস্য শিকার ঘাস আছে এমন অনেকটা স্থান
জুড়িয়া একটা জাল পাতে,
পরে ঘেরা স্থানে বন্য লক্স আসিয়াছে বৃদ্ধিতে পারিলে
জাল গুটাইতে থাকে, এবং শিকার কোনও বলিষ্ঠ কাছা-
ড়ীর হাতের কাছে আসিলে লাঠি ও দায়ের আঘাতে
ইহার ভবলীলা সাঙ্গ হয় । মৎস্য শিকারটা বেশীর ভাগ
স্ত্রীলোকেরই কার্য্য । পূর্ন হইতেই মৎস্য ধরার একটা
দিন স্থির হয়. এবং সেই নির্দিষ্ট দিনে এক বা একাধিক
গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সমবেত হইয়া এক বা
একাধিক স্বল্পজলা নদীতে মৎস্য শিকার করিয়া
থাকে । শীত কালই মৎস্য শিকারের প্রশস্ত সময় ।
সে সময়ে পার্কর্ত্য নদীতে দেড় হাতের বেশী জল থাকে
না. সুতরাং মৎস্য শিকারের জন্য জালের পরিবর্তে
অত্যাণ্ড অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে । জাণ্ডি বা ‘হোচা’
এবং ‘পলো’ কাছাড়ীর নিত্য ব্যবহার্য্য মৎস্য শিকারের অস্ত্র ।

মৎস্য-শিকার-যাত্রা কাছাড়ীদের একটা জাতীয়
পর্বের মত । যাত্রার দিন বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক দুই দলে
বিতণ্ডিত হইয়া জাণ্ডি লইয়া কোনও নদীতে যায় । এক
এক দলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা একরূপ থাকে যে, পাশাপাশি
ভাবে জাণ্ডি ফেলিলে এক পার হইতে অপর পার পর্যন্ত
নদীতে কোনও ফাঁকা স্থান থাকে না । যেখানে এক
দল জলে নামিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করে দেখান
হইতে দেড় শত কি দুই শত হাত দূরে আর এক দল
জলে নামিয়া একটা সারি বাঁধিয়া মাছ ধরিতে প্রবৃত্ত
হয় । এক দল আর এক দলের যত নিকটবর্তী হইতে
থাকে নদীর মাছগুলিও প্রাণের ভয়ে নিরাশ চেষ্টায়
তত লাফালাফি করিয়া সরলা কাছাড়ী নারীর
আমোদের মাত্রাটা বনাইয়া তুলে ।

কাছাড়ীরা এঁড়ি নামক এক প্রকার গুন্টি পোকা
পোষণ করিয়া তাহা হইতে এঁড়ির
শিল্প গুন্টি জন্মায় । গুন্টিগুলি হইতে
স্ত্রীলোকেরা এঁড়ি হতা পাকাইয়া

আষাঢ় ১৩১৯

লয় এবং সেই হুতা ঘারা হাতে তাঁত চালাইয়া উৎকৃষ্ট ও প্রায় রেশমের তায় মূল্যবান এবং শীত নিবারক এঁড়ি নামক বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। এড়ণ্ড বা এঁড়ি বস্ত্র এই সকল পোকার প্রধান খাদ্য বলিয়াই বোধ হয় ইহাদের নাম এঁড়ি। এবং এই এঁড়ি পোকা হইতে হুতা ও সেই হুতা হইতে কাপড়ের উৎপত্তি হয় বলিয়া এই উভয়ের নামও এঁড়ি। কিন্তু আসামজাত গামাড়ি বৃক্ষের পাতাও এঁড়ি পোকার খাদ্য।

তাঁতগুলি কাছাড়ীরা নিজ হাতেই প্রস্তুত করে। ইহাদের নির্মাণ প্রণালী অতি সরল এবং তাঁতের উপ-করণাদি স্থানীয় বাজারেই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। একটি তাঁত প্রস্তুত করিয়া খাটাইয়া লইতে পাঁচ টাকার বেশী খরচ পড়ে না।

গৃহিণী বা যুবতী কতরাই ঘরের কোণে তাঁত চালাইতে চালাইতে মনের আনন্দে ও পরম শান্তিতে গুণ-গুণ করে গান করে। কিছু কম এক শতাব্দী পূর্বে কাছাড়ীরা এত শান্তিতে তাঁত চালাইতে পারিত না। তখন কাছাড়ী দুয়ার ব্রিটিশ শাসনে আসে নাই। কাছাড়ীরা তাহাদের পূর্বপ্রভু ভূটান রাজগণের অধীনে ব্রিটিশ শাসনের শাস্তি মুখ উপভোগ করিতে পারিত না।

বাড়ীর কর্তা পরিবারের কার্য্যক্রম পুরুষদিগকে লইয়া অতি প্রত্যুষে সূর্যোদয় হইতে না হইতে ক্ষেতে চলিয়া যায়। এদিকে বাড়ীর মেয়েরা বেলা ৮টা ৯টা পর্য্যন্ত তাঁত চালাইতে থাকে। সেই সময়ে গৃহিণী কলাপাতে করিয়া এবং কলাপাতে উত্তমরূপে ঢাকিয়া যাহারা মাঠে কাজ করিতে গিয়াছে তাহাদের খাদ্য লইয়া যায়। ফিরিয়া আসিয়া আবার তাঁতে বসে, এবং যতক্ষণ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়া দৃষ্টিশক্তি রোধ না করে ততক্ষণ অক্লান্তভাবে কার্য্য করিতে থাকে। কাজে বিশেষ বাধা না ঘটিলে এক জন কাছাড়ী রমণী দৈনিক এক হাত এঁড়ি প্রস্তুত করিতে পারে। এইরূপ এঁড়ি সাধারণতঃ দুই গজ চওড়া হইয়া থাকে, এবং প্রতি গজের মূল্য খুব সস্তা হইলেও ২৭ দুই

টাকার কম হয় না; সুতরাং প্রতি স্ত্রীলোক কর্তব্য গৃহ কার্য্যে অবহেলা না করিয়া মাসে ৩০ অনায়াসে উপার্জন করিতে পারে।

কাছাড়ী স্ত্রীলোক অবরোধ প্রথার অধীন নহে। পৰিবারে অপরিচিত পথিকের মুখ পানে তাকাইয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে কাছাড়ী স্ত্রী-স্বাধীনতা রমণী দ্বিধা বোধ করে না। অথচ যাহা রমণীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য-সম্পদ

—বাহা রমণীর গৌরব, কাছাড়ী স্ত্রীলোকের তাহার অভাব নাই। তাহাদের মুখে সজ্জ ভাবটি প্রফুল্ল পুষ্পের উপর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ছটার তায় সর্বদা লাগিয়া আছে। কাছাড়ী পত্নী স্বামীর নিকট একটা আত্মাহীন শুধু বিলাস বা ভোগের সামগ্রী নহে। স্বামী পত্নীকে দস্তুর মত সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং পত্নী স্বামীর সমকক্ষ, সঙ্গী ও বন্ধু বলিয়া বিবেচিত হয়। রমণী যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে অথচ সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার হইতে বড় একটা দেখা যায় না। কোনও আগন্তুক বাড়ীতে উপস্থিত হইলে পরস্পর আত্মবিশ্বাসের পর গৃহস্বামী স্বয়ং পত্নীকে কাছাড়ী ভাষায় “এই আমার বুড়ী” বলিয়া আগন্তুকের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেয়। এই সম্বোধনে ব্যঙ্গ বা হীন জনের প্রতি মিনতি-করুণ কাকূতির উত্তরে কারুণ্যপূর্ণ অঙ্গুগ্রহের ইঙ্গিত নাই— আছে প্রেমপূর্ণ প্রীতি ও আন্তরিক শ্রদ্ধা।

কাছাড়ী রমণীগণ সাধারণতঃ বহু সন্তানের প্রসূতি হইয়া থাকে। অতএব অনেক কাছাড়ী জননী গুলি শিশু সন্তান যখন তাঁতের সন্তান বাৎসল্য সম্মুখে খেলা করিয়া অশান্তি ঘটায় তখনও জননী সন্তানকে মমতাহীন শাসন করে না। যদি বা কোনও সময়ে শাস্তি বিধান করিতে বাধ্য হয় তখন জননীর মুখে ক্রোধ অপেক্ষা কোমলতা মিশ্রিত দুঃখের ভাবটাই বিকশিত হইয়া উঠে।

শ্রীশুকুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

জ্ঞানী ও অজ্ঞান

(তেলেগু ভাষা হইতে)

বিজ্ঞা, বুদ্ধি নাহি যার অমূল্য রতন,
সেই জন করে শুধু মুখে আশ্ফালন।
বিজ্ঞার প্রভাবে যার হৃদয় গভীর
বাক্য তার ঢালে সুধা জুড়ায় শরীর।
আঘাত পাইলে স্বৰ্ণ সে রহে নীরব
পিতল জানায়ে দেয় আপন বিভব।
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মহিষ্ঠা।

পূর্বপুরুষীয় স্মৃতি

১৯০৬ খৃঃ জুন মাসের “উনবিংশ শতাব্দী ও তৎপর”
(Nineteenth Century and After) নামক সুপ্রসিদ্ধ
মাসিক পত্রিকায় পাশ্চাত্য পণ্ডিত “ফরব্‌ছ ফিলিপ্স”
(Forbes Phillips) যে “পূর্বপুরুষীয় স্মৃতি” আখ্যা
দিয়া একটি উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা
অবলম্বন করিয়াই উপস্থিত প্রবন্ধটি লিখিত হইল।

আমাদের জীবনে কোন সময় এরূপ ঘটনা ঘটয়া
ধাকে যে, আমরা জীবনে যেখানে কখনও যাই নাই বা
যাহা দেখি নাই এরূপ নূতন স্থানে উপস্থিত হইলেও তাহা
যেন আমাদের পূর্ব পরিচিত, সে সমস্ত দৃষ্টই যেন আমা-
দের পূর্ব দৃষ্ট এবং তৎস্থানের কোন বিশেষ ঘটনার সহিত
যেন আমাদের সংশ্লিষ্ট ছিল এই প্রকারের ভাব আমাদের
মনে হঠাৎ উদ্ভিত হয়। এই ব্যাপার ইতিহাসের প্রথম
আলোকের সহিতই মনুষ্যের মন অধিকার করিয়া
ব্যাখ্যার জন্ত তাহার চিন্তাকে ব্যাপ্ত করিয়াছে। ব্রাহ্মণ-
গণই তাহাদের দর্শনে প্রথম ইহার ব্যাখ্যা প্রদান
করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যায় জগৎগৌরীণ সংস্কারই পূর্বোক্ত
ব্যাপারে মূল রহস্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের
উন্নত নীতি বিজ্ঞানে তাহাই অস্বীকৃত হইয়াছে, এবং

ঐতিপ্তেস্ত তাহাই প্রকৃত হইয়াছে। গ্রীক দার্শনিক প্রবর
প্লেটোর দ্বারাও তাহাই অবলম্বিত হইয়াছে। ব্রিহদি
ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইহার অনুবর্তন দেখা যায়।
জার্মেন ও ইংরাজ দার্শনিকদিগের মতও ইহারই দ্বারা
অনুরঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ সর্ববাদিসম্মত হইলেও
পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাতে কতকটা অনুমানের আশ্রয় লইতে
হয়, ধর্ম ও দিব্য জ্ঞানের দোহাই দিতে হয়। স্মৃতরাং
এটিকে অবিতর্কিত সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে পারা
যায় না। এই কারণে ফিলিপ্স (Phillips) ইহার
স্থলে একটি নূতন ব্যাখ্যার প্রস্তাব করিয়াছেন। “পূর্ব
পুরুষীয় স্মৃতি” স্বীকার করিলে ইহাট শেষ তত্ত্ব দাঁড়ায়।
আমাদিগকে ইহার জন্ত অনুমান বা অজ্ঞ কোন মতের
আর অপেক্ষা করিতে হয় না।

শিশু যে সাধারণতঃ পিতামাতার আকৃতিবিশেষ ও
পিতামহের ভাবভঙ্গী প্রাপ্ত হয় তাহাতে কি ইহাই
প্রমাণিত হয় না যে, শিশুতে পূর্ব পুরুষীয় স্মৃতিই অংশতঃ
বিজ্ঞমান আছে? তাহাদের রক্তে যে পূর্ব পুরুষের
সংস্কার নিবদ্ধ রহিয়াছে সময় ও সুযোগ মতে তাহাই কি
উদ্ভূত হইয়া পূর্বোক্ত রূপে প্রকটিত হয় না? যদি তাহাই
হয় তবে প্রাচ্য ধর্ম বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকেই
কি আমরা পূর্বপুরুষীয় স্মৃতিতেই জীবনের বহু সমস্তার
ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারি না?

মনুষ্যের মনে সর্বদা সংস্কার সকল প্রবেশ লাভ
করিতেছে। সুদূরবর্তী পূর্বপুরুষগণের সংস্কার এরূপ
গভীর ভাবে আমাদের স্মৃতিতে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে,
পূর্বে যাহা উচ্ছারিত ছিল এক্ষণে তাহা স্মৃতঃ প্রোদিত
হইয়া পড়িয়াছে। মনুষ্যের কোন অভ্যাস গঠিত হওয়ার
কথা আমরা বলিয়া থাকি কিন্তু আমরা বিবেচনা করিয়া
দেখি না যে, বহু স্থলেই অদ্ব্যতমসামান্য অতীত কাল হইতেই
তাহা তাহার জন্ত গঠিত হইয়া আসিয়াছে।

নির্জন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তা দিয়া চলিবার সময়
আমাদের কর্ণ চকিত হইয়া থাকে, আমরা দক্ষিণে, বামে
কুণ্ডি পাত করিতে থাকি, এবং আমাদের ক্ষমতার উপর দিয়া

পশ্চাদিকে চাহিতে যাই। এই অভ্যাস আমরা কোথা হইতে শিক্ষা করিলাম? এক্ষণে কি হইতে পারে না যে, এখনে আমাদের বহু পূর্বকালে মুদ্রিত স্মৃতি ফলক তাহার লিপিকে প্রকটিত করিতেছে? আমাদের অসভ্য পূর্ব পুরুষ বহু কালের অভিজ্ঞতা দ্বারা যে নির্জন ও অন্ধকারাজ্বর স্থানে সচকিত থাকিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন ইহা কি তাহারই ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না?

যখন আমাদের কোণের ভাব পূর্ণরূপে উদ্ভিক্ত হয় তখন আমাদের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসে, আমরা ওষ্ঠ দংশন করিতে থাকি; আমাদের দাঁত বাহির হইয়া পড়ে; আমাদের সমস্ত দেহ-ভঙ্গীতে আমরা যেন লক্ষ প্রদান করিতে উদ্ভত হইয়াছি তাহারই আভাস পাওয়া যায়। এখানে আমরা আদিম মানুষের প্রকৃতির পরিচয়ই পাইতেছি বলিয়া মনে করিতে পারি।

সেই মনুষ্য শত্রুকে দস্ত ও নখদ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিবার জন্য এক্ষণে তাবেই আপনাকে আপনাতে সংশ্লিষ্ট করিয়া লক্ষ প্রদান পূর্বক তাহার উপর পতিত হইত। অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি যে “গুরুকার জনক” এই কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়। আমাদের পূর্ব পুরুষ যে অতীব “গুরুকার জনক” পচা মাংসের অসহ্য দুর্গন্ধ হইতে নাক ফিরাইয়া লইতেন আমাদের কল্পনা যেন তাহার দ্বারাই এখনও অধিকৃত রহিয়াছে।

আমরা যখন রোমহর্ষণ দৃশ্যের বর্ণনা করি তখন প্রায়ই তনুহুর্ভের জন্য চক্ষু বুজিয়া থাকি, অথবা মাথা নাড়িতে থাকি, যেন আমরা সেই অপ্রীতিপ্রদ বস্তুটিকে দূর করিয়া দিতে বা না দেখিতে চেষ্টা করিতেছি। সেই অভ্যাসটি অবশ্যই আমাদের পূর্ব পুরুষের অভিজ্ঞতা জনিত সংস্কার হইতেই সঞ্চারিত হইয়াছে।

ফিলিপ্সের দৃষ্টান্তের সমর্থনে এখানে আমরা পাশ্চাত্য তত্ত্ববিৎ বিডনেলের অতীব কৌতুকবহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা একান্ত কর্তব্য বোধ করিতেছি।

“আমরা কেন লাল, সবুজ ও নীল এই তিন বর্ণকে

মূল বর্ণ বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছি?” তিনি এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উত্তরে বলিয়াছেন যে, প্রথম মানুষের বর্ণজ্ঞান এই তিনটি বর্ণেরই সখিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে বলিয়াই ইহাদের ঈদৃশ প্রাধান্য হইয়াছে। তাহার উপরে নীল আকাশ-মণ্ডল বিরাজিত; চতুর্দিকে সবুজ উদ্ভিদে জগৎ শোভমান, দেহা-ভ্যস্তরে লাল রক্ত প্রবাহিত। এইরূপে ইহাদের সহিত নিকট সম্পর্ক হইতে ইহাদের সম্বন্ধে সংস্কারই যে সর্বাপেক্ষা প্রবল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের দেহ-শোণিত হইতেই যে লাল বর্ণের নাম হইয়াছে তাহা দেহশোণিতের রক্ত ও রুধির এই নাম হইতেই প্রমাণিত হয়। যখন শত্রুকর্তৃক আহত হইয়া আমাদের পূর্বপুরুষের দেহ হইতে রক্ত পাত হইত ও তাহাতে কষ্ট হইত তখন রক্তপাতের সহিত ক্ষত জনিত কষ্টের স্বভাবতঃই একটা যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কালে ক্ষত শুকাইয়া গেলেও রক্তের লাল বর্ণের সহিত যন্ত্রণার সংযোগ রহিয়া গিয়াছিল। আরণ্য মহিষ রক্ত দেখিলে উন্মত্ত হইয়া উঠে। লাল কাপড়ের টুকরা দেখিলে বুধ কিরূপ ক্ষেপিয়া উঠে তাহা সকলেই জানেন। রক্ত-পাত কেবল যে অসভ্য লোকদিগের মধ্যেই লুক্কায়িত হিংসা ভাবের উত্তেজক হয় তাহা নহে, কিন্তু পরিমার্জিত প্রকৃত সভ্য লোকদিগের মধ্যেও ঐ ভাবেরই উত্তেজক হইয়া থাকে। সুতরাং এখানে পূর্বপুরুষীয় সংস্কারই যে প্রবল তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি।

স্বপ্নে যে আমাদের অদৃষ্টপূর্ব অশ্রুতপূর্ব ঘটনা দর্শন হয় তাহার জন্যে ফিলিপ্স পূর্বপুরুষীয় স্মৃতির পরিবর্তে জাতীয় স্মৃতি বা পুরাতন আত্মা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, আমাদের জীবনের সাধারণ বিষয় এবং বহির্জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়যোগে সাধারণ জ্ঞানের নিয়মে অনুভূত হইয়া থাকে বটে কিন্তু প্রাগুক্ত বিশেষ ব্যাপারে আমাদের পুরাতন আত্মা অর্থাৎ জাতীয় স্মৃতি যোগেই সজ্জিত হইয়া

ধাকে। ঐ সমস্ত ব্যাপারে যেরূপ বোধ, যেরূপ দর্শন হইয়া থাকে তাহা চিরাগত জ্ঞান দ্বারা অন্তর্ভুক্ত তাহা সাধারণ বোধ ও দর্শনের ত্রায় ব্যক্তি বিশেষে, বাসস্থান বিশেষে আবদ্ধ নহে। বিভিন্ন বংশ ক্রমাগত সংস্কারের সার সংস্কার সকল দ্বারাই পূর্বোক্ত পুরাতন আত্মা বা জাতীয় স্মৃতি গঠিত হয়। সুতরাং ইহার কার্য্য যে পূর্বপুরুষীয় স্মৃতির কার্য্য অপেক্ষা বিশিষ্টতর ও উচ্চতর হইবে তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। যখন আমরা সাধারণ জ্ঞান-জগৎ হইতে এই জাতীয় বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান-জগতে প্রবিষ্ট হই, তখনই আমরা ভূমানন্দ, দিব্য জ্ঞান, ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত্র দর্শন প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপার সকল নিষ্পাদন করিবার শক্তি লাভ করিয়া থাকি। এই প্রকারে ফিলিপ্‌স্ পূর্বপুরুষীয় ও ভারতীয় স্মৃতি দ্বারা আমাদের জীবনের আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত ব্যাপারেরই ব্যাখ্যা করিয়া ক্রমবিকাশ বাদের সহিত ইহার সামঞ্জস্য প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

এখানে ফিলিপ্‌স্‌র মত সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ করা সম্ভব বোধ করি। ফিলিপ্‌স্‌ বহু স্বীকার্য্যের দোষ দিয়া হিন্দু মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি নিজেরও তাহা হইতে নিম্নোক্ত হইতে পারেন নাই। তিনি এক বার পূর্বপুরুষীয় স্মৃতি স্বীকার করিয়া লইয়া যখন তাহার দ্বারা সমস্ত ব্যাখ্যাত হয় না দেখিলেন তখন আবার আত্মা ও জাতীয় স্মৃতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তিনি “পূর্বপুরুষীয় স্মৃতি” কোন অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় না। ইহা যদি কেবল মাত্র মনুষ্যজাতির পূর্বপুরুষকেই বুঝায় তবে ইহা বিশেষ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে সুতরাং ইহারদ্বারা সমস্ত জীব বিকাশের ব্যাখ্যা না হইয়া এক বিশেষ জাতীয় জীবের বিকাশই মাত্র ব্যাখ্যাত হয়।

ফিলিপ্‌স্‌ হিন্দু মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহার নিজের মত যে হিন্দু মতকে ছাড়াইয়া যাইতে

পারিয়াছে আমাদের নিকট এরূপ বোধ হয় না। জন্মান্তরবাদ যোনিভ্রমণবাদ ও কর্ম্মবাদ এই কয়টির দ্বারাই হিন্দুগণ জীবের ক্রম বিকাশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জন্মান্তরবাদ দ্বারা একই জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন জন্মের দ্বারা আমাদের ক্রম উন্নতি হয় আমরা তাহা বুঝিতে পারি। যোনিভ্রমণবাদের দ্বারা আমরা ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে উন্নত জাতিতে পরিণত হইতে পারি তাহা বুঝিতে পারি। কর্ম্মবাদের দ্বারা আমাদের উন্নত বিকাশের মূল রহস্য যে কর্ম্ম তাহা বুঝিতে পারি। হিন্দুর ক্রমবিকাশবাদের পূর্বোক্ত মূল সূত্রদ্বারা ফিলিপ্‌স্‌র মতের ব্যাখ্যা হইতে পারে কি না এক্ষণে আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

ফিলিপ্‌স্‌ যেখানে “পূর্বপুরুষ” বলিয়াছেন হিন্দু মত সেখানে “পূর্বজন্ম” বলিয়াছেন। এই “পূর্বজন্ম” কথাটি যেরূপ ব্যাপক “পূর্বপুরুষ” সেরূপ ব্যাপক নহে। পূর্বজন্মের মধ্যে যেমন পূর্বপুরুষ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে তদ্রূপ নিজেরও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। পূর্বপুরুষ মর্মে পুনর্বার কখন কখন নিজ পরিবারে বা বংশে জন্ম গ্রহণ করে ইহা হিন্দুর সাধারণ বিশ্বাস। পিতা নিজেরই যে পত্নীতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে তাহা স্পষ্টই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা—

“পতির্জায়াং প্রবির্শতি গর্ভভূত্বাহ মাতরং ।

জায়ায়া শুদ্ধি জায়াং যদন্তাং জায়তে পুনঃ ॥”

পতি গর্ভ রূপে মাতৃরূপিণী পত্নীতে প্রবেশ করেন, পুনর্বার তাহাতে (ভার্য্যাতে) জাত হয় বলিয়া তাহার “জায়া” নাম হইয়াছে। শেষোক্ত মতটিতে আমরা ফিলিপ্‌স্‌র মতেরই স্পষ্ট আভাস পাইতেছি। ইহাই সম্ভারিত হইয়া যে ‘বাদের’ উৎপত্তি হইয়াছে তাহাও আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম যে, হিন্দুর জন্মান্তর বাদে যেমন পূর্বপুরুষবাদ অন্তর্নিবিষ্ট তেমনই পূর্বজন্মবাদও অন্তর্নিবিষ্ট।

যোনিভ্রমণবাদে আমরা এক শ্রেণীর জীব অন্ত

শ্রেণীর জীবে পরিণত হয় তাহারই ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হই। হিন্দুর চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের কথা সকলেই অবগত আছেন। জন্মান্তরকে আমরা এক শ্রেণীর জীবের উচ্চ নীচ বিকাশ বলিয়া ধরিতে পারি এবং যোনি ভ্রমণকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্য দিয়া বিকাশ মনে করিতে পারি। মনুসংহিতাতে এই বিকাশ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

“অসংখ্য মূর্ত্তয়ন্তু নিপতন্তি শরীরতঃ।

উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি য়াঃ ॥

— ১২ শ অধ্যায় ১৫ শ্লোক।

সেই আত্মার শরীর (লিঙ্গ শরীর) হইতে অসংখ্য শরীরী উৎপন্ন হইয়া সতত উচ্চ নীচ জীবদিগকে কার্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে।

আত্মার অসংখ্য বিকাশ রূপেই উচ্চ নীচ জীবসকল সর্বদা দেহ ধারণ করিয়া কার্য্য করিতেছে। সুতরাং হিন্দুর জীববিকাশ যে চৌরাশি লক্ষের উপর অর্থাৎ অসংখ্য তাহাই আমরা জানিতে পারিতেছি। হিন্দু একই আত্মার সহিত সমস্ত জীব বিকাশকে সংযুক্ত করিয়া বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে কিরূপ বিশাল ও সমগ্র ভাবে এই বিকাশকে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং কলিপ্সুর জাতীয় আত্মার পরিবর্ত্তে বিশ্ব আত্মাকে ব্রহ্মাণ্ড বিকাশের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রমবিকাশের কিরূপ চরম সীমা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমরা এখানে দেখিতে পাইলাম।

উপরে আমরা জন্মান্তরবাদ ও যোনিভ্রমণবাদ, কেবল ক্রমবিকাশের প্রকার, ক্ষেত্র ও মাত্রার বিষয় জানিতে পারিয়াছি। কর্ম্মবাদে আমরা ইহার প্রক্রিয়া বা কার্য্য প্রণালীর বিষয় জানিতে পারিব। একটি প্রচলিত শাস্ত্র-বাক্য আছে “কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধিঃ।” কর্ম্মের অনুরূপই বুদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের কর্ম্মের যতই উৎকৃষ্টতা হইবে, আমাদের বুদ্ধিরও ততই উৎকর্ষ হইবে এবং বুদ্ধিবৃত্তির যতই উৎকর্ষ হইবে আমরাও ততই উন্নত হইব। এইরূপে বুদ্ধির সর্বাপেক্ষা

উৎকর্ষ দ্বারা, মনুষ্য জগতের শ্রেষ্ঠ জীবের পদে অবিরূঢ় হইয়াছে। কহু লিখিয়াছেন :—

“ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।

বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥—মনুসংহিতা ১ম অধ্যায় ১৬।

জগতে আমাদের দুই প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, এক বাহ্য বিষয় ও অপর অন্তরের বিষয়। বাহ্য বিষয় মনের দ্বারা গ্রাহ্য এবং অন্তরের বিষয় বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগ হইয়াই বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত এই যোগ হইতেই মন অন্তঃকরণ (অন্তরিন্দ্রিয়) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই আত্মা অধিষ্ঠিত। তাই গীতার উক্ত হইয়াছে :—

“ইন্দ্রিয়ানি মনো বুদ্ধিরস্থানিষ্ঠান মূঢ়্যতে ॥” ৩।৪০

মনের দ্বারা স্থূল বিষয়ের পরিচয় হয়, কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয়ের পরিচয় হয়, মনের দ্বারা স্থূলভূত বিষয়ক চিন্তা হয়। কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা বিত্ত্বক সাত্বিক জ্ঞান হয়; মনের দ্বারা পার্থিব বিষয়ের ধারণা হয়, কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয়ের ধারণা হয়; সুতরাং মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। ত্রীমতি এনিবেসেট তাঁহার গীতার অনুবাদের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন—

“Manah (মনঃ) is the mind both in the lower mental process in which it is swayed by the senses, and emotions, and in the higher processes of reasoning; Buddhi is the faculty above the ratiocinating mind, and is the pure Reason exercising the discriminative faculty of intuition of spiritual discernment.”—Introduction. The Bhagabad Gita or the Lord's song.

এই বুদ্ধির উৎকর্ষ ও উজ্জলতা হইতেই আত্মা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই ধানেই বিকাশের পরাকাষ্ঠা। গীতার এসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে

“ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহ রিদ্ভিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসন্ত পরা বুদ্ধি র্যোবুদ্ধেঃ পরতন্ত সঃ ॥”

৪২, ৩য় অধ্যায়।

আম্মার বিনাশে মনুষ্য ঐশ্বরিক মহিমা লাভ করিয়া থাকে সুতরাং তখন তাঁহার গন্ধে ফিলিপ্‌সের উল্লিখিত অতীশ্রয় দর্শন প্রভৃতি কিছুই অসম্ভবনীয় থাকিতে পারে না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী।

নব নিদাঘ

অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ নব নিদাঘের ঘোর ;
ওরে মন, আয়, সাজ করিয়ে সকল কর্ম তোর।
বিহারে যে মোর শিথিল শরীর—প্রথ আঁচলের মত,
খোলা বাতায়নে অর্ধ শয়নে চেয়ে থাক অবিরত।

দুপ'র বেলার রোপ্য রৌদ্রে ফুলদল পড়ে যুয়ে,
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি উড়ে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া গুহট করিয়া আছে,
তুই, অমনি গান কি গন্ধের মত ঘুরে বেড়া মোর কাছে।

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রোজ ঝিল্লী-রবের মত,
অগ্নিকুণ্ড জ্বলি তে হাপড়ে ছুঁ দিতেছে অধিরত !
দিকে, দিকে, দিকে জানি না কি পাখী হাভুড়ি ঠুকিছে তালে
কোন্ রূপসীর স্বপ্নমেখলা গড়িছে বিশ্বশালে।

কাল দীঘিঙ্গলে গাহন করিতে নেমেছে গাছের ছায়া,
নিজ্জিত মাঠে, নির্জন ঘাটে, জাগিছে এ কার মায়া !
মরীচিকা চাহি শ্রান্ত পথিক ফুকারে 'ফটিক জল'।
অঙ্গে আলস আসে জড়াইয়ে ছাড়ে না অশথ-তল।

আজি রে বিশ্ব কি মধু মধুর মদির নেশায় ভোর !
মাধায় তাহার ঘুরছে হাজার ঘূর্ণি হাওয়ার ঘোর ;
বাগনা তাহার মরীচিকা হ'য়ে আঁকা পড়ে দূর পটে,
কল্পনা তার গুণ্ গুণ্ করে অলি-গুঞ্জে রটে।

দূর অতীত নিকটে এসেছে কি গোপন সেতু বাহি !
অঙ্গে আলস দাঁড়ায়েছে যেন মোর মূখ পানে চাহি।
এসেছে তাহার দিগন্তহারা সাহার-প্রান্ত হ'তে,
এসেছে রে তারা কোন্ বসোরার ঋতুর বীথি-পথে !

কত বেহুয়ান পার ক'রে মরু—দীপ্ত অগ্নি ঢালা—
নাযায় আমার হৃদয়ের হাটে তরুণী ইরানী বালা।
সরসী-সোপানে কে বসি গোপনে চন্দন মাখি গায়,
মোর, নয়ন-পাতায় শয়ন বিছায় পল্লব ঘন ছায় !

আখি মুদে একা পড়ে আছি এই মূখস্থ তিষেরা নীড়ে
প্রাণ ভ'রে যায় চেনা অচেনার মিলন মধুর ভিড়ে।
বেলা প'ড়ে আসে বধু চলে ঘাটে ভরিতে সাঁঝের জল,
পথপাশে তরু গায়ে তুলে নিগ চ্যুত ছায়া অঞ্চল।
স্বপ্নান্তরে নিয়ে চলে মোরে নিদাঘ-নিশীথ ঘোর
ওরে মন, আয়, ছিঁড়ে কেলে আয়, সকল কর্ম-ভোর।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত।

বসন্ত শিল্প

পূর্ব প্রকাশিতের পর

(ঢাকার ইতিহাসের জন্য লিখিত)

বসন্ত—আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাসেই মঙ্গলীন
প্রস্তুতের উপযুক্ত সময়। একধানা ডুরিয়া বা চার ধান
মঙ্গলীন প্রস্তুত করিতে প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হইত।
সর্বোৎকৃষ্ট মলমল ধান অথবা সরকার আলী অর্ধ ধান
বয়ন করিতে ৫১৬ মাস কাল লাগিত। উহার মূল্য ৭০,
৮০ টাকা অবধারিত ছিল।

বিভিন্ন প্রকারের মলমল এখানে প্রস্তুত হইত বলিয়া
অবগত হওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটির বিবরণ প্রদত্ত
হইল।

ঝুনা—হিন্দি বিনা (স্বস্ত) হইতে ঝুনা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা দেখিতে ঠিক মাকড়সার জালের মত। দৈর্ঘ্যে ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন ৮০ আউন্স।

বিলাসী ধনীবর্গের পুরাঙ্গনাগণ এবং নর্তকী ও গায়িকাগণই সাধারণতঃ ইহা ব্যবহার করিত। “কুলতা” নামক একখানি প্রাচীন তিব্বতীয় গ্রন্থে ঝুনা মসলীনের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ নাকি এই বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। কলিঙ্গরাজ একদা এক খানি ঝুনা মসলীনের কোশলরাজকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। “Gt sing Dgha mo” নামী খলিত-চরিত্রা জনৈক ধর্মযাজিকা কোন প্রকারে উহা হস্তগত করিতে সমর্থ হন। তিনি একদা এই বস্ত্রখানা পরিধান করিয়া সর্বসমক্ষে বহির্গত হইলে, “নয়দেহে” লোক-লোচনের গোচরীভূত হইবার ভয় তাহাকে অবমানিতা ও লাজিতা হইতে হইয়াছিল। অতঃপর ধর্মযাজিকা-গণকে কেহই এবিধ স্বস্ত্র বস্ত্র উপহার প্রদান করিতে পারিবেন না এবং তাহারাও উহা গ্রহণ করিতে পারিবেন না বলিয়া রাজাদেশ প্রচারিত হইয়াছিল (১)।

সুত—ইহা প্রায় ঝুনা মসলীনের মতই স্বস্ত্র। দৈর্ঘ্যে ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন প্রায় ৮ আউন্স ৪ ড্রাম।

সরকার আলি—ইহার স্বত্রগুলি নিবিড় সন্নিবিষ্ট হইলেও ইহা অত্যন্ত কোমল এবং দেখিতে অতিশয় রমণীয়। বস্ত্রের নবাবগণের জন্তই ইহা প্রস্তুত হইত। সরকার আলি নামে এক প্রকার বাদসাহী জায়গীরের উল্লেখ বহু গ্রন্থে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দিল্লীশরের জন্ত যে সকল মলমল ঢাকাতে প্রস্তুত হইত তাহার ব্যয় সম্বলন জন্তই এই জায়গীরের সৃষ্টি হইয়াছিল।

নবাব ও সুবাদারগণ প্রতিবৎসর দিল্লীশ্বর সন্নি-
ধানে যে সকল জব্বাতি উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিতেন
তন্মধ্যে সরকার আলি অন্যতম। জায়গীর লব্ধ রাজস্ব

ইহার প্রস্তুত জন্ত ব্যয়িত হইত বলিয়া ইহা সরকার আলি এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দৈর্ঘ্যে ১০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন ৪ আউন্স কিংবা ৪ আউন্স।

খাঙ্গা—পারসী “খাঙ্গা” (উৎকৃষ্ট, সুবৃদ্ধ) শব্দ হইতে খাঙ্গা মলমলের নামকরণ হইয়াছে। ইহার স্বত্রগুলিও ঘন সন্নিবিষ্ট। আবুল ফজল তদীয় আইন-ই-আকবরি নামক গ্রন্থে এই মলমলকে কঁসাক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সোনারগাঁও অঞ্চল উৎকৃষ্ট খাঙ্গা মলমল প্রস্তুতের জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল (১)। সর্বোৎকৃষ্ট খাঙ্গা মলমল “জঙ্গল খাঙ্গা” নামে অভিহিত ছিল। দৈর্ঘ্যে ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ হইতে ১১ গজ, ওজনে ২১ আউন্স।

সবনম—এই স্বচ্ছ ও স্বস্ত্র বস্ত্রখণ্ড রূপকচ্ছলে পারসী ভাষায় সাক্ষ্য শিশির (Evening dew) বলিয়া অভিহিত হইত। আমল তৃণ শোপোপরি ইহা আত্মীর্ণ করা গেলে শিশির নিবিক্ত দুর্দাদল বলিয়া ভ্রম জন্মিত। একদা পরীক্ষাচ্ছলে আলিবর্দি খাঁ একখানা সবনম মলমল খাঙ্গার উপরে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, একটি গরু খাস খাইতে খাইতে বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ড উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল (২)। ইহার দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজনে ১০ হইতে ১৩ আউন্স।

আবরোস্তান—আব=জল, রোস্তান=প্রবাহিত হওয়া। নির্মলসলিসা স্রোতবতীর মত ইহা অতিশয় স্বচ্ছ; এজন্যই ইহার নাম আবরোস্তান। জলের সহিত একরূপ ভাবে মিশিয়া থাকে যে, জল হইতে না তুলিলে কাপড় বলিয়া অনুমান হয় না (৩)। দৈর্ঘ্যে ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজনে ২ হইতে ১১ আউন্স।

(১) Analysis of the Dulva by A Cosmekorosi in Res. Asiatic Society of Calcutta, vol. xx pt 1 page 5.

(1) Sarcar Sunargnon. In this Sarcar is fabricated cloth called ‘Cosoch’-Gladwin’s translation of Ain-i-Akbari-Page 305.

(2) History of the cotton manufacture of Dacca District.

(3) See Bolt’s Consideration on the affairs of India. Page 206

আলাবাল্লা—তত্ত্বাবহুল আলাবাল্লা শব্দের অর্থ করেন “অতি উৎকৃষ্ট”। ইহার স্বত্রগুলি নিবিড় সমা-
চ্ছন্ন। “Sequel to the periplus of the Erythrean
sea” নামক পুস্তিকার ডাক্তার ভিন্সেন্ট এই বস্ত্রকে
“abollai” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন এই
গ্রীক শব্দটি লাতিন abolla শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে।
লাতিন abolla শব্দ সৈনিকের কুর্তা বুঝায়।

এরিয়েন ভারতীয় কার্পাস সম্পর্কেই সম্ভবতঃ এই
শব্দটি প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। আমাদিগের বিবে-
চনায় আলাবাল্লাসংজ্ঞক মলমলকেই তিনি “abollai”
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তজ্জব—পারসী “তন” = শরীর এবং জেব = অল-
ঙ্কার। ইংলণ্ডে ইহা তাজ্জব নামে সুপরিচিত। দৈর্ঘ্যে
২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন ১০ হইতে ১৮ আউন্স।

তরন্দাম—তত্ত্বাবহগণ এই শব্দের অর্থ আলাবাল্লা
বলিয়া থাকেন। আরবী তুগ = ব্রকম, এবং পারসী
উদাম = শরীর, এই উভয় শব্দের একত্র সংযোগে
তরন্দাম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্বে তেরেন্দাম
নামে ইহা ঢাকা হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি হইত। দৈর্ঘ্যে
২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন ১৫ হইতে ২৭ আউন্স।

নকুনশুক—ইহা অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের।
আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে ইহা “তুনশুক” বলিয়া উল্লি-
খিত হইয়াছে। আবুল ফজল ইহার মূল্য ৪৭ টাকা
হইতে ৮০ টাকা পর্যন্ত নির্দেশ করিয়াছেন। দৈর্ঘ্যে
২০ গজ, প্রস্থ ১১ গজ।

বন্দনশাস—নয়নশুকের জায় ইহার স্বত্রগুলি
খস সন্নিবিষ্ট নহে। দৈর্ঘ্যে ১০ হইতে ২৪ গজ, প্রস্থ ১১ গজ
ওজন ১২ আউন্স।

সুন্নবতী—সুর = মণ্ডক, ও বন্দন = বন্ধ করা,
এই শব্দ দুইটির সম্বন্ধে এই শব্দটি নিষ্পন্ন হই-
য়াছে। ইহা শিরজাপ নকশা ব্যবহৃত হইত। দৈর্ঘ্যে
২০ গজ হইতে ২৪ গজ, প্রস্থ অর্ধ গজ হইতে ১ গজ,
ওজন ১২ আউন্স।

সন্নবতি—সন্নবতি শব্দের অর্থ মোচড়ান অথবা
কুণ্ডলীকৃত ভাবে জড়াইয়া রাখা। ইহাও শিরজাপ
রূপে ব্যবহৃত হইত। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ সন্নবতির অমু-
রূপ।

কুমীস—আরবী কুমীস (সার্ট) শব্দ হইতে ইহার
উৎপত্তি হইয়াছে। এই বস্ত্র দ্বারা মোসলমানগণ কুর্তা
প্রস্তুত করিতেন। দৈর্ঘ্যে ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন
১০ আউন্স।

ডুরিয়া—ডুরিয়া প্রস্তুত প্রণালী একটু স্বতন্ত্র
রকমের। দুইটি স্বত্র একত্র পাকাইয়া ইহার তানা প্রস্তুত
হইয়া থাকে। স্বতরাং বয়ন করিলে উহা ডুরিয়ার জায়
প্রতীয়মান হয়। বেঙ্গ ও সোরাজ জাতীয় বিভিন্ন
প্রকারের তুলা হইতে স্বতা কাটিয়া ইহার বয়ন কার্য
নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। দৈর্ঘ্যে ১০ হইতে ২০ গজ, প্রস্থ
১ হইতে ১১ গজ পর্য্যন্ত।

চারখানা—এই মলমল বিভিন্ন বর্ণের স্বত্রদ্বারা
নির্মিত। ইহা ডুরিয়ারই অমুরূপ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ
ডুরিয়ার জায়। ডুরিয়া ও চারখানার “ডোরা” গুলির
আয়তন সমান নহে। “Periplus of the Erythrean
sea” গ্রন্থে ইহা Dia Krossia নামে ভারতীয় বস্ত্র সমূহ
মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। Apollonius, Dia Krossia
শব্দের অর্থ করিয়াছেন “ডুরিদার।”

জামদানি—যে সমুদয় বস্ত্রের কারুকার্য তাঁত
হইতেই কলে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে পারসী ভাষায় তাহাকে
জামদানী বলে। পূর্বে ইহার বয়ন কার্যে ২০০ শত
হইতে ২৫০ নম্বরের স্বত্র ব্যবহৃত হইত। জামদানী
বস্ত্র প্রস্তুতের খরচ অত্যন্ত বেশী। সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই
বস্ত্রের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া
যায়। তিনি ইহার এক একখানা ২৫০ টাকা দিয়া
গ্রহণ করিতেন। মহম্মদ রেজা খাঁ ইহার এক এক খানা
বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য ৪৫০ টাকা প্রদান করিতেন।
“Periplus of the Erythroan sea” গ্রন্থে ইহা
Skotulats বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

জামদানী বস্ত্র নানাবিধ বস্ত্র :- তোড়াদার, কারেলা, বুড়িদার, তেরছা, জলবার, পায়াহাজার, মেল, হুবলিজাল, ছাওয়ান প্রভৃতি।

জামদানী বস্ত্রের নির্মাণ কার্য যোগল গবর্ণমেন্টের হস্তে একচেটিয়া ছিল। সর্বোৎকৃষ্ট জামদানী বস্ত্র মুরশিদাবাদের নবাবগণের জন্যই প্রস্তুত হইত। ঢাকা আড়ংএর তত্ত্বাবগণই সাধারণতঃ ইহা প্রস্তুত করিত। একজ্ঞ ঢাকার সদর মলমল খাস কুঠীর দারোগা তত্ত্বাবয় দিগকে দান দিয়া রাখিতেন। কিন্তু সদর মলমল খাস কুঠীতে দারোগার কর্তৃত্বাধীনে অতি অল্প পরিমাণ জামদানী বস্ত্রই প্রস্তুত হইত। অধিকাংশ বস্ত্রই তত্ত্বাবগণ স্বীয় গৃহে নির্মাণ করিতেন। কিন্তু তাহারাও গিনির অধিক মূল্যের বস্ত্র অন্তের নিকট বিক্রয় করিতে পারিত না। একজ্ঞ ইউরোপীয় এবং দেশীয় বণিকগণ বস্ত্র ব্যবসায়ের জন্য দালালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন (১)।

তত্ত্বাবগণকে “ছাপা জামদানী” নামে এক প্রকার কর প্রদান করিতে হইত। গবর্ণমেন্টের অজ্ঞাতসারে জামদানী বস্ত্র বিক্রয়ের অধিকার প্রাপ্তির জন্যই তত্ত্বাবয় কুল এই প্রকার কর প্রদান করিতেন। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে এই কর রহিত হয় (২)।

এখনও ২০০ টাকা মূল্যের অত্যন্ত সংখ্যক কয়েক-খানা জামদানী মসলীন ত্রিপুরার মহারাজ এবং অত্যন্ত কতিপয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্য ঢাকাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪০০ টাকা মূল্যের জামদানী মসলীনও মধ্যে মধ্যে প্রস্তুত করিতে দেখা যায় (৩)।

ঢাকা সহর ব্যতীত, নাস্তি, ডেমড়া, খামরাই, কাচাপুর, সিদ্ধিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও জামদানী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মলমল খাস—দিব্বার সম্রাটগণের ব্যবহারার্থে ইহা প্রস্তুত হইত। এই মসলীন এরূপ স্থল যে, একটি বন্ধুরী-য়কের মধ্য দিয়া সমুদয় বস্ত্রখানা এক দিক হইতে অপর-দিকে টানিয়া নেওয়া যায়। দৈর্ঘ্য ১০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন ৮১/১০ আট তোলা, ছয় আনা। মূল্য সাধারণতঃ ১০০।

মলমল খাস প্রস্তুত করিবার জন্য সুবাদারগণের নিয়োজিত স্বতন্ত্র লোক ঢাকা ও সোণারগাঁয়ে অবস্থান করিত। উহা “মলমল খাস কুঠী” নামে অভিহিত হইত। তত্ত্বাবগণের কার্য পর্যবেক্ষণের জন্য এক জন দারোগা মলমলখাস কুঠীতে অধ্যক্ষ স্বরূপে সর্বদা অবস্থান করিত। তাঁতের কার্যে যাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহাদিগকেই মলমলখাস কুঠীর কার্যে নিয়োজিত করা হইত। এই সমস্ত তত্ত্বাবগণের নামের একখানা রেজেষ্টরী বহি কুঠীতে রাখা হইত। প্রত্যেক কার্যকারক প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া কার্য করিতেছে কি না তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দারোগার কর্তব্য মন্তে পরিগণিত ছিল (১)।

প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কার্য সুসম্পন্ন হইল কি না তাহার পরীক্ষা দারোগা স্বয়ং করিতেন। কার্যারম্ভের পূর্বে দারোগার কর্মচারী হুতাগুল ভালরূপ পরীক্ষা করিত। আদর্শ মলমল খাসের হুতার সহিত তুলনায় উহা সমশ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হইলে কার্যারম্ভ করিতে দেওয়া হইত। এরূপ কঠিন বিধি ব্যবস্থার প্রচলন ছিল বলিয়াই মলমলখাস প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগিত (২)।

কর্মচারীগণের উৎপীড়নঃ—এই সুযোগে নবাবী কর্ম-চারীগণ তত্ত্বাবদিগের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে পরাক্রম হইত না। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময়ে মলমল-খাস কুঠীর কর্মচারীগণ তত্ত্বাবদিগের প্রাপ্য টাকার অংশ হইতে শতকরা ২৫ টাকা হারে কর্তন করিয়া রাখিত বলিয়া ঢাকার রেসিডেন্ট লিখিয়াছেন।

(১) History of the Cotton manufacture of Dacca District

(২) Ibid.

(৩) A Survey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam for 1907-1908 by Mr. G. N. Gupta, M. A. I. C. S.

(১) History of the cotton manufacture of Dacca District.

(২) Ibid.

Abbe Raynel চাকার তত্ত্বাবধিগের অবস্থা বর্ণনা করিতে বঙ্গের সুবাদারগণ মলমলখাস প্রস্তুত করিবার জন্য করিতে এক স্থানে লিখিয়াছেন “ইহারা ক্ষিপ্ৰকারিতার প্রতিবৎসর যে অর্থ ব্যয় করিতেন তাহা দিল্লীখয়ের প্রাপ্য সহিত অল্প সময়ে নির্দিষ্ট কার্য পরিসমাপ্ত করিলে নবাবের বার্ষিক নজরানা স্বরূপ ধরিয়া লওয়া হইলেও প্রকৃত কর্মচারীগণ উহাদের দ্বারা বেশী কাজ করাইয়া লইয়া প্রত্যাবে উহা বাদশাহার রাজস্ব হইতেই ব্যয়িত হইত তদ্বাবদে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিতে সর্বদাই এবং সরকার আলী জাঙ্গীরের হিসাবে খরচ লেখা কার্পণ্য করিতেন ; এবং কার্য করিবার সময় উহারা হইত ।

এক প্রকার বন্দী অবস্থায়ই কাল যাপন করিত ।” (৩)

বিভিন্ন সময়ে মলমল খাস বঙ্গের মূল্য যত ছিল নিম্নোক্ত তালিকা দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে ।

| প্রস্তুতের সময় | দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, | তানার হাতার পরিমাণ | ওজন | মূল্য |
|---|------------------|--------------------|---------|------------------|
| সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসন সময়ে—১০ গজ ৩৫" X ১ গজ ৩৬" | | ১৮০০ । | ১০ তোলা | ১০০ আর্কট মুদ্রা |
| ১৭২০/১৮০০— | " " | " | ১২½ " | ৮০ " ৬ |
| ১৮৫০— | ১০ গজ X ১ গজ | " | ৪½ " | ১০০ " |

নবাব জাফর আলি খাঁ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সম্মিথানে নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করা গেল । মলমলখাস ব্যতীত প্রতি বৎসর ৫০০ খানা মলমল খাস বঙ্গ নজরানা স্বরূপ সুবর্ণ ও রৌপ্যের বাদলা, পাখা, শ্রীহট্টের ঢাল, নাপ প্রেরণ করিতেন । ১৮০০ খৃঃ অব্দে ঢাকার নায়েব কেশর আতর প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য ঢাকা হইতে নাজিম নসরৎ জঙ্গ বাহাদুর প্রাচীন দলিলাদি দৃষ্টে নবাব প্রেরিত হইত বলিয়া জানা যায় । সমুদয়ে মোটে জাফর আলীর প্রদত্ত উপঢৌকনাদির যে একটি তালিকা ১২৭৮৭১৬০ ব্যয়িত হইয়াছিল বলিয়া তালিকাতে লিখিত কমার্সিয়েল রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়া ছিলেন আছে ।

ঢাকা আড়ং ।

| | |
|--|---------------|
| ১০০ খানা জামদানী ধুতী ২৫০৷ হিসাবে | ২৫০০৷ |
| ৫০ " " " রেশমী বুটাদার ২০০ হিসাবে | ১০০০৷ |
| ৬০ খানা রেজ অর্থাৎ রৌপ্য হস্তের কারুকার্য খচিত মসলীন ১০০৷ হিসাবে | ৬০০৷ |
| ধোলাই ও ইজি খরচ | ১৪৮০৷ |
| | <u>৪২৪৮০৷</u> |

সোনার গাঁও আড়ং

| | |
|---------------------------------|----------------|
| ১০০ খানা সাদা মসলীন ২০০৷ হিসাবে | ২০০০৷ |
| ২০ " সাদা সরবন্দ ৮০৷ " | ১৬০৷ |
| ধোলাই ও ইজি খরচ | ২২৫০।০ |
| | <u>২৪৫৫০।০</u> |

| | |
|---|--------|
| নাগ কেশরের আভর | ২৬০৭ |
| ৫০ খানা গ্রীহট্টের ঢাল ১৬৭ হিসাবে | ৮০০৭ |
| ঢালের কারুকার্য বাবদ | ২৬৮০৭ |
| | <hr/> |
| | ৩৪৮০৭ |
| ১০০ খানা সুবর্ণ স্তরের জড়াও করা লাঠি এবং ২০০ খানা তালপত্রের পাখা | ২০০৭ |
| উহার কারুকার্য খরচ | ৪০০০৭ |
| | <hr/> |
| | ৪২০০৭ |
| সোনার বাদলা | ৫০০০৭ |
| রৌপ্য বাদলা | ১১০০০৭ |
| | <hr/> |
| | ১৬০০০৭ |

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

সাধ

(Rogersএর wish কবিতার মর্মানুবাদ)

১
সাধ হয় হবে মোর একটি কুটার,
বহিবে তটিনী যার চুমিয়া চরণ,
হাসিবে মল্লিকা যেথা হইয়া অধীর ;
পরশি সাঁঝের বেলা ঘীর সমীরণ।

২
উষা না কুটিতে পিক গাবে তরু'পরে,
ভ্রমর গুঞ্জরি যাবে প্রভাতী রাগিনী,
নাচিবে শিখিনী আসি আমার ছুরারে ;
দূরে ফেলি লাজ-বাস হাসিবে নলিনী।

৩
নিদ্রাঘের দ্বিপ্রহরে শ্রান্ত পাহ আসি,
হবে গো অভিধি মোর দরিত্র কুটীরে,
যতনে ভুবিব তারে সাদরে সম্ভাবি ;
সুমধুর বন-ফলে শুল্লীতল নীরে।

৪
চাদিনী মাধবী রাতে বন ফুল-হার,
গাঁধিয়া প্রিয়ের গলে দিব পরাইয়া,

সোহাগে চুমিবে প্রিয় অধরে আমার ;
পুলকে এ ক্ষুদ্র হৃদি উঠিবে ভরিয়া।

৫
কৌমুদী প্রাবিত নিক্ত তটিনী-পুলিনে,
সে ধীরে বাজাবে বীণা, আমি গাব গান,
পাপিয়ার মধুগীতি মিশিবে সে তানে ;
বন-নদী বহে যাবে তুলি কল তান।

৬
আধভাবী এতটুকু সোনার পুতলী,
'চুমা দে' বলিয়া কোলে পড়িবে কাঁপিয়া,
আদরে চুমিয়া তারে বুকে লব তুলি,
জননী-হৃদয় মেহে যাবে গো গলিয়া।

৭
চাহিব না স্বর্গ-সুখা—নন্দনের মধু-
হেরিব কুটীরে নিত্য স্বরণের ছবি,
ওধু শ্রীতি, ওধু মেহ, ভালবাসা ওধু
তার মাঝে নিশি দিন রহিব গো ভুবি।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

“ঘন ঘোর বরিষায়”

সে দিনো এমনি বুঝি নিবিড় বরষা
সুদীর্ঘ বিরহ-মান রামধিরি-শিরে
জাগিয়ে তুলিয়াছিল আকুল পিয়াসা
অলকার মোহমুগ্ধ বন্ধের অন্তরে !
আজো তাই গুরু গুরু মেঘ গরজনে
বিষের বিরহ-ব্যথা উঠিতে জাগিয়া ;
শ্রাবণ-গগন-পথে নিষিক্ত পবনে
অভূত আকাঙ্ক্ষা যেন দেছে কে ঢালিয়া !
কুলে কুলে ভরা গাও, অধীর আকুল,
ছুটিয়াছে লুটাইতে অকুলের বুকে ;
বরষা-আসার-স্নাত তরু, লতা, ফুল
ঈঙ্গিতে প্রতীক্ষিছে প্রীতি-কুল যুগে !
রূপ, ঝাপ, বরিষণ, শূন্য বাতায়নে
প্রবাসীর ক্ষুধা দৃষ্টি আকাশের পানে !
শ্রী বোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ।

পহেলা আষাঢ়

বিরহের জন্ম তিথি

সখে !

আজকে মাসের পহেলা !
বেহাগের সুরে, আজি সুরপুরে
বিরহে বাজিছে বেহেলা !
ছাপিয়া গিয়াছে পাগিয়া-“দিউ”
কুঞ্জে না রোয়ে কোয়েলা !

জিউ,

“আর্জ-বিরহে” রহে-বা না-রহে
কাদে “পোড়াদহে” দোয়েলা !

সখে !

আজকে মাসের পহেলা !
ডাহক-ডাহকী চক্র-চাতকী
শালিখী-শীখি-চন্দনা

আকুলি-ব্যাকুলি কাকলী করিয়া

গাহিছে বিরহ বন্দনা !

রদুর-বাদলে বাদল পাইয়া

দক্ষিণ ডাকে ভৈরবে !

কলাপী একা আলাপে কেতা ;

বাগী-জলে খেলে কৈরবে !

ঈঙ্গিত লাগি নিশীথ জাগি

দীপ জালিছে জোনাকী,

ভ্রমর-ভরে নীপ শিহরে !

কম্পবন্ধ কেতকী !

প্রেমবিকারে বিল্লী ফুকারে

আত্ম কুঞ্জে পশিয়া

পূবের বাতাস করে হা-হতাশ

সর্জ-কাননে শসিয়া !

আজ

কাঁদিছে কান্তাকাতর বন্ধ

প্রিয়া পরশ লাগিয়া

“মন্দাকিনী” ছন্দঃ গাহিছে

বর্ষা বামিনী জাগিয়া !

আষাঢ় আকাশে নীরদ ভাসে,

স্নিগ্ধ সুনীল কায়

জীবুতে কত সে কাকুতি করিয়া

প্রেরিয়া অলকার !

“কণ্ঠাশ্রব প্রণয়িনী” বিনা

মনটা কেমন করে !

“তব্বী শ্রামা শিখর দশনা”—

আশায় বছর ধরে’ !

বিনে সে “অর্জ” বাঁচে কি মর্দ ?

ভোয়াজে কে রাখে তাজা ?

কৈদে কবি কয় “খাও এ সময়

রোজ রোজ চানা তাজা”

শ্রীকুলচন্দ্র দে ।

যমুনা

প্রেমের প্রবাহে বহে যমুনার ধারা,
কোন উচ্চ তুল্য হতে হ'য়ে নিজ হারা
পাগলিনী এসেছিল সন্ধ্যানে কাহার
পীঠ স্থান বৃন্দাবন বেলাভূমে তার।
মিলিয়াছে হারানিধি তাই সে গৌরবে
পুণ্যময় করিয়াছে প্রেমের সৌরভে।
অঙ্কিত আলিও সেই অক্ষয় কাহিনী
উঠেছিল এক দিন প্রেমের রাগিনী
যে মহাপ্রাণের মাঝে। এই যমুনার
তীরে, নীরে লীলা খেলা, যে সুখ সম্ভার
রেখে গেছে রাধা শ্রাম, কালের স্রবণে
জলন্ত রয়েছে তাহা প্রেম শীর্ণ স্থানে।
যমুনা প্রবাহে হেরি প্রেমের বারতা
ভক্তির উচ্ছ্বাসে আজো মুখে পড়ে মাথা।

শ্রীশ্রমাসুন্দরী বোব।

নামি-কো

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বগৃহে জেনারেল

একদা শনিবার অপরাহ্ন সময়ে ডায়-কাউন্ট লেফ-
টেড্যান্ট-জেনারেল কাতাওকা পাঠাগারের চেয়ারে
আরামে বসিয়াছিলেন। তখন জুন মাসের মধ্য ভাগ ;
তার বাটার নিকটস্থ চেসনট গাছগুলি পুষ্পিত হইয়া
উঠিয়াছে। তার বয়স পঞ্চাশের অধিক উর্দ্ধে না উঠিলেও
কপালের উপরিভাগে কতকটা ঢাক পরিয়াছে ও চুলগুলি
শাদা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তার বিশাল বপুধানির ওজন
প্রায় সার্ক দুই মণ হইবে ; তার ভারে আরব খোড়ারও
পলদমর্ষ হওয়া বিচিত্র নয়। স্থূল গ্রীবা প্রশস্ত কঁধের

মধ্যে লুপ্তপ্রায়, ও 'দোভালা' খুতনী বেন বন্ধে আসিয়া
মিলিয়াছে। তার ভুঁড়িটি বৃহৎ ও উরুদেশ বড়ের উরুর
মত স্থূল। বাদামি মুখ, বড় নাক, পুরু ঠোঁট, দাড়ী যৎ-
সামান্য ও চোখের জ পাতলা। তার চক্ষুদ্বয়ও
দেহের অবশিষ্টাংশের সহিত বেন মিল রাখিবার জন্য,
হাতীর চোখের মত সরু ও দেখিতে শাস্ত। মুখের উপর
সদাই একটু মৃদু হাস্য লাগিয়া থাকিতে তাঁহাকে বেশ
একটু রসিক গোছ দেখাইত।

কয়েক বৎসর পূর্বে, শরৎ কালে, জেনারেল এক
পাহাড়ে জায়গায় শীকার করিতে গিয়াছিলেন। তিনি
তার সাধারণ পোশাকেই সজ্জিত ছিলেন ; এক ক্ষুদ্র
কুটীরে একাকিনী এক বৃদ্ধা বাস করিত ; তার নিকট
তিনি চা প্রার্থনা করিতে বৃদ্ধা খুব মনোযোগের সহিত
তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল, ও তারিফ করিয়া বলিল—
“তুমি ত খুব জোয়ান ! কিছু শীকার করেছ বোধ হয় ?”
জেনারেল দ্বিধা হাস্য করিয়া বলিলেন—“না কিছু
না।”

“শীকার করে কি কখন পেট চালায় যায়।
তোমার মত শরীর নিয়ে দিন-মজুরের কাজ কর, নিশ্চয়
তুমি পঞ্চাশ 'ইয়েন' উপায় করবে।”
“মাসে ?”

“না, না। এক বছরে অবিশিষ্ট। কাজ আরম্ভ কর,
তখন বলবে আমি তোমাকে একটা কাজ দেব।”

“খতবাদ। আর এক দিন এসে তোমার পরামর্শ
নেব।”

“হ্যাঁ, নিশ্চয় তাই করবে। এমন প্রকাণ্ড
শরীরটা শীকার করে বেড়িয়ে নষ্ট কোরো না।”

এই হাস্যকর ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া তিনি বহুবাকব-
দের চিত্তবিনোদন করিতে ভালবাসিতেন। তার সহিত
যার পরিচয় নাই সে হয়ত তার সম্বন্ধে এই বৃদ্ধারই মত
মত প্রকাশ করিত। কিন্তু তাঁহাকে যে ভালো রকম
জানিত, সে বুঝিত, বিপদের সময় এই আত্ম-নির্ভর যোদ্ধা
একটি সজীব লৌহ-প্রাচীরের মত। তার ক্ষুদ্র পাহাড়ের

মত প্রকাণ্ড শরীর ও দেবতাদের মত অবিচ্ছিন্ন চিত্র আসন্ন বিপদের সম্মুখে কম্পমান সৈন্যদলের মন নির্ভয় করিতে সমর্থ ছিল।

নিকটস্থ টেবিলে একটি নীল বর্ণ আধারে এক ঝাড় সরল “বামন” বংশ। দেয়ালের উপর দিকে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর ছবি টাঙানো; তল্লিয়ে, অপর দিকে একখানি ক্ষুদ্র কাঠ পীঠিকা; উহার উপর নান্দু-লিখিত দুইটি অক্ষর; উহাদের অর্থ—“দয়ালু হও।” বইয়ের সেলফে কয়েক থাক পুস্তক; আঙনের চুম্বির উপরকার তাকে ও ঘরের কোণে স্থিত তেপায়ার উপর জাপানী ও বিদেশী প্রায় অর্ধ ডজন ছবি; তাদের মধ্যে কেহ কেহ সৈনিকের সাজে সজ্জিত।

সবুজ পরদাগুলি একধারে সরাইয়া দিয়া পূর্ব ও দক্ষিণের ছয়টি জানালাই সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত। পূর্বাদিকে তানিমাচির জনাকীর্ণ রাস্তার উপর দিয়া পত্রাচ্ছাদিত রৈইনাল্ পাছাড় দৃষ্টিগোচর হয়; উহার উপরে আতাঙো বুরুজের চূড়া ঈষৎ মাথা তুলিয়াছে। একটা চীল ইহার উপরে গুর পাকু ঝাইতেছিল। দক্ষিণে পুষ্পিত চেসনট-বৃক্ষের ছায়াস্তর একটি উত্তান; গাছগুলির মধ্যকার ফাঁক দিয়া হিকাওয়া মন্দির প্রাঙ্গণে সবুজ বর্ষার মত একটি ঝাউ গাছ দেখা যাইতেছিল।

জানালায় মধ্য দিয়া নবীন গ্রীষ্মের আকাশ নীলবর্ণ সাটিনের মত দেখাইতেছিল। তরুণ পত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে স্তবকে স্তবকে ফিকা জরদা রঙের প্রচুর চেসনট-ফুল ফুটিয়া আকাশের নীলিমার উপর অঙ্কিত রহিয়াছে। একটি শাখা জানালার নিকট উদ্গত হইয়া রহিয়াছে। দেখিতে অশোভন হইলেও ইহার উপর সৈনিকের পোষাকের ধোবার মত ফুলের বোঝা; এবং সংহত সূর্য্যালোক ইহার পত্রাবলির মধ্য দিয়া মরকত, নীলোৎপল ও ভৃগমণির দীপ্তিতে প্রকাশিত হইতেছিল। বাতাসের ঈষৎ স্পন্দন অজ্ঞাতসারে কক্ষ মধ্যে পৌরভ বহন করিয়া আনিতেছিল, ও জানালা হইতে নীলাভ পাণ্ডুর বর্ণ ছায়া গুলো জেনারল্‌এর বাম হস্ত ধৃত “সাইবিরীয় রেল পথের

বর্তমান অবস্থা” নামক পুস্তিকার পাতার উপর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। অপ্রশস্ত চক্ষু দুটি মুহূর্তের ভ্রম বন্ধ করিয়া তিনি নিখাস টানিলেন; তার পর ধীরে ধীরে চাহিয়া পুস্তিকার উপর দৃষ্টি ফিরাইলেন।

বাহিরে কোথায় বল গড়ানোর মত কূপের কপি কলের শব্দ হইল। শীঘ্রই সে শব্দ থামিয়া গেল। অপরাহ্নের নিশ্চলতা এক্ষণে বাটীতে বিরাজ করিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল দুইটি শিশু গোপনে বাটী প্রবেশের সুবিধা খুঁজিতেছে।

ঈষদ্ব্যক্ত দ্বারের মধ্য দিয়া তারা গোপনে মন্তক প্রবিষ্ট করাইয়া আবার বাহির করিয়া লইল। তারপর বাহিরে চাপা হাসির শব্দ শুনা গেল। তাদের মধ্যে একটি অষ্টমণ্ডীয় বালক, নাবিকের পোশাকে সজ্জিত; অপরটি বালিকা, তার চেয়ে দুই তিন বৎসরের ছোট হইবে; মন্তকের কেশ ক্রুর উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে; তার পরিধানে বেগুনে রঙের আঁজিকাটা পোষাক ও লাল কোমরবন্ধ।

দুই জনে কিছুক্ষণ ইতস্তত করিল, তার পর যেন আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া কক্ষ মধ্যে লাফাইয়া পড়িল; রাশীকৃত কাগজের দুর্গ সহজেই উত্তীর্ণ হইয়া তারা একেবারে জেনারল্‌এর চেয়ার আক্রমণ করিল, ও দক্ষিণ দিক হইতে ‘নাবিক’ ও বাম দিক হইতে বালিকা বিপুলকায় যোদ্ধার হাঁটু দুটি দখল করিয়া বসিল।

“বাবা!”

“ইন্দ্রলের ছুটি?” জেনারল্‌ সহাস্তে বলিলেন; সে স্বর বৃকের গভীরতম প্রদেশ হইতে নির্গত হইল। ভারী হস্ত দিয়া তিনি ‘নাবিকের’ পিঠ ও কন্টার চূর্ণ কুস্তল খাবাড়াইতে লাসিলেন।

“পরীক্ষা কেমন হল? ভাল?”

“বাবা, আমি অঙ্কে A পেয়েছি।”

“বাবা, মাষ্টার মশায় বললেন আমার সেলাই ভালো হয়েছে।”

জানুয়ারি ১৩১২

“চূর্ণ কুণ্ডল” কিণ্ডার গাটেনের কাজ বাহির করিয়া পিতার হাটুর উপর রাখিল।

“বাবা, বেশ হয়েছে!”

“আর পড়াতে আর লেখাতে? পেয়েছি, বাদ বাকী সব। শেষে আমি মিনাকামির কাছে হেরে গেলুম। ভারী কষ্ট হচ্ছে।”

“আচ্ছা, লেগে থাক। আজ কি গল্প পড়া হল?”

‘নাবিক’ ছুটিতে বলিল, “মাসাৎসুরার গল্প, বাবা! আমার মাসাৎসুরাকে খুব ভাল লাগে। আচ্ছা বাবা মাসাৎসুরা বড়, না নেপোলিয়ন বড়।”

“হুজনেই বড়।”

“বাবা আমি মাসাৎসুরাকে ভালবাসি, কিন্তু নৌবিভাগ আরো ভালবাসি। বাবা তুমি হলে স্থল সৈন্যের মধ্যে, আর আমি হব নৌ-সেনা।”

জেনার্ল হাস্ত করিলেন। “তাকেও-সানের অধীনস্থ নাবিক হবে?”

“সে. সে ত ‘এন্সাইন্’। আমি চাই ‘লেফ্টেন্যান্ট জেনার্ল’ হতে।”

“নৌ-বিভাগে তা বলে না; ‘রৌর আড্‌মিরাল’ বলে। তুমি আড্‌মিরাল হতে চাও না?”

“কিন্তু তুমি বাবা ‘লেফ্টেন্যান্ট জেনার্ল’। আচ্ছা বাবা ‘লেফ্টেন্যান্ট জেনার্ল’ ‘এন্সাইনের’ চেয়ে বড়, কেমন?”

“এন্সাইন্” ই হোক আর ‘জেনার্ল’ ই হোক, যে বেশী লেখাপড়া করে সে-ই সব চেয়ে বড়।”

“বাবা, বাবা ও বাবা,” ‘চূর্ণ-কুণ্ডল’ পিতার হাটুর উপর লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, “মাষ্টার মশায় আমাদের এমন সুন্দর গল্প বলেছেন—খরগোস আর কচ্ছপের গল্প। গল্পটা তোমায় বলব? এক সময়ে একটা খরগোস ও একটা কচ্ছপ ছেলো—এই যে মা আসচে।”

ঘড়িতে যেই দুইটা বাজিল, অমনি প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স্কা এক ঢেঙ্গা স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিল। তার বিদেশী ধরণে চুল ঝাড়া; সামনের চুল কুঞ্চিত এবং

উঁচু কপালের উপর সিঁথি কাটা। ট্যারা বহু চক্ষু দুটি তার কৃষ্ণ মেজাজের পরিচয় দিতেছিল। তার ঈষৎ কৃষ্ণাভ মুখ সামান্য রঞ্জিত এবং দাঁতগুলি, (কখন কখন দেখা যাইতেছিল,) যতদূর সম্ভব মার্জিত। তার জঁকালো ক্রেপের পোষাক, কালো সাটিনের কোমরবন্ধ ও হস্তে মূল্যবান অঙ্গুরীয়।

“তোমরা আবার তোমাদের বাবাকে বিরক্ত করুচ।”

“তা কেন হবে, আমি ওদের ইস্কুলের পড়ার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। আচ্ছা, এইবার বাবা পড়বে। তোমরা খেলা কর গে। এর পরে আমরা সকলে মিলে বেড়াতে যাব।”

“কি মজা!” ‘চূর্ণ-কুণ্ডল’ বলিল।

‘নাবিক’ চীৎকার করিল—“বান্‌জাই!”

বালকবালিকা হাত ধরাধরি করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল; দূরে “বান্‌জাই,” “কি চানু আমায় দাও” প্রভৃতি চীৎকার শুনা যাইতে লাগিল।

“তুমি যা-ই বল, তুমি তোমার ছেলেদের বড় আদর দাও।”

ঈষৎ হাস্ত করিয়া জেনার্ল বলিলেন, “না, ঠিক তা নয়। কিন্তু ছেলেপুত্রদের ভালবাসলে তাদের উন্নতি হয় ভালো।”

“কিন্তু তুমি ত জানই যে ‘কঠোর পিতা’ ও ‘দয়্যাবতী মাতা’—সাধারণ লোকেও এই ধারণার বশবর্তী। কিন্তু তুমি তাদের যে রকম আদর দাও, সেই জন্যে কথাটা উঠে গেছে। আমাকেই সব সময়ে তাদের শাসন কর্তে হয়। আমি-ই কেবল বদনামের ভাগী হয়েছি।”

“যাক্ আমাকে ভৎসনা করবার দরকার নেই। আর তুমিও একটু ঠাণ্ডা হও। মাষ্টার মশায়, দয়া করে বসুন।” হাস্ত করিতে করিতে টেবিল হইতে জেনার্ল একখানি পুরাণো ‘রয়েল থার্ড রীডার’ তুলিয়া লইলেন ও ধীরে ধীরে সাৎসুরার উচ্চারণে তাঁর কিত্তত ইংরাজি পাঠ করিতে লাগিলেন।

রমণী মনোযোগপূর্বক শুনিতেন লাগিল ও মাঝে মাঝে ভুল সংশোধন করিয়া দিতে লাগিল।

ইহাই জেনারুলের প্রাত্যহিক পাঠ। ১৮৬৮ সালের ‘নেটোরেসনে’ যোদ্ধাক্রমে উন্নীত হইয়া তিনি এমন গুরুতর কার্যের মধ্যে পড়িয়া গেলেন যে, বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিবার আর অবকাশ রহিল না। এই গত বৎসর কেবল তাঁহাকে রক্ষিত সৈন্যদলভুক্ত করা হইয়াছে। এইরূপে যে কয়েক ঘণ্টা অবকাশ পাইলেন তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরাজি পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করিলেন। শিক্ষকের জন্য ভাবিতে হয় নাই, যিও ঠাকুরাণী হাতের কাছেই ছিলেন। তিনি এক বিখ্যাত ‘চামু-সামুরাই’এর কন্যা : ও এত দিন লগুনে বাস করিয়াছিলেন যে, তাঁর মত ইংরাজি ভাষায় পণ্ডিত জাপানে পাওয়া দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্য ভাবে তিনি এত দূর অনুপ্রাণিত ছিলেন যে, সেই সুদূর দেশে যেমন দেখিয়া-ছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে তিনি স্বীয় সংসার চালাইতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু হৃর্ভাগ্য বশত তাঁর চেষ্টা সফল হয় নাই; তৃতোরা তাঁর অনভিজ্ঞতা দর্শনে গোপনে হাসা হাসি করিত, এবং ছেলে মেয়েরা কেবল তাহাদের সদাশয় পিতার পাছে পাছেই ঘুরিত। এই সব ভুল, এবং তাঁর স্বামীর প্রাক্তন ক্রোধোচিত ঔদার্য—তিনি ছোট খাটো বিষয়ে মাথা ঘামাইতেন না—সদাই বেচারীর মেজাজ বিষম বিগড়াইয়া দিত।

অবশেষে জেনারুল অনেক কষ্টে এক পাতা পড়া শেষ করিলেন, এবং উগা অনুবাদ করিতে বাইতেছিলেন, এমন সময় দ্বার খুলিল ও একটি ফুট ফুটে পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা প্রবেশ করিল। তার চুলগুলি লাল ফিতা দিয়া বাঁধা। প্রকাণ্ড হাতে একখানি ছোট বই ধরিয়া পিতাকে ছাত্রের মত নিরীহ ভাবে পাঠ করিতে দেখিয়া সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসিয়া ফেলিল ও কহিল, ‘মা, কাতো মাসীমা বৈঠক-খানায় বসে আছেন।’

“তাই নাকি?” প্রায় অপ্রত্যক্ষভাবে ক্রুদ্ধিত করিয়া তিনি জেনারুলের কথার অপেক্ষায় রহিলেন।

কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া জেনারুল দাঁড়াইয়া উঠিয়া পার্শ্বে একখানা চেয়ার টানিয়া লইলেন, ও বলিলেন, “তাকে এখানে নিয়ে এস।”

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বর্ষীয়া এক সুশ্রী রমণী কক্ষে প্রবেশ করিয়া “শুভ অপরাহ্ন” জ্ঞাপন করিলেন। তাঁর চোখে নীল চশমা : কারণ বোধ হয় দৃষ্টি শক্তির অপ্রার্থ্য। তাঁহাকে দেখিতে কতকটা নামি-সানের মত। ইহার কারণও ছিল। তিনি জেনারুল কাতাওকার প্রথম স্ত্রী। লর্ডস মহাসভার সভ্য ভায়কাউন্ট কাতোর সহিত তাঁর বিবাহ হইয়াছিল। এবং তিনিই স্বামীর সহিত তাকেও ও নামির বিবাহে ষটকতা করিয়াছিলেন।

জেনারুল সহাস্তে তাঁহাকে একখানি চেয়ার দিলেন ও সামনের জানালার ছোট পর্দাখানি টানিয়া দিয়া কহিলেন; “বসুন, বহু দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি। আপনার স্বামী খুব ব্যস্ত বোধ হয়?”

“হ্যাঁ, ঠিক তাই। তিনি ঠিক মালির মত, সব সময়ে কান্ডে হাতে ঘুরতেন। ‘আইরিস’ যদিও এখনো ফোটে নি কিন্তু তাঁর আদরের ডালিম গাছে খুব ফুল ফুটেছে; আর গোলাপও ফুটেছে। দেখতে আসবেন।” (কাতাওকা গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া) “তিনি বিশেষ করে আপনাকে আসতে বলতে বলেছেন। কি-চান্ আর মি-চান্কেও সঙ্গে আনবেন।”

ঠিক কথা বলিতে কি ভায়কাউন্টস্ কাতো-গৃহিণীকে বিশেষ পছন্দ করিতেন না। শিক্ষা ও প্রকৃতির পার্থক্য হেতু তাঁদের মধ্যে প্রীতি ত এক প্রকার অসম্ভব ছিল। তদুপরি তিনি যে প্রথম পত্নীর ভগ্নী এচিন্সা ভায়কাউন্টসের মনে উদ্ভিত হইয়া বিষম অস্বস্তি সৃজন করিত। তিনি জেনারুলের হৃদয়ের উপর এক চেটিয়া অধিকার স্থাপনে ও সংসারে সম্রাজ্ঞীর মত শাসনদণ্ড পরিচালনে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু এই যে পূর্বপত্নীর ভগ্নীটি,—ইনি কেবল যে জেনারুলের সম্মুখে যে গিয়াছে তার জীবন্ত প্রতিমূর্তি রূপে প্রকাশিত হইতেন তা নয়; কিন্তু গোপনে নামি ও খাজী ইকুর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে

অতীত দিনের কথা অংশে করা ইয়া দিতেন, এবং নানা প্রকারে মৃতের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া প্রাণাত্মের জন্ত যুদ্ধ করিতে উত্তম হইতেন। ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। এক্ষণে নামি ও ইকু যাওন্নাতে পূর্বাধিকার স্বত্ব অপসারিত হইয়াছে, তিনি খুব তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন : কিন্তু যত বারই তিনি কাতো-গৃহিণীর মুখ সন্দর্শন করিতেন, তখন মনে হইত যেন মৃত তার কবর ছাড়িয়া স্বামীর জন্ত, গৃহিণীপনার জন্ত, এবং তিনি বহু যত্নে সংসার পরিচালনের যে সব উপায় স্থির করিয়াছেন সে সবার জন্ত, তাঁর সহিত বিবাদ করিতে আসিয়াছে।

কাতো-গৃহিণী রেসমের ধলি হইতে কিছু মিষ্টান্ন বাহির করিলেন।

“কি-চান্ ও মি-চান্কে আমার ভালবাসা জানাবেন। এখনো ইঙ্কুলের ছুটি হয় নি না কি? তাদের দেখতে পাচ্ছি না। ও ভালো কথা মনে পড়েছে;—(চা লইয়া আগন্ত লাল-ফিতা-পরা মেয়েটিকে একটি কৃত্রিম ধোঁপার ফুল দিয়া) “কোমা-সানকে ভালবাসার সহিত দিলুম।”

“ওদের সকলের জন্ত ধন্যবাদ। ওরা ভারী খুসী হবে।” এই কথা বলিয়া কাতো-গৃহিণী মিষ্টান্নগুলি টেবিলের উপর রাখিলেন। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল “রেড ক্রস্ সোসাইটি”র লোক আসিয়াছে, কর্তার সহিত বৈধা করিতে চায়। তিনি তৎক্ষণাৎ কক্ষ ত্যাগ করিলেন। বাহিরে গিয়া মেয়েটিকে ইসারা করিয়া ডাকিয়া তার কানে কি বলিলেন। রমণী বারান্দা দিয়া বৈঠকখানা অভিমুখে চলিয়া গেল; মেয়েটি চুপে চুপে আসিয়া যেখান হইতে শুনা যায় এমন স্থানে পর্দার আড়ালে দাঁড়াইল।

লাল-ফিতা-বাঁধা কোমা প্রথম পত্নীর কথা। নামিকে ভাল না বাসিলেও ভায়কাউন্টেস্ ইহাকে খুব ভালবাসিতেন। তিনি শাস্ত তুষ্ণীস্তাবাপন্ন নামিকে একান্তই বলিয়াই জানিতেন; কনিষ্ঠা ভগ্নীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ তার উত্তম স্বভাব তাঁর স্বভাবের

সহিত বেশ মিল খাইত। নামির প্রতি প্রকারান্তরে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার জন্ত, ও বিমাতা কি করিতে পারে তাহা জগৎ সমক্ষে প্রচারিত করিবার জন্ত, স্বামী যেমন নামিকে আদর করিতেন তিনিও তেমনি কোমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। একান্তই লোকের স্বভাব কাহাকেও ক্রক্ষেপ না করিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করা; কিন্তু তার ছিত্রাঘেবী না হওয়া সম্ভব। পরে তাহাকে ভাল বলুক ইহা সে সর্বদা ইচ্ছা করে এবং যাহাতে নিজের লাভ এমন কাজ করিতে তার বিরাম থাকে না। তার মত ধোঁসামোদ-প্রিয় আর কেহ নয়। কাতো-গৃহিণী মাস্কিতকুচি তেজস্বিনী রমণী; যুদ্ধশাস্ত্র-বিশারদ স্বামীর সহিত তর্কে সর্বদা তাঁর জয় হইত; কিন্তু স্বামী যেখানে যাইতেন সেখানেই বন্ধু লাভ করিতেন, আর তাঁহাকে সকলেই বর্জন করিত। সেই হেতু যারা তাঁর পাশে পাশে গুরিত তাদের তিনি স্নেহ করিতেন। সরল সাধাসিধে প্রকৃতির ভৃত্যোরা একে একে বিতাড়িত হইল, তাদের স্থান অধিকার করিল সভ্য, মুখমিষ্ট লোকেরা। কোমাসানের ভগ্নীকে ভাল না বাসিবার কোনো কারণ ছিল না; কিন্তু যখন সে বুঝিল বিমাতা তার মুখে নামির নিন্দা শুনিতে ভালবাসেন, তখন সে মিথ্যা অভিযোগ করা—এই মন্দ অভ্যাসটি অর্জন করিল। এটাই হেতু কখনো কখনো সে ইকুর বিরক্তি-ভাজন হইত। কোমার এই স্বভাব ভায়কাউন্টেসের কাছে আসিয়াছিল; নামির বিবাহের পরও তিনি বর্তমান ঘটনার মত ছোট ছোট কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিতেন।

পূর্বদিককার বারান্দার দ্বিতীয় জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া কোমা এক বার পিতার ভাঙ্গা গলায় হাসি ও এক বার মাসীমার মধুর হাসি শুনিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই কণ্ঠস্বর মূঢ় হইয়া আসিল, কথাগুলো অস্পষ্ট হইয়া গেল। যতই ‘খাণ্ডী’, ‘নামি-সান্’ প্রভৃতি কথাগুলো জানালা দিয়া অস্পষ্টভাবে শ্রুত হইতে লাগিল, লাল-ফিতা-পরা মেয়েটি ততই মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিল।

“মহাদেশ হ’তে আসে ঐ আসে

লক্ষ অরাতি সৈন্ত,

নর্ভয় তবু কামাকুরাবাসী

বীরের অগ্রগণ্য।”

এই গানটি গাহিতে গাহিতে আগত ক্ষুদ্র ‘নাবিকের’ দৃষ্টি বারান্দায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ‘লাল-ফিতা’র প্রতি আকৃষ্ট হইল। মুখ ঢাকিয়া মাথা নাড়িয়া তার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া, তাহাকে বুখাইবার নানা চেষ্টা সত্ত্বেও সে ‘কোমা-চান’ বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া অগ্রসর হইল, এবং সে কি করিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিল। সে তখনো তাহাকে ধামাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বহু সংখ্যক ‘কিঃ’ দ্বারা বিরক্ত হইয়া অজ্ঞানতা বশতঃ উচ্চকণ্ঠে ‘দুর্’ বলিয়া ফেলিল; পরক্ষণে এই অকাল দুর্ঘটনায় ঘাড় কাঁপাইতে কাঁপাইতে সে স্থান হইতে দ্রুতপদে চম্পট দিল।

‘আ, কাপুরুষ কোথাকার!’

এই কথা বলিয়া ‘নাবিক’ পিতার পাঠাগারে গমন করিল। মাসীমাকে দেখিয়া সহাস্তে অভিবাদন করিয়া একেবারে পিতার হাঁটুর কাছে গিয়া হাজির হইল।

‘বাবা কি-চান্ যে। তুমি গত বারে যা দেখেছিলুম তার চেয়ে ঢেঁড়া হয়েছ দেখছি। রোজ স্কুলে যাচ্ছ? ইস্কুলে গেসলে? অঙ্কে A পেয়েছ? বেশ। বাবা আর মার সঙ্গে মাসী মার বাড়ী এসো।

‘মিচি কোথায়? এই দেখ মাসীমার উপহার। এ তুমি ভালবাস, কেমন?’

কেকথানি তাহাকে দিয়া জেনারল্ বলিলেন, ‘তোমার মা কোথায় জান? এখনো বৈঠকখানায়? তাঁকে বল মাসীমা যাচ্ছেন।’

শিশুটি বাইতেছে দেখিয়া আগন্তকের প্রতি চিন্তাবিহীন দৃষ্টিপাত করিয়া জেনারল্ কহিলেন, ‘তা হলে ইকুর বিয়টা নিশ্চয় স্থির করবেন। এই রকমই যে ঘটবে এ আমি প্রথমেই ভেবেছিলুম। আমি তাকে পাঠাতুম না, কিন্তু নাহি আর তাঁরও ইচ্ছামুদারাই পাঠিয়ে

ছিলুম। হ্যাঁ, ঠিক। আমার কথাটা এখন বুঝতে পেরেচেন?’

কাতাওকা গৃহিণীর আগমনে কথোপকথনে বাধা পড়িল। তিনি কাতোঠা হুরাগীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ‘এখুনি চা্লেন? একটি লোক আসাতে উঠে যেতে হয়েছিল। না, এইমাত্র তিনি গেলেন! আবার সেই ‘চারিটি বাজারের’ কথা। এতে কিছু হবে বলে ত বিশ্বাস হয় না। একাঙাই যাবেন? চিজুকো-সান্কে আমার ভালবাসা দেবেন। নামি গিয়ে পর্য্যন্ত ভাদ্রী তাকে দেখতে ইচ্ছে হয়।’

‘তার শরীর ভাল নেই। অনেক দিন দেখা করতে আসে নি। নমস্কার।’

‘নমস্কার’

‘ধানিকটা আপনার সঙ্গে যাব,’ জেনারল্ কহিলেন।—‘এই একটুখানি। কী, মী—তোমরা এস, এইবার বেড়িয়ে আসা যাক।’

বৈঠকখানার একখানা আরাম কেদারায় কাতাওকা গৃহিণী বসিলেন ও ‘চারিটি-বাজারের’ অমুঠান পত্র উন্টাইতে উন্টাইতে কোমার প্রতি মাথা নাড়িলেন।

‘কোমা-সান্ কি বিষয়ে কথা হচ্ছিল?’

‘ভালো করে শুন্তে পেলুম না, মা। কিন্তু ইকুর সম্বন্ধে কছু।’

‘ইকু?’

‘হ্যাঁ, এই রকম। তাকেও-সানের বুড়ো মার বাত হয়েচে ও তিনি খুব খিটখিটে হয়েছেন। ইকু এক দিন নামি-সানের সঙ্গে তার ঘরের ভিতর কথা কইছিল। সে বলে ‘বুড়ি এত খিটখিটে হয়েছে কেন? ঠাকরুণ আমি তোমার জন্তে দুঃখিত; কিন্তু বুড়ীর বয়েস হয়েছে, আর মরণে দেয়ী নেই।’ ইকুর এমন কথা বলা আশ্চর্য্যকর নয় মা?’

‘কুঁহলে বুড়ীটা সদাই গোল বাধিয়ে বেড়াচ্ছে।’

‘আর ঠিক সেই সময়ে বুড়ী ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ইকুর কথা সব শুন্লে। শুনে খুব রেগে উঠলো।’

“দেখ! আড়ি পেতে শোন্‌বার ফল।”

“সে এত রেগেছিল যে নামি-সান্ কি করবে ভেবে না পেয়ে কাতো মাসীমার কাছে গেছলো।”

“মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে?”

“নামি-সান্ সব কথাতেই মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে যায়।”

রমণী শুক হাসি হাসিলেন।

“আর কি?”

“তার পর বাবা বললেন ইকুকে ‘ভিজা’ তদ্বির করতে পাঠাবেন।”

“তাই নাকি?” রমণী উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন।

“আর কিছু নয়?”

“আমি আরো শুন্তুম কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কি-চান্ এসে পড়লো, আর—।”

ত্রিহেমন্তলিনী যায়।

গ্রন্থ সমালোচনা

১১। বাল্ল ভূঞা।—শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় প্রণীত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাম রাম বসু মহাশয় ভারতবর্ষে নবগত সাহেবদের পাঠ্য পুস্তক রূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য প্রতাপাদিত্য চরিত লিখিয়াছিলেন। বহি-
খানা বঙ্গ সাহিত্যের নূতন যুগের উবা-তারা। দেশের গৌরবময় অতীতের বিবরণ সঙ্কলনের চেষ্টা সেই প্রথম, এবং সহজ সরল বাঙ্গালার গুরু বিষয়ের রচনা-প্রয়াসও উহাই প্রথম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে, বঙ্গদেশে পাঠান শাসন যখন শিথিলমূল তখন উক্ত মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশের যে জাতীয় জীবনশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার নেতাদিগকে মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ ডাকাতরূপে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন বা একেবারেই উল্লেখ করেন নাই; এবং বঙ্গের আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই সকল বঙ্গবীরের ইতিহাসের

উদ্ধারে এত কমই মনোযোগ দিয়াছেন যে, রাম রাম বসু প্রতাপাদিত্যের বিষয় যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন আজ দীর্ঘ এক শতাব্দীর পরেও আমরা প্রতাপাদিত্যের বিষয়ে তাহার চেয়ে বড় বেশী জানি না! একজন বিদেশী—
ডাক্তার ওয়াইজ—প্রথম বার ভূঞার ইতিহাস উদ্ধারে মনোযোগী হন। তাহার পরে ষাঁহারাই এই দুর্গমপথ শূণ্যম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও সমালোচ্য পুস্তকের প্রণেতা শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ-
যোগ্য।

শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় মহাশয়ের প্রায় সারা জীবনের শ্রমের ফল এই বার ভূঞার ইতিহাস আমরা সানন্দে অভিনন্দন করিয়া লইতেছি। পুস্তকখানিকে বার ভূঞার ইতিহাস না বলিয়া বার ভূঞার বিবরণ বলিলেই ঠিক হয়। আনন্দ বাবু বার ভূঞার বিষয়ে যেখানে যাহা পাইয়াছেন, কঠোর পরিশ্রমের সহিত সমস্ত সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে সুপীকৃত করিয়াছেন। শৃঙ্খলা এবং ঐতিহাসিক বিচারের অভাবে পুস্তকখানা ঠিক ইতিহাস হইয়া উঠে নাই। ইতিহাস ষাঁহারাই লিখিবেন ভবিষ্যতে তাহারাই এই বিপুল সংগ্রহকে উপেক্ষা করিতে পরিবেন না। আনন্দ বাবুর স্থাপিত এই ভিত্তির উপরই তাহাদিগকে প্রাসাদ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

পুস্তকে ঈশারখার বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলিয় বোধ হইল। শুধু ইলিয়ট (Elliot's History of India by its own Historians) অবলম্বনেও এই বিবরণকে বিস্তৃততর ও দৃঢ়তর করা যাইত। ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়ীর পূর্ববর্তী খিলগাও গ্রামের পূর্ব প্রান্তে ঈশারখার পিতা কালিদাস গজদানীর বসত বাটি ছিল। সেই বসত বাটির চিহ্ন এবং কালিদাস গজদানী প্রতিষ্ঠিত বার তীর্থের জল সমন্বিত পুকুর ইত্যাদি এখনও আছে। কোন ঐতিহাসিকই ইহার উল্লেখ করেন নাই। আনন্দ বাবুর পুস্তকেও ইহার উল্লেখ পাইলাম না। বার ভূঞাদের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট চারিটি দেবী মূর্তির—(জয়পুরের

শিলাদেবী, যশোহরের যশোরেশ্বরী, ভুল্লয়ার বরাহী দেবী, এবং নদীয়া লার্খাড়িয়ার ভুবনেশ্বরী) — ফটোগ্রাফ পুস্তকে যুক্ত হইলে পুস্তকের উপাদেয়তা অনেক বর্দ্ধিত হইত। যাহা হউক প্রথম চেষ্টায় দোষ ক্রটি থাকা অনিবার্য। লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে যাহারা ব্রতী আছেন তাঁহারা ই জানেন, কাজটি কিরূপ আরামের। আনন্দ বাবু যাহা করিতে পারেন নাই তাহা সামান্য, কিন্তু যাহা করিয়াছেন তাহা এই আলস্য শয্যায় সুখ শায়িত বাঙ্গালাদেশে স্মৃত নহে আমরা তাহারই জন্ত আনন্দ বাবুকে সর্বাঙ্গঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। বাঙ্গালাদেশের প্রতি ঘরে ও লাই-ব্রেরীতে এই পুস্তকখানা থাকা আবশ্যক। শ্রীন—

১২। প্রবন্ধ—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রব-চরিত্র ভারতের নিতান্ত আপনার সামগ্রী—অন্য দেশে ইহা অসম্ভব। সেই অতুলনীয় দেব-চরিত্র আমাদের দেশে শিশু সন্তানের জন্য সহজ, সুখ বোধ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার সকলেরই ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

পুস্তকখানি আগাগোড়া দুই রঙে সুন্দর করিয়া পরিষ্কার কাগজে ছাপা। একখানি তিন রঙে, দুইখানি দুই রঙে, ও দুই খানি এক রঙে ছাপা হাফটোন ছবিতে সুশোভিত। ছবিগুলি পরিষ্কার সুন্দর—সাধারণ পুস্তকে হ্রাসিত। দুই একটা মুদ্রাকর প্রমাদও লক্ষিত হইল। পুস্তকের বাঁধাই সুন্দর—সিকের কাপড়ে বক্ বকে সোনার জলে নাম লেখা। পুস্তকের অন্য ছেলের দলে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে তাহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

পুস্তকখানি ঢাকা কটন লাইব্রেরী হইতে শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য যথা সম্ভব সুলভ—মাত্র ১৮/০ ছয় আনা।

শ্রীঅঃ—

১৩। অর্ঘ্য—কবিতাগ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী নন্দী প্রণীত। ৭০টি খণ্ড কবিতার সমষ্টি,—২০০ শত পৃষ্ঠা। ছাপা কাগজ মন্দ নহে, কিন্তু প্রথমেই বর্জাইস অক্ষরে লেখা ওদ্ধি পত্র দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। লেখকের বহিঃদয়ের পরিচয় পুস্তকের সর্বত্রই আছে, কিন্তু কবি

প্রতিভা কোন কবিতায়ই বিশেষ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই। লেখক সর্বত্রই ভাবোচ্ছ্বাসে লিখিয়াছেন, কিন্তু পাঠকের হৃদয়ে ভাব উচ্ছ্বসিত করিতে পারিয়াছেন অতি অল্প কয়েকটি কবিতার অল্প কয়েকটি স্থানে। চন্দ্রধরের তুলনায় লেখকের ভাষার এবং ছন্দের দৈন্য এই গ্রন্থে পরিফুট হইয়াছে।

শ্রীন—

১৪। অন্তীম—শ্রীপাঠ্য গ্রন্থ, স্বামী জীর কণো-পকথনের মধ্যে জীর প্রতি স্বামীর সত্যধর্মের উপদেশ। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত এবং ঢাকা কটন লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। নীল রঙে বড় অক্ষরে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই—মূল্য ১০ ও ৫০ আনা।

পুস্তকখানা পড়িয়া আমরা অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি, এবং আরও নিরাশ হইয়াছি ঢাকার প্রকাশকদের সাহিত্য রস-জ্ঞানহীনতা দেখিয়া। তাঁহারা এই সমস্ত ছাই ভস্ম ছাপাইয়া সাধারণের সমক্ষে ধরিতে সাহসী হইতেছেন দেখিয়া মনে হয় না যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি বিধানের তাঁহাদেরও যে একটা কর্তব্য আছে, এই জ্ঞান তাঁহাদের আছে। তাঁহারা মনে করেন যে, কোন একটা লেখা খুব জাকজমক করিয়া ছাপাইয়া বাঁধাইয়া বিজ্ঞাপনের জোরে কোন রকমে কাটাইয়া দিতে পারিলেই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ হইল।

বর্তমান লেখকের রচনা ভঙ্গী এমন হস্ত জনক, লেখা এত কাঁচা, ক্রটি এমন বালকোচিত, উপদেশগুলি এত প্রাণহীন ও নীরস যে, এমন অদূত পুস্তক পড়িয়া উপদেশ লাভ করিতে হইলে মেয়েদের মনে যে, স্বাভাবিক সরলতা ও সৌন্দর্য্য বুদ্ধি আছে তাহাও লুপ্ত যইয়া যাইবে। লেখক নানা সহপাঠ্যান অংলঘন করিয়া ছেলে মেয়েদের জন্য পুস্তক রচনা করিতেছেন, সহজ সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় তাহাই করিতে থাকুন,—তাহাতে তাঁহার কিঞ্চিৎ সাফল্যের সম্ভাবনা আছে:—নিজের রিক্ত কল্পনার উপর নির্ভর করিতে গিয়া পুনরায় হান্তান্দ না হন ইহাই আমাদের অভিলাষ।

সমালোচ্য গ্রন্থের ৩৮-৪৬ পৃষ্ঠার উপাখ্যানটি বাদ না দিলে ভদ্র পরিবারে এই পুস্তকের প্রবেশ নিষেধ হওয়া উচিত।

এরূপ বিসদৃশ ও বীভৎস আখ্যান সঙ্গপদেশমূলক হইলেও সর্বথা পরিত্যজ্য। না হইলে রোগ অপেক্ষা ঔষধ ভয়ঙ্কর হইবে।

ত্রীন—

১৫। প্রস্তাব—“বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক” ত্রিযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত—উদ্ধৃতাংশটুকু আমাদের নহে, এটি গ্রন্থকারের নিজস্ব। পুস্তকখানি ত্রিহৃদয়চন্দ্র বসাক কর্তৃক ঢাকা আলবার্ট লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, আকার ডবল ক্রাউন বোড়শাংশিত মূল্য ১০/- - ৬০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। লাল ও সবুজ কালির ছাপা, জাকাল বর্ডার, কাগজ ভাল; মাঝে মাঝে দুই একটি বর্ণাভঙ্গি আছে। আজ কাল ছাপার এরূপ চাকচিক্য বিরল নহে।

গ্রন্থকার সরল ভাষায় পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই। এই শ্রেণীর গ্রন্থ বালকদিগের চরিত্র গঠনে বিশেষ উপকারী, সুতরাং যাহারা এইরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাঁহারা সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। পুস্তকখানিতে চারখানা রঙ্গিন ছবি আছে।

শান্তিময়।

বর্ষা-আবাহন

এস, ওগো এস, অগ্নি বর্ষা !
নিখিল-যৌবন-রসে উথলি—
বঙ্গ-বন-ছায়া-তল প্রাণিয়া
তাপ-দগ্ধ-বায়ু-ভার নীতলি।

এস চির বিশ্বের মানসী,
এস চির ঢল ঢল মুরতি,
কল কল সঙ্গীত পূর্ণ
স্বচ্ছ হে দ্রবময়ী ভারতী।

নেচে নেচে এস চির নবীন—
তরল-মরাল-কোটি-শোভিতা,
খুঁয়ে ফেল নীরসতা-কালিমা
দ্রবময়ী অঞ্চল কবিতা।

নদ-নদী-জলাশয় ভাসায়ে
এস মহাপারাবার দলিয়া ;
মন্দাকিনী, খসে পড় ভূতলে—
পল্লী শিরে শিরে পড় গলিয়া।

উথলিয়া উঠ নারী-অঙ্গে
পুরুষের আধি প্রেমে উজলি—
ধরা কর যৌবন-সজলা,
আকাশেতে ফুটাইয়া বিজলি।

এস তুমি গগনের আভানে
জলদের করপুট ভরিয়া,—
ধরণীর রসনাতে এস গো
পিয়াসার আকুলতা হরিয়া।

সুশীতলে, যেও তুমি গোপনে
বিরহীর হৃদি-তি পরশি'
নব প্রাণ দিও মৃত ভূতনে
দিশি দিশি সঞ্জীবনী বরষি।
ত্রিহুর্গামোহ কুশারী।

অর্থব্যয় করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিবেন না।

আপনি নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া নিজের স্বাস্থ্য হানি করিতেছেন। তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না। খাওয়া দ্রব্যে বাহ্য বস্ত্র মিশ্রিত থাকিলে যেরূপ তাহা অখাদ্য ও স্বাস্থ্যহানিকর হয়, সেইরূপ “চা”ও যদি বিশুদ্ধ ও বাহ্য বস্ত্র পরিশূন্য না হয় তবে তাহাও শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া থাকে। ‘চা’র সহিত বাজে পাতা কৃত্রিম উপায়ে সুগন্ধীকৃত করিয়া মিশ্রিত হয়। এরূপ ‘চা’ পান করা অপেক্ষা ‘চা’ পান ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। অনেক ভাল ‘চা’ও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মূল্যাধিক্য বশতঃ তাহা সাধারণের ব্যবহার্য্য নহে। মূল্যাধিক্যের কারণ আর কিছুই নহে, কেবল ব্যবসায়ি-গণের লাভের আধিক্য।

সাধারণের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ভট্টাচার্য্য কোম্পানী উত্তম বাছাই চা মূল্যে মুদ্রা বিক্রয় করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য কোম্পানীর চা গুণে মূল্যবান কিন্তু মূল্যে সাধারণ “চা”র সমতুল্য। দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও সংবাদপত্রসমূহ একথা স্বীকার করেন।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানী, “চা” বিক্রেতা।

৬৪১, নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

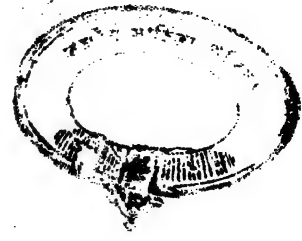
প্রতিভা ।

১৩১৯, শ্রাবণ ।



কবি রজনীকান্ত । (রূপাবস্থা ।)

উচ্চ বেঙ্গল প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ।



প্রতিভা

২য় বর্ষ

শ্রাবণ, — ১৩১৯

৪র্থ সংখ্যা ।

কবি-স্মৃতি

সে আশ ১৫ বৎসরের কথা, যখন কবি রজনীকান্তের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমরা মির্জাপুর ষ্টেটের ২৭।২ নং বাড়ীতে থাকিতাম। এই বাড়ীতে আমাদের সহিত বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা শ্রীমতী সরলাবালা সরকার মহাশয়ের পর-লোকগত স্বামী শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ও থাকিতেন। এক দিন সন্ধ্যার পর বাসায় আসিয়া দেখি যে, একজন অপরিচিত ভদ্রলোক খুব সঙ্গীতের ফোয়ারা ছাড়িয়া দিয়াছেন। অল্পসন্ধানে জানিলাম যে, ইনি শরৎ বাবুর একজন বন্ধু ও ইঁহার নাম শ্রীরজনীকান্ত সেন। রজনী বাবুর পরিবারের সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ আত্মীয়তা আছে, এবং সেই হেতু রজনী বাবুর নাম ও পরিচয় পূর্বেই আমি আমার কোন অতি বৃদ্ধা আত্মীয়ার নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, রজনী বাবুর গল্প বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে, এবং পাঠ্যবস্তুর যখন তিনি মাঝে মাঝে বাড়ী আসিতেন, তখন পরিবার ও প্রতিবেশী মণ্ডলীর বৃদ্ধাদের নিকট ইতিহাস ও ভ্রমণ কাহিনী অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করিতেন।

সেই রাত্রিতেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইল। তিনি ২।১ টি গান গাহিয়া স্বীয় আবাস স্থলে যাইবার

জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আমরা সকলেই তাঁহাকে আর কয়েকটি গান গাহিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে তিনি তৎপর দিন আমাদের বাসায় আসিয়া রাত্রি যাপন করিবেন বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন। কথামত পরের দিন সন্ধ্যার সময় তিনি যথা সময়ে আমাদের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং রাত্রি ৯।১০টা পর্যন্ত সমান বেগে গান চলিতে লাগিল। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের নিজের ব্যুৎপত্তি বা অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কম, সুতরাং সেই সময়ে তিনি কোন কোন গান গাহিয়াছিলেন তাহা আমাদের কিছুই মনে নাই। আমার বোধ হয় সে সময় তিনি নিজে সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেন নাই। আহারের পর তাঁহাকে পুনরায় গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করা হইল, কিন্তু তিনি নিজেই প্রস্তাব করিলেন যে, গান না করিয়া তৎপরিবর্তে একটি গল্প বলিবেন। আমরা তাঁহার এ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, এবং তিনি রাত্রি প্রায় ৩টা পর্যন্ত তাঁহার আখ্যায়িকা বর্ণনা করিলেন।

রজনীকান্তের স্মরণ শক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। অনেক বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, গদ্য ও পদ্য তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন। এই রাত্রিতে আমাদের নিকট যে গল্পটি বলিয়াছিলেন, তাহা একটি Detective story. এই গল্প তিনি এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও এরূপ ভঙ্গীমহকারে বলিয়াছিলেন যে, সেই গল্পের কোন কোন অংশ এখনও আমার বেশ মনে আছে।

এই ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পর কবির সহিত আমার দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হয়। সে সময়ে আমি Eden Hindu Hostel এ থাকিতাম। কবির জ্যেষ্ঠপুত্র তাই Cancer রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার কলিকাতায় আগমন করেন ও অবশেষে এই রোগের করালগ্রাসে পতিত হন। সে সময়ে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই।

ইহার প্রায় ৭ বৎসর পর কবির সহিত আমার তৃতীয় বার সাক্ষাৎ হয়। এইবার তিনি তাঁহার নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ সেনের চিকিৎসার কলিকাতায় আগমন করেন। আমরা তখন ৬৫।৩ হারিসন রোডে থাকিতাম। পুত্রের চিকিৎসার নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক দিন কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল এবং তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকিতেন। ইহার পূর্বেই সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি স্থাপিত হইয়াছিল। স্মরণ্য আমরা প্রথম ২।৪ দিন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ভীতিপূর্ণ সঙ্গের চক্ষে দেখিয়া তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাঁহার চরিত্র ও ব্যবহার এরূপ অস্বাভাবিক ও সরলতা পূর্ণ ছিল যে, আমরা এবং আমাদের বয়স্কনিষ্ঠ ষাঁহারা আমাদের সহিত থাকিতেন তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে সমবয়স্কভাবে তাঁহার সহিত বিনামূল্যে মিশিতেন। রজনী বাবুর যে কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত বাঙ্গালার প্রতিগৃহে শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদের ২।১টি এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। তিনি সুগায়ক ও সুরসিক ছিলেন। তাঁহার সুরসিকতার পরিচয় তাঁহার রচিত গানে বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সাধারণ আলাপাদিতে তিনি বেক্রপ রসিকতার পরিচয় দিতেন, তাহাতে বোধ হয় যে, রসিকতা তাঁহার চরিত্রের একটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। সামান্ত সামান্ত কথাতে তিনি এরূপ হাস্য রসের উল্লেখ করিতে পারিতেন যে, তাহা প্রায় অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব ছিল তাঁহার গুণগ্রাহিতা। আমাদের সমবয়স্ক যে সমস্ত বন্ধু বান্ধব ভাল গান করিতে

পারিতেন, কি কোন বাজনা বাজাইতে পারিতেন তাহা-
দিগকে তিনি সমাদর করিতেন। তাহাদের মধ্যে কাহারও গলার সুর তাঁহার নিজের সুর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মিষ্ট হইলে যে তাবে তাহাদের সেই মিষ্টতা স্বীকার করিতেন, তাহা আমাদের দেশের অনেক বড় লোকের-
পক্ষে শিক্ষাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে রাত্রি প্রায় ২টা পর্যন্ত তাঁহার সহিত আমার অনেক প্রকার আলাপাদি হইত। তাহাতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আইন, সঙ্গীত ও রসিকতা চর্চা ব্যতিরেকে জড়বিজ্ঞানের চর্চাও তাঁহার বর্ণেই ছিল; এবং এই প্রসঙ্গে তিনি রামেন্দ্র বাবুর “জিজ্ঞাসা” নামক গ্রন্থখানির বর্ণেই প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এরূপ সুন্দর পুস্তক তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কখনও পাঠ করেন নাই। বলা বাহুল্য যে, আমাদের এই সময়ের দৈনিক জীবনের এক চতুর্থাংশ তাঁহার সঙ্গীত, রসিকতা প্রভৃতি উপভোগে কাটিয়া যাইত।

এই ঘটনার প্রায় ৮।১০ মাস পরে রজনী বাবুর সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাত পৌত্রের বিবাহ উপলক্ষে আমি তখন তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। আমাদের দেশে এক প্রবাদ আছে যে, রজনী বাবুর কোন পূর্বপুরুষ দম্ভাতা পূর্বক প্রভূত অর্থ অর্জন করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক দিন কোতুহলের বশবর্তী হইয়া এই প্রবাদ সত্য কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলেন যে, তাঁহার পিতামহের নামের সহিত এই দম্ভাতাপবাদ জড়িত আছে— কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই অপবাদের মূলে কোন ভিত্তি নাই। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য বাল্যে অতি কষ্টে দরিদ্রতার মধ্যে বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক সময় উপাধানের অভাবে ইষ্টকণ্ঠ মাধার দিয়া তাঁহা-
দিগকে রাত্রি বাপন করিতে হইত।

এই বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তাঁহার পিতামহের দম্ভাতালক প্রচুর অর্থ থাকিলে তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যকে কখনই বাল্যে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত

না। এই সময়ে ৫৬ দিন আমি তাঁহার বাড়ীতে ছিলাম। তাঁহাদের বাড়ী হইতে স্নান করিবার ঘাট কিছু দূরে; তিনি যখন স্নান করিতে যাইতেন, তখন আমরাও তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। সেই কয়েক দিনের স্নান এখন ঠিক স্মরণের মত মনে হয়। প্রায় এক ঘণ্টা করিয়া আমরা স্নান করিতাম, এবং সেই সময় অতি ছোট ছোট রসাল গল্প বলিয়া মৃত কবি যেক্রপ ভাবে স্নান ক্ষেত্রে হস্ত ক্ষেত্রে পরিণত করিতেন তাহা অপরকে বুঝান অসম্ভব।

এই ঘটনার পর ৬৭ মাস মধ্যে রজনী বাবুর সহিত আমার পুনরায় দেখা হয়। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিতে আরম্ভ করে। এ সময়ে তাঁহার শ্রালীপুত্র আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কটকে অবস্থান করিতেন। রজনী বাবু সেই সময়ে স্থান পরিবর্তন লক্ষ্য রাজসাহী হইতে কটকে যান, এবং কটক যাওয়ার রাস্তায় কলিকাতার সপরিবারে আমাদের বাসায় আসিয়া উঠেন। এই অল্প সময় মধ্যেই তাঁহার শরীরের যেক্রপ অবনতি দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমরা সকলেই তাঁহার জন্ম অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম।

কটক হইতে স্বাস্থ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাভ করিয়া তিনি পুনরায় কলিকাতায় আসেন। আমি গ্রীষ্মাবকাশে সেবার বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম; ফিরিয়া আসিয়া দেখি তিনি সপরিবারে স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার শরীর কিছু ভাল হইয়াছিল বটে কিন্তু শরীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইবার পূর্বেই সেই যাত্রায় তাঁহাকে আবার রাজসাহী ফিরিয়া যাইতে হয়। ইহার পর রাজসাহী সাহিত্য সম্মিলনে তাঁহার সহিত আমার পুনরায় দেখা হয়। বলা বাহুল্য সম্মিলনের উপলক্ষে যে দুই দিন আমি রাজসাহীতে ছিলাম, সেই দুই দিন তাঁহার বাড়ীতেই আমাকে থাকিতে হইয়াছিল। রাজসাহী সম্মিলনে তিনি যে ভাবে বালকপুত্র ও বালিকা কন্যা-সাহায্যে উপ-স্থিত ভদ্র মণ্ডলীর সংবর্ধনা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং সে বিষয়ের উল্লেখনিম্নপ্রয়োজন।

ইহার পর ৬৭ মাস পরে এক দিন সংবাদ পাইলাম যে, রজনী বাবু অসুস্থ হইয়া কলিকাতার সুরেশ বাবুর বাসায় সপরিবারে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া শুনিলাম যে, ডাক্তারেরা তাঁহার cancer হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। আমার বোধ হয় তিনি পীড়ার প্রথম সূচনার অসম মৃত্যুকে বিশেষ ভয়ের চক্ষে দেখিতেন, অন্ততঃ তাঁহার কথা বার্তাতে এইরূপ প্রকাশ পাইত। cancer এ অস্ত্র চিকিৎসার জন্ম কেহ কেহ তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কিছুতেই সন্মত হন নাই। কলিকাতার এইরূপে কিছু দিন ভুগিয়া এবং পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া তিনি চিকিৎসার্ষ কালীধাম চলিয়া যান। এই সময় হইতে তাঁহার আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে আরম্ভ হয়, এবং কালিম বাজারের মহারাজা বাহাদুর, দিবাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার শ্রদ্ধাম্পদ সারদা বাবু প্রভৃতি সেই সময় হইতে তাঁহার ও তাঁহার দুঃস্থ পরিবারের সাহায্য কল্পে যেক্রপ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন তাহা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। কালীতে গিয়া কিছু দিন এক সন্ন্যাসীর চিকিৎসাধীন থাকেন, কিন্তু এ চিকিৎসায় বিশেষ কোন ফল না হওয়ার তিনি পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া সুরেশ বাবুর বাসায় অবস্থান করেন। এই সময় হইতে তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ অতি দ্রুতবেগে খারাপ হইতে আরম্ভ হয়। এক দিন হঠাৎ দম্ব বন্ধ হওয়ার তাঁহার মৃত্যুর উপক্রম হয়; সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময়ে আমাদের বন্ধু যতীন্দ্রমোহন দাস আমার নিজ বাড়ী হইতে একটি রোগী দেখিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্ম সুরেশ বাবুর বাড়ীতে যান, এবং তাঁহার এই ভীষণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ক্লিষ্টতার সহিত তাঁহাকে Medical Collegeএ লইয়া যান ও অস্ত্র প্রয়োগে তাঁহার জীবন রক্ষার বন্দোবস্ত করেন। ইহার পর হইতেই তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত Medical Collegeএর Cottageএ অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র

শরীফের বিবাহ হয়। বিবাহোপলক্ষে দেশ হইতে আয়ীয়া স্বজন কলিকাতায় আগমন করেন। সেই সময়ে বোম্বাইয়ে একটি বাসা ভাড়া করা হইয়াছিল, এবং তিনি সেই বাসাতে বিবাহোপলক্ষে কয়েক দিন ছিলেন। Medical College-এর Cottage-এ অবস্থান কালীন (আমার যত দূর জানা আছে) এক দিন তিনি নিজের কোন আত্মীয়ের বিবাহে (গত মে মাসের প্রথম ভাগে কিম্বা এপ্রিলের শেষে) শ্রাবণাঙ্গারে যাইতে পারিয়া ছিলেন, ইহা ব্যতীত যখন তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকিত তখন তিনি Cottage-এর সম্মুখস্থ রাস্তাতে (Eden Hospital Road-এ) মাঝে মাঝে ভ্রমণের জন্য বাহির হইতেন। এই Cottage-এ অবস্থান কালীন তিনি হার্মোনিয়ম বাজাইয়া আগন্তুক ভদ্র মণ্ডলীর সংবর্দ্ধনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সর্বসাধারণের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত। সুতরাং ইহাদের বর্ণনা নিম্নরূপে। কেবল মাত্র দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমি পাঠক-গণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

তাঁহার অনস্বস্ততা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার সংবাদ লইবার জন্য তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব তাঁহার নিকট আসিতেন। এক দিন এই বিষয়ের উল্লেখ করাতে তিনি হাসিয়া আশ্বাসিতকৈ লিখিয়া বলিলেন যে “লোকের যতই বৃদ্ধি হয় মাথায় ততই দোল দেখা যায়।” রসিকতা তাঁহার নিজের অস্থি মজ্জার সহিত কি ভাবে জড়িত ছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য আর কোন দৃষ্টান্তের আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

রজনী বাবুর সাহায্যের জন্য Minerva রত্নমণ্ডে যে একটি অভিনয় হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। এইরূপ অভিনয়লব্ধ অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা উচিত কি না ভবিষ্যে তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। এই সময়ে তাঁহার শেষ মত জানিবার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। আমি পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার

নিকট যাইয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি অতি বীরভাবে সমস্ত কথা শুনিলেন; এবং কিছু ক্ষণ বিবেচনা করিয়া প্রজ্ঞাপদ সারদা বাবুর কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে লিখিয়া জানাইলেন যে, যখন এত বড় লোক এই অভিনয়ের অহুষ্ঠানে সাহায্য করিতেছেন তখন এ বিষয়ে তাঁহার আর কোন বিধা নাই। আমরা স্বচ্ছন্দে অভিনয়ের উদ্বোধন করিতে পারি।

এই ঘটনার পর আর তাঁহার সহিত কোন বিষয় লইয়া কোন প্রকার কথা বার্তা হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে না।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

গোময়ের ব্যবহার *

আমাদের দেশে গোময় সাধারণতঃ ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত কার্যের জন্য গোময়ের সহিত অল্প পরিমাণ জল এবং দাহিকাশক্তির বৃদ্ধির জন্য কখনও কখনও তুষ বা ধড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড মিশ্রিত করিয়া চাপটি বা গুলি প্রস্তুত করিয়া শুকাইয়া লওয়া হয়। কখনওবা সরু বংশখণ্ডের গাত্রে সংলগ্ন করিয়া বিশোধণ কার্য সাংসাধিত হয়। প্রাদেশিক ভাষায় এতদঞ্চলে উহাকে “ববি”, “বুটে” বা গইঠা বলে। শুষ্ক “গইঠা” অতি সহজেই প্রজ্জ্বলিত হয়। এতদ্ব্যতীত ভূমির সার-রূপেও অনেক সময় গোময় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাররূপে গোময়ের ব্যবহার কৃষকদিগের মধ্যে এখনও সম্যক্রূপে প্রচলিত হয় নাই। চেষ্টা করিলে অতি সহজেই যথেষ্ট পরিমাণ গোময় সংগ্রহ করা যায়। যে সমস্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণ জালানি কাঠ বিনামূল্যে

* ১৯০৮ সনের আগষ্ট মাসের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নেল (Indian Trade Journal) এ প্রকাশিত ঢাকা কলেজের অধ্যাপক Wat-son সাহেবের প্রবন্ধের সূত্রাবলম্বনে লিখিত।

বা স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায় সেরূপ স্থানে সাধারণতঃ গোময় আবর্জনারূপে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে গোময়ের সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ব্যবহার কি?

উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে:—

১। দাহন কালে এতদেখীয় অগ্নাজ ইন্ধনের সহিত তুলনায় গোময়ের তাপদায়িনী শক্তির আপেক্ষিকতা।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, সমস্ত দাহ বস্তুরই উত্তাপ প্রদান করিবার ক্ষমতা সমান। কিন্তু এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। এক সের ওজনের সাধারণ আলানি কাঠ সম্পূর্ণ দহ্য করিলে যতটুকু জল বাষ্পে পরিণত করা যায় উক্ত ওজনের কয়লা সম্পূর্ণ দহ্য করিলে তাহার প্রায় দ্বিগুণ জল বাষ্পে পরিণত হইবে। অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কয়লাতে পাক ক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পাদিত হইয়া থাকে।

২। যে সমস্ত দ্রব্য আমাদের দেশে ভূমির সাররূপে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে সার-প্রদায়িনী শক্তির তুলনায় গোময়ের স্থান।

৩। যে সমস্ত দ্রব্য ইন্ধন অথবা ভূমির সাররূপে এদেশে ব্যবহৃত হয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তাহাদের মূল্যের সহিত গোময়ের মূল্যের তুলনা।

অধ্যাপক ওয়াটসন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে গোময় এবং ততদেখীয় বিভিন্ন প্রকার ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দাহন কালে তাহাদের প্রত্যেকটির মোট উত্তাপ প্রদান করিবার ক্ষমতা নির্ধারণ করিয়াছেন। পুবা কুবিগবেষণালয় হইতে Mr. B. Coventry গোময়ের সারপ্রদায়িনী ক্ষমতা নির্ধারণ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট বাণিজ্য বিভাগের মিউলপেটেন সাহেব (Mr Neolpaton, Director General of Commercial Intelligence) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গোময় ও অগ্নাজ প্রকার ইন্ধনের মূল্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কাজেই সংগৃহীত বিবরণী হইতে গোময়ের সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত-

ব্যবহার কিরূপে হইতে পারে এই প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। অধ্যাপক ওয়াটসন শিবপুর, কটক, মাজাজ, পাটনা, মৈনপুরী (উত্তরপ্রদেশ), আলিগড় এবং সুরাট হইতে গোময় প্রস্তুত “গইঠা” এবং আলানি কাঠ সংগ্রহ করিয়া চারিপ্রকার বিভিন্ন চিহ্ন বিশিষ্ট কেরোসিন তৈল এবং বহু দেশীয় কয়লা ও কোক্ লইয়া কেলরিমিটার (calorimeter) বা তাপ পরিমাপক যন্ত্রদ্বারা দাহনকালে তাহাদের প্রত্যেকটির মোট উত্তাপ প্রদান করিবার ক্ষমতা নির্ধারণ করিয়াছেন। কেলরিমিটার যন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, উহার সাহায্যে কোনও বস্তুর দাহন কালে প্রদত্ত মোট তাপ স্থল ভাবে নির্ধারণ করা যায়। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত “গইঠা বা ঘুটে”, বিভিন্নপ্রকার আলানি কাঠ, বিভিন্ন মার্কা বিশিষ্ট কেরোসিন তৈল, কয়লা ও কোক্ প্রভৃতির দাহন কালে প্রদত্ত মোট তাপ পরিমাণের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কপাত সাধারণ পাঠকের নিকট তেমন ক্রটিকর হইবে না, এই ভয়ে এই স্থলে তাহা উল্লেখ করা গেল না; কেবল পূর্বপ্রকার অঙ্কপাতগুলির একটা গড় করিয়া দেওয়া গেল:—

ইন্ধনের নাম দাহনকালে প্রদত্ত মোট তাপের পরিমাণ

১। গইঠা বা ঘুটে... ৪৩০০ ভাগ (B. T. unit)

২। আলানি কাঠ... ৭২১০ ভাগ „

৩। কেরোসিন ১৯৬১১ ভাগ „

৪। কয়লা —

(ক) উৎকৃষ্ট ১২১৪১ ভাগ „

(খ) নিকৃষ্ট ১১৫১১ ভাগ „

যতটুকু উত্তাপ এক ভাগ জলকে ১ ডিগ্রী ফাঃ (one degree Fahrenheit) উত্তপ্ত করিতে পারে ততটুকু তাপকে ১ ভাগ তাপ (B. T. unit) ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ একভাগ ইন্ধন প্রদত্ত মোট তাপ দ্বারা যত ভাগ জলকে ১ ডিগ্রী ফাঃ উত্তপ্ত করিতে পারে, উক্ত সংখ্যা ঐ ইন্ধনের মোট তাপদান পরিমাণ। ধরুন বলা

হইয়াছে গইঠার গড়পড়তা মোট তাপদান পরিমাণ ৪৩৩০ ভাগ; ইহার অর্থ এই যে, এক সের গইঠা সম্পূর্ণরূপে দাহন করিলে ৪৩৩০ ভাগ জল ১ ডিগ্রী ফাঃ উত্তপ্ত হইবে। পূর্বে জলের উষ্ণতা ৫৪ ডিগ্রী থাকিলে উত্তাপের পর ৫৫ ডিগ্রী হইবে।

পূর্বোক্ত অঙ্ক সমূহ হইতে দেখা যায় যে, উত্তাপ দান করিবার ক্ষমতা তুলনা করিলে কেরোসিন সর্বোৎকৃষ্ট এবং “গইঠা” নিকৃষ্ট। কিন্তু পূর্বসংখ্যা সমূহ হইতে কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বাইতে পারে না; কারণ রন্ধনাদি কার্যের জন্য যে প্রকার মুগ্ধ বা লৌহ নির্মিত চুল্লী ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাতে ইন্ধন প্রদত্ত অধিকাংশ ভাগ তাপই প্রকৃত পক্ষে কোনও উপকারে না আসিয়া চুল্লীর পার্শ্ব দিয়া উত্তপ্ত অনিল পদার্থরূপে (as hot gas) বায়ুতে লীন হইয়া যায়। সাধারণ চুল্লীর আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে অস্বাভাবিক পরিমাণ ধূম নির্গত হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, দাহ্য বস্তু সম্পূর্ণরূপে দহ্য হইতে না পারিয়া ধূমরূপে বহির্গত হইয়া যায়। কাজেই কেবলমাত্র আংশিক তাপই কাজে লাগিয়া থাকে। কোনও বিশেষ অবস্থায় কোনও বস্তুকে দহ্য করিলে মোট যতটুকু তাপ প্রকৃত পক্ষে কাজে লাগে তাহাকে ঐ অবস্থায় উক্ত বস্তুর মোট কার্যকরী তাপদান ক্ষমতা (total available heating power) বলা বাইতে পারে।

‘গইঠা’ এবং কাঠ সাধারণতঃ মুগ্ধ চুল্লীতে ব্যবহৃত হয়। কয়লা বা কোক ব্যবহৃত করিতে হইলে বিশেষ ভাবে নির্মিত চুল্লীর প্রয়োজন, এবং কেরোসিন কেবলমাত্র ষ্টোভে (stove) ই ব্যবহার করা চলে।

বিভিন্ন ইন্ধনের তালিকায় গোময়ের স্থান নির্ধারণ করিতে হইলে যে যে অবস্থায় তাহারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই সেই অবস্থায় উহাদের প্রত্যেকটির ও “গোময়ের কার্যকরী তাপদানের ক্ষমতার” তুলনা করিতে হইবে। নিম্নলিখিত উপায়ে কোন ইন্ধনের কার্যকরী তাপদান ক্ষমতা নির্ধারণ করা বাইতে পারে।

কোনও বস্তুকে ১ ডিগ্রী সিঃ (one degree centigrade) উত্তপ্ত করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন উহাকে উক্ত বস্তুর “আপেক্ষিক তাপ” (Specific heat) বলা হয়। জলের আপেক্ষিক তাপ ১ ধরিয়া অস্বাভাবিক বস্তুর আপেক্ষিক তাপ নির্ণীত হয়। মুগ্ধ পাত্রের আপেক্ষিক তাপ জলের আপেক্ষিক তাপের $\frac{1}{2}$ অংশ অথবা ২। জলীয় বাষ্পের প্রচ্ছন্ন তাপ (latent heat) ৫৪০ ভাগ। অর্থাৎ এক ভাগ ফুটন্ত জলকে (boiling water) বাষ্পে পরিণত করিতে হইলে ৫৪০ ভাগ তাপের প্রয়োজন। উক্ত তাপ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে এবং তাপমাত্রা যন্ত্রদ্বারা (Thermometer) নির্ধারণ করা যায় না। জলের বাষ্পীয় অবস্থা সংরক্ষণের জন্য ঐ তাপ অনিবার্য ভাবে প্রয়োজনীয়।

একটি নির্দিষ্ট ওজনের মুগ্ধ পাত্রে নির্দিষ্ট ওজনের জল লইয়া নির্দিষ্ট ওজনের পরীক্ষাধীন ইন্ধন সম্পূর্ণ দাহন করিয়া উত্তপ্ত করিলে প্রথমতঃ মুগ্ধ পাত্র এবং তদ্ব্যবস্থায় জল জলের “ফুটন তাপ” (“boiling temperature of water”) পর্যন্ত উত্তপ্ত হইবে। পরে ঐ জল বাষ্পে পরিণত হইতে আরম্ভ করিবে। সমস্তটুকু ইন্ধন নিঃশেষিত হইয়া গেলে পর ঐ পাত্র এবং তদ্ব্যবস্থায় জল ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া স্বাভাবিক উষ্ণতা প্রাপ্ত হইবে। তখন জল সহ পাত্রটিকে পুনরায় ওজন করিয়া পূর্ব ওজন হইতে বাদ দিলে কতটা জল বাষ্পে পরিণত হইয়াছে তাহা নির্ধারিত হইবে। এইরূপে নির্ধারিত জলের ওজনকে ৫৪০ দ্বারা গুণ করিলে, বাষ্পীকরণ কার্যে কতটুকু তাপ ব্যয়িত হইয়াছে তাহা নির্ণীত হইবে।

পূর্বে আপেক্ষিক তাপ সম্বন্ধে বাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে মুগ্ধ পাত্র ও তদ্ব্যবস্থায় জলকে স্বাভাবিক উষ্ণতা হইতে “ফুটন তাপ” পর্যন্ত উত্তপ্ত করিতে কতটুকু তাপ ব্যয়িত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যাইবে। এই দুই প্রকারে ব্যয়িত তাপের পরিমাণ একত্র করিলে পরীক্ষাধীন ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত মোট কার্যকরী তাপের

পরিমাণ পাওয়া বাইবে। কারণ ইন্ধন প্রদত্ত তাপ উক্ত দুই প্রকার কার্য ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার কার্যে ব্যবহৃত হয় নাই। অবশিষ্টাংশ বায়ুতে লীন হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব বর্ণিত প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, “গইঠার” কার্যকরী তাপদান ক্ষমতা ৮৮০ তাপ। সাধারণ জ্বালানি কার্টের কার্যকরী তাপ দান ক্ষমতা ১৩৫১ তাপ। কার্যকরী তাপদান ক্ষমতা কে কার্য-
মোট তাপদান ক্ষমতা

করী উপযোগিতা ধরিলে দেখা যায় যে, গইঠার কার্য-
কারিণী উপযোগিতা (cooking efficiency) = $\frac{880}{1351} \times 100 = 21\%$ । জ্বালানি কার্টের কার্যকরী উপযোগিতা $\frac{1351}{1351} \times 100 = 100\%$ । (এ স্থলে মোট কার্যকরী ক্ষমতাকে ১০০ ধরা হইয়াছে), অর্থাৎ “গইঠা” সম্পূর্ণরূপে দাহ করিলে

প্রকৃত পক্ষে যতটুকু মোট তাপ পাওয়া যায়, আমরা যেই প্রকারে গইঠা ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে তাহার এক শত ভাগের মাত্র ২১ ভাগ তাপ কাজে আসে। অবশিষ্ট তাপ বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, যে প্রকার যুগ্ম চুল্লী রন্ধনাদি কার্যের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা বিজ্ঞানানুযায়িত নহে। ইন্ধনের মহার্ঘতার সঙ্গে সঙ্গে চুল্লীর গঠন প্রণালী সঙ্ঘর্ষে সংস্কার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

রন্ধনাদি কার্যের জন্য কেরোসিন কেবল মাত্র ঠোঙেই ব্যবহৃত হয়। প্রচলিত তিন প্রকার ঠোঙ লইয়া স্বচ্ছ উৎকৃষ্ট কেরোসিনের যে কার্যকরী তাপদান ক্ষমতা এবং কার্যকরী উপযোগিতা (cooking efficiency) নির্দ্ধারিত করা গিয়াছে তাহা নিয়ে দেওয়া গেল।

পরীক্ষণীয় কেরোসিনের—

| ঠোঙের বিবরণ। | মোট তাপদান ক্ষমতা। (B. T. units) | কার্যকরী তাপদান ক্ষমতা (B. T. units) | কার্যকরী উপযোগিতা। |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| বিট্রিস্ ঠোঙ (Beatrice) ... | ১২৩০২ ... | ৬০৫০ ... | ৩১ % |
| সানরাইজ্ ঠোঙ (Sun rise) ... | ১২৩০২ ... | ৬১৯২ ... | ৩২ % |
| জার্মান মেক্ (German Make) ... | ১২৩০২ ... | ৭৪৫৬ ... | ৩৮ % |

উক্ত অঙ্কপাত সমূহ হইতে দেখা যায় যে, জার্মান-মেক্ (German-make) ঠোঙ কার্যকরী উপযোগিতা সঙ্ঘর্ষে প্রচলিত অন্য দুই প্রকার ঠোঙ হইতে উৎকৃষ্ট। ইহার দাম ও অপেক্ষাকৃত কম।

কয়লা এবং কোক্ লোহ মিশ্রিত উজ্জাটা এবং পাকা চুল্লীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ববর্ণিত উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উজ্জাটাতে জ্বালাইলে কয়লার কার্যকরী তাপদান ক্ষমতা ১৩০২ তাপ এবং কার্যকরী উপযোগিতা ১১% ; পাকা চুল্লীতে জ্বালাইলে কয়লার কার্যকরী তাপদান ক্ষমতা ১২১৫ তাপ এবং কার্যকরী উপযোগিতা ১০% ; কোকের কার্যকরী তাপদান ক্ষমতা ১৯১৭ তাপ। পাকা চুল্লীতে কম তাপ

পাইবার কারণ এই যে, প্রয়োজনানধিক বায়ুর প্রবেশ হেতু অনেকটা তাপ উত্তপ্ত বায়ুর সঙ্গে চলিয়া যায় এবং প্রকৃত কাজে আসে না।

পূর্বে বিভিন্ন প্রকার ইন্ধনের কার্যকরী তাপদান ক্ষমতা এবং কার্যকরী উপযোগিতা সঙ্ঘর্ষে যে সমস্ত বিভিন্ন অঙ্কপাত করা হইয়াছে তাহার একটা পড় হিসাব নিয়ে সন্নিবেশিত হইল —

| ইন্ধনের নাম | মোট তাপদান ক্ষমতা Absolute heating power in B. T. units | কার্যকরী তাপদান ক্ষমতা Available heating power in B. T. units | কার্যকরী উপযোগিতা Cooking efficiency |
|--------------|--|--|---|
| ১। গইঠা | ৪৩৩০ | ২০০ | ২১ % |
| ২। আলানি কাঠ | ৭২১০ | ১১৫২ (গড়ে) | ১৬ % |
| ৩। কেরোসিন | ১২৬১১ (গড়ে) | ৭৪৫৬ | ৩৮ % |
| ৪। কয়লা | ১১৮০০ (গড়ে) | ১৩৩২ | ১১ % |
| ৫। কোক্ | — | ১২১৫ | — |

কাজেই দেখা যায় যে, কার্যকরী উপযোগিতা ধরিতে গেলে কেরোসিন শ্রেষ্ঠ। কারণ কোন নির্দিষ্ট ওজনের কেরোসিন হইতে যতটুকু তাপ পাওয়া যায় উক্ত ওজনের অন্য কোন প্রকার ইন্ধন হইতে ততটা তাপ পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যবহারের অন্ত কোন প্রকার ইন্ধন শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ কার্যের অন্ত ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ইন্ধনের মূল্যের তুলনা করিতে হইবে। অবশ্য কল প্রভৃতি চালাইবার অন্ত যে প্রকার ইন্ধন উৎকৃষ্ট, রন্ধনাদি কার্যের অন্ত তাহা সম্পূর্ণ রূপে অনুপযোগী হইতে পারে, কারণ পূর্বোক্ত স্থলে ইন্ধন সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ রন্ধনাদি কার্যের অন্ত বিভিন্ন প্রকার ইন্ধন যে যে অবস্থায় ব্যবহৃত হয় আমরা তাহারই আলোচনা করিয়াছি।

ভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ইন্ধন সমূহের মূল্যের তুলনা করা সহজ নহে। কারণ প্রথমতঃ বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ওজন প্রচলিত। দ্বিতীয়তঃ পাইকারীদরে কিনিতে গেলে খুচরা দাম অপেক্ষা অনেক কম মূল্য পড়ে। সাধারণ লোকেরা ইন্ধন খুচরা হিসাবে ক্রয় করিয়া লয়। কাজেই আমরা খুচরা মূল্যের বিষয়ই আলোচনা করিব। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ইন্ধনের পাইকারী মূল্য সহজেই সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু খুচরা মূল্য সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। তাহার কারণ এই যে,

একই প্রদেশে, এমন কি একই জেলায় এবং অনেক স্থলে একই সহরের বিভিন্ন অংশে, একই বস্ত ভিন্ন ভিন্ন দামে খুচরা বিক্রীত হইয়া থাকে। ঢাকা জেলায় অনেক স্থানে কয়লার মূল্য কলিকাতার কয়লার মূল্য অপেক্ষা বিগুন, কোথাও বা তাহারও অধিক। মাল সম্বন্ধে কয়লার অনুবিধাই উক্তরূপ মূল্যাধিক্যের কারণ। সমুদ্রোপ-কূলবর্তী বন্দর যমুহে কেরোসিনের মূল্য অপেক্ষা সমুদ্র হইতে দূরবর্তী নগর সমুহে কেরোসিনের মূল্য অনেক অধিক। অবশ্য গইঠা প্রভৃতি ইন্ধন পাইকারী দরে কখনও বিক্রীত হয় না। মিঃ নিউলপেটন (Neol paton) যত দূর পারিয়াছেন, বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার ইন্ধনের যে খুচরা মূল্য-তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গইঠার মূল্য (১৯০৮ সালে সংগৃহীত) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে—(১) আলিগড় — প্রতিমণ ১০ হইতে ১০ পর্য্যন্ত।

(২) মইনপুরী—৫০০ গইঠার মূল্য এক টাকা। প্রতিমণ ১/১০ আনা।

(৩) অযোধ্যা (প্রতাপ গড়) ১০০ গইঠার মূল্য এক আনা হইতে দশ পরসী পর্য্যন্ত। (প্রত্যেকখানা গইঠার ওজন দুই হইতে ৮ ছটাকের মধ্যে)। প্রতি-মণ ১/১০ আনা হইতে ১/১০ আনা পর্য্যন্ত।

বোম্বাই প্রদেশ—(১) বোম্বাই সহর—প্রতি মণ ১/১০ আনা; ৫ সের ২/৫ পরসী।

১ পরসার চারি খানা গইঠা ।

(১০ খানা গইঠার ওজন ৮৪০
সের) ।

(২) সুরাট—১০০ গইঠা ৮৫ পরসার ;
প্রতি মণ ১০ আনা ।

বঙ্গদেশ—(১) কলিকাতা—প্রতি মণ ৮০ আনা ।

(২) পাটনা—প্রতি মণ ৮০ আনা ।

(৩) কটক—উৎকৃষ্ট গইঠা প্রতি মণ ১০ আনা ।
নিম্নগুণ গইঠা প্রতি মণ ৮১০ আনা ।

মধ্য প্রদেশ—১০০ গইঠার মূল্য ৮১০ আনা ; প্রতি মণ
৮১০ আনা ।

মাদ্রাজ প্রদেশ—(১) মাদ্রাজ সহর—১০০ গইঠা ৮০
আনা । (২৫ হইতে ৩০ খানা
গইঠার ওজন ৮৫ সের) । প্রতি মণ
৮০ আনা ।

(২) আতুর—১০০ গইঠা ৮০ আনা
প্রতিমণ ১১০ আনা ।

(৩) কোয়াস্বাটুর—প্রতি মণ ৮০ আনা
প্রতি সের এক পাই ।

অবশ্য পূর্বে যে মূল্য তালিকা দেওয়া গেল উহা
সহরের মূল্য । নগর হইতে দূরে অবস্থিত গ্রাম সমূহে
গইঠার মূল্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম । পূর্বে তালিকা
হইতে দেখা যায় যে, গইঠার দাম ভারতে সর্বত্রই প্রতি
মণ ৮০ আনা হইতে ১০ পর্যন্ত । গড় পড়তা হিসাব
করিতে গেলে প্রতি মণের মূল্য ১০ আনা নিঃসঙ্কোচে
ধরা যাইতে পারে ।

বিভিন্ন প্রদেশে যে যে স্থানের গইঠার মূল্য পূর্বে
সন্নিবেশিত হইয়াছে ঠিক ঐ সকল স্থানে জালানি কাঠ,
ও কেরোসিনের মূল্যও সংগৃহীত হইয়াছিল । সাধারণ
পাঠকের নিকট ঐ সকল অল্পপাত তেমন রুচিকর হইবে
না ভয়ে বিভিন্ন প্রদেশের পূর্বোক্ত ইন্ধন সমূহের মূল্যের
কেবল মাত্র একটা গড় করিয়া দেওয়া গেল ।

জালানি কাঠের মূল্য

(১৯০৪ সালে সংগৃহীত) ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই প্রদেশ এবং
বঙ্গদেশ সর্বত্রই গড়ে প্রতি মণের মূল্য ১০ । মাদ্রাজ
প্রদেশে গড়ে প্রতি মণের মূল্য ৮১০ আনা ।

কেরোসিন তৈলের মূল্য

(১৯০৮ সালে সংগৃহীত)

বিভিন্ন মার্কা বিশিষ্ট কেরোসিন তৈলের মূল্য
বিভিন্ন । প্রচলিত কয়েক প্রকার মার্কাবিশিষ্ট কেরো-
সিনের মূল্যের গড় করিয়া মোটামুটি মূল্য ঠিক করা
হইয়াছে । প্রতি টিনে কেরোসিনের মূল্য হইতে টিনটির
দাম ১০ আনা বাদ দিলে পূর্বের হিসাবে প্রতি মণ
কেরোসিনের দাম গড়ে বঙ্গদেশে, বোম্বাই ও মাদ্রাজ
প্রদেশে ৩৮/৫ আনা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে
৪৮/১০ হয় ।

কয়লা ও কোকের মূল্য ।

বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার খুচরা মূল্য সংগ্রহ করিতে
না পারায় আসানসোলকে (Asansol) কয়লার জন্ম-
স্থান বা কেন্দ্রস্থল ধরিয়া উক্ত স্থানে কয়লার ও
কোকের মূল্যের সহিত কয়লার জন্ম নির্ধারিত রেল
বা জাহাজ ভাড়া যোগ দিয়া ভারতের যে কোন প্রদেশের
কয়লা এবং কোকের মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে :—

| স্থানের নাম | কয়লার মূল্য | কোকের মূল্য |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | প্রতিমণ (খুচরা) | প্রতিমণ (খুচরা) |
| কলিকাতা | ৮০ | ৮০ |
| মাদ্রাজ | ৮৫ | ৮৫ |
| পাটনা | ৮১/৫ | ৮১/৫ |
| মইনপুরী (উত্তরপশ্চিমাঞ্চল) | ৮১ | ৮১ |
| সুরাট | ৮৫ | ৮৫ |

পূর্বে বিভিন্ন প্রকার ইন্ধনের কার্য্যকরী উপযোগিতা
এবং বিভিন্ন প্রদেশে তাহাদের গড়পড়তা মূল্যের
বিষয় সম্যক আলোচনা করা হইয়াছে । কাজেই মূল্য

এবং কার্যকরী উপযোগিতা একত্র হিসাব করিলে অধিক পরিমাণ কার্যকরী তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা কোন প্রকার ইন্ধন সর্বোৎকৃষ্ট এবং ব্যবহার করা নির্ধারণ করা যাইতে পারে। পূর্বোক্তরূপ হিসাব নিয়ে উচিত, অর্থাৎ কোন প্রকার ইন্ধন হইতে অল্প, ব্যয়ে প্রদত্ত হইল।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল।

| ইন্ধনের নাম | প্রতিমণের মূল্য | প্রতিসের ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত কার্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units) | প্রতি টাকায় প্রাপ্ত কার্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units) |
|-------------------|-----------------|---|--|
| ১। গইঠা | ১১০ | ১৮০০ | ২৫৬০০০ |
| ২। আলানি কাঠ ... | ১০ | ২৩০৮ | ১৮৮৩০০ |
| ৩। কেরোসিন | ৪৮/১০ | ১৪২১২ | ১৩৩৫০০ |
| ৪। কয়লা | ১১৫ | ২৬৬৮ | ১২৩৭০০ |
| ৫। কোক | ৮১৫ | ৩৮৩০ | ১২১৫০০ |

বোম্বাই প্রদেশ।

| ইন্ধনের নাম | প্রতিমণের মূল্য | প্রতিসের ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত কার্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units) | প্রতি টাকায় প্রাপ্ত কার্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units) |
|-------------------|-----------------|---|--|
| ১। গইঠা | ১১০ | ১৮০০ | ২৫৬০০০ |
| ২। আলানি কাঠ ... | ১০ | ২৩০৮ | ১৮৮৩০০ |
| ৩। কেরোসিন | ৩৮/৫ | ১৪২১২ | ১৬৮০০০ |
| ৪। কয়লা | ১১৫ | ২৬৬৮ | ২০৫৭০০ |
| ৫। কোক | ৮৫ | ৩৮৩০ | ১২২২০০ |

বঙ্গদেশ।

| ইন্ধনের নাম | প্রতিমণের মূল্য | প্রতিসের ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত কার্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units) | প্রতি টাকায় প্রাপ্ত কার্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units) |
|-------------------|-----------------|---|--|
| ১। গইঠা | ১১০ | ১৮০০ | ২৫৬০০০ |
| ২। আলানি কাঠ ... | ১০ | ২৩০৮ | ১৮৮৩০০ |
| ৩। কেরোসিন | ৩৮/৫ | ১৪২১২ | ১৬৮০০০ |
| ৪। কয়লা | ৮১/৫ | ২৬৬৮ | ২৫০৭০০ |
| ৫। কোক | ৮১/৫ | ৩৮৩০ | ২২৭০০০ |

মধ্য প্রদেশ।

| ইন্ধনের নাম | প্রতিমণের মূল্য | প্রতিসের ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units) | প্রতি টাকার প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units) |
|---------------------|-----------------|---|---|
| ১। গইঠা | ১০ | ১৮০০ | ২৫৬০০০ |
| ২। জ্বালানি কাঠ ... | ১০ | ২৩০৮ | ১৮৪৩০০ |
| ৩। কেরোসিন | ৪১/১০ | ১৪২১২ | ১৩৩৫০০ |
| ৪। কয়লা | ১১৫ | ২৬৬৪ | ১২৩৭০০ |
| ৫। কোক | ৭১৫ | ৩৮৩০ | ১২১৫০০ |

মাদ্রাজ প্রদেশ।

| ইন্ধনের নাম | প্রতিমণের মূল্য | প্রতিসের ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units) | প্রতি টাকার প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units) |
|---------------------|-----------------|---|---|
| ১। গইঠা | ১০ | ১৮০০ | ২৫৬০০০ |
| ২। জ্বালানি কাঠ ... | ১১৫ | ২৩০৮ | ৩২৩২০০ |
| ৩। কেরোসিন | ৩১/৫ | ১৪২১২ | ১৬৪০০০ |
| ৪। কয়লা | ১৫ | ২৬৬৪ | ২০৫৪০০ |
| ৫। কোক | ৭৫ | ৩৮৩০ | ১২২২০০ |

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, মাদ্রাজ ব্যতীত ভারতের সর্বত্রই এক টাকার গইঠা হইতে যতটা কার্য্যকরী তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায় অত্র কোন প্রকার ইন্ধন হইতে ঐ খরচে ততটা তাপ পাওয়া যায় না। মাদ্রাজ অঞ্চলে জ্বালানি কাঠের মূল্যের স্বল্পতা নিবন্ধন গইঠা ততটা উপযোগী নহে। বঙ্গদেশে কয়লার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় এক টাকার গইঠা হইতে যতটা কার্য্যকরী তাপ পাওয়া যায় এক টাকার কয়লা হইতেও প্রায় ততটা তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কয়লার যে মূল্য ধরা হইয়াছে তাহা কলিকাতা ও পশ্চিমাঞ্চলের বড় বড় সহর সম্বন্ধে প্রযোজ্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলে কয়লার মূল্য কলিকাতার কয়লার মূল্য অপেক্ষা দ্বিগুণ। কাজেই গড়ে হিসাব ধরিলে বঙ্গদেশেও কয়লা ইন্ধনরূপে গইঠার সমকক্ষ হইতে

পারে না। মাদ্রাজ ব্যতীত ভারতের সর্বত্রই কার্য্যকরী তাপদান ক্ষমতা এবং মূল্যের বিষয় একত্র বিবেচনা করিতে হইলে গইঠাই সর্বোৎকৃষ্ট ইন্ধন এবং কেরোসিন নিকৃষ্টতম ইন্ধন।

ইন্ধন ব্যতীত গোময়ের যদি অত্র কোন প্রকার ব্যবহার না থাকিত তাহা হইলে গোময়ের ইন্ধনরূপ ব্যবহারই প্রশস্ত হইত এবং অত্র ইন্ধনের তুলনায় গোময় সর্বোৎকৃষ্ট ইন্ধন বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু গোময় ভূমির সাররূপেও ব্যবহৃত হয়, কাজেই গোময়ের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে প্রথমতঃ বিভিন্ন সারের তালিকায় গোময়ের স্থান নির্ধারণ করিতে হইবে। কোন সারের সারের গুণের বিষয় আলোচনা দুই প্রকারে করা যাইতে পারে; প্রথমতঃ কোন সার-দ্রব্য হইতে ব্রহ্মাদির

গোময় এবং বুদ্ধির অল্প খাত্তরূপে ব্যবহারের উপযোগী যবক্ষার যান (Nitrogen), প্রফুরকান (phosphoric acid) ও পটাস (potash) কি পরিমাণে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ—কোন সার ব্যবহার নিবন্ধন ভূমিতে কত অধিক পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত বিষয়টি এখনও সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। কাজেই প্রথমোক্ত ভাবেই গোময়ের সার-গুণ নির্ধারণ করিতে হইবে। কোন সার হইতে বৃক্ষাদির যতটা খাত্ত (plant food) আহৃত হইতে পারে ঐ হিসাবেই উহার মূল্য নির্ধারিত হয়। যথা,—সোরাতে—(Potassium nitrate) শতকরা ১৩ ভাগ যবক্ষার যান ও শতকরা ৪০ ভাগ পটাশ বিজ্ঞমান রহিয়াছে। ১ সের যবক্ষার যানের বাজার দর ১০ টাকা ও ১ সের পটাশের বাজার দর ৭০ আনা। এই হিসাবে অর্থাৎ সাররূপে ব্যবহৃত হইলে ১০০ সের সাধারণ সোরার দাম ২১০ টাকা (১৩ × ১০ + ৪০ × ৭০) এবং ঐ মূল্যেই বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১৩ ভাগ যবক্ষার যানের সহিত ৪০ ভাগ পটাশ বৃক্ষের খাত্তরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কাজেই অব্যবহার্য্য অবস্থায় অনেক পটাশ নষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ সাররূপে সোরা ব্যবহার করিলে উহার মূল্য বাদে যতটা খরচ পড়ে তদনুযায়ী ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু গোময়ের যবক্ষার যান, পটাশ ও প্রফুরকান যে তুল্য পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে তাহাতে উহাদের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই বৃক্ষের খাত্তরূপে ব্যবহৃত হয় এবং অব্যবহার্য্য অবস্থায় উক্ত উপাদান সমূহের কোন অংশই নষ্ট হয় না। যে প্রকারে গোময় জালানিকর্ত্তরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাতে শতকরা ১ ভাগ যবক্ষার যান, ১ ভাগ প্রফুরকান ও ১১ ভাগ পটাশ আছে ইহা মোটামুটি ধরা যাইতে পারে। ১ সের যবক্ষার যানের

মূল্য ১০ টাকা, ১ সের প্রফুরকানের মূল্য ১০ আনা ও ১ সের পটাশের মূল্য ৭০ আনা। কাজেই সাররূপে গোময় ব্যবহার করিলে ১০০ সের গোময় হইতে (১০ টাকা + ১০ আনা + ৭০ আনা) = ১৮০ আনা মূল্যের সার-দ্রব্য পাওয়া যায়; অথবা প্রতিমণ গোময় হইতে ১৮০ আনা মূল্যের সার-দ্রব্য পাওয়া যায়, অর্থাৎ ভূমির সার দ্রব্যের তালিকায় গোময়ের মূল্য প্রতিমণ ১৮০ আনা হইতে পারে।

পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, যদিও গোময় সর্বোৎকৃষ্ট ইন্ধন তথাপি ইন্ধনরূপে গোময়ের ব্যবহার সর্বোৎকৃষ্ট নহে। ১০ আনা ব্যয়ে ১ মণ গোময় সাররূপে ব্যবহার করিলে ১৮০ আনা মূল্যের অল্প সার ব্যবহারের ফল পাওয়া যাইবে। অথবা ১৮ টাকার গোময় সাররূপে ব্যবহার করিলে ২১০ টাকার অল্প সারের ফল পাওয়া যাইবে। এস্থলে গোময়ের কার্য্যকরী তাপ প্রদায়িনী ক্ষমতার পুনরাবৃত্তি করা যাউক। মল্লাজ ব্যতীত অগ্নাত্ত প্রদেশে ১৮ টাকার গোময় জালাইলে ২৫৬০০০ ভাগ কার্য্যকরী তাপ পাওয়া যায়, এবং ১৮ টাকার জালানি কাঠ জালাইলে ১৮৪০০০ ভাগ কার্য্যকরী তাপ পাওয়া যায়। অথবা ১৮ টাকার গইঠা জালাইলে ১৮০ আনা মূল্যে জালানি কাঠের তাপ পাওয়া যায়। কিন্তু বলা হইয়াছে যে, ১৮ টাকার গোময় সাররূপে ব্যবহার করিলে ২১০ টাকা মূল্যের অল্প সারের কার্য্য পাওয়া যায়। কাজেই গোময়ের সাররূপে ব্যবহারই সর্বোপেক্ষ লাভজনক এবং ইন্ধনরূপে ব্যবহার না করিয়া ভূমির সাররূপে ব্যবহার করাই সর্বোতোভাবে কর্তব্য।

শ্রীঅমুকুলচন্দ্র সরকার।

বিক্রমপুরে বর্ষা

পাটের ক্ষেতে পাঁচ হাত পানি, পদ্মা এলো ঘাটে,
জাঁকজমকে বর্ষারাগী আসলো ঠমকু ঠাটে।
কদম-রেণু মাখা তন্ন, ধোঁপায় চাপা ফুল,
কণ্ঠভরা কুলু কুলু, রুমকা কাণের ঢুল।
রূপার জালায় নদী-নালায় দিচ্ছে সলিল ঢেলে,
বনের কোঁপে, ধোঁপে ধোঁপে, জোনাকু দিলে জেলে।
এস এস বর্ষারাগী—“ভাদ্র”—ঘরের মেয়ে
আর্জ বশে মুক্ত কেশে নৃতন ডিঙি বেয়ে।

মাঠের মাঝে পুকুর রাজে—চার ধারে তার ধান,
মধুমলেতে ছাওয়া ঘেন, শুভ্র মুকুর ধান।
পাড়া-পড়্‌সী বড়্‌লী ফেলে সরসীর সে জলে,
ভেলায় চাপি’ ভোলা “পুতি” “চাই” পাতিতে চলে।
গাবের গাছে বাঁধা আছে, হাট বাজারের তরী,
“পাছ-দুয়ারে” “কাইপ্লা”—মান্দার আছে আঁধার করি।
“পিটখিরা” আর “ছিটকি”—ঘেরা “ছিটাল” আশে পাশে
নৌকা, “চাড়ি” সারি সারি বাড়ীর কোণে ভাসে।

“পিড়ায়” বসে বিড়াল কঁাদে, “সরাল” ডাকে দলে,
বাড়ীর আব্রু আত্র-“বটু”—হিজল গলা জলে।
ঠন্থনে সে উঠানু খানির খানিক জলে লাগে,
“নাথের” বাড়ীর ভাতের হাঁড়ী ভাসে “সোতের” রাগে,
বন্ধ ঘরে সন্তঃ নদী—যেঁকের বাঁশের মঁচা
নিমাই মুলী কিমায় ‘বসে’—মাছুষ পাখীর খাঁচা।
“বোঁরা” গাছের নোয়া ডালে, “বেধাইকু” বনের পাশে
বাঁশের সিঁড়ির সেতখানাটি আধেক জলে ভাসে।

“ছিলাম পাইনের” ভাঙ্গা নাও, গাবের গুণে “ন’রা”,
হুটিছাড়া “কিঁজি” খানি—ইটিমারের “বরা”,

হোগ্লা পাতার “বাদাম” ভুলে, কিলের ‘হাতাইল’ দিয়া
ছিদাম্ মাঝি যাচ্ছে অই—কি—“নাইওরি” নিয়া।
ধানের ক্ষেতে, ধীরে ধীরে যাচ্ছে “ধুরি” বেয়ে,
“বঁধু যদি হাপনু হৈত”—মধুর সুরে গেরে।
মাঝে মাঝে মেঘ আওয়াজে, গর্জে ছিদাম্ পাইন—
“শোনুছনি রে মিত্রা ভাই—যার যার—ডাইনু”

গোহাল ঘরে গোরুগুলি গোবর গারে খাড়া,
গাম্‌লা-মাঝে মুখটি গুঁজে, “গুজ” দিতেছে নাড়া;
বেড়ার কাছে বাঁধা আছে, পাট-পেকাটির আটি,
বর্ষাকালের ভর্সা সে যে—ভিজে আখার মাটি।
ঘরের কোণে ডালিম গাছ, টুকটুকে ফুল ডালে—
হাঁহুর বাড়ীর কনে বউ, সিঁদুর টুকু ভালে।
সন্ধ্যা হ’লে কিলে-লতা হন্দে ফুলে সাঙ্গে,
চুল বেঁধে সে কুল বধু—ঘোমটা টানে লাঙ্গে।

“পোলাপানে” খোলা প্রাণে, ডাকছে গলা বেঁধে—
“পানি কাউর।” আমার লাইগা এউকা ভুব্দে।
শ্রাম সাগরে—ঢেউ উঠেছে, আউস ধানের ক্ষেতে,
“দলপিপি” আর বক বসেছে, “দামের” আসন পেতে।
কাতর প্রাণের কতই কথা—চাতক পাখীর ডাকে—
আঁধির পাতা আপনি ভেজে—মনে পড়ছে কা’কে।
মুহ-মুহ ডাকছে ঘুঘু—হহ করে প্রাণ,—
কণে কণে পল্লী-বনে—ঝিল্লী ধরে তান।

সহরের সে ঘন্টা ঘড়ির “ধপর” কেবা রাখে।
“কোড়াল”—চণ্ডে ‘প্রহর’ বাজে, প্রভাত জানার কাকে।
“বলাস” আছে পলাশ গাছে, রাত্রে বাজার হোরা,
দণ্ডপলের গঙগোলের ভয় কি রাখি মোরা।
ভোরের আগে মোরগ “বাগে” শিয়াল সন্ধ্যা হ’লে—
বিনা দামের গ্রামের বাড়ি।—“অয়েল” নৈলেও চলে।

৮

কি-যেন এক মস্ত-বলে জাগলো সারা বিল,
হাজার মানিক উঠলো জলে' বিলু মিলিয়ে বিলু!
পানার দলে পান্না প্রচুর, মুক্তা কচুর পাতে,
ভোরের বেলা হেমের মেলা, রূপার খেলা রাতে!
কল্মী, কমল, শৈবাল শ্রামল, “শাপলা” শাদা শাদা,
চকাচকি—ডাউক্ ডাহকী, একই সুরে বাঁধা!
তরল জলে মরাল-দলে নাচ্ছে ঘুরি ঘুরি,
নীয়ে পশি' তারা শশী খেলছে লুকোচুরি!
সৌম্য নীকে গিলের মাঝে, কে তুমি গো কবি?
কালো জলে, আলো জ্বলে ফুটাও সোনার ছবি!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

প্রতি শোধ

(১)

মনোমত সম্পন্ন কৈবর্ত যুবক। পিতাব মৃত্যুতে সে
আজ পাঁচখানি জেলে ডিঙ্গির অধিকারী হইয়াছে।
জুলিয়ার উপর সত্য সত্যই তাহার নজর পড়িয়াছে
যেহেতু লোকে নানা গুহব রটাইতে লাগিল। পারুল-
পুরে বাহারা মনোমতকে চিনিত তাহাদের চক্ষুর সম্মুখ
হইতে জুলিয়ার জীবনের যবনিকাটা সরিয়া গেল, কারণ
মনোমত ভীষ-প্রতিজ্ঞ লোক ইহা কাহারও অবদিত
ছিল না। কেহ কেহ কিন্তু বলিত জুলিয়া সাগরকেই
ভালবাসে। সাগর ধরিয়া লইয়াছিল আলস্তই প্রেম-
কের বিলাস-বিভব, এবং কর্মে অপ্রীতি প্রেম প্রার্থনায়
সিদ্ধি লাভের অব্যর্থ উপায়। তাই সে উদ্বেগহীন
মত বিনা কাজেই সর্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত। মাতা এক

মাত্র অকর্ম্মা পুত্রকে লইয়া কোন প্রকারে দিনাতিপাত
করিত। সুতরাং মনোমতের সহিত প্রতিবন্ধিতার
তাহার জয়ের আশা একান্ত দুঃশা বলিয়াই সকলে
বুঝিয়া লইয়াছিল।

কার্তিকের মাঝামাঝি। তিতাস নদীর মোহানার কাছে
মাছের ‘জো’ হইয়াছে তাই পারুলপুরের সমস্ত কৈবর্ত
জেলে ডিঙ্গিতে দশ দিনের উপযোগী খাচ্চাদি লইয়া ভাটী
বাহিয়া চলিল। ডিঙ্গিগুলি একদল রাজহাঁসের মত
পাখা ছড়াইয়া নদী-বন্ধ ছাইয়া ফেলিল।

এক একখানা ডিঙ্গি পঞ্চাশ হইতে সত্তর হাত লম্বা।
পেছনের গলুইগুলি জলের প্রায় পাঁচ হাত উপরে, এক
জন লোক গলুইর গোড়ায় বসিয়া ঝুলান পায়ে
আঁকড়াইয়া ধরিয়া সুদীর্ঘ হালটি চালাইতেছে, আর
সম্মুখের গলুইগুলি সলিল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে।
নৌকার গর্তগুলি আঁধার করা বাঁশের পাটাতনে ঢাকা।
মাঝখানে লাড়ে তিন কি চার হাত যায়গা জুড়িয়া একটি
একটি বাঁশের চটের ছই।

সরঞ্জামের মধ্যে জগৎবেড় জাল প্রকাণ্ড অজগর
সর্পের মত লম্বালম্বি নৌকার এক ধারে পড়িয়া আছে।
দুইটি কলিয়া জীর্ণ মালিন কাঁধা; রোলারের মত
শক্ত দুটি দুটি কুমিল্লার চারখানার বালিশ। তেলে তেলে
গায়ের ময়লায় উপরটাতেও একটা বেশ পুরু আস্তরণ
পড়িয়াছে—নথ দিয়া আঁচড়াইলে খড়ি ওঠে।

আঠার ইঞ্চি লম্বা একটি ‘বন’ বাঁশের চোঙ্গ—মাঝ-
খানে একটা গাঁট, উপরের দিকটা খোলা, ভিতরে
তামাক থাকে, এবং সেই খোলা মুখটা কাল নেকড়ার
সিঁপিতে আঁটা। গাঁটের নীচে একটি ত্রিকোণ ছিদ্র—
ভিতরে ‘গুগ’ বা ‘টিকা’। ছিদ্রটি একরূপ কোশলে কাটা
যেন ঢালিলে একটির বেশী ‘টিকা’ বাহির হইয়া না
আসে। উপরের খোলা মুখটার একটু নীচে একটি
ছোট ছিদ্র, এক প্রান্তে গিড়ো দেওয়া একটি স্ক্রু দড়ি
সেই ছিদ্রটিতে আটকান, অপর প্রান্তে হুন্নাগ্র একটি
বাঁশের কাঠি বাঁধা। জেলেরা এই কাঠি ছইএর বাঁধাডিতে

গুঁজিয়া রাখে ও চোখটি জুলিয়া থাকে। তা ছাড়া প্রত্যেক নৌকাই আছে গুটিদুই এনামেলের বাসন, একটি খটি ও একটি বাটি, একটি হাঁড়ি-ভাঙ্গা চুলা ও কিছু পাটখড়ি।

মনোমত সাধারণ জেলে ডিক্কিতে গেল না—একখানা লাল ডিক্কি সাজাইয়া চলিল; আর জুলিয়া তীরে দাঁড়াইয়া চন্দ্রধরের মত অম্লচর বেষ্টিত মনোমতের নদী-যাত্রা একটু যেন বিশেষ উৎসাহের সহিত দেখিয়া লইল।

সকলেই কানাকানি করিতে লাগিল মনোমত ফিরিয়া আসিলেই জুলিয়ার সহিত তাহার বিবাহ হইবে।

(২)

সাগরের বুদ্ধি আদৌ তীক্ষ্ণ ছিল না, এবং সে অস্ত্রের ব্যাপার লইয়া আন্দোলনও করিত না। বিশ্ববতঃ জুলিয়াকে লইয়া যে কানায়ুধা হইতেছিল ইহাতে মনোমতের সংশ্রব আছে বলিয়া সে এক্ষেত্রে কোনও কথাই বলিত না, শুধু সাবধানে সকল কথা শুনিয়া যাইত। কেবল মনোমত এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না এই একটা আকুল উৎকণ্ঠায় তাহার চিন্তা বেদনাময় হইয়া উঠিতে লাগিল।

পাকুলপুরের ঘাটটি বড় সুন্দর। প্রায় তিন হাত যায়গা তীরে তীরে ঢালু হইয়া নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে রোজ সকালে জেলেদের ডিক্কি লাগে, মেয়েরা স্নান করে, কাপড় কাচে, কলসী কাকে করিয়া জল জুলিয়া নেয়। ঢালু স্থানে বিস্তর হাঁড়ি ভাঙ্গা পড়িয়া আছে—খালি পায়ে চলিলে বেশ লাগে। দুই একটা নৌকা ডাকার তোলা, দুই একটা তীরের নিকট অগভীর জলে অর্ধময়। পরিষ্কার জায়গায় জেলেরা চুড়ায় একটা বাঁশ বাঁধিয়া ও আড়াআড়ি ভাবে একটা বাঁশের দুই প্রান্ত আটকাইয়া রোজে “কনুই জাল” শুকাইতে দেয়—আবার কখনও নদীর কুলে বহু দূর ব্যাপিয়া বেড়জালগুলি বাঁধা বাঁশের উপর

কাপড়ের মত ছড়াইয়া দিয়া থাকে। দরিদ্র জেলের ছোট ছোট চালা ঘরে তীরভূমি আকীর্ণ। শীত কালে চটের উপর রোজে ছড়ান নানাবিধ গুঁকটি মাছের পচা গন্ধ বহু দূরে ছড়াইয়া পড়ে। মাঠের ওপারে তরুশ্রেণীগুলি ঘন কালির রেখার মত দেখা যায়।

অদূরে একটি ধনীর প্রাসাদ বহু উর্দ্ধে মাথা জুলিয়া চালা ঘরগুলিকে যেন উপহাস করিতেছে। পাকা অঙ্গন হইতে পঞ্চাশ হাত লম্বা প্রায় পঞ্চাশটা সিঁড়ি নদীতে নামিয়া আসিয়াছে। বহু দূর পর্য্যন্ত নদীর তীর পাকা, যেন ভাঙ্গিতে না পারে। দোতারা বাড়ীখানার দক্ষিণদিকেই নদী ও সদর দরজা; পশ্চিমদিকে দোতারার উপরে অর্ধচন্দ্রাকার একটি বেশ বড় খোলা বৈঠকখানা বড় বড় ধামের উপর বড় সুন্দর দেখায়। বর্ষা কালে সিঁড়িগুলি সমস্ত জলে ডুবিয়া যায় এবং পশ্চিম দিকেও ধামের গোড়ায় জল আসে। ধপ্ ধপে সাদা প্রকাণ্ড বাড়ী বহু দূর হইতে নদীযাত্রীগণের চক্ষুগোচর হইয়া তাহাদের প্রাণে অজ্ঞাতসারে একটা আকুল হাঁসিকার জাগাইয়া দেয়।

অম্বরগময় অরুণোদয়ে, ধর মধ্যাহ্নে ও শান্ত সন্ধ্যায় সাগর প্রতিদিন এই ঘাটে ব্যাকুলচিত্তে বসিয়া থাকিত। চিত্রিত গলুই নৌকাগুলি পাখা ছড়াইয়া কি জানি কখন ফিরিয়া আসে! বসিয়া বসিয়া অনেক সময় সাগরের চক্ষু ভাঙ্গিয়া যাইত—দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্ত হইয়া সে ঘরে ফিরিয়া আসিত।

এক দিন অপরাহ্নে সূর্য্যের কিরণ মন্দ হইয়া আসিতেছে এমন সময়ে সে প্রথমে দূর নদীতে একখানি নৌকার পাল দেখিতে পাইল। দেখিতে দেখিতে নৌকাঘাটে অনেক স্ত্রী-পুরুষের সমাগম হইল। কিন্তু সেখানে সাগর জুলিয়াকে দেখিতে পাইল না; মনে মনে ভারি খুসি হইল। তখনই উৎসাহের একটা উজ্জল আভা তাহার নয়ন কোণে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল।

মনোমত বুকভরা আশা লইয়া ভিড় তৈলিয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু কি একটা আকাজকের সামগ্রী খুঁজিয়া

না পাইয়া তাহার মনটা বড় দমিয়া গেল। সাগরের সমুদ্রীন হওয়া মাত্র সে বলিল,

“কেমন, বেশ মাছ মাঝা গেল?”

“মন্দ নয়।”

“আমার সঙ্গে তোমার একটা কথা আছে। তোমার কাছে আমার একটা অল্পগ্রহ তিকা আছে।”

“অল্পগ্রহ দেখাবার সুযোগ ত চলিয়া গিয়াছে, এখন তুমি কি অল্পগ্রহ চাও?”

এই ভীত বিজ্ঞপটা সাগরের মনে বড় লাগিল।

“অল্পগ্রহ আমি চাই না। জুলিয়াকে তোমার ক্ষমা করিতে হইবে।”

জুলিয়ার নামে মনোমত আহত বিষয়ের তার পক্ষন করিয়া ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলিল,

“জুলিয়া! কেন, সে কি করিয়াছে?”

“তবে শোন; আমি কিছুই গোপন করিব না; আমি তাকে ভালবাসি, সুতরাং তার অনিষ্টের আশঙ্কায় আমার ভয় হইতেছে। বিশেষ না ভাবিয়া তার অনিষ্ট করিয়া পাছে অহুতাপ কর, তাই তোমাকে সব কথা বলিতে যাইতেছি। ফিরোজপুরের তুলারাম দাস জুলিয়ার দূর সম্পর্কিত মামা। সে আজ সাত দিন সেই তুলারামের বাড়ীতে। সেখানে শীঘ্রই তাহার বিবাহ হইবে।”

সাগর এই বলিয়া সরিয়া গেল। মনোমত কলাপালের মত নিশ্চল ভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, পরে দ্রুতপদে জনতা তেদ করিয়া চলিয়া গেল।

(৩)

নদী-তীর হইতে বরাবর জুলিয়ার কুটীরদ্বারে আসিয়া মনোমত দেখিল এক বৃদ্ধা শয্যায় পড়িয়া অশ্রুটধরে কি বলিতেছে, এবং এক প্রতিবেশিনী রন্ধন করিতেছে, জুলিয়া গৃহে নাই।

সেখান হইতে সে বাড়ীতে গেল। তাহার বাড়ী গ্রামের অপর প্রান্তে। তাহার একটা দো-নালা বন্দুক ছিল। দুই পুরুষ বাবৎ সরকার বাহাদুর দয়া করিয়া এই বন্দুকের পাশ দিয়া আসিতেছেন; শরন-কন্ডে প্রবেশ করিয়াই প্রাচীরের গায়ে লম্বিত সেই ভরা বন্দুকটা নামাইয়া লইয়া আবার মুক্ত বায়ুতে বাহির হইয়া পড়িল।

গ্রামের বাহিরে ক্ষুদ্র প্রান্তর পার হইয়া নিবিড় অন্ধকারে মনোমত ফিরোজপুর অভিমুখে চলিয়াছে। তাহার চিন্তাপীড়িত মলিন বদনে পুঞ্জীভূত নক্ষত্রের জ্যোতিঃ পড়িয়া ঘেন ম্লান হইয়া যাইতেছে। শুধু রক্ত-পাত ও হত্যার চিন্তা এক হইয়া তাহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল প্রতিষেদীর রক্তেই তাহার প্রেম-যজ্ঞের আহুতি হইবে। প্রতি-হিংসাই এখন তাহার সাধন মন্ত্র। হঠাৎ আকাশ হইতে মেঘের আবরণ সরিয়া গেল। পট অপ-সারিত হইলে রক্তমঞ্চ যেমন সমুজ্জল হইয়া উঠে, তাঁদের আলোকে সমস্ত ভূভাগটা হঠাৎ তাহার সমুখে তেমনই আলোকদীপ্ত হইয়া গেল। সে তখন তুলারামের বাগান বাড়ীর সমুখভাগে উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পশ্চাতে গভীর অন্ধকারে গ্রামের প্রান্তভাগ শান্তিতে ঘুমাইতে ছিল।

বাগানের দেয়াল কম পক্ষে সাড়ে চার হাত উঁচু। দেয়ালের লাগা একটা গাছ বাহিয়া অতি কষ্টে দেয়ালের মাধ্যম প্রথমে বন্দুকটি রাখিয়া পরে সে প্রাচীরে উঠিল, এবং অতি সতর্পণে একটা ডাল ধরিয়া বাগানে নামিয়া পড়িল।

বাগান বাড়ীর এই পাশে কোনও খিড়কির পথেই একটি দীপের ক্ষীণ রেখাও দেখা যাইতে ছিল না। কিন্তু অতি সাবধানে চাহিলে দেখা যায় নিম্নতলের খিড়কির একটি খড়খড়ি খোলা আছে। সেই আলোক রেখা লক্ষ্য করিয়া সে নিঃশব্দে সেই খড়খড়ির নীচে আসিল এবং কোনও ঝঞ্ঝারে হাটু ঝাড়িয়া বসিল। পরে অতি

সাবধানে মাথা উঠাইতে লাগিল এবং উঁকি মারিয়া প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরটা এক বার দেখিয়া লইল। দেখিল হুইটি মনুষ্য মূর্তি নীরবে বসিয়া আছে। দেখিয়া নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না, চমকিত হইয়া ঘাসের উপর আবার বসিয়া পড়িল। তাহার হস্ত তখন শিথিল। বন্দুকটি তুলিয়া লওয়ার সামর্থ্যও যেন তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রতিহিংসা-বৃত্তির দৃঢ়তা তাহার হৃদয়কে বলীয়ান করিয়া তুলিল। তখন সে দৃঢ় মূর্তিতে বন্দুকটি ধরিয়া স্থির ও সংযত চিত্তে বন্দুকের ঘোড়া সম্পূর্ণরূপে টানিয়া ধরিল। পরে ঘোড়াটার দিকে এক বার স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিল এবং ধীরে ধীরে বন্দুকটি ঝড়ঝড়ির পথের দিকে তুলিয়া ধরিয়া আর এক বার উঁকি মারিয়া প্রকোষ্ঠের ভিতরটা দেখিয়া লইল।

এক প্রান্তে ছুটি মনুষ্য মূর্তি—পশ্চাতে তরল অন্ধকার কিন্তু ক্ষীণ দীপালোকে তাহাদের মুখ ছুটি পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। হাশ্মতের দুই মুখই ফোটা ফুলের মত সুন্দর। ইহাদের মধ্যে এক জন পুরুষ অপরিচিত যুবতী এবং মনোমত দেখিল সেই যুবতী তাহার প্রেম-স্বপ্নের কুহকিনী—জুলিয়া।

তখন একটু একটু জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। জানালায় পাশে প্রথমতঃ একটা ধসু ধসু শব্দ শোনা গেল, অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার বন্দুকের নল চক্ষুক করিয়া উঠিল এবং তৎপরেই একটা গুরুম্ গুরুম্ শব্দে চতুর্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মনুষ্যের ক্রক ছায়াও ভীর বেগে ঘাসে ঢাকা একখণ্ড জমির উপর দিয়া নিঃশব্দে দেয়ালের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মনোমত রুদ্ধশ্বাসে ছুটিতেছিল এবং প্রতি পদক্ষেপেই যেন সে কোনও অমুসরণকারীর পদ শব্দ শুনিতেছিল। চতুর্দিক নীরব। তুলারামের বাড়ীর সম্মুখীন হইয়া অবসর মনে সদর রাস্তার পার্শ্বে সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার অঙ্গ শিথিল; পা

ছুটি শক্তিহীন; কিন্তু হত্যাপরাত্তের অপ্রাক্ত নিদর্শন বন্দুকটি তখনও তাহার হস্তে।

মনোমত এখন হত্যাপরাত্তী! কিন্তু এই ভাবনারও সে এখন শাস্তি পাইতেছে। সে প্রতিশোধ লইয়াছে। যদি জুলিয়াই অবিবাসিনী হইল তবে তাহার জীবন ধারণে আর ফল কি?

(৪)

সম্মুখে কতগুলি ঘন-পল্লব বকুল গাছ। বকুল গাছের ভলে পথ। পথে জ্যোৎস্নার আলো ও পাতার ছায়ার মিলন স্থানে দৃষ্টি পাত করিয়া মনোমত বস্ত্রপুত্তলির মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দেহ ষষ্টিবৎ নিশ্চল ও নিষ্পন্দ। সম্মুখে একটি রমণী-মূর্তি ধীর পদবিক্ষেপে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সে ক্ষীণ অন্ধকারে একদৃষ্টে সেই মূর্তির দিকে তাকাইতে লাগিল এবং সেই ছায়ামূর্তিটাও ক্রমশঃ জুলিয়ার সত্য মূর্তিতে পরিণত হইতে লাগিল। পরিশেষে নিশার নীরবতা ভেদ করিয়া একটা অস্পষ্ট স্বরলহরী মনোমতের কর্ণে প্রবেশ করিল—“মনোমত, তুমি এখানে?”

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে সে শিহরিয়া উঠিল এবং বন্দুকটি হস্তভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল।

কিন্তু তখনই প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—“তুমি কি স্বপ্ন, না সত্য জুলিয়া!”

“হাঁ, আমি সত্যই জুলিয়া। কেন, তুমি কি আমার গলায় স্বরও চিনিতে পার না? তুমি এমন সময় এখানে কেন?”

জুলিয়ার স্বর স্নিগ্ধ, আবেগ-রহিত, কোমল ও প্রেম-পরিপূর্ণ ছিল।

সুগোপিতের দ্বার এক হাতে স্বীয় স্পন্দিত গণ্ড স্পর্শ করিয়া ও অপর হাত জুলিয়ার দিকে বাড়াইয়া মনোমত বলিতে লাগিল—

“তুলিলাম আজ সাত দিন তুমি তুলারামের বাড়ীতে আছ, এবং তোমার বিবাহ। যে আমার স্বপ্নের প্রেম-স্বপ্ন ভাঙিয়া দিতে উদ্ভত হইয়াছে তাহাকে

জানু, ১৯১৯

উপযুক্ত শান্তি দেওয়ার জন্য এখানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু সাগরই সম্পূর্ণ দারী, কারণ সে-ই তোমার দেখিলাম, তুমি এক জন যুবকের সম্মুখে এক রাশি সন্দেশে আমার মনে একটা মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টি করিয়া জোছনার হাসি লইয়া বসিয়া আছ। দেখিয়া আমার চিত্ত ক্রোধ ও ঈর্ষ্যার বিষে ছাইয়া গেল। একে একে তোমাদের দুই জনের উপরই গুলি চালাইলাম। তোমরা অন্ধকারে মিশিয়া গেলে; আমিও পলাইলাম—কিন্তু প্রাণপণে ছুটিয়াও আর দূরে বাইতে পারি নাই। তারপর তোমার জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি—এখনও বিশ্বাস হইতেছে না, তুমি সত্য—কি মায়া।”

অগত্যা নীরব থাকিয়া জুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল—
“তোমার হৃদয়ের ফলে এক সপ্তাহের পরিশ্রম মাটি হইল।”

“তুমি কি বলিতেছ?—কার পরিশ্রম—কিণের পরিশ্রম।”

মনোমতের স্বর ক্রমশঃই কর্শ হইয়া উঠিতেছিল।

“ঈর্ষ্যার পাগল হইয়া তুমি একেবারে অন্ধ হইয়াছ। তুলারাম আমার শালা মাটির মূর্ত্তি গড়িতে শিখিয়াছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া আমার একটা মূর্ত্তি গড়িতে চান—মামা তাই আমাকে তাহার বাড়ীতে আনাইয়াছেন। কাল সন্ধ্যায় এই মূর্ত্তিটা শেষ হইয়াছে। কিছু দিন—আগে এই গত পূজার সময় তিনি আর একটা পুরুষ মানুষের মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই দুইটা স্তম্ভের মূর্ত্তিই তুমি নাশ করিয়াছ।”

মনোমত হাঁক ছাড়িয়া বেন একটা গুরুতর দৃষ্টিস্তা হইতে বাঁচিল—তার হৃদয়টা হালকা হইল। সে স্থির দৃষ্টিতে জুলিয়ার দিকে চাহিয়া ক্রীণ কণ্ঠে বলিল—
“জুলিয়া, আমার ক্ষমা কর। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারের

কথা শুনিয়া জুলিয়ার চক্ষু অলিয়া উঠিল। মনোমত ফিরিয়া দেখিল অদূরে সাগর দাঁড়াইয়া আছে। অমনি ক্রীণ কুকুরের মত তাহাকে আক্রমণ করিল। সাগর যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিয়া বলিল—“মনোমত, আমার হ্রস্তসিদ্ধি নাই। আমি তোমাকে সব কথা সত্য ভাবিয়াই বলিয়াছি—উদ্দেশ্য জুলিয়ার প্রাণ রক্ষা। তোমার হাতের বন্দুকটা এক বার বেশ করিয়া দেখে দেখি?”

কিন্তু প্রতিবন্দীর কথা কানে না তুলিয়া সে পুনরায় আক্রমণের প্রয়াস করিতে লাগিল। সাগর ক্রমশঃই ক্রীণবল হইয়া পড়িতেছিল—এখন শ্বাস কণ্ঠে রুদ্ধ থাক হইয়া কর্শ দৃষ্টিতে জুলিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল—
“তুমিই বন্দুকটা তুলিয়া মনোমতকে টোটাগুলির অবস্থা দেখাও, জুলিয়া।”

“এই কথা শুনিয়া মনোমত সাগরকে ছাড়িয়া দিল এবং বন্দুকটা তুলিয়া লইল। টোটাগুলিও খুলিয়া লইয়া দেখিল। সে দুটাই ত কাঁকা আওয়াজ করিয়াছে! তখন সে এক বার সাগরের দিকে চাহিল। জুলিয়াও উভয়কেই বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিল।”

এই দৃষ্টিতে যেন কত কালের তাহার কি একটা প্রচ্ছন্ন কাহিনী আর এক বার সজীব ও সজাগ হইয়া মুহূর্ত্তেই পুনরায় বিশ্বস্তির স্তরে আবৃত হইয়া গেল।

এই ঘটনার পরে পারুলপুরে সাগরকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

ধামরাই গ্রামস্থ যশোমাধবের

ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ধ্বংসাবশেষের

সংক্ষিপ্ত বিবরণ *

আজকাল ঢাকা জেলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে চারিদিকেই অসুসন্ধান চলিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশে বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য যতদূর উত্তম ও চেষ্টা চলিতেছে, উত্তরাংশে ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহের জন্য তাহার শতাংশের একাংশ চেষ্টাও করা হয় নাই। এরূপ না হইবার কতকগুলি কারণ আছে; প্রথমতঃ, ভাওয়াল প্রভৃতি অরণ্যসমাকুল স্থানে যে ঐতিহাসিকের অসুসন্ধান অনেক বিষয় আছে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। দ্বিতীয়তঃ, বিক্রমপুরের তুলনায় ঢাকা জেলার উত্তরাংশ সম্পূর্ণ অশিক্ষিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—এইজন্য এই সমস্ত কার্যে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত লোকের তথায় সম্পূর্ণ অভাব। তৃতীয়তঃ, ভাওয়াল অঞ্চল অপেক্ষাকৃত দুর্গম হওয়ায় তথায় অসুসন্ধান উদ্দেশ্যে পর্য্যটন অত্যন্ত দুর্লব। আমি এই প্রবন্ধে ভাওয়ালের অন্তঃ ও প্রান্তবর্তী কতকগুলি ঐতিহাসিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। যদি অন্তঃপর কোনও যোগ্যতর ব্যক্তির মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হয়, তবেই নিজের সামান্ত উত্তম সার্থক বিবেচনা করিব।

ভাওয়ালের অন্তঃস্থ ও প্রান্তস্থ স্থান সমূহের ঐতিহাসিক বিবরণ দিতে গেলে প্রথমেই ভৌগোলিক ও ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অবস্থার পরিচয় দিতে হয়। মোটামুটি বলিতে গেলে ভাওয়াল মধুপুর জঙ্গলের দক্ষিণাংশ মাত্র। ইহার সীমা দক্ষিণে প্রায় ঢাকানগরী, উত্তরে মধুপুরের গড় এবং পূর্বে লক্ষানদী। পশ্চিমে ধলেশ্বরীর বালুকাময় অববাহিকা

(Basin)। ভাওয়ালের অধিকাংশ স্থানই পূর্বে শাল ও গজারী বৃক্ষে সমাকীর্ণ ছিল—এক্ষণে প্রায় অধিকাংশ স্থান পরিষ্কৃত হইয়া আবাস যোগ্য হইতেছে। ঢাকা জেলার অন্যান্য অংশের মৃত্তিকা দো আঁশলা (Alluvial), কিন্তু ভাওয়ালের মৃত্তিকা ঘোর রক্তবর্ণ, বাধা এঁটেল। ঢাকা জেলার অন্যান্য অংশের তুলনায় ভাওয়াল বেশ উচ্চ, বর্ষার জলে ইহার কোন অংশ প্রাবলিত হয় না।

আমি যে সমস্ত ঐতিহাসিক বিষয়ের পরিচয় দিতেছি তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল।

(১) বরইবাড়ীর যশঃপাল বা যশোবন্ত পাল রাজার প্রাচীন বাটীর ভগ্নাবশেষ।

(২) সাতারের হরিশচন্দ্র পাল রাজার বাটীর ভগ্নাবশেষ। সাতার ভাওয়ালের পশ্চিমতম প্রান্তে অবস্থিত।

(৩) ধামরাইএর প্রসিদ্ধ বিগ্রহ যশোমাধবের বিবরণ।

ধামরাই গ্রাম বা নগর খাঁটি ভাওয়ালের প্রান্তদেশ হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। কিন্তু যশোমাধব বিগ্রহ যে স্থানে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ, সে স্থান (মাধবচালা) ভাওয়ালের অন্তর্গত।

(৪) আরও কতকগুলি প্রবাদ ও ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ করা যাইবে। এ ধ্বংসাবশেষ আমি নিজে পর্য্যবেক্ষণ করি নাই বলিয়া বিশেষ বিবরণ দিতে পরিলাম না।

বরইবাড়ী যশোবন্ত পাল রাজার রাজার ভগ্নাবশেষ। এই স্থান সাতার ধানার অন্তঃপাতী এবং সাতার হইতে প্রায় কুড়ি মাইল উত্তরে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সীমারেখায় অবস্থিত। এই স্থানের নিয়ে তুরাগ নামে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে। নদী হইতে প্রায় এক মাইল উত্তরে এক প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের উপর ইহা অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে এক মাইল ও প্রস্থে অর্ধমাইল এরূপ উন্নত ভূমিখণ্ডের উত্তরাংশে অনেকটা স্থান ব্যপিয়া এই ধ্বংস অবস্থিত। অল্পদিন হইল

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে গঠিত।

কয়েক ঘর মুসলমান আসিয়া এইস্থান আবাদ করতঃ বাস করিতেছে।

এখানে চারিটি ছোট বড় পুকুরিণী আছে। একটি পুকুরিণী এক বৃহৎ গর্ত বিশেষ। দৈর্ঘ্যে প্রায় প্রায় এক শত হাত, এবং গভীরতাও প্রায় ১৫ হাত হইবে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই স্থানে রাজার হস্তীকে দান করান হইত।

আর দুইটা পুকুরিণী অত্যন্ত বৃহদাকার। প্রথমটির নাম ঢোলসমুদ্র, দ্বিতীয়টির নাম কোটামণি। ঢোল সমুদ্র দৈর্ঘ্যে অল্পমান ৫০০।৬০০ হাত এবং প্রস্থে প্রায় ৩০০ হাত হইবে। উত্তর ও পশ্চিম দিকে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন পাওয়া যায়। ঢোলসমুদ্র অত্যন্ত গভীর। স্থানীয় অধিবাসিগণ বলে যে চৈত্র মাসের প্রথম রৌদ্রেও দীর্ঘ বাঁশ দিয়াও উহার তলা পাওয়া যায় না। ঢোল সমুদ্র নাম সম্বন্ধেও বেশ প্রবাদ আছে। ঢোলসমুদ্র দীর্ঘি বধন খনন করা হয় তখন রাজা উহার গভীরত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য ঢুলীদিগকে তলে নামাইয়া দেন। তাহারা খুব জোরে ঢোল বাজাইতে থাকে—কিন্তু দীর্ঘি এত গভীর হইয়াছিল যে উপরের লোকে ঢোলের শব্দ একেবারেই শুনিতে পায় না। এই জন্য রাজার আজ্ঞানুসারে পুকুরিণীর নাম হইল ঢোলসমুদ্র। পুকুরিণীর চতুঃপার্শ্ব আজকাল জঙ্গলময় এবং বক্কোদেশ নানা আগাছায় পরিপূর্ণ। জল অপেক্ষ।

দ্বিতীয় পুকুরিণীর নাম কোটামণি। এই পুকুরিণীর পার্শ্বে রাজবাটীর বৃহৎ ভগ্নাবশেষ। এই পুকুরিণীটি ঢোলসমুদ্র হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। পশ্চিমদিকে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন পাওয়া যায়। স্থানীয় অধিবাসিগণ পানীয় জলের জন্য পুকুরিণীর এক পার্শ্বে কূপ খনন করিয়াছে। তাহারা বলে যে, এই কূপ খনন করিতে তাহাদিগকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে। কারণ ভূমিপৃষ্ঠ হইতে নীচে প্রায় ৭।৮ হস্ত পরিমিত স্থান কেবল ইষ্টকময়। কূপের চারিপার্শ্বে কেবল ইষ্টকে সমাকীর্ণ।

এই পুকুরিণীর পশ্চিমপার্শ্বে অনেকটা স্থান ইষ্টকে সমাকীর্ণ। লোকে বলে এইস্থানে রাজার বাটী ছিল। কিন্তু ইষ্টক রাশি ছাড়া রাজবাটীর সংস্থান সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার আর কিছুই নাই। মধ্যস্থলে একটি ভগ্নস্তূপ আছে। উহার ব্যাস প্রায় ১০।১২ হাত হইবে।

ইষ্টকগুলি অধিকাংশই ক্ষুদ্রাকার। মধ্যে মধ্যে বর্গক্ষেত্রাকার (square) ইষ্টকও পাওয়া যায়। কতকগুলি ইষ্টকের কোণগুলি অন্ত্রপ্রয়োগে গোল করান হইয়াছে।

এই স্থানের নিকটবর্তী অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে, এখানে যে দুই চারি ঘর লোক আছে, তাহারা এই ভগ্ন বাটী হইতে অনেক প্রাচীন যুগে এবং ধনরত্ন ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানীয় লোকেরা অবশ্যই তাহা স্বীকার করে। কিন্তু তাহারা বলে যে, ইষ্টকরাশির মধ্য হইতে অনেক সময় খোদিত ইষ্টক ও মূর্তি পাওয়া যায়। আমি চেষ্টা করিয়া একখণ্ড ভগ্ন-ইষ্টক সংগ্রহ করিয়াছি। তাহা ঢাকা সাহিত্য পরিষদে প্রেরণ করিয়াছি। সম্ভবতঃ এই স্থান খনন করিলে আরও অনেক প্রাচীন কীর্তি সংগৃহীত হইতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্বে স্থানীয় জমিদার এই স্থান হইতে অনেক ইট নিজবাড়ীতে লইয়া যান। এ ঘটনার পরেই তাহার বিষয় পীড়া উপস্থিত হয়। প্রবাদ তিনি স্বপ্নে আদিষ্ট হন যে ঐ স্থানের ইষ্টক নেওয়াতেই দেবতার কোপে তাহার পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। তৎপর তিনি সেই সমস্ত ইষ্টক পূর্বস্থানে রাখিয়া আসেন। এই প্রবাদ সত্য কি না তাহা বলিতে পারি না।

বাটীর অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র পুকুরিণী আছে। লোকের বিশ্বাস উহা অন্দরবাটীর পুকুরিণী।

এই ভগ্ন বাড়ীটির অবস্থান দেখিলে মনে হয় যে, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য কোনও রাজা কর্তৃক এই নিহৃত প্রদেশে এই বাটী নির্মিত হইয়াছিল। জনপ্রবাদ অনুসারে এই স্থানে যশোবন্ত

পাল নামে কোনও হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন। ধামরাই নগরীর সুপ্রসিদ্ধ মাধব বিগ্রহ তাঁহারই গৃহ দেবতা ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বলা যাইতেছে।

ধামরাই গ্রাম ঢাকা নগরী হইতে প্রায় বিশ মাইল উত্তরে বংশী নামক একটা ক্ষুদ্র নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। এই নদীর পূর্বপার হইতে ভাওয়ালের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। ধামরাইকে গ্রাম না বলিয়া নগর বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হয়, কারণ অনেক সহর হইতেও ইহার লোক সংখ্যা অধিক। এই নগরে অসুসন্ধেয় অনেক জিনিষ আছে—কিন্তু যশোমাধব বিগ্রহই সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। মূর্তিটি দারুণ, নিম্নকাঠে নির্মিত। প্রতি বৎসর রথযাত্রা, পুনর্ষাট্রা, মাঘীপূর্ণিমা, উখানৈকাদশী প্রভৃতি পর্কোপলক্ষে ঢাকা জেলার প্রায় সমস্ত স্থান হইতে ধামরাইতে বহুলোকের সমাগম হয়। পুনর্ষাট্রা উপলক্ষে এখানে এক বৃহৎ মেলা হয়, এবং তদুপলক্ষে প্রতিবৎসর প্রায় ৪০।৫০ সহস্র লোকের সমাগম হয়। রথযাত্রার দিন মাধবকে বৃহৎ কাঠময় রথে আরোহণ করা হয়। গুণ্ডিচা বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং পুনর্ষাট্রার দিন আবার গুণ্ডিচা বাড়ী হইতে রথারোহণে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করান হয়। মাধবের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনের জন্ত অনেক কাল্পনিক গল্প রচিত হইয়াছে—এতৎসঙ্গে প্রদত্ত মাধবের বিবরণ পাঠে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইবে। এই সমস্ত গল্পের স্থূল তাৎপর্য এই যে পুরীতে জগন্নাথদেবের মূর্তি নির্মিত হইলে যে কাঠ অবশিষ্ট থাকে, তাহা দিয়া বিশ্বকর্মা মাধবমূর্তি নির্মাণ করেন। প্রথমে মাধব পুরীতে ছিলেন, পরে কালাপাহাড়ের দৌরাত্যের সময় পালাইয়া আসিয়া ধামরাইএর নিকটে মাধবচালা নামক স্থানে ভূগর্ভে লুক্কায়িত থাকেন। এই সময়ে রাজা যশোবন্ত পাল বা যশঃপাল রাজা ঢাকার উত্তর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। একদা তিনি শিকারোপলক্ষে মাধবচালার উপর দিয়া যাইতেছিলেন (অবশ্য তখন মাধবচালা জঙ্গলময় ছিল)। কিন্তু হঠাৎ এক টেকের সম্মুখে

আসিয়া হস্তী ধমকিয়া দাড়াইল। মাহত শত আঘাত করিয়াও হস্তীকে এক পদ অগ্রসর করাইতে পারিল না। হস্তী বারম্বার শুভু দিয়া মূর্তিকা গ্রহণ করিয়া কপালে স্পর্শ করাইতে লাগিল। হস্তীর অদ্ভুত ব্যবহারে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া রাজা ঐ স্থান ধনন করাইতে আদেশ দিলেন। ধনন করিলে পর ঐ স্থান হইতে এক মন্দির বাহির হইয়া পড়িল। রাজা দেখিলেন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। শত চেষ্টা করিয়াও দ্বার খুলিতে পারিলেন না। অবশেষে মন্দিরের সম্মুখে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবসে স্বপ্নে আদেশে হইল—“তুই যদি আমাকে এস্থান হইতে লইয়া বাস, তবে তোর পার্শ্বব সম্পদ কিছুই থাকিবে না। ধন, জন, রাজ্য, বংশ সবই বিনষ্ট হইবে।” রাজা বলিলেন, “আমি পার্শ্বব সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা নহি, পারলৌকিক সম্পদই আমার অধিকতর বাঞ্ছনীয়। তখন রাজার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া মাধব সে স্থান হইতে আপনাকে উত্তোলন করিবার আদেশ দেন। তখন রাজা মাধব বিগ্রহ নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠা করেন।

কিছুকাল পরে রাজা ধন জন সহ সবংশে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার বিশালপুরী ধ্বংস হইতে লাগিল। মাধবের সেবক পুরোহিত বংশ মাত্র মাধবের পূজার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রহিল। কিন্তু মাধব রাজা যশোবন্ত পালের অচলা ভক্তিতে প্রীত হইয়া ইহলোকে তাহার নাম চিরস্থায়ী করিবার জন্ত যশঃপালের আরাধ্য মাধব বা যশোমাধব উপাধি গ্রহণ করিলেন।

যাহা হউক মাধবকে শূন্য পুরীতে আর বেশী দিন অবস্থান করিতে হইল না। ধামরাইর পার্শ্ববর্তী পঞ্চাশ নামক পল্লীতে রামজীবন রায় মৌলিক নামক এক জন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া মাধবকে উঠাইয়া নিজে নিজগৃহে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তদবধি মাধব যশোমাধব নামে ধামরাইতে বাস করিতেছেন।

এই গেল মাধবের প্রচলিত বিবরণ। অস্বস্ত

বীরেশ্বর ভৌমিক নামক আমাদের অঞ্চলের এক জন ভদ্রলোক মাধবের প্রাচীন কথা সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া একখানা ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। তাহাতে তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত কথা বিবৃত হইল। তাঁহার মতে মাধব বঙ্গ বা বিহারের পালবংশের কোনও বিশিষ্ট শাখার গৃহবিগ্রহ ছিল। মুসলমানগণ কর্তৃক পালরাজ্য বিনষ্ট হইলে এই বংশের কোনও রাজকুমার পলায়ন করতঃ গৃহ দেবতা মাধবসহ ভাওয়ালের জঙ্গলে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া রাজ্য করিতে থাকেন। পরে যশোবন্ত পালের সময় তাঁহার বংশ নির্বংশ হইয়া যায়। মাধব সেই জঙ্গলে বহু দিন অজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। পরে স্থানীয় জৈনক জমিদার গোবিন্দপ্রসাদ রায় জঙ্গল মধ্যে সেই মূর্তি প্রাপ্ত হইয়া শিমুলিয়া গ্রামস্থ জৈনক ব্রাহ্মণকে উহা দান করেন। সেই ব্রাহ্মণ পরকোপলকে মাধবকে নিকটস্থ বংগী নদীতে নদান করাইতেন—সেই উক্ত স্থানের নাম হইয়াছে তীর্থবাটা। পরে সেই ব্রাহ্মণ নিজ জামাতা রামজীবন মৌলিককে ষোড়শরূপ উক্ত মূর্তি দান করেন। তদবধি উক্ত মূর্তি মৌলিক বংশেই প্রতিষ্ঠিত আছে। মৌলিক মহাশয়দের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে ১০৭৯ বঙ্গাব্দে (খ্রীঃ ১৬৭০) মাধব মূর্তি তাঁহাদের হস্তগত হয়।†

এই দুইটি বিবরণের প্রথমটিতে মূর্তি অপেক্ষা ভক্তিরসাত্মক অলৌকিকত্বের, এবং দ্বিতীয়টিতে ঐতিহাসিক কাব্য রসের প্রভাব লক্ষিত হইবে। যাহাই হউক, মাধব-মূর্তি যে অত্যন্ত পুরাতন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন যে, মাধব-মূর্তি কেশব, নারায়ণ প্রভৃতি পুরাণোক্ত চতুর্বিংশতি বিষ্ণুমূর্তির তৃতীয় মূর্তি। মাধব মূর্তিও এক প্রকার বিষ্ণুমূর্তি। পুরাণোক্ত বিষ্ণু মূর্তির অঙ্গসংস্থানের সহিত

মাধবের অঙ্গসংস্থান মিলাইয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

যশোমাধবের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকটা অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। এক বার শুনিয়াছিলাম মাধবের পাদদেশস্থ এক খণ্ড প্রস্তরে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে খ্রীঃখ্রী ৮ যশোমাধব নাম উৎকীর্ণ আছে—কিন্তু সামাজিক রীতি-বশতঃ নিজে মন্দিরে যাইতে না পারিয়া অল্প লোক দিয়া এসম্বন্ধে অনুসন্ধান করাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে কোন উৎকীর্ণ লিপির সন্ধান পাই নাই। রায়মৌলিক মহাশয়গণ ইচ্ছা করিলে হয়তঃ মাধবের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু তাহারা যে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া মাধবের মাহাত্ম্য-সূচক পন্নটির সৌন্দর্য্য নষ্ট করিবেন এমনতরো বোধ হয় না।

মাধবরূপী বিষ্ণুমূর্তির পূজা একসময়ে ঢাকার উত্তরাংশে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। আমি অনুসন্ধান করিয়া লোকমুখে আরও ছয়খানা মাধব মূর্তির সন্ধান পাইয়াছি। জয়দেবপুরের জমিদারগণের কোনও পূর্বপুরুষ পুষ্করিণী ধনন কালে এক মাধব-মূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তাহার নাম “নীলমাধব”। উহা এক্ষণে জয়দেবপুরের রাজবাটিতে গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। জয়দেবপুরের নিকটবর্তী সাফাসর নামক গ্রামে মূর্তিকা ধনন কালে এক প্রস্তরময় মাধব পাওয়া গিয়াছিল। উহার নাম হরিমাধব কি জটামাধব এইরূপ কিছু একটা হইবে। জৈনক ধর্ম্মাঙ্ক মোল্লা উহার নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছে। এইরূপে ভাওয়ালের নানা স্থানে মাণিকমাধব, জটামাধব, বেলীমাধব ইত্যাদি ছয়খানা মাধবমূর্তি আছে বলিয়া অনেক অভিজ্ঞ বুদ্ধের মুখে শুনিয়াছি। মাধবের উপ-নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে জনপ্রবাদ একেবারে নিরুত্তর।

যশোমাধবের প্রকৃত ইতিহাস এখনও অনেকটা অনুমানের জিনিষ। মাধবের প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিতে হইলে প্রথমতঃ যশঃপাল রাজার ঐতিহাসিকত্ব আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। পূর্ব অবচ্ছেদে (Para-

† এই প্রদত্ত অলটি অবধান বোধ্য। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের দ্রষ্টব্য থাকিতে পারে যে ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে বাদশাহ আউরঙ্গজেব বিষ্ণুদের উপর জিজিয়া কর হারপন করেন।

graph) দেখান গিয়াছে যে, মাধবরূপী বিষ্ণুপূজা এক সময় ঢাকার উত্তরাঞ্চলে বেশ প্রচলিত ছিল। কিন্তু যশোবন্ত পালের সহিত ইতিহাস বিখ্যাত পালবংশীয় রাজগণের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহাই এক্ষণে প্রধানতঃ বিবেচ্য। এই প্রসঙ্গে ঢাকার উত্তরাঞ্চলের আর একটি ধ্বংসাবশেষের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে। বাঁহারা কখনও সাভার গমন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাভারের উত্তরাংশে নদী-তীরে লাল-মাটির এক উচ্চ প্রাচীর দেখিয়া থাকিবেন। সাধারণ লোকে উহাকে হরিশচন্দ্র বা হবচন্দ্র রাজার ‘কোটবাড়ী’ বলিয়া থাকে। এই হরিশচন্দ্র রাজাও পালবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত। হরিশচন্দ্র রাজার ভগ্নবাটীর বিবরণ নিম্নের ব্যক্তিগত পর্য্যবেক্ষণ হইতে দেওয়া যাইতেছে।

‘কোটবাড়ী’ চতুষ্কোণ মণ্ডায় প্রাচীর বেষ্টিত ভূমিখণ্ড মাত্র। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অল্পমান ৮০০×৫০০ হাত। প্রাচীর জমি হইতে ৮।১০ হাত উচ্চ এবং ৫।৬ হাত চওড়া। মধ্যস্থলে কতকগুলি তালগাছ ব্যতীত কিছুই নাই। এই মৃত্তিকাময় প্রাচীর দ্বারা রাজার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইত বলা দুষ্কর।

সাভার গ্রামের উত্তর ও পূর্ব দিক পূর্বে জঙ্গলময় ছিল। এই জঙ্গলে হরিশচন্দ্র পালের বাটীর ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। আজকাল জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে আবাসযোগ্য হইতেছে। লোকের বিশ্বাস এই জঙ্গল মধ্যে সর্বশুদ্ধ সাড়েবারগুণ বা পঞ্চাশটি দীঘি আছে। ‘কোটবাড়ী’ হইতে পূর্বদিকে গেলে অনেকগুলি দীঘি দৃষ্ট হয় :—

১। সছু পলোয়ানের দীঘি।

২। গজারিয়ার দীঘি।

৩। নিরামিষ দীঘি—প্রবাদ হরিশচন্দ্র রাজার বৃদ্ধা মাতা অত্যন্ত নির্ভাচারী ও নিরামিষাঙ্গী ছিলেন। যে পুকুরের জলে মাছ আছে সে জল অশুদ্ধ ও অপেয় মনে করিয়া শুদ্ধ জলের জন্য নিরামিষ দীঘি খনন করান। সাধারণের বিশ্বাস—এখনও এ পুকুরে মাছ

জন্মে না। দীঘিটি বেশ বড়, কিন্তু এখন প্রায় ভরিয়া আসিয়াছে।

৪। কোদাল ধোয়া দীঘি বা কোদালিয়ার দীঘি।

‘কোদাল ধোয়া’ নামধের দীঘিগুলি সম্বন্ধে সাধারণ প্রচলিত কিম্বদন্তী সর্বত্র সুপরিজাত এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

এতদ্ব্যতীত—বনপুকুর, মরাপুকুর, সাতপুকুরিয়া, ইত্যাদি অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ দীঘি আছে।

এই সমস্ত পুকুরগুলি অতিক্রম করিয়া গেলে সমতল জমির উপর একটি কৃত্রিম লালমাটির ঢিপি দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানীয় লোকে উহাকে বুরুজ বলে। সাধারণতঃ সৈন্যদিগকে লক্ষ্যবেধ শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেরূপ ঢিপি নির্মিত হয় ইহাও সেই ধরনের। তবে নানাবিধ বস্তুরক্ষা জন্মিয়া উহার পার্শ্বদেশ ছারারোহ করিয়া তুলিয়াছে। এই বুরুজের উপর একটি লুপ্ত কূপ আছে। উহার মুখ ইষ্টকে বাঁধান।

উক্ত ঢিপি হইতে আরও কিছু পূর্বে অগ্রসর হইলে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটি প্রশস্ত রাস্তা দেখা যায়। রাস্তাটি মৃত্তিকা হইতে ২।৩ হাত উচ্চ এবং ৭।৮ হাত চওড়া। আত্মোপাস্ত ঘোর লালমাটিতে তৈয়ারী, সুরক্ষিত বোধ হয় এত লাল হয় না। এই রাস্তাটি উত্তরে কতদূর গিয়াছে জানি না। কতিপয় বৎসর পূর্বে এখানে ঘোর জঙ্গল ছিল। ক্রমে ক্রমে জঙ্গল পরিষ্কৃত হওয়ার কয়েক বৎসর হইল এই অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অপরাংশ এখনও জঙ্গলে আবৃত।

এই রাস্তা দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রায় এক মাইল আগিলে একটি ক্ষুদ্র পল্লীপাওয়া যায়। পল্লীর নামটি অবধান যোগ্য—নাম ‘রাজাসন’। রাস্তার পূর্বদিক দিয়া ধারে ধারে একটি ক্ষুদ্র সরিৎ চলিয়া গিয়াছে স্থানীয় লোকে উহাকে সুখা নদী বলে। ‘রাজাসন’ পল্লীতে রাস্তাটি এক সমকোণে আবর্তন করিয়া ঠিক পশ্চিমদিকে সাভার অভিমুখে কতদূর চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার কিছু

দক্ষিণে একটি বৃহৎ দীঘি আছে নাম সাগরদীঘি। দীঘিটিতে বাটের চিহ্নাদি কিছুই লক্ষিত হয় না।

এই দীঘির পশ্চিম তীরে অনেকটা জায়গা ব্যাপিয়া এক প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ। এই স্থানেই রাজার প্রাসাদ ছিল। আজকাল বস্ত্র আগাছা জন্মিয়া ইষ্টকস্তূপকে অত্যন্ত ছুরারোহ করিয়া ফেলিয়াছে। খনিত না হইলে এখানে কি আছে বলা দুষ্কর।

প্রাচীন লোকদের মুখে শুনিয়াছি যে, প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে রাজবাটীর কতকাংশ দণ্ডায়মান ছিল এবং ইষ্টক স্তূপ আরও বহুদূর ব্যাপী ছিল। পরে সাতার গ্রামস্থ কতকগুলি লোক জঙ্গল মধ্যে লুকায়িত ভগ্নবাটীর সন্ধান পাইয়া ইষ্টক স্তূপ খুঁড়িয়া বহু ধনরত্ন আত্মসাৎ করে। সাতারের অনেক ধনীগৃহে এখনও ঐ বাটিতে প্রাপ্ত মুদ্রাদি আছে। পরে ইষ্টকাদি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহার অধিকাংশই স্থানীয় মুসলমানগণ সাগরদীঘি ও সুখানদী দিয়া ঢাকাতে চালান দিয়াছে। এখন মৃত্তিকা মধ্যে লুকায়িত দ্রব্যাদি ব্যতীত ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্বই অবশিষ্ট আছে।

সুখানদীর পরগারে রাজবাটীর আরও কতকগুলি চিহ্ন আছে। সমরাস্তাব বশতঃ সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই। গতবৎসর স্থানীয় কয়েকজন কৃষক মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে অনেকগুলি পুতুল ও ইষ্টক প্রাপ্ত হয়। সে গুলির কি গতি হইয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই।

এতদ্ব্যতীত ভাওয়াল অঞ্চলে আরও অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। নিজে দেখি নাই বলিয়া এসম্বন্ধে কোন বিবরণ দিতে পারিলাম না—কেবল নাম উল্লেখ মাত্র করিলাম—

(১) হাট সুলবেড়িয়ার উত্তরে কালিদাসের বাটি ও দীঘি (ময়মনসিংহ জেলায়)।—এই কালিদাস কে স্পষ্ট জানা যায় না। অমুমান ইনি প্রসিদ্ধ ইশাখার পিতা ‘কালিদাস গজদানী’ হইবেন।

(২) রাজেন্দ্রপুরের চাঁতাল রাজার বাটি

(আমি ইতিহাসের অল্পরোধে স্থানীয় প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিতেছি—আশা করি ইহাতে আতিবিশেষ মনে করিয়া কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন না।)

—এই ‘রাজার’ সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে—কতকটা স্মৃৎ-উপস্মৃৎ উপাখ্যানের মত। প্রবাদ আছে—ইহারা দুই ভ্রাতা একত্র রাজ্য করিতেন। নীচ বংশের মনে করিয়া ব্রাহ্মণাদি কেহই তাঁহাদের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিতেন না। ইহাতে তাঁহারা একদিন ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে জোর করিয়া স্পৃষ্ট জল পান করাইতে প্রতিজ্ঞা করিল। তখন ব্রাহ্মণগণ এক কৌশল উদ্ভাবন করিল। তাঁহারা বলিলেন আপনাদের স্পৃষ্ট জল পান করিতে আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু আমরা প্রথমে যাহার হাতের জল পান করিব, তাঁহার বংশেই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তখন দুই ভ্রাতাই প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে জল দান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বিবাদ আরম্ভ করিল। এবং পরস্পর বিবাদ করিয়া নিহত হইল। ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইলেন।

ভাওয়ালের প্রাচীন ইতিহাস ও ধ্বংসাদি সম্বন্ধে বাক্য জানিতে পারিলাম, তাহা পূর্ববর্তী কয় পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিলাম।

এই সমস্ত প্রবাদ ও ধ্বংসাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এই কয়েকটি অমুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

(১) বঙ্গের বা মগধের পালরাজ্য বিনষ্ট হইলে পালবংশের কোনও রাজকুমার ভাওয়ালের জঙ্গলে পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ কর্তৃক বরইবাড়ী ও সাতারের প্রাসাদগুলি নির্মিত হয়। সম্ভবতঃ মাধবরূপী বিষ্ণুমূর্তি তাঁহাদেরই উপাস্ত ছিল। সাতার ধামরাই প্রভৃতি প্রাচীন গল্পীগুলি তাঁহাদেরই নির্মিত। এখনও স্থানীয় প্রাচীন লোকগণ সাতারকে সন্তার নগরী ও ধামরাইকে ধর্ম্মরূপ বা ধর্ম্মরূপ বলিয়া জানেন।

(২) এই পালবংশীয় রাজগণ পাঠানদের অধি-

কারের সময় ভাওয়ালের জঙ্গলে নির্দিষ্টবাদে আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। ভাওয়ালে তখনও হিন্দুদের বসতি হয় নাই। আদিম অধিবাসীগণ, এবং কোচ, বংশী প্রভৃতি নবগত অসভ্যগণই তাঁহাদের প্রজাতি ছিল।

(৩) সম্ভবতঃ পাঠানাদিকারের অবসানে, যোগল-রাজত্বের প্রারম্ভে পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ (বার) ভূঁইয়া জৈনা বাঁ কর্তৃক এই সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হয়। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন যে, যোগল রাজত্বের প্রারম্ভে জৈনা বাঁ পূর্ববঙ্গে জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে আবাস নির্মাণ করিয়া স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। পরে মানসিংহ কর্তৃক পরাস্ত হইয়া দিল্লীতে গমন করেন। সম্রাট আকবর তাঁহাকে পূর্ববঙ্গে বহু স্থান জায়গীর স্বরূপ দান করেন। প্রত্যাগমন কালে জৈনা বাঁ গাজীকে আপনার সঙ্গে আনয়ন করতঃ আপন সুবিস্তৃত জায়গীর হইতে তাহাদিগকে জায়গীর দান করেন। এই সমস্ত গাজীদের নামানুসারেই ভাওয়ালের সমীপস্থ সমস্ত পরগণার নামকরণ হইয়াছে—এইরূপে তালেপ গাজী হইতে তালেপাবাদ, কাশিম গাজী হইতে কাশিমপুর, চাঁদগাজী হইতে চাঁদপ্রতাপ (আধুনিক নাম রোয়াইল), এবং সুলতান গাজী হইতে সুলতানপুর, পরগণার নামকরণ হইয়াছে। ভাওয়াল পরগণা এক কালে বাঁর ভূঁয়ার অত্যন্তম হৃদ্যন্ত ফজল গাজীর অধিকৃত ছিল। পরে কোনও কারণে ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে ভাওয়াল তাঁহার বংশধরগণের হস্তচ্যুত হইয়া জয়দেবপুরের জমিদারগণের হস্তগত হইয়াছে।

(৪) বংশীবন্ত পালের রাজ্য নির্দিষ্ট হইলে তাঁহার পুরোহিতগণ সম্ভবতঃ বহু দিন ভগ্ন বাটীতে যশোমাধব সহ বাস করিতে থাকে। পরে বাদসাহ আউরঙ্গজেবের সময় হিন্দুদেবমূর্তির উপর অত্যাচার আরম্ভ হইলে

বোধ হয় মাধবের সেবাইতগণ ধামরাইর তদানীন্তন ভানুকদার রামজীবন রায়ের আবাসে মাধবকে লুকাইয়া রাখেন।

(৫) যশোমাধব রায়মৌলিকদের হস্তগত হইলে তাঁহারা তাঁহার মাহাত্ম্যবর্দ্ধনের জন্ত ধামরাই গ্রাম, রথ ও মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। পরে নানা কাল্পনিক উপাখ্যান দ্বারা মাধবকে জগন্নাথদেবের সহ যুক্ত করান হইয়াছে।

এই স্থলে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করা গেল। অতঃপর এদিকে ঢাকা সাহিত্যপরিষদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে নিজের সামান্ত উত্তম সার্থক মনে করিব।

শ্রীমেঘনাদ সাহা।

মধুকর *

মধুকর ফুলের মধু পান করিয়া জীবন ধারণ করে। মধুকর কত প্রকার আছে অজ্ঞাপি তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই। এ পর্য্যন্ত পাঁচ প্রকার মধুকর দেখিতে পাইয়াছি। ইহাদের প্রকৃতি, বাসা নির্মাণ, চালচলন একরূপ হইলেও কঠিনের সামান্ত পার্থক্য লক্ষিত হয়।

(১) এক শ্রেণীর মধুকর পাচ নীলের আভাযুক্ত কাল রঙের। টুনটুনি পাখীর চেয়ে একটু বড়। চক্ষু দুটি পাচ ক্রকবর্ণ। চারি পাশে ফিকে কাল রঙের একখানি পাতলা বেটনী আছে। পা দুটি কাল এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম। মধুকরের ঠোঁট তাহাদের দেহের তুলনায় অত্যধিক লম্বা—এক ইঞ্চিরও বেশী। ঠোঁটের অগ্রভাগ দ্বি-বাঁকানো। লেজ ষাট, ডানা দুটি অত্যন্ত হালকা, কিন্তু বেশ মজবুত। ইহারা ফুলের উপর বসিয়া লম্বা ঠোঁট ফুলের ভিতর প্রবেশ করাইয়া মধু চুষিয়া লয়।

+ ৩ রাজকুমার যশোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত প্রথমশিকা বাঙ্গালার ইতিহাসে তাঁহার বার ভূঁইয়ার তালিকার ভূয়ালের ফজলগাজীর নাম করিয়াছেন। ইংরেজীর পাঠান্তরে তিনি Bhowal কে ভূয়াল করিয়াছেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

ইহারা গুণ গুণ করিয়া গান করে। ছেলেরা ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গান গায়।

“বিন্ বিন্ বিন্ বীণা বাজায়।

দেখুতে দাঁড়কাকের মত মধু চুষে খায়।”

দাঁড়কাকের কৃষ্ণ বর্ণের উপরেও ইহাদের দেহে নীলাভার চাকচিক্য অনেক বেশী প্রকাশিত। চীনা-করবী, দলকমল, প্রভৃতি ফুলে এই শ্রেণীর মধুকর মধু পান করিয়া থাকে। শিমূল ফুলের মধুও ইহাদের প্রিয়। ইহারা মধু পান করিয়া ডালে ডালে নৃত্যগীত করিয়া বেড়ায়।

বাসা নির্মাণ সম্বন্ধে পাঁচ শ্রেণীর মধুকরেরই প্রায় একরূপ রীতি দেখা যায়। পরিত্যক্ত ঘরের কানাচে অথবা জঙ্গলে অত্যন্ত নিরালায় মধুকর বাসা নির্মাণ করে। তুলা, শণ, পাট, লোম, কলার আঁশ প্রভৃতি ইহাদের বাসা নির্মাণের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহারা বাসা ঝুলাইয়া রাখে। বাসাগুলি অতি কোমল এবং অভ্যন্তর ভাগ যথাসম্ভব মৃদু হয়। কখন কখন ইহারা গাছের পাতা পরস্পর সংযোজিত করিয়া তাহার ভিতরে বাসা করিয়া লয়। সেই বাসায়ও ইহারা বিলাসিতার উপকরণরূপে তুলা ইত্যাদি বিছাইতে ক্রটি করে না। ফাঙ্কন হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত মধুকর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, অতঃপর ইহাদিগকে প্রায় দেখা যায় না।

এই জাতীয় মধুকরের ডিম আকাশের মত নীল বর্ণের। খেলিবার ছোট মার্কেলের মত বড় হয়। ইহারা এককালে ৩৪টি ডিম পাড়ে। অনধিক তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত তা দিলে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। ডিমের অভ্যন্তর ভাগ নীলের আভাযুক্ত ঈষৎ শাদা। প্রথমাবস্থার ছানাগুলি ইঁদুর ছানার মতই বড় হয় এবং মাথা ও উদর ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটি পা ও দুখানি ডানার চিহ্ন মাত্র দৃষ্ট হয়। তখন ইহাদের গায়ের উপর অতি পাতলা হরিদ্রাভ পালথ বর্তমান থাকে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অবয়ব পরিপুষ্ট হয় এবং পালথের বর্ণ পরিবর্তিত হইতে থাকে।

মধুকর দ্রুত উড়িয়া পলাইতে সক্ষম। একটু ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেই ইহারা যুদ্ধ মধ্যে স্থান ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হয়। ইহাদের ডিমে তা দিতে একটি পাখীকে অহর্নিশ ডিমের উপর থাকিতে হয় না। ডিমগুলির উপর এভাবে তুলা, পালথ ইত্যাদি সাধান থাকে যে, পাখী চলিয়া গেলে ঐগুলি চতুর্দিক হইতে ডিমের উচ্চতা রক্ষার সাহায্য করিতে তত্পরি ঝুলিয়া পড়ে। একত্র মাদী মধুকর আপন আহাৰ্য্য সংগ্রহের জন্ত সময় সময় ছুটি লইতে সক্ষম হয়।

(২) এই শ্রেণীর মধুকরের দৈহিক গড়ন এবং বর্ণ প্রথম শ্রেণীর মধুকরের মতই বটে; কিন্তু বৃকের মাঝামাঝি হইতে লেজের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত নিম্নদেশ যেটে সাদা রঙ্গের। অন্তান্ত বিষয়ে কোনও পার্থক্য নাই।

(৩) ইহাদের বর্ণ লবাক্ষ্মের মত গাঢ় লাল, সর্কাদ ময়ূরী প্রমাণ কৃষ্ণচিহ্ন যুক্ত। চক্ষুরের চতুর্দিক পীতভ বেঙীতে আবৃত। পদব্র মটে রঙ্গের। ঠোঁট সকল শ্রেণীর মধুকরেরই এক প্রকার। ইহারা রক্তজবা, বকফুল, রক্তকাঞ্চন প্রভৃতির মধু পান করে। বাসা নির্মাণ প্রণালী প্রথম শ্রেণীর মধুকরের অনুরূপ। ইহাদের ডিম দেখি নাই। শাবকগুলির প্রথমাবস্থায় পালক হরিত্রার আভাযুক্ত সাদা হয়।

(৪) ইহারা প্রায় তৃতীয় শ্রেণীর মধুকরেরই মত। ইহাদের গলদেশ ময়ূরের গলদেশের বর্ণের পালথ আবৃত। ছই ডানাতেই গাঢ় সবুজ বর্ণের ছইখানি পালথ আছে।

(৫) ইহাদের দৈহিক গঠন উপরি লিখিত মধুকর চতুর্দয় অপেক্ষা ঈষৎ বড়। লেজের মধ্যভাগে ছই তিনটি পালক একটু লম্বা। বৃকের অর্ধেক পর্য্যন্ত ও উপরের সমুদয় অংশ রক্তবর্ণ। পেটের পালথ পরিষ্কার সাদা। ডানার ছই ধারে গাঢ় সবুজ ছইটি পালথ আছে। এই শ্রেণীর মধুকর তারাকাঞ্চন, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলের মধু পান করে। ডিমগুলি নীলাভ ও তাহাতে কাল ডোরা আছে। বাসা নির্মাণ প্রণালী একরূপ।

ফুলের মধুকোষ হইতে মধু আহরণের অন্তই এই
সকল ক্ষুদ্রকার পক্ষীর ঠোঁট বেশী লম্বা এবং অগ্রভাগ
বাঁকান ।

প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণীর মধুকর দুই ভিনটিকে একত্র
বিচরণ করিতে দেখা যায়; কিন্তু অগ্রভাগ মধুকর প্রায়শঃই
একাকী মধু পান করে এবং মিঠে গলায় মিহি সুরে গান
করিয়া থাকে; ইহারাও শিব্দিয়া গান করে ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।

কল্পনা *

সজনী লো ! গভীর নিশায়
আয় আজ একবার আয় !

লুকান মনের ছ'টি কথা
গোপন বৃকের আকুলতা—

চুপে চুপে ক'ব ছ'জনায় !
সজনী লো ! একবার আয় !

নীরব নিখর চরাচর
এই ত পরম অবসর !

ভারা-নাথ ভারারাজি সনে
জাগে সুখে গগন-ভবনে—

মধু বায়ু বহে মৃদুতর !
এই ত পরম অবসর !

আয় সখি, এক বার আয়
মিলাইবি হিয়ায় হিয়ায় ।

কেটে গেছে সারা দিনমান
হেরি নাই ও বিধু বয়ান—

সারা প্রাণ আজি তোরে চায় !
আয় সখি, এক বার আয় !

ভুলাইলি নিখিল ভুবন
তুই মোর সাধনার ধন !

তোর পাশে কি ছার সংসার
যেথা শুধু হুঃখ হাহাকার !

পলে পলে মরম-মহন !
তুই মোর সাধনার ধন

তোরে করি দোসর আমার
এ মরুভূ হ'য়ে যাব পার !

তুই মোরে দেখাইবি পথ
আলোময় শোভন মহৎ ;

মায়া-ঘেরা ছায়া-সুকুমার !
তোর সনে হব মরু পার !

ফুল ফুটে পুনঃ করে যায়
এ জীবন তেমতি যে হয় !

ছ' দিনের হাসি খেলা গান
ছ' দিনেতে হয় অবসান—

সাধ আশা ধলায় লুটায় !
এ জীবন ছ' দিনের হয় !

ভুলে শুধু ভরা চারি ধার
কে পারে বুঝিতে মন কার !

অকারণ যশ-অপযশ
করে সবে আকুল বিবশ—

কোথা শেষ মরীচি লীলার
কে পারে বুঝিতে মন কার !

আজ মোরে দেবতার যত
পূজা করে কেহ অবিরত !

কোন জন গরবে ঘণায়
দূর হতে দূরে সরে যায়—

আমি হাসি নীরবে সত্যত !
ছ' জনায় ভুল একমত ।

* এই কবিতাটি লেখকের অপ্রকাশিত কাব্য "প্রেমলোক"
হইতে গৃহীত ।

আঠশষ ছদরের রাণী

আমি সখি, তোরে শুধু জানি !

তুই ঘোরে শিখালি যে গান

জগতে তা' দিহু আজি দান—

ওনাইহু স্বপনের বাণী !

আমি সখি, তোরে শুধু জানি !

খেলা ঘোর কুরাবে যখন

স্বতি রূপে দিবি দরশন !

আমার গানের সুরে সুরে

আমি রব এ মরত-পুরে—

তুই র'বি সবাতে গোপন !

স্বতি রূপে দিবি দরশন !

সবাকার সব ভুল হায়,

ঘুচাইয়ে দিস্ ইসারায় !

নব ভাবে জগৎ তখন

ঘোরে ঘেন করে আলিঙ্গন

বসি' লয়ে সকল হিয়ার !

ঘুচাইয়ে দিস্ ভুল হায় !

আদরিণি, কি কহিব আর

সফল মিলন দৌহাকার !

জনমে জনমে ঘেন তোরে

এই মত লভি ভুল-ভোরে—

তুই যে আশিষ দেবতার !

সফল মিলন দৌহাকার !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

দ্বিজ মুকুন্দ ও তদীয় গ্রন্থচতুষ্টয়

জগন্নাথমাহাত্ম্য ও ব্রহ্মপুরাণ ।*

এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় দুইখানি জগন্নাথ মাহাত্ম্য ও দুইখানি ব্রহ্মপুরাণ। চারিখানি গ্রন্থই বাক্যলাপ্তে লিখিত এবং উহাদের বিষয় এক ; অর্থাৎ, প্রজাপতি ব্রহ্মার উপদেশে মহারাজ ইন্দ্রহ্য কর্তৃক পুরীধামে জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা এবং জগন্নাথ-মাহাত্ম্য বর্ণন। চারিখানি গ্রন্থই দ্বিজ মুকুন্দ বিরচিত। দ্বিজ মুকুন্দের বাড়ী কোথায় এবং গ্রন্থগুলি কোন সময়ে রচিত হইয়াছে, গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তদীয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৪৫৮ পৃষ্ঠায় দ্বিজ মুকুন্দ কৃত ইন্দ্রহ্যর উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের নাম ও শ্লোক সমষ্টির দিকে দৃষ্টি করিলে, ইহা যে আলোচ্য গ্রন্থগুলি হইতে ভিন্ন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। আলোচ্য গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। জগন্নাথ মাহাত্ম্য—দ্বিজ মুকুন্দ বিরচিত। অমূলিকার গয়ানাথ শর্মা, সাং গোবিন্দপুর, পরগণা জাফরসাহি, সরকার বোড়াঘাট। সপ্তদশ অধ্যায়ে, তুলট কাগজের ৪৮ ½ পত্র বা ২৭ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। শ্লোক সংখ্যা ১০৬২। অমূলিকার সময় ১২৫৮ সন।

২। জগন্নাথ মাহাত্ম্য—দ্বিজ মুকুন্দ বিরচিত। তুলট কাগজের ২২ পত্র বা ৪৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। শেষ কয়েক পঙ্ক্তি না পাওয়াতে অমূলিকারের নাম ও অমূলিকার সন তারিখ পাওয়া গেল না।

৩। ব্রহ্মপুরাণ—দ্বিজ মুকুন্দ বিরচিত। পাঁচালীকার সুবুদ্ধি দাস। অমূলিকার সময়—১২২০ সন। তুলট কাগজের ২১ পত্র বা ৪২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

৪। ব্রহ্মপুঞ্জাণা—বিজয়মুকুন্দ বিরচিত। তুলট কাগজের ২০ পাত্রে বা ৪০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। শেষ করেক পঙ্ক্তি না পাওয়াতে অস্থলিপির সন তারিখ জানা গেল না।

প্রথম গ্রন্থখানি (জগন্নাথ মাহাত্ম্য) সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব, এবং অপর তিন খানি সম্বন্ধে বাহা বক্তব্য, প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া যাইব।

ঐক্যেপ্রত্যাগত যুবক বৃদ্ধ বন্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবানের কাঠ মূর্তি কেন? পরিহাস-রসিক বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, “ভগবান্, জীপুল ও নিজের হৃদয়া চিন্তা করিতে করিতে কাঠ মূর্তি হইয়াছেন।”

“একা ভাৰ্য্যা প্রকৃতি-মুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুলোহিপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্থধো হুর্নিবারঃ;
শেষঃ শয্যা, বসতি জলধৌ, বাহনং পন্নগারিঃ,
স্মারং স্মারং স্বগৃহ-চরিতং দারুভূতো মুরারিঃ।”

এই কাঠমূর্তি জগন্নাথ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। ভক্তেরা জগন্নাথের মূর্তি যত স্নন্দরই দেখুন না কেন, কিন্তু লোকে বলে “বিষকর্ম্মার কারিগরি জগন্নাথেই প্রকাশ।” বস্তুতঃ দেবশিল্পীর রচিত কাঠমূর্তি নিতান্তই কৌতুকাবহ।

গ্রন্থের প্রথমেই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে কিছুই ছিল না; জল, স্থল, অগ্নি, বায়ু, কিছুই ছিল না; এই ত্রিভুবন, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ছিল না। একদা নারায়ণের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল; তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সৃষ্টি করিলেন। ইহাদের কার্য্যও নির্দিষ্ট হইল—ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবেন, বিষ্ণু পালন করিবেন এবং শিব সংহার করিবেন।

“জল স্থল না ছিল কিছু আনল পবন।
সর্গ মস্ত পাতাল না ছিল ত্রিভুবন।
প্রথমে ত্রিজিলাব্রহ্মা বিষ্ণু গঞ্চানন।
সৃষ্টাইতে তিন দেব করিলা সৃজন।
ব্রহ্মারে সৃজয়ে বিষ্ণু পালয়ে সংসার।
এলয়ের হেতু হর করয়ে সংহার ॥”

এই তিন দেবতাকে নমস্কার করিয়া বিজয় মুকুন্দ মূল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। সংস্কৃত পুরাণের প্রারম্ভেই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে; পুরাণের ইহা একটি লক্ষণ; বিজয় মুকুন্দ বাঙ্গালার পুরাণ লিখিতে বাইয়া সংস্কৃত পুরাণের রীতি অনুসরণে বিফল প্রয়াস পাইয়াছেন। সংস্কৃত পুরাণে জল, স্থল, উদ্ভিদ ও প্রাণিবর্গের উৎপত্তি ক্রমানুসারে বর্ণিত হইয়া থাকে, কিন্তু বিজয় মুকুন্দের পুথিতে তাহার কিছুই দেখা যায় না। এই পুথিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তির পরেই হঠাৎ উড়িয়াভূমে স্বর্ধ্যবংশীয় নৃপতি ইন্দ্রদ্ব্যয়ের আবির্ভাব।

সংস্কৃত পুরাণে দেখা যায় ইন্দ্রদ্ব্যয় অবন্তি দেশের (মালবের) রাজা ছিলেন, তিনি সদল বলে উড়িয়ায় আগমন পূর্বক পুরী অধিকার করেন এবং এখানেই রাজত্ব করেন; কিন্তু বিজয় মুকুন্দের গ্রন্থে অবন্তিদেশের উল্লেখ মাত্র নাই। মহারাজ ইন্দ্রদ্ব্যয় এক চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তি স্থাপনের জন্য এক স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করিলেন এবং এই মূর্তি পাইবার জন্য ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া সন্ধ্যা করিতে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্তে রাজার ৬০ হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল। ব্রহ্মা ফিরিয়া আসিলে রাজা পুনরায় তাঁহার অতিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ব্রহ্মা রাজাকে স্বীয় রাজ্যের অবস্থা অবগত হইয়া পুনরায় আসিতে বলিলেন। রাজা স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন তাঁহার রাজ্যের কোন চিহ্ন নাই—রাজপুরী নাই, জী নাই, পুত্র নাই, রাজপরিবারের কেহই নাই, সব অরণ্যময়। রাজা দেখিয়া অবাচ্। এসব কি হইল? কোথায় গেল? ৬০ হাজার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে তথাপি রাজার শরীরে বার্দ্ধক্য-লক্ষণ উপস্থিত হয় নাই। কবির কল্পনা-মাহাত্ম্যে ভৌতিক শরীর স্বীয় ধর্ম্ম বিশ্বত হইয়াছে। রাজা ক্রমে অক্ষয় বট, পেচক ও কুর্শের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তিনি দেবতা জানে ইহাদের স্তুতি করিলেন।

অক্ষয় বট—“তরুণের দেখিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন মহামতি।
ভূমিতে পড়িয়া করে অষ্টোক্ত প্রণতি।
ভূমী দেব নারায়ণ দেব সোনাভন।
অনন্ত তোমার নাম জানে ত্রিভুবন।”
ইত্যাদি।

পেচক—“তোমার চরণে মোর অশেষ প্রণতি।
মোর নিবেদন কিছু কর অবগতি।”
ইত্যাদি।

কুর্শ—“অষ্টোক্তে প্রণাম করে কুর্শ দরশনে।
করপুটে স্তুতি করে বিবিধ বিধানে।
ভূমি ব্রহ্মা ভূমি বিষ্ণু ভূমি মহেশ্বর।
পতিত পাবন ভূমি পরম ঈশ্বর।”
ইত্যাদি।

সভ্যতার আদিম অবস্থায় মানবগণ উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর পূজা করিত। আধুনিক সময়েও উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর পূজা নানা দেশে ও নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে বর্তমান থাকিয়া সভ্যতার বিভিন্ন স্তর সূচিত করিতেছে।

রাজা কুর্শের পরামর্শে পুনরায় রাজ্য স্থাপন করিলেন। তিনি মৃত্তিকায় প্রোথিত ধনাগার উদ্ধার করিয়া, অর্থবলে রাজবাটী, সৈন্য সামন্ত, হাতী, ঘোড়া, সব পাইলেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্য হইতে লোক আনাইয়া প্রজা পত্তন করিলেন। তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজ্যে ব্রাহ্মণ থাকিতে পাত্রীর অভাব হইবে কেন? এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অর্থলোভে বর্ষায়ান্ বরে স্বীয় যুবতী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণের দরিদ্রতা চিরপ্রসিদ্ধ। যথাশাস্ত্র বিবাহ সম্পন্ন হইল। বিবাহ দেখিতে বহু লোকের সমাগম হইল; স্বয়ং ব্রহ্মাও আসিলেন। এ সমুদয় বিবরণ পাঠ করিলে আমাদের ঠাকুরমার রূপকথা মনে পড়ে!

রাজা ও রাণী এক বজ্র আরম্ভ করিলেন; বজ্রের নাম ব্রহ্মবজ্র। কিন্তু সংস্কৃত পুরাণে ও লোকপ্রবাদে বজ্রটির নাম অশ্বমেধ। ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া বর দিতে চাহিলেন। রাজা বর চাহিলেন, “এক মূর্ত্তি দেহ মোরে বৃক্ষ কলেবর।” ব্রহ্মা বলিলেন, “ভূমি দারুভ্রক্ষ পাইবে।”

তিনি আরও বলিলেন—“ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে জয়া নামক ব্যাধের বাণে আহত হইয়া যোগমগ্ন হইবেন এবং সেই যোগাগ্নিতে তদীয় দেহ ও আশ্রয়তরু নিম্নবৃক্ষ দক্ষীভূত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের পঞ্জরাস্থি সহ দক্ষ নিমগ্নাঙ্কটি সমুদ্রে পতিত হইবে এবং উহা ভাসিতে ভাসিতে উড়িষ্ঠা-তটে আসিবে। এই নিম্ন গাছে জগন্নাথ মূর্ত্তি নির্মাণ করিবে।”

কবি যোগাগ্নিতে শ্রীকৃষ্ণের কলেবর ও নিম্ন গাছ উভয়ই দক্ষ করাইয়াছেন। তিনি কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পক্ষে বহু উর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইয়া এ কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, ভৌতিক মানব-দেহ ও পার্থিব বৃক্ষ, অপার্থিব আধ্যাত্মিক পদার্থ যোগাগ্নি দ্বারা দক্ষ হইবার নয়।

সমাজে দুই দলের লোক আছে। এক দল তार्কিক আর এক দল ভক্ত। তार्কিকেরা কথায় কথায় প্রমাণ চাহেন; ভক্তেরা আগ্রবাক্যেই সন্তুষ্ট; তাঁহারা প্রকল্পাদ ব্যক্তির বাক্যে কিছু মাত্র সন্দেহ করেন না। পুরীতে জগন্নাথ মূর্ত্তি স্থাপন ও তাহার পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে এই দুই দলের মত আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি—অকল্প ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় এবং আমি নিজের ব্যক্তিগত মতও প্রকাশ করিতেছি না।

তार्কিকেরা বলেন দ্বারকা ও পুরীর ভৌগোলিক অবস্থান ও ভারতবর্ষের প্রাক্তবর্তী সামুদ্রিক স্রোতের বিষয় চিন্তা করিলে বোধ হয় যে, নিম্নবৃক্ষটি এজিন যুক্ত না হইলে, কিম্বা ঐ বৃক্ষস্থিত শ্রীকৃষ্ণাস্থিপঞ্জরের অতিমাত্রাধিক বা দৈবশক্তি না থাকিলে, উহা প্রভাস হইতে পুরীতে আসিতে পারে না। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে, এক্ষণ ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটয়াছিল। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, নিম্ন গাছটির পুরীতে আসিতে বহু শত বা বহু সহস্র বৎসর লাগিলেও এবং জলবায়ুর অবিরাম স্রোত ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেলেও, দক্ষ বৃক্ষটি প্রায় অবিকৃত অবস্থাতেই ছিল। তাঁহারা বলেন, যে ভগবানের ইচ্ছায়

ব্রহ্মাও সৃষ্ট হইতে পারে, তাঁহার ইচ্ছায় কি একটা গাছ অবিকৃত থাকিতে পারে না। নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু বহু পাশ্চাত্য ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ বলেন যে, খ্রীষ্টকের অষ্টপঞ্চম একটা কথার কথা মাত্র। উহা প্রকৃত নহে; উহা বৌদ্ধ ভূপে রক্ষিত বুদ্ধের অস্থি, দন্ত ও কেশাদির অমুকরণ মাত্র। তাঁহারা আরও বলেন যে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিলুপ্ত হইতে থাকিলে খ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান হয়। এই অভ্যুত্থানে হিন্দুগণ বৌদ্ধ ধর্মটিকে স্বীয় ধর্মের সহিত বধা সম্ভব সমন্বয় করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধ-দেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকৃত করিয়া লইলেন; বৌদ্ধ ত্রিমূর্তি স্থলে—বুদ্ধ, ধর্ম (১) ও সত্যের স্থলে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম মূর্তি কল্পিত হইল; জগন্নাথের প্রসাদ গ্রহণে বৌদ্ধধর্মভাব, জাতিভেদরাহিত্য, হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়া পুরীতে প্রচলিত হইল। সাধারণতঃ হিন্দু দেবমন্দির সকল দক্ষিণদ্বারী হইলেও বৌদ্ধ মঠের অমুকরণে জগন্নাথের মন্দির পূর্বদ্বারী করিয়া নির্মিত হইল, ইত্যাদি।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণের শেথোক্ত মতটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, হিন্দু শাস্ত্রে একটি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বচন আছে—পূজক প্রাজুধ বা উদজুধ হইয়া পূজায় বসিবেন; ইহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, প্রতিমা পশ্চিম বা দক্ষিণমুখী হইবে, অর্থাৎ দেবমন্দিরের পশ্চিম বা দক্ষিণদ্বারী হওয়া আবশ্যক—

অজ্রায়্যাং বোধষেদেবীং মূল্যায়াক প্রবেশয়েৎ।

পূর্বোক্তরস্তাং সংপূজ্য শ্রবণায়্যাং বিসর্জয়েৎ ॥”

বৃহন্নিকেশ্বরপুরাণ।

দেবীপুরাণেও এই মতের সমর্থক বচন আছে।

পুরাণে আরও একটি শ্লোক আছে, তাহার মর্ম এই যে, সাধকের প্রয়োজনানুসারে দেবমূর্তিকে যে মুখী ইচ্ছা সে মুখী করা যাইতে পারে। এই ঢাকা সহরেই

দেবমন্দিরগুলির দ্বার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত দেখা যায়।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অপর মতগুলি সম্বন্ধে আমি তত্ত্ব-মার্গাবলম্বী বৈষ্ণবদিগকে এবং জ্ঞানমার্গাবলম্বী বৈত ও অবৈতবাদীদিগকে তর্ক বুঝে আশ্বাস করিয়া মহা-প্রসাদ ও তৎসম্পর্কীয় জাতি বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

দ্বিজ মুকুন্দ বিরচিত ব্রহ্মপুরাণের প্রারম্ভে পাঁচালী-রচক সুবুদ্ধি দাস জগন্নাথ দর্শন ও মহাপ্রসাদ ভক্ತের ফল বর্ণন করিয়াছেন। সংস্কৃত ব্রহ্মপুরাণ নারদ-পুরাণাদিতে জগন্নাথের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইলেও ঐ সকল গ্রন্থে মহাপ্রসাদের উল্লেখ মাত্র নাই। ব্রহ্মপুরাণের অন্তর্গত উৎকলখণ্ডে মহাপ্রসাদ ভক্তের ফল বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু অনেকে বলেন উহা নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ এবং উহা খ্রীষ্টচৈতন্তের পুরীতে গমনের পরে রচিত হইয়া ব্রহ্মপুরাণের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্রের সভাপণ্ডিত বিখ্যাত নৈয়ায়িক সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য প্রথমে মহাপ্রসাদে অনাস্থাবান ছিলেন। তিনি মহা-প্রসাদ ভক্ত করিতেন না; পরে খ্রীষ্টচৈতন্তের শিষ্য গ্রহণ করিয়া উহা ভক্ত করেন। যাহার স্বতির শাসনে বর্তমান বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ চলিতেছে সেই সার্ক রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখমাত্র করেন নাই। শাস্ত্র অপেক্ষা বৈষ্ণবগণই মহাপ্রসাদে অধিক-তর আদর দেখাইয়া থাকেন। জনসাধারণের বিশ্বাস জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্যই খ্রীষ্টক্রে জাতিবিচার রহিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের অমুকূলে ছই একখানা আধুনিক বৈষ্ণব গ্রন্থ ব্যতীত কোন বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখা যায় না। খ্রীগৌরাক্ষের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে অনেক পরিমাণে জাতিবিচার পরিত্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও স্থানবিশেষের জ্ঞান নির্দিষ্ট হয় নাই। বৈষ্ণব-দিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীমদ্রাবণেও জাতিবিচারের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এ অবস্থায় খ্রীষ্টক্রে জাতিবিচার রহিত হইল কেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। তদ্বশান্ত্রে

ইহার একটা কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তত্ত্বে আছে—
 “প্রাপ্তে তু বিমলা-ক্ষেত্রে সর্বে বর্ণা বিশোত্তমাঃ।”
 অর্থাৎ; বিমলাক্ষেত্রে গমন করিলে সকল বর্ণই জাতি-
 শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া থাকে। সকলেই যেখানে
 ব্রাহ্মণ সেখানে জাতিবিচারের স্থান কোথায়? হিন্দু-
 যাত্রাই অবগত আছেন যে, ত্রীক্ষেত্রই বিমলা-ক্ষেত্র।
 বিষ্ণু চক্রে বিচ্ছিন্ন সতীদেহ হইতে নাভি-পদ্ম এখানেই
 নিপতিত হইয়াছিল, এজন্য ইহা একান্ত পীঠের অন্ততম
 পীঠ স্থান। স্মরণ্য তত্ত্বোক্ত বচন মানিতে হইলে
 ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব
 নিবন্ধন ত্রীক্ষেত্রে জাতি বিচার রহিত হয় নাই, উহা
 বিমলা-ক্ষেত্র বলিয়া জগন্নাথ দেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব
 হইতেই সেখানে জাতিবর্ণের বিচার বিলুপ্ত হইয়াছিল।
 আজিও দেখা যায় জগন্নাথের প্রসাদ যখন মন্দির
 হইতে বাহির করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ আনা হয়, তখন
 উহা বিমলা দেবীর মন্দির প্রাক্কন দিয়া আনীত হইয়া
 থাকে; এ পথ ব্যতীত অন্য পথে মহাপ্রসাদ বাহিরে
 পাঠাইবার কাহারও অধিকার নাই। এরূপ জাতি-বর্ণ-
 নির্কিশেষে প্রসাদ গ্রহণ যদি বিমলা-ক্ষেত্রের প্রভাবে
 না হইত, তবে ভোগমন্দিরে যে পথ দিয়া অন্ন বাজানাদি
 আনীত হইয়া থাকে, উৎসর্গের পরও ঐ সহজ পথেই
 অনায়াসেই উহা বাজারে প্রেরিত হইতে পারিত; কিন্তু
 তাহা না হইয়া বক্র পথে বিমলা মন্দিরের সম্মুখ দিয়া
 যখন মহাপ্রসাদ বাজারে নেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে,
 তখন জাতিবিচাররাহিত্য যে বিমলা-ক্ষেত্রেরই প্রভাবে
 পরিচায়ক তাহাতে বোধ হয় সন্দেহ করা যাইতে
 পারে না।

এই পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিমলা এবং
 ভৈরব স্বয়ং জগন্নাথদেব। পুরাণ পাঠে জানা যায়
 যে, পুরীর অদূরবর্তী ভুবনেশ্বরই এই পীঠস্থানের
 অধিষ্ঠাত্রী বিমলা দেবীর ভৈরব ছিলেন। প্রবাদ এই
 যে, কলির প্রারম্ভে যখন ভগবান্ বিষ্ণু জগন্নাথ রূপে
 আবির্ভূত হন, তখন তিনি এই পীঠস্থানের আশ্রয়

ভৈরব হইবার জন্য বর লাভ করিয়াছেন। সেই সময়
 হইতে এই পীঠস্থানে বিমলা ভৈরবী এবং জগন্নাথ
 ভৈরব রূপে বিরাজ করিতেছেন। পূর্বে বৌদ্ধ ও
 হিন্দুধর্মের সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে। এখানেও
 আবার বিমলা ভৈরবী ও জগন্নাথ ভৈরব রূপে বর্ত-
 মান থাকিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের সম্বন্ধ সূচিত
 করিতেছেন।

ভারপর মহামন্দির নির্মাণের কথা। বর্তমান
 আলোচ্য গ্রন্থ চতুর্থে লিখিত আছে যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন
 এই মন্দির নির্মাণ করিয়া ইহাতে দারুভ্রম্মমূর্তি—জগন্নাথ,
 সূভদ্রা, বলরাম মূর্তি—স্থাপন করেন। প্রচলিত লোক-
 প্রবাদে ও পাণ্ডাদের মুখে ইহাই সমর্থিত হয়।

কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন
 অবন্তি দেশের (মালবের) রাজা ছিলেন। পরে তিনি
 দল বল লইয়া উৎকলে উপস্থিত হন ও তথায় রাজ্য
 স্থাপন করেন। দেবর্ষি নারদও তাঁহার সঙ্গে আসিয়া-
 ছিলেন। যে মহাবেদীর উপর এখন দারুভ্রম্মমূর্তি স্থাপিত
 হইয়াছে, উহার উপরে বসিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ
 সমাপন করিয়াছিলেন। উৎকল বা ওড়্র অতি প্রাচীন
 রাজ্য; ইহার নাম রামায়ণের কিকিদ্ধা কাণ্ডে ও
 মহাভারতে দ্রোণ পর্বে দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রদ্যুম্নও অতি প্রাচীন
 রাজা; ইহার নাম রামায়ণ বা মহাভারতে পাওয়া না
 গেলেও, ইনি যে প্রাচীন রাজা তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।
 অনেকে অনুমান করেন যে, ইনি ঐতিহাসিক যুগে
 বুদ্ধধর্মের অধঃপতনের সময় প্রাচুর্য হইয়াছিলেন। এ
 মত বুদ্ধিসহ কি না বিচার্য। ইনি যে জগন্নাথের মন্দির
 প্রথমে নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতেও বোধ হয় কাহারও
 সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্তমান মহামন্দির ইন্দ্রদ্যুম্ন নির্মিত
 মন্দির কি না তৎসম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে। মহা-
 বেদীর পশ্চাতে যে প্লোকটি আছে তাহা হইতে স্পষ্টই
 বুঝা যায় যে, এই মন্দির রাজা অনঙ্গ ভীম কর্তৃক ১১১১
 শকে নির্মিত হইয়াছিল।

“শকানে রত্ন ত্রাণে রূপ নক্স নারকে ।

প্রাণাৎ কররাশানকতীমেন ধীমতা ॥”

(রত্ন = ২ ; ত্রাণে = ১ ; রূপ = ১ ; নক্স নারক = ১)

রাজা ইন্দ্রহার বীর কত্তা সত্যবতীকে দারুণভূক্তি জগন্নাথের সহিত বিবাহিত করিলেন। মহাশয়গোহে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইল; দেবতার বিবাহ দেখিতে আসিলেন। বর্তমান সময়ে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু দেব-মন্দিরে দেবদাসীগণ বর্তমান থাকিয়া দেবমন্দিরের পবিত্রতা ও পবিত্র ধর্ম তাব অনেক পরিমাণে হ্রাস করিতেছে। আমাদের বোধ হয় এই দেবদাসীগণ একটি চিরগত প্রথার তৃতীয় সংস্করণ। ইহার এক সংস্করণ অমর্য্য দেখিতে পাই বৌদ্ধ সম্বাসিতা বৌদ্ধ সম্বাসিনী বুদ্ধ-পত্নী গোপাতে; এবং অপর সংস্করণ দেখিতে পাই জগন্নাথের সহিত বিবাহিতা ইন্দ্রহার-কত্তা সত্যবতীতে। দাক্ষিণাত্যের দেবদাসী প্রথা এখন কুৎসিত আচারে পরিণত হইয়াছে। আশা করি এই প্রথার চতুর্থ সংস্করণ আবারিগকে দেখিতে হইবে না।

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার ৭ম ভাগে অর্থাৎ ১৩০৭ সনের ষষ্ঠে বিখ্যাত সাহিত্যাচার্য্য প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ষি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিজয় মুকুন্দ রচিত “জগন্নাথ বিজয়” সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, “জগন্নাথ বিজয়” ব্যতীত বিজয় মুকুন্দের অপর কোন গ্রন্থ তিনি প্রাপ্ত হন নাই। তিনি এই গ্রন্থ বরদমনসিংহ জিলাস্থ টাঙ্গাইল মহকুমা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি অস্বস্তান করেন যে, বিজয় মুকুন্দ টাঙ্গাইল মহকুমার অধিবাসী। তিনি এই গ্রন্থ হইতে “আছিল”, “খুইয়া”, “অখন” প্রভৃতি ১৫টি পদ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, যেহেতু এই পদগুলি টাঙ্গাইল মহকুমা ব্যতীত অন্তর সমগ্রিক প্রচলিত নহে, অতএব বিজয় মুকুন্দ টাঙ্গাইলের অধিবাসী। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমি বিজয় মুকুন্দের চারিখানি গ্রন্থ তিন জিলা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি—হুইখানি ত্রিপুরা জিলা, একখানি কোক্সবাজার জিলা এবং অপরখানি বরদমনসিংহ জিলা

হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং গ্রন্থের প্রাপ্তি স্থান নির্ণয় করা কঠিন। তারপর বসু মহাশয় যে ১৫টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের ১০টি ই বিক্রমপুরে সমগ্রিক প্রচলিত। বর্তমান প্রবন্ধ লেখক বিক্রমপুরবাসী সুতরাং এ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে বসু মহাশয় তাহার উপর নির্ভর করিতে পারেন। ১৯০৬ বৎসর পূর্বে নবাবশেখর রাজকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বীর কাব্যে “আছিল ও খুইয়া” পদের প্রয়োগ করিয়াছেন; যথা—

সে দোব খুইয়া হুই আনাইল তিন পুই

জাহ্নবী বলিয়া তোর নামে ।”

বিজ্ঞা নামে তার কত্তা আছিল পরম যত্ন

রূপে লক্ষী গুণে সরস্বতী।

(জগন্নাথবিজয়)।

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বীর কাব্যে “আছিল” পদের ব্যবহার করিয়াছেন; যথা—

“কুসুমদান সজ্জিত, দীপাবলী তেজে

উজ্জলিত নাট্যশালা সম যে আছিল

এ বোর সুন্দরী পুরী !”

(মেঘনাদবধ-কাব্য—১ম সর্গ)

ভারতচন্দ্র ও মাইকেল দত্ত টাঙ্গাইল বা বিক্রমপুরের লোক নহেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও বসু মহাশয়ের যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। তিনি কৃত্তিবাসের ভাবার সহিত জগন্নাথ বিজয়ের ভাষা তুলনা করিয়া বিজয় মুকুন্দকে অধিকতর পূর্ববর্তী কালের লোক বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন এবং বিজয় মুকুন্দের গ্রন্থতীর্থ কাল ১৩০৩ খৃষ্টাব্দ বলিতেছেন।

উক্ত বসু মহাশয় “জগন্নাথ বিজয়ের” সমালোচনার বলিতেছেন যে, কৃত্তিবাসের ভাষা বিজয় মুকুন্দের ভাষা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মার্জিত। কিন্তু আমি নোয়াখালী জিলা হইতে কৃত্তিবাসী রায়শেখর যে উত্তরাকাড প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার ভাষা মার্জিত নহে; ইহা গড়িয়া কৃত্তিবাসকে অতি প্রাচীন কবি বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে কৃতিবাসী রামায়ণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার ভাষা মার্জিত সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার মনে হয় অমূল্যিকারগণের হস্তে পড়িয়া ইহার ভাষা ক্রমশঃ মার্জিত হইয়া আসিয়া থাকিবে। আমার হাতে যে কৃতিবাসী রামায়ণ আছে তাহার পাঠে উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত কৃতিবাসী রামায়ণের পাঠে অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত রামায়ণ

পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষণ সত্তর।

কালপুরুষেরে নিল রামের গোচর ॥

পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া রাম দিলেন আসন।

বোড় হস্তে জিজ্ঞাসেন কহ প্রয়োজন ॥ ইত্যাদি

অং সংগ্রহীত রামায়ণ

এতেক যুনিয়া লক্ষণ চলিল সত্তর।

সকল কহিল গিয়া শ্রীরাম গোচর ॥

সত্তরে বাইল রাম সে বার্তা পাইয়া।

কালপুরুষ বরিলেক পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া ॥

মধুর বচনে রাম জিজ্ঞাসে কখন।

কি কারণে তোমার এখানে রামগমন ॥ ইত্যাদি

ইহার কোনটি খাঁটি কৃতিবাসী রামায়ণ নির্ণয় করা কঠিন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও তদীয় “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” বলিয়াছেন যে, খাঁটি কৃতিবাসী রামায়ণ হ্রস্বত। সুতরাং বর্তমান কৃতিবাসী রামায়ণের ভাষা দ্বারা কৃতিবাসের প্রাচুর্য্য কাল নির্ণয় করা কঠিন এবং ইনি বিজয়কুম্ভের পূর্ববর্তী কি পরবর্তী তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। ৬ প্রকল্পচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কৃতিবাসের জন্ম শক ১২৫৭; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে কৃতিবাস ১৩০৫ শকের লোক; শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কৃতিবাসের জন্ম শক ১৩৬২। আমার বোধ হয় কৃতিবাস বিজয়কুম্ভ অপেক্ষা প্রাচীন কবি।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষাদর্শ

(১)

ভারতে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত তাহা আমাদের রাজপুরুষদিগের নিকট এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়ছে। কেবল পাশ্চাত্য আদর্শের অমূল্যবর্তন দ্বারা ইহার সমাধান হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। পাশ্চাত্য আদর্শের সহিত প্রাচ্য আদর্শকে সংযুক্ত করিতে পারিলেই ইহার প্রকৃত সমাধান সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। প্রাচ্য শিক্ষাদর্শটি যে উপেক্ষার বিষয় নহে পরন্তু পাশ্চাত্য উন্নত বৈজ্ঞানিক আদর্শের পার্শ্বেই স্থান পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য আমাদের আলোচনা দ্বারা তাহাই পরিষ্কৃত হইবে বলিয়া আমার ভরসা করি।

ভারত চিরকালই সর্বিশেষ ধর্মপ্রাণ। ভারতের সমস্ত বিষয় ধর্মেরই সহিত বিশেষরূপে অমুখ্যাত। সুতরাং ভারতে শিক্ষার মূল আশ্রয় ধর্মকেই প্রথম দেখিতে পাই। ভারতের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। এই বেদের সাধারণ এক নাম “ব্রহ্ম” যথা “বেদন্তব্যং তপোব্রহ্ম”—অমরকোষ। এই বেদাধ্যয়ন ও বেদাচরণে শিক্ষার প্রকৃত আরম্ভ হইত বলিয়াই শিক্ষার্থীর নাম “ব্রহ্মচারী” হইয়াছে।

শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে থাকিয়া তাহার নিকটে বাস করিতে হইত বলিয়াই তাহার এক নাম “অন্তেবাসী” এবং গুরুর সম্পূর্ণ অমুগত হইয়া তাহাকে চলিতে হইত বলিয়া তাহার অপর এক নাম “শিষ্য”।

শিক্ষার্থী গুরু গৃহে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন, বেদাচরণ করিত এই জন্ত শিক্ষাজীবন “ব্রহ্মচর্য্য” ও “গুরু কুলে বাস” বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

গুরু গৃহে বাস করিলেও শিষ্যের শিক্ষা গৃহে হইত না, অনাবৃত স্থানে, মুক্ত বায়ুতেই তাহার শিক্ষা হইত। সাধারণ প্রাতঃ মেঘ গর্জন, বৃষ্টি, বজ্রপাত প্রভৃতিতে অধ্যয়নের যে সাধারণ নিবেদন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতেই ইহার একটি সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যাইতে

পারে। গৃহাদিতে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে পুরোঁস্ত সামান্য প্রাকৃতিক অনুবিধায় তাহার ব্যাঘাত হওয়ার কোন কারণ বর্তিত না।

হস্তী, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বস্ত্র জন্ত গুরু ও শিশুর মধ্যদিয়া চলিয়া গেলে যে অনধ্যায় শাস্ত্রে বিধি বদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে অরণ্য মধ্যেই যে শিক্ষার স্থান ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। এখানে আমরা একটি অনধ্যায় বিধান শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

“পক্ষগণ্ডসারসসিংহব্যাঘ্রমহাপাপি কৃতয়াদাবক্ষম-
ধ্যায়ঃ ॥”

ইতি নির্ণয় সিদ্ধান্ত স্বত্বার্থসারঃ।

মুনি-ঋষিগণ ধর্ম্মে, জ্ঞানে, চরিত্রে সকলের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন বলিয়া তাঁহারা সকলের গুরুরূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইঁহারা অরণ্যবাসী ছিলেন, অরণ্যেই তাঁহারা শিক্ষা দান করিতেন। বৃহস্পতি যেমন আর্য্যদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ তেমনই তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তদীয় অনন্যসাধারণ গুরু নামেই তাহার অলঙ্ক নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে। বৃহস্পতির বিদ্যালয়ের বর্ণনায় আমরা অরণ্যেরই দৃশ্য দেখিতে পাই, যথা—

“কনকশিলোচ্চর বিবরজ তরুকুসুমাসঙ্গি মধুকরানুরূতে।
বহবিহগ-কলহ সুর-সুবতি-গীত মন্ত্রস্বনোপবনে।১
সুরনিলয়শিখরিশিখরে বৃহস্পতির্নারদায় যানাহ ॥২

বৃহৎসংহিতা, ২৪শ অধ্যায়।

সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গভাত বৃক্ষগণের পুষ্পোপরি আসক্ত বটপদ পংক্তির গুঞ্জন শব্দে নানাবিধ বিহগকুলের কলনাদে এবং সুর-সুবতিগণের মুহু গভীর গীত-স্বরে পরিপূর্ণ পর্ব্বত-চূড়াস্থিত সুরনিলয় উপবনে বৃহস্পতি নারদকে যে রোহিণী যুগ বলিয়াছিলেন।”

বজ্রবাসীর অনুবাদ।

উপনিষদ্ আরণ্যক প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ বিশেষ ভাবে অরণ্যে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যেই প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। উপনিষদ্ শব্দের এক অর্থ নির্জন,

আরণ্যক শব্দের অর্থ অরণ্যে রচিত, সুতরাং ইহাদের নাম হইতেই আমরা অরণ্যে শিক্ষার প্রমাণ পাইতেছি।

ঋষিগণ যেমন বাচনিক উপদেশ দ্বারা শিক্ষা প্রদান করিতেন তেমনই গ্রন্থ পাঠের দ্বারাও শিক্ষা প্রদান করিতেন। বেদ সকল যে আদিতে শুনিয়াই শিক্ষা হইত বেদবাচক ঋতি শব্দই তাহার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদের বিভিন্ন অংশ সকলের নাম প্রপাঠক। ইহা হইতে ইহাকে শিশুর নিকট পঠিত হইত তাহাই আমরা বুঝিতে পারি।

পাণিনি ব্যাকরণে “তেন প্রোক্তং অধীয়তে” এই হ্রস্বের প্রসঙ্গে আমরা বেদ শাস্ত্রের বহু উপদেষ্টার নাম প্রাপ্ত হই। ইহাদের মধ্যে কাণ্ডপ, বরভট্ট, বৈশম্পায়ন, শৌনক, কঠ প্রভৃতি নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহারা বক্তৃতা দ্বারা শাস্ত্রোপদেশে বিশিষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন বলিয়াই শাস্ত্রবক্তা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন।

বেদোপদেষ্টা শিক্ষকগণ প্রধানতঃ আচার্য্য নামেই অভিহিত হইতেন। বৃহস্পতি ও গুরু এই দুই বৈদিক ঋষি অশেষ জ্ঞানের দ্বারা আচার্য্য পদবীক একরূপই গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন যে, “আচার্য্য” শব্দ তাঁহাদের নামের সঙ্গে চির সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাতেই বৃহস্পতি “সুরাচার্য্য” এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য নামে পরিচিত রহিয়াছেন।

উপরি উক্ত আচার্য্য, বক্তা, প্রপাঠক প্রভৃতি শিক্ষক-দিগকে আমরা পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের (Professor, Lecturer, Readers প্রভৃতিরই) অনুরূপ বলিয়া মনে করিতে পারি।

অপর এক প্রকারের অধ্যাপক আমরা ঋষিদিগের মধ্যে দেখিতে পাই যঁহাদিগের নাম ছিল “কুলপতি।” এই কুলপতির শিষ্য সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তিনি সকল শিষ্যের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ভার বহন করিতেন। কুলপতি পদটি একরূপই বহল প্রচলিত হইয়াছিল যে, ইহা একটি পারিভাষিক শব্দে পরিণত হইয়া-

ছিল। তাহাতেই কুলপতির এইরূপ পত্রিকার আশ্রয়
দেখিতে পাই—

“দুর্নীনাৎ দশ সাহস্রং যোহরদানাদি পোষমাৎ ।

অধ্যাপন্যতি বিপ্রবিরসৌ কুলপতিঃ স্বতঃ ॥”

কুল, গুরুকুল বা শিক্ষা-স্থানকেই বুঝাইয়া থাকে বলিয়া
“কুলপতি” শব্দের অর্থ কুল বা শিক্ষাস্থানের পতি অর্থাৎ
অধ্যাপকই হয়। ইহা পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের Principal
বা অধ্যাপকেরই অনুরূপ বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু
পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১২টি ব্যতীত কোন বিদ্যালয়ে
দশ হাজার ছাত্রের অধ্যাপনা হওয়ার ব্যবস্থা আছে
বলিয়া আমরা জানি না। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ
বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব অজহরের ছাত্র সংখ্যাও ইহার অপেক্ষা
কমই হইবে না। সুতরাং কুলপতি পরিচালিত বিদ্যালয়
যে কিরূপ প্রকাণ্ড ছিল তাহা আমরা ইহা হইতেই
অনুমান করিতে পারি।

বশিষ্ঠকে আমরা কালিদাসের রঘুবংশে কুলপতি
নামে অভিহিত দেখি। বশিষ্ঠ স্বর্ঘ্যবংশের কুলগুরু
ছিলেন। স্বর্ঘ্যবংশীর রাজাদিগের পৃষ্ঠপোষকতায়ই বোধ
হয় তাঁহার প্রকাণ্ড বিদ্যালয়ের ব্যয় ভার নির্বাহিত
হইত। এক জনের পক্ষে দশ হাজার ছাত্রের অধ্যাপনা
অসম্ভব। সুতরাং বশিষ্ঠের অধীন শিক্ষকবর্গ দ্বারা
অধ্যাপনা কার্য সম্পাদিত হইত ইহাই সম্ভবপর বলিয়া
বোধ হয়। বশিষ্ঠের বিদ্যালয় যে বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্তায়
বিজ্ঞান-বিশেষ তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

মহর্ষি ছর্গাসাও একজন “কুলপতি” ছিলেন; তাঁহার
ছাত্র সংখ্যাও দশ হাজার ছিল। অধিকন্তু ইউরোপীয়
অধ্যাপকদিগের ছাত্র লইয়া স্থান ভ্রমণ (Tour) করার
জায় তিনিও ছাত্র লইয়া সময় সময় পর্যটনে বাই-
তেন; তাহাতেই কখন কখন শিশু সূহ তাঁহার অতিথি
হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়।

আমরা “পরিষৎ” নামে যে এক প্রকার বিদ্যালয়ের
উল্লেখ পাই তাহা প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়েরই অনুরূপ।

ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের এক বিংশতিসংখ্যক অধ্যাপক
দ্বারা অধ্যাপনা কার্যের পরিচালনা হইত, যথা—

“একবিংশতিসংখ্যকৈর্ম্মাংসাত্তারপারৈঃ ।

বেদাদ কুশলৈশ্চৈব পরিবৃত্তং প্রকল্পয়েৎ ॥”

ইতি শব্দকল্পদ্রুমমুত প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ ।

প্রদ্যাম্পদ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তদীয় Civilisation
of Indian (ভারতীয় সভ্যতা) নামক গ্রন্থে লিখি-
য়াছেন যে, বেদ ও সাধারণ বিজ্ঞা আয়ত্ত করিবার পর
বিচক্ষণ ও বিখ্যাত ছাত্রগণ উচ্চ শিক্ষার জন্য পরিবর্তে
ভর্তি হইত। *

উত্তর ভারতের তক্ষশিলাতে অতি প্রাচীন কালেই
একটি অতি উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় থাকার বিবরণ বৌদ্ধ
সাহিত্যে পাওয়া যায়। মহর্ষি অত্রি ইহার প্রধানতম
অধ্যাপক ছিলেন। ধর্ম্ম-প্রবর্তক বুদ্ধদেব, বৈয়াকরণ
মহর্ষি পাণিনি ও ভাষ্যকার পতঞ্জলি ইহার ছাত্র ছিলেন।
বহু কাল পর্যন্ত ইহা সমগ্র ভারতেরই সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞা-
স্থানরূপে পরিগণিত ছিল; তাহাতেই নানাদিগদেশ হইতে
ছাত্রের সমাগনের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা এখানে
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের দক্ষিণাপথ ভ্রমণ হইতে
ইহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—“আমরা প্রাচীন
বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ ও পালিভাষার বিরাচিত পুস্তক সমূহ
পাঠে জানিতে পারি প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্বে
ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম ভাগে তক্ষশিলায় একটি
বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত শাস্ত্র-
বেত্তা ঋষিগণ অধ্যাপক ছিলেন। হুঃখের বিষয় সকলের
বিবরণ অবগত হওয়া যায় না, কেবল মহর্ষি অত্রি ও
অজ্ঞাত দুই একটি ঋষির নাম মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

* “They left their parents at an early age, lived
with teachers for years and learnt the Vedas and
Sciences known to the age, and after studying with
such teachers, clever and distinguished boys went
up to *Parishads*, answering to the Universities of
Europe.” Civilisation of India (Temple Primers
Series) P. 21.

কিন্তু বাঁহারা তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া
অপরিখ্যাত হইয়াছিলেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও
বৃত্তান্ত স্থানে স্থানে লিপিবদ্ধ আছে। সংস্কৃত ভাস্কর্য
নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায় জীবকনামা এক জন
চিকিৎসা-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র।
তাঁহার জন্মস্থান মগধ। তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধদেবের
চিকিৎসা করিয়াছিলেন। মহর্ষি আত্রের ইহার অধ্যা-
পক ছিলেন। যে শাক্য মুনি স্বপ্রদর্শিত ধর্ম ও উচ্ছল
আলোকে অগৎ আলোকিত করিয়াছেন তিনিও তক্ষ-
শিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি স্বর্ষ্য প্রচারের
পূর্বে এই স্থানে আগমন পূর্বক দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন
করিয়াছিলেন। গ্রন্থ ২৫২৬ বৎসর পূর্বে ভগবান্
শাক্যসিংহ আবির্ভূত হন। তখন তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যা-
লয়ের পূর্ব অভ্যাস। সর্ব প্রধান বৈয়াকরণ মহর্ষি
পাণিনিও তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি অন্যান্য
২২৭৫ বৎসর পূর্বে গান্ধার প্রদেশের শালতুর গ্রামে
শাক্যপীর ব্রাহ্মণ বংশে গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।
পাণিনি পুষ্কপুত্রে আগমনে পূর্বে তক্ষশিলা বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। আর মহাভাস্কর
পতঞ্জলিও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি জন্মস্থান
ইলাবৃত্তবর্ষ হইতে প্রয়াগে আগমন কালে ঐ
স্থানে কয়েককাল অবস্থান করিয়া বিদ্যা শিক্ষা
করিতেছিলেন।”

ইউরোপে যেমন আমরা বিজ্ঞান সম্মিলনের বহু
সভা সমিতি দেখিতে পাই ভারতেও প্রাচীন কালে ভ্রূপ
সভা সমিতি বর্তমান ছিল। নৈমিষারণ্য বিভাগোচনার
এইরূপ একটি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল। তথায় ব্যাস রচিত
পুরাণ শাস্ত্র সকল প্রচারিত হয়।

আর্য্যকদের উৎপত্তির ইতিহাসেও হিমালয়ে একটি
বিরাট আলোচনা সভা আহুত হওয়ার বিবরণ পাওয়া
যায়। চরক সংহিতায় সেই বিবরণটি এই প্রকারে
প্রকটিত হইয়াছে—

বিরভূতা বদা যোগাঃ প্রাহুত্ভূতাঃ শরীরিণাম্ ।
ভপোপবান্ধায়ন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাহুত্ভাম্ ॥ ৫
তদা ভূতেষু যজ্ঞোৎসাহঃ পুরুষত্যা মহর্ষয়ঃ ।
সম্যেতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পার্থে হিমবতে শুভে ॥ ৬
অগ্নিরা যমদগ্নিচ বশিষ্ঠঃ কাশ্যপোহুতঃ ।
আত্রেরো গৌতমঃ সাম্বাঃ পুলস্ত্যা নারদোহসিতঃ ॥ ৭
অগস্ত্যা বামদেবশ্চ মার্কণ্ডেয়শ্চলানরৌ ।
পারিকির্তিকুরাত্রয়ো ভরদ্বাজঃ কপিঙ্গলঃ ॥ ৮
বিশ্বামিত্রাশ্বরথোচ ভার্গবশ্চাবনোহতিজিৎ ।
গার্গাঃ শাণ্ডিল্য কোভিল্যো বার্কির্দেবলগালবৌ ॥ ৯
সাংকভো বৈজবাশিষ্ঠ কুশিকো বাদরায়ণঃ ।
বড়িশঃ সরলোমাত কাপ্যকাত্যায়নাবুভৌ ॥ ১০
কঙ্কায়নঃ ককশেয়ো ধৌম্যো যারীচিকাশ্রপৌ ।
শর্করাকো হিরণ্যাকো লোকাকঃ শৈবিরেবচ ॥ ১১
ব্রহ্মজ্ঞানন্ত নিধয়োদমন্ত নিরমশ্যচ ।
তপসন্তেজসাদীপ্তা হুয়মানা ইবাময়ঃ ॥ ১২
সুধোপবিষ্টান্তে তত্র পুণ্য্যং চক্ৰুঃ কষামিহাম্ ।
ধর্ম্মার্থকামমোকশাণামারোগ্যং মূলমুত্তম্ ॥ ১৩

শ্রীশ্রীভগবদ্গদ্য চন্দ্রিকা ।

পাহাড়ে মেয়ে

(সঙ্কলিত)

শীত কাল। চারি দিক ভূবারে ঢাকা পড়িয়াছে।
পথ, বাট, মাঠ দালা হইয়া গিয়াছে। পথ চিনিয়া চলি
হুঃসাধ্য।

পাহাড়ে দেশ। লোকের বসতি নাই বলিলেই হয়।
হু একখানা কুটার কেবল মল্ল্য জীবনের পরিচয়
দিত্তেছে।

সেই জনহীন দুর্গম পথে অঝোরোহণে সে কত ঘণ্টাই চলিয়াছে। যে স্থানে রাত্রি কাটাঁইবে স্থির করিয়াছিল সে স্থান এখনো অনেক দূর। শীতের ভীষণ রাত্রি আসিতে আর বিলম্ব নাই, তার উপর এইমাত্র আবার বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, বাতাস উঠিয়াছে। বরফের কণাগুলো তার নাকে মুখে চোখে আঘাত করিতেছে; শ্রান্ত ঘোড়াটা আর চলিতে চাহে না। শীতে তার হাত অবশ হইয়া গিয়াছে, লাগাম ধরিয়া রাখা যায় না। সে কোথায় যাইবে! কি করিবে! আশ্রয় একটু কোথায় মেলে।

ঐ না! ঐ যে ঐ পাহাড়ের মাথায় একখানি কুটীর দেখা যাইতেছে। আঃ কি আনন্দ! মরু-প্রান্তরে জল দেখিয়া বুঝি তুফার্ত পথিকের এত আনন্দ হয় না!

অনেক কষ্টে ঘোড়াটাকে লইয়া সে কুটীরের ধারে উপনীত হইল। কুটীরের আসে পাশে দীর্ঘ তুষারচ্ছাদিত দেবদারু পাছগুলো ঝড়ের বেগে হুইয়া পড়িতেছে। কুটীরের মোটা কাঠের কপাট বন্ধ রহিয়াছে। তাহাতে সে সন্ধ্যারে আঘাত করিল।

এক বৃদ্ধা আসিয়া দ্বার খুলিল। সেই সুন্দরন পথিকের ছরবহা দেখিয়া দয়ার্জচিত্তে কহিল, “আহা! ভদ্রলোক কত কষ্টেই পেরেচে! আশুন, আশুন, প্রবেশ করুন।”

তোমোতাদা অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। কুটীরের পশ্চাতে একটা ছাউনির তলায় অশ্বটিকে বাঁধিয়া কুটীরে প্রবেশ করিল। দেখিল টুকরা বাঁশ ও ট্যাচাড়ির আশুনে এক বৃদ্ধ ও এক নবীনা হাত গরম করিতেছে। তাহারা লম্বনের সহিত তাহাকে আশুনের ধারে আহ্বান করিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আপত্তককে তার প্রমণ বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিতে করিতে আশুনের উপর ‘সাকে’ গরম করিতে লাগিল। আহাৰ্য্যও প্রস্তুত হইতে লাগিল।

তরুণী পর্দার অন্তরালে উঠিয়া গেল; তার পরণে ছিন্ন বলিন বসন। মাথায় চিরুণী পড়ে নাই, আলুলারিত কুন্তল এলোমেলো ভাবে পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু এ সমস্তের মধ্য হইতে তার রূপ উছলিয়া পড়িতেছে। এই জনহীন পার্বত্যপ্রদেশে এ রত্ন কেমন করিয়া আসিল! কেন, তিমিরগর্ভ কদম্ব্য খনিতে কি হীরক থাকে না?

বাহিরে বাতাসে কপাট নড়িতে লাগিল, কুটীর কাঁপাইতে লাগিল। বৃদ্ধ কহিল, “গ্রাম এখান হইতে অনেক দূরে; বাহিরে অবিরাম তুষার পাত হইতেছে। পথ চিনিয়া ত আপনি যাইতে পারিবেন না। আমাদের কুটীর অতি কদম্ব্য, আপনার অশ্ববিধাও অনেক হইবে। কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন ত আজ রাত্রের মত দরিজের কুটীরে থাকিয়া যান। আপনার ঘোড়ার কোনে অবতর হইবে না।”

এ বিনীত অশ্বরোধ তোমোতাদা এড়াইবার চেষ্টা করিল না। বরং তরুণীকে দেখিবার সুবিধা হইল ভাবিয়া মনে মনে বিশেষ আনন্দ লাভ করিল।

এই বার আছার আসিল। সাধারণ রকমের হইলেও পরিমাণে প্রচুর। তরুণী পর্দার অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিল। এবার সে একটি পরিষ্কার পোষাক পরিয়াছে, মুক্ত কেশ আঁচড়াইয়া মন্থণ করিয়াছে। সে বধন নত হইয়া তোমোতাদার ‘সাকে’র পাত্র পূর্ণ করিতেছে তখন সে বুঝিল তার জীবনে এমন অপূর্ব সুন্দরী আর দেখে নাই। তার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গীর মাধুর্য্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা কিন্তু বলিল, “আমাদের মেয়েটি এই পাহাড়ে দেশে একলা মানুষ হয়েচে তাই সে ভদ্রলোককে কি ভাবে পরিচর্যা করিতে হয় তা জানে না। ওর অকমতা দূর্য্য করে মার্কনা করবেন।”

তোমোতাদা সুন্দরীকে দেখিবে, না আহাৰ্য্য করিবে। সে অনিবেশ লোচনে তরুণীর মুখ পানে চাহিয়াছিল। তরুণীর মুখ লজ্জার রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কি করিবে! সে তার মুখের উপর হইতে চোখ সরাইতে পারিতেছিল না। আহাৰ্য্য অস্পৃষ্ট রহিয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধা কহিল, “বহাশ্রম, দয়া করে কিছু পানাহার করুন।

ধাবার বড়ই কদর্য, কিন্তু মহাশয় শীতে বড় কষ্ট পেয়েচেন, আপনার কিছু আহার করা আবশ্যক ।”

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার সন্তোষ সাধনের জন্য তোমোতোদা সাধ্যমত পানাহার করিল। ইতিমধ্যে সেই লজ্জানত্না তরুণী তার স্বল্প অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সে তার সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিল, তার বাণী তার মুখের মতোই মধুর। পার্শ্বত্যাগে লোকালয়ের বাহিরে লালিত হইলেও, তোমোতোদার স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে, বালিকার মাতাপিতা নিশ্চয়ই সম্ভ্রান্ত বংশ সত্ত্বত; নচেৎ তার এরূপ মার্জিত ভাব ও ভঙ্গী হইতে পারে না। তোমোতোদা মনের আনন্দ আর গোপন করিতে না পারিয়া হঠাৎ তরুণীকে কবিতায় এই প্রশ্ন করিয়া বসিল—

কালে চলেছিলাম আপনার মনে

সহসা পথের ধারে,

বা’ দেখিলাম চোখে ফুল বলে হার

ভুল হ’য়ে গেল তারে—

কালে যাওয়া আর হ’ল না আজিকে

হেথা-ই কাটিল বেলা,

বুঝিতে না পারি অকালে কেন এ

প্রভাতী রঙের মেলা। *

কণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তরুণী উত্তর দিল—

অকালে আমি আলোর আভাস

আড়াল করিয়া রাখিগো যদি

তবে বুঝি মম প্রভু প্রিয়তম

রহিবেন হেথা বেলা অবধি। *

তোমোতোদার বুঝিতে থাকি রহিল না যে, তার অমুরাগ প্রত্যাখ্যান হয় নাই। তরুণী যে কবিতা দ্বারা স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিল তা তোমোতোদার অন্তর কি এক নামহীন পুলকে পূর্ণ করিয়া দিল। তার কবিতা-রচনার শক্তিও তাহাকে বিম্বিত করিল। এমন জী, এত সুন্দর, এমন বুদ্ধিমতী, সাগা বিশ্ব খুঁজিলেও

মিলিবে না। তার অন্তরের মধ্যে কে বেন চুপে চুপে বলিতে লাগিল, এমন রত্ন হেলার হারা হইও না।

তোমোতোদা মুগ্ধ, মোহিত হইয়া গিয়াছিল, তাই কোনো ভূমিকা না করিয়া স্বীয় নাম, “ধাম ও বংশের পরিচয় দিয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধার নিকট কত্ভার পাণি প্রার্থনা করিল। তারা এ কথা শুনিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, বিশ্বাসের সহিত তাহাকে অভিবাদন করিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “মহাশয় আপনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। এ আপনার মহৎ অমুগ্রহ। আমরা যে কত দূর কৃতজ্ঞতা কথায় বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের কত্ভা নিতান্ত নির্দোষ, তার কোনো রকম শিকাই হয় নি; মহাশয়ের জ্ঞান সম্ভ্রান্ত সামুরাই’এর গৃহিণী হওয়া তার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু আপনি দেখিচি তাকে পছন্দ করেচেন, আর তার গ্রাম্য চালচলন ও অভ্যুত্থা রূপা করে মার্জনা করেচেন। সেই জন্য আমরা উহাকে আপনার হাতে দাসীরূপে সমর্পণ করলুম।”

প্রভাতের পূর্বেই বড় ধামিয়া গিয়াছিল। নির্দোষ পূর্বাকাশে রাঙা সূর্যের উদয় হইল। ভূবারের উপর তরুণ কিরণ পড়িয়া দিকে দিকে বিচিত্র সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিল। সেই প্রভাত সূর্যের কিরণের জ্বালা লজ্জিত মুখের গোলাপী আভা অঞ্চল দিয়া তার প্রেমিকের চক্ষু হইতে চাকিলেও তোমোতোদার আর অপেক্ষা করিবার অবসর নাই। কিন্তু তরুণীকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াও অসম্ভব; তাই যখন যাত্রার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে তখন সে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে কহিল, “আমি যা পেয়েছি তারও অধিক কিছু প্রার্থনা করা অসুচিত, কিন্তু আমি আবার আপনার কত্ভার পাণি প্রার্থনা করুচি। তার বিচ্ছেদ আমি সহ্য করতে পারব না। আপনার কত্ভাও আমার সহিত বাইতে অসম্মত নয়। তাহাকে আমার হাতে অর্পণ করুন; আমি চিরকাল আপনাদিগকে মাতাপিতার জ্ঞান ভক্তি করব। গত রাত্রের সদয় পরিচর্য্যার বিনিময়ে এই বৎসিকিৎ উপহার গ্রহণ করুন।”

কিন্তু কিস্তি বর্ষ দুইপূর্ণ বলিষ্ঠ আঙুলে আঙুলে সরাইয়া দিয়া কহিল “আপনি অতি দয়ালবান্। দুইপূর্ণলি আপনি রাখুন। শীতের দিনে দীর্ঘ পথ বাবার সময় ওগুলি আপনার কাছে আসিবে। আবারের অন্নভেই সংসার চলে, বর্ষদুইয়ার আবারের প্রয়োজন নাই। আমরা ত আপনার কতাকে আপনার হাতে সমর্পণ করেছি; অন্নভ ইচ্ছা আপনার অঙ্গুগমন করে। আমরা কবে আছি কবে নেই, আবারের বেয়েটির যে একটা পতি হ’ল এ আবারেব পরম সৌভাগ্য। আপনি তাকে যত্নে নিয়ে বেতে পারেন।”

শুভত শীত! তোমোতাদা সুন্দরীকে নিজের পাখের কোঁড়ার উপর তুলিয়া লইল। তার পিতামাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আনন্দিত চিত্তে বাজা করিল।

(২)

তখনকার দিনে সামুরাই নিজ প্রভুর অঙ্গুভি ব্যতীত বিবাহ করিতে পারিত না, এবং যে কার্যে তোমোতাদা প্রেরিত হইয়াছিল তাহা সম্পন্ন না করিয়া অঙ্গুভি গ্রহণ করা বার কেমন করিয়া। সেই হেতু কিরোতো পৌঁছিয়া তোমোতাদা সুন্দরীকে সম্বন্ধনে সুকারিত করিয়া রাখিল; পাছে তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া হোসোকোগা-রাজ ভাণ্ডের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়। তিনি সুন্দর মুখের বিশেষ ভক্ত।

কিন্তু কবার আছে, যেখানে বাঘের ভর সেখানেই সন্ধ্যা হয়; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সুন্দরীকে হঠাৎ এক দিন হোসোকোগা-রাজের এক অঙ্গুচর দেখিয়া ফেলিল, শুধু বীর ভরুণ প্রভুকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। অবিলম্বে সুন্দরীকে বিনা বাক্য ব্যয়ে তোমোতাদার নিকট হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল।

তোমোতাদার দুখ বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। দাইম্যোর তুলসার সে সমান্ত এক জন কর্মচারী, দাইম্যোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কি করিতে পারে। আর যেত যোড়ার নিরম বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে, প্রভুর অঙ্গুভির অপেক্ষা না করিয়াই গোপনে বিবাহ

করিয়াছে। কেমন করিয়া সে প্রিয়ার উদ্ধার সাধন করিবে? উত্তরে এ বেশ ছাড়িয়া পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু পলাইবে কেমন করিয়া? পত্র লিখিবে? দাইম্যোর অন্তঃপুরে প্রেম-পত্র পাঠানো, তা-ও ত একটা বিব্রত ব্যাপার। যদি বরা পড়ে?

নামা চিন্তার পর পত্রের পরিবর্তে সে একটা চীৎকার কবিতা রচনা করিল। তার গভীর প্রেম ও অসীম বিরহ-বেদনা কবিতা-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রিয়া যন্ত্রিণীনে চলিল—

হার, মণি-লাবণিরা তরুণীর চোখে

অবিরল জলধার,

আজি, কাছে কাছে দূরে’ রাজার কুবার

পাছে পাছে ফিরে তার।

ওগো, বড়র পীড়িত মাগয়ের রীতি,

উজ্জ্বলে সুপতীর;

হার, আমি দুর্ভাগা কিরি আজ একা

প্রান্তে এ পৃথিবীর।*

কবিতাটি প্রেরিত হইবার পরদিন সন্ধ্যাকালে দাইম্যোর নিকট তোমোতাদার তলব পড়িল। তোমোতাদা ভাবিল এই বার দফা রফা। কিন্তু এ জীবন লইয়াই বা জ্ঞাত কি? এ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সে আর সহ করিতে পারে না। তার মরণই ভাল।

হোসোকোগা-রাজ সভার সামুরাই পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তোমোতাদা যখন অতিবাদন করিতে অগ্রসর হইল, তখন সভার যে নিম্নকতা তা বটিকার পূর্বের নিম্নকতার মতো ভয়াবহ। কি এক অজ্ঞানিত বিপদাশঙ্কায় তোমোতাদার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

অতিবাদনের পর এক অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। হোসোকোগা-রাজ দৃক হইতে অবতরণ করিয়া তোমোতাদার হস্ত ধারণ করিলেন। দুখ তুলিয়া তোমোতাদা দেখিল তাঁর মনন অঙ্গুপূর্ণ। তিনি কহিলেন:—“তোমার কবিতা আমি পাঠ করিয়াছি।

* শ্রীমন্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অঙ্গুবাণ

তোমাদের মধ্যে যে গভীর প্রেম সে প্রেমে বাদ সাধিতে পারিব না। অভিন্ন হৃদয় তোমাদের হৃৎকনকে আমি ঠাই ঠাই করিব না। আজ এই সত্যের সকলের সম্মুখে তোমাদের বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হইবে।” অচিরে সত্য গৃহের পার্শ্বদেশের পর্দা সরিয়া গেল, ও লজ্জারক্তিম মুখে বধুবশে তরুণী স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

(৩)

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শীতের সন্ধ্যার আগুনের ধারে পতিপত্নী বসিয়া রহিয়াছে। বাহিরে ধূসরবর্ণ চন্দ্রভারকাহীন আকাশ হইতে অবিরাম তুবার-পাত হইতেছে। বায়ু হাহা রবে কাঁদিয়া ফিরিতেছে।

তোমোতাদার মনে পড়িল আর এক রাত্রে বায়ু এনি ভাবে বহিতেছিল, তুবার-পাতেরও বিরাম ছিল না। সেই রাত্রে প্রিয়ার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ।

হঠাৎ কাতর চীৎকারে তোমোতাদা চমকিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখে তার জীব মুখ শাদা হইয়া গিয়াছে। শশ-বাস্তে সে তাহাকে ছুই হাতে ধরিল। জী ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, “হঠাৎ চীৎকার করে উঠে ছিলুম, আমার মার্জনা কর। কিন্তু বেদনাটা এখনি হঠাৎ এসেছিল! আমাদের বিচ্ছেদ বনীভূত হয়ে এসেছে। পূর্বজন্মের কর্মফলে এ জন্মে আমাদের মিলন হয়েছিল, আবার পরজন্মেও হবে বলে আমার বিশ্বাস। তুমি অবিশ্বাস করুচো? কিন্তু সত্যি আমি মরুচি। তোমাকে এত দিন বলি নি যে আমি মানবী নই। একটা গাছের আত্মা হচ্ছে আমার আত্মা; গাছের অন্তঃকরণ আমার অন্তঃকরণ। দেবদারু গাছের যে রস তাই আমার প্রাণ। এই মুহূর্তে কে আমার গাছটি কাটুচে তাই আমি মরুচি—বিদায় প্রিয়তম।”

আবার বসন্ত কাতর চীৎকার। প্রাতি মুহূর্তে তার শরীর ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল, শেষে মেঝের উপর জুটাইয়া পড়িল। তোমোতাদা ভুলিতে গিয়া দেখে কেবল একরাশ রেশমী পোশাক, তার অভ্যন্তরে দেহের চিরুন্মাজও নাই।

তোমোতাদা মন্তক মুগুন করিল। বোঁক তিকুর বেশ পরিধান করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইল। প্রিয়ার স্মৃতি বুকে ধরিয়া, তীর্থে তীর্থে, কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সেই পাঠাড়ে দেশে আসিল। দেখিল সে কুটীর ধুলির সহিত মিশিয়াছে। আছে কেবল তিনটি ছিন্ন-কাণ্ড দেবদারু গাছের মূল। গাছগুলি দেখা গেল সে আসিবার বহু পূর্বে কণ্ঠিত হইয়াছে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মান ও অপমান

কে বলে গৌরবে বাড়ে প্রাণের গরব?
কিরাট-কুসুম-ভারে পড়ে চূড়া হয়ে,
দিগন্ত নোয়ায় মেঘে, সলিল বিভব,
সম্মান ভারের মত শিরে টানে ভূঁয়ে।
দিলে যা সম্মান তার গুণীর মাথায়,
কেমনে বহিবে তাহা এই দ্বিধা ভয়ে,
গুণী যে রহিল নত জগতের পায়,
সবার সঞ্চিত ধন নিজ শিরে ব'য়ে!

কে বলেছে অপমানে দণ্ডী বিদ্রোহীর
জ্বরেছে উদ্ধত গীর্ষ পথের ধূলার?
ফলের গৌরব গেলে শাখী বৃণ্ডশির,
পদাঘাতে, দর্পে ফণী গরজে ফণার।
অপমানে সবি যদি লহ তার হরে,
হতাশ বিদ্রোহী সে যে সকলি হারারে।
উৎপত্তি ধনু, গুণ ছিন্ন হ'লে পরে,
সবেগে বিধিয়া বন্ধ উঠিবে দাঁড়ায়ে।

শ্রীকালিদাস রায়।

কাছাড়ী বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ *

বিবাহ—প্রাচীন কালে কাছাড়ীদের মধ্যে রাক্ষস বিবাহ প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়ে এই প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে, এবং অনেকটা গন্ধর্ব্ব বিধানের বিবাহ কার্য নিম্পন্ন হইতেছে। আধুনিক বিবাহ প্রথা চার প্রকার—

(১) গন্ধর্ব্ব প্রথা :—পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে যুবক যুবতী স্বেচ্ছায় পরিণয় হুত্রে বদ্ধ হয়। এই প্রথা সমাজে অস্বাভাবিক না হইলেও এবং নিন্দনীয় হইলেও অসিদ্ধ নহে। এইরূপে বিবাহ হইলে কস্তার পিতা-মাতা বর হইতে দণ্ডস্বরূপ নগদ পাঁচ টাকা এবং কস্তার জন্ত প্রচলিত দেয় পণ অপেক্ষা কয়েকটি মুদ্রা বেশী আদায় করিয়া লয়। এই বিষয়ের মীমাংসা হইলেই বিবাহের সকল গোল মিটিয়া যায়।

(২) সাধারণতঃ যে ভাবে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা এইরূপ। পুত্র পনের বৎসর অতিক্রম করিলেই পিতা মনোমত পাত্রীর অঙ্গসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। উপযুক্ত পাত্রীর অঙ্গসন্ধান হইলে গ্রামের কয়েক জন মাতঙ্গর ও পাত্রের পিতা চাউল, মদ, সুপারি প্রভৃতি উপঢৌকন সহ পাত্রীর বাড়ীতে উপস্থিত হয়। এই সকল উপঢৌকন গ্রহণ করিলে পাত্রীর স্বজনগণ প্রস্তাবিত বিবাহে অঙ্গমোদন করিল বুঝা যায়। বিবাহে উত্তর পক্ষের অভিমত হইলে তৎক্ষণাৎ কস্তার জন্ত দেয় পণ বা “পা-প্রেন্নেল” পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়। পণের পরিমাণ ৪০৭ টাকা হইতে ৬০৭ টাকা, কিন্তু কামরূপ বা গোয়ালপাড়াতে পণের পরিমাণ ১০০৭ টাকার কিঞ্চিৎ বেশী। বিবাহের কথাবার্তা স্থির হওয়ার অনেক দিন পরে বিবাহ হইয়া থাকে, এবং পণের টাকা বিবাহের সময়ই প্রদত্ত হয়। বালিকা যৌবন সীমায়

পদার্পণ না করিলে বিবাহ হয় না, স্ত্রতরাং বিবাহের কথা স্থির হইলেও অনেক স্থলে কিছুদিন উত্তর পক্ষকেই অপেক্ষা করিতে হয়।

(৩) যদি বরপক্ষ গা-ধনের টাকা দিতে না পারে তবে বর তৎপরিবর্তে স্বত্তর বাড়ীতে থাকিয়া ষাটয়া দিতে পারে, এবং উত্তর পক্ষ পরামর্শ করিয়া সময়ের পরিমাণ স্থির করিয়া লয়। তবে বরকে ৩ বৎসরের কম ও ১৫ বৎসরের বেশী ষাটিতে হয় না। এক বৎসর কি দেড় বৎসর ষাটিতেই কস্তা স্বামি-সংসর্গ করিতে পারে। এবং ষাটিবার নির্দিষ্ট সময় শেষ হইলে স্বামী-স্ত্রী যেখানে ইচ্ছা বাইরা বাস করিতে পারে। এই প্রকার নাম **ওলাও অর জিন্দা**।

(৪) ‘বরজামাইয়া’ বিবাহ প্রথাও কাছাড়ীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। বরজামাইয়া কাছাড়ীকে স্বীয় পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া স্বত্তর পরিবারের সঙ্গে মিশিয়া বাইতে হয়, এবং স্বত্তরের মৃত্যুর পর সে তত্ত্বীয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে।

কাছাড়ী বিবাহ ধর্ম্মাহুতান বা ধর্ম্ম ক্রিয়া নহে। ইহা একটা সামাজিক মিলনোৎসব ও প্রীতি ভোজন মাত্র। পাত্রী বাড়ী আনার নামই বিবাহ।

নির্দিষ্ট দিনে ৩০।৪০ জন পুরুষ ও ৪।৫ জন রমণী কতগুলি খাত্ত জ্বা লইয়া পাত্রীর বাড়ীর দিকে যাত্রা করে। দুই জন লোক একটা শূকর বহিয়া লইয়া যায়, আর দুই জনে একটা মদের জালা ভাড়াইয়া নেয়। তা’ ছাড়া চার জন চার বোকা পান মাথায় করিয়া লয় আর এক জন রাখাল বালকদের জন্ত কিছু খাত্ত জ্বা সঙ্গে লইয়া যাত্রা করে। পাছে রাখালেণ্ড পাত্রীর বাড়ীতে প্রবেশের পথে কোনও বাধা জন্মায় এই ভয়ে তাহাদের তুষ্টি-সাধনের জন্তই খাত্ত জ্বাদি লওয়া হইয়া থাকে। সময় সময় বর স্বয়ংও ইহাদের সঙ্গে যায়। বরযাত্র কস্তার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে কস্তাপক্ষেরেরা তাহাদের উপর **কাছুশান্ধী** নামক এক প্রকার আলাকর তরল পদার্থ ছিটাইয়া দেয়, এবং বরযাত্রগণও নীরবে এই

* টাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত কাছাড় ও কাছাড়ী প্রবন্ধের তৃতীয় অংশ। দ্বিতীয় অংশ আবার সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অভিবাদন গ্রহণ করিয়া থাকে । অনেক সময় কাছাড়ী-শ্রমী শরীরে লাগিয়া কোথা গড়িতেও দেখা গিয়াছে । তৎপর আনীত ত্রব্য সম্ভার কস্তাপক্ষীরগণের তত্বাবধানে আইসে এবং অবিলম্বে বিবাহ-ভোজের আয়োজন হইতে থাকে ।

ভোজের সময় গ্রামের মাভসরেরা পংক্তিবদ্ধ হইয়া সম্মুখভাগে এবং বালকেরা ইহাদের পশ্চাৎভাগে বসিয়া যায় । প্রত্যেকের সম্মুখে এক এক খণ্ড কলাপাত বা এক একটা পিতলের থালা স্থাপিত হয় । এইরূপে সকলে উপবেশন করিলে পাত্রী, স্বয়ং প্রত্যেক পত্রে অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করে । পরিবেশন সমাপ্ত হইলে কস্তা জীবৎ অবনত মস্তকে সকলকে অভিবাদন করিয়া এবং কখনও কখনও তাম্বু পাতিয়া তাহাদের সম্মুখে উপবেশন করিয়া, প্রস্তাবিত বিবাহ কার্য্যে তাহাদের অমুমতি ভিক্ষা করিয়া থাকে । বর উপস্থিত থাকিলে সেও কস্তার সহিত এই অমুমতানে যোগ দেয় । এইরূপে প্রার্থনা-কার্য্য সমাপ্ত হইলে জনৈক মাভসর সংক্ষেপে পরিণয়ার্থী যুবক যুবতীর মঙ্গল কামনা করে, এবং তাহার বক্তব্য শেষ হইলে সকলে “ইরইনা জাচাং” অর্থাৎ তথাস্ত বলিয়া তাহার আশীর্ব্বাদের সাফল্য কামনা করিয়া থাকে । অবশিষ্ট দিন পান-ভোজন ও আমোদ-উৎসবে কাটিয়া যায় । সন্ধ্যা কালে পাত্র পাত্রী লইয়া বাজা করে । যদি পথে কোনও নদী বা আলি পার হইতে হয় তবে প্রতি বার পাত্রীকে ২টি সুপারী ও ২টি পান দেওয়া হইয়া থাকে । এক একটা নদী বা আলি বরের বাড়ী যাওয়ার পথে বধূ স্বামি-গৃহে গমনের অনিচ্ছার চিহ্ন ধরিয়া পান ও সুপারী দ্বারা তাহার এই অনিচ্ছা দূর করা হইয়া থাকে । ফিরিয়া আসিলে প্রত্যেক বরবাত্রীই এক জালা শুড় ও এক জালা মদ পাইয়া থাকে, এবং রাজ্যে তাহাদের ভোজনের বিশেষ বন্দোবস্ত হয় । বাড়ী ফিরিয়া আসিলে বধূ-বর পান সুপারী বদল করে । একটি ঘোরণ ও একটি যুগ্ম দেবতার নিকট বলি

দেওয়া হয়, এবং উৎকৃষ্ট যুগ্মীর মাংস রন্ধন করিয়া বধূ-বর একত্র ভোজন করিয়া থাকে ; কিন্তু পাঁচ দিন অতীত না হইলে এই বিবাহ সিদ্ধ বা পাকা হয় না । এইরূপ বিবাহ ব্যাপারে অন্যান্য ২০০ ছই শত টাকা খরচ হয়, এবং এই সম্পূর্ণ খরচ পাত্র পক্ষই বহন করিয়া থাকে । এই প্রথা মোচ নামক কাছাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত আছে ।

প্রাচীন যুগে কাছাড়ীদের বিবাহ আপন আপন সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ ছিল । বিভিন্ন সম্প্রদায় বদিও একত্র আহার-বিহার করিত তথাপি পূর্বে ইহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল । আজ কাল এই নিষেধ বিধি উঠিয়া বাইতেছে । এক জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ না হইলেও, প্রশস্ত নহে, এবং এইরূপ বিবাহ হইলে বরকে ক্রিষ্ণ অর্ধ-ব্যয় করিয়া গ্রাম্য লোককে বিশেষ ভোজ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হয় । এই ব্যাপারটা আমাদের পাক-স্পর্শের ভোজের মত ।

শোণিত-সম্পর্কে বা অন্তরূপে বনিষ্ট আত্মীয়ের সহিত বিবাহের কোন রূপ বিধান বা নিষেধ নাই । বিপক্ষীক তাহার পূর্ব পক্ষীয় কনিষ্ঠা সহোদরাকে পক্ষীরূপে গ্রহণ করিতে পারে, জ্যেষ্ঠাকে পারে না । পক্ষীয় জ্যেষ্ঠা সহোদরা মাতৃ-ভুল্যা । অপর পক্ষে বিধবা রমণী তাহার স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরকে পতিত্বে বরণ করিয়া লইতে পারে, জ্যেষ্ঠকে পারে না ।

কাছাড়ীরা বহুবিবাহের আদৌ পক্ষপাতী নহে । তবে জী বন্ধা হইলে দুই বিবাহে দোষ নাই । মৌজা-দার, মণ্ডল প্রভৃতি ধনী ও উচ্চপদস্থ কাছাড়ীরা কদাচিৎ একাধিক পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে । কাছাড়ী জী কখনও একাধিক স্বামী গ্রহণ করে না । কিন্তু ভুটান ও তিব্বতে এই প্রথার প্রচলন আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় ।

কাছাড়ী রমণীর সতীত্বের আদর্শ হীন নহে । যৌবনে ইহাদের চরিত্র কলঙ্কিত হইতে প্রায়ই দেখা

বার না। বিবাহিত এটা রমণীর দৃষ্টান্ত বিরল এই কথা বলিলেও কাছাড়ী রমণীর চরিত্রের প্রতি একটু কটাক্ষ হইয়া থাকে। যদি দৈব-বশে অবিবাহিতা কাছাড়ী যুবতীর গর্ভসঞ্চার হয় তবে দোষী ব্যক্তির নাম অবগত হওয়ার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে—

প্রাকগৃহ সিন্ধুত বৃক্ষের মূলদেশে সন্ধ্যাগমে কিছু চাউল গর্ত করিয়া পুতিয়া রাখা হয়। রাত্রি প্রভাতে পরিবারস্থ সকল লোক বৃক্ষ-তলে সমবেত হয় এবং সেই চাউল তুলিয়া বয়স্কা বালিকাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। অপরাধিনী ভয় হেতু ভাল করিয়া চাউল চিবা-ইতে পারে না। এইরূপে পরীক্ষায় যে অপরাধিনী সাব্যস্ত হয় তাহার নিকট হইতে অপরাধীর নাম পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে অপরাধীকে প্রচলিত “গা-লান” অপেক্ষা অনেক বেশী অর্থ দণ্ড দিতে হয়, এবং তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, এই গর্হিতা-চরণ দ্বারা সে বাবতীর গ্রামকে কলঙ্কিত এবং স্বীয় চরিত্রকে দূষিত করিয়াছে।

বিবাহচ্ছেদ বা তালাক।

কারণ থাকিলে স্বামী পত্নী পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু পত্নী স্বামী পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিবাহ বন্ধন সাধারণতঃ উভয়ের মতামুসারে ছিন্ন হইয়া থাকে।

বিবাহচ্ছেদের কারণ উপস্থিত হইলে, পতি-পত্নী গ্রাম্য মাতঙ্গরগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং মাতঙ্গরেরা উভয়ের বক্তব্য শ্রবণ করিলে বিবাহচ্ছেদ অমুমোদিত হইয়া থাকে।

বিবাহচ্ছেদের আদেশ হইলে একটা পান চুই ভাগ করিয়া চিরিয়া দেওয়া হয়—উদ্দেশ্য, এই চিরা পান বেহন আর মিলিতে পারে না তরুণ বিবাহবন্ধনচ্ছেদার্থী পতি পত্নীরও আর মিলন হইতে পারে না। এই অমু-চ্চানের নাম পান চিহ্ন। এই পান চিরার পর হইতেই তাহারা সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া যায়।

স্বামীর পক্ষে বিবাহচ্ছেদের যথেষ্ট কারণ থাকিলে, অর্থাৎ রমণী ব্যভিচারিণী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে স্বামী তাহার বিবাহে যে পরিমাণ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল তাহা দাবী করিতে পারে, এবং যে ব্যক্তি এই ব্যভি-চারিণীকে পুনরায় পত্নীরূপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে তাহার নিকট হইতে এই রমণীর পূর্ব স্বামী সেই ধরনের পরিমিত, অর্থাৎ, অনূন ১৫০ ও অনূর্ধ্ব ২০০ টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে। এই টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোন রমণীই দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতো পারে না।

মণিপুরে বিবাহিত রমণী প্রলোভনে পড়িয়া পর পুরুষের সহিত পলায়ন করিলে, রমণীর স্বামী তাহার দাম্পত্য স্বত্ব ভঙ্গের জন্য অপরাধীর নিকট দণ্ড স্বরূপ ৬০ টাকা দাবী করিতে পারে, এবং এই ৬০ টাকা প্রদান করিলেই অপরাধী ব্যক্তি রমণীটিকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারে, অত্যা রাঙ্ঘারে তাহার কারা-বাসের ব্যবস্থা হয়। এই অপরাধে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মণিপুরে এক ব্যক্তির ৬ মাসের কারা-দণ্ড হইয়াছে।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

ফতেজঙ্গপুর

আর এস, এন কোম্পানীর বরিশাল তারপাশা লাইনের জবসা ষ্টেশন হইতে পূর্বদিকে এক মাইল দূরে একটি পুরাতন স্থান বর্তমান রহিয়াছে। তাহার উত্তরাংশের নাম “নগর” ও দক্ষিণাংশের নাম “ফতেজঙ্গ-পুর”। স্থানটি দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত। এই নগর ও ফতেজঙ্গপুর সম্বন্ধে আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রীযুত আনন্দনাথ রায় মহাশয় বীরকাহিনীশীর্ষক প্রবন্ধে উপরোক্ত ফতেজঙ্গপুর গ্রাম-

কেই বঙ্গের শেখবীর কেরার রায়েরপরাজঙ্গ-স্থল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা—শ্রীযুত বোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ও তাঁহার মতেই অঙ্গুসরণ করিয়াছেন। বাস্তবিক কতেজঙ্গপুরই পূর্বোক্ত যুদ্ধ-স্থল কিনা এ প্রবন্ধে আমরা প্রধানতঃ তাহা লইয়াই আলোচনা করিব।

ইলিয়ট সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কেরার রায়ের শাসন সময়ে ত্রীনগর নামক স্থানে কোঁজ থাকিত, এবং ঐ স্থানেই কেরার রায়ের সহিত বাদশাহী সৈন্তের শেষ যুদ্ধ সংসাধিত হয়। আমরা বর্তমান ‘নগর’ গ্রামকেই ত্রীনগর প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

“কতেজঙ্গপুর” শব্দটি পার্শী ভাষা হইতে গৃহীত; অর্থ যুদ্ধ-জয়-স্থান। শব্দটি পার্শী; কাজেই মুসলমান কর্তৃক স্থানটির নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা বোধ হয় অসম্ভব নয়। কাজেই যে যুদ্ধই এখানে সংঘটিত হইয়া থাক না কেন, বোধ হয় উহাতে মুসলমানই জয় লাভ করিয়াছিল।

এদিকে, যেইরূপে পৌণ্ডবর্জন পাণ্ডুরায়, লক্ষণাবতী লাক্ষোতিতে এবং পাটলীপুত্র পাটনায় পরিণত হইয়াছে, সেইরূপে “ত্রীনগর” “নগরে” পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই ইহা হইতেই প্রায় নগরকে ত্রীনগর বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ প্রথমতঃ সমস্ত জায়গাটির নামই ত্রীনগর ছিল; পরে সহরের দক্ষিণাংশে জয় লাভ করিয়া মুসলমানেরা ঐ অংশটিকে কতেজঙ্গপুর নাম প্রদান করেন।

ইহা ছাড়া স্থানটির অবস্থান ও পূর্বোক্ত বিখ্যাসের সহায়তা করিতেছে। দেখা যায় যে, চাঁদ রায় ও কেরার রায় নির্মিত ত্রীপুর হইতে যে বিখ্যাত “কাচকীর দরঙ্গা” লেদাঘের নদী পর্যন্ত নির্মিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক সোজানুজি না গিয়া বাঁকাইয়া নগর কতেজঙ্গপুরের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। অপর, বিখ্যাত কালীগঙ্গা নামক নদী সে সময় ত্রীপুরের নিকট

দিয়া প্রবাহিত হইত এবং ইহার একটি প্রধান শাখার তীরেই নগর ও কতেজঙ্গপুর অবস্থিত ছিল। ঐ নদী এখন “কালীগঙ্গা” বা “কতেজঙ্গপুরের বাঁদ” বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে এবং চৈত্র ও বৈশাখ মাসে একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপে সে সময় স্থানটি যে ত্রীপুরের সহিত বিশেষভাবে সংযোজিত ছিল ইহা হইতে তাহা নিরূপিত হয়। এই সমস্ত অবস্থা পূর্বোক্ত বিখ্যাসেরই সহায়তা করিতেছে।

এইস্থানে পূর্বে যে নবাব সৈন্ত থাকিত, প্রবাদ ও তাহার সাক্ষী প্রদান করিতেছে। “দৌগঘরী” প্রণেতা শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঘটক মহাশয় পুরাতন কাগজপত্র দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বর্তমান কতেজঙ্গপুর হইতে দামাদ সাহেব নামক জনৈক মুসলমান দেনানায়ক রূপ-লাবণ্য বিভূষিতা দৌগঘরী নাম্নী হিন্দু বালিকাকে বলপূর্বক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া বিবাহ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করেন। পার্শী দামাদ শব্দে জামাই বুঝায়। কাজেই এই দামাদ শব্দে হয়ত কোনও নবাবের জামাতা কিলমকন্দেই বুঝাক বা অন্য যাহাকেই বুঝাক সে সময় কতেজঙ্গপুরে যে সৈন্ত থাকিত ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এই ঘটনা চাঁদকেদারের শাসন সময়ের প্রথম অংশেই ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কারণ পূর্বোক্ত আক্রমণের সময় কেরার রায়ের গুরু গোসাক্ষী ভট্টাচার্য্যের পিতা ঘটনা-স্থলে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

স্থানীয় কেহ কেহ বলেন রাজা রাজবল্লভের পঞ্চম পুত্র গোপাল বাবু ও কান্তিকপুরের জমিদারদের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহা এই স্থানে ঘটিয়াছিল বলিয়া স্থানটির নাম কতেজঙ্গপুর হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। কারণ ঐ যুদ্ধ যে বড়িসারে ঘটিয়াছিল প্রথমতঃ প্রবাদ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ সেই যুদ্ধের যেই সময় চিহ্ন এখনও বর্তমান রহিয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই বড়িসারের চতুঃপার্শ্বে। কতেজঙ্গপুরে প্রাপ্ত পুরাতন কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে, রাজা রাজ-

বঙ্গভের সময়ও স্থানটি কতেজপুর্ নামেই অভিহিত হইত। কাজেই গোপাল বাবুর বুদ্ধ হইতে স্থানটির নামকরণ হওয়া অসম্ভব। রাজনগরের ইতিহাস গ্রন্থেও ঐ যুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন; বুদ্ধ বড়িসারে ঘটয়াছিল বলিয়া তিনিও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই গোপাল বাবু ও কাঞ্চিকপুর্নের জমিদারদের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহা যে এখানে ঘটে নাই এবং তাহা হইতে যে স্থানটির নামকরণ হয় নাই, তাহা সুনিশ্চিত।

অবশ্য, রাজনগর, নড়ীকুল প্রভৃতি স্থান পদ্মাগর্ভে বিলীন হওয়ার পূর্বে এই সমস্ত স্থান অজলাবৃত ছিল বলিয়া কেহ কেহ স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত হন; কিন্তু সেইরূপ সন্দেহের মূলে কোন ভিত্তিই বর্তমান নাই। কারণ এইরূপ অনেক মহানগরীর অস্তিত্বের কথা শুনা যায় বাহা সে কালীন রাজা মহারাজের রাজধানীরূপে ব্যবহৃত হইয়া সমগ্র জগতে আপন প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছিল, কিন্তু কালকবলে পতিত হইয়া এখন বন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। আজ কয়েক দিন হয় উক্ত 'নগর' গ্রামে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্মিত পুরাতন বিষ্ণুমূর্তিও স্থানটির প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। মূর্তিটি কলিকাতা সাহিত্য পরিষদ গৃহে রক্ষিত আছে। পঞ্চাশতের উত্তর বিজয়-পুর্নের ত্রীনগর যে অতি অল্প দিন যাবৎ উক্ত নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে, প্রবাদ হইতেই তাহা নিরূপিত হয়। অনধিক ১৫০ শত বৎসর যাবৎ পুরাতন রাইবাব গ্রাম ত্রীনগর নামে অভিহিত হইতেছে। কাজেই বর্তমান নগর কতেজপুর্নই যে পুরাতন ত্রীনগর তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে, বিপ্লব মহাযাত্রী, বা অত্র কোনও কারণে পরবর্তী সময়ে স্থানটি জনশূন্য হইয়া থাকিবে।

দেখা যায়, মুসলমান রাজত্বের সময় যখনই বেখানে কোন হিন্দু জমিদার বিশেষ ক্ষমতাসালী হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্যে জমিদারের রাজধানীর নিকটবর্তী কোনও স্থানে মুসলমান-প্রধান স্থানের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাদশাহগণ সতর্কতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উপরোক্ত বিষয়সমূহ হইতে

নগর-কতেজপুর্নকেও ত্রীপুরের রাজ রাজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত মুসলমান প্রধান স্থান বলিয়াই বোধ হয়। এখনও উক্ত স্থানের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে অসংখ্য মুসলমানের বাস। চাঁদাকেন্দারের অসীম ক্ষমতানিবন্ধন বাদশাহ এই স্থানে এক জন উচ্চ কর্মচারীর অধিনায়কতার অধিক সংখ্যক সৈন্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহারা সহরের দক্ষিণাংশে নদী-তীরে বাস করিত।

ত্রীনগরের ইতিহাস এই, রাজা কেন্দার রাজ ত্রীনগরে রক্ষিত বাদশাহী সৈন্যাদ্যাক কিলমককে আক্রমণ করিলে তিনি কিছু কাল পর্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। পরে রাজা মানসিংহ মগরাজাকে (নেঙরাম মেঙ—Ngyaung Ram Meng) পরাজিত করিয়া পাঁচশত রণপোত সংগ্রহকারী কেন্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, এবং কিলমকের সাহায্যার্থ কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সমস্ত সৈন্যের সহিত কেন্দার রাজের এক অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সংঘটন হয়। পরিশেষে কেন্দার রাজ পরাজিত হইয়া বন্দী হয়। কিন্তু রাজসন্নিধানে নীত হইবার অত্যন্ত কাল পরেই যুদ্ধে প্রাপ্ত ভীষণ কত হইতে তাহার মৃত্যু ঘটে। (১)

শ্রীমধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়।

1. Raja Mansingh after defeating the Magh Raja turned his attention towards Kaid Rai of Bengal who had collected nearly 500 vessels of war and had laid siege to Kilmak the Imperial commander in Srinagar. Kilmak held out till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally overcame the enemy and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner who died of his wounds soon after he was brought before the Raja. (Elliot's History of India Vol VI. Takmil Akbarnama. P IIII).

মিনির ঘটকালী

ভাল করিয়া গোঁপের রেখা দিতে না দিতেই ২১ বৎসর বয়সে যখন প্রকাশচন্দ্র এন, এ, বি, এল পাশ করিয়া বসিল, তখন তাহার সমস্ত হিতাকাঙ্ক্ষীরাই বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিল যে, এই ছেলের দশা হ'বে কি? এর কাছে এখন মকেলই বা আসবে কেন, ভলই বা কথা মানবে কেন? পরসার বিশেষ অভাব না থাকিলেও প্রকাশচন্দ্র পত্নীর ভাবে বলিল “গাজীপুরে গিয়া এখনই ‘প্র্যাকটিস্’ আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে।” বাড়ীর লোকে বলিল ‘অত দূরে কেন?’ প্রকাশ বলিল পশ্চিমে, শরীরটা থাকবে ভাল। প্রকাশচন্দ্র গাজীপুর রওনা হইল;—তখন দুই তিন স্থান হইতে তাহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছে।

গাজীপুরে পক্ষার ধারে প্রকাশ একখানি বাংলার বাসা লইল। ব্রাহ্মণ ও চাকর বোগাড় করিতেও বিশেষ কষ্ট পাইল না।

হারারে পশ্চিম! শরীর ভাল ত বোধ হয় প্রত্যহ ‘পঞ্চতিস্ত পান’ বা অল্পরূপ অস্ত্রাঙ্গ কুচ্ছ সাধন করিলেও থাকে। সাধের পশ্চিমের দারুণ গ্রীষ্মে প্রকাশচন্দ্রের প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইল। সমুদ্রেই শীর্ণকায় গঙ্গা, শীতল বাংলা দেশের দিকে প্রাণপণে ঢেউ টানিয়া চলিয়াছে। অবশিষ্ট তিনখণ্ডে অনলধাসী প্রান্তরের মাঝে দু'একটি বাংলা রৌদ্রে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। দূরে দূরে ক্লমক্লম ‘পাইকোট’ করিয়া মরুক্ষেত্র জল-সিক্ত করিবার বুধাই চেষ্টা করিতেছে। বাতাসে আর্দ্রতার নাম নাই; কেবল ধূলায় গন্ধ, নাক জলিয়া যায়। কোনদিকে শ্রাবণতার চিহ্ন নাই; কেবল পাংশ-বর্ণ ককর, চোখ কলসিয়া যায়। শরীরে একবিন্দু শ্বাস হয় না, যে বাতাস খাইয়া সিদ্ধ হইবে।

প্রকাশচন্দ্র সেই পরমেও একটু কবির করিয়া ভাবে—‘মার দেহ ছাড়িয়া এ কোন বিষাতার নির্ধাতনের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। কোর্টে হুতার দিন গিয়া

‘প্র্যাকটিস্’ করিয়া আসিয়াছে। এখন হুপর বেলা ঘরে বসিয়া বসিয়া ভাবে, এত শীঘ্র বাড়ী ফিরি কোন্ লজ্জার! কিন্তু বে লজ্জাতেই হউক বাড়ী যে ফিরিতে হইবে, সেটা ক্রমেই ঠিক হইয়া আসিল। চিঠি দিল ‘এখানে আমার শরীর ভাল থাকিতেছে না, শীঘ্রই বাড়ী যাইতেছি।’

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। প্রকাশচন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া ‘গেটের’ কাছে একটা নিমগাছের তলায় চেয়ার লইয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময় একটি ১।১০ বৎসরের বালিকা আসিয়া তাহাকে বলিল “তোমাদের বাড়ীর মধ্যে আমার মিনি গিয়েছে, নিয়ে আসব?” ফুটফুটে রঙ। উজ্জল নির্ভীক চক্ষু। বালিকা বোধ হয় ছুটাছুটি করিতেছিল—স্বন্দর মুখখানি লাল হইয়া দামিয়া উঠিয়াছে। গুচ্ছগুচ্ছ কৌকড়া চুলে ঢাকা মুখখানি শিশিরসিক্ত ঈষদুষ্টিয় গোলাপ কলিকার মত বড়ই রমণীয় দেখাইতেছিল। প্রকাশ বুকিল, মেরেটি পাশের বাংলোর ডাক্তার বাবুর মেরে। বা হ'ক একটা কথা কহিবার লোক পাইয়া বলিল “তোমার মিনি আমার হৃদ ধেরে ফেলে—আমি যদি না ছেড়ে দিই?”

বালিকা মাড় কাঁপাইয়া বলিল “বাঃ তা দেবে না কেন? মিনি ত মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীরও হৃদ ধেরে ফেলে। হৃদ ভাল কোরে ঢেকে রাখলেই পার।” প্রকাশ হাসিয়া বলিল “তা, আজ নিয়ে বাও, কিন্তু আর যেন এ বাড়ীতে না আসে।”

বালিকা বলিল “সে কথা আমি কি কোরে বলব? বেড়ালের কি বুজি আছে যে, আমি বললেই আর আসবে না।”

প্রকাশচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া উঠিল। বালিকা ততক্ষণে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া মিনির মাড় ধরিয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে বাহির করিয়া আনিল। যখন গেট পার হইয়া যায় তখন প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল “তোমার নাম কি?”

বালিকা বলিল “আমার ডাক নাম পান্ন, ভাল নাম যুগলবালা।” বালিকা চলিয়া যায়; প্রকাশ আর কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, “আমার নাম জিজ্ঞাসা করুলে না।”

পান্ন প্রকাশের মুখের উপর একটুখানি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার নাম কি?” প্রকাশ বলিল, “আমার নাম ‘সেদো’।”

বালিকা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, “মিছে কথা, তা হতেই পারে না।” প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, “কেয় হ’তে পারে না?”

পান্ন বলিল “তা কেমন কোরে হবে।” বলিয়া আবার উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তখন প্রকাশ বলিল, “আমার নাম প্রকাশচন্দ্র।”

হাসি ধামাইয়া বালিকা গভীর ভাবে প্রকাশকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল ‘তা হ’তে পারে।’

এমন সময় মিনি হঠাৎ হাত ছাড়াইয়া মাটিতে পড়িয়াই দৌড় দিল। বালিকাও তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়া গেল। সে দিন এই পর্য্যন্ত।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত হইয়াই শেষ হয় নাই। আজকাল করিয়া প্রকাশের বাড়ী যাওয়া হইয়া উঠিতেছে না। হুপরের ট্রেনে—যে গরম! রাত্রির ট্রেনে—তাইত! মিনিও প্রকাশের হৃৎপূর্ণ কণ্ঠাহের স্থান নিরূপণ করিয়া লইয়াছে।

“না, আমি নিচ্চর বলছি, নিচ্চর।”

বা বলিল “কি নিচ্চর।”

“দেখছো না, মিনি মুখ আঁচড়াচ্ছে।”

“তা কি হয়েছে।”

“বাই আমি দেখে আসি” বলিয়া পানি খাবার কেলিয়া উঠিল। বা বলিল “কোথা বাস? খেয়ে যা।”

“না বা, মিনি নিচ্চর আবার প্রকাশ বাবুর হৃৎ খেয়ে এসেছে।”

পানি সেই হুপরে রোজে ছুটিয়া প্রকাশের বাসায় আসিল। হুয়ার ঠেলিয়া ধরে ছুকিয়াই বালিকা দেখিল,

প্রকাশ চৌকির উপর গভীর নিদ্রা বধ, আর ঘরের কোণে ঠোঙের উপর হইতে হৃৎ শুদ্ধ কড়াই উল্টিয়া পড়িয়া গিয়াছে। মেকের হৃৎ পড়াইয়া বাইতেছে।

“ওমা, আমার কি হবে?”

প্রকাশ আসিয়া উঠিয়া দেখিল বালিকা ঐবা বাঁকাইয়া কপোলে তরুণী টিপিয়া বিশ্বয় বিস্কারিত নেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। রোজে ছুটিয়া আসার মুখখানি ঠিক গোলাপ ফুলের মতই রাল হইয়াছে। প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল “কি হয়েছে পান্ন?”

“কি হয়েছে? উঠে দেখ। এমন ঘুমও তোমার!”

প্রকাশ দেখিল, সব হৃৎ পড়িয়া গিয়াছে। বায়ুন আসে নাই, নিজেই ঠোঙে হৃৎ আল দিয়া অপরাহ্নের যোগাড় হইল ভাবিয়া প্রকাশ ঘুমাইতেছিল। একটু ক্ষুধা হইয়াই বলিল—“এ তোমার মিনির কাজ, নিচ্চরই!” বালিকা বড় অপ্রতিভ হইল। ৩।৪ দিন মিনি এই রকম হৃৎ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অক্লান্ত হইয়া বলিল “হৃৎ ভাল কোরে রাখনি কেন! তোমার বায়ুন কোথায়?”

“বায়ুন আজ আসেনি, বোধ হয় আসবেও না।”

“তবে তুমি কি ধাবে।”

প্রকাশ বলিল “সে বা হয় হবে? তুমি এই রোজে ছুটিয়া আসিয়াছ কেন? “তুমি আজ ধাবে কি?—আজ্ঞা প্রকাশ বাবু, তুমি একজা থাকো কেন? তোমার বা কোথায়?” বালিকার স্বর করুণার্ত।

“আমার বা বাপ সকলেই বাড়ীতে আছেন, আমি এখানে কাছাড়ীতে কাজ করি।”

“আজ রাত্রিতে আমাদের বাড়ী তোমার নিমন্ত্রণ।”

“আমরা কুলীন বায়ুন, তোমাদের বাড়ী যাবো কেন?”

“ইস! আমাদের চেয়ে? আমরা খুব বড় কুলীন।” কোলিভাতিমানে বালিকার চক্ষুর বিস্কারিত ও বকিম ঐবা কহু হইয়া উঠিল।

প্রকাশচন্দ্র হাসিয়া বলিল, “তুমি নিমন্ত্রণ করুলে ত

আমি যেতে পারি না, তোমার বাবা ত নিমন্ত্রণ করেন নাই।”

“আমার নিমন্ত্রণ নেবে না? বেশ!” চোখের উপর হইতে চুলের ঝুজ সবেগে সরাইতে সরাইতে বালিকা ঘরের বাহির হইয়া গেল। প্রকাশ উঠিয়া ধরিতে আসিলে ছুটিয়া পলাইল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে রাজমোহন বাবু আসিয়া অনেক কথাবার্তার পর প্রকাশকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন, এবং সন্ধ্যার পর পুনরায় নিজে আসিয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। ছই জনে খাইতে বসিয়া রাজমোহন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“পাড়ে” পান্নু খেয়েছে?”

পাড়ে বলিল “না, মা ঠাকরুণ কিছুতেই খাওয়াতে পারলেন না।”

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, কি হয়েছে?”

রাজমোহন বাবু বলিলেন, “কি জানি, হুপের বেলা থেকে কি রাগ হয়েছে।” মেয়ের কিসে রাগ হয় কিসে না হয় কিছুই বুঝতে পারি না।” প্রকাশ কিন্তু বুঝিতে পারিল, কিছু বলিতে পারিল না।

পান্নুর বৌদিদি পান্নুকে অনেকটা চিনিত। সে বলিল—“কি লা! না খাবি নাই খাবি, প্রকাশবাবু ত তোর বর নয়, সাম্নে বেকতে নজ্জা কি?”

সহসা পান্নু উঠিয়া যেখানে পিতা ও প্রকাশ বাবু আহার করিতেছেন, সেইখানে আসিয়া বলিল, “পাড়ে, আমার এইখানে খাবার দিয়ে যাও।”

পান্নুর মার আপত্তি সত্ত্বেও শেষে সেইখানেই তাহাকে খাবার দিতে হইল। প্রকাশবাবুদের আহারের পূর্বেই আহার সমাপ্ত করিয়া বালিকা চলিয়া গেল। প্রকাশ যে তাহার বর নয় সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না।

“বর বর, তুমি শীগ্গীর বর, তোমার হুখ খাওয়া বুচে থাক!” পান্নুর মা বলিল, “ওকি লা, বেড়ালটাকে বেঁধে আবার জমন কচর ঠালাচ্ছিল কেন?”

“দেখ দেখি মা, হতভাগা মিনি আবার প্রকাশ বাবুর সব হুখ খেয়ে ফেলেছে।”

“তা বলছি ত মা, ও হতভাগা বেড়ালটাকে বিদ্যের কোরে দে। ভদ্রলোককে আধেকদিন খেতে দেয় না।”

“তা বেড়ালের দোষ কি? আমি শিকে পর্য্যন্ত টানিয়ে দিলাম, বাবু সেখানে হুখ রাখতে পারেন না।” বলিতে বলিতে পান্নু একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। পান্নুর মা এবং বৌদিদি আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না।

হতভাগা বেড়াল, ভদ্রলোককে আধেক দিন খেতে দেয় না! বৈকালবেলা রামশরণকে সঙ্গে লইয়া পান্নু মিনিকে গঙ্গা পার করিয়া দিতে চলিল। ওপারে নৌকা পৌঁছিলে রামশরণ মিনিকে ডাঙায় ছুঁড়িয়া দিয়াই নৌকা ঠেলিয়া দিল। মিনি জলের ধারে আসিয়া নিরুপায় সঙ্করুণ স্বরে মিউ মিউ করিয়া ডাকিতে লাগিল। পানি সে দিকে চাহিল না;—মনে মনে বলিতে লাগিল ‘হতভাগা বেড়াল, ভদ্রলোককে অধেকদিন খেতে দেয় না।’

সকলেই জানিল, পানি তার মিনিকে গঙ্গা পার করিয়া দিয়া আসিয়াছে। ইহাতে পানির পিতা মাতা একটু দুঃখিত হইলেন। এই বাল্যাবধি প্রায় দুই পশ্চিম দেশে মিনিই মেয়েটির একমাত্র সঙ্গী ছিল। প্রকাশও শুনি। তাহার কাব্যরসসিক্ত হৃদয় মুহূর্তেই সজাগ হইয়া উঠিল, বলিল ‘একি! এ যে সর্ব্বম লইয়া কথা’।

মিনি নাই, স্মৃতরাং পান্নুর আর প্রকাশের বাসায় বাইবার কোন আবশ্যক হয় না। কিন্তু পান্নুকে দেখিবার জন্য প্রকাশের বাসনা এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, সে আর বেশ সহজভাবে তাহাদের বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসিতে পারিল না। অথচ তাহাকে শীঘ্রই চলিয়া যাইতে হইবে। বাড়ী হইতে চিঠির উপর চিঠি আসিতেছে, ‘শরীর অসুস্থ লিখিয়াছ, বাড়ী আসিতেছ না কেন? শীঘ্র চলিয়া আসিবে।’

এক দিন সন্ধ্যার পর রাজমোহন বাবু নানা কথায় মধ্যে প্রকাশের কাছে পান্থর কথাই বেশী করিয়া উল্লেখ করিতে লাগিলেন। শিশুকাল হইতে তাহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, অনন্যমূল্য গৃহকর্মদক্ষতা এবং সর্বশেষে বিড়াল নির্কাতনের কথাও বলিলেন। সহজেই অস্বস্তি হইতে পারে, ভ্রমলোকের একটা গুরুতর অভিসন্ধি আছে। প্রকাশের পিতার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে বড় হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহাকে এক পত্র দিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তর পাইয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে উত্তর পক্ষেই আনন্দজনক হইত, কিন্তু কতটা নিভাত্ত বালিকা, এবং প্রকাশের পিতা অজ্ঞাত্রে অবগত আছেন যে, প্রকাশের বালিকাবিবাহে আদৌ মত নাই। সুতরাং পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি এ কার্য করিতে পারেন না।

অবশেষে রাজমোহন বাবু তাঁহাদের পত্র লেখালিখির কথাটি গোপন রাখিয়া প্রকাশের নিকট স্পষ্টভাবেই প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। প্রকাশ খাড়া নীচু করিয়া উত্তর দিল, “সে সম্বন্ধে বাবাকে লিখুন, তাঁর উপর আমার মতামত কি?” রাজমোহন বাবু বুঝিতে পারিলেন, খুসী হইয়া অল্প কথা তুলিলেন। প্রকাশকে সেই রাত্রির ট্রেনেই বাড়ী রওনা হইতে হইল। যে পিতার মতামতের উপর তাহার কোনই আপত্তি থাকিবে না সেই পিতার মতামতের অপেক্ষায় ত এত দূরে নিরপেক্ষভাবে বসিয়া থাকা যায় না।

পান্থ বখন শুনিল প্রকাশ চলিয়া গিয়াছে, তখন প্রকাশের উপর তাহার মর্মান্তিক রাগ হইল। পূর্বে একথা বলিলেই পারিত যে আমি থাকিতে আসি নাই। রামশরণকে হুকুম করিল ‘নোকা লইয়া পারে চল।’ রামশরণ অগত্যা নোকা ধুলিল। পান্থ উপরে গিয়া অনেকক্ষণ এদিক ওদিক খুঁজিয়া রামশরণকে বলিল, “তুই কোথায় গেলে দিইছিলি?”

“মা, কেলে ত দিইছিলাম ইধানটার। কিন্তু সে কতদিন হোলো, এখনও কি ইধানে ব’সে থাকবে?”

অকারণ রামশরণকে গালি দিতে দিতে বালিকা বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

কিছুদিন পরে পান্থ শুনিল যে সেই প্রকাশ বাবুর সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে। বাকালীর মেয়ে যতই অশান্ত মুখরা হউক বিবাহের কথায় কখনই মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। পান্থ মনে মনে বলিতে লাগিল, “হে মা কালী, এ সম্বন্ধে যেন ভেঙ্গে যায়। আর আর সঙ্গে হয় হউক, প্রকাশ বাবুর সঙ্গে যেন আমার বিয়ে না হয়, হে মা কালী।”

কিন্তু মা কালী বালিকা নহেন, বালিকার মাতা। সুতরাং তিনি এই ছেলেমানুষের কথায় প্রকাশের স্ত্রায় সংপাত্ত হাত ছাড়া করা মুক্তিলাভ করেন করিলেন না। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ সমস্ত দেবতারূপে পরিবৃত্ত হইয়া হোমায়ির অন্তরাল হইতে নব দম্পতীকে আশীর্বাদ করিয়া তিনি কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল বাহা দেবতারূপ বা বর কল্প উভয় পক্ষীয় বাজীরূপের মধ্যে কেহই লক্ষ্য করে নাই। কেবল মাত্র পড়িতে পড়িতেও বর এবং কত্যা উভয়েই লক্ষ্য করিয়াছিল যে একটি পরিচিত মার্জার অদূরে সিঁড়ির পাশে বসিয়া নিরপেক্ষভাবে লোকসমাগম নিরীক্ষণ করিতেছে। শুভদৃষ্টির সময় প্রকাশের মনে হইল যেন পান্থর মুখ তখনও একখানি পাতলা মেঘে ঢাকা, পান্থ একবার ঈষৎ হাসিতেই অন্তোন্মুখ অভিমানহর্যোর শেষ রক্তচ্ছটার সে খানি সিঁদুর হইয়া উঠিল।

ছয় সাত বৎসর পরে এক দিন প্রকাশ কাছাড়ী হইতে আসিয়া দেখিল ধোকা এমন ছটানী করিতেছে যে, ধোকার মা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ আসিতেই পান্থ ক্রন্দনস্বরে বলিল “আমি আর পারিনে; ঐ দেধ ধোকা কি করেছে, আঁতাকুড় থেকে একটা লাঠি তুলে আমার ছুঁয়ে দেবার জন্ত বেড়াচ্ছে।” প্রকাশ গভীরভাবে বলিল, “তা আমি কি করবো?”

বক্সি বেড়ালকে বিস্মা দোষে নির্দোষিত কোরেছিলে,
বক্সি ত শান্তি দেবেনই।”

পান্ন রাগিয়া বলিল, “বাও, তোমার এতও মনে
থাকে।”

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ।

শুভদৃষ্টি

পুরাকনে উঠল হনুমান

শতেক হাতে কঁকণ ওঠে বাজি ;

বধূরা সব বাজায় ঘন শাঁখ,

ঢেকে গেল আলিপুরনার আঁক।

পুর ঘারে উথলে ডাক হাঁক’

দেউল ঘিরে সোণার টোপে সাজি,

কেশর খাড়া ক’রে রাজার খোড়া—

চারিদিকে জলে আতস বাজি।

গাঙ্গার-রাজ দিচ্ছেন আজ মেয়ে

কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের হাতে ;

বাদ্য যত উঠল বেজে জোরে,

বর কস্তা মুখোমুখী ক’রে

বলে সবাই “চেয়ে দেখ বরে

শুভ কপে আজকের এই রাতে”।

শুনে রাণীর চোখে এল জল,

হৃৎ-সুখের পুলক-বেদনাতে,

রোপ্যাধারে হাজার রত্ন-দীপ

উঠল অলে দীপ্ত শিখা মেলি,—

বরের অঙ্ক চক্ষু ওঠে নেচে

কপিক তরে চকিত মুক্তি বেচে ;

আকুল হিরা কেঁপে ওঠে মিছে

চির ক্রুদ্ধ কপাটখানি ঠেলি ;

একটি বার—শুধু একটি বার—

দেখতারা যদি বা দেয় খুলি।

নিমেষ-হারা নলিন নরন ছুটি—

গাঙ্গারী চার প্রিয়ের মুখ পানে—

চক্ষে তাহার ভরে এল জল ;

নিমেষ তরে সকল কোলাহল

মিলিয়ে গেল, আঁধার শূন্যতল

ছেয়ে এল অসীম নিশা সনে ;

হৃৎ ভরে মাতা কেলেন শ্বাস

বরণ ডালা লয়ে পুরাকনে।

মন্ত্র পড়া হয়ে গেল শেষ,

বর কস্তা গেল অস্তঃপুরে ;

বধুবৈী হুহিতারে টানি

বুকের মাঝে সোহাগ ভরে রাণী

কর্ণে তাহার কহেন ধীরে বাণী

স্নেহ ধারা বিগলিত স্বরে,

“আর্য্যাবর্তে হ’বি বৎসে রাণী”

আনন্দাশ্রু বকে পড়ে বরে।

অলঙ্কৃত চাকু-লগাট খানি

স্নেহে মাতা চুমেন বার বার,

দেখেন কস্তা নেতের আঁচল ছিঁড়ি

নয়ন নিজ রেখেছে আবরি ;

দেখে রাণী শঙ্কাতে শিহরি,

মনে জাগে অমঙ্গল ভার

সুধান “আজকে নয়ন কেন বাঁধা ?”

কণ্ঠে বাণী নাহি সরে আর।

চোখের উপর রক্ত নেতের আঁচল

উঠল ঈষৎ ভিজ়ে সজোপনে

গাঙ্গারী কয়, “চোখের আলোর বাঁহার

চক্ষু হৃৎ চির কিরণ-আধার

দৃষ্টিহার অঙ্ক সে যে আবার ?

অঙ্ক আমি হইছি তাঁর সনে।”

কাঁদি মাতা কহেন, “অভাগিনী

কহিলি নি তা আগে কি কারণে !”

শ্রীআমোদিনী ঘোষ ।

গ্রন্থসমালোচনা

১৬। পঞ্চবাতি তত্ত্ব—বর্গগত (“বর্গীয়” শব্দটি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করাই ভাল) মূলী কালীনাথ দাশ গুপ্ত প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। নোয়াখালী হইতে উকিল শ্রীযুক্ত বগলামোহন দাশ গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১/৬ ছয় আনা। আকার ডিমাই বাদশাংশিত প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা। কাগজ ও ছাপা ভাল নহে। সুতরাং মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রারম্ভে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপাঠে জানিলাম, মূলী মহাশয় গ্রাম্য ডাক সংস্থাপন, কন্ডাপণ প্রথা নিবারণ, বিক্রমপুরে পথ নির্মাণ, এবং ধর্ম সমাজ ও নীতি বিষয়ক উৎকর্ষ সাধনার্থ নানাবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমালোচ্য পুস্তকের ভাষা প্রাচীন ধরণের; গ্রন্থ পাঠেই গ্রন্থকারে একাগ্র চর্চার পরিচয় পাইয়াছি।

অলোচ্য গ্রন্থে প্রধানতঃ পঞ্চবতীর মাহাত্ম্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রীয় নানা গ্রন্থ হইতে সংকলিত ও বিবৃত হইলেও “মরণে বা মতিঃ সা গতিঃ” “আত্মার অবিনশ্বরত্ব,” “পুনর্জন্ম” এবং “ভক্তি ও বিশ্বাস” শীর্ষক চারিটি কোডুহলোদীপক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

“পঞ্চবতী তত্ত্ব” গুনিয়াই কেহও পঞ্চবতী নির্মাণ করাইবেন কি না, সে বিষয়ে আমরাও বিশেষ সন্দেহান।

“সদানন্দ।”

১৭। মা আন্নার কাল’ কেন?—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত; প্রকাশক শ্রীমতীশচন্দ্র আচা, হাওড়া। মূল্য ১/০ তিন আনা। ডাকমাণ্ডল ২০ পরস। আকার ডবল ফুলস্কেপ্ বোডশাংশিত, ৩৮ পৃষ্ঠা; কাগজ ও ছাপা ভাল। কিন্তু ছাপার ভুল যথেষ্ট।

গ্রন্থকার প্রথমতঃ আধুনিক আলোক বিজ্ঞানের আণবিক তরঙ্গ বাদের Corpuscular Vibration theory) বিশ্লেষণ পূর্বক আধ্যাত্মিক যোগ-তত্ত্বের কিঞ্চিৎ

আভাস প্রদান করিয়াছেন। বাহু জগতের তরঙ্গবাদের সিদ্ধান্তরূপে তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, “স্বর্ঘ্যের গুণ আলোকও সমস্ত বর্ণের সমষ্টি; অন্ধকারও সমষ্টি হইতে পারে। প্রভেদ এই, স্বর্ঘ্যালোকে বর্ণ তরঙ্গ সক্রিয়ভাবে অবস্থান করে এবং অন্ধকারে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে।” আর অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন—“বাহার মনোময় ক্ষেত্রে চক্ষুয়ান্ তাঁহার দর্শিতে পা’ন প্রত্যেক মনুষ্যের মনোময় দেহ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত। আমাদের মনোময় দেহ বহুরঙ্গী। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চিন্তা তরঙ্গের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই বর্ণের উপর নানা বর্ণের রঞ্জনা উঠিতেছে।” যোগ সাধন বা বাহুজগৎ হইতে মতকে প্রত্যাহরণ পূর্বক একাগ্রতাসহকারে রক্ততগিরিনিভ মহেশ্বর মূর্ত্তির ধ্যান করিলে মনের ভিতরকার তরঙ্গগুলিও ঐ গুণবর্ণে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত তরঙ্গকে শোষণ বা গ্রাস করিয়া লয়। সেই মহাশক্তি রূপিনী কৃষ্ণবর্ণা মা আমানিগকে তখন জগদ্ ভাবিরূপ অন্ধভূতির কবল হইতে পরিজ্ঞান করিয়া নিস্তরঙ্গ শান্তির দিকে লইয়া যান। তাই আমাদের যথার্থ্যপ্রদর্শিকা বিশাল মায়ী সংহারিণী চিন্ময়ী জননী কৃষ্ণারূপে মূর্ত্তিমতী।

বিষয়টি আধ্যাত্মিক রহস্যের এক অতি জটিল তত্ত্ব। গ্রন্থকার বাহুজগতের বর্ণবিচার সম্পর্কে যে রূপ বিজ্ঞবোধ্য বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্তর্জগতের আলোচনায় তাদৃশ বিশদতা অবলম্বন করেন নাই। বিশেষ চিন্তা ও অনুধাবন না করিলে গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তগুলি হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সর্বসাধারণের পক্ষে তাঁহার প্রচারিত তত্ত্ব গুলির ভাবগ্রহণ সম্ভবপর নহে। বাহা হউক, সমালোচ্য তত্ত্বপ্রচারে গ্রন্থকারের যথেষ্ট যৌলিকত্ব আছে। পুস্তিকা পাঠে আমাদের ধারণা হইয়াছে গ্রন্থকার এক জন তক্ত সাধক। সরল বঙ্গ ভাষায় উদৃশ গ্রন্থের বহুল প্রচার স্বধর্মনিরত্ত হিন্দু মাত্রেই বাহুনী।

“সদানন্দ।”

১৮। সর্বমঙ্গলা—ডবল ক্রাউন, বোড়শাংশিত, ১২৪ পৃষ্ঠার পূর্ণ, ত্রিগীতাঙ্কর নাথ প্রণীত, ঢাকা কটন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, কাগজে বাধাই মূল্য ৯০ আনা। তিন রঙের ছবিযুক্ত মূল্যের মলাট। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার একমাত্র নির্দোষ উপভাষ্য বড় দেখা যায় না। পিতা ও কন্যা অথবা ভ্রাতা ও ভগিনী একত্র পাঠ করিতে পারেন। এ যুগে সর্বমঙ্গলার মত উপদেশপূর্ণ উপন্যাস পাঠে বালকবালিকাগণের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে। গ্রন্থকার সরল ভাষায় গল্পটি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষার জোর বড় কম, আর মাঝে মাঝে সাধু ও প্রাদেশিক ভাষার মিশ্রণে সাহিত্য সৌন্দর্যের হানি হইয়াছে। ভবিষ্যতে এ সকল ত্রুটি সংশোধন করিলে গ্রন্থকার সাক্ষ্য লাভ করিবেন। আর এই শ্রেণীর গল্প ছোট হইলেই ভালরূপ ফুটিয়া উঠে। সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন গ্রন্থকারের পক্ষে নিরুৎসাহ হওয়ার কারণ নাই। সর্বমঙ্গলার সরল ভক্তি হিন্দু বালিকার বর্ধা আদর্শ। পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার কর্তৃক অঙ্কিত সাত খানি হার্টটোন ছবি আছে। ১০৮ পৃষ্ঠায় “সর্বমঙ্গল নৈবেদ্য খাইতেছেন” ছবিখানি মন্দ হয় নাই।

শান্তিময়

নামি-কো

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রী

তাকেওর মাতার নাম কেই; তাঁর বয়স তিন্ময়। তাঁর স্বাস্থ্য খুবই ভাল, প্রায়ই বাতে কষ্ট পান—এই যা। কথিত আছে, বাটা হইতে তাঁর স্বামীর সমাধিভূমি—প্রায় দশ মাইল পথ, তিনি অনায়াসে পদব্রজে বাইতেন। ওজনে তিনি প্রায় দুই মণ ছিলেন; এ বিষয়ে খুব অল্প মহিলাই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

তাঁর স্বর্গীয় পতি কাণ্ডোসিমা গণাস্তমিত এক নামান্ত ‘সামুরাই’ ছিলেন। বিবাহের সময় অবস্থা নিতান্ত খারাপ ছিল; কিন্তু ‘রেটোরেশনের’ যুগে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন, ও ওকুবো-মন্ত্রীসভার অধীনে দীর্ঘকাল স্থানীয় শাসনকর্তার কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁর অতিরিক্ত একগুঁয়ে স্বভাবের জন্য, তার্কাউক্ট্ কাতোও আর কয়েকজন ব্যতীত সকল সহকারীরই সহিত মনান্তর ঘটয়াছিল। ওকুবোর পতনের পর তিনি সাধারণের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা পান নাই। লোকে বলিত—তাঁহাকে ‘ব্যারণ’ করিবার কারণ,—যে তিনি সৌভাগ্যক্রমে কাণ্ডোসিমায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রুশমেনজাঙ্ক, একগুঁয়ে মিচিতাকে মদ্যপানে তাঁর বহুল অসন্তোষ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন; প্রায় পাঁচ পাত্র ‘সাকে’ ‘পার’ করিয়া, যখন তিনি বুক ফুলাইয়া দৈত্যের মত লাল মুখ লইয়া স্থানীয় সভার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেন, তখন কেহ তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না।

এমন অসুখী পরিবার সর্বদা দেখা বাইত না। সমস্ত বাড়ীটি যথেষ্টাচারে শাসিত হইত; পরিবারটি যেন ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রের মাঝে এক দীর্ঘ তরুতলে অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। কেবল তাকেওই, বাল্যকালে, পিতার জামুই নৃত্যের উপযুক্ত স্থানও তাঁহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ খেলার সাথী বলিয়া জানিয়াছিল; তা ছাড়া সকলেই,—তাঁর স্ত্রী, ভৃত্যগণ, এমন কি বৈঠকখানার ধামগুলো পর্যন্ত প্রভুর হস্তে বেদনার সহিত পরিচিত ছিল। গ্যাখাকী, যে এখন “ভদ্র ব্যবসায়ী” রূপে সুপরিচিত, সেও এ দান হইতে একেবারে বঞ্চিত ছিল না; কিন্তু সে কখনো কাণ্ডোসিমা পরিবারে যাতায়াত বন্ধ করে নাই। তাঁর সন্তোষ বা অসন্তোষে তার লাভের তুলনার এ মাডলটা নিতান্ত শক্তা বলিয়াই বোধ হইত।

যখন গুজব উঠিত কর্তা চটিয়াছেন, তখন রান্নাঘরের ইঁহরটাও তার ‘হুর্, হুর্’ শব্দ ধামাইত; বাটার অভ্যন্তর হইতে অতিক্রান্ত অশনি-পাতের মত যখন তাঁর

ক্রোধকম্পিত স্বর শুনা বাইত, যখন নিম্নীল জ্বতোর হস্ত হইতে ছুরি খসিয়া পড়িত। শুনিতে পাওয়া যায়, অধীন কর্মচারীরা যখন তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তখন তারা জ্বতাদের নিকট হইতে বাতাস কোন দিকে বহিতেছে, সে কথা পূর্নাঙ্কেই জানিয়া লইত।

কেই-ঠাকুরাণী, যিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর স্বামীর সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কতটা সহ্য করিতে হইয়াছে তা একবার ভাবুন! পতির পিতামাতা যখন জীবিত ছিলেন তখন তাঁদের স্বভাবের তুলনায় পতির স্বভাব বিশেষ অসাধারণ বলিয়া বোধ হয় নাই; কিন্তু পরে যখন তাঁদের দুজনেরই মৃত্যু হইল, তখন পতির নিজমূর্ত্তি সুপ্রকাশিত হইয়া উঠিল, ও তাঁর বৈর্যাগুণের পরীক্ষার আর অন্ত রহিল না। প্রথম প্রথম তিনি বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিলেন তাহাতে কোন ফল নাই। অতঃপর আর তিনি সাহস দেখাইতেন না; হয় বুদ্ধিমানের মত বড়ের বেগে নত বেগুদণ্ডের মত সব সহিয়া বাইতেন, নয় নিরাপদ হইবার বা শ্রেষ্ঠ উপায়, তাহাই করিতেন—চম্পট দিতেন।

ইতিমধ্যে স্রোত কিরাইবার উপায় তিনি কতকটা শিখিয়াছিলেন, এবং তিন বারে এক বার প্রায় কৃতকার্য হইতেন; কিন্তু তাঁর স্বামীর স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হইল না। বিশেষত জীবনের শেষ তিন চার বৎসর তিনি মত্ত পানোদীপ্ত এমন একটা ক্রোধের আভিষেকের মধ্যে বাস করিতেন, যে, তাঁর বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও স্বীয় হৃৎগায়া জীবনের দারুণ দুঃখ মর্মে মর্মে অনুভব করিতেন। প্রিয় পুত্র তাকেও ও স্বীয় শুভ্র কেশের কথা ভুলিয়া সর্বদাই তিনি ভাবিতেন, যে, ব্যারনেস্ ও শাসনকর্তার গৃহিণী হওয়ার চেয়ে দরিদ্র মন্দির-রক্ষকের গৃহিণীর শাস্তিময় জীবন কত ভাল! কিন্তু সময় ভীরের মত দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল, এবং যখন তিনি দেখিলেন, তাঁর হৃদয়হীন স্বামী আকাশের দিকে মুখ করিয়া কঠিন হইয়া বাত্মের মধ্যে শুইয়া আছে, তখন ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। তিনি একটা

আরামের নিশাস ফেলিলেন—কিন্তু তবু, তাঁর গন্ত বাহিয়া বর বর করিয়া চোখের জল পড়িতে লাগিল।

তিনি কাদিলেন, কিন্তু এবার তাঁর ভাবনা দূর হইয়াছে; স্বাধীনভাবে নিশাসগ্রহণের সঙ্গে কতকটা শক্তিও তিনি পাইলেন। স্বামীর জীবিতাবস্থায়, সেই বিপুলকায় উচ্চকণ্ঠ লোকটির পাশে তাঁর অস্তিত্ব এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু এখন, যেই তিনি কোণ হইতে বাহিরে আসিলেন অমনি কাঁপিয়া উঠিলেন। স্বামীর পার্শ্বে যারা তাঁর ভীকৃত্য লক্ষ্য করিয়াছিল, তারা বলিল, পরিবর্তনটা অদ্ভুত হইয়াছে। জনৈক পণ্ডিতের কিন্তু মত, যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বামী স্ত্রী আকৃতি ও প্রকৃতিতে ক্রমশ এক হইয়া পীড়ায়। সত্য মিথ্যা বাহাই হউক, তাঁর সম্বন্ধে বাস্তবিকই এ কথা খাটিত। তাঁর চেহারা, ব্যবহার, অভ্যস্ততা সর্বোপরি তাঁর রূপ স্বভাব, মৃত স্বামীর দ্ববহ নকল।

কথায় বলে “উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।” এ কথাটার প্রকৃতির এক অদ্ভুত দ্ব্যর্থপ্রতিঘাতের নিয়ম ব্যক্ত হয়। গভর্নমেন্টের বিপক্ষীয় পার্লামেন্টের এক সভ্য গভর্নমেন্টকে আক্রমণ করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতা বেশ ভালই হইল, কিন্তু কয় জন বোঝে যে তাঁর তেজের অর্ধেক, গত রাত্রে যে সুদ-ধোর তাঁহাকে চাপাচাপি করিয়াছিল তার-ই উদ্দেশে বাহির হইয়াছে। আবার ধরুন, দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বায়বীয় চাপ জাপানের মধ্য ভাগে বস্তার সৃষ্টি করিল; জোয়ারের ঢেউ তীরভূমি ভাসাইয়া দিল। প্রকৃতি কেবল তাহার প্রাপ্য খুঁজিতেছে। মানবীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ এক ব্যক্তির মতে, এবং এই প্রাপ্য আদায় করিতে, রূপণ যেমন ধার শোধ করিতে এক দিন বিলম্ব হইলেও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে ও কড়া তাগিদ দেয়, হীনচিত্ত ব্যক্তিও ঠিক সেই মত কার্য করে। কিন্তু মহৎ ব্যক্তি সমস্ত হিসাব ভগবানের জিহ্বায় রাখিয়া কার্যমনোবাক্যে তাঁর নিজের কাজ সমাধা করেন।

ধীর সহিষ্ণুতা দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল ব্যরণ নাই তার-
এই হইয়া আসিয়াছিল, সেই কাওয়াবিয়া গৃহিণী ভাবিলেন,
এখন তাঁর দিন আসিয়াছে। তাঁর স্বামীর মৃতদেহ
বাল্লেরে বেই বন্ধ হইল অতিনি তিনি সহিষ্ণুতার বন্ধন, যা
কত তার সহ্য করিয়াছে, একেবারে খুলিয়া দিলেন।
যাহাকে তিনি সর্বাঙ্গপেক্ষা ভয় করিতেন, সে ত চলিয়া
গিয়াছে; আর তার স্বপ্না হস্ত তাঁহাকে আঘাত করিবে
না। বোধ হইল যেন তিনি দেখাইতে চান, যে,
এতাবৎকাল তিনি যে চূপ করিয়াছিলেন, স্বীয় অসহায়
অবস্থা তার কারণ নয়। বহু পূর্বে যে টাকা ধার
দেওয়া হইয়াছিল এবং বহুদিনের শৈথিল্যে যাহাদের
স্বদের পরিমাণ, অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল; সেই সব
লোকের নিকট,—তিনি আপনাকে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী
বলিয়াই জানেন,—এ কথা নিশ্চিতরূপে বুকাইয়া দিয়া—
টাকার জন্য অতিমাত্রায় তাগিদ পাঠাইতে লাগিলেন।
স্বামীজীর রোষ-প্রবণতার মধ্যে প্রভেদ অনেক ছিল।
মৃত ব্যারণ বীরভাবে অসুপ্রাণিত ছিলেন, এবং বিরক্তি
জনক হইলেও, তাঁর ক্রোধের মধ্যে এমন একটা বেগ
ছিল যা দেখিয়া স্তম্ভ হয়; কিন্তু তাঁর জী ছিলেন স্বার্থ-
পর, সন্ধিহীন, সন্ধীর্ণমনা, আর পুরুষের নির্ভীকতা ত তাঁর
একেবারেই ছিল না। তাঁর মেজাজ একেবারেই অসহ্য;
ভৃত্যদের অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া উঠিল।

ইনিই নামির খাণ্ডী।

নূতন গৃহিণীঘের অনিশ্চিত মানসিক অবস্থার দরুণ
বিবাহের ঠিক পরেই প্রত্যেক নববধূর একটা পরীক্ষার
সময় আছে। স্বাক্ষরমাণ্ডে, * যেটা বিবাহিত জীবনের
আদব কার্যদা অসুসারেই প্রয়োজন, সেটা বর্জন করিয়া
অন্ত কোনো ক্যান্ডানে চুল বাঁধা যাইতে পারে। কিন্তু
কুরুমাওলা।† হয়ত তাহাকে ‘কুমারী’ বলিয়া সম্বোধন
করিবে, এবং যে রমণীর এ ভুলটী সংশোধন করিবার
সাহস নাই, সে তখন মহা কাঁপরে পড়ে। বাড়ীতে

আবার ভৃত্যগণে তাহাকে ‘কর্তা ঠাকুরাণী’ বলিয়া
উদ্ভাস্ত করিয়া তুলিবে। এ সম্বোধন সে এখনো বরদাস্ত
করিতে পারে না। কিন্তু শীঘ্রই সে তার নূতন অবস্থা
বুঝিয়া লয়, এবং এতদিন যাহা লজ্জার অস্পষ্ট আবরণের
মধ্য হইতে সামান্য মাত্র বৃদ্ধিতে সমর্থ হইয়াছিল, এখন
সেই সব চারিদিককার ব্যাপারের আসল মুষ্টিটা দেখিতে
পায়। এখন নামি তার জীবনের এই অবস্থার পৌছিয়া-
ছিল।

প্রত্যেক পরিবারের চালচলন ধরণধারণ বিভিন্ন
প্রকারের। সেই হেতু পুরাতন বাড়ীর আদর্শের সহিত
নূতনের তুলনা না করা, এবং এখন হইতে, নামি-
কাতাওকা চলিয়া গিয়াছে, এ কথা না ভোলা; এবং
তাহাকে এক নূতন নামি-কাওয়াবিয়া হইতে হইবে—
এই কথাগুলি, সে যখন বধূসজ্জার সজ্জিত হইয়াছে ও
গাড়ী যাত্রার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তখন তার পিতা
আন্তরিক স্নেহের সহিত তাহাকে বলিয়াছিলেন। উপ-
দেশটি তার ভালরূপই মনে ছিল; নূতন গৃহে পৌছিয়া
সে দেখিল পার্শ্বকাটা বিস্ময়কর। কাওয়াবিয়া পরি-
বারের সম্পত্তি তার পিতার সম্পত্তি অপেক্ষা হয়ত
অধিক ছিল। নূতন অভিজাতবর্গের মধ্যে যারা
সর্বশ্রেষ্ঠ, এ পরিবার তাদেরই অন্ততম বলিয়া বিবেচিত
হইত; কারণ তাকেও পিতা শাসনকর্তারূপে কার্য
কালে বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সে কিন্তু
দেখিতে পাইল তার পিতার ধ্যাতির জন্য কাতাওকা
পরিবার কত জনপ্রিয়, ও সেখানে সবই স্বর্বে্যাদয়ের
মত উজ্জল; কিন্তু এখানে সবই ডোবার মত বন্ধ,
নিশ্চল। কুটূষ ছিল না, পরিচিতির সংখ্যাও বেশী
নয়, এমন কি বাহার্য্য তাকেও পিতা বর্তমানে আসিত
তার ও তাঁর মৃত্যুর পর আসা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর
বিধবা একেবারেই মিস্তক ছিলেন না। বাটীর কর্তা,
যে বাটীর পৌরব প্রতিষ্ঠা করিবে, তার বয়স অল্প, সে
নিম্নপদের কর্মচারী এবং অধিকাংশ সময়ই বাটীতে
থাকে না। নামির বিষাতা নূতন উজ্জল সামগ্রী পছন্দ

* এক প্রকার বোঁপা

† কুরুমা অর্থাৎ রিক্স বা বাস্তুব টানা গাড়ী

করিতেন; তিনি গৃহীণীনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর অকৃত উপায়ে ব্যয় সম্বলান ধৈর্য কখনো কখনো কৃত্যাত্মক নিন্দা করিত—প্রাত্যহিক ব্যাপারে তাদের কাণ্ডজ্ঞান পুরোমাত্রায় বর্তমান ছিল। কিন্তু যে বা বলুক, সৈনিকের সংশ্রবে যেকোনো হওয়া স্বাভাবিক, মোটের উপর সেখানে সবই সেরূপ জমকালো ও মূল্যবান। কিন্তু এ নূতন গৃহে কি পার্ক্য। পুরাণো প্রথা ও অসভ্য গ্রাম্য রীতিগুলিকে ইহার আঁকড়িয়া রহিয়াছে, যেন জগতে এ কোনোই একমাত্র রীতি। বিধবার গৃহীণীপনার প্রণালী, ত্রিশ বৎসর আগে সে যখন এক দরিদ্র ‘সামুয়াইয়ের’ গৃহীণী, তখন যেমন এখনো তেমনি ছিল। সবই নিজে বন্দোবস্ত করা, বা আগে আগে অনিবার্য কারণে করিতে হইত—এই অভ্যাসটা এখন স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। তাকাকি নামক এক সাধাসিধে ভাল মানুষ সামান্য কৃত্যকে ভাঙারী নিযুক্ত করিয়া তিনি নিজেই আলানি কাঠ, করলা, প্রকৃতি প্রত্যেক জিনিসের মাসিক ব্যয়ের হিসাব করিতেন। এইরূপ অবস্থায়, এমন সময় ইকু পরিচারিকারূপে নামির সহিত আসিল। বিধবা সন্নিহনে বলিল; “এই নামজাদা পরিবারগুলোর কি চাল।” আসল কথা বলিতে কি, ইকুর অসঙ্গমহচক মন্তব্যে বিধবার কোথ যে তার বহিষ্কৃত হওয়ার একমাত্র কারণ, কি না বলা কঠিন।

বুদ্ধিমত্তা হইলেও বধু অল্পবয়স্কা; সেহেতু সে যে হঠাৎ নূতন গৃহের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের চালচলনের সহিত মিলাইয়া চলিতে অক্ষম হইল, ইহাতে বিনয়ের কিছুই নাই। কিন্তু নামি পিতার উপদেশের গুরুত্ব ভালরকমই বুঝিত, সে নূতন অবস্থার স্রোতে গা তাসাইয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল। তার সংকল্প পরীক্ষা করিবার একটা সুযোগও নিকটেই ছিল। ইকাও হইতে কিরিবার অনতিকাল পরেই তাকেওর প্রতি সমুদ্র ভ্রমণের আদেশ হইল। নামিকের সহিত তার বিবাহ হইয়াছে, সে যেহেতু নামি মধ্যে মধ্যে বিচ্ছেদের ভয়

সম্পূর্ণ প্রভুত ছিল, কিন্তু মিলনের পর এত দীর্ঘই বিচ্ছেদ, ইহাতে তার হৃদয় প্রায় ভাঙিয়া বাইবার উপক্রম হইল, কিছুকাল সে ভ্রান্ত হইয়া রহিল।

নামির সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পূর্বে নামির পিতার সহিত তাকেওর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পিতা তাহাকে খুব পছন্দ করিয়াছিলেন, সে পিতার কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বিবাহ করিল। ফলে সে যে ঠিক কাজ করিয়াছে তাহা প্রমাণিত হইল। সে দেখিল তাকেও উচ্চমনা নির্ভীক পুরুষ, সরলতা তার মজাগত এবং হৃদয় স্নেহপ্রবণ; তার মধ্যে নীচতার কণামাত্রও নাই সে তার প্রিয় পিতার যেন ক্ষুদ্র ছবি। এমন কি তার দীর্ঘ পদক্ষেপে জোলা চালে চলিবার ধরণ ও শিশুর মত হাসি তার পিতারই অনুরূপ। এমন স্বামীর সহিত থাকিতে কত সুখ! সে সমস্ত হৃদয় দিয়া স্বামীকে ভালবাসিত। তাকেওরও এই প্রেমময়ী পত্নীর প্রতি গভীর ভালবাসা জন্মিল। সে পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তার মনে হইল সে একই সঙ্গে স্ত্রী ও ভগ্নী দুই পাইয়াছে। সে শোভাগ করিয়া পত্নীকে তার নিজের প্রিয় “নামি-সান্” বলিয়া ডাকিত। বিবাহের পর এখনো তিন মাস অতীত হয় নাই, কিন্তু তারা উভয়ে উভয়কে এত ভালবাসিত যেন তারা পূর্বজন্ম হইতে পরিচিত; তাই অল্পকালের ভ্রম হইলেও, বিচ্ছেদের দুঃখ উভয়েরই অসহ্যপ্রায় হইয়াছিল।

নামি কিন্তু দুঃখে বেশী দিন কাঁদিতে পারে নাই। তাকেও চলিয়া বাইবার পরই তার খাত্তী কঠিন বাত রোগে আক্রান্ত হইলেন ও তাঁর স্বাভাবিক কোথ খুব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। পরে ইকু যখন চলিয়া গেল, তখন বেচারী নামি বিশেষ কষ্টে পড়িল।

নূতন ‘ক্যাডেট’কে পুরাতনেরা কিছুকাল আলাতন করে, কিন্তু বৎসর খানেক অতীত হইলেই, সে-ই নিজে আবার নবাগতদিগকে বিরক্ত করিয়া বত আনন্দ পায়, তত আর কিছুতে পায় না। নূতন যখন খণ্ডরালগে আসিয়া ছিল, তখনকার কষ্ট খাত্তী খুব ভালরকমই জানে;

বধূর সহিত অস্ত্রায় ব্যবহার করা তার কখনো উচিত নয়। কিন্তু মানুষের স্বভাব এমনি দুর্বল যে, যৌবনের ফুল শুকাইয়া গেলে যখন সে আপনাকে ঋণাত্মক অবস্থায় হানাত্বরিত দেখিতে পায়, তখন তার অত্যাচারী স্বভাব মাথা তুলে এবং যে ঋণাত্মককে সে এত ঘৃণা করিত সে নিজে ঠিক সেই ঋণাত্মক হইয়া দাঁড়ায়।

“এই দেখ চণ্ডারু তুল করেছে। এটা চার ইঞ্চি করে এই রকম করে ঘোরাও। আঃ কি বিপদ!” সে বধূকে বলে, “অমন করে নয়। দাও দাও আমাকে দাও। অবাক করলে, তুমি এ বিশ বছর ঘুমে ছিলে না কি? হঁ, তুমি আমার গিন্নী হতে চাও।” এই অবস্থায় যদি বিগত সময়ের একটা বিক্রমপূর্ণ কণ্ঠস্বর ও মুখভঙ্গী মনে পড়ে বাহা একদা তার নিকট ভেমনি ঋণাত্মক ছিল যেমন এই বধূটির নিকট, যে তাহারি সামনে বসিয়া আছে, তবে হয়ত তার হৃৎক হইতে পারে এবং এমন কি গোপনে হয়ত সে নিজ ব্যবহার সংশোধন করিবার চেষ্টাও করিতে পারে,—এমন জীলোক অসাধারণ। অনেকেই “নাকের বদলে নাক” এই নীতির অনুসরণ করে, এবং ‘বুদো’র ঋণাত্মক যে ক্ষতি করিয়াছে ‘উদো’র জীর উপর সে অত্যাচারে প্রতিশোধ লয়। এইরূপে তারা অজান্তসারে নিজেদের জীবনে প্রতিশোধ দিবার জন্য ব্যস্ত হয়। নারির ঋণাত্মক এই ধরণের লোক। সাহেবি-ধরণের বিমাতার অধীনে থাকিয়া আবার সেকলে-ধরণের ঋণাত্মক হাতে লালিত হওয়া—এমনি বেচারী নারির অদৃষ্ট। অনেক সময়ে নারি রোগ শয্যায় শায়িত হুজা বিধবার হৃৎক যেখান হৃৎকিত হইয়া তাহাকে সেবা করিতে বাইত। কিন্তু এ কার্যে সে অনভ্যস্ত ছিল, তাই তার সমুদয় চেষ্টা রোগিনীর কখনো মনঃপূত হইত না। নারিকে বিধবা একবার ধন্যবাদ দিয়া পরকণ্ঠেই ইচ্ছাপূর্বক পরিচারিকাকে এমন উচ্চ বিকট স্বরে ভৎসনা করিতেন যে দশ বৎসর ধরিয়া বিমাতার ব্যাকোক্তি শুনিতে অভ্যস্ত নারিরও ভয় করিত। প্রথম করেক সপ্তাহ এইরূপ চলিয়াছিল;

তারপর আক্রমণটা সোজাসোজি নারির উপরই হইত। বাটার মধ্যে একমাত্র সদয় ব্যক্তি ইকুও যখন বিদায় হইল, তখন কখন কখন নারির মনে হইত সে যেন তার অতীত দিবসের নিরানন্দ কোণে ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন সে ঘরের মধ্যে গিয়া টেবিলের উপর রূপার ফ্রেমে বাঁধানো বলিষ্ঠ সৈনিকের নির্ঝাক ছবিখানি দেখিত, তখন তার সমস্ত ভাবনা দূর হইয়া বাইত। ছবিখানি হাতে করিয়া তুলিতে তুলিতে তার হৃদয় মেহে কোমলতায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। প্রাণ ভরিয়া সে ছবিখানি দেখিত, চুপন করিত, বুক চাপিয়া ধরিত এবং ছবিখানি যেন শুনিতে পাইতেছে, এমনি ভাবে চুপে চুপে বলিত—“ফিরে এস, শীগ্গির ফিরে এস, প্রিয়তম।” প্রিয়তমের জন্য সে হঠাৎ সকল কষ্ট সহ্য করিবে, ও আপনা ভুলিয়া ঋণাত্মক সেবা করিবে।

শ্রীহেমলিনী রায়।

নিবেদন ।

যখন আপনাতুলি চিন্তি তোমা জগতরে,
অন্তরের মলিনতা চলে যায় কত দূরে।
পবিত্র স্তম্ভর ভাবে হয় যদি ভরপুর,
হৃদয় বীণার তারে উঠে কি নূতন সুর।
বিশ্বময় সব দেখি পুণ্য পবিত্রতা মাথা,
স্বর্গীয় প্রভার যেন ধরিত্রী প্রকৃতি ঢাকা।
আবার যখন হই আপনাতে নিমগন,
সে স্তম্ভর ভাবরাশি কোথা করে পলায়ন।
ভুলে যাই প্রভু তোমা, অনন্ত করুণাময়,
তাবিশুধু আপনাতে, স্বার্থে নিমজ্জিত হয়ে।
প্রার্থনা তোমার পদে যে বিকৃত জগতস্বামী,
বড় ক্ষুদ্র হীনমতি ছুঁতাতো তোমার আমি।

দাও বোর চিন্তে আনি হেন শক্তি দয়াময়,
বাত্রে সে স্বর্গীয়তাব হৃদে চিরস্থায়ী হয়।
কছু নাহি ভুলি তোমা, হৃদয়মন্দিরে রাখি,
বানস কুম্ভে পূজি প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা মাখি।

শ্রীচাক্রবাল্য গুণ্ডা।

অর্দ্ধকালী

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ মহকুমার অধীন
নুওসিদ্ধ মিতরা গ্রাম বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট পরম তীর্থ
বলিয়া পরিগণিত। ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর পূর্বে
ভগবতী যোগমায়ার অর্দ্ধকালী মূর্তিতে এই গ্রামে আবির্ভূত
হন। আজিও সেই দেবীর লোকাভীত মহিমা পূর্ব ও
উত্তর বঙ্গের সর্বত্র ভিখারীর কুটীর হইতে ধনীর প্রাসাদ
পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এবং প্রত্যহ মধুর প্রভাতে
অর্দ্ধকালীর পুণ্য নাম আবালবৃদ্ধের মুখশ্রীতে ভক্তি-
মিশ্রিত আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলিতেছে।

পতিগৃহ গমনকালে আমরা দেবীর মুখে যে দর্শনমূলক
উপদেশ শুনিতে পাই উহা উজ্জ্বল তারকার জ্য
প্রজ্বলিত হইয়া সাধকশ্রেষ্ঠ বিজয়দেবের প্রশান্ত হৃদয়ে
পরিপূর্ণ শক্তিরূপে প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছিল, এবং
তাহারই ফলে তিনি নিজ জীবনকে মহৎ আদর্শে গঠিত
করিয়া ভূমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত মুক্তাগাছার অতি নিকট
বর্তী পণ্ডিতবাড়ী গ্রামে সাধক বিজয়দেব বাস করিতেন।
তিনি পূর্বজন্মে দেবী যোগমায়ার আরাধনা করিয়া
প্রেম ও সত্যকে জীবনের সঙ্গী করিয়াছিলেন। তাই
সত্যের পুণ্যালোক তি নি দেখিতে পাইলেন, চিরময়ী
দেবীর বিচিত্র মূর্তি জড়রূপে সৃষ্টি করিতে না পারিলে
আত্মা হইতে পাপ-মলিনতা সম্পূর্ণরূপে প্রকালিত হয় না।

তিনি বুঝিলেন দেবী সম্মুখে আবির্ভূতা না হইলে
জীবাত্মার ভগবতী যোগমায়ার স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয় না।
প্রার্থনা, বিশ্বাস, সত্য ও ধৈর্য্য এই চারিটি কার্যের
অনুষ্ঠান দ্বারা সাধক বিজয়দেব নিজ অতীষ্ট পথে অগ্রসর
হইলেন। মাতৃরূপিনী ভগবতী সন্তান বাৎসল্যে মুগ্ধ,
তিনিই সাধকশিশুর জীবনের শক্তি ও মুক্তি। তিনি
দেখিলেন তাঁহার ভক্ত সন্তান জ্য, সত্য ও ধর্মের অনুষ্ঠান
দ্বারা তাঁহাকে কতরূপে লাভ করিতে উদ্ভত। পরীক্ষা
না করিয়া ভাগবতী শক্তি কর্ণমণ্ড জীবাত্মার নিকট জড়
দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূতা হন না—তিনি ভালবাসা
মাখিয়া ভক্তের প্রাণের ভক্তি-তন্ত্রী স্পর্শ করিলেন।
যা যেই বুঝিলেন এই হৃদয় খাঁটি, অবনি তিনি আপন
ক্রোড়ে ভক্তের মাথাটি রাখিয়া হাত বুলাইতে লাগিলেন।
বিজয়দেব চক্ষু মেলিয়া চারিদিকেই সুন্দর বস্তু দেখিতে
লাগিলেন।—দেবী বলিলেন,—

“বাবা, তুমি আমার প্রিয় শিশু। আমি আছি,
এই দেখ তোমাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছি, তোমার
কোন ভয় নাই।”

সাধক বলিলেন,—

“মা, আমি প্রকৃত শান্তির অশ্রু ব্যাকুল হইয়াছি।
মাগে, তুমি আমার মনশ্চক্ষুর নিকট হইতে আর
তিরোহিত হইও না। কোন্ শুভ দিনে তোমাকে নিজ
গৃহে কতরূপে পাইয়া এই তপ্ত হৃদয় শান্ত হইবে?”

মানবের ধর্ম জীবনের ইতিহাসে দেখিতে পাই

—‘দেবীভক্ত্যানুগত্যেহ জগতি ন করোতি কিং?’

ভক্তের প্রার্থনানুসারে ভগবতী যোগমায়ার অঙ্গগ্রহণ
পূর্বক জয়চূর্ণা নামে খ্যাত হইয়া পণ্ডিতবাড়ী গ্রামে
অধিষ্ঠিতা হইলেন।

সাধু বিজয়দেব সত্যের ভিত্তির উপর ভৃঙ্করূপে দণ্ডায়মান
হইয়াছেন—জয়চূর্ণাকে কন্যারূপে লাভ করিয়া তিনি
প্রকৃত চিন্তে চতুর্দশ বর্ষ ও অধ্যবসায় সহকারে সাধনার
পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি রিপুঞ্জী—
জানালোকে তাঁহার প্রাণ পরিপূর্ণ, সংসারে থাকিয়াও

তিনি মুক্ত। ক্ষুদ্র শিশুকে কোলে বসাইয়া সাধকশ্রেষ্ঠ
সাম্বলার গীতি গাহিয়া আনন্দতপ্ত।

একদা শিবরূপী ভগবান্ রাঘবরাম বিজয়দেবের টোলে
শাস্ত্রাধ্যয়ন ছলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ‘রাঘব
খাতে’ মন্ত্র ধরা ইহার যোগজীবনের প্রধান ও প্রথম
ঘটনা। যোগ-পরায়ণ রাঘবরাম যাত্রাপ্রভাবে অস্ত্রাস্ত্র
সমপাসিধেরে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন।

বিজয়দেব শিষ্যদের মুখে এই অলৌকিক ঘটনার
প্রকৃত রহস্য অবগত হইয়া রাঘবরামকে নিজ কন্যা
জয়দুর্গার শিবসুন্দরের মত উপযুক্ত বর বলিয়া স্থির
করিলেন।

শুভ দিনে অমৃতময়—তেজোময় মহাপুরুষ রাঘবরাম
জয়দুর্গারূপিনী মহাশক্তির সহিত মিলিত হইলেন। সেই
অপূর্ব শুভসম্মিলন নিজ চক্ষে দেখিয়া বিষয়াসক্ত নর-
নারী ধন্য ও কৃতার্থ হইল।

হর-গৌরীর মিলন অন্তরে ও বাহিরে অনুভব করিয়া
সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তত্ত্বিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির অন্য
পথ হিন্দু জানে না। সমস্ত জগৎ এই আদর্শ দম্পতীর
প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।
সুনীল আকাশে শুভ্র নীরদধোপরি স্বর্ষ্যাকিরণ
প্রতিফলিত; প্রকৃতি সুনন্দী উজ্জল মরকত পরিচ্ছদে
ভূষিত হইয়া শ্রামল কনকাকল প্রসারিত করিয়া রূপের
ছটায় চারিদিক উজ্জল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই সংসার
সেই লীলাময়ী মহামায়ার খেলাঘর,—তিনি প্রতিনিয়ত
এই খেলাঘরে কত ভাঙ্গাগড়ার খেলা খেলিতেছেন।

যোগমায়ার শিবসুন্দরের সহিত মিলিত হইয়া শঙ্করা-
লয় মিতরায় চলিয়াছেন। প্রকৃতি রাণী শত শত কুসুমের
গন্ধতার চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া তাপদগ্ধ সংসারিককে
বেন উদ্দেশ করিয়া হাসিমুখে বলিতেছে,—

“জীবন-সংগ্রামের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরের জড়মূর্ত্তি
দেখিয়া আনন্দভূগু লাভ কর। এই যুগলমূর্ত্তিই ধর্ম-
জীবনের পূর্ণ বিকাশ।”

রমিতা গ্রামে অর্দ্ধকালী চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা

হইয়াছিলেন। মিতরায় কেন দেবীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল?

এ সম্বন্ধে ‘রাঘবদীপিকা’-লেখক বলেন,—

“মিতরা শব্দের বৈয়াকরণ বা যৌগিক অর্থ এই—
ভূমিঞ ক্ষপে—মি ধাতু ক্ত প্রত্যয়ান্ত করিয়া মিত শব্দ
নিষ্পন্ন। তৎপরে রা শব্দে ধন বুঝায় কিন্তু ধন বলিলে
সাধারণ লোকে যাহা বুঝে মহাআগণ তাহা বুঝেন না।
তাহারা ধন বলিলে কেবল শমাদি সম্পত্তি বুঝিয়া
থাকেন। তাহা হইলে পদময় মিলিত হইয়া এই বুঝায়—
“মিতাঃ ক্ষিপ্তা রাঃ শমাদি সম্পদো যত্র” যে স্থানে শমাদি
সম্পত্তি নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ, যে সম্পত্তি না থাকিলে
মহুগ্ধগণ মহুগ্ধচন্দ্রাবত পশু, যাহা প্রাপ্ত হইলে সার্কভৌম
পদও ত্বণবৎ তুচ্ছ অনুমিত হয়, যাহার সংরক্ষণ ও
পরিপোষণের জন্য পূর্বতন মহর্ষিগণ গহনে বিরাজ
করিতেন, যাহার পরিষ্করণ হইলে মন সমস্ত বিষয় ভুলিয়া
নিরন্তর পরমানন্দ-তরঙ্গে ভাসিতে থাকে, যাহা আমাদের
পূর্বপুরুষীয় মহাআগণের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজ করিত,
যাহার গুরুত্ব ও মধুরতা, নিরোধশক্তি-পরায়ণ অন্তঃসারবান
মহাআগণ ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না, সেই নিরোধ-
সমুত শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, ভক্তি,
ক্ষমা, দয়া, আর্জব, শৌচ, সন্তোষ, বিবেক, বৈরাগ্য,
শান্তি, আত্মানুভূতি ও পরমাশ্রুতি প্রভৃতি সম্পত্তিগুলি
যে স্থানে স্থিত হইয়া বিশেষ যত্নপূরঃসর নিবিষ্ট হইলে,
স্থানীয় প্রকৃত বল হৃদয়ে পরিষ্কৃত হয় সেই স্থানই
মিতরা।”

দেবী অর্দ্ধকালীর গৌরনৌল ও চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে প্রকাশ
হইবার নিগূঢ় কারণ কি? সাধকের অচলা ভক্তির প্রবল
আকর্ষণে ভগবান্ বা ভগবতী জড়দেহ ধারণ করিয়া
সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন ভক্ত যে যে রূপে
আরাধ্য দেবতাকে দেখিতে চায়, তিনি তাহাকে সেই
রূপেই দর্শন দিয়া থাকেন। এখানেও তাই বেন
হইয়াছিল। যিনি ইঞ্জিয় ও মনের অপোচর, সেই
ভগবতী মহামায়া অপরূপ চতুর্ভুজা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া

অমৃত নয় করে উপস্থিত জন মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া আশ্বাসবাণী দিয়াছিলেন। দেবী কহিলেন,—

“বৎসগণ, তোমরা উৎকৃষ্ট কল্যাণ সম্পন্ন হইয়া সংসারে অধিষ্ঠান কর। আইস, আমার কাছে আইস। আমার কাছে আইস। আহা তোমরা আমার কল্প কত না রেশ পাইয়াছ, কত না যাতনা সহিয়াছ। তোমরা আমার হৃদয়ের ধন। তোমাদের অনন্ত দুঃখের অবসান হউক, ‘মায়ামুক্ত’ হইয়া নিত্য নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দে তোমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক।”

সকলে ‘জয় অর্দ্ধকালীদ জয়’ নামে দশদিক মুখরিত করিয়া তুলিল। বিশ্বত্রঙ্কাত আনন্দময় ‘মা—মা’ ধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

বাংলার গৃহে গৃহে সর্বমঙ্গলার আবাহন শ্রীতি ধ্বনিত হইতেছে। মঙ্গল শব্দ ও কাসর বাজিয়া উঠিল। আজ দেবী-পূজা। অশুদ্ধ চণ্ডী পাঠ করিয়া রাঘবরামের বিশাল নয়নদ্বয় কোণে ও কোণে জলিতেছে। ক্ষুদ্র বালক রামেশ্বর হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত প্রভৃতির উচ্চারণে পিতার ভুল ধরিয়াছেন। দীর্ঘে হ্রস্বের কীর্তন, হ্রস্বে দীর্ঘের কীর্তন, বিন্দু, বিসর্গের লোপ ও বর্ণের বিপর্যয়ে আজিকার চণ্ডীপাঠ বিফল হইয়াছে। অপমানের তীব্র হলাহলে শিবসুন্দরের ঐর্ষ্যাচ্যুতি ঘটয়াছে। তিনি বঙ্গগভীরতরে পুত্রকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন,—

“আমার অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠের বিষম ফল যেন তোমাতেই পর্যাপ্ত হয়। আমি আরও বলি আমার বংশে কেহই যেন চণ্ডী পাঠ করে না।”

আজিও ৮ অর্দ্ধকালী বংশে দুর্গাপূজার সময় চণ্ডী পাঠ হয় না।

গৌরনীনলিতাংদেবীং কলৌ কুল বিলাসিনীং ।

যোগমায়াং মহাকায়াং নমামি রাঘবান্ধন্যং ॥

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

ঢাকার খাজালির মসজিদ ।

খাজালি সাহেব পাঠানবুগের একজন অল্পতরুণ কৃতী পুরুষ। বাটগলুজ ও খাজালির রোজা নামক ইতিহাস প্রসিদ্ধ অট্টালিকাঘর এবং ঠাকুরদীঘি, পচাদীঘি ও ঘোড়াদীঘি প্রভৃতি বিশাল সরবরসমূহ বাগেরহাটের উপকণ্ঠে বিস্তৃত থাকিয়া এখনও তাহার কীর্তিকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। বাগেরহাটের কীর্তি ব্যতীত খুলনা জেলার আমাদৌল ও মসজিদকুড় এবং ষশোহর সহরে খাজালি সাহেব ও তাহার সহচরগণের মসজিদ ও দরগা প্রভৃতি বর্তমান। ষশোহর হইতে বাগেরহাট এবং তথা হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত দুইটি সুপ্রশস্ত রাজবংশ ও খাজালি সাহেবের কৃত বলিয়া বিখ্যাত। ইহা ব্যতীত তাহার আর কোনও কীর্তির কথা আমরা অবগত নহি।

কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ব্রহ্মদাস সাহেব নিজ ঢাকা সহরের চুড়ীহাটা মহলের মসজিদটী খাজালি সাহেবের নিৰ্ম্মিত বলিয়া অনুমান করেন * । উক্ত মসজিদগাত্রে শীলালিপি পাঠে জানা যায় যে নাসির-উদ্দীন আবুল মোতাক্কর মহম্মদ শাহ রাজত্বকালে হিজিরা ৮৬৩ সালের ২০ শে শাবন (১৪৫৯ খৃঃ ১৩ই জুন) তারিখে বাজেজাহান উপাধিধারী জৈনক খাঁ কর্তৃক এই মসজিদ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে।

বাগেরহাটের খাজালি সাহেবের সমাধি মন্দিরগাত্রেও লিখিত আছে যে হিজিরা ৮৬৩ সালের ২৬ শে জিলহিজ্জা (১৪৫৯ খৃঃ ২৬ শে অক্টোবর) বুধবার রাত্রিতে পুণ্যলোক খাজালি সাহেব নব্বয়দেহ পরিত্যাগ পূর্বক দিব্যাধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

উত্তর স্থলের শীলাফলক লিখিত সময়ের তুলনা এবং নামের সাদৃশ্য দৃষ্টে যিঃ ব্রহ্মদাসের এই অনুমান অধৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। ঢাকার ভায় মুসলমান

* Mr. Blochman's notes on Arabic and Persian inscription in J. A. S. B, Part I, 1872 pp 109 and 108.

প্রধান প্রাচীন সহরের বহুসংখ্যক অধিবাসিবর্গের জন্য খাজালি সাহেবের দ্বারা সম্পদশালী ভগবন্তজ্ঞ পুরুষের একটা মসজিদ নির্মাণ করিয়া দেওয়া খুব অসম্ভব নহে— তবে ইহা অসম্ভব নাহি।

প্রকৃত পক্ষে ঢাকার মসজিদ নির্মাণকারী ‘খাজে জাহান’ এবং বাগেরহাটের ‘খাঁ জাহান আলি’ অভিন্ন কি না, উভয়ে অভিন্ন হইলে খাজালি সাহেব কি হুজ্জে ঢাকার মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ঢাকার তাহার অন্য কোনও কীর্তিচিহ্ন আছে কি না এ সম্বন্ধে অসুসঙ্গ হওয়া আবশ্যিক।

ঢাকার কোনও উত্তমশীল সাহিত্যসেবীকে আমরা এই তথ্য নির্ণয়ে অগ্রসর হইতে দেখিলে আনন্দিত হইব।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

খুলনার খাজালী মসজিদ।*

পুরাকালে খুলনা জেলা প্রাচীন বঙ্গ অথবা সমতট সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল। তদনন্তর তাহা রাজা বল্লাল সেন প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদেশের বাগ্‌দী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিম্বদন্তী এই যে, খাজালী নামে জনৈক মুসলমানের সময়ে উহা প্রখ্যাত হইয়া উঠে। খাজালী সার্ব্বচারিশত বর্ষ পূর্বে খুলনা জেলায় আগমন করেন। তিনি যে কোন্ স্থান হইতে শুভাগমন করিয়াছিলেন তাহা স্থির করা নিতান্ত দুষ্কর। তবে কেহ কেহ বলেন, তিনি লোদী বংশের রাজত্বকালে দীল্লি হইতে কোন কার্য্যান্তরোধে এইস্থানে প্রেরিত হইলেন। ইনি অত্যন্ত সুচতুর লোক ছিলেন। ইনি পৌড়রাজের নিকট হইতে একটি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সুন্দর-

বন জঙ্গলাবৃত দেখিয়া তাহার বহুমান পরিষ্কার করতঃ কৃষিকার্য্যে রূপাণ নিযুক্ত করেন। এই প্রকারে তিনি আজীবন এই সকল ভূখণ্ড লইয়া স্বাধীন রাজার দ্বারা প্রজাপালন ও শাসন করিয়া আসিতে ছিলেন। অবশেষে তাঁহার ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তিনি এই প্রদেশ মসজিদও কবরে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তাহার ভগ্নাবশেষ অধুনা বাগের হাট ও মসজিদকূড়ে পরিদৃষ্ট হয়।

আমরা আজ পাঠক পাঠিকাদিগের জন্য উক্ত স্থানের কতিপয় ঐতিহাসিক বিবরণ এইস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। অধুনা আমরা খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমায় কয়েকটি পুরাতন মসজিদ সম্বন্ধে কতিপয় বিবরণ বর্ণনা করিব। এই স্থানের একটি মসজিদ পায়ে পারস্ত ভাষায় কতিপয় ছন্দে লিখিত আছে। তাহার অর্থ আমরা এইস্থলে প্রদান করিলাম উক্ত পারস্ত লিপির অর্থ এই,—“যতপি কেহ অর্থলিপ্সু হইয়া থাক তাহা হইলে সে এই মসজিদ সমূহের চতুর্দিকে ৩০, ৪০ বিঘা ভূমী খনন করিলে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইবে।” এই প্রকার লিখিবার বা কৌশল অবলম্বন করিবার হেতুবাদ নিয়ে প্রদান করিতেছি। জমি গভীররূপে খনন করিলে তাহার উর্বরাশক্তি অত্যধিক পরিমাণে বর্ধিত হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া কৃষি-কার্য্যোপলক্ষে এবং প্রকারে সুচলিত রূপে খনন করিয়া শস্ত রোপন করিতে পারে না। অপিচ, অর্থলিপ্সু হইয়া যতপি কেহ ভূমি খনন কার্য্যে ব্যাপ্ত হয়, তবে তাহার কার্য্যই সমধিক সন্তোষ জনক হইয়া থাকে। এইরূপ চিন্তা করিয়া খাজালী ৩০, ৪০ বিঘা জমির মধ্যে অর্থ লুকায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অর্থ-গুপ্ত ব্যক্তিগণ খননোত্তে প্রাপ্ত মসজিদের চতুঃপার্শ্বে বহুশত বিঘা জমি সুগভীররূপে খনন করিয়া ফেলিয়াছিল। অদৃষ্টক্রমে বহু লোকে উহার সন্নিহিতবর্তী স্থানেই বহু অর্থ লাভ করিয়া দৈন্যদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। তাঁহার কৌশল কোন প্রকারেই অপ্রশংসার বোধ্য নহে। বর্তমান সময়ে উক্ত মসজিদের চতুঃপার্শ্বের বহুবিঘা

* আবার Indian Antiquary তে একশিষ্ট প্রবন্ধের বর্ণনা-
বাদ।

জমি শতশালিনী হইয়া স্বর্ণ প্রসব করিতেছে। ইহাও ধনন কার্যের বিশেষ ফল বলিতে হইবে। পরন্তু যে পরিমাণ অর্থ ভূমধ্যে প্রোথিত করা হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ মাত্র ব্যয় করিলেই জমির উর্বরাশক্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইত ভবিষ্যে অল্পমাত্রও সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তদীয় হস্তে প্রচুর অর্থ ছিল বলিয়া তিনি ঐ প্রকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তবে বহুস্বত্বক ঐ স্থানের জমি ধনন করিয়া ধনী হইয়া পড়িয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

বাট-ঘোমট।

মসজিদের কারুকার্য অত্যন্ত পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহার পূর্বভাগে একটি সুবিশাল “হল” দৃষ্ট হয়। তাহার সহিত মসজিদের কোন সম্বন্ধ নাই ছুটিই স্বতন্ত্র অট্টালিকা। বর্তমান আলোচ্য ‘হল’টি সুদৃঢ়রূপে গঠিত। উহা বস্তুতঃ দ্বারবিশিষ্ট। ইহাকেই বাট-ঘোমট বলে। ‘ঘোমট’ অর্থে দ্বার বুঝায়। অসুমান ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার চতুঃসীমা এমনই হইল :—বাট-ঘোমটের উত্তরে বাগের হাট রাস্তা। তাহার উত্তরে মগরা ও চিত্তারখোল গ্রামদ্বয় এবং হাওলী পরগণা। হাওলী পরগণার ঠিক উত্তরে ভৈরব নদী। দক্ষিণে মধুদিয়া পরগণা, খোস্তাকাটা চক ও চৌমোহনা নদী। পূর্বদিকে কাড়াপাড়া গ্রাম ও হাওলী পরগণা। পশ্চিমে বারাকপুর ও রাজদিয়া পরগণা। এই পরগণার সীমা ভৈরব নদী পর্যন্ত বিস্তৃত।

দীঘির বিবরণ।

রাজদিয়া পরগণার অন্তর্ভুক্ত বারাকপুর গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে। তাহাকে লোকে “ঘোড়াদীঘি” বলিয়া থাকে। উহা দৈর্ঘ্যে এক মাইলের অধিক হইবে। উক্ত দীঘি অত্যন্ত গভীর ও জল অতিশয় পরিষ্কার। “ঘোড়াদীঘি” প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৎস্যে পরিপূর্ণ। উহা মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। প্রাচুর্য

সুবিশাল হল “বাট-ঘোমটের” ঠিক পূর্বদিকে “ঠাকুর-দীঘি” বলিয়া একটি ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। উহার অপূর্ণ নাম “দেব-দীঘি” উহা দৈর্ঘ্যে অর্ধ মাইল হইবে। এই জলাশয়ই সর্বপেক্ষা সুগভীর বলিয়া তত্রস্থলের লোকে কহিয়া থাকে। এই ঠাকুর দীঘির ঠিক মধ্যস্থলে একটি দেওয়াল আছে। চৈত্র, বৈশাখ মাসে ঐ মন্দিরের শিরোভাগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বৎসরের অবশিষ্ট মাসে উহা জলমগ্ন থাকে। এই স্থানে আরও আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে। সেই দীঘির মধ্যে সুবহৎ কুতীরদ্বয় বিরাজ করিতেছে। আমরা অধুনা তাহার বিষয়ই বলিতে যাইব। লোকে তাহাদের “ধলা পাহাড়” ও “কাল পাহাড়” বলিয়া থাকে। নামানুযায়ী তাহাদের বর্ণও সূচিত হইতেছে। অর্থাৎ তন্মধ্যে একটি খেত ও অপরটি কাল। পূর্ববঙ্গে খেত বা শাদাকে “ধলা” বলিয়া থাকে। আমাদের মনে হয় “ধলা” ধবল শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। ধবল সংস্কৃতজ শব্দ স্মৃতরাং “ধলা” কথাটি নিতুল বলিতে হইবে। উক্ত জন্তদ্বয় বিলক্ষণ শাস্ত, শিষ্ট এবং প্রতিহিংসাবিরত। তাহারা কদাচ লোককৃতিকর ব্যাপারে বিনিযুক্ত হয় না। যতপি কেহ তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকে তাহারা তৎক্ষণাৎ বাটের দিকে ছুটিয়া যায়। তাহাদের আশা, তথায় বাইলে আহারোপযোগী খাদ্য যথেষ্ট মিলিবে। লোকে আদর করিয়া তাহাদের জন্ত পায়রা, মুরগী প্রভৃতি প্রদান করে। কখন কখনও কেহ কেহ সন্দেশ, চিনি, ইত্যাদি মিষ্ট সামগ্রীও দিয়া থাকে। তাহারাও স্বেচ্ছায় মুখ হাঁ করিয়া উক্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকে আমাদের বর্ণিত ঠাকুর দীঘির ঠিক পূর্ব ভাগে “পচা দীঘি” তিনপোয়া মাইল জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। “পচা দীঘি” দীঘির মধ্যে এক্ষণে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। অত্র বর্ণিত দীর্ঘিকাষর কাড়াপাড়া গ্রামের অন্তর্গত।

খুলনা পর্যন্ত জোয়ার ভাটার জোড়া বিলক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় স্মৃতরাং নজাদির জল জোয়ার দ্বারা পরিচালিত হইয়া লবণাক্ত হইয়া পড়ে। জলে অত্যধিক পরিমাণে

লবণের বিচ্যমানতা হেতু উক্ত বারি পানোপযোগী নহে।
এবস্থিৎ কারণ নিবন্ধন খুলনা, বাথরপঞ্জ প্রভৃতি জেলার
পুষ্করিণী দীঘি, কূপ ইত্যাদি হইতে পানীয় জলের
আহরণ হয়। এই স্থানের দীঘিকা ও কূপাদির প্রাচুর্য
বোধ হয় প্রাপ্তকারণেই হইয়া থাকিবে। চৌমোহানা-
নদী ঠাকুর দীঘির একটি বিপর্যয় সংসাধিত করিয়াছে।
উহা উক্ত দীঘির সহিত মিলিত হইয়া উহার জল লব-
নাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে সুতরাং উহা পানের সম্পূর্ণ
অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম ও তৃতীয় দীঘিকার
জল এত স্বচ্ছ, নিষ্কল ও স্বাস্থ্যপ্রদ যে বাগেরহাট বহু-
কুমার পানীয় জল সরবরাহ করিবার জন্য এই দীঘিকা-
ঘরেরসহিত পাইপ বা নলের সংযোগ করিয়া জল
লইয়া গেলে কি প্রকার হইতে পারে, বহুদূর হইতে
পাইপ দ্বারা জল সরবরাহ সুবিধা জনক কিনা ইত্যাদির
প্রস্তাব চলিতেছে। বহু বিজ্ঞ ডাক্তার এই স্থানের জল
পরীক্ষা করিয়া শারীরিক অবনতিবিধায়ক কোন বিষাক্ত
জীবাণু (Microbe, bacilli) প্রাপ্তহয়েন নাই।
কলিকাতার জ্বর কলের জলের ব্যবস্থা করিতে হইলে
যথেষ্ট শ্রমসাধ্য কার্য সংসাধন করিতে হয়। কলিকাতার
জলের কলের ব্যবস্থা এইরূপ। কলিকাতার বহির্ভাগ হইতে
পাইপ সাহায্যে জল লইয়া আসা হয়। তাহা রিজার্ভ
চৌবাচ্চার রাখিয়াদিলে উহার কর্দমা দি খিতাইয়া নিরে
পতিত হয় উহাকে “তলানী” বলে। পরে ঐ জল তথা
হইতে নীত হইয়া পরিষ্কৃত ও গরম করা হয়। সর্বশেষে
তাহা সংপেষণ-বস্ত্রের সাহায্যে গৃহেগৃহে সংযুক্ত পাইপ
দ্বারা কলিকাতার প্রতি গৃহে প্রেরণ করা হয়। যে জল
পরিষ্কার করিতে বহু আয়াস আবশ্যক হয় যতগুলি তাহা
যন্ত্রায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায় তবে আর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত
হইয়া কে তাহার অবহেলা করিতে প্রয়াসী হয়!
বাগেরহাটের অধিবাসীগণ পাইপ সংযোগে কাড়াপাড়া ও
বারাকপুর হইতে এমন পরিষ্কার জল প্রাপ্ত হইলে কম
সুবিধা হইবে না।

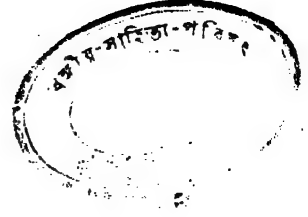
একণে আমরা খাজরালী সাহেবের মসজিদ প্রস্তুত

বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিয়া আমাদের প্রবন্ধের উপ-
সংহার করিব। কিম্বদন্তী এইরূপ যে তিনি বাগেরহাট ও
মসজিদকুড়ে তাহার কীর্্তি সংরক্ষণ মানসে বহুপয়সার
হইয়া অট্টালিকাদির সরঞ্জাম আনয়ন করিবার জন্য চিন্তা
করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রাম হইতে নৌকাসংযোগে
দ্রব্যাদি আনয়ন বিশেষ সুবিধাজনক স্থির করিয়া তথা
হইতেই সমগ্র উপকরণাদি লইয়া আসিবার মনন
করিলেন। খুলনা হইতে ভৈরব নদী হইয়া সুন্দর-
বনের মধ্যদিয়া চট্টগ্রামে সহজেই পৌছাইতে পারা
যায়। এমত সুবিধা পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে।
সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া খাজরালী সাহেব
চট্টগ্রামের একটি ক্ষমতাশালী ককিরের নিকট লোক
প্রেরণ করিলেন। সেই ক্ষমতাশালী ককির কিঞ্চিৎ
উদ্বত প্রকৃতির ছিল। সে তাহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া
অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিরলিখিতরূপ লিখিয়া পাঠাইল :—
“একরত্তি বাড়াণী তার চাটগাঁয়ে বরাং।” ইহার অর্থ
এই—খাজরালি, তুমি একখণ্ড ক্ষুদ্র জমির অধিকারী
হইয়া আমার জায় ফকিরের নিকট হকুম-নামা প্রেরণ
করিতে লজ্জাবোধ কর নাই। ইহা তোমার কম বেয়াদবী
নহে। আমি তোমাকে বাড়াণী * বা চাউল প্রস্তুত-
কারক বলিয়া মনে করি। তুমি এতদূর ক্ষুদ্র ব্যক্তি
হইয়া আমার নিকট হকুম-নামা প্রেরণ করিতে পার
না।” এইরূপ প্রত্যাশ্রয় পাইয়া খাজরালী অতিমাত্র
অপমানিত হইয়া অপর স্থান হইতে প্রস্তুত ও অস্তিত
আসবাব আনয়ন করিয়া মসজিদাদি প্রস্তুত করিতে
আরম্ভ করেন। অবশেষে সেই ককির তাহাকে একজন
বড় জায়গীরদার বলিয়া জানিতে পারিয়া তাহার নিকট
ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং পরিশেষে যে যে জায়ের

* বাড়াণী,—বাহারা নিত্য দরিদ্র, ধান ভানিয়া বৎসামান্ত
পারিজমিক প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা দৈনিক প্রাসাদান করে তাহা-
দিগকে “বাড়াণী” বলে। একরত্তি—বৎসামান্ত। চাটগাঁয়ে—
চট্টগ্রামে। বরাং—আদায়।

আবশ্যক হইত তাহা সে প্রেরণ করিত। দীর্ঘিকার সেই ষ্টিলানের কার্য আবার এমন সুন্দর যে কতিপয় ঘাট এখনও সুন্দর ভাবে বিদ্যমান। মসজিদ ও অপরা- শতাব্দী অতীত হইয়াছে তথাপি ইহার কোন প্রকার পর ইয়ারতাদি ষ্টিলানে প্রস্তুত তাহাতে কড়ি ও বরগার বিকৃতি লক্ষিত হয় নাই এবং ভূমিকম্পেও ইহার কোন আবশ্যক হয় নাই। এই প্রকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্থান ভগ্ন করিতে পারে নাই। ইহার গঁধুনী বা নির্মাণ ইয়ারতাদি কড়ি ও বরগার সাহায্য না লইয়া কিপ্রকুর পরিপাট্য অতীব সুন্দর।
যে দণ্ডায়মান হইতে পারে তাহা চিন্তার বিষয় বটে।

শ্রীগণপতি রায়।



প্রতিভা

২য় বর্ষ

ভাদ্র, ১৩১৯

৫ম সংখ্যা

ভারতীয় সাহিত্যে বৌদ্ধ আদর্শের প্রভাব (১)

পৌরাণিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে বস্তু-ভিত্তি ব্যক্তি-নিষ্ঠা বা ব্যক্তি-কর্তৃত্বের ন্যূনাধিক অসম্ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; উহার প্রবল পারিবারিক আদর্শ, সাম্প্রদায়িক আদর্শ, এবং সাম্প্রদায়িক ভাবুকতাটুকুও লক্ষ্য করিয়াছি। এখন, এই পৌরাণিক লক্ষণ ভারতীয় সাহিত্য চিরজীবী-ভাবে প্রবল থাকিতে পারে নাই, উহা প্রবল থাকিলে ভারতবর্ষে প্রকৃত সাহিত্য পদার্থের জন্ম হইত কিনা সন্দেহ; কিন্তু, উহা ঘটতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ, বুদ্ধ-আত্মার আবির্ভাব। বুদ্ধদেব উপনিষদ যুগের শেষে এবং পৌরাণিক যুগের প্রথম ভাগেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা।

(১) এই প্রবন্ধ বানীপন্থার মধ্যে 'সাহিত্য-আত্মার অভিব্যক্তি' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত; পূর্ববর্তী সন্ধে পরম্পরায়ত্তে গ্রথিত। সাময়িক পক্ষে খণ্ডাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধমাত্রই পাঠকের কিছু-না-কিছু ধোঁয়াচ্যুতি ঘটাইয়া থাকে; এই আশঙ্কায় ফুটনোটের সূত্র রক্ষা করিয়া প্রত্যেক বারে প্রকাশিত অংশ স্বতন্ত্র নামে প্রকাশ করা হইয়াছে।—লেখক

অনার্য্য এবং দ্রাবিড়গণকে ব্যাপকভাবে আৰ্য্য-আদর্শের
অধিকারভুক্ত করিবার জন্য,
বৌদ্ধ ধর্ম ও মনুষ্যের সমস্ত ভারতবর্ষকে আৰ্য্য-
সভ্যতা মধ্যে উহার হিন্দু নামের দীক্ষা দান
বিশেষ কল। করিবার জন্য, আৰ্য্যসমাজে

যেই চেষ্টা হইতেছিল; আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার নামই পুরাণ। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবও নানাদিকে ভারতীয় জাতীয় হৃদয়ের এই অধ্যাত্ম-চেষ্টার ফল বই নহে। বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্ম প্রচারের ধর্ম নহে; উহা নৈসর্গিক ধর্ম, এবং কেবল আচার-মূলক ধর্ম বলিয়াই উহার উপাধি 'সনাতন ধর্ম'। বৌদ্ধ ধর্মই পৃথিবীর সর্বজ্যোষ্ঠ প্রচারক। সত্যের সমাচার যে দেশকাল-জাতি নির্বিশেষে প্রচার করিতে হয়; অন্যকে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতে, দীক্ষাদান করিতে এবং প্ররোচনা করিতে হয়; পৃথিবীর একপ্রান্তে বসিয়া কোন জাগ্রত চক্ষু: কর্তৃক পরিদৃষ্ট সত্য যে সমগ্র মনুষ্য সমাজের উত্তরাধিকার সম্পত্তি; এই বিষয়ে যে কোনরূপ সীমাসঙ্কীর্ণতার স্থান নাই; এই মহাবার্তা—মনুষ্যত্বের এই পরম স্বত্ব সর্ব প্রথম বুদ্ধদেব কর্তৃকই পরিদৃষ্ট হয়, এবং ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইতে থাকে। তাই, বুদ্ধদেবই

ভাদ্র ১৩১১

আধুনিক মনুষ্য-সভ্যতার আদি পুরোহিত। সত্যকে দেশকালের নিঃসম্পর্কভাবে দর্শন করিয়া উহার নির্যাত এবং নিরুপলব্ধ বস্তুগত দুই মনুষ্য-সমক্ষে উপস্থাপন, সত্যকেই পরম ধর্মরূপে স্থাপন, ইহা মনুষ্য-সভ্যতার প্রাপ্তি বলিয়াই মনে করি। উহা মনুষ্য জাতির ইতিহাসে জ্ঞান-যুগের—প্রকৃত বিজ্ঞান-যুগের প্রথম সুবপাত; মনুষ্যাত্মার জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছার মধ্যে সর্বপ্রথম সত্যক পুরুষকারের আরম্ভ। বুদ্ধদেবের এই প্রকট দেবতা-বিত্রোহ হইতেই ভারতবর্ষে দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্যের এবং শিল্পের ক্ষেত্রে এক নব-যুগের আরম্ভ হইয়াছে; বুদ্ধপূর্ববর্তী যুগের নামই প্রাগৈতিহাসিক যুগ। তব্ধে, তিতরে অল্পসন্ধান করিলেই দেখিবেন, বুদ্ধদেব স্বয়ং এই স্তরে বহু পূর্ববর্তীর সমবেত অধ্যাত্ম-ফল ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ভারতবর্ষে আর্য্যগণ কর্তৃক উপনিবেশ স্থাপনের অনতিব্যবহিত যুগে, আর্য্য-অনার্য্যের এবং আর্য্য সমাজের মধ্যস্থিত বহু-সাম্প্রদায়িকতার এবং বর্ণজাতি-ভেদ আদর্শের প্রথম সংঘর্ষের যুগে, সর্বপ্রথম এক অতিক্রমি মহাপুরুষের ছায়ামূর্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে। এই ক্ষত্রিয় ঋষি এবং এই বীর-পুরুষই সর্বপ্রথম মনুষ্যত্ব-স্বত্বের খ্যাতি করিয়া মনুষ্যাত্মার বিশ্ব-প্রভুতা এবং অনন্ত শক্তি প্রমাণিত করিয়া যান; সমস্ত কৃত্রিম বর্ণ-ধর্ম এবং আশ্রম-তত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া, বর্তমান এবং অনাগত আর্য্যজাতি এবং আর্য্য-আচারী মাত্রকেই একই সমভূমে আনয়ন করেন; নিজের অতুলনীয় সবিতৃমন্ত্রের (গায়ত্রীমন্ত্রের) সাধক ও উপাসক মাত্রকেই দ্বিজত্ব লক্ষণের অধিকারী করিয়া যান। বিশ্বামিত্রকেই প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষের প্রথম বিজ্ঞানাত্মা বলিয়া মনে করি। বিশ্বামিত্রের বিরোধী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বশিষ্ঠাদি ঋষি এবং তার্গব প্রভৃতি মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাদের বাদ-বিসম্বাদের ফল ভারতীয় সমাজের স্থিতিশীল অধ্যাত্ম লোকে নানা দিকে কার্য্য করিয়াছিল। (২) বিশ্বামিত্রের

পর সর্বপ্রথম তাঁহার বক্তৃতি রামচন্দ্রের মধ্যেই তাঁহার উদার আদর্শের অনুসরণ-চিহ্ন লক্ষিত হয়। অহল্যার উদ্ধার, তার্গবের পরাজয়, এবং গৃহক ও সুগ্রীবাদি অনার্য্য সমূহ পতির সঙ্গে মিতালী, দাক্ষিণাত্যে আর্য্যপ্রভাবের বিস্তার এবং প্রজাহুগত রাজশক্তি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত মধ্যে উহারই পরিচয় পাই। নিরাবিল ত্রাণা আদর্শের লেখনী চিত্র হইতেই এই সমস্ত লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। উহার পর, ভারত যুদ্ধের সময়ে, আর্য্য আদর্শীয় স্বাপর যুগের শেষভাগে, ভারতবর্ষে অপর এক ক্ষত্রিয় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। সমগ্র আর্য্য সমাজের আদর্শ এবং উহার আধ্যাত্মিকতা তাহার দ্বারা নানাদিকে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল (৩) এই দুই জন ক্ষত্রিয় ঋষি ভারতবর্ষে প্রাচীন মনুষ্যত্ব আদর্শের অবতার বা ‘দেবাংশ’ রূপে ত্রাণগণের দ্বারাই সম্পূজিত হইয়াছেন। ত্রাণি বিশ্বামিত্র এবং জীবনযুদ্ধনিরত এই দুই ক্ষত্রিয় রাজর্ষিই প্রাচীন ভারতে প্রকৃত ত্রাণবিহার (বিশিষ্টাষ্টৈতবাদের) প্রতিষ্ঠাতারূপে সন্তক উল্লমিত করিয়া আছেন। তাঁহাদের পরবর্তী এবং তাঁহাদের জীবন আদর্শের যুগোচিত ফল রূপী এই শাক্যসিংহ, ‘পদ্মবলিপ্রদায়ী’ ‘যজ্ঞশিষ্ট ভোজী’ ‘সোম-পীথি’ এবং মাংসাশী আর্য্য সমাজের মধ্যে একান্ত ভাবে বেদবিরোধী এবং অহিংসাবাদী এই শাক্য সিংহ! গ্রাম সমাজ এবং পরিবার তন্ত্রের প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহী এবং নির্দোষমূলক ‘সংঘ’ আদর্শের প্রতিষ্ঠাপক এই শাক্যসিংহ! একদিকে চতুরাশ্রম আদর্শের বিরুদ্ধে একান্ত ভাবে ‘নৈকর্ম্ম’-বাদী, অত্মদিকে প্রবল লোকাদর্শ, লোকায়ত-জীবন, লোকক্লেম এবং প্রবল ‘সংকর্ম্ম’ বাদী

ও পৃথিবী একবংশতিবার নির্জাঙ্গ করার উল্লেখ ব্যাস-পুরাণে আছে।—লেখক।

(৩) গৌরগোবিন্দ রায়, নবীনচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক নানাদিকে ঐতিহাসিক প্রণালীতে এই মহাপ্রকাশের প্রধান অধ্যাত্ম লক্ষণগুলি নির্ধারিত হইয়াছে। এই বিষয়ে কুতূহলী পাঠক নব্য-ভারত ১৩১৮ সনে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত মল্লিখিত ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।—লেখক।

(২) কার্তবীৰ্য্যার্জুন ভনয় সুভোম কর্তৃক পরশুরামের নিধন

এই শাক্যসিংহ! একই হস্তে দ্বি-কলক অস ধারণ করিয়া উপস্থিত! জন্মগত অধিকার এবং তন্মূলক সমুহ আদর্শের বিরুদ্ধে প্রকট ব্যক্তিগত স্বাভাব্য এবং ব্যক্তিব্যবহার আদর্শ কার্য্য না করিলে, প্রত্যেক মনুষ্যের সমক্ষে সবিস্তারে নিজের জীবন ধর্ম গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা এবং অধিকার না ধরিলে, এই 'শ্রমণ' এবং উপাসক আদর্শের পরম্পরবিরুদ্ধ ধারা কোন মতেই সম্মতি লাভ করিতে পারিত না! ব্যক্তিগত মনুষ্যব্যবহার স্বয়ং এবং স্বাভাব্যকে একান্ত ভাবে সম্মুখে না রাখিলে এই বিরুদ্ধ বাঁকা দাঁড়াইতেই পারিত না! সমগ্র ভারতবর্ষের হৃদয়, আর্ধ্য এবং অনার্য্য নির্বিশেষে, বুদ্ধদেবের এই আদর্শকে দৃষ্টিমাত্র পরম আগ্রহে বরণ করিয়া লইয়াছিল। বৌদ্ধমত 'লোকায়ত' হইয়া পড়িয়াছিল। স্থিতিশীল সমাজধর্মের মধ্যে পরম স্বাধীন চিন্তার স্বতন্ত্রপাত করিয়া বুদ্ধদেব প্রাচীন তত্ত্বের সভ্যতাবন্ধে অপরূপ গতিপ্রবাহ আনয়ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধাচার এই প্রবল প্রবাহ ভারতবর্ষের হিমালয় প্রাকার উল্লঙ্গন পূর্বক, সমগ্র এসিয়া ভূমির মনুষ্য সমাজে তরঙ্গের পর তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া প্রাচীন স্থিতিনীতি পর্য্যুদাস্ত করিয়াছিল; সমগ্র প্রাচীন মহাদেশের সমাজ সভ্যতায় এবং ধর্মের আদর্শে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমরা অজ্ঞাত খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীকে মনুষ্য সভ্যতার মহাঙ্গারণ যুগ নামে নির্দেশ করিয়াছি। পূর্বপশ্চিমের চৈন এবং হীক্সক্সাতির মধ্যেও ওই সময়ে সর্বত্র এইরূপ আত্মজাগরণের প্রবাহই লক্ষ্য করিতেছি। চীনের কংফুসী এবং হীক্সক্সাতির 'প্রফেট'গণ এই নবজাগরিত বিশ্ব-মনুষ্য-আত্মার উদগ্ৰ উদ্দীপ্ত তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। পৃথিবীর অভ্যন্তরে তখন বিজ্ঞানাত্মার অতর্কিত ব্রহ্ম-জাগরণ কার্য্য করিতেছিল; জগতের সবিতা পুরুষ ধরণীর দিকে সদয়োন্মিষ্ট কল্যাণনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; লোকলোকান্তর হইতে নব-তত্ত্বীয় জীবাত্মা-গণ যুগ্মীয় পাশ্চাত্য পদধূলি দান করিয়া যাইতেছিলেন! বুদ্ধাচার ওই নব যুগধর্মের প্রকটিত অধ্যাত্ম-ফল বই নহেন।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্র তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া, চিরকাল গৌরব করিয়া আসিতেছে। বুদ্ধাচার পূর্বে জগতে সর্বত্র সমাজ এবং ধর্মের আদর্শ নির্দিষ্টতার ভাবে পরস্পরে ওত প্রোত হইয়া, নানাদিকে মনুষ্যত্বকে সংকীর্ণ, নিপীড়িত এবং সীমাবদ্ধ করিয়া চলিয়া আসিতেছিল। বিশ্বজগৎ সর্বত্র দৈবতত্ত্বের পরিপূর্ণ, এই সমুদ্রত আদর্শ মনুষ্যের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকিলেও, এবং ব্যক্তি-বিশেষে উহার সাহায্য ব্যক্তিগত ভাবে মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারিলেও, সম্প্রদায়মধ্যে উহার কোন বিশেষ ফল ফলে নাই। বিশেষবিশেষ ধরণের পূজা-বলি ভিন্ন দেবতাবিশেষের প্রীতি সংসাধিত হয় না বলিয়া একটা সংকীর্ণ আদর্শ জগতের সর্বত্র মনুষ্যত্বকে ধর্ম-এবং ধর্মিত করিয়া রাখিয়াছিল; প্রসারিত কিংবা আত্মপ্রচার-শীল সংসারের আবর্ষাও ইতাপি বলবান হইতে পারে নাই। নীতিই ধর্ম; এবং নীতিই যে বিশ্ব-চক্রকে এবং মনুষ্যত্বকে ধারণ করিয়া উহাকে পরমার্থে উপনীত করিতে পারে; বিশেষভাবে দেব-পূজা সাধন না করিয়া, এমন কি পূজা এবং উপাসনা হইতে সম্যক বিরত থাকিয়াও যে পরমা গতি লাভ করা যায়, পৃথিবীর মনুষ্য-সমাজে ইহাই বুদ্ধাচার প্রধান সমাচার! উহার পর হইতে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম-আদর্শ (সেই-এবং নিরীশ্বর আদর্শ) বুদ্ধ-প্রবর্তিত এই সুসমাচার-ফলে, এই নীতিমূলক ধর্ম-আদর্শের গৌণ বা মুখ্য ফলেই নিমগ্ন হইয়া আসিয়াছে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই বুদ্ধাচার সম্ভব হইয়াছিল। ভারতবর্ষের আত্মা তৎকালে, সকল দিকে ধর্ম, সমাজ এবং অধ্যাত্মতার ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল; মনুষ্যের বুদ্ধি দার্শনিকতার তরফেও কতদূর জাগরিত এবং প্রসারিত হইয়াছিল; এই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, প্রভাব এবং প্রসার চিত্তা করিলেই তাহা কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মনুষ্যের মন কতদূর স্বাধীন হইতে পারিলে, যুগযুগান্তরব্যাহী সামাজিক এবং পারিবারিক

ভালমন্দভাব-পুঞ্জ এবং আবজ্ঞানকে কতদিকে কাড়িয়া উঠিতে পারিলে পর, বৌদ্ধ আদর্শের এই বিজ্ঞান-স্বপ্নে এবং স্বাধীনতার স্বপ্নে উৎসাহী হইতে পারে! এতকাল পরে, এই সার্কি-বিসহস্র বৎসর পরেও, এবং বিংশশতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক-যুগে দাঁড়াইয়াও কল্পজন ব্যক্তি এই আদর্শটাকে নিরাবিল ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন? বুদ্ধাঙ্গার উদ্ভব-ক্ষেত্র (ভারতবর্ষীয় উপনিষদ্ যুগের তপোবন এবং গ্রাম-সমাজ) তখন মনকে কতদূর পূর্ব সংস্কার-হীন করিতে এবং কেবলমাত্র প্রতিবিশ্ব-গ্রাহী শুভ্র-দর্পণ-রূপে (tabula rasa) পল্লিত করিতে পারিয়াছিল, তাহাই চিন্তা করিবেন!

যাহা হউক, প্রাচীন সমাজতন্ত্রের মধ্যে বুদ্ধাঙ্গার এই সমাচার যে পরম বিদ্রোহ রূপেই কার্য্য করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দেবতাবাদ এবং বজ্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ, ভারতবর্ষের অধ্যাত্মরাষ্ট্রো, সমাজে এবং সাহিত্যে, অভাবনীয় ভাণে কার্য্যকর হইয়াছিল। বিদ্রোহ বলিলাম, কেন না, হিন্দুসমাজের সমস্তই বৌদ্ধ

আদর্শের মুখ্য অপেক্ষা গোণ প্রভাবেই

ভারতী সমাজে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধাঙ্গার কার্য্য। ব্রাহ্মণ্য বিপুল পুরাণ-চেষ্টা করিয়া, সমস্ত

প্রাচীন এবং প্রচলিত সাহিত্যের কাব্য

ইতিহাস দর্শনের উদ্বেগ-বিষয়কে, ব্রহ্মবাদ আঙ্গার অমরত্ব পুনর্জন্ম এবং পরলোকের আদর্শ প্রভৃতিকে নানাদিকে সংশোধন ও পরিবর্জন করিয়া, বৌদ্ধ আদর্শের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে উপস্থাপন পূর্বক আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বুদ্ধ-পরবর্তী ভারতের কোন বিষয়ই বৌদ্ধ আদর্শের গোণ-মুখ্য প্রভাব হইতে নিম্নুক্ত নহে।

উহাকে সবিশেষে ধারণা করার ইহা স্থান নহে। ভারত-বর্ষের সমাজ অথবা ধর্ম্মের পদাঙ্ক-পরিচয়-কামী ব্যক্তি যাত্রেয় জন্ত, সকল প্রকৃতিজ্ঞানস্বরূপ জন্ত এবং বর্তমান কালের সর্ব প্রকার শ্রেয়ঃ-প্রার্থীর জন্ত, এই জিজ্ঞাসা-অধ্যায় অপরিহার্য্য হইয়া আছে। ভারতবর্ষের সমাজের এবং ধর্ম্মের প্রধান তত্ত্বাধ্যায় এখনও লিখিত হয় নাই।

এই ইতিবৃত্ত সম্যক না জানাতেই আমরা বর্তমানের কর্তব্য বিষয়ে নানাদিকে অমার্জনীয় ভ্রমে পতিত হইয়া রহিয়াছি।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ-আদর্শের প্রভাব অভূতনীয় এবং অভাবনীয় আকার ধারণ করিয়া আছে। উহার একটা প্রধান কার্য্য, সাধারণ লোকাদর্শের এবং লোকায়ত ভাবের পরিপোষণ করিয়া দেশবাসীর হৃদয় সন্নিহিত

ভাষার পুষ্টি সাধন; এক কথায়,

ভারতের ভাষা সাধারণের মাহাত্ম্য প্রচার, সংস্কৃত নামক সমূহে বৌদ্ধ পণ্ডিত ভাষার মাহাত্ম্য অস্বীকার আদর্শের কল। করিয়া, দেশপ্রচলিত এবং ন্যূনাধিক

আর্য্য-অনার্য্য-মিশ্র দেশ-ভাষাকেই

পরম বীরত্বের সহিত আলিঙ্গন! এই আদর্শে, নানাদিকে অগঠিত এবং ছুঁকিনীত পাল্লী-ভাষার মধ্যেই সারস্বত-ভূর্গ পরিকল্পনা করত, বুদ্ধদেব গোঁড়া আর্য্যত্বের এবং ব্রাহ্মণ্যের প্রভাবকে নিগৃহীত করিতে এবং ভারতবর্ষকে বিজয় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। উহার দ্বারাই, সর্ব প্রথম ভারতবর্ষে সাধারণের মাহাত্ম্য বিবোধিত হইল! পরকালে উহার দরুণেই হয় ত, বিপক্ষদলের সাপক্ষে এই ভূর্গটাকে বিক্ষুব্ধ করার পক্ষে সুবিধা ঘটয়াছে; কিন্তু, উহার প্রধান ফল, সংস্কৃতের মাহাত্ম্য অস্বীকার! উহার ফলেই, ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রদেশভাষাসমূহ সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়া, সাম্প্রদায়িকতা এবং গ্রাম্যসমাজের শত সংকীর্ণতা সম্বন্ধেও নানাদিকে নিসর্গ-গতির পরিপোষণ করিয়া, ভারতের দেশে-দেশে বৃহৎ-বৃহৎ জাতি-নামের নিদান হইতে পারিয়াছে; সংস্কৃত ভাষার পরম পবিত্র পুরী-মধ্যেও পৈশাচী ভাষার প্রবেশ ঘটাইতে পারিয়াছে!

পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য, উহার কাব্য নাটক কথা এবং উপকথার সমস্তই, এই বুদ্ধদেব দৃষ্ট সাধারণ মনুগ্রন্থ আদর্শের প্রভাবেই নিয়মিত হইয়াছিল;

ভারতীয় সাহিত্যে পুরাণ অথবা তন্ত্রমন্ত্র সাহিত্যের ঐকা-উহার কার্য্য।

স্তবিকতাকে নিগৃহীত করিয়া ভারতবর্ষে প্রসারিত ভাবে জীবৎ-শক্তি লাভ

করিয়াছিল। একাদশবর্তী পরিবার, অথবা পৌরোহিত্য অধিষ্ঠিত নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্মতন্ত্রতা, কিংবা গ্রামের স্থিতিশীল সমূহ আদর্শের মধ্যে, নির্মূল সাহিত্য-রস-ভোগ নামক পদার্থের উদ্গতি কিংবা উদ্ভূতি হওয়া সহজ ছিল না। কোন প্রাচীন সমাজতন্ত্রেই উহা সুগম হইতে পারে নাই। জীবিকার্জন অথবা প্রত্যাহার এবং প্রতি দণ্ডের দেব প্রীতিসাধনা ব্যতীত, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ত্রেতা ও দ্বাপর নামক যুগদ্বয়ের আর কোন বিশেষ কার্য-নির্দর্শন (বেদ ও রামায়ণ মহাভারত ভিন্ন) স্বরস্বতী মাতা রক্ষা করা আবশ্যক মনে করেন নাই (৪)। অনেক-কিছুর বিনাশ অথবা বিলয় প্রাপ্ত হইবার যথেষ্ট অবকাশ ঘটিয়াছে, সত্য কিন্তু প্রাচীন বৈদিক অথবা পুরাণ-সংহিতার ঐকান্তিক ধর্ম-আদর্শের ব্রাহ্মণ-জ্ঞানী বিদ্বান অথবা ধার্মিকের পক্ষে, প্রাতঃ সন্ধ্যা-মধ্যাহ্নের অবশ্য-কর্তব্য হোমাদি বা প্রায়শ্চিত্তাদি ধর্ম-কার্য সমাধা করিয়া, আর নিঃশ্বাসফেলিবার অবকাশ কাল যেন কোথাও নির্দেশিত নহে! প্রাচীন তত্ত্বীয় ধর্মের আদর্শ মধ্যে—‘কাব্যোলাপাংশ্চ বর্জয়েৎ’ এই নীতি-উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমরা দেখিয়াছি, এখনও এই ভারতবর্ষে সম্প্রদায় বিশেষ নানাদিকে এইরূপ আদর্শের মনুষ্য জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইতেছেন। ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবের স্বাধীন মানব-তত্ত্বীয় আদর্শ প্রচারিত হওয়ার পরেই আমরা, সরস্বতীর সাহিত্য প্রেক্ষাগৃহে শূদ্ররাজ্যের সভামণ্ডপে এবং ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্ম্মার মুখে, সর্বপ্রথম উহার আত্ম-মাহাত্ম্য কীর্তন শুনিতে পাইলাম—

সংসার-বিষ-বুদ্ধশ্রদ্ধে ফলে অমৃতোপমে। (৭)

কাব্যান্তরসাম্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ ॥

ধর্মার্থ কাম মোক্ষ-লাভের উপায় গুলির মধ্যে সাহিত্যও একতম বলিয়া স্বীকার এবং সম্বর্জন লাভ

(৪) সত্যযুগে আর্ধ্য-কুল কেবল ‘ঐমণ’ তংপর ছিলেন অর্থাৎ পৃথিবী বকে উপনিবেশ সংস্থাপনে তংপর ছিলেন, ইহার উল্লেখ পুরাণে মিলিতেছে।

করিল! কেবল অসঙ্গ হওয়া, যতি-ব্রত হওয়া কিংবা সংহিতাশাস্ত্রাদির অনুসারে ধার্মিক হইবার ঐকান্তিক আদর্শটুকু লেখকের নয়ন সমক্ষ হইতে অস্বহিত। শেষ কথাটির অর্থও লক্ষ্য করিবেন! সজ্জনসঙ্গ! এই ‘সজ্জন’টাও অবশ্য নিখুঁতভাবে সাম্প্রদায়িক ধর্ম-আদর্শের সজ্জন নহেন! উহার মধ্যে পরম অসাম্প্রদায়িকতার গন্ধই প্রবল! এই ‘সজ্জন’ শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ আধুনিক; লোক-নীতি-নিষ্ঠাই উহার প্রধান সঙ্গত!

হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রের মধ্যেই আমরা সর্বপ্রথম নিরবচ্ছিন্ন লোক নীতি-তত্ত্বীয় হিতোপদেশ আদর্শের এবং লৌকিক কর্তৃত্ব এবং পঞ্চতন্ত্র। আদর্শের সাহিত্যচেষ্টার সম্মুখীন হই। রামায়ণ মহা-

ভারত ব্যতীত তৎপূর্ববর্তী অত্র কোন সাহিত্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে কিনা তাহা নিঃসংশয়ে নির্দেশ করা কঠিন। হয়ত, এই হিত-কথাগ্রন্থও পর কালে সংশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু চাণক্যই উহার আদি-কর্তা; এই ক্ষেত্রে কিংবদন্তীকেই সত্য বলিয়া মনে করি। যাহা হউক এই দুই গ্রন্থই আর্ধ্য ভাষার মধ্যে প্রাথমিক বৌদ্ধপ্রভাবের ফল। সংহিতা-পুরাণ এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম-আদর্শের লক্ষণটাকে অতিক্রম করিয়া ভারতে এই নবীন এবং সর্বপ্রকারে আধুনিক সাহিত্য-পদ্ধতির জন্ম হইল! এই পদ্ধতির দর্শন মাত্র সমগ্র এসিয়া খণ্ড তাহাকে চিনিয়া ফেলিল; এবং পরম আগ্রহে বরণ করিয়া লইল। এই গ্রন্থদ্বয় বিপুল উৎসাহ সহযোগে ভাষান্তরিত হইতে লাগিল। সুদূর ইউরোপখণ্ডে পর্যন্ত উহার সূত্র বিস্তারিত হইয়া জৈনপ্ এবং পিল্পের গল্পকথাসমূহের জন্মান করিল (৫)।

(৫) বিদ্যুৎ বা পিল্পের গল্পসমূহ ভারতবর্ষীয় বিভাগপতি নামক রচয়িতার কর্তৃত্বই প্রমাণিত করে; ইণ কোন কোন যুরোপীয় পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন।

ভারতের বা জগতের প্রাচীন সাহিত্যজগৎমধ্যে
হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির এত প্রাধান্য ঘটিবার
কারণ কি? উহাদের অসাম্প্রদায়িক
উহাদের সাহিত্য, ভাব, অভিনব সাহিত্য-রীতি, এবং
আদর্শ। নিরবচ্ছিন্ন লোকনীতি-নিষ্ঠা। মনুষ্য-

মন জীবজন্তুর চরিত্রকথার অছিল।
ধরিয়া এই একবার পরম মুক্তি লাভ করিয়াছিল।
এই সমস্ত গ্রন্থে সর্বত্র জীব-জন্তুকেই,—দীর্ঘগ্রীব, লক্ষকর্ণ
এবং মনুষ্য প্রভৃতিকেই হৃদয়ভাবে প্রকাশের
নায়কস্বরূপে বরণ করা হইয়াছে। উহার কারণটাই
লক্ষ্য করিবেন! উহার প্রধান উদ্দেশ্য অতি প্রবল
সাম্প্রদায়িক আদর্শ হইতে মুক্তি! কোন সংহিতা-
পন্থী ব্রাহ্মণকৃত্রিয়বৈশেষের চরিত্রাবয়ব অবলম্বনে ওই
সমস্ত নীতিকথা নিষ্কাশিত করিতে পসিলেই চাণক্য
পণ্ডিত পদে পবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেন। শাস্ত্র-
সংহিতার দ্বারা সীমানিদ্ধ দৈনন্দিন জীবনের সমক্ষে
আসিয়া, পদে-পদে এবং প্রত্যেক পল বিপলে হস্ত-
সঙ্কোচ করিতে হইত! হিন্দু-আদর্শের 'সাঁজ' হইতে
বহির্গামী হইয়া কেহই যেমন তেমন করিয়া থাকিতে—
বসিতে—চলিতে বা কথা কহিতেও পারিত না! পদে
পদে সর্বত্রই সামাজিকতা রক্ষা করিয়া, অথবা গৃহা-
স্থত্র এবং মনুসংহিতার নৈমি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই
চলিতে হইত! হিতোপদেশ প্রভৃতি কেন, এই যুগের
বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থাদির মধ্যেও সর্বত্র এই প্রকার নীতিই
লক্ষ্য করিবেন। মনুষ্যাত্মা পরিশেষে, যেন কাল্পনিক
অথচ সংপ্রসারিত 'জীবন্ত' আদর্শের উন্মুক্ত প্রাপ্তবরের
মধ্যে ছুটিয়া আসিয়াই, সকল সাম্প্রদায়-আদর্শের কবল
হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে—যেন হাঁক ছাড়িয়াই,
ধাঁচিয়াছে! একেবারে পুনরবর্তন করিয়া জীবজন্তুর
সঙ্গ-সঙ্গের মধ্যে আত্ম-বিলোপ সমাধা করিয়াই, মনুষ্য
নিজের স্বহস্তরচিত শাস্ত্র-আদর্শের বেড়ালাল হইতে মুক্ত
হইতে চেষ্টা করিয়াছে! সুতরাং এই সমস্ত গ্রন্থের প্রধান
লক্ষ্যই মনুষ্যের আত্ম-বিলোপ; উহাদের 'চরিত্র' আদর্শও

তাই নানাদিকে 'ব্যক্তিহীন বা impersonal';
উহার সম্পূর্ণ লোকায়ত-আদর্শের প্রভাবেই বিরচিত।
হিন্দুধর্ম-নিষ্ঠ শূদ্র-রাজার সভাগুলে ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিরচিত
বলিয়া, বৌদ্ধধর্মগণকগণের মন্তক-উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে
'বুদ্ধগণ্ড' ব্যবস্থা করিয়া থাকিলেও, উহাদের হৃদয়
মধ্যে বুদ্ধ-পদাঙ্কই মুদ্রিত হইয়া আছে।*

বৌদ্ধ আদর্শের প্রত্যক্ষ সংসর্গে থাকিয়া, (প্রকৃত
বৌদ্ধমতাবলম্বী কর্তৃক) সংস্কৃত ভাষার মধ্যে বিশেষ কোন

* এই যুগের সংস্কৃত বিশেষত: পালি গ্রন্থগুলির এই জীবজন্তু
সংক্রান্ত লক্ষণ এবং অবিকশিত 'পশুপীতি' চিত্রা করিয়া, অনেক
ইয়োরোপীয় পণ্ডিত, উহাদিকে একেবারে আদিম গ্রন্থ বলিয়া
নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ, ওই সমস্ত গ্রন্থের
পূর্বে, সংস্কৃত ভাষাতেও একবার বেদ ব্যতিরিক্ত অথ কোন
গ্রন্থই যে বিরচিত হয় নাই, এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত করিতে
চাহিয়াছেন। ভারতীয় বর্তমান সংহিতা শাস্ত্র বা পুরাণ দর্শনাদি
এমন কি রামায়ণ মহাভারত পর্যন্ত সমস্তই যে বুদ্ধাবির্ভাবের
পরবর্তী এইরূপ একটা মত বদ্ধপরিকর হইয়া চালাইয়াছেন। জীব-
জন্তু বিষয়ক পদ্য বলিয়া, অথবা, পালিভাষায় সাহিত্যরীতির শৈশব
সূচিত করিতেছে বলিয়াই, উহারা যে ভারতীয় মনুষ্যগণের শৈশব
সূচনা করিবে, আদিম বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহার পক্ষে কিছুমাত্র
নিষ্ফলতা নাই; বিশেষত: ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে—যেই ক্ষেত্র বুদ্ধাত্মাকে
জন্মদান করিতে পারিয়াছিল, কেবল যুক্তির উপরে নির্ভর
করিয়াই নিরীকর ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল! পালিভাষার
অপরিণত বয়োবৃদ্ধি আলোচনা করিয়াও অনেকে 'সংস্কৃত' ভাষা-
টাকেই উহার পরবর্তী এবং অর্ধাচীন বলিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টা
করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, কোন প্রাদেশিক
বা পৈশাচী ভাষার অপরিণত রীতি-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া
সংস্কৃত ভাষার বা তাহার পুরাণদর্শনাদির বয়স পরিমাণ করা
যাইবে না। পালিভাষার গ্রন্থ সমস্তই ন্যূনাধিক সাধারণজনহৃদয়কে
লক্ষ্য করিয়াই বিরচিত। ওই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে মনুষ্যমতের শৈশব
সূচিত হয় বলিয়াই, ভারতীয় মনুষ্যমন তখনও শৈশব অবস্থায় ছিল
বলিয়া সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে; অথচ ঐতিহাসিক-
গণকে প্রায়ই এই জাতীয় প্রমাণ পদ্ধতি আশ্রয় করিতে দেখা যায়।
আমরা বলিব, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে উহার কবিত-ভাষা-প্রকৃতি বা
পদ্য আদর্শ, কদাপি তাহার জ্ঞান-বুদ্ধির সহিত বা 'ব্রাহ্মণ' বুদ্ধির
সহিত সমতল বা সমান্তরাল ছিল না। বুদ্ধাবির্ভাবের পূর্বে হইতেই

সাহিত্য রচিত হইতে পারে নাই। কেবলমাত্র রচিত বুদ্ধ-চরিত কাব্যও বহু পরবর্তী। ভারতীয় বাণী-পন্থা উহার গৌণফলেই পরিকৃত হইয়াছিল। পালি ভাষার মধ্যেও হিতোপদেশ প্রভৃতির লক্ষণযুক্ত, বহু বিস্তৃত সারস্বত চেষ্টা ঘটিয়াছে; কিন্তু সমস্তই ধর্ম-সংক্রান্ত এবং ন্যূনাধিক ধর্ম্মাধিকারের সাহিত্য। বৌদ্ধধর্ম্ম কোন বিশেষ পূজাবিধিকে একান্তভাবে অবলম্বন না করিয়া কেবল আধ্যাত্মিক নীতি-সাধনাকে পরম লক্ষ্যরূপে বরণ

করায়, এই সমস্ত গ্রন্থে পৌরা-
সংস্কৃত সাহিত্যে নিক লক্ষণ প্রবল হইতে পারে
উহার পৌণফল। নাই। কিন্তু, উপদেশের

প্রণালীটাই মুখ্যভাবে অল্পহৃত
বলিয়া, পালি ভাষার 'ত্রিপিটক' ধর্ম্মপদ প্রভৃতি গ্রন্থকে

ভারতে বৈদিক সাহিত্য, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদর্শ 'ঋষি' এবং 'বিপ্র'দের অবস্থিতি, এইরূপ সিদ্ধান্তের বিপরীত। ভারতবর্ষ বুদ্ধজন্মের বহুপূর্বে সাধারণ লোক-ভূমি হইতে বহুদূরে তপোবন রচনা করিয়া, অতুলনীয় সংস্কৃত সাহিত্যে অর্জন করিয়াছিল। পাণিনির সংস্কৃত ভাষার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পাণিনি ব্যাকরণটাই অন্ততঃ ষোড়শপুর্ন পঞ্চম শতাব্দীতে বিরচিত। আসল কথা, ভাষার বা সাহিত্যের প্রকৃত সাহিত্য চিরকাল প্রতিভাবান সাহিত্যসেবীর সজন্মের উপরেই নির্ভর করে। তদভাবে পূর্ণপরিণত সাহিত্যবুদ্ধিও অপরিশ্রুত ভাষাপ্রকৃতির মধ্যে আসিয়া হানাপুড়ি দিয়া চলিতেই বাধ্য হয়। বর্তমান বঙ্গভাষার অবস্থাটাই লক্ষ্য করুন। পরম-গরিষ্ঠ ইংরাজী ভাষা এবং এই বিশ শতাব্দীর মনোজীবনের সংশ্রবে থাকিয়াও, এমন কি, ইংরাজী ভাষার মহিমাযুক্ত ভাবে লেখনী চালাইতে জানিয়াও, আমরা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই কি বর্তমানের বঙ্গভাষার মধ্যে এবং বঙ্গীয় পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে আসিয়া বালকের মত পদ-বাক্য ব্যবহার করি না; বঙ্গ-ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া বালক-মূলক বাক্যপ্রকৃতির আলস্য লই না? এখনও আমাদের মধ্যে কি স্বল্প-পদতাই প্রাঞ্জ-লভার প্রধান লক্ষণ নহে? অধিকাংশ বঙ্গীয় লেখকের,—ইংরাজীতে অতি-শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখকের রচনা-রীতিই কি বঙ্গভাষাধিকারে বালকত্বই প্রতিপাদন করে না? উহার দ্বারা আমাদের মনো-জীবনের কিংবা ইংরাজীসংক্রান্ত বুদ্ধি-বয়সের পরিচয় করিতে গেলে কি সুবিচারের সম্ভাবনা আছে? এমন কি ১৫ বৎসর পূর্ব্বেকার

প্রকৃত সাহিত্যসংজ্ঞায় নির্দেশ করা চলে না। তবে, সাহিত্যের কোঠায়, সাহিত্য আদর্শের প্রদর্শন এবং পরিক্ষাটন বিষয়ে, উহাদের সাহিত্যে যে অনন্তসাধারণ তাহা বারম্বার স্বীকার করিতে হইবে। এই আদর্শ যেমন মনুষ্যমনকে সমস্ত সাম্প্রদায়িক অথবা ধর্ম্ম-গোড়ামীর আবর্জনা হইতে নিমুক্ত করার পক্ষে সহায় হইয়াছে, তেমনি উহার সাহিত্যকেও বিনির্ম্মল আত্মজ্ঞানের মধ্যেও জাগরিত করিয়া গিয়াছে। সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ অথবা মহৎ ঘটনা আর কি হইতে পারে! আধুনিক সাহিত্য-আত্মা বুদ্ধদেবেরই দীক্ষা-শিষ্য! মনুষ্যত্ব-নিষ্ঠাটুকুই তাহার পরা প্রাপ্তি। এই সিদ্ধির পর হইতেই তাহার মতি-রীতি এবং পতি অব্যাহত হইয়া নব নব রস-লোকে অধিকারলাভে প্রয়াসী হইতে পারিয়াছে! বহুকাল পরে বাঙ্গালী-ব্যাঙ্গের অপহৃত আদর্শকে এই মনুষ্যত্বের মধ্যে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ভারতীয় মানবাত্মা আপনার অন্তর্লোক হইতে বেই উচ্ছ্বাস তুলিয়াছিল, তাহার শক্তি মহামহিম-রূপে প্রকটিত হইয়া হিন্দু-ভারতবর্ষে এক অপরূপ সাহিত্য-সদ্বীত উৎসারিত করিয়াছিল! উহার নামই সংস্কৃত সাহিত্য;

রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা রচনার রীতি-প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া যদি তাহার মানসিক উন্নতি বিচার করিতে যাই, তা হইলে কি প্রতিপদে ভুল করিতে থাকিব না? বেই জাতির মধ্যে ভাষা-বৈত ঘটিয়া যায়, তাহার কথিত ভাষার পক্ষে সমুদ্রত মানবজীবন লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ ব্যাপারটি নানামতে বাধিত হইতে পারে। বঙ্গভাষা এবং সাহিত্যকে চিরকাল এই জাতীয় বাধা অভিক্রম করিয়াই ধীরপদে অগ্রসর হইতে হইতেছে। সাধারণ বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে বঙ্গভাষার সর্বতোমুখী শক্তি বা গৌরব সাহিত্যে অনায়াস ভাবে সিদ্ধ হইতে, কিংবা এই ক্ষেত্রে তাহাদিগকে ইংরাজী ভাষার সাধারণ লেখকগণের সমতল লাভ করিতে আরও অন্ততঃ একশত বৎসরের ঐকান্তিক সাহিত্য-জীবনের আবশ্যক হইবে বলিয়াই মনে করি। সাহিত্য বা ভাষার সাধারণ সমতল উন্নীত হওয়া ব্যাপারটি দীর্ঘকাল এবং বহু-সাধকের লংঘ্য চেষ্টা ভিন্ন কদাপি সম্ভব নহে।—লেখক

ভাষ্য ১৩১১

উহা সম্পূর্ণ আধুনিক আদর্শের সাহিত্য এবং বিশ্ব-
সাহিত্যের লক্ষণযুক্ত। উহার মতিগতি সম্পূর্ণ আধুনিক !
যখন পৃথিবীর সমস্ত সর্বত্র অতিজটিল ধর্ম-ভাবুকতায়
জড়সর, যখন মনুষ্য-হৃদয়
সংস্কৃত ভাবের প্রকৃত প্রকৃত মনুষ্যাকর্ষণে কথা-
সাহিত্য ও তাহার কথা পর্যন্ত বিশ্বত হইয়া
আদর্শ। কেবল পূজাস্বত্তি এবং
বলি-বিষয় লইয়াই মাতিয়া

আছে, তখনই বুদ্ধ-পদাঙ্ক-গর্ভী ভারতীয় সমাজ আপনার
অশেষ দেবপূজা এবং শৈবশাক্ত এবং বৈষ্ণবীয় আদর্শ-
গভীর মধ্য হইতেও এই নির্মল সাহিত্য-তত্ত্বের মাহাত্ম্য-
ফল চয়ন করিয়া গিয়াছে ! ঈশ্বর প্রকৃতি এবং মনুষ্যের
অপরূপ সম্বন্ধ-তত্ত্ব জাগরিত হইয়া অতুলনীয় ভাব-রসা-
নন্দে বিলাসী হইয়াছে ! ভারতীয় হৃদয়ের এই সাহিত্য-
উচ্ছ্বাস এখনও পৃথিবীর সাহিত্য-ক্ষেত্রে নানাদিকে
অতুলনীয় এবং অনতিক্রম্য হইয়া আছে ! তাহার শূন্যক
কালিদাস এবং ভবভূতি প্রভৃতি আপনাদের স্বাধীনতায়
মনুষ্যত্ব-নিষ্ঠায় এবং এক অদ্বিতীয় নিসর্গ-তন্ময় রসানন্দে,
বিশ্বসাহিত্য-রসিকের নিকট চিরকালের আনন্দস্থলী
হইয়া রহিয়াছেন ! তাঁহাদের এই মাহাত্ম্য কখনও ক্ষুণ্ণ
হওয়ার নহে ! তাঁহাদের সময় হইতে দ্বাদশ শতাব্দী
পর্যন্ত ভারতের দেশে দেশে, সাহিত্যের এই আদর্শটাই
প্রবল থাকিয়া কচিৎ-কদাচিৎ সমুন্নত প্রতিভা-সঙ্গমের
দৃষ্টান্তও দেখাইয়া গিয়াছে। কালক্রমে হিন্দু-ভারতবর্ষ
বৌদ্ধ-ধর্মকে নির্দয় ভাবে কবলিত করিয়াছে, অথবা

বিভাড়িত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু উত্তরোত্তর বর্ধমান
ভেদনিষ্ঠা এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম-আদর্শের দ্বারা চির-নিপী-
ড়িত এই ভারতভূমির বক্ষেও, বুদ্ধচরণাশ্রিত এই সাহিত্য-
সৌভাগ্য একবার সমুদিত হইবার পর আর একেবারে
বিলয়প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। মনুষ্যের হৃদয় আপনার
নির্মল নিগূঢ় পরমাত্মার মধ্যে একবার জাগরিত হইয়াছিল
বলিয়াই, আর উহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বত হইতে পারে
নাই।/ ভারতীয় মনুষ্যের মনোমধ্যে, একদিকে ঘন-
জটিলতাময় সম্প্রদায় আদর্শ, অত্রদিকে নিযুক্ত-নির্মল
সাহিত্য লোকের এই ‘মনুষ্যত্ব’ আদর্শ, উভয়েই অপরূপ
নির্বিরোধ ভাবে পাশা-পাশি থাকিয়া আসিয়াছে ! কাল-
ক্রমে এই সম্প্রদায় এবং জাতিভেদ-আদর্শের অশেষ
সঙ্কীর্ণতা এবং অনিষ্ট-সঙ্গমে তাহার সংস্কৃত-
ভাষাটাই জমাট বাধিয়া এবং অচল হইয়া গিয়াছিল
এবং সাহিত্যকেও নিষ্জীব রাখিয়া গিয়াছে, সত্য ;
কিন্তু, ‘মনুষ্যত্ব’ আদর্শের মৌলিক নিষ্ঠা হইতে কখনও
অলিত করিতে পারে নাই। মনুষ্য সাহিত্যের মধ্যে
একবার নিম্মুক্ত ভাবে আত্ম-জ্ঞানী হইতে পারিলে
তাহার পর শত সহস্র দৈব-দুর্ঘটনা কিংবা আপদ-বিপদে
ও তাহাকে মূল নিষ্ঠা হইতে চ্যুত করিতে পারেনা।

হোমর কিংবা গ্রীক পূর্ববর্তী গ্রীক সাহিত্যের সহিত
তুলনা করিলে আমরা দেখিব যে ভারতীয় সাহিত্যের
এই দৃষ্টান্ত অতুলনীয়।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতি *

নির্দিষ্ট লিখনপ্রণালীর সাহায্যে কোন ভাষার প্রচলিত শব্দ-বাক্য-পদ সংযোগে নিজের মনোভাব ও অভিমত অপরের জ্ঞান-গম্য করিবার অভিপ্রায়ে যে প্রবন্ধ বা বিষয় লিখিত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণতঃ সেই ভাষার সাহিত্য-পদ-বাচ্য। অনেকের মোটামুটি এই ধারণা আছে যে, যে প্রবন্ধ বা বিষয়ে ভাষার লালিত্য ও সৌন্দর্য্য, ভাবের গাভীর্ষ্য ও সরসতা, পদ-বিচ্ছাসের শ্রুতি-মধুরতা ও নিপুণতা প্রকাশের জন্য চেষ্টা ও কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয়, কেবল মাত্র সেই সকল প্রবন্ধ বা বিষয়ই সাহিত্য নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু আমরা বলি যে, কেবল ব্যাকরণের সমস্ত শব্দার্থাদি অলঙ্কার পরিশোভিত পুস্তক মাত্রই যে সাহিত্য বলিয়া পরিচিত তাহা নহে ; যে কোন পুস্তক পাঠ করিয়া সাধারণে কোন বিশেষ বিষয়ের মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হয়—লেখকের উদ্দিষ্ট ভাব উপলব্ধি করিতে পারে—পাঠকের কোন বিশেষ জ্ঞানের উন্মেষ হইতে পারে, তৎসমস্তই আমরা সাহিত্য-শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া গ্রহণ করি ; তাহাতে ভাষার দুর্ব্বোধ্যতা বা গ্রাম্য-দোষাদি থাকিলেও আমরা তৎসমস্তকেই সাহিত্য-সংজ্ঞায় অভিহিত করি। এই সাহিত্য, সমাজে রক্ষিত হইবার বস্তু। ইহার সাহায্যে বহু-যুগ-যুগান্তরেরও ব্যক্তিবর্গের মনোভাব ও অভিজ্ঞতা তৎপরপর্তী কালের জন-সংঘ উপলব্ধি ও নিজের তুলনায় তাহার দোষগুণ বিচার করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সাহিত্য, একদেশসন্নিবিষ্ট নহে। ইহাকে ব্যাপক বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি। এই ব্যাপকতার নিদর্শন আমরা ক্রমে প্রদর্শন করিব।

সাহিত্য প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, গদ্য ও পদ্য। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম কালে সকল দেশে সকল ভাষায় পদ্যের প্রচলনই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষাও চুঁচুড়া সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

প্রকৃতির সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য কোন সময়ে সমাজে প্রথম প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কোন পুথি বা পদ্যাবলী প্রথম কোন সময়ে সাধারণ লোকের লক্ষ্য স্থলে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিবার অসম্পূর্ণ চেষ্টা নীরস ভাবে আপনাদের সমক্ষে অস্ত্র উপস্থাপিত করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিব না ; আর তাহার চেষ্টা এখনও সম্পূর্ণ ফলবতী হইবার অবস্থায় উপস্থিত হইতে বহু দূরে অবস্থান করিতেছে। এতাবৎ কাল বহু উত্তমশীল, সাহিত্যাত্মশীলনকারী বহু আয়াসে, বহু অর্থ ব্যয়ে, বহু চেষ্টায়, সময়ে সময়ে তাহার অনেকগুলি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে এখন আমাদের ক্রমে বিশ্বাস হইতেছে যে, সে উপকরণ সংগ্রহের সম্পূর্ণতা সাধিত হইতে বিলম্ব আছে। বাহা ইউক, প্রত্নতত্ত্বাত্মসারী ব্যক্তিগণের গবেষণার ফলে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছি যে, অন্ততঃ সহস্র বর্ষ পূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রচলনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখন পাওয়া গিয়াছে, সে সময়ের অনেক গুলি পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সে সময়ের অধিকাংশ সাহিত্যই পদ্যময়। কিন্তু তখন যে গদ্য সাহিত্য একবারে ছিল না, তাহা এখন কোন মতেই বলিতে পারা যায় না। কারণ, অনেকগুলি গদ্য পুথিরও আবিষ্কার হইয়াছে। ধ্বংস-প্রবণ কালের তিমিরময় অতীত গর্ভ হইতেও ‘শূদ্র পুত্রাণ’ ‘রাগময়ীকণা’ ‘আত্ম-জিজ্ঞাসা’ ‘চন্দ্র-চিন্তামণি’ ‘ভক্তি রত্নাবলী’ ‘বৈষ্ণব গ্রন্থ বা পাতড়া’ ‘ষোড়শ পাট নির্ণয়’ ‘আশ্রয় নির্ণয়’ প্রভৃতি অনেকগুলি গদ্য-পদ্য মিশ্রিত গ্রন্থ লোক-লোচনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ; পরে আরও যে উপস্থিত হইতে না পারিবে, তাহারও কারণ দেখি না।

এই ত গেল, তনসাহস্র সময়ের কথা। পরে যখন ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে অসিয়া অর্থ উপার্জন-অভিলাষে বাণিজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার-উদ্দেশ্যে, এদেশের জন-

গণকে নূতন ধর্মালোকে দীপ্তিমান করিবার অভিপ্রায়ে, এদেশের প্রচলিত ভাষা ও সাহিত্যসম্বন্ধে অল্পসন্ধান-পর হইলেন, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এদেশের পাদপ-সমাচ্ছাদিত দুর্ভেদ্য ধর্মময় গিরিরাজ্যের গহ্বর-ভাঙরে স্নিগ্ধ, সুগন্ধ, সুনির্মল উৎস-বারি, নেপথ্যে বৃহৎ স্রাব্য কলনাদে মধুর ঝঙ্কার করিতেছে। কোনরূপ চেষ্টায় সেই উৎসকে উৎসারিত করিতে পারিলে সাহিত্যের প্রস্রবণে দেশ সুশীতল ও শ্রী-সম্পন্ন হইবে এবং সেই সাহিত্যের অল্পসরণে তাঁহাদের ধৃষ্টধর্ম-প্রচারেরও সহায়তা হইতে পারে। পর-দুঃখকাতর পরহিতৈষী ইংরাজ তখন নিজের সম্পূর্ণ শক্তি, অদম্য উৎসাহ, স্বাভাবিক উত্তম, উক্ত উৎসকে ঘোর ভিমিরাচ্ছন্ন পর্কট-গহ্বর হইতে বাহিরে আনিবার জ্ঞান নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাদের সেই শক্তি, উৎসাহ, উত্তম-বলে বহু কষ্টের মধ্য হইতেও বাঙ্গালা সাহিত্য ক্রমে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহাদের কার্যের অঙ্কুরণে আমরাও ক্রমে ক্রমে সেই গুহ্যস্তরিত সাহিত্য-ধারার অনেকগুলি, অক্লিস্থধীন করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্য-ইতিহাসের এই ঘটনা সর্বাপেক্ষা উজ্জল ও অচ্ছেদ্য।

ইহার পূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে ধর্মালোচনাই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পূজা-প্রচার-উপলক্ষে বিবিধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল;—(বৌদ্ধ) ধর্ম-ঠাকুর, শিব, লীতলা, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, সূচনী, কালিকা, বটী, কমলা বা লক্ষ্মী, সারদা বা স্বরস্বতী, গঙ্গা, সূর্য্য প্রভৃতি নানা দেবদেবীর উপাসক-গণ সময়ে সময়ে পূজা-মাহাত্ম্য-প্রচার উদ্দেশ্যে বহু সাহিত্যের দেব-দেবীর মাহাত্ম্য, ব্রত কথাদির প্রচলন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সে সময় “ডাক পুরুষের কথা” ‘ধনার বচন’ প্রভৃতি পুস্তকে রাজ্য, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, ধর্ম, কৃষি, সমাজনীতি, ইত্যাদি সাধারণ জনগণের শিক্ষিতব্য অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়া অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছিল।

হিন্দুরাজগণের রাজস্বাবসানে মুসলমান রাজগণের দ্বারাও বাঙ্গালা সাহিত্য নানা বিষয়ে উৎসাহিত ও উপকৃত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময় সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অনেকগুলি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। তাহারই ফলে আমরা এক্ষণে কুতিবাস, দ্বিজ রামপ্রসাদ, রঘুনন্দন গোস্বামী, ফকীর রাম বিজ্ঞানভূষণ, গোবিন্দ দাস, কবিচন্দ্র প্রভৃতির রামায়ণ, কাশীরাম, বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয়, কবীন্দ্র, ঘনশ্যাম দাস, উৎকল ব্রাহ্মণ সারণ, গোপীনাথ দত্ত, ত্রিলোচন চক্রবর্তী নিমাই পণ্ডিত, মধুসূদন নাগিত প্রভৃতির সম্পূর্ণ বা আংশিক মহাভারত,—গুণরাজ ধানোপাধিক মালাধর বসু ও রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের শ্রীমদ্ভাগবত,—ভবানন্দের হরিবংশ এবং সঞ্জয় ও বিজ্ঞাবাগীশের ভগবদ্-গীতার বাঙ্গালা অনুবাদ আমরা দেখিতে পাইয়াছি।

ইংরাজগণেরও উৎসাহ-সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া উক্তরূপ আরও অনেক নূতন গ্রন্থ অনুবাদিত ও পুরাতন অনুবাদ মুদ্রায়ন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। এই সময় শুদ্ধমাত্র সংস্কৃত গ্রন্থ বেদান্তসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি হইতেই যে অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন হইত, তাহা নহে; অনেক ইংরাজী পুস্তকেরও অনুবাদ এই সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশপদ ফেবল্, ইলিয়াড, টেম্পেষ্ট এবং কোন কোন ইংরাজী ইতিহাস পুস্তকের অনুবাদ এই সময় দেখা যায়,—পাদরি-গণ বাইবেল ও ধর্মপুস্তকেরও অনুবাদ এই সময় আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেমিষ্ট্রি, হাইড্রোষ্টাটিক্‌স্, নিউমেটিক্‌স্ অপটিক্‌স্, এনাটমি, ফিজিক্‌স্, মেটেরিয়া মেডিকা প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক পুস্তক-প্রবন্ধাদিও এই সময় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এইরূপে—মুদ্রায়ন্ত্রের অভাবকালে হস্ত-লিখিত পুস্তক প্রচার যুগ এবং মুদ্রায়ন্ত্রের প্রচলনে মুদ্রিত পুস্তক প্রচার যুগ—এই উভয় যুগের আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, সাহিত্য নানা শাখায় প্রসার লাভ করিয়াছে। যেমন ধর্মশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, তত্ত্ব-জ্ঞান, নীতিউপদেশ, পুরাণেতিহাস, সেইরূপ চরিত্রাধ্যয়ন,

বংশাধ্যান, জীবনী, ইতিহাস ও ইতিকথা,—যেমন পারমার্থিক সংগীত, ভজনগীত, বিবিধ উপাস্ত দেবতার পালা গান, পদাবলী, সেইরূপ যাত্রার পালা গান, কবি ও পাঁচালীর গান, বাউল ও তর্জার গান ;—যেমন জ্যোতিষ গ্রন্থ, সামুদ্রিক গ্রন্থ, কাকের বচন, ধনার বচন, সেইরূপ ভূগোল, খগোল, অক্ষশাস্ত্র, বৈদ্যাগ্রন্থ ;—যেমন ন্যায় শাস্ত্র, আয়ুর্বেদশাস্ত্র বা শারীরস্থান—ঔষধ প্রয়োগ, প্রস্তুত ও ব্যবস্থা তত্ত্ব, সেইরূপ পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিজ্জ বিদ্যা, রসায়ন ;—যেমন আইন ও ব্যবস্থা শাস্ত্র, সেইরূপ কুলপঞ্জী বা জাতীয় ইতিহাস,—যেমন বিজ্ঞান তত্ত্বালোচনা, সেইরূপ সমালোচনা ; ইত্যাদি বিবিধ ক্ষটিকবৎ স্বচ্ছ শুভ্র অথবা রঞ্জিত রমণীয় মণিবৎ ধারা শ্রেণীদ্বারা সাহিত্য-উৎস সুসজ্জিত হইয়া, অধুনা গিরি-গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে এবং নূতন নূতন ধারা সংযোগে বর্দ্ধিত হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়া লোক-লোচনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। উপরি উক্ত বিষয় ব্যতীত বাঙ্গালার নিজস্ব “কথকতা” “পাদপুরণ” “সমস্তাপুরণ” এবং প্রহেলিকা, প্রবচন প্রভৃতি দ্বারাও সাহিত্য সেই অন্ধ তামস যুগে শোভিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা ভাষায় উন্নতিচিহ্নী ইংরাজের বাঙ্গালা সাহিত্য প্রচারের পূর্বে সাহিত্যের ভাষাপ্রয়োগ রচনা কারীদিগের স্ব-ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত ; সুতরাং তখনকার সাহিত্য বিবিধ ও কখন কখন বিসদৃশ রূপে সজ্জিত ও প্রণীত হইত। এই স্বেচ্ছা চারিতার ভাব ইংরাজ-চেষ্টিত বাঙ্গালা-ভাষা-সংস্কারের প্রথম অংশেও সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। ইংরাজ উহাকে সংযত ও প্রণালী বদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাঙ্গালা অভিধান প্রথম প্রস্তুত করেন। তৎপরে সময়ে সময়ে অনেক ইংরাজ এবং বাঙ্গালি কর্তৃকও ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলিত হইয়াছিল। এই সকলের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য ক্রমে নিয়মবদ্ধ ও সংস্কৃত

হইয়া আসিয়াছে। ইংরাজী সন ১৮৫৪ সালে মুদ্রিত “শব্দানুশি” নামক অভিধান দেখিলে বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষা পূর্বাপেক্ষা সেই সময় সুসংস্কৃত হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং সাহিত্যের শক্তি ও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসরণে বাঙ্গালা সাহিত্য পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টায় ভাষায় বিস্তর সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহারই ফলে পূর্বোক্ত “শব্দানুশি” অভিধানের সৃষ্টি। যেমন সংস্কৃত শব্দ আসিয়া বাঙ্গালা ভাষা পরিপুষ্ট হইয়া পড়িল, অমনই সংস্কৃতানুসারী পদ প্রয়োগ ও বাক্যবিষ্ঠাসের ব্যবস্থাও কতক পরিমাণে বাঙ্গালা সাহিত্যে লক্ষ প্রবেশ হইল। সেই জন্ম মধ্যকালের সাহিত্য জটিল-শব্দ-ময়, সমাসান্বিত দীর্ঘপদ যুক্ত সুতরাং সাধারণের সহজ বোধের অতীত হইয়া পড়িল। ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ তখন সে প্রণালীর পরিবর্তন করিয়া সাহিত্যের বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতা, মনোহারিত্ব ও সহজবোধ্যতা রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইলেন। স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিজ্ঞানাগর, স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান।

শিশুদিগের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে “শিশুবোধক” পুস্তক প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। এই একখানি পুস্তকের সাহায্যেই সে সময় সাহিত্যের বর্ণশিক্ষা হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ সাহিত্য শিক্ষা, অল্প শিক্ষা, নীতি শিক্ষা প্রভৃতি হইত বটে : কিন্তু তাহাতে শিক্ষার ততদূর সুবিধা হয় না নিশ্চয় করিয়া স্বর্গীয় কবি মদন মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় “শিশু শিক্ষা” নামক ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ পুস্তক রচনা করেন। এই তিন ভাগে সোপানক্রমে ক্রমোচ্চ সাহিত্য মাত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই পুস্তকত্রয় এখন তত প্রচলিত নাই ; কিন্তু সুকুমারমতি, স্বভাবতঃ ক্রীড়া-শীল শিশুর পক্ষে ইহা অতীব উপকারী পুস্তক। গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ কবিত্বের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন,—প্রথম ভাগ অতীব সুশ্লীল ও শিশুগণের বিশেষ প্রিয়। ইহার—

ভাৱ ১০১২

“পাখীসব করে রব, রাতি পোহাইল।

কাননে কুমুম কলি সকলি ফুটল।”

ইত্যাদি কবিতা কি কবিত্বশালী, সুমধুর, প্রাঞ্জল ও বিশ্বশব্দ-বর্জিত। বানান-শিকার প্রতিপদে সেই কবিত্ব জাগরক,—যথা “কাটা কান, ফাটা শাপ”—“মিঠাই খাইব, কোথায় পাইব ?” ইত্যাদি।

যাহা হউক, এখন সাহিত্যের রূপে এক প্রকার নিয়ম-নিবদ্ধ-রূপে অপেক্ষাকৃত স্বাভাৱে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহা এখন সমাস-বহুল, অ-নিত্য ব্যবহার্য্য জটিল শব্দ-রাশি-সমাকুল নহে; অথচ ইহা চলিত-কথনীয় ভাষা বা প্রাদেশিক শব্দ সমাকুলও নহে। এখন ইহাতে বিজ্ঞান দর্শন ও অজ্ঞাত তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক শব্দ নূতন রচিত বা সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে সাহিত্যের জটিলতা বৃদ্ধি হয় নাই। প্রয়োজন বোধে সে সকল অপরিহার্য্য, তাহাতে উন্নতি ভিন্ন অবনতি হইতে পায় না।

এইরূপে সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি যে হইতেছে, তাহা সুনিশ্চিত। মুদ্রাবস্তুর সৌকর্য্যে সাহিত্য প্রচারের সম্যক স্ফায়িত হইতেছে বলিয়াই দ্রুত গতিতে ইহার উন্নতি পল্লিক্রিত হইতেছে। এক্ষণে সাহিত্য নূতন নূতন শাখা-প্রশাখার নবোদগমে কেবল যে ত্রিসম্পন্ন হইতেছে, তাহা নহে; তদ্বারা ইহার গাভার্য্য, শক্তিমত্তা ও পুষ্টির লক্ষণ বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। নানাপ্রকার শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, পুস্তক, পুস্তিকা সাহিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে,—বর্ণ চিত্রণ আলোক-চিত্রণ, ভূতত্ত্ব, কবিতত্ত্ব, রন্ধন-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া সাময়িক পত্রাদিতে প্রবন্ধ ও স্বতন্ত্র পুস্তকও প্রকাশিত হইতেছে। নাটক, নাটিকা, নাট্য-গীতি, প্রহসন, গল্প, নূতন ভাবে ভূষিত হইয়া যেন অক্ষয় তুলীর মধ্য হইতে নির্গত হইতেছে, আর উপ-ভাস, রহস্যভাস, গুপ্ত কথা, ইতিকথা, ক্ষুদ্র গল্প, ইহাদের সংখ্যা নির্ণয় এক প্রকার সাধ্যাতীত হইয়াছে। গবর্ণ-মেন্টের অনুগ্রহবলে আদর্শ কাব্যক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়াতে

কৃষি বিজ্ঞান ও কৃষিশিল্প সম্বন্ধে আলোচনাকল্পে সে দিকেও সাহিত্য প্রচার লাভ করিতেছে। সংগীত শিল্পের সহিত সংগীত বিজ্ঞানের অনুশীলনে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভ্রমণ সম্বন্ধীয় বিবরণও সাহিত্যের এক দিক পুষ্ট করিতেছে। আবার আজকাল প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস সংগ্রহের দিকে শিক্ষিত ধনশালী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পতিত হওয়াতে, তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট চেষ্টায় গবেষণায় বাস্তবিক অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া সাহিত্যকে নূতন আলোকে আলোকিত করিতেছে।

প্রত্ন-তত্ত্ব আজকাল যেরূপ ক্রটিত প্রদর্শন আরম্ভ হইয়াছে,—কেবল মাত্র সুখ-শয্যায় শয়ান থাকিয়া অপর ভাষার পুস্তকস্থ প্রত্নতত্ত্ব পাঠ করিয়া তাহারই সার সংকলন না করিয়া নানা দুর্গম স্থানে কষ্ট স্বাকার পূর্বক ভ্রমণ করিয়া—নিভৃত নিদর্শন বা লোকপরিম্পরা শ্রুত কিম্বদন্তী অবলম্বন পুরঃসর এদেশীয়গণ যেরূপ অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিতেছেন, সেইরূপ ক্রটিত সেইরূপ যত্ন, সেইরূপ আগ্রাস অপরাপর বিষয়ের প্রতি প্রয়োগ করা এখন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। নাট্যকলা ও সঙ্গীত কলার সম্বন্ধে কেহ কেহ উদ্যোগী হইতেছেন ইহা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লক্ষিত হয় না। সাহিত্যের অঙ্গভূত করিয়া তাহার অনুশীলন না করিলে যেমন সাধারণতঃ তাহার বিস্তার হইবে না, উদার, কণ্ঠ জনগণের নিজ নিজ ক্রটিত তাহাতে সংযুক্ত না হইলে তাহার স্থায়িত্ব ও বলবত্তা সাধিত হইবে না। শুদ্ধমাত্র নাট্য ও সংগীত কলা নহে, সর্বপ্রকার কলা সম্বন্ধেই এই কথা প্রতিবর্ণীকৃত্যে প্রযুক্ত হইতে পারে। প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে একটি কথা বলিবার বিশেষ ইচ্ছা হইতেছে। সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রতি যেরূপ ভাবে এখনকার লোক আদর ও যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে কিছুদিন পরে এমন সাহিত্যিক উন্নতির যুগেও—সঙ্গীতের কোন কোন অঙ্গ একবারে লোপ পাইবার সম্ভাবনা। ঢপ সঙ্গীতের অনুশীলন এখন আর সেরূপ দেখা যায় না; এই অংশের সম্বন্ধে শীঘ্র মনোযোগ করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া

উপলব্ধি হইতেছে। নতুবা অল্প দিবস পরেই ভবিষ্যৎ-বংশের নিকট ইহা আকাশকুসুমবৎ প্রতীয়মান হইবে। অন্ততঃ ইহাকে সাহিত্যের অঙ্গগত করিয়া ইহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিলেও আংশিক রক্ষা হইতে পারে।

এইরূপে শিল্প ও বিজ্ঞানের অল্প নানা শাখা সম্বন্ধে ও উক্তরূপ নিজ নিজ কৃতিত্ব ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহিত্যিক আলোচনার একান্ত প্রয়োজন উপলব্ধি হইতেছে। এই বিভাগে আমাদের কৃতিত্ব এখনও কিছুই নাই, করিবার প্রবৃত্তিও অতীব অল্প। ভূতত্ত্ব ও রসায়ন সম্বন্ধে অধুনা দুই এক জনকে উক্তরূপে অগ্রসর হইতে দেখা যাইতেছে বটে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা একবারে নিতান্ত অল্প। রসায়ন শাস্ত্র একজন যোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ও উত্তম শীলতায় অনুশীলিত হইতেছে। তাহাতে আমাদের অনেকটা আশা আছে। কিন্তু অপরাপর বিজ্ঞান-শাখায় এখনও সেরূপ বড় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এই ব্যাপারে মনে হয়, এখন আপাততঃ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অপর ভাষার পুস্তক প্রবন্ধাদি হইতে অনুবাদ বা বাঙ্গালা ভাষায় তাহার সাংসংগ্রহ করা হউক, এবং এই জ্ঞান পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াও বিভিন্ন উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে সেই কার্যের ভার অর্পিত হউক। এই সাহিত্য-সম্মিলনের পূর্ব পূর্ব সম্মিলন-ক্ষেত্রে এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আঙ্গ-পর্যন্ত তাহার কার্য কিছু দেখিতে না পাইয়া আমরা এই সম্মিলনের সমক্ষে পুনরুদয় ক্রন্দন করিতে হইতেছে। আলস্য-পরতন্ত্রতা যে আমাদের জাতিগত, স্বভাব-সিদ্ধ দোষ ও নিন্দার কথা, তাহা কি অপমৃত হইতে পারে না? ভগবান্ এই বসন্তাগমে আবার ক্রোড়াক্ষলে প্রকৃতিগাত্রে রঞ্জনবিশেক করিয়া জড়তা দূর পূর্বক চঞ্চলতা, কার্যতৎপরতা উৎপাদন করিতেছেন,—জড়জগৎ মুখরিত, মুকুটিত, উন্মাদমগ্ন হইতেছে—এমন সময়ে আমাদের অন্তরের তমোরাশি কি আপসারিত হইবে না? রঞ্জনগোক্রান্ত হইয়া কণ্ঠ

প্রকৃতির ত্রায় দ্রুতপদ সঞ্চারে সাহিত্যের সর্বাধি উন্নতি কল্পে বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে পারিব না?

কিন্তু আমার আশা হইতেছে—না,—আমি যেন মনশ্চকুর সম্মুখে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, সাহিত্যিক সর্বাদ্বীন পুষ্টি অচিরেই সাদিত হওয়াতে—সুকুমার অথচ গম্ভীর সৌন্দর্য্যচ্ছটার উদ্ভাসিত হইয়া চারিদিকে নিজ শক্তি বিস্তার করিয়া সাহিত্য-কানন সুন্দর নয়নতৃপ্তিকর উপবনে পরিবর্তিত হইয়াছে,—অপূর্ব প্রতিভা-রশ্মি-বিস্ফারিত-বদন শোভিত, ধীশক্তিশালী বহুতর প্রৌঢ় ও যুবক একান্ত যত্ন ও আগ্রহে, অক্লান্ত পরিশ্রমে নানাজাতীয় সাহিত্য-বৃক্ষ-লতাগুল্মের সেবা কার্যে নিরত রহিয়াছেন; কেহ বা পাদপ-তল পরিক্রান্ত করিতেছেন—কেহ বা আলবালে-জল সেচন করিতেছেন, কেহ বা পুষ্প চয়ন করিয়া মালা গ্রথিত করিতেছেন। আবার সুদূর হইতে আগত হইয়া কোন অল্পদেশীয় যুবক এই সাহিত্য উপবনের কোন কোন জাতীয় তরুর ফলান্বাদনে আনন্দিত হইয়া পূর্বোক্ত উদ্যানরক্ষক কোন যুবকের নিকট তত্ত্বতরুর সুপক ফলের বীজ নিজ দেশে নিজ সাহিত্য উদ্যানে রোপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করিতেছেন—বাস্তবিক আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? বাহা দেখিলাম, তাহা কি মায়ামরীচিকা? না—তাহা হওয়া অসম্ভব;—উহা স্বপ্ন নহে—মরীচিকা নহে। এই জাতীয়তার উন্মেষের দিনে আমাদের শিক্ষিত যুবক ও প্রৌঢ় সম্প্রদায় কি সাহিত্য-উপবনের সেবাকার্যে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইতে পারেন না? নিযুক্ত হইয়া দেশের—সমাজের উন্নতি ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়া বাঙ্গালির মুখরক্ষা করিতে পারেন না? এই সম্মিলনের মধ্যবর্তিতায়—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মধ্যবর্তিতায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা যোপার্জিত ধীশক্তি দ্বারা—তাহা সামান্য হইলেও—বহু লোকের সমগ্রীভূত জ্ঞান দ্বারা, কি সাহিত্যিক পরিপুষ্টি সহজে স্বল্প সময়ে সাধিত হইতে পারিবে না? নিশ্চয়ই সাধন করিতে

ভাদ্র ১৩১২

হইবে;—নতুবা কন্তব্য কর্ষে প্রত্যাবার ঘটিবে,—মানব-
জন্ম-ধারণের সফলতা হইবে না—আমাদের রক্ষক-
দেবতার অভিসম্পাত-গ্রস্ত হইতে হইবে।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী।

প্রাচীন জাপান

বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তনের যুগ

(খৃঃ ৫৪০—৬৪৪)

এ যুগে রাজসভার বিভিন্ন দলের মধ্যে চক্রান্ত ও
কলহের অন্ত ছিল না। সেই হেতু কোরিয়ার উপর
জাপানের প্রভাব অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল।

বাণিজ্যের বিস্তার ও নৌবিদ্যা পারদর্শিতা জাপানকে
সাক্ষাৎভাবে চীনের সংস্পর্শে আনিয়াছিল, এবং ফলে
দেশী চালচলন রীতিনীতি অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়া
গিয়াছিল।

রোমিন্ বা স্বাধীন বাসিন্দা ও সেনমিন্ বা পরাধীন
বাসিন্দার মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল ও তাহের
মধ্যে বিবাহ কঠোরভাবে নিবারণিত হইয়াছিল।

এতাবৎকাল জাপানীরা বহু দেবতায় বিশ্বাস করিয়া
আসিতেছিল। ৫২২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কেইতাই এর রাজত্ব
কালে বুদ্ধের বাণী কোরিয়া হইতে জাপানে পৌঁছিল।
৫৫২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কিন্মেই কোরিয়া রাজের নিকট হইতে
উপহারস্বরূপ কয়েকখানি ধর্ম গ্রন্থ ও বুদ্ধের একটি প্রতি
মূর্তি পাইলেন ও স্বয়ং বৌদ্ধ হইলেন। এ ঘটনা তাঁর
সভাসদ ও মন্ত্রীগণের মধ্যে ঘোর তর্কবিতর্কের সৃষ্টি
করিয়াছিল। যাহা উদ্ভূত এই সময় হইতে বৌদ্ধ ধর্ম
জাপানে দৃঢ় মূল হইতে আরম্ভ করিল। বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের
৭০ বৎসর পরে দেশে সর্ব সম্মত ৪৬টি বৌদ্ধমন্দির, ৮১৬
জন পুরোহিত ও ৫৬৯ জন ভিক্ষুণী ছিল। রাজধানী ও
ভল্লিকটবর্তী স্থানেই মন্দিরগুলি অবস্থিত থাকার গ্রাম

বাসিগণ তাদের পুরাতন বিশ্বাস ও আচার ব্যবহার
পরিত্যাগ করে নাই।

অজানা লোককে বা অজানা লোকে যে দ্রব্য বহন
করিতেছে তা স্পর্শ করিলে লোক অশুচি হইত! হয়ত
কোনো লোক বিদেশে চাকরি করে। স্বদেশে প্রত্যা-
বর্তনের সময় সে হয়ত পীড়িত হইয়া পশ্চিমধ্যে প্রাণত্যাগ
করিল। যে গ্রামে সে মরিল তা এই রূপে অশুচি হইল।
মৃত ব্যক্তির সহযাত্রীগণকে গ্রামের অমঙ্গল দূর করিবার
জন্ত নানারূপ পূজা স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করিতে বাধ্য করা
হইত! কেহ জলে ডুবিয়া মরিলেও একই প্রকার বিধান।
পশ্চিমার্ধে কাহাকেও মরিতে যে দেখিয়াছে বা মৃত
কাহাকেও দেখিয়াছে তার অর্থব্যয় করিয়া স্বস্ত্যয়নাদি
করাইতে হইত। এই হেতু নিকট আশ্রয়ও কেহ
জলে ডুবিয়া বা অশ্রু কারণে মারা গেলে সহযাত্রী আর
আর সকলে মৃতদেহ ফেলিয়া পলাইত!

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও কলার
প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পশু, পক্ষী, পুষ্প
প্রভৃতি খোদিত স্তম্ভ বর্ণাঙ্গ সজ্জিত নয়নমোহন মন্দির
ও সুদৃশ্য প্যাগোডা নির্মিত হইয়াছিল। প্রস্তর ও ধাতুর
উপর খোদাই, ঢালাই, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি প্রভূত উৎকর্ষ
লাভ করিয়াছিল। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিল্পেরও উন্নতি
হইয়াছিল। পণ্ডলোম হইতে বস্ত্র নির্মাণ এই যুগে
প্রবর্তিত হইয়াছিল।

স্থানে স্থানে বাজার মেলা প্রভৃতি বসিত। সুদূর
পল্লীতে ও পণ্য দ্রব্য লইয়া ফিরিওয়ালা যাইত। জাপানী
বন্দরে বিদেশী জাহাজের আগমন হইয়াছিল। ৫৮৮
খৃষ্টাব্দে চীন হইতে তুলাদণ্ডের আবির্ভাবে ও ৬৪০ খৃষ্টাব্দে
নির্দিষ্ট ওজননের বাটকারা প্রবর্তিত হওয়াতে সঙ্ঘোষজনক
ব্যবসায়ের পথ অনেকটা উন্মুক্ত হইয়াছিল।

৬৪২ খৃষ্টাব্দে সরকার নির্মিত একটি বাটীর ছাদ
টালিচার আচ্ছাদিত হইল। সম্রাটের প্রাসাদের ছাদও
তক্তা দ্বারা আচ্ছাদিত হইল। এতাবৎকাল ছাদের
ছাউনি করিতে তুণ-পর্শাদি ব্যবহৃত হইত।

৬০০ খৃষ্টাব্দে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সভাসদ ও ওমরাহদের ভক্ত ভিন্ন ভিন্ন ক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সর্বসমেত বারোটি শ্রেণী ছিল, প্রত্যেক শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন কাসমুরি বা টুপি। ফলে এই সময় নতুন ধরণে চুল বাঁধা আরম্ভ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ইহা কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল।

বৌদ্ধধর্ম সর্বপ্রকার জীবহিংসা হইতে বিরত হইতে শিক্ষা দেয়, ফলে এই নব ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ক্রমে তাঁর জাল ছিঁড়িল, ও ব্যাধ ধম্ম ভাঙিল। অনেক লোকে মৎস্য মাংসাহার একেবারে পরিত্যাগ করিল।

৫৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রবল বারিপাত ও বতায় দেশ ভাসিয়া গেল। দরিদ্র লোকের দুঃখের অবধি রহিল না। দৈব-জ্ঞেরা কহিল কামো নামক দেবতার ক্রোধবশতঃই এরূপ হইয়াছে। তাঁহার প্রীত্যর্থ সন্মতি কিয়েই এপ্রিল মাসে একটা বিরাট উৎসবের আয়োজন করিলেন। আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, প্রচুর শস্তও উৎপন্ন হইল। সে অবধি প্রতি বৎসর কিওতোয় কামো উৎসব হইয়া থাকে। কামো মন্দিরটি কামো নদীর তীরে অবস্থিত।

নৃত্য ও যন্ত্রবাদনের উন্নতির মূলেও বৌদ্ধধর্ম, কারণ ঐ ধর্মের ক্রিয়াকর্মাদিতে উভয়েরই প্রয়োজন। পূর্বে জাপানী সম্রাট ব্যক্তির মৃগয়ার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, এবং রমণীগণও তাহাতে যোগদান করিতে বিরত হইতেন না, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম মৃগয়ার পরিবর্তে জাপানীর চিত্তে পুষ্পপ্রিয়তা জাগাইয়া দিল। এই সময়ে জাপানে নিরীহ রকমের এক প্রকার ‘স্কট্-বল’ খেলা প্রচলিত হইয়াছিল।

এই সময়ে উফোৎসের আবিষ্কার হয় এবং উহা স্বাস্থ্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। ধনী লোকেরা প্রায়ই এই সব স্থানে যাইতেন।

নারা যুগ

(খৃঃ ৬৪৫—৭৮১)

৬৪৫ খৃষ্টাব্দে শাসনপ্রণালীতে এক মহা পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। প্রাসাদ ও রাজসভার যাবতীয় উচ্চ

পদগুলি এতাবৎকাল কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবারে বংশানু-ক্রমে আবদ্ধ ছিল, যোগ্যতা থাকুক বা নাই থাকুক। এখন এই পদগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইল। দেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া রাজসভা কর্তৃক নির্বাচিত শাসন কর্তার অধীনে রাখা হইল। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য-নির্বাহক সভা দাজোকান্ নামে অভিহিত হইত। ইহার অধীনে আটটি বিভাগ ছিল। কর্মচারীদের বারোটি শ্রেণী এখন বর্ণিত হইয়া তেরটি হইল। প্রত্যেক শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন কাসমুরি বা টুপি নির্দিষ্ট হইল।

৭০১ খৃষ্টাব্দে শ্রেণীগুলির সংখ্যা ৪৮ হইয়াছিল। এবার টুপির পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন পদনী নির্দিষ্ট হইল পদ অনুসারে কর্মচারীদের বেতন নির্ধারিত হইল। জমি, কাপড়, চাউল, লবণ বা অন্য কিছু অর্থের পরিবর্তে বেতনস্বরূপ প্রদত্ত হইত। দেশের সমস্ত কর্ষণোপযোগী ভূমি লোকদের মধ্যে—প্রত্যেক পুরুষ দুই ‘তান্’ বা অর্ধ ‘একার,’ ও প্রত্যেক স্ত্রী ‘১/২ ‘তান্’, এই হিসাবে—ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ভূমির স্বতন্ত্র স্বত্ব কেহ ভোগ করিতে পারিত না। বাসিন্দারা দেশজাত পণ্যদ্রব্য, চাউল বা নিজেদের মেহনতি করস্বরূপ প্রদান করিত।

গুপ্ত বিবাহের ফলে যে সব সম্ভান জন্মিত, তারা সেন্‌মিন্ বা দাসশ্রেণীভুক্ত হইত। দারিদ্র্য বা দেনার দায়ে অনেক স্বাধীন অবস্থায় জাত ব্যক্তি ও দাসশ্রেণীভুক্ত হইত। এতাবৎকাল কেবল দুই শ্রেণীর লোকেরই যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের সংস্কারে এই নিয়ম রহিত হইয়া গেল। স্থির হইল দেশের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র রাজ্যের অঙ্গাগারে আনীত হইবে এবং সৈন্যদলভুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ অস্ত্র লইয়া ঘুরিতে পাইবে না। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে (৬৭৬ খৃঃ) সম্রাট তেনমু শিক্ষিত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল গঠন করিলেন। তাঁর পরবর্তী সম্রাজ্ঞী জিতো নিয়ম করিলেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের এক চতুর্থাংশ যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত হইবে। এইরূপে (Conscription বা বলপূর্বক সৈন্যদলভুক্ত করণ প্রথার সূচনা হইল। ৭০২

খৃষ্টাব্দের সংস্কারে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের এক তৃতীয়াংশ সর্দাদাই সৈন্যদলভুক্ত হইয়া থাকিবে স্থিরীকৃত হইল। দেশকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা হইল। পাঁচ ছয়টি অংশ একত্র করিয়া এক একটি 'এজি' বা Army Division গঠিত হইল। সৈন্যেরা সীমান্ত-রক্ষক ও প্রাসাদ-রক্ষক এই দুই ভাগে বিভক্ত হইল। সৈন্যদের কার্যকাল তিন বৎসর নির্দিষ্ট হইল। সীমান্তরক্ষকদিগকে প্রতি বৎসর এক স্থান হইতে অত্রস্থানে বদলি করা হইত। যুদ্ধের সময় বিশেষ সেনাদল গঠন করা হইত। কিন্তু কিছুকাল গত হইলে উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়িল ও এ নিয়ম রদ করা হইল। দেশের পরাক্রম ক্রমশঃ সামুদ্রাইদিগের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল।

বাটীর কর্তা ও তাঁর পরিবারবর্গের সমষ্টিকে 'কো' বলা হইত। পাঁচটি 'কো' মিলিত হইলে একটি 'হো' হইত। এই 'হো'র অন্তর্গত সকলে পরস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য, একরূপ বিধান প্রবর্তিত হইল। পাঁচটি বাটীর কর্তাদের মধ্যে এক জন 'হো'র সভাপতি মনোনীত হইতেন, তাঁর উপর সকলের পর্যাবেক্ষণভার অর্পিত হইত। 'হো'র অন্তর্গত কোনো পরিবার করদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্ত চম্পট দিলে 'হো'র যাবতীয় সভ্যেরা ইহার জন্ত দায়ী হইত। একটি বাটীতে একটি বৃহৎ পরিবার বাস করিত, এবং কর্তার অধীনে, ভাই, খুড়া, খুড়ী, জ্যো, রক্ষিতা জ্যো, ছেলেপুলে চাকর, চাকরাণী প্রভৃতি প্রায় এক শত লোক বাস করিত। কর্তার মৃত্যু হইলে তার পুত্রই বাটীর কর্তা হইত। কখন কখন জ্যোকে বাটীর কর্তা হইত। পদমর্যাদায় তৃতীয় শ্রেণীর রাজসভাসদ অপেক্ষা যারা উন্নত সেই সব পরিবারে পুত্র না থাকিলে পৌত্র (জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র), ও পৌত্র না থাকিলে মধ্যম পুত্র উত্তরাধিকারী হইত। বৈধ পুত্রের বা পৌত্রের অভাব ঘটিলে রক্ষিতা জ্যো গর্ভজাত পুত্র, বা তার পুত্র উত্তরাধিকারী হইত। চতুর্থ শ্রেণীর চেয়েও নিম্ন শ্রেণীর পরিবারে পৌত্র উত্তরাধিকারী হইতে পাইত না।

পুত্র না থাকিলে আত্মীয়ের মধ্যে হইতে এক জনকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকেই উত্তরাধিকারী করা হইত।

পুরুষের পঞ্চদশ ও জ্যোকে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স পূর্ণ হইলে তবে বিবাহ হইত। বিবাহ কিস্ত বর ও কন্যার মাতা পিতা ও ঠাকুর দাদা ঠাকুরমার অনুমতিসাপেক্ষ ছিল। বিবাহের কথাবার্তা স্থির হইবার পর (১) তিন মাসের মধ্যে উহা অনুমোদিত না হইলে, (২) ভাবী বর কোথাও চম্পট দিলে এবং এক মাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন না করিলে, (৩) বা বিদেশ গিয়া এক বৎসরের অধিক-কাল বাস করিলে, (৪) বা কোনো গুরুতর অপরাধ করিলে—বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ হইতে পারিত। বিবাহের পর, (১) স্বামী যদি সন্তান বর্তমানে পাঁচ বৎসর এবং সন্তান অবর্তমানে তিন বৎসর বিদেশে গিয়া থাকিত, (২) যদি সে জ্যোকে পরিত্যাগ করিয়া সন্তান বর্তমানে তিন বৎসর, বা সন্তান অবর্তমানে দুই বৎসরের জন্য কোথাও পলাইত তবে জ্যো স্বামী হইতে পৃথক হইতে পারিত।

সন্তানহীনতা, ব্যভিচার, স্বামীর মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, চৌর্য্যাপরাধ, দ্বর্জ্য্য, সামাজিক ব্যাধি ইহার মধ্যে যে কোন কারণে স্বামী জ্যোকে পরিত্যাগ করিতে পারিত। কিন্তু একরূপ কারণ সত্ত্বেও সে তার মাতাপিতা ও ঠাকুর দাদা, ঠাকুর মার সম্মতি গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিল। পুরুষ কেবল মাত্র একজনকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারিত। প্রেণী-বিশেষের সহিত শ্রেণীবিশেষের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। স্বাধীন প্রজা ও 'দাস জাতীয়ে'র মধ্যে বিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। যদি কেহ না জানিয়া একরূপ বিবাহ করিত তবে সে বিবাহ ন্যায্য, ও তাদের সন্তানেরা স্বাধীন-অবস্থায় জাত বলিয়া বিবেচিত হইত। পরে একরূপ মিশ্রিত বিবাহে আপত্তির অবসান ও মিশ্রিত বিবাহে উৎপন্ন সন্তান স্বাধীন-জাত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল।

মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া হইবে

ভূতাপণেরও এ সম্বন্ধে উইল বা ইচ্ছাপত্র ~~করিবার~~ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। উইল না রাখিয়া কেহ মৃত হইলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার পরিবারবর্গের মধ্যে দেশের আইন অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। সম্পত্তি সকল সময়েই বিক্রয় করা যাইত। কর্ণিচ ভূমি, বসতবাটা এবং ভূতাদির সরকার নামে-মালিক থাকিতে এ গুলি বিক্রয় করিবার পূর্বে সরকারের অনুমতি লইতে হইত। অথ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু যে কোনো সময়ে এক জন সাক্ষীর সম্মুখে বিক্রয় করা যাইতে পারিত। টাকা দুই প্রকারে কর্জ দেওয়া হইত, মৃদ গ্রহণ করিয়া বা না করিয়া। পুরোহিত ও মঠবাসিনীদিগের মৃদ লওয়া নিষিদ্ধ ছিল। সরকারি কর্মচারীরা তাদের অপেক্ষা নিম্ন কর্মচারীর নিকট কর্জ লইতে পারিত না। মৃদের হার বাট দিনে আসলের আট-ভাগের এক ভাগ হইত, ধারের পরিমাণ যত দিনেরই হউক না কেন মৃদের পরিমাণ কখনো আসল অতিক্রম করিবার যো ছিল না। কেহ ধার শোধ করিতে না পারিলে তার সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যাইত, শেষে তার ক্রীতদাসের মত হওয়াও সম্ভব ছিল। কর্জকারী অমুস্থ বা পীড়িত থাকিলে তার পরিবর্তে কর্জ গ্রহণের সময় যে সাক্ষী ছিল তাহাকে গোলাম হইতে হইত।

৭.১ খ্রীষ্টাব্দে বসতবাটা ও জমি জমা বন্ধক রাখিয়া কর্জ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ধনবানদিগের হস্তে ঘাহাতে সম্পত্তি জমা হইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে এই নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

এ যুগে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ধব, গম, ভূত, শণ, নাশপাতি, বাদাম, শালগম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উষা

বিমল হাসিতে ভরি নয়ন অধর
কে তুই রে সুধাময়ী বালা,
নেমে এলি স্বর্গ হতে কিরণ ধারায়
রূপে করি এ ধরণী আলা ?

কি মধুর দৃষ্টিখানি ! করিছে যেন রে
দিকে দিকে সুধা বরিষণ,
ধরায় বিকশি উঠে হরষে পুলকে
যেন নব নব জাগরণ।

এসেছিস সুনির্মল পবিত্র সুন্দর
শিশিরেতে সন্তান করি,
তনু দেহে আলোকের বিশদ বসন
সযতনে পরিধান করি।

এনেছিস কুড়াইয়া কত সযতনে
ভরি তব হৃদয়ের ধানি,
হাসি অশ্রু ভরা ওই কুশুমের রাশি
কত শত বকুল শেফালী !

এ বিশ্ব মন্দির মাঝে বিরাজে কোথায়
দেবতার আসন নির্জন,
তুমি কি এসেছ বালা হৃদয়ের ফুলে
পূজিবারে তাঁহার চরণ ?

কণিক দাঁড়ারে হেথা পূজিবার আগে
মন্দিরের প্রবেশ দুয়ারে
তুমি কি ডাকিছ, আহা নয়নের পাতে
বিশ্ববাসী নিদ্রিত সবারে !

আমারে শিখাও বালা তোমার মতন
হইবারে পবিত্র সুন্দর,
তোমার মতন হোক সরল, উজ্জল,
সুধাময়, আমার অন্তর।

প্রাণের কুম্বগুলি করিয়া চরন
ভক্তি অশ্রু মাধিয়া যতনে,
শিখাও আশারে বালা নিত্য নিবেদিতে
দেবতার পবিত্র চরণে।

শ্রীপুষ্পকুম্ভলা দত্ত।

শুভদৃষ্টি

(১)

শরৎ ও সতীশ মেসে থাকিয়া এম্. এ. পড়িত।
হুই জনেই অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে; বি, এ. পাশ করিয়া
উভয়েই আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইত,—বিশেষ
পরীক্ষার তখন তাড়া ছিল না।

নারী ও নারীর প্রেমকে সতীশ চিরদিনই বরণ্য
বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছে; সাহিত্যে যেখানেই
নারীর রূপ ও শ্রেষ্ঠতা বর্ণনার কথা পড়িয়াছে সেখানেই
লাল দাগ দিয়া তাহা মুগ্ধ করিয়াছে; এবং সম্প্রতি
ভাগ্যসিদ্ধ মনন করিয়া যে নারী-রক্কে সে লাভ করিয়াছিল
তাহার অনবদ্য সৌন্দর্যের উপর আরও খানিকটা মাধুর্যের
লালিমা চড়াইয়া তাহাকে দিবারাত্রি ধ্যাম করিত।

শরৎ থাকে সন্ন্যাসী হইয়াছিল,—কামিনী কাকন
ত্যাগ করিয়া মোটা রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়া ভূত
সাধনা করিতে গিয়াছিল। ভূত সাধনা হইয়াছিল কি না
সে কথা ইতিহাসে লেখে না, কিন্তু তাহাকে অনতি-
বিলম্বেই সংসারে ফিরিতে হইয়াছিল। তাহার একটা
প্রবল কারণ পিতার তাড়না। বাবা হউক সংসারে
ফিরিয়া সে সংসারের উপর কোন প্রকাশ্য প্রতিশোধ
লইল না; পেরুরা বস্ত্রের পরিবর্তে ঢাকাই কাপড় এবং
ফিনকিনে পাঞ্জাবী শোভা পাইতে লাগিল, এবং চেয়ো-
রসমের গন্ধে দিগ্বিদিক অবন্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

শরৎ বলিত সন্ন্যাসের দুইটা পুরাতন অভ্যাস সে
কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে নাই,—প্রথমটা নারীর
প্রতি বিতৃষ্ণা, দ্বিতীয় রুদ্রাক্ষের মালা।

নিম্নকোরা বাল্য প্রথমটা ভান মাত্র এবং দ্বিতীয়
অভ্যাসটি প্রাচ্য হিসাবে সৌন্দর্য-বৃদ্ধি ও ভক্তি-
আকর্ষণের উপায় মাত্র।

বাংলা দেশে যে ছেলে এম্. এ. পড়ে তাহাকে
পাইবার ওত্র কোন পুত্রীর পিতা না উৎসুক হয়? সুতরাং
ভূতপূর্ব সন্ন্যাসী শরৎজেরও বিবাহ সম্বন্ধের অভাব
হইল না।

সে দিন চাঁদনি রাত, ছাদের উপর বসিয়া শরৎ
হারমোনিয়াম বাজাইতেছিল এবং সতীশ অনতিদূরবর্তী
শনিবার-রাত্রের মধুর ছবি আঁকিতেছিল! কানের
কাছে যেন চুড়ির লজ্জা আওয়াগ, চাবির কনকনা
বাজিতেছিল, এবং চোখের উপর আনন্দ ও লজ্জার এক-
খানি আগাগোড়া লাল মুখের মধুর সৌন্দর্য্য ভাসিয়া
উঠিতেছিল।

সতীশ কহিল, “শরৎ তোমার বিয়ের কি হ’ল?”
শরৎ ইতিপূর্বে তার অনেক বার উত্তর দিয়াছে, বিবাহ-
সম্বন্ধে তাহার গভীর অনাস্থা জানাইয়াছে। কিন্তু আজ
এমন সুন্দর রাত্রে বোধ হয় সন্ন্যাসীর মনও টলিয়াছিল—
এক কথায় উত্তর না দিয়া কহিল, “আচ্ছা সতীশ, বিয়ে
ক’রে তুমি কি সুখী?”

সতীশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, “সুখী! এত নিঃসন্দেহ
সুখ জীবনে আর কখনও আমি পাই নি।”

শরৎ দেখিল সতীশ কবিত্বময় হইয়া উঠিতেছে।
কথাটা অল্পদিকে ফিরাইয়া লইল।

“কই, তোমার এমন সুখের আকর বউকে
একবারও দেখালে না!”

সতীশ কহিল, “ভাই, এখন সে বাপের বাড়ীতে; দেখাতে
আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু কোথলে দেখতে
হবে।”

শরৎ চিরদিনই অকৃত রকম বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী ! তাহার চোখ দুটা জলিয়া উঠিল, সে কহিল, “বেশ, একটা মংলব ঠাওরেছি—”

সতীশ কহিল, “কি ?”

শরৎ কহিল, “তোমার চাকর হ’য়ে এই শনিবার তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমার বউ দেখে আসবো।”

সতীশ ইহাতে মহা আপত্তি করিল, বলিল, “তা হইয় ! তুমি আমার চাকর হ’তে যাবে কেন ?”

শরৎ কিছুতেই শুনিলা ।

(২)

শরতের বাড়ী বেহারে, স্মৃতরাং চাকর সাজিতে তাহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না । একটা খাটো কুর্তি কিনিয়া আনিয়া তাহাকে তেলে ও কাদায় ভিজাইয়া ময়লা করিল, একটা ছেঁড়া কাপড় মাল কোচা বাধিয়া পরিল, এবং মাথায় দীর্ঘ পাগড়ি বাধিল । চাকর দরবানের ভক্তি আকর্ষণের জন্য রুদ্রাক্ষটি গলায় রাখিল ; হাতে বাঁশের লাঠি, পায়ে নাগরা জুতা ।

এ হেন চাকর সঙ্গে লইয়া সতীশ শনিবার সন্ধ্যায় কিছু পূর্বে শ্বশুর বাড়ী যাত্রা করিল । মেস হইতে শ্বশুর বাড়ী আধ ঘণ্টার রাস্তা ।

শ্বশুর বাড়ীর ফটকে ভোজপুরী দরবানু জামাই বাবুকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল । শরৎ তাহাকে অভিবাদন করিলে সেও প্রত্যভিবাদন করিল ; বুঝিল বাবুর চাকর ; কিন্তু গলায় মোটা রুদ্রাক্ষ দেখিয়া ভক্তি হইল একাসনে বসিতে অস্বরোধ করিল ।

শরৎ বসিয়া তাহার “আরে” জেলার গল্প পাড়িল । সন্তোষি সিং শরৎদের দরওয়ান, তাহার বাড়ী ভোজপুরে । তাহার কথা বলিতেই দরওয়ান ছটু সিং তাহাকে চিনিয়া ফেলিল । শরৎ বলিল সে আমার ভারী দোস্ত, এক সঙ্গে কাজ করেছি ! তাহাতে শরতের সহিত ছটু সিং প্রেম গভীর হইয়া উঠিল ; সে ঠৈখনী বাড়িয়া তাহাকে খাইতে দিল, এবং গাঁজা সাজিতে আরম্ভ করিল ।

গাঁজা দেখিয়া শরতের ভয় হইল, এইবার বিপদ ! তাহার অসম্পূর্ণ সন্ধ্যাস ধর্ম্মে সে গাঁজায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই !

এমন সময় ঐ আসিয়া কহিল, “হ্যাঁগা জামাই বাবুর চাকর কে আছো, জামাই বাবু ডাকছেন।”

চেহারা দেখিয়া জামাই বাবুর চাকরটিকে বোধ হয় ঝির মন্দ লাগিল না ; সে একবারে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া কহিল, “তুমি ! চলো” ।

শরৎ উপরে গিয়া দেখিল পরিষ্কার সাজান বৈঠক-খানা ; তাহাতে সতীশ বসিয়া তামাক খাইতেছে । সম্মুখে পাত্রে জলখাবার ।

সতীশ কহিল, “শরৎ এসো, খাবার খাবে !”

শরৎ কহিল, “কি আশ্চর্য ! আমি যে চাকর !”

সতীশ কহিল, “এ ব্যাপারটা আমার একটুও ভাল লাগছেনা।”

শরৎ কহিল, “আমার মন্দ লাগছে না, কিন্তু বেশীক্ষণ আমি থাকতে পারবো না, ধরা পড়বার ভয় হ’চ্ছে । তাড়াতাড়ি দেখবার একটা মংলব বার কর, আমি চলে যাই।”

সতীশ কহিল, “খাবার দিয়ে গেছে, জল এখনো আনেনি । তুমি এই দরজা দিয়ে গিয়ে জল চাওনে । এইখানেই সকলেই আছেন আওয়াজ শুন্তে পাচ্ছি । সেখানে গিয়ে সহজেই পরীকে দেখতে পাবে !”

(৩)

দরজার ভিতর দিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া শরৎ দেখিল চঞ্চলিলান বাড়ী । একটা বারান্দায় জীলোকের ভিড়—সেইখান হইতেই মধুর কলরোল উঠিতেছিল ।

এক জন তরুণী চুল বাধিতেছিল, আর এক জন যুবতী তাহার চুল বাধিয়া দিতেছিল । এক জন প্রৌঢ়া কুটনা কুটিতেছিল ; এক জন যুবতী ছেলেকে দুধ খাওয়াইয়া দিতেছিল, আর টিয়ে পাখীর গল্প বলিতেছিল । চার পাঁচ জন জীলোক গোল হইয়া রসিয়া জটলা করিতেছিল ।

এক দিকে ঘোর রবে তাস খেলা চলিতেছিল। অল্প দিকে ছুই তিন জন ছেলে পিলে কান্নাকাটি ও মারামারি করিতেছিল।

এই বিচিত্র দৃশ্য-শালায় শরৎ আসিয়া কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। যে অপূর্ণ সুন্দরী তরুণীর চুল বাধা হইতেছিল—শরৎ তাবিল সেই সতীশের স্ত্রী—কি মধুর তাহার সৌন্দর্য্য! শরৎ একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল—চোখ যেন আর ফিরাইতে পারিল না।

তরুণী শরতের পানে চাহিল—চারি চক্কের মিলন হইল। কিন্তু সেই সুবিরাট পাগড়ি ও মলিন কুর্তির অন্তরালে যে একটি কোমল হৃদয় ছিল তরুণী তাহা বুঝিল না। অকলের প্রান্ত দিয়া মুখ ঢাকিতে ঢাকিতে স্পষ্ট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, “ওমা, ও কে গো!”

তখন সকলেই অক্ষুণ্ণে কলরব করিতে লাগিল—“এ আবার কে গো—কোথা থেকে এলো!”

শরৎ কহিল, “জামাই বাবুকো ওয়াস্তে পানি”—পূর্ণ পরিচিতা রি আসিয়া কহিল, “ভয় কি! ও যে জামাই বাবুর চাকর, জল চাচ্ছে!” বলিয়া তাহার দিকে আর এক বার কটাক্ষ করিল।—“তাই না?”

জামাই বাবুর চাকরের শুভ্র গৌরবর্ণ, মলিন বেশের ভিতর দিয়াও যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, তাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য ও ক্রোড়কাট দাড়ি, তাহার সমস্ত ছদ্মবেশকে যেন মিথ্যা করিয়া তুলিতেছিল।

এক জন প্রৌঢ়া বলিল, “এ যে কেমন কেমন বোধ হ’চ্ছে পা!” আর এক জন কহিল, “ভদ্র লোকের মতন চেহারা যে!”

শরতের পার্শ্বে শরতের বৌদিকি বড় বোন প্রমদা দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি সম্পর্কে সতীশের খুড়খাণ্ডি। তিনি অক্ষুণ্ণে বলিলেন, “আমাদের শরতের মতন বোধ হয় না! আবার ক্রমাকের মালাও আছে কে!”

ততকালে বি জল লইয়া আসিয়াছে। বির ইচ্ছা ছিল শরতের হাতে জল দিবার অবসরে সে আর এক বার

কটাক্ষ হানিবে। কিন্তু শরৎ তখন ঢৌক গিলিতেছিল—তাড়াতাড়ি জলের গ্লাস গ্রাস ছিনাইয়া লইয়া বাহিরে প্রস্থান করিল।

বাহিরে আসিয়া জলের গ্লাস রাখিতে রাখিতে শরৎ কহিল, “এঃ ধরা পড়ে গেছি—চললাম তাই।”

সতীশ কহিল, “ভয় নেই—একটু খাবার খেয়ে যাও।”

শরৎ কহিল, “না, তবে গলাটা বড় কাঠ বোধ হ’চ্ছে—একটু তামাক খাই, দেও।”

ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া যেমন শরৎ তামাক খাইতেছিল তখন বি জানালার ফাঁকে চোখ দিয়া তাহা দেখিল।

চোখ দুটা কপালে তুলিয়া বি হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া কহিল, “ওমা! আবার জামাই বাবুর গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছে!”

সতীশের কড় শ্রীলী নিরুপমা তাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “কি হবে গো!”

শরৎ তখন প্রস্থান করিয়াছে

(৪)

নিরুপমা সতীশের নিকট আসিয়া কহিল, “হ্যাংগো জামাই বাবু, সঙ্গে কাকে এনেছিলে?”

সতীশ কহিল, “কেন, চাকর!”

নিরুপমা ক্র-ভঙ্গি করিয়া কহিল, “চাণাকি কেন? ভদ্র লোকের ছেলেকে চাকর সাজিয়ে এনেছিলে? কি ঘেন্না!”

সতীশ কহিল, “তা কেন হবে?”

নিরুপমা কহিল, “না ঠাট্টা নয়। খুড়িমা বলছেন উনি ওঁর বোনের দেওর—শরৎ বাবু! ছি—ছি—ওঁকে কেন এমন ক’রে এনেছিলে—পরীকে দেখাতে বুঝি?”

সতীশ কহিল, “ওর ঝোঁক!”

নিরুপমা কহিল, “মা ভারি দুঃখ করছেন। ভদ্র লোকের শিক্ষিত ছেলে—তাকে কি না চাকর ক’রে নিয়ে এলে—বাড়ীতে ঢুকিয়ে অপদস্থ করলে—তারপর

খাটিয়ে খুটিয়ে নিয়ে না খাইয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে ।
তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে এক দিন পরীকে দেখালেই হ'ত ।
মা বলেছেন তাঁকে এক দিন খেতে ব'লো—তান কি
মনে করেছেন বল দেখি ।”

সতীশ কহিল, “তাই” হবে ।

* * *

শরৎ যখন শুনিল সে একেবারেই ধবা পড়িয়া
গিয়াছে—তখন সে যথেষ্ট লজ্জা ও অনেকটা আনন্দ
অনুভব করিল । বলিল, “এ একটা রাতিমত অভিযান ।”

কিন্তু তাহাব নামন্ত্রণেব কথা শুনিয়া একেবাবে দমিয়া
গেল, বলিল, “তাকছুতেই হয় না ।”

বলিল, “সত্যিই অপকপ সুন্দরী তোমার স্না ! গালের
ওপর তিলটি পর্যন্ত কি সুন্দর ! সত্যিই ভাগ্যবান তুমি ।”

সতীশ কহিল, “যার কপে তুমি মুগ্ধ হইবে সে আমাব
ছোট গ্রাণী, সুহা ! তারই গালে তিল আছে ।”

শরৎ চমকিয়া উঠিল, “সত্যি ।

সতীশ, “একটা সংবাদ আছে—সে অবিবাহিতা ।”

শরৎ চাহিয়া রহিল ।

সতীশ কহিল, “এবং সেই গালে তিল শুদ্ধ অপকপ
সুন্দরী আমাব গ্রাণিটিব ধাবা ইচ্ছা মাএই তুমি ভাগ্য-
বান হ'তে পারো ।

সেদিনও জ্যোৎস্না ছিল—এবং বোধ হয় মলমল
বহিতেছিল । শরৎ গলা হইতে কদ্রাক্ষের মালা খুলিয়া
ফেলিয়া সতীশের হাতে দিয়া কহিল, “এই নাও বদল
করিবার মালা ।”

সতীশ কহিল, “এ আমাবকাছে রইল—আমার এমন
গ্রাণিকাটিকে যেদিন তুমি হরণ করবে সেই দিন এই
মালা আমি পরব ! তোমাদেব জগ্রে ফুলের মালাব
বন্দোবস্ত ।”

(৫)

সতীশ মান-মুখে আসিয়া নিকপমাকে কহিল, “শবৎ
কিছুতেই এখানে এসে অমান খেতে চায় না ।”

নিকপমা কহিল, “তুমি আমাদের কি লজ্জাতে
ফেললে !”

সতীশ কহিল, “লজ্জা নিবারণের একটি উপায় আছে !
তাকে যদি দক্ষিণা দেও তবেই সে খেতে পারে !”

নিকপমা কহিল, “কি দক্ষিণা !”

সতীশ কহিল, ‘সে সবজী, মাংসাদি তোমার ছোট
বোন সুহাসিনী !’

নিকপমা বিস্মিত হইয়া কহিল, “সত্যি !” সতীশ
কহিল, “পরীকে দেখতে এসে সে সে দিন সুহাকে
ক'রে গেছে ! এখন বিবেচনা দলে ত আর চলে না ।”

নিকপমা কহিল, ‘এক আমাদের জগ্রে
মাকে বলিগে ।’

দুই পক্ষেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল ।

বিবাহের রাত্রে সতীশ সত্যিই কদ্রাক্ষ পরিয়া
স্ত্রী আচারেব সময় নিকপমা শরৎের কান ধরিয়া
না বটে, কিন্তু সন্ধ্যাকৈ তাহার ভৃত্যগণের
বলিয়া তাহার কান লাগ কাওয়া জুলিল ।

বাসর ঘরে ঢুকিবার সময় পরী একটা
ছেঁড়া কাপড় ও পাগড়ি আনিয়া শরৎকে
‘বেশ পরিবর্তন না কবিলে বাসরে ঢুকিতে
দিব না ।’

কি আসিয়া এক গ্রাস জল দিয়া বলিল, “আজ
জল ।” সে দিন কিন্তু সে আর কটাক করিল না ।

বাসর ঘরে সুহাকে ডাকিয়া শরৎ কহিল, “সত্যি
তোমাব সে দিন আমাকে পছন্দ হইবেছিল না ?”

সুহা কহিল, “কোন দিন ।”

‘যে দিন চাকর সেজেছিলাম ?’

সুহা তাহাব হাত ছুটা প্রবল ভাবে
কহিল—যা :—

“তবে আজ হয়েছে বোধ হয় ?”

সুহা শুদ্ধ নীরাক ভাবে চাহিয়া
কহিল, ‘কিন্তু সেই দিনই আমাদের সত্যকার
হইবেছিল ।’

ত্রিগিরীকান্ত গদ্যোপাধ্যায় ।

ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদর্শ

(২)

চৈত্রবর্ষে অপর একটি আলোচনা সভায় আয়ুর্বেদের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্কবিতর্কেব বিবরণ পাওয়া যায়। —

শ্রীমদ্ভাগবতকাণ্ডে শাকুন্তলভৈবস। পূর্ণাখ্যৈশ্চব
কৌশিকঃ ॥ ২ ॥ যঃ কুমারশিরা নাম
কুমারশিরাভবঃ । শ্রীমন্ বার্হোবিদশ্চৈব রাজামতিমতাং
নিমিষ্ট রাজা বৈদেহো বডিশ্চ মহামতিঃ
বাল্লীকো বাল্লীক ভবজাং ববঃ ॥ ৪ ॥ এতে প্রত-
স্তিতাঃ সিতাখ্যামো বহবরঃ । বনে চৈত্রবর্ষে বমে সমায়ু-
জিতবর্ষঃ ॥ ৫ ॥ তেষাং তত্রোপবিষ্টানামিযমর্থবতী কথা ।
সম্যগ্ৰসাহারবিনিশ্চয়ে ॥ ৬ ॥

ইতি দ্রবকসংহিতায়াং ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ॥

একদা আত্রেয়, তজ্জকাপ্য, শাকুন্তল, পূর্ণাখ্য
কৌশিক, কুমারশিরাভবজা, বাজর্ষি
বার্হোবিদ, নিমিষ্ট, বৈদেহ, বডিশ, কাক্যন, বাল্লীক, ও
বাল্লীক এই সকল প্রতিজ্ঞানসম্পন্ন, জিতাশ্রা ও
সমায়ুজিতবর্ষ মহাবিশ্ব বিহারেচ্ছার রমণীয় চৈত্রবর্ষ বনে মিলিত
হইয়াছিলেন। তাঁহারা সেই বনে উপনিবিষ্ট হইয়া
সকল দ্রব্য আহার বিষয় নিশ্চয় করিবার অর্থযুক্ত
এক প্রকল্প করিলেন।

কুমারশিরা একটি অতি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানকেন্দ্র ছিল।
বাল্লীক বিজ্ঞানাদিত্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। যে
নয়টি পণ্ডিতগণ এই বিজ্ঞানকেন্দ্র গঠিত হইয়াছিল
তাঁহারা ইতিহাসে “সবর” খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।
তাঁহাদের “রস” খ্যাতিবাহাই ইহাদের সমকক্ষ যে
তৎকালে কেহ ছিল না তাহা প্রমাণিত হয়। বস্তুতঃ
বিজ্ঞানবিদ্যার সবর সভাতে পাণ্ডিত্য বীকৃত হয় হইলে
কেহই পণ্ডিত বলিয়া বীকৃত হইতে পারিতেন না।
“বিজ্ঞানবিদ্যার সবর সভা” প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।

বৌদ্ধযুগ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর্যদিগের
প্রাচীন শিক্ষাদর্শের রূপান্তর দেখিতে পাই। বৌদ্ধদিগের
সময়ে শিক্ষাহান এবং উন্নত অবস্থা নহে, তাহা সুনিশ্চিত
গৃহ। এই বিজ্ঞানগৃহের নাম “মঠ।” বৌদ্ধ যুগের অমর
কোষাভিধানে তাহাতেই “মঠস্থাত্তাদি নিলয়” বলিয়া
উল্লেখ পাওয়া যায়। “মঠ” ছাত্রদিগের নূতন শিক্ষা স্থান
হইলেও বৌদ্ধদিগের নিজস্ব ধর্ম সাধনার স্থান
সিহাবে অবস্থিত হওয়ায় তাহাতে আর্য শিক্ষাদর্শেরই
অনুবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের বিশাল
শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দাতে আর্যকুলপতিদিগের ছাত্রসংখ্যা-
ন্যায়ই বিপুল ছাত্র সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য-
দিগের পবিত্রের জায় বৌদ্ধদিগেরও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।
ইহা সংখ্যাবান নামে অভিহিত হইত। বৌদ্ধদিগের
বিজ্ঞানশিক্ষাও, ছাত্রের আবাস ও আহার বিদ্যালয় হইতে
প্রদত্ত হইত। আর্যদিগের ত্রক্ষাচর্য্যবই জায় বৌদ্ধ-
বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ ত্রক্ষু জীবন যাপন করিত। আর্য-
ছাত্রদিগের মধ্যে যেমন কেহ কেহ চিরত্রক্ষাবী থাকিত
বৌদ্ধবিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের মধ্যেও অনেকে চিরাব্রক্ষু
থাকিত। এইরূপে আর্য আদর্শ বৌদ্ধদিগের প্রধান
অবলম্বন হইলেও, তাঁহাদের হস্তে ইহা একদা নূতন গঠন
ও সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শও
ইহার নিকট নূতন ও সমৃদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না।
প্রত্যুত কোন কোন বিষয়ে ইহাই উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত বলিয়া
বিবেচিত হইবে। এখানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের
কিঞ্চিৎ বর্ণনা উদ্ধৃত কবিয়া দিতেছি তাহা হইতেই
আমাদের উক্তির যথার্থ্য প্রমাণিত হইবে—“বিজ্ঞানগণ
বিনাশ্যে আহার ও বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়া বিজ্ঞান
করিতেন। জয়েনসাং যখন নালন্দায় আগমন করেন
তখন প্রায় দশ সহস্র ত্রক্ষু তথায় অধ্যয়ন করিতেন।
জয়েনসাং ৬৭২ হইতে ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নালন্দায় অধ্যয়ন
করেন। তিনি ইহার স্থায়ী অধিবাসী ত্রক্ষু সংখ্যা তিন
সহস্রের অধিক লিখিয়া গিয়াছেন। তবে বোধ হয়
অস্থায়ী ছাত্রসংখ্যাও অনেক ছিল কারণ নালন্দা

বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র উচ্চতর শিক্ষা প্রদত্ত হইত এবং অন্যান্য শিক্ষাগুলি হইতে বাহারা পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন তাঁহাদের জন্যই নিরুপিত ছিল। সুতরাং এখানে শিক্ষার মান (Standard) এত উচ্চ ছিল যে, অধিকাংশ বিদ্যার্থীকেই বিফল মনোরথ হইয়া প্রস্থান করিতে হইত। হ্যেনসাং বলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে দ্বার-পাণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহাব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে না পাবিলে, কাহাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত না। এইরূপ প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াও বাহারা প্রবেশ লাভ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও বহুসংখ্যক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সর্বোচ্চ শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পাবিয়া অকৃতকার্য হইয়া প্রস্থান করিতেন। হ্যেনসাং বলেন বাহারা বিদ্যার্থী হইয়া আগমন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যেও শতকরা সত্তর জন ফিরিয়া বাইতে বাধ্য হইতেন।

হ্যেনসাং বলেন, “তর্কশাস্ত্রে ব্যাপ্তিলাভের জন্য নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থীগণ নানান্য আসিতেন এবং নিজে প্রাচীন দেব বৎসর পর্য্যন্ত তথ্য যোগ, জায়াভুসাব, অভিধর্ম, হেতুবিজ্ঞা, শব্দবিজ্ঞা, প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। এতদ্ব্যতীত তত্ত্বশাস্ত্রেরও অধ্যাপনা হইত।”

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়রূপ বিরাট প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তিরক ব্যয় কিরূপে নির্বাহ হইত আমবা ইংসিংএব বিবরণ হইতে তাহাব কতক জানিতে পারি। তিনি বলেন, “নালন্দা মঠের ব্যয় নির্বাহার্থ দুই শতাব্দে অধিক জনপদের রাজস্ব উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। হ্যেনসাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষ সাধক যে কয়জন নরপতির নামোলেখ করিয়াছেন সম্ভবতঃ ইহা তাঁহাদেরই দান।”

হ্যেনসাং বলেন, পর পর পাঁচ জন মগধ সম্রাট এবং এক জন মধ্য ভারতবর্ষের নরপতি ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক মঠ বিহার প্রভৃতি নির্মাণ করিয়াছেন। এই মঠ বিহার প্রভৃতিতে ভাস্কর্য্য শিল্পের চরম বিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এগুলি দেখিতে প্রকৃতই বিস্ময়াবহ। সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংসিং নালন্দার আটটি বৃহৎ কক্ষ

(Hall) ও তিন শত ক্ষুদ্রতর কক্ষ দেখিতে পান। তিনটি দেশীয় গ্রন্থে নালন্দার বৈশিষ্ট্যনা পাওয়া যায় তাহাতে প্রকাশ যে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য বৃহৎ পুস্তকালয় অবস্থিত ছিল তাহা “সুখগুপ্ত” নামে কথিত হইত। এই অংশে ‘রত্নসাগর’ ‘নন্দোদিনি’ ও ‘বিবজ্ঞক’ নামে তিনটি বৃহৎ সৌধ বর্তমান ছিল। “রত্ন সাগর” বিস্তৃত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহা একটি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ছিল।

আজ্ঞানাল যেমন অক্সফোর্ড কেবলমাত্র প্রাচীন বলিয়া পরিচয় দেওয়া পৌববজ্ঞক বলিয়া বিখ্যাত এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইলে উত্তীর্ণ হইয়া এই গৌরবলাভের জন্য এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জন কবেন, পুণাকালেও নালন্দা সম্বন্ধে এইরূপ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শীর্ষস্থানীয় বিবেচিত ও সর্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। ভারতবর্ষের সমস্ত, শিক্কাইল এবং চীন তিব্বত, তাতার, ব্রহ্ম ও শ্রাম দেশ হইতে সম্মান অর্জনের জন্য দলে দলে দিগ্বিদিক আসিতেন।”

নালন্দার লক্ষপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকদিগের সম্বন্ধে প্রাচীন শতক্কল শাস্ত্রী “দীঘ দক্ষিণাপথ ভ্রমণে লিখিয়াছেন “প্রসিদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন, আর্যদেব, সুবায়লক, শিব ভদ্র, চন্দ্রকীর্তি প্রভৃতি বিখ্যাত অসংখ্য মনোবী তির তির সমবে এই বিশ্ব বিদ্যালয়ে অবস্থান করিয়া অসংখ্য কার্য সম্পন্ন করিতেন।”

উপরি উক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে ছাত্রাবস্থায় একত্রাবস্থান-বাবস্থা-বিশিষ্ট পাশ্চাত্য (Residential) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত উপকরণই যে প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান ছিল তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

Endowment বা সম্পত্তিদানের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেবালয়, বৈশাখ, ১৯১১ বাৎ, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরার এমএ লিখিত।

স্থায়িত্ব বিধান, বিভাগচর্চার সৌকর্য্যার্থে শিষ্টাচারে পুস্তক-পার সংস্থাপন, বিভাগে ছাত্রদিগের আবাস ও আহা-হানের সংস্থান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশলাভার্থে প্রবেশিকা পরীক্ষা, উচ্চ শিক্ষা লাভের তত্ত্ব বৈদেশিক ছাত্রের সমাগম প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যালয়েরই ব্যবস্থা অবিকল একই রূপ। কিন্তু তাহা প্রাচ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশেষ গৌরব বলিতে হইবে যে, তাহাতে শিক্ষার মধ্যে সকল ছাত্রেরই আবাস ও আহারের ব্যবস্থা করা হইত। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন (Fellow) অর্থাৎ জীবনব্যাপী ছাত্র আছে, প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়েও সেইরূপই চিরভিক্ষুক ভিল। অধ্যাপনার বিষয় সম্বন্ধে বলা যায় এই যে, বৌদ্ধধর্ম যুক্তিমার্গের ধর্ম বলিয়া বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করিতেন। যুক্তিশাস্ত্রের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাহাতেই তাহীদের অধীত শাস্ত্র মধ্যে আমরা ত্রায় শাস্ত্রের প্রাধান্য দেখিতে পাই। আমরা আর্য্যদিগের যুক্তিবিজ্ঞানের উল্লেখ পাই তাহাতে ত্রায় শাস্ত্রেরই স্থান সর্বোচ্চে দেখিতে পাওয়া যায়।

“আধুনিক জরীবার্তা দণ্ডনীতিশ শাস্ত্রীঃ।

এতা বিভাগতত্ত্ব লোকসংস্থতি হেতবঃ ॥

ত্রায় দর্শনেরই নামান্তর। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়েও দর্শনপরিদর্শিতার প্রতি উচ্চ সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাহাতেই পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি হইয়াছে Ph. D. (Doctor of Philosophy) অর্থাৎ দর্শন নিরোমণ।

প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যাপনার উল্লেখ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তখন বিজ্ঞানের চর্চাও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ, হিন্দুর রসায়ন বিজ্ঞান তত্বেই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে; এবং বৌদ্ধগণ যে রসায়ন শাস্ত্রের সবিশেষ চর্চা করিতেন ও ইহার সবিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

উপরে আমরা প্রাচীন কালে জ্ঞানিকার প্রচলন প্রসঙ্গ দেখিয়াছি। কিন্তু কি না ওসময়ে কোন আলোচনা করিবার অবসর

পাই নাই। এখানে আমরা সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। বিশ্ববারা, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বেদাভিজ্ঞ রমণীদিগের নাম সকলেই অবগত আছেন। ইহাদের মধ্যে বিশ্ববারা বেদে ঋষি মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, এবং গার্গী ও মৈত্রেয়ী শাস্ত্রবিচারে ঋষিদিগের সহিতও সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গার্গী ঋষেদের টীকাও করিয়াছেন।

জীলোকেরা কেবল বে শিকার্বিনী ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী পুরুষ-দিগের যেমন উপাধ্যায় আচার্য্য প্রভৃতি উপাধি ছিল শিক্ষাকার্য্যপারায়ণা জীলোকদিগেরও তদনুরূপ উপাধ্যায় উপাধ্যায়ী, আচার্য্য, উপাধি পাকার প্রমাণ পাওয়া যায়; যথা, অমরকোষে “উপাধ্যায়াপুপাধ্যায়ী স্তাদাচার্য্য পিচবতঃ।” স্বয়ং অধ্যাপনা করিলে উপাধ্যায়ী উপা-ধ্যায়ী ও আচার্য্য প্রভৃতি নাম হইয়া থাকে।

মালতীমাধবে কামন্দকীকে ময়ী ভূরিবস্তুর সহা-ধ্যায়িনী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে জ্ঞানী পুরুষের একত্র অধ্যয়নের যে বাধা ছিল না তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। কামন্দকী এরূপই বিদ্বা হইয়াছিলেন যে, তিনি একখানা প্রসিদ্ধ নীতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তনীয় গ্রন্থ “কামন্দকীয়া নীতিসার” নামে এখনও তাঁহার অমর কীর্তি-স্বস্তরূপে বিরাজিত রহিয়াছে।

খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে সমস্ত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তৎ সমস্ত “খনার বচনে” চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী বীজগণিতের যে সমস্ত উচ্চ নিয়ম প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন তৎ সমস্তই তাঁহার নিজের নামের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া গণিত শাস্ত্রে অমর গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে। আজকাল পাশ্চাত্য মেয়ে রংলারের (Wrangler) নামে আমরা বিষয়ে অভিভূত হই। লীলাবতী কি ইহাদের উপরে আসন পাইবার যোগ্য নহেন?

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের দুটি বিদ্যালঙ্কার নারী

বিদ্যাকে আমরা পণ্ডিতের উপাধিতেই ভূষিত দেখিতে পাই।

কেহ কেহ হয়ত বলিলেন যে, প্রাচীন কালে স্থল বিশেষেই মাত্র জীশিক্ষার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, ইহা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয় নাই। তাঁহাদিগকে আমরা শাংয়ের “কস্তাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিব্রতঃ” এই উদার বাক্যটি স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

শিক্ষক সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। এক্ষণে আমরা ছাত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ছাত্র যে ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হইত তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই নাম হইতেই ছাত্রের প্রধান কর্তব্য ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য এরূপেই সংযম ও নিষ্ঠার সাধারণ সংজ্ঞাতে পণ্ডিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সংযম ও নিষ্ঠা-ভাব অধ্যয়নের মূলে বর্তমান থাকায় অধ্যয়ন একটি তপস্তাতে পরিণত হইয়াছিল। তাহাতেই ‘ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ’—‘অধ্যয়ন ছাত্রের পক্ষে তপস্তাবিশেষ’ এই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

অধ্যয়নের মূলীভূত সংযমভ্যাসের প্রথম উপায় সর্বপ্রকার বিলাস-বিসর্জন। তাহাতেই মহর্ষি মনু তদীয় ধর্ম্মসংহিতায় লিখিয়াছেন, “ভোগার্থীচেৎ ত্যজ্জৈদ্বিগ্ধাং বিদ্বার্থী ভোগমুৎসজ্জেৎ ॥” ভোগাভিলাষী হইলে বিদ্বার আশা ত্যাগ করিবে এবং বিদ্বাভিলাষী হইলে ভোগ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ব্রহ্মচারীর সংযমার্জন ও বিলাস বর্জন সম্বন্ধে মনু যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালনের উপদেশ করিয়াছেন, তৎসমস্ত আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মালাং রসানস্ত্রিয়ঃ ।

শুক্রানি যানি সর্বাণি প্রাণিনাকৈবং হিংসনম্ ॥

অভ্যঙ্গমঞ্জনকাক্ষৌর্যপানচ্ছত্রধারণম্ ।

কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ভনং গীত বাদনম্ ॥

হ্যাতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানুত্তম্ ।

জীর্ণাঞ্চ প্রেক্ষণালস্তমুপযাতং পরস্তচ ॥

“ব্রহ্মচারী মধু ও মাংস ভোজন করিবে না, কর্পূর চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য ভক্ষণ বা বিলপন করিবে না, মালা ধারণ করিবে না, গুড় প্রভৃতি আহার করিবে না, জী সংসর্গ করিবে না; যে সকল বস্তু স্বাভাবিক মধুর কিন্তু কারণ বশে অথবা অস্ত্র কোনরূপে অন্ন হয় তাহাদিগকে শুদ্ধ বলে, তাহাও খাইবে না এবং প্রাণিহিংসাও করিবে না।

যে রূপ তৈল মস্তকে দিলে সর্বাঙ্গে লাগে তাহা তৈল ব্যবহারের নাম অভ্যঙ্গ, তাহা করিবে না; নয়নে অঞ্জন প্রদান করিবে না, চর্ম্মপাটুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিবে, এবং নৃত্য, গীত ও বাণ্য পরিত্যাগ করিবে।

অঙ্গাদি জীড়া, লোকের সহিত বৃথা বলহ, পরের দোষোদ্ঘোষণা, মিথ্যা কথন, কুৎসিতাভিপ্রায়ে ত্রীলোক দিগকে অবলোকন বা আলিঙ্গন, এবং পরের অনিষ্টাচরণ পরিত্যাগ করিবে।”

গুরুর প্রতি ভক্তিমান ও তাঁহার বাক্যে প্রভাবিত হইয়া গুরু হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। কোন বিষয়ে অনুরাগ বা প্রজ্ঞা না থাকিলে সেই বিষয় শিক্ষার কোনও ফল হইতে পারে না। এই জন্তই শাস্ত্রে প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কেবল পাঠের সময় গুরুর প্রতি প্রজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াই যে ছাত্রের কর্তব্যের অবগান হইত, তাহা নহে। সর্বপ্রকারে শিক্ষকের সন্তোষ ও সুখবিধানই ছাত্রের একমাত্র ধ্যান ছিল। এই জন্তই আত্মসুখে অলাঞ্জলি দিতে ছাত্র অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইত না।

গুরুর অনুজ্ঞাপালনে আত্মধর্ম্মোন্মাদ, উদালক ও আকর্ণি যে অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, গুরু ভক্তির উচ্চ আদর্শরূপে তাহা ভারতীয় ছাত্র জীবনের ইতিহাসকে চির সমুজ্জল করিয়া রাখিবে।

ছাত্রের হৃদয়ের উপর গুরু ভক্তির এরূপই আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল যে, নিজে গুরুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা দূরের কথা, অন্তের নিকট গুরুর নিন্দা শুনিতেও ছাত্র মহা অপরাধ মনে করিত—যথা মনুসংহিতায়,

গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিম্নাব্যাপি প্রবর্তিতে।

কর্ণোত্তর পিণ্ডাত্ম্যো গন্তব্যং বাততোহন্ততঃ ॥

“যেখানে গুরু কুংসা বা নিন্দা হইয়া থাকে সেখানে কাণে হাত দিয়া থাকিতে হয়, অথবা তথা হইতে অস্ত্র চলিয়া যাইতে হয়।” *

সংঘ, গুরুভক্তি ও গুরুপদেশে প্রজ্ঞা দ্বারা ছাত্র শিক্ষার্থীর প্রকৃত যোগ্যতা লাভ করে মাত্র, কিন্তু অধীত বিষয়ে প্রশ্ন না করিলে কখনও প্রকৃত বিভার্জন সম্ভবপর নহে। এই অস্ত্র শ্রমকেই বিদ্যার্জনের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। শাস্ত্রেও বিদ্যার্জনে শ্রমের প্রাধান্য স্পষ্টরূপেই স্বীকৃত হইয়াছে যথা—“শ্রমাস্ত্রমারিণী বিভা।”

পাশ্চাত্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য কার্লাইল এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রতি উপদেশ দিতে যাইয়া ভূমিকাতেই এই শ্রমকেই ছাত্রের সর্বপ্রকার উন্নতির মূলধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—

Diligent : that includes in it all the virtues that a student can have ; I mean it to include all those qualities of conduct that lead on to the acquirement of real instruction and improvement in such a case. Inaugural Address at the Edinburgh University, 2nd April, 1866 by Thomas Carlyle.

পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন আত্মজীবন ছাত্র বা Fellow দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মজীবনের গুরুকুলেও তেমনই আত্মজীবন ব্রহ্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার নৈতিক ব্রহ্মচারী বলিয়া অভিহিত হইতেন। যহু ইহাদের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

“বদ্বিত্যাত্মিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃ কুলে।”

বৃক্তঃ পরিচরেদেনমাশরীরী বিমোষাণাৎ ॥ ২৪০ ২য় অধ্যায়।

* ছাত্রের প্রচলিত ব্যুৎপত্তিও “গুরু দোষ আচ্ছাদন করে যে” এই অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, যথা গুরু-দোষাচ্ছাদনং হ্রজং তদ্বীলমন্ত ভাহুনিগীকিত কৃত অমর-গীকা।

যদি নৈতিক ব্রহ্মচারী হইলেন অর্থাৎ গুরু গৃহে চিরবাস প্রার্থনা করেন, তবে গুরুকুলে বাস করতঃ একান্ত বহু সহকারে যাবজ্জীবন গুরুর শুশ্রূষা করিবেন। তরুত শিরোমণির অনুবাদ।

উপরে আমরা গুরুশিষ্য সম্বন্ধের যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতে গুরুর প্রতি শিষ্যের ঐকান্তিক ভক্তির যে পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই, পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরূপ ভক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্ত বাধ্যতা বা নিয়মানুগতিয়ার (discipline) প্রতিই অধিক লক্ষ্য, প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনয়ের প্রতিই অধিক লক্ষ্য। এই অজুই বিনয় বিস্তার প্রথম ফল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যথা—“বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্ ॥”

এই বিনয় ভাবের সমুচিত অনুশীলনটীনা হওয়াতেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় ক্রমেই ঐক্যতাবাব ও সমতাবের প্রবৃত্তির বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

আপনার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ গুরুকে দক্ষিণা প্রদান ছাত্রের প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। নিজের প্রথম উপার্জন সাধারণতঃ গুরুর পাদপদ্মে উপহৃত হইত। বঁহার রূপায় শিষ্যের উপার্জন ক্ষমতা লাভ হয়, তাঁহাকে উপার্জনের সর্বপ্রথম ভাগ প্রদান অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়াই বোধ হয়।

ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে কোন কোন বিদ্যা প্রচলিত ছিল, তাহার আলোচনা করিলেই কোন কোন বিস্তার তখন অধ্যাপনা হইত তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। শাস্ত্রে আমরা চতুর্দশ ও অষ্টাদশ প্রকার বিস্তার উল্লেখ প্রাপ্ত হই, যথা—

অঙ্গানি বেদাশ্চকারো যৌবাংসা ত্রায় বিস্তরঃ।

ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিভাষ্যেতাচতুর্দশ ॥

আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো পাক্ষিক চৈতি তে ত্রয়ঃ

অর্থ শাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিভাষ্যেতাষ্টাদশৈব তাঃ ॥

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (অভিধান), জ্যোতিষ ও চন্দ্র: এই ছয়টি বেদান্ত। ঋগ্, যজুঃ, সাম, অথর্ব এই চারি বেদ। মীমাংসা, শ্রায় ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ এই সমস্ত শাস্ত্র মিলিয়া চতুর্দশ বিদ্যা এবং ইহাদের সহিত আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্ষশাস্ত্র এই চারিটি যোগ করিয়া বিদ্যার সংখ্যা অষ্টাদশ হয়।

এই অষ্টাদশটি শাস্ত্রের দ্বারাই ভারতীয় জ্ঞান রাজ্য পণ্ডিত হইয়াছিল। যজুর্ব্যোমের জাতব্য প্রায় সমস্ত বিষয়ই যে ইহাদের অন্তর্নিবিষ্ট তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, সঙ্গীত প্রভৃতি সমস্ত আধুনিক শিক্ষা বিষয় যে পূর্বোক্ত বিদ্যা সকলেরই অন্তর্ভুক্ত তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। জ্যামিতিকে অনেকেই পাশ্চাত্য উদ্ভাবন বলিয়া জানেন, কিন্তু সংস্কৃত বিশারদ মহাপণ্ডিত থিবো সাহেব গবেষণা দ্বারা বৈদিক “হৃদহুত্রে” জ্যামিতি শাস্ত্রের মূল আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং প্রাপ্তকৃত অষ্টাদশ শাস্ত্রে পারদর্শিতাই পাণ্ডিত্যের চরম সীমা বলিয়া বিবেচিত হইত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই অষ্টাদশ শাস্ত্র যথারীতি অধ্যয়ন করিয়াই যে পাণ্ডিত্যের সর্বোচ্চ খ্যাতি অর্জন করিতে হইত, “চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্রে পণ্ডিত” এই প্রচলিত কথা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধাঙ্গদ রমেশবাবু তদীয় (Civilisation of India (ভারতীয় সভ্যতা) নামক গ্রন্থে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে কি কি বিদ্যার অনুশীলন হইত তাহার এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন—

Closely connected with this vast body of religious literature (Brahmanas, Aranyakas, Upanishads) were other departments of learning, which the pious Hindu considered it his duty to acquire. In one of the old Upanishads we find these departments of learning thus enu-

merated :—The four Vedas, Chronicles and Cosmogonies, Grammars, Ancestral Worship, Arithmetic, Science of Portents, Divisions of Time, Logic, Ethics, Etymology, Pronunciation and Prosody, Demonology, Science of Arms, Astronomy, and the Science of Serpents and Spirits.”—The Civilisation of India (Temple Primers Series) pp. 22—23

অষ্টাদশ বিদ্যার অধিকার আমরা ভারতের সর্বোচ্চ শিক্ষারই আদর্শ বলিয়া মনে করি। ভারতে শিক্ষার যে একটি সাধারণ আদর্শ ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কালিদাস ‘রঘুবংশে’ রঘুর শিক্ষায় সেই আদর্শের একটি চিত্র দিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

“দ্বিঃ সমগ্রৈঃ সগুণৈরুদারবীঃ। ক্রমাচ্চতুশ্চতু-
রর্ণবোপমাঃ ততঃ বিদ্যাঃ॥” এখানে রঘু চারিটি বিদ্যা অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মল্লিনাথ চীকায় চারিটি বিদ্যার নাম এইরূপে দিয়াছেন—

আত্মিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ শাস্ত্রী!

এতাবিদ্যাশ্চতুশ্চ লোকসংস্থিতি হেতবঃ॥

“আত্মিকী অর্থাৎ যুক্তিশাস্ত্র, ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ, বার্তা অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র, এবং দণ্ডনীতি অর্থাৎ শাসন নিয়ম এই চারিটিই চতুর্বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সমস্তের দ্বারা পৃথিবীর লোকের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়॥”

এই চারিটি বিদ্যা কার্য্যকরী বিদ্যার মধ্যে গণ্য বলিয়াই লোকশৃঙ্খলার কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বর্তমানেও তর্কশাস্ত্র (Logic), বার্তা (Political Economy) ও দণ্ডবিধি (Law) প্রভৃতি বৈবক্ষিক জীবনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বেদ ভারতে সকল বিষয়েরই মূল বলিয়া এবং ভারতে বেদ বা ধর্মই সমস্তের নিয়ামক বলিয়া বেদও কার্য্যকরী শিক্ষার অঙ্গীভূত হইয়াছে।

কালিদাস নিজ গ্রন্থে চারি বিদ্যার উল্লেখ করিতে

বুঝা যায় তাহার সময়ে চারি বিজ্ঞান অধ্যয়ন বিশেষরূপেই প্রচলিত ছিল। এই চারি বিদ্যার অধ্যাপনা হইতেই সম্ভবতঃ বর্তমানে প্রচলিত সংস্কৃত বিদ্যালয়ের নাম চতুষ্পাঠী হইয়াছে।

উপরে আমরা কালিদাসের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাই যে শিক্ষা বিষয়ে রূতকার্য্যতার প্রধান সহায় তাহার আভাস আমরা পাইয়াছি। মল্লিনাথ ইহার টীকায় শিক্ষার্থীর যে সমস্ত ধীশূণের নাম কামন্দকীয় নীতি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষাপদ্ধতির একটি সুন্দর চিত্র আমাদের নিকট উন্মোচিত হয়। আমরা এখানে সেই চিত্রটিকে ভাল রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মল্লিনাথ টীকায় লিখিয়াছেন, “ধীর”ইতি অত্রকামন্দকঃ “শুশ্রূষা শ্রবণঞ্চৈব গ্রহণং ধারণং তথা। উহাপোহার্ধ-বিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ধীশূণাঃ।” উদ্ধৃত শ্লোক হইতে শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহা, আপোহ, অর্ধ বিজ্ঞান, ও তত্ত্ববিজ্ঞান এই আটটিকেই মানসিক গুণ বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে।

শিক্ষার্থী এই কয়টি মানসিক গুণের অধিকারী হইতে পারিলে তবেই তাহার শিক্ষা প্রকৃতরূপেই ফলোপধায়ক হইতে পারে। শিক্ষা বিষয়ে এই সমস্ত মানসিক গুণের অনুশীলন কিরূপে করিতে হইবে তাহাই আমরা এক্ষণে আলোচনা করিয়া দেখিব। প্রথমতঃ শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর আন্তরিক অনুরাগ উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। তবেই গুরুপদেশ শুনিবার জন্ত তাহার মনে যত্নবতী আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার হইবে, ইহাই শুশ্রূষা। তৎপর সে অবশ্যই মনোযোগের সহিত গুরুপদেশ শ্রবণ করিবে; ইহাই ‘শ্রবণ’। এই প্রকারে মনঃসংযোগের সহিত শ্রবণ করিলে পর গুরুপদেশ অবশ্যই তাহার হৃদয়ঙ্গম হইবে, ইহাই ‘গ্রহণ’। উপদেশটি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলেই তাহার ধারণা বদ্ধবুল হইয়া থাকিবে; ইহাই ধারণ। কিন্তু এই ধারণাটিকে সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিবার জন্ত আরও কয়েকটি প্রক্রিয়ার আবশ্যক। পূর্বোক্ত

ধারণাটিকে নির্দিষ্টাচারে গ্রহণ না করিয়া নিজের বিচার শক্তির দ্বারা ইহার সত্যাসত্যতা পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। প্রথমতঃ ইহার সম্বন্ধে মনে সংশয়ভাব ধারণ করিবে ইহাই ‘উহা’। তৎপর যুক্তির দ্বারা সেই সংশয়ের নিবারণ করিবে; ইহাই ‘আপোহ’। এই প্রকারে সংশয়ের নিবারণ হইলে তবেই জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের উপলব্ধি হইবে। অর্থাৎ ইহাকে সম্পূর্ণরূপে জানাইবে, ইহাই ‘অর্ধবিজ্ঞান’।

এক্ষণে পাশ্চাত্য মহামনীষী কার্লাইলের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব হইতে একটি মন্তব্য তুলনার জন্ত উদ্ধৃত করিতেছি। “Try all things they set before you in order, if able, to understand them, and to follow and to adopt them, in proportion to their fitness for you. Generally see what kind of work you individually can do; it is the first of all problems for a man to find out what kind of work he is to do in the universe. Choice of books.—“শিক্ষকগণ তোমার নিকট যে সমস্ত বিদ্য উপস্থিত করেন, তৎসমস্ত সম্ভবপর হইলে বুঝবার জন্ত চেষ্টা করিবে এবং তোমার পক্ষে এই সমস্ত যে পরিমাণ উপযোগী হইবে সেই পরিমাণে ইহাদিগকে অনুসরণ ও গ্রহণ করিবে। ক্রমে ক্রমে তুমি নিজে নিজে কিরূপ কার্য্য করিতে পার তাহাই দেখিবে। এই জগতে কাহাকে কোন কার্য্য করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করাই প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে প্রথম সমস্যা।” পূর্বোক্ত-রূপে বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান হইলেই তৎপর তাহার মূল তত্ত্বের জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা তত্ত্ব-জ্ঞান।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী।

আমার ভ্রমণ

হাবড়ার পোলের উপর দিয়া মাছুব ও শকটের যে স্রোত চলেছে একদিন এই প্রকার স্রোতের মধ্যে স্তম্ভকপদ সঞ্চালনে সন্ধ্যার পূর্বে হাবড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া একখানি ‘মিক্‌স্ট্’ ট্রেনে আসিয়া চাপিয়া বসিলাম।

ট্রেন ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করতে লাগলো, এবং গাড়ী থেকে মায়া কাটিয়ে অনেকে নাবৃত্তে লাগলেন, তৎস্থলে বহুসংখ্যক এসে আমাদের মায়া পূর্ণ করে দিতে লাগলো। ক্রমে প্রথম মায়ার দল একেবারে শূন্য হয়ে গেল,—সে পক্ষের কেবলমাত্র আমি অবশিষ্ট, তারপর দ্বিতীয় মায়ার দল একেবারে শূন্য হইতেই তৃতীয় মায়ার দল এসে জুড়ে বসল। এমন করে বহু দলের নেবে যাবার পর দু'পাঁচজন অতি দূরের যাত্রী ও উঠলো।

আমরা “পাণীপাড়ের” দেশ ছাড়িয়ে “মিশ্রি মহারাজের” দেশও ছাড়াতে চললাম। বাংলার মিশ্র প্রচুর সলিল কণা সেবিত বায়ু, অজস্র বৃক্ষবল্লরী আচ্ছাদিত, নানা সলিলধারাপিনদ্ধ, বাংলার ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ট্রেন ছোটনাগপুরের পর্বতরমা, শুষ্ক সতেজ বায়ু সেবিত দেশ ছাড়াইয়া বহুল আত্মকুঞ্জপরিবৃত্ত নানা শস্য উৎপাদিনী বিহারের উর্বর ভূমি অতিক্রম করিয়া, কঠিনভূমি-মিশ্রিত মুক্তিকাময়ী গঙ্গাযমুনার সঙ্গম উপকূল ছাড়াইয়া যুক্তপ্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিল, “পাণী পাড়ের” বিদায় প্রাপ্ত হইয়া “মিশ্রি মহারাজ” রূপে দেখা দিলেন। এই বিচিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে—ওগো কোথায় গেলে, কাহা পেয়েলো হো ভাইয়া—ভাইয়া কিধার গিয়া হো ইত্যাদি বিচিত্র সুর ও বিচিত্র ভাবার লয় ও আবির্ভাব হইল। বেহারের সরল বলিষ্ঠ কপটতা বর্জিত ভীক ও শক্তি দৃষ্টিপূর্ণ গ্রাম্য লোকগুলি

ট্রেনে উঠিতেছিল। তাহাদের আটা সাটা মলিন পরিচ্ছদাদি ভ্রমলোকদের বিরক্তির সঞ্চার করবে বলেই তারা এক পাশে বসে পড়েছিল।

এলাহাবাদের পূর্ব হইতেই দীর্ঘমুষ্টি যুক্তপ্রদেশের ভাইয়া গণের সংখ্যা ভর্তি হইতে থাকে। তাহারা শ্রম পরায়ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কর্মঠ বলিয়া মনে হয়, বীরত্বের ভাবও তাহাদের মধ্যে গুণ আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কঠোর সংসারচক্রে পিষ্ট মনে হয়। ইহাদের ফিন ফিনে কামিজ, চুরিদার পাজামা ও পাতলা টুপি, বাদসাহী আমলের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধের পরিচায়ক।

ট্রেন যখন মধ্য প্রদেশ ছাড়াইয়া রাজপুতনার প্রবেশ করিল তখন “মিশ্রি মহারাজ” বিদায় প্রাপ্ত হইয়া “পাণী-মহারাজের” আবির্ভাব হইল।

এখন ভূমি অত্যধিক বালুকাময় ও অনেক স্থলে কঙ্কর পূর্ণ। পর্বত মালার উলঙ্গ মুষ্টি, তৃণলতা বিবর্জিত মাঠ, হরিৎক্ষেত্রও অপ্রচুর। পর্বতের প্রত্যন্তদেশগুলি উর্বর, তথায় ভূট্টা ও আফিম দুই-এরই চাষ হয়।

পর্বত অভিসন্ধি বা দুই পর্বতের নিম্নস্থ কোড় দেশ বহুবৃক্ষসম্বলিত। দবাবোহ শৈলপ্রাচীরের সান্নিধ্যশে স্থানে স্থানে এইরূপ স্থান বড় নয়নরঞ্জন বলিয়া বোধ হয়।

পর্বত মালার মধ্যদেশে আজমোড়ে এসে ট্রেন অনেক কণ থামে। চান্দিনিকের আরাবল্লি পর্বতমালা এবং দূর হইতে নগরটি রমা গিরিগুহার অন্তরালবর্তী মায়া-পুরীর মতই মনে হয়। এখানেও পর্বত মালা জায় আচ্ছাদন বিরহিত।

এই আজমোড়ের পরেই আর এক নূতন দৃশ্য—প্রায় ৮ ঘণ্টা কাল ক্রমাগত মারবারের মরুভূমির মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

বিস্তীর্ণ মরুভূমি, এক প্রকার কণ্টকবৃক্ষসমাকুল, শুষ্ক বালুকারাশি—মসৃণ ও সমতল।

দূরে দূরে পাখাড়গুলি মেঘের মত মনে হয়। কোম কোম পাখাড়ের শীর্ষদেশে রক্তপ্রস্তরের আভা বা অপরাক-

ভাত্র ১৩১১

রবির রক্তিমচ্ছবি করাল বদনা মরুভূমির রক্তিম, জিহবার মতো মনে হয়।

রাস্তায় কোন কোন স্থানে লাইন রক্ষক ও পরিদর্শক-গণের পানীয় জল ট্রেনের বয়লারের প্রস্তুত সঞ্চিত জল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ট্রেন আসিয়া মারোয়ার জংসনে থামিল, চতুর্দিকে মরুভূমির ভীষণচ্ছবি শুষ্ক ভীর্ণ প্রান্তর এক প্রকার কণ্টক স্তম্ভে পূর্ণ। এখানে অনেক লোক নামিল উঠিলও বটে। কতগুলি লোক ট্রেন থেকে নেবে, ক্ষুদ্র ষ্টেশনের দালানটির পিছনের প্রান্তর দিয়ে চলতে লাগলো। দূরে বতদূর দেখা যায়, পল্লি নগর বা বৃক্ষচ্ছায়ার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। এরা যার কোথায়!

রাজপুতনার রেল যাত্রীর প্রায় সর্বত্রই এমন অবস্থা। কোন স্থলে হয় ত রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে নিকটতম পল্লির দূরত্ব ২৫।২৬ মাইল; তদ্ব্যতীত ৫০।৬০ মাইল দূর হইলেও কিছুমাত্র আশ্রয় নাই। রাজপুতনার যে অতি অত্যন্ত অংশ ব্যাপিয়া রেল লাইন গিয়াছে তাহাতে আশ্রয় কিছুমাত্র নাই।

প্রকৃতি যেখানে বিরূপ, সেখানে লোকও তজ্জপ সহিষ্ণু। পানীয় জল সর্বাঙ্গের দুর্য্যভ, জল ব্যবহারের প্রণালী ও তাহাদের এতদূর সংকীর্ণ যে বাংলাদেশের এঁটোজান সম্পন্ন লোক তাহাদের উপর খড়গহস্ত হইয়া হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিতে বিন্দুমাত্র কুন্তিত হইবে না। তারপর অত্যন্ত জল ব্যবহার প্রণালী যা' তা' না বলাই ভাল।

বরাবর বেহার থেকে এ পর্য্যন্ত একটা প্রধার সামঞ্জস্য খুব লক্ষ্য করে এসেছি, সেটা “রামরাম” দিবার প্রথা। ট্রেনে কেউকে তুলে দিতে এসে আত্মীয় স্বজনগণ গাড়ীর হাতল ধরে ‘বর্টাভর’ দাড়িয়ে থাকবে, মুখে কথাটি নেই, কিন্তু যেই ট্রেনটি ছেড়ে দিলে আর উপায় নেই—মহা একটা কলরব শুরু হয়ে যায়। তখন উভয় পক্ষ থেকে “রাম রাম” দিবার একটা বিপুল আগ্রহ পড়ে যায়, বতাই দূরে ট্রেন যেতে থাকে ততই কণ্ঠ উচ্চ করে

বলতে থাকে,—অন্যকে আমার “রামরাম” দিও, অন্যকে দিও, গুণ্ডা বাচ্ছা সকলকে উভয় পক্ষ থেকে “রাম রাম” দিতে দিতে যখন ট্রেন ‘ডিস্টেন্ট’ সিগনেল ছাড়িয়ে চলে যায়, তখনও হয় ত ষ্টেশনের লোকটি বিকট চীৎকার করে “রাম রাম” প্রদান করতে থাকে।

মারবার ছাড়িয়ে ট্রেন কিছুক্ষণ দুর্গম পর্বত মালার মধ্য দিয়া চলতে থাকে। এ পাহাড়গুলি এমনই কদর্য্য যে ঠিক যেন বিরাট দৈত্য মুখ ব্যাধান করে আছে, শ্রামল বৃক্ষপত্রের চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয় না, দৃশ্য দেখে চক্ষু কাঁ কাঁ করতে থাকে।

তার কিছুক্ষণ পরেই দৃশ্য সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়। এ যেন দৈত্যপুরী হ’তে সুরপুরে এসে পৌঁছিতে হয়, এবং উভয়ের মাকথানে কদর্য্য কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়গুলি সীমানা কেটে রেখেছে। শৈলকাননকুসুমা এই আবুতে পৌঁছে প্রাণ মন শীতল হয়ে যায়। পর্বতের অধিত্যকা উপত্যাকা ভ’রে শলাশ গাছই অধিক দৃষ্ট হয়। শীত-কালের শেষে পর্বত প্রান্তর ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। পাহাড়গুলি শ্রাবলবসনভূষিত, তাহার চতুর্দিক হ’তে সহস্র নিকার বর্জিত পদবিক্ষেপে সমতল প্রদেশাভিমুখে ছুটে আসছে। উৎফুল্ল হরিণ-হরিণী প্রস্তর হ’তে প্রস্তর-খণ্ডে ছুটে বেড়াচ্ছে। হাজার পাখীর গানের সুর বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে। কেকা রবে শ্রবণ চমকিত হলে চতুর্দিকের বনের আশে পাশে ময়ূর ময়ূরীর সহর্ষ বিচরণ দেখা যায়। বর্ষার পর সত্যি আবু নন্দন কান্দে পরিণত হয়। ঝরণার কল কল নাদ, ময়ূরের কেকা রব, মনভুলান ভিজামাটির কোমল গঞ্জে নন্দনের স্বপ্ন রাশি বুকে করে বাতাস যেন উড়ে আসে।

ঝোপ ঝোপ ও বন-লতাকুঞ্জের তলে তলে উজ্জল ঝরণা-শিশুর মুখের গীতি নিরলস দেবকন্ডার সঙ্গীতের মতই সুধাস্রাবী। আবুর পর্বত-নিম্ন সমতলভূমিসমূহ অত্যন্ত উর্বর ও বিবিধ শস্তে পরিপূর্ণ।

আবু পর্বত বা অর্জুনাচল আরাবল্লি পর্বতেরই শেষ শীর্ষ। সমুদ্র সমতল হইতে প্রায় চারি হাজার ফিট উচ্চ

মহারাও শিরোহিপতির নিকট হইতে এখানটি ব্রিটিশ পৰ্ব্বমেষ্ট গুজরাত ও রাজপুতনার উচ্চ ইংরেজ কর্ণ-চারীদের বসবাসের জন্য লইয়াছেন।

আবু ছাড়াইলেই টেন গুজরাতে আসিয়া পৌঁছিল। প্রথমে পালনপুর জিলা। পালনপুরে এক জন নবাবও অছেন। এখানকার ভূমি উর্বর কিন্তু কঙ্করপরিপূর্ণ। নিম আম ও বাবলা গাছের খুব বাহলা দৃষ্ট হয়। টেন আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে ভূমি একেবারে কঙ্কর-শুভ্র হইয়া আসে, ভূমি উর্বর ও বাজরী, ভুট্টা, ধান, যব, মটর, কলাই বিবিধ শস্তশালিনী। বিস্তীর্ণ বালু শস্যার প্রান্তবাহিনী শীর্ণকারা অনেকগুলি নদী গুজরাতে সলিলা-সরবতদাজী। আবু ছাড়াইলে গাড়ী জী পুরুষে ভরে ওঠে। এতক্ষণ গাড়ীতে পুরুষরাই অধিক উঠিত, মহিল কদাচিত, কিন্তু এখন জী পুরুষের সমান ভিড়। অশঙ্কিত ও দর্পিতভাবে মহিলারা গাড়ীর কক্ষগুলি অধিকার করিয়া লইতেছেন।

বহু পূর্বে হইতেই “পাণি মহারাজ” বিদায় লইয়া তৎস্থলে ‘বালতি’ হস্তে “মহারাজ” রূপে দেখা দিয়াছেন।

টুণ্ডালার গাড়ী বদল করিয়া বান্দিকুট অথবা আঞ্জ-মীড়ে যাইয়া গাড়ী পরিবর্তন করিতে হয়। টুণ্ডালার ই, আই, আবু শেব, তৎপর আবু, এম্, আবু আমদাবাদ পর্য্যন্ত, এবং তথা হইতে বঙ্গে বড়োদা সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া রেলওয়ে (B. B. & C. I.) গাড়ীতে বড়োদা হইয়া পৌঁছিতে হয়। বান্দালীর মুখে ইহা বরদা বা বড়োদা, গুজরাতির মুখে ইহা বরোদা এবং মহারাষ্ট্র বাসীর মুখে বড়োদা। বড়োদা গুজরাতে মধ্য হইলেও এখানে বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্র লোক বাস করে। বড়োদা নগরীতে শতকরা প্রায় ৪০ জন মহারাষ্ট্র লোকের বাস। মহারাষ্ট্রবাসী ও গুজরাতিবাসী সম্পূর্ণ প্রতিবাসী; কিন্তু তাহাদের সামাজিক জীবন, রীতিনীতি, পদ্ধতি এমন কি ভাবগত পার্থক্যও বহুল দৃষ্ট হয়। গুজরাতি লোক শান্তশিষ্ট ও নব্র প্রথর বাণিজ্যবুদ্ধিপ্রবণ এবং ইহাদের মধ্যে একানবর্তী পরিবারপ্রথা সম্পূর্ণ রহিত। মহারাষ্ট্র

লোক গর্ভিত ভৈরবী ও আত্মমর্য্যদাসম্পন্ন, এবং ইহাদের মধ্যে একানবর্তী পরিবারপ্রথা দৃঢ়তর, আমাদের বাংলা দেশের সঙ্গে এ বিষয়ে খুব মিল আছে।

জৈন ধর্ম্মের নির্জীব করুণভাব, রণছোড়া বা দারকা-পতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবাৎসল্যভাব, শঙ্করের বীরবৈরাগ্য অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকারী হওয়ায় গুজরাতি লোকের চরিত্রে কোমলতা ও শান্ত ভাব অধিক স্থান পাইয়াছে।

ত্রিভুবনবিনাশী শিব উন্নত রণরঙ্গে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন, কঠোর সাধনসংযমরত মহাদেবের বীর ভাব মহারাষ্ট্র লোকের চরিত্রে অধিক কার্য্যকারী হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ গুজরাতি ভাষার প্রথম প্রাচীন কবি নরসিংহ মেহেতা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসঙ্গীতকাব্যে দেশ ভাসাইয়া-ছেন। শ্রেষ্ঠকবি প্রেমানন্দ প্রেম সঙ্গীতে দ্বিতীয় জয়দেব স্বরূপ, তৎপর বলভাচারীর শিষ্য প্রশিষ্টেরা বালগোপাল পূজার প্রবর্তন করিয়া বাৎসল্য রসের ধারায় সমস্ত গুজরাতি প্রাবিত করিয়াছে। মহারাষ্ট্রদিগের মধ্যে তুকারাম ও তুলসীদাস ভক্তির গোড়া পত্তন করিয়াছেন; তৎপর মোরপহু জ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি বীর রসের ধারা চালিয়াছেন, রামদাস প্রভৃতি সাধু সন্ন্যাসীরাও মৃতপ্রায় শক্তিতে পুনরায় ইন্দ্রন সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

রাজপুতের জীবনচরিত্রে তেমন কিছুই দৃষ্ট হয় না। সমস্ত রাজপুতনা প্রাণবিহীন, এমন কি জাতীর ভাব ও মর্য্যাদার পর্য্যন্ত উপলব্ধি বিহীন।

ভাট এবং চারণের সঙ্গীত মুখে মুখেই প্রতিধ্বনিত হইত; রাজদরবারে আত্মপ্রশংসার কাহিনীটুকু মাত্র স্থান পাইত; কাজেই চারণের সঙ্গীত নীরব হইতেই সমস্তই নীরব হয়ে গেছে; এমন কি কাহিনী পর্য্যন্ত লোকে বিন্মত হয়ে গেছে, কারণ প্রথম অবধিই শত্রুবিজ্ঞা ছাড়া শত্রু-বিজ্ঞার কোন চর্চ্চা ছিল না। মারাঠার সঙ্গে সংঘর্ষে সে শত্রুবিজ্ঞাও ধ্বংস হওয়াতে সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে।

রাজপুতনার স্থানে স্থানে জৈন প্রভাব সামান্য বিদ্যুত

হইয়াছে। তন্মধ্যে মারবার ও মিবারের মধ্যেই সর্বাধিক বেশী। রাণা কুম্ভের সময় চিত্তোরে জৈন প্রভাব বিস্তৃত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। মারবার ও মিবারে জৈনদিগের কয়েকটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান আছে।

সমস্ত রাজপুতনায় শৈব প্রভাবই সর্বাধিক বেশী; বৈষ্ণব প্রভাব অতি সামান্য।

মিবারের মধ্যে নাথদ্বার নামক স্থান বৈষ্ণবদের তীর্থ-মহিমায় দ্বিতীয় বন্দাবন তুল্য। সমস্ত রাজপুতনায় মধ্যে ইহা একটি শান্তি শতদল।

শৈব বৈষ্ণব উভয়ের পক্ষেই আজমীরের সন্নিহিত পুন্ডর তীর্থ পুণ্য স্থান।

চিত্তোর মহিষী মহাভক্তিময়ী মীরাবাইএর প্রভাব রাজপুতনায় অধিক স্থান পায় নাই! মীরাবাইএর সম্পূর্ণ ভক্তিভাব গুজরাতির নরনারীর অন্তরে কার্যকরী হইয়াছে। মীরার ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীতে গুজরাতি মহিলাদিগকে গরবা গানে আনন্দ উৎসে ন্যাচাইয়া তোলে।

বাংলাদেশ থেকে বড়োদা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে ভারতবর্ষীয়া মহিলাদের অবস্থার ক্রমাগত পরিবর্তন লক্ষ্য করে আসা যায়।

বাংলা দেশের মহিলা লজ্জাশীলা ভীকু ও অবগুষ্ঠন-বতী পুরুষের সম্পূর্ণ-সাহচর্য্য ব্যতিরেকে গৃহের বাহিরে সমস্ত কার্য্যে অক্ষম ও সঙ্কুচিত, কিন্তু অত্যন্ত দয়ালী ও জননীম্নেহে ভরা। বিহারে আসিলে মহিলা-দের অবগুষ্ঠন হ্রস্বতা প্রাপ্ত দেখা যায়। মহিলারা স্বাধীন ভাবে চলা ফেরায় অভ্যস্ত, পুরুষের সহকারিতা তাঁহাদের অনেক অল্প আবশ্যক হয়।

যুক্ত প্রদেশে আসিলে মহিলাদিগের আবার পর্দা দেখা যায়, কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েদের মত তাঁহারা অত সঙ্কুচিত ও দুর্বল নহেন, এবং তাহারা সর্বদা পুরুষের সহগামিনী হইয়া চলা ফেরা করেন।

রাজপুতনায় মেয়েদের অবগুষ্ঠন আর একটু দীর্ঘ; কাজেই তাঁহারা গমনাগমনের সময় হস্ত দ্বারা এক চক্ষুর উপরিস্থ আবরণ অর্ধ উন্মুক্ত করিয়া একচক্ষু লোকের

মত তাঁহাদের দৃষ্টি শক্তির ব্যবহার করে। রাজপুতনার মেয়েদের লজ্জার ভাব একান্ত কম, বিশেষতঃ তাঁহাদের অঙ্গাবরণের অবস্থা বড়ই অসাবধান।

তারপর গুজরাতি মেয়েরা স্বাধীন সতেজ। তাঁহাদের অবগুষ্ঠন মাথার উপরিভাগেই অবস্থান করে। পুরুষের সহকারিতা তাহাদের মোটেই আবশ্যক হয় না; নিঃশঙ্কভাবে তাঁহারা সর্বত্র গমনাগমন করে।

মহারাষ্ট্র সধবারা মোটেই অবগুষ্ঠন প্রদান করেন না, সেটা বিধবাদের জন্তই সঞ্চিত থাকে; তাহারাও নির্ভীক কিন্তু পুরুষের সাহায্য তাহারা আত্মমর্য্যাদার অঙ্গাবরণ রূপে সর্বদাই গ্রহণ করেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

বেদের উষা-কবি

উদয় স্তম্বেক-শিরে স্নেহ বেশবাসে
ফেলিতে প্রথম পদ ধরেছি উষায়!
লজ্জাক্রণ গণ্ড তার করেছি চূষন;
মুদিয়া দিয়েছি সুখে উজ্জল নয়ন।

ওই উষা আসে!

আমার প্রেমের চিত্র, এখনো সে আছে
কপোলে কপোলে তার, আকুলিত বাসে,
উচ্ছল আকাশব্যাপী হরষ-উচ্ছ্বাসে!
যে হরষ স্রোতোমুখে ভুবন ভাসায়,
লুটে যারে ফুল-কুল, দিকে দিকে ভাগে,
মেঘেরা হৃদয়ে ধরি নাচিয়া বেড়ায়!

ওই উষা আসে!

ওই সে রজনী আভা—আমারি প্রাণের
সমগ্র বাসনা-রাগ বিপুল আকুলে
অথরে কপোলে তার দিয়েছিছ ঢেলে!

ওই বার-বার ।
কিছু বল বল কোটে পার পার ।
মিকে বিকে, ঘরা ছুড়ি ওই উঠে সাড়া—
ভেগে উঠে কারা ?

কাহার সছ কঠে উল্লাসিয়া উঠি,
শত বয়ে উজলিয়া হৃদয়-দেউটি,
সহস্র সঙ্গীত-ছন্দে আবগ-সস্তার
আনন্দের সজ্জরসে আরতি উদার
নিহরদিছে অর্থা-ভারে আমাঝি প্রিয়ারে !
দেশে-দেশে লোকে-লোকে কালে-কালান্তরে !

আমার সে উবা আজি অগতের ধন
যে ছিল প্রথম শুধু আমারি আপন !
সেই উবা স্বর্যরূপে, অগ্নি বায়ু রূপে
অদ্বিতি বরুণ সোম লক্ষ ঋক রূপে
আহুতি উক্ণের রূপে, গায়ত্রীর রূপে
সুখদুঃখ জ্ঞানকর্ম তত্ত্ব প্রীতি রূপে
নিখিলের হৃদয়ের আবগ-আধার,
বিশ্বের কবিতারূপে প্রাণ-বেদনাব,
জীবনের জ্যোতিঃ পহী আশা-ভাষাময়ী
ললিত সঙ্গীত চিত্র শিল্প কলাশ্রয়ী,
ওতপ্রোত সুনিবিড় সুধার আভাস
কোটি মুখে কোটি রূপে অসীম-উল্লাস
ভবের ভাবের রাজ্য করেছে প্রকাশ !

যে ছিল আমারি শুধু হৃদয় নন্দিনী,
আজি সে বিশ্বের প্রিয়া—বিশ্ববিকাশিনী !
আজি বিশ্বলোক
পূজিছে তাহারে, রচি আনন্দের শ্লোক !
নবীন বরষা-ছট শফরীর সম
উলটি-পালটি ধরে প্রাণে, অল্পম
প্রসাদ লভিতে তারি—আঁখি তলে তার
উলটিছে আপনার প্রাণের ভাঙার !

আমার সে প্রিয়িনী প্রথমা-প্রাণিয়ে,
জানি আজি, বিশ্বলোক নিজ বৈষ্ণবের
নিয়মে গেল জনে জনে নিজ অন্তঃপুরে ।

তবু সে আমার—
প্রথম প্রহ্ন-চিত্ত অনাদি মিশার,
প্রথম প্রণব-ধ্বনি হিয়া-বেদনার,
প্রথম প্রেমিক আমি চিরদিন তার ।
শ্রীশশাক মোহন সেন ।

নামি—কো

সপ্তম পরিচ্ছেদ
কার্যে নিযুক্ত

“হংকং, জুলাই—,—

“প্রিয়তমা নামি,

নিরানব্বই ডিগ্রী গরমে গলদর্শ অবস্থায় তোমার এই
চিঠি লিখ্চি। সাসেবো থেকে যে পত্র দিয়েছিলুম
তা বোধ হয় পেরেছ। সেখান থেকে বাজা করে অবধি
দিন ওষো এত গরম হয়েছিল যে—“অজের হীপের” নাবিক
আমরাও একটু দুশ্চে পড়েছিলুম। আমাদের কর্মচারী
ও নাবিকদের মধ্যে উজন খানেক লোকের সর্কি-গর্দি
হয়েছিল, আমি কিন্তু ভাল আছি। রোগীদের কামরার
আমার একদিনও থাকতে হয় নি। বিবুরেখার নিকটে
কলসান রোদে পড়ে আমার কালো চেহারার উপর এমন
একটি পৌছ পড়েছে যে আমি নিজেই অবাক হই। আজ
জাহাজ থেকে নেমে এক নাপিতের দোকানে গিয়ে-
ছিলুম, অক্কামনক ভাবে যেই আর্শির দিকে ফিরেচি, দেখি
এক নতুন লোক দাঁড়িয়ে! আমার এক আয়ুদে বহু
আমার এই অবস্থার ছবি একখানা তোমার কাছে পাঠাতে
বল ছিল, কিন্তু আমি তা কর্চি না। সমস্ত পথটাই
ভালোয় ভালোয় কেটেছে, একবার কেবল বড় পেরে
ছিলুম। গতকল্য আমরা এখানে অরুণমির মধ্যে
নিরাপদে এসে পৌঁছেচি।

“আসেবোতে তেয়ার মেহমাথা পত্র পেয়ে বার বার
সেখানি পড়েচি। মা’র আবার সে পুরাণে ব্যারাম হয়েছে
তুনে দুঃখিত হলুম। কিন্তু তুমি তাঁর সঙ্গে আছি বলে এ
বৎসর আমি খুব নির্ভাবনায় আছি। আমার বদলে তুমি
তাঁর পরিচর্যা করো। ব্যারাম হলে তাঁর মন যুগিয়ে
চলা দায়। সেই জন্ত তোমার জন্ত আমার দুঃখ হচ্ছে।

“আশা করি আকাশাকার সকলে ভালো আছেন।
কাতো মেসোর ধবর কি? এখানো কাঁচি হাতে ব্যস্ত
না কি? তা হলে ইকু চলে গেছে। কেন এ রকম
হ’ল তা জানি না। কিন্তু এতে আমি বড় দুঃখিত।
তাকে চিঠি লেখবার সময় আমার ভালবাসা জানিও,
আর বোলো তার জন্তে আমি অনেক উপহার নিয়ে
যাব। আমি তাকে ভারি ভালবাসি। সে খুব আয়ুদে।
তুমিও বোধ হয় তার বিচ্ছেদ অস্বস্তি করছ। কাতো
মাসী ও চিজুকো-সান তোমার সঙ্গে দেখা করতে কখনো
কখনো আসেন কি?

“চিজিওয়া সর্বদাই আসে শুনলুম। আমাদের জন
কয়েক মাত্র আত্মীয়, তার মধ্যে চিজিওয়া একজন। মা
তার উপর ভারি সন্তুষ্ট। তাকে আদর করলে মা খুসী
হবেন। সে বেশ চালাক চতুর লোক, দরকার হয় ত
আশা করি সে তোমার সাহায্য করবে।

“তোমার বড় মেহের

“তাকেও

পুঃ। সন্দের চিঠিখানা মাকে পড়িয়ে শুনিও।
এখানে দিন কতক থাকবে। এখান থেকে রসদ নিয়ে
মানিলা হয়ে সিড্‌নী, তারপর নিউ ক্যালিডোনিয়া,
ফিজি হয়ে সন্‌ফ্রান্সিসকো, তার পর হাওয়াই হয়ে
বাড়ী। শরৎকালে বাড়ী পৌঁছব আশা করি।

পুঃ। সন্‌ফ্রান্সিসকো (আমেরিকা) জাপানী
বাণিজ্য দূতের নিকট,—এই ঠিকানায় চিঠি পাঠিও।

“সিড্‌নী. আগষ্ট,—

“প্রিয়তমা নানি,

...গত যে মাসে নানিসানের সঙ্গে ইকাওতে ‘কার্ণ’

সংগ্রহ কর্ছিলাম; আর এখন আমি দক্ষিণ গোলার্ধের কত
নীচে, সিড্‌নীতে! রাতে যখন ঘুম ভুলে “সাদারম্‌ জন্স”
এর দিকে দেখি ও গতদিনের কথা ভাবি, তখন আমাদের
জগৎটা কি পরিবর্তনশীল এ কথা না ভেবে পারি না।
গত বৎসর যখন সমুদ্র ভ্রমণ করতুম, কখন কখন শরীর
খারাপ হত, কিন্তু আশ্চর্য্য, এ বৎসর আমি খুব ভাল
আছি। এবার একটা নতুন অননুভূতপূর্ব্ণ ভাব আমার
সঙ্গে সদা সর্বদা রয়েছে। ‘ব্রিজের’ ওপর একলা
দাঁড়িয়ে যখন দেখি দক্ষিণ-দেশের অন্ধকার আকাশে
অসংখ্য হীরের টুকরো ঝিক্‌ ঝিক্‌ করে জ্বলচে, তখন এই
ভাবটা বিশেষ প্রবল হয়ে ওঠে, তখন যেন আমি চোকের
সামনে তোমার সুন্দর মুখখানি দেখতে পাই। আমার
নিবুদ্ধিতা দেখে হেসো না। বন্ধুদের সঙ্গে যখন থাকি তখন
যেন কোনো ভাবনা নেই এমনি ভাণ করে তাদের সঙ্গে
গাই “বাড়ীতে অগ্রবর্ষণ, আমরা তাতে জ্বক্‌প করি না,
কারণ সাহসের কাজ—ইত্যাদি”, কিন্তু (হেসোনা) নানি-
সানের ছবি সন্ধানি আমার কোটের ভেতরের পকেটে
রয়েছে। এই চিঠি লিখতে আমি একজনের চেহারা
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে ‘পামের’ ছায়া-ঢাকা বাড়ীর ছোট
ঘরটিতে এই চিঠি পড়বে।

“সিড্‌নী উপসাগরে অনেক পরিবার জল-বিহার
করে বেড়াচ্ছে। আমি ভাবি যে যখন কাজ-কর্ম্‌ শেষ
করে নামি-সান্‌ আর আমার দুজনেরই চুল পাকবে তখন
আমরাও অন্তত পাঁচ হাজার টনের একখানা বড় বিহার-
তরঙ্গী তৈরি করাব। আমি হব সে জাহাণের কাপ্তেন,
আর আমাদের ছেলেরা আর নাতিরা হবে নাবিক।
আমরা সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াব। আবার আমরা
সিড্‌নীতে আসবো; বহু বৎসর আগে এক তরুণ
নাবিক যে সব স্বপ্ন ছন্দে পোষণ করত সে স্বপ্নের
কথা তখন তোমার বলবে।

“তোমার বড় মেহের,

“তাকেও”

“তোকিও,—

“প্রিয়তম তাকেও :

হংকং থেকে ১৫ জুলাই যে মেহমাথা চিঠিখানি পাঠিয়েছ তা কতবার পড়েছি! এত গরমেও তুমি ভাল আছে শুনে বড় আফ্লাদিত হলাম। মা ভাল হয়ে উঠছেন, তাঁর জন্ম ভেবো না।

নিঃসঙ্গ দিনগুলো কোনো রকমে কাটিয়ে দিই। তুমি এখানে নেই সেইজন্মে বিশেষত মাকে স্মৃতি করতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমি বড় মুখা যতটা ইচ্ছে হয় কান্ধে ততটা করে উঠতে পারি না। তুমি যে দিন নিরাপদে বাড়ী পৌঁছবে সে দিনের জন্মে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছি।

“আকাশাকার সকলে ভাল আছে। তারা জুঁবির ‘ভিলা’তে গেছে। কাতো-রা ওকিংস্‌ গেছে, তোকিওতে আমরা ভারি একলা পড়ে গেছি। ইকুও জুঁবিতে আছে; সে ভাল আছে। তোমার ইচ্ছা তাকে জানিয়েছিলাম। সে তোমার দয়ার জন্মে অজস্র ধন্যবাদ আমার দিয়েছে।

“আমি বুঝতে পারছি কতগুলো প্রয়োজনীয় বিদ্যা আমার শেখা হয় নি। গৃহস্থালির কাজকর্ম শেখবার জন্মে বাবা আমার বিশেষ করে বলতেন, তখন শিখিনি সে জন্মে এখন অনেক অনুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। তোমার ইচ্ছামত ইংরাজি পড়ব মনে করেছিলুম, কিন্তু বই নিয়ে বেনীকরণ বসলে মা পাছে অসন্তুষ্ট হন সেই ভাবনা হয়। তাই আপাতত গৃহস্থালির কাজকর্মেই সমস্ত সময়টা দিচ্ছি। বিনা কারণে পড়াশুনো করুঁচ না আশা করি এক কথা ভাববেন। লিখতে লজ্জা করে, কিন্তু শব্দ সমর বখন খুব দুঃখ হয়, বড় একলা বোধ হয়, তখন তোমার দেখতে এত ইচ্ছা হয় যে মনে হয় পাখীর মত ডানা থাকলে তখন তোমার কাছে উড়ে যাই। তোমার আর তোমার জাহাজের ছবিই এখন আমার একমাত্র সাহায্য। ইকুও পড়বার সময় সাধারণ ভূগোল প্রতী বিশেষ মনোযোগ দিই নি কিন্তু এখন—একখানা কত-কালের জীর্ণ, কিন্তু মানচিত্র বার করে তাতে তোমার জাহাজের গম্যপথটি বার করতে কত আনন্দ হয়। কখন

কখন আমার মনে হয় আমি যদি পুরুষ হতুম, আর নাবিক হতুম তা’হলে সকল সমুদ্রযাত্রাতেই তোমার সঙ্গে লড়ে থাকতে পারতুম। প্রিয়তম, আমার দুর্বল চিত্তের প্রতি দয় কোরো; আমার সকল চিন্তা তোমারই জন্মে। খবরের কাগজে এত দিন বায়ুর অবস্থা সম্বন্ধীয় বিবরণ পড়তুম না, কিন্তু এখন রোজ পড়ি: আমি জানি তোমার জাহাজ যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার বায়ুর অবস্থা এরূপ নয়, কিন্তু তবুও যখনি বাড়ের সম্ভাবনা দেখি তখন তোমার জন্ম বড় ভাবনা হয়। খুব সাবধানে থেকো।

‘তোমার মেহের পত্নী

“নামি”

“তোকিও, অক্টোবর—

“প্রিয়তম তাকেও.

প্রতি রাত্রেই স্বপ্ন তোমায় দেখে তোমার দেখবার জন্মে প্রাণ আকুল হয়েছে। গত রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি ‘ফার্ন’ সংগ্রহ করবার জন্মে জাহাজে চড়ে তোমার সঙ্গে ইকাও গেছি—সেখানে কে যেন আমাদের মধ্যে এস,—তুমি যেন দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছ, ঠিক এমন সময়ে আমি জন্মে পড়ে গেলুম। আমি চীৎকার করে ওঠাতে মা আমায় জাগিয়ে দিলেন। যখন বঝলুম এটা স্বপ্ন, তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। কিন্তু তবুও কিসে যেন আমায় যাতনা দিচ্ছে। তুমি জীগ গির ফিরে এস, তোমার জন্ম আমি কত ভাবচি। নিজের মুখে তোমায় সব কথা বলব মনে করে তুমি যে দিক থেকে আসছ প্রতিদিন সেই পূর্রাকাশের দিকে দেখি। হয়ত রাস্তায় চিঠিখানা তোমার অতিক্রম করে যাবে, কিন্তু আমি এখানে হনোলুতে পাঠাচ্ছি।

তোমার মেহের পত্নী।

“নামি।”

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

শ্রীহেমলিনী রায়।

জিজিরা

জিজিরা একটি ক্ষুদ্র জনপদ। বুড়িগঙ্গা নদী ঢাকা ও জিজিরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। জিজিরার প্রাসাদ শা সূজা নিশ্চিত, বড় কাটরার বিপরীত দিকে বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। জিজিরা ও ঢাকার যাতায়াতের জন্য বড় কাটরার নিকটে বুড়িগঙ্গার বক্ষোপরি এক ইষ্টক নিশ্চিত সেতু নবাবী আমলে বিদ্যমান ছিল। উহার আংশিক চিহ্ন অতাপি বিলুপ্ত হয় নাই। ঢাকা নগরী হইতে জনসাধারণ যেন নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত জিজিরা ও অজ্ঞাতস্থানে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে সেতু নিশ্চিত হইয়াছিল (১)। বর্তমান সময়ে জিজিরায় দর্শনীয় তেমন কিছুই নাট বলিলেও চলে। নবাব নিশ্চিত প্রাসাদের ভগ্নশূন্য এবং একটি ভগ্ন চূড় অট্টালিকার অংশ মাত্র নয়নপথে পতিত হইয়া অতীতের বিবাদমুখিত জাগ্রত করিয়া দেয়। ডাক্তার টেইলার তদীয় টপোগ্রাফি অব ঢাকা গ্রন্থে নবাব ইব্রাহিম খাঁকে জিজিরার প্রাসাদ নির্মাতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (২)।

জিজিরার রাজপ্রাসাদের সহিত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের বিবাদমুখিত ওতঃপ্রোতঃ ভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। এক সময়ে এই প্রাসাদের প্রতি কক্ষ হইতে সরফরাঙ্গ-সওকতজঙ্গ-হোসেনকুলি-আলিবর্দি-সিরাজের পুরমহিলা ও বংশধরগণের ব্যথিত শব্দের ভগ্নশব্দ এবং তাহাদিগের ক্রন্দনের অক্ষুট রোল বহির্গত হইত। এই মুক প্রাসাদের প্রাচীর ও প্রতি ইষ্টক খণ্ড উহাদিগের পতীর মর্ম বেদনার চির

সহচর রূপে বিরাজমান ছিল। পিতার জীবদ্দশায় বে প্রতিবন্দী বেশেটি বেগম ও আমিনা বেগমের গর্ভোন্মত গ্রীবার জীব-আন্দোলনে শত শত অশ্রুর বর্গ কৃতার্ষমুহ হইয়া অবিলম্বে আদেশ প্রতিপালন জন্য ব্যস্ত হইত, অশ্রু নৈমীর আশ্রয় পরিবর্তনে তাহাদের উভয়ের ভাগাশ্রয় একত্র গ্রথিত হইয়া এই প্রাসাদের এক প্রান্তে উভয়েই বিবাদক্লিষ্ট বদনে ক্ষুধমনে কাল যাপন করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। মতিঝিলের সুসজ্জিত সুরম্য অট্টালিকার নানা-বিধ বিলাস ব্যসনামোদের মধ্যে অবস্থান বাহার পক্ষে শোভনীয়, জিজিরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠমধ্যে বন্দী অবস্থার কাল যাপন করা তাহার পক্ষে মৃত্যুর অধিক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যেই হতভাগ্য নবাব সিরাজদৌলার নাম আজ পর্যন্তও সর্ব সাধারণের নিকটে নানাবিধ প্রবাদ-বাক্যের সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, যাহার তর্জনী তাড়নায় এক সময়ে ইংরেজ বনিকদলকেও সন্ত্রস্ত হইতে হইয়াছিল, তাহার জননী, প্রিয়তমা মহিলা ও শিশু-তনয়া যে সময়ে বুড়িগঙ্গাতীরে তরণী হইতে অবতরণ করিয়া মীরণের বন্দীরূপে জিজিরার প্রাসাদ অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, সেই সক্রুণ দৃশ্য সন্দর্শন কর-বার জন্য বহুলোক নদীতীরে সমবেত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

প্রতিপালক প্রভুপুত্রের শোণিতপাত ঘারা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া আলিবর্দি, কতিপয় দিবসমধ্যে সরফ রাজের বেগম ও তদীয় পরিবারস্থ অপরাপর পুরাজনা গণের সহিত সরফরাজনন্দন হাফেজালি খাঁকে এই প্রাসাদ মধ্যেই বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সরফরাজের বংশধর গণকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে আলিবর্দির পাপলব্ধ সিংহাসন স্তম্ভত এবং কণ্টকপরিশ্রুত হয় এই বিবেচনায়ই দুরদর্শী নবাব উহাদিগকে রাজধানীর নিকটে রাখা বুদ্ধিসঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু উক্ত বাহাতে সুখস্বচ্ছন্দে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে পারেন, তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য ঢাকার তদানীন্তন নায়ক নাজিমের প্রতি আদেশ প্রদান

(১) Khan Bahadur Syed Aulad Hussein's Antiquities of Dacca & Tarikhi- Dacca.

(২) "On the opposite side of the river there is an old building surrounded by a Moat, which is said to have been built by the Nawab Ibrahim khan". Dr Taylor's Topography of Dacca page 91.

করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। নবাব সিরাজদ্দৌলা বঙ্গের মসনদে আরোহণ করিয়া সওকণ্ডক ও হোসেন কুলীখাঁর পরিবারবর্গকেও এই স্থানেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। পলাসীর রণাভিনয়ের পরে বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের হস্তে বন্দী হইয়া সিরাজ প্রভৃতি ও সিরাজের শিশুকন্যা এবং বেগম প্রভৃতিও এই স্থানেই আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে ঝাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব পরিবার বর্ণের বিবাদ-স্বৃতি বহুকাল পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষণ করিয়া আজ জিজিরা একটা ক্ষুদ্র নগর্য পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। শোকভারাক্রান্ত জিজিরা নবাব পরিবার বর্ণের শ্মশান ভূমি, ঐতিহাসিকের পক্ষে পুণ্যক্ষেত্র ও পাঠস্থানের অন্যতম একটি।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে পলাসীর যুদ্ধের অবসান হইলে ক্লাইব সেনাপতি মীরজাফরকে বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আলিবর্দীর সময় হইতে মীরজাফরের সিংহাসনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ ষোড়শ বর্ষকাল মধ্যে সরফরাজের পুত্রদ্বয় মধ্যে কোন অশান্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল না। অতি দীন ভাবেই তাহার জিজিরার প্রাসাদমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু তথাপি মীরজাফর সুস্থিরচিত্তে কালযাপন করিতে পারিলেন না। মসনদে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি সরফরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র হাফেজালিকে ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে আনয়ন করিলেন। হাফেজ মুরশিদাবাদে আগমন করিয়া একরূপ বন্দীভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ক্লাইবের নিকটে যে দীনতা ও স্বীয় হীনাবস্থা জ্ঞাপন করিয়া অভি-বিনীত ভাষায় এক সুদীর্ঘ লিপি প্রেরণ করেন, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া মীরজাফর অনেক পরিমাণে মুহু হইলেন। কিন্তু সরফরাজের দ্বিতীয় তনয় আমানী খাঁর চরিত্র তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক উপাদানে গঠিত। তিনি স্বভাবতঃই কিছু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও তেজস্বী। অথবা দীর্ঘকাল ব্যাপী নৈরাশ্যই তাহাকে শত্রু বিপৎপাতেও নির্ভীক এবং সহিষ্ণু করিয়া তুলিয়া-

ছিল (১)। যখন দেখিলেন যে এই সুদীর্ঘ ষোড়শ বৎসরকাল যথোপ যথায় তিনি অদৃষ্টলক্ষীর প্রসাদকণিকা লাভে সমর্থ হইলেন না, বরং উত্তরোত্তর নৈরাশ্যই বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন তিনি মনে করিলেন, একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করা যাউক, দেখি কি হয়।

এদিকে মীরজাফরের দারুণ অর্থশোষে ঢাকার রাজ-কোষও একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল। এমন কি সাম্রাজ্য রক্ষার্থ সৈন্তের ব্যয়নির্বাহই কষ্টকর বিবেচনা কেবল মাত্র দ্বিশত সংখ্যক সৈন্ত ঢাকার লালবাগ দুর্গে রক্ষিত হইল। যাহারা রহিল তাহাদিগকেও অতি সামান্য মাত্র বেতন প্রদান করা হইত, সুতরাং সৈন্তগণের আর উৎসাহ ও উদ্যম রহল না। সুশিক্ষিত এবং কার্যদক্ষ প্রধান লোকও ঢাকার সৈন্তশ্রেণীর মধ্যে রহিল না। এই সমুদয় সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করা আমানী খাঁর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধুর প্ররোচনায় ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে তিনি নবাব জেসারং খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া লালবাগের দুর্গ অধিকার করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। জেসারং খাঁকে নিহত করিতে পারিলেই অন্ততঃ ঢাকার নবাবী পদ তাহারই প্রাপ্য হইবে আমানী খাঁ এই অমূলক চরাশা মনোমধ্যে পোষণ করিতে ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ২২ শে অক্টোবর তারিখে অতি সজোপনে জিজিরার বস্ত্রশালা হইতে বহির্গত হইয়া লালবাগের দুর্গ আক্রমণ করিবেন ইহাই স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু আমানী খাঁর প্রতি বিধাতা নিশ্চিতই বিরূপ। নির্দিষ্ট দিবসের দুইদিন পূর্বে আমানী খাঁর বিশ্বাসঘাতক জনৈক অনুচর জেসারং খাঁর নিকটে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ করিয়া ফেলে। জেসারং খাঁ তৎক্ষণাৎ কতিপয় সৈন্ত প্রেরণ পূর্বক আমানী খাঁ এবং তদীয় কতিপয় অনুচরকে ধৃত করিয়া, তাহার সুখবশ্ত ভঙ্গ করিয়া দিলেন। এই সময়ে ঢাকার ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ ড॰ জন সৈনিক পুরুষ দ্বারা নবাব জেসারং খাঁর সাহায্য করিয়াছিলেন। ঢাকার এই বিজ্রোহ ব্যাপারে

মীরজাফরের মনের অশান্তি আরও শতগুণে বর্ধিত হইল।*

মীরজাফরের রাজ্যচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ তাহার নিষ্ঠুর চরিত্র ও অসংখ্য নরহত্যাপরাধের বিষয় উল্লেখ করিলেও সমসাময়িক জনৈক গ্রন্থকার এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন (১)। বস্তুতঃ তিনি যে নিতান্ত দুর্বলচিত্ত ছিলেন তাহা সন্দেহ নাই। মীরনের যথেষ্টাচারিতা ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের উপযুক্ত শাসন না করায়, জনসাধারণ মীরজাফরকেও মীরনের কার্যকলাপে সহকারীই ভাবিত। এমন কি ১৭৬০ খৃঃ অব্দের (২) জুন মাসের এক গভীর নিশীথে ঢাকায় যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইয়াছিল, তাহাতেও অনেকে মীরজাফরকেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন (৩)। কিন্তু যুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন মীরনের আদেশক্রমেই উহা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আলিবর্দি-মহিবী ও তদীয় কন্ডাধর (যেসেটী বেগম ও আমিনা বেগম); সিরাজ মহিবী সুফিয়েছা বেগম ও তাহার শিশু কন্ডাগণ; লুৎফেল্লাহ বেগম ও তদীয় শিশু কন্ডা এবং নওয়াজিসের পালক পুত্র (পাদশা কুলী খাঁর পুত্র) মোরাদদৌলা মীরজাফরের আদেশক্রমে জিজিরায় বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন (৪)। উহাদিগকে বধ করিতে পারিলেই সিংহাসন কণ্টক পরিশুদ্ধ হয় ইহা বিবেচনা করিয়া কূটনীতিবিশারদ নিষ্ঠুর মীরণ ঢাকার নায়েব নাজিম জেসারৎ খাঁকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন (৫)।

* See Orme's Indushtan Vol II, P. 270—271.

(১) Transactions in India from 1756—83. London 1784 (Debret) Pp. 38—39.

(২) "The last day of Sheval, or the first of Zilcaad, in the year 1173 the Hegira" Translation of the Seir Mutaqherin, Vol II. Pp. 371.

জেসারৎ খাঁ অভি ধর্মতীক লোক ছিলেন; মীরনের এই নিষ্ঠুর আদেশ প্রতিপালন করিতে কিছুতেই তিনি সম্মত হইলেন না। অনন্তর সংবাদবাহককে স্বয়ং এই কার্যোদ্ধার করিবার জন্য প্রেরিত হইতে হইল। কারণ, মীরণই তাহাকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া প্রেরণ করেন যে, যদি জেসারৎ খাঁ আদেশ প্রতিপালন করিতে ইতস্ততঃ করেন, তবে যেন সে স্বয়ং এই কার্য সম্পন্ন করে। সংবাদবাহক এক গভীর নিশীথে মুরশিদাবাদে লইয়া যাইবার ছল করিয়া নওয়াজিস মহিবী যেসেটী বেগম, সিরাজ জননী আমিনা বেগম, নওয়াজিসের ভাবি উত্তরাধিকারী মৃত এক্রামউদ্দৌলার শিশু পুত্র মুরাদদৌলা, সিরাজবেগম সুফিয়েছা এবং সিরাজের শিশু কন্যা (সুফিয়েছার গর্ভজাত) এই প্রাণী পঞ্চককে জিজিরায় প্রাসাদ হইতে নৌকাযোগে ধরত্রোতা ধলেশ্বরী বন্দে আনয়ন পূর্বক ৭০ জন অশুচিবর্গ সহ জলমগ্ন করিয়া দেয় (৬)। এইরূপে আলিবর্দি, নওয়াজিস ও সিরাজের বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

হোসেন কুলি ও সুরফরাজের বংশধরণ কোম্পানীর হস্তে দেওয়ানীভার অর্পিত হওয়ার পরেও বন্দী ভাবে জিজিরায় প্রাসাদেই অবস্থান করিতেছিলেন (৭)। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে লর্ড ক্লাইব তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন এবং বার্ষিক মং ৩৪ ৭৫৫ টাকা পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। টেইলার সাহেবে যে সময়ে ঢাকার ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তখনও উহাদের বংশধরণ ইংরেজ প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিয়া আসিতে ছিলেন (৮)।

(৩) See Orme's Indushtan Vol II. Pp. & Selections from the unpublished Records of Govt; 478. Causes of the Deposition of Mirjaffer.

(৪) Translation of Seir Mutaqherin Vol II. & Long's unpublished Records.

(৫) Seir muteqherin Vol II. Pp. 368.

(৬) Long's selections from the Records of Govt of India. (৭) Dr. Taylor's Topography of Dacca. (৮) Ibid.

ডাকার নিজামত হইতেই উহারা বাসহারা প্রাপ্ত হইতেন । নিম্নে জিজিয়ার রাজপ্রাসাদস্থিত বন্দী বর্ণের পরিচয় প্রকৃতি প্রদত্ত হইল (১) ।

| বন্দীগণের নাম | পরিচয় | কোন সনে বন্দী হয় | কাহা কর্তৃক বন্দী | বাসহারা । |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| ১। হাফেজউল্লাহ | সরফবাজ খাঁর তনয় | ১৭৪৪ | আলিবর্দি খাঁ | ১০০/ |
| ২। ... | হাফেজউল্লাহর জননী | " | " | ২০/ |
| ৩। ... | হাফেজউল্লাহর ভগ্নি | " | " | ৫০/ |
| ৪। মুদরেণা বেগম | হাফেজউল্লাহর তনয়া | " | " | ১৫/ |
| ৫। ভালুবেগম | হাফেজউল্লাহর মহিষী | " | " | ৫০/ |
| ৬। শুরুরুল্লা খাঁ | সরফরাজের অগ্রতম তনয় | " | " | ৫০০/ |
| ৭। মির্জা মোগল | ঐ ... | " | " | ৮০/ |
| ৮। ... | মির্জামোগল জননী | " | " | ২০/ |
| ৯। মীর জুই | সরফরাজের অগ্রতম পুত্র | " | " | ৮০/ |
| ১০। ... | ঐ মাতা | " | " | ২০/ |
| ১১। মির্জা বুর হেণ | সরফরাজের অগ্রতম পুত্র | " | " | ৮০/ |
| ১২। ... | ঐ মাতা | " | " | ২০/ |
| ১৩। ... | ঐ ভগ্নী | " | " | ৩০/ |
| ১৪। ১৫। ... | আগামীজ্জার জননী ও সরফ রাজের জনৈক পুত্র } | " | " | ২০/ |
| ১৬। ... | আগামীজ্জার স্ত্রী | " | " | ৮০/ |
| ১৭। মীর আসাদ | সরফরাজের জামাতা | " | " | ৮০/ |
| ১৮। নাজিবুল্লোছা | মির আসাদের দ্বিতী | " | " | ২৫/ |
| ১৯। কারসোমনলোছা | ঐ ... | " | " | ২৫/ |
| ২০। মতি বেগম | সরফরাজনন্দিনী ... | " | " | ৫০/ |
| ২১। আসিজ বেগম | ঐ ... | " | " | ৫০/ |
| ২২। মোতিম বেগম | ঐ ... | " | " | ৩০/ |
| ২৩। বিবি উকিয়ৎ | সরফ রাজের স্ত্রী ... | " | " | ২০/ |
| ২৪। ... | সরফরাজের ভ্রাতৃপুত্র শুজনকা হোসেনখাঁর মাতা } | " | " | ২০/ |
| ২৫। সাংলি বেগম | শুজনকা হোসেনখাঁর স্ত্রী | " | " | ১৮০/ |
| ২৬। জেনারৎ দাস | সকৎ জজের পুত্র | ১৭৫৫ | সিরাজদৌলা | ১০০/ |
| ২৭। সৈয়দীনমহম্মদ খাঁ | " | " | " | ১০০/ |
| ২৮। মির্জা জুলা | " | " | " | ৮০/ |

ভার ১৩১১

| বন্দীগণের নাম। | পরিচয় | কোন সনে বন্দী হয় | কাহা কর্তৃক বন্দী | মাসহারা |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| ২৯। মিজাঁমেগলু | " | " | " | ৮০৭ |
| ৩০। মিজাঁভোলা | " | " | " | ৮০৭ |
| ৩১। বুলিবেগম | সকৎজঙ্গ হুহিতা | " | " | ৮০৭ |
| ৩২। বুলিজি | হোসেনকুলিখার স্ত্রী | ১৭৫৬ | " | ১০০৭ |
| ৩৩। উজ্জয়ন্তেছা | ঐ | " | " | ৩৬০৭ |
| ৩৪। সাহেবজী | সকৎজঙ্গবহিবী | " | " | ৮০০৭ |
| ৩৫। সীতারাম উকীল | সরাইএর জনৈক খোজার প্রতিভু | " | " | ১৫৭ |
| ৩৬। উম্মুল্লুয়েছা | সিরাজদৌলার কন্যা | ১৭৫৭ | মিরজাফর | ৫০০৭ |
| ৩৭। লুৎফুল্লুয়েছা | ঐ | " | " | ১০০৭ |

(লুৎফুল্লুয়েছা ও লুৎফুল্লুয়েছা স্বভঙ্গ দুইজন ছিলেন ।)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় ।

(০)

শেষ কথা

শেষ কথাটি যাইব লিখে ।

মন্ত্র কব কানে কানে

আমার দুঃখিনী এ পৃথিবীকে ।

বখন আমার মৃত্যু হবে,

প্রভাত-রবি উঠবে নভে,

বিহবেরি শুভ্র হবে

জাগবে ধরা দিকে দিকে,—

রবির বুকে আমার কথা

ভাঙ্গবে নিশা-নীরবতা,

শুভ্র, নব উজ্জলতা

খুলবে বহু আকাশটিকে !

নয় সে বেদ নয় পুরাণ,

নয় সে কাব্য গ্রাণ কুড়ান,

দেশ বিদেশে নয় কুড়ান,

যনে রাখিনি, তা শিখে শিখে ।

কোন কথাটি জানি না সে,

আত্মা মাঝে পরকাশে,

নিজা-ঘোরে স্বপ্ন-ভাষে

পাই যেন সে সত্যটিকে !

নবীন উষার দীপ্তালোকে

লিখ'ব তাহা অরুণ বুকে,—

উষোধিব নরলোকে

অক্ষরময়ী ভারতীকে ।

প্রাণের কথা লিখার আগে

দংশে যদি মৃত্যু-নাগে,

ফিরে, পূজ'ব নব অম্বরগে

জগন্মুখি জননীকে ।

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী ।

মরীচিকা ।

(১)

যুধিকার পিতা কলিকাতার এক সওদাগরি আপিসে
অল্প বেতনে কেরানীর কাব করিতেন । যে গলির মুখে
তাদের বাড়ী, ঠিক তার পাশেই হিমাংগদের বাড়ী ।

হিমাংশুর পিতা পুলিশ কোর্টের উকীল। হিমাংশু কলেজে পড়ে। যুথিকা নভেলের নায়িকা হওয়ার উপযুক্ত রূপসী ও অরই, মাসিক কাগজের ছোট গল্পের চলন-সই রকমের নায়িকা হওয়ার যোগ্য পাত্রী কি না সে বিষয়েও বিস্তর যত্নবোধ ছিল। অতি সংক্ষেপে তার রূপের বর্ণনা শেষ করিয়া দিতে হইলে এইমাত্র বলা যায় যে, তার চেহারার মধ্যে এমন একটা কোমলতা ছিল, যা' দেখিলে খালি মনে হয়,—আহা! আবে এক বার দেখি! সমস্ত শিশুকাল ধরিয়া হিমাংশু ও যুথিকাতে অবাধ দেখা সাক্ষাৎ চলিয়া আসিতেছে। শৈশবের সঙ্কোচহীন আনন্দ-ধারায় তারা দু'জনে এক সঙ্গে কত দিন কত কাগজের নৌকা ভাসাইয়া খেলা করিয়াছে। হিমাংশু যুথিকার অনধিগম্য পরী-রাজা হইতে অনেক উদ্ভট সংবাদ আহরণ করিয়া দিয়াছে, সে সমুদয় খবর স্বয়ং বেরণ রয়টারও জানেন না। যুথিকাও তার কাকা বাবুর টিয়া পাখীটায় দেখা-বুলিগুলির রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া, “তার সর্ব সর্ব রক্ষিত” পেণ্ডা মেনি গিরাবটা চব্বয় বিপ্লোব কবি।। নিজের খাস তহবিল হইতেও হিমাংশুকে আনন্দ বিতরণ করিতে কোন দিনও কসুর করে নাট। অ’চ. এই অবাধ মিলা-মিশার মধ্যে কোথাও কোনও দিন গোল বাধে নাট। কারণ, যে অশরীরী দেবতা হৃদয়ে হৃদয়ে ফুল-ফুলের সাকো বাধিয়া, আকাশে, বাতানে, তাব য চাঁদে অনায়াসে ছড়িয়া খেলা করিতে ভালবাসেন, তাঁর সঙ্গে তাদের তখনো দেখা হয় নাট।

এক দিন ফাল্গুনের শেষ রাত্রিতে হিমাংশু স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়া একেবাবে বিছানায় বসিয়া পড়িল। কেরোসিনের বাতির শিখাটি খুব নাচু করিয়া দেওয়াতে, দেয়ালের নীচের অংশটাতে আলো খুব স্নান হইয়া পড়িয়াছে; আর উপরের অংশ অন্ধকার; দীপ-শিখার কম্পনে কম্পনে, চারদিকের দেয়ালে নিঃশব্দ নুপুরে নৃত্য করিতেছে,। খোলা জানালা দিয়া দক্ষিণের মুহু বাতাস ঘরে প্রবেশ করিয়া হিমাংশুর বালিসেব কালর চূষন করিতেই তার স্বপ্ন মণ্ডিত শব্দার মন্দির-স্পর্শে যেন

একেবারে অবশ হইয়া পড়িতেছিল। জ্যোৎস্না তখন বাল-বিধবার চিরনিরহিত কপোলের মত স্নান—বাহিরের জগৎটাও যেন কুহেলীমাখা স্নান জ্যোৎস্নার মাঝে নুতন কবির অক্ষুট কল্পনার সহিত জড়িত হইয়া গিয়া, ঋণিকটা সত্য, বাকীটা অসত্য হইয়া উঠিয়াছে।

হিমাংশু উঠিয়া বসিয়া রহিল; বাকী রাতটা ভাকে বসিয়াই কাটাতে হইল। ঘুম-ঘোরে আজ যে স্বপ্ন স্বপ্ন তাহাকে দেখা দিয়াছে, জাগিয়াও যেন সে আজ সেই স্বপ্নই দেখিতে লাগিল। তার বারে বারে মনে হইতে লাগিল, যেন আজ তার স্বপ্নের সঙ্গে জ্যোৎস্না কেমন কড়াইয়া গিয়াছে, জ্যোৎস্না যেন ফুল-রেণুতে তার হইয়া উঠিয়াছে। কোকিলের মত ঝঙ্কার আজ দিগন্ত প্রাবিত করিয়া কোন অকূলের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে।

‘হিমাংশুর বাবে বারে গরখা চিরিয়া মনে পড়িতে লাগিল; সে যেন কারে ভালবাসে! সে যেন জন্মজন্মান্তরের অনাদি অনন্ত ভালবাসা। যেমন করিয়া পুত্র কন্দন, চাকের তুলা, পাতা ঘেরা ছায়া-নীতল নীড়ের ডিমগুলির মাঝে গমাইয়া থাকে, তাব ভালবাসাও যেন এত দিন কি এক রহস্যের নীড়ে লুপ্ত ছিল! আজ এক অদৃশ্য দেবতা গম ঘোরে আসিয়া তার লুপ্ত সঙ্গীকে যুথ-পিত করিয়া দিয়াছেন। সমুদয় প্রকৃতি যেন আজ তার সেই রাগিণীর সুরে বাধা! হিমাংশু হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে অদৃশ্য কারন সে ভালবাসে! এ স্বপ্ন নয়, মতিভ্রম নয়, সে যেন সত্য সত্যই ভালবাসে! কিন্তু কাহাকে? —তার হৃদয় লক্ষীকে?

সহসা প্রতিধ্বনির নিকট হিমাংশু এ প্রশ্নের কোনও জবাব পাইল না।। নিজের নাতিতে যুগমল রাধিয়া গন্ধে পাগল হইয়া, তাহারই সন্ধানে কস্তুরী যুগ যেমন সারা বনভূমিতে ছুটাছুটি করে, হিমাংশুও সেইরূপ “কাহাকে” “কাহাকে” বলিয়া বাকী রাতটা অন্তরের আনন্দ-তরল মত্ততার মাঝে আপন হৃদয় লক্ষীকে খুঁজিয়া ফিরিল। অবশেষে প্রভাতে যখন নিশীথের মৃদুহীন ছায়া-জগৎ নুতন আলোকে সত্যরূপে ফুটিয়া উঠিল, তখন হিমাংশু

ভাষ্য ১০১১

দেখিল তার হৃদয়ের নারিক। উবার শিশির-সিক্ত সজল
কিরণে পুষ্প-স্নান করিয়া, মূর্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে, সে
যুধিকা!

প্রেম-বুদ্ধে—যঃ পলায়তে, স জীবতি। হিমাংশু সে
নীতি জাতি না। তাই সে স্বেচ্ছায় আপনার জালে
আপনি বন্দী হইল।

মেঘের গর্জনে বৈতর্য্য মণির রত্ন-শলাকা যেমন ভূমি-
তল হইতে ফুটিয়া বাহির হয়. সেইরূপ হিমাংশুর প্রেম-
বিহ্বল হৃদয়ের সাড়া পাইয়া যুধিকাও তার সমুদয় হৃদয়
খানিকে পুষ্পাজলির মত তার প্রণয় দেবতার মুখে, চক্ষে,
বক্ষে, চরণতলে আচ্ছন্ন করিয়া দিল, ইহাই নারীর সর্ব-
শ্রেষ্ঠ দান, ইহাই পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। প্রেমে যদি
এত মোহ না থাকিত, তবে বুঝি এ পৃথিবী এমন সুন্দর
হইত না।

জ্যেষ্ঠ মাসের শেষ। সারা আকাশটা সাদা মেঘের
একখানি উজ্জল বাষ্প-স্তরে ঢাকা। রৌদ্রের কিরণ লাগিয়া
তাহা গালা চাঁদির মত বকমক করিতেছে। সহরে
কাক, পাড়ার ছুঁই ছেলে—এমন কি ফেরিওয়ালার অদম্য
উৎসাহ পর্য্যন্ত যেন আজ দুপুরের রোদে তাতিয়া উঠিয়া
সর্বশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুধিকাদের বাড়ীর
সকলে কালীঘাটে গিয়াছেন। যুধিকার কালীঘাট
বাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কারণ তখন তার তীর্থ নিজ
অন্তরের মাঝে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।
“বড় গা বমি বমি কচ্ছে” এই মিছা সাক্ষী দিয়া সে এ
যাত্রা কালীঘাটে বাওয়ার দায় হইতে খালাস পাইল।
হিমাংশু আজ সারাটা প্রাতঃকাল ধরিয়া একটা মতলব
আঁটিয়াছে। আজ দৈব স্বয়ং “লাইন ক্লিয়ার” দিয়া তার
মতলবের প্রতিকূল সমুদয় রিয় একেবারে কালীঘাট নিয়া
ফেলিয়াছেন।

এমন সময় ভগবান মীনকেতু তাঁর প্রেমের ধনুকে
পঞ্চ ফুলের বাণ আরোপিত করিলেন; তাই হিমাংশু
মাথার তেল মাখিতে মাখিতে তাদের ছাদে আসিয়া
উপস্থিত; যুধিকাও ছোট খোকার একটা পেনি শুকা-

ইতে দিবার ক্ষমতা তাদের ছাদে আসিয়া হারিল। মেঘখ্য
হইতে দেবতা ফুল-ধর ত্যাগ করিলেন, অমনি চারি চক্রে
মিলন হইল। হিমাংশু যুদ্ধের মত যুধিকাকে হাতের
ইসারায় কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিল, যুধিকাও তপো-
বনের মৃগীটির মত যদিয়ারত নয়নে তাদের ছাদের আলি-
সার কাছে, হিমাংশুর দিকে অগ্রসর হইল। দুজনে
মুখামুখী করিয়া দাঁড়াইল। ভগবান স্বর্ঘ্যদেব সাক্ষী।
আবার চারি চক্রে মিলন হইল। নীল চুলের চেউয়ের
মাঝে যুধিকার তখনকার মুখখানি দেখিলে যমুনার
ভেসে-যাওয়া রক্তপদ্মের কথা মনে পড়ে—লজ্জায় যেন দুই
গালে দুটি পার্কতা ডালিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিমাংশু
ধীরে ধীরে প্রাণ তরা গাঢ় স্বরে ডাকিল—“যুধি!” অনন্ত
আকাশের উদারতা তখন হিমাংশুর মুখ নয়নে মাখানো।
তার যা কিছু বলিবার, যা কিছু দিবার, যা কিছু চাহিবার
সব যেন ঐ ডাকের ভিতরে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। যুধিকা
চুপ করিয়া রহিল। এমন ডাকের উত্তর কি আছে?
কিছুকণ চুপ করিয়া থাকার পর হিমাংশু কয়েক বার
টোক গিলিয়া বলিল—“তুমি যদি বল, তবে কথাটা
তোমার বাবার কাছে পাড়ি!” কোন কথা, হিমাংশু
তাহা ভাবিয়া বলে নাই। ভাবিয়া বলার তত আশঙ্কও
ছিল না। হিমাংশু আবার বলিল, “আমি কিন্তু সে
দিন সত্যি সত্যি স্বপ্নে দেখেছি তোমাতে আমাতে বে’
হ’য়ে গেছে। ‘আপন লজ্জার মাঝে ‘ন যযৌ ন তসৌ’
অবস্থায় দাঁড়াইয়া যুধিকা কেবল বারে বারে লাল হইতে
ছিল, এমন সময় দৈব তাহার প্রতি অশ্রুফুল হইলেন।
কালীঘাটের ফেরত। গাড়ী বড় বড় করিয়া দরজার সামনে
আসিয়া দাঁড়াইল। অমনি যুধিকা বলিয়া উঠিল, “ঐ যা না
বৌ-দিদি সবাই এসে পড়েছে যে, আমি বাই এখন?”
এই বলিয়াই প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পীঠের উপর
নীল চুলের তরঙ্গ তুলিয়া যুধিকা ছুটিয়া পালাইল।

হিমাংশু ধীরে ধীরে গর্জিত পাদবিক্ষেপে নবীন
বিজয়ী সেনাপতির মত নীচে নামিয়া গেল—সে যেন
ওয়াটারলুর যুদ্ধ জয় করিয়া বাড়ী কিরিতেছে।

কলিকাতা সহরে যদি ছাদে যাবার সিঁড়ী না থাকিত তবে না জানি কটি প্রেমের কি দুর্গতিই ঘটিত !

হিমাংশু ঘরে আসিয়া ডাবিল মনসিজের আসল বাপার খানা যেরূপ নিষ্কিয়ে স্তম্ভপন্ন হইয়া গেল, তাহাতে প্রজ্ঞাপতি ঠাকুর যে কোন গোল পাকাইয়া তুলিতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও তার মনে উদয় হইল না ! সে এবার মেডিকেল কলেজের ফাইনেল পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে । আর ছয় সপ্তাহ কাল পরেই পরীক্ষার ফল বাহির হইবে । এল. এম. এদ উপাধির সেজ লাগাইয়া উপাধীনকম হইয়া যুধিকার জন্ত তাহার পিতার নিকট আবেদন করিলে, তিনি তার প্রার্থনা নামঞ্জুর করিবেন না, এমনি মনে হইল ।

হিমাংশুর কাকা বাকীপুরের টকীল । ইতিমধ্যে তাঁর নিকট হইতে বাকীপুর যাওয়ার নিমন্ত্রণ আসিল । এক দিন তারকালোকিত সন্ধ্যায় যুধিকার নিকট ছাদে সাত দিনের “কেসুয়েল সিভ” লইয়া, হিমাংশু বাকীপুর রওনা হইয়া গেল ।

অপ্রত্যাশিতের হাত কেহ এড়াইতে পারে না । বাকীপুরে পাঁচ দিন যাঠিতে না যাঠিতেই হিমাংশুর কাকা অরে পড়িলেন । দেখিতে দেখিতে অবল নিউমোনিয়া দেখা দিল । তাঁহাকে আরাম না করিয়া ত আর হিমাংশু চলিয়া আসিতে পারে না, বিশেষতঃ সে নিজে যখন একজন ডাক্তার । তাঁর ভাল করিয়া সারিতে ছয় সপ্তাহ পার হইয়া গেল ।

এক দিন বিকাল বেলায় হিমাংশু কাক বাবুর ঘরের বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসিয়া আশার ফুলে বিনা স্ততার হার গাঁথিতে ছিল, স্বপ্ন-লক্ষ্যের জন্ত । এমন সময় ডাকে সে মায়ের চিঠি পাইল । সে ত চিঠি নয়, সে বেন তার মৃত্যুর ওয়ারেন্ট ! পত্রের শেষ ভাগে মা এক যায়গায় দুই লাইনে লিখিয়াছেন যে, গত পরশু রাত্রিতে যুধিকার সহিত সুলকার এবং ততোধিক সুলবুদ্ধি এক জমিদারের পুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে ।

বহুর্ভের ভূমিকম্পে তার বড় সাথের মিণার ধ্বংস হইয়া গেল ।

পরদিন প্রাতে তারে খবর আসিল হিমাংশু এল, এম এদ পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত পাশ হইয়াছে ।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ শর্মা ।

ইতিহাস-বিজ্ঞান এবং মানব জাতির আশা *

বঙ্গীয় জাতীয় বিজ্ঞানসভার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম. এ. প্রণীত. লঙ্গম্যানস্, গ্রীন কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত । পুস্তিকা পানা ইংরেজী ভাষায় লিখিত । গ্রন্থকারের অন্যতম পুস্তক ‘ঐতিহাসিক প্রবন্ধ’ এই পুস্তিকার এক বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে ।

বিনয় বাবু সকলের নিকটই সুপরিচিত । তাঁহার উত্তমশীলতা বিশেষ প্রশংসনীয় । তিনি শিক্ষার উন্নতি বিধান কল্পে সারা জীবন ব্যাপী ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন । এবং তাহার ফলে ‘শিক্ষা-বিজ্ঞান’ নামক বিশ খণ্ডে সমাপ্ত এক নিরাট গ্রন্থ রচনায় প্রয়ত হইয়াছেন । আমাদের যেরূপ উত্তম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় তাহাতে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, এক জনের দ্বারা এরূপ বিরাট ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারিবে না । কিন্তু ইতিমধ্যেই উহার দশ খণ্ড প্রকাশিত হইয়া আমাদের সমস্ত আশঙ্কাদি দূরীভূত করিয়া দিয়াছে । কিন্তু এখানেই তাঁহার উত্তম শীলতার শেষ হয় নাই । তিনি আবার বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টিবিধানরূপে অপর এক গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । ঐ কার্য সম্পাদন দেশের সকলের সাহায্য সাপেক্ষ । কিন্তু তথাপি তিনি এখন উহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন ভরসা হয় ঐ কার্যও উপযুক্তরূপে সম্পাদিত হইবে । আলোচ্য গ্রন্থ ও ‘ঐতিহাসিক প্রবন্ধ’

ভাদ্র ১৩১১

তাহার উত্তমশীলতার অত্যন্ত নিদর্শন। বাঙ্গালীর
একুপ উত্তমশীলতা সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

আজকাল ইতিহাস রচনার দিকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর
মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ইতি মধ্যেই মৌলিক গবে-
ষণা পূর্ণ কতিপয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত ও
প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত ইতিহাস
বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। এ অব-
স্থায় বিনয় বাবুর এই উৎকৃষ্ট চিন্তাশীল গ্রন্থ যে নিত্য
সম্বোধনযোগী হইয়াছে সে বিষয়ে আর কিছু মাত্র সন্দেহ
নাই।

ইতিহাসকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করিয়া তাহার
প্রত্যেক শাখা স্বতন্ত্ররূপে আলোচিত হইতে পারে। কিন্তু
যে রূপে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা এবং আলোচনা ও
বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইতে কতকগুলি সাধারণ
প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কৃত হইতে পারে তদ্রূপ বিভিন্ন
ঐতিহাসিক ঘটনা একত্রে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া
তাহা হইতেও কতকগুলি মূলতত্ত্ব নিষ্কাশিত হইতে পারে,
ইহাই ইতিহাসবিজ্ঞানের কার্য। ইতিহাসকে সমগ্র
ভাবে আলোচনা না করিলে এই কার্য সম্পন্ন হইতে
পারে না। ইতিহাসবিজ্ঞান রচনা করিতে হইলে ইতি-
হাসের প্রত্যেক শাখা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা না করিয়া
ইতিহাসকে সমগ্রভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

কিন্তু ইতিহাসকে নানাদিক হইতে সমগ্র ভাবে
আলোচনা করা যাইতে পারে। কোন কোন ইউরোপীয়
পণ্ডিত কর্তৃক দর্শন শাস্ত্রের দিক হইতে ইতিহাস
আলোচিত হইয়াছে। বিনয় বাবু প্রাণ-বিজ্ঞানের দিক
হইতে ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন
সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসবিজ্ঞান উভয়েরই ভিত্তি প্রাণ-
বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসকে প্রাণ-বিজ্ঞানের
সুদৃঢ় ভূমিতে স্থাপন করিলেই ইতিহাস আলোচনা হইতে
আমরা মানবের উন্নতির সহিত সমাজের অভিযুক্তি এবং
সভ্যতার ক্রম বিকাশ সম্পর্কীয় মূলতত্ত্ব গুলি লাভ করিতে
পারিব।

এই ধানেই গ্রন্থের অভিনবত্ব। এই অভিনব প্রণা-
লীতে ইতিহাস আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার কয়েকটি
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ কোন এক জাতির
উন্নতি বা অবনতি বা কোন কার্য কেবল মাত্র সেই
জাতির স্বতন্ত্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে না, উহা ভগতের
অত্যাচার জাতির সর্ববিধ আন্দোলনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
বিভিন্ন জাতির পরস্পর সংগ্রাম ও সংঘর্ষণ দ্বারা প্রত্যেক
জাতির প্রকৃতি গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে
এইরূপ পরস্পর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন আকার
ধারণ করে এবং তদ্বারা বিভিন্ন প্রকারের জাতীয় চরিত্রের
সৃষ্টি হয়। তৃতীয়তঃ, মানব সমাজের বা চরিত্রের এই
সমস্ত অভিযুক্তির আকার ও মত্বনিহিত ভাব স্থায়ী নহে,
পরিবর্তনশীল। ভগতের অবস্থার পরিবর্তনের সহিত
উহাদের পরিবর্তন হয়। পরিশেষে গ্রন্থকার বলেন যে,
পারিপার্শ্বিক ভাব ও শক্তি সমূহই এবং বিভিন্ন জাতিগুলির
পরস্পর সংঘর্ষণই প্রত্যেক জাতির চরিত্র গঠন করিয়া
দিলেও জাতীয় জীবন গঠনে পুরুষকারের স্থান আছে।
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রতি-
কুল পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলিকে স্ব স্ব জাতীয় জীবনের
অনুকূল করিয়া জাতীয় জীবনের অচিন্ত্যপূর্ণ
পরিবর্তন ও নৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। এইপ্রকার
মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় বলিয়াই মানব জাতির
নৈরাশোর কোন কারণ নাই।

এই সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মতবৈধ হওয়ার কোন
কারণ নাই। তবে এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে,
গ্রন্থকারের আলোচনা প্রণালী নূতন হইলেও তাহার
সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিই যে একেবারে নূতন এরূপ বোধ হয়
না। আমাদের যেন মনে হয় যে, প্রাণ-বিজ্ঞানের
সাহায্য ব্যতীত ও ঐতিহাসিক ঘটনা পরস্পর পর্যালোচনা
করিয়া এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়।
জাতীয় জীবন গঠনে মহাপুরুষের স্থান সন্দেহে গ্রন্থকার
যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত প্রাণ-বিজ্ঞানের যে সন্দেহ
নাই তাহা আলোচ্য গ্রন্থেই অস্বীকৃত হইয়াছে। কারণ,

নবম অধ্যায়ের প্রথমেই গ্রহকার বলিয়াছেন যে, মানব-সমাজের সহিত ইতর জীবের একটা পার্থক্য আছে। পারিপার্শ্বিক প্রভূতির প্রভাবে জীব গঠিত ও পরিপুষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের উপর প্রভাব বিস্তার ও তাহা পরিবর্তন করিয়া লইবার ক্ষমতা একমাত্র মানবেরই আছে, ইতর জীবের নাই। প্রাণ-বিজ্ঞানের সহিত মানব ইতিহাসের পার্থক্য এই স্থানে। কার্লাইল প্রভৃতি মনস্বীগণ ও প্রাণ-বিজ্ঞানের দিক হইতে ইতিহাস আলোচনা না করিয়াও এই সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তবে বিনয় বাবু মানব সমাজের উন্নতি বা পরিণতি একমাত্র মহাপুরুষের উপরই যে নির্ভর করে তাহা স্বীকার করেন না। মানব সমাজের উপর পারিপার্শ্বিক প্রভূতিরও একটা প্রভাব আছে। দ্বিতীয় হইতে সপ্তম অধ্যায়ে গ্রহকার তাহা সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক Guizot সভ্যতার ক্রম-বিকাশ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া প্রতিষ্ঠান (institution) এবং ব্যক্তি, উভয়েরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। বিনয়বাবু প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে পারিপার্শ্বিক প্রভূতির উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ প্রতিষ্ঠানগুলিও যে পারিপার্শ্বিকের ফল। জাতীয় জীবন গঠনে মহাপুরুষদিগের প্রভাব সম্পর্কে মিল বলিয়াছেন, “মহা শক্তিশালী শাসনকর্তাও তাঁহার স্বীয় আদর্শ অনুসারে জগৎ গড়িয়া তুলিতে পারে না। সমাজে (ভাব এবং কর্মের) যে স্বাভাবিক স্রোত বহিয়াছে তাঁহাকে কতকটা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে হয়। সুদক্ষ কর্ণধারও প্রতিকূল বায়ুর বিরুদ্ধে গমন করিতে অক্ষম বটে কিন্তু তথাপি সুদক্ষ কর্ণধার থাকা ও না থাকার মধ্যে প্রভেদ অনেক। শার্লমেন জন্ম গ্রহণ না করিলে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলতা কত দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইত তাহা কে বলিতে পারে?” (J. S. Mill's Disertation and Discussion VOL II pp 255) বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়াও উভয়ে একই সিদ্ধান্তে

উপনীত হইয়াছেন। তবে মিল প্রাণ-বিজ্ঞানের ভাষা ব্যবহার করেন নাই; এই যা পার্থক্য।

গ্রহকারের অপরোপরি সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে যে, সিদ্ধান্তগুলি সত্য বটে কিন্তু প্রাণ-বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীতও তাহাদিগের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বিভিন্ন সভ্যতার যাত-প্রতি-যাতের দ্বারা যে প্রত্যকেরই পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা ইতিহাস সহজ ভাবে আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়। কোন এক জাতির উন্নতি ও অবনতি যে কেবল মাত্র সেই জাতির স্বতন্ত্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে না তাহাও ঠিক। জাপানের অভ্যুত্থান যে কেবল জাপানীগণের চেষ্টা ও বীরত্বের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা কোন ঐতিহাসিকই—তিনি প্রাণ-বিজ্ঞান মানুন আর নাই মানুন—স্বীকার করিবেন না। যদি চীন দুর্বল না হইত, যদি কোরিয়ার শোচনীয় অধঃপতন না হইত, যদি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যার ভাব না থাকিত, তবে জাপানের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইত। আবার ইহাও ঠিক যে, জাপানের অভ্যুত্থান, ইউরোপ কর্তৃক সমগ্র এশিয়াখণ্ড গ্রাস করিবার চেষ্টার একটি প্রতিক্রিয়া। এইরূপ অসুস্থ এবং প্রতিকূল অবস্থায় (প্রাণ-বিজ্ঞানের ভাষায়, পারিপার্শ্বিকের) কলেই জাপানের অভ্যুত্থান সংঘটিত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ঐতিহাসিক ঘটনা আলোচনা করিয়াও উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়; প্রাণ-বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু অপর পক্ষে একথা বলাও আবশ্যক যে, নূতন প্রণালীতে আলোচিত হইলে পুরাতন সিদ্ধান্তও নূতন অর্থসম্বিত হয়। যেমন কোন পদার্থকে চিরাত্যন্ত দিক হইতে না দেখিয়া নূতন দিক হইতে দেখিলে তাহা নূতন বলিয়া বোধ হয়, তাহার অনেক অজ্ঞাত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। যাহা পূর্বে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ছিল, বিনয়বাবুর আলোচনার কলে

তাঁহা স্পষ্টতঃ এবং সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিনয়বাবু যে অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব সে কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। আমাদের দেশে ইতিহাসের আলোচনাই হইয়াছে কম। যতটুকু আলোচিত হইয়াছে তাহাতে যে এই অভিনব প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

এই অভিনব প্রণালীতে ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে বলিয়াই এই পুস্তক ইংরেজী ভাষায়ও প্রকাশিত হইবার যোগ্য হইয়াছে। বাকালীর মস্তিষ্ক অভিনব ক্ষেত্রে ও অভিনব বিষয়ে প্রধাবিত হইয়াছে দেখিয়া সমস্ত বাকালীরই আনন্দিত হইবার কথা। বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধা দেশে বৃদ্ধি পাইতেছে, সুখের কথা। কিন্তু জ্ঞানের প্রকৃত মাফলাই তাহার প্রয়োগে। অধ্যয়ন-লব্ধ জ্ঞানের যদি উপযুক্ত প্রয়োগ না হয় তবে তাহা হরকটানিবদ্ধ গঙ্গার মত জনসমাজের উপকারে আসে না। বঙ্গদেশে পাণ্ডিত্যের উপযুক্ত প্রয়োগের অভাব অধিক। শ্রীযুক্তবিনয়কুমার সরকার প্রমুখ ইতিপূর্ব কৃতবিদ্বৎ মনস্বী লেখক কর্তৃকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াতে আশা হয় যে, বাকালীর মস্তিষ্ক অনুর্ধ্বের বলিয়া যে অপবাদ আছে তাহা অচিরেই বিদূরিত হইবে।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

পল্লী মা

(১)

শস্ত-হরিৎ ক্ষেত্রে সেধায়,

মুক্ত বায়ুর সঙ্গে,

লক্ষ্মী রাণীর স্বর্ণ আঁচল

চক্ষে নাচায় রঙ্গে।

সিঁড়-সবুজ দুর্গা তাঁহার

চিত্র-পটের দৃশ্য ;

বৃক্ষ নিকর শত্রু-ছারায়

রক্ষে তাঁহার দিক্ কায়ার ;

দুঃখে সেধায় শক্তি হারায়

তল্ল প্রথর গ্রীষ্ম !

(২)

অঙ্গে তাঁহার বর্ণ-মধুর

স্বর্ণ-লতার সজ্জা,

সূর্য্য-কিরণ বর্ষে সেধায়

হর্ষ, সোহাগ, লজ্জা !

যত্ন-বিহীন কুঞ্জে তাঁহার

রত্ন বালার কান্তি,

—বর্ণ ভূষণ গন্ধে বাহার

স্বর্ণ জাগায় মর্ত্য-মাঝার—

মৃদ্ধ, বিভোর দৃষ্টি-আধার,

চিন্তে পুলক, শান্তি !

(৩)

ছন্দ-মুগ্ধর ভক্ত বিমান

বন্দে তাঁহার নিত্য,

রাতি-দিবস রাগে তাঁহার

রক্ত-রসের নৃত্য !

চন্দ্র-কিরণ-স্পর্শে সেধায়,

স্বপ্ন-মোহের সৃষ্টি !

জ্যোৎস্না রাণীর হস্ত-ধারায়,

চিত্ত সেধায় বিধে হারায়.

ভৃগু-ছায়ায় সৃষ্টি দাঁড়ায়.

তল্লা-বিবশ দৃষ্টি !

(৪)

সুদ্র হৃদয় শুক আমার,

পল্লী মা, তোর বক্ষে,

শান্তি-সুধার পুণ্য ধারায়

প্রজ্ঞা গড়ায় চক্ষে !

লব-অভাব-দৈন্তে মা তুই,

শক্তি, অশ্রু-দুর্গ ;

তত্ত্ব হৃদয়, স্পর্শে বা তোর,
শান্ত, শীতল, ভক্তি-বিভোর ;
স্বর্গ কোথায়? মর্ত্যে যে ঘোর

পল্লী বা তুই স্বর্গ।

শ্রীমৎস্বামী নাথ চৌধুরী।

কাছাড়ীর ধর্ম *

এক কথায় কাছাড়ীর ধর্ম আতঙ্ক বা ভয়ের ধর্ম, প্রেমের ধর্ম নয়। কাছাড়ী কোনও মূর্তি পূজা করে না। বা পূজার জন্য তাহাদের কোনও নির্দিষ্ট মন্দির নাই। কাছাড়ীর বিশ্বাস ভূ-পৃষ্ঠে, আকাশে, বাতাসে মোদাই নামে অসংখ্য অদৃশ্য শরীরী জীব বিচরণ করে, এবং এই সকল ভূত-যোনি লোকের অনিষ্টাচরণ করিতে সদাই প্রস্তুত। হৃদয়ে ভূত-ভয়ের বহুমূল সংস্কার কাছাড়ীর আধ্যাত্মিক উন্নতির বাধক। যাহার মনে ভূত-ভয়ের মাত্রা যত দৃঢ় ও বহুমূল হইয়াছে সে ধর্ম জগতে ভূত অগ্রসর হইয়াছে। দরাজ জেলায় সাম্প্রতিক ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত কোনও কাছাড়ীকে তাহার কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিবে যে, তাহাকে মোদাইয়ে ধরেছে। সুতরাং ভূত-ভয়ই কাছাড়ীর ধর্মের প্রাণ। ভূতেরা রোগ সৃষ্টি করে, দুর্ভিক্ষ খানয়ন করে এবং ভূ-কম্প ঘটাইয়া লোকের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। চাউল, কলা, শুর্কর, কুচুট প্রভৃতি বলি প্রদান করিয়া এই সকল অপদেবতাকে ভুট ও শান্ত না রাখিলে লোকের মঙ্গল হইতে পারে না, এবং বিভিন্ন দেবতা বা ভূতের প্রীতির জন্য বিভিন্ন পূজার অমুষ্ঠান ও বিভিন্ন বলি হইয়া থাকে।

মঞ্চ নির্মাণ করিয়া আপন আপন বংশের মৃত ব্যক্তির

আত্মার উদ্দেশে কাছাড়ীরা তাহার প্রিয় খাড়াদি স্থাপন করে। গ্রামের বয়স লোক এই খাড়া স্পর্শ করে না, কিন্তু বালক-বালিকারা স্বাধাৎ এবং আত্মাদে ইহা উদরস্থ করিয়া ফেলে।

কোনও কোনও কাছাড়ী সম্প্রদায়ে প্রাকৃতিক শক্তির পূজা প্রচলিত আছে। যেমন 'বিহ' বা চৈত্র সংক্রান্তিতে পারোয়া পূজা। পারোয়া একটা সুদীর্ঘ বংশ-নৃত্য; ইহাতে নেকড়া জড়াইয়া এবং নিশান বাঁধিয়া গ্রামের বাহিরে একটা গাছের পাশে পুতিয়া বহুসংখ্যক কাছাড়ী যুবক, যুবতী, বালক, বৃদ্ধ ইহার চতুর্দিকে ঢাক বাঁধাইয়া নৃত্য করে ও আমোদে আত্মহারা হইয়া পড়ে। কেহ কেহ বলেন এই উপলক্ষে অনেক যুবক কাছাড়ী যুবতীকে লইয়া পলাইয়া যায়। অন্যান্য সপ্তাহ কাল নিরুদ্ধে মিলন-সঙ্গের পরে উভয় পক্ষের অভিভাবক বর্ণের অভিমতানুসারে পরিশেষে ইহাদের পরিণয় কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

জল কাছাড়ীর বড় পবিত্র জিনিস। জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কাছাড়ীরা সুদ নদীগুলিকে উপদেবতা এবং ব্রহ্মপুত্রকে ইহাদের জননী বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। উত্তর কাছাড় পর্বতের বড়া জাতি আজিও তাহাদিগকে, ডি-মা-স। বা নদীপুত্র নামে পরিচয় দিয়া গর্ভ অমুষ্ঠান করে। কাছাড়ীরা অধুনা প্রত্যেক ভাবে জলের পূজা না করিলেও জলের প্রতি ইহাদের ভক্তির বিন্দুযাত্র ও হ্রাস পায় নাই। ইহারা স্রোতস্বতীর তীরে শয়ন দাহ করে ও বিশেষ বিশেষ পূজার অমুষ্ঠান করিয়া থাকে।

আজকাল কাছাড়ীরা অনেক হিন্দু দেব-দেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং ইহাদের জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক দেবতার সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কাছাড়ী জাতির উপাত্ত দেবতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে—(১) পারিবারিক দেবতা ও (২) গ্রাম্য দেবতা। পারিবারিক দেবতা গৃহাভ্যন্তরে এবং গ্রাম্য দেবতা গ্রামাণ্ডের অদূরে বাশ বা বৃক্ষকূলের সমীপবর্তী স্থানে পূজিত হইয়া থাকে।

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত কাছাড় ও কাছাড়ী গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়। ভূতীয়াংশ প্রাণ সংখ্যার প্রকাশিত হইয়াছে।

পাৰিবাৰিক বা গাৰ্হস্থ্য দেবতার সংখ্যা অনূন উনিশটি এবং গ্রাম্য দেবতার সংখ্যা পঁয়ষট্টিটি। পাৰিবাৰিক দেবতার মধ্যে ক্ষমতার “কাঁটা সিদ্ধ” প্রথম ও তাঁহার পত্নী কৃষি দেবী দ্বিতীয়। “কাঁটা সিদ্ধ” বৃক্ষৰূপে আমাদের চক্ষুৰ বিষয়ীভূত হইয়া থাকেন কিন্তু তাঁহার পত্নীর কোনও প্রাকৃতিক স্বৰূপ নাই। তিনি শস্ত-সম্পদের দেবী বলিয়া কাছাড়ীৰ অতিশয় ভক্তির পাত্র। ডিম্ব কৃষি-দেবীর বড় প্রিয়। বৎসরে দুই বার ধান কাটার সময় কৃষি দেবীর পূজা হইয়া থাকে সুতরাং তিনি “আউস-দেবী” ও “শালি-দেবী” এই দুই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। “বুড়া-বাঘ-রাজা” নামে আর একটি পাৰিবাৰিক দেবতা আছে। এই দেবতার নামে কাছাড়ী আতঙ্কিত হয়। “বুড়া-বাঘ-রাজা” হিংস্র ব্যাঘ্রের সংজ্ঞা মাত্র। বাঘা বনের রাজা বলিয়া কাছাড়ীরা ইহাকে ভয় ও সন্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

কাছাড়ী যে অনেকটা হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়াছে তাহা তাহাদের উপাস্ত গ্রাম্য দেবতার নাম হইতেই উপলব্ধি হয়। কাছাড়ী গ্রাম্য দেবতা অনেক স্থলে হিন্দু দেবতার নামান্তর মাত্র, যেমন ‘বুড়া মহাদেও’, ‘বুড়া গোসাই’ ‘জল কুবেৰ’, ‘ধল কুবেৰ’ ইত্যাদি।

দৈহিক বা মানসিক শক্তিতে সাধারণ কাছাড়ী অপেক্ষা উন্নত তাহাদের কোনও কোনও পূৰ্বপুরুষ মহুয়া-লীলার অবসানের পর আপন জাপন নামে ‘অমরত্ব লাভ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, যেমন ‘শিলা রায়’ সুপ্রসিদ্ধ কোচরাজ নর নারায়ণের এক জন বিচক্ষণ সেনাপতির এই নাম ছিল। তিনিই এখন এই নামে দেবতার তালিকায় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কাছাড়ীরা বৎসরে তিনটি মাত্র উল্লেখযোগ্য পূজা করিয়া থাকে। ‘আহ’ বা ‘আত’ ধান্য কাটার পর এক বার, ‘কৰ্মা’ ধান্য কাটার পর দ্বিতীয় বার এবং শালি ধান্য কাটার পর তৃতীয় বার পূজা হয়। যে জাতি শুধু

কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন যাত্রা নিৰ্ব্বাহ করে সেই জাতির পক্ষে এইরূপ উৎসব বা পৰ্ব্বই স্বাভাবিক। পূজার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। ইহা একটা জাতীয় মিলনোৎসবের উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণে ‘জু’ সেবনের সুযোগ মাত্র।

কাছাড়ীরা পাঠা, পায়রা, পান প্রভৃতি বলি প্রদান করিয়া কলেরা দানবার (Cholera Demon) পূজা করিয়া থাকে। এই পূজার বিশেষ ময়ম মোহরজ পূজা। কখনও কখনও গ্রামের লোকেরা ফুল, ডিম ও চালের গুঁড়া ভেলার উপর সাজাইয়া নদী দেবতা কলি-মদাইয়ের উদ্দেশে নদীতে ভাগাইয়া দেয়।

এই রূপ ভেলা দেখিলেই বুঝা যায় যে, কোনও কাছাড়ী গ্রামে মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে। ‘গজি’ বা একত্র মিশ্রিত চাউল, ডাইল, পাঠা, মোরগ প্রভৃতি কোনও প্রাচীন বৃক্ষের গুঁড়িতে সাধারণতঃ দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হয়। পশু পক্ষীগুলির ছিন্ন মস্তক এই সকল বৃক্ষের গুঁড়িতে পাড়িয়া থাকে এবং কবন্ধগুলি প্রসাদ রূপে কাছাড়ীরা ভক্ষণ করিয়া থাকে। কোনও পরিবারের কর্ত্তা রোগ নিবারণের উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ এই সকল বলি প্রদান করিয়া থাকে।

কাছাড়ীদের মধ্যে পুরোহিত বলিয়া কোনও পৃথক সম্প্রদায় নাই। নেউল্লি বা নেওন্দাই নাম-ধারী গ্রাম্য মাতঙ্গরেতাই আজকাল পূজা পার্কেণে পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ নাম প্রাপ্ত হয় কিন্তু কাছাড়ীদের মধ্যে ভূত ছাড়াইবার মন্ত্রাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞ না হইলে দেউরির পুত্র দেউরি হইতে পারে না। কামরূপের প্রথা কিন্তু ভিন্নরূপ। বড়া জাতীয় কোনও বিশিষ্ট সমাজ-স্তরের ব্রাহ্মসুতাই (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ) নামক এক শাখাই এই জাতির পূজা পার্কেণে পৌরোহিত্য করে। ত্রুনা নামে আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারাও কোন কোন ধর্ম্মক্ৰিয়ায় পুরোহিত হয়। কড়ি ও শামুক সর্কদা ইহারা সঙ্গী রাখে, এবং এইগুলির সাহায্যে

লোকের প্রশ্ন ও ভবিষ্যৎ ভাণ্ডা গণনা করে; এবং গ্রামে মারীভগ উপস্থিত হইলে কোন দেবতা বা মোদাইকে কি কি বলি দারা পূজা দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইবে বলিয়া দেয়।

দেওদানী নামক স্ত্রীলোকেরা ভূতাপ্রিতা হইয়া মহামারীর পূজায় পৌরোহিত্য করে। এই জাতীয় পূজা একটু বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৪০ হাত পরিমিত বর্গক্ষেত্রের আকারে একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া ইহার উপরিভাগ হইতে বাঁস চাচিয়া ফেলা হয়; এই পরিষ্কৃত স্থানের পশ্চিম প্রান্তে বাঁশের উপর একটা কাপড়ের পরদা বাঁধা থাকে, এবং পূর্ব প্রান্তে ১৮ অঙ্গুলি চওড়া ও ৬ অঙ্গুলি উচ্চ একটা মাটির আইল বা আল প্রস্তুত হয়, এবং বনজবাঁস পাকাইয়া ৭টা কি ৯টা মনুষ্কৃতি এই আলটার উপর বসাইয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকটা মূর্তির সম্মুখে কলার খোলের উল্টা পিঠে পাঠা, পায়রা মোরগ প্রভৃতির ছিন্ন মুণ্ড স্থাপিত হয়। ইহাদের সঙ্গে নুন, কলা, আক, 'গজি' প্রভৃতি রক্ত-প্রোক্ষিত অন্যান্য উপকরণও মিশ্রিত থাকে। এই সময়ে মুক্তকুন্ডলা, ডাকিনী-মূর্তি দেওদানী ললাটে সিন্দুর লেপিয়া ও একটা আলখেলা পরিয়া ঘাসের মূর্তি গুলির সম্মুখে মন্দিরা এবং ঢাকের তালে তালে তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে এবং ক্রমশঃ নৃত্যের উত্তেজনা ও উন্মাদনায় ইহাদের জ্ঞান লোপ হইয়া আসে। এইরূপ অবস্থা হইলেই বুঝা গেল দেওদানীকে 'মোদাই' বা ভূতে আশ্রয় করিয়াছে। তখন একটা পাঠা আনিয়া "ইক্ষি" নামক খাড়ার এক আঘাতে একটা তৃণমূর্তির সম্মুখে ইহার মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়, এবং এই পশুর সমস্ত রক্ত "মোদাই" মূর্তির নিকট উৎসর্গীকৃত হয়। উপস্থিত বাক্তিবর্গের বস্ত্রাদিও এই শোণিতের ছটায় কিঞ্চিৎ রঞ্জিত হইয়া থাকে। এই বলিয় পরেই দেওদানী বাহিত জ্ঞান লাভ করে, অর্থাৎ কোন মোদাই অসন্তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়াছে এবং কোন বলিতে ইহার তৃপ্তি সাধন হইবে ইত্যাদি

বিষয় বলিয়া দেয়। এই উপলক্ষে গ্রামের সমস্ত অধিবাসী অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটা ভোজের আয়োজন করিয়া থাকে।

ইহা ছাড়া কাছাড়ীর আরও কয়েকটা উৎসব আছে। এইগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা, গার্হস্থ্য ও সাম্প্রদায়িক। গার্হস্থ্য উৎসবের মধ্যে "নুহন খাওয়া" (নবান্ন) এবং "মশক তাড়ান" উল্লেখ যোগ্য। প্রথমটি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ও দ্বিতীয়টি নবেম্বরের শেষাংশে সম্পন্ন হয়। গোয়লা পুলকিত রাত্রে প্রকাণ্ড পিরামিডাকৃতি টোপর মাথায় পরিয়া এবং শুষ্ক কলাপাতে শরীর ঢাকিয়া কতিপয় অল্পত বেষধারী কাছাড়ী তাণ্ডব নৃত্য ও চীৎকারে গৃহস্থের বাড়ী মুখর করিয়া দেয়। সাধারণতঃ যুবক সম্প্রদায়ই এই উৎসবের পাণ্ডা। এইরূপে মশক তাড়াইয়া ইহার গ্রামের মাতব্বরগণের নিকট হইতে পুরস্কার বা পারিশ্রমিক স্বরূপ সামান্য অর্থ ও খাদ্য দ্রব্যাদি আদায় করিয়া লয়।

মোদাই-পাখ্যান—নদীর উপত্যকায় কাছাড়ীদের মধ্যে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। এক দিন ভগবান শ্রী বা সোতাগ্য দেব মৃগয়া করিতে করিতে তৃষ্ণাতুর হইয়া হিমালয়ে একটা সুন্দর সরোবরের তীরে উপনীত হন। ভগবান শ্রী জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। সরোবরের মৎস্তগুলি তখন ব্রহ্মপুত্রে লইয়া যাওয়ার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল। ভগবান শ্রীও তথাস্থ বলিয়া মৎস্তগুলিকে তাঁহার হস্তির প্রান্তদেশে বাঁধিয়া পশ্চাতে টানিয়া আনিতে লাগিলেন, এবং দাগে দাগে জলধারা প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইল। এই জলধারাই পরিশেষে নদী হইয়াছিল। ইত্যাদি আরও সুন্দর সুন্দর অনেক গল্প শোণিতরূপে কাছাড়ীর ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

কাছাড়ী জাতির মধ্যেও উচ্চ নীচ ভেদে উপভ্রান্তি আছে। নিয়ে কয়েকটি শ্রেণীর নামোল্লেখ করা গেল।

(১) স্বর্গজাতি—দেউড়ি ওঝা প্রভৃতি। ইহারাই

পৌরোহিত্য করে। এই শ্রেণীর লোকে কখনও ভূমি কর্ষণ করে না।

(২) ভূমিজাতি—কবর ও শাসন নির্মাণ কবিবার জন্য এই জাতীয় লোককে ভূমি ক্রয় করিয়া লইতে হয় না।

(৩) ব্যাভ্রজাতি—ইহাদের বিশ্বাস ব্যাভ্র ইহাদের পূর্বপুরুষ। সুতরাং ব্যাভ্র বরিলে ইহারা শোক প্রকাশ করিয়া থাকে।

(৪) তৃণজাতি—একপ্রকার বন্য তৃণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই জাতির এই নাম হইয়াছে।

(৫) তিল জাতি—প্রাচীন কালে ইহারাই আসামে তিলের চাষ করিত। ইহাদের বংশধরগণ আজিও তিলকে বড় সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

(৬) জেঁকজাতি—ইহারাই জেঁককে বড় সম্মান করে এবং সাধারণতঃ জেঁক হত্যা মঙ্গাপাপ বলিয়া মনে করে। প্রাচীন কালে কোনও পরিবারে কোনও সম্ভান ভূমিষ্ট হইলে অশৌচান্তের দিন পরিবারের যাবতীয় লোক এক একটা জেঁক কিছুকালের জন্য শাকের সহিত চিবাইত ; কিন্তু এই জেঁক চিবান জীবনে এক বারের বেশী হইত না।

(৭) পাটজাতি—প্রাচীন কালে এই উপজাতীয় লোকেরা কোন পরকোপলক্ষে পাট চিবাইত।

(৮) নদী জাতি—ইহারাই প্রাচীন কালে মৎস্য শিকার করিত।

(৯) ভিক্ষুকজাতি—এই জাতি ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়—ইহাদের নির্দিষ্ট বাসগৃহ নাই।

(১০) বাগ্গকর জাতি—ইত্যাদি।

শ্রী গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যোন্মূর্ত্য-কম্পনা

সন্ধ্যা আসিতেছে, দিন চলিয়া যাইতেছে, তাই কবি আজ ডাকিতেছেন—

ওরে আয় !

আমায় নিয়ে যাবি কেরে

দিন শেষের শেষ খেয়ায় ?

অতীতের মত স্মৃতিতে আধিজলে আকুল হইয়া বলিতেছেন—

ঘরেই যার, যাবার তারা কখন গেছে ঘর পানে

পারে যার যাবার গেছে পারে ;

ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে

সন্ধ্যা বেলা কে ডেকে নেয় তারে !

ফুলের বাগ নাইক আর ফসল যার ফল্গনা

চোখের জল ফেলতে হাসি পায় ;

দিনের আলো যারকুরোল সাঁঝের আলো জ্বল্গন

সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।

আর হতাশ ভাবে ডাকিতেছেন—

ওরে আয় !

আমায় নিয়ে যাবি কেরে

বেলাশেষের শেষ খেয়ায় !

তিনি এ জীবনে যত গান গাহিয়াছেন তাহারা যেন কলকণ্ঠ চঞ্চল শিশুমণ্ডলীর মত তাহার বৃদ্ধ বয়সের শুদ্ধ ধ্যানাসনের চারিধারে গুণগোল করিয়া বেড়াইতেছে,— তাহাকে শাস্তি দিতেছেন। তাই তিনি আজ, ডাকিতেছেন,—

এবার নীরব করে দাও হে তোমার

মুখর কবিরে—

তার হৃদয় বাঁশী আপনি কেড়ে

বাজাও গভীরে।

নিশীথ রাতের নিবিড় সুরে

বাঁশীতে তান দাওহে পুরে

যে তান দিয়ে অবাক কর

এই শবীরে।

যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে
জীবনে মরণে ।

গানের টানে মিলুক এসে
তোমার চরণে ।

বহু দিনের বাক্য রাশি
এক নিমেষে যাবে ভাসি
একলা বসে শুনব বাণী
অকুল তিমিরে ।

কিন্তু যখন মধুর কৈশোরে জীবনে প্রথম বসন্তের বাতাস বহিয়াছিল, শত আশা অভিলাষ আশঙ্কা লইয়া হৃদয় ধীরে ধীরে পুষ্পের জায় বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল, যখন “কৈশোর কবি মুগ্ধ ছবি” জীবনের বাসনায় প্রথম সোপানে বসিয়া শত নবীন আশায় বন্ধুর দিয়া, “বাক্যের বীণা রচিত রাগিনী,”—তখন ও দূরনির্ঝরিণীর মধুর নিকণে মত প্রেমময় মৃত্যুর নুপুর ধ্বনি যেন স্বপ্নধোরে আসিয়া তাহার শ্রবণে প্রবেশ করিত;—আর তিনি উচ্ছ্বসিয়া গাহিয়া উঠিতেন,—

মরণেরে, তুহু মম গ্রাম সমান ।

মানবের শেষ শান্তি মরণের উদার চোকে ছল ছল নেত্র চাহিয়া একান্ত অসহায় ভাবে বলিতেন—“হে মরণ, হে মম প্রিয়তম, হে মম গ্রামসমান, পৃথিবীতে যাহা কিছুকে আমি আপন বলিয়া আকড়িয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছি, যে কিছু সাকল্যের আশায় মত্ত আবেগে প্রাণপণে ঘুরিয়া ঘুরিতেছি, যাহা কিছু “আপনার মন ভুলাতে” ধরে লইয়া যাইতেছি, সে সমস্তই এক দিন হঠাৎ আমাকে বিমুগ্ধ হইতে পারে, ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, ধূলি হইয়া ধূলায় মিশিয়া যাইতে পারে, কিন্তু হে মোর শরণ, আর চিরমেঘময় স্নান, তুমি কখনও আমাকে বিস্মৃত হইবে না,—“তুহু ন ভইবি মোরে বাম” !

প্রথম যে দিন প্রিয়তম মৃত্যুর দূত ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন কবির তরুণহৃদয়রূপিনী অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকাটি চঞ্চল হইয়া উঠিল; সে জানে যে এ প্রিয়তমের দূত, কিন্তু এর বেশী সে আর কিছুই জানেনা ।

এ প্রিয়তম কে, তাহার আবাস কোথায়, কিরূপ তাহার আকৃতি প্রকৃতি, এ সব সে কিছুই জানে না; তাই নবোঢ়া হিন্দু বালিকা যেমন স্বামী গৃহে যাইতে ভয় পায় অথচ জানে তাহার যাইতেই হইবে, কবির হৃদয় বালিকা ও সেইরূপ “ভয়ভারাতুর” হইয়া পড়িল। কিন্তু তবু সে দীপহাতে যাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল, ব্যাকুল তীতি আবেগ বক্ষে চাপিয়া তাহাকে আদর করিয়া ঘরে বসাইল এবং নয়ন জলে পুষ্প করিয়া পরাণের ধন তাহার চরণ তলে সঁপিয়া দিল ।

এখন হইতে আর এই স্বামীগৃহ কবির অপরিচিত নহে। তথায় যে কি অনন্ত শান্তি বিরাজ করিতেছে তাহার আভাস তিনি পাইয়াছেন। তাই যখন তিনি দেখেন যে পিতৃগৃহের খেলা পূজা সাঙ্গ করিয়া একটি হৃদয় মরণস্বামীর গৃহে চলিয়াছে, আর তাহার আত্মীয় স্বজনগণ তাহাকে ঘিরিয়া অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতেছে; তখন তিনি নির্দ্বাক ভাবে একধারে দাঁড়াইয়া অনিমেষে চাহিয়া দেখিতে থাকেন,—মনে মনে শান্তি মন্ত্র উচ্চারণ করেন। বলেন,—

হেসে হেসে গলাগলি করে খেলছিল যাহাদেরে নিয়ে,
আজো তার ঐ খেলা করে, ওর খেলা গিয়েছে ফুরিয়ে ।
সেই রাব উঠেছে গগনে, কুটেছে সমুদ্রে সেই ফুল;
ও কখন খেলাতে খেলাতে মাঝখানে ঘুমিয়ে আকুল !
শ্রান্ত দেহ, নিম্পন্দ নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয় বেদনা;
চুপ করে চেয়ে দেখে ওরে, থাম, থাম, হেসনা—কৈদনা ।

কিন্তু এ যে বড়ই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ ! এই হৃদয়বিদায়ণ বর্জমান বিচ্ছেদের তুলনায় মরণের প্রত্যাশিত ভাবী শান্তি যে সময় সময় বড়ই তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। কবি জানেন মরণের গৃহে অসাম অন্তিম শান্তি বিরাজ করিতেছে কিন্তু যাহা আছে তাহাকে বিদায় দিতে যে বর্তমানে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। এই নিষ্ঠুর শূন্যতার তুলনা কোথায় ?

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে আজ কাছে নাই,
নিভান্ত সামান্ত একি নাথ ?
তোমার বিচিত্র ভবে, কত আছে কত হবে
কোথাও কি আছে প্রভু হেন বজ্রপাত ?

ভাষা ১০১১

আছে সেই স্বর্ধ্যালোক নাহি সেই হাসি,
আছে চাঁদ নাই চাঁদ মুখ ;

শুভ পড়ে আছে গেহ, নাই কেহ—নাই কেহ,
রয়েছে জীবন নেই জীবনের সুখ !

সেই টুকু মুখখানি, সেই দুটি হাত
সেই হাসি অধরের ধারে,

সে নহিলে এ ক্ষণে শুক মরুভূমিবৎ

নিতান্ত সামান্য একি এ বিশ্ব ব্যাপারে ?

সে যে এখানেই শত প্রাণ-বন্ধনে দৃঢ় বদ্ধ ছিল। কত
প্রভাত সন্ধ্যার মাধুরী এই খানেই তাহার জীবনে মিশিয়া
গিয়াছিল, এখানে সে কত জনকে ভাল বাসিয়া ছিল, কত
জনের ভালবাসা পাইয়াছিল ! কিন্তু আজ আর একজন
তাহার প্রিয়তম হইয়া উঠিয়াছে, আজ অশ্রুজলের বত্মা
চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে তবু সে থাকিবে না।
বঙ্গদেশে যেমন পুত্রপৌত্রপরিবর্তন প্রবীণা গৃহিনী ও সময়
সময় পিতৃগৃহের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জন করেন,
নিজের বর্তমান সংসারের শত কাজের মধ্যেও সহসা
পিতৃগৃহের অতীত দিনের কথা মনে করিয়া আকুল হইয়া
উঠেন, এই মরণস্বামী গৃহে যাত্রার প্রাকালে একবার
পশ্চাৎ পরিত্যক্ত ধরা গৃহের দিকে ফিরিয়া তাকান ও
ঠিক সেই রকম আত্মবিক।

ফিরিয়া তাকাইলেই যে হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠে !
প্রাণপণ ভালবাসা যাহার পরশে মিথ্যার বন্ধন হইয়া
যায় এবং নিমেষে খসিয়া পড়ে অথবা সমস্ত ভালবাসা
আঁধার করিয়া তবে সে ভালবাসিবে,—এত বড় যাহার
দাবী, তাহাকে সহসা প্রিয়তম বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব
হইয়া পড়ায়। যাহার গৃহে গমন অর্থই পিতৃ-গৃহ
হইতে,—জীবনের সমস্ত কোমলতম প্রিয়তম স্মৃতি হইতে
চির নির্বাসন, তাহাকে ও আত্মীয় বলিয়া মনে হয় না।
অশ্রুজলে তখনই নয়ন আকুল হইয়া উঠে। মনে হয়,—
হায় দেবতা ! এমন করিয়াই যদি বিচ্ছিন্ন করিবে তবে
বাঁধিয়াছিলে কেন ?

তখন কণেকের ভরে যুত্মার মধুর রূপ লুপ্ত হইয়া

যায়, যুত্মাকে সহসা নিষ্ঠুর দম্ভ্য বলিয়া আতঙ্ক হয়।
মনে হইতে থাকে আপন আপন প্রিয়তম স্নেহ ভালবাসা
সুখ দুঃখগুলি লইয়া কত অসহায় আমরা ! কি নিষ্ঠুর হত্যা
কাণ্ডের মধ্যে আমরা আমাদের জীবনের সর্বস্ব ঢালিয়া
থর করা পাতিয়া বসিয়াছি ! সেই নিষ্ঠুর দম্ভ্য যখন
আসিয়া বলিবে—“চল”—যখন নীরব, স্থির, শীতসঞ্চারী
নয়নে চাহিয়া তাহার অকল্পিত হস্তখানি সে বাড়াইয়া
দিবে,—তখন মুহূর্ত্তে সমস্ত শেষ হইয়া যাইবে ;—প্রাণ
শতধা দীর্ণ হইয়া গেলেও কোন ওজর আপত্তি না করিয়া
তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইতে হইবে !

প্রাণহীন এ মন্ততা না জানে পরের ব্যথা
না জানে আপন ;

এর মাঝে কেন রয় ব্যথা ভরা স্নেহময়
মানবের মন !

যা কেন রে এইখানে শিশু চায় তার পানে
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে !

মধুর রাবির করে কত ভালবাসা ভরে
কত খেলা করে তারা কত সুখে দুখে !

কেন করে টলমল দুটি ছোট অশ্রুজল
সকরণ আশা,

দীপশিখাসম কাঁপে ভীত ভালবাসা !

কিন্তু এ বিদ্রোহ ক্ষণিক। যুত্মার আপাত নিষ্ঠুরতার
বিকল্পে উত্তেজনার বশে বিদ্রোহবাণী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা
করিয়া যখন মন কতকটা শান্ত হইয়া আসে তখন নিজের
বাক্যবাণীকে নিজের প্রলাপ বলিয়া মনে হইতে থাকে।
ধীরে ধীরে বন্ধের মাঝে প্রিয়তমের বুকজোড়া আন্তরিক
অনুভূত হইতে থাকে, উদার আকাশের মত তাহার নীল
নেত্রের নির্নিমেধ দৃষ্টি সমস্ত হৃদয় মন শান্তিতে আশ্রুত
করিয়া ফেলে। উদ্ধত মস্তক নত হইয়া আসে।
বিদ্রোহের অবসান হয় এবং মুহূর্ত্তে প্রিয়তমের সঙ্গে সন্ধি
স্থাপিত হইয়া যায়। তখন কেবল অশ্রুকরণ মিনতি—
“হে প্রিয়তম, হে অনন্তশান্তিময়, তোমার গুণ হইয়াছে,
আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি। এখন হইতে তুমিই আমার

মহা-আনন্দ, আমার মহা পরিণাম । তোমাকে চিরদিনের
জন্ম পাইয়াছি, তোমার সহিত আর আমার বিচ্ছেদ
হইবে না ; কিন্তু তোমাকে পাইবার জন্ম বাহা ছাড়িয়া
আসিলাম, বাহা ক্ষণেকের মিলনে চিরপরিচয় দেখা আঁকিয়া
দিয়া গিয়াছে, প্রাণপণ ভালবাসা দিয়া যেগুলি একদিন
আঁকিয়া ধরিয়াছিলাম সেই খেলনাগুলির মধ্যে
আমাকে আরও কিছুকাল বিলম্ব করিতে দাও । তাহারা
অসার, তাহারা ক্ষণস্থায়ী, তাহারা মায়া,—তবু তাহারা
এক দিন আমারি ছিল,—আজ তাহারা চিরদিনের জন্ম
চলিয়াছে ! শুধু এই মুহূর্তে জন্ম দাঁড়াইয়া পশ্চাতে
চাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু মোচন করিতে দাও !

তারপর ? তারপর আমি সম্পূর্ণ তোমার । ‘মহা
বরবার রাক্ষস’ আমি তোমারি হাত ধরিয়া ভীর্ণ
হইয়া যাইব ।

সম্মুখে নক্ষত্রদীপালোকিত অনন্তের যাত্রাপথ পড়িয়া ।
ধরণীর তৈলহীন দীপ অর্দ্ধ রজনীতে ধীরে ধীরে নিভিয়া
আসিতেছে । চারিদিকে অসংখ্য অদৃশ্য ফুলের সুগন্ধ
চঞ্চল সমীরণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে । বিশ্বের
নিশেধ বিরাট শ্রোতের স্বপ্নময় অপর কূল হইতে তরঙ্গ
ধ্বনি উথিত হইয়া অন্ধকার গগন প্রাক্কন পূর্ণ করিতেছে ।
গভীর ক্লান্তিতে আমার পরাণবধুর নয়ন পত্রদ্বয় নিম্ন-
লিত হইয়া আসিতেছে । অসহায় সে, তাহাকে বন্ধে
নিবিড় বাহুবন্ধনে তুলিয়া লও । গভীর চুপনে তাহার
রক্তিম অধর পাণ্ডু করিয়া দাও,—হতচেতন, অবশ হইয়া
সে তোমার বন্ধে ঢলিয়া পড়ুক ।—বিরাট পক্ষ বিস্তার
করিয়া বিধে বাহির হইয়া পড় ;—

তখন কোথায় তারে ভূলায়ে লইয়া যাবি

কোন শূন্য পথে !

অচৈতন্য প্রেমদীরে অবহেলে লয়ে কোলে

অন্ধকার রথে !

যেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চির কুমারী ;

অলোক পরশ

একটি রোমাঞ্চ রেখা আঁকেনি বাহার গাত্রে

অসংখ্য বরষ ;

স্বপ্নের পর প্রান্তে যে অনন্ত অন্তঃপুরে

কভু দৈব বশে

দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি

তিল নাহি পশে ;

সেখায় বিরাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তারিয়া

বন্ধন বিহীন,

কাঁপবে বন্ধের কাছে নব পরিণীতা বধু

নূতন স্বাধীন !

* * * * *

তোর ম্লান সুগন্ধার অচঞ্চল প্রেমমূর্তি

অসীম নির্ভর,

নিানমেষ নীল নেত্র বিশ্বব্যাপ্ত জটাজুট,

নির্ঝর অধর ;

তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দ গুলি

তুচ্ছ মনে হবে,

সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্থিতি

অরণে কি রবে ?

বিশাল, প্রসন্ন, শান্ত, মরণ-সমুদ্রে মানবের অশান্তিময়,
উচ্চ, ঝঞ্ঝাফুল্ল জীবনশ্রোতের গভীর আনন্দময় মিলন
চিত্র ! এচিত্র কল্পনায় ও অন্ধনে রবীন্দ্রনাথের কবিশ্বের
চরম বিকাশ ।

শ্রীমানমোক্ষ ভট্টাচার্য

লগ্নহারা

তখনো চাহিনি' ফিরে,
লাঞ্জে ভয়ে থামি' থামি' ধীরে অতি ধীরে
তৃণাক্ত ছায়া ঢাকা সরসী তীরে
সে যবে দাঁড়াল আসি, শুধু মিছা কাজে
শত বার শত ছলে ছিছু জলমাঝে।
পরে যবে ধীরে ধীরে বাধা ঘাট বাহি'
কাছে আসি' নামি' মোর মুখ পানে চাহি'
সুধাল—'চেন কি মোরে?'—আমি দূরে সরি'
গুঠন টানিয়া দিহু। যবে হাত ধরি'
কহিল,—'চাহলো বালা! দরশ-পিয়াসী
আসিয়াছি বড় আশে; এক বার হাসি'
কহলো একটি কথা',—লাজ তরে ন গ
শিহরি উঠিহু আমি লতিকার মত।
নীরবে টানিয়া লয়ে হাতখানি ধীরে
শিয়িল আঁচল টানি গৃহপানে ফিরে
আত্ম-বন-ঘেরা শুক গ্রাম্য পথ পাশে
দাঁড়াহু ক্ষণেক তরে;—সুদূর আকাশে
শুভ্র মেঘ ধগুগুলি চলিয়াছে ভাসি',
সরসীর ভরা বুকে স্বচ্ছ বাতিরশি
ছলকিছে কলগান, দূর বন-চায়
বিরহিনী পিকবধু মরম-ব্যথায়
পঞ্চমে উঠিল গাহি', ঘিরি সারা বন
সহসা বহিয়া গেল উত্তলা পবন,—
বাশ-বনে, ঝাউ-শাখে, পাতায় পাতায়
সহকার শাখে বদ্ধ মাধবী লতায়
বোমাঞ্চ উঠিল যেন; সারা বন ভরি'
শুভ্র পত্রে, তরু শাখে মর্মরি' মর্মরি'
তরঙ্গিয়া মুধুরিয়া কানন-বিতান
শত যুগ যুগান্তের বিরহের গান
একটি সুরেতে যেন উঠিল লাগিয়া,—
'লো বালা! চাহলো কিরি', তোমারি লাগিয়া

আসিয়াছি দূর হ'তে, শুধু এক বার
কহলো একটি কথা।'—মুছি, আশি-ধার
আসিলাম গৃহে কিরি' বন-পথে ধীরে;
এক বার তবু তারে দেখি নাই ফিরে।
—আজি এ পরাণ মাঝে
কত ব্যর্থ হাহাকার রহি' রহি' বাজে,—
ফিরে আমি চাহিনিক' হেলা ভরে লাজে
অনাহুত এলে যবে; এস এস আজ,
নীরবে টানিয়া লব হৃদয়ের মাঝ।

শ্রীপারমলকুমার ঘোষ।

মৃঢ়

(সেখ সাদির মূল পারসী হইতে)

সুদূর প্রবাস হ'তে ভ্রমি সে আসিল যবে
গুণাইহু তায়,
কি বার্তা এনেছ আজি বিদেশ ভ্রমিয়া বল
তু'ষতে আমায়।
কহিল সে "প্রিয়তম, যথার্থই আনিয়াছি
বারতা নূতন,
অনন্ত শয়ন রচি' ঘুমায়েছে বৈরী তব
জন্মের মতন।"
কাতরে কহিহু তারে, 'হায়! প্রিয়কি শুনালে
বিদরিছে প্রাণ,
মৃত্যুর কবল হ'তে তোমারো আমারো সখা
কোথা পুঙ্খিলান?'

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভগবতী ডাঙা

হুগলী জেলায় ইলচোবা নামে একটি গ্রাম আছে। উহার পূর্বদিকে একটি লোকালয় গুহ প্রশস্ত মাঠ ধু ধু করিতেছে। অধুনা ঐ প্রান্তরে নানাবিধ বৃক্ষ জন্মিয়া উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। যে বিস্তৃত অংশ এখন ধাতু-ক্ষেত্র, ঐ স্থানে যে পূর্বে নদী ছিল তাহা উহার আকার প্রকার দেখিলেই সহজে বুঝা যায় নদী মজিয়া গিয়া এখন ঐ স্থান ধাতাদির ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে অনেক ছোট ছোট পুকুর আছে; তাহাদের মধ্যে একটির নাম 'দেউল গড়'। ঐ প্রান্তরের মধ্যে একটি স্থান 'ঝিটকী পোতা' নামে বহি-হিত হয়, তথায় এখনো পুরাতন খাপরা ইষ্টক পাওয়া যায়। এই সুবিস্তৃত প্রান্তরের নাম "ভগবতী ডাঙা"।

অনুমান পাঁচ শত বৎসর পূর্বে এই ভগবতী ডাঙায় রাজা লক্ষীকান্তের রাজধানী ছিল। তিনি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি এক জন সাধু সন্ন্যাসীর নিকট কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করেন। তৎপরেই লক্ষীকান্ত পাণ্ডুরায় গিয়া তথাকার রাজা গণেশের নিকট স্বায় পরিচয় দিয়া তথায় বাস করেন।

কালক্রমে তিনি মহারাজ গণেশের প্রাডবিবাক্ত হন, এবং তদনন্তর তাঁহার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য, সেনা ও বিস্তৃত রাজ্য সহ 'রাজ্য' উপাধি প্রাপ্ত হন। পাণ্ডুরায় এখনো সকলে রাজা গণেশের সভাকে 'বাইশ দুয়ারী' বলিয়া থাকে। রাজা গণেশের একমাত্র পুত্রের নাম ছিল যদু। তিনি স্বহস্তে একটি চিত্র-ব্যাঘ্রকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া 'চিত্রমল্ল' আখ্যা পাইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র মুসলমান ধর্ম গ্রহণ এবং জেলালুদ্দিন নাম ধারণ পূর্বক রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজা লক্ষীকান্তের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের নাম হরিদাস ও কন্যার নাম ইলা। হরিদাস পাণ্ডুরায়

ধাকিতেন, চিত্রমলের সহিত তাঁহার পুত্র প্রণয় হইয়াছিল অনন্তর হরিদাস মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া পাণ্ডুরায় তদানীন্তন উজিরেব কন্যা সোণাবিবিকে বিবাহ করেন।

লক্ষীকান্ত নিজে অত্যন্ত একনিষ্ঠ শক্তি উপাসক হিন্দু ছিলেন। তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে ভগবতীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেউলেন নামাঙ্কণ করে দেউলগড় নামে পুষ্করিণী খনন করান। ঝিটকী পোতার পূর্বে অনেক কুতকাবের বাস ছিল। ভগবতী ডাঙার যে স্থানে নদী ছিল বলিয়া বুঝা যায়, তথায় কল নামে একটি ছোট নদা ছিল উহাব তীরেই রাজ-প্রাসাদ ও পজাদের বাসস্থান ছিল।

লক্ষীকান্ত রাজা দেবপালেন সহিত স্বীয় কন্যা ইলার বিবাহ দেনেন স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু ইলা পাণ্ডুরায় সুব রাষ্ট্র চিবমল্লকে গোপনে হৃদয় দান করিয়াছিলেন। এদিকে রাজা লক্ষীকান্ত কন্যার বিাহের যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়া এবং 'দন স্থির করিয়া বিবাহ সভা আহ্বান করেন। ঐ সভার নাম হইয়াছিল 'ইলা সভা'। বিবাহ সভায় সকলে উপস্থিত হইয়াছে রাজা দেবপাল বনবেশে বরা-সনে সমাসীন হইয়াছেন, ইলা স্থানলঙ্ঘ্যে বিভূষিত হইয়া সম্মান স্থানে আনীত হইয়াছেন লক্ষীকান্ত কন্যা সম্মাদান করিবার জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। এমন সময়ে হঠাৎ চিত্রমল্ল সৈন্য সামন্ত সহ তথায় উপস্থিত হইয়া ইলাকে হরণ করিয়া লইয়া যান, এবং নিজ গৃহে যাইয়া যথাবীতি ইলার পাণিগ্রহণ করেন।

রাজা লক্ষীকান্ত দারুণ মনঃকষ্টে তৎপর দিনই অপরি-বারে দিল্লী চলিয়া যান। আর কখনো এদেশে আসেন নাই। গ্রামবাসীগণও ক্রমে ক্রমে ভিন্ন গ্রামে গিয়া বাস কারতে থাকে। সুতরাং তদবধি উক্ত স্থান জন শূন্য প্রান্তরে পরিণত হইয়া যায়। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ভগবতী ডাঙায় প্রতি রাতে ভগবতী বিচরণ করেন।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্তী।

গ্রন্থ সমালোচনা

কাছাড়ের ইতিহাস—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি, এ
প্রণীত, ঢাকা সাধনা লাইব্রেরী হইতে শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত
কর্তৃক প্রকাশিত। আকার ডবল ক্রাউন, বোড়শাংশিত,
২৪৯ পৃষ্ঠা। ছাপা মন্দ নহে, কিন্তু কাগজ তত ভাল নয়।
দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও তাহা আলোচনা করিতেছেন
এরূপ লেখকের সংখ্যা সাহিত্য ক্ষেত্রে আশি ও মুষ্টিমেয়
সুতরাং বাহারা এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের
উত্তম অল্পাধিক সারস্বতী স্বাক্ষর সংবর্দ্ধন কবিবেই
করিবে।

এই ক্ষেত্রে গ্রন্থকার পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিয়া
কাঁচা সঞ্চয়ে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন
তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেকেই এই
পুস্তক পাঠ করিয়া আনন্দ পাইবেন; এবং মাঝে মাঝে
কৌতূহলোদ্দীপক যে সকল উপাখ্যান এই পুস্তকে স্থান
পাইয়াছে সেগুলি সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে।
কাছাড়ের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস নাই—এখানি
কতকটা তাহার স্থান পূর্ণ করিবে। সুতরাং গ্রন্থকার
আমাদের ধন্যবাদেয় পাত্র। আশা করি তিনি এই
ঐতিহাসিক গবেষণায় তৎপর থাকিয়া পুস্তক খানিকে
ক্রমে পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইবেন।

শান্তিময়।

অবকাশ—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ
প্রণীত ৮৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০। ভূতপূর্ব বহুদর্শী সম্পাদক
শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ বিশারদ মহাশয় “সমা-
লোচকের দোহুগ্যমান খড়্গতলে সোধেগচিত্তে বিনষ্ট
নয়নে” অবস্থিত গ্রন্থকারের পরিচয় ভূমিকা স্বরূপ দিয়া
“ভয়বিহ্বল” গ্রন্থকারকে “আশস্ত” করিয়াছেন। কাব্য-
তীর্থ মহাশয়কে আমরাও আশাসবাগী ও নাইতে পারিয়া
সুখী হইতেছি। লেখার নিজস্ব, নূতন, অথবা নূতন
সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কোথাও বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু সমস্তগুলি
রচনায় স্বাভাবিক দিয়া লেখকের মঙ্গলার্তিসারী মনের যে

শান্তির আদর্শ সূচিয়া উঠিয়াছে তাহা উপভোগ্য। পুস্তকে
গাথা, তত্ত্বমসি, পরমাণু, সুখ, পরমাশ্রয়, প্রতিমা পূজা,
মৈত্রেয়ীর আশ্রয়ণ, আয়েয়ীর দীক্ষা, মাহাশ্বতা ও
কাদম্বরী এই কয়টি সন্দর্ভ আছে; ইহার কোনটিই অসার
কিংবা প্রাণহীন নহে। ভাষায় যে একটু নীরসতা আসিয়া
পড়িয়াছে সংস্কৃত শিক্ষিত পণ্ডিতের লেখায় তাহা ক্রমাহ-
শ্রীয়ায়পাশিক।

ভগীরথ শ্রীঅজুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত,
ঢাকা আরমানিটোলা ইষ্ট বেঙ্গল পিস্টিং এণ্ড পাবলিশিং
হাউস হইতে প্রকাশিত, আকার ডবল ক্রাউন অষ্টাংশিত,
৮০ পৃষ্ঠা, এম্টিক কাগজে, ব্রঞ্জ কালি স্বন্দর ছাপা—
‘জলু মুনি’ নামক তিন রঙ্গের ছবিযুক্ত সুন্দর মলাট।
মূল্য ১০ আট আনা মাত্র।

শিশুসাহিত্যে ভগীরথ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ।
পুস্তক খানি তিন অংশে বিভক্ত প্রথম অংশে গ্রন্থকার
বালক-বালিকাগণের ভক্ত সরল গণ্ডে সগর বংশের ধ্বংস
ও উদ্ধার মূলক পৌরাণিক কাহিনী লিখিয়াছেন :
দ্বিত্যাংশে সগর বংশের বিবরণ গঙ্গাবতরণ প্রভৃতি কৃতি
বাসের রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, ও পরিশিষ্টাংশে
গঙ্গার পাবনী শক্তি ও গঙ্গাবতরণের ব্যাখ্যা কৌতূহলের
সামগ্রী হইয়াছে।

উপসংহার ভাগের মনোবী শব্দ ও কনিষ্ঠর বাজিকৌ-
রুত হিন্দু নিত্য পঠনী গঙ্গাস্তোত্র দুটি আবৃত্তি
করিলে বালক বালিকাগণের মনে ভক্ত ভাবের সহিত
ভাষার সৌন্দর্য্য উপভোগেব প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে উদ্বেষিত
হইবে। এরূপ পুস্তক হিন্দু গৃহে পরম আদরের বস্তু হইবে
আমরা আশা করি।

চারি খানি হাকটোন চিত্রেব মধ্যে সাগর-সঙ্গমে
সুন্দর হইয়াছে—কিন্তু সাগরের বর্ণ “মেহগেনি ট্রাউন”
হওয়ার বড় অস্বাভাবিক হইয়াছে।

শান্তিময়।

২২। **রাজমঙ্গল**—(পূর্বাঙ্গ—বীর ব্রত)—
দৈব বীর বাঙ্গারাজ; ভূতপূর্ব নির্মাণ্য পত্রিকার সম্পাদক
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রেনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মণ্ডার
পাবলিশিং কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত—আকার ডবল
ক্রাউন, বোড়শাংশিত ১১৬ পৃষ্ঠা; কাপড়ে বাঁধা, সোনার
জলে নাম লেখা; কাগজ ভাল।

আলোচ্য রাজমঙ্গল একখানি মহাকাব্য, অর্থাৎ,
মহাত্মা চন্দ্র প্রণীত সমগ্র রাজস্থানের পঞ্চময় বিবৃতি—
অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত।

গ্রন্থখানি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশের নামকরণ
হইয়াছে বীরব্রত—ইহা বাঙ্গারাজ, হামীর, চণ্ডরাজ,
পৃথ্বরাজ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ ও রাজসিংহের
জীবন কাহিনী। দ্বিতীয়াংশের নামকরণ হইয়াছে
সতী-ক্ষেত্র। ইহাতে রমণীরঙ্গ সাধ্বী পদ্মিনী, পান্না,
সরোজিনী, কৃষ্ণকুমারী ও যোধাবাইর অপূর্ব জীবনী
সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের উত্তম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। বীরভূমি ও
পুণ্ড্রভূমি রাজস্থানের ইতিহাস ভারতবাসী মাত্রেই আদ-
রের সামগ্রী; সুতরাং এই দ্বাদশ খণ্ড কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত
হইয়া সাহিত্য-ভাণ্ডারের মূল্যবান রত্নরূপে গৌরব লাভ
করিতে দেখিলে আমরা সুখী হইব, এবং তাহা হইলেই
সারস্বত মন্দিরের একটা অর্পণ প্রকোষ্ঠ পূর্ণ হইবে। তবে
আলোচ্য গ্রন্থের কোন কোন স্থল পড়িয়া আমরা নিরাশ
হইয়াছি। মাত্র কয়েকটি অংশ নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত
করিলাম—

(১) অকস্মাৎ চারি দিকে ফুটিল (?) সৌরভ।

(২) শিশু বাঙ্গা নবীন সঞ্চারে (?) ধায় ধেনুর
পশ্চাতে।

(৩) মাপ, যজ্ঞ, মঠ, বস্ত্র, দীর্ঘিকা-খনন কর রাজ্যে
অজুড়িত (?)।

(৪) আশ্রয় হতে আশ্রয় (?) হইবে তাহার।

(৫) — — — — — ভীম বাদল — — —

বেলাইবে রাজস্থানে ইরন্দ নামে (?)

(৬) কুলার (?) বিহগ মন্দরিছে (?) পর্ণ-কুঞ্জে—

(৭) আকাশার (?) উচ্চ ভরে উঠি ভিন্ন গ্রাম (?)

অধিকন্তু পুস্তকখানিতে বর্ণাঙ্কিত অতি সুন্দর; কমা
প্রকৃতি পাঠ চিত্রাদির অপব্যবহারে গ্রন্থ প্রতি পংক্তির
ভাব উদ্ধারেই গোলযোগ ঘটে।

আবার আর এক শ্রেণীর প্রমাদ লক্ষ্য করুন—

(১) দাঁড়াইল বন্দীপদ (বন্দী পদ) বিনয় সুধীর।

(২) পুরাইব উচ্চ লক্ষ্য অতীষ্ট-প্রবল।

(৩) বিভাতিল (?) বিভাবরী সংগ্রাম হকারে—

অলমতি বিস্তরেণ

শান্তিময়।

২৩। **মহরম**—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত, ঢাকা
পপুলার লাইব্রেরী হইতে শ্রীহরিরাম ধর, বি, এ, কর্তৃক
প্রকাশিত, আকার ডবল ক্রাউন, বোড়শাংশিত, ২০ পৃষ্ঠা,
মূল্য ১০/০ আনা।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রাণম্পর্শী মহরম-কাহিনী বালক
বালিকাগণের জন্য সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় লিখিত
হইয়াছে। মহাত্মা হাঙ্গেনের কমা, চরিত্র-বাহাদুর্য,
ধর্ম ভাব ও উদারতা, এবং হাঙ্গেনাবাহুর অপূর্ব
স্বামি-ভক্তি ও সপত্নী-প্রীতির দৃষ্টান্ত ইতিহাসে স্থান
লাভ। বালক বালিকাগণের উপযোগী করিয়া এই আদর্শ
চিত্রণে গ্রন্থকার অকৃতকার্য হন নাই। আবার পাশেই
মামুনা ও জায়েদার চরিত্রের লোমহর্ষণ
অভিনয় ও ভীষণ পরিণাম। এই সকল দৃষ্টান্ত পাঠ
করিলে মনে পুণ্য ও ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ অহুসার এবং
পাপ ও অধর্মের প্রতি বদ্ধমূল বিরাগ যুগপৎ মাথা তুলিয়া
দাঁড়াইয়া উঠে। পাতায় পাতায় সুন্দর রঙিন বর্ডার—
একটিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা। কমা, বদিনা, কুফা ও
কারবালায় চারিখানি হাক্টোন ছবিই অতি সুন্দর
হইয়াছে।

শান্তিময়।

সহদেব

পঞ্চ পাণ্ডবের সর্বকনিষ্ঠ সহদেব ছাড়া আমাদের বনের পল্লী নিকটে আর এক সহদেব বাস করে। এ সহদেবও ছোট বটে, কিন্তু সে মানুষ নয়,—পাখী।

সহদেবকে পাড়ারগারে চলিত কথায় ‘সওদেব’ পাখী বলে। কেহ কেহ ইহার “কুকুসখী” আখ্যাও দিয়া থাকেন। সহদেব যে শিশু দেয় তাহাতে ঠিক যেন বলে “স-হ-দে-ব,” “ও স-হ-দে-ব”! অপর পক্ষ বলেন, না সে বলে “কুকু সখী” “ও কুকু সখী।” তবে শেষোক্ত মতের সমর্থনকারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম সুতরাং ভোটের বিচার মতে আমরা সহদেব নাম গ্রহণ করিতে পারি। লেখক স্বয়ং এই মতের পক্ষপাতী ইহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ বেশে শাক্তের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধিরদিকে চলিতেছে, এমতাবস্থায় স্বয়ং কুকুর পক্ষ পাওয়াই দায়. “কুকুসখী” ত কথাই নাই।

সহদেবের বর্ণ গেরিমাটির মত। গেরিমাটি জলে বেশ ঘন করিয়া মারিয়া লইলে যে রঙ হয় তাহার চাইতে একটু ময়লা রকম সহদেবের বর্ণ। ইহারা বেশ গোলগাল ছোট পাখী। চড়ুই অপেক্ষা সহদেব বড় নহে; তবে মোটা একটু বেশী এবং লম্বা ঈষৎ খাট। ইহারের সর্বাঙ্গে একই বর্ণ। কেবল তৈল-কোষের চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থান ঈষৎ ফিকে লাল। সে স্থানে পাখীর সজ্জিত ‘সার’ বা ‘তৈল’ থাকে, কাজেই পার্শ্ববর্তী পালঙ্ক-গুলি সতেজ হইয়া প্রকৃত বর্ণের উপর একটু গাঢ় হইয়া প্রকাশিত হয়। অত্যধিক সারের মাটির ঘাস চতুঃপার্শ্ববর্তী ঘাসের অপেক্ষা তেজীমান ও চক্চকে হইয়া উঠে।

সহদেবের পায়ের রংও অনেকাংশে পালঙ্কের মতেরই মত। পা সুরু এবং অপেক্ষাকৃত ঘর্ক। চক্ষু দুটি উল্লেস ও পরিষ্কার। তাহার চারিদিকে ফিকে শাদা রঙের অতি সূক্ষ্ম ভোঁরা দেওয়া। ঠোঁট সোজা এবং সিকি-ইকি লম্বা। ঠোঁট ও পায়ের বর্ণ প্রায় একরূপ। তবে

ঠোঁট একটু পরিষ্কার দেখা যায়; কারণ,—প্রাণবনের সহায়তা করিতে ঠোঁটের ব্যবহার। ব্যবহারের শুণে ইহা বেশী পরিষ্কার বোধ হয়।

সহদেবের ডানার পালঙ্ক খাঁজ আড়াই ইঞ্চি লম্বা। পালঙ্কের অপর পৃষ্ঠ (নিম্ন দিক) ঈষৎ শাদা। এই পাখীর ডানা স্বজবৃত্ত হইলেও ইহার কদাচিৎ বাহিরের মুক্ত বায়ুতে বেড়ায়। দুর্বলের পক্ষে স্পর্ধা করিয়া সমাজের মধ্যে আপনাকে খাড়া করা অপেক্ষা আত্মপ্রকাশ না করায় লাভ বেশী। এজন্যই সহদেব কাহারও সঙ্গে বেশামেশি করিতে চাহে না। ইহারা উষা সমাগমেই জাগিয়া বাসা পরিত্যাগ করতঃ বাঁশের ঝোপ বা লতাকুলে অথবা ছোট ঝোপের ভিতর কখন বসিয়া, কখন নাচিয়া নাচিয়া ডালে ডালে বেড়াইয়া গান করে,—“সহদেব” “ও সহদেব।” ঠিক তাহার পরেই আর এক ঝোপ হইতে উত্তর হয় “সহদেব” “ও সহদেব।” অতি মধুর পঞ্চমে এই ক্ষুদ্র পাখী শব্দ কঠে, উষা রাণীর সম্বর্ধনা করে। প্রত্যাঘে উত্তীর্ণা ঝোপের আসে পাশে বা অদূরবর্তী রাস্তায় ভ্রমণ করিলে উষার শীতল বায়ু যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে সুখ দেব্য হয়, এই ক্ষুদ্র পাখীর গানও তেমনই ঐতি-মধুর হইয়া থাকে। প্রায় একই সময়ে চারি দিকে কুড়ি পঁচিশটা সহদেবের সমবেত শব্দ শোনা যায়। সকলেই মন প্রাণ খুলিয়া গাইতেছে “সহদেব”, “ও সহদেব।”

সহদেব উচ্চ শাখায় ভ্রমেও পা দেয় না, প্রকৃত স্থানে তাহার গতিবিধি নাই। সহদেব যেন গৈরিকে রঞ্জিত বসনে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নিজ্জন বনান্তরালে আত্মরক্ষা করতঃ ভগবানের নাম গানে বিভোর হইয়া থাকে। ইহারা স্বর্ঘ্যোদয়ের প্রাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দেড় প্রহর বেলা পর্যন্ত নাচিয়া গাহিয়া কাটাইয়া দেয়। আবার অপরাহ্নে যখন স্বর্ঘ্যদেব পশ্চিম গগন প্রান্তে চলিয়া পড়েন, তখনও সহদেব গান করিয়া তাহাকে বিদায় বলনা করিয়া থাকে। ইহারা প্রায় বারমাসই আনন্দে নাচিয়া গাহিয়া কাটায়।

সহদেব অল্পকাল কোপে বা বাঁশ কোপের মধ্যে কোনও বিশেষ সুরক্ষিত স্থানে পালক, আঁশ, লোম প্রভৃতি দ্বারা গোলাকৃতি করিয়া বাসা তৈয়ার করে। ইহার ফাঙ্কন বাসের শেষ বা চৈত্র মাসের প্রথম ভাগে দ্বিধ প্রসব করে। এক কালে তিন চারিটি ডিম প্রসব করিয়া থাকে ডিমগুলি জ্বল নীলাভ এবং আধুনির চেয়ে ছোট। ইহারও পরের বাসায় ডিম পাড়িবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা থাকে এবং সুবিধা পাইলে “নাচনী ঘুরণীর” বাসায় ডিম পাড়ে। “নাচনী” পাখীও পরের হাতে ছেলের ভার দিতে উদ্ভোগী; সুতরাং সহদেব সর্বদা পনের উপর ধাত্রীগিরিটা দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার যোগাড় করিয়া উঠিতে পারে না। “নাচনী” প্রায়ই আপন বাসার অদূরে তাহার নাচবে আসন্ন জমাইয়া লয় একজ্ঞও সহদেবের অসুবিধা নিতান্ত অল্প হয় না। ঘোট কথা সহদেব ও কতকাংশে পরভূত। তবে সে স্বয়ং ধাত্রীবিজ্ঞায় অপটু নহে।

ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ ভক্ষণ কবিয়া জীবন ধারণ করে। সহদেব সহজই পোষ মানে কিন্তু নালবর্ণের, ছুঁতাক কাপড় দিয়া খাঁচা ঢাকিয়া না বাধিলে সে শিব দেয় না, কেবল খাঁচার এ পাশে ওপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদিগকে “রাধাকৃষ্ণ” বুলি ধরিতে দেখা যায় না।

ত্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রাজা চিত্রসেন রায়

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দী খাঁ মহম্মদ জঙ্গ ময়ূরভঞ্জন রাজ্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই অবসরে নারায়ণপুরের অধিপতি রঘুজী ভোঁসলা তাঁহার সেনাপতি

† ইহার বাঁদী নামটি এগর্য্যন্ত জাদিবার সুবিধা হয় নাই। অগত্যা যে নামে সে আদিয়ার নিকট পরিচিত সেই নামই ব্যবহার করিয়াছি। নাম জানিতে পারিলে উহার বৃত্তান্ত একান্তই হৃদয়ঙ্গম হবে। লেখক।

ভাঙ্কর পণ্ডিতও বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্র সেনা লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করিতেছেন শুনিয়া আলিবর্দী খাঁ ময়ূরভঞ্জন জয়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বঙ্গদেশের দিকে সৈন্য চালনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য ময়ূরভঞ্জনের উপকণ্ঠস্থ বন অতিক্রম করিবার পূর্বেই মহারাষ্ট্রগণ বর্ধমানের অভিমুখে ধাবিত হইয়া মগর বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, ও প্রচুর ধনরত্ন তাহাদের হস্তগত হইল। মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ নগরের গৃহসকল দগ্ধ করিতে লাগিল। নাগরিকগণ প্রাণ-ভয়ে ভীত হইয়া দূরে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ স্থানে আশ্রয় লইল। ইহাই বঙ্গদেশে “বর্গীর হান্ধামা” নামে আবাদবদ্ধ বনিতার ভীতি উৎপাদন করিয়া থাকে।

ইত্যবসরে আলিবর্দাব সেনা বর্ধমান পহঁছিল। মুসলমানের মহাবাহে এক ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আলিবর্দী খাঁ মারহাট্টাগণের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করিলেন। তথাপি তিনি রণে বিরত হন নাই। সারাদিবস অনাহারে, অনিদ্রায়, কখনও বৃক্ষপত্র ভোজন করিয়া, কখনও বা তৃণক্ষেত্রে শয়ন করিয়া তিনি কাটোয়ার উপস্থিত রহেন। সেই সময়ের কথা ইতিহাসে অরণীয় হইয়া আছে। সেইদে গোলাম হোসেন তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সাধন উণ মুতাকরাণে তাহা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন।

আলিবর্দী খাঁ কাটোয়ার দুর্গ হইতেই ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মহারাষ্ট্রগণকে পরাজিত করেন। †

বর্গীর হান্ধামার সময় চিত্রসেন রায় বর্ধমানে রাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। হাট্টার সাহেব বলেন যে, বর্ধমান যে সময়ে বর্গীগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সে সময়ে চিত্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র তিলক চন্দ্র বর্ধমানের রাজ পদ্বীতে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, চিত্রসেন ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান ছিলেন, সুতরাং বর্গীর হান্ধামা (১৭৪২ খৃষ্টাব্দ) যে তাঁহারই সময় সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। (Vido Hunter's

১৯১২

Statistical Account of Bardwan) হাট্টার তিলক চক্রের লিখিত একখানি পত্রের উল্লেখ করিয়া বলিতে চাহেন যে, তাঁহার সময়ে বর্জমান বর্গীগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল।

কিন্তু উল্লিখিত পত্র খানির সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। আলিবর্দী খাঁ ভাস্কর পণ্ডিতকে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে নিহত করেন। তাহার পর হইতে পুনরায় মহারাষ্ট্র বর্গীর অত্যাচার বঙ্গদেশে প্রবল ভাবে অমুভূত হইয়াছিল। বোধ হয় এই সময়ে তাহার আশ্রয় একবার বর্জমান গুঠন করে। তাহারই কথা সম্ভবতঃ পত্রে উক্ত হইয়াছে। সে বাহা হউক, চিত্রসেন ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বর্জমান হইতে পলায়ন করিয়া যশোহরের অন্তর্গত নলডাঙ্গার রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। নলডাঙ্গাখ সে সময়ে রঘুদেব রায় রাজা ছিলেন। রঘুদেব বর্জমানের ক্রমশঃ সাদরে নলডাঙ্গায় গ্রহণ করেন। নলডাঙ্গায় প্রবাদ এই যে, রঘুদেব চিত্রসেনের সহিত পাগড়ী খঁদল করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপিত করেন। বর্গীগণের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য চিত্রসেন এক সুবাসিত গড় নির্মান করেন। এই গড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও নলডাঙ্গার নিকটবর্তী তৈলকুপ গ্রামে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উক্ত গড়ের পরিধি নানাদিক অর্ধমাইল। চতুর্দিকের গভীর পরিখা এখনও এই স্থানের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিতেছে। এই পরিখা তিন চার হাত গভীর এবং প্রস্থে ছয় গাত হাত হইবে। নদী-তীর হইতে একটি খাঁকা বাঁকা পথ ক্রমশঃ উচ্চ হইতে নিম্নতর ভূমির মধ্য দিয়া গড়ে প্রবেশ করিয়াছে। এই পথ ধরিয়া গড়ের উপর উঠিলে সম্মুখেই একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও চিত্রসেন খনন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এই পুষ্করিণী এক্ষণে কর্দমপূর্ণ। ইহার চতুর্দিক বেতগ বনে আচ্ছাদিত। স্থানে স্থানে প্রবেশ করা দুসোধ্য। অধুনা গড়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পুরাতন ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া বাইতেছে। নিকট বর্তী গ্রাম সমূহে এই ধ্বংসপ্রায় ভগ্ন “রামদান হলের গড়”

নামে পরিচিত। কিছুদিন পূর্বে এই স্থান রামদান হলের নামে এক ব্যক্তির অধিকারে থাকার উক্ত গড় এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।*

গড়ের অনতিদূরে দুইটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। মন্দিরে পূর্বে শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। অধুনা ইহা কোনও নৈসর্গিক কারণে যুক্তিকানিমে বসিয়া গিয়াছে।

চিত্রসেনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বেগবতী নদী-তীরে বর্তমান। এখানে তিনি একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে এক বৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শিবের নাম “গুজনাথ”। তাঁহার নামে নদীর পর পারে অবস্থিত গুজ নগরের নামকরণ হইয়াছে। গুজনাথকে লোকে “বুড়োশিব” বলিয়া থাকে। গুজনাথের মন্দির বিবিধ কারুকার্যে খচিত। মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময়ই ইষ্টকের উপর মনোহর শিল্পকার্য্য সর্বপ্রথম দর্শকেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। দরজার উপর নিপুণ হস্তে রামচন্দ্রের সহিত বাবণের সমরভিনয় চিত্রিত হইয়াছে। এক পার্শ্বে রথারূঢ় রামচন্দ্র ও তাঁহার আগণিত বানর সৈন্য এবং অপর পার্শ্বে লক্ষাপতি বাবণ ও তাঁহার ভীষণ দর্শন রাক্ষস-অনোকিনী। এই চিত্রটি দেখি- নাই শিল্পী শিল্প কার্য্যের ভূয়সী প্রাণসান্য করিয়া থাকে যায় না। মন্দির গাত্রস্থ প্রত্যেক ইষ্টক খোদিত কারুকার্য্য শোভিত। কোনও ইষ্টকের উপর এক জন শিকারী ক্ষিপ্তহস্তে ভল্লদ্বারা শূকর বিদ্ধ করিতেছেন; কোনও ইষ্টকের উপর দ্বারী অস্ত্রযজ্ঞ সজ্জিত হইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে; কোথাও বা মনোহর কুমুদহাব শিল্পী শিল্পকৌশলতার পরিচয় দিতেছে। অঙ্কিত চিত্রগুলি শিল্প নৈপুণ্যে সজীব বলিয়া বোধ হয়।

চিত্রসেন বর্গীর হান্দামার অবসানে বর্জমানে প্রত্যা-গমন করেন। যত্নপর্য্যন্ত তিনি নলডাঙ্গার মন্দিরগুলির পরিচালনাকার্য্য স্বহস্তে নির্বাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বহু দিন ধরিয়া গুজনাথের সেবা করিয়াছিলেন। * এক্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ ব্যয় ভার নলডাঙ্গার রাজা কর্তৃক নির্বাহিত হইতেছে। চিত্রসেন চিনিয়া গিয়াছেন, সে আজ কত দিনের কথা, কিন্তু তাঁহার কাহিনী আজিও নলডাঙ্গার অধিবাসিগণের মুখে ধ্বনিত হইয়া তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীমনীপোপাল মজুমদার।

* Vide “the Naldanga Raj” family.

* Vide the Naldanga Raj family.



প্রতিভা

২য় বর্ষ

আশ্বিন ১৩১৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাঙ্গলা ভাষার প্রসার বৃদ্ধি

অর্থাৎ

বাঙ্গলার প্রান্তবাসী পার্বত্য জাতি

সমূহের মধ্যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গাকর

প্রচলন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব

(চুঁচুড়া সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত)

ভারতের সমস্ত প্রাকৃত ভাষার মধ্যে বাঙ্গলার স্থান আজি সর্বোচ্চ। কবিতা ও নাটক, পুরাণ ও উপন্যাস, ভাষাতত্ত্ব ও সমালোচনা, ব্যাকরণ ও বাদ্যর্ষ, ইতিহাস ও ভ্রমণ কাহিনী, ধর্মশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র ও দর্শন, জীব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র, সমাজনীতি ও ব্যবহার শাস্ত্র, গণিত ও জ্যোতিষ, জড় বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান প্রায় সকল শাখায়ই অস্বাভাবিক বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা, সাহিত্য, প্রতিভা প্রভৃতি কয়েকখানি সাময়িক পত্রও এই সকল শাস্ত্রের নানারূপ প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। ইহা স্বীকার্য যে, এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই ইংরাজি বা সংস্কৃত পুস্তকের ছায়াবলম্বনে লিখিত, অনেকগুলি কেবল অনুবাদ। তাহা হইলেও এই সকল দ্বারা বঙ্গভাষার কলেবরের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। আর ইহাদের মধ্যে মূল গ্রন্থও আছে; অনেকগুলি পুস্তকে যৌলিক গবেষণা ও

স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দৃষ্ট হয়। কতকগুলি গ্রন্থে প্রতিভার বিকাশও পূর্ণ বা আংশিক ভাবে দেখা যায়। ইহা বাঙ্গালির কম গৌরবের কথা নয়।

আর একটি গৌরবের কথা এই যে, এই সকল গ্রন্থের পাঠক এখন বাঙ্গলার বর্তমান। পাঠক না থাকিলে গ্রন্থপ্রকাশে প্রযুক্তি থাকে না, গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। মূল কথা, বঙ্গদেশে প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা ও শিষিবার আগ্রহ পূর্য্যাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। বাঙ্গালি এত দিন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভার্য্য বহন করিয়া আসিয়াছে মাত্র—এখনও সে ভার্য্য সম্পূর্ণ রহিয়াছে। তবে বাঙ্গালি এখন বুঝিয়াছে, বুঝিতেছে যে, যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, মাতৃ ভাষায় না পড়িলে সেই সকল বিষয়ে পূর্ণ অধিকার লাভ করা বড়ই কঠিন। কেবল শাস্ত্রপাঠে বিভ্রাট হয় না! শাস্ত্র স্মৃতিস্তিত হইলেই তাহাতে অধিকার জন্মে। লোকে প্রায়ই মাতৃভাষায় চিন্তা করিয়া থাকে। স্মৃতরাং বিভিন্ন ভাষায় রচিত শাস্ত্রগুলি বাঙ্গলার বিশুদ্ধরূপে অনুদিত করিয়া লইলে ঐ সকল গ্রন্থে সাধারণ বাঙ্গালি পাঠকের অধিকার লাভ অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। আপনাদের ভাষায় ঐ সকল গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিয়া আমরা অন্ততর আয়াসে মূলগ্রন্থলেখক নানাদেশবাসী দেবমানবগণের সাহচর্য্য লাভে সমর্থ হইতে পারি। তিন্ন ভাষায় বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষার পরিশ্রম ভাষাচিন্তায় প্রযুক্ত

হইলে অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা। তাহাতেই শাস্ত্রে জ্ঞান জন্মে—ক্রমে আত্মদর্শনের পথ উন্মুক্ত হয়। সেই জন্তই এখন ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষার অমূল্যজন অধিকতর বিস্তার লাভ করিলেও বাঙ্গালি মাতৃভাষায় অনুদিত বাঙ্গলায় লিখিত বিভিন্ন শাস্ত্রের গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া থাকেন। ফলতঃ বাঙ্গালি এখন জ্ঞান-বলে মানুষ হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; পরাজয়বর্জিত। ক্রমে ছাড়িতেছে; সকল প্রকার অসুবিধা, ব্যাঘাত, ও উপহাস সমস্ত উপেক্ষা করিয়া নিজের পরিশ্রম একাগ্রতা ও তপস্যার বলে মানবসমাজে আপনার জাতিগত প্রতিষ্টা লাভের জন্ত উৎসুক হইয়াছে। তাহাতেই অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের এত উন্নতি।

বিস্তার নানা শাখায় বাঙ্গলার যেরূপ কলেবর পুষ্ট হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভাষার প্রসারবৃদ্ধিও তদনুরূপ হইতেছে কি না, তাহাও আমাদের বিচার্য বিষয়। বাঙ্গলাভাষী ও বাঙ্গলাপাঠীর সংখ্যা বৃদ্ধিতেই বঙ্গভাষার প্রসার বৃদ্ধি। সে দিকে কিন্তু আশাহরূপ ফল ফলিতেছে না। তাহার একটা প্রধান কারণ, বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের বঙ্গভাষার উপর বর্তমান বিভৃক্ষা। পূর্বে মুসলমানেরা হিন্দুর জায় বাঙ্গালা শিখিতেন, বাঙ্গলায় কবিতা লিখিতেন, গান বাঁধিতেন। বাগ্যাকালে, ৬০।৬৫ বৎসর পূর্বে আমরা মুসলমান প্রতিবেশী বালকদিগের সহিত একত্র এক বাঙ্গলা পাঠশালার বিভাগভাগ করিয়াছি। মুসলমানের বাঙ্গালা শিখিবার আগ্রহ হিন্দুর অপেক্ষা কম ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা জাতিনির্কিষেবে বাঙ্গালাতেই সম্পাদিত হইত। এখন কিন্তু ঐ পাঠশালা সমূহে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যার অনুপাত পূর্বাপেক্ষা অনেক কম। ইহার কারণ, অনেক মুসলমান এখন বাঙ্গালাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত।

ঐহাদের এই বিভৃক্ষা কেবল বঙ্গভাষার উপর নয়, বঙ্গান্বয়ের উপরেও কতকটা আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্বে বঙ্গান্বয়ে লিখিত বা মুদ্রিত উর্দু পদবহুল মুসলমানি বাঙ্গলা গ্রন্থ সকল সচরাচর পঠিত হইত। এখন ঐ সকল

পুস্তকের প্রচলন সেরূপ দেখা যায় না। আবার শ্রীহট্ট অঞ্চলের কতক মুসলমান ‘সিলেটি হিন্দি’ নামে এক অপূর্ণ ভাষা প্রয়োগের প্রয়াসী। ইহার বর্ণের সংখ্যা কমাইয়া লিখিত ভাষা উচ্চারণানুগ করিতে চাহেন। এ চেষ্টায় বিশেষ দোষ নাই। বর্তমান সময়ে অনেক দেশে অনেক ভাষা-ভাষীদিগের মধ্যে এই নূতন রোগের আবির্ভাব দেখা যায়। তবে বঙ্গের পূর্বপ্রান্তবাসী শ্রীহট্টের উক্ত মুসলমান ভ্রাতৃগণ যে বঙ্গান্বয় ও বঙ্গভাষায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশ লঙ্ঘন করিয়া সিলেটি ‘হিন্দি’ চালাইতে চাহেন, ইহাতে হয়ত শক্তিকরয়েরই সম্ভাবনা। শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার ব্যতীত স্থায়ী উপকার লাভ হয় না।

হিন্দু মুসলমানের পূর্ব সৌহার্দ্য, পূর্ব সাহায্য সাহচর্যের অন্তর্ভাবনের সহিত বাঙ্গালা ভাষার প্রতিও মুসলমানের অমুরাগ কমিয়াছে। এখন প্রধান প্রধান গ্রামে, সহরে প্রায় পল্লীতে পল্লীতে, বাঙ্গালা পাঠশালার জায় উর্দু পাঠশালা বসিয়াছে ও বসিতেছে। ইহার ভিতর রাজনৈতিক কথা সংঘট আছে কি না, তাহা আমাদের বিবেচ্য নয়। তবে বাঙ্গালী সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে বাঙ্গালা সেবকের এইরূপ শিবির পরিবর্তন বড় ক্ষোভের কথা। সুখের বিষয় এই এখনও দেশে এমন মুসলমান আছেন, যাহাদের জীবন মাতৃভাষার সেবায় উৎসৃষ্ট। ঐহাদের মধ্যে বাঙ্গালা সুলেখক ও সুলেখিকাও আছেন। ইমদাদুল হক, মৈয়দ এমদাদ আলী, আব্দুল করিম, ওসমান আলী, মহাম্মদ কে টাঁদ, এবং কোহিনুরের বর্তমান সম্পাদক প্রকৃত শক্তিশালী বাঙ্গালা লেখক। কিন্তু ঐহাদের ঐকান্তিক চেষ্টাতেও বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে মাতৃভাষানুরাগ পুনরুদীপিত হইতেছে না। কারণ, এখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যেন একটু মনোমালিগ দাঁড়াইয়াছে, অনেক অনেক বাঙ্গালি মুসলমান এখন বঙ্গভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলিয়া মনে করিতেছেন। বাঙ্গালাকে ঐহারা মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। কতকগুলি প্রধান পরিবারে

বঙ্গভাষার উর্দু ভাষার কথাবার্তা চালাইবারও প্রয়াস চলিতেছে। জননী বঙ্গভাষা অনেকগুলি মুসলমান হারাইতে বসিয়াছেন।

প্রকৃতই বাঙ্গালি মুসলমান সম্প্রদায়ে উর্দু বা পারসি কথোপকথনের ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে—এরূপ আশঙ্কা হয়ত অমূলক। আর মুসলমানদিগের উক্তরূপ মনোভাবে বঙ্গভাষার প্রসার-প্রসারের আশঙ্কা প্রকৃত না হইতেও পারে। তাহা হইলেও বাহাতে বিভিন্ন উপায়ে বঙ্গভাষার প্রসার বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা প্রত্যেক বাঙ্গালিরই কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি বাঙ্গালি সমাজের বিচারার্থ উপস্থিত করিতেছি।

বঙ্গের উত্তরে, পূর্বে ও পশ্চিমে বহু সংখ্যক পার্শ্বীয় জাতি বাস করে। পূর্বে ও উত্তরপূর্বে ত্রিপুরি, মণিপুরি কুকি, খাসিয়া, মিশান নাগ, তাবলঙ নাগা, খাসি নাগা,

আকমি নাগা; মধ্যে গারো; পশ্চিমে সাঁওতাল; এবং উত্তরে নেপালি, পার্শ্বীয় লেপচা, সিকিমি ও ভুটিয়া জাতির বাস। এই সকল জাতির মধ্যে বঙ্গভাষার বঙ্গভাষা ও বঙ্গাকর প্রবেশ করাষ্টতে পারিলে অনেক কাজ হয়। তবে কোন কোন জাতির মধ্যে বঙ্গাকর বা বঙ্গভাষার প্রচলন সম্ভব, তাহা অনুসন্ধান।

উত্তরে পার্শ্ববাসী নেপালি, পার্শ্বীয় সিকিমি, ভুটিয়া ও লেপচা জাতির মধ্যে বাঙ্গলা প্রবেশিত করা সম্ভব নয়। নিম্নলিখিত কয়েকটি একাধিক বোধক শব্দ দেখিলেই বুঝা যায় যে, নেপালি পার্শ্বীয়দিগের (পাহাড়িয়া জাতির) ভাষা প্রায় হিন্দি। সিকিমি, ভুটিয়া ও লেপচা জাতির ভাষা প্রায় তিব্বতীয় ভাষার অনুরূপ।

| বাঙ্গলা | নেপালি পাহাড়িয়া | ভুটিয়া | তিব্বতীয় | সিকিমি | লেপচা |
|---------------|-------------------|---------|-----------|--------|-------|
| হাওয়া বায়ু | বাতাস | লুং | লুং | লুং | |
| শিপড়া, রুই | কমিলা | কোমা | টোমা | কোমা | |
| বান, শর, তীর, | দা | দা | দা | দা | শিসি |
| পক্ষী | চারা (Tsara) | পিকুং | কিউ | পিকুং | কো |
| রক্ত | রগ | খাগ | ঠাক | খাক | |
| নৌকা | নাশ | ট | ট | ট | |
| অস্থি, হাড় | হাড় | রিডোক | রুইপা | বিডোক | |
| মহিষ | ভইসী | মহি | মহি | মহি | |
| বিড়াল | বিড়ালু | পিলি | শিমি | আলুই | |
| গো | গাই | নো | পাজুক | নো | |
| কাক | কাগ | অইলা | ওরোগ | অইলা | |
| দিন | দিন | জিম্ | জিমা | জিন্ | |
| কুহুর | কুহুর | খা | খা | খা | |
| কর্ণ, কান | কান | নম্‌কো | নাওয়া | নম্‌কো | |
| পৃথিবী | নাটো | সা | সা | সা | |

নেপালি পাহাড়িয়া জাতির লিখিত সাহিত্য আছে; লিখনে হিন্দি বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়। সিকিমি, ভুটিয়া ও লেপচা দিগের মধ্যে তিব্বতীয় সাহিত্য প্রচলিত, এবং ইহাদের নিজের ভাষা তিব্বতীয় অক্ষরে লিখিত হয়। ইহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে রোমান বা ইংরাজী বর্ণমালা প্রচলনের চেষ্টাও হইয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা

বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। এই সকল জাতির যখন লিখিত ভাষা দাঁড়াইয়াছে, এবং লিখনার্থ নির্দিষ্ট বর্ণমালাও আছে, তখন ইহাদের মধ্যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গাকর প্রচলনের প্রয়াস বুঝা। তবে সিকিমি, ভুটিয়া ও লেপচা জাতির মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্য চালাইবার চেষ্টা কিয়ৎ পরিমাণে ফলপ্রসূ হইতে পারে; কারণ এই সকল

জাতির ভিত্তির সহিত সম্বন্ধ ক্রমেই কমিতেছে এবং বাঙ্গালার সহিত সংস্রব বাড়িতেছে।

ত্রিপুরি (টিপরা) মণিপুরি ও কুকি জাতির মধ্যে আমাদের কার্যের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ আছে। ত্রিপুরি ও মণিপুরিদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা থাকিলেও ইহারা অনেকে বাঙ্গালির সংস্রবে আসিয়া বেশ বাঙ্গালা বলিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরি ও মণিপুরি ভাষা ঐ দুই জাতির পারিবারিক ভাষা মাত্র। বাঙ্গালির সহিত ইহারা বাঙ্গালাতেই কথা বলে। অপেক্ষাকৃত উন্নত ত্রিপুরিগণ বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন এবং রুস্তিবাসের রামায়ণ ও কালীদাসের মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিয়া থাকেন। উন্নত মণিপুরিগণও অনেকে বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থ আলোচনা করেন। ইহাদের পারিবারিক ভাষা লিখিবার ক্ষমতা স্বতন্ত্র বর্ণমালা নাই। সুতরাং অল্প-রাসেই ত্রিপুরি ও মণিপুরি ভাষা লিখনে বাঙ্গালা প্রবর্তিত করা যাইতে পারে।

কুকি জাতির লিখিত ভাষা নাই। ইহারা প্রধানতঃ স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা—ঐ রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব প্রান্তবর্তী পর্বতসমূহে বাস করে। ইহাদের অধিনেতৃগণ ত্রিপুরেশ্বরের সামন্ত রাজা বলিয়া পরিগণিত। ত্রিপুরাপতি এই জননায়কদিগকে রাজ্যোপাধি প্রদান করেন। ইহাদের মধ্যে বঙ্গভাষা প্রচলনের চেষ্টা পূর্বেও হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের যত্নে ও উদ্যোগে (১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বা ১৮৮৪ সালে) কৈলাসহর মহকুমার মধ্যে মৃত কুকিরাজ রাঙবুম বাহাদুরের পুত্র শ্রীমুন্ড রাজা মুরচুঙ্গী বাহাদুর ও তাঁহার ভগিনী রাজকুমারী লালমুরি চুঙ্গী উল্লিখিত কুকিরাজের উভয়ের কন্যা শ্রীমতী লালমুরি এবং অন্যান্য সম্রাট বংশীয় কুকি বালকবালিকাদিগের শিক্ষার জন্য প্রথমে একটি বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হয়। তৎপরে ১২৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রধানতঃ স্বর্গীয় ষষ্ঠ মনাই রাজার শিক্ষার্থ তাঁহার বাঁটিতে একটি এবং মৃত লালসইয়া রাজা বাহাদুরের পুত্রগণের শিক্ষার্থ আর একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার পর অল্পতম কুকিরাজ ষষ্ঠা বাহা-

দুরের বাঁটিতেও একটি বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের অধিকার কালে এই বিদ্যালয়-গুলির অবস্থা বেশ ভাল ছিল এবং শিক্ষাপরিদর্শনাদি কার্য সুচারুরূপে চলিত। এই বিদ্যালয় এখন আছে কি না—থাকিলে ইহাদের বর্তমান অবস্থা কিরূপ তাহা বলা যায় না। তবে কুকিদিগের শিক্ষার জন্য পূর্বের ত্রায় বঙ্গ ও আগ্রহ নাই এইরূপ জনরব শুনা যায়। যাহাই হউক এখানে কর্মী বাঙ্গালি সাহিত্যিকের কর্মক্ষেত্রের দ্বার উন্মুক্ত। বিশেষ চেষ্টা করিলে এই মহৎ কার্যে ত্রিপুরা ও মণিপুর দরবারের সাহায্যও মিলিতে পারে।

উল্লিখিত জাতি সমূহের মধ্যে বঙ্গ সাহিত্যের প্রবর্তনের সহিত যাহাতে বঙ্গাকরে ইহাদের তথা কথিত পারিবারিক ভাষা লিখিত হয় সে চেষ্টাও কর্তব্য। বাঙ্গলা ভাষা এই সকল জাতির মধ্যে পূর্ণ প্রসঙ্গ লাভ করিলে হয়ত ক্রমে বর্তমান কথিত ভাষাগুলি হতাদর হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বতদিন তাহা না হয়, তত দিন ঐ সকল ভাষা উপেক্ষা করিলে অল্প পক্ষ হইতে ভিন্নাকরে পরিচ্ছিন্ন করিয়া ঐ ভাষাগুলিকে সাহিত্যিক গৌরব প্রদানের চেষ্টা হইতে পারে। তখন বর্তমান আসামিগণের ন্যায় ঐ সকল জাতির মধ্যেও কেহ কেহ জাতিগত ভাষাগত স্বতন্ত্রতাকাম হইয়া শক্তিশালী মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহ সৃষ্টির পক্ষপাতী হইতে পারেন। বাঙ্গালি কর্মী সাহিত্যিকগণ এই বিষয়টি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করেন এই প্রার্থনা।

উল্লিখিত জাতিসমূহের ন্যায় গারো, খাসিয়া, সাঁও-তাল এবং বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত নাগাদিগেরও কথিত ভাষার বর্ণমালা নাই। পাদ্রিসাহেবদিগের চেষ্টায় রোমান অক্ষরে ঐ সকল ভাষার স্কুলপাঠ্য পুস্তক ও বাইবেলাদি গ্রন্থ লিখিত ও প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এ উদ্ভম এখনও বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই; কারণ এখনও এই সকল জাতির মধ্যে বিদ্যালয়িক বিস্তার লাভ করে নাই। আরও এ দেশীয় ভাষাসমূহে উচ্চারিত স্বর ও ব্যঞ্জনগুলির জাপক সকল অক্ষর রোমান বর্ণমালায় নাই। বাঙ্গালা

বর্ণমালাও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নহে। তাহা হইলেও রোমান বর্ণমালায় এ অসম্পূর্ণতা অনেক অধিক। আবার এই সকল জাতির মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালির সংস্রবে আসিয়া বাঙ্গালা বলিতে ও লিখিতে শিখিয়াছেন। এইরূপ শিক্ষিত লোকের বঙ্গাকরে আদর স্বাভাবিক। তবে খাসিয়া জাতি এবং মেলা অঞ্চলের অধিবাসীদিগের (ইহারও একশ্রেণীর খাসিয়া), মধ্যে অনেকে ইংরাজি শিখিয়াছেন। ইহারা বেশ বুদ্ধিমান ও মেধাবী। অল্পকাল মধ্যেই ইহাদের মধ্যে অনেকে এরূপ ইংরাজি শিখিয়াছেন যে, সরকারি আপিষের কাজকর্ম বেশ চালাইতে পারেন। এই শিক্ষিত খাসিয়াগণ ইংরাজি ভাষা ও রোমান অক্ষরের পক্ষপাতী। এই শ্রেণীর লোক অনেকে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তবে ইহারা বাঙ্গালির সহিত মিলিতে মিশিতে প্রয়াসী। কোন কোন ধর্মে নবদীক্ষিত হইলে যেমন জাতি, বর্ণ, পরিচ্ছদ—এমন কি নাম পর্যন্ত বদলাইয়া নূতন মানুষ হইতে হয়, খৃষ্টধর্ম-দীক্ষায় তেমন কিছু পরিবর্তন ঘটে না; সুতরাং স্বজাতীয়দিগের মধ্যে, আপনাদের সমাজে তাহাদের স্থানভ্রষ্ট হইতে হয় না, বাঙ্গালি হিন্দুর সহিতও পৃথক মিলিয়া মিশিয়া থাকেন। এইখানেই আমাদের আশা আছে। ইহারা যদিও এখন আপনাদের ভাষা লিখন পঠনে রোমান অক্ষর ব্যবহার করেন, তাহা হইলেও বাঙ্গালা ভাষা শিখিলে ঐ সকল কার্যে বাঙ্গালা বর্ণমালার উপযোগিতা বুঝবেন। আর এরূপ শিক্ষিত খাসিয়ার সংখ্যা অতি অল্প, আর ইহাদের বাঙ্গালি বিদ্বেষ বা বাঙ্গালা বিদ্বেষ নাই, বরং বাঙ্গালিকে শ্রদ্ধা করিয়া চলেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে গারোদিগের অবস্থা হীন হইলেও ইহারা অনেকেই বাঙ্গালা বুঝে। গারোপর্বতের দক্ষিণে অধিত্যকা ও উপত্যকাসংগণ সমুদায় ক্রমাগতঃ মুন্সীর হাট, হালুয়ার ঘাট প্রভৃতি বিশদ্বীপীতে আসিয়া থাকে। বৈতনিক নানা জব্বা এবং পদবীভোগ্য অত্যন্ত সামগ্রী ঐ সকল বিপণিতে বিক্রয় করিয়া ইহারা তৈল লবণাদি কিনিয়া লইয়া যায়। ইহাদের সহিত

কথোপকথন করিয়া দেখিয়াছি, ইহারা বাঙ্গালা একরূপ বুঝিতে পারে এবং এরূপ মিশ্রিত ভাষা বাঙ্গালা বলে, যাহাতে হাটের লোক তাহাদের অতিপ্রায় বেশ বুঝিতে পারে। এই জাতির বুদ্ধি তত প্রখর নয়, কিন্তু ইহারা ধীরপ্রকৃতি এবং বাঙ্গালিকে বেশ সম্মান করিয়া চলে। তবে ইহারা বাঙ্গালির সহিত একত্র এক গ্রামে প্রায়ই বাস করে না। মাঠে, পর্বত-পাদে উপত্যকা, স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রস্থল পল্লীসমূহে, মঞ্চোপরি নির্মিত গৃহমণ্ডলীতে ইহাদের বাস। এই স্বতন্ত্রতার জন্য বাঙ্গালিই দায়ী। তাঁহারা গারোদের সহিত একত্র থাকিতে চাহেন না—তাহাদিগকে ‘বাঙাল’ নামে আখ্যাত করিয়া নানারূপ অবজ্ঞা প্রদর্শনও করেন। গারোদের পল্লীতে প্রবেশ করিলে তাহারা বিরক্ত হয় না, অথবা নবাগত হিন্দু বা মুসলমানকে দেখিলে তাহাদের ‘পচুই’-পান বা নৃত্য-বাগের ব্যাঘাত ঘটে না।

ছোটনাগপুরে—বিশেষতঃ মানভূম জেলা এবং কয়লাখনি ও রেলওয়ের নগরসমূহে শত শত সাঁওতাল বাঙ্গালির সংস্রবে সর্বদাই আইসে। কলিকাতাতেও অনেক সাঁওতাল থাকে। সাত আট বৎসর পূর্বে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় অক্সফোর্ড মিশন স্কুলে যাইতাম। অনেক সাঁওতাল বালক সেখানে থাকিয়া বিজ্ঞানভাগ ও শিল্প শিক্ষা করে। শ্রীযুক্ত রেভারেন্ড মতিলাল ঘোষ প্রমুখ মুশিক্ষকদিগের যত্নে ইহারা প্রায় বাঙ্গালি হইয়া উঠিয়াছে। এই ছাত্রদিগকে সাঁওতাল বলিয়া চেনাই যায় না ইহারা বেশ বাঙ্গালা বলে এবং পোষাক পরিচ্ছদ, চাল-চলন—সকল বিষয়েই ঠিক বাঙ্গালি খুঁটান বালকের ন্যায়। ইহারা দেশ-নির্ভর বা সমাজ-সংস্রবশূন্য নহে। এই বালকেরা এখানে বাঙ্গালা শিখিয়া দেশ গিয়া যাহাতে ক্রমে বাঙ্গালার প্রসার বৃদ্ধি করে, সে চেষ্টা আমাদের কর্তব্য। আমার মনে হয় খৃষ্টধর্মাবলম্বী বাঙ্গালি প্রচারক, যাজক ও শিক্ষকদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যসুসাহিত্য করিতে পারিলে এই কর্ম সিদ্ধির পথ অনেক উন্মুক্ত হয়। অনেক মুশিক্ষিত বাঙ্গালি

আখিৰ ১০১১

মিশনরি বঙ্গের সীমান্তে পার্শ্বত্যা দেশসমূহে থাকিয়া ধর্ম ও বিজ্ঞানলোক বিস্তার করেন। তাঁহাদের মধ্যে মাতৃভাষাভাষাগীও অনেক আছেন। তাঁহারাও বাঙ্গালি ও বঙ্গভাষী। আর বাঙ্গালি সাহিত্যিকদিগের মনে সাম্প্রদায়িক ভাব বড় নাই। সুতরাং বাঙ্গালি মিশনরিগণের সহিত মিশিয়া তাঁহাদিগকে এই জাতীয় কার্যে আকৃষ্ট করা বড় কঠিন কার্য বলিয়া মনে হয় না। অথচ ইহারা আমাদের সাহিত্যসহযোগী হইলে অনেক কাজ হইবার সম্ভাবনা। সাঁওতালেরা সর্বদাই বাঙ্গালির সংস্রবে আসে বলিয়া ইহারা অনেকে বাঙ্গালা বুকে এবং বাঙ্গালায় আপনাদের মনোভাব একরূপে ব্যক্ত করিতে পারে। ইহারা বাঙ্গালিকে প্রজ্ঞা করে। স্বর্গীয় বিজ্ঞাসাগর মহাশয় ইহাদিগকে বাঙ্গালি-প্রীতি শিখাইয়াছেন।

গারো ও সাঁওতালদিগকে বাঙ্গালা শিখান এবং তাঁহাদের ভাষা লিখনে বঙ্গাক্ষরের প্রবর্তন বিশেষ কঠিন নয়। রোমান অক্ষর ইহাদের মধ্যে এখনও বিশেষরূপে চলিত হয় নাই।

ফল কথা—শিক্ষিত বাঙ্গালি বিজ্ঞাগুরু সভ্যতাগুরু ছাড়িয়া, একটু লঘুতা স্বীকার করিয়া উদার-ভাবে এই সকল সরল প্রকৃতি পার্শ্বত্যাদিগের সহিত মিশিতে চেষ্টা করিলে ইহারা সানন্দে মিশিবে। তখন ইহাদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যে দীক্ষিত করা এবং তাঁহাদের কথিত ভাষা সমূহের লিখনে বঙ্গাক্ষর প্রবর্তন করা কঠিন হইবে না। কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ ও হীনতা স্বীকার তিন্ন লোকের ভালবাসা পাওয়া যায় না, স্থায়ী ভাল কাজ করা যায় না, প্রকৃত বড় হওয়া যায় না। কর্মী বাঙ্গালি সাহিত্যিক যদি আত্মগৌরব ছাড়িয়া এই মহৎ কাজ সাধিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণপ্রিয় বাঙ্গালা ভাষা সমধিক প্রসর লাভ করিবে; আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি জাতিও এই সকল প্রতিবেশী জাতিসমূহের মধ্যে সম্মানিত হইবেন। আত্মগৌরবের একটু লাঘব স্বীকার করিয়া একাগ্রভাবে কাজ করিলে সাহিত্যসেবী বাঙ্গালি এখন বাবুসর্বস্ব বলিয়া ঘৃণিত হইলেও সময়ে সাহিত্যিক

কর্মবীর বলিয়া পরিচিত হইবেন—ধন্ত হইবেন।

মানব সমাজের উন্নতির সহিত কার্য সাধনের উপায়ও ফিরিয়াছে—আরও ফিরিবে! এখন যে কাজ সৈনিকের পক্ষে দুঃস্বপ্ন, তাহা রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে সহজ; সাহিত্যিকের নিকট আরও সহজ। পৃথিবীতে বিজ্ঞা, বুদ্ধি, সভ্যতা যতই বাড়িবে—এ মহৎ সত্য ততই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত—প্রতিপন্ন হইবে; কার্য সাধনে সাহিত্যিকের অসাধারণ শক্তি ততই বর্দ্ধিত হইবে। পূর্বে বাহুবল বা ক্ষত্র বলই একমাত্র কার্য সাধনের উপায় ছিল। এখন বুদ্ধি বা ব্রহ্ম বল ক্রমে আত্মগৌরব ধ্বংস করিতেছে। অস্ববল অপেক্ষাও রাজনীতিজ্ঞের দূরপ্রসারিণী বুদ্ধির বলে এখন অধিক কার্য সাধিত হইতেছে। রাজনীতিজ্ঞের এই বল ক্ষত্র বল ও ব্রহ্ম বলের সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন। সাহিত্যিকের বল কেবল ব্রহ্ম বল। যেখানে ব্রহ্মবল ব্যর্থ, বাহা রাজনীতিকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরও অবিধয়, সেখানেও সাহিত্যিকের ব্রহ্মবলের প্রসর আছে, এই প্রসর ক্রমেই বাড়িবে। শেষে সাহিত্যিকের এই মহাশক্তিই মানব সমাজকে পরিচালিত করিবে।

এই মহৎ সত্য হৃদয়ে ধরিয়া কর্মী বাঙ্গালি সাহিত্যিক একাগ্রতার সহিত, অদম্য উৎসাহে, অথচ তপস্বীর জ্ঞায় দীনভাবে কার্যসাধনে অগ্রসর হউন;—কর্মস্বৈবাধিকারন্তে মা ফলেমু কদাচন—এই মহাবাক্য অহর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হউন, ঐশিক বিধানে নিশ্চয়ই তাঁহার একনিষ্ঠ কর্মের উপর অমৃত—সিদ্ধি-অমৃত বৃষ্ট হইবে।

শেষে একটি বিষয় বিবেচ্য আছে। সেটি ব্যয়ের কথা। কমলার কুপাভাজন সাহিত্যিকের সংখ্যা বড়ই কম। ইহারা আছেন, তাঁহাদেরও অর্থহালী এখন সর্বতোমুখী। সাধারণ সাহিত্যিকের অর্থবল নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। অথচ এই শিক্ষা-প্রচার কার্য অর্থ-সাপেক্ষ। সে অর্থ কোথায়? আমার কিন্তু মনে হয়—অধ্যবসায় ও উত্তম বলে সকল প্রকার বিষবোধী অভিক্রম করিতে পারা যায়; আপাততঃ দুই চারি জন দৃঢ়-

সংকল্প ধীরপ্রকৃতি প্রচারক লইয়াও কার্য আরম্ভ হইতে পারে। এক জন ইংরাজ আপনায় ভূপ্রদক্ষিণ কাহিনী বর্ণন উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে, তিনি একবার অশেষ ক্লেশ সহিয়া পাপুয়া দ্বীপের নিবিড় বনাচ্ছন্ন এক পর্বত শিখরে আরোহণ করেন। সেখানে নরমাংসালী অসভ্য মানবগণের একস্থানি বড় গ্রাম ছিল। সেখানে দেখেন—গ্রামের মধ্যে এক ক্ষুদ্র কুটীরে দুই জন ফরাসি ধর্মপ্রচারক রহিয়াছেন। দুর্ভাগ্যপ্রকৃতি গ্রামবাসিগণ তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করে না; বরং বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করিয়া চলে। ধর্মপ্রাণ সাহেব দুটি বেরুপ সেই সভ্যতালোকবজ্জিত ভীষণ স্থানে, সেই ভীষণ আতির মধ্যে, অস্ত্রের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বকার্যসাধনে নিরত ছিলেন, সকল প্রকার সুখস্বচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া এক মহদুঃখে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশে সেরূপে কাজ করিবার লোক কি আশ্রিত জন্মে নাই?—এই নিজের দেশে, ইংরাজ-রাজ শাসিত, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে, বহুবাক্যবাদির অনতিদূরে, সভ্যতালোকমণ্ডলের ঠিক পার্শ্বে থাকিয়া কাজ করিবার লোক কর্মী সাহিত্যিক

গণের মধ্যে নিশ্চয়ই আছেন। এইরূপে অল্পে অল্পে কার্য আরম্ভ করিলে ব্যাধিক্রমের সম্ভাবনা নাই। সাধারণতঃ তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয় মহারাজ-রাজগণের বয়স সদ্ধি বলে সহজেই সংগৃহীত হইবে। অনেক স্থলে প্রতিবেশী কর্মী সাহিত্যিক অতি অল্প ব্যয়ে যথেষ্ট কাজ করিতে পারিবেন।

কথিত পার্শ্বভাষা সমূহের মূল নির্ণয় এবং উহাদের সাহিত্যিক সমীকরণ সম্ভব কি না তাহা আমাদের ভাষাতত্ত্ববিৎ সাহিত্যিকগণের বিচার্য। তাঁহাদের বিচারার্থ কয়েকটি ভাষার একার্থবোধক কতকগুলি শব্দের তালিকা এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে প্রদত্ত হইল।

সাঁওতালের ভাষার সহিত বঙ্গের পূর্ব ও উত্তর প্রান্তবাসী পার্শ্বভাষাগণের ভাষার দূর সম্বন্ধও বুঠ হইয়া না; সুতরাং ঐ সকল ভাষার সহিত সাঁওতালি ভাষার সমীকরণ প্রয়াস বিফল হইবারই কথা। সেই কারণে সাঁওতালি প্রতিশব্দ দিয়া পরিশিষ্টের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না।

পরিশিষ্ট

| বাক্সালা | ত্রিপুরা | মণিপুর | খাসিয়া | মিথাননাগা | তাবলংনাগা | খাসি নাগা | অজামিনাগা |
|---------------|----------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| হাওয়া, বায়ু | নকবার | মুংসিং | কানগার | রাংবিন | ওয়াংরাংক | আনিং | টিবে |
| পাঁপড়া, রুই | মুইসুম | কাংচেং | উদ্বিউ | টিকবা | টিক্‌হা | হুংজা | হাচে |
| বাণ, শর, তীর | — | — | উবনম | সান | লাহান | টাকাবা | মিইউ |
| পক্ষী | তক্‌সা | উচেং | কাসিম্ | ও | ওউহা | ওজা | পাড়া |
| রক্ত | খুই | ই | কান্‌ম্ | আজি | ইহ্ | অই | উনি |
| নৌকা | রুড | হি | কালিঙ | খোজা | ইসেং | আরাং | ক |
| অস্থি, হাড় | বেজেং | সক | কাসিঙ, কাচিং রা | — | ওয়ান্ | টরেট্ | উরু |
| মহিষ | মিসিপ্ | ইরই | উসিন্‌রেজ | লোই | টেক্ | অনং | মপি |
| বিড়াল | আমিং | হোদং | মিউ | মিয়া | অমি | মোচি | নোমো |
| গো | মুক্ | সন্ | কামাসি | মাহ্ | মাহ্ | মাহ্ | মিধু |
| কাক | ভবা | কোআক | কাটিআব | ওবা | — | ওরাক | বেজা |

| বাঙ্গালা | ত্রিপুরা | মণিপুরি | ধাসিয়া | মিথান নাগা | তাবলং নাগা | ধাসি নাগা | অসামি নাগ |
|---------------|----------|---------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| দিন | — | — | কাসিজি | অবি, অন্নি | তিনি | অসোজ | তিসো |
| কুকুর | হুই | হুই | উকমিউ | হি | কুই | আই | তম্ |
| কর্ণ, কান | কুবজু | নাকং | কসকর | না | না | ভেনহৌ | অন্নে |
| পৃথিবী | — | — | কাখিঙিউ | হাওয়ারান | কাতক | অনি | কিলে |
| ভিম | তকতুই | যেকুম | কিলিলেঙ | ওতি | কের | অগম্ | গোমজু |
| হাতি | মাযুং | সামু | কাহাতি | লোয়াক | লোকনিউ | সাতি | ডুম্ |
| চক্ | মকল | মিং | কাখিমত | মিক | মিক | তেলিক | অমহি |
| গিতা | বা | পা | উথ্‌পা | আপা | ওপা | তপ | অপো |
| অগ্নি | হর | মই | কাডিঙ | ডন | আ | মৎম্ | মি |
| মৎস্ত | তন্ | ও | কাড্‌খা | ন্দিয়া | গ্রানে | অকো | খো |
| ফুল | খুঙ | লৈ, লেই | উসিং, টিউ | মাইপোয়া | চুপেং | তবেন | পপু |
| পা | য়াক্‌ং | খং | কাপঙ কিজাত চা | য়ালান | তচং | উকি | তম্ |
| ছাগ | পুন | হামেত্র | উরাও সিনগং রোন | য়ল | নবোং | অভম্‌খা | অবি |
| চুল | খলাই | সম্ | উক্ | খো | নি, হ্ | খা | অৎম্ |
| হাত | ইয়াক | খুং | কাষ্ট | চক | য়ক | তখেত | অৎম্ |
| মাথা | খড়ক | কক | কান্দি | খাং | সং | তেমিন | অৎম্ |
| শুকর | ওয়ারক | অক | উনিঙ থাউ | ভক | অক | আউক | খাডো |
| শিং, শৃঙ্গ | বকরং | — | কিরেঙ | রোং | ওয়ার | তি | পখো |
| ঘোঁ | করাই | সগন | উকুলাই | মন | কোয়াই | কুংরি | চেতুইর |
| বাঁটা, বাঁড়ী | ন-ক | য়ম্ | কাইঙ | হম | লোক | অকি | কি |
| লোহা | সর | য়ং | কানার | জিয়ান | রান | অয়িন | যে |
| পাছের পাতা | ব্রই | লা | কিন্নাডিং | পন্বক | কুময়াক | তুয়া | পণ্যে |
| আলোক | পছর | — | কাজিংসাই | রংগাই | নিনিং | রোপো | জুকি |
| মানব, মানুষ | বরক | মি | উব্রিট | মি | সোনিয়াক | অমি | থেমে |
| বানর | মথরা | য়ং | উ শ্রি | মৈমুক | সিমাং | কিসা | তকি |
| চাঁদ | তাল, | বা | উবনাই | লেট্‌গু | লে | লেটা | খর |
| মাঁতা, | মা | মা | কাকনি | আর, | ওম্ | টু | আজো |
| পর্কত | হাটুক্ | — | উলম, | — | — | অপি | চক্ |
| মুখ | মথং | মাই | উবনাই | তুন | চুমিম | তরো | অম্ |
| মশক, মশা | খাম্পুই | কাং | উদখিউ | — | — | মৃগা | ভিক |
| নাম | য়ং- | মিং | কাঙ্কর-তেং | মন | মিন | আচু | জা |
| রাত্রি | হর | অহিং | কামিট্ | রঙনক | ভঙনিয়াক | আয়া | টিজি |
| তৈল | থক | খাট | কমকিনিয়িং | মদা | মোপা | তৎম্ | ককিছু |
| কলা, কদলী | খাইলক | লকই | কাকারং | — | — | মকো | তেকসি |
| মদী | ভুইমা | ভুরেন | কাওয়ার | ম্ম ১ | য়ংম্ | অৎম্ | খর |

| বাঙ্গালা | জিপুরা | মণিপুরি | খাসিয়া | মিথান নাগা | ভাবলং নাগা | খাসি নাগা | অজারি নাগা |
|--------------|----------|-----------|----------------|------------|------------|-----------|------------|
| পথ | সাধা | লবেং | কাসতক | লম | লম | লি | চা |
| লমণ | সন্ | খুম | কবেলু | হম | হম | মচি | মৎসে |
| চামড়া, চর্ম | বুকুর | বকু | কান্নি | গোরাণ | সো | ভাপাপ | বিধর |
| আকাশ | মখা | — | কান্‌ইন্‌চিনেঙ | — | — | অনিঙ | মি |
| সর্প | চিবুক | লিম | উসিঙ | পু | পু | আহ | ধিন্‌যো |
| নক্ষত্র | আখু কুরি | খোরান মচা | উধুর | লেসি | চাচা | পেতি | খেমু |
| পাখর | হলং | ... | উমাও | লাং | য়োং | অলোং | কচে |
| সূর্য্য | সাল | মুনিংখা | কাসিঙি | রংহান | ওয়াংহি | হুহি | নধি |
| বাজ্র, বাঘ | মসা | কৈ (কই) | উধু। | চিরান্‌ | সাহু | আখু | তাখু |
| দাঁত | ওরা | ইরা | কাখিনিরাং | ভা | ফা | তাকা | উহ |
| গাছ | বুকাং | উপান্‌ | ... | গন | পে | মুকোং | সি |
| শ্রাম | পারা | খুনং | ... | তিং | তিয়াং | মরিম্‌ | অরমে |
| জল | তুই | ইসিং | কাউম্‌ | ডি | রিয়াং | অংহু | জু |

সর্ব্বনাম

| | | | | | | | |
|-------------|--------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| আমি | আং | আই (ঐ) | জা | হু | ভৌ | নি | আ |
| তুই, তুমি | মুং | নং | কি | নং | নং | নং | সো |
| আমরা | চুং | রাং, রাধর, | জি | — | — | অকৌ | আবে |
| তোমরা | নরক্‌ | নঠে, নধর | — | — | — | নিধল্‌ | নটলেসি |
| তিনি | — | — | উ | মি | ভৌপা | পৌ | মে |
| ভাষারা | বরখ্‌ | নঠে | জংকি | — | — | তুংখল | ভে |
| আমার, মরীর | আনি | রাংকি | অজা | হুহুহে | ভেংসেই | নি | — |
| তোমার, মরীর | নিনি | নংগি | ভংকি | — | — | তুংখল | তখভে |
| এক | কাইসা | অমা | ওরে | আভী | চা | অখেত | পো |
| দুই | হুহুই | আনি | আর | আনি | ই | অরে | কনে |
| তিন | কখান্‌ | অহন্‌ | লাই | আজন্‌ | লেম | অলন্‌ | হু |
| চারি | বুকুই | মরি | সাউ | আলি | পিলি | কলি | মে: |
| পাঁচ | বা | মজা | সান | আগা | জা | কজা | পজু |
| ছয় | দক | তরুক | হিভো। | আরোক | ভোক | ভরোক | সোর |
| সাত | মি | ভরেড | চিগ্‌ | আনখ্‌ | নিখ | ভনি | খেনে |
| আট | — | নিপান্‌ | ক। | আচেট্‌ | মাখ | সচেড | মেখা |
| নয় | — | মপান্‌ | খাডাই | অহু | খু | ভেহু | খাহু |
| দশ | — | তরা | সিকো | বন | গন | ভর: | হুর |
| বিশ | — | হুন্‌ | আরোকো | চা | — | মখি | মকু |
| ত্রিশ | — | — | লাইকো | — | — | সমরা | হুর |

| বাঙ্গলা | ত্রিপুরা | মণিপুরি | খাসিয়া | মিথান নাগা | ভাৰলং নাগা | খাসি নাগা | অজাৰি নাগ |
|----------------------|----------|---------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| চল্লিশ | — | ছল্লখা | সাতকো | পাশি | — | লির | ইহিনে |
| পঞ্চাশ | — | — | সানকো | — | — | ভনম্ | রিপজু |
| শত | — | চা | সিম্পা | পুগা | — | কক্ৰা | ক্ৰে |
| ইহা | ইম | অসি | কা | হিহা | মইনান্ | পিও | হুওএ |
| উহা | উম | অসি | কাতা | হিহা | খইমিত্ত | পৈচোচু | লিওএ |
| কোন্ (which) | বু (বু) | করি | কাবা | — | — | কুই | কিউক |
| কি (what) | ভমে | করি | কায়ে | তেম্ | ভোইনান্ | চবউ | কভে |
| কে ? | সাৰ | ক্ৰা | উএই | ওভি: | ওয়াই | সুই | সোক |
| যাকিছু (anything) | — | — | কানো কানো | — | — | কুইয়াই | কাজিপুর |
| যে কোন লোক (anybody) | সাৰ কান | — | উনো উনো | — | — | কোইবু | চক্ৰপক |

বিভক্তি

| | | | | | | | |
|-------|----|--------|-------|----|----|-----|------|
| ইহিতে | নি | তকি | না | — | — | আসে | — |
| এ, তে | অ | তা, দা | হাজান | খা | স: | ও | কিহু |

ক্রিয়া বিশেষণ

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|
| উপর (on) | সাকা | মাথক্ | — | — | — | ভম্বে | — |
| এমন | তাবুক | হজিক | মিন্তা | অথা | চাহ | হিক্ | আকিহবে |
| তখন | আক্ৰ | — | তে | — | — | জিক্ | লিলিতিহা |
| কখন | বুফ্ | কদং অয় | ল্যামো | — | — | কুইম | ভাদম্বে |
| আজি (অন্ত) | ভিনি | ওসি | মিনতাকা | সিওলি; অজি | ভিত্তি | খনি | ভেজে |
| কলা | খানা | হয়েং | লাসাই | নাইনি | জাইনি | অলং | খেহু |
| গত কলা | মিয়া | লাহান্ | লিনহিন | মিন; যজি | যজি | হসি | কোসে |
| এখানে | অর | আসিদা | হাংনে | — | — | নিকো | হবি |
| সেখানে | উর | — | হাংতাই | — | — | ওয়ারদু ওজু | লিখে |
| কোথায় ? | বর, বুর | কদহিদা | স্তানো | পু (পউ) | তউ, ওয়াই, | কুচি | কিরপক |
| উপর (above) | সাকাও | মাথক্ | হানেও | দিং | কওসং | ভমচিজু | ভলে |
| নীচে | ভলাও | মাথানা | হাপ | হোলং | ওপং | ভমোক্‌সিং | চকিমে |
| মধ্যে | কচার | মৈয়ারদা | হাপডেং | — | — | চিওং | — |
| ছাড়া (without) | বাদে | বাদে | ধেম | — | — | ভকিও | কিতে |
| মধ্যে | বিসিং | মহুং | হাপ | — | — | ভিসিকো | কিহু |
| দূর (far) | হাকচান, | আথাপ্পা | সাতাও গাই | আতাই | কাভিকে | উকুও | চওএ |
| দিকট | সাৰ | নকপা | হাজান্ | হোলে | ওভিকে | আমহাও | চওনো |
| ছোট | বশাতে কুহু | পিকপা | কাবারিদ | ওহিপিভা | এচিংবা | ইচমকো | কটুনো |
| চের, অনেক | কুওসা | আরাবা, রাবা | সিবুন | ওইহ | এসেলই | কালজু | ক্যাপুর |
| কত ? | বুহু | কৈয়া | কংনো | — | — | কুইয়া | কিহু |
| এইরূপে | উমতুই | অহুং তৌদা | কুমশো | — | — | ইট্যাংকো | সেওএ |

| বাঙ্গালা | ত্রিপুরা | মনিপুরি | খাসিয়া | মিথান নাগা | তাবলং নাগা | খাসি নাগা | অসামি নাগা |
|----------|----------|----------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| কিরণে | — | — | কুম্বে | — | — | কোতিপা | নকিমিহি |
| কেন | তমানি | করিপি | এম, | — | — | চিবৎ মউই | কজি |
| হী | অয়্ | হৈসেহয়্ | হয়্ | ভই | অইয়া | হৌ | এ |
| না | না | নতে | এম | মনতই | মংচ | নোদো | মৌই |

ক্রিয়াপদ

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|-------------|--------|---------|------------|-----------|
| খাওয়া | চামান | চাবা | বাম | সাহা | হাঠি | দৌং | চিলিবে |
| পান করা | ফুংমনি | খকুণা | ডি | সিওহা | য়ংয়িং | অংসিওং | ফুকোটাএ |
| ঘুমান | ধুমনি | হিপপা | খিয়া | লিপদউ | চুনপি | ইপিজলি | ফু |
| | | | | | | ইপিসিলি | |
| জাগা | হজাপ্ | হোবা | করসিউ | — | — | সিসউপো | সিরটে |
| হাসা | ফুফুইমনি | নকপা | কাবারাখি | নিলে | লিচি | মনিংলি | ফু |
| কীদা | কাবমগি | কপপা | লেনইয়ার | সপ্লে | সপ্তিপে | চিপ লি | করা |
| চুপকরা | তাপুংদি | ডাকপু | সনগাপ,জায়, | — | — | ফুফুয়া | চাসিবলে |
| বলা | সামান | হৈবা | বান,ক্রন | কা | তা | এহং | পুমিতে |
| আশা | কাইমানি | নাকপা | বানওয়ান | রাহই | ওংকই | হিনেরং | ওকিকিরিতে |
| বাওয়া | খাংমানি | চাংপা | বানলেটং, | তোং | অংমি | ওমা | তোতচে |
| দাঁড়ান | বাচামানি | লেপ্পা | বামইয়েও | অজোং | য়ংচি | হংলিসিলি | বেলে |
| বসা | আচুকমানি | ফম্বা | বানসং | ফেন্দো | ওম্ চি | এনিও | বচে |
| বেড়ান | বেরাইমানি | কৈবা | বানইয়াইকাই | তোংখা | অংমি | য়োংজোমা | তোখে |
| দোড়ান | খাইচকমানি | চেনবা | বানকেট | কিক্লে | কলচি | পেমেকা | কাখেলে |
| দেওয়া | ক্রমানি | পিবা | বানমাই | লাইই | য়থু | বিউপো | ফুওমাএ |
| লওয়া | নামানি | লোবা | বানসিন | গোলে | য়কেই | হিরাউপো | মুলিওয়ে |
| মারা | বুমানি | ফুবা | বানস | মৈধুন | সেভাচি | য়াকচো | ততএ |
| হত্যা করা | বুখামানি | হাতকপা | নংপিনিক্র | লংদো | তোইচি | য়াকসিতোপো | ফুখিমাওএ |
| আনা | তবুমানি | পুরুকপা | ওয়ালাময়া | লাহই | য়কেই | হেবেরংলি | সেয়াওয়ে |
| লইয়া বাওয়া | তিলাংমানি | পুখিবা | সিমবো | পইপউ | নোংসি | হেবেরোপা | সকেলে |
| ভোলা | তিসামানি | খাওংপা | রাসায়েবং | লৌকো | নোংসি | ফুকোংসো | ভুপেলে |
| গুনা | খানামানি | তাবা | সন্গাব | অথক | চৈহা | জৌপো | সিলোওবে |
| বুকা | সি মানি | য়াংবা | সঙউথ | অভন | ভোসিংপু | যেতে বো | সিওএ |

বিশেষণ

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|------|
| ভাল | কাহান্ | আকাবা | বাতা | বৈলে | মৈমুকে | অরোং | ডিওএ |
| মন্দ | হাইম | কতে বা | ল্লিউ | মন্টৈ | য়েমই | মরো | সোওএ |
| শীতল | কাচাং | ইংবা | খাইয়াং | য়াংখ্ | ওয়াংসম | আইয়াং | সি |
| গরম | ফুতুং | আসাবা | সিট | খম | নোম | ভেতসা | খাকউ |

আব্দিন ১৩১৩

| বাঙ্গালী | ত্রিপুরা | মণিপুরি | ধাসিয়া | মিথান নাগা | ডাবলং নাগা | খাসি নাগা | অজাপি নাগা |
|------------|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| কাটা | কুখুং | অসংবা | বমপুটাই | — | — | ডাচম | মেনো |
| পাকা | কুমুন্ | আমুন্বা | কা বাই | জুম | রিম | ডেনহিং | মে |
| মিষ্ট | কুতুই | আখুম্ বা | খিয়ং | তি | উয়ং | মিঅং | চে |
| টক | কুখুই | সিন্‌বা | কবাজে | শি | সি | ডেসন্ | খো |
| ভিত | কথা | আখাৰা (খাৰা) কথাও | — | বা | বা | খা | চাপি |
| মুন্দর | নাইথক্ | কজাৰা | ইভমাদ | — | — | কুইরতরো | ভিসু |
| কুৎসিং | সিজা | খিবা | ইসি | — | — | ব.রো | সোপুয় |
| সোজা | — | — | কাবাবেই | — | — | মথুজো | খেখা |
| খাঁকা | ককয়ং | আপৈবা | কালি য়ং | কোম | কোম | তিকিং | ক্রেউই |
| কাল | কসন্ | আমুবা (মুবা) কাবাইয়ং | — | নক | নিঅক | নক | কতি |
| সান্না | কুকুর | আঙোবা(ঙোবা) কাবালি | — | খোঃ | হেং | বেসিং | কচ |
| রাঙা | কচাক | আঙাংবা | — | — | — | টমুরম্ | ত্রি |
| লম্বা | কলক | সাংবা | কাৰাজং | লো | লউ | টিল হো | জোম্ |
| সবুজ | কচুয়া | অসংবা | জিরনাম | — | — | শিমপুলু বা | কপজে |
| খাট | — | — | লিঙবাট্ | মো | সোঃ | তুংসিজো | জু |
| চেঙ্গা | কলক | সাংবা | কাবাজ | চোঅক | তো | ওয়েণ্ড | করখে |
| বৈটে, নীচু | বারা | ভেস্‌বা | লঙ বাট্ | — | — | ওয়েজুতে | খর ও |
| কুজ, ছোট | খসাতে, কুম্ | পিক্‌গা | বারিধ | অহিগমা | মুই | মিংইজি | কমচপো |
| বৃহৎ, বড় | কতর | চাউবা | বাজ্রাও | অচুংনো | যংসোং | তপেতিও | জোপুয় |
| গোদ | কিতিং | — | পমুন | — | — | মেকেতং | খুহি |
| নোটা, ধূল | কতর | — | কাৰাসিনগাই | চোং | মিওম | ডবিতি | গোমোজা |
| মোণা | চিকন | আপিকপা | কা আইয়ো | — | — | অচি | সোগোৎনারু |

শ্রীনকুলেশ্বর বিজ্ঞানভূষণ ।

আচার্য্য হরিনাথ

১০১৮ সনের ১৩ই ভাদ্র বুধবার বাংলা দেশে একটা 'ইঙ্গ-পাত' হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যাঙ্কি হয় না। ভারতের কেন, সমগ্র এশিয়ার অধিতীয় ভাষাবিদ আচার্য্য হরিনাথ দে সেই দিন অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র চৌত্রিশ বৎসর হইয়াছিল; এত বড় লোকের জীবনহৃদ্য এরূপে অসময়ে মধ্য-গগনে পূর্ণ ভেঙ্গে বিকাশের পূর্বে যে অনন্তের কোলে আপনার অস্তিম পয়ন বিছাইয়া কালনিদ্রায় চলিয়া পড়িল, তাহাতে দেশের অশেষ ক্ষতি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হায় হতভাগ্য দেশ ! এখনও হরিনাথের মত লোককে পুত্র বলিয়া গর্ভ করিবার সৌভাগ্য তোমার হয় নাই, তাই হরিনাথ অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাই হেলায় এমন রত্ন হারাইলে ! তিনি অকালে চলিয়া গিয়াছেন, কে জানে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সাহিত্যকে কি অপূর্ণ সম্পদে ভূষিত করিতেন !

হরিনাথ দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল পরীক্ষাই দিয়াছিলেন, এবং সবগুলিতেই সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ; কিন্তু ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট গৌরবের কারণ নহে। খুঁজিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে এরূপ অনেকের নাম পাওয়া যায় যাহারা সমান সম্মানের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যশোলাভ করিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই বিদ্যান হইবার প্রকৃষ্ট উপায় নহে। হরিনাথ প্রকৃত পক্ষে বিদ্বান ছিলেন ; শুধু তাহাই নহে, জীবনের শেষ সজ্জন মুহূর্ত্ত পর্যন্ত তিনি বিদ্যার্থী ছিলেন। মাথার উপর বিপদ ঝুলিতেছে, কিন্তু তখনও তিনি জ্ঞান-উৎসের ক্ষীরধারা পানে আত্মহারা। তখনকার সেই পাঠনিরত গুরুগম্ভীর মূর্ত্তি যে দেখিয়াছে সেই সন্দিগ্ধ চিত্তে ভাবিয়াছে, এ'র মাথার উপর কি এত বিপদ ঝুলিতেছে।

তাহার পাঠাবস্থার সফলতার কথা সকলেই জানেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, পাশ করিয়া ১৮৯৭ খৃঃ অঙ্গে বিলাতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। ঐ বৎসর তিনি বিলাতে অবস্থান কালেই গ্রীক ভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষা দেন এবং সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তাহারই জন্ত সে বৎসর সাধারণ নিয়ম হইতে ব্যতিক্রম করিয়া বিলাতে ঐ পরীক্ষা গৃহীত হয়। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ এবং সর্বাঙ্গীণ কঠোর 'ট্রাইপস' পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। ঐ খানে অবস্থান কালেই তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক কবিতার জন্য স্কটস পুরস্কার ও লর্ড চ্যান্সেলারের পদক লাভ করেন। মিস্টন ও টেনিসন তাহাদের সময়ে ঐ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন ; ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে ! অতঃপর তিনি কিছুদিন জার্মানী ও ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়সমূহে পাঠ করেন। পাঠসমাপনাতে তিনি ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে নিয়োজিত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর ঢাকা ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছু দিনের জন্ত অধ্যাপকতা করিয়া হপলী কলেজের অধ্যাপকতা করেন, এবং তাহার পরে রাজকীয় পুস্তকালয়ে (Imperial Library) গ্রন্থরক্ষকের পদে রত হন। তিনি সর্বসমেত ঐ উনত্রিশটি ভাষা জানিতেন।

আজ পর্যন্ত প্রাথবাতে যত বড় লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনুসন্ধান কারলে প্রায় তাহাদের সকলের জীবনেই জননার প্রভাব অল্পবিস্তর দোষেতে পাওয়া যায় ; হরিনাথেরও তাহার অভাব ছিল না। তাহার জননী নিজে বিদ্বা মাংলা। তিনি ইংরাজী, বাংলা, মারাঠি ও হিন্দি এই চারিপ্রকার ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। জননীর প্রতি হরিনাথের অপরিসীম ভক্তি ছিল। মাতার সুস্বচ্ছন্দ্যের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, এবং সে জন্ত সময়ে সময়ে তিনি নিজের সুখ ও স্বচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতে পরাধীন হন নাই।

হরিনাথের অসাধারণ মেধা ও অধ্যবসায় ছিল।

আষাঢ় ১৩১১

এই দুই গুণের বলেই তিনি অল্প বয়সে এত মহৎ সম্বানের অধিকারী হইতে পরিয়াছিলেন। তিনি কখনও অধিকরণ ধরিয়া বা রাত্রি ভাগরণে অধিক পরিশ্রম করিয়া পাঠ অভ্যাস করিতেন না। তাঁহার স্মরণশক্তি অসাধারণ প্রখর ছিল; তাহারই বলে তিনি একবার যাহা দেখিতেন তাহাই তাঁহার স্মৃতিতে অঙ্কিত হইয়া যাইত। ইদানীং তাঁহার কাছে এত লোক আসা যাওয়া করিত যে, তাহাতে তাঁহার পাঠের বিশেষ ব্যাঘাত হইত, কিন্তু তিনি সে দ্রষ্ট কখনও চিন্তিত হইতেন না। পরীক্ষা নিকটবর্তী, আর অধিক বিলম্ব নাই, অথচ এক এক দিন দেখিয়াছি তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত গল্প করিতে ছেন, অথবা অন্য কোনও কার্যে ব্যাপ্ত আছেন। আবার এক এক দিন একরূপও দেখিয়াছি যে, চারিদিকে নানারকমের লোক বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছে, কিন্তু তাঁহার তাহাতে ক্রক্ষেপ নাই—তিনি পাঠে আত্মহারা! পাঠ সমাপন করিয়া আবার সাধারণের কথাবার্তায় যোগ দিলেন! এই মেধা ও একাগ্র চিন্তাই তাঁহার উন্নতি ও সাফল্যের মূল মন্ত্র।

প্রায় ৭৮ বৎসর আগে, যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন তাঁহার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। এক দিন শুনিলাম ঢাকা কলেজ হইতে প্রোফেসর হরিনাথ দে আমাদের পড়াইতে আসি তেছেন। ইতিপূর্বেই আমরা তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত নাম শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে সকলেই অভ্যস্ত ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সাধারণতঃ নূতন শিক্ষক প্রথম আসিলে ছেলেরা তাঁহাকে একটু আলাতন করে; কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ে, হরিনাথ দে যখন প্রথম পড়াইতে আসেন সেদিন ছেলেরা কোনও রকম গোলমাল করে নাই। জানি না তাঁহার বিশাল চক্ষুদ্বটির ভিতর কেমন একটা জ্যোতিঃ, ছিল, তাঁহার কঠোর স্বরে কেমন একটা গাভীয়া ছিল, ছেলেরা সকলেই বেশ মনোযোগের সহিত তাহার নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল।

সে সময়ে মিস্টনের ‘কোমাস’ ও ‘হেন্সের এসেস’ আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল। তিনি সেই পুস্তক দুখানি আমাদের পড়াইতেন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া কোমাসের allusion গুলি তিনি এত ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে, আর দ্বিতীয় বার পড়িবার প্রয়োজন হইত না। অনেকে বলেন যে, তিনি বড় বেশী ‘নোট’ দিতেন; কিন্তু আমার মনে হয় যে, ছাত্রেরা নোট না পাইলে এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না বলিয়া তিনি এত নোট দিতেন। এইরূপ অনবরত নোট দেওয়া তিনি নিজেও পছন্দ করিতেন না, কিন্তু বলিতেন, উপায় নাই, নোট না দিলে ছেলেরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না।

কলেজের অধ্যাপকতা তাঁহার উপযুক্ত কর্ম নয়। তিনি কতদিন বলিয়াছেন, এ কাজ আমার ভাল লাগে না; ইহাতে আমি ছেলেদেরও বিশেষ উপকার করিতে পারি না, নিজেরও কোন উপকার হয় না, বরং পড়াশুনার বড় ক্ষতি হয়। শেষে যখন তিনি ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর গ্রন্থরক্ষকের পদে বৃত্ত হন, তখন উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন, এই ঘর নিজের ইচ্ছামত কাজ পেয়েছি, বোধ হয় এখন হইতে নিজের ইচ্ছামত পড়িতে পারিব। হায়! তিনি জানিতেন না যে, এই ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর গ্রন্থরক্ষকের পদই তাঁহার অদৃষ্টাংশের রাহ।

ইউরোপীয় আধুনিক ও পুরাতন সাহিত্যে ও ভাষায় তিনি বিশেষ রকম বিদ্বান ছিলেন। শুনিয়াছি না কি প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব প্রোফেসর সুপণ্ডিত পার্সাভেল সাহেব এক বার তাঁহার ক্লাশের ছেলেদের কাছে হরিনাথের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘Yes, he can teach me Latin and Greek for several years!’ হরিনাথ দ্বিতীয় বার যখন বিলাত যাত্রা করেন তখন তিনি বর্জমানের মহারাজার Guide ছিলেন। মহারাজ রোম নগরীতে পোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আধুনিক রোমের ভাষা ইতালীয়, ল্যাটিন আমাদের সংস্কৃতের

ভার দেবতাবা। পোপ বিদেশীয়েদের সহিত সাক্ষাতের সময় লাটিন ছাড়া অল্প কোনও ভাষায় কথা কহিগেন না। কাজেই হরিনাথকে সে স্থানে ভিত্তাবীর কার্য্য করিতে হয়। তিনি সে কার্য্য এত সুন্দর রূপে সম্পন্ন করেন যে, পোপ একজন বিদেশীয়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়ের লাটিন ভাষায় এরূপ অধিকার দেখিয়া বিস্ময়াগর হন।

কিছু দিন পূর্বে রুষীয় পণ্ডিত বার্সাটস্কী যখন ভারতে আসেন, তখন হরিনাথের পাণ্ডিত্যে তিনি এত মুগ্ধ হন যে, তাঁহাকে সেণ্ট পিটার্সবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিতে চাহেন; কিন্তু হরিনাথ যাতুভূমি ত্যাগ করিয়া কেবল অর্থের জন্য সুদূর তুয়ারায়ত রুশদেশে যাইতে স্বীকৃত হন নাই।

তিনি কখনও অর্থের কাকাল ছিলেন না। বাল্যে কৈশোরে তিনি স্বাক্ষর্য্যের মধ্যে লালিত হইয়া ছিলেন, যৌবনে নিজে উপার্জনকর হইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। কেবল মাত্র বৃত্তি পারিতোষিক হিন্দাংই তিনি স্ত্রীনাথিক ২০,০০০ সহস্র মুদ্রা উপার্জন করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি তিনি মৃত্যুকালে নিজের বর্ষীয়সী জননী, ভ্রাতা ও বনাথ স্ত্রীপুত্রাদির জন্য কোনও সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। নিজের জন্য কেহ কখনও তাঁহার ব্যয়-বাহুল্য দেখে নাই; তিনি সর্বদাই সাধারণ মূল্যের পরিচ্ছদ পরিভেন; কখনও তাঁহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিভে দেখি নাই।

জীবনে তাঁহার একটি প্রধান সখ ছিল, পুস্তক ক্রয়। যদি শুনিতেন, কোথাও কোনও ভাল পুস্তক বিক্রয় হইতেছে, অমনি তিনি তাহা দেখিতে ছুটিতেন, অথবা আনাইতেন; এবং যদি তাহা ক্রয়যোগ্য হইত তখনই তাহা ক্রয় করিতেন। কত দিন তাহার সঙ্গে কত পুস্তকের দোকানে ঘুরিয়াছি। অনেক দিন তাহার বাড়ীতে প্রাতঃকালে গিয়া দেখিয়াছি, তিনি চারিদিকে পুস্তক লইয়া বসিয়া আছেন, সম্মুখে কয়েক জন পুস্তকবিক্রেতা—তিনি পুস্তকগুলি দেখিয়া কোনটি বা রাখিতেছেন কোনটি বা ফেরৎ দিতেছেন। এইরূপে তিনি একটি

সুন্দর পুস্তকালয় করিয়াছিলেন। বোধ হয় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত এরূপ সুন্দর পুস্তকের সংগ্রহ আমাদের দেশেও নাই, অল্প দেশেও বিরল। আমাদের দেশের অনেক বড় বড় লোকের বড় বড় পুস্তকালয় আছে, হয় ত তাঁহাদের পুস্তক সংখ্যা হরিনাথের পুস্তক সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী; কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ পুস্তকের পৃষ্ঠা এখনও অকর্তিত, আর হরিনাথের সকল পুস্তকই সময়ে অধীত! একের পক্ষে পুস্তকগুলি শোভা ও সৌন্দর্য্যের সামগ্রী, অথের পক্ষে জ্ঞানলাভের—আত্মোন্নতি ও আত্মতৃপ্তির প্রকৃষ্ট উপকরণ। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন এক দিন তাঁহার পুস্তকাগারে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তাহার আর পুস্তক নাই, সমস্ত ধূল্য আচ্ছন্ন! যেন তারাত হৃদ্বিন ও বিপদ আসন্ন বুঝিয়া, মৌন, শ্রীহীন। Sherlock Holmesএর জার্মান অনুবাদ ও বট তলার খনার বচন একসঙ্গে গড়াগড়ি যাইতেছে। কেই বা তখন তাহাদের দিকে তাকায়?

তাহার জীবনের আর একটি সখ, অথবা টাকা নষ্ট করিবার প্রকৃষ্ট উপায়—সাঁহার যাহা ইচ্ছা বলুন—দান। খৃষ্টের উপদেশ, Let not your left hand know what your right hand doth, তিনি অকরে অকরে পালন করিতেন। বিজ্ঞানাগরের পর এরূপ দান করিতে কাহাকেও শুনি নাই। যে কেহ যখন তাহার কাছে আসিয়া হাত পাতিয়াছে, তখনই সাহায্য পাইয়াছে, নিতান্ত পক্ষে কেহ বিফল যনোরণ হইয়া গিরে নাই। সে জন্য তাহাকে সময়ে সময়ে পরের নিকট ঋণ করিতে হইয়াছে, অনেক রকম অনুবিধায় পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু তথাপি বিপন্নকে সাহায্য করিতে তিনি বিমুগ্ধ হন নাই। এমন অবস্থায়ও পড়িতে হইয়াছে যে, তিনি হস্ত পাওনাদারকে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সে নির্দ্ধারিত দিনে আসিয়া উপস্থিত, তাহাকে টাকা দিবার জন্য টাকা বাহির করিয়াছেন, এমন সময় এক জন বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থনা করিল; তিনি তখনই আর দ্বিতীয় বার চিন্তা না করিয়া সেই টাকার সমস্ত বা কতকাংশ তাহাকে দিয়া

ফেলিলেন। পাণ্ডানাদার হয় ত অসন্তুষ্ট হইল, দুটা কড়া কথা শুনাইল, তিনি অবনত মস্তকে তাহা সহ্য করিলেন, তথাপি বিপন্নকে বিমুখ করিতে পারিলেন না।

এইরূপে তিনি যে কত দরিদ্র ছাত্রকে, কত বিপন্ন, কত কল্যাণদায়, পিতৃমাতৃ দায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণের উপকার করিয়াছেন, তাহা স্থির করা কঠিন। যখন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন এই সকল উপকৃত ব্যক্তি মৃতের প্রতি শেষ সম্মান দেখাইবার নিমিত্ত দলে দলে আসিয়া পঁহছিল। যে শত শত লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহার অনাহুত হইয়াই আসিয়াছিল; কেহ তাহাদিগকে ডাকিতেও যায় নাই, অথবা সে জন্ত হ্যাণ্ড-বিলও বিতরিত হয় নাই।

‘কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট’ নামক ছাত্র-দিগের সমিতিতে ষ্টুডেন্টস্ ফণ্ড নামক একটি ধনভাণ্ডার আছে। প্রধানতঃ ছাত্রদিগের নিকট হইতে মাসিক কিছু কিছু লইয়া এই ভাণ্ডারে জমা করা হয়; দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণও সময় সময় ইহাতে টাকা দিয়া থাকেন। এই ভাণ্ডারে সংগৃহীত অর্থ হইতে অনেক দুস্থ বিপন্ন ছাত্রদিগকে সাহায্য করা হইয়া থাকে। অনেকেই জানেন না যে উক্ত সমিতির সভ্যরা ৬ হরিনাথ দের নিকট সাহায্য ও সহায়ত্বের প্রতিশ্রুতি পাইয়াই উক্ত ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করেন, নতুবা সমিতির প্রতিষ্ঠাতার এরূপ গুরুভার নিজ নিজ কক্ষে বহন করিতে সাহস করিতেন না।

ছাত্রদিগের তিনি ‘মা বাপ’ ছিলেন। শুধু যে গরীব ছাত্রদিগকে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন তাহা নহে, অন্যত্র শত উপায়ে তিনি ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতেন। পরীক্ষক রূপে তিনি কখনও ছাত্রদিগের উপর অযথা কঠোর হন নাই। সে অন্য সময় সময় তাঁহাকে উপর ওয়ালার নিকট জবাবদিহি করিতে হইত।

ইউনিভারসিটির সহিত যখন তাঁহার সংশ্লেশ ছিল, সে সময় তিনি তথায় প্রকৃত পক্ষে Students’ Champion ছিলেন। কাহারও কাগজ পুনর্বার পরীক্ষা করাইতে

হইবে, সে তাঁহাকে ধরিত; কোনও পরীক্ষার কালে প্রায় অযথা কঠিন হইয়াছে, ছেলেরা তাহাকে উকীল পাক-ড়াইত; এইরূপ যখন যাহার কিছু এরকম পড়িত, সেই তাঁহাকে ধরিত, আর তিনিও প্রকৃত পক্ষে সে অমুরোধ অন্য় না হইলে তাহার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহার মৃত্যুর পরদিনই সিনেট সভার একটি অধিবেশন হইলেও তথায় তাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা সভ্যদের মধ্যে কেহই আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে তাঁহার সংস্কৃতে এম, এ, পরীক্ষা দিবার ইতিহাস মনে পড়িল। সেটি বেশ কৌতুহল উদ্দীপক। তিনি নিজে আমার কাছে গল্প করিয়াছিলেন।

এক বার কোনও একটি সংস্কৃত পরীক্ষার প্রস্তুতকৃত অযথা কঠোরতা প্রভৃতির জন্ত তিনি তাহার ভীত সমালোচনা করেন। তিনি সংস্কৃতির কিছুই জানেন না বলিয়া পাণ্ডিত্যভিমानी পণ্ডিতেরা তাহার সমালোচনা অগ্রাহ করিয়া মিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পান। তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদের যে ধারণা তাহা অমূলক প্রমাণ করিবার জন্ত কিছুদিন পরেই তিনি সংস্কৃতে এম এ পরীক্ষা দেন এবং সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন।

হরিনাথ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমান বা গর্ব করিতেন না। বাহির হইতে তাহাকে দেখিলে কেহ বুঝিতেই পারিত না যে, তিনিই এত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত! তাঁহার শিশুর ন্যায় সরলতা ছিল। স্বীয় গৃহে তিনি যখন নগ্নগাত্রে নগ্নপদে একখানি মোটা কাপড় পড়িয়া বজ্রবান্ধবের সহিত সরস গল্প করিতে করিতে কক্ষ-স্থল হাস্যকোলাহলে মুখরিত করিয়া তুলিতেন, তখন দূর হইতে তাহাকে দেখিলে ভ্রমেও কেহ ভাবিত না যে ইনিই স্বনামধন্য হরিনাথ দে! তিনি বিদ্বান ছিলেন, পদস্থ ছিলেন, তবু কি উচ্চ কি নীচ সকলের প্রতি তাঁহার ব্যবহার সমান বিনয়পূর্ণ, সমান উদার ছিল; তাঁহার অন্তর বাহির সমান ছিল।

হরিনাথ দে বিলাতফেরৎ ছিলেন, কিন্তু অশ্রদ্ধ

অধিকাংশ বিলাত ফেরতের বন্ধ সাহেবো ভাষণের ছিলেন না, অথবা সমাজ ত্যাগ করিয়া নব ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তিনি পিতৃপিতামহের ধর্মের আশ্রয়ে বর্ষায়সী মাতা ভ্রাতা ও অগ্রাগ্র আত্মীয়স্বজনের সহিত স্বীয় জীপুত্র লইয়া বাস করিতেন। হিন্দুর দেব দেবীতে তিনি প্রকৃত আস্থাভাবন ছিলেন কিনা জানি না, তবে তিনি যে দেশাচার ও কুলচার মানিয়া চলিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শুনিয়া অনেকে হয় ত নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, ইতিপূর্বে তাহার অস্থখ করিলে অনেকবার দেখিয়াছি তাঁহার জননী তাহাকে দেবতার চরণামৃত আনাইয়া দিয়াছেন, এবং তিনি বিধা না করিয়া উহা শিরে ধারণ করিয়া পান করিয়াছেন! তিনি যখন মৃত্যুশয্যায়া শয়িত, তখনও স্নেহময়ী জননী তাঁহার হাতে রক্তাবদ্ধনী ও নয়নে হোমধূমের কজ্জল পরাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু দেবতার আশীর্বাদও তাঁহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষিতে পারিল না!

যাহারা অনেক বড় বড় কথার মোহাই দেন, তাহারা তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ কালে বলিয়াছেন—তিনি আমাদের জন্ত নিজের অসৎ আদর্শ ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যান নাই। কিন্তু তিনি ত সময়ে চলিয়া যান নাই! তিনি যে সময়ের পূর্বেই মহাপ্রস্থান করিলেন। ভগবান্ তাহাকে কিছু রাখিয়া যাইবার অবকাশ দিলেন কই? তাঁহাকে কিছু লিখিবার কথা বলিলে তিনি বলিতেন, ‘শিখলাম কি যে লিখবো? এখনে! লিখিবার যথেষ্ট বাকী।’ জীবনক্ষেত্রে সমস্তই সম্মুখে পড়িয়াছিল, কার্যো নামিবার জন্ত সর্বোচ্চ উজোগ করিয়াছিলেন, জগতে জ্ঞানবুদ্ধির সূচনা হইয়াছিল মাত্র।

তাঁহার অসমাপ্ত লেখার বিষয়বৈচিত্র্য দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, কোনটাই সম্পূর্ণ নহে। কোনও বিষয়ে হয়ত দুই পাতা, কোথাও বা দুই লাইন, কোনও বিষয়ে হয়ত Synopsis মাত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন।

তিনি ভিক্ষাতীর্থ ও চীম ভাষা হইতে গ্রন্থাদি অনুবাদ

করিতেছিলেন; অমৃত বাবুব সরস গ্রন্থসন বাবুর ইংরাজী অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন; শঙ্করলালও একটি সরল ছন্দে ইংরাজী অনুবাদ করিতেছিলেন— তাহাও সম্পূর্ণ হয় নাই। মাত্র দুই অঙ্ক প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক পরিচালিত ‘ইন্ডেন্টস ম্যাগাজিন’ পত্রিকায় অধুনালুপ্ত নামক প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার স্বহস্তলিখিত অনুবাদটি আজও আমি সযত্নে রক্ষা করিতেছি; কি সুন্দর সুন্দর মত লেখা! ইহা ছাড়া তিনি বিভিন্ন দেশীয় কতকগুলি কবিতার ইংরাজী পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন, সেগুলি এক করিয়া মুদ্রিত করিলে একখানি সুন্দর পুস্তক হইতে পারে। তাহার অসংখ্য বন্ধ ও গুণগ্রাহী ভক্তদের ভিতর ইহা কেহ করিবেন কি?

তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ সাধ ছিল, বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বিবর্তন অনুসন্ধান করা; একথা তিনি নিজে আমাদের অনেক বার বলিয়াছেন। হায় অভাগিনী বঙ্গভাষা, অস্থায়ী জ্ঞানেন বাচিতরা থাকিলে দূর ভবিষ্যতে হরিনাথ তোষাকে কোন গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেন!

এরূপ এক জন মহৎ লোকের মৃত্যু দেশের দুর্ভাগ্য ও দৈবজ্ঞের চিহ্ন সন্দেহ নাই। আত্মীয়স্বজনের অশ্রুকাণ্ডের প্রার্থনা শত শত ভক্তের ও বন্ধুর হৃদয়ভেদী আবেদন তাঁহাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না! অকালে তিনি দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন, তথায় পরম সুখের অধিকারী হইয়াছেন, কিন্তু দেশ যে একটি রক্ত হারাইল! ভারত—ভারত কেন, সমগ্র জগৎ যে তাঁহার নিকট অনেক আশা করিয়াছিল! অতীতের তিমিরময় গর্ভ হইতে যে সকল জ্ঞানরত্ন আহরণ করিয়া তিনি জগতের সাহিত্যকে সৌন্দর্য্যশালী ও গৌরবান্বিত করিতে পারিতেন, আবার কেহ এমন আশিবে কি যে সেগুলির উদ্ধার সাধন করিতে পারিবে? না, এক হরিনাথের মৃত্যুতে রক্ত লুপ্তই থাকিয়া বাইবে? কে জানে নিম্নতির কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে কি আছে? তাঁহার নখর শরীর

আখির ১০১১

পঞ্চভূতে মিশাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্বর্গস্থ আত্মা
আজও তাঁহার শত শত ভক্তের ও বন্ধুর কর্ণে আশার বাণী
ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে! ভগবানের কাছে প্রার্থনা
করি, তাঁহার এই আশার বাণীতে প্রবুদ্ধ হউন, সেই
পরলোকগত মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহারই
আরও কর্তব্য নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করুন; নিশ্চয়ই
সকলের সমবেত চেষ্টায় তাহা সফল হইয়া তাঁহার
স্মৃতিকে চিরকালের জন্য উজ্জীবিত রাখিবে।

“He is not dead ! Though summoned to
the skies,
Still in our hearts he lives, and then will
reign ;
Still the dear memory will the power
retain

To teach us where our foremost duty lies,
Truth, justice, Honor, simple worth to prize,
And what our best have been to be again”

শ্রীঅবোধনাথ ঘোষ

নমস্কার

কি স্নিগ্ধ, মাধুরীমাখা মেহের অকল
বিছায়েছ ধরণীর গায়।

বিশ্বরপুলকে শুক, ভক্তিনত প্রাণ—
অপলক—স্থির নেত্রে চায়।

ফুলে ফুলে ঢেকেছ ভুবন,
প্রতি দলে রাখিয়াছ মধু।

বিবাদের নাহিকো আভাস,
ঢেলে দে'ছ মেহটুকু শুধু।

পবন গগনে বহে—ছুটে দিশি দিশি
তোমার সে বশের বারতা।

ভূমি সত্য, ভূমি প্রেম, ভূমি সনাতন,
চিরায়ত প্রাণের দেবতা।

নিশির আঁধার নাশি উবার কিরণ
ছুটে তব চরণ পরশে।

কুসুমের ফুল হাসি, নদীকলতান
জেগে উঠে তোমার দরশে।

যরুভূমি কর ফুলময়,
শুক কণ্ঠে ঢাল সুধা-বারা।

মৃদু আলো কর বিকীরণ—
পথ পায় চির পথ-হারা।

তুমি ছিলে, তুমি আছ, র'বে চির দিন
কোন কালে নাহিকো বিনাশ।
চিরতৃপ্ত, চির শান্ত, চির নির্বিকার,
পরিপূর্ণ প্রেমের বিকাশ।

অনন্ত প্রেমের বিন্দু পড়িলে হৃদয়ে
হাসে প্রাণে অমৃত কিরণ।
ফুলে যাই সুব্রহ্মাণ্ড স্বার্থের বারতা
টুটে য'র মায়ার বন্ধন।

বন্ধে রাধ তাপিত পরাণ
অশরণে কোলে দাও স্থান।
উচ্চ নীচ নাহিকো গণনা,
পাপ দণ্ডে কর পরিত্রাণ।

এ জগতে তুমি সব—সব তোমা ময়,—
অতুলন মহিমা অপার।
বিশ্বর পুলকে শুক, সরে না বচন—
নত শিরে করি নমস্কার।

শ্রীদেবেশনাথ ঠাকুর

ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদর্শ

সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে যেমন, তেমনি ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধেও প্রকৃত অর্থজ্ঞান না হইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এই জন্তই অর্থ পরিগ্রহ না করিয়া কেবল পাঠ করিলে বেদাদি পাঠের কোন ফল হয় না, ইহা শাস্ত্রে পরিষ্কার ভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

“ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তোষ্টো বৈভবেৎবিজ্ঞঃ ।

পাঠমাত্রাবসন্নস্ত পক্ষে গৌরবতিষ্ঠতি ।

অধীত্য বিধিবদেদং বেদার্থং ন বিচারয়েৎ ।

স সাধারণঃ শূদ্রকল্পঃ পাত্রতাং ন প্রপদ্যতে ॥” ইতি শব্দকল্পদ্রুমমুদিত কোর্মে উপরিভাগে ১৩শ অধ্যায়।

“কেবল বেদপাঠ করিয়াই বিজ্ঞ সন্তুষ্ট হইবে না।

কেবল পাঠ করিয়াই যে ক্লাস্ত হইয়া পড়ে, সে পক্ষে পতিত গরুর দশা প্রাপ্য হয়। যে বেদপাঠ করিয়া বেদের প্রকৃতার্থের বিচার না করে, সে পুত্রাদিসহ শূদ্রকল্প থাকে এবং কখনও যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না।” প্রকৃতপক্ষে যে শিক্ষাতে বিচারশক্তি না জন্মে সে শিক্ষাকে নিফল শিক্ষা মনে করিতে হয়। পণ্ডিতপ্রবর কাল্‌হিল লিখিয়াছেন যে, বোধ-শক্তি বিশেষ বরণীয় ঐশ্য বটে, কিন্তু অনেক সময়ই শিক্ষাতে তাহা অর্জিত হয় না; সুতরাং শিক্ষাও নিরর্থক হয়।

এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীন অনুশীলন দ্বারাই শিক্ষা ছাত্রের মানসিক প্রকৃতিতে পরিণত হইতে পারে। ইহাই প্রকৃত বিজ্ঞতা। কাল্‌হিল তদীয় শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে পূর্কোক্ত মৌলিক বিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে উৎকৃষ্ট মন্তব্য করিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এখানে উদ্ধৃত করা আমরা একান্ত কর্তব্য বোধ করি :—

“তোমাদের যেন মনে থাকে যে, পুস্তক ও শিক্ষার অন্তরালে, যাহাকে বিজ্ঞতা বলে, তাহার অর্জন বর্তমান রহিয়াছে। যে সমস্ত পদার্থ তোমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান ও যথার্থ

বিচারে সেই বিজ্ঞতা প্রকটিত হইয়া থাকে, এবং জ্ঞানপরিচয়তা, সরলতা, পরিষ্কার অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যবিষয়ে একান্ত আসক্তির সহিত আচরণের অভ্যাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥”

বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা না হইলে শিক্ষার্থী কখনও শিক্ষার প্রকৃত কল লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাতেই সংস্কৃত নীতিশাস্ত্র বলিতেছে,

“যন্ত নাস্তি স্বয়ংপ্রজ্ঞা শাস্ত্রং তন্ত করোতি কিম্ ।”

লোচনাভ্যাং বিহীনস্ত দর্পণঃ কিং করিস্ততি ॥”

“যাহার নিজের জ্ঞান নাই শাস্ত্র তাহার কি উপকার করিবে। যে জন হুঁচকিতে বঞ্চিত, দর্পণ তাহার কি উপকার করিবে?”

এখানে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে জ্ঞানই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। যে শিক্ষাতে জ্ঞানের বিকাশ হয় না, তাহা নিফল শিক্ষা। জ্ঞানের অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কিছুই উৎকৃষ্ট নহে। তাহাতেই শাস্ত্রে বলে, “জ্ঞানাৎ পরতরং নহি ।” কাল্‌হিলও জ্ঞানকেই সর্বোপরি স্থান প্রদান করিয়াছেন যথা :—‘জ্ঞান মহৎ, জ্ঞান অমূল্য। ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ বর্ণনাই অতিরঞ্জিত নহে। ইহা মনুষ্যের সর্বোৎকৃষ্ট অধিকার। যাহার জ্ঞান আছে, তিনিই শ্রেয়োলাভ করিয়াছেন।’ আমাদের পারজীবীমতে ‘ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়েৎ’ বলিয়া জ্ঞানের জন্তই আমরা প্রার্থনা করিয়া থাকি।

বস্তুর মূল তত্ত্ব জ্ঞান আমরা বিস্তারশেষ ফল বলিয়া উপরে উল্লেখ করিয়াছি। সমস্ত বস্তুর মূলতত্ত্বের জ্ঞানের দ্বারাই আমরা ঈশ্বর জ্ঞানে উপনীত হইতে পারি; কারণ পরমেশ্বর সমস্ত বিখ্যেরই মূলধার। সুতরাং শিক্ষার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় বলিয়া যে আমরা বলিয়াছি তাহাতে প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরজ্ঞানই বুঝাইয়া থাকে। এই ঈশ্বর জ্ঞান হইতেই আমরা মুক্তির অধিকারী হইতে পারি। বেদপাঠ ও বেদাচরণ দ্বারা ব্রহ্মচারী কিরূপে ক্রমে ক্রমে চরম ঈশ্বর তত্ত্বে উপনীত হয়, নিরোদ্ধৃত শাস্ত্র বিবরণ হইতে তাহা জানিতে পারা যাইবে যথা—

“গন্ধা বনং যো বিধিবজ্জহ্মাৎ জাতবেদসম্ ।

অধীকৃত সন্ধানিত্যং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সমাহিতঃ ॥

সাবিত্রীং শতরুদ্রীয়ং বেদান্তাংশ্চ বিশেষতঃ ।

অভ্যাসেৎ সততং যুক্তোত্তমজ্ঞানপরায়ণঃ ॥

এতদ্বিধানং পরমং পুরাণং বেদাগমে সম্যগিহেরিতং

বঃ ।

পুরামহর্ষি প্রবরাতি পৃষ্টে: স্বায়ম্ভুবো যম্মমুরাহ দেবঃ ॥

এতমীশ্বর সমীরিতং নরোযোহমুত্তিষ্ঠতি বিধিঃ

বিধানবিৎ ।

যোহজ্ঞানমপহায় সোহমুতোযাতি তৎপদমনাময়ং

শিবম্

শব্দকল্পদ্রুমযুক্ত কোশে উপরিভাগে ১৩শ অধ্যায় ।”

“যিনি বনে বাইয়া যথাবিধি অগ্নিতে হোম করেন, সর্বদা ব্রহ্মকে হৃদয় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সাবধান হইয়া সাবিত্রী ও শতরুদ্রীয় নিত্য পাঠ করেন, এবং বিশেষরূপে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন ; পক্ষান্তরে যিনি বিধানজ্ঞ হইয়া সংসার-বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ না হইয়া ভাস্করানপরায়ণ হইয়া পুরাকালে মহর্ষিশ্রেষ্ঠদিগের দ্বারা বেদ ও আগমে (তোমাদের জন্ত) সম্যক উপদিষ্ট এবং স্বায়ম্ভুব মমুর দ্বারা উক্ত ঈশ্বরাদিষ্ট বিধান সকলের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অজ্ঞান জাল ভেদ করিয়া মঙ্গলময় নিত্যপদ লাভ করতঃ অমর হইয়া থাকেন ।”

অতএব বিজ্ঞার দ্বারা ভবজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তপস্তায় যুক্তি লাভ হইবে, ইহাই বিজ্ঞার প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি ।

হিন্দুশাস্ত্রে এই জ্ঞানই বিজ্ঞাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে । এক ভাগ ‘পর্য বিজ্ঞা’, অপর ভাগ ‘অপর্য বিজ্ঞা’ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । পর্যবিজ্ঞা ধর্ম জীবনের বিশেষ উপযোগিনী, অপর্য বিজ্ঞা বৈষয়িক জীবনের বিশেষ উপযোগিনী । একটীতে ধর্মশিক্ষা প্রধান লক্ষ্য, অপরটীতে বৈষয়িক শিক্ষা প্রধান লক্ষ্য । পাশ্চাত্য General বা Secular এবং Religious বা Theological Education ও এই রূপেই কল্পিত হইয়াছে ।

কেবল জ্ঞান লাভই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া বলা যায় না । সেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য । তাহাতেই নীতিশাস্ত্রপ্রণেতা চাণক্য লিখিয়াছেন, “পুস্তকহা চ যা বিজ্ঞা পরহন্তগতং ধনং । কার্য্যকালে ন আয়াতি, ন সা বিজ্ঞা ন তদ্ধনম্ ॥” “যে বিজ্ঞা পুস্তকেই থাকে এবং যে ধন পরের হাতে থাকে, তাহা বিজ্ঞা বা ধন নয় ; কারণ তাহা কাজের সময় পাওয়া যায় না ।”

যেমন আহাৰ্য্যের পরিপাক না হইলে তাহাতে শরীরের পরিপোষণ হয় না, তেমনই অশিক্ষা না হইলে মানসিক কোন উন্নতিই সাধিত হয় না প্রভূত তাহা বিববৎ অপকারই করিয়া থাকে । তাহাতেই চাণক্য বলিয়াছেন, “দূরধীতা বিম্ববিজ্ঞা অজীর্ণে ভোজনং বিম্বম্ ॥”

যে শিক্ষা জীবনে প্রতিভাত না হয় তাহা প্রকৃত শিক্ষা নহে, তাহা অশিক্ষা বলিয়া বিবেচিত হওয়াই উচিত । শিক্ষা দ্বারা জীবন গঠিত হইলে, চরিত্র গঠিত হইলে, পৃথিবীর কার্য সাধিত হইলে, তবেই তাহা প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । ভারতে শেখোক্ত শিক্ষাটী কিরূপ উচ্চমর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং প্রথমোক্ত শিক্ষাটী কিরূপ অধঃকৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নোক্ত প্রচলিত বাক্য দুটি হইতেই জানিতে পারা যায়, যথা শাস্ত্রাধীত্যপি ভবন্তি মূর্খাঃ । যন্ত ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ ॥

শাস্ত্র পাঠ করিয়াও মূর্খ হইয়া থাকে । যে ক্রিয়াশীল সেই প্রকৃত বিদ্বান ।

“পঠকাঃ পাঠকা শৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ ।

‘সক্সে’ বাসনিনো মূর্খাঃ যঃ ক্রিয়াবান্ সঃ পণ্ডিতঃ ॥”

অধ্যয়নশীল, অধ্যাপক, আরও শাস্ত্রচিন্তাকারী সকলেই ব্যাসনাসক্ত এবং মূর্খ । যে ক্রিয়াশীল সেই পণ্ডিত ।

এখানে শিক্ষার কার্য্যে তৎপরতার যেমন নিরতিশয় প্রশংসা দেয়া যায়, পণ্ডিতপ্রবর কালহীনের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবেও তজ্জ প্রশংসাই দেয়া যায় যথা—

“তখন বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ভূমি বধনু নিজে স্বাধীন ভাবে অধ্যয়নে নিরত হইবে, ভূমি যে কার্য্যক্ষেত্র নির্বাচন করিয়াছে—বাহা তোমার কৃতির অমূল্যরূপ—

সাহায্যে তুমি অধ্যয়ন ও কার্য্য করিতে পার—তাহা তোমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন বলিয়াই বোধ হইবে। পৃথিবীর মধ্যে সেই লোকই সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য যে পৃথিবীতে তাহাকে কি কার্য্য করিতে হইবে বলিতে পারে না, যে তাহার জ্ঞান পৃথিবীতে কোন কার্য্য নির্দিষ্ট দেখিতে পায় না ও তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না।”

গ্রন্থাদি পাঠের অভ্যাস যে ছাত্রাদির পক্ষে বিশেষ রূপে প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা “আবৃত্তি সৰ্ব্ব শাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী”, এই প্রচলিত কথা হইতেও প্রমাণ হয়। গ্রন্থাদি সংগ্রহ অর্থাৎ নিজের একটী পাঠ্যপুস্তকের মত সংস্থাপনও যে জ্ঞান সঞ্চয়ের পক্ষে নিতান্ত উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইত তৎসম্বন্ধে ও একটী সুন্দর কথা প্রচলিত আছে যথা “গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ।” “গ্রন্থ থাকিলেই পণ্ডিত হয়।”

অধ্যয়নের কি কি উপকরণ পুরাকালে বর্তমান ছিল তৎসম্বন্ধে অল্পসন্ধান করিলে, গ্রন্থ পাঠ হইত এবং তাহা ভূজ্জবকলে বা তালপত্রাদিতে লিখিত হইত, তাহাই আমরা জানিতে পারি। এই জন্যই ভূজ্জবকলের এক নাম “বিজ্ঞানদল” এবং তালপত্রাদি হইতেই পুস্তকের পাতার নাম “পত্র” হইয়াছে। পত্রগুলি যে সূত্রেব দ্বারা একত্র গ্রথিত হইত, গ্রন্থ নামের দ্বারা তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা শিক্ষাজীবনের পরই গার্হস্থ্যশ্রম অর্থাৎ সাংসারিক জীবন। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গার্হস্থ্যশ্রমকেই আপনার সুবিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রের ত্রায় সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে পাইত।

ব্রহ্মচারী জীবন বা ছাত্রজীবন সাধারণতঃ ২২ বৎসর ব্যাপী হইত। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় দারপরিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। অষ্টম বর্ষে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচারী গুরুর হস্তে অর্পিত হইত, এবং ২২ বৎসর পরে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইত। অন্তর্য্যাম গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবেশের সময় তাহার বয়স ত্রিংশৎ বৎসর। সমাপ্তাবস্থা ত্রিংশদ্বর্ষ যুবক গৃহস্থ্যশ্রমে প্রবেশ করিয়াই দারপরিগ্রহ করিত; যথা “ত্রিংশদ্বর্ষোবহৎ

কন্ধ্যাং হৃন্ধ্যাং দাদশবার্ষিকীম্॥” যন্ত্রতে বিশেষ স্থলে ছত্রিশ বৎসর পাঠেরও উল্লেখ আছে, যথা,

“যটু ত্রিংশদাদিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্। তদর্জিকং বার্কিকংবা গ্রহণান্তিকম্বেববা॥ বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদংবাপি যথাক্রমম্। অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থ্যশ্রমমাবসেৎ॥”

“ব্রহ্মচারী গুরুস্থলে বাসকরতঃ যটুত্রিংশদ্বর্ষ ব্যাপিয়া ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয় অধ্যয়নরূপ ব্রতচরণ করিবেন, বা অষ্টাদশ বৎসর ব্যাপিয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন, কিংবা নয়বৎসর বেদত্রয় অধ্যয়ন করিবেন; অথবা যাবৎ পরিমিত কাল এই বেদত্রয় অধ্যয়ন করিতে পারেন, ততকাল গুরু গৃহে অবস্থিতি করিয়া অধ্যয়ন করিবে।

স্নাতক ব্রহ্মচারী স্বধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া যথাক্রমে বেদশাখাত্রয় বা বেদশাখাদ্বয় অথবা একমাত্র বেদশাখা অধ্যয়ন করিয়া, কৃতদার হইয়া গৃহস্থ্যশ্রমে বসতি করিবেন।”

পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য সন্দর্শন করিয়া আমাদেরগকে সন্নিবেশ বিম্বিত হইতে হয়। আমাদের ব্রহ্মচারীগণ যেমন ভিক্ষা বা শিক্ষক প্রদত্ত অন্নের উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রজীবন যাপন করিত, পাশ্চাত্য বিদ্যালয়েও ভিক্ষা বা বৃত্তির উপরই ছাত্রকে নির্ভর করিতে হইত। পাশ্চাত্য কলেজ (College) নামটির প্রধান প্রতিপাদ্যই ভিক্ষা বা বৃত্তি বিতরণ। আমাদের শিক্ষা যেমন পবিত্র আশ্রমে বা মঠে হইত, পাশ্চাত্য ছাত্রদিগের শিক্ষাও তেমনিই ধর্ম্ম মন্দিরে বা মঠে হইত। আমাদের মধ্যে যেমন কুমার থাকিয়া শিক্ষা শেষ করিবার নিয়ম ছিল, পাশ্চাত্য দিগের মধ্যেও তজ্রূপ কুমার থাকিয়াই শিক্ষার শেষ করিবার নিয়ম; তাহাতেই এখনও তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ উপাধি Bachelor (কুমার)। এই উপাধি লাভ করিবার পূর্বে ছাত্রদিগকে লিখিত বা মৌখিক বিচারে আপনাদের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে হইত।

আবিস ১০১১

সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে উত্তরপক্ষ অবগদন করিয়া নির্বাচিত দুই বা ততোধিক প্রতিপক্ষের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইত। যে সমস্ত শিক্ষক এই বিচারে অধ্যক্ষতা করিতেন, তাঁহারা মধ্যস্থ বলিয়া কথিত হইতেন। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের Wrangler উপাধিটীর অর্থানুধাবন করিলে ইহার মূলে এক পকার বিচারপ্রণালী বর্তমান থাকারই যেন প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের চতুর্ঙ্গাণীতে বৈরূপ তর্কবিতর্ক দ্বারা ছাত্রদিগের অধ্যয়ন ও শিক্ষা হইয়া থাকে, পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়েও তেমন তর্কবিতর্ক দ্বারাই বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা হইত।

আমাদের বর্তমান চতুর্ঙ্গাণীর উপাধি ও সভায়ও পূর্বোক্ত বিচারপ্রণালী আজ্ঞামান নিদর্শনই দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতদিগের তর্কচূড়ামণি তর্কভূষণ তর্কপঞ্চানন তর্কবাগীশ প্রভৃতি উপাধি বিচারনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া থাকে। পণ্ডিতদিগের আহুত সভায় এখনও পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ এই দুই পক্ষ বিভাগ হইয় বিচার হইয়া থাকে, এবং প্রবীণ অধ্যাপকগণ মধ্যস্থতা করিয়া থাকেন।

পাশ্চাত্য প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর যে চিত্রাভাস আমরা উপরে প্রদান করিয়াছি পাঠকদিগের কৌতুহল পরিভূষ্টির জন্য পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস হইতে আমরা তাহার মূলদর্শনী এখানে তুলিয়া দিতেছি :—

The word College or Collegium, may have been derived from the Latin word College, I collect or gather ; and the academic gatherings from which College arose very probably took place in connection with Churches and monasteries simply for the reception of alms to which subsequently a condition was added to learn and perform something for the service of the Church. In England the legal definition of a College is that it is an eleemosynary lay Corporation, because its object is perpetual dis-

tribution of alms in the shape of stipends. Even in our times, we have seen alms-houses converted into work-houses, and prisons into reformatory and industrial institutions.

The exercises by which the competency of the Scholars was determined were first of a private character and were carried on in the schools of the respective teachers at stated periods and were called disputations, determination, responses. They were afterwards converted into general and public academic Solemnities. The candidate took part in the private disputations of the schools in order to make himself known to the teachers, and he gave cursory lectures.

These public exercises were exacted after the candidate was emancipated from his teacher's scholarship but was still under his auspices and patronage and eventually gave rise to the distinction called the Baccalaureate or the Bachelor. Up to the 12th century the bachelor's position was looked upon as a scholastic step simply.

Still subject to the superintendence and patronage of his teacher, the candidate for the license was bound to attend lectures on specified subjects and to terminate his career of study by an "Act" which in those times signified "the delivery of some specimen of erudition in the shape of a thesis or oration, or disputation in which the candidate proposed to maintain and defend a proposition, true or false, and was called the respondent, because he answered to the objections of two or three others selected

for the purpose, and hence called opponents ; and the masters presiding over the disputation were called moderators." A Manual on Universities, by William Masters.

ঋষিগণই শিক্ষাশুক্র পদে বরিত হইতেন বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি । কিন্তু হিন্দুগণ একরূপ সঙ্গীর্ণমনা ছিলেন না যে ঋষি ব্যতিরিক্ত উপযুক্ত গুণী ব্যক্তিকে শিক্ষাশুক্রর ন্যায় অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেন । তাহাতেই যে মনু নব্য শিক্ষিতের নিকট অমুদারতার অপবাদ গ্রস্ত হইয়া থাকেন, তিনিও হুই স্থানে যুক্তকণ্ঠে সেই অধিকারের বিধি প্রদান করিয়া গিয়াছেন ; যথা—শ্রদ্ধানঃ ভূতঃ বিজ্ঞানাদদীতেতরাদপি । ২৮৮, ২য় অধ্যায় ।

“শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর ভাতি হইতেও উত্তম বস্তু গ্রহণ করিবে ।”

“অত্রাক্ষণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে । অমুত্রজ্যা চ শুক্রবা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ ॥” ২৪৬, ২ অধ্যায় ।

“ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের অভাবে অত্রাক্ষণের নিকটও অধ্যয়ন করিতে পারে । যে পর্য্যন্ত গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিবে সে পর্য্যন্ত তাঁহার অমুগমন ও শুক্রবা করিবে ।”

পূর্বোক্ত শাস্ত্র-বিধান প্রকৃত কার্য পরিণত হইয়াছিল কি না এ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহের কারণ থাকিলে “নীচাদপ্যুত্তমাবিজ্ঞা” এই সুপ্রচলিত নীতিবাক্য দ্বরণ করিয়েই ভদ্রীর সংশয় অপনোদিত হইতে পারে । কারণ বিধি বা বিধান যেমন শাস্ত্রের উপদিষ্ট নিয়ম, নীতি তেমনই সাধারণের পালিত নিয়ম ।

ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদর্শের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা করিয়া আসিলাম । উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে বিজ্ঞা বিদ্যান্ ও বিজ্ঞাশুক্রকে ভারতবর্ষ যেরূপ উচ্চমর্যাদা প্রদান করিয়াছে, পৃথিবীর আর কোনও দেশে কখনও সেরূপ উচ্চ মর্যাদা প্রদর্শন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি । এখানে আমরা আমাদের উক্তির সমর্থনে নিত্যপ্রচলিত কয়েকটি নীতিবাক্য

উদ্ধৃত করিতেছি, তৎসমস্ত দ্বারাই আমাদের কথায় যথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদিত হইবে । যথা, বিজ্ঞার মর্যাদা—

সর্কদ্রব্যোষু বিদ্যোব জব্যাহরমুত্তমম্ । অহাৰ্যাদানর্থ-
বাদক্ষয়জাচ্চ সর্কদা ॥”

“সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বিজ্ঞাই অমুত্তম দ্রব্য, কারণ ইহা অপহরণ করিতে পারে না । ইহা অমূল্য এবং সর্কদাই অক্ষয় ।”

“বিজ্ঞারত্ন মহাধনম্ ।” বিজ্ঞা বড় মহামূল্য ধন ।
বিদ্যানের মর্যাদা—“বিদ্বদ্বক নৃপত্বংচ নৈব তুলাং কদাচন ।

বদেবে পুত্র্যতে রাজা বিদ্বান সর্ক পুত্র্যতে ॥

“বিজ্ঞাবস্ত ও নৃপত্ব কখনও তুলা নহে । রাজা মাত্র বদেবে পুত্রিত হন, বিদ্বান সর্কত্রই পুত্রিত হন ।

“অকুলীনোহপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈতরপি পুত্র্যতে ।”

“শাস্ত্রজ্ঞ কুলহীন হইলেও দেবতাদিগের দ্বারা পুত্রিত হন ।”

শুক্রমর্যাদা—একমপাক্ষরংবস্ত গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ ।

পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্ ব্যং যদ্বদা সোহনৃণীতবেৎ ॥

“যে গুরু এক অক্ষরও শিষ্যকে শিক্ষাদান করেন, পৃথিবীতে এমন বস্তু নাই, যাহা দিয়া শিষ্য গুরুর সেই ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে ।”

“ন চ বিজ্ঞা সমোবজ্ঞু নাস্তি কশ্চিৎ গুরোঃ পরঃ ॥”

“বিজ্ঞার সমান বজ্ঞু নাই, এবং গুরু হইতে অধিক মাত্র আর কেহ নাই ॥”

বিজ্ঞার প্রভাব সম্বন্ধেও আমরা সবিশেষ উজ্জল বর্ণনা প্রাপ্ত হই, যথা—“বিজ্ঞা নাম কুরুপুরুপমধিকং, প্রচ্ছন্ন মন্ত-
র্জনং । বিজ্ঞা সাধুজনপ্রিয়া শুচিকরী বিজ্ঞা গুরুণাং গুরুঃ ॥ বিজ্ঞা বজ্ঞুজনার্জিনাশকরী বিজ্ঞা পরং দেবতা । বিজ্ঞা ভোগ্যযশঃ কুলোন্নতিকরী বিজ্ঞাবিহীনঃ পশু ॥”

“বিজ্ঞা কুরুপদিগের অধিকরূপ । ইহা গুঢ় মানস ধন ইহা সাধু লোকদিগের প্রীতির বস্তু । ইহা উজ্জল প্রভা সম্পাদন কারী । ইহা সর্কশ্রেষ্ঠ গুরু । ইহা বজ্ঞুদিগের পীড়াকরকারী ইহা পরম দেবতা, ইহা ভোগ্যযশঃকরী, কুলোন্নতিবিধায়িনী । বিন্যাহীন লোক পশুতুল্য ।

আবিন ১০১৯

চাণক্য বলিয়াছেন “বিদ্যা সর্বস্য ভূষণম্ ॥” “বিদ্যা সকলেরই অলঙ্কারস্বরূপ।” চাণক্য আরও বলিয়াছেন— “বিদ্যা সমস্ত গুণের আকর এবং অজ্ঞতা সমস্ত দোষের আধার; সুতরাং সহস্র মূৰ্খ অপেক্ষাও এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অধিক বৈশিষ্ট্য, যথা—

“পণ্ডিতেচ গুণাঃ সর্বে মূর্খে দোষাহি কেবলম্ ।

তস্মান্মুখসহস্রেণ প্রাজ্ঞ একোবিশিষ্যতে ॥”

উক্ত বাক্য সকল হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে ভারতে বিদ্যার মাহাত্ম্যই সর্বোপরি স্বীকৃত হইয়াছে।

শিক্ষক দ্বারা আমাদের জীবনে যে ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপাদিত হয়, তৎসম্বন্ধে আমাদের নীতি শাস্ত্রের সাধারণ ভাবের যে একটি বাক্য প্রচলিত আছে তাহাতে আমরা প্রাচীন আৰ্য্য শিক্ষার অতীব সুন্দর একটি সংক্ষিপ্ত আদর্শ প্রাপ্ত হই! সেই বাক্যটি এই—

“বিদ্যা দদাতি বি-য়ং বিনয়ং যতি পাত্রতাম্ ।

পাত্রদ্বাদ্বনমাপ্নোতি ধনাক্ষয়ং ততঃ সুখম্ ॥”

বিদ্যা হইতে বিনয় (নম্র ভাব) হয়, বিনয় হইতে যোগ্যতা জন্মে, যোগ্যতা হইতে ধনোপার্জন হয়। ধন হইতে ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এখানে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে বিদ্যানুশীলন করিলে আমাদের বিনয়গুণ জন্মিবে। বিনয়গুণের দ্বারা আমরা যোগ্য হইতে পারিব। যোগ্য হইলে আমাদের ধনলাভ হইবে। ধনের দ্বারা আমরা ধর্ম্মকার্য্য করিতে সমর্থ হইব। তাহার ফলে আমরা নির্মল সুখ লাভি ভোগ করিয়া জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিব। বিদ্যার দ্বারা লোক জানী হইয়া সংপদ ও ধর্ম্মপদ অহুসরণ করতঃ এইরূপেই জীবনের সকলতা লাভ করে। সুতরাং বিদ্বান ব্যক্তি বৈবয়িক কার্য্যের মধ্যেও আপনার জ্ঞানপ্রভাবে ধর্ম্মের বিমল আনন্দকে চরম লক্ষ্য জানিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হন। ইহাই উক্ত নীতিবাক্যটির প্রকৃত তাৎপর্য্য। অতএব ধর্ম্ম ও ভজ্ঞনিত বিপুল দ্বারা মুখ্যই যে আৰ্য্যদিগের শিক্ষার শেষ লক্ষ্য তাহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

আর্য্যগণ জানিতেন যে জীবনের পূর্ণ পরিণতির জন্য বিদ্বান্জনই প্রথম আবশ্যক। বিদ্বান্জনে আরম্ভ হইয়া বিসর্জনে জীবনের পূর্ণতা সাধিত হয়। এই পূর্ণতা সাধিত হইলে নিরবচ্ছিন্ন পরম সুখে জীবনের চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে। তাহাতেই তাঁহারা বলিয়াছেন,

“প্রথমে নার্কিতা বিদ্বা বিতীরেনার্কিতং ধনম্ । তৃতীয়ে নার্কিতো ধর্ম্মঃ চতুর্থে কিং করিষ্যতি ॥”

এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে শিক্ষার আদিতে যেমন ধর্ম্মের যোগ অন্তেও তেমনই ধর্ম্মেরই যোগ। ইহা হইতে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে আৰ্য্যদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণ ধর্ম্মাত্মক শিক্ষা ছিল, বর্তমানবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ত্যায় তাহা ধর্ম্মহীন শিক্ষা ছিল না।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি শিক্ষার প্রতি আদর, বিদ্যার প্রতি সম্মান, ধর্ম্মের প্রতি অনু-রাগ, উন্নত জ্ঞান ও উন্নত সভ্যতার পরিমাপক হয়, তবে ভারতবর্ষ যে একসময়ে জ্ঞান ও সভ্যতার চরম সীমায় অধিরোধণ করিয়াছিল, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীতলচন্দ্র চক্রবর্তী ।

দর্পহারী ভগবান

(১)

শ্রীযুক্ত হরকিশোর বাবু মফঃস্বলের এক সহরে মৃত্ত এক পাটের আফিসের বড় বাবু। তাঁহারই হাতে বড় বড় তিন তিনটা কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে, সুতরাং ঘরে রক্ত খণ্ডের কোন অভাব ছিল না। তবে যে আজও চাকুরী ইন্তকা দেন নাই, সেটা নিতান্ত মধ্ করিয়া। সে বা হ'ক, সম্প্রতি ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লইয়া তিনি বড় পোলের মধ্যেই পড়িয়াছেন। বয়স বিয়ান্নিশ পার হয় নাই, এ কথা নূতন গৃহিনীকে বুঝাইয়া দিতে তিনি কখনো চেষ্টার কল্পন করেন নাই, অথচ ইহাতে যে একটা “কিন্তু”র পোলযোগ

ধাকিয়া যাইত, তাহা উত্তর পক্ষের কাহারও অপোচর থাকিত না। কোষ্ঠীপত্রে এ সম্বন্ধে জ্যোতিষী ঠাকুর যে একটা গুরুতর সন্মত সংবাদ লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা প্রমাণের জন্য বিশেষ সাক্ষীসাবুদেরও প্রয়োজন ছিল না। হৃদয়ে যৌবনমত্ততার তরঙ্গ ছিল না। হরদম্ হাত পাখা চালাইয়াও মরা গঙ্গায় কিছুতেই ঢেউ উঠিত না। মনের নীচে এমন অবস্থায় ভাটার টান যখন অত্যন্ত প্রবল, তখন হরকিশোর বাবু মনের জিনিষ ছাড়িয়া দিয়া, দোকানের জিনিষ দিয়া, নব যুবতীর মন হরণের জন্য অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু, এই ভাবে রক্তমঞ্চের উপর সীন টানাটিয়া, মিথ্যাকে স্বপ্নের তবকে জড়াইয়া যদি সত্যকে ঢাকা দিয়া রাখা যাইত, তবে অবশ্য সংসার স্তব্ধের হইত। হরকিশোর বাবু এ ক্ষেত্রে নিজের ক্রটি দেখিতে না পাইয়া মনে মনে কেবল পত্নী লীলাকেই দোষী সাব্যস্ত করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, লীলা যেন হল্করা ভাসের হরতনের বিবিটি, তার রূপ আছে, যৌবন আছে, পারিপাট্যের বাহার আছে, কিন্তু হৃদয় নাই! তাহাতে ঘর সাজানো যায়, কিন্তু মন সাজানো যায় না! তবু শরীরে যত দিন বল ছিল, বিশেষতঃ মনে যত দিন অহঙ্কার ছিল, তত দিন এক রকমে কাটিয়াছে; কিন্তু এই ভাটির মুখে, হরকিশোর বাবু নিজেকে লইয়া নিজে বড় আরাধ্যে ছিলেন না।

(২)

সে দিন হরকিশোর বাবু দুপুর বেলা ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত ক্লান্ত দেহটাকে কষ্টে টানিয়া লইয়া, আফিস হইতে ঘরে ফিরিলেন। স্নানাহার তাড়াতাড়ি সারিয়া লইয়া আবার ২টা ৩০ মিনিটের সময়, পাটের দাদনের টাকার হিসাব বুঝ করিয়া দিতে হইবে। দুই দিন দেবী হইয়াছে বলিয়া সকালে বড় সাহেব বড় তস্কি করিয়াছেন। আবার মাগ। চারি দিকের সবুজ গাছ পালার উপর যেন একটি সজলতা ছলছল করিতেছে। সারা আকাশময় একটা অবয়বহীন মেঘের বিষণ্ণতা;—তার মাঝে এক জায়গায় উজ্জল কুজাটিকার তায় একটা তেজের আভাস স্বর্গদেবের নিকটস্থ হুচনা করিতেছে।

হরকিশোর বাবুর বাড়ীর পেছনে একটি ছোট খাল। বর্ষার কপিল জল তার দুই কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পানাগুলি সারি বাঁধিয়া সবুজ তারার ছিন্ন হারের মত জলের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। লীলা সেই খালের ঘাটে একটা পড়া গাছের গোড়ার উপর বসিয়া আন-মনে হাতে বার বার সাবান মাখিতেছিল, আবার জল দিয়া ধুইয়া ধুইয়া বার বার তার স্বচ্ছ, গোণার চূড়িপরী হাতখানি দেখিতেছিল। জলে ছায়া তার অঙ্কুরণ করিতেছিল। পাশে একটা কামিনী ফুলের গাছ ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। তার নীচে কয়েকটি পাতি হাঁস কাছাকাছি হইয়া বসিয়াছিল। একটা বড় সবুজ গোল পাতার উপর একটি অকাল পক্ষের কুঁড়ি লীলার পায়ের কাছে তার আরক্তিম মুখখানি তুলিয়া ধরিয়াছে।

লীলাকে এমন সময় একাকী ঘাটে দেখিতে পাইয়া হরকিশোর বাবু বড় আমোদ পাইলেন না, অগত আসল মনের কথাটা ব্যক্ত করিতেও সাহস পাইলেন না। একে হিসাবের চিন্তা, তার উপর সাহেবের কড়া হুকুম, তার উপর জুধা! এই ত্রাহস্পর্শের জালায় লীলাকে এমন মধুর ভাব-রাজ্যের মধ্যে লাগাল পাইয়াও তিনি নিজের মনে যে যথেষ্ট কাব্যের উদ্ভেদনা অনুভব করিলেন না, সে জন্য তিনি বঙ্গদেশের সমুদয় দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী-সম্মদায়ের নিকট বিশেষ ভাবে মার্জনীয়।

হরকিশোর বাবু কল-তলায় তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া খাবার ঘরে আসিয়া দেখেন, লীলা তখনো বসিয়া বসিয়া হাতে সাবানই মাখিতেছে! এবার তিনি মনে মনে বিলক্ষণ চটিয়া উঠিলেন। তবু ত দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। স্মৃতি তাই কিছু নামাইয়া লইয়া ডাকিলেন,—

“লীলা, ও লীলা! আজকে কি চলিল ঘটা খালি স্নানযাত্রাই চলবে, না, কারো খাবার টাবার মধ্যে শুনে দিতে হবে!”

লীলার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া রজনী গাঘরা দিয়া চুল হইতে জল মুছিতে মুছিতে ভিজা কাপড়ে তার স্বামীর নিকট হাজির হইল। হাসি

আশ্বিন ১৩১৮

হাসি মুখখানির চারি ধারে কুঞ্চিত কুন্তল রাশি, দেখিতে ঘেঘের ঝালরের মত। হরকিশোর বাবুর মনে হইতে-ছিল, বুঝি বা প্রারুট-লক্ষী শস্ত্রশ্রামল প্রান্তর ভুলিয়া গিয়া সিন্ধু বসনে আজ তাঁর দীন-ভবনে আসিয়া উদ্ভিত হইয়াছেন। মনের অবস্থাটা খুব হালুকা থাকিলে ভক্তিতরে সে দিন হরকিশোর বাবু যে কি করিয়া ফেলিতেন তা বলা যায় না। কিন্তু জী-জাতির, বিশেষতঃ দ্বিতীয়পক্ষপ্রস্তাদিগের বিশেষ দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁর মনটা সে দিন নিতান্ত বিরল—কে যেন তাতে যথেষ্ট পরিমাণে ‘কষ্টিক লোসন’ মাখাইয়া দিয়াছিল।

নিজের মন যখন তিত্ত থাকে, তখন সমুদয় ছুনিয়াটাই বিরল বোধ হয়। লীলা হরকিশোর বাবুর আহ্বারের খোঁগাড় করিয়া দিল। কিন্তু আহ্বারে বসিয়াই তিনি মুখটা বেজায় বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কি রান্নাই করেচ মাথা মুণ্ড! ডালনাটা ত কেউ মুখে দিতে পারে না, অত ঝাল! দেখ, রাগ করো না, লীলা, পেটের জন্টাই তো এত ঝকঝক! যে রোজগার করে, তারো তো দুমুঠা খেতে হবে! কি ছাই খাব, এ সব খেয়ে খেয়ে ডিসপেনসিয়া ধরে গেল! কাল মাছের ঝোলটা খুন দিয়ে পুড়িয়ে রেখেছিলে, আজকে এ ভাব।”

লীলার মুখের উপর তখন একটা খণ্ডপ্রলয়ের মেঘ ঘনাইয়া উঠিয়াছে। প্রায় বর্ষণোন্মুখ! কিন্তু আজ হরকিশোর বাবু কিছুতেই খাবড়াইলেন না। সাহেব আজ তাঁহাকে বেশ কড়া রকমের দম দিয়াই বাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন।

লীলা বলিল, “তা আর কি করবো বল! পরশু অত করে তোমার জন্ট ডিমের ‘কারি’ করে দিলাম, নলিনী দিদি নিজে দেখিয়ে দিলে। তুমি তো দেখেই চীৎকার দিয়ে উঠলে, এত মসলা দিয়ে রেখেছ, হজম করবে কে? সে দিন ইলিশ মাছ দিয়ে ঝোল হলো, টক হলো, তুমি ত চাকরটাকেই বকে অস্থির—বেটা বারো আনার মাছ আনালি কি বলে! পরশু দিবে একটি, গান শুনবে

অকুর হয়ণ। তা আমাকে নিয়ে যদি তোমার অসুবিধা হয়, তো আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেই চলে।”

লীলা যখন শরাসন ধারণ করিয়া হরকিশোর বাবুর প্রতি শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিল, পাটের বড়-বাবু তখন কিছু দমিয়া গেলেন। পরে আপোষের ভাবে কহিলেন, “আহা; রাগ করুচ কেন, লীলা, আমি তোমায় কিছু বলছি না। আমার পেটটাই হচ্ছে বড় ধারাপ। যা খেয়ে হজম কতে পারব না, মনে হয়, তা দেখেই খাবড়ে যাই! আর তুমি যখন হচ্ছ আমার জী—ঘরের লক্ষী, তখন আমার সুবিধা অসুবিধা সব তো তোমাকেই বলতে হবে! কেমন, তাই নয় কি, লীলা?”

লীলাও আপোষের প্রস্তাবে কোনও দিনই বিমুখ নয়। আপন হৃদয়ের সঙ্গে আপোষ করিয়াই ত সে হরকিশোর বাবুর সংসারে আত্মবিসর্জন করিতে আসিয়াছে। নতুবা লীলার পক্ষে হরকিশোর বাবুর ধর করা অসম্ভব। তিনি তার ঠাকুরদাদার বয়সী!

লীলা একটু সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল, “তা-তো-বটেই!” হরকিশোর বাবু বলিলেন, “এই দেখ, তপসী মাছটা অত নরম করে ভাজতে হয় না—ভেতরটা কাটাই রয়ে গেছে।”

লীলা নাকের নোলকটাতে একটা প্রবল নাড়া দিয়া বলিল, “আহা, তাকি আর আমি জানি! কড়া ভাজলে তোমার যে আবার পেটে সয় না! শ্যাম রাখবো না এখন কুল রাখবো?”

হরকিশোর বাবু আরো কয়েক ঘাট খাদে নামিয়া বলিলেন, “আহা, চট কেন লীলা; আমি কি আর বলছি তুমি পার না! মোদা কথাটা হচ্ছে এই যে, পেটের অবস্থা বুঝে রান্নাটার মাঝে একটু রকম সন্ধ্যা করে নিতে হয়। কিন্তু তাই বলে একেবারে কড়া মাছ খাওয়া—তা হলে রান্না করার ত আর দরকার দেখি না।”

এবার একেবারে ধারা-বর্ষণ!

পরে লীলা অশ্রুজ্বলিত হয়ে বলিল, “তোমার ঘরে যখন টাকার ছুঁখু ছিল না, তখন দেখে শুনে একটা

জ্যোৎস্না ঘরে আনলেই হতো! আমার না আছে রূপ না আছে গুণ, এমন অকর্ম্মার ঢেঁকী আমি!”

কথাগুলির ভিতর দিয়া আহত চার্গকনীর তৃষ্ণা ও নিরাশার বেদনা দুইই অতি করুণ সুরে ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল।

হরকিশোর বাবু ভাবিলেন, কথা যখন ফুটিয়াছে, তখন যুবতীর জন্য আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। পরে ভাব-গদাগর কর্তে বলিলেন,—

“পাগলামি করো না লীলা! তোমার রান্নায় কোন খুঁত নাই! তবে কি না ডিস্‌পেন্সিয়ার মুখ, সর্বদাই বিরস; আর মেজাজটা আমার সব সময় ঠিক থাকে না! কখন যে কি বগে ফেলি, ঠাইর থাকে না।”

লীলা তার মুখে চুপ্ করিয়া থাকিল, “সান্নেহহীণ হৃদয়মগ্নিনী ন প্রবুদ্ধা ন স্তুভা।”

হরকিশোর বাবু বেশ একটু ফেনাইয়া কথাটা পাড়িলেন—“জান কি লীলা, যেমন তেমন লোকের যে সে রকম রান্না হলেই এক রকম চলে যায়। কিন্তু আমাদের বংশে কেউ খারাপ রান্না কখনো দেখে নাই। আমাদের পলিশপুরে আজো মা দিদির লোকে কত সূখ্যাতি করে, কেবল এই জন্তে! আমি বেটা ছেলে, কিন্তু এক বার হাতা বেড়ী নিয়ে যদি লেগে যাই, তবে একেবারে ফেলে দিতে পারবো না! মোট কথা, এ বিজ্ঞাটা বংশানুক্রমে আমাদের মধ্যে চলে আসছে এখন একেবারে মজাগত হয়ে পড়েছে।”

লীলা হরকিশোর বাবুর কথা শুনিয়া অতি সংক্ষেপে এমন ভাবে একটা “হঁ” করিয়া জবাব দিল, তাহাতে সে যে তাঁহার কথাগুলো সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল, এমন বোধ হইল না! স্বামীর কথার উপর আবার সন্দেহ! শুধু লীলার উপর কেন, তিনি বাংলা মূল্যের ময়ূর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-সম্প্রদায়ের উপর আন্তরিক চটিয়া গেলেন। কিন্তু নেটা খুব মনে মনে। কারণ এক বার হার মানিয়াছেন, পুনরায় লীলার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিলেন না! পরে একটু

কাঁঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, “যা হোক, এখন থেকে রান্নার উপর তোমার খুব ঝোঁক হবে আশা করি।”

লীলা হাসিয়া বলিল, “আশা অমর, মরণ কাল! আমার বাপের কুলে রান্নারান্নার কোন কালে তেমন নাম ছিল না! কাজেই আমি যে তোমার ‘আশা’ এ জন্যে পূরণ করে যেতে পারবো, আমার তো তেমন ভরসা হচ্ছে না।”

হরকিশোর বাবু দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর স্বামী; কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিবার লোক নন। বক্তৃতাটা অল্পপুরে যে বিশেষ কাজে লাগে, প্রথম বিবাহের পর হইতেই সে কথা হরকিশোর বাবু জানিতেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণির সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, “বল কি লীলা, তোমরা না পার কি? চোখের জলে তোমরা জিভুবন জয় করে রেখেছ!”

লীলা খুসী হইল। সে যে এমন হাতে হাতে সাট-ফিকেট পাইবে, এতটা মনে করে নাই। মনে মনে কি একটা ফন্দি আঁটিয়া লইয়া লীলা বলিল,

“তুমি মাহের দমটা খুব পদন্দ কর, না?”

হরকিশোর বাবু খুব উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, “ঠিক ঠিক বলেছ লীলা! তুমি যে দিন যে দমটা রান্না করেছিলে তা বেশ হয়েছিল। তবে কি না মাছটা একটু শক্ত ছিল, আর ঝোল রেখেছিলে কিছু বেশী! আর তত তেল ঘি না ঢাললেও হতো; ঝালটা একটু জেরানো হয়েছিল, আর কিস্মিস একেবারে দেওই নি!”

লীলা বলিল “বা, যেদিন ত আমার এ সব কিছু বল নি! যা পাতে দিয়েছিলাম, খেয়েছিলেনও তো সবটুকু। তা যা হোক, তোমাদের বাপের বাড়ীর রান্নাটা এক দিন শিখিয়ে দিও আমায়।”

হরকিশোর বাবু খুব উৎসাহের সহিত বলিলেন,

“তা নিশ্চয়। তোমার এমন শিখবার আগ্রহ আছে বলেই ত এ সব কথা বলছি; নৈলে আমার হৃদয়ের শক্তি একেবারে লোপ পেলেও তোমায় এ সব কিছু বলতুম না।”

লীলা বলিল “কাল বুঝি রবিবার, তোমাদের আপিস বন্ধ?”

হরকিশোর বাবু সম্মতি স্বচক বাড় নাড়িলেন।

লীলা বলিল, “দেখ, আসচে কাল নলিনী দিদির মনদের বর আসচে। নলিনী দিদি আজ মাথার দিব্যি দিয়ে বিকেল বেলা থেকে তাদের বাড়ীতে গিয়ে হাতা-হাতি কাযকর্ম করে দিতে বলে পাঠিয়েছে। তার খাণ্ডীীর অনুখ সে নিজে কোলের ছেলে ফেলে সব কায কর্তে পারেন না। মাছ, ঘি, তেল, মসলা, সব আমি ঠিকঠাক করে রান্না করে রেখে যাব। তুমি শুধু তোমার বাপের বাড়ীর ধরণে মাছের দমটা করে রেখে দিও। আমি এসে তাড়াতাড়ি ভাতটা নামিয়ে নেবো এখন, নৈলে বড় দেবী হয়ে যাবে।”

হরকিশোর বাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, “তা পারব না? নিশ্চয় পারব, কিন্তু জান কি—”

লীলা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, “কিন্তু, কিন্তু নয়, আজকে তোমায় এটা করে রাখতেই হবে। আমার মাথার দিব্যি; তোমার বাপের বাড়ীর রকম করে মাছের দমটা করা চাই।”

হরকিশোর বাবু আরও একটু ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিলেন, “বাঃ, লীলা তুমি আমাকে নিজে রান্না কর্তে বলচো? বরঞ্চ তুমি সব করো, আমি দেখিয়ে শুনিয়া দেবো এখন।”

লীলা হাসিয়া উঠিল; অতি কষ্টে হাসির বন্ধারটা ধামাইয়া বলিল, “সে আবার কি! তোমাদের বংশে রান্না করাও বা, ইসের ছানার জলে সাঁতার কাটাও তা; বংশের গুণ; তোমার কোনও ল্যাঠায় পড়তে হবে না।”

লীলার হাসিটা হরকিশোর বাবুর দর্পের উপর যেন কতকটা ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিল। হরকিশোর বাবু আবার মনে মনে কিছু চটিলেন—পরে বলিলেন, “তা ত নয় তবে কি না, নিজে নিজে উলুন ঠেলা, সেটা পুরুষের কায নয়।”

লীলা পুনরায় হাসিয়া বলিল, “তা খুলে বল না যে, পারবে না, তা হলেই ত ল্যাঠা চুকে যার। আমি না হয় নলিনী দিদিদের বাড়ী আজ আর নাই গেলাম।”

হরকিশোর বাবুর অভিমানের একটা কচি ডগা মিছরির ছুরির আঘাতে ছিন্ন হইয়া গেল। হরকিশোর বাবু আহত ব্যাঘ্রের ভায় হুকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, “পারব না! সামান্য একটা মাছের দম রান্না করা, তাই পারব না! নৈলে পলাশপুরে বনেদি রায়দের ঘরে আমার জন্মই বুধা!” পরে সুরটা একটু নামাইয়া বলিলেন, “তবে কি না, সকলে বলাবলি হাসাহাসি করবে; বলবে বাবু, বুড়ো বয়সে দ্বিতীয় পক্ষের দ্বীীর খাবার কস্তে হৈসেলে গেছে।”

লীলা হাসিয়া বলিল, “তুমি বুঝি আবার বুড়ো, না?”

হরকিশোর বাবু কয়েক বার তোক গিলিয়া বলিলেন, “তা বুড়ো হই বা না হই, সে কথা হচে না; কিন্তু ছোটলোক ভলো যে বলাবলি হাসাহাসি করবে, সেইটে অসহ।”

লীলা হাত নড়িয়া দিয়া বলিল, “তবে তো ব্যে গেল! বেশ তো, দিক না ওরা সব কথা খবরের কাগজে ছাপিয়ে! বেশ নতুন রকম একটা মজা হবে।”

হরকিশোর বাবু রাহগ্রস্ত সূর্য্যের মত নিস্তেজ ভাবে বলিলেন, “মজা আর এতে কি বেশী হবে!”

“কেন, তোমার নিজের হাতে তৈরী মাছের দম, ঐতো মজা! সেটা পুরুষ লোকের পক্ষে কি কম কথা?” “আমি তো আর যোগলাই ক্যাননে রাখবো না, আমার সব মেনের উপরে।”

“সে দেখা যাবে, এখন।”

হরকিশোর বাবু তখন খুব গভীর ভাবে বলিলেন, “বহুত আচ্ছা, আজ দেখাবো তোমায় মাছের দম কাকে বলে।”

সহসা হরকিশোর বাবুর এতটা ভেজের কারণ এই যে, ত্রীযুক্তা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর “আমিষ ও নিরামিষ আহার” নামক বইখানা ঘরেই ছিল।

(৩)

সন্ধ্যার পাকীগুলি যখন কলরব করিয়া আপন আপন নীড়ে ফিরিয়া যায়, তখন হরকিশোর বাবু বড় সাহেবের সঙ্গে হুজু প্রবেশ করিয়া সবে বাড়ী ফিরিয়াছেন। মনের গাত কিছু ভাল, কারণ সাহেব হিলাবের ফাঁকি ধরিতে না পারিয়া জমাখরচ পাশ করিয়া দিয়াছেন। কাছীতে স্নানস্নান আগিলের কোটটা সবে আলনার উপর ঝাঙিয়াছেন, এমন সময় লীলা বহুভের ঝালকের মত তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাঁহাকে বলিয়া গেল, “আমি যাচ্ছি কিন্তু, মশলা, ঘি, ছুন, মাছ, লক্ষা ভেজপাত সব ঠিকঠাক করে রাখা ঘরে রেখে দিয়েছি।”

হরকিশোর সের্ননাদী ছন্দে জবাব দিলেন,

“নিবাস পলাশপুরে, পত্নী লীলা মোর, আমি কি ডরাই মাছ মাছের দামেরে!”

সাঁড়ের দিকে লীলার হাসির তরঙ্গটা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল।

তখন ঘরে আলো জ্বলিয়াছে।

লীলা যখন চলিয়া গেল, তখন হরকিশোর বাবু দৃঢ় সংকল্প করিলেন—“আজ আমি এমন মাছের দম রাখা করব, যা লীলার চৌক পুরুষে কেউ কখনও খায় নাই!” এই ভাবিয়া সাঁচের আঁতুলন কলহ এর কাছে গুটাইয়া লইয়া একটা সিগারেট ধরাইলেন। তার পর কাক জানি লাগবে, তার একটা খসুড়া ফদ কারবার জুত কাগজ পেন্সিল লইয়া টোবলের ধারে গিয়া বাসলেন। কাটিয়া ছাটিয়া খসুড়া ফদ মনোমত হইলে পর কালা কলম দিয়া “ফেরার কাপ” করিয়া লইলেন, এবং প্রজ্ঞা সুন্দরীর রই দোষিয়া কোন জিনিষটা কখন কি পরিমাণে দিতে হইবে “মাত্রাজেন” তার একটা “নোট” লিখিয়া রাখিলেন ছিন্ন করিলেন। তারপর এমন আশ্চর্য্য দম তৈয়ারী হইয়া যাইবে, যা লীলার বংশে কেউ কখনও চোখেও দেখে নাই।

এই সংকল্প করিতে করিতেই রাত্রি ৭টা বাজিয়া

গেল। ইতিমধ্যে হরকিশোর বাবু তিনটি সিগারেট ধংশ করিলেন। তারপর তিনি আলমারী হইতে প্রজ্ঞাসুন্দরীর বইখানা বাহির করিয়া আনিতে গেলেন। আলমারীর কাছে আসিয়া হরকিশোর বাবু দেখিলেন ভীষণ বড়মুখ! পুথির আলমারির গায়ে আজ একটির স্থানে দুইটি তালা পড়িয়াছে।

চাকরের নিকট গুলিলেন লীলা তালা বন্ধ করিয়া চাবির গোছা আঁচলে বাধিয়া তার সহী নলিনীদের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে। হরকিশোর বাবুর অনেক খানি দর্প এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অন্তহিত হইল।

হরকিশোর বাবু ভাবিয়া হয়রাণ হইয়া গেলেন। অবশেষে ঠিক করিলেন যে, আজ মাছের দম এমন Original styleএ (মৌলিক ভাবে) তৈরী করা যাইবে যে, আজ লীলা দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া থাকিবে। তারপর ফর্দে পেন্সিল দিয়া লিখিলেন—মাছ সাড়ে এগার ছটাক। ঘি লাগিবে কি ভেজ লাগিবে এ সংবাদ কোন অভিধানে লেখা আছে? আর কি লাগিবে? লক্ষা, হলুদ, দারুচিনি, লবঙ্গ, ধনে এলাচ মাথামুণ্ড সব তো আছে। এর মধ্যে কি লাগিবে কি লাগিবে না, কে বলিয়া দিবে? আগে ঘি গরম করিয়া। ক তাহাতে মাছ চড়াইয়া দিতে হইবে, না আগে মাছ সিদ্ধ করিয়া লইয়া পরে ঘি দিতে হইবে। আজ বিপদের দিনে এ জটিল সমস্যা কে সমাধান করিবে? হরকিশোর বাবুর কপাল ঘামিয়া উঠিল; তান ভাবলেন এর চাইতে পাটের দর কসা অনেক সহজ।

এমন বিপদের সময়, হরকিশোর বাবু ঘরের পশ্চিমা চাকর মঙ্গলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“হাঁরে মঙ্গল, মহলি ক্যাসে পাকানে হোতা, তা বলতে পারিস?”

মঙ্গল সংক্ষেপে বলিল, “মছলি হামলাক কব্হি নাহি খাতা, বাবুজী!”

মঙ্গল কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। তখন হরকিশোর বাবুর মনে হইল, যা যা আছে, সবই ত ভাল ভাল

আশ্বিন ১৩১১

জিনিষ, আদা, মুন, লঙ্কা, ধ'নে, জাক্রাণ, হলুদ, মাছ ইত্যাদি! এ সমুদয়ই ত খাবার জিনিষও বটে! এ সব দিলে ত আর রান্না খারাপ হতে পারে না। আর এ সব যখন দিতেই হইবে, তখন আর অগ্রপশ্চাৎ করিয়া দিয়া বিশেষ লাভ কি? সব জিনিষপত্র মাছের সহিত এক সঙ্গে ডেকচিতে তুলিয়া দিলেই আপদ শাস্তি! পরিমাণ, হাতের আন্দাজ! রসনা হাতের আন্দাজের সাহায্য করিবে।

এ রসনা পথে বহু সুরস মাছের দম তলাইয়াছে, সে কি আজ এ বিপদের দিনে হাতের আন্দাজকে একটুও সাহায্য করিবে না?—মন বলিল, “করিবে বৈ কি?” বেইমান রসনা চুপি চুপি বলিল, “না, কখনই ন!”

তারপর হরকিশোর বাবু ডেকচি ভরিয়া উত্তনের উপর জল তুলিয়া দিলেন। জল উষ্ণ হইলে তাহাতে মাছ ছাড়িয়া দিলেন। তার পর, তেল, ঘি, মুন, হলুদ, জাক্রাণ, তেজপাত, ধ'নে সব এক সঙ্গে চড়াইয়া দিয় একখানা থালা দিয়া ডেকচির মুখ ঢাকিয়া দিয়া ঘড়ি খুলিয়া বসিলেন। মনে মনে হরকিশোর বাবু স্থির করিলেন, ৪৫ মিনিটের পর ডেকচি নামাইয়া মুখের থালা নামাইলেই দেখা যাইবে যে, অতি সুস্বাদু মাছের দম রান্না হইয়া গেছে।

এতক্ষণ চুপটি করিয়া উত্তনের সামনে বসিয়া থাকা! হরকিশোর বাবু, আর একটা সিগারেট ধরাইয়া খবরের কাগজটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিলেন। তখন রুব জাপানে ভয়ানক যুদ্ধ! বন্টিক ফিট জাপানীরা উড়াইয়া দিয়াছে! খবরের কাগজ নানা সংবাদ ও কাহিনীতে পূর্ণ। পড়িতে পড়িতে হরকিশোর বাবু পুরা দুই ঘণ্টা কাটাইয়া দিলেন। তিনি যে রক্তনকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, খবরের কাগজ হাতে লইয়া সে কথা পর্যন্ত ভুলিয়া গেলেন।

সহসা একটা কেমন গন্ধ অনুভব করিয়া হরকিশোর বাবুর চমক ভাঙ্গিল। হরকিশোর বাবু ভাবিলেন ডেকচির ভিতরে একটা নিগূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতেছে।

তিনি ডেকচির মুখ হইতে থালা সরাইয়া দেখিলেন, জল সব শুকাইয়া গিয়াছে, এবং পোড়া মাছ হইতে দুর্গন্ধ-যুক্ত ধোঁয়া উঠিতেছে! তাড়াতাড়ি ডেকচি নামাইয়া ফেলিয়া হরকিশোর বাবু দেখিলেন কতক মাছ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, আর উপরের কতক মাছ এখনও কাটাই রহিয়া গেছে! হরকিশোর বাবু ভাবিলেন রান্নাটা যে ভাল হয় না, তা কেবল লীলার দোষ নয়। আসল কথা, ডেকচিটাই যায়গায় যায়গায় অত্যন্ত পাতলা হইয়া গেছে। সামান্য আঁচ লাগলেই ভিতরের অনেক জিনিষ বলুসে যায়।

(৪)

রান্নার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সবে বড় আয়নার কাছে হরকিশোর বাবু দাঁড়াইয়াছেন। আয়নার ভিতরে দেখিলেন, ডেকচির তলার প্রায় সমুদর কালো তাঁহার নাকে মুখে লাগিয়া গিয়াছে, এবং চেহারাটা যাহারা লক্ষ্য দক্ষ করিয়াছিল, তাহাদেরই এক জনের মত হইয়া পড়িয়াছে! তাড়াতাড়ি আলুনা হইতে তোয়ালেখানা পাড়িয়া লইয়া সাবানটার জল আয়নার দেয়ালে হাতড়াইতে ছিলেন, এমন সময় পেছন হইতে একটা হাসির তরঙ্গ কানে আদিয়া পৌঁছিল! হরকিশোর বাবু মুখ ফিরাইলেন না, কিন্তু আয়নার মধ্যে দেখিতে পাইলেন, হাসিতে হাসিতে লীলা তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে! লীলাও আয়নার মধ্যে হরকিশোর বাবুর মুখ দেখিয়াই হাসিয়া উঠিয়াছিল।

তাড়াতাড়ি তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে হরকিশোর বাবু বলিলেন, “তবু তুমি এলে যা হোক! নয়টার সময় আসবে বলে গেলে, আর এখন রাত ১১টা!”

লীলা হাসিয়া বলিল, “কেন আমি আর নলিনী দিদি ঠিক ১১টার ঘরে কিরে এতক্ষণ পালিয়ে তো তোমার রান্নাই দেখছিলাম! নতুন ধরণের রান্না তোমার! বাপের বাড়ীর নমুনাটা দেখান চাই তো!”

হরকিশোর বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “তামাসা রাখ লীলা, দম নিভাও যন্দ হবে না খেতে!”

লীলা হাসিয়া বলিল, “আমি কি তাই বলেছি!”

* * * * *

আহায়ে বসিলে পর, লীলা যখন হরকিশোর বাবুর পাতে তাঁহার স্বপক মাছের দম আনিয়া দিল, তখন তাহার অন্ন-প্রাশনের অন্ন শুদ্ধ পেটের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। এমন অবস্থায় ত আর বাপের বাড়ীর রান্নার গন্ধ বজায় রাখা যায় না। তবু হরকিশোর বাবু নিজের বাহ্যিক ছাড়িতে রাজি হইলেন না। এটা তাঁর পাটের আপিসের শিক্ষা! তিনি বলিলেন, “দেখ লীলা, আজ যা হয়েছে তা মোগলাই দম নয়, এটা হচ্ছে বিলাতি দম—English pattern.

লীলা হাসিয়া বলিল, “তা ভাল জিনিষ সবখানি ভুমিই না হয় খেয়ে ফেল!”

কিন্তু আজ হরকিশোর বাবুর আহায়ে বিশেষ রুচি দেখা গেল না! আঙ্গুল দিয়া বিলাতী দম কয়েকবার নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন; “ভুমি বুঝি কখনো কোলকাতায় যাও নি, লীলা?” লীলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “না”।

“ওঃ, তবে এ সব তোমার তত ভাল লাগবে না! এ সব সাহেবী খানা—গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলে এই দম খেয়ে বড় বড় সাহেবরা কত তাদ্রিক করে। আমি এক বাবুর্জিকে নগদ তিন টাকা দিয়ে এ রান্না শিখেছি।

লীলা হাসিয়া বলিল, “এমন ভাল জিনিষটা মুখে তো তোমার দেখছি একেবারেই রুচল না!”

হরকিশোর বাবু এবার লজ্জায় লাল লইয়া উঠিলেন। বার কয়েক কাশিয়া বলিলেন “পেটের গতিকটা আজ বড় ভাল বোধ হচ্ছে না, লীলা! ডিসপেপ্সিয়ার ভাব!

কাল তোমার কাচা ভপসী মাছ খেয়ে অবধি আজ পর্যন্ত পেটটা বুটবুট কছে। আর আমি খাবো না, ভুমি দমটা খেয়ে দেখো এক বার!”

লীলা একটু মুচুকে হাসিয়া বলিল, “ও সব বিলিভী খানা, চৌদ্দ পুরুষে আমরা কখনো চোখেও দেখি নি!”

হরকিশোর বাবু নিতান্তই অভুক্ত অবস্থায় উঠিয়া যান দেখিয়া লীলা হাসিয়া বলিল, “নলিনী দিদি তাদের ঘরে যে মাছের দম করেছিল, তা একটু পাঠিয়ে দিয়েছে। তা একটু চেকে দেখ দেখি!”

হরকিশোর বাবু নিঃশব্দে লীলার সঙ্গত প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। হরকিশোর বাবু সে রাত্ৰিতে যে ভাবে লীলার প্রদত্ত মাছের দমের সদ্যবহার করিলেন তাহা দেখিয়া কেহ বলিতে পারিত না যে, হরকিশোর বাবুর কোনও দিন ডিসপেপ্সিয়া ছিল।

পরদিন প্রাতে আফিসে বাইবার লম্বা ধরা চূড়া পরিয়া হরকিশোর বাবু তাকের উপরে চসমার কেসটা খুঁজিতেছিলেন, লীলা হাসিয়া আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“কিছু খেয়ে গেলে হয় না? আপিস থেকে ফিরবে তো সেই এগারোটায়!”

“কেন, তোমার নলিনী দিদির বাড়ীর দমটা আজও আছে নাকি?”

লীলা হাসিয়া বলিল, “না, কিন্তু তোমার সেই বিলাতী দমটা, প্রায় সবখানিই মজুত আছে। এক টুকরো প্যাঁকটা দিয়ে খানিকটে খেয়ে যাও না!”

“ওটা টেপী কুকুরটাকে দিয়ে ফেল,” এই বলিয়া হরকিশোর বাবু হাসিতে হাসিতে দ্বিতীয় পকের দ্বার সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া তাড়াতাড়ি আপিসের দিকে পলাইলেন।

শ্রীশ্রুতেশ্বর সিংহ শর্মা

প্রাচীন জাপান

নারা যুগ

(৬৪৫—৭৮১ খৃঃ)

পূর্বানুস্মৃতি

স্থপতি বিস্তার চীনা শিল্প ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইত। দেশের নানা স্থানে তিন হইতে নয় তালা, এমন কি কচিং তের তালা উচ্চ 'প্যাগোডা' নির্মিত হইয়াছিল। ৭৪১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট বোমু আদেশ প্রচার করিলেন যে, প্রত্যেক প্রদেশে এক একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মিত হইবে; এবং তাহাদের মধ্যে বুদ্ধের তিন ভাবের তিনটি করিয়া মূর্তি ও এক একখানি 'দাইহান্জাকো' বা 'মহাপ্রজ্ঞাপারমিত সূত্র' রক্ষিত হইবে, সম্রাট বোমুর আদেশে নির্মিত প্রাদেশিক মন্দিরগুলির মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উচ্চ বৌদ্ধ মূর্তি সমন্বিত তোদাইজি মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। এই সব মন্দিরগুলি সুগঠিত করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

আমরা এ যুগে শিল্পের অগ্রান্ত বিভাগেও উন্নতির চিহ্ন দেখিতে পাই। বস্ত্রবুনন শিল্পে সর্বপ্রথম 'আকুতি'-বুনন হইতে দেখি। সম্রাট তেনমুর রাজত্বকালে লাল 'ল্যাকার' সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। অগ্রান্ত নানারকম 'ল্যাকারে'র কাজও এই সময়ে আরম্ভ হয়।

দেশের সর্বত্রই বাজার বসিত। সাধারণতঃ কোনও একটি ছায়াশীতল স্থানে বাজারগুলি দ্বিপ্রহরে খোলা হইয়া সূর্যাস্তের সময় বন্ধ হইত। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাজার বসিত। বাজারের সময় ঢাক বাজান হইত।

৭০৮ খৃষ্টাব্দে গেনমেই সম্রাটের রাজত্ব সময়ে প্রথম তান্ত্র-মুদ্রার প্রচলন হয়। ইহার কিছুকাল পরে রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু জনসাধারণ প্রথমে মুদ্রা প্রচলনের পক্ষপাতী হয় নাই; কারণ

তাহারা বিনিময়ে ক্রয়বিক্রয়েই অভ্যস্ত ছিল। রাজসরকার মুদ্রা প্রচলন করাইবার জন্ত নিয়ম করিলেন যে, অতঃপর মুদ্রার ক্রয় দিতে হইবে; ও বাহাদুর ভোখাখানার নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা মজুত থাকিলে তাহাদিগকে অভিজাতবর্গের সাধিল করিয়া দিবেন বলিয়া সোভ দেখাইলেন। কিন্তু ইহার ফল এই হইল যে, মুদ্রার প্রচলন কমিয়া গেল, তাহা স্থানে স্থানে জমা হইতে লাগিল। তখন সরকার বাধ্য হইয়া নিয়ম রদ করিলেন ও মুদ্রা জমা করিবার বিরুদ্ধে ইত্তাহার জারি করিলেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি বাড়িতেছিল। ইহা সম্রাট ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের ধর্ম ছিল। পুরোহিত ও অভিজাত বংশীয়ের এ ধর্ম প্রচার করিবার সবিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও প্রথম প্রথম নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এ নবধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। কথিত আছে, গ্যোজি নামে পুরোহিত যোমুসিতো বা বৌদ্ধধর্ম ও জাপানের প্রচলিত ধর্ম—এই উভয় ধর্মের এক মিশ্রিত সংস্করণ প্রবর্তন করেন। পূর্বে প্রচলিত হরিণের শিঙের পরিবর্তে কচ্ছপের খোলা পোড়াইয়া ভবিষ্যৎ বলা হইত। চীন হইতে নবাগত জনপ্রিয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের অঙ্গুলীগনের জন্ত বিশেষ কার্যবিভাগ খোলা হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ কখন বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। ভবিষ্যৎবাণী করিবার এক অভিনব প্রথা ছিল; কোনও লোকের ফটকের ধারে দাঁড়াইয়া পথিকের কথা শুনা; এবং পথিকের দৈবাৎ কথিত কোনো একটা কথা ভগবানের ইচ্ছা, ও তাহা নিশ্চিতই ঘটবে বলিয়া নির্দেশ করা হইত।

কুসংস্কার যথেষ্ট ছিল। অবিধাসীদিগকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্ত পুরোহিতেরা আত্মীয় দেহান্তরক্রম মতের সাহায্য গ্রহণ করিত। পরজন্মে কুকুর কিংবা শূকররূপে জন্মগ্রহণ অসম্ভব নয়, এ কথা অনেকের মনে ভীতিসঞ্চার করিত। পুরোহিতেরা ভয় দেখাইবার জন্ত অনেক উদ্ভট কথার প্রচার করিত। যথা, কোন ব্যক্তির মৃতদেহ একব্যক্তি কবরস্থ করিয়াছিল। মৃত ব্যক্তির মাথার খুলিটা নাকি পরজন্মের সুখস্বাদ্দের জন্ত ধত্বাদি জানাইতে

যে তাহাকে কবর দিয়াছিল তাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল! কোনো এক গ্রামের মোড়ল পবিত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রের নিন্দা করিয়াছিল; তজ্জন্ত ভগবান তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন! সকল দেশের গায় এদেশেও অনেক ছোট খাটো কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, যথা, স্বপ্নে বৈদ্যদর্শন প্রয়াসী নারী শয়নের পোষাক ভিতর-দিক উপর করিয়া পরিধান করিত; ক্রীতদাস, হাঁচি বা হঠাৎ কটিবন্ধের শিথিল হওন, প্রেমানন্দে আগমন স্থগিত করিত; পথপার্শ্বে কেহ ঘাসেব আঁটি বাধিলে এবং সেই আঁটি কয়েক ঘণ্টা বাধা থাকিলে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে ইহাই স্থচিত হইত। খেত হরিণ, খেত শৃগাল, খেত ইঁদুর, খেত পারাবত কিংবা এক বৃন্তে যুগপৎ শুভচিহ্নরূপ রাজসভায় উপহার প্রদত্ত হইত!

চীনা বিজ্ঞা শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া মনে হইত বুঝি বা এ বিজ্ঞা দেশজাত। এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে চার শতেরও অধিক ছাত্র হইয়াছিল। মাতাপিতার প্রতি ভক্তি সকল গুণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। গভর্নমেন্ট পিতৃমাতৃতত্ত্ব পুত্র বা পৌত্র, বিশ্বস্তা পত্নী বা সদয় পতিগণকে প্রশংসা করিতেন ও পারিতোষিক দানে সম্মানিত করিতেন।

৭১০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কিন্‌মেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নারা নামক স্থানে স্বীয় আবাস প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেশের রাজধানীর উপযুক্ত সাজে এই স্থান সজ্জিত হইল। কিন্তু প্রায় সত্তর বৎসর পরে দেশের রাজধানী অগতঃ কোথাও স্থাপিত হওয়া উচিত বোধ হওয়াতে ৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কাম্মু কর্তৃক রাজধানী নাগাওকা নামক স্থানে স্থানান্তরিত হইল।

৬৪৫ খৃষ্টাব্দে দেশময় সংবাদ প্রেরণের সুব্যবস্থা হইয়াছিল। নূতন নূতন রাস্তা ও বন্দর নির্মিত হইয়াছিল, ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছিল; চিঠি পত্র এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্ত অশ্ব ও লোক নিযুক্ত ছিল। সকল প্রদেশের সীমান্তে রক্ষীদের আড্ডা স্থাপিত হইয়াছিল ও ছাড়পত্রের ব্যবহার প্রচলিত

হইয়াছিল। ইহা দ্বারা ফেরার আসামী ধরিবার অনেক সুবিধা হইয়াছিল।

পার্সীরা প্রদেশের মধ্য দিয়া নূতন নূতন পথের প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধ পুরোহিতেরা দেশের উন্নতির প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল। উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তির পক্ষে ভ্রমণ অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার ছিল। তাঁরা ডাকের ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেন; ডাক বদলাইবার স্থানে রাত্রিকালে শয়ন ও বিশ্রামের উপযোগী গৃহ ছিল। দরিদ্র পথিকের কিন্তু ভ্রমণের সীমা ছিল না। বৃত্তিকবোচকা এবং ভ্রমণ সময়ের উপযোগী খাদ্য বহন করিয়া তাহাদিগকে পদব্রজে যাইতে হইত। পথের মধ্যে সরাই বা বিশ্রামের স্থান ছিল না, এমন কি খাদ্য ক্রয় করিবার দোকানও ছিল না। ফলে, কারিগর দূর দেশে কার্য্য সারিয়া গৃহে প্রত্যাগমন কালে পথের মাঝে ঋণাত্মক মরিত, এরূপ ঘটনা বিরল ছিল না। ইহার প্রতীকারার্থ ৭০৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী গেন্‌মেই ও ৭২০ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী গেন্‌মো পথিকগণের পরিচর্য্যার জন্ত স্থানে স্থানে বাটী নির্মাণের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। সেখানে বাধা দরে খাদ্য ও বাসস্থান পাওয়া যাইত; পথের ধারে ধারে যে সব ধনী ব্যক্তি বাস করিত, পথিকদিগের চাউল বিক্রয় করিবার জন্ত তাহাদিগকে উৎসাহিত করা হইত। যারা বৎসরে এইরূপে এক শত কোকুর অধিক চাউল বিক্রয় করিত তারা রাজসরকারে সম্মানের সহিত উল্লিখিত হইত। ৭৫২ খৃষ্টাব্দে জনৈক বৌদ্ধ পুরোহিতের প্রস্তাব ক্রমে পথিকদের সুবিধার জন্ত পথপার্শ্বে ফলবৃক্ষ রোপণ করার প্রথা প্রচলিত হয়।

রাজধানীর বাটীগুলির ছাদ টালি দ্বারা আচ্ছাদিত হইত। লাল ল্যাকারের আবিষ্কার হওয়াতে মন্দিরগুলি রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইতে লাগিল। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ রেশমী পোষাক পরিধান করিত। কর্মচারী-দের পদ অনুসারে তাদের পোষাক নিরূপিত ছিল। ৬৮১ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে রমণীরা দুই পার্শ্বে পা দিয়া অর্ধে আরোহণ করিতে লাগিল। এতাবৎকাল

তারা এক ধারেই দুই পা দিয়া অর্ধে আরোহণ করিত ;
এরূপ ভাবে উত্তমরূপে অর্থ পরিচালন সম্ভব হইত না।

ত্রীলোকদিগের কেশবিন্যাসের একটা বিশেষ নিয়ম করা
হইয়াছিল। কেবল সম্রাট মহিলারাই স্বরূপদেশের উপর
দিয়া মুক্ত কেশ বুলাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু
এ নিয়ম বেশী দিন টিকিতে পারে নাই।

সকলকে আদবকায়দা মানিয়া চলিতে হইত। এ বিষয়ে
বিশেষ কড়াকড়ি ছিল। সম্রাটের প্রাসাদের ফটকের
সাম্নে দিয়া যাইবার সময় পায়ে হাঁটিয়া যাইবার যো
ছিল না। শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইত।
সম্রাট তেঁনু এই হামাগুড়ি প্রথা রহিত করিলেন ও হুকুম
দিলেন যে, প্রাসাদের দিকে গিরিয়া একটা সেলাম
করিলেই চলিবে। এই সম্রাট প্রাসাদের মেঝেগুলি
তক্তা দিয়া আচ্ছাদিত করাইয়া লইয়াছিলেন ও চীনাাদের
দেখাদেখি চেয়ার ব্যবহার করিতেন। তিনি সৌখীন
লোক ছিলেন সন্দেহ নাই। সম্রাট ও দেবতাদিগকে
অভিবাদন করিবার সময় হাততালি দেওয়া হইত—
পূজার সময় এরূপ করা এখনো প্রচলিত আছে।

মাংসাহার বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু গোপনে
অনেকে যে না খাতিত এমন নয়। ৬৫০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট
কোতোকু কোরিয়া হইতে দুগ্ধবতী গাভীর আমদানী
করিয়াছিলেন। উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে কিছুকাল
দুগ্ধপান করা একটা 'ক্যাশানের' মধ্যে ঢাড়াইয়াছিল।

৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কোনিনের রাজত্বকালে সম্রাটের
জন্মদিন সর্বপ্রথম জাতীয় পর্বেদিনরূপে বিবেচিত হইয়াছিল।

জীর বাপের বাটীতে, বা শ্বশুরালয়ে স্বামী প্রতাহ
জীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত ; ত্রীক নিজের
কাছে রাখিবার ইচ্ছা হইলে স্বামীকে পৃথক বাটী নির্মাণ
করাইতে হইত। ভাবী স্বামী ভিন্ন কাহাকেও
বাগদস্তা ত্রীলোক তার প্রকৃত নাম বলিত না, ও বালিকা
নারীকে উপনীত হইয়া সর্বপ্রথম যখন চুল বাধিত,
তখন বাগদস্তার স্বামী চুলে গেরো বাধিয়া দিতেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অহুষ্ঠানগুলি প্রায় পূর্বের তায়ই

ছিল। শবাধারটি 'মোয়া' বা 'মৃতের বাটী'তে রাখা
হইত। মৃতের উদ্দেশে আগাখ্যা জ্বা ও মস্ত অর্পিত
হইত। মৃত ব্যক্তির এক জন আত্মীয় মৃত ব্যক্তির গুণ ব্যাখ্যা
করি। বক্তৃতা পাঠ করিতেন। তৎপরে ধ্বংস পতাকা ও
বাণ সহকারে শবাধার সমাধিভূমিতে লইয়া যাওয়া
হইত। নিকটস্থ আত্মীয়েরা হস্তাধানেক সমাধি পাহারা
দিতেন। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহ দাহ করিবার
(ভারতীয়) রীতি প্রবর্তিত হইল। প্রথম ৭০০ খৃষ্টাব্দে
দোষো নামক পুরোহিতের মৃতদেহ দাহ করা হইল,
পর বৎসর সম্রাজ্ঞী জিতো এই প্রথা অনুসরণ করিয়া ইহা
প্রচলিত করিয়া দিলেন। রাজকীয় কবরগৃহগুলি বেড়া
দিয়া ঘেরা হইল ও মৃতের গুণব্যাখ্যাকৃত সমাধিস্তম্ভ
স্থাপিত হইল। শোকচিহ্ন ধারণ করিবার প্রথাও
চীন হইতে গৃহীত হইয়াছিল।

নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুক প্রচলিত ছিল। কুস্তি,
বাণ নিক্ষেপ, দোড়দোড়, 'ফুটবল' খেলা ও 'পোলো'র
তায় একপ্রকার খেলাও কুকুর ও বাজপাখী লইয়া শিকার
করা প্রচলিত ছিল। বাটীর অভ্যন্তরে 'সুডোরোকু' ও
'গো' নামে অনেকটা দাবা খেলার মত খেলা প্রচলিত
ছিল। ফুল, পাখী ও কবিতা রচনার সখ প্রায় সকলেরই
দেখা যাইত।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শারদ মঙ্গল

কঙ্কণার কোকনদ আচ্ছাদে গদগদ শীতল সরিত-তড়াগে।
কুঞ্জ ভবন অব অভিনব পেলব পল্লব-পুষ্প-পরাগে !
তড়িত-জড়িত কত খেত জলদ-রথ শৈল-শিখর পুরোভাগে
নীল স্নানির্মল নগ্ন পগনতল মগ্ন জোহন-সোহাগে !
তরুণ অরুণ-তরু জলন্ত দ্ববাজহু প্রভাত-ভালে ভাল শোহে,
স্বচ্ছ নদী নদ ; সিনগধ নীরদ অচ্ছাদ হৃদে অবগাহে !
কিরণ-বিকীরণ—শূণ্যে শিশিরকণ ; পুষ্পে মদिर-মকরন্দ ;
ধ্বজ ধরনী ধামে ; তম্বু তটিনী দানে ; বস্ত্র বিহগে নব হৃদ !

উৎসবে উনমত্ত বালক-যুগ যত, উত্তর পবন সুমন্দ ;
 ব্রহ্মব কেরা-কোলে, কাশ-চামর দোলে, শিউলি-নীলি-
 মুখে বন্দ !
 প্রসন্ন নিশানাথ, প্রোজ্জ্বল ছায়াপথ ধরিত্রী রিক্তপঙ্ক,
 নেত্র অভিরাম ক্ষেত্র নবীন গ্রাম ; মগ্ধপে মঙ্গল শব্দ !
 শারদা ! মনোরমা ! কল্যাণী ! কমলা রমা ! শশিসুখমা-
 শ্রুমা ! করুণা !
 লীলা-কমল-করে, কুন্দ অলক পরে, বিশ্বজননী, ওমা
 অরুণা !
 শ্রীকল চন্দ্র দে ।

কাছাড়ে হিন্দু প্রভাব*

পৌষ ও চৈত্র 'বিহু' ছাড়া কাছাড়ীদের আর কোনও
 সাম্প্রদায়িক বিশেষ উৎসব
 সাম্প্রদায়িক নাই। এই উৎসবকে ঠিক
 মহোৎসব জাতীয় উৎসব বলা যাঠিতে
 পারে না, এবং এই উৎসবের
 মূল নির্ণয় করা দুষ্কর। কাছাড় প্রদেশের হিন্দুগণের মধ্যেও
 এই উৎসবের প্রচলন দেখা যায়। সমগ্র বঙ্গদেশেও
 মহাবিশ্ব সংক্রান্তির দিনে চড়ক পূজা হইয়া থাকে। এই
 বিষ্ণু বা বিহু উৎসব সম্ভবতঃ অনার্য্য প্রথা—ধীরে ধীরে
 আৰ্য্য সমাজে পরিবর্তিত আকারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।
 পৌষ বিষ্ণুর উৎসব পৌষ সংক্রান্তিতে ও চৈত্র বিষ্ণুর উৎ-
 সব চৈত্র সংক্রান্তিতে সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশেও
 পৌষ পূর্ষ বিখ্যাত। পৌষ সংক্রান্তি স্থান বিশেষে পিষ্টক
 বা তিল্লাই সংক্রান্তি নামে অভিহিত আছে। খুষ্টান দিগের
 নিকট কমলা ও 'কেকে'র মধুর স্মৃতি লইয়া যেমন
 'খুষ্টমাস', বাঙ্গালীদের নিকটও পিষ্টকের স্মৃতি লইয়া
 পৌষ সংক্রান্তি।

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত কাছাড় ও কাছাড়ী প্রবন্ধের
 পঞ্চমাংশ ; চতুর্থাংশ ভাঙ্গ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পৌষ সংক্রান্তি বা পৌষ বিহুর কয়েক সপ্তাহ পূর্ষ
 হইতেই কাছাড়ী যুবকেরা নিশানবাধা লম্বা লম্বা বীশ
 পুতিয়া ইহাদের চতুর্দিকে বেশ উচু করিয়া খড়ের স্তূপ
 দিতে আরম্ভ করে। এই স্তূপের পাশ্বে আবার খড়ের
 ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট কুটীর নির্মিত হয়। এই
 গুলিকে বিহুর ঘর বলে। বিহুর রাত্রে খড়ের স্তূপে
 ও বিহুর ঘরে আগুন লাগাইয়া যুবকেরা বিপুল আনন্দে
 পান ভোজন ও নৃত্য করিতে থাকে। এই উপলক্ষে প্রচুর
 "জু" বা মদের ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহা বলাই বাহুল্য।

পৌষ মাসে ধান পাকে এবং সমস্ত পৌষ মাসটা এই
 পাকা ধান কাটিতে, মারিতে ও গোলায় তুলিতে কাছা-
 ডীরা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে। এবং এই হাড়-
 ভাঙ্গা পরিশ্রমের অবসানে বিহুর আনন্দোৎসবে কর্ম-
 ক্রান্তির অবসর-সুখের মাদুর্য্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ
 করে। বিলাতের Harvest Home এর সঙ্গে এই
 পর্ব্বের স্তূন্দর সাদৃশ্য আছে। বাঙ্গালা দেশের কোনও
 কোনও জেলায় বিশেষতঃ ত্রিপুরায় ও শ্রীহট্ট জেলার
 দক্ষিণাংশে "মাঘ মানের" একটা প্রথা আছে।
 বালকেরা পৌষ সংক্রান্তির দিন প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ
 করিয়া স্নান করে এবং দুই এক দিন পূর্ষ হইতে
 সংগৃহীত খড়ে আগুন ধরাইয়া দিয়া অগ্নি সেবা করিয়া
 থাকে। এটাও বোধ হয় এই অনার্য্য প্রথার একটা শেষ
 চিহ্ন আৰ্য্য সমাজের গায়ে খাজিও লাগিয়া রহিয়াছে।

চৈত্র বিহুর আমোদটা বড় অসংযত। এই উপলক্ষে
 কাছাড়ীদের মধ্যে পান ক্রিয়া এবং ইঞ্জিয় বৃত্তির উদ্যম
 প্রশ্রয় দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া
 থাকেন। দরাস জেলায় এই উৎসব সপ্তাহ ব্যাপিয়া
 চলিয়া থাকে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন দলে কখন কখন
 গুরুতর হাঙ্গামাও হইয়া থাকে।

বিহুর দিন প্রাতঃকালে গৃহস্থ আপন
 আপন গরুগুলিকে নিকটবর্তী পুকুর বা নদীতে
 লইয়া গিয়া স্নান করায়। স্নানের পর বিলাতি
 বেগুন এবং হরিজামিশ্রিত 'জু' ইহাদের গায়ে ছিটাইয়া

আব্দিন ১৩১৯

দেয়, এবং শিংগুলি তৈলাক্ত করে। পরিশেষে তৈল, ছাই ও চালের গুঁড়া একত্র মিশাইয়া গরুর গায়ে স্থানে স্থানে লাগাইয়া দেয়। এই অনুষ্ঠানের পরেই নৃত্য গীত ও আমোদ উৎসব আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে শিশুদের যুখে কাছাড়ী ভাষায় যে সকল সঙ্গীত শুনা যায় নিজে তাহারই দুই একটা মন্তব্য দেওয়া গেল—

- (১) বিহর দিনে আজি
বৈশাখী আয় সাজি ;
ছেড়ে ঘরের কোণ
ধেলেতে আয় বোনু।
- (২) দাদা আমার সোনামণি,
এই যাউ, এই এখনি।
করিও না তাড়াতাড়ি
পরছি আমি ভাল সাড়ী।
একটু দেরী কর ভাই,
মেয়ে—না সেজে যেতে নাই।
- (৩) রাজার চাকর আমার কাকা—
মোজাদারের কত টাকা!
ছয়টা মোটা শূরর কাটি
দিবে খাওয়া পারপাটি।

এই সকল সঙ্গীতে মিল আছে, অথচ বিশেষ অর্থ নাই এমন কয়েকটা শব্দের সমষ্টি মাত্র। উল্লিখিত সঙ্গীত তিনটিতে কোনও কাছাড়ী পরিবারের ভ্রাতা-ভাগিনীর বিহর উৎসবে যোগ দেওয়ার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ভ্রাতা বৈশাখী নাম্নী ভগিনীকে আর বিলম্ব না করিয়া বিহর উৎসবে যোগদান করিতে অতি আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতেছে; ভগিনী স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ বেশবিভাষের জন্য একটু সময় চাহিতেছে, এবং উভয়ে মিলিয়া কোনও ধনী আত্মীয়কে বিহর উপলক্ষে তাহার উচ্চ পদের উপযুক্ত এক ভোজের আয়োজন করিতে অনুরোধ করিতেছে।

কাছাড়ী যুবতীর প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইলে সে আত্ম-কাছাড়ী রমণীর সম্মান বজায় রাখিতে সুসভ্য আত্ম সম্মান জাতীয় রমণী হইতে কোনও

অংশে ন্যূন নহে। কোনও অস্থিরমনা প্রেমিক এক সময়ে একটি গ্রাম্য সুন্দরীর প্রেম প্রার্থনা করিয়া পরিশেষে অন্য যুবতীর পাণিগ্রহণ করে। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই তাহার পত্নী বিয়োগ হয়, এবং বিগতীক কাছাড়ী পুনরায় তাহার পূর্বপ্রণয়িনীর প্রেম ভিক্ষা করে। আধুনিক সভ্যতাবিজ্ঞানে অনতিজ্ঞ পার্কৃত্য ভগ্নী এই প্রেমার্থীকে যে ভোজ্যগর্ভদুগ্ধ উত্তর দিয়াছিল তাহা শুনিলে সকলের চিত্ত এই নারীর প্রাণ নীরব প্রশংসায় ভরিয়া উঠিবে।

সরে যাও দূরে আজি নিলজ্জ বর্কর,
মদন-মোহন বেশ!—কি তার আদর!
কপট, বঞ্চক!—হবে তুমি মম বর!
এত আশা! এত স্পর্শ! স্থাগত তব্বর!
উচ্ছষ্ট প্রণয়পূর্ণ বাহার অন্তর
সে কার্যবে স্পর্শ মোর মূপবিজ্র কর!

এই জাতিতে মানব প্রকৃতির এই উচ্চ নৈতিক ভাবের বিকাশটা কত বিকশিত এক বার ভাবিয়া দেখুন।

এই কাছাড়ী জাতির অনেক সম্প্রদায়ই হিন্দুধর্মের মেচ প্রভাবে আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকের মতে মেচ সম্প্রদায় ভীমের ঔরষে ও হাড়িম্বার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন রাজা যযাতুর পুত্র তুর্কশু হইতে তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে। তুর্কশু পিতার অভিশাপে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, সুতরাং তাহার পুত্রগণ 'স্নেচ্ছ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। 'মেচ' শব্দ স্নেচ্ছ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মীমুদোদিত আচার ভ্রষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই তাহাদের নাম স্নেচ্ছ বা মেচ হইয়াছে। মেচেরা শিবের নিকট মোরগ বলি দেয়। মেচ পুত্র বা কন্যা পিতামাতার মৃত্যুর ৭, ৯ বা ১১ দিন পরে ব্রাহ্ম কার্যের ত্রায় এক প্রকার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া থাকে।

ঋতী সম্প্রদায়ের কোন কোন শাখা হিন্দু শাক্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার বৈশাখ, মাঘ

রাতা ও কার্তিক মাসে একটা পূজা করে।
এই পূজার কৃত্রিম ব্রাহ্মণ পুরোহিত
নিযুক্ত হয় না, বা কোনও মন্দির নাই। দেউড়িরাই
পূজার কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

হাজংদিগের দুই শাখা। এক শাখা বৈষ্ণব ও
অপর শাখা শাক্ত। বৈষ্ণবেরা বরাহ-
হাজং মাংস ভক্ষণ বা মদ্য পান করে না।
কিন্তু দুই শাখার মধ্যেই বিবাহার্হ
কন্যার আদান প্রদান হয়। ইহাদেরও ব্রাহ্মণ নাই এবং
ইহারা নিজ ব্রহ্মকে দেবতা বলিয়া মান্য করে না।

মোরাণ নামে আর একটা অতি নগণ্য সম্প্রদায় আছে।
যাদও বড়া জাতির সহিত তাহারা
মোরাণ কোনও সম্পর্ক স্বীকার করে না, তথাপি
তাহারা যে বড়াজাতির অতুল্য
উভয়ের ভাষাগত সাদৃশ্য হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।
মোরাণেরা বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। তাহারা গো-মাংস বা
বরাহ-মাংস ভক্ষণ করে না, কিংবা মদ বা ফটিক
পান করে না। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত গৃহপালিত পশু ও
মৎস্য আহার করে, এমন কি পতঙ্গ পর্য্যন্তও ভক্ষণ করিয়া
থাকে। তাহারা কোনও মূর্তি পূজা করে না এবং
তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণও নাই। মেন্সী বা ভক্ত নামক
এক সম্প্রদায় ধর্মকার্যে পুরোহিত্য করিয়া থাকে।
“সভা” বা সামাজিক সম্মেলনে মোরাণেরা যুদ্ধ ও
করতাল বা মন্দির বাজাইরা কৃষ্ণগণ কীর্তন করিয়া
থাকে এবং ঐক্ককের উদ্দেশে ঢোল, কলা, লবণ, সুবাসি
প্রভৃতি নিবেদন করিয়া দেয়। প্রাচীন কালে মোরাণ
দিগের তিনটা ‘ছত্র’ বা ধর্ম কেন্দ্র ছিল। এক একটা
মদ্য-বুড়া বা ডাকেরিয়ার উপাধিকারী এক এক
অধিপতির অধীনে চালিত হইত। আজিও এই সকল
ডাকেরিয়া আসামে ধর্মগুরু বাসিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি-
শালী। মোরাণ পরিবার ইচ্ছামত আপন আপন
ডাকেরিয়া নির্বাচন করিয়া লইতে পারে। এক ডাক-
েরিয়ার শিষ্য অপর ডাকেরিয়ার শিষ্যের প্রভুত অন্ন ভক্ষণ

করে না। এমন কি, এক ডাকেরিয়ার শিষ্য না হইলে
পুত্রও পিতা কর্তৃক প্রভুত অন্ন গ্রহণ করিতে পারে না।

বহু প্রাচীন কালে চুটিয়াগণের মধ্যে নরবলি প্রথা
বর্তমান ছিল। পূর্বে যে ‘ভাস্কর মন্দির’
নরবলি প্রথা বা দেউড়ি মন্দিরের উল্লেখ করা
হইয়াছে সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে
একটা প্রস্তর নির্মিত যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।
কথিত আছে আহম দিগের সময়ে এই মন্দিরে
নরবলি হইত। প্রথম প্রথম এ স্থলে অপরাধীর শিরশ্ছেদ
হইত মাত্র, কিন্তু ক্রমশঃ এই নরবলি ধর্মের একটা অঙ্গ
হইয়া উঠে। বলির উপযুক্ত স্থলক্ষণ ও পূর্ণাঙ্গ নর
অনেক সক্ষম পাওয়া যাইত না। সুতরাং আহম রাজার
অধীন শ্বেল্ নামক একটা চুটিয়া উপশাখা বলির কৃত্রিম
‘নর’ সরবরাহ করিত, এবং এই রাজ-সেবার প্রতিদান
স্বরূপ তাহারা খিনা করে ‘খেরা’ পার হইত এবং ‘বাজার
ওক’ হইতে অব্যাহতি পাইত। উচ্চ জাতীয় নর না
হইলে বলির উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইত না, এবং সামান্য
অঙ্গহীন হইলে, এমন কি কানে একটু ছিদ্র থাকিলেও
নর বলির অযোগ্য হইয়া পড়িত। অথচ, ব্রাহ্মণ-বালি
নিষিদ্ধ ছিল এবং হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অপবিত্র বলিয়া
বলির অযোগ্য বিবেচিত হইত।

বলির যোগ্য নর পাইলে কয়েক দিন ‘দেউড়ি
মণ্ডপে’ বন্দী স্বরূপে রাখিয়া বিশেষরূপে তাহার আচারের
বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইত। পরে স্বর্ণ ও
রৌপ্যালঙ্কারে সুন্দররূপে শোভিত করিয়া গুপ্তপথে
দেউড়ি পুরোহিতেরা একটা সুগভীর কূপের পার্শ্বে
তাহাকে উপস্থিত করিত। সেখানে অগন্ধারগুলি
খুলিয়া লইয়া তাহার মস্তকচ্ছেদ করা হইত। দেহটা
কূপের মধ্যে অবস্থ হইয়া যাইত এবং মুণ্ডটা কূপের পার্শ্বে
স্তুপাকৃত যজ্ঞ-কপালের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত। কেহ কেহ
বলেন আহম রাজ্য ব্রহ্মরাজের করতল গত হইলে এই
নরবলি প্রথা তিরোহিত হয়। সে সময়ে দেউড়ির
ভাস্করমণ্ডপের সমীপবর্তী প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া

আশ্বিন ১৩১৯

যায়। আবার কেহ কেহ বলেন রাজ্য। গৌরীনাথ মিশমি-
দিগের আক্রমণ হইতে দেউড়িদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ
হইয়া ব্রহ্মপুত্রের একটা সুবিস্তৃত চরে তাহাদের বাসের
ব্যবস্থা করিয়া দেন। এইরূপে দেউড়িরা সদিয়ার
কয়েক মাইল পূর্বদিকে চুনপুরা নামক স্থান হইতে
বাস উঠাইয়া চলিয়া যায়। (সমাপ্ত।)

শ্রী গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

ভারতীয় সাহিত্যে বৌদ্ধ আদর্শের প্রভাব (২)

বুদ্ধের নীতিমূলক ধর্ম এবং মনুষ্যত্ব আদর্শের সঙ্গম
ফলে, ভারতবর্ষের মনুষ্যমন যে নানাদিকে স্বাভা-
বিকারে চেঁচা করিয়াছিল, ‘আচার’ ধর্মের আদর্শ দেবতা-
বাদ কিংবা পৌরাণিক তাকে নিগূহীত করিয়া, ভারতের
অন্তরাঙ্গা যে স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবে ক্ষুণ্ণ লাভ করিতে চেঁচা
করিয়াছিল, এবং এই স্বত্রে তাহার সাহিত্যের মধ্যেও
যে এক অপূর্ণ স্বাধীনতা এবং মনুষ্যত্ব-আদর্শের স্বত্বপাতি
হইয়াছিল, এই বিষয় আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে উল্লেখ করি-
য়াছি। ভারতীয় সাহিত্যের এই আদর্শলাভ বিশ্বমধ্যে
সর্বকোষ্ঠ এবং অতুলনীয় বলিলে অত্যাক্তি হইবে না।
খ্রীষ্টপূর্ববর্তী গ্রীক সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলেই
আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের এই মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে
পারিব।

প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের নাটকাদি নানামতে গ্রীস
দেশের ধর্ম এবং পূজা পৌরোহিত্যের প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত
হইয়াছিল। গ্রীক জাতির অতুলনীয় গজুবুদ্ধি-বিষয়, বস্তুনিষ্ঠা
এবং ভাবসংযমের আদর্শ গতিকে তাহার সাহিত্য-হৃদয়
ব্যাপক ভাবে অত্যাচার করিতে না পারিলেও তাহার

(২) এই প্রবন্ধ বাণী-পন্থার ‘সাহিত্য-আঙ্গার অভিব্যক্তি’
প্রসঙ্গের অন্তর্গত,—লেখকঃ।

সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য সর্বত্র অদৃশ্য কিংবা অদৃষ্ট দেবতার
মাহাত্ম্য খ্যাপন বই নহে। তাম্রের শিল্পের অদ্বিতীয়
দৃশ্য লেকুন (Lacoon) প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীক জাতির
হৃদয় নিহিত সাহিত্য-প্রতিভার প্রতিরূপ! উহার মনুষ্যত্ব
আদর্শের প্রতিরূপ। অতিকায় মহাসর্পের অশেষ
কুণ্ডলী মধ্যে নিরাশ্রয়ভাবে বিগড়িত, এবং নির্দয়
নিষ্পিষ্ট ওই মহাবল মনুষ্য মূর্তি সকল দিকেই গ্রীক আদর্শের
অদৃষ্ট-নিয়তির দৃষ্টান্ত! মানুষ এই ভবজীবনের মধ্যে
এইরূপ নিয়তি-চক্রে নিপতিত হইয়াই অসহায় ভাবে
লীলা শেষ করিতেছে! গ্রীক আদর্শের দৈব-নিয়তির
এবং গ্রীক ট্রেজিডির অধ্যাত্ম ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে
লেকুন পরিদর্শন করুন। এই নিয়তিটাকে অকুণ্ঠিত
মুখে মানিয়া চলাই গ্রীক-বীরত্বের আদর্শ! দুঃসহ
দুঃখ-নিয়তির মধ্যেও গ্রীক হৃদয় নিজের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা
অটল! অপরিহার্য্যাকে অমান মুখে শিরোধার্য্য করিয়াও
গ্রীক পুরুষকার নিজের আদর্শে অটুট, ঝটিকা-বায়ু-
প্রহত হেলিকন পর্বতের জায় নিরাকুল এবং নিরুপ!।
এই স্থলেই বিশ্বমধ্যে গ্রীক সভ্যতার গুরুতা, গৌরব এবং
মাহাত্ম্য! আমরা এই বিষয়ে সময়ে বিস্তারিত ভাবে প্রবন্ধ
করিতে পারিব। সংগ্রহিত এইমাত্র দেখিব যে, মনুষ্যত্বের
এই মাহাত্ম্য-ঘোষণা সত্ত্বেও গ্রীক আদর্শের মধ্যে দেবতার
মাহাত্ম্যই সমধিক প্রবল! উহা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরি-
ক্ষুট দেব-বাদের আদর্শ, উহা পৌরাণিকতা! সংস্কৃত
সাহিত্য এই নিয়ন্ত্রণার লেশ-লক্ষণ হইতেও মুক্তিলাভ
করিয়া মনুষ্যত্বকে অনাবিল সুপ্রতিষ্ঠায় পরিকল্পনা করিয়া
গিয়াছে। কালিদাসাদির কাব্য মধ্যে যেমন কোনরূপ
অজ্ঞেয় দৈব-আদর্শের প্রভাবে মনুষ্যত্ব নিয়ন্ত্রিত নহে,
তেমনি উহার কোনরূপ সাম্প্রদায়িক দেবতা-পূজা অথবা
দেবতা-বাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যেও উদ্গীর্ণ নহে।
উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মনুষ্য-হৃদয়ের আনন্দরস—মানব
রস—সাহিত্য-রস! কালের পৌরোহিত্য বিচার করিতে
হইলে, পৃথিবীর অত্র কোন জাতি এত অগ্রগামী হইয়া
এই সাহিত্য-রসটাকে এত নিরাবিল ভাবে ধারণা

করিতে পারে নাই। প্রকৃত সাহিত্যাদর্শের সাধন ক্ষেত্রেও এই দেশের মনুষ্যাত্মাই অগ্র-জাগরণ লাভ করিয়া গিয়াছে! বুদ্ধদেবের নির্মল নীতিমূলক ধর্ম-আদর্শের গভিকেই ভারতের সাহিত্যরীতিমধ্যে এই অগ্র-জাগরণের সাহায্য সম্ভব হইয়াছিল! নতুবা ভারতীয় আর্গ্য গণের আত্মাও দেবতাবাদী। বুদ্ধদেবের অজিজ্ঞাসা-বাদ বা অনীশ্বর উপদানর আদর্শ হইতে সাহায্য লাভ না করিলে, ভারতবর্ষের সাহিত্য-সরস্বতী সাম্প্রদায়িক ধর্মের কবল হইতে কোন কালে মুক্তি লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা পরমা প্রাপ্তি! ইহাকে হৃদয়ঙ্গম করার মধ্যেই যাবতীয় ভবিষ্য উন্নতির ভিত্তি। পরম শৈব কালিদাস কুমারসম্ভব রচনা করিতে গিয়াও, উমাশিবের মনুষ্য-আচরণকেই সাহিত্যরসের ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়াছেন; শিবের পূজা-প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। ভবভূতি কালপ্রিয়নাথের উৎসব বিশেষের জন্য নাটক রচনা করিয়া থাকিলেও তন্মধ্যে দেবস্তুতি কিংবা পূজা-প্রচার লক্ষ্য করেন নাই। ভারতীয় কবি-গণের নাটকাদি প্রায়ই বিবাহ, অভিষেক বা বিশেষ বিশেষ ধর্মোৎসবের সম্মিলিত মণ্ডলীর আনন্দবিধান উদ্দেশ্য করিয়াই বিরচিত হইয়াছিল! তথাপি উহাদের মধ্যে এই ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য মাত্রও যে আঘাত হইতেছে না, কবিগণের হৃদয়মধ্যে বিনির্মল সাহিত্য আদর্শ সমুদ্ভূত হইতে না পারিলে এই ঘটনা কোন মতেই সম্ভব হইত না; বরং উহার সর্বপ্রকারে ইয়োরোপের মধ্যযুগের ধর্মনাট্যগুলির বা আমাদের যাত্রা প্রভৃতির সমধর্ম্য হইয়া পড়িত।

সংস্কৃত ভাষায় সর্বপ্রাচীন সাহিত্য চেষ্টার দৃষ্টান্ত শূদ্রক প্রণীত মৃচ্ছকটিক। এই গ্রন্থ কবি শূদ্রকও নানাদিকে অপূর্ণ! বিশ্ব মৃচ্ছকটিক। সাহিত্যের পরম গুরু এই শূদ্রক! রামায়ণ মহাভারতও হামে হামে পৌরাণিক আদর্শের দ্বারা কলঙ্কিত হইয়া

আসিয়াছে; ওই কলঙ্ক কখন কোন মতলবী মনুষ্যের দ্বারা আরোপিত তাহা নিশ্চয় করা অসম্ভব। মৃচ্ছকটিকই ভারতের সর্বপ্রাচীন সাহিত্য সরস্বতীর আদর্শ বহন করিতেছে। এই কাব্যকে কোন কোন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত পৃথিবীর সর্বপ্রধান নাটক বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। উহাই হয় ত ঠিক। যখন ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বা ঋষি সভ্যতাও ভারতের মনুষ্যমনকে প্রবল ভাবে অধিকার করিতে পারে নাই, এই নাটক হয়ত সেই দূরবর্তী অতীতের প্রকোষ্ঠেই বিরচিত হইয়াছিল! অতেরা উহাকে বৌদ্ধপ্রভাবের সমকালবর্তী এবং উহার ফলপ্রসূত বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন—অন্ততঃ খৃষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতাব্দী। যাহা হউক, এই নাটক ভারতীয় প্রাচীন কবিহৃদয়ের—মনুষ্যহৃদয়ের সত্ত্বলনীয় স্বাধীনতার বাস্তব বহন করিতেছে! যখন ব্রাহ্মণ্য বা পৌরাণিকতাঃ আদর্শ ভারতের সাহিত্য বা সমাজকে একটা বিশেষ ‘ছাঁচের’ মধ্যে ফেলিতে পারে নাই, উহাই মৃচ্ছকটিক নাটকের কাল! এই নাটকের মধ্যে যেই প্রণালীতে তৎকালীয় ভারতবর্ষের একটি সুপ্রসিদ্ধ নগরের লোক রীতি, সমাজরীতি, রাজনীতি প্রভৃতির সুস্পষ্ট স্বভাব-চবি ধরা হইয়াছে, সেই প্রণালীটাও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরম আধুনিক হইতেও আধুনিক! এ কালের ইয়োরোপীয় সাহিত্যে প্রাকৃতবাদ বা ‘রিয়েলিজম’ (Realism) ও ‘নেচারেলিজম’ (Naturalism) বলিয়া যে একটা আদর্শ বহু পূজা লাভ করিতেছে, ভারতবর্ষীয় শূদ্রক কবি তাহার সর্বাদিম পুরোহিত! শূদ্রক সাহিত্যে স্বভাববাদিতার আদি গুরু! মৃচ্ছকটিকের মতন এইরূপ অবিকল ‘ফোটো’ ভারতীয় সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই, কোন প্রাচীন সাহিত্যে আছে কি না জানি না। শূদ্রকের হৃদয় একটা অতুলনীয় ফোটোগ্রাফীর যন্ত্র। আবার দেখুন, কত বড় সাহসী এবং স্বাধীন প্রকৃতি এই শূদ্রক! ঋষি-ভারতের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কে এত দূরবর্তী কালে আপনাকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া কেবল মনুষ্যত্ব দাবীর উপরেই নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

শুদ্ধ বাহাই হটন, এই আখ্যায় নিজকে পরিচিত করার পশ্চাতে যে একটা অপূর্ণ মহত্ব এবং অনন্য মেকনডের অবলম্বন আছে, আমরা নিজের হৃদয়কে দুই হাজার ২৭সর পূর্বকার সমাজ আদর্শের মধ্যে উপনিবিষ্ট করিতে না পারিলে, তাহার সম্পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব হইবে না।

এই স্তরে সংস্কৃত সাহিত্য আখ্যায়ের নিসর্গবাদ এবং নিসর্গানন্দের যতদূর অনুবর্তী হইয়াছিল, রামায়ণ মহাভারতের মহামুভব মনুষ্যত্ব অথবা লোকাতিগ উচ্ছ্বাসের যতদূর অনুগত হইয়াছিল, প্রবল 'ধর্ম' লক্ষণাক্রান্ত পৌরাণিকতা অথবা ব্রাহ্মণ্য আদর্শ হইতে ততই দূরবর্তী হইতেছিল! চাণক্য এবং শূদ্রক প্রবর্তিত সংস্কৃত সাহিত্য ধারার উহাই প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই সাহিত্যের একটা মহত্তম লক্ষণ উহার নিসর্গ প্রেম অযত্ন সুলভ বস্তুবিধয়ে মনুষ্যহৃদয়ের অনাবিল সুখানুভূতি, উহাদিগকে নিজের হৃদয় প্রাণময় এবং ভাবময় জ্ঞান করিয়া কবিশ্রমের পরম সরল সংশ্লিষ্ট! এই লক্ষণের মূল বীজ আখ্যায়ের ঐতিহাসিক মধ্যোই নিহিত ছিল। উপনিষদ যুগের 'তপোবন' সাংবাদর্শনের পুরুষ এবং প্রকৃতিবাদের মধ্যেও এই 'অনন্দ' জ্ঞানের বীজটাই অভিযুক্ত। এই লক্ষণ সংস্কৃত সাহিত্যকে যাবতীয় সাহিত্য মধ্যে অতুলনীয় মহিমায় বিশিষ্ট করিয়া গিয়াছে। আখ্যায় ভারতের উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে আখ্যায়ের সরল শক্তি উপাসনা এবং আধুনিক শক্তি উপাসনার মধ্যেও একটা স্বতন্ত্রাঙ্গ বলবৎ রাখিয়াছে! স্বতন্ত্রাঙ্গ ঐতিহ্যের মধ্যে যেই সরল মনুষ্যত্ব প্রকটিত, মহাকাব্যগুলির মধ্যে উহাই প্রসার লাভ করিয়া 'মহাপুরুষ' আদর্শের সৃষ্টি পূর্বক উহাদিগকে বিপুলবিক্রান্ত ভারতজাতির হৃদয়গাথা স্বরূপে রাখিয়া গিয়াছে! স্মৃত্যং পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের এই মনুষ্যত্ব আদর্শও প্রাচীনতম ঐতিহ্য সহিত ধারাবাহিক ভাবেই সম্বন্ধ। কল কথা, ভারতীয় সাহিত্যের মূল প্রতিষ্ঠা এই প্রাচীন ঐতিহ্য, এই পরম্পরাক্রান্ত আখ্যায়। আখ্যায় সত্যযুগে যেই হৃদয় লইয়া ভ্রুকোকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যেই হৃদয়

লইয়া ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন এবং তপোবন রচনা করিয়াছিলেন, যেই হৃদয় লইয়া ঋগ্বেদের অভ্যন্তরে প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্ব দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাটী অল্পপম সাহিত্য সঙ্গীতে উৎসারিত করিয়া গিয়াছে! আমরা আরও দেখিব যে, আখ্যায় আর একটা তত্ত্বও দর্শন করিয়াছিল। পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়টাই যে একই পরমাখ্যায় সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন লহরী, একই মহাখ্যায় প্রকট লীলা, আখ্যায় তাহাও অনুভব করিয়াছিল। বেদান্তের এই তত্ত্ব পরিচয় প্রাচীনতম বেদ এবং উপনিষদের মধ্যেই মিলিতেছে! কিন্তু ওই তত্ত্বের সমস্ত সূক্ষ্ম ফল সংস্কৃত সাহিত্য হ্রস্বত সকল দিকে চ্যুত করিতে পারে নাই; উহা ভবিষ্যৎ কালের জন্ত হ্রস্বত উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী বা ইয়োরোপীয় সাহিত্যের জন্তই প্রতীক্ষা করিতেছিল; হ্রস্বত ভারতবর্ষ হইতেই বিশেষ দীক্ষা প্রাপ্ত ইংরাজী সাহিত্য!

বাহাইউক, আমরা নবযুগের সংস্কৃত সাহিত্যের এই মহামুভব লক্ষণগুলির সঙ্গপরিচয় আরও কিছুকণ অনুসরণ করিব। ইহা ভারতীয় মনুষ্যহৃদয়ের একটা নব জাগরণ এবং নবজীবনের যুগ। ভারতবর্ষের সংস্কৃত সাহিত্য ভারতবর্ষের হৃদয়গুণ সঙ্গমেই আপনা হইতে এই নব জাগরণ লাভ করিয়াছিল। ইহা সাহিত্যে মনুষ্যহৃদয়ের প্রথম রোমান্স যুগ (১)। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের আখ্যায়সমুদ্রত শিল্প সাহিত্য হইতে প্রবল উদ্দীপনা লাভ করিয়া ইয়োরোপের সাহিত্যে এবং শিল্পে চিত্র, সঙ্গীত, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যের যে নব জীবন এবং নব জাগরণের সূচনা হইয়াছে, বুদ্ধ দেবের বলীয়ান 'মনুষ্যত্ব' আদর্শের সঙ্গমফলে সচেতন হইয়া ভারতবর্ষের হৃদয় আপনা হইতেই উহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে।

এই জাগরণের প্রধান লক্ষণ, প্রাচীন দেব-বাদ হইতে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্য এবং যাবতীয় কল্প ধর্মের আদর্শ হইতে মনুষ্য হৃদয়ের উদ্ধার। দেব-ভীতি হইতে উদ্ধার!

(১) উহার মূল লক্ষণ গুলি ইয়োরোপীয় সাহিত্য বিচার কালে বিস্তারিত ভাবে চিত্রা করা যাইবে।—লেখক

সাহিত্য রসের মধ্যে সর্বত্র প্রবল মনুষ্যত্ববাদ, আনন্দবাদ, স্বাভাব্য এবং স্বাধীনতার অনুসরণ ! বুদ্ধদেব নীতি-আদর্শ খাপন পূর্বক মনুষ্যমনকে, তাঁহার ধর্মকে, পরাক্রান্ত আচার আদর্শ হইতে দেব-ভীতি, যজ্ঞ এবং পুণ্যপ্রণালী হইতে উদ্ধার করিয়া প্ৰথম আশ্বাস দান করিয়া গিয়াছিলেন । প্রাচীন পৃথিবীর সমস্ত আচারমূলক ধর্ম হইতে বুদ্ধদেবের নীতিমূলক ধর্মের এই স্থানেই পার্থক্য !—মহাপার্থক্য ! সমস্ত প্রাচীনতামূলক সামাজিক ধর্ম অথবা ধর্মাবিরুদ্ধ সমাজ-আদর্শ হইতে, আধুনিক সভ্যতা-আদর্শের এই স্থানেই পার্থক্য ! নীতিই ধর্ম, এবং নীতি অনুসরণে জীবন যাপন করিলেই যে দেবতার প্রীতি-পরিতোষ বা পরমার্থ লাভ করা যায় উহাই বুদ্ধ ধর্মের প্রধান আশ্বাস বলিয়া ইতিহাস উল্লেখ করিয়াছে । এইরূপ আদর্শ প্রকারান্তরে মানিয়া লওয়াইতে মনুষ্যের সভ্যতা মধ্যে অতর্কিতে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়া গিয়াছে ! এখন শূদ্রক প্রভৃতি ভারতীয় কবিগণ, নিজের হৃদয়ের প্রবল শোণিতগতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই আদর্শকেই বরণ করিতে লাগিলেন । ধর্মোপাসনা বা দার্শনিকতার ক্ষেত্রে শৈবই হউন, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন, রামায়ুত, অদ্বৈত মতাবলম্বী বা মায়াবাদী যাহাই হউন, সাহিত্যের আসরে অবতরণ মাত্র সকলেই মানুষ । আপনার হৃদয়-গতির একান্ত অনুসরণকারী, হয়ত প্রাচীন ধর্ম-আদর্শের নানাটিকে বিদ্রোহী, কেবল মাত্র ‘মনুষ্য’ । রুচ্ছ চাক্ষায়ণ দেব-পূজা, বৈরাগ্য বা বিশ্বমায়া হইতে পলায়নের আদর্শ একেবারে অস্তিত্বহীন । শূদ্রক হইতে আরম্ভ করিয়া দণ্ডী, বিষ্ণুশর্মা, কালিদাস, ভবভূতি, বিশাখদত্ত, অমর, ক্রীড়, ধাবক, মাধ, ভারবি, ভট্টহরি, বাণভট্ট, ভট্টনারায়ণ বা জয়দেব সকলের মধ্যেই নানাটিকে এই অপরূপ মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা, এমন কি বিদ্রোহের আদর্শই লক্ষিত হইবে । বিদ্রোহ ! কেন না, কোন ব্রাহ্মণ পবিত্র যজ্ঞযন্ত্র স্পর্শ করিয়াই শপথ করিতেছেন—“হুন্দরী তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না” । কেহ বা জীবনের সমস্ত অর্থও

পুণ্যকার্যের পুরস্কার স্বরূপ, সেই ‘অনঘ’ রূপের প্রত্যাশায় লালায়িত হইতেছেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নিয়ত বাঁহার দাসকর্মে নিযুক্ত আছেন, ত্রিভুবন-বিজয়ী প্রেম-দেবতার, কুম্ভায়ুধ দেবতার পবিত্র নামোল্লেখ পূর্বক স্বস্তিবাচন পুরঃসর কোন ব্রাহ্মণ কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত, প্রিয়তমার প্রীতরণে ভাব-বিকশিত পুষ্পাঞ্জলিদানে অবহিত । মায়াবাদী এবং বৈরাগ্যবাদী সন্ন্যাসীগণের দূরবস্থা অরণ পূর্বক কোন কবিদার্শনিক অপরূপ অস্থায়ী সহিত যেন তাহার গুচ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—“উহারা মনুষ্য-রাজ্য রাজ্য মধ্যে ‘মহাপরাধী,’ ‘সর্গার্ষসম্পৎকরী’ স্ত্রীমুদ্রাকে অবহেলা করার অপরাধে, রাজ্য উহাদিগকে গুরু দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন, মাধা মুড়াইয়া নয়ীকৃত করিয়া দেশে দেশে লম্বাইতেছেন !” কোন মহাত্মা অগ্নানমুখে পরম সমুদ্ভূ-সিত কণ্ঠে গাহিয়া বসিয়াছেন—

যদি সা প্রমদা হৃদয়ে বসতি

ক যপঃ ক তপঃ ক সমাধিবিধিঃ ।

সংহিতাপন্থী ব্রাহ্মণ, নিরুত্তি-আচারী ধার্মিক, পরম শৈব এবং বেদান্তশিষ্যগণের এই কথা ।

এই সমস্তই সামাজিক রুচ্ছ ধর্মের বিরুদ্ধে মনুষ্য হৃদয়ের বিদ্রোহ । তন্ত্রমন্ত্র-সংহিতা বা একান্ত বৈরাগ্য বাদের বিরুদ্ধেই এই জ্ঞানরূত বা অতর্কিত বিদ্রোহ !

কেবল ইহাই নহে । কেবল বিদ্রোহ আচরণ করিয়াই মনুষ্য-হৃদয় ক্ষান্ত হয় নাই । এই নব অধিকার সূচুত করিয়া, আপনাদের কবিধর্মকে সকল ধর্মের সমান আসনে স্থাপন করিয়া বরঞ্চ উহাকেই একটা বিশিষ্টতর ধর্মরূপে প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত করিয়াই, তবে কবিগণ বিরত হইয়াছেন ! ভারতবর্ষে সকল ধর্ম এবং কর্মজিজ্ঞাসার, সকল গ্রন্থচেষ্টার প্রাকালেই একটা সংকল্প, একটা প্রয়োজনজিজ্ঞাসা এবং অর্থবাদের প্রণালী অরণ্যভীত কাল হইতেই প্রচলিত ! প্রয়োজন-জিজ্ঞাসা, কেন না “প্রয়োজনমহুদ্ভিগ্ধ ন মন্দোহপি প্রবর্ততে” । তাই ভারতের সকল দর্শন শাস্ত্রের গোড়াতেই একটা জিজ্ঞাসা আছে । ভারতীয় দার্শনিকমাত্রই প্রায় হুঃখবাদী ।

সুতরাং “দ্বৈতজ্ঞানতিবাহিতা জিজ্ঞাসা”। বহুভাষ্যের জীবিত হুগে আহত হইয়া উহার পরিহারকরে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে। তাই ‘জিজ্ঞাসা’ উঠিতে পারে, কাব্যের আবার প্রয়োজন কি? বহুব্যবহার পক্ষে এই ‘অভ্যর্থন সেবা’ এবং অবধা বচন-রচনার কি দরকার? কবিগণ সাহেবকারে এই জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তর করিয়াছেন। কবিগণের হৃদয়নিহিত এই প্রত্যুত্তর লিপিবদ্ধ করিয়াই অলংকার শাস্ত্রের আরম্ভ। “তুমি যশ চাও, অর্থ চাও, লোকব্যবহারের জ্ঞান-লাভ করিতে চাও, দুঃখ-দৈত্য অমল বা ব্যাধি-বিপত্তির নিবারণ করিতে চাও, কবিগণ সে সম্বন্ধেও আশাস প্রদান করিতেছে! তুমি নীতি-ধর্মশাস্ত্রের ‘উপদেশ চাও, ভাল, কাব্য তাহাই দিবে? এবং আরও একটা বিশেষ কিছু, বাহা তোমার হৃদীর অতিরিক্ত, তাহাই দিবে! উহা প্রীতি-পরিচ্ছন্ন উপদেশ—‘কান্তাসম্মত’ উপদেশ। ধর্ম অধিকারের পরম আনন্দ চাও? কাব্য সকল কৃষ্ণ সাধনার সম্পর্ক হইতে বহু দূরে, তোমার হৃদয়কে পরম ‘দ্বৈতজ্ঞান’ দেখে লইয়া গিয়া, সেই ‘পর-নির্ভূতি’ প্রদান করিবে।” উপনিষদের ঋষি বলিয়াছিলেন, “রসো ঽৈব সঃ”। আবার বলিয়াছেন “ভূমৈব স্মৃৎ, নাম্নে স্মৃৎমতি।” কবিগণ অমনি জোটবন্দী হইয়া পরম উৎসাহে বলিয়া বসিলেন, “ওই রসের বোঝা, ভোক্তা, যোক্তা ত আমরা! কবিতার প্রদান উদ্ভেদ ওই রস! আমাদের ‘সাহিত্য রস’ কি? উহাই ত সেই পরম রস।” এই ‘রসের’ চরমসীমা প্রদর্শন করিতে গিয়াই সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন—

সখোজ্জেকাদেবং বপ্রকাশানন্দ চিত্তয়ঃ।

বেদান্তের স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মবাদ সহোদরঃ।

এই সকল গৌড়া-গোবিন্দের সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে?

এখন দেখুন, ইহা সম্পূর্ণ ভাগবত আদর্শ। কবিতার আশ্রয় নাই রস। এই রস বহুব্যবহার ভাব-বৃত্তির খাদ্য। বহুব্যবহারের ভাববৃত্তির পরিপোষণ করিয়া এই রস-পলা বহুব্যবহারকে বিকৃপদের সঙ্গে অন্তর্কিতে সংযুক্ত রাখিয়াছে। ~~কবিগণ~~ বর্ণ ও মর্ত্যের মধ্যে বিবাহ সংঘটন করিয়াছে।

কবিগণ হৃদয়-ধর্মের বশবর্তী হইয়াই অমলপদের সহিত বহুব্যবহার এই ‘রসানন্দ’ যোগ সূর্য্যপ্রে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিলেন। ভারতীয় বহুব্যবহারের বহুকালী পুরাণ-চেষ্টাও ইহার পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। প্রাচীন আর্ধ্যসমাজের মধ্যে ক্রিয়া-কৌশলবাদ প্রীতিহীন বজ্রতরু এবং কৃষ্ণ-পীড়ন অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত দেশের হৃদয় দেবভীতি এবং শুদ্ধ জ্ঞানবৈরাগ্যের প্রবল মাপপাশে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন সময়েই কবিগণের উৎকোশপক্ষী প্রভাত ডাকিয়াছে! জগতের সকল প্রাচীন ধর্মের আদর্শই যে এইরূপ প্রীতিহীন ক্রিয়াকৌশল, কৃষ্ণ, অহুষ্ঠান এবং অবিকল আচারতন্ত্রে জড়সর, তাহা আমরা দেখিতে পাইব। কবির আশ্রয় উহার মধ্যে ভাগবত ভ্রমের সুরধুনী প্রবাহিত করিয়া গিয়াছে। রসের আশ্রয় এক বার পাইয়াই বহুব্যবহার আর তাহাকে কোন মতেই ছুলিতে পারেন নাই।

এক দিকে প্রকল্প বিব্রোহ-ভাব অস্ত্র দিকে কবিগণের পবিত্রতা বিষয়ে পরম বিশ্বাস! উহাই নবজাগ্রিত কবিগণ এবং সাহিত্যসাধনার হৃদয়মর্মকে পরিচালিত করিয়াছিল! উহাকে পরমধর্মরূপে সকল ধর্মের উপরি-কার আদর্শরূপে স্থাপন করিয়াছিল! ইহা সম্পূর্ণ ‘মানব’ আদর্শ! সারস্বত ক্ষেত্রে এই আদর্শই পৌরাণিকতা এবং দেবভীতির কবল বা সংশ্রব হইতে বহুব্যবহারকে উদ্ধার করিয়া, মানবের স্বাধীন ভিত্তির উপরেই সাহিত্যকে স্থাপন করিয়াছে; ধর্মের ক্ষেত্রেও এই আদর্শটাই তত্ত্ব-পুরাণগুলির সৃষ্টি করিয়া বহুব্যবহারকে পরম পদের অভি-বৃদ্ধে সোজাশুভি পথ দেখাইয়া গিয়াছে। মধ্যবর্তিতা, সাম্প্রদায়িক অচলতা, অথবা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির বিবাদ মধ্য হইতে পলকে উদ্ধার সাধন করিয়া বহুব্যবহারকে নিজের রসতত্ত্বের মধ্যেই প্রাচীন আর্ধ্য-আদর্শের ‘তপোবন’ রচনা করিতে দীক্ষা দান করিয়াছে। ‘নব রসের সাহিত্য-ভাবে উপগত হইবার জন্য, যেমন দেবতাকে প্রিয়, তেমন প্রিয়কে দেবতা’ করিবার জন্যও পথ দেখাইয়াছে। ইহা নানাদিকে বৃদ্ধ আদর্শের ফল।

নড়ই বা কত। এই দীনদীন, এবং সংসারবুদ্ধে পড়ে পড়ে অযোগ্যতর ব্যক্তিরদ্বারা পরাভূত কবিগুলার অহংকারই বা কত। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, বৈয়াকরণ, দিকপাল রাজা, নিজেদের হস্তাকর্তা প্রভু, যোগী, সন্ন্যাসী কেহই বাদ পড়ে নাই। নিবৃত্ত ধর্ম, সাম্প্রায়িক সত্যাসীর ধর্ম চিন্তাবৃত্তির নিরোধ, অত্র দিকে ক্ষুণ্ণতা জড়তা বা ইহসংসারতার আদর্শ কিছুই ইহাদের কটাক্ষ বিচার হইতে রক্ষা পায় নাই। “তুমি রাজা, তুমি কষতাবান; আমরা উদরারের অত্র তোমার সভার আসিতে বাধ্য হই; তুমি যেমন ইচ্ছা আমা-দিগকে ডাহিনে বামে, সম্মুখে বা পশ্চাতে বসাইতে পার। কিন্তু মনে রাখিও তাহাতে আমাদের মূল্য কমিবে না, আমরা বচনরচনা দ্বারা তোমার এই রাজ্যটা—সমস্ত পৃথিবীটা কিনিয়া ফেলিয়াছি; ক্রোধ-দারিদ্র্য অপমানবিনিকার ইহাদিগকে দমাইতে পারে নাই। ইহারা কালের পটে অবিনশ্বর আলোকের অক্ষরে নিজেদের নাম লিখিয়া যাইতেছিলেন। জয়দেব গোস্বামী জীবনে কি পরিমাণ শরীরার পরিচয় পাইয়া ছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি নিজের প্রাণ-কোষ মধ্যে গীতগোবিন্দের মধুসূদন এবং রূপের আশ্বান লাভ করিয়া, অপক্লপ উৎসাহ সহকারে চীৎকার করিয়া গিয়াছেন—

“শকরে ককরাগি”। কিংবদন্তী আছে, দরিদ্র ভব-ভূতি উত্তররাবচরিতে শ্লোকবিশেষ (১) ধারণা করিয়া এমন একটা উন্নমন প্রদান করিয়াছিলেন যে, ক্ষুদ্র কুটিরের বর্ণীর মাথা ঠেকাইয়া রক্তাক্ত দেহেই ভূমিসাৎ হন। এই গল্পবটীর মধ্যে তাবের রাজা কবির অন্তর্ভাবের এবং উহার ঐশ্বর্য্য বিষয়ে তাঁহার নিজের একটা উন্নত উন্নাদের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, অত্র দিকে তাঁহার শ্রীকর্তৃপদলাহনার মধ্যে সে কালের একটা মহারাজের

সাতিকিকেটুকুও যেমন দেখা যায়, হার, তেমনি জীর্ণ কুটিরখানিও উঁকি দিতেছে।

“বিনমিত পটলাগুং দৃশ্যতে জীর্ণকূট্যম”
কিন্তু দরিদ্রতা। দারিদ্র্যকে ত ইহারা নিজের মাহাত্ম্যের পতাকারূপেই ব্যবহার করিয়াছেন। “সরস্বতীই আমার মা, লক্ষ্মী, বিমাতা। মা-টা মুখরা, বিমাতাও চঞ্চলা, হুটীতে মিলিয়া প্রত্যহ আমার গৃহে বগড়া, বিমাতা রুগী হইয়া বাড়ী ছাড়িয়াছেন। তুমি লক্ষ্মীমন্ত, তুমি মহারাজ, বিমাতার তালাসেই তোমার দরজার এগেছিলাম; তোমার কথার বুঝতে পেরেছি, তিনি এক দিন এ’বাড়ীতে ছিলেন সত্য, কিন্তু এস্থান ত্যাগ করেছেন। তুমি বৈয়াকরণ, নৈয়ামিক, তুমি দার্শনিক। বড়ই অবদ-জগ্গ তাবে এবং গভীরবুদ্ধে আমাদের খুঁটি-নাটি ধারতে লাগিয়া যাও; কিন্তু তোমাদের মতন মূর্খ কে? তোমরা আদৌ জান না কাব্যের মূলতত্ত্ব কোথায়; কাব্যকে কোন দিক হইতে দৃষ্টি করিতে হয়—

পঠন্তি কতিচিচ্ছাৎ ধ-ক-ছটেতি বাচং শঠাঃ।

ষটঃপটেতি কতিচিৎ পটু রটন্তি নৈয়ামিকাঃ।

বয়ং বকুলমঞ্জরীগলদপারমাধ্বীকুরী—

ধুরীণঃ পদরীতিভি বু’বতিভি বিনোদাধরে॥”

মালতীমাধবের প্রস্তাবনার কবির যে সাহংকার উক্তি আছে, কোন টিপ্পনাকার উহার একটা বুকচেরা ব্যাখ্যার আভাস দিয়াছেন। ব্যাখ্যা যথার্থ না হউক, উহার মধ্যে অন্ততঃ এক দল সাহিত্যপ্রেমিকের একটা মনের কথা পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন—

যে নাম কোচিদিহ নঃ প্রথমস্ত্যবজ্ঞাং

জানন্তি তে কিমপি তান প্রতি নৈব যত্নঃ।

উৎপত্ততেহন্তি মম কোহপি সমানধর্ম্য

কালোহয়ং নিরবধি বিপুলো চ পৃথী।

এই একটা অর্থও যেন কবির অভিপ্রায় ছিল বলিয়াই মনে হয়—“যে সমস্ত লোক আমাদের ইহসংসারকে, ঐহিকতার সম্পর্ক মাত্রকেই অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের জন্য কিন্তু আমার এই কাব্য-চেষ্টা নহে—একথা গোড়া-

(১) অকিকিদিপি কুর্য্যামঃ সৌভাগ্যঃখ্যাভিপোষতি।

ভবত কিমপি ভবং মোহি বত্ম শ্রিয়োজনঃ।

হেই বলিয়া রাবি। তাঁরা কি-ই-বা জানেন। তা' লইয়াই পরম স্নেহে দূরে থাকিতে পারেন। মনুষ্যের মধ্যে কি আমার সমধর্মী ব্যক্তির অভাব হইবে—হয়ত এখনও আছে। যে হেতু, এক দিকে কাল যেমন অনন্ত, অন্য দিকে পৃথিবীটাও তেমনি বিপুল।" ঐহিকতার উপর মনুষ্যত্ব ভিত্তির উপরেই সাহিত্যের নিষ্ঠা; অন্য-দিকে যেমন স্বাধীনতা তেমনি সমধর্মতা বা সহানুভূতির উপরেই উহার প্রধান প্রতিষ্ঠা।

যে রূপেই হউক, শ্লোকটির মর্ম মধ্যে এই নব-জাগ্রত সাহিত্য-আন্দোলনের প্রধান মর্মটাই লুক্কায়িত দেখিতেছি। বাঁহারা সংসারের সহিত তাবৎ সম্পর্ক ছেদন করার অভিপ্রায়ে বলিয়াছিলেন—“কাব্যলাপাংশ বর্জয়েৎ” তাঁহাদের বিরুদ্ধেও যেন একটা জবাব পাইতেছি। মনুষ্যত্ব এবং সংসার-ভিত্তির উপরেই সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত! নশ্বর, হয়ত পার্থিব বিষয়কে আলম্বন করিয়াই অবিনশ্বর স্থায়ী ভাবের উদ্দীপন করা, অপার্থিব রস-সংযোগ সিদ্ধি করাই সাহিত্যের বিশেষত্ব। এই পরম সার্বজনীন অথচ আধ্যাত্মিক পন্থাই বুঝি বাণী-পন্থা। ললিতকলামাত্রেরই কি কারে-প্রকারে উহাই উদ্দেশ্য নহে! আমরা দেখিতে পাইব, এই নব আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বঞ্চিত অল্পসংখ্যক করার মধ্যেই সমগ্র মনুষ্য-সত্য-তার একটা বৃহৎ কর্তব্য নিহিত রহিয়াছে।

বাণী হউক, ভারতভূমে এই নব সাহিত্য-পদ্ধতির জন্ম হইল। সাহিত্য গ্রন্থের এক জন কর্তা চাই; কেবল ব্যাস, বাসীকি, ধন বা শুভকরের নামকর্তৃত্বে প্রচারিত হইলে সাহিত্য-পদার্থের একটা প্রধান লক্ষণই খণ্ডিত হইয়া যায়। এই কর্তৃত্ব, এবং অসংখ্য কর্তার একটা ব্যক্তিত্ব এবং দায়িত্বের লক্ষণ সাহিত্যের স্বরূপ নিরূপণে অপরিহার্য। সাম্প্রদায়িক অহুর্ভাব এবং পূজা প্রণয় উদ্দেশ্য করিয়া-ছিল বলিয়া পৌরাণিক রচনার মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণের বেশীকম অসম্ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। পৌরাণিক গণের সারস্বত আদর্শকে অতিক্রম করিয়া অসংখ্য উহারই ক্রমপরিণতি স্বরূপে ভারতবর্ষে এই নব

সাহিত্যের জন্ম হইল! শূরক, দত্তা, বিষ্ণুধর্মী, কালিদাস প্রভৃতি আপনাদের কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব ঘোষণা করিয়া দাঁড়াইলেন। দায়িত্ব—কথার দায়িত্ব। এক একটা কথা হয়ত অনন্ত কাল মনুষ্যসমাজের মধ্যে জীবিত থাকিয়া কোটা কোটা মনুষ্যের মনকে ভাগমন্দের জন্ত নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকবে বলিয়াই দায়িত্ব।

শ্রীশঙ্করমোহন সেন :

ছায়াছন্দ।

ছিন্ন ছায়া ঘনিষে এল

ঘুমে নয়ন আলা,

ঘুমাক্ আছা ঘুমাক্ তবে

বালা;

ছাওয়ার ভয়ে যায় পরীরা,

ঢেউয়ের ফণায় নবল হীরী,

ছাড়িয়ে গেল ললাট ঘিরে

নিদ্রুকুসুমের মালা।

ঘুমাক্ আছা ঘুমাক্ তবে

বালা।

তোলে নি আজ বৈকালী ফুল,—

ভরে নি আজ থালা,

ছায়ার ছাওয়া রূপের রসের

ডালা;

গন্ধ তুণের গহন খাসে

শিউলি কুঁড়ি ঝামিয়ে আসে,

তম্বা-ভারে পড়ল ভেঁরে

আঁধারে ডাল-পালা।

ঘুমাক্ আছা ঘুমাক্ তবে

বালা।

শিয়রে ধোও সোনার কাঠি

সন্ধ্যা-বেশে ঢালা,

খণ্ড চাঁদের দীপখানি হোক

আলা ;

হাওয়ার মুখে নাই কোনো বোল,—

অশথ পাতার দেয় না সে দোল,

আঁধার শুধু কোল তরেছে,—

হিমে শীতল—কাল। !

ঘুমাক্ আঁধা ঘুমাক্ তবে

বালা।

শুনে না সে আজ ঝিঝিদের

রাজি ব্যাপী পালা,

দেখবে না গো বনে জোনাক্-

আলা ;

পর্দাখানি দাও গো টানি'

ঘুমিয়ে গেছে আলোর রাণী,

লুপ্ত-শিখা সোনার প্রদীপ

মৃত্যু-ভুবন আলা ;—

ঘুমিয়ে গেছে ঘুমিয়ে গেছে

বালা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

নামি-কো

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহজীবন

কাওয়ারিমা-গৃহিণী আঙনের ধারে বসিয়াছিলেন। সেই মাত্র বড়িতে আটটা বাজিল ; কাঁধের উপরে বড়ির দিকে দেখিয়া তিনি মুহূরুরে কহিলেন, “আটটা বাজিলো। তাদের কেয়া উচিত ছিল।” ষটপুট হাতখানি বাড়াইয়া

তিনি তামাকের বাস্কাটি গ্রহণ করিলেন, ও খুব জোরে কয়েকটা টান দিয়া স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

সহরের উপকণ্ঠের নিকটবর্তী হইলেও রাস্তা হইতে কুরুমা বাতায়াতের শব্দ আসিতেছিল। নব বর্ষের পর কয়েক দিন ধরিয়া সন্ধ্যায় এইরূপ হইয়া থাকে। নিকটবর্তী একটি বাটী হইতে জৌড়ামন্ত বালকবালিকাদের আনন্দ কোলাহল বৃদ্ধার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল, মাঝে মাঝে নিশার নিস্তকতা ভাঙিয়া হাসির তরঙ্গ উঠিতেছিল।

অসহিষ্ণু ভাবে তিনি একবার গজ্ গজ্ করিয়া বলিলেন, “এতে হাসির কি আছে? হাঁ।” তারপর তাকেও কথামনে পড়িয়া গেল, “যখন আকাশাকা বায় তখন এই রকম—সকলেই সব কাজ ভুলে যায়, তাকে, নামি, সকলে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আর পারবার জো নাই।” বিড়্ বিড়্ করিতে করিতে একটু নড়িতে গেলেন, অমনি কোন্ বেতো জায়গায় আঘাত লাগাতে ‘উঃ’ করিয়া উঠিলেন। মুখবিকৃতি করিয়া রাগতভাবে তামাকের নলটা ঠুকিতে ঠুকিতে উচ্চকণ্ঠে ঝিকে ডাকিলেন, “মাৎসু, মাৎসু, অ মাৎসু।” ঠিক সেই সময়ে ফটকে দুইখানি কুরুমা আসিয়া দাঁড়াইল, ভৃত্য হাঁকিল, “প্রভু প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।”

নববর্ষের সৌধীন পোষাক পরিয়া পরিচারিকা ব্রত ভাবে বেগে ঘরে প্রবেশ করিল। কর্তীঠাকুরানী কেন ডাকিয়াছেন বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে তামাক খসক দিয়া উঠিলেন, “এত দেবী কেন?” পরিচারিকা খত মত খাইয়া প্রস্থান করিল।

এমন সময় তাকেও আসিয়া মাতাকে শুভসন্ধ্যা জ্ঞাপন করিল। তাহার নিজের ও বাবীর কোর্ডা পারিচারিকার হাতে দিয়া তাকেও ঠিক পশ্চাতে নামি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া মুহূরুরে মাতাকে শুভসন্ধ্যা জানাইয়া বলিল, “বড় দেবী হয়ে গেল।”

“ধাক্, তোমরা ফিরেছ তা হলে? গেসুলে ত আধকে নয়।”

আশ্বিন ১৩১১

তাকেও কহিল, “হ্যাঁ, বা! আমাদের দেবীই হয়ে গেছে। আমরা প্রথমে গেলুম কাতোদের ওখানে। তাঁরা বলেন, আমাদের সঙ্গে আকাশাকা যাবেন। যেসো বশাই, মাসীমা, চিছুকোমান, নামি আর আমি পাঁচ জনে মিলে আকাশাকা গেলুম। আকাশাকার ওঁরা আমাদের দেখে তারি খুসী। সেখানে আরো অনেকে এসেছিলেন, গল্প করতে করতে দেবী হয়ে গেল।” পরিচারিকার হাত হইতে এক পেরালা চা লইয়া পান করিয়া তাকেও আপনার মনে বলিল, “একটু যেন দেখা হয়েছে।” বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, “আকাশাকার সকলে ভাল ত, নামি?”

“হ্যাঁ, তাঁরা সবাই ভালো আছেন। আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন। তাঁরা আসতে পারলেন না, আপনি যেন কিছু যেন না করেন এই কথা বলতে বলেছেন। আপনার সুন্দর উপহারের জন্যে আপনাকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

“উপহারের কথার মনে পড়ে গেল, নামি, কোথায় গেল ওদের—এই যে!” এই কথা বলিয়া তাকেও নামির হাত হইতে একখানি রেকাবি লইয়া যাতার সাবনে রাখিলেন। কতকগুলি শীকার করা পাখী রেকাবির উপর সাজানো ছিল।

“পাখী দেখছি যে? এতগুলো!”—

“হ্যাঁ বা, খুঁজ বশাই এবারে খুব শীকার করেছেন, তিনি সব একত্রিশে তারিখে ফিরেচেন। পাখীগুলো আজই আমাদের এখানে পাঠাবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কাল একটা বুনা শূরোর শীকার করচেন বোধ হয়।”

“বুনা শূরোর? সত্য নাকি? নামি তোমার বাবা ত আমার চেয়ে কেবল তিন বছরের ছোট, না? ছেলে বেলা থেকেই খুব সাহসী তাঁর, এখনো দেখচি কম নয়।”

“তবে শোন বা, তাঁর এত শক্তি যে, তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে তিন রাত্তির কাটিয়েছেন, কিন্তু শরীর তাঁর একটুও ব্যাথা হয় নি। ছেলে ছোকরার মত কষ্ট লইতে পারেন বলে তিনি গর্ব করেন।”

“তা তো করবারই কথা বাপু। আমাদের মত যারা বাতে পছঁ তারা আর কোন্ কাজে লাগে বল। ব্যামোর মত আর মানুষের শত্রুর নেই। যাও তোমরা কাপড় ছেড়ে শোওগে। হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে, আজ র্যান্সাহিকো এসেছিল।”

তাকেও উঠিতে বাইতেছিল, কথাটা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইল বলিয়া বোধ হইল না। নামিও সচকিত হইয়া উঠিল।

“চিজিয়া?”

“সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।”

কণকাল ধামিয়া তাকেও কহিল, “তাই নাকি? আমিও তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। সে টাকা চাইতে এসেছিল না কি না?”

“কেন? না, না। এ রকম ভাবছ কেন তুমি?”

“আমি তাঁর বিষয়ে কিছু শুনেছি। থাক, শীগগিরই তার সঙ্গে দেখা করব।”

“আর, রান্সাহিকো এসেছিল।”

“অ! সেই মুখুঁটা নাকি?”

“দুই তোমাকে ধাবার জন্যে বলে গেছে।”

“আলালে!”

“তোমার যাওয়া উচিত। সে এখনো তোমার বাবার দয়া ভুলতে পারে নি।”

“কিন্তু———”

“না, তোমার নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত। আমি শুতে চলুম।”

তাকেও ও নামি উভয়ে তাঁহাকে শুভ-রাত্রি জাপন করার বিদায় হইল।

ঘরে আসিয়া নামি স্বামীর কোটটি খুলিয়া লইয়া একটি ভূলাতরা রেশমী পোষাক পরাইয়া দিল। তাকেও একটি সাধা ক্রেপের কোমরবন্ধ বাঁধিয়া আরাম কেমারায় বলিয়া পড়িল। নামি তাহার কোটটি ঝাড়িয়া পাশের ঘরে টাঙাইয়া রাখিল, পরিচারিকাকে চা তৈয়ারি করিতে বলিয়া পতির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

“তোমার আজ বড় কষ্ট হয়েছে, না?”

তাকেও চুরট টানিতে টানিতে নববর্ষের চিঠি, কার্ড প্রভৃতি দেখিতেছিল, এই কথা শুনিয়া মুখ তুলিল।

“তোমার কষ্ট হয়েছে, নারিসান্। আহা, কি সুন্দর!”

“কি?”

“এই তোমাকে কি সুন্দর দেখতে!”

“আর ঠাট্টার কাজ নেই।”

পতি তাহার সৌন্দর্যের প্রশংসা করিয়াছেন, সে লজ্জার রক্তিম হইয়া উঠিল, চোক দুটি ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোক হইতে ফিরাইয়া লইল। তাহার স্নান কপোল গোলাপী আভায় অল্পরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, মাথার পোল ধোঁপা কাচের যত চক্ চক্ করিতেছে। তাহার পরণে একটি কালো রঙের রেশমী ‘কিমোনো’, পা দুটি বেড়িয়া কিমোনোর যে অংশটি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে সেখানে ঢেউ আর সমুদ্রের পাখীর ছবি আঁকা। কোমরে হৃদের সরের রঙের একটি প্রশস্ত কোমরবন্ধ, বুকে একটি মণিবসানো পিন্, তাকেও সেটি আমেরিকা হইতে আনিয়াছিল। আলোকের সম্মুখে লজ্জাক্রান্ত নিতহাস্তে দণ্ডায়মানা পত্নীকে দেখিয়া তাকেও মুগ্ধ হইয়া গেল।

“তোমাকে ঐ পোষাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন আমার একটি নতুন স্ত্রী লাভ হয়েছে।”

“ও সব কথা বল ত চলে যাব।”

তাকেও হাসিল, “আর বলবো না। কিন্তু চলে যাবে কেন?”

এইবার নারিও হাসিয়া ফেলিল, “এই কাপড় ছাড়তে যাব।”

গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই তাকেও সমুদ্র স্রোত করিয়া বাহির হইয়াছিল, শরতেই তাহার ফিরিবার কথা ছিল কিন্তু জাহাজের কলকজা ধারণ হইয়া যাওয়াতে, সেগুলি বেরানভের জন্ত স্ত্রুফ্রান্সিস্কেতে অনেক দিন বিলম্ব হইয়া গেল। বছরের শেষাংশেই তাকেও বাড়ী ফিরিল। আজ, আত্মহারাি মাসের তেরমা সে প্রথম নারিকে সঙ্গে

লইয়া কাতো ও কাতাওকাদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। ইহার পূর্বে আর ঘটনা উঠে নাই।

তাকেওর মাতা সেকলে ধরণের স্ত্রীলোক, তিনি বিদেশী ধরণধারণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তাহার পুত্র একালের ছেলে, তার রুচি একটু ভিন্ন রকমের হওয়া স্বাভাবিক, তাই তার সম্মুখে তিনি বেশী কড়াকড়ি করিতে পারিতেন না।

পুত্রের প্রশস্ত বৈঠকখানাটি দেশী ও বিদেশী, উভয় ধরণেই সজ্জিত। ঘরের মেঝের উপর কোমল সাদা বিছানো, তাহার উপর একখানি সবুজ কার্পেট পাতা। একটি দেয়ালে একখানি ‘লেওকেপ’ ছবি। তাহার সামনের দেয়ালে তাকেওর পিতা মিচিভাকের একখানি ছবি বিলম্বিত। ঘরের এক কোণে একটি পুস্তকের আলমারি ও কয়েকটি শেল্ফ্। সেখানে পিতার প্রিয় একখানি তরবারি। একটা শেলফের উপর নাবিকের একটা টুপি ও একটি দূরবীণ। একটা ধামের গায়ে একখানা ছোয়া ঝুলিতেছে। দেয়ালের গায়ে আরো কয়েকখানা ছবি, তন্মধ্যে, সে যে যুদ্ধজাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল তার একখানি ও শিক্ষানবীশ এক দল নাবিকের একখানি ছবি। এখানি বোধ হয় সে যখন য়েদাজিমার ইন্সুলে পড়িত, তখনকার। টেবিলের উপরেও কয়েকখানি ছবি; এক খানিতে তিনটি চেহারা—তাকেওর পিতামাতা ও তাকেও নিজে—তাকেওর যখন প্রায় পাঁচ বৎসর বয়স তখনকার, সে পিতার হাঁটুর উপর তর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর একখানি, সেনাপতির পরিচ্ছদে তাহার স্বত্তর কাতাওকার ছবি। ঘরের মালিকটি অল্পবয়স্ক ও অসাবধান হইলেও বয়সি শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত, কোথাও কণামাত্র ধূলো নাই। টেবিলের উপর পুরাণো একটি ধাতুনির্মিত ফুলদানিতে কয়েকটি ‘প্লাই’ওল্ড সূচাক্রমে রক্ষিত। সমস্তই একটি মেহ কোমল হৃদয় ও এই ঘরের মধ্যে প্রতিনিয়ত কার্য্যে ব্যাপৃত দুইখানি বিপুল হৃদয় হস্তের পরিচয় দিতে ছিল। সেই

হৃদয় ও হাতের মালিক কুলদানির নিকটে একখানি রূপার ফ্রেমের মধ্যে হইতে হাসিতেছে যেন সে প্রাণের মধুর সুরভিতে পরিমাত। ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোক ঘরের চতুর্দিক আলোকিত করিতেছে, সবুজ কার্পেটের উপর আঙনের বাস, তাহা হইতে কয়লার আঙনের বেগুনে শিখা উঠিয়া বেশ একটু স্বচ্ছন্দ্যের আভাস দিতেছিল।

অনেক জিনিসই আমাদিগকে আনন্দ দেয় ; কিন্তু দীর্ঘ ভ্রমণের পর নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া ভ্রমণের পোষাক ছাড়িয়া একটি চিলেচালা পোষাক পরিয়া আঙনের ধারে বসন বসি, এবং বসিয়া বসিয়া বাহিরে নিশীথ বাতাসের কক্কণ ক্রন্দন ও ভিতরে সদাজাগ্রত ঘড়িটির টিক্ টিক্ শব্দ শুনি, তখন যেমন আনন্দ পাওয়া যায় এমন আর কি ছুতে নয়। এই আনন্দ আবার শতগুণ বাড়িয়া উঠে, যদি গৃহে নীরোগ মাতা ও স্নানরী তরুণী ভার্য্যা থাকেন।

আরাম কেদারায় বসিয়া ধূমপানরত তাকেও ঠিক এমনি ধাণা আনন্দ উপভোগ করিতেছিল।

কিছুক্ষণ পূর্বে মাতা যাহার কথা বলিতেছিলেন কেবল সেই চিজিওয়ার চিত্তাই তাহাকে পীড়া দিতেছিল। এইমাত্র আগন্তুকদের কার্ডের মধ্যে সে তার নাম দেখিতে পাইয়াছে। আজই সে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ লজ্জার কথা শুনিতে পাইয়াছে। গত মাসে সময় বিভাগের সময়ে চিজিওয়ার নামে একখানা পোষ্টকার্ড আসে। ভ্রমক্রমে এক জন কর্মচারী কার্ডখানি উঠাইয়া লইয়া পড়ে। সেইখানি এক নামজাদা স্নদধোরের নিকট হইতে আসিয়াছিল ; তাহাতে লাল কালিতে চিজিওয়ার দেনার পরিমাণ লেখা ছিল। তারপর মাঝে মাঝে কোন অজানিত দ্বার দিয়া সামরিক গুপ্তত্বসকল বাহির হইয়া পড়িতেছিল, তাহাতে কয়েক জন ব্যবসায়ীর বেশ ধনবৃদ্ধি হইতেছিল। চিজিওয়ারকে নাকি ঠিকের বালায়ে ঘুরিতে দেখা গিয়াছে। সে স্থানে সামরিক কর্মচারীর গতিবিধি কোনক্রমেই মার্জনীয় নয়। এই সব নানা কারণে চিজিওয়ার উপর সকলের সন্দেহ হইয়াছে। স্বপ্নের মহাশয়ের নিকট তাকেও সব শুনিয়াছে, তিনি সদয়ের প্রধান

কর্মচারীর বিশেষ বন্ধু। তিনি তাকেওকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, চিজিওয়ারকে তাহার স্বভাব সংশোধন করিবার জন্য যেন সে বলে।

“পান্ডি কোথাকার” ! নিজেই মনে এই কথা বলিয়া তাকেও পুনরায় চিজিওয়ার কার্ড দেখিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে এই সব অপ্রীতিকর চিন্তা করিতে পারিল না। সে নিজে তাহার সাহিত সাংক্ষাৎ করিয়া বাহা করিবার তা করিবে। তাহার মন পুনরায় বর্তমান স্বচ্ছন্দ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। এমন সময় নামি পোষাক পরিবর্তন করিয়া চায়ের পেয়ালা হস্তে উপস্থিত হইল।

“চা ? ধন্যবাদ।”

চেয়ার ছাড়িয়া সে আঙনের ধারে গিয়া বসিল।

“মা কি কর্তেন ?”

“তিনি এই ক্ষতে গেলেন।”

নামি পত্নির হাতে এক পেয়ালা চা দিল। তাহার রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “তোমার কি মাথা ধরেচে ? অঙ্কটা ‘সাকে’ না খেলেই হত। মা পেড়া-পীড়ি করিতে লাগলেন !”

“না, না। আজ ভারি আয়োদ করা গেছে। বাবার কথা শুনে আমার এমন ভালো লাগছিল কষ্টটা ‘সাকে’ খেলুম কিছুই হুস ছিল না।” তাকেও হাসিয়া উঠিল। “বাস্তবিক নামি তোমার বাবা বড় ভাল !” নামি ঈষৎ হাসিল, পতির দিকে ফিরিয়া বলিল, “আর তার চেয়েও ভালো আমার—”

“কি ? কি বললে ?”

বিশ্বয়ের তান করিয়া তাকেও চক্ষু ঘুরাইতে লাগিল।

“জানি না” বলিয়া নামি রক্তিম মুখ নত করিল, আংটিটি লইয়া ঘুরাইতে লাগিল।

“ও বাবা ! এসব কথা ভূমি শিখলে কবে ? এসব কথার দাম যে অনেক বেশী, পিন্টায় ত কুলুবে না !”

আঙনে তাতালো হাত দুখানি লাজরক্তিম কপোলে ঘষিয়া একটি ছোটখাটো নিখাস ফেলিয়া নামি চিত্তা-

হৃদিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, “সত্যি না, নিশ্চয়ই অনেক দিন বড় একলা বোধ করেছেন। যখন ভাবি আবার তুমি লীগগির কাজে বেড়িয়ে যাবে তখন মনে হয় সময়টা যেন ছুটে চলেছে।”

“আবার আমি যদি সব সময় বাড়ী থাকতে আরম্ভ করি তুমি নিশ্চয়ই এক দিন অল্পর বলবে, যাও, যাও একটু বেড়িয়ে এস।”

“কি বলচ? আর যা বোব?”

পেরালায় এক চুয়ুক দিয়া ও সীগারের ছাই আগুনের বাল্লে কেলিয়া তাকেও পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত ঘরের চারিদিকে চাহিল।

“ছ মাসের বেশী জাহাজে সরু বেঞ্চের উপর দোলা খেয়ে এখন এ ঘরটাকে বড় বড় বলে বোধ হচ্ছে। এখানে যেন সবই স্বপ্নের মত আরাম দিচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন আমার মধুবাসর উপভোগ করছি। তোমার কি তা মনে হয় না নামি?”

বিবাহের পরই তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটয়াছিল, আজ প্রায় ছয় মাসের পর তাহাদের মিলন, এমন সুখের সময় আর কখনো আসিয়াছিল বলিয়া অঙ্গ হয় না। মুখে কথা নাই, অধরে হাসি লাগিয়া রহিয়াছে, উভয়ে মুখোমুখি করিয়া বসিয়া তাহারা যেন কোন স্বপ্নের আবেগে বিভোর! প্রাণের গন্ধে ঘরটি আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে, তরুণ দম্পতী আগুনের ধারে বসিয়া বসিয়া কোন সুখের স্বপ্নে উধাও হইয়া গিয়াছিল। নামি মাথা তুলিল, হঠাৎ যেন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

“তুমি তা হলে য়ামাকির ওখানে যাচ্ছ।”

“য়ামাকির ওখানে? না বলছেন যেতে; যেতেই হবে বোধ হয়।”

“আমিও যাব।”

“নিশ্চয়ই আমরা এক সঙ্গে যাব।”

“না আমি যাব না।”

“কেন যাবে না?”

“আমার ভয় করে।”

“ভয়? কিসের ভয়?”

“আমায় দেখতে পারে না, জান ত।”

“দেখতে পারে না? কে দেখতে পারে না?”

“এক জন আমায় দেখতে পারে না। বলবো? ওতোয়ো-সাম।”

“পাগল! সে একটা অদ্ভুত মেয়ে, না? তাকে কে বে করবে তাই ভাবি।”

“মা বলছিলেন, য়ামাকির সঙ্গে চিকিওয়ার খুব আপাত। সে ত বে করতে পারে।”

“চিকিওয়া? চোর দে! আমি ভাবতুম সে বেশ বুদ্ধিমান, চালাক-চতুর লোক; একবারও ভাবিনি তার ওপর কখনো সন্দেহ আসতে পারে। আস, কালকার কর্মচারীদের কথা ভাবলে লজ্জা হয়, যদিও আমিও তাদের এক জন। সেই সামুরাইদের তেজের এক কড়া তাদের নেই। তারা চায় কেবল বড় লোক হতে। আমি অবশ্য এ কথা বলছি না যে, কর্মচারীরা গরীব হয়ে থাকুক। তারা টাকা জমা, তাদের পরিবারের যাতে কষ্ট না হয়—এতে আমার কিছু আপত্তি নেই। কিন্তু আমি এই কথা বলতে চাই, যার ওপর দেশরকার তার রয়েছে, তার টাকা রোজকার করা অজায়; বিশেষতঃ বেশী সুদে টাকা ধার দিয়ে, বা গরীব সৈনিকের খাবার চুরি করে, কিংবা জোগানদারদের সঙ্গে জোট করে বেআইনি রকমে টাকা রোজকার। সব চেয়ে আমার রাগ হয় জুয়ো খেলায়। আমি জানি আমাদের কোনো কোনো কর্মচারী এই কাজ করে। এ আমার একেবারে বরদাও হয় না। আজ কাল সবাই যেন ওপরওলার খোসামুদি ও ভাবেদারের টাকা লুট করতে বাস্ত।”

সংসারানভিজ্ঞ তরুণ কর্মচারী—অন্যান্য কর্মচারীদের ক্রটিগুলো ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিতেছিল, যেন তাদের মুখের সামনে বলিয়া যাইতেছে! তাহার প্রত্যেক কথা নামি পুলকযুক্ত হৃদয়ে পান করিতেছিল। তাহার এমন স্বাভা! তিনি নোবিভাগের মন্ত্রী হইয়া সমস্ত ক্রটি ও দোষের সংস্কার করুন!

“হুনি যা বলছ, তা আমার খুব সত্য বলে মনে হয়। আমি অবশ্য এসব বিষয়ে বেশী কিছু জানি না, কিন্তু বাবা যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন কত লোক কত উপহার নিয়ে আসত, তারা কত রকম যে আর্জি করত তা আর কি বলব। বাবা তাদের রকম সতম ভাল বলতেন না; বলতেন, যা করবার তা তিনি করবেন, তা তারা আর্জি করুক আর নাই করুক; আর যা করবার নয় তা তিনি করবেন না, তারা উপহারই দিক আর যাই দিক। কিন্তু তবু তারা কোন না কোনো ছল করে উপহার পাঠাতো। বাবা হাসতে হাসতে বলতেন, সবাই যে কর্মচারী হতে চায় তাতে আর আশ্চর্য্য কি?”

“ঠিক তাই। এবিষয়ে নৌবিভাগও যেমন সেনা-বিভাগও তেমনি। টাকাই সব।”

ঘড়িটা বাজতে আরম্ভ করিল। তাকেও ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, “দশটা বাজলো যে!”

নামি কহিল, “সত্যি, সময়টা কি করে গেল, বল দেখি।”

শ্রীহেমলিনী রায়।

হায়দার আলি খাঁ বাহাদুরের দৈনিক জীবন

হায়দার আলি খাঁ বাহাদুরের নাম ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাঝেই জ্ঞাত আছেন। আজ এই বীরপুরুষের দৈনিক জীবনের কিকিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

হায়দার সাধারণতঃ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করিতেন। তিনি গাত্রোথান করিলে পর সৈনিক বিভাগের যে সমস্ত নিম্নতম কর্মচারী পূর্বরাত্রে কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহারা তাঁহাদিগকে অবসর করিবেন এই উত্তর পক্ষ তাঁহার কণ্ঠে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব বিবরণী কথমানস্তর সৈন্যাধ্যক্ষ ও অমাত্যদিগের প্রতি যে সমস্ত

আদেশ হইত তাহা অবধান করিতেন। সৈন্যাধ্যক্ষ ও অমাত্যগণও বিশেষ জরুরী কার্য থাকিলে নবাবের পরিচ্ছদাগারে প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন। যে সমস্ত বার্তাবাহ রাতে অথবা প্রভাতে আসিয়াছে তাহারিও আসিয়া তদীর চরণে স্ব স্ব সংবাদ জ্ঞাপন করিত। অনন্তর নবাব রানাগারে প্রবেশ করিতেন। এখানে তাঁহার বহুক্ষণ অতিবাহিত হইত। তবে যুদ্ধাদিতে ব্যাপৃত থাকিলে অবশ্য এই রান কার্যে অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হইত।

বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় তিনি একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেন। এখানে বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষগণ তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিতেন। বিভাগানুযায়ী প্রাপ্ত পত্রাদি তিনি তাঁহাদের হস্তে প্রদান করিতেন ও তৎসমুদয়ের কি প্রকার উত্তর দিতে হইবে তৎসম্বন্ধেও উপদেশ দিতেন। অনন্তর তাঁহার পুত্রগণ, আত্মীয়বর্গ ও বিশেষ অঙ্গুগৃহীত ওমরাহগণ প্রবেশ করিতেন এবং নয় ঘটিকার সময় তাঁহারা প্রধানুযায়ী আহ্বার করিতেন। এই সময় অবসর থাকিলে হায়দার বারান্দায় বাহির হইতেন এবং তাঁহার হস্তী ও অধগণের সেলাম গ্রহণ করিতেন। এই সফল জন্ত এই জন্ত পূর্ব হইতেই অর্জচন্দ্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ থাকিত। এই সময় ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরিদর্শনের জন্ত তাঁহার সম্মুখে আনা হইত। হায়দার স্বহস্তে তাহাদিগকে এক একটি লাডু প্রদান করিতেন, এবং তাহারি যখন ধাবা দিয়া সেই গুলি তুলিয়া লইত তখন তাহাদের হাবভাব পূর্ণ সেই বিচিত্র দৃশ্য বড়ই নয়নাভিরাম হইত।

আহারের পর হায়দার দরবার গৃহে (অথবা সৈন্ত-মধ্যে হইলে একটি বৃহৎ বস্ত্রাবাসে) প্রবেশ করিতেন। তিনি সাধারণতঃ একটি সুবিস্তৃত অঙ্গনে একটি সোফার বসিতেন; তাঁহার মস্তকোপরি একটি চন্দ্রাতপ থাকিত। সম্মুখে এবং উত্তর পার্শ্বে তাঁহার কতিপয় আত্মীয় উপবিষ্ট থাকিতেন। বহুসংখ্যক ব্যক্তির এই দরবারে উপস্থিত থাকিবার অঙ্গুহতি ছিল।

প্রয়োজন হইলেও নির্দিষ্ট কর্মচারীর নিকট আবেদন করিলে সকলেই দরবারে প্রবেশ করিতে পারিত; অথবা তাহাদের প্রয়োজনের বিষয় লিখিয়া পাঠাইলেই ঐ সকল কর্মচারীর মারফৎ উত্তর পাইত। গুরুতর ব্যাপার না হইলে অথবা দরবারে প্রবেশ করিতে বাধা প্রাপ্ত না হইলে কেহই আবেদনাদি দ্বারা হায়দারকে ভ্রমণ সময়ে পধিমধ্যে বিরক্ত করিতে পারিত না।

এই দরবারে ভূপতির বামদিকে দেওয়ানের বরাবর প্রায় ৩০:৪০ জন সেক্রেটারী উপবিষ্ট থাকিয়া ক্রমাগত লিখিতেন। প্রায় প্রতি মুহূর্তেই বার্তাবহগণ আসিয়া পৌঁছিত এবং তাহাদিগকে সশব্দে নবাবের পদপ্রান্তে উপস্থিত করা হইত। তাহারা সেখানে তাহাদের কাগজপত্র রাখিত। অনন্তর এক জন সেক্রেটারী নতজানু হইয়া ঐ কাগজপত্র খুলিয়া পাঠ করিতেন। তৎক্ষণাৎ হায়দার উত্তর বলিয়া দিতেন এবং পত্রখানি এক জন মন্ত্রী কার্যালয়ে প্রেরিত হইত। উত্তর লিখিত হইলে হায়দার ক্রমাগত তৎসমুদয় স্বাক্ষর করিতেন। এই সঙ্গে গোপনীয় আদেশগুলিও স্বাক্ষর করা হইত। মন্ত্রীদের কার্যালয় হইতে যে সকল হুকুম জারী হইত তাহাতে কোনও স্বাক্ষর থাকিত না, কেবল একটি বড় মোহর অঙ্কিত করা থাকিত, ও পত্রগুলি মন্ত্রীদের নিজ নিজ মোহর দিয়া বন্ধ করা হইত। হায়দারের নিজ স্বাক্ষরিত পত্রাদি মুড়িয়া তাঁহার নিজের মোহর দিয়া পাঠান হইত। এই মোহর প্রধান সেক্রেটারীর জিহ্বায় থাকিত। যখন নবাব কোনও জরুরী হুকুম দিতেন অথবা কোনও বিশেষ বিষয় লিখিতেন তখন তিনি তাঁহার অঙ্গুরীস্থিত মোহরের ছাপ দিয়া স্বয়ং এক জন বার্তাবহের নিকট কাগজগুলি প্রদান করিতেন। এই কাগজের পুলিন্দার সহিত সংলগ্ন এক টুকরা কাগজে উহা প্রেরণ করার সময় লিখিত হইত এবং প্রতি ডাকবারেই উহা পৌঁছিবার সময় লিখা হইত।

যদি হায়দার অথবা হস্তী ক্রম করিতেন অথবা যদি কোনও নূতন তোপ নির্মিত হইত বা কোনও বন্দর কিম্বা

অস্ত্রাগার হইতে আনীত হইত তবে তিনি এই দরবারে তৎসমুদয় পরিদর্শন করিতেন।

অমাত্যবর্গ, সৈন্যাধ্যক্ষগণ, রাজদূতগণ এবং অস্ত্রাস্ত্র প্রধান ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে অথবা নবাব বাহাদুরের অমুজ্ঞাভিন্ন কদাচিৎ এই দরবারে উপস্থিত হইতেন। অপরাহ্নে যখন বড়লোক ব্যতীত অস্ত্র কাহারও প্রবেশাধিকার থাকিত না তখন দরবারে উপস্থিত হইয়া নবাবের সহিত আনন্দ উপভোগ করাই যেন তাঁহাদিগের পদমর্যাদার একটু বিশেষত্ব ছিল। সকল সময় এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দরবারে উপস্থিত হইতেন না। তখন ইঁহাদের পক্ষ হইতে উকিল নিযুক্ত হইত। এই সমস্ত উকিল সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, এবং নিযুক্ত হইলে ইঁহারা সপত্নীমে দরবারে প্রবেশ লাভ করিতেন। মন্ত্রীদের পরিষর্ভে সময় সময় তাঁহাদের বিভাগীয় সেক্রেটারী প্রেরিত হইত। তাঁহারা অস্ত্রাস্ত্র সেক্রেটারীর তায় দস্তুর অমুযায়ী উপবেশন করতঃ স্ব স্ব বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেন। কোনও বিশিষ্ট রাজদূত অথবা কোনও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে সর্বপ্রধান অভ্যর্থনাকারী “রাজনু, অমুক স্থানের অনীশ্বর আপনাকে অভিবাদন করিতেছেন” ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে রাজসমীপে উপস্থিত করিতেন। কিন্তু মন্ত্রী, সেক্রেটারী, উকিল, অথবা অস্ত্রাস্ত্রবিষয়ী ব্যক্তিগণের আগমন ঐরূপে বিধোষিত হইত না। তাঁহারা বিশেষ কোনও প্রকার দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়াই দরবারে আসা-যাওয়া করিতেন। তবে তাঁহারা প্রতিবারেই নবাব বাহাদুরকে অভিবাদন করিতে ভুলিতেন না। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন উঠিঃস্বরে বিজ্ঞাপিত হইলে নবাব তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন পূর্বক আসন পরিগ্রহ করিতে অমুরোধ করিতেন। নবাবের সহিত সমাসীম বহুবর্গ একে অস্ত্রাস্ত্র প্রধান ব্যক্তিগণও তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন, এবং নবাবগত ভদ্রলোকের নবাব বাহাদুরের সহিত বহুদূর ঘনিষ্ঠতা তদমুযায়ী তাঁহাকে নবাবের সমীপস্থ হইবার অস্ত্র স্থান ছাড়িয়া দিতেন। কোনও সাধারণ পদস্থ ব্যক্তি

আগস্ট ১৯১৯

সাক্ষাৎকারের প্রার্থী হইলে প্রবেশ করিয়াই তাঁহাকে ভূমি পর্য্যন্ত হস্ত নত করিয়া তৎপরে মস্তক স্পর্শ করতঃ তিন বার কুনিশ করিয়া প্রধান অভ্যর্থনাকারীর এক ধারে করজোড়ে নির্ভীক হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। নবাব হস্তদ্বারা স্বীয় উকীল স্পর্শ করিয়া প্রত্যভিবাদন করিয়া পূর্বের ন্যায় তাঁহার সহিত সমাসীন অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপে ব্যাপৃত থাকিবার ভান করিতেন। অনন্তর তিনি আগন্তুককে অগ্রসর হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেন এবং সাধারণের চিত্তাকর্ষক স্মৃষ্টি বচনে তাহার বক্তব্য কি তাহা বলিতে আদেশ করিতেন।

প্রার্থীর প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইলে তিনি তাহাকে তাহার প্রেমের পূর্ণ ও পরস্পর উত্তর দান করিতেন। প্রার্থী, সাধু উপজীবিকাবলম্বী ব্যবসায়ী অথবা সওদাগর হইলে তাঁহাকে বসিতে বলা হইত এবং তিনি দক্ষিণ পার্শ্বে সেক্রেটারীদের দিকে সম্মুখ দিয়া উপবেশন করিতেন। তাঁহার জীবিকা, দেশ এবং সমুদ্র-যাত্রাদি বিষয়ে নবাব তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার বাণিত্য দ্রব্যাদি পরিদর্শন করিবার জন্য এক সময়টি নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন। তৎপরে আগন্তুককে পান দেওয়া হইত এবং শুদ্ধারা বুঝাইত যে তাঁহাকে দরবার পরিত্যাগের অজুমতি দেওয়া হইল। দরবার ভ্যাগ কালেও প্রবেশ কালের দস্তুর মত কার্য্য হইত।

বেলা ৩ ঘটিকার সময় এই দরবার ভাঙ্গিত এবং নবাব নিজ প্রকোষ্ঠে প্রত্যাবর্তন করতঃ নিজা যাইতেন। সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় তিনি দরবার গৃহ অথবা অত্র কোনও প্রশস্ত গৃহের বারান্দায় আগমন করিয়া নিজ সৈন্ত দলের কুচ দর্শন করিতেন। এই সময়েও প্রান্তের ন্যায় তাঁহার উভয় পার্শ্বে তাঁহার বন্ধু ও স্বগণগণ অবস্থান করিতেন এবং সেক্রেটারীগণ পত্র পাঠ ও লিখনে ব্যস্ত থাকিতেন।

প্রায় পাড়ে ছয়টার সময় দিবা অবসান হইলে বহু-সংখ্যক মশালচী প্রাসাদের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠগুলিতে যাইবার সময় নবাব বাহাদুরকে

অভিবাদন করিয়া যাইত। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা প্রকোষ্ঠ গুলি (বিশেষতঃ খেইটিতে নবাব থাকিতেন সেইটি) আলোকিত করিত। প্রকোষ্ঠগুলিতে এই নির্মিত অতি বিচিত্র পত্রপুষ্পের কারুকার্য্যে শোভিত ঝাড় লক্ষিত ছিল এবং বাত্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইংলিশ কাচের আবরণ ব্যবহৃত হইত। প্রাসাদের স্থানে স্থানে নানা কারুকার্য্য খচিত বড় বড় লঠনও ছিল। ওমরাহ, মন্ত্রী এবং রাজদূতগণ রাজে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁহারা নানাবিধ বহু মূল্য বস্ত্র ও দিব্য স্নগন্ধ ব্যবহার করিতেন। ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ এবং কর্ম্মচারীগণ ব্যতীত অনেক অল্পবয়স্ক আমীরগণে প্রকোষ্ঠ-গুলি পরিপূর্ণ হইত এবং সকলেই উপযুক্তরূপে আদব কায়দা রক্ষা করিয়া চলিতেন। নবাবকে অভিবাদন করিয়া তদীয় পুত্র ও আশ্রয়বর্গকে তাঁহারা সরলভাবে অভিবাদন করিতেন। অল্পবয়স্ক আমীরগণের মধ্যে কতিপয় সংখ্যকের পদবী আরবসূবেকী; প্রত্যহ সাধারণতঃ তাঁহাদের চারি জন করিয়া উপস্থিত থাকিতেন। ইহাদের বিশেষত্ব এই ছিল যে, ইহারা প্রায় ভ্রমণ-যাত্রার ন্যায় কোষ-নিবদ্ধ তরবারি হস্তে রাখিতেন। অত্যাশ্রয় সকলে তাঁহাদের বালক ভৃত্য ও অন্যান্য ভৃত্যের নিকট স্ব স্ব অস্ত্রাদি রাখিয়া প্রবেশ করিতেন। এই সকল ভৃত্যাদিতে প্রাসাদের স্তম্ভাকীর্ণ বারান্দাগুলি পরিপূর্ণ থাকিত। কেবল বালক ভৃত্যদিগেরই প্রবেশাধিকার ছিল। তাহাদের প্রভুগণ যতক্ষণ না প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া পাহুকা ত্যাগ করিতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা তাঁহাদের পরিচ্ছদের লক্ষ্যমান পশ্চাত্তাগ ধরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইত। পাহুকা উন্মোচিত হইলে সেখণ্ডলি একটি ব্যাগের ভিতর পুরিয়া বাহিরে গিয়া বারান্দায় অপেক্ষা করিত। নবাবের প্রকোষ্ঠদ্বয় উৎকৃষ্ট পারশ্বদেশীয় গালিচার উপরে আবৃত শুভ্র মসলিনে আবৃত থাকিত। নবাব শুভ্রবর্ণ এত ভালবাসিতেন যে, মলমলে ঢাকা কাজ করা চেয়ার, সোফা এবং এমন কি দেওয়ান-সংলগ্ন রং করা, বাণিশ করা ও সোনালী কাজ করা

কাঁঠগুলি পর্ধাস্ত খেত বর্ণের মসলিনে আবৃত করিতেন ।

প্রায় প্রতি রাতেই একটি মিলনাস্তক নাটক অভিনীত হইত । রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় হইতে ইহা আরম্ভ হইত এবং একাদশ ঘটিকা পর্ধাস্ত চলিত, ইহা নাচ ও গানমিশ্রিত ছিল । এই সময় আরব্বেকীগণ আগন্তুক ভদ্রলোক দিগের নিকট বলিয়া তাঁহারা যাহা জানিতে চাহিতেন ভদ্রতার সহিত তাহা তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিতেন । আগন্তুক পানাহার করিতে ইচ্ছা করেন কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইহারা ভুলিতেন না । তাঁহারা আহার করিতে স্বীকৃত হইলে তাঁহাদিগকে সরবৎ ও অগ্ন্যস্ত্র উপাদেয় খাণ্ডগামগ্রী সরবরাহ করা হইত ; কিন্তু প্রায়ই তাঁহারা আহারে স্বীকৃত হইতেন না । নবাব প্রায়ই নাচ গানে বিশেষ মনোযোগ না করিয়া মন্ত্রীদেব সহিত পরামর্শে ব্যাপৃত থাকিতেন ; মধ্যে মধ্যে গুপ্ত মন্ত্রণাদির জন্ত তাঁহাকে কক্ষান্তরে বাইতে হইত । রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় গীতবাণ্ড শেষ হইত এবং সকলে শয়ন করিতেন ।

মহাবীর হায়দারের দৈনিক জীবনযাত্রা সাধারণতঃ এইরূপে নির্বাহিত হইত ; কিন্তু সৈন্ত মধ্যে ও যুদ্ধাদিতে ব্যাপৃত থাকলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত সন্দেহ নাই ।

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় ।

ঘুঘু পাখী *

(১)

নিরুপম মধ্যাহ্নে যবে নিখিল অবনী
নীরব নিশ্চল,
জালি' রাখে চারি ধারে দীপ্ত দিনমণি
সুতীত্র অনল,

* এই কবিতাটির ছন্দে ঘুঘু পাখীর ধ্বনি তরঙ্গের অঙ্গসঙ্গ করা হইয়াছে ।

মহাযোগে সমাহিত বিশ্ব-আত্মাখানি
করে কার ধ্যান,—

এমন সময়ে নিত্য 'ভেদি' অরণ্যগাণী
জাগে কিবা গান !
একি অনাহত ধ্বনি ! পবিত্র ওঙ্কার !
স্বতোথিত সুর !—
অনন্তের কূল হতে দিগন্তের পার
আসে স্নমধুর !

(২)

চিনেছি চিনেছি তাহে—পেয়েছি সন্ধান—

এবে ঘুঘু গায়,—

কোথা বন-অন্তরালে খুলে দিল প্রাণ
সুস্মিদ্ধ ছায়ায় !

উদাস করুণ কণ্ঠে করিছে হৃদয়
উদাস আকুল,

মনে হয় এ জগতে কিছু ক্রম নয়
সব কিছু ভুল !

কত-শোভা-হাসি-গান উঠিছে উধলি'
সকলি বৃথায়,—

কোথা যেন যেতে হবে—ডাকিছে কেবলি
কে যেন আমায় !

(৩)

আমারি বন্ধের প্রেম—মর্শের সঙ্গীত—

প্রাণের সাধনা,—

বিহঙ্গম রূপে আজি এসেছে নিশ্চিত
পেয়েছে চেতনা !

সুত্র পাখী কোথা পাবে অত ভালবাসা
অমন রাগিণী,—

কেমনে জাগাবে চিতে ব্যাকুল পিপাসা
প্রয়াণ-কাহিনী !

প্রচ্ছন্ন কানন-কোলে মিলন-মন্দির
বিরচিয়া আজ,

আমারি সর্ব্বশ বৃষ্টি পুলকে গভীর
করিছে বিরাজ !

(৪)

হৃদি-পিঞ্জরের পাখি! মধ্যাহ্নের সাধি !

অনাদির গান !

বনদেবী তোর তরে শ্রামাঞ্চল পাতি'

আনরে মহান্

পত্রের মর্শ্বর তানে—মৃদুল পবনে—

কল্পিত ছায়ায়—

তোরে বৃষ্টি বরি লয় প্রেরণীর সনে

নিভৃত ছায়ায় !

মুগ্ধ প্রণয়ী তুই—প্রণয়িনী তোর

চিত্র-গরবিনী —

ভুলিলি—ভুলালি ধরা প্রেমে রহি তোর

দিবস যামিনী !

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত ।

হল্‌দে পাখী *

হল্‌দে পাখী প্রায় পাপিয়ার সমান বড় হয় । ইহা-
দিগকে হল্‌দে পাখী, কুটুম পক্ষী (কুটুম), ইষ্টি কুটুম
পক্ষী প্রভৃতি বলা হয় । ইহারা সাধারণতঃ “ইষ্টি-কুটুম”
বলিয়া ডাকে, ইহাই লোকের ধারণা । পল্লীগ্রামে এখনও
প্রাচীনাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যদি ইষ্টিকুটুম-পক্ষী
“ইষ্টিকুটুম” বলিয়া গৃহের উপর দিয়া যাতায়াত করে, তবে
সেই দিন বাড়ীতে কুটুমের আগমন অবশ্যজ্ঞাবী, অন্ততঃ
পর দিন কুটুম আসিবেই । এই সংস্কারের মূলের সত্যতা
পরীক্ষা করি নাই ; কিন্তু ছেলেবেলায় ইষ্টি কুটুমকে
ঘরের উপর দিয়া যাতায়াত করিতে দেখিলে কাহারও
আগমনের দৃঢ় প্রত্যাশা লইয়া বসিয়া থাকিতাম । কেহ

আসিত কি না সে কথা ঠিক মনে পড়ে না । সে সংস্কার
অনেক দিন ছুটিয়া গিয়াছে ।

হল্‌দে পাখীর মাথা ও গলার কতকাংশ পর্য্যন্ত গাঢ়
কৃষ্ণবর্ণ, সমুদয় শরীর উজ্জল পীতবর্ণ । তেমন গাঢ় এবং
চাক্‌চিক্যময় পীতবর্ণ সচরাচর দৃষ্ট হয় না । উভয় ডানা-
তেই দুই তিনটি গাঢ় পালঙ্ক আছে । হল্‌দে পাখী পাখা
জুটাইয়া বসিলে ঐ উভয় পার্শ্বের কাল পালঙ্ক দুটিতে
তাহাকে বড়ই সুন্দর দেখায় । ইহাদের লেজের মধ্যেও
কাল পালঙ্ক আছে । বসিয়া থাকার কালে ঐ কাল পালঙ্ক
ঈষদ্ব্যক্ত দৃষ্টি গোচর হয় ; কিন্তু যখন উড়িয়া যায় তখন
লেজ কতকটা বিস্তৃত হয়, সেই সময় লেজের দুই পার্শ্বে
এক এক ইঞ্চি আন্দাজ হল্‌দে, তার পর দুই পার্শ্বে দুইটি
গাঢ় কৃষ্ণ রেখা (এক ইঞ্চির কম) ও মধ্য স্থান হল্‌দে
দেখা যায় । হল্‌দে পাখীর ঠোঁটের রং চুণ-হল্‌দে মিশ্রান
রঙের মত, অগ্ন্যভাগ একটু হল্‌দে । ঠোঁট প্রায় দেড় ইঞ্চি
লম্বা হয় । চক্ষু উজ্জল কাল এবং চারিদিকের বেষ্টনী ঈষৎ
পীতভাঙ, পা জাম্বু পর্য্যন্ত পীত পালঙ্কে আবৃত, অবশিষ্টাংশ
পীতভাঙ । পায়ে অঙ্গুলি, নখ প্রভৃতি অত্যন্ত পক্ষীরই মত ।

হল্‌দে পাখীর ডানা খুব মজবুত নহে । একজ্ঞ ইহার
অনেক দূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে না । পূর্বে
কথিত অজ্ঞাত পাখীর তুলনায় ইহার একটু দুর্বল ।
হল্‌দে পাখী বাড়ীর আশে পাশে গাছের ডালে বসে বটে,
কিন্তু ঘরের চালে বা মাটিতে কদাচিৎ বসিয়া থাকে ।
ইহার রোজের ভয়ে গাছের ছায়ায় অবস্থান করে । রোজ
উড়িয়া যাইতে ইহার অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে । ইহা-
দিগকে ফল খাইতে দেখা যায় না । বড় বড় গাছে যে
সকল কীট পতঙ্গ পায় তাহা ভক্ষণ করিয়াই ইহাদের
জীবন যাত্রা নির্বাহিত হইয়া থাকে । ইহার এক স্থানে
অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকে না ; কয়েক
মিনিট পরই অজ্ঞাত উড়িয়া যায় । সকালে এবং
বিকালে ইহাদের “ইষ্টিকুটুম” ধ্বনি শোনা যায়, মধ্যাহ্নে
ইহার খুব কমই ডাকিয়া থাকে ।

এই পাখীর উপর ডোম চিল ও বাজের দৃষ্টি তত

* “পায়ক পাখীর” অন্তর্গত ।

সুপ্রসন্ন নহে। সময় সময় ইহারা চিল ও বাজের জঠরানল নির্ঝঞ্ঝে ব্যবহৃত হয় এই জন্তই হলুদে পাখী মরদানে খুড়িয়া বেড়াইতে বেশী অগ্রসর হয় না। দুঃখের বিষয় নামা কারণে আমাদের দেশে এই সৌন্দর্যের আধার বিহঙ্গটির বংশ হ্রাস পাইতেছে। এখন আর আগেকার মত বেশী হলুদে পাখী দেখিতে পাওয়া যায় না।

হলুদে পাখী অনেক সময়ই একাকী বিচরণ করে। কখন কখন ক্রৌঞ্চ মিথুনের মত এক জোড়া হলুদে পাখী “ইষ্টিকুটুম”কে ডাকিয়া উড়িয়া বেড়ায়! অল্প কোনও পাখীর সংস্রবে যাইতে ইহাদেরে কিছুমাত্রও অগ্রসর দেখা যায় না। এমন কি ইহারা যে গাছে বসিয়া থাকে, সেই গাছে অল্প জাতীয় দুই একটি পাখী বসিয়া গণ্ডগোল আরম্ভ করিলেই নিরীহ ভাল মানুষের মত ইহারা “হান ত্যাগেন দুর্জনঃ” নীতির অনুসরণ করিয়া থাকে। হলুদে পাখী ঘাস, লোম, প্রভৃতি দ্বারা বাসা নির্মাণ করে এবং জঙ্গলের মধ্যে উচ্চস্থানে ঘন পাতার অন্তরালে সেই বাসা ঝুলাইয়া দেয়; বিশেষ চেষ্টা না করিলে হলুদে পাখীর বাসা খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে। বাসার এক ধারে মুখ থাকে। সেই পথ দিয়া এক একটি পাখী ভিতরে বাইরা ডিমে তা দেয়। শাবক উড়িয়া বেড়াইতে সক্ষম হইলে ইহারা বাসার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে।

হলুদে পাখী মাঘ মাসের শেষভাগে গর্ভ ধারণ করিয়া ফাল্গুনের শেষভাগে তিন চারিটি ডিম্ব প্রসব করে। ডিমগুলি প্রায় একইধি বড় হয়। ডিমে ঈষৎ লম্বা—হাঁসের ডিমের আকৃতি বিশিষ্ট, রঙ ফিকে সাদা এবং তাহাতে স্থানে স্থানে কাল দাগ আছে।

হলুদে পাখীর শাবকগুলি প্রথমে পাঁতিহাঁসের শাবকের মত থাকে, ক্রমে বড় হয় এবং ইহাদের জাতীয় বর্ণ লাভ করিতে থাকে। পাঁচ ছয় মাস কাল পর্যন্ত ইহাদের শাবকগুলির পালঙ্ক ফিকে হলুদে রঙের থাকে। শরৎকাল আসিলে বর্ণ গাঢ় হয় এবং বসন্তকালে ইহারা সম্পূর্ণরূপে আগনার জাতীয় বর্ণ প্রাপ্ত হয়। শরৎ

কালের পরও একটু নিবিড়ভাবে দেখিলে শাবকগুলি চিনিয়া লওয়া নিতান্ত দুষ্কর হয় না। শীতকালে ইহারা বাহিরে আসিতে ইচ্ছুক হয় না। নিবিড় জঙ্গলেই অনেক সময় অবস্থান করে।

হলুদে পাখীর সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর কাহিনী আমরা ঠাকুরমার মুখে শুনিয়াছি। এখনও সেকেলে ধরণের স্ত্রীলোকদিগের মুখে এই কাহিনীটি শোনা যায়।

সে ছিল এক গৃহস্থের ঘরের বো। এক দিন বাড়ীতে জামাই আসিল, খাণ্ডী বোকে রান্ধিতে ফরমাইস করিলেন; বো রান্ধিতে গেল। আদরের বো সে, কোনও দিন রান্না ঘরে যায় নাই, আজ নূতন গিয়াছে। বেচারী খালি কতকগুলি হলুদবাটা জল দিয়া এক হাঁড়ি খোল রান্ধিয়াছে! খাণ্ডী আসিয়া দেখিয়া তনিয়া অবাক! বো এর উপর পুষ্প বৃষ্টি হইল। অবশেষে খাণ্ডী রাগ করিয়া খোদ কঠোর নিকট নালিশ করিতে গেলেন। বো দেখিল লজ্জার আর কুল কিনারা নাই। তখন সেই হলুদ জলের হাঁড়িটা মাথায় ভাঙ্গিয়া দিয়া বো পাখী হইয়া লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। হাঁড়ি মাথায় ভাঙ্গিয়া ছিল, তাই মাথা কাল আর হলুদের জল গায় পড়িয়াছিল তাই সর্সাদ হলুদময়। পাড়াগায়ের বো ঝিরা স্নান করিয়া মুখে পান দিয়া তবে রন্ধন শালায় যায় *। তাই হলুদে পাখীর মুখ রান্না।

আর ইষ্টি কুটুম আসিয়াছিল বলিয়া তাহার এই দুর্দশা হইল বলিয়া সে পূর্ব স্মৃতি জাগাইয়া গান করে “ইষ্টি কুটুম”। ইষ্টিকুটুম ‘আসিতে দেখিলেই—সে ঘরের চালের উপর দিয়া উড়িয়া যায় এবং “ইষ্টিকুটুম ইষ্টিকুটুম” বলিয়া বাড়ীর বো দিগকে সতর্ক করিয়া দেয়। জানি না বধুগণ এজন্ত হলুদে পাখীর নিকট কৃতজ্ঞ কি না।

ত্রিপুরা চন্দ্র ভট্টাচার্য।

* স্নান করিয়া যে বা নারী মুখে দেয় গো পান, লক্ষী বোলেন্ সেই নারী আশাদি সখান ॥—লক্ষীর হটা বা হড়া

গ্রন্থ সমালোচনা

২৪। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ—শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ১০১ পৃষ্ঠা, গ্রন্থকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র, প্রাচ্য দেশের দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তথাপি তিনি মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত। ইহা আমাদের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ইতঃপূর্বে “শিক্ষা বিজ্ঞান” নামক এক বিরাট খণ্ডঃ প্রকাশিত গ্রন্থ রচনায় প্রযুক্ত হইয়া বঙ্গভাষার প্রত্যেক সুহৃদকেই যে গুণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন আলোচ্য গ্রন্থ সে গুণপাশকে আরও দৃঢ় করিয়াছে।

গ্রন্থারম্ভে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রবান কর্ণধার সুধা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—“বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ইতিহাসের গ্রন্থ অনেক মুখস্থ করিয়াছে। কিন্তু এই ইতিহাস বিজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা এখনও আমাদের মধ্যে আসে নাই। * * * * * বাঙ্গা সাহিত্যের এই কক্ষটা একেবারে শূন্য। খানকতক পাঠশালার পাঠ্য ইতিহাস আছে, না থাকিলেও চলিত। * * * * * স্বদেশের ও বিদেশের অতীত কথার আলোচনা করিয়া তাহা হইতে শিক্ষা লাভের চেষ্টা দেখি না। * * * * * এদেশে শিক্ষিত ব্যক্তিকে এজন্ত ব্যাকুল হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।”

গ্রন্থকার বাঙ্গালা সাহিত্যের এই ঘরটি পূরণ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, কেবল সেই ক্ষতই আমাদের তাঁহার কাছে ঋণী হওয়া কর্তব্য। বোধ হয় ইতিহাসের এরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা ইতিপূর্বে খুব কম লোকেই করিয়াছেন; এবং এইরূপ আলোচনা করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন সে সম্বন্ধে সর্বত্র আমাদের মতের ঐক্য না থাকিলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তিনি গ্রন্থের সর্বত্রই তাঁহার উজ্জল প্রতিভা ও বিশ্লেষণক্ষমতা ও গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তিনি যে সকল ঐতিহাসিক সম্ভর্ভ লিখিয়াছিলেন—সেই গুলিই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভরসা করি পুস্তকাকারে ইহা মাসিক পত্রিকার গ্রাহক ছাড়া আরও বহুতর পাঠকের হৃদয়ে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবার জন্ত স্পৃহা, উত্তম ও অধ্যবসায় সঞ্চারিত করিবে।

পুস্তকখানির ছাপা কাগজ পরিষ্কার। চক্রবর্তী বানার্জি এণ্ড কোং (কলেজ স্কয়ার) কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র। আমাদের মনে হয় মূল্য আরও সুলভ হইলে এরূপ সদগ্রন্থের আরও বহুল প্রচারের সুবিধা হইত।

বর্তমান যুগের উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থনিবন্ধ তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করিয়া গ্রন্থকার সমালোচ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

শ্রীঅঃ—

২৫। ডালিন্,—শ্রীযুক্ত সৈয়দ এমদাদ আলী কর্তৃক রচিত, ঢাকা এলবার্ট লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। আকার, ডবল ক্রাউন, বোড়শাংশিত, ১০২ পৃষ্ঠা, মনোরম সিকের বাধাই, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট এটিক কাগজে ব্রঞ্জ কালার ছাপা, মূল্য ১ এক টাকা। মূল্য একটু বেশী বলিয়া বোধ হইল।

আলোচ্য গ্রন্থ ৩২টি খণ্ড কবিতার সমষ্টি তন্মধ্যে কয়েকটি মাসিক পত্রে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন নহেন, স্মৃতরাং তাঁহার নাম সাহিত্যিকের অনেকেই অবগত আছেন। টেনিসন প্রভৃতি অমর কবিগণের কয়েকটি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ আছে,—মৌলিক কবিতা হইতে এগুলি নিকট হয় নাই। ‘সেকেন্ডা’ কবিতাটি সুন্দর হইয়াছে। অস্তান্ত আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা আছে। গ্রন্থখানি ‘কবির মন’ প্রভৃতি কয়েকটি হাফ্টোন ছবিতে শোভিত, তন্মধ্যে ‘কবির মন’ তিন রঙে রঞ্জিত।

শান্তিময়।

প্রতিভা

কার্তিক, ১৩১৯।



পরলোকগত হরিনাথ দে।

(স্মরণে)



প্রতিভা

২য় বর্ষ

কার্তিক ১৩১৯

৭ম সংখ্যা

হৃদ্ধ ও বীজাণু *

আমাদের চতুর্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল বিভিন্নজাতীয় অসংখ্য বীজাণুতে পরিপূর্ণ। মরুভূমির বায়ু-কণার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু বায়ুস্থিত বীজাণু-সমূহের সংখ্যা নির্ধারণ অসম্ভব। এই বীজাণু-সমূহ নগরক্ষেত্রে অদৃশ্য, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের অল্পবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ইহাদের অবস্থিতি অল্পতর করা যায়। প্রত্যেক প্রকার বীজাণুর নিজস্ব বিশেষ কার্য আছে। এক প্রকার বীজাণুর কার্য অল্প কোন বীজাণু বা বস্তু দ্বারা, বা বীক্ষণাগারে রসায়নবিদের কোন যন্ত্রসাহায্যে তত সহজে, এবং অনেক স্থলে একেবারেই, সম্পাদিত হইতে পারে না। হস্ত পদ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিহীন, এমন কি অনেকস্থলে অদেহবদ্ধ (unorganised) এই বীজাণুসমূহকত প্রকারে আমাদের কাছে আসিতেছে, তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। বিভিন্ন

* গত বৎসরের কান্তন্য নামের “প্রতিভায়” প্রকাশিত “হৃদ্ধের বিভক্ততা” শীর্ষক প্রবন্ধ সহ পাঠ করিলে ভাল বুঝা যাইবে —লেখক

প্রকার বীজাণুসমূহ স্থান এবং অবস্থাতেই কি প্রকারে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহা অনেক স্থলে বিশদভাবে কিছুই নির্ধারিত হয় নাই।

অনেক সময় বীজাণুসমূহের শরীর হইতে এক প্রকার জসীয় রস নির্গত হয় এবং উক্ত রস দ্বারা ই তাহাদের কার্যকরী ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়া থাকে। অত্যধিক শৈত্য বা উষ্ণতার প্রথমতঃ বীজাণু-সমূহের কার্যকরী ক্ষমতা ক্রমে লোপ হইতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে তাহাদের বংশই সম্পূর্ণ বিনাশ পাইয়া থাকে।

বীজাণু-সমূহের একটি বিশেষত্ব এই যে উপযুক্ত স্থান বা বস্তু পাইলে তাহাদিগের সংখ্যা এবং কার্যকরী ক্ষমতা অতি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বিষয়ে হৃদ্ধ অতুলনীয় ; কারণ

বীজাণু-সমূহের বংশ হৃদ্ধমধ্যে বেরূপে সহজে ও দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে অল্প কোন বস্তুর মধ্যে সেইরূপ পারে না। বার্গথেল (Bergthel) কোন বিবাক্ত হৃদ্ধ পরীক্ষা করিয়া ১ ঘন সেন্টিমিটার (1 cubic centimetre) বা ২০ কোঁটা হৃদ্ধে ১,০০,০০০,০০০, এক শত পঞ্চাশ

কোটি বীজাণু পাইরাছেন। ছুঁতে বীজাণু-সমূহের সংখ্যা
কিরূপ বৃদ্ধি পাইরা থাকে, উক্ত দুটোই হইতে সহজেই
বুঝা যাইবে। যে সমস্ত বীজাণু ছুঁতে আক্রমণ করিয়া
থাকে তাহাদিগকে সাধারণতঃ ছুঁই ভাগে বিভক্ত করা
বাইতে পারে :—

(১) ছুঁই বিরোজনকারী বীজাণু; এই প্রকার
বীজাণু বিবাক্ত নহে; সুতরাং নিরাপদ। ইহারা কেবল
ছুঁতে বিরোজিত (decomposed) করিয়া নিজেদের
বংশ বৃদ্ধি করে।

(২) রোগবাহক বীজাণু; এই প্রকার বীজাণুসমূহ
ছুঁতে কোল-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়
না। বিস্ফটিকা, সাল্পিগাত অর, ডিপথেরিয়া
(Diphtheria) টিউবারকুলসিস্ (Tuberculosis)
প্রভৃতি রোগের বীজাণু শেযোক্ত শ্রেণীভুক্ত। ইহারা
অতিশয় অনিষ্টকারী।

বীজাণুসমূহের ছুঁতে প্রতি এমনই একটা
আকর্ষণ আছে যে ছুঁতে বীজাণুগুণ
রাখা এক প্রকার অসম্ভব। আমেরিকায়
কলম্বিয়া প্রদেশে রাজকীয় নিয়মামুসারে, যে ছুঁতে ১
ঘন সেন্টিমিটার বা ২০ কোঁটাতে ৫০০০ পাঁচ হাজারের
অধিক বীজাণু নাই, উহা প্রথম শ্রেণীর ছুঁই। কারণ,
পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিশেষ উপায় অবলম্বন
করিলেও ছুঁতে বীজাণুর সংখ্যা ইহা অপেক্ষা কম করা
যায় না। ২০ কোঁটা ছুঁতে পাঁচ হাজার হইতে এক লক্ষ
পর্যন্ত বীজাণু থাকিলে ছুঁই দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিয়া পরি-
গণিত হয়, এবং উহা ব্যবহারের যোগ্য থাকে। কিন্তু
প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে একলক্ষের অধিক বীজাণু থাকিলে
উহা ব্যবহার করা উচিত নহে।

দোহনের পর রাখিয়া দিলে বায়ু হইতে অসংখ্য
প্রকার বীজাণু ক্রমে ছুঁতে আক্রমণ করিয়া উহাদের
রাজ্য বিস্তার করিতে থাকে এবং ঐ ছুঁইও ক্রমে সজ্জিত

(Fermented) হইয়া পরিবর্তিত হইতে থাকে।

কয়েক ঘণ্টা পর পরীক্ষা
বীজাণুর আক্রমণে দ্রুতের বিকার করিলে দেখা যাইবে যে
ঐ ছুঁতে আর্পেন্সিক

গুরুত্ব পূর্ণাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইরাছে। পরিবর্তনক্রিয়া
কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে ছুঁই ক্রমে অন্নবাদবিশিষ্ট হইতে
থাকে। তাহার কারণ এই যে ছুঁই শর্করাভাগ এক
প্রকার অণুজীব (micro-organism) দ্বারা আক্রান্ত
হইয়া আংশিকরূপে ছুঁইলান বা ছুঁইলান (lactic acid)
পরিণত হয়। উক্ত বীজাণু-সমূহকে ছুঁইলান বীজাণু বা
দধি বীজাণু (Lactic acid bacilli) বলা হইয়া থাকে।
এই বিশেষ প্রকার বীজাণু ব্যতিরেকে আরও কয়েক
প্রকার বীজাণু বা কিঞ্চিৎ (Ferment) ছুঁই-শর্করাকে
ছুঁইলান (lactic acid) পরিণত করিতে পারে। স্থান
ও অবস্থাতেই কোনটির ক্রিয়া বিশেষভাবে প্রকাশিত
হয়; কিন্তু মোটামুটি বলা বাইতে পারে যে,
সাধারণতঃ ছুঁইলান-বীজাণুর সংখ্যাধিক্য হেতু উহাদের
ক্রিয়াই বিশেষ সজ্জিত হইয়া থাকে এবং উহাই উন্নত-
যোগ্য। পূর্বাঙ্গকারে ছুঁই-শর্করা হইতে ছুঁইলান উৎ-
পত্তিকে ছুঁইলান-সজ্জান (lactic acid fermentation) বলা
হয়।

উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজাণু-সমূহের রক্ষণ ও বর্জন করিলে
উহাদিগের আশ্চর্য্য ও দ্রুত বংশবৃদ্ধিক্রমতা সহজেই
উপলব্ধি করা যাইতে পারে। পরীক্ষার জন্য অল্প
পরিমাণ অন্নবাদবিশিষ্ট অর্থাৎ ছুঁইলান বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত
ছুঁই সহিত এক সহস্র ভাগ মিশ্রিত মিশাইয়া তাহা হইতে
এক বিন্দু লইয়া কিঞ্চিৎ গিলেরিন (Gelatin) এর উপরে

কেলিয়া কয়েক দিন রাখিয়া দিলে
বীজাণু রক্ষণ ও দেখা যাইবে যে ঐ ছুঁই-বিন্দু হইতে
পরিবর্তন। ছুঁইলান বীজাণুসমূহ দ্রুতভাবে বংশবৃদ্ধি

লাভ করিয়া গিলেরিনের উপর সজ্জ
দঙাকারে বিভিন্ন সজ্জ হাপন করিয়াছে।

বিপুলদর্শক কাচের (Magnifying glass) সাহায্যে উহাদের আকৃতি অনেকটা বাদামের জায় দেখায়। বীজাণু-সমূহের বংশবর্দ্ধনের পক্ষে শিরীস বিশেষ উপযোগী; বিশেষতঃ শিরীস দুগ্ধের জায় তরল পদার্থ নহে বলিয়া বীজাণু-সমূহের অস্তিত্ব সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

১০° সি: (10 Degree centigrade) শৈত্যে দুগ্ধায় বীজাণু-সমূহের কোনও ক্রিয়া নাই। উত্তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের উপর উহাদের ক্রিয়া আরম্ভ হয়; কিন্তু ১৬° সি: উষ্ণতা পর্যন্ত কার্যকরী ক্ষমতা অতি মৃদু থাকে। ৩৫° সি: হইতে ৪২° সি: পর্যন্ত উষ্ণতার মধ্যে উহাদের ক্রিয়া সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রবল হয় এবং উষ্ণতা ৪৫° সি: হইলে কার্যকরী ক্ষমতা পুনর্বার সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। দুগ্ধকে ৭০° সি: পর্যন্ত উষ্ণ উত্তাপভেদে বীজাণুর ক্রিয়াকালে বীজাণু সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশ-সমূহের বায়ুর স্বাভাবিক উষ্ণতা ১৫° সি:; কাষেই দুগ্ধায় বীজাণুসমূহ দুগ্ধের উপর সহজে বিশেষ ক্রিয়া করিতে পারে না, এবং ঐ সকল স্থানে দোহনের ৮।১০ ঘণ্টা পরও দুগ্ধ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকে; এমন কি, সতর্কতার সহিত রাখিয়া দিলে, দোহনের ২।৩ দিন পরেও দুগ্ধের বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। আমাদের দেশের বায়ুর স্বাভাবিক উষ্ণতা ৩০° সি:; কাষেই দোহনের পর অল্প সময়ের মধ্যেই বীজাণু-সমূহ দুগ্ধকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করিয়া অল্পস্বাদবিশিষ্টে করিয়া ফেলে।

দুগ্ধ শর্করাভাগ পূর্ক প্রকারে দুগ্ধায় পরিবর্তিত হইতে হইতে অল্পের স্বাদা বখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছবে, তখন দুগ্ধ জমাট বাধিতে আরম্ভ করিবে। পূর্কোক্ত কারণেই দুগ্ধ হইতে দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে বায়ুর স্বাভাবিক শৈত্য নিবন্ধন দুগ্ধ হইতে দধি প্রস্তুত হইতে অধিক সময় লাগে; কারণ উক্ত অবস্থায় বীজাণু-সমূহ দ্রুত ভাবে কাজ করিতে

পারে না। এই কারণেই আমাদের দেশে শীতকালে দধি প্রস্তুত করিতে হইলে, যে পাত্রে দধি প্রস্তুত হইতেছে, গোয়ালাগণ উহা চুম্বীর নিকটে রাখিয়া দেয়, অথবা লেপ কঞ্চল প্রভৃতি দ্বারা ঢাকিয়া উহাকে শৈত্যের সংস্পর্শে আসিতে দেয় না। শীতকালে দধি প্রস্তুত হইতে অন্ততঃ বার ঘণ্টা সময় লাগে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে দশ ঘণ্টায়ই উত্তম দধি প্রস্তুত হয়। থরনার (Thorner) দেখাইয়াছেন যে ১০০ একশত ভাগ দুগ্ধে অন্ততঃ ২০৭ ভাগ দুগ্ধায় থাকিলে দুগ্ধ জমাট বাধিতে আরম্ভ করিবে। দধি প্রস্তুত হইবার কারণ এই যে, অল্প বর্তমান থাকিতে দুগ্ধে যে কেসিন (Casein) বা ছানা-ভাগ পূর্ক অবস্থায় ছিল, উহা চাপ বাধিয়া যায়। দুগ্ধ চর্বিভাগের কোন পরিবর্তন হয় না, শর্করাভাগ আংশিকরূপে পরিবর্তিত হইয়া দুগ্ধায় রূপে (Lactic acid) থাকে। নিম্নে বিস্তৃত দুগ্ধ ও বিস্তৃত দধির বিশ্লেষণ-ফল দেওয়া গেল:—

| বিস্তৃত দুগ্ধ | বিস্তৃত দধি |
|--------------------------------------|-------------------------|
| প্রতিদ (Proteid)—শতকরা ৪.২৮ ভাগ..... | শতকরা ৪.৭৭ ভাগ |
| চর্বি (Fat)— | ” ৩.২৫ ” ” ৩.৫৭ ” |
| দুগ্ধ শর্করা— | ” ৩.১ ” ” ২.৮ ” |
| দুগ্ধায় (Lactic acid) ” | ” ০ ” ” ০.৪ ” |
| খাতব পদার্থ | ” ০.১৮ ” ” ০.৬২ ” |
| অম্ল | ” ৮.৭৪ ” ” ৮.৭৪ ” |
| মোট ১০০ ভাগ..... | মোট ১০০ ভাগ |

দধি বীজাণু আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী নহে। যে দধিতে দধি-বীজাণু ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার বীজাণু নাই, তাহাকেই বিস্তৃত দধি বলা যাইতে পারে। দোহনের পর দুগ্ধ রাখিয়া দিলে দধি-বীজাণুর সঙ্গে সঙ্গে বায়ুহ অল্প প্রকার বীজাণু-সমূহ দুগ্ধকে আক্রমণ করিবে। তন্মধ্যে কোন প্রকার রোগবাহক বীজাণুও থাকিতে পারে। ঐ প্রচলিত দধি প্রস্তুত প্রকার দুগ্ধ হইতে দধি প্রস্তুত করিলে পূর্কোক্ত বিবাক্ত বীজাণুও বর্তমান থাকিবে। অসিদ্ধ দুগ্ধ জাত দধি আমাদের কোন

কার্তিক ১৩১১

মতেই ব্যবহার করা উচিত নহে। দুধকে সিদ্ধ করিলে কোন প্রকার বীজাণু থাকিতে পারে না। বায়ুর সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিতে পারিলে ঐরূপ দুধকে বহু দিন ইচ্ছা অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। ইহাই দুধসংরক্ষণপ্রণালীর মূলমন্ত্র। বীজাণু-সমূহ দুধকে আক্রমণ না করিলে দুধের কোন পরিবর্তন ঘটে না। কাষেই বিত্ত্ব দধি প্রস্তুত করিতে হইলে, দুধকে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া অল্প গরম থাকিতে উহাতে দধি বীজাণু ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইয়ুরোপে দধি বীজাণুর (Lactic acid bacilli) এক প্রকার বটিকা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, এবং দধি প্রস্তুত করিবার জন্য সাধারণতঃ উহাই ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে দুধ সিদ্ধ হইবার পর তৎসঙ্গে অল্প পরিমাণে পুরাতন দধি “সাজা” দেওয়া হয়; অর্থাৎ, পুরাতন দধিতে যে বীজাণু ছিল, তাহা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। অনেক স্থলে কোনরূপ “সাজা” ব্যবহার না করিয়া, পুর্কে যে পাত্রে দধি প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেই পাত্র ধৌত না করিয়া পুনরায় তাহাতেই দধি প্রস্তুত করা হয়। পুরাতন দধি হইতে যে দধি-বীজাণু পাত্র-পাত্রে সংলগ্ন ছিল, উহারা ক্রিয়া আরম্ভ করে। কখনও বা পুরাতন দধি-পাত্র-ধৌত জল “সাজা” রূপে ব্যবহৃত হয়। শেষোক্ত কোন প্রকার প্রণালীই বিজ্ঞানানুমোদিত নহে। তাহার কারণ এই যে, পুরাতন দধি-পাত্রে বা তৎ-ধৌত জলে বায়ু হইতে অজ্ঞাত প্রকার বীজাণুও সংলগ্ন হইয়া থাকিতে পারে; অতএব উহা হইতে যে দধি প্রস্তুত হইবে, তাহা কখনও বিত্ত্ব হইবে না। বিশেষতঃ দুধে দধি-বীজাণু ব্যতীত অন্য কোনও ক্ষতিকারক বীজাণু থাকিলে উত্তম দধি প্রস্তুত হইতে পারে না। যে দধি বিত্ত্ব নহে তাহা খাওয়া অসুচিত।

নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে বিত্ত্ব দধি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। দধি প্রস্তুত করিবার পাত্র

ফুটন্ত জলে (boiling water) উত্তম রূপে ধৌত করিয়া লইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পাত্র-পাত্রে কোন বীজাণু সংলগ্ন থাকিলে ঐ প্রক্রিয়ায় ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অপর একটি পাত্রে দুধের সহিত কিছু জল মিশাইয়া উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া দুধের পুর্কের আয়তনের সমান করিতে হইবে। উক্ত দুধ পুর্কোক্ত পাত্রে ঢালিয়া তৎসঙ্গে এক চামচ পরিমাণ বিত্ত্ব পুরাতন দধি মিশ্রণ পূর্বক উত্তমরূপে ঢাকিয়া উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিবে। এইরূপ করিলে ৮-১০ ঘণ্টার মধ্যেই উত্তম দধি প্রস্তুত হইবে। চামচটিকেও ব্যবহারের পুর্কে গরম জল দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করা উচিত। পুর্কেই বলা হইয়াছে যে, দুধের শর্করাভাগ দুধালে পরিবর্তিত হইয়া দুধকে দধিতে পরিণত করে। দুধের ছাড়া অজ্ঞাত অল্পও উক্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে। অনেক সময় দুধে একটু তৈল ফেলিয়া দধি প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু উত্তম ও উপকারী দধি পাইতে হইলে দধি-বীজাণু ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। তাহার কারণ এই যে, উক্ত বীজাণু-সমূহের প্রক্রিয়া দ্বারা যে অল্প পরিমাণ দুধের প্রস্তুত হয়, উহাতে আমাদের পরিপাক-কার্যের যথেষ্ট সাহায্য হয়।

দধিতে কেসিন বা ছানার ভাগ জমাট অবস্থায় থাকে হেতু দধি পরিপাক করিতে দুধ অপেক্ষা কিছু অধিক সময় লাগে। দধিতে দুধালের মাত্রা অধিক হইলেও পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়; এবং তাহা হইতে সর্দি, কাশি, বেদনা প্রভৃতি অল্পজনিত রোগও হইতে পারে।

পুর্কেই বলা হইয়াছে যে, দধি পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য করে। ইহা ছাড়া দধির আরও একটি বিশেষ গুণ আছে। বীজাণুতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের মতে, ৪০ বৎসর বয়সের পর মানুষের অন্ত্রমধ্যস্থ বীজাণু-

সমূহের সংখ্যা ও কার্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং উহার ভুক্তব্যয় পচনশীল প্রভিদ (proteid)

ভাগকে আক্রমণ করিয়া দীর্ঘই
দধির গুণ পরাক্রমশালী হইয়া পড়ে; এবং
যখন আশ্রয়ের শরীরে কোন

প্রকার পীড়া হয়, তখন এই সকল জীবাণু-সমূহ ক্রতভাবে বৃদ্ধি পাইয়া নানা প্রকার রোগের বিধ উপপাদন করে। অধ্যাপক মেচ্‌নিকফ্‌ (Metchni koff) এর মতে, মনুষ্যের বয়োরুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্পমধ্যে এ সকল জীবাণুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং উক্ত বিধ দ্বারা দীর্ঘায়িত হওয়াতে, মানব-দেহে বার্ষিকজনক পরিবর্তন উপস্থিত হয়। উক্ত অধ্যাপক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, পূর্কোক্ত বার্ষিক আনয়নকারী জীবাণু-সমূহের বৃদ্ধি ও কার্যকরী ক্ষমতা দুগ্ধ (lactic acid) দ্বারা আংশিকরূপে প্রতিহত হইতে পারে। এই স্থলে মনে হইতে পারে যে, নিয়মিতরূপে দুগ্ধ (lactic acid) বাজার হইতে ক্রয় করিয়া সেবন করিলে, এই সকল দেহক্ষয়কারী জীবাণু-সমূহের আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা করা যাইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিত্তল লেকটিক এসিড্‌ সেবন করিলে তাহা অল্পমধ্যে যে স্থলে পূর্কোক্ত জীবাণুসমূহ রাজ্য বিস্তার করিয়া শরীরের ক্ষয়সাধন করিতেছে ততদূর পর্যন্ত না পৌঁছিয়া পাকস্থলীর মধ্যেই রহিয়া যায়, এবং কাহেই ঐ জীবাণু-সমূহের উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। কিন্তু উক্ত জীবাণু-সমূহের আবাসস্থানে যদি দুগ্ধ প্রস্তুত করান যায়, তাহা হইলে উহা জীবাণু-সমূহকে সহজেই আক্রমণ করিয়া উহাদের কার্যকরী ক্ষমতা কতক পরিমাণে নাশ করিয়া দিতে পারে। অধ্যাপক মেচ্‌নিকফ্‌ দেখাইয়াছেন যে, বিত্তল দধিভোজন দ্বারা এই কার্য সম্পাদিত হইতে পারে। কারণ দধিভোজন করিলে তদ্ব্যবস্থ দুগ্ধ বীজাণু-সমূহও lactic acid bacilli) তৎসহ তদ্ব্যবস্থে প্রবেশ করিবে এবং ঐখানে দধিই অবশিষ্ট শরীরভাগকে

দুগ্ধে পরিণত করিবে। এই দুগ্ধ অল্পমধ্যে দেহক্ষয়কারী জীবাণু-সমূহের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া অকাল-বার্ষিক্য ও অন্যান্য বিবিধ প্রকারের রোগ হইতে শরীরকে রক্ষা করে।

দধির গুণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, নিয়মিতরূপে বিত্তল দধিভোজন করিলে অকাল বার্ষিক্য এবং বিবিধ প্রকার রোগের হস্ত হইতে কতক পরিমাণে পরিব্রাণ পাওয়া যায়।

অধ্যাপক মেচ্‌নিকফ্‌ ও সিদ্ধান্ত
নিয়মিত দধিভোজন করিয়াছেন যে, প্রত্যহ
দীর্ঘজীবন-লাভের দুগ্ধ বীজাণু অল্পমধ্যে প্রবেশ
উপায় করায়, অর্থাৎ, প্রত্যহ বিত্তল
দধিভোজন করিলে, মনুষ্য

দীর্ঘজীবী হয়, এবং ইন্দ্রিয়সকল সবল ও কার্যকর থাকে। মেচ্‌নিকফ্‌ বুলগেরিয়া (Bulgaria) প্রদেশের অধিবাসিগণের আয়ুসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উক্ত সত্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমগ্র ইয়ুরোপে বুলগেরিয়াতেই দধির সর্বাধিক প্রচলন এবং উক্ত প্রদেশের অধিবাসিগণ প্রত্যহ অন্যান্য আহাৰ্য্য দ্রব্যের সঙ্গে অল্পাধিক মাত্রায় “টক দুগ্ধ” (বা দধি) পান করিয়া থাকে। সমগ্র বুলগেরিয়াতে ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস; তন্মধ্যে ১০ জনের বয়স ১১৫ এর অধিক, ৮৮ জনের বয়স ১২০ হইতে ১২৫ এর মধ্যে, ২৩৪০ জনের বয়স ১১০ এর উপর। পৃথিবীতে বুলগেরিয়া সর্বাধিক দীর্ঘজীবী মনুষ্যের দেশ। অনেক বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস যে, ঐ দেশের অধিবাসিগণ প্রত্যহ দধিভোজন করে বলিয়াই তাহারা এতদীর্ঘজীবী হয়। মেচ্‌নিকফের উক্ত আবিষ্কারের পরে ইয়ুরোপে দধিভোজনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে, এবং অনেকেই নিয়মিতরূপে প্রত্যহ দধিভোজন আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত, যে বিত্তল দধিই উপকারী।

কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের জীবাণুতত্ত্বের

অধ্যাপক ত্রিভুজ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বুলগেরিয়ার প্রদেশে আবাদের দেশের দধি-যে দধিবীজাণু দুগ্ধকে দধিতে বীজাণুর জৈষ্ঠতা পরিণত করে এবং দুগ্ধ প্রস্তুত করে, তাহা হইতে আমাদের

দেশীয় দধি-বীজাণু সম্পূর্ণ পৃথক এবং অধিকতর ক্ষমতা-শালী। বুলগেরিয়ার দধি-বীজাণুর তুলনায় ইহার প্রায় দ্বিগুণ দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে পারে; কাজেই দ্বিগুণ তেজে অনিষ্টকারী বীজাণু-সমূহকে ধ্বংস করিতে থাকে অর্থাৎ, শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আমাদের দেশের দধি ইউরোপীয় দধি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এদেশে দধি-বীজাণুর সহিত মিশ্রিত হইলে বিষটিকার বীজাণু ১২ ঘণ্টায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং একদিন পর তাহাদের চিহ্নমাত্রও থাকে না। সাল্মিপাত অরের (Typhoid) বীজাণু দধির সহিত মিশ্রিত হইলে ৪৮ ঘণ্টায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।*

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, দধিস্থিত কেসিন ভাগ জমাট অবস্থায় থাকা হেতু আমাদের পক্ষে, বিশেষতঃ রোগীদের পক্ষে, উহা পরিপাক করা কিঞ্চিৎ কষ্ট সাধ্য। এইরূপ স্থলে দধির পরি-
 ঘোল বর্ত্তে ঘোল বা মাঠা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঘোলেও দধি বীজাণু থাকে। পেটের পীড়াতে ঘোল পরম উপকারী। কিন্তু একান্তই দধি ব্যবহার করিতে হইলে তৎসঙ্গে উত্তমরূপে জল মিশাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লওয়া উচিত।

ইয়ুরোপে অল্প দিন যাবৎ দধির গুণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে দধির ব্যবহার চলিয়া আসি-
 তেছে। প্রত্যেক ভোজ-ব্যাপারে দধি একটি প্রধান

উপকরণ। বঙ্গদেশে বিভিন্ন স্থানে অতি উৎকৃষ্ট দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢাকা জেলার গজারিয়া, তিলি, সূর্যাপুর প্রভৃতি স্থানের দধি বিখ্যাত। প্রত্যেক জেলার দধিপ্রস্তুতপ্রণালীতে অস্বাভাবিক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিজ্ঞানা-
 সন্মোদিত নহে। বাজারের দধিতে অনেক অনিষ্টকারী বীজাণু থাকে। দধিপ্রস্তুত বিষয়ে এ দেশের গোয়ালাগণের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

হিন্দু শাস্ত্র মতে দধির গুণ—“উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিদীপ্তি-
 কারক, স্নিগ্ধ, কষায়, গুরু, অন্নবিপাক, ধারক, রক্তপিত্তকারক, শোথনাশক
 হিন্দু শাস্ত্রে দধির গুণ। মেদোবর্দ্ধক, কফপ্রদায়ক, বলকারক, গুরুবর্দ্ধক, মূত্রকৃচ্ছ, প্রতিশ্রায়, শীতক নামক বিষম জ্বর, অভিসার, অরুচি, ও কৃশতার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।”

ভাব-প্রকাশের মতে দধি পাঁচ প্রকার যথা :—(১) মন্দ দধি—“যে দুগ্ধ বিকৃত হইয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়, অথচ অব্যক্তরস, অর্থাৎ সম্যক দধিরূপে পরিণত হয় নাই, এই জন্ত আপনা হইতেই স্বীয় রস বিহীন হয়, তাহাকে মন্দ দধি বলে। ইহার গুণ—মল ও মূত্র নিঃসারক এবং ত্রিদোষজনক। (২) স্বাদু দধি—যে দুগ্ধ সম্যক গাঢ় হইয়া অতিশয় মধুর রস

প্রকারভেদে দধির গুণ।

যুক্ত হয়, অন্নরস অনুভব হয় না, তাহাকে স্বাদু দধি কহে।

ইহার গুণ—অত্যন্ত অভিষান্দী, গুরুজনক, মেদোবর্দ্ধক, কফকারক, বায়ুনাশক, মধুর, বিপাক এবং রক্তপিত্তের দোষনাশক। (৩) স্বাদন্ন-
 দধি—যে দুগ্ধ গাঢ় হইয়া জীবৎ কষায়যুক্ত, মধুর অন্ন স্বাদ হয়, তাহাকে স্বাদন্ন দধি বলে। ইহার গুণ দধির সামান্য গুণের ত্রায়। (৪) অন্ন-দধি—যে দধি মধুরতা-বিহীন হইয়া অন্ন রস পায়, তাহাকে অন্ন দধি কহে। ইহার গুণ—অগ্নিসান্দীপক, রক্তপিত্তবর্দ্ধক, ও কফবর্দ্ধক।

* দধির আলোচনা বিষয়ে বর্ত্তমান বৎসরের “স্বাস্থ্যসংস্কারের” জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত “দধি ও দধি বীজাণু” হইতে কতকটা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।—লেখক

(৫) অত্যন্ন দধি—যে দধি দ্বারা দস্তর্ঘর্ষ, রোমহর্ষ, কণ্ঠাদিতে দাহ উৎপন্ন হয় তাহাকে অত্যন্ন দধি কহে। ইহার গুণ—অগ্নিদীপ্তিকারক ও রক্তপিত্তজনক।”

সুস্বাদের মতে দধি সাত প্রকার—বর্ষা বাহু, অন্ন, অত্যন্ন, মন্দজাত, পকদুগ্ধজাত, দধিরস, ও অসার। পকদুগ্ধ জাত দধি—পক দুগ্ধ হইতে যে দধি হয়, তাহার গুণ—রুচিকারক, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুণকারী, পিত্ত ও বায়ু নাশক এবং বাত্ময়ি সমূহের বলকারক। দধিরস—দধি মত্ত অর্থাৎ, দধি-নিঃসৃত জল তৃষ্ণা ও ক্লান্তি নাশক, লঘু, শরীরের দ্বার শোধনকর, অন্ন, কষায়, মধুর, বাতশ্লেষ্মায় শাস্তিকর, কিন্তু তেজো-বর্ধক নহে। অসার দধি—দধি অসার হইলে (উহাতে চর্কি জাতীয় ভাগ না থাকিলে—অর্থাৎ, টানা দুধের দধি হইলে), উহা ক্লক, মলরোধক, বায়ু বর্জনকর, লঘু, কষায় ও রুচিকর হয়। আয়ুর্বেদে মতে হেমন্ত, শিশির ও বর্ষা এই তিন ঋতুতে দধি-ভোজন প্রশস্ত, এবং রাত্রে দধি-ভোজন নিষেধ।

বিগুহ দধির যে বিশ্লেষণ-কল দেওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, তাহাতে কেবল মাত্র শতকরা ৪ ভাগ দুগ্ধান আছে, এবং অবশিষ্ট অত্যন্ন দধির দোষ। শর্করাভাগের কোনও পরিবর্তন হয় নাই। ঐরূপ দধি উৎকৃষ্ট। অনেক দধিতে শতকরা ২ ভাগ পর্য্যন্ত দুগ্ধান থাকে। অত্যধিক অন্ন থাকা হেতু ঐরূপ দধি অহিতকর গুণ দর্শায়। সুতরাং অত্যন্ন দধি ভোজন করা উচিত নহে।

দুগ্ধান বীজাণু দ্বারা দুগ্ধে কি কি পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, পূর্বে তাহার আলোচনা করা গিয়াছে। আর এক জাতীয় বীজাণু দুগ্ধস্থ বিউটরিন (Butyrin) ভাগকে আক্রমণ করিয়া ইহাকে আংশিকরূপে বিউটরিক অন্ন নামক অম্লে পরিবর্তিত করে। উক্তরূপ পরিবর্তনকে বিউটরিক অন্নসন্ধান (Butyric Acid Fermentation) বলা হয়। বিউটরিক অন্নবীজাণুর ক্রিয়া প্রায় দুগ্ধান বীজাণু ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়; কিন্তু প্রথমতঃ

অতি মৃদু ভাবে ক্রিয়া হয় বলিয়া উহা বিশেষ লক্ষিত হয় না। দুই দিন পর উহাদের পচা হয়। ক্রিয়া অতি প্রবল ভাব ধারণ করে, এবং তখন দুগ্ধে এক প্রকার দুর্গন্ধ ও ক্ষারস্বাদ জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ উহাকে “পচা” দুগ্ধ বলে। বিউটরিক-অন্ন বীজাণুসমূহ অপকারী না হইলেও, পচা দুধ কখনও পান করা উচিত নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দুগ্ধস্থ শর্করাভাগকে দুগ্ধানে পরিণত করিতে পারে, দুগ্ধানবীজাণু ব্যতিরেকে এমন আরও কয়েক প্রকার বীজাণু দুগ্ধকে আক্রমণ করিয়া থাকে। যখন দুগ্ধ কেবল দুগ্ধান বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন দুগ্ধ-শর্করা হইতে দুগ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কোনও মস্তসার বা সুরাসারের (alcohol) উৎপত্তি হয় না। কিন্তু দুগ্ধ যখন অল্প কয়েক

প্রকার বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পূর্বোক্তরূপে সন্ধিত হয়, তখন দুগ্ধ শর্করাভাগ কেবল দুগ্ধানে পরিবর্তিত না হইয় অল্পাধিক মাত্রায় সুরাসারেও পরিবর্তিত হয়। এই প্রকারে সুরাসারের উৎপত্তিকে সুরাসার সন্ধান (Alcoholic Fermentation of milk) বলা হইয়া থাকে। দুগ্ধস্থ শর্করাকে বিশেষ ভাবে এবং সহজেই সুরাসারে পরিবর্তিত করিতে পারে, ডুলক্স (Duelanx) এবং কেসার (Kayser) এইরূপ কয়েক প্রকার বীজাণু আবিষ্কার করিয়াছেন।

পনীর প্রস্তুত কালে দুগ্ধস্থ চর্কিভাগ ও প্রোটিদ্ ভাগই ব্যবহৃত হয়। শর্করাভাগ পরিত্যক্ত জলীয় অংশে পড়িয়া থাকে। পূর্বোক্তবিধিত বীজাণু দ্বারা ঐ জলীয় ভাগকে সন্ধিত করিয়া উৎকৃষ্ট “দুগ্ধসুরা” (Whey Wine) প্রস্তুতের চেষ্টা হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসর পনীর প্রস্তুতের অন্ত ২২,৪০,০০,০০০ গ্যালন বা ২,৮০,০০,০০০ মণ দুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত দুগ্ধস্থ জলীয় অংশের কিঞ্চিৎ ভাগ দুগ্ধশর্করা

(Milk of sugar) প্রস্তুতের ভিত্তি, এবং অবশিষ্ট ভাগ শুকরের খাতরূপে ব্যবহৃত হয়। এই জলীয় অংশকে স্নায়ুরূপে “হুঙ্সুরাতে” পরিবর্তিত করিতে পারিলে একটা নূতন ব্যবসায় প্রচলিত হইবে। “হুঙ্সুরা”তে শতকরা ৩ হইতে ৪ ভাগ পর্যন্ত প্রস্তুত সুরাসার থাকে। বলা বাহুল্য, বিত্তহীন দ্বিভিত্তে কোন সুরাসার থাকে না।

তাতারগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে হুঙ্স হইতে কোমিষ (Koumiss) নামে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। কোমিষ সাধারণতঃ ঘোটক বা উষ্ট্রহুঙ্স হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। দশ ভাগ সত্তা: উষ্ট্র হুঙ্সের সহিত অল্প পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া এক ভাগ পুরাতন বা অন্নবাদ্যবিশিষ্ট (অতএব সম্বিত) হুঙ্স মিশাইয়া কয়েক ঘণ্টা নাড়িয়া তাতারগণ উত্তম

কোমিষ সুরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। কোমিষ-সুরাতে শতকরা ১.৫ ভাগ হইতে ২ ভাগ পর্যন্ত বিত্তহীন সুরাসার থাকে। মাখন তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এইরূপ গো-হুঙ্সের সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত বীজাণু দ্বারা সজ্জিত করিলে, অবিকল কোমিষের সুরা এক প্রকার সুরা প্রস্তুত করা যায়। ইহা শিশুদিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট বলকারক খাদ্য।

ককেশাস্ প্রদেশে গো-হুঙ্সকে চর্শ্বনির্মিত ধলিয়াতে পুরিয়া সজ্জিত করিয়া “কেফির” নামক এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে অজীর্ণ, অধিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে “কেফির” উৎকৃষ্ট কায করে। নিম্নে বিত্তহীন কোমিষ ও কয়েক প্রকার প্রচলিত সুরার বিশ্লেষণ-ফল দেওয়া গেল :—

| | ১০০ ভাগে চর্শ্বির অংশ | ১০০ ভাগে প্রতিদের অংশ | ১০০ ভাগে শর্করার অংশ | ১০০ ভাগে হুঙ্সার অংশ | ১০০ ভাগে সুরাসার অংশ | ১০০ ভাগে জলের অংশ |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| বিত্তহীন হুঙ্স | ৩.৮ | ৪.৮ | ৪.১ | ০ | ০ | ৮৭.৩ |
| কোমিষ সুরা | ২.০৫ | ১.১২ | ২.২০ | ১.১৫ | ১.৭৫ | ৯১.৮০ |
| কেফির সুরা | ২.০ | ৬.৮ | ২.০ | ০.২ | ০.৮ | ৯০.৮২ |
| উৎকৃষ্ট ত্রাণ্ডি (একবার নং ১) | | | | | ৫১ | |
| গোর্ট মদ | | | | | ১৮—২০ | |
| বীয়ার (Beer) | | | | | ৫—৬ | |
| জ্যাম্পেন্স মদ | | | | | ১৫—২০ | |

এই বিশ্লেষণ-ফল হইতে দেখা যায় যে, অজ্ঞাত প্রচলিত সুরার তুলনায় হুঙ্সুরাতে বিত্তহীন সুরা-সারের অংশ অতি কম। কাজেই অজ্ঞাত সুরার সুরা হুঙ্সুরার বাদকতা নাই; অথচ ইহা অতিশয় বলকারক এবং ভোজ্যবর্ধক।

কখনও কখনও হুঙ্স সত্তা:ই নীলবর্ণ ধারণ করে। এরেনবার্গ (Ehrenberg) দেখাইয়াছেন যে, ছাইনো-

জেনাস্ নামক এক প্রকার বীজাণু (Bacillus cynogen-ous) হুঙ্সকে আক্রমণ করিয়া উত্তরূপ হুঙ্স বিবর্ণকারী পরিবর্তন সংঘটন করে। এই বীজাণু-সমূহ দেখিতে যেটে নীলবর্ণ এবং সরু দণ্ডের সুরা। ইহারা অপকারী নহে। হিউক্

(Houppé) উক্ত বীজাণু-বর্তিত খাদ্য বিভিন্ন প্রাণীকে খাওয়াইয়া তাহাদের দেহে কোন প্রকার রোগলক্ষণ বা

বিবাক্রিয়া প্রাপ্ত হন নাই। দুগ্ধপাত্র নিয়ন্ত্রিতরূপে
চুটত জন দ্বারা ধোত করিলে এই বীজাণুসমূহ দ্বারা
আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এতদ্ব্যতীত নানা
প্রকার বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দুগ্ধ পীত, রক্ত,
সবুজ বা বেগুণে বর্ণ ধারণ করিতে পারে। এইরূপ হলে
বীজাণুসমূহের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে
পূর্বে প্রবন্ধ * লিখিত সাধারণ সাবধানতা
অবলম্বন করা কর্তব্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বৃষ্টির দিনে
কখনও কখনও দুগ্ধ পাতলা আঠার আকৃতি ধারণ করে।
ইংরেজীতে ঐরূপ দুগ্ধকে ‘রোপী’ দুগ্ধ (Ropy milk)
বলে। এই দুগ্ধ এত ঘন এবং আঠা হয় যে, এক পাত্র হইতে
অপর পাত্রে ঢালিতে গেলে তরল পদার্থের স্থায় না পড়িয়া
উহা গাঢ় তৈলের স্থায় পড়ে। দুই তিন প্রকার বীজাণু
দ্বারা ঐরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে। বায়ুর
উষ্ণতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধ পুনরায় স্বাভাবিক তরলতা
প্রাপ্ত হয়। দুই এক স্থলে দেখা যায় যে, দুগ্ধ একটি
ভিক্স স্বাদ থাকে। লেইব্‌সার (Leibschner) দেখাইয়া-
ছেন যে, এইরূপ স্থলে গাভীর বাট-নিঃসৃত কয়েক ধার
দুগ্ধই কেবল ভিক্সস্বাদবিশিষ্ট থাকে। তিনি সিদ্ধান্ত
করিয়াছেন যে, পূর্বরূপ দুগ্ধবিরসকারী বীজাণুসমূহ
গাভীর বাট হইতে দুগ্ধে প্রবেশ করে। এইরূপ অবস্থায়
গোশালা এবং গাভীর পালান তিন চারি দিন পর্যন্ত
কার্যকর এলিড্‌ দ্বারা ধুইয়া শোধন করিয়া দিলে এই
সকল বীজাণু বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

আমাদের দেশে দুগ্ধ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নিতে
হইলে গোয়ালাগণ দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে কয়েকখানা খেজুর পাতা
বা মরিচ পাতা ফেলিয়া রাখে। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ
পাতা দুগ্ধকে অন্নস্বাদ হইতে দেয় না, অর্থাৎ দুগ্ধবিরোজন-
কারী বীজাণুসমূহের ক্রিয়া প্রতিরোধ করে। কিন্তু এই
বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। ঐ পাতা
গোয়ালাগণের দুগ্ধ-ব্যবহার করার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে,
সংরক্ষণ-প্রণালী। ঐরূপ করিলে দুগ্ধপূর্ণ ভাঙ্গ
লইয়া ক্ষত গমন কালে

পাত্রস্থ দুগ্ধ বলকাইয়া পড়িতে ও দখিত হইতে
পারে না।

কোন কোন গাছের পাতার দুগ্ধকে ঘন করিবার ক্ষমতা
আছে। কায়েই, দুগ্ধে জল মিশাইয়া ঐরূপ পাতা ফেলিয়া
রাখিলে আপেক্ষিক গুরুত্ব বর্দ্ধিত হওয়াতে
জলমিশ্রিত দুগ্ধও স্বাভাবিক দুগ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।
লিসবোয়া (Lisboa) বোম্বাই প্রদেশে এই কার্যে
এরাক্ট গাছের পাতা ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছেন।
এরাক্ট গাছের পাতার দুগ্ধকে ঘন করিবার ক্ষমতা আছে।

বায়ু-সংস্পর্শে রাখিয়া দিলে পূর্ববর্ণিত নির্দোষ
বীজাণুসমূহ ব্যতীত নানা প্রকার রোগবীজাণুও
দুগ্ধকে আক্রমণ করিয়া বিবাক্ত
দুগ্ধে রোগবাহক করিতে পারে। সংক্রামক রোগ-
বীজাণু বাহক বীজাণুসমূহ দুই প্রকারে
দুগ্ধে প্রবেশ লাভ করিয়া

থাকে। প্রথমতঃ, পাতীর কোন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি
থাকিলে, দোহনকালে উহার উৎস বা দেহ হইতে ঐ
রোগের বীজাণু দুগ্ধে প্রবেশ করিয়া তাহাদের রাজ্য বিস্তার
করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বায়ু হইতে বিসৃচিকা, সান্নি-
পাত অর, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি রোগের বীজাণু দুগ্ধে
প্রবেশ লাভ করিতে পারে। দেশে কোন সংক্রামক রোগের
প্রাদুর্ভাব থাকিলে শেযোক্ত উপায়ে দুগ্ধ বিবাক্ত হইবার
বিশেষ আশঙ্কা। কেহ ঐরূপ দুগ্ধ-পান করিলে শীঘ্রই
বিবাক্ত বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। কার্যেই
সাবধানতার জন্য দুগ্ধ উত্তমরূপে চুটাইয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে
পান করা উচিত। হিন্দু শাস্ত্রকারগণও এই বিষয়ে
বিশেষ বিধি করিয়া গিয়াছেন। সুশ্রুতে দুগ্ধের ব্যবহার
সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, “দুগ্ধ অগ্নিতে পাক করিলে লঘু
হয় এবং নারীর দুগ্ধই অপকাবস্থায় হিতকর। অপর দুগ্ধের
মধ্যে ধারোক্ষ (অর্থাৎ দোহনের পর স্বভাবতঃ যতক্ষণ উষ্ণ
থাকে) দুগ্ধই গুণবিশিষ্ট; দোহনের পর শীতল হইলে
বিপন্নীত গুণ দর্শায়।” উত্তাপপ্রদানে বীজাণু-সমূহ
ধ্বংস পাইয়া থাকে। কত উত্তাপে কোন

কার্তিক ১৩১১

ভাপ-প্রয়োগে বীজাণু বিনষ্ট হয় তাহা নিয়ে দেওয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। বীজাণুশূন্য দুধপানে কোন প্রকার বীজাণুর ধ্বংস। গেল—(অবশ্য দুধকে ফুটাইলে দুই রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে না।) :—
এক মিনিট মধ্যেই সর্বপ্রকার বীজাণু

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----------|
| যক্ষা বীজাণু | ... | ৭৭ সি: (77 Cent) | ... | ... | ... | ১০ মিনিটে |
| সার্মিপাত জ্বরের বীজাণু | ... | ৮৫ সি: | ... | ... | ... | " " |
| দুগ্ধজ বীজাণু | ... | ৮৫ সি: | ... | ... | ... | " " |
| বিস্ফটিকা বীজাণু | ... | ৬০ সি: | ... | ... | ... | " " |
| টিউবারকিউলসিস বীজাণু | ... | ৬০ সি: | ... | ... | ... | " " |
| পচনকারী ও অন্ন উৎপাদনকারী সর্ব- প্রকারের বীজাণু | ... | ৪৬ সি: | ... | ... | ... | ১৫ " |

পূর্বোক্ত প্রকারে দুধকে বীজাণুশূন্য করার প্রণালীকে “ দুধ অস্থূরীকরণ ” (Sterilise) করা বলে। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে দুধকে বীজাণুশূন্য বা “অস্থূরীকরণ” করিতে হইলে ১৫ হইতে ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত উত্তম রূপে ফুটাইয়া বাহাতে বায়ুর সংস্পর্শ না ঘটে একরূপভাবে আটকাইয়া রাখা হয়।

উক্তরূপ সংরক্ষিত দুধ সত্তাঃ দুধের মত গুণকারী কি না সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের মতভেদ আছে। তাহার কারণ এই যে—(১) যদিও উত্তাপ-প্রয়োগ হেতু বিস্ফটিকা, সার্মিপাতিক জ্বর, ডিপথেরিয়া ও টিউবারকিউলসিসের বীজাণু অতি ক্ষীণ হইয়া বিনষ্ট হয়, কিন্তু ঐরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা শিশুদিগের উদরাময় রোগের বীজাণুসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। কারণ উহার দুই ঘণ্টা কাল

দুধে অত্যধিক পর্য্যন্ত জলের ফুটন তাপ (boiling temperature) সহ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। ঐ বীজাণু-সমূহ দুধে পেপটোন (Peptone) প্রস্তুত করিয়া শিশু-দিগের উদরাময় রোগ আনয়ন করে।

(২)—সত্তাঃ দুধেরও বীজাণুনাশক ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ, সত্তাঃ দুধ পান করিলে উহা শরীরস্থ অস্ত্রান্ত অপকারী বীজাণু-সমূহকে আংশিকরূপে বিনষ্ট করিতে পারে। দুধের উক্ত ক্ষমতা দোহনের কয়েক ঘণ্টা পর পর্য্যন্তও বর্তমান থাকে। কিন্তু দুধে তাড়াতাড়ি

অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহার পূর্ববর্ণিত বীজাণু-নাশক গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

(৩) উত্তাপহেতু দুধস্থ “অন্তলাগম্য ভাগ” (Lacto-albumin) জমাট বাধিয়া দুধের উপর সর পড়িতে থাকে। কাজেই উহা পরিপাক করা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য হয়।

(৪) অত্যধিক তাপে দুধস্থ কেসিন (casein) ভাগের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয় এবং ছানা বাধিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়।

(৫) ষাভা জব্যস্থ খেতসার (starch) ভাগকে পরিপাক করিতে পারে, পূর্ণবয়স্কদের সুখস্থিত লালান্তে এইরূপ একপ্রকার বীজাণু আছে। কিন্তু শিশুদের লালান্তে এইরূপ কোন বীজাণু নাই। উক্ত কার্য্য করিতে পারে এইরূপ একজাতীয় বীজাণু সত্তাঃ দুধেও থাকে, এবং উহা শিশু-দের পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করে। দুধে উত্তাপ প্রয়োগ কালে উহার সহজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; কাজেই শিশুদের পরিপাক ক্রিয়ার কোন সহায়তা করিতে পারে না।

(৬) ষাভাবিক দুধে চর্বিভাগ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু উত্তাপ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিন্দু বিন্দু ভাবে পৃথক হইয়া উপরে তাসিয়া উঠে এবং কাষেই তখন উহা পরিপাক করা কঠিন হইয়া পড়ে।

কাহিনী ১০

(৭) অত্যধিক তাপ-প্রয়োগে দুগ্ধই শর্করা-ভাগও কিকিং পরিবর্তিত হইয়া থাকে। উক্ত কারণেই বন দুগ্ধে বা কীরে এক প্রকার গন্ধ অনুভূত হয়।

পূর্বে বাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, অল্প দুগ্ধ কোন মতেই পান করা উচিত নহে, অথচ অতি মাত্রায় সিদ্ধ করিলেও দুগ্ধের গুণ ক্ষয় করিয়া

যায়। দুগ্ধ কয়েক মিনিট পর্যন্ত উত্তমরূপে গরম করিয়া পান করাই শ্রেয়ঃ। উত্তম করার

পক্ষে অধিকতর গরম হইলে, উহাতে পুনরায় কোন প্রকার বীজাণু প্রবেশ লাভ করিতে পারে। হিন্দু শাস্ত্র মতে “দুগ্ধ জ্বালিয়া জৈবদুগ্ধ থাকিতে থাকিতে পান করিতে হইবে। জ্বাল দিবার পর তিন মুহূর্ত অতীত হইলে সেই দুগ্ধকে অতপ্ত বলিয়া জানিবে। এই দুগ্ধ দূষিত হয়। দুগ্ধে জ্বাহার চতুর্থ ভাগ জল মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া পান করিলে হিতকর হয়।”

দুগ্ধকে বীজাণুশূন্য এবং সংরক্ষিত করিবার জন্য পান্চাত্য দেশসমূহে কি কি বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে, ইত্যাদি বিষয় এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

শ্রীঅনুভূতচন্দ্র সরকার।

পরমার্থ

হির হও! এ বিশ্বের সাগর গভীরে
যে না জানে নিমজ্জিতে বিছা সেই কবি;
অতলে অলখে ডুবি, মনে যপি-পুরে
প্রাণের আরশে কবি, ধর' বিশ্ব-ছবি।
ছবি সে, বসতি যার লোকালোক-পুরে
প্রকাশে জীবন-রসে আলোক-হারার।
জড়ের তাবের দেশে সজ্জের সুরে
প্রতি-টি রেখার যার রহে অভিপ্রায়।

যুগ-যুগান্তর ধরি' কোটি জন্মের
ভ্রম-আক্রমণে যার না ফুরাবে আশা;
কোটিরূপে কোটি মুখে জন্ম মনের
পিয়াসে ভিরাবে যার উৎসার ভাষা।
গভীরে অতলে সেই পুণ্য-ফলোদয়
কবিতার পরমার্থ করহ সঙ্গর।

শ্রীশশীকমোহন সেন।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং*

ইউয়ান চ্যাংয়ের বিস্তৃত জীবনী “বুহং মঠের ত্রিপিটকে পারদর্শী প্রভুর বর্ণনা” (Record of the Tripitaka Master of the Great Compassion Monastery) নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। জুলিয়েন এই গ্রন্থ হইতেই সারাংশ সংকলন করিয়াছিলেন এবং বীলও জুলিয়েনের পছন্দ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ এবং অন্যান্য কয়েকখানি চৈনিক পুস্তক হইতে পর্যটকের বংশাবলী ও জীবনী প্রদত্ত হইল।

পর্যটকপ্রবর যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই চেন বংশের নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং পর্যটক নিজে “আই” নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ বা সমসাময়িক কোন লেখকের গ্রন্থেই অয়ান (Hsuan) বা ইউয়ান (Yuan) চুয়াং (Chuang) ব্যতীত তাঁহার অন্ত কোন নাম দৃষ্ট হয় না। ইউয়ান চুয়াং যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন তাহা হুয়াংটি (Huang-Ti) হইতে উদ্ভূত হয়। সম্রাট সান্ এই বংশ সজ্জত, এবং পূর্বে এই বংশ সান্ নামে আখ্যাত হইত। পুরাকালে বংশধরেরা হোয়ানানের পূর্বদিকে কুইটিং জিলায় বাস করিতেন ও পরে সানচ্যাংয়ের নিকটবর্তী স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। চৌ-বংশের প্রথম রাজা উওয়াংয়ের (Wu-wang) রাজত্বকালে ‘হুকাংকুই-

* ওয়াটস লিখিত ইউয়ান চ্যাং বা হিউয়েন সাংয়ের ‘সি-ইউ-কি’র ছবিকা অবলম্বনে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

বান্ (Hsu-Kuang-kuoi-man) নামক এক ব্যক্তি সান বংশের কশধর খলিয়া পরিগণিত হইতেন।

এই ব্যক্তি উওয়াংয়ের স্থল পরিদর্শক ওয়ুর পুত্র। এই পদ বংশান্ত্রকমেই ভোগ করা হইত এবং উওয়াং মানকে নিজ কস্তা সন্তান করিয়া মা'ইন্ ("How") উপাধিতে ভূষিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে জামাতাকে চেন (Chen) নামক জায়গির প্রদান করেন। ইহাতে মান বিশেষ সম্মানিত হন। ৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মানের বংশধরগণ এই জায়গির ভোগ করিতে থাকেন। তৎপরে তাঁহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন বটে, কিন্তু 'চেন' উপাধি ধারণ করিতে থাকেন।

তৃতীয় পূর্ব খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে আর আমরা চেন বংশীয় বিখ্যাত কোন ব্যক্তির দেখা পাই না। কিন্তু এই শতাব্দীতে আমরা সুবিখ্যাত চেন-পিংয়ের (Chen-Ping) দেখা পাই। চেন-পিং তখন ইয়াংউতে (বর্তমান কৈফং) বাস করিতেন। পিং সামান্য অবস্থা হইতে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া ইতিহাসে অমর্য লাভ করেন। জীবনে শ্রীযুক্ত লাভ করিবার এবং ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইবার কারণ এই যে, তিনি অত্যন্তর সৎ ছিলেন এবং বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার পন্থা উদ্ভাবন করিতে তাঁহার বিদুমাত্রাও বিলম্ব হইত না। তিনি যে সকল পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ছয়টি বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল এবং তাহা হইতে একটি প্রবাদবাক্যও সৃষ্ট হইয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হ্যাংকাও-সুর (Han-Kao-Tsu) উপকারার্থেই পিং এই সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং সকল গুলিই ফলবতী হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইউয়ান চুয়াংয়ের অন্য একটি প্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হন। বর্তমান হোনানের অন্তঃপাতী হু-চৌ-ফু (Hsu chow-foo) অথবা হু (Hsu) নামে খ্যাত ছিল এবং চেনশি (Chen-shi) বা চ্যাং ক্যাং (Chung-Kung) এই হু প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। সম্রাট হ্যাং হুয়াংটি (Han-Huan-Thi)র রাজত্বকালে চেনশি রাজকার্যে নিযুক্ত হন। দ্বি-কর্তব্যপন্নায়ণ

ও সং ছিলেন এবং প্রজার হিতকর কার্যে সর্বদাই ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি যদিও করুণাপরবশ ছিলেন তথাপি অবিচলিতচিত্তে রাজকার্যে পর্যবেক্ষণ করিতে রাজা ও প্রজা উভয়েরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। প্রাথমিক শাসনকর্তারূপে তিনি সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শাসনকালে প্রাচীন চুফু করিতে লজ্জা বোধ করত। নিকটবর্তী জিলার অধিবাসীবৃন্দ তাঁহার শাসনাধীনে থাকিবার জন্য স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আসিত। কয়েক বৎসর পরেই তিনি রাজকর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করেন। পারিবারিক জীবনেও তিনি সুখ ভোগ করিয়াছিলেন এবং ধার্মিক পুত্র ও পৌত্রগণ পরিবৃত্ত হইয়া তিনি সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবার "ধার্মিক নন্দ্র পুত্র" নামে অভিহিত হইতে লাগিল, এবং ভগবানও ইহা লক্ষ্য করিলেন। পুনরায় রাজকর্ম গ্রহণের জন্য আহত হইলে চ্যাং ক্যাং অস্বীকার করিলেন এবং ১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেহ ত্যাগ করিলেন।

পরবর্তী কশধরগণের মধ্যে চেংটার (Chen-Ta) নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি চতুর্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তখন চিং (Chin) বংশ তদ্দেশীয় রাজা। ইনিও পণ্ডিত ছিলেন এবং উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। চ্যাং চেংয়ের (Chang-cheng) শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে তাঁহার বংশধরগণ সিংহাসনারোহণ করিবেন, তিনি এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়, কারণ টার বংশধর সুবিখ্যাত চেং-পা-সিয়েং (Chen-Pa-hsein) চেং রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশ হঠাৎ হুই শত বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করেন। কিন্তু আমাদের পর্য্যটকের পূর্বপুরুষগণ খুব সম্ভব এই শাখার অন্তর্ভুক্ত নহেন।

ইউয়ান চ্যাংয়ের প্রপিতামহ চিং (Chin) চ্যাংয়ের শাসনকর্তারূপে কার্য্য করিতেন। পর্য্যটকের পিতামহ ক্যাং (Kung) সুপণ্ডিত ছিলেন এবং রাজধানীর জাতীয় উচ্চ শিক্ষালয়ে (National College) অধ্যাপক ছিলেন।

এই পদের পারিশ্রমিকস্বরূপ তিনি চৌনান নগরের রাজ্য উপভোগ করিতেন। পর্যটকের পিতৃদেব হই (Hui) সুবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘাকার শিকিত ও বুদ্ধিমান এবং স্বধর্মপরায়ণ ছিলেন। যথাসময়ে তিনি রাজকার্য্য গ্রহণ করেন এবং রাজ্য-বিপ্লব উপস্থিত হইলেই পদ ত্যাগ করেন। পরে তিনি চেং-পাও-কু (Chen-pao-ku) নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। এই গ্রাম কো-সি নগরের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। ইউয়ান চুয়াংকে কখনও কখনও কো-সিবাসা বলা হয় এবং সম্ভবতঃ এই নগরের সন্নিকটস্থ তাঁহার পিত্রালয়ে তিনি ৬০০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

চিয়েং হইর পরিবারবর্গের সংখ্যা কম ছিল এবং ইউয়ান চুয়াংয়ের জ্যেষ্ঠ আরও তিনটি ভ্রাতা ছিলেন। বাল্যকালে তিনি, তাঁহার অষ্টাত্ত ভ্রাতৃগণের সহিত পিতার নিকটেই শিক্ষা লাভ করেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকও ছিলেন। শৈশবেই ইউয়ান চুয়াং তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দেন। তাঁহার প্রথম স্বরণশক্তি ছিল এবং তিনি সাতিশয় বিজ্ঞানরক্ত ছিলেন। শৈশবে, অষ্টাত্ত বালকের ভায় তিনি আদৌ জীভাশক্ত ছিলেন না, এবং একাকী থাকিতেই ভাল বাসিতেন। তিনি কনফুউ-সিয়াসের মতানুসোদিত সত্যানের কর্তব্য সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা বৌদ্ধধর্ম অবলম্বনানন্তর যতিব্রত গ্রহণ করিলেন এবং ইউয়ান চুয়াং অজ্ঞাত ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মঠে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারও অন্তঃকরণে যতিব্রত গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা আগিয়া উঠিল এবং বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক পাঠে তিনি গভীর মনোনিবেশ করিলেন। বিংশ বর্ষ বয়স্ককাল কালে তিনি যতিব্রত গ্রহণ করেন, এবং ভদ্রেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন মঠে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট তিনি এই ধর্ম সংক্রান্ত মূল্যবান পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই সুপণ্ডিত ও বজ্রা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

কিন্তু তিনি অধিক কাল চীনে থাকিতে পারিলেন না; কারণ, বৌদ্ধধর্মের আদিহান ও সুবিখ্যাত তীর্থগুলি দেখিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে আগ্রহক হইল। বিশেষতঃ, ধর্ম পুস্তকগুলির চীন দেশীয় প্রচলিত অনুবাদে তিনি আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, এবং মৌলিক পুস্তকগুলি দেখিতে এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে প্রকৃত অর্থ জানিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানাদি করিয়া ও আরোহণাদি শেষ করিয়া গোপনে তিনি ৬২৯ খৃঃ অব্দে চ্যাং আন (বর্তমান সিয়ান) পরিত্যাগ করিলেন। যে যে স্থানে তিনি পর্যটন করেন, তাহার বর্ণনা তাঁহার পুস্তকে বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ষোড়শ বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া তিনি চীনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে চ্যাং আমে পৌছেন। তখন চ্যাং টে সাং রাজত্ব করিতে ছিলেন।

ইউয়ান চুয়াংকে দেশাধিপতি স্বরূপ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, ইতঃপূর্বে অথবা পরে আর কোনও বৌদ্ধ যতি এরূপ সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হন নাই। সম্রাট স্বয়ং, রাজকর্মচারী, বণিকগণ এবং জনসাধারণ সকলেই ইউয়ান চুয়াংকে অভ্যর্থনা করেন। রাজপথে স্ত্রী ও পুরুষগণ পতাকা ও বাদ্যধ্বনি সহকারে পর্যটকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। প্রকৃতি দেবীও সেদিন এই অভ্যগতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ আকাশ রক্তিম বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিলেন। পর্যটকের প্রিয় পাইন বৃক্ষও তাহার শাখা প্রশাখা কম্পিত করিয়া তাঁহাকে আগত সম্ভাষণ করিয়াছিল। যে দিন ইউয়ান চ্যাং প্রথম বিদেশ যাত্রা করেন, সেই দিন এই বৃক্ষ ইউয়ান চ্যাংয়ের প্রার্থনামুসারে ইহার শাখা প্রশাখা পশ্চিমদিকে নত করিয়াছিল এবং ততদিন পর্যটক ঐ দিকে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন, ততদিন এই ভাবেই ছিল। কিন্তু যখন তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তনার্থ পূর্বাভিমুখী হইলেন, তখনই বৃক্ষটি ইহার শাখা প্রশাখা ও পত্র-পুষ্পসহ পূর্বাভিমুখী হইল। এই দৃশ্যে অধিবাসীবৃন্দ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইউয়ান

চ্যাং গৃহাতিমুখী হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি গৃহে প্রত্যা-
বর্তন করিয়াছেন এবং অনেক দিবস ধরিয়া সকলের
বিস্ময়েৎপাদন করিবেন। যে স্থানে অস্ত্র কোন চীনবাসী
ইতঃপূর্বে যান নাই, তিনি সেই দেশে গমন করিয়া-
ছিলেন। যে দেশ পূর্বে অস্ত্র কোন চৈনিক পর্য্যটক
দেখেন নাই তিনি সেই দেশ দেখিয়াছেন। একাকী
তিনি ভূতপ্রেতসম্বিভ প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন।
তিনি অদ্ব্যুচ্চ পর্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি
পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশ দেখিয়াছেন এবং যে স্থানে সকল
ঔষ্যের শেব, তিনি সেই স্থান দেখিয়াছেন। এক্ষণে
তিনি নিরাপদে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং সঙ্গে
মূল্যবান বহু জব্বা আনয়ন করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত
৬৫৭ খানি পুস্তক সঙ্গে আনিয়াছেন। ইহাদের কতকগুলি
অদ্ব্যুচ্চ বিপদ দূরীভূত করিতে পারে, এবং সকলগুলিই
অদ্ব্যুচ্চ ভারতীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ এবং তালপত্র বা গ্রথিত
বহুল-নির্মিত। অধিকন্তু, সুন্দর সুন্দর বুদ্ধমূর্তি এবং সুবর্ণ,
রৌপ্য, কটিক এবং চন্দন কাষ্ঠনির্মিত বুদ্ধের ও সিদ্ধ
পুরুষগণের মূর্তি সঙ্গে আনিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অনেক
অদ্ব্যুচ্চ অদ্ব্যুচ্চ চিত্র, এবং সর্কোপেক্ষা মূল্যবান বুদ্ধদেবের
প্রকৃত দেড় শত স্মরণ চিত্র তাঁহার সঙ্গে আনিয়াছে।
এই সকল চিত্র ফুড়িটা বোড়ার বহন করিয়া আনয়ন করে
এবং বিশেষ জাকজমক ও শিষ্টাচারের সহিত নগর মধ্যে
লইয়া যাওয়া হয়।

সম্রাট তৈয়াং পর্য্যটক বিনামূল্যে অস্ত্র গমন
করিয়াছিলেন, এই অপরাধ ক্ষমা করিলেন, ইউয়ান
চ্যাংয়ের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন এবং তাঁহার
অন্তরঙ্গ বন্ধ হইলেন। তিনি অস্ত্রপূরে ইউয়ান
চ্যাংয়ের অভ্যর্থনা করিলেন এবং অক্লান্তচিত্তে ইউয়ান
চ্যাং-বর্ণিত অজ্ঞাত দেশের বর্ণনা এবং সেই দেশে বুদ্ধদেব
ও তাঁহার শিষ্যগণ যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটাইয়াছেন,
তাঁহার বর্ণনা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ইউয়ান চ্যাং
বাহাতে বতিব্রত পরিভ্রমণ করিয়া রাজকাৰ্য্য গ্রহণ
করেন, তৎকাল সম্রাট বৎপরোন্মত্তি চেষ্টা করিতে

লাগিলেন। কিন্তু পর্য্যটক এসময়ে বৃঢ়প্রতিভা ছিলেন
এবং সত্বর মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া চৈনিক ভাষায়
ভারতীয় পুস্তকগুলির অমূল্যবোধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার
আবেদনের ফলে অমূল্যবোধ-সম্পাদন ও অমূল্যলিপি করণার্থে
সম্রাট কয়েকজন শিক্ষিত যতি ও পণ্ডিত নিযুক্ত করেন।
ইতি মধ্যে ইউয়ান চ্যাং সম্রাটের অমূল্যবোধে তাঁহার সি-
ইউ-চি সঙ্কলন করেন। ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের প্রথম
'খসড়া' সম্রাটের নিকট উপস্থিত করা হয় কিন্তু ৬৪৮
খৃষ্টাব্দের পূর্বে পুস্তক শেষ হয় নাই। গ্রন্থকারের জীবিত
কালে পাণ্ডুলিপির অমূল্যলিপি প্রচার করা হয়। সি-ইউ-
চি শেষ করিয়া পর্য্যটক প্রচুর অমূল্যবোধে প্রবৃত্ত হন।
অবসর মত তিনি শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন এবং নির্দিষ্ট
কারণে কাল যাপন করিতেন। ৬৬৪ খৃষ্টাব্দের ৬ষ্ঠ
দিবসে তিনি ঘেহ ত্যাগ করেন। পূর্বে হইতেই তিনি
একান্ত প্রস্তুত ছিলেন এবং 'প্রস্থানের' আয়োজনও
করিয়াছিলেন। একান্ত ভীত হইবারও তাঁহার কোন
কারণ ছিল না, এবং তিনিও দেহান্তে স্বর্গবাসী হইবেন,
ইহা স্থির জানিয়াই সমস্ত চিন্তা প্রাণ ত্যাগ করেন। যতদিন
মৈত্রীর পৃথিবীতে আগমন না করেন, ততদিন তিনি
তথায় তাঁহার সহিত অপেক্ষা করিবেন, এবং তাঁহারই নদী
হইয়া ইউয়ান চ্যাং পৃথিবীতে প্রত্যাগমন ও অস্ত্রের
উপকারার্থে পুনরায় বুদ্ধদেবের আদেশাবলী প্রতিপালন
করিবেন, এই আশায় তিনি স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছেন।

বাহ্যিক আকৃতিতে ইউয়ান চ্যাং তাঁহার পিতৃদেবের
জায় দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চক্ষু সুন্দর ছিল
এবং তিনি সুশ্রী ছিলেন। তিনি একাধারে নৈতিক ও
মানসিক গুণাবলী সম্বিভ ছিলেন, এবং সাধারণ চীন-
বাসীদিগের সহিত তাঁহার বখেষ্ট পার্থক্য ছিল। মাতাপিতা
ও ভ্রাতৃগণের প্রতি তাঁহার বধার্থ আশক্তি ছিল, এবং
বাল্যে ও বৃদ্ধাবস্থায় তিনি তাঁহাদের প্রতি বরদান ছিলেন।
তিনি উৎসাহী, কষ্টসহিষ্ণু এবং অধ্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু
তাঁহার প্রকৃতি নীরস ছিল এবং তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি
ছিল না। তিনি অতিশয় কর্মগঠ ছিলেন এবং তাঁহার

বিভার্চার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বলবতী ছিল। যদিও তাঁহার পিতৃপিতামহগণ কমকিউসিয়সের মতাবলম্বী ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং বাল্যে সেই মতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তথাপি পরে তিনি এক জন গৌড়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার পিতৃদেব ও বাল্যকালের শিক্ষকগণের নিকট হইতে যে ধর্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যশালী পরিমাণ ও ইহার ধর্মের মহিমা তাঁহাকে তাঁহার চীনের প্রতি ভাল-বাসা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। চীনের পারি-বারিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক আচার ব্যবহারের তিনি সর্বদাই প্রশংসা করিতেন। ষাট বৎসর বয়স্ক কালেও তিনি তাঁহার স্বর্গীয় মাতাপিতার সমাধিস্থলে পুত্রোচিত কর্তব্য পালনে পরাধুখ হন নাই। এইগুলি কোথায় অবস্থিত জানিতে না পাইয়া তিনি তাঁহার বিবহিতা ভগ্নীর নিকট অনুসন্ধান করিয়া ইহাদের নির্দেশ করেন। তখন সমাধিস্থলগুলির দৃশ্য দেখিয়া তিনি সম্রাটের অজ্ঞমতি লইয়া তাঁহাদের মৃতদেহের অবশেষ স্থানান্তরিত করিয়া পুনরায় সমারোহের সহিত প্রোথিত করেন। যদিও তিনি বহুপূর্বে শাক্যমুনির ভক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য বিন্মত হইতে পারেন নাই।

ইউয়ান চুয়াং বৌদ্ধধর্মাবলম্বিত কল্প-পদ্ধতি প্রতিপালনে সাতিশর তৎপর ছিলেন। কিন্তু ধর্ম-মত সম্বন্ধে তিনি উদার ছিলেন এবং বস্তুতঃ তাঁহার প্রকৃতিই উদার ছিল। তাহা হইলেও তিনি সম্রাট তৈস-দের অহুরোধে ‘তাও-তি-চিং’ (Tao-Te-ching) অহু-বাদে বীকৃত হয় নাই অথবা তাও-তি-চিংয়ের গ্রন্থকার লাওজুকে (Lao-Tzu) বুদ্ধদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করিতে পারেন নাই। আত্মত্যাগী হইলেও ইউয়ানচুয়াং সদাসর্বদাই তাঁহার ধর্মের মহত্ত্ব ও গৌরব রক্ষা করিতেন। অনেকে তাঁহাকে অসম্বদ্ধ বলিয়া মনে করেন কিন্তু কোন বিষয়কে সহজেই প্রত্যয় করা বা বাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই বিশ্বাস করা তাঁহার প্রকৃতি

ছিল না। ইউয়ান চুয়াং সর্বদাই নিজে প্রত্যয় না করিলে কোন বিষয়ে প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার ধর্মবিশ্বাস অনেক সময় তাঁহাকে অনেক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করাইয়াছে এবং বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত অনৈসর্গিক বর্ণনায় তিনি সহজেই আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। সামান্য একটি ক্ষুদ্র ছিন্ন, পক্ষ-পাত্রে কোন চিত্র, এবং যে কোন ঘটনা বর্ণনিতা কর্তৃক বাস্তবিক বলিয়া বর্ণিত হইলেই তিনি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং এই সকলই তাঁহার সন্দেহ দূরীভূত করিয়া, তাঁহাকে বিষম আনন্দ প্রদান করিত। এই জন্যই পর্যটক প্রবর সকল সময়ে প্রকৃত ঘটনার তথ্যসম্বন্ধানের সুরোগ পান নাই। প্রকৃত পক্ষে, তিনি মনোযোগ সহ-কারে অনেক বিষয় দেখেন নাই বা বহুপূর্বক অনুসন্ধান করেন নাই অথবা সম্ভাবজনক ভাবে বর্ণনা করেন নাই, এবং সেইজন্য অনেক বর্ণনিতব্য বিষয় ছিল, যাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই।

আমাদের ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইউয়ান চুয়াং কেবল বুদ্ধ ও বুদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বিষয় জানিবার জন্যই ব্যগ্র-ছিলেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস এবং উৎসাহ, তাঁহার সমসাময়িক লোক সমূহের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া নোদ হইত, কিন্তু আমাদের নিকট ইহা অত্যা-শ্চর্য্য বোধ হয়। কেন না, ইউয়ান চুয়াং যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আসক্ত ছিলেন, যে পদ্ধতি তিনি অধ্যয়ন, সন্মান ও প্রচার করিতেন, সে পদ্ধতির সহিত গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের বধেই পার্থক্য ছিল। শেবোক্ত ধর্ম যোগ বা যাহুবিজ্ঞার দ্বার দারিত না। প্রজ্ঞাপরিমিতা অথবা অনি-শ্চিত এবং নিষ্ফল দর্শনের সন্মাহুসন্ধান কিংবা স্বপ্ন-রাজ্যের কথা বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যগণের নিকট বিচার বা প্রচার করেন নাই। কিন্তু ইউয়ান চুয়াং মৌলিক ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিষয়ে প্রত্যয় স্থাপন করিতে কোন বিধা বা দোষ বোধ করেন নাই। তথাপি হীনযানমতাবলম্বীগণকে তিনি ব্রাহ্ম ধারণার বশবর্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে মহাযান

জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন।

ইউরান চ্যাংয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃতদেহ ক্ষয় হয় নাই এবং তাঁহার কয়েক জন শিষ্য তাঁহার দর্শন পাইয়াছিল। জীবিতকালে তিনি “বর্তমান শাক্যমুনি” নামে কথিত হইতেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গণ্য করিতে থাকেন। একখানি গ্রন্থে তিনি তিনটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং অন্য গ্রন্থে তিনি চীন দেশে চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শেবোক্ত সম্প্রদায় ইউরান-চ্যাংয়ের সহাধ্যায়ী নীলভদ্র কর্তৃক নালন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, এইরূপ কথিত আছে।

কোন কোন বৌদ্ধ মন্দিরে আমরা এই পর্য্যটকের মূর্ত্তি দেখিতে পাই; এগুলিকে পূজা করা হয়। সাধারণতঃ পর্য্যটকগণের শ্রবণের বেশে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক এবং বাম হস্তে তিকা পাত্র লইয়া উপবিষ্ট আছেন, মূর্ত্তিগুলি এই ভাবেই গঠিত।

শ্রীবোগীন্দ্রনাথ সমাদার।

আদর্শ ধনপতি *

(১)

যাহার অর্থের অভাব, তাহার রূপের কোনও প্রয়োজন নাই। ভালবাসা, প্রেম, কবিত্ব সেত ধনীদেবজন্ত, কাজকর্ম্মহীন বেকার লোকের জীবন নিত্য সাধাসিধে গভময় হওয়া উচিত। নিজেকে কিসে সুন্দর দেখাইবে, কিসে দশমানে তাহার সুখ্যাতি করিবে, সে চেষ্টা না করিয়া কিসে দুই পরসী রোজগার করা যায়, সে চেষ্টা করাই তাহার কর্তব্য। সংসারের এই সত্যগুলি আর-

ক্ষিনের বাধার কিছুতেই প্রবেশ করিত না। দেখিতে সে তারি সুন্দর—চন্দ্র তলে ছাঁচে ঢালা সুখখানি, বাধার ঘনকুঞ্চিত কেশরাজি, নীলকান্তমণির মত চক্কু দুটি—জীপুরুষ সকলের নিকটই সে প্রিয় ছিল। তাহার সব গুণই ছিল, একটি ছাড়া—সেটি অর্থোপার্জনোর কৌশল।

পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারহত্রে সে যাত্রা একখানি মে কালের তরবারি ও পঞ্চদশ খণ্ডে সমাপ্ত একখানি পনিম্নঙ্গার (Peninsular) বৃদ্ধের ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেগুলিকে তাহার বসিবার ঘরে সবয়ে সাজাইয়া রাখিয়া তাহার বৃদ্ধা ধুলতাতপত্রীর প্রদত্ত বাৎসরিক দুই শত পাউণ্ডের সাহায্যে সে দিব্য নিরুবেণে দিন যাপন করিত।

সে প্রথম প্রথম অর্থোপার্জনোর জন্য কিছু চেষ্টা করিয়াছিল। প্রায় ছয় মাস একচেত্রে দালালী করে, কিন্তু সে কার্য্য তাহার মত নিরীহ লোকের জন্য নহে—সে তাহা ছাড়িয়া দিল। তাহার পর চারের ব্যবসা আরম্ভ করিল—ছয় মাস না যাইতে যাইতে চারের নাম সুখ হইতে করিতে করিতে বেচারী অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার পর সে মদের ব্যবসা লইয়া পড়িল, কিন্তু হিতৈষী বন্ধু বান্ধবের গুণ ইচ্ছায় তাহাও টিকিল না। তখন বেচারী কাজকর্ম্মের আশা ত্যাগ করিয়া হতাশ হইয়া দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবে দিন যাপন করিতে লাগিল।

এইত তাহার অবস্থা—তাহার উপর সে প্রেমে পড়িয়াছিল। যুবতীর নাম লরা বেট্রন—এক জন অবসরপ্রাপ্ত কণ্ঠেলের কন্যা। কণ্ঠেল একটু অল্পত প্রকৃতির লোক। তারতবর্ষের জলহাওয়ার গুণে তিনি তাহার মেলাক ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরিপাকশক্তি হারাইয়া ছিলেন; উত্তরকালে রুয়ের কোনটাকেই আর কিরিয়া পান নাই।

লরা তাহাকে ভালবাসিত; আরকিন তার জুতার কিতাটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিলে আগুনাকে ধক্ক মনে করিত। দুটিতে বেশ মানিয়েছিল; লোকে

বলাবলি করিত, একরূপ বোড় লণ্ডনের মত সহরেও
হুলত।

কর্ণেল তাঁহার কণাকে খুবই ভাল বাসিতেন; কিন্তু
তাহাদের উভয়ের বিবাহের কথায় একবারেই কর্ণ-
পাত কবিতেন না। সে বিষয় প্রস্তাব করিলে কর্ণেল
আরন্ধিনকে বলিতেন, “আগে দশ হাজার পাউণ্ড উপার্জন
কর, তার পর এ কথা বলিও। তখন তাবিয়া দেখিব।”
যুবক মর্মান্বিত হইয়া লরার কাছে গিয়া সাজুনা পাইত।

(২)

আরন্ধিনের এক সম্ভ্রান্ত বন্ধু ছিল, তাহার নামা এলেন ট্রেভর।
সেদিন লরাদের বাড়ী যাইবার পথে সে এক বার তাহার
এই বন্ধুটির সহিত দেখা করিবার ইচ্ছায় তাহার গৃহে
প্রবেশ করিল। ট্রেভর তখনকার এক জন বিশিষ্ট প্রতিভা-
শালী চিত্রকর। দেখিতে সে অতি রুক্ষমূর্তি, মাথায়
একরাশ ভামার রংয়ের চুল, কিন্তু সেই ট্রেভর যখন রং ও
তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে দাঁড়াত, তখন তাহার সাথে
পাল্লা দেয়, এমন চিত্রকর দেশে ছিল না। তখনকার
বাজারে ট্রেভরের ছবির মূল্য খুবই বেশী।

ট্রেভর প্রথম এই তরুণ যুবকের চমৎকার মুখখানি
দেখিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছিল; ক্রমে সে আরন্ধিনের
সরল উদার প্রকৃতিতে ও নিবিড় প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে
এত মুগ্ধ হইয়া পড়িল যে, তাহাকে তাহার ষ্টুডিওতে
প্রবেশের অবাধ অধিকার দিল।

সেদিন তাহার ষ্টুডিওতে প্রবেশ করিয়া আরন্ধিন
দেখিল, ট্রেভর একটা প্রকাণ্ড প্রমাণ আকারের ভিক্টোর
চিত্রে শেষতুলিকাপাত করিতেছে। অদূরে ঘরের এককোণে
একটি যক্ষের উপর একটি ভিক্টর দণ্ডায়মান। লরার এই
ভিক্টর উপর আপনার আধিপত্যের চিত্র রাখিয়া
গিয়াছে; মুখখানা কৌকড়ানো পার্চমেন্ট কাগজের মত
ক্যাকাশে ও রুক্ষ, পরণে একটা ছেড়া বরবরে বাদামি
রংয়ের আলখেল্লা—পায়ে এক ভোড়া জুতা, তাও শততালী
বিশিষ্ট। ভিক্টর এক হাতে একটা লাঠি, অপর হাতে
একটি টুপি ভিক্টর জন্ত প্রসারিত।

বন্ধুকে অভিবাদন করিয়া, বসিতে বসিতে আরন্ধিন
বলিল, “কি আশ্চর্য আদর্শ!”

উচ্চ হাস্তে ষ্টুডিও ঘর প্রতিধ্বনিত করিয়া ট্রেভর,
বলিল, “আশ্চর্য্যই বটে—এরকম ভিক্টর যখন তখন মেলে
না; আমার অদৃষ্ট আজ বড় ভাল। রেমব্রান্ট এরকম
একটা আদর্শ পেলে কি সুন্দর ছবিই না আঁকত।”

আরন্ধিন বলিল—“আহা বেচারীর সারা মুখখানার
ছুঁধের নিদারুণ কাহিনী ফুটে উঠছে। তুমি হয়ত
ভাবছ, যুগের ঐ ভাবটার জোরেই সে ছ’ পয়সা রোজগার
করে খায়!”

ট্রেভর বলিল, “তা আর বলতে! যদি তার মুখখানা
বেশ পরিপুষ্ট ও হাস্তোজ্জ্বল হয় তা’ হলে তার ভিক্টর
থাকে কোথায়?”

একটা ডাইভ্যান চেয়ারে আরাম করিয়া বসিয়া
আরন্ধিন জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার আদর্শের পারিশ্রমিক
কি?”

“যন্টায় এক শিলিং!”

“আর তুমি তোমার ছবিখানার জন্ত কত পাবে?”

“ওঃ সে অনেক! এই ছবিখানার জন্ত ছ’ হাজার!”

“পাউণ্ড!”

“গিনি, ঘিনি! কবি, চিত্রকর ও চিকিৎসক এরা
কেহ গিনির নীচে কথা ক’ন না, বুঝেছ?”

হাসিতে হাসিতে আরন্ধিন বলিল, “আমার মনে হয়
তোমাদের উপার্জনের কিছু অংশ এই আদর্শদের
দেওয়া উচিত। তারাও প্রায় তোমাদের সঙ্গে সমান
পরিশ্রম করে।”

“পাগল! একগাটি সমস্ত দিন ঘরের ভিতর বন্ধ
হয়ে কাপড়ে রংএর তুলি ঘসা কত সহজ ভাত জান না
আরন্ধিন! লোককে বলা খুব সহজ; কিন্তু আমাদেরও
এমন সময় আসে যখন ফুটে মজুরের মত খাটতে হয়।
যাক, আর বেশী বকিও না, আমার অনেক কাজ আছে,
নাও লক্ষ্য ছেলোটর মত চুপটি করে বসে বসে এই
সিগারেটটি খাও।”

ট্রেভর একমনে ছবি আঁকিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তৃত্য আসিয়া জানাইল ফ্রেমওয়ার্লা একবার ট্রেভরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়।

“এখনি আসছি আরন্ধিন, পালিয়ো না, বস” বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই অবসরে বুদ্ধ ভিখারী পশ্চাৎস্থিত একটি বেঞ্চ এক বার বসিয়া হাত পা একটু ছড়াইল। তাহার জরাজীর্ণ হৃর্ভিকপীড়িত মুখখানি দেখিয়া আরন্ধিনের মনে দয়ার উদয় হইল। সে এক বার হাত দিয়া পকেটস্থিত অর্থের পরিমাণ অনুমান করিয়া লইল। একটা স্বর্ণ ও গোটা কয়েক তাম্র মুদ্রা ছাড়া আর বিশেষ কিছু সেখানে পাওয়া গেল না।

আরন্ধিন মনে মনে ভাবিল, “আহা গেচারীর যেরূপ অভাব দেখিতেছি তাহাতে আমার অপেক্ষা উহার এ অর্থের প্রয়োজন বেশী; যদিও এইটুকু স্বার্থ ত্যাগের জন্য আমাকে পনেরো দিন পদব্রজে বেড়াইতে হইবে, গাড়ীর ভাড়া যোগাইতে পারিব না।” পরক্ষণেই সে উঠিয়া গিয়া বুদ্ধের হাতে স্বর্ণ মুদ্রাটি গুঁজিয়া দিল।

বুদ্ধ চমকিয়া উঠিল, তাহার ওষ্ঠদ্বয়ের ভিতর দিয়া হাসির একটা ক্ষীণ তরঙ্গ বহিয়া গেল। আশ্চর্যবরণ করিয়া সে বলিয়া উঠিল, “ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!”

এমন সময় ট্রেভর ফিরিয়া আসিল। আরন্ধিন নিজের এই আকস্মিক উদ্ধৃতিতে মনে মনে লজ্জিত হইয়া তাহার নিকট বিদায় লইয়া পলায়ন করিল।

সেদিন সমস্ত বেলাটা লরার সহিত একত্রে কাটিল, তাহার এইরূপ অযথা অমিতব্যয়িতার জন্য একটু মৃদু মধুর ভৎসনা লাভ করিল এবং অর্থাভাবে সন্ধ্যার পরে পদব্রজে আরন্ধিনকে গৃহে ফিরিতে হইল।

(৩)

তখন রাত্রি আন্দাজ ১১।০ টা। ফিরিবার পথে আরন্ধিন এক বার “প্যাালেট ক্লাবে” প্রবেশ করিল। ট্রেভর তখন ধূমপান করিতে একাকী বসিয়া কিছু পানীয় পান করিতেছিল। তাহার পার্শ্বস্থিত একখানা চেয়ারে

বসিয়া চুরুট ধরাইতে ধরাইতে আরন্ধিন বলিল, “কি এলেন, তোমার ছবি আঁকা শেষ হল?”

ট্রেভর বলিল, “আঁকা শেষ কি বল, বাঁধানো পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছে! হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি’ত বড় তরানক লোক হে! দেই যে ভিখারী, যাকে তুমি আজ সকালে আমার ঘরে দেখেছিলে, সে তোমাকে দেখে একেবারে ভুলে গিয়েছে! তুমি যাবার পর সে কেবলই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল—তুমি কে? কোথায় থাক? কি কর? তোমার--”

তাহাকে বাধা দিয়া, আরন্ধিন বলিয়া উঠিল, “তবেই হয়েছে! মিস্টর বাড়ী গিয়ে দেখবো, সে বেচারী কিছু পাবার আশায় দরজার কাছে বসে আছে। আহা তাকে দেখলে আমার বড় দয়া হয়; আমার দ্বারা তার যদি কোনও উপকার হয় তা হলে, আমি তা’ এখনি করতে প্রস্তুত! লোকের দুঃখ দারিত্র্য দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। হ্যাঁ, দেখ আমার অনেকগুলি পুরানো কাপড় পড়ে রয়েছে, তা’র কিছু হয়ত বেচারার কাছে লাগতে পারে। আহা তার পরণের ন্যাড়া খানা একেবারে ছিঁড়ে বল বল করছিল!”

উচ্চ হাস্য করিয়া ট্রেভর বলিল, “কিন্তু সেই ছেড়া শাকড়ায় তাকে কি সুন্দর দেখিয়েছিল! আমাকে’ত লক্ষ টাকা দিলেও, আমি তাকে ত্রক কোট পরিয়ে ছবি আঁকাবো না! তুমি যাকে ছেড়া শাকড়া বললে, আমার কাছে তার ভিতরেই সারা বিশ্বের সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। যাহোক তোমার এই পুরানো কাপড় দেবার প্রস্তাবের কথা তাকে আমি জানাবো।”

আরন্ধিন একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, “ছিঃ এলেন তোমরা—চিত্রকরেরা বড় হৃদয়হীন।”

ট্রেভর বলিল—“শিল্পীর মাথাই তাহার হৃদয়। আর কি জান, আমাদের কাজ হচ্ছে পৃথিবীকে তার ভাল, তার মন্দ, তার বর্তমানে যা দোষ গুণ আছে তাই নিয়ে দেখা, পৃথিবী কি রকম হওয়া উচিত, বা সকলে চেষ্টা করলে কি রকম হতে পারতো তা জানা নয়। যাক্

ওকথা; এখন তোমার লগা কেমন আছ বল দেখি? বুদ্ধ আদর্শটি ত খুব আগ্রহের সহিত সংবাদ নিচ্ছিল।”

আরক্তিনের মুখ লাল হইয়া উঠিল; সে বলিল, “সত্য সত্যই কি তুমি তার কাছে লগার গল্প করেছিলে?”

“নিশ্চয়ই! সে তোমার সুন্দরী লগা, একগুঁয়ে কর্ণেল, ও তার ১০,০০০ পাউণ্ডের ধনুর্ভঙ্গ পণের সকল কথাই জানে!”

ক্রোধে অধীর হইয়া আরক্তিন বলিল, “তুমি কি বলে আমার পারিবারিক রহস্য একটা বুদ্ধ ভিখারীকে বললে?”

ঈশ্বর হস্ত করিয়া ট্রেভর বলিল, “আহা! রাগ কর কেন? তুমি যাকে বুদ্ধ ভিখারী বলে জান, সে ইয়ো-রোপের এক জন সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী। সে যদি ইচ্ছা করে ত আজ এখনই সমস্ত লণ্ডন সহরটা কিনে ফেলতে পারে, ব্যাঙ্কে তার এত টাকা জমা আছে। ইয়ো-রোপের প্রত্যেক রাজধানীতে তার বাড়ী আছে, সোনার খালায় সে নিত্য ভোজন করে এবং তার এমন ক্ষমতা আছে যে, সে মনে করলে এখনি রাশিয়ার অন্ত সাম্রাজ্যের সহিত যুদ্ধোত্তম বন্ধ করতে পারে।”

আরক্তিন কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গেল; সবিস্ময়ে বলিল, “তার মানে?”

“ঠিক যা বললাম! আজ যে বুদ্ধটিকে আমার ঘরে দেখেছ, তাঁর নাম ব্যারন হান্সবার্গ! তিনি আমার এক জন বিশিষ্ট বন্ধু। আমার আঁকা প্রায় সব ছবিই তিনি কেনেন; আজ প্রায় মাস ধানেক হ’ল তিনি ভিখারী বেশে তার এক থানা ছবি আঁকতে আমাকে ভাষা দেন। কিন্তু, এ কথা স্বীকার করতেই হবে তাঁকে তাঁর সেই ছেড়া পোষাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল! তাঁর ছেড়া কাপড়ই বা বলি কেন? সেটা আমারই, সেবারে স্পেন থেকে আমি সেটা এনেছিলাম।”

“ব্যারন হান্সবার্গ (Baron Hansberg) ! বল কি? আমি যে সত্য সত্যই ভিখারী মনে করে তাকে একটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়েছি।” আরক্তিন আর বলিতে পারিল

না, হতাস হইয়া সে একটি আরাম চেয়ারে শুইয়া পড়িল।

উচ্চ হাস্য করিয়া ট্রেভর বলিল, “বল কি? তাঁকে একটা স্বর্ণ মুদ্রা দিয়েছিলে! বেশ; কিন্তু মনে থাকে, যেন সেটি আর ফিরে পাচ্ছ না।”

একটু অশ্রুযোগপূর্ণ স্বরে আরক্তিন বলিল, “কিন্তু এলেন, এ কথা তোমার আগে বলা উচিত ছিল; এরকম করে আমাকে বোকা বানানো তোমার উচিত হয়নি।”

ট্রেভর বলিল, “প্রথমতঃ, আমি স্বপ্নেও ভাবি নি তুমি আজকাল এই রকম করে পাত্ৰাপাত্ৰ বিবেচনা না করে হুহাতে দান করছো। যদি আমার ঠুঁড়িওতে কোনও সুন্দরী রমণী—আদর্শকে তুমি চুষন করতে তাহ’লে তার মানে বুঝা যেত, কিন্তু একটি কদাকার দরিদ্র ভিক্ষুকে দেখে তাকে একটি স্বর্ণ মুদ্রা দেওয়ার কোনও সদর্শই পাওয়া যায় না। তা’ছাড়া, আমি সে সময়ে বাহিরের কাহারও সহিত দেখা করতে প্রস্তুত ছিলাম না; তার পর তুমি যখন এলে, তখন, ‘হয়ত ব্যারন সেটা পছন্দ করবেন না, এই ভেবেই তাঁর পরিচয় তখন তোমাকে দিই নি; জানই’ত তখন তিনি কি রকম পোষাক পরেছিলেন।”

“ছি, ছি, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পাগল ভেবেছেন।”

“মোটাই না। তুমি চলে যাওয়ার পর তাঁর মেজাজটা ভারি সুন্দর ছিল। মনের আনন্দে তিনি থেকে থেকে কেবলই নিজের লীর্ণ হাত দুখানা রগড়াচ্ছিলেন। তখনো আমি বুঝতে পারি নি তোমার সম্বন্ধে ধোঁক নেবার তার এত আগ্রহ কেন? এখন বুঝতে পারছি। ভয় কি আরক্তিন—তিনি তোমার টাকাটি খাটিয়ে হ’মাস অন্তর ঠিক তোমার সুদটি পাঠিয়ে দিবেন, আর মাঝে মাঝে খাওয়া দাওয়ার পর বন্ধ বান্ধবের কাছে তোমার এই অসীম দয়া ও দানশীলতার আখ্যানটি বলে বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করবেন।”

হতাস হইয়া আরক্তিন বলিল, “থাক, কি করবো বল সবই অদৃষ্ট! কিন্তু এলেন এ সম্বন্ধে কাকেও কিছু

বলো না, লক্ষ্মীটি, বুঝেছ? ছি, ছি, জা হলে কাকেও আর মুখ দেখাতে পারবো না।”

“আরে পাগল, এতে আর লজ্জা কি? এতো তোমার দয়া প্রবৃত্তির পরিচায়ক মাত্র। আরে বলো, পালিয়ে না। এই, নাও আর একটা চুরুট খাও; ইয়া, তোমার লরার দু'টা'রটি খবর দাও?”

কিন্তু আরস্কিনকে কিছুতেই ধরিয়৷ রাখা গেল না। নিভান্ত অধঃসর হুদয়ে সে চলিয়া গেল; ট্রেডার বসিয়া বসিয়া আপন মনে হাসিতে লাগিল।

(৪)

পর দিন প্রভাতে প্রাতরাশের সময় জুতা আসিয়া তাহাকে একখানি কার্ড দিয়া গেল, তাহাতে লেখা—

“মিঃ গাষ্টেভ নডিন, (Gustave Naudin)

ব্যারণ হান্সবার্গের নিকট হইতে।”

শুভ্রলোকটিকে উপরে আনিতে বলিয়া আরস্কিন ভাবিল, “বোধ হয় ব্যারণের কাছে আমার ক্রমা প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করতে এসেছে?”

কণপরেই, এক জন পক্ষকেশ অশীতিপর বৃদ্ধ— তাহার চক্রে সোনার চশমা, কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটু ফরাসী উচ্চারণের সহিত বলিল,

“নমস্কার, বোধ হয় আপনার নামই মিঃ আরস্কিন?”

“আজ্ঞো, হাঁ।”

“আমি ব্যারণ হান্সবার্গের নিকট হইতে আসিতেছি; তিনি—”

তাহাকে বাধা দিয়া আরস্কিন শুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

“আপনি দয়া করিয়া ব্যারণ সাহেবকে জানাইবেন, আমার কল্যাকার ব্যবহারের জন্য আমি অত্যন্ত অনুরক্ত; তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বার্জনা করেন।”

বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিল, “ব্যারণ সাহেব আপনাকে এই পত্রখানি দেবার জন্য আমাকে আহ্বান করেছেন।” বৃদ্ধ একখানি লীলমোহর করা চিঠি আরস্কিনকে প্রদান করিল।

বিস্মিত হইয়া আরস্কিন দেখিল চিঠির বহিরাবরণের

উপর লেখা, “আরস্কিন ও লরা মার্টনের বিবাহোপলক্ষে প্রীতি উপহার—এক জনবৃদ্ধ ভিক্ষুক।” আর তিতরে ১০, ০০০ দশ হাজার পাউণ্ডের এক খানি চেক!

* * * * *

তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল; সে বিবাহে এলেন ট্রেডার মিস্ট-বর (bestman) হইলেন আর বিবাহের পরবর্তী আনন্দ ভোজে ব্যারণ সাহেব বর-কস্তাকে আশীর্বাদ করিয়া বক্তৃতা করিলেন।

উভয়ের বন্ধু চিত্রকর এলেন হাসিতে হাসিতে বলিল, “চিত্রকরের ক্রোরপতি আদর্শ সাধারণতঃ দুর্লভ, কিন্তু তাহারও অপেক্ষা সুদুর্লভ ব্যারণের মত আদর্শ ক্রোরপতি!”

শ্রীঅখ্যোঁর নাথ ঘোষ।

শ্মশানের পাশে

চুপ কর নছি! বরষা-চঞ্চল, যেয়ো না এমন নির্ভর হেসে,

এই তো শ্মশান, এখানে দাঁড়াও, ওই যে নিবান চিতার পাশে!

এখানের তার, মেঘজালে ঢাকা,—ব্যথাভরা তার মধুর দিটি,

কত আঁধি-জল, বন ফুল হয়ে, চিতারে ঘেরিয়া উঠেছে স্কুটি!

বুল্ বুল্ গাছে চুপ করে যায়,—মূলে ঝরি পড়ে বকুল রাশি,

ঘোমটা টানিয়া, পাণ্ডুর বদনে, চমকি দাঁড়ায় অমিয়-শশী।

চেউয়ের চুড়ায়, মুকুতা শুদ্ধ বাধিয়া, তটিনী : হাসিয়া যাও—

হৃথের মাঝারে যে পড়েছে ঘুমে, তার কাছে শুধু কথা না কও!

ভীর্ণরাজ সবে মিলেছে নীরবে, বন-ভর-ঘেরা
 অশান-বৃকে,—
 সুখ দুখ দৌছে মিলিয়া মরণে কাব্য মহান
 রেখেছে লিখে !
 সে কাব্যের মাঝে, কবিতা একটি, হৃদয় ভুলানো
 কাহিনী তার,
 লেখা আছে তার, কোন চাতকীর পিপাসা মেটে নি
 সাগর-পার !
 সেই তো কবিতা, যে ফুলের কুড়ি পায়না ফুটিতে
 শিশির-বাত্তে,—
 গন্ধ-লেখা বার, স্বপনে মিলায়, কুহেলিকুড়িত
 চাদিনি রাতে !
 হাসি তার ছিল পাণ্ডুর অতি, কণ্ঠ অশ্রু ভরা
 নয়ন কালো,
 প্রাণ সঁপি এক শঠের ছলায়, তবু তারে নারী
 বাসিত ভালো !
 চির বিদায়ের ছন্দে লেখা তারি পরিণামখানি
 অশান কুলে—
 শান্তি কহে, নদি ! কথা কও ধীরে, ঘুমটি তাহার
 ভেঙো না ভুলে !
 শ্রীমুরেশ চন্দ্র সিংহ শর্মা

বিদ্যালয়বিদ্যালয়ে অনুপ্রাস

বাগ্‌বাদিনী বীণাপাণি বিদ্যা-মন্দিরে বিরাজিতা
 দেবী; অতএব বিদ্যার আদান-প্রদান বা আধুনিক কালের
 ক্রয়বিক্রয়-বাণিজ্যব্যাপারে অনুপ্রাস অনাবাস্যতা
 হওয়াই উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাহিরে
 অনুপ্রাসের অব্যবহৃত অধিকার।

পাঠশালার পড়ুয়ার পাতভাড়াতে, বেতহাতে গুরু-
 মহাশয়ের ছেলে-লেখানতে, কাগের ছা বগের ছা বা হিজি-
 বিজি বা হিলিবিহি লেখায়, কোদালে ‘ক’এ, আঁকুরে
 ‘ক’এ, আনাপোনা ‘খ’এ, বেগুনবীচি ‘চ’এ, কঁকে

কলসী ‘ঝ’এ, হাড়গোড় ভাঙ্গা ‘দ’এ, পেটকাটা
 ‘ধ’এ, হলহলে ‘হ’এ, ‘ক’এ করাত ‘খ’এ খরগোস
 প্রভৃতি প্রাচীন কিংবদন্তিগণের প্রণালীতে, অনুপ্রাস
 গজ্ গজ্ করিতেছে। শিশুশিক্ষাকালে ‘অবুতবু
 (অবতবু বো) গিরিনুতা, মায়ে বলে পড় পুতা’ ‘লেখাপড়া
 করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে গেই’ ইত্যাদি শ্লোকবাক্যে
 অনুপ্রাসের খর নজর আছে। কালী কলম কাগজে, কালী
 কলম মনে, লালনোল পেনশিলে, ফাউন্টেন পেনে, অনু-
 প্রাসের আঁচড় আছে। না-প’ড়ে পণ্ডিতও অনুপ্রাসের
 খাতির রাখেন। ঠেকে শেখা ও দেখে শেখা—উভয়ই
 অনুপ্রাসের অন্তর্গত।

‘কমারখান’ কলেজ বা বাণিজ্যবিদ্যালয়ে, কৃষি-কলেজ,
 কারিগরি-কলেজ, বয়ন-বিদ্যালয়, বিজ্ঞান-বিদ্যালয়, হাতে-
 হেতেড়ে শিক্ষা, সারাস্স এসোসিয়েশন, কিংবদন্তিগণের
 কর্মসঙ্গীত, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, সাধারণশিক্ষা, শিশু-
 শিক্ষা, প্রতিযোগিতাপরীক্ষা, ব্রাহ্ম বয়েস্ বোর্ডিং, ডেফ্-
 এণ্ড ডব্লু স্কুল, প্রাইমারী বা প্রাথমিক পাঠশালা, কবীন্দ্র
 কলেজ, বাগানসী বেদ-বিদ্যালয়, বিশ্বদ্বানন্দ বিদ্যালয়—
 সকলই অনুপ্রাস। মেডিক্যাল কলেজের মাঝখানে অনু-
 প্রাস উঁকি মারিতেছেন, ক্যান্সেল হাঁসপাতাল, ত্রাশতাল
 কাউন্সিল ও মর্টন ইন্সটিটিউশনের পশ্চাতে অনুপ্রাস
 লাগিয়া আছেন। মাষ্টার মশায়, প্রাইভেট টিউটর,
 সেকালের জুনিয়র সিনিয়র স্কলার, হেয়ার-হিন্দু, হেয়ার
 স্কুলের পূর্বপরিচয় স্কুল-সোসাইটির স্কুল,—অনুপ্রাসই এ
 সকলের মূল। বড়দিনের বন্ধ, শেষ শনিবারে ছুটি, অনু-
 প্রাসের যোগাযোগে। এল্ এ ফেলের মাষ্টারী করিতে
 করিতে মোক্তারী পড়া অনুপ্রাসেরই অনুপ্রাণ।

স্ত্রীশিক্ষায়, বালিকা বিদ্যালয়ে, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যা-
 লয়ে, বীটুন বালিকা বিদ্যালয়ে, প্রথম প্রতিষ্ঠান প্যারীচরণ
 সরকারের বারাসত বালিকা-বিদ্যালয় ও চোর-বাগান
 বালিকা-বিদ্যালয়ে, মাতাজী মহারাজীর মহাকালী পাঠ-
 শালায়, ‘কল্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষণীয়ত্ববতঃ’, এই
 বুলমন্ডে অনুপ্রাসের শুভ অবসর রহিয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

সংস্কৃত শিক্ষায়, বিজ্ঞাবিনোদিনী সভায়, বঙ্গবিবুধ-জননী সভায়, বর্ধমান বিজয়কেন্দ্রে, আধ্যাত্মিক সমিতিতে, সংস্কৃতসঙ্গীত সমাজে, সংস্কৃত-সঙ্গীতবী সভায়, সংস্কৃত সমিতিতে, সন্মিলনী সভায়, সারস্বত সমিতিতে, সাবস্বত সন্মিলনে, সারস্বত সমাজে, সর্বত্র অল্পপ্রাস অল্পপ্রাস। টোল চৌপাঠের উপাধিতেও অল্পপ্রাসের উপরোধ উপেক্ষিত হয় না। যথা—কাব্যকণ্ঠ, তর্কতীর্থ, ভক্তিবৃক্ষ, ভাগবত ভূষণ, বাণীবিনোদ, বিজ্ঞাবাগীশ, বিজ্ঞাবাচস্পতি, বিজ্ঞাবিনোদ, বিজ্ঞাবিশারদ, বিদ্যবল্লভ, বেদবিদ্যাংবর, বেদান্তবাগীশ, বেদান্তবাচস্পতি বা চক্ৰ, বেদান্তরত্ন, সাংখ্যসাগর, সাহিত্যসরস্বতী, সিদ্ধান্তসাগর সিদ্ধান্তশিরোমণি—অল্পপ্রাস সকলেরই মাথার মণি। ফল কথা, স্মার্তশিরোমণিই বলুন আর বিজ্ঞানিগঞ্জই বলুন, মহামহোপাধ্যায়ই বলুন আর পোলিটিক্যাল পণ্ডিতই বলুন, কেহই অল্পপ্রাসের অতীত নহেন।

বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্পস ক্রিষ্টি কলেজ, সিডনি-সাসেক্স কলেজ, ক্রেয়ার কলেজ কেমব্রিজ, ট্রিনিটি টার্ন সমার সেমেটার (জার্মান), পিট প্রেস সিরিস, হোরেস হার্ট, ক্রেভন্ ক্যাসিক্যাল স্কলারশিপ, সিনিয়র রয়্যালার -সর্বত্রই অল্পপ্রাসের বাহার।

স্কুল কলেজের খেলাধুলার আমোদপ্রমোদেও অল্পপ্রাস উঁকিঝুঁকি মারেন। যথা—কলেজ ক্রিকেট ক্লাব, প্রেসিডেন্সী স্পোর্টস্, দীননাথ ও বঙ্কিমবিহারী সেন শীল্ড্ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অল্পপ্রাস জল্ জল্ করিতেছে। বালকবাসের বোর্ডিং ব্যবস্থায়ও অল্পপ্রাসের হাত আছে; যথা, হিন্দু-হোষ্টেল, ডান্ডাস্ হোষ্টেল।

মাধব বাবুর বাজারের ধারে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অল্পপ্রাসের হাট জমজমাট। শিক্ষা ও পরীক্ষা, বিধিব্যবস্থা, পরীক্ষা-পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র, প্রশংসা-পত্র, পদক প্রাইজ পারিতোষিক পুরস্কার, স্কুল-কলেজ, সেকসান, পেপার-সেটার, ল লেকচার, ট্যুট কোর্ট, রীডার, Rules & Regulations, Senate & Syndicate, Sub-

jects & Syllabus, Curriculum, Tabulator & Moderator, Keys Cribbs & Gram-books, Subscription & Donation, Fees & Fines, I. A., B. A., M. A., I. Sc, B. Sc., M. Sc., Ph. D, D. Sc, B. L., M. L., D. L., মাসুলি এল এল ইত্যাদি উপাধিধারী—সর্ব্ব ঘটে অল্পপ্রাস। General Geography, Mixed Mathematics, পুরাতন ব্যবহার Sanitary Science প্রভৃতি বিষয়নির্দেশেও অল্পপ্রাস। History & Economics এ অল্পপ্রাসের অভাব দেখিয়া হাল আইনে Economics & Politics এ ষোড় মিলান হইয়াছে। Entrance Examination বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্কুলের অল্পপ্রাস ছিল; নূতন নাম Matriculation Examination এও আছে, তবে পুঙ্খদেখে জবড়জব গায়েছে।

প্যাচিটি প্রাইজ, মতিলাল মল্লিক মেডাল, স্টিফেন ফিনি মেডাল, সংস্কৃতে পোনামণি মেডাল, মোহিনীমোহন মিত্র রৌপ্যপদক, এম্ বিতে ম্যাকলাউড্ মেডাল, ম্যাথ-ম্যাটিয়ে ম্যাককান্ মেডাল, এবং ছাত্রজীবনের সেরা সম্মান (blue ribbon) মাউয়াট মেডাল ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিতে অল্পপ্রাসেরই অল্পবৃত্তি। অল্পপ্রাস-প্রবণ ম্যাথ-ম্যাটিয়ে কৃতবিদ্য বাঙ্গালী দুই দুই জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে 'নমিনেশান' পাইয়াছেন, ইহাতেও অল্পপ্রাসের জয়জয়কার। অল্পপ্রাসের অল্পগ্রহে, প্রথম বাঙ্গালী প্রোফেসর প্রেসিডেন্সীতে প্যারীচরণ সরকার, প্রথম বাঙ্গালী কলেজ মেট্রপলিট্যান্ ইনস্টিটিউশ্যান্। সিটিকলেজ ও সেন্ট্রাল কলেজেও ইংরাজীতে অল্পপ্রাসের অল্পপ্রাস আছে। অল্পপ্রাসের অল্পরোধে বহরমপুর কলেজ কৃষ্ণনাথ কলেজ হইয়াছে, গৌহাটী কলেজ কটন কলেজ হইয়াছে, ও ময়মনসিংহে কলেজের নামে আনন্দ-মোহনের স্মৃতি সন্মানিত হইয়াছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় বয়োবৃদ্ধি ও পরিপ্রশ্ন-প্রযুক্ত পরীক্ষা-পাশে কৃতকার্যতা বা সম্মানে উত্তরণ অল্পপ্রাসের পোষক প্রমাণ নহে কি? অল্পপ্রাসের অল্পসারেই প্রথম বিভাগে পাশের পরিমাণ বাড়িয়াছে কি না (বিশেষতঃ

প্রবেশিকা পরীক্ষায়) কে জানে? বাড়াবাড়ি দেখিয়া পরীক্ষা-পাশে প্রতিভার পরিমাপ বা বিস্তার বহর বিচার হয় না। এই অজুহাতে কেহ কেহ পরীক্ষাপাশ পণ্ডিত ও উপাধি ব্যাধি বলিয়া তুচ্ছতাচ্ছল্য করেন। তাঁহা-দিগকে অল্পপ্রাণে অল্পরক্ত ভবভূতির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে,—

যে নাম কেচিদিহ ন : প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং

জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈব যতঃ ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভসাধনাকল্পে নবনিযুক্ত শিক্ষাসচিব ও সহকারী শিক্ষাসচিব অল্পপ্রাণের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছেন। সে যাহাই হউক, আমরা হীনপ্রাণ, হোমরা চোমরা সাহেব-সুবার ধার ধারি না। অশ্বদাদির অদৃষ্টের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা—অক্লান্তকৰ্ম্ম অঘর্ষনামা ডবল ডাক্তার সৰ্ব্বগিষ্ঠাবিশারদ বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ের সারসৰ্বস্ব স্তার ত্রিআশুতোষ সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি, ডি এল, ডি এস সি, এফ আর এ এস, এফ আর এস ই. ৭৭ রসা রোডে রহিয়াছেন। ইতি

বঙ্গবাসী কলেজ, }
কলিকাতা। } ত্রিললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

পূর্ববঙ্গে মগ ও ফিরিজি দস্যু (১)

সোনার বাঙ্গলার এ সুখৈর্ষ্য ও সমৃদ্ধি গৌরবের কথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইয়ুরোপ খণ্ডে প্রবাদের মত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই নীলাম্বুতরঙ্গবিধ্বংস করিয়া পর্তুগীজ বাণিজ্য-তরুণি এদেশে আগমন করে। তৎকালে সুদূর ভারতে আগমন করিতে কত বীরহৃদয়ই না কলিত হইত। কিন্তু অদৃষ্টেনমীর আশ্চর্য্য আবর্তনে মুষ্টিমের পর্তুগীজ বাণিজ্যব্যপদেশে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া যে ভীষণ অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিলেও শরীর আতঙ্কে কণ্টকাকীর্ণ হয়। খ্রীষ্টীয়

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পর্তুগীজ ও আরাকানবাসী মগ এই দুইটি বিদেশীয় জাতি দ্বারা পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বড়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা কখনও সম্মিলিত ভাবে এবং কখনও বানানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পূর্বদক্ষিণ বঙ্গকে একরূপ জনহীন করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের অত্যাচার সে সময়ে কিরূপ ভীষণ ও বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছিল, তৎসাময়িক গ্রন্থাদিতেও তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবিকণ্ঠহার প্রণীত সৈন্য কুল-পঞ্জিকা গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে :—

“মহেশ সেনজাতন্তু গোপীনাথং স্মৃতো হতবৎ ।

চাটীগ্রাম মসৌ নৌতো বলান্নগচমুচরৈঃ” ॥

অর্থাৎ, মহেশ সেনের জামাতা গোপীনাথের একমাত্র পুত্রকে মগেরা বলপূর্বক চট্টগ্রামে ধরিয়া লইয়া যায়। তাহাতেই এই বংশ একেবারে বিলুপ্ত হয়।

এই নরপিশাচ দস্যুগণ যে কেবল বঙ্গোপসাগরের উপকূল বিভাগেই আতঙ্করূপ হইয়াছিল তাহা নহে; উন্মুক্ত নৌকায় আরোহণ পূর্বক উহারা পদ্মা, মেঘনাদ, কালীগঙ্গা ও তাহাদের খাড়ির মধ্যে পরিক্রমণ করিয়া জন-সাধারণের যথা সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নিত। “বানিয়াবের ত্রমণ বৃত্তান্ত” ও ডানভারের “পর্তুগীজ ইতিহাস” নামক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উহাদের অধিকাংশই নানারূপ কুক্রিয়াসক্ত ও পাপামুগ্ধান-পরায়ণ হওয়ার গোয়া, সিংহল, কোচিন, মালক্ক ও পুর্কোপদ্বীপের পর্তুগীজ উপনিবেশ হইতে বিতাড়িত হয়। যাহারা দস্যু ও বদমায়েস তাহারা বঙ্গদেশে আসিয়া দলবদ্ধ হইত। চৌর্য্য ও দস্যুস্বত্তিই উহাদের প্রধান সম্বল ছিল। নৌচালন-বিদ্যায় পারদর্শী থাকায়, ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ করিয়া উহারা বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে এবং কখনও কখনও মেঘনাদ, পদ্মা প্রভৃতি নদীতে প্রবেশ করিয়া তীরবর্ত্তী স্থানগুলি লুণ্ঠন করিত। জীপু-ব-দিগকে ধরিয়া কতক বিক্রয় করিত, অবশিষ্ট দাস ভাবে রাখিয়া দিত। অল্পম বৃদ্ধদিগকে অসহনীয় নির্ধ্যাতন করিয়া ছাড়িয়া দিত, যুবক ও প্রৌঢ়গণকে লইয়া দাস

রূপে বিক্রয় করিত, অথবা স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইত। হাট বসিবার দিনে, বিবাহ দিবসে অথবা অল্প কোনও পক্ষোপলক্ষে যখনই লোক-সমাগম হইত, তখন তাহার। অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া সমবেত জনসংঘের উপর পতিত হইত, এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়া অথবা বন্দী করিয়া লুণ্ঠনকার্য্য সমাধা করিত। ইহাদের নৈতিক অধঃপতন একরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল যে, সমগ্র ভারতের পৰ্তুগীজ উপনিবেশ অন্বেষণ করিলেও একখানা বাইবেল পাওয়া যাইত না। ফলতঃ ইহাদের অমানুষিক অত্যাচারে বহু জনপদ ভাঙ্গা ও লোকহীন হইয়া শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সমুদ্র-তীরস্থ অধিকাংশ অধিবাসীরাই হিন্দু ছিল এবং সুন্দরবন অঞ্চলে বহুজনাকীর্ণ জনপদসকল বর্তমান ছিল। প্রাচীন পৰ্তুগীজগণের আকৃতি মানচিত্রে সুন্দরবনের অনেক সমৃদ্ধিশালী নগরের নাম পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু বর্তমান সময়ে ঐ সমুদয় স্থান ভীষণ অরণ্যানী-সঙ্কুল হিংস্র জন্তুর আবাস-স্থানরূপে পরিণত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কোনওরূপ সংক্রামক রোগের প্রকোপে অথবা অল্প কোনও দুর্ঘটনায় ঐ সমুদয় স্থানের অধিবাসিবৃন্দ স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রবল বন্যায় প্রায় দুই লক্ষাধিক লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। তৎপরে দুর্ভাগ্যের সহচর মহামারীতেও বহুলোক কাল-কবলিত হওয়ায় জনহীনতার মাত্রা বৃদ্ধি হয়। মিঃ গ্রান্ট উল্লিখিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন,— “এই সকল কারণে, বিশেষতঃ পরিশেষে মগ ও পৰ্তুগীজ-দিগের উৎপাতেই সমুদ্রতীর জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল; সম্ভবতঃ শেষোক্ত কারণটি প্রথমটির অপেক্ষা প্রবল।” মেজর রেণেলের বাঙ্গলার মানচিত্রে অনেকগুলি জেলা “মগদিগের অত্যাচারে জনহীন হইয়া পড়িয়াছে” বলিয়া চিহ্নিত আছে।

তৎসময়ে মগদিগকে একরূপ নর-পিণ্ডাচ বলিয়া সাধারণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন

পক্ষীতে প্রবেশ করিলেই তত্ৰত্য অধিবাসিগণ আতঙ্কিত হইয়া বিবেচিত হইত। পূর্ববঙ্গে এইরূপ মগে-তিলি, মগে-কামার, মগে-কুমার প্রভৃতি বর্তমান আছে, তাহারা অল্প সম্প্রদায়ের সহিত মিশিতে পারে না। পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে “দুর্ঘা দোখালি” প্রাচীন পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মগাই পুকুর বলিয়া পরিচিত। (১)

মোগল কুলতিলক আকবর বাদশাহের সময়েই এই উপদ্রবের প্রথম সূত্রপাত হয়; একজ্ঞ তিনি সাহাবাজ নামক এক জন সুদক্ষ সেনাপতিকে এই দস্যুদলন-ব্যপদেশে পূর্ববঙ্গে প্রেরণ করেন। সাহাবাজ ষাঁ মেঘনাদের মোহানায় সেনা সন্নিবেশ করিয়া স্বীয় নামানুসারে ঐ স্থানকে সাহাবাজপুর আখ্যা প্রদান করেন। সাহাবাজ ১৫৮৫ খ্রীঃ হইতে ১৫৮৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ত্রুতী থাকিয়া মগ ও পৰ্তুগীজদিগের প্রভাব অনেক পরিমাণে তিরোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সম্বীপের আধিপত্য লইয়া ত্রিপুরারাজ, আরাকান-রাজ, পৰ্তুগীজ, মোগল এবং কেদার রায়ের সঙ্গে সর্বদা সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। এই সময়ে পৰ্তুগীজগণ সম্বীপে আপনাদিগের নিজস্ব বৈজয়ন্তী প্রোধিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ত্রিপুরাধিপতি বীরাগ্রগণ্য কেদার রায়ের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পৰ্তুগীজেরা তাহাকেই সম্বীপের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করে। কেদার রায় পৰ্তুগীজদিগকে হস্তগত করিবার জন্য সম্বীপের শাসনভার কার্তালোর হস্তে অর্পণ করেন।

এই সময়ে মোগলগণের লুলোপ দৃষ্টি সম্বীপের উপর নিপতিত হইল। মোগলেরা অসংখ্য রণতরী সহ সম্বীপের চারিদিক বেষ্টন করিয়া ফেলে। কার্তালো অবরুদ্ধ হইবার পূর্বে চট্টগ্রামের পৰ্তুগীজ সেনাপতি ইমানুয়েল মাটুসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মাটুস চারি শত সেনা লইয়া সম্বীপে উপনীত হন। ফিরিকী ও

(১) আমাদের বিবেচনার এই সমুদয় বীর্ণিকা মোগলদল আমলে খনিত হইয়াছিল, পরে মগদিগের সংশ্রব হেতু মগাই পুকুর বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠে।

মোগলের জল-যুদ্ধে বঙ্গোপসাগর আন্দোলিত হইয়া উঠিল। মোগলগণ অধিতবিক্রমে যুদ্ধ করিল বটে কিন্তু ফিরিঙ্গির গোলায় নিকটে তাহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। ফলে, তাহারা অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সম্বীপ কার্ডালো ও মাটুসের হস্তে পরিত্যক্ত হইল।

এই সময়ে সেলিম সা আরাকানের সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। অনেক পর্তুগীজ তাহার অধীনে অবস্থিতি করিত, কিন্তু ক্রমে তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করে। উহাদের মধ্যে ফিলিপ ডি ব্রিটো প্রধান। বঙ্গোপসাগরে পর্তুগীজ-প্রাধান্য বিস্তৃত হইতেছে দেখিয়া সেলিম সা তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দেড় শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী ও কামান-সজ্জিত বৃহৎ রণতরী সম্বীপে প্রেরণ করিলেন। কার্ডালো এই সংবাদ কেদার রায়ের নিকট পাঠাইলে, তিনি স্বীয় এক শত কামান ও বন্দুক সজ্জিত “কোবা” নৌকা তাহার সাহায্যার্থ ত্রিপুর হইতে সম্বীপে প্রেরণ করিলেন। বাঙ্গালীর পরিচালিত সেই নৌ-বাহিনী পদ্মা ও মেঘনাদের উত্তালতরঙ্গ বিক্ষুব্ধ করিয়া সম্বীপে উপনীত হইল। বাঙ্গালী ও পর্তুগীজের সহিত মগদিগের ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বন্দুক ও কামানের গর্জনে নীলাম্বুরাশি মুহূর্ত্তে কল্পিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গি অল্পত বীরত্ব দেখাইল। মগেরা অবশেষে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল। তাহাদের ১৪৯ খানি রণতরী কার্ডালোর হস্তে পরিত্যক্ত হইল।

যে সময়ে কার্ডালোর সহিত সেলিম সার সৈন্যগণের জলযুদ্ধ হইতেছিল, ব্রিটো সেই অবসরে আরাকানরাজের অধিকারস্থ পেশুর সাইরাম বন্দর অধিকার করিয়া বসে। সেলিম সা পর্তুগীজদিগের এরূপ ব্যবহারে ক্রোধাক্ত হইয়া সম্বীপ অধিকারের জন্য পুনর্বার এক সহস্র রণতরী প্রেরণ করিলেন। রণতরী-সমূহ তোপধ্বনি করিতে করিতে বঙ্গোপসাগরের উত্তীর্ণালা চূষন করিয়া সম্বীপে

উপনীত হইল। কার্ডালো তাহাদিগের সম্ভাবনার জন্য পূর্বাভূই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি স্বীয় পর্তুগীজ সৈন্য ও কেদার রায়ের প্রেরিত বাঙ্গালী সৈন্যদ্বয়কে আপন আপন রণতরীতে সজ্জিত করিয়া বিপুল উত্তমে সেই বিরাট নৌ-বাহিনীর সহিত অগ্নিক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাহাদের রণকৌশলে মগদিগের রণতরী সমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। কতকগুলি বঙ্গোপসাগরের নীলাম্বুরাশি মধ্যে সলিলশায়ী হইল, কতকগুলি কাষান ও বন্দুকের গোলায় দগ্ধ হইয়া গেল, অবশিষ্টগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এই ভীষণ জলযুদ্ধে মগদিগের প্রায় দুই সহস্র সেনা হত ও ১৩০ খানি রণতরী দগ্ধ হইয়া যায়।

কার্ডালো এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তাহার রণতরী সমূহের কতক ভগ্ন ও কতক নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তিনি আবার নৌ-নহর গঠনের জন্য ত্রিপুরে আগমন করেন। ত্রিপুর, বাকসা, ও সাগর ঘাটে তাহার রণতরী-সমূহের সংস্কার ও নূতন রণতরীর নির্মাণ হইতে লাগিল।

বারভূঞাগণের সহিত বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মনো-মালিন্য সংঘটিত হওয়ার মগ ও পর্তুগীজগণ প্রশ্রয় পাইয়া পুনরায় সমুদ্রতীরে উৎপাত আরম্ভ করে। এই সময়ে ঢাকাতে রাজধানী সংস্থাপিত হইলেও উহাদের অভিযাত্র-স্রোত প্রশমিত হইয়াছিল না। সময়কূণল ইসলাম খাঁ সম্বীপের যুদ্ধে আরাকান ও মগদিগের সম্মিলিত শক্তি বিধ্বস্ত করিলেও উহারা তৎপরবর্তী শাসনকর্ত্তা কাসেম খাঁর সময়ে মোগলশাসিত বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে থাকে। নবাব ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ ও মগদিগের উপদ্রব হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারেন নাই। “উহাদের অভিযাত্রার কবল হইতে ঢাকা নগরকে রক্ষা করিতে পারিলেই শত্রুর সুবাদারের কর্তব্য শেষ হইত বলিয়া তাহারা মনে করিতেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকার নানাটিকে লোহশৃঙ্খলিত করিয়া বংশ নির্মিত সেতু দ্বারা উহাদের আগমন পথ আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত।”

“নদরায় ব্রহ্মপুত্রের যে শাখা শিতলক্ষ্যা নামে

অভিহিত হইয়া খিজিরপুরের পানদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, মগ দস্যুগণ বর্ষাপ্রভাতে ঐ পথ দিয়াই ঢাকা নগরীর দিকে অগ্রসর হইত। বাঙ্গলার সুবাদার উহাদের আগমন বার্তা শ্রবণ করিলেই খিজিরপুরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিতেন। শীত ঋতুর শেষে ব্রহ্মপুত্রের স্থানে স্থানে কালক্রমে শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় উহারা এই পথে ঢাকাতে আসিতে পারিত না। সুতরাং তাহারা ফরিদপুর ও যাত্রাপুরের পথ দিয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ লাভ করিত।”

✓“চট্টগ্রাম হইতে দক্ষিণ দিকে ভুলুয়া ও বাম দিকে সম্মুখী রাখিয়া উহারা একেবারে সংগ্রামগড়ে উপনীত হইত।” ফরিদপুরের ইতিহাস ও বিভারিঞ্জের বাথর গঞ্জের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, সাহাবাদপুর পরগণার অন্তর্গত গাকিয়া গ্রামের অনতিদূরে ইলিসা নদীতীরে সংগ্রামগড় বর্তমান ছিল। এই স্থানটি মেহেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত। সংগ্রামসাহ মগদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ এই স্থানে একটি কেল্লা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে নৌ-বহর সংস্থাপন করিলে মগ ও পর্তুগীজ দস্যুগণের বঙ্গদেশে প্রবেশের পথ একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, এই উদ্দেশ্যেই এই স্থানে দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। নবাব সারোজা খাঁ চট্টগ্রাম জয় কালে এই স্থানে প্রায় শতাধিক রণতরীর বহর রাখিয়াছিলেন।”

বঙ্গদেশে মোগল পতাকা প্রোথিত হইবার পরে মগেরা বিপুল বিক্রমে তিন বার বঙ্গদেশ আক্রমণ করে,* (১) মহম্মদ খাঁর পুত্র নবাব খানজাদ খাঁর

সুবাদারী আমলে মগেরা ঢাকা নগরী পর্যন্ত আগমন করিয়াছিল। মগী নৈশ্বেয় তাণ্ডব নৃত্যে ঢাকা সহর টলটলমান হয়। উহারা নগর ভ্রমসাৎ করিয়া ধনরাশি লুণ্ঠন ও আবালবৃদ্ধ নির্মিশেষে বহুলোক বন্দী করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশে চলিয়া যায়। (২) নবাব আবদাস সালামের (ইসলাম খাঁ মেসেদী) সময়ে আরাকানরাজ সেলিম সার মৃত্যু ঘটে। সেলিম সার জনৈক কর্মচারীর পুত্র এই সময়ে পরাক্রান্ত হইয়া রাজ সিংহাসন অধিকার করে। মৃত আরাকানরাজ সেলিম সার ভ্রাতা ধর্ম সা ১২টি হস্তী এবং তদীয় পরিবারবর্গ ও চারি পাঁচ সহস্র অশ্বচরবর্গ সহ ভুলুয়ায় মোগল ফৌজদারের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাকে নবাব ইসলাম খাঁ মেসেদীর নিকট স্থলপথে ঢাকা নগরীতে প্রেরণ করেন। ভুলুয়াতে স্থান প্রদান করিতে মোগল ফৌজের সাহসে কুলাইল না।

প্রতিপালক প্রভুর রাজ্যাপহারক দস্যু ধর্ম সাহর উদ্দেশ্যে আরাকান নৌবাহিনী প্রেরণ করিল। তাহারা খিজিরপুরে উপনীত হইলে ধর্ম সা প্রাণে প্রাণে লক্ষ্য নদী উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা নগরীতে আসিয়া পৌঁছিল। এই সময়ে ইসলাম খাঁ অধিকাংশ রণপোত ও মোগল সৈন্য আসাম অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং মগদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি “নল খাগরা এবং বংশ খণ্ড দ্বারা ঢাকার নালার (বুড়িগঙ্গার) নানা স্থানে সেতু নির্মাণ করিয়া মগ-বাহিনীর গতিরোধের চেষ্টা করেন। মহালক্ষ্মী খাঁ দরয়াবাদীকে বহু সৈন্য সহ ধাপাতে মগদিগের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রেরণ করেন। ধর্ম সা ঢাকা নগরীতে পৌঁছিয়াছে শ্রবণ করিয়া মগেরা খিজিরপুরে এক দিন অপেক্ষা করিয়া নিকটবর্তী একটি বৃক্ষের শাখায় নবাবের উদ্দেশ্যে একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া যায়। তাহাতে লিখিত ছিল, “আমাদের রাজ্যের পলাতককে ধৃত করিবার জন্যই আমাদেয়

* প্রবাদ এই যে, নবাব খানজাদ খাঁ এইরূপ ভীষণভাবে ছিলেন যে, তিনি মগের ভয়ে ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতে সাহস করিতেন না। মোস্তা মুরসিদ ও হাকিম হারদরকে ঢাকার তদীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তিনি রাজবহলে অবস্থান করিতেন। মগেরা সৈন্যে ঢাকাতে আগমন করিলে প্রতিনিধির মগর হইতে নিরস্ত হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া মগেরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দিন ডালিস রহস্যজ্ঞানে লিখিয়াছেন, “মগের সহিত যুদ্ধ করা মোস্তা হাকিমের কর্তব্য নয়।”

রাজা আদেশ করিয়াছিলেন। যোগল সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করা অথবা যোগল-শাসিত স্থান উপক্রম করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ঢাকা নগরীতে উপনীত হইয়া যুদ্ধ করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং আমরা রাজার অমুখতির অপেক্ষায় স্বীয় রাজ্যে প্রস্থান করিলাম। যদি তিনি যুদ্ধ করাই সমীচীন জ্ঞান করিয়া অমুখতি প্রদান করেন, তবে আমরা আগামী বৎসরে আসিয়া তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিব।”

অনতিকাল পরে ইসলাম খাঁ দেওয়ানী পদ লাভ করিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করায় ধরম সার সাহায্য করিতে পারেন নাই। ধরম সা ও তদীয় অমুচরদিগকে “মগবাজারে” প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। ক্রমে মগদিগের নামানুসারে এই স্থানের নাম “মগবাজার” বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠে। ধরম সার ভরণপোষণ জন্য খালসা জমী হইতে দৈনিক রুতির বন্দোবস্ত ছিল। ধরম সার মৃত্যুর পরে তদীয় তিন পুত্র যোগল সরকারে চাকুরীজীবী হইয়া প্রবেশ লাভ করে। (৩) সুলতান সুলতা ঔরংজেব কর্তৃক পরাজিত হইয়া ঢাকা নগরীতে আগমন করিলে, তদীয় পুত্র জৈনউদ্দিন মোহাম্মদ আরাকানরাজের সাহায্যার্থী হন। আরাকানরাজ সুলতান সুলতার সাহায্যার্থ তিন শত রণতরী ঢাকাতে প্রেরণ করেন। জমিদার মানোয়ার খাঁ সুলতার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন বলিয়া, উহার মানোয়ার খাঁর সহিতই যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। এবারে তাহারা ঢাকা নগরীতে কোনও প্রকার উৎপাত করে নাই। ঢাকা ছাড়াইয়া ৪৫ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া আরাকান নৌ-বহর ঢাকাতে প্রত্যাবর্তন করে, এবং পরাজিত সুলতাকে তদীয় পরিবারবর্গ সহ আরাকান রাজ্যে লইয়া যায়।

আসাম অভিযানের প্রাক্কালে নবাব মীরজুমলা হাজিগঞ্জ, বন্দর ও ইটাকপুরের (মুলীগঞ্জ) কেল্লা নির্মাণ করেন। মগ ও পর্তুগীজ দস্যুগণের অভ্যুত্থার হইতে বেশ রক্ষা করিবার জন্যই তিনি এই কয়টি দুর্গ নির্মাণ

করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি নওয়ারার সংকার সাধন করলে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই তিন স্থানে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়াছিলেন।

মীরজুমলার আসাম অবস্থান কালে এহিতিসিম খাঁ তদীয় প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকাতে অবস্থান করিতেছিলেন। শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে এহিতিসিম খাঁই সর্কেসর্কা ছিলেন। রায় ভগবতী দাসের প্রতি রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। এহিতিসিমের পালকপুত্র সয়রাবেগ সর্দার (নওয়ারার সর্দার) পদে নিযুক্ত থাকিয়া ত্রীপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। মগ দস্যুগণ মীরজুমলার অমুপস্থিতির সুযোগে পুনরায় বিক্রমপুর ও যাত্রাপুর প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে, এবং এহিতিসিমের পালকপুত্রকে বন্দী করিয়া নাজিরপুর অভিযুখে প্রস্থান করে।

খিজিরপুরের জৈশা খাঁ মসনদ আলীর অনন্তরবংশ মানোয়ার খাঁ, সাহসুল্লা, মীরজুমলা ও সায়েস্তা খাঁর সময়ে সয়রাবের সর্দার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অসৌখ সাহসী ও নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে তিনি মগদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য কতিপয় রণতরী সহ বাগদিয়া নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মীরজুমলার আসাম অভিযানের ফলে বাঙ্গলার নওয়ারা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, সুতরাং মগেরা অতি সহজেই মানোয়ার খাঁকে পরাজিত করতঃ মোণারগাঁও ও বিক্রমপুরে প্রবেশ লাভ করিয়া বিনা বাধায় অনেক স্থান লুণ্ঠন করিতে থাকে।

মীরজুমলার মৃত্যুর পরে নবাব সায়েস্তা খাঁর পুত্র আকিদাদ খাঁ ঢাকার ফৌজদারপদে বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি নওয়ারার সর্দার মীরাক সুলতান ও ফরহাদ খাঁকে ঢাকার সন্নিকট ষাণাতে (১) নৌবহর সহ প্রেরণ করেন,

(১) রেণেলের ম্যাপে এই স্থান “দাণেকা কেল্লা” বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। মিঃ পিটারসনের রিপোর্টে এই স্থানের বিপরীত দিকে বুড়ীগঙ্গার অপর তীরেও একটি দুর্গ ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ স্থান এক্ষণে বুড়ীগঙ্গার মুক্তিগত হইয়াছে। বর্তমান কতুরার সন্নিকটেই ষাপার কেল্লা অবস্থিত ছিল।

এবং এহিতসিম থাকে ষিজিরপুর ও রাজা ইলমুনকে ইজাকপুরের কেলা বক্ষার্ণে নিযুক্ত করেন। ত্রীপুরে ধানাদারের সাহায্যার্থে মহম্মদবেগ আকাশকে কতিপয় রণতরী সহ তথায় প্রেরণ করেন।

এই সময়ে সেধ জিয়াউদ্দিন ইউসুফ লড়িকুল বন্দরের দারোগা পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। লড়িকুল বন্দরে পর্তুগীজ-গণ কুঠী নির্মাণ করিয়া লবণের ব্যবসা করিতেছিল। দক্ষিণ বিক্রমপুর মধ্যে আকারিয়া ও লড়িকুল পর্তুগীজ-গণের প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। এখানে পর্তুগীজগণের কয়েকখানা রণতরী সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। বর্তমান সময়েও দক্ষিণ বিক্রমপুরে পর্তুগীজ প্রাধাত্যের চিহ্ন স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হয়। মোজে কোয়রপুরের নিকটে হাওলা গঙ্গাঙ্গেস বলিয়া যে একটি প্রাচীন জমার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা পর্তুগীজ বীর সিবাণ্ডিয়ান গঙ্গাঙ্গেসের নামানুসারেই হইয়া থাকিবে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। মূলফং গঞ্জের ১ মাইল পশ্চিমে নড়িয়া গ্রামে দর্ভা দিখী-(Da Artus tank) তথাকার পর্তুগীজ প্রাধাত্যের শেষ চিহ্ন স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে। আসাম অভিযানে আবুল হোসেন নৌযুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন বলিয়া তাঁহাকে দেড় শত (রণতরীর) সয়রাবের সর্দার নিযুক্ত করিয়া ত্রীপুরে প্রেরণ করা হয়। এই সময়ে মগেরা ফরিদপুরের পথ হইয়া লড়িকুলের সমীপবর্তী হইলে আবুল হোসেন দেড় শত নৌবহর সহ উহাদিগকে আক্রমণ করেন। সংবাদ পাইয়া ষিজিরপুর হইতে মহম্মদ বেগ অবকানও আবুল হোসেনের সাহায্যার্থ আগমন করেন। যোগলের দুর্জয় কামান মেঘমল্লের গর্জন করিয়া অগ্নিময় গোলক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই অস্ত্রত যুদ্ধে কালী-গঙ্গার তরঙ্গ শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। রণপোতগুলি সেই তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া নাচিতে লাগিল। এই ভীষণ রণযজ্ঞে অনেক মগবীর জীবনাহুতি প্রদান করিল। ফলে মগেরা বিক্রমপুর অঞ্চল হইতে একেবারে বিতাড়িত হইল।

নবাব সায়েস্তা খাঁ মগদিগকে দমন করিবার জন্য নিম্ন-লিখিত রূপে নওয়ারা গঠন করিয়াছিলেন :—

কোম, জলবা, ড্রাব, পারেন্দা, বজরা, পাতেলা, সলব, পানে, বহর, বালাম, খাটকুড়ি, মহাল কুড়ি, পালওয়ার। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গীও সঙ্গে থাকিত। এই সমুদয় তরঙ্গী দৈর্ঘ্যে ৭০ হইতে ১৫০ হাত পর্যন্ত হইত। খাটকুড়ি ও মহালকুড়ি, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি বহন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। বালাম, বজরা, পালেন ও বহর প্রভৃতি তরঙ্গীতে রসদ-পত্র ও গোলাবারুদাদি থাকিত। পারেন্দা ও সলব শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিত; বলা বাহুল্য যে, এই শ্রেণীর নৌকাগুলি খুব ক্ষুদ্র-গামী ছিল। সলবের আকার কতকটা আধুনিক খোন্দা নৌকার মত এবং পারেন্দা ছিপ নৌকার আকার ছিল। কোম, জলবা, ড্রাব ও পাতেলা সুধু যুদ্ধ সময়েই ব্যবহৃত হইত। ড্রাব নৌকা গলুই এত দীর্ঘ ও উচ্চাকারে নির্মিত হইত যে, নদীগর্ভ হইতে উহা তীরস্থিত দুর্গ প্রকোরে স্পর্শ করিতে পারিত, সুতরাং নৌকা হইতেই একেবারে সৈন্যগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইত।

সায়েস্তা খাঁ নবাবী পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ রাজ-মহলে আসিয়া উপনীত হন। তথা হইতে ঢাকা অভিযুগে রওনা হইয়া লাক্ষরা হাটীতে উপনীত হইলেন এবং ফরিদ-পুরের পথে বাঃবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঢাকা যাইবার উহাই একমাত্র সোজা পথ। কানকের পথে যাইতে হইলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু তদীয় কর্মচারী-বর্গ ফরিদপুরের পথ মগদিগের অত্যাচারের লীলাভূমি এবং বিপদময় বলিয়া তাহাকে এই পথে যাইতে নিরস্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাওয়াছিল। কিন্তু সায়েস্তা খাঁ শত্রুর ভয়ে ভীত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ষিজির-পুর ও যাত্রাপুর হইয়া এই পথে আসিতে আসিতে কি প্রকারে মগদিগকে দমন করিবেন তাহার উপায় উদ্ভাবন করেন। ঢাকায় পৌঁছিয়া তিনি লড়িকুলের দারোগা জিয়াউদ্দিন ইউসুফের নিকট আদেশ প্রেরণ করিলেন যে, লড়িকুলের ফরিদগণ যেন তাহাদের চট্টি-

গ্রামের আশ্রয় স্বজনের নিকট এই বলিয়া চিঠি লিখিয়া দেন যে, যদি ফিরিজিগণ মূর্তন হুজি পরিত্যাগ করিয়া নবাবের অধীনে চাকুরী স্বীকার করে তবে তাহারা বখেটে রূপে পুরস্কৃত হইবে। জোয়াউদ্দিনের যত্নে সায়েস্তা খাঁর এই উত্তম ফলবতী হইয়াছিল। ফলে চাটিগাঁ অধিকার কালে অনেক ফিরিজি সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে যোগ দান করিয়া মগদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম প্রদেশে যোগল পতাকা প্রোথিত করিয়া তথাকার কতিপয় ফিরিজি যোদ্ধাকে ঢাকাতে আনয়ন করেন, এবং তাহাদিগকে ফিরিজিবাজারে জারগীর দিয়া স্থাপন করেন। এখনও ফিরিজিবাজারে পর্তুগীজগণের বংশধরগণ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। উহারা ক্যাথলিক খৃষ্টান, ইহাদের সঙ্গে বর্তমান দেশীয় কৃষকগণের কোনই পার্থক্য নাই। মগবন্দোদিগকে তিনি মগবাজারে স্থান প্রদান করিয়াছিলেন।

এইরূপে নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে মগ ও ফিরিজির অত্যাচার নিবারিত হয়, এবং পূর্ববঙ্গবাসী জনগণ প্রায় শতাধিক বৎসর পরে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কালক্রমে পর্তুগীজ দস্যুগণের অনন্তরবংশীয়গণ ইংরেজ রাজের অধীনে গোলন্দাজ সৈনিকের অথবা গার্ডিয় ভূত্যের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। কেহ কেহ বাঙ্গালীর সহিত মিশিয়া কবির দল বাধিয়া সুনিপুণ বেহালা বাদকরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

পেরারা, কামরাজা, চীনাবাদাম প্রভৃতি অনেক দক্ষিণ আমেরিকার ফল সম্ভবতঃ পর্তুগীজেরাই সর্ব-

প্রথম এদেশে আনয়ন করে। পর্তুগীজেরা বড়ই উদ্ভানপ্রিয় ছিল। স্বর্ধামুখী, বৃকুট ফুল, পাত করবী, গাঁদা প্রভৃতি অনেকগুলি মেক্সিকো দেশীয় ফুল উহারা এদেশে আনয়ন করিয়া এ দেশের পুষ্প-সজ্জার স্বজি করিয়াছে।

পর্তুগীজদিগের এ দেশে আগমনের ফলে একটি কদর্যা রোগেরও আমদানী হইয়াছিল। তাবপ্রকাশ-নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে এই রোগটি ফিরজি নামে অভিহিত। যথা:—

“গন্ধরোগঃ ফিরজোহয়ং জায়তে দেহিনাং ভ্রমঃ।

ফিরজিগোহতিসংসর্গাৎ ফিরজিগ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ ॥

ফিরজসংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যত্বেৎ।

তস্যাং ফিরজ ইতু ক্তো ব্যাধি ব্যাধিবিশারদৈঃ ॥”

রোগীর পথ্য পাউরুটি ও বিকৃত প্রস্তুপ্রণালী আমরা পর্তুগীজগণের নিকটই প্রথম শিক্ষা লাভ করি। এক সময়ে এ দেশের সুন্দরীদিগের মধ্যে ফিরিজি খোপার খুব প্রচলন ছিল, উহা নিশ্চয়ই পর্তুগীজদিগের অন্ত্রকরণের ফল। তাহাদের নানা প্রকার ক্রীড়াও উহা-দিগের প্রসাদেই আমরা শিখিয়াছি।

যে তাম্রকূট আজকাল বঙ্গের ঘরে ঘরে বিক্রাজ করিয়া আতিথেয়তার প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে, যে আনারসের সুস্বাদু রসেরও রসনার তৃপ্তি সাধন করে, যে বেহাগার সুমধুর স্বরধ্বনি প্রাণ মাতিয়া উঠে, তাহার জন্ম পর্তুগীজগণের নিকট আমরা খণী।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

সে আজ কোথায় !

শরভের লঘু মেঘ সে কোন্ সুদূর
ভাসিয়া চলিছে ধীরে স্বচ্ছ ভক্তকায় ;
সপ্তমীর ক্ষীণ আলো ম্রাব মূর্ত্যাতুর
লভিছে বিরাম মোর নিঃসঙ্গ শযায় ।
নকত্র-বিরল আঁধি উজ্জল গগন
রচিয়াছে ইজ্ঞালা—যুদ্ধ স্বপনের
মিথ্য ভ্রান্তি-বিভড়িত । ব্যাকুল পবন,
অশান্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস সুপ্ত নগরের,
নিঃশেষিছে আপনারে অন্ধুর অটল
গর্ভোদ্ধত প্রাসাদের পাৰ্বাণ উরসে ।
নিগ্রাহীন নিশীথেরে করিয়া চঞ্চল
বিগ্রহ বিবাহধির অঙ্গুলি পরশে,
ভাদরের আর্দ্র বায়ু পাহিছে হোখায়—
এমন মধুর রাতে সে আজ কোথায় ।

ঐবোধেশচন্দ্র চৌধুরী

পূজার ছুটি

১

পূজার ছুটিটা কালীতে কাটাইবার কল্পনা করিয়া-
ছিলাম, এবং সেইজন্য তিন দিন যাত্র মার নিকট থাকিয়া
কালী বাজা করিলাম ।

গাড়ীতে ভিড়ের অন্ত নাই, সুতরাং কোনরূপে
দেহটাকে যাত্র রক্ষা করিয়া চলা । কিন্তু যোগলসরাইয়ে
গাড়ী বদলের পর তাহাও প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল ;
ছোট একটি কামরায় লোক যখন আর কিছুতেই ধরে না,
এবং ট্রেন ছাড়িবার বিলম্ব নাই, তখন কাঁচা-পাকা-চুল
এক জন প্রৌঢ় ভক্তলোক সঙ্গে পূর্বত প্রমাণ লগেজ ও তিন
চারিটি স্ত্রীলোক লইয়া তাহারই মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন ।

গাড়ীতে প্রবল আপত্তির একটা কলরোল পড়িয়া
গেল,—সকলেই ভক্তলোকটিকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন,

তিনিও কোন সহ্যের বৃদ্ধিয়া না পাইয়া ভক্ত হইয়া
রহিলেন এবং স্ত্রীলোক কয়েকটি নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া
পড়িলেন ।

তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া আমি নিজের জায়গা ছাড়িয়া
দিয়া কহিলাম—“সকলকেই যখন যাইতে হইবে, তখন
সামান্য অসুবিধার জন্য ভক্তলোককে আপনারা অত্যা-
ভৎসনা করিতেছেন । মহাশয় আমার বসিবার স্থান
যদিও এক জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তবু আমি তাহা ছাড়িয়া
দিতেছি, কোনও এক জন স্ত্রীলোককে বসিতে বলুন ।”

কথাটার কল হইল । গাড়ী ভক্তলোক ধামিয়া গেল—
এবং ভক্তলোকটি সন্তোষে নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া
বলিলেন, “মশায় আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দোবো
জানি না ! আপনাকে কষ্ট করে জায়গা ছেড়ে দিতে
হবে না—এখান থেকে কালী কতটুকুই বা,—আমরা বেশ
যাব । আপনি বসুন ।”

আমি বলিলাম—“তবে জায়গাটা খালিই থাক্, আমি
বসিতে প্রস্তুত নই ।”

তিনিও ভক্তলোকটি সর্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোকটির
দিকে চাহিয়া বলিলেন “লীলা, তুই বস ।”

যেহেটি নড়িয়া চড়িয়া ইজিতে জানাইল, সে বসিতে
প্রস্তুত নহে ।

তখন ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছে ।

যদিও আমার জায়গার আমরা কেহ বসিলাম না
তথাপি তাহা খালি রহিল না । পার্শ্বের আরোহীটি
একটুখানি ভাল করিয়া ছড়াইয়া বসিয়া সে স্থানটুকু
অধিকার করিয়া লইল ।

তাহা দেখিয়া লীলা আমার দিকে চাহিল । তাহার
চোখ দুটি সক্রিয় সুন্দর—বোধ হয় তাহাদের জন্য আমি
নিজের স্থান হারাইলাম, এইজন্যই সক্রিয় । আমিও
তাহার দিকে চাহিলাম—গ্যাসের আলো তখন নিশ্চয়
হইয়া আসিয়াছিল এবং বাহিরের উবার আলো তখনও
সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয় নাই,—তাহারই মাঝখানে তাহার অনবদ্য
সৌন্দর্য্য আলো-অন্ধকারে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল ।

২

প্রৌঢ় ভক্তলোকটি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,
“মশায়ের নিবাস ?”

উত্তরে বলিলাম “হুগলী জেলায় হরিদেবপুর গ্রামে।”
শুনিয়া তিনি ধানিকটা ধামিয়া বলিলেন, “সেখানকার
বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার পরম বন্ধু
ছিলেন,—আহা, হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়।”

আমি বলিলাম “তিনি আমার পিতা।”

শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন “এ্যা—
বিনোদের ছেলে আপনি—তুমি ? তাই তুমি আমার এত
পরমাত্মীয়ের মত !—তা শুনেছি, তুমি নাকি ডেপুটি
ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছ—উপস্থিত কোথায় আছ ?”

আমি কহিলাম, “গয়ায়”।

“তা বেশ ! আহা তোমাদের দেখে কত আনন্দ হয় !
ছোট বেলা থেকে বিনোদ আর আমি এক সঙ্গে পড়েছি,
এক বাসায় এক সঙ্গে খেয়েছি—কর্মজীবনেও যখন অবসর
পেরেছি তখনই সাক্ষাতের সুযোগ ছাড়ি নি—তার পর
এক দিন শুন্লাম বিনোদ নেই ! একেবারে বুকের হাড়
ক’খানা বেন ভেঙ্গে গেলো।” বলিতে বলিতে তাঁহার
চোখ দুটা চক্ চক্ করিয়া উঠিল। “আহা,” বিনোদের
ছেলে তুমি, দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো বাবা—”

বলিয়া তিনি ধানিকটা চূপ্ করিয়া রহিলেন। এবং
তাহার পর বলিলেন, “তুমি কি এখানে বেড়াতে এসেছো—
না কোন বন্ধুর বাড়ীতে এসেছো—না খুঁজর বাড়ী এখানে ?”

আমি কহিলাম, “বিবাহ এখনও আমার হয় নাই,—
বন্ধুর বাড়ী এখানে নাই,—বেড়াতে এসেছি মাত্র।”

ভক্তলোকটি নিরাত্মন বিস্মিত হইয়া কহিলেন
“বিবাহ এখনও হয় নি !—কেন ?”

“আমি কহিলাম “ইচ্ছা করিয়াই করি নাই—বিবাহ
করিবার কল্পনা উপস্থিত নাই।”

শুনিয়া তিনি হাসিলেন, বলিলেন, “আজকালকার
ছেলেদের ও-একটা হয়েছে বটে। ওটা কিন্তু সম্পূর্ণ
বিদেশী আমদানী।”

আমি কহিলাম, “আপনি আমার পিতৃ-বন্ধু আপনার
পরিচয় পাইলে কৃতার্ব হইব”—

তিনি কহিলেন, “আমার নাম শ্রীলীলকণ্ঠ বন্দ্যো-
পাধ্যায়, বাড়ী হরিদেবপুরেরই কাছাকাছি, পলতার।
তবে অনেক দিন দেশত্যাগী, রাঁচিতে উপস্থিত কর্মস্থান,
সেখানে ওকালতী করিয়া থাকি, এবং উপস্থিত বাস সেই
খানে। মেয়েদের ইচ্ছায় ও অনুরোধে কানীতে
তীর্থ করিতে বেরিয়েছি, কিন্তু গোড়াথেকেই যে রকম
সুবিধা দেখছি—হী তুমি নাওবে কোথায় ?”

আমি বলিলাম, “সম্ভব বেনারেস হোটলে।”

“বেনারেস হোটেল ? সেটা কোথায় ?”

“শুনিয়াছি দশাধর্মের ঘাটের উপরেই”। লীলকণ্ঠ বাবু
সাগ্রহে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তা কি হয় ?
আমি যখন মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বাসা করে থাকিব
তখন তুমি গিয়ে একটা হোটলে থাকবে, তা কি হয়
বাবা ? তুমি বিনোদের ছেলে, তোমাকে আমি অল্প
কোথাও উঠতে দিতে পারি না।”

আমি কহিলাম, “ইহার উপর আমারও বক্তব্য
বিশেষ কিছু থাকিতেই পারে না। তবে একটা কথা।
আমার আর ২।১ জন বন্ধুর ঐ হোটলে আসিবার কথা
আছে—তাহাদের সঙ্গে ক’টা দিন দেখা সাক্ষাৎ করার
কল্পনা আছে—সেই জন্যই হোটলে ওটা প্রয়োজন।”

লীলকণ্ঠ বাবু কহিলেন, “আমার বাসায় দু’বেলা দুটি
খেলে আর তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের কি ক্ষতি হবে
বাবা। তোমার কথা আমি শুনবো না।”

এমন সময় ষ্টেশন আসিয়া পড়িল,—লীলকণ্ঠ বাবু
“কুলি, কুলি” করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, এবং
আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন “তোমাকে আমি
যেতে দেবো না।”

আমি কহিলাম “হাত আমার ছেড়ে দিন,—জিনিষ
পত্রগুলো নামাইতে সাহায্য করিতে হইবে। আপনি
যদি আমাকে না ছাড়েন, তা আমি কি পালাইয়া
বাইব ?”

জিনিষপত্রের স্তূপ নামান হইল—তাহার পর জীলোকগণ নামিলেন।

তাহার পর গাড়ী ভাড়া করিয়া জীলোকদ্বিগকে চড়াইয়া দিয়া নীলকণ্ঠ বাবু আমাকে ডাকিলেন “এসো”।

আমি কিন্তু অনেক করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম, তিনি আমাকে তাঁহার ঠিকানা দিয়া গেলেন—স্থির হইল, যে বজুরা যদি আসিয়া থাকেন তাহা হইলে দু’দিন হোটেলের থাকিয়া তাঁহার বাসায় যাইব, তাহা না হইলে আজই যাইতে হইবে। উপস্থিত পরিত্রাণের ভরসায় তাহাতেই সন্মত হইতে হইল।

নীলকণ্ঠ বাবু গাড়ীতে উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই কথাই ঠিক রইল?”

তখন ভরুণ সূর্য্যের কনক কিরণে লীলার মুখ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল,—মাথার কাপড় সরিয়া গিয়াছিল, সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না, তাহার দুইটি করুণ চোখ গাড়ীর এক কোণ হইতে আমারই মুখের দিকে চাহিয়া ছিল,—আমি কি উত্তর দি তাহারই প্রতীক্ষায়। মাহুষের মুখ এত সুন্দর হয় আমি জানিতাম না,—আমি অল্প উত্তর খুঁড়িয়া পাইলাম না, কহিলাম “হাঁ”! শুনিয়া নীলকণ্ঠ বাবু নিশ্চিন্ত হইয়া গাড়ীর ভিতর মুখ ঢুকাইয়া লইলেন এবং লীলা মাথার কাপড় টানিয়া দিল।

বিবাহ করিব না এমন একটা কল্পনা আমি পোষণ করিয়াছিলাম। আমার মা আমাকে তাহার জন্ত কত অহুযোগ করিতেছেন—কত অহুরোধ করিয়াছেন। পূজার ছুটিতে যে তিন দিন তাঁহার নিকট ছিলাম, তাহারই মধ্যে গুটিদশেক রাজকত্তা ও তাহাদের অর্দ্ধ-রাজত্বের সন্ধান আমাকে দিয়াছিলেন,—কিন্তু আমি সন্মত হই নাই। মাহুষের জীবনে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা আমি বুঝিতে পারিতাম না—এক জন সঙ্গিনী না হইলে যে জীবন যাত্রা সম্ভব হইতে পারে না,—এমন কথা আমি স্বীকার করিতাম না। তাই এই কৌমার্য্য। আমার এইটুকু ইতিহাসই যথেষ্ট।

৩

বেনারস হোটেলের উঠিয়া দেখিলাম বজুরদের মধ্যে

কেহই আসেন নাই, পূজার এই কটা দিন তাঁহারা বেনারসের নীরস হোটেলের কাটান অপেক্ষা, আপনাদিগের গৃহের মাঝখানে, যেখানে দীর্ঘ এক বৎসর ধরিয়া নীরব প্রেম ও অপরিমিত মেহ এই বারো দিনের অপেক্ষায় সজ্জিত হইয়া উঠিতেছে, সেইখানে যাওয়াই প্রেম মনে করিয়াছেন,—এই মর্ম্মের এক পত্রও এক বজুর নিকট হইতে আসিয়া রহিয়াছে দেখিলাম।

এই বিবাহিত জীবন! কথা দিয়া যাহার জন্ত কথা রাখা যায় না, বজুর বজুবকে যাহা পদে পদে আঘাত করে, সেই জীবন এত বাহনীয়! মাহুষ তাহারই জন্ত পাগল! বজুর পরধানাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া কঠিন রাস্তার পাথরের উপর লক্ষ লোকের পদতলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বেন কতকটা আরাম পাইলাম।

সমস্ত দিন আর কোথাও বাহির হইলাম না,—বিকাল বেলা রৌদ্র ঝঞ্ঝন পড়িয়া গেল, তখন বারান্দায় একটা চেয়ার লইয়া বসিয়া বিচিত্র জনতাস্রোতের মধ্যখানে আমাকে হাল্কাইয়া ফেলিলাম।

বজুরা আসে নাই,—সঙ্গীর অভাব, মনটা প্রসন্ন ছিল না! কিন্তু তবু যেন মনের স্তরে স্তরে আজ প্রভাতের স্নিগ্ধ কনক-কিরণেরই মত ঐ কিসের মাধুরী আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছিল।

এমন সময় হোটেলের দরজায় একটা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, তাহা হইতে নীলকণ্ঠ বাবু নামিলেন। তাঁহাকে আমার নিকট বসাইলাম।

নীলকণ্ঠ বাবু বলিলেন, “তোমার বজুরা বোধ হয় আসেন নাই?”—

আমি বলিলাম, “না”।

তিনি বলিলেন, “তবে আমাদের ওখানে চলো।”

আমি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম,—কহিলাম, “হয়ত আপনাদের অনুবিধা হইতে পারে।”

নীলকণ্ঠ বাবু কহিলেন, “হোটেলের সন্ন্যাসী যদি তোমার বিশেষ ভাল লাগিয়া থাকে, তা হ’লে আমি কেমন করে তোমাকে নিয়ে যাব। কিন্তু আমার অনুবিধার বোঝাই

দিও না। প্রথম আমি তোমার দ্বারা অসুবিধার বিশেষ কোন সম্ভাবনা দেখি না। তার পর আমার স্ত্রী আর আমার বোন—তুমি হয়ত, বিশ্বাস করবে না যে, তাঁরাই জোর করে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠাইয়াছেন। তারপর আমার মেয়ে স্নহা,—তুমি গেলে তার অসুবিধা হবে এমন কোন সংবাদ পাই নি। তারপর লীলা, আহা! তাকে যদি জানতে, বুঝতে পারতে ভাগ্যহীনতার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান মানুষকে হৃদয়হীন করেন না।”

বুকের ভিতর একটা কোমল স্থানে যেন কিসের আঘাত লাগিল, আমি কহিলাম, “ভাগ্যহীন কি রকম?”

নীলকণ্ঠ বাবু পথের পানে জনতা-স্রোতের দিকে চাহিয়া একটু স্থির হইয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, “সে আমার বন্ধু হরিহর বাঁড়ুয়োর মেয়ে। দারুণ কলেরা রোগে যখন একে একে হরিহরের স্ত্রী ও হরিহর মারা গেল, তখন মৃত্যুর সময় হরিহর লীলাকে আমার কাছে দিয়ে গেছে! যার বাপ নেই, মা নেই তার আর কি আছে! কিন্তু লক্ষ্মী, মেয়েটি লক্ষ্মী! রূপে যেমন গুণেও তেমনি।—আমাদের সংসারটি সে একাই চালায়,—কি সেবা! আর আনন্দ যদি বিশ্বে কোথাও থাকে ত ঐ মেয়েটির মুখে চোখে! ওর সমবয়সী আমার এক মেয়ের বিয়ে আজ দেড় বৎসর হল দিয়েছি, কিন্তু ১০ বর আজ দেড় বৎসরে আর মিললনা! অভাগিনী, বাবা অভাগিনী!”

মুহূর্ত্তে আমার কাছে যেন সব পরিষ্কার হইয়া গেল। লীলা যে জীবন্ত লক্ষ্মী তাহা আমি দেখিয়াছি। কিন্তু পরের সংসারে আসিয়া সে অনাদৃত। সংসারের সমস্ত কাজ সে করে—তাহার মানে দাসীর কাজ তাহাকে করিতে হয়। তারপর উহার সমবয়সী মেয়ের বিবাহ আজ দেড় বৎসর হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পিতৃমাতৃহীন এই অভাগিনীর কথা কেহ ভাবে নাই! আহা, ভাগ্যহীনার চোখে কত অশ্রু নিরুদ্ধ হইয়া আছে, বুকে কত দীর্ঘ শ্বাস সঞ্চিত আছে, তাহার সন্ধান কেহ রাখে না। জীবনের নিরবচ্ছিন্ন

নিরানন্দকে মুখে চোখে আনন্দরূপে ফুটাইয়া তুলিতে দিবারাত্র সে অন্তরের বহ্নিতে যে ইন্ধন জোগাইতেছে—তাহা বুদ্ধ নীলকণ্ঠ কি জানে!

আমাকে শুক থাকিতে দেখিয়া নীলকণ্ঠ বাবু বলিলেন, “হাঁ—হাঁ—বলছিলাম কি,—আর এইত লীলা, একটা চড়ুই পাখী পড়তে দেখলে কেন্দ্রে অস্থির হয়—এরাই তোমার যাওয়াতে কষ্ট পাবে?—কি বল বাবা!—চলো তোমাকে এখনি যেতে হবে—মস্ত বড় বাড়ী অকুলন হবে না, কোন অসুবিধা হবে না।”

ইহার পর নীলকণ্ঠ বাবুর উপর আমার প্রহার পরিমাণ অনেকটা কমিয়া গেল—কিন্তু লীলা! লীলার কথা মনে করিয়া যাঁহাতে ইচ্ছা হইল, বলিলাম, “চলুন।”

হোটেলের ম্যানেজারের হিসাব পত্র চুকাইয়া দিয়া, জিনিষ পত্র লইয়া নীলকণ্ঠ বাবুর বাড়ীতে উঠিলাম।

(৪)

সেই দিন সন্ধ্যার পর একটু বেড়াইতে বাহির হইলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম আমার জিনিষপত্রগুলি যথাস্থানে গোছান রহিয়াছে,—এবং তাহার ভিতর এমন একটা বিশেষত্ব আছে, যাহা স্বতঃই চোখে পড়ে।

নীলকণ্ঠ বাবুর স্ত্রী আসিয়া আমাকে যথোচিত আদর সম্ভাষণ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, “লীলা, অমলের জন্য খাবার নিয়ে আয় ত!”

এক খাল খাবার লইয়া যখন লীলা আমার নিকট আসিল, তখন তাহাকে সভ্যই প্রতিমার মত দেখাইতেছিল! ভগবান তাহাকে রূপ দান করিতে রূপগতা করেন নাই, এবং তাহার সহিত এমন একটা পবিত্রতাও দিয়াছেন যাহা একান্তই দুর্লভ! সুন্দর মুখে নির্মল চোক দুটি তাহার অন্তরের শুচিতার নিদর্শন স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দেহের যৌবন যেন অরূপধে শুক হইয়া দাড়াইয়া গিয়াছে!

লীলার মত যাহার গুণ, লীলার মত যাহার রূপ, সে অভাগিনী,—তাহার জন্য পাত্র পাওয়া যায় না! বিচিত্র ভগবানের বিধান!

লীলার সেই অপরূপ মধুর মুখ,—হাস্তময় কিন্তু দ্রবৎ
বিষয়,—সমস্ত রাত্রি আমার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে
লাগিল।

পরদিন বেড়াইয়া আসিয়া যখন সন্ধ্যার সময় ঘরে
চুকিলাম, তখন দেখিলাম পার্শ্বের জানালার গরাদে ধরিয়া
লীলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি যে ঘরে চুকিয়াছি,
সে কথা সে জানিতে পারে নাই। নিশ্চল প্রস্তর-মূর্তির
মত দাঁড়াইয়া সে কি ভাবিতেছিল! তাহার স্তিমিত
স্তব্ধ ধ্যান ভঙ্গ করিবার ইচ্ছা আমারও ছিল না, আমি
ধীরে ধীরে বসিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যার তারার মত পবিত্র নির্মল তাহার রূপ!
আঁধার যখন চারিদিকে ঘনাইয়া উঠে, তখনও উজ্জ্বল,
সুন্দর! দেবতার আশীর্বাদের মত শুচি, সুগন্ধ পুষ্পের
মত অনবদ্য!

হঠাৎ সে আমাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, লজ্জায়
তাহার মুখ লাল হইয়া গেল;—তাহার গোপন চিন্তা
তাহার রূপের স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া পাশে বাহির হইয়া
পড়ে, বোধ হয় সেই লজ্জায়! তাহার পর একটি মাত্র
কথা না কহিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ঘরে তখনও আলো দিয়া যায় নাই,—অন্ধকার ঘরের
মধ্যে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, একি! এই অন্ধকার
ঘরের মধ্যে একাকী লীলা তাহার কথা ভাবিতেছিল!
তাহার নারী-হৃদয়ে হয় ত কোন গভীর বেদনা জাগিয়া-
ছিল,—হয় ত কোন গোপন কথা! কি সে বেদনা,
কি সে কথা! আমার অন্তর যে আজ পরিপূর্ণ হইয়া
উঠিয়াছে,—তাহারই ব্যথায় যে কানায় কানায় ভরিয়া
উঠিয়াছে, এ কি!

এমন সময় নীলকণ্ঠ বাবু ঘরে আসিয়া কহিলেন,
“কি বাবা, কোন অনুবিধা বোধ হচ্ছে না ত?”

আমি বলিলাম “না”।

* * *

পরদিন সমস্ত দিন আর লীলাকে দেখিতে পাইলাম
না,—তবে আমার পাশের ঘর হইতে একটা রুদ্ধ

কন্দনের শব্দ শুনিতে পাইলাম। মন বলিয়া দিল,
এ লীলার কানার শব্দ—আর তাহাতে সন্দেহ করিবার
কিছু ছিল না।

মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। এই আশ্রয়হীন
অনাশা বালিকা,—সে কি গভীর মনোবেদনায় দিনের
পর দিন এখানে যাপন করিতেছে! সংসারের সমস্ত
কার্যই তাহাকে করিতে হয়,—কিন্তু তাহার পরিশ্রম ও
বেদনার পরিবর্তে সে হয় ত দিনান্তে একটি মাত্র সান্ত্বনার
কথাও শুনিতে পায় না! সত্যি অভাগিনী সে!
অন্তরের বেদনা নিদারুণ না হইলে এমন করিয়া কেহ
কঁদিতে পারে না!

সর্ব প্রকারে সৌভাগ্যের উপযুক্ত এই অভাগিনীর
জন্ত আমার অন্তর সমবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল!
উদ্ধার কি তাহার নাই? কথাটা বিদ্যাতের মত তীক্ষ্ণ
চমকে আমার সমস্ত মনকে সজাগ করিয়া তুলিল।
পরগৃহে অনাদৃত এই উপেক্ষিতার উদ্ধার কি আমারই
হাতে নাই? আমি যদি উহাকে বিবাহ করি, তাহা
হইলে সহজেই ত তাহাকে মুক্তি দেওয়া যায়!

কিন্তু আমি কি করিয়া বিবাহ করিতে পারি!
বহু দিনের আমার কল্পনা বিবাহ কারব না, বহু যুক্তি ও
তর্কের পর সে সিদ্ধান্ত করিয়াছি,—আজ এত সহজেই
কেমন করিয়া তাহা উপেক্ষা করিতে পারি?

এত সহজে? এক জন বালিকা এবং লীলার মত
বালিকা, নিঃশঙ্কে এমন গভীর বেদনা দিনের পর দিন
সহ করিতেছে,—হয় ত তাহার বন্ধ-পঙ্কর চূর্ণ বিচূর্ণ
হইয়া যাইতেছে,—ইহা কি এত লঘু কারণ? ইহার
জন্ত কি অনুবিধা ভোগ করিয়াও নিজের একটা সিদ্ধান্ত
ভঙ্গ করা উচিত নহে?

কিন্তু লীলা কি আমাকে চায়? সে যে আমাকে
পাইয়া স্তুতী হইবে, তাহার প্রমাণ কোথায়? তাহাকে
বিবাহ করিয়া যদি নূতন করিয়া আমি তাহাকে অনুতী
করি, তাহা হইলে আমার পাপের সীমা থাকিবে না।

কিন্তু লীলা কি সত্যি আমাকে চায় না? কাল

প্রভাতের নবীন সূর্য্যকিরণে তাহাকে যে ভাবে দেখিয়া-
ছিলাম, এবং সন্ধ্যার পর সে যেমন করিয়া আমারই
ঘরে ছিল—তাহা হইতে কি বুঝা যায় না যে, সে আমাকে
চায়? হয় ত বুঝা যায় না, হয়ত আমার এ কল্পনা
ভিত্তিহীন!

নানা সন্দেহ ও চিন্তায় মনটা এমনই বিক্ষিপ্ত হইয়া
গেল যে, নীলকণ্ঠ বাবুর সহিত সন্ধ্যার পর যখন দেখা
হইল, তখন তাঁহাকে বলিলাম, “আমাকে ছুটি দিন,
আমি কালী থেকে কালই চ’লে যেতে চাই।”

নীলকণ্ঠ বাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, “কালই?
কেন, এত তাড়াতাড়ি? অশুবিধা হচ্ছে বুঝি?”

আমি বলিলাম, “না মনটা হঠাৎ ধারাপ হ’য়েছে—
মার কাছে যেতে চাই।”

নীলকণ্ঠ বাবুর আগ্রহাতিশয়ে তাহার পর দিন থাকিয়া
পর দিন প্রাতের ট্রেনে যাওয়া স্থির হইল।

(৫)

পরদিন সমস্ত দিন বাড়ীর বাহিরে কাটাইলাম;
সে দিনটা যেন আর কিছুতেই কাটিতে চায় না। সন্ধ্যার
সময় বাসায় ফিরিলাম।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখিলাম, ঘরের একটা টেবিলে
হেলান দিয়া লীলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—আমি আসিতেও
সে সরিল না। বোধ হয় কোন কথা ভাবিতেছিল।

তাহার নিকট গিয়া ডাকিলাম, “লীলা।” লীলা
চমকিয়া উঠিয়া, মুহূর্ত্তেক আমার পানে চাহিয়া—ধীরে
ধীরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

আমি ডাকিলাম “লীলা, শোন।”

লীলা ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

আমি কহিলাম, “লীলা, কাল সকালেই চলে যাবো।”

লীলা আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। আমি
কহিলাম, “লীলা, তোমার মুখের একটা কথা আমি
শুনতে চাই,—আমি গেলে তোমার কিছু কষ্ট হবে না?”

লীলার মুখ লাল হইয়া গেল, সে আমার দিকে
চাহিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল,—মুখের কথা যেন

বাহির হইতে চায় না। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল,
“হবে।”

তাহার পর চকিতে আমার পানে চাহিয়া কহিল,
“এবার যাবো?”

তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল—ঢাকিবার
চেষ্টা করিয়াও সে ঢাকিতে পারিল না।

প্রেম! প্রেম যদি ইহারই নাম হয়, ত তাহা বেদনা
ও আনন্দের বিচিত্র সমাবেশ! সমস্ত অন্তরকে মগ্নিত
মর্দিত করিয়া পণের স্নুকুমার রক্ত-দলের মত তাহাকে
রক্ত-লোহিত করিয়া তুলে!

* * *

পর দিন প্রভাতে ট্রেন—সেই জন্ত সকাল সকাল
গুইয়া পড়িলাম।

নিদ্রা ও স্বপ্নেব মধ্য দিয়া কেমন করিয়া রাত
কাটিয়াছিল জানি না; কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখনও
ভোর হয় নাই, পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া টানের
কিরণ ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল, এবং ঘরের কোণের
কেরোসিন ল্যাম্প মিটমিট করিতেছিল।

আমি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, এইবার
যাইবার উদ্ভোগ করি। এমন সময় পাশের দরজার
খুলিয়া দিয়া আমার সম্মুখে কে এক জন আসিয়া
দাঁড়াইল,—আলো-আঁধারে প্রথমে স্পষ্ট দেখা গেল না,
তাহার পর দেখিলাম, লীলা।

বিস্ময়ের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম,
কহিলাম, “লীলা?”

লীলা ধীরে ধীরে কহিল, “মাপ করবেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ সময় এখানে?”

লীলা কহিল, “আর দেখা হবে না তাই।”

ধীরে ধীরে আসিয়া লীলা আমার বিছানা হইতে
ধানিকটা দূরে মেঝের উপর বসিল।

বলিল “একটা কথা।”

আমি বলিলাম “কি, বল?”

লীলা কহিল “আমাকে এমন কিছু দিয়ে যান, যাকে

কাণ্ডিক ১০১০

আমি যত্ন ক'রে রেখে দিতে পারি,—যা আমাকে এ ছুটো দিনের কথা—”

আমি বিস্মিত, শুক, স্তম্ভিত হইয়া কহিলাম, “সে কি লীলা—তুমিই বল।”

লীলা কাপড়ের ভিতর হইতে সম্বন্ধ-রক্ষিত একখানি খাতা বাহির করিয়া কহিল, “এতে আপনার নাম লিখে দিন।”

আমি বড় বড় অক্ষরে লিখিলাম, “তোমারই অমল-কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।”

খাতাখানি আপনার বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া লীলা কহিল, “এখন যাই।”

আমি কহিলাম, “একটা কথা; তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে আশা করি।”

লীলা আমার মুখের পানে নির্ঝাঁক হইয়া চাহিয়া রহিল।

মার কাছে ফিরিয়া গিয়া কহিলাম, “মা তোমার দাসীর ঠিকানা করিয়া আসিয়াছি,—তবে সে রাজকন্যা ত নয়ই,—পথের ভিখারী বলিলেও চলে।”

মা বলিলেন, “তা হ'ক;” এবং আনন্দে পাঁচ দিকার সিগ্নি দিলেন।

বেলী বয়সে বিবাহ করার একটা গোল যে নিজেই কঠোঁ সাজিতে হয়। যা হোক, উপায় নাই। সেই অন্তই অগ্রহায়ণ মাসের এক শুভ দিনে রাঁচী যাত্রা করিলাম।

সেখানে বিবাহে খুব ধুম হইয়াছিল, এ কথা বলিলে হয় ত আপনারা বিশ্বাস করিবেন না,—কেননা লীলা পরের মেয়ে বই ত নয়। আমারও একটু আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল।

কিন্তু বিবাহের পরে সে বিশ্বাসের কারণ আর রহিল না। নীলকণ্ঠ বাবু, এখন আমার খণ্ডর মহাশয়ই বলি,—বিবাহের পর আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, “একটা কথা তোমাকে মিথ্যা বলেছিলাম—সেইটের সংশোধন করতে চাই। লীলা আমারই মেয়ে!”

কথাটা শুনিয়া আমি এত বিস্মিত হইলাম যে,

কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, “আমি বুঝেছিলাম যে, তোমার করুণা আকর্ষণ ভিন্ন আমি তোমাকে অন্য উপায়ে কিছুতেই পেতে পারি না। অর্থের প্রলোভনও বুধ। তাই আমার এই মিথ্যা রচনা। করুণা ও সমবেদনা জাগিয়ে তোমাকে পেয়েছি। আমরা উকীল মানুষ, বাক্যে ও কার্য্যে আমাদের দিব্য-ব্রাহ্ম মিথ্যা আচরণ করতে হয়; মেয়েটার সদগতির জন্যে যদি একটা মিথ্যা কথা বলে থাকি ত তার ক্ষমা আছে এমন ভরসা করি,—বিশেষ তুমি যখন বিনোদের ছেলে! কিন্তু বাবা, আমার আশায় যদি কোন মূল্য থাকে, ত' আমি বলতে পারি, তুমি অসুখী হবে না। আলীকাদ করি তোমার লীলা যেন তোমার যোগ্য হ'তে পারে।”

ক্ষমা করা ভিন্ন তখন অন্য উপায় ছিল না। বিশেষ সব দিক ভাবিয়া দেখিলাম, রাগ করিবার কোন কারণও ছিল না। লীলাকে সে দিন ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল।

খণ্ডর মহাশয় বলিলেন, “আমার এ মিথ্যা রচনার মধ্যে আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না—সুতরাং অপরাধটা সমস্তই আমার।”

মনে কিন্তু ভারী খটকা রহিয়া গেল। রীতিমত একটা প্লট হইয়াছিল নিশ্চয়ই, তা নটলে অকারণ লীলা সমস্ত দিন কাঁদিল কেন? সে দিন যদি সে না কাঁদিত, তাহা হইলে হয় ত এত দূর অগ্রসর হইতাম না।

কথাটা কিন্তু সে দিন আর ভাবিলাম না। পরে কথা-প্রসঙ্গে এক দিন লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি সে দিন অত কেঁদেছিলে কেন?”

লীলা কহিল, “আমার মাঝে মাঝে দাঁতে ভারি বেদনা হয়, ক'দিন ভারি যন্ত্রণা হয়েছিল।”

আমি শুক হইয়া গেলাম! হায় চক্রান্ত শুধু নীলকণ্ঠ বাবুর নহে, তাহার সহিত লীলার দাঁত, ও আমার নিবুদ্ধিতা সকলেই যোগ দিয়াছিল।

আমার বিবাহের গল্পটা আগাগোড়া একদিন লীলাকে বলিলাম। শুনিয়া সে ভারি হাসিল। কহিল, “ভাগিস্ আমার দাঁতে ব্যথা হইয়াছিল।”

কিন্তু সেই দিন হইতে একটা বিপদ হইয়াছে। নীলাকে দাঁত সারাইবার জন্য কয়েকবার ডেন্টিস্টের বাড়ী লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার এমনই কুসংস্কার যে সে কিছুতেই তাহার দাঁত বদলাইবে না। বলে আমার ঐ ধারাপ দাঁতই ভালো তা নইলে আমি আজ কোথায় থাকিতাম!

ঐ জগতই ত' জীজ্ঞাতিটার উপর আমার এত রাগ।

ত্রিগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কবিতার প্রতি

স্বপনের মধুময় শেষ শুভ ক্ষণে,
এসেছিলে তুমি, অগ্নি গরবিনি! মম
বাসনা-জড়িত-বুকে; পরশে তোমার,
উজলিলে কি আলোকে পূর্ণ-ইন্দু সম
বিযুক্ত হৃদয় মোর; নিদ্রালসভরা
শিথিল নয়নে হেরি, একি গো কল্পনা!
ভাবের আবেশে প্রাণ উঠিছে মাতিয়া
লয়ে শত আশা ভয়, আকুল বেদনা।
নিখিলের রূপরাশি প্রসারিত আজি
আঁখির সম্মুখে মম; কোন্ যাত্রকর
বিশ্বপটে আঁকিয়াছে রহস্তের ছবি
বিস্ময় পুলকে সদা মুগ্ধ বাহে নর।
জীবনের কুহেলিকা সরাইয়া দূরে,
বিরাজ সতত দেবী ভক্তের অন্তরে।

ত্রিপ্রতিভাময়ী দেবী।

ব্রহ্মচর্য্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম

ভারতভূমি সন্ন্যাস ধর্ম্মের জন্ম-ক্ষেত্র। নির্কৃতি ও শাস্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় যুগে যুগে অসংখ্য ব্যক্তি আর্ন্ত-হৃৎ-কাতর মহাপুরুষগণের শরণাপন্ন হইয়াছেন;

ছুষ্ট সংসার তাহাদিগকে মায়ার পাশে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। সমাজের অনিয়ম, আশা-ভঙ্গ, অসার সংসার-সুখ এবং স্পৃহাসম্পৃক্ত কর্ম্মকোলাহল হইতে অবাহতি লাভের উদ্দেশ্যেই তাহারা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। ভারতের জল বায়ু, ভারতের প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় মনের ধ্যানপরায়ণতা প্রভৃতি সমস্তই সন্ন্যাস ধর্ম্মের আনুকূল্য করে, সুতরাং কর্ম্মসম্মুল সংসার-গণ্ডীর বাহিরে অবোধে নিবিষ্ট মনে ধর্ম্মচর্য্য না করিতে পারিলে, এবং কথঞ্চিৎ কৃচ্ছ সাধন না করিলে, মনুষ্যের চরম শ্রেয়ঃ বা যথার্থ নির্কৃতি লাভ হইতে পারে না এরূপ মনে করা ভারতীয়ের পক্ষে স্বাভাবিক। এই সকল কারণেই প্রাচীন আর্য্য সমাজের ঋষি-জীবনে প্রথমতঃই ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ত্যাগ-ধর্ম্ম মুখ্য বলিয়াই ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। এই ব্রহ্মচর্য্যই সন্ন্যাসের প্রথম সোপান। আবার চিরপ্রচলিত ভারতীয় আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যেই সন্ন্যাস ধর্ম্মের বীজ গুপ্ত রহিয়াছে। এই চারিটি আশ্রমেই আমরা পবিত্র ধর্ম্ম জীবনের আদর্শ দেখিতে পাই।

প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্যশ্রমের বিষয় চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, গুরু-গৃহে বেদাধ্যয়ন কালে ব্রহ্মচারীকে শৌচতত্ত্বিসম্পন্ন হইয়া সংযত থাকিতে হয়। ব্রহ্মচারী মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন না, অহিংসা পালন করেন, ও নৃত্য-গীতাদি আশোদপ্রমোদ একান্ত ভাবে বর্জন করিয়া থাকেন। তিনি পরম শিষ্টাচারসম্পন্ন যুগচর্য্যধারী ও গৈরিক বসনে ভূষিত হইয়া ভিক্ষায়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করেন। একটু অসুখাবন করিলেই দেখা যায় বৌদ্ধ ও অপরাপর সন্ন্যাসাশ্রমের ধর্ম্মেও এই সকল বা এই সকল নিয়মের অনুরূপ নিয়ম পালনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

আবার ব্রহ্মচারী ইচ্ছা করিলে আজীবন গুরু-গৃহে শাস্ত্র-চর্চায় নিরত থাকিয়া গুরু লোকান্তরিত হইলে তদীয় পারিবারভূক্ত হইয়া বাস করিতে পারেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মচারীর জীবনীর সচিত্র চতুর্থাংশাংশই যতি, মুক্ত, সন্ন্যাসী বা পরিভ্রাজকের জীবনের কোনও প্রভেদ নাই, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী যে সকল

নিয়মের অধীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীবর্গও স্বল্পভাবে সেই সকল নিয়মেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। আমরা দেখিব বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের জীবন এই ব্রহ্মচর্যের আদর্শেই গঠিত হইয়াছিল।

প্রাচীন যুগে জ্ঞানপিপাসু আজীবন ব্রহ্মচারী সত্যের অনুসন্ধানে বিশিষ্ট গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিতেন, সুতরাং অনুমান করিতে পারা যায় যে, এইরূপ এক এক জন বিশিষ্ট গুরুর তিরোধান হইলে তদীয় শিষ্যবর্গ আপন আপন গুরু-প্রবর্তিত নিয়মাবলীর শাসনাধীন হইয়া এক একটি ‘সন্ন্যাস সংঘ’ বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেন, এবং এই রূপেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান, বিধি ব্যবস্থা, নিয়ম প্রণালী, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি স্বতন্ত্র হইয়া পড়িত। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণও এই রূপেই শিক্ষালাভ ও ব্রহ্মচর্য পালন করিতেন। এখন আমরা এস্থলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বৌদ্ধ যুগ কোন সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে মহারাজ অশোকের (অশোক সংঘ) সময় সুগঠিত বৌদ্ধ ‘সংঘ’ বা সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল এবং এই সম্প্রদায় বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় বিধি-নিয়মে পরিচালিত ও শাসিত হইত ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে, নিগ্রহ ও আজীবক সম্প্রদায়ের ত্রায় এই সম্প্রদায়ও যথেষ্ট প্রাচীন। বিশেষতঃ প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে নিগ্রহ ও আজীবকগণের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং এই দ্বিবিধ সম্প্রদায়ের সহিত শাক্যগণের সংঘর্ষের সাহিনোও বর্ণিত আছে। সুতরাং এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়ই যে এক সময়ে গঠিত হইয়াছিল এই রূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে।

প্রতিমাসে বুদ্ধভক্তগণের পূর্ণিমা ও ‘উপসংঘ’ প্রভৃতি পালনের ব্যবস্থা আছে। এসকল নিয়মও যে কোনও প্রাচীনতর সম্প্রদায়ের ব্যবস্থার অনুকরণে প্রবর্তিত হইয়াছে ইহা মনে করা যাইতে পারে। এরূপ অগ্ৰাণু দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। এমন কি আমরা দেখিব

যে, সমগ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গঠন ও প্রবর্তন প্রণালী এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের শাসনসম্পর্কীয় বিধি প্রভৃতিও কোনও প্রাচীনতর সম্প্রদায় বিশেষ হইতে গৃহীত হইয়াছে। তবে বৌদ্ধ ধর্ম যে এই সকল নিয়মানুষ্ঠানের জন্ম অল্প সম্প্রদায়ের নিকট সম্পূর্ণরূপে ঋণী তাহা স্বীকার করা যায় না।

বৌদ্ধ সংঘ বা সম্প্রদায়ের কর্তা স্বয়ং কোনও বিধি প্রণয়ন করেন নাই, তিনি প্রচলিত বা প্রবর্তিত বিধি যথা নিয়মে পালিত হইতেছে কি না শুধু তাহাই দেখিতেন। তিনি প্রায়শঃ কোনও আদেশ প্রদান করিতেন না। কেবল প্রবর্তিত বিধির অনুমোদন করিতেন; কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষু বা অগ্ৰাণু ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে মতান্তর ঘটিলে তিনি তাহা মীমাংসা করিয়া দিতেন। তারপর বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত নীতিগল্পগুলির বিষয় পর্যালোচনা করিলেও আমরা দেখিব যে এগুলি অনেকটা আধুনিক।

কোন কোন নিয়ম বা বিধির অনুমোদনের জন্ম সময় সময় উল্লিখিত নীতিমূলক গল্প রচিত হইয়াছে; ইহাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। এগুলি সম্প্রদায় বিশেষে প্রবর্তিত বিধি বা নিয়মাবলীর ঐতিহাসিক ছায়া মাত্র; বস্তুতঃ এই সকল গল্পের মূলে অভিজ্ঞতা বা বহুদর্শিতা ভিন্ন আর কোনও অবলম্বন নাই। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, এই সকল নীতি-গল্পের সহিত মূল বৌদ্ধ শাস্ত্রের পর্য্যস্ত ঐক্য নাই, এমন কি কোন কোন গল্প বাস্তবিক পক্ষে মূলের বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করে, এবং এই সকল গল্প পাঠ করিলে পাঠকের মনে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও ভ্রাম্যাক ধারণা জন্মিয়া থাকে; অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যে সকল নীতি-গল্প শাস্ত্র বচন সমর্থন বা বিশদ করার উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেগুলি শাস্ত্র প্রণয়নের বহু কাল পরেই রচিত হইয়াছিল। তবে বৌদ্ধ দণ্ডবিধি যে অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এই দণ্ডবিধি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কয়েকটি মাত্র অতিরিক্ত বিধি বাদ দিলে প্রতি-

মোক্ষকেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দণ্ডবিধি বা শাসন শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। এই প্রতিমোক্ষই সম্ভবতঃ বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রাচীনতম। এই দণ্ডবিধিই বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্য পরিবর্তিত আকারে সর্বত্র প্রচলিত আছে; কিন্তু প্রতিমোক্ষ মূলতঃ সর্বত্রই এক ও অভিন্ন। প্রতিমোক্ষের পালি সংস্করণই (পতিমোক্ষ) প্রাচীনতম ও সংক্ষিপ্ত। প্রতিমোক্ষে ভিক্ষুগণের পালনীয় মোট ২২৭ টি বিধি আছে; কিন্তু ধর্মগুপ্ত সম্প্রদায়ের চৈনিক সংস্করণে, তিব্বতীয় সংস্করণে, এবং মহাভূতপতি সংস্করণে সর্বসাকল্যে যথাক্রমে ২৫০ টি, ২৫৩ টি ও ২৫৯ টি বিধির উল্লেখ দেখা যায়।

ভগবান বুদ্ধের আদেশ আছে যে, প্রতিমাসের মধ্যভাগে চতুর্দশী কি পূর্ণিমা তিথিতে অশ্রুতঃ চার জন ভিক্ষু সমবেত হইয়া প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবেন। সাধারণতঃ আবৃত্তি আরম্ভের পূর্বেই সমবেত ভিক্ষুগণের মধ্যে কেহ প্রতিমোক্ষের কোনও বিধি লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে সেই পাপ স্বীকার করিয়া তবে প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিতেন; কিন্তু এক একটি বিধির আবৃত্তি শেষ হওয়া মাত্রই সমবেত ভিক্ষুগণের মধ্যে কেহ সেই বিধি লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে তখন তাঁহার অপরাধ স্বীকার করাই ব্যবস্থা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্থূল কথায় বৌদ্ধ দণ্ড বা শাসনবিধি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা লঙ্ঘনজনিত পাপ স্বীকারের জন্ত কয়েকটি লিপিবদ্ধ নিয়মের সমষ্টি মাত্র। এখন আমরা ধৃত্যঙ্গনামক বৌদ্ধ দণ্ডবিধির কথা আলোচনা করিব। ধৃত্যঙ্গ-বাঙ্গলগণের পালনীয় নিয়মেও বানপ্রস্থাবলম্বিগণের ধর্মের ছায়া বিद्यমান রহিয়াছে।

ধৃত্যঙ্গ প্রতিমোক্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধৃত্যঙ্গ নিবদ্ধ নিয়ম শুধু ভিক্ষুগণের ভিত্তিই বিধিবদ্ধ হইয়াছে : এবং যে সকল ভিক্ষু বাণপ্রস্থধর্মাবলম্বী বৈধানসগণের জ্ঞান অরণ্যে আশ্রয় লইতেন কেবল তাঁহারা এই সকল নিয়ম পালন করিতেন।

দক্ষিণ ভারতে ত্রয়োদশ ও উত্তর ভারতে দ্বাদশ

ধৃত্যঙ্গের উল্লেখ আছে। ধৃত্যঙ্গের আর একটি নাম ধৃত্যঙ্গ। পালি গ্রন্থে বর্ণিত ধৃত্যঙ্গ বা ধৃত্যঙ্গগুলির ধারাবাহিক তালিকা এস্থলে সংযোজিত হইল।

(১) পাংশু কুলিক। ধূলিস্তূপ বা আবর্জনা-রাশি হইতে সংগৃহীত জীর্ণ বস্ত্র দ্বারা নির্মিত পরিচ্ছদ পরিধান।

পূর্বকালে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে আরণ্যক ভিক্ষুর অভাব ছিল না। তাঁহারা বিশেষ ভাবে কৃচ্ছ্র সাধন করিতেন। ভগবান বুদ্ধের জীবিত কালে কাশ্যপ ধৃত্যঙ্গবাঙ্গলগণের অগ্রণী ছিলেন। এই সকল ভিক্ষু অরণ্যবাসী ছিলেন বলিয়াই ছিন্ন ও জীর্ণ বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পরিধান করিতেন। পরে এই নিয়ম প্রায়ই প্রতিপালিত হইত না।

(২) ত্রৈচবরিক। কোনও ভিক্ষুরই এক সময়ে তিনটির অধিক পরিধানোপযোগী পরিচ্ছদ রাখিতে না পারা।

(৩) পৈশুপাতিক। ঘায়ে ঘায়ে ভিক্ষা করিয়া লব্ধ ভিক্ষায় জীবন ধারণ করা। যাহারা এই নিয়ম পালন করিতেন তাঁহারা কদাপি সলাকভত্ত, * সংঘ-ভত্ত ও আমন্ত্রণাঙ্গ গ্রহণ করিতেন না।

(৪) সপদানচারিকা। ভিক্ষাকালে পালনীয় নিয়ম।

(৫) ঐকাসনিক। একাসনে উপবেশন করিয়া ভোজন।

(৬) পত্তপিণ্ডিক। একটি মাত্র পাত্রে ভোজন।

(৭) খলুপশ্চাস্তিক। অতিরিক্ত কিংবা পূর্বে পরিত্যক্ত দ্রব্য ভোজন না করা।

(৮) আরণ্যক। তপস্বীর জ্ঞান অরণ্যে বাস।

(৯) বৃক্ষমূলিক। বৃক্ষ মূলে বাস।

* টিকেট দেখাইলে যে অন্ন পরিবেশিত হইত তাহার নাম “সলাকভত্ত;” এবং ষষ্ঠবাসিগণের আহারের জন্ত যে অন্নাদি প্রদত্ত হইত তাহার নাম “সংঘভত্ত।”

- (১০) আভ্যবকাশিক। অনারত স্থানে বাস। দুইটি খাচায় থাকি ছট্‌ফট্‌ দুটি পাখী,
 (১১) শাশানিক। শ্মশানে বাস। শুধু ব্যর্থ ডাকাডাকি চক্ষুবিদারণ।
 (১২) যথাসনস্তরিক। যে কোন আসনে মাংস অস্থি-পঙ্করের রক্ত হীন ভূধরের
 বিশ্রাম। “রাত্রিকালে বিশ্রামের অন্ত শয্যা রচনা না গাত্রে প্রতিহত দুটি নদীর স্পন্দন,
 করা”ই বোধ হয় যথা সনস্তরিকের প্রকৃত অর্থ। দুই হ’য়ে কিবা প্রয়োজন?
 (১৩) নৈশদ্যিক। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিজা এক হলে বাঁচে দুটি প্রাণ,
 যাওয়া। দুই ভূবা, দুই জন, দাঁউদাঁউ—টলমল,
 পাঠককে অরণ রাধিতে হইবে যে, যে সকল মরোচিকা অলুঅলু সারা দিনমান,
 নাম উল্লিখিত তালিকাভুক্ত হইয়াছে এইগুলি গুণ, কিন্তু ভেঙে বাধা বন্ধরাজি দুটি প্রাণ মিশে আজি,
 এই নামগুলি ব্যক্তিকেও বুঝাইতে পারে; তাহা হইলে উছলি উঠুক অধে দীর্ঘিকার প্রায়,
 এক একটি নামে সেই গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি বা ভিক্ষুকে ফুটাইয়া শতদল আশ্রয়ানন্দে ছল্‌ছল্‌,
 বুঝাইবে। ভূবা যেন তট সম তাহাতে হারায়, আকণ্ঠ ডুবিয়া তাহে মিলন-সঙ্গীত গাহে
 চতুর্থ ও ষষ্ঠ নিয়ম উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল না। আকণ্ঠ ডুবিয়া তাহে পূর্ণ প্রেমানন্দে সর্বভূবা অবসান।
 সেই প্রদেশে ভিক্ষুগণ তুলার বস্ত্রের পরিবর্তে পশমী বস্ত্র এক হলে বাঁচে দুটি প্রাণ।
 ব্যবহার করিতেন। শীতাতপ বশতঃই বোধ হয় এই ব্রীকলিদাস রায়
 ব্যবহার প্রচলন হইয়াছিল।

ভিক্ষুগণ এই সকল নিয়ম পালন করিতে বাধ্য নহেন, তবে এই সকল বিধি পালন করিলে পুণ্য লাভ হয় শাস্ত্রে এরূপ আভাস আছে। ৮ম, ৯ম, ১০ম, ও ১১শ নিয়ম ভিক্ষুগণের পালনীয় নহে, এবং তাহাদের ১১শ, ১২শ ও ১৩শ বিধি পালনে স্পষ্ট নিষেধ রহিয়াছে। শ্রমণ, শ্রমণীগণ দ্বিতীয় বিধি পালন করিতেন না, কারণ ঔষাদিগকে সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত না। সাধারণ ভিক্ষুগণ মাত্র ৫ম ও ৬ষ্ঠ নিয়ম পালন করিতেন।

শ্রীগুরুবদ্ধ ভট্টাচার্য্য।

দুইয়ে এক

দুই হয়ে কিবা প্রয়োজন?

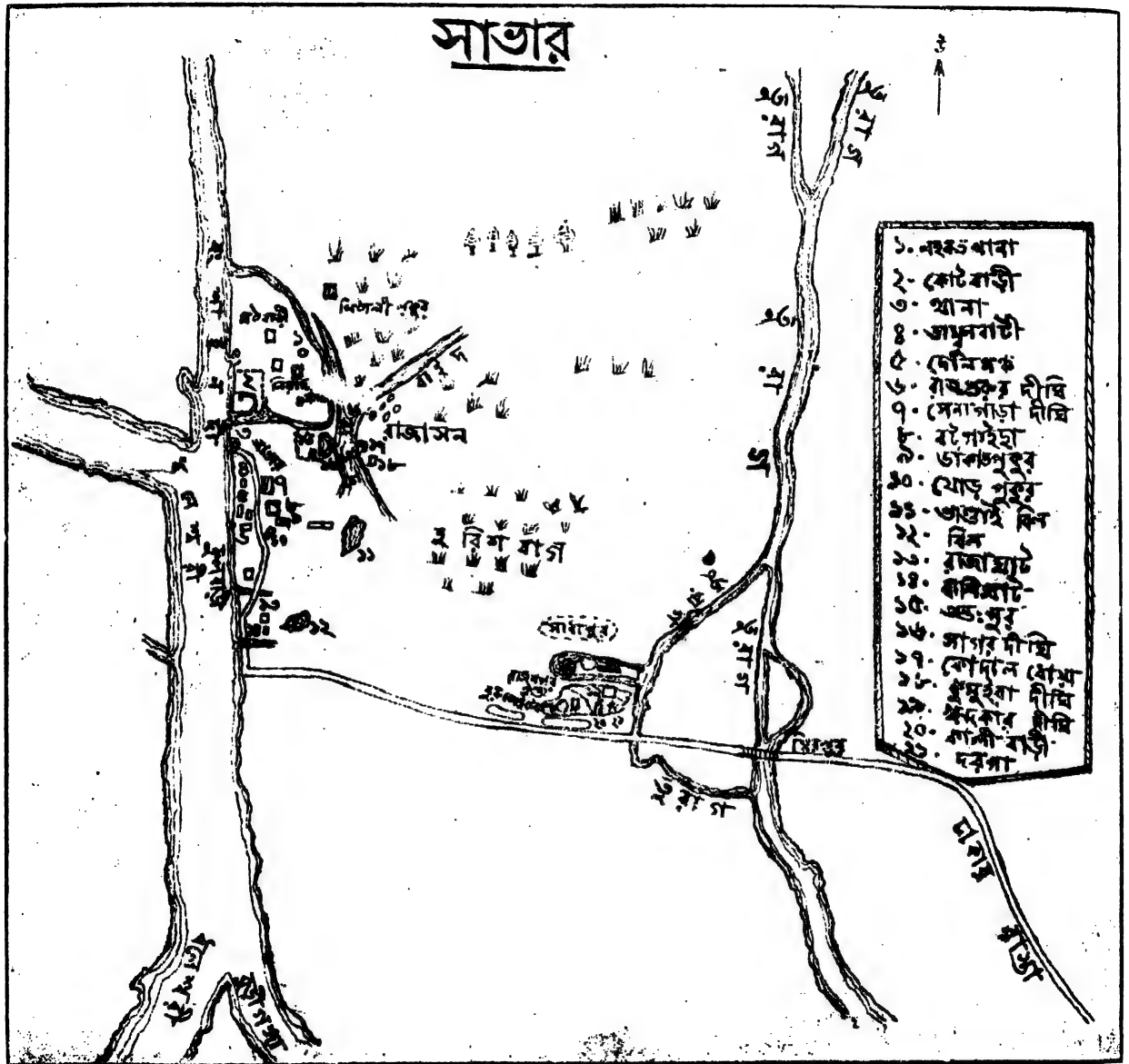
রাত্রিদিন ব্যবধান বাধা বাধি সবধান,
 প্রচণ্ড প্রয়াসে শুধু আংশিক মিলন,
 নয়নের বাতায়নে বসি শুধু দুই জনে,
 মিলিত মিলিবার লাগি বাহু-প্রসারণ।

স্মৃতি।

(Shelley)

তান কাঁপে হিয়ার মাঝার,
 গান যবে থেমে যায়,
 কুসুম শুকায়ে যায় তবু
 আকুল স্রবাস ভাসে বায়।
 পাতা রচে বাসক-শয়ন
 (যবে) গোলাপ সে ঝরে যায় ;—
 তুমি যাবে, স্মৃতিটি তোমার
 রবে প্রেম-স্বপনের ছায়।

শ্রীপরমলকুমার ঘোষ।



সাতারে প্রাচীন কীর্তি

(ঢাকা-সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

ঢাকা নগরীর ছয় ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ফুলবাড়ী, কর্ণপাড়া, সাতার, গান্ধারিয়া, কুণ্ডা প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম অবস্থিত। গ্রামগুলি পরস্পর এক মাইল কোথায়ও বা দুই মাইল ব্যবধান। ইহাদের মধ্যে সাতার গ্রামটি ধলেশ্বরী ও বংশাই নদী ঘরের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত থাকতে বাণিজ্যের সুবিধা হেতু উহা একটি দ্রুত উন্নতি-শীল বন্দরে পরিণত হইয়াছে। সাতারের দেড় ক্রোশ দক্ষিণে ধলেশ্বরী-তটে ফুলবাড়ী গ্রাম। ফুলবাড়ীর বরাবর পূর্বদিকে এক ক্রোশ অভ্যন্তরে কুণ্ডা ও গান্ধারিয়া অবস্থিত। ঢাকা জেলার উত্তর ও মধ্যভাগে যে লোহিত-মৃত্তিকাময় ও বনাবৃত উচ্চভূমি দৃষ্ট হয়, এই গ্রামগুলি সে উচ্চ ভূমির সর্বদক্ষিণাংশে অবস্থিত। ইহাদের অব্যবহিত দক্ষিণ দিক হইতেই নিম্নভূমি আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে সমুদ্র তীর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ভূতাত্ত্বিকের মতে এই নিম্নভূমি কয়েক শতাব্দী পূর্বে বঙ্গোপসাগরের কুক্ষিগত ছিল। বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ সহস্র বৎসর পূর্বে সপ্তগ্রামে সমুদ্রতীরী আগমনের বার্তা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সপ্তগ্রাম ও সাতার প্রায় এক অক্ষরেখাতেই (Latitude) অবস্থিত এবং ইহাদের দক্ষিণাংশ অপেক্ষাকৃত নিম্ন। এই হিসাবে আমরা প্রাচীন কালে ঢাকা জেলার দক্ষিণ ভাগ সমুদ্রনিম্ন ছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারি। অন্তর্দিকে পূর্বকথিত গ্রামগুলি হইতে আরম্ভ হইয়া একটি বিস্তীর্ণ উচ্চ ভূমি ঢাকার উত্তর সীমা দিয়া মৈমনসিংহ জেলার মধুপুরের গড়ের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। এই অরণ্যভূমি পূর্বদিকে নীতললকা হইতে পশ্চিমদিকে বংশাই নদীর তট পর্যন্ত বিস্তৃত। উচ্চতা ও মৃত্তিকার অবস্থা দৃষ্টে এই নগরকে অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। হিংস্রজন্তুবল্ল নিবিড় বনে আবৃত থাকায় এ প্রদেশটিতে অতি বিরল বসতি। অনুসন্ধান ক্রমের ভয়ে এবং এতদঞ্চলে শিক্ষিত লোকের অভাবহেতু এপর্যন্ত কোনও ঐতিহাসিক এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের ইতিবৃত্ত

সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন নাই। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, পূর্ববঙ্গের প্রাচীন ইতিকথা এই অরণ্য-ভূমিতে লোহিত মৃত্তিকা-স্তূপের অভ্যন্তরে লুকায়িত রহিয়াছে। মৃগয়া ব্যাপারে বা অন্য কোনও কারণে যাহারা এই বস্ত্র ভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বিজন বন মধ্যে বিশাল দীর্ঘিকা, ইষ্টকস্তূপ, মৃৎপ্রাচীর প্রভৃতি দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছেন। সম্প্রতি এই অঞ্চলে বিলাবো গ্রামে ভোজবর্মদেবের যে তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, এপ্রদেশটি প্রাচীন পৌণ্ড্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভোজবর্মদেব “শ্রীপৌণ্ড্র-ভূজ্যন্তঃপাতী উদ্যালিকাগ্রাম” দান করিতেছেন বলিয়া উক্ত ফলকে বিবৃত আছে।

এই অরণ্য ভূমিতে কতিপয় প্রাচীন নরপতির রাজত্ব-কথা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, এবং সেই সকল নরপতিগণের কীর্তিকলাপ এখনও অনেক পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে। অল্প আমরা ইহাদের একতম রাজা হরিশ্চন্দ্রের ইতিহাস আলোচনা করিব।

পূর্বকথিত সাতার, ফুলবাড়ী, গান্ধারিয়া প্রভৃতি কতিপয় গ্রামে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কীর্তিরাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। কথিত আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় দেশ হইতে যাত্রা করেন ও কিছুকাল ভোজগোড় নগরীতে বিশ্রাম করিয়া সৈন্যে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হন, এবং এপ্রদেশ বিজয় করতঃ বিশাল রাজ্য সংস্থাপন করেন। বংশাবতী তটে তদীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্বন্ধে আমার জনৈক বন্ধু এই পয়্যারটি পাঠাইয়াছেন—

বংশাবতী-পূর্বতীরে সর্বেশ্বর নগরী।

বৈসে রাজা হরিশ্চন্দ্র জিনি সুরপুরী ॥

উক্ত পয়্যার মতে রাজা হরিশ্চন্দ্র বংশাবতী বা বংশাই নদীর পূর্বতীরে সর্বেশ্বর নগরে রাজধানী নির্মাণ করেন। পয়্যারটি কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না, উহা নাকি লোক-মুখে গীত হইয়া থাকে। কাজেই আমরা তদুপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। সর্বেশ্বরের বর্তমান নাম সাতার; অন্য মতে সাতারকে সম্ভার করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে

কাঙ্ক্ষিক ১০১২

সম্ভারপতি বলা হইয়া থাকে। বোধ হয় সংস্কৃত কোন শব্দের অপভ্রংশ সম্ভার হইতে পারে সে বিষয়ে গবেষণা করিতে করিতে কোনও মনস্বী সম্ভার নাম আবিষ্কার করিয়াছেন। কারণ সম্ভার নামটিও সকলের অজ্ঞাত। সম্ভার বা সর্বেশ্বর ইহাদের কোনটিও ঠিক না হইতে পারে। ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃত নাম বাহির হইবে। আমরা সম্প্রতি হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীকে সর্বেশ্বর নগরই বলিয়া যাইব।

রাজা হরিশ্চন্দ্র কীর্ত্তি স্থাপন করতঃ বহু জনপদ অধিকৃত ও করায়ত্ত করিয়া বিজয়লক্ষ্য অর্থে রাজকোষ পরিপূর্ণ করেন; এবং রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিধান করিয়া রাজধানী সর্বেশ্বর নগর সুশোভিত ও সমলব্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে সর্বেশ্বর নগরের দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে তিন ক্রোশ এবং পরিসর পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় দেড় ক্রোশ স্থানব্যাপী ছিল। এই সুবিস্তৃত রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বংশাবতী তটে গভীর অরণ্য মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সে ভগ্ন স্তূপরাশি এবং তাহাদের অবস্থিতি পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় সর্বেশ্বর নগর বর্তমান ঢাকা নগরী হইতেও বৃহৎ এবং বহু সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল।

ঢাকার উত্তরস্থ লোহিত মৃত্তিকাময় সমগ্র অঞ্চলেই পানীয় জল বড়ই দুর্ঘট। বিশেষতঃ শীত ও গ্রীষ্মকালে কূপ ব্যতীত জল প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রজাবর্গের এই অনুবিধা দূরীকরণার্থ রাজধানী ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে বহু কূপ, দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। রাজবাটীর চতুঃপার্শ্বেই ‘সাড়ে বার গণ্ডা’ বা পঞ্চাশটি দীঘি খনিত হয়। এখনও উহাদের চিহ্ন বর্তমান আছে। রাণী কর্ণাবতীর বিলাসভবন কর্ণপুরীতে সাড়ে সাত গণ্ডা অর্থাৎ ৩০টি সরোবর খনিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত রাজ্ঞী ফুলবতীর বিলাসবাটী, গাঙ্গারগড়, ভট্টপল্লী, মদনপুর প্রভৃতি রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত অগণ্য স্থানে বহু পুষ্করিণী খনিত হয়। কথিত আছে রাজধানীতে দীঘির সংখ্যা মোট “কুড়ি বুড়ি” অর্থাৎ ৪০০

শত; কাহারও কাহারও মতে ৭০০ শত। সর্বেশ্বরের সমগ্র স্থান ভ্রমণ করিলে একথা অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় না। অধিকাংশ সরোবরই এখন ভরট ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনেকের অতি ক্ষীণ চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। কতকগুলিতে এখন ধাতু রোপিত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট দীঘিগুলির চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালে সে সমুদয় জলহীন শুষ্ক ক্ষেত্রে পরিণত হয়। অল্প কয়েকটি দীর্ঘিকাই গ্রীষ্মকালে জলহীন হয় না। কথিত আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রিতে ৩০টি দীঘি ও ৫০টি কূপ খনন করাইয়াছিলেন।*

এই সকল দীঘির অনেকগুলিরই পূর্বনাম বিলুপ্ত হইয়াছে। কৃষকগণ পরিচয়ার্থ উহাদের অবস্থিতি ও তটভূমির প্রকৃতি দৃষ্টে এক একটি নামে উহাদিগকে অভিহিত করিয়া থাকে। আমরা যে কয়েকটি দীঘি ও পুষ্করিণীর নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা ছাড়া বহু দীঘি ও পুষ্করিণী স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে। কেহই তাহাদের নাম বলিতে পারে না।

রাজধানীর অন্তর্গত কতিপয় দীঘি ও পুষ্করিণীর নাম

| | |
|-------------------|---------------------|
| * ১। সাগর দীঘি | * ৬। ধন পুকুর |
| * ২। সুখ সাগর | ৭। নির্ম্মূলী পুকুর |
| * ৩। রাজ সাগর | ৮। লাল পুকুর |
| * ৪। নিরামিষ দীঘি | ৯। ছোবামারা |
| * ৫। সতিনী দীঘি | * ১০। বন পুকুর |

* কেহ কেহ বলেন একদা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্ট উপস্থিত হওয়াতে রাজা শত শত দীর্ঘিকা ও কূপ খনন করাইয়া জলপ্রাপ্তির সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, এবং প্রজাগণ খনন কার্য্যস্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া দুর্ভিক্ষ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বোধ হয় রাজধানীতে সম্পন্ন ব্যক্তিগণের বাটীতে ও সাধারণের ব্যবহারোপযোগী স্থানে এই সকল সরোবর নিখাত হয়।

| | | | |
|----------------------------------|--|--|---|
| ১১। জলরি | * ৩২। ভাটপাড়া দীঘি (ভট্টপল্লীতে) | ৫১। দাইতা বাড়ীর পুকুর | ৫৭। ধোপা খোলার পুকুর |
| * ১২। মঠবাড়ী পুকুর (১) | * ৩৩। সাতপুকুর (সাতটি দীর্ঘিকা এক স্থানে) | * ৫২। বড় খুড়া | ৫৮। মালী পুকুর |
| ১৩। দেওপুকুর | ৩৪। কেউচার পুকুরিণী | * ৫৩। ছোট খুড়া | ৫৯। কুমার পুকুর |
| ১৪। পেটকাটা | ৩৫। শোলার পুকুরিণী | ৫৪। ইছামতী | * ৬০। রাজার পুকুর |
| ১৫। লালটেঁকি | ৩৬। মাগর ডুগী | ৫৫। ডাকাত মারা | * ৬১। আশান পুকুর (মাছুষ পোড়ার টেক সংলগ্ন) |
| ১৬। সাতগাইছা | * ৩৭। সাত বোয়াইলা | * ৫৬। সেনাবাড়ীর দীঘি (কর্ণপাড়াস্থিত সেনা- নিবাসের অন্তর্ভুক্ত) | ৬২। পলোয়ানের দীঘি |
| * ১৭। হাড়িবাড়ী | ৩৮। নালার ঘোণা | | |
| ১৮। আন্ধারডুধা | ৩৯। পিটালী পুকুর | | |
| * ১৯। দোয়াতধোয়া | ৪০। ঘোড় পুকুর (৩টি এক স্থান) | | |
| * ২০। কুমইরা পুকুরিণী (২) | ৪১। বেলগাইছা | | |
| * ২১। কোদালধোয়া } (৩) | ৪২। কলাগাইছা | | |
| * ২২। কোদালধোয়া } | ৪৩। বটগাইছা | | |
| * ২৩। সলারপুকুর (কাঁটা ধোয়া) | ৪৪। আন্ধা পুকুর | | |
| ২৪। সলার পুকুর (কাঁটা ধোয়া) | ৪৫। তাল গাইছা | | |
| * ২৫। চাইরা | ৪৬। বড়ই গাইছা | | |
| * ২৬। চৌমাগা | ৪৭। জীয়াস পুকুর | | |
| * ২৭। চটিমারা | * ৪৮। রাজগুরুর পুকুরিণী | | |
| ২৮। চৌমাচ্চা | ৪৯। সানবাধা পুকুরিণী | | |
| ২৯। নাওগাড়া | * ৫০। তাবুল বাড়ীর পুকুরিণী (৪) | | |
| ৩০। বেকাই পুকুরিণী | | | |
| ৩১। আইচা পুকুর | | | |

(১)। রাজার স্থাপিত মঠের নিয়ে এই পুকুরিণী অবস্থিত। মঠ এখন নাই। উহা ভাঙ্গিয়া পুকুরিণীতে পতিত হয়। এখনও পুকুরিণীর সেই অংশে প্রচুর ইষ্টক পাওয়া যায়।

(২) ইহাতে কুস্তীর ছিল।

(৩) পুকুরিণী কাটাইবার কালে প্রতাহ কার্যশেষে হাত পা ও কোদাল ধোয়ার জল ব্যবহৃত হইত।

(৪) ইহার পশ্চিম তটে দোলঘর, উত্তরে তাবুলবাড়ী ও দক্ষিণে রাজগুরুর আশ্রম।

* চিহ্নিত নামগুলি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক।

এই সমুদয় সরোবর বাতীত অনংখ্য কূপ ও ইন্দারা খনিত হইয়াছিল; বর্তমানে তাহাদের চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোনও স্থলে দুই একটি কূপের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। পূর্বেকৃত দীঘিগুলির মধ্যে সাগরদীঘি অতি বৃহদায়তন। ইহাতে চৈত্র মাসেও প্রায় ২ হাত জল অবশিষ্ট থাকে। এই সাগরাকার বিশাল দীর্ঘিকার পশ্চিম তটে রাজবাটী ও অন্তঃপুর ছিল। এ স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন মনোরম, অবস্থিতিও তেমন রাজনৈতিক কৌশলপূর্ণ। সমভূমি হইতে প্রায় ১৫১২০ ফিট উচ্চ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইষ্টক ও মৃত্তিকাস্তূপ এখন রাজপ্রাসাদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। স্তূপনিচয় বনবাশ ও লতাদি বিজড়িত হইয়া অতি দুর্গম ও নিভৃত অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। এখনও ব্যাঘ্র, বরাহ, সর্প প্রভৃতি স্থাপদনিচয় রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্রের প্রিয় নিকেতনে বসতি করিয়া থাকে। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে ঢাকার বাদামতলিঘাটনিবাসী আমিন হায়দর নামক জনৈক ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়া কতিপয় ইষ্টকব্যবসায়ী রাজ-অন্তঃপুর খনন করিয়াছিল। খননচিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। স্থানীয় বুদ্ধ অধিবাসিগণ এক বাক্যে বলিয়া থাকে যে, এ স্থান খনন করিয়া শত শত নৌকা বোঝাই ইট ও সুরকি ঢাকাতে চালান দেওয়া হইয়াছিল। বন্দোবস্তকারিগণ ৩০।৪০ টাকা দিয়া এক বৎসরের জন্ত বন্দোবস্ত লইত। সারা বৎসর খনন করিয়া সে ইষ্টকরাশি সংগৃহীত হইত উহাই বর্ষাকালে

কার্তিক ১৩১২

সাগরদীঘির ঘাট হইতে নৌকা (১) বোকাই করিয়া চালান দেওয়া হইত। এইরূপে স্থানে স্থানে ২০ এমন কি ৩০ হাত পর্য্যন্ত গভীর গর্ত করিয়া “কপিকল” দিয়া ইট উঠান হইত। প্রাচীর-ভিত্তি এরূপ খনন করাতে স্থানে স্থানে খালের জায় গভীর অথচ সুদীর্ঘ গর্ত এখনও বিদ্যমান আছে। গর্তগুলির দুই ধারে ভয় ইট ও সুরকির স্তূপ সমভূমি হইতে এখনও প্রায় ২০ হাত উচ্চ হইবে। এই সমুদয় খালের জায় বিস্তৃত প্রাচীর-ভিত্তির খাত দেখিয়া বোধ হয় দ্বিতল রাজবাটীর প্রাচীরগুলি প্রায় ৩৪ হাত পরিসর ছিল। বর্তমানে কোনও প্রাচীরই এক গজের অধিক প্রশস্ত হয় না। ইষ্টকগুলিও অতি দৃহদায়তনের।

এই সময়ে সাতারনিবাসী সাহা ও পাল মহাজনগণও এস্থান হইতে বহু ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের আবাস বাটী নির্মাণ করে; এখনও ঐ সকল বাটীতে অব্যবহৃত বহু ইষ্টক রহিয়াছে। যেগুলি দালানে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা এখনও গাঁথা আছে। খার্বাক ব্যবসায়িগণ কর্তৃক বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন কীর্তির এরূপ বিনাশবাস্তা শ্রবণে সন্দেহ হয় ঐতিহাসিক দৃষ্টে ম্রিয়মাণ হইবেন সন্দেহ নাই। আজ যদি রাজবাটী পূর্ববৎ অধনিত থাকিত তবে প্রত্নতত্ত্ববিভাগীয় কর্মচারিগণ কর্তৃক উহা যথানিয়মে খনিত হইয়া জগতের সমুখে বঙ্গীয় প্রাচীন কীর্তির প্রত্যক্ষ নিদর্শন আবিষ্কৃত ও উপস্থাপিত করিত। ভারত-বিখ্যাত মগধরাজপুরী খনন করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যে অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হন নাই বঙ্গরাজ হরিশ্চন্দ্রের রাজপ্রাসাদে সে সমুদয় অবিকৃত ভাবে প্রাপ্ত হইতেন, এবং বাঙ্গালার ইতিহাসে এক নব যুগের আবির্ভাব হইত সন্দেহ নাই।

(১) তৎকালে ইট বোকাই নৌকা রাজ্যসনের উত্তরস্থিত “বাইদ” বা ডবা নদী দিয়া তুরাগ হইয়া ঢাকাতে পৌঁছিত। এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়ে উক্ত ডবা নদীটি প্রকৃত নদীরূপে বারমাস রাজধানীর অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইত। ইহাতেই তৎকালে বাণিজ্যাদির বিশেষ সুবিধা ছিল বলিয়া বোধ হয়।

রাজবাটী খনন কালে যাহারা তথায় উপস্থিত ছিল তাহারা এখন অলীতিপর বৃদ্ধ। আমরা এরূপ কয়েকটি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের * সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম বাটী খনন কালে ধনরত্ন ও মোহর সম্বলিত কতিপয় ভাণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। সেগুলি এরূপ ভাবে গোপন করা হইয়াছে যে, তাহাদিগের উদ্ধারের আর আশা নাই। তাহা ছাড়া কয়েকটি স্বর্ণ থালা এবং তামার বড় বড় পত্রা (বড় থালা)ও পাওয়া গিয়াছিল। প্রাচীর ভাঙ্গিবার কালে খণ্ড খণ্ড মূর্তি সম্বলিত বহু ইষ্টক পাওয়া যায়। দেবমূর্তিও অনেক বাহির হইয়াছিল। তাহার অনেকগুলি স্থানীয় লোকেরা লইয়া যায়। যেগুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয় সেগুলি খননকারিগণ আত্মসাৎ করে। এই সময় চারিখানি ইষ্টক একটি মুসলমান বাটীতে নীত হয়। সেগুলি প্রাক্ষণে হস্তপদ প্রক্ষালনার্থ ব্যবহৃত হইত। মূর্তির চিহ্ন দেখিতে পাইয়া কর্ণপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত আচার্য্য মহাশয় সেগুলি চাহিয়া আনেন। তাহাই শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র কর্তৃক ঢাকা সাহিত্য-পরিষদে প্রেরিত হইয়াছে। বহুমূল্য শাল ও পরিধেয় বস্ত্র এবং ধাতুপূর্ণ কতিপয় ভাণ্ডও (মটকি) পাওয়া গিয়াছিল। বস্ত্রাদির ও ধাতুর বর্ণ শত শত বৎসর পরেও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ছিল। কিন্তু হস্তস্পর্শ মাত্র সেগুলি ধূলিতে পরিণত হইয়া যায়। অনুসন্ধানে ভাণ্ডগুলির কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অন্তঃপুরের অব্যবহিত উত্তরে কাটাগাঙ্গ। এই কাটাগাঙ্গ বংশাবতী হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় সরল রেখা ক্রমে পূর্বাভিমুখে সাগর দীঘির উত্তর তট পর্য্যন্ত আসিয়া উত্তর দিকে যাইয়া রাজবাটী হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরে পুনরায় বংশাবতীতে পতিত হইয়াছে। কাটাগাঙ্গের তটদেশে উচ্চ মৃত্তিকা-প্রাচীর উহার উৎপত্তি হইতে পতন

* ইহাদিগের মধ্যে জনৈক মুসলমান রমণীর পিত্রালয় রাজ-অন্তঃপুরেই বর্তমান। উহারা প্রায় একশত বৎসর হইল ঐ স্থানে গৃহাদি নির্মাণ করিয়া বসতি করিতেছে। রমণী বালিকা বয়সে স্বচক্ষে খনন-স্থানে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি দেখিয়াছিল।

স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মৃত্তিকা-প্রাচীরের বর্তমান বিস্তার ৪ হইতে ১০ ফিটের মধ্যে; বর্তমান উচ্চতা ৫ ফিট হইতে ১৫ ফিট। ইহাতে মধ্যে মধ্যে বড় বড় ইষ্টকখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। কাটাগাঙ্গ খনন করিয়া উহার মৃত্তিকা দ্বারা এই সুদীর্ঘ প্রাচীর বা বেড় প্রস্তুত হইয়াছিল। কাটাগাঙ্গ একটি কুলা বা পরিখা বিশেষ। উহার বর্তমান পরিসর ৪০ হইতে ৫০ ফিট। গভীরতা ৫ হইতে ১০ ফিট। বর্ষাকালে কাটাগাঙ্গে প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয়। রাজধানীর অভ্যন্তরে নৌকা যোগে গমনাগমনের ইহাই একমাত্র অবলম্বন।

যে সমতল ভূভাগের উত্তর ও দক্ষিণ সীমায় কাটাগাঙ্গ ও তটস্থিত প্রাচীর এবং পশ্চিম সীমাতে বংশাই নদী, রাজধানীর মধ্যে সেই সমতল প্রদেশই সর্কাপেক্ষা সুরক্ষিত স্থান। সাগর দীঘির উত্তর তীর হইতে প্রায় ৭০০ গজ উত্তরে পূর্বোক্ত প্রাচীরের অভ্যন্তরে “নিরামিষ দীঘি” অবস্থিত। দীঘি অতি বিস্তৃত। চারি পার সমভূমি হইতে প্রায় ৪ হাত উচ্চ। গ্রীষ্মকালে উহা শুষ্ক হইয়া যায়। হবিষ্কাশিনী ধর্ম্মরতা রাজ-মাতার নিমিত্ত এই পুষ্করিণী খোদিত হয়। ইহা একেবারে মৎস্য বিহীন। এক্ষণে ইহাকে আক্ৰিও নিরামিষ দীঘি বলে। চতুর্দিকের মুসলমানপণ বলিল, বর্ষাকালে নিরামিষ দীঘির চতুঃপার্শ্বে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ দীঘিতে একটি ক্ষুদ্র মৎস্তের চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় না। সম্ভব মৎস্য উহাতে নিক্ষেপ করিলে উহা সম্বর পক্ষ হইয়া থাকে।

নিরামিষ দীঘির ৩০০ হাত উত্তরপূর্বে কাটাগাঙ্গের ১০০ শত হাত পশ্চিমে একটি উচ্চ ভিটি বর্তমান আছে। উহা সমভূমি হইতে ৩০ ফুট উচ্চ। স্তুপের উপরে দুইটি কূপ বর্তমান আছে। উহাদের চারিধার ইষ্টকে বাধান ছিল। ইষ্টকগুলি এখনও বর্তমান রহিয়াছে। তাহা ছাড়া স্তুপের উপরিভাগ শুধু ইষ্টকে আবৃত। এই স্থানে একটি সমুচ্চ গম্বুজ (Dome) ছিল। উহার উপরি-

ভাগ হইতে প্রত্যহ তানলয় সংযোগে নহবত বাস্ত হইত। অনেক সময় মহারাজ স্বয়ং গম্বুজের শিখর-দেশে বায়ু সেবনার্থ পরিভ্রমণ করিতেন। * এতদ্ব্যতীত গম্বুজ-শীর্ষ হইতে কতিপয় প্রহরী সৈন্ত স্তূপের নিরীক্ষণ করিয়া শত্রু সমাগম পর্য্যবেক্ষণ করিত। স্থানটি এখনও নহবতখানার নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এই, রাজা হরিশ্চন্দ্র এই গম্বুজ-শীর্ষ দিয়া স্বর্গপথে যাতায়াত করিতেন।

নহবতখানার উত্তরপশ্চিমে মঠবাড়ীর পুকুর। ইহার তটদেশে বিরাটকায় সমুচ্চ মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মঠের অন্তর্ভুক্ত চূড়া সর্কেশ্বরের গৌরবস্বরূপ দিগ্দিগন্তে রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্রের কীর্তি ঘোষণা করিত। সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধ শ্রমণদিগের একটি আশ্রম ছিল।

মঠবাড়ীর বহু উত্তরে ভট্টপল্লী। এই স্থানে রাজ-ভট্টগণের বসতি ছিল। সেকালে ভাটগণ দেশের জীবন্ত সংবাদপত্র রূপে বিরাজ করিতেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র তৎকালীন নিয়মানুসারে ভাটদিগকে বহু ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দ্বারা পালন করিতেন। তাঁহারা দেশ দেশান্তরে রাজকীর্তি প্রচার ও দোত্য কার্য্য নির্বাহ করিতেন। হরিশ্চন্দ্রের কীর্তি বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ভাটগণও এস্থান হইতে বহু কাল হইল অন্তর্হিত হইয়াছেন। এখন কতিপয় মুসলমান ভাটপাড়ায় বসতি করিয়া থাকে।

ছইলাকলমানামক স্থানে রাজ-সৈন্তের “চান্দমারি” হইত, অর্থাৎ এই স্থানে তীরদ্বারা লক্ষ্যভেদ শিক্ষা দেওয়া হইত।

অস্তঃপুরের উত্তরাংশে মদনপুরনামক স্থানে প্রকাণ্ড বাজার ছিল। এতদ্ব্যতীত ভাটপাড়ার উত্তর-পশ্চিমস্থ চাইরা-চৌমাথা নামক স্থানেও দুইটি বৃহৎ সরোবর ও দুইটি প্রসিদ্ধ বিপণি অবস্থিত ছিল। চারিটি

* সাধারণের বিশ্বাস এই যে, উক্ত গম্বুজশীর্ষ আকাশের সহিত সংলগ্ন ছিল। রাজা গম্বুজের শীর্ষদেশ দিয়া প্রত্যহ আকাশে বেড়াইতে যাইতেন।

বৃহৎ রাজ-পথের সংযোগ-স্থান বলিয়া উহা চাইরা চৌমাথা নামে খ্যাত। মেরিখোলা এবং আরও অন্যান্য স্থানে রাজার বন্দর থাকার প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাজবাটীর পশ্চিমে কাটাগানের উত্তর তটে এবং বংশাবতীর পূর্বপারে যে স্থানে কাটাগান ও বংশাবতী একত্র মিলিত হইয়াছে, তথায় হরিশ্চন্দ্রের কোটবাড়ী বা দুর্গ অবস্থিত। কোটবাড়ী চতুষ্কোণ। চতুর্দিকে প্রায় ২০ ফুট উচ্চ লাল মাটির প্রাচীর। প্রাচীরের পরিসর নিম্ন দিকে ১২ হাত। প্রাচীরের বহির্দেশে প্রায় ৩০ ফুট প্রশস্ত পরিখা চতুর্দিকে কোটবাড়ীকে বেষ্টিত করিয়াছে। পশ্চিম দিকে বংশাবতীর প্রবাহ বর্তমান থাকায় সে দিকের মাত্র ক্রিয়দংশ পরিখা-বেষ্টিত। প্রাচীরের দক্ষিণ দিকে কাটাগান পরিখা রূপে বর্তমান। দুর্গের চারি দিকে চারিটি বহির্গমন পথ বা দ্বার দৃষ্ট হয়। প্রাচীরের অভ্যন্তরে সমভূমিতে সেনানিবাস স্থাপিত ছিল। সমভূমির পরিমাণ ৬০ বিঘা হইবে। উহা এখন কাঁঠাল বাগিচায় পরিণত হইয়াছে। দুর্গটি ঢাকা লালবাগ কেলা হইতে কিছু ছোট হইবে। কিন্তু উহার অবস্থান অতি কৌশলপূর্ণ এবং নিশ্চিন্ততার রণ-বিজ্ঞায় অনন্তজ্ঞতার পরিচায়ক। কোটবাড়ীর দুর্গ রাজধানীর উত্তর-পশ্চিম দিক রক্ষা করিত। “ধলেশ্বরী” বা বংশাই অতিক্রম করিয়া কোনও শত্রুর পক্ষে নগর প্রবেশ করা তৎকালে অসাধ্য ছিল।

রাজ-প্রাসাদের সমুখস্থ বিশাল সাগরদীঘিতে তিনটি বাধান ঘাটের অবশেষ পাওয়া যায়। দীঘির পশ্চিম তটে রাজপুরীর অভ্যন্তরে প্রমোদবন ছিল। প্রমোদবনের অভ্যন্তরস্থ “কেলি-সরোবর” এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে; উহা প্রায় তরুট হইয়া আসিল।

সাগর দীঘির পূর্বতীরে একটি জলপ্রণালী বা “বাইদ” রহিয়াছে। বাইদটি (১) প্রায় ৩০০ শত হস্ত বিস্তৃত। উহার তলদেশে শাল রোপিত হইয়া থাকে। এই বাইদটি

নববতখানার উত্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া কাটাগানের সহিত সমান্তরাল ভাবে দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া সাগর-দীঘির পূর্বতট দিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে চলিয়া আসিয়াছে। বাইদের পশ্চিম তটে সাগর দীঘি এবং বরাবর অপর তটে “কোদাল ধোয়া” ও “কুমইরা দীঘি” বর্তমান আছে। কুমইরা পুষ্করিণীর ২০০ শত হাত উত্তর হইতেই রাজাসনের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

রাজাসনে রাজার বহির্কীর্টি ও “দরবার গৃহ” ছিল। দরবার গৃহে বা ‘সভা নিকেতনে’ রাজ সিংহাসন স্থাপিত থাকায় উহা “রাজাসন” নামে বিখ্যাত হয়। বর্তমানে ‘সভা নিকেতনে’র চিহ্ন মাত্রও নাই। স্থানটি আবাদ হইয়া যাওয়াতে কৃষকগণ চতুর্দিক কাটিয়া সমভূমি করিয়া ফেলিয়াছে। কেবল পাঁচটি শীর্ণকায় স্তূপ এখনও ক্ষীণ দেহে রাজ-সমৃদ্ধির ক্ষীণ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এই স্তূপগুলিও কর্তিত ও কর্ণিত হইয়াছে। স্তূপের অভ্যন্তরে ঐতিহাসিকের প্রিয় পদার্থ বিদ্যমান থাকিতে পারে। কৃষকগণ কোদাল দিয়া যত্নর সাধ্য স্তূপের উচ্চতা কমাইয়া তদুপরি হলকর্ণ ও শস্তরোপণ করিতেছে। হলকর্ণকালে বহু ভগ্নমূর্তি স্তূপ হইতে বাহির হইয়াছিল। কোনটির হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও বা কেবলমাত্র কোমর পাওয়া যায়। মূর্তিগুলি প্রায় সমুদ্রই লাল মাটির, এবং কতকগুলি অতি বৃহদাকার ছিল সন্দেহ নাই। কয়েক মাস হইল একটি স্থান কর্ণকালে অর্ধ হস্ত পরিমিত দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তর মূর্তি ও তিনখানি গোলাকার প্রস্তর দ্রব্য বাহির হয়। মূর্তিগুলি অভয় ও অতি সুন্দর কারুকার্য-খচিত ছিল। কৃষক বালকগণ সেগুলি ভাঙ্গিয়া চূড়মার করিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও পাঁচখানি কৃষ্ণ বর্ণের মূর্তি অত্র এক স্থানে পাওয়া গিয়াছিল। কৃষকেরা সকলেই মুসলমান। তাহারা মূর্তি পাইয়া সকলেই পর্যবেক্ষণে রত হয়, সেই সময় কতিপয় নীচ জাতীয় হিন্দু সন্তান সে পথে চলিয়া যাইতেছিল। তাহারা মূর্তিগুলি চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনখানি মূর্তি না কি রোয়াইলের জমিদার বাড়ীতে প্রেরিত হয়। রাজাসন

(১) উচ্চ ভূমি হইতে জল সরিবার নিমিত্ত ‘বালেক’ নামে একটি পয়ঃপ্রণালীকে এতদঞ্চলে ‘বাইদ’ বলা হয়।

এই ধ্বংসাবশেষগুলির উত্তরেই পূর্ববর্ণিত বাইদের ত্রায় আর একটি বাইদ উত্তরপূর্ব কোণ হইতে আসিয়া প্রথমোক্ত বাইদে মিশিয়াছে। বাইদ দুইটির সঙ্গমস্থানটি ধ্বংসাবশেষ নিচয়ের উত্তরপশ্চিম কোণে অবস্থিত; সুতরাং রাজ্যসনের অবস্থিতি কিরূপ প্রাকৃতিক রহস্ত-পূর্ণ এবং উহার দৃশ্য কিরূপ মনোরম তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইবে। সম্ভবতঃ সুদূর অতীত যুগে এই বাইদ দুইটি তুরাগের ত্রায় পার্শ্বত্যা নদীরূপে বর্তমান ছিল। কালক্রমে নদী-খাত ভরট হইয়া উহা বাইদে পরিণত হইয়াছে। ওনা যায় রাজ্যসনের উত্তরস্থিত বাইদকে ঢাকার বাইদ বলে। উহা দ্বারা পূর্বে নৌকাদি তুরাগ নদীতে বাহির হইত। রাজ্যসনের পূর্বদিকে সমতল প্রান্তর। দক্ষিণপূর্বে গোপের বাড়ী। এই স্থানে রাজার প্রকাণ্ড গোশালা বর্তমান ছিল। উহার নিকটেই ঘাসমহাল ও গোচারণ-মাঠ।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের দুই জন মহিষী ছিলেন। প্রথমা করণাবতী (কর্ণাবতী); দ্বিতীয়া ফুলবতী। রাজা বৃদ্ধ বয়সেও পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত থাকিয়া অবশেষে ফুলবতীর পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু বিধির বিপাকে পুণ্যবান্ হরিশ্চন্দ্রের পুত্রমুখদর্শন ঘটে নাই। রাজা দুই রাণীর নিমিত্ত রাজধানীতে দুইটি দীঘি খনন করেন। তাহাই এখন “দুই সতিনের” দীঘি নামে খ্যাত।

রাণীদ্বয়ের নিমিত্ত দুইটি বিলাসভবনও নির্মিত হয়। রাণী কর্ণাবতীর বিলাসভবন কর্ণপুরী এখন কর্ণপাড়া নামে পরিচিত। আর ফুলবতীর কেলি-নিকেতন এখন ফুলবাড়িয়া নামে কথিত হয়।

কোটবাড়ীর অর্ধ ক্রোশ দক্ষিণদিকে বংশাবতী-তটে রাজ্ঞী কর্ণাবতীর বিলাসভবন কর্ণপুর নির্মিত হয়। কর্ণপুরীতে কেবল রাজ্ঞীর বিলাসভবন ছিল না। এই স্থানে বংশাবতীর তটদেশ হইতে প্রায় ১০০ হাত পূর্বদিকে রাজার দোলমঞ্চ নির্মিত হয়। দোলমঞ্চ এখনও রাজকীর্তির নিদর্শনরূপে নীরবে দণ্ডায়মান আছে। মঞ্চের অর্ধাংশ লোকে কাটিয়া ফেলিয়াছিল। যে ভিত্তি বিদ্যমান আছে

তাহার বর্তমান দৈর্ঘ্য পূর্বপশ্চিমে ১২০ ফিট এবং উত্তর-দক্ষিণে ২৬ ফিট। সম্ভবতঃ মঞ্চটি উত্তর দক্ষিণেই অধিক বিস্তৃত ছিল। মঞ্চের অবস্থিতি দৃষ্টে উহাই প্রতীত হয়। কিন্তু মঞ্চ-ভিত্তির অব্যবহিত উত্তরাংশ কাটিয়া জনৈক লোকের বাসভবন প্রস্তুত হওয়াতে এখন কিছুই চিনিতে পারা যায় না। বর্তমান মঞ্চটি কাটিয়া যে টুকু অবশিষ্ট রাখিয়াছে তাহার নিম্নদিকের আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ৪২ ফিট। শিরোভাগের আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৪০½ ফিট, পূর্ব-পশ্চিমে ২৪½ ফিট। মঞ্চের শিরোভাগ ভূমি হইতে ২৮ ফিট উচ্চ। দোলমঞ্চের বিভিন্ন স্থানের যে পরিমাপ দেওয়া হইল তাহা দেখিয়া বুঝা যাইবে মঞ্চটি কিরূপে কর্তন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ পূর্বে ইহা একটি বিরাট মঞ্চ ছিল। ঢাকা পল্টন মাঠের উত্তরে সৈন্যদিগের ক্রীড়া যে “চাঁদমারি ভিটা” প্রস্তুত হইয়াছে দোলমঞ্চটি প্রায় তত বড় অথচ চতুষ্কোণ ঘন-ক্ষেত্রের (cube) আকৃতি বিশিষ্ট ছিল। এই বিশালকায়, সমুন্নত দোলমঞ্চে মহাসমারোহে রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্র অমাত্যবন্ধুসহ বসন্তোৎসবে যোগদান করিতেন।

দোলমঞ্চের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কত ঐতিহাসিক গৌরবস্মৃতি উদ্ভিত হইয়া মন আনন্দ রসে আপ্লুত করে! বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় দোলমঞ্চ অল্পদিন পরেই কোদালের আঘাতে সমভূমিতে পরিণত হইবে। আমরা কর্ণপাড়া নিবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

দোলমঞ্চের পূর্বদিকে পুষ্করিণী। উহা উৎসবকালে ব্যবহৃত হইত। মঞ্চের অব্যবহিত দক্ষিণ দিকে বংশাবতী-তটে রাজগুরুর আশ্রম ছিল। এখন সে স্থানটিতে কতিপয় বাটী ও বৃক্ষ অবস্থিত আছে। উহার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগেই “রাজগুরুর দীঘি” এখনও সাধারণের নিষ্কট পূর্বনামে পরিচিত।

দোলমঞ্চের উত্তর দিকে রাজার তাণ্ডুলবাড়ী ছিল। কর্ণাবতী-ভবনে বিশ্রাম ও তাণ্ডুলবাড়ীতে রাজা তাণ্ডুল চর্চণ করিতেন। তাণ্ডুলীরা তাণ্ডুলপাত্র হস্তে সসন্মানে

দণ্ডায়মান থাকিত। তাহুলিনীরা রাণীর সহচরীর কার্য করিত এবং তাহুল-করক হস্তে রাণীর অঙ্গুগমন করিত। তাহুলবাটীর পূর্বে এখন জেলা বোর্ডের সড়ক প্রস্তুত হইয়াছে। তাহুলবাটী ও বর্তমান সড়কের পূর্বদিকে সেনাপাড়া অবস্থিত। এই স্থানে সহস্র সহস্র রাজসৈন্য পরিখা-বেষ্টিত ভূমিতে অবস্থিতি করিত। পরিখার ক্ষীণ রেখা এখনও বিদ্যমান আছে। সেনাপাড়ায় সেনাপতিও বসতি করিতেন। এই স্থানের উত্তরদিকে একটি দীঘি বর্তমান আছে; উহাকে সেনাপাড়ার দীঘি বলে। দক্ষিণদিকে বটগাইছা, ডাকাডপুকুর, কলাগাইছা, বেলগাইছা, ষোড়পুকুর প্রভৃতি পুষ্করিণী সৈন্তগণের পানীয় সংগ্রহার্থে খনিত হইয়াছিল।

তাহুলবাটীর উত্তরেও একটি দীঘি বর্তমান আছে; উহাকে “সানবাধা” দীঘি বলে। গ্রীষ্মকালে উহা শুষ্ক হইয়া যায়। পুষ্করিণীটির দক্ষিণ তীরে এখনও ইষ্টক বাধান সুন্দর ঘাট বর্তমান আছে। ঘাটটি পাঁচ, ছয় রকমের ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত। নিয়ে তাহাদের পরিমাণ ইচ্ছিতে প্রদত্ত হইল।

| | | |
|----|--------|-------|
| ১। | ৬×৫×১০ | ইঞ্চি |
| ২। | ৫×৪×৮ | “ |
| ৩। | ৫×৫×১৮ | “ |
| ৪। | ৬×৪×৫ | “ |
| ৫। | ৭×৫×১৪ | “ |
| ৬। | ৮×৬×১৮ | “ |
| ৭। | ৬×৫×১৫ | “ |

রাজবাটীতে যে সমুদয় ইট ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাদের কতকগুলির পরিমাণ ঐরূপ; অনেকগুলি আবার অতি বৃহৎ আয়তনের—

| দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | বেধ |
|-------------|----------|--------|
| ১। ২০—২২ ই: | ১০—১২ ই: | ৩—৪ ই: |
| ২। ১০—১২ ই: | ৫—৬ ই: | ৩—৪ ই: |

যাহা হউক কর্ণপাড়ায় “সাড়ে সাত গণ্ডা” অর্থাৎ ত্রিশটি দীঘির প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা যে

কয়েকটির নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহাদের অধিকাংশই সৈন্তদের নিমিত্ত খনিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ সেনাপাড়া রাজার প্রধান সেনানিবাস ছিল। সম্ভবতঃ এইজন্যই সুরক্ষিত স্থান বোধে ইহার নিকটেই পাটরাণীর বিলাসভবন নিৰ্ম্মিত হয়। সেনাপাড়া রাজধানীর মধ্যস্থলে থাকিয়া নদী-তট ও মধ্যভাগ রক্ষা করিত।

সেনানিবাসের উত্তরাংশে কাতলাপুর নামক স্থানে এখন ৬ কানাইলাল নামক বিগ্রহের একটি আখড়া বিদ্যমান আছে। আখড়াটি বোধ হয় শত বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। স্থাপয়িতার নাম আন্দারাম মাঝি, (১) জাতিতে জালিক। কানাইলালের মূর্তি প্রস্তরে খোদিত অতীব সুঠাম। এই মূর্তিটি ছাড়া আরও দুইখানি প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি রহিয়াছে। একটি নরসিংহ মূর্তি অণুটি চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি। এতদ্ব্যতীত কতিপয় ধাতুনির্ম্মিত মূর্তিও স্থাপিত আছে। প্রস্তর মূর্তিগুলির উচ্চতা প্রায় দেড় হাত হইবে।

কর্ণপাড়ার অর্ধ ক্রোশ দক্ষিণে বংশাবতী বা ধলেশ্বরী-তটে ছোট রাণী ফুলবতীর বাসভবন পরে নিৰ্ম্মিত হয়। এই স্থানে রাজার পুষ্পোদ্ভান ছিল। রাজফুলবাড়ীর অনেক স্থান ধলেশ্বরীর কুক্ষিগত হওয়াতে প্রাচীন কীর্তি লোপ পাইয়াছে। যে স্থান অবশিষ্ট আছে তথায়ও এরূপ ঘন বসতি হইয়া গিয়াছে যে, প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ অসম্ভব। তথাপি এইস্থানে দুইতিনটি প্রাচীন বৃহৎ দীর্ঘিকা

(১) আন্দারাম নবাব সরকারে নৌকা বাহিত। একদা পল্লানদী অভিক্রম কালে আন্দারাম মাঝি নৌকার ভিতর হইতে শুনিতে পাইল কে তাহাকে “আন্দারাম আন্দারাম” বলিয়া ডাকিতেছে। আন্দারাম বাহির হইতে প্রশ্ন করিল “কে আপনি?” উত্তর হইল— “আমাকে দেখিতে পাইবে না, আমি—কানাইলাল, পাষণ্ডমূর্তিতে নদীগর্ভে পতিত আছি। এখন আমাকে উঠাও; আমি আর নদীগর্ভে থাকিব না।” আন্দারাম উঠাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিতে দৈববাণী হইল “জাল ফেলিলে যখন টান পড়িবে তখনই আমাকে উঠাইবে।” আন্দারাম তাহুসারে কার্য্য করিয়া কানাইলালকে উঠাইয়া নিজ গৃহে লইয়া যায়।

এখনও শুদ্ধ দেখে আপনাদের প্রাচীনতা ও খননকারীর রাজসমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। একটি প্রাচীন দীঘির নাম “ক্ষিত্রগতি (ক্ষিপ্ৰ ?) সরোবর।” ফুলবাড়ীয়ার পূর্বাংশে রাজাঘাট ও বালিঘাট বর্তমান আছে; এই উভয় ঘাটের মধ্যস্থলে শুদ্ধ নদীর ক্ষীণ চিহ্ন দৃষ্ট হয়। রাজা ফুলবতীর বাসভবনে অবস্থান কালে রাজা এই ঘাটের জলে স্নান করিতেন বলিয়া আজিও উহা রাজাঘাট নামে কথিত হইয়া থাকে। রাজফুলবাড়ীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণ হইতেই উচ্চ ভূমি ও লোহিত মৃত্তিকাময় আরণ্য অঞ্চল শেষ হইয়াছে। ইহাই সর্কেশ্বর নগরের সর্বদক্ষিণ অংশ। কোটবাড়ী হইতে ফুলবাড়ীর দক্ষিণাংশ দেড় ক্রোশ ব্যবধান।

পূর্বকথিত কোটবাড়ী, সাভার, ভাটপাড়া, মদনপুর, কর্ণপাড়া এবং ফুলবাড়ী প্রভৃতি গ্রামগুলি সর্কেশ্বর নগরের বিভিন্ন অংশ বিশেষ। বংশাবতীর পূর্বতটে রাজবাটী কর্ণাবতী ও ফুলবতীর বাসভবন সমন্বয়ে অবস্থিত। ইহার প্রত্যেকটিই পূর্বে পরিখাবেষ্টিত থাকার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। রাজবাটী হইতে বিস্তৃত সকল রাজপথই নদী-তট দিয়া কর্ণপাড়া ও ফুলবাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কাহারও কাহারও মতে হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীর নাম সম্ভারনগর। একথা সত্য হইয়া থাকিলেও বোধ হয় কেবল রাজবাটী ও তাহার চতুঃপার্শ্ব স্থানকে সম্ভার বলা হইত, তাহাই এখন সাভার আখ্যা পাইয়াছে।

প্রাচীন রাজবাটীর বিভিন্ন অংশ এখন বড়বলীমেহার, মস্জিদপুর (১) ও ইমামদিপুর (২) নামে খ্যাত।

কোটবাড়ীর ও সেনাপাড়ার দুর্গ বাতীত আর একটি

দৈববাণী হওয়াতে উহাকে তথা হইতে পুনরায় কাতলাপুরে আনা হইয়াছে। আখড়াটি জনৈক জালিক কতৃক পরিচালিত। উহার ৩ খাদ্য ৫ পানী (৩/ পানী) দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। মন্দির ইটক নিৰ্ম্মিত।

(১) মস্জিদ = ধর্মমন্দির।

(২) ইমাম = ধর্ম।

বিশাল দুর্গ রাজধানীর দক্ষিণ ভাগ রক্ষা করিত। উহার নাম গাঙ্গারপুর। বর্তমানে গাঙ্গারিয়া নামে পরিচিত। গাঙ্গারগড় ফুলবাড়ী হইতে এক ক্রোশ পূর্বে এবং রাজাসন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। গাঙ্গারিয়ার বর্তমান অবস্থান সন্দর্শন করিলে স্থানটি যে অতি যত্নে নিৰ্ম্মিত বৃহৎ দুর্গ ছিল তাহা স্বতঃই প্রতিভাত হয়। গাঙ্গারিয়ার চতুর্দিকে প্রায় ৩৫০ হস্ত পরিসর বিশাল পরিখা বিস্তৃত আছে। পরিখাটি প্রায় তুরাগ ও বংশাই প্রভৃতি পার্শ্ব নদীদ্বয়ের দ্বারা বিস্তৃত। এখন উহার অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে। মধ্যভাগে এখন প্রায় ৫০ পঞ্চাশ হস্ত বিস্তৃত একটি খাল বর্তমান আছে। এই মধ্য অংশ এখনও সমস্ত বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকে। গ্রীষ্মকালেও ইহার গভীরতা তিন হাতের কম নহে। প্রায় ডিম্বাকারে পরিখাটি গাঙ্গারপুর পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীন পরিখা যতদূর বিস্তৃত ছিল উভয় তটের ততদূর হইতে ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া বর্তমান শীর্ণকায় পরিখার তীর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এখন উভয় তটস্থিত ঢালু জমিতে ধান্ন রোপিত হইয়া থাকে। পরিখাটি পূর্বদিকে দুইটি শাখা দ্বারা তুরাগ নদীর সহিত সম্মিলিত। পরিখাতে এখনও রীতিমত জোয়ার ভাটা খেলিয়া থাকে। পশ্চিম দিক হইতে আর একটি খাল বংশাই হইতে আসিয়া পরিখাতে পতিত হইয়াছে। এই খালটি কেবল বর্ষাকালে জলপূর্ণ হয়। গাঙ্গারপুরের সমৃদ্ধির সময়ে উভয় দিক হইতে উক্ত খাল দ্বারা পরিখার সহিত বংশাই ও তুরাগের সংযোগ রাখা হইত। ফলে পরিখা সর্বদা গভীর জলে পূর্ণ থাকিত এবং নৌকারও সুবিধা ছিল। পরিখার বর্তমান গভীরতা সমভূমি হইতে ২৫—৩০ ফিট হইবে। বঙ্গদেশে এক্ষণে সুদৃঢ় পরিখাপূর্ণ দুর্গ অতি বিরল। পরিখার অন্তর্ভুক্ত স্থান অতি উচ্চ এবং মৃত্তিকা খোর লোহিত বর্ণের। স্থানটির দৈর্ঘ্য পূর্বপশ্চিমে এক মাইল এবং প্রস্থে অর্দ্ধ মাইল হইবে।

এই বিশাল গড়ের পশ্চিমাংশে রাবণ রাজার বাটীর

কাঙ্ক্ষিক ১০১১

ঋণসাবশেষ বিভ্রম। রাবণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশীয় ছিলেন। সঙ্গীত বিভাগ্য তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তদীয় আবাস বাটীতে সঙ্গীত কলাভিজ্ঞ বহু ব্যক্তি বসতি করিতেন। ভৌর্যাত্মিক সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা স্থল বলিয়া তদীয় সভা দেশবিখ্যাত ছিল। সঙ্গীতজগৎ রাজা রাবণের নেতৃত্বে বিদ্বৎ তালময় সংযুক্ত রাগ রাগিণী আলাপন দ্বারা মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সন্তোষ বিধান করিতেন। কাল বশে রাজা রাবণের ৭১ পুরী অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু স্থান ও বংশ-মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হয় নাই। আজিও তথায় কতিপয় বিদ্বৎ সঙ্গীতজ্ঞ কর্তৃক সাময়িক রাগ রাগিণীর আলাপন হইয়া থাকে। রাজা রাবণ এই প্রসিদ্ধ চূর্ণকে গান্ধারপুর আখ্যা প্রদান করেন।

রাজা রাবণের বাটীর উত্তর দিকে পরিধা-তটে ঋশান-ভূমি। ঋশান-ক্ষেত্রের চতুর্দিকে জল বেষ্টিত ছিল। ঋশান ভূমির বর্তমান দৈর্ঘ্য ৪৪০ ফিট এবং পরিসর ২০০ ফিট। হুইটি উচ্চ স্তূপে শব দাহ করা হইত। ঋশান-স্তূপসংলগ্ন পূর্বদিকে একটি চতুষ্কোণ পুষ্করিণী হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সলিল সংগৃহীত হইত। পুষ্করিণীর বর্তমান দৈর্ঘ্য ১৮০ ফিট। বহু কাল যাবৎ এ ঋশান-ক্ষেত্রে কোনও শব দাহ করা হয় না। কারণ উহার নিকটবর্তী স্থানে কোনও বসতি নাই। অনেকটা ব্যবধানে ঢালিপাড়ায় মুসলমান বসতি। কিন্তু আজিও স্থানটি “মাহুঘ পোড়া টেক” নামে পরিচিত।

রাবণ রাজার বাড়ীর পশ্চিম দিক হইতে ঢালিপাড়া আরম্ভ হইয়াছে। গড়ের অধিকাংশই ঢালিপাড়ার অন্তর্গত। ঢালিপাড়ায় ৫২ হাজার ঢালি সৈন্ত বসতি করিত বলিয়া, প্রবাদ শুনা যায়। উহারাই গড়ের সংরক্ষক ছিল। সম্ভবতঃ রাজা রাবণ উহাদের নেতা স্বরূপ বসতি করিতেন। এই বিশাল ঢালিবাহিনী কর্তৃক রাজধানীর দক্ষিণপূর্বভাগ সুরক্ষিত ছিল।

ঢালিবাড়ীর উত্তরপশ্চিমাংশে একটি উচ্চ স্তূপ ছিল। স্তূপটি এখন কর্তন করিয়া উহাতে কদলী বন প্রস্তুত

হইয়াছে। এই উচ্চ স্তূপ হইতে সৈন্তগণ দূরগত শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিত। স্তূপের নিম্নে ইষ্টক বাধান বিস্তৃত ঘাট পরিধার তলদেশ পর্য্যন্ত নামিয়াছে। ঘাটের ইষ্টকাদি এখন অপস্থত হইয়াছে। স্থানে স্থানে খণ্ড খণ্ড ইষ্টক বিভ্রম আছে। কিন্তু ঘাটটির চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট।

ঢালিবাড়ীর উত্তর-পূর্বাংশে বাগবাড়ী। বাগবাড়ীর পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যগণ এতদঞ্চলে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ রাজবাটীর দ্বারপণ্ডিতরূপে বিরাজ করিতেন। বাগবাড়ীর পণ্ডিতদিগের কথা লোকে শত-মুখে কীর্তন করিয়া থাকে, কিন্তু হায় কালের কুটিল গতিতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিপুল কীর্তিনিচয়ের সহিত সে দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিতগণের বংশও বিলুপ্ত হইয়াছে। বাগবাড়ীর জায় একরূপ সমতল উচ্চ ভূমি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপরিপূর্ণ স্থান অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বাগবাড়ীর দক্ষিণেই রাজার দীঘি। উহার দৈর্ঘ্য ৪১২ ফিট এবং বিস্তার ২৭৬ ফিট। দীর্ঘিকাতে চৈত্র মাসেও এক হস্ত গভীর জল থাকে। কেহ কেহ ইহাকে সম্প্রতি “আন্ধা পুকুর” বলিয়া থাকে। রাজপণ্ডিত বর্গের নিমিত্তই এই দীঘি খনিত হইয়াছিল। “রাজা রাবণের বাটা”, “ঢালিবাড়ী” এবং “বাগবাড়ী” বেড় দ্বারা অপরাংশ হইতে পৃথক থাকান্তে গান্ধারিয়ার অবশিষ্টাংশ “বেড়াইদ” নামে কথিত হয়। শেযোক্ত স্থানে “নগর বসতি” অর্থাৎ নাগরিকগণের বাসস্থান ছিল।

গান্ধারগড়ের পূর্বদিক হইতে নিম্ন ভূমি তুরাগ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গড়ের উত্তরদিকস্থ পরিধার অব্যবহিত উত্তরে সাধাপুরগ্রাম। এখানেও অনেক প্রাচীন দীঘি বর্তমান আছে। এই স্থানটিতে ধোপা, মালী, কর্মকার প্রভৃতি শ্রমজীবী জাতীয় লোকের ব্যবহারার্থেই জলাশয় খনিত হইয়াছিল। তজ্জন্ত পুষ্করিণীগুলির নামও তদনু-যায়ী। যথা :—(১) ধোবাখোলার পুকুর, (২) মালী-পুকুর ইত্যাদি।

সাধাপুরের উত্তরে রাজাসন হইতে প্রায় অর্দ্ধ কোশ

দক্ষিণপূর্বে হরিশবাগ (১) অবস্থিত। এইস্থানে রাজা হরিশচন্দ্র বিবিধ কলের উদ্ভাৱন প্রস্তুত করেন। স্থানটি এখন নিবিড় বনে আবৃত, বহু বৃক্ষসম্বিষ্ট এবং বিজন। হিংস্র ঋপদনিচয়ের আবাসভূমি বলিয়া কেহই তথায় নিরস্ত্র ঘাইতে সাহসী হয় না। এখানেও ইষ্টকথণ্ড বিস্তৃত-মান আছে। সম্ভবতঃ এখানে রাজার উদ্ভাৱনবাটী নির্মিত ছিল।

আমরা সংক্ষেপে রাজধানী সর্বোত্তম নগর ও তদন্তর্গত বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা করিলাম। বিশাল রাজধানীর প্রত্যেক স্থান পুণ্যভূমিরূপে অনুসন্ধান করিলে আরও ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যাইবে। রাজধানী বিজন অরণ্যে পরিণত হওয়াতে অনুসন্ধান অতীব কষ্টদায়ক হইয়াছে সন্দেহ নাই।

রাজা হরিশচন্দ্র এই বিশাল রাজধানী নির্মাণ করিয়া শত্রুবিজয় করতঃ দোদাঁড়প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি অতি ধার্মিক ও প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। প্রত্যহ দুগ্ধবতী গাভী ও স্বর্ণ দান করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতেন। কৃষকগণ বলিয়া থাকে রাজা প্রত্যহ ৫৬ পুস্তরি স্বর্ণ দান করিতেন। পুণ্যবান্ হরিশচন্দ্রের নাম এতদঞ্চলে প্রাচীনস্মরণীয়।

রাজা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াও পুত্রযুগ্ম দর্শন করিতে পারেন নাই। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে সহোদরা রাজেশ্বরী দেবীর গর্ভজাত রাজা দামোদরকে রাজ্য প্রদান করিয়া তিনি প্রত্যাগমন করিলেন। *

(১) কেহ কেহ ইহাকে হরিশবাগ বলিয়া থাকে।

* হরিশচন্দ্রের তিরোধান সম্বন্ধে একটি প্রবাদ এতদঞ্চলে আপামর সাধারণে প্রচারিত রহিয়াছে—বৃদ্ধবয়সে রাজা নিজপুত্রীহিত রাণীগণ, দাস দাসী ও আত্মীয় কুটুম্বাদি লইয়া সমগ্রীয়ে স্বর্গাভিমুখে প্রয়াণ করেন। পুণ্যবান্ হরিশচন্দ্রের এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনে দেবগণ ঈর্ষ্যাবিষ্ট হইলেন। রাজা অনুচরবর্গের কোলাহলে মর্মে অবস্থান অসম্ভব হইবে স্থির করিয়া তাঁহারা রাজাকে আর অগ্রসর হইতে দিলেন না। স্বর্গদ্বার অবরুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু বহুত পুণ্যবলে রাজা আর ধরাধামে পতিত না হইয়া তদবধি ত্রিশমুখ দ্বার স্বর্ণ ও মর্দোর

রাজবাটীতে যে সকল মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তদ্বৃষ্টে বোধ হয় রাজা স্তম্ভ বুদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্ম্মেই আস্থাবান্ ছিলেন। বৌদ্ধমূর্তি নিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে দোলমঞ্চ, রথ-খোলা প্রভৃতি দর্শনে এ কথাই সমর্থিত হয়। বস্তুতঃ রাজা উভয় ধর্ম্মেই অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। সেকালে বহু রাজপরিবারেই এরূপ হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল স্রোত এবং বৌদ্ধ সম্রাটগণের প্রাধান্য থাকিতে অনেক স্থলেই এরূপ হইত। বিশেষতঃ বৌদ্ধ যুগের শেষ ভাগে হিন্দুগণ বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করিতে আর কোনও গোলযোগ ছিল না। ফলে রাজগণ হিন্দু প্রজাগণের মনোরঞ্জনার্থ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানেও বিশ্বাস হইতেন না। তবে যাহারা রথযাত্রাকে দন্তযাত্রা বলিতে চাহেন আমরা তাহাদিগকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিব কি না সন্দেহ।

হরিশচন্দ্র বৌদ্ধ ছিলেন একথা শুনিবা মাত্র কতিপয় নব্য ঐতিহাসিকপ্রবর ঘরে বসিয়া বসিয়া হরিশচন্দ্রকে ‘পাল’ উপাধিতে ভূষিত করিয়া পালবংশের তালিকাভুক্ত করিতে ব্যগ্র হন। এরূপ গবেষণা প্রশংসাজনক বটে। আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, কাহারও নিকট এই ভিত্তিহীন কথার প্রমাণ পাইতে পারি নাই। বিশেষতঃ রাজা হরিশচন্দ্রের যে অধস্তন পুরুষগণ এখনও বিস্তৃমান তাহারা এ কথা ঘৃণাকরেও স্বীকার করেন না। এরূপ স্থলে কাল্পনিক বিষয়ে বিতণ্ডা অনর্থক। হুংধের বিষয় ঐতিহাসিক অনুসন্ধানেন নূতন ত্রতী কর্ম্মকর্ম ব্যক্তিগণও ইহাদিগের দ্বারা বিপথে

মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন। এ অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান সকল জাতীয় লোকেরই বিশ্বাস যে, ধান, চাউল বা শস্তাদি গৃহে আনিয়া রাখিয়া না রাখিলে রাজা হরিশচন্দ্র পরিবারবর্গের আহারার্থ উহা হইতে কতক অংশ অপহরণ করিয়া থাকেন। পুণ্যবান্ মহাপতির কি শোচনীয় পরিণাম!। শ্রীলোকেরা পারিবারিক কোনও কার্যের ক্রততা হেতু শস্তাদি রাখিয়া রাখিবার অবসর না পাইলে অন্ততঃ উহার কিয়দংশ করপুটে লইয়া তিন চারিবার রাখিবার অভিনয় করিয়া রাখিয়া যাইবেই।

কার্তিক ১৩১১

চালিত হইয়া পড়েন। এই শ্রেণীর লোকদিগের রচিত দুই একখানি আধুনিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া সর্বেশ্বর অঞ্চলের কতিপয় ব্যক্তিও পাল উপাধি ব্যবহারের ইচ্ছা করিয়া থাকেন। বারাস্তরে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্ত শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা হরিশ্চন্দ্র আবির্ভূত হন। বংশ পত্রিকামতে হরিশ্চন্দ্র হইতে বর্তমানে ৩৮ আটত্রিশ পুরুষ চলিতেছে। তিন পুরুষে একশত বৎসর ধরিলে রাজা এখন হইতে প্রায় ১৩০০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১১১২—১৩০০=৬৮৮ সনে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন প্রমাণিত হয়। বংশ পত্রিকার বিবরণী ব্যতীত আরও নানাবিধ প্রমাণ দর্শনে আমরা সপ্তম শতাব্দীতেই হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাব স্থির করিতে অভিলাষী। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজকীর্তির বাহা কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে তাহাতেই একথা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজা ছিলেন না। রামপালে বল্লালসেনের যে কীর্তিংশেব দৃষ্ট হয় তাহা ইহার শতাংশেরও তুল্য নহে। সুতরাং রাজা হরিশ্চন্দ্র সেনবংশের সমসাময়িক হইলে বিক্রম-পুরের অব্যবহিত উত্তর-স্থিত সর্বেশ্বর নগরীর বিবরণী অন্ততঃ কথাপ্রসঙ্গেও উল্লিখিত থাকিত। ইহাতে বোধ হয় হরিশ্চন্দ্র নবম শতাব্দীর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অল্প দিকে বৌদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্রের শাসন কালে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ প্রাধিক্রম হইত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট এবং নবমে শঙ্করাচার্য্য ভারত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম বিতাড়িত করেন। সুতরাং ৭ম শতাব্দীতে হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাবই সম্ভবপর হইয়া উঠে। হরিশ্চন্দ্রের পর তদীয় ভাগিনেয় রাজা দামোদর এবং তৎপর দামোদরের দ্বিতীয় কি তৃতীয় অধস্তনের সময় কোচ সৈন্যগণ সর্বেশ্বর অধিকার করিয়া নগর বিধ্বস্ত ও রাজবংশকে বিতাড়িত করিয়াছিল। আমরা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে আসামরাজ (১) হর্ষদেব

কর্তৃক গোড়, উৎকল, কলিঙ্গ, কোশল প্রভৃতি দেশ বিজয়ের বার্তা পাইয়া থাকি। সম্ভবতঃ ঐ সময়েই কোচ ও আহম সৈন্য সর্বেশ্বর ধ্বংস করিয়াছিল। তাহা হইলে উক্ত ঘটনার ৩৪ পুরুষ পূর্ববর্তী রাজা হরিশ্চন্দ্র সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই প্রমাণিত হয়। খৃষ্টীয় ৬২৯—৬৪৫ অব্দ পর্য্যন্ত পরি-ব্রাজক হিউয়েনত্ সাঙ এদেশে অবস্থিতি করেন। তদীয় বিবরণে ‘সর্বেশ্বর’ বা ‘সম্ভার’ কোনও নামই পাওয়া যায় না। বোধ হয় সর্বেশ্বর নগর সংস্থাপনের কতিপয় বৎসর পরেই হিউয়েনত্ সাঙ এদেশে আগমন করেন। নব রাজধানী তখনও দেশ বিখ্যাত হইতে না পারায় উহা উল্লিখিত হয় নাই। অথবা খৃষ্টীয় ৬৪৫ অব্দের অব্যবহিত পরেই সর্বেশ্বর নগর বিনিশ্চিত হয়।

সর্বেশ্বর পরিভ্রমণ কালে তথাকার জনৈক শিক্ষিত লোকের সহিত আমাদের আগমন হয়। তাঁহার মতে রাজা হরিশ্চন্দ্র মগধরাজ অশোকের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। আমরা কথাটি বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে রাজা হরিশ্চন্দ্র ভাগিনেয় দামোদরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। রাজা দামোদর হরিশ্চন্দ্রের সহোদর। রাজেশ্বরী দেবীর গর্ভসম্ভূত। কুবকগণ দামোদরকে “দামুরাজা” ও রাজেশ্বরী দেবীকে “রাজিরানী” বলিয়া থাকে। রাজা দামোদর রাজ্যসনেই অধিক সময় বসতি করিতেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যসন পূর্বাশ্রয়ী শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। রাজ্যসনকে তজ্জন্ত দামোদর রাজ্যের রাজধানীও বলা হয়। রাজা দামোদরের শাসনকালেও রাজবংশের দোর্দণ্ড প্রতাপ বর্তমান ছিল। রাজা দামোদর কর্তৃক রাজ্যসনের দক্ষিণ দিকে রথখোলানামক স্থানে প্রতি-বৎসর মহাসমারোহে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। এখন তথায় রথযাত্রার কোনও লক্ষণ বিদ্যমান নাই বটে, কিন্তু স্থানটি এখনও রথখোলা নামে পরিচিত। রাজ্যসনের সন্নিকটে সর্বেশ্বর পতি রাজা দামোদরের

‘পীলখানা’ ও অশখালার চিহ্ন এখনও লোকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া থাকে।

দামোদরের পর হইতেই রাজবংশের অবনতি আরম্ভ হয়। বিশাল রাজ্য ক্রমশঃ কোচগণ অধিকার করিতে থাকে। আহম ও কোচগণ রাজসৈন্য নিৰ্ম্মূল করিতে করিতে মধুপুর ভাওয়াল প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়া অবশেষে রাজধানী অবরোধ করিল। সর্বেশ্বরপতি প্রাণপণ সত্ত্বেও রাজধানী রক্ষা করিতে না পারিয়া সপরিবারে সর্বেশ্বরের দক্ষিণ—পূর্বস্থিত সুরক্ষিত গান্ধারগড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয়ী বিপ্লবদল মহোন্মাদে রাজধানী অধিকার করিয়া রাজভবন ও পণ্যবীথিকানিচয় লুণ্ঠন পূর্বক প্রাসাদ ও দেবালয় বিচূর্ণ এবং হট্টস্থান ও প্রকৃতিপুঞ্জের আবাস নিচয় অগ্নিস্রাব করিয়া প্রস্থান করে। এই সময় হইতেই কোচগণ ভাওয়াল অঞ্চলে বসতি নির্মাণ করতঃ অবস্থিতি করিতেছে।

কোচবাহিনী চলিয়া গেলে বিশ্বস্ত সর্বেশ্বরের পুন-নিৰ্ম্মাণ বহুবায়সাধ্য এবং কার্য্যতঃ অসম্ভব বৃত্তিতে পারিয়া তদানীন্তন সর্বেশ্বরপতি গান্ধারপুর পূর্কোপেক্ষা সুরক্ষিত করতঃ তথায় বসতি করিতে থাকে। এই সময় হইতেই রাজ্যসন প্রভৃতি পরিত্যক্ত হইয়া বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়া যায়। একমাত্র কোটবাড়ীতে তখন কতক সৈন্য রাজ্যের উত্তর দিক সংরক্ষণার্থ অবস্থিতি করিত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আসামরাজ হর্ষদেবের শাসনকালে সম্ভবতঃ এই আক্রমণ ব্যাপার সংঘটিত হয়।

এই সময়ে গান্ধারপুরে নব রাজধানী নির্মাণ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। পরিখাবেষ্টিত গড়ের অভ্যন্তরে কেবল রাজ-অস্ত্রপুর, গুপ্তভবন, অস্ত্রাগার, সৈন্যনিবাস ও দ্বারপণ্ডিতবর্গের সমাবেশ স্থান ছিল। রাজবাটী, রাজ-কর্ম্মচারিগণের বসতি, সভাক্ষেত্র, বিপণি প্রভৃতি সম্বলিত রাজধানীর নিমিত্ত গান্ধারপুরের দক্ষিণদিকে পরিখার অব্যবহিত দক্ষিণস্থ উচ্চ ভূমি মনোনীত হয়। বর্তমানে

উহা “রাজনগর কোণা” (কুণা) নামে কথিত। গান্ধার-গড় ও “রাজকুণ্ডার” মধ্যে কেবল পরিখাটি ব্যবধান। “রাজকুণ্ডা” গান্ধারিয়া হইতে আয়তনে অনেক বিস্তৃত। উহার দৈর্ঘ্য দেড় মাইল এবং প্রস্থ প্রায় এক মাইল হইবে। গ্রামটি প্রায় ডিম্বাকার। ইহার উত্তর দিকে গড়ের পরিখা কার্য্যতঃ ইহারও পরিখারূপে অবস্থিত। পূর্বদিকে তুরাগ নদী প্রবাহিত। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকেও পরিখা-বেষ্টিত করিয়া কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি বহির্গমন পথ* রাখা হইয়াছিল। বিস্তৃত পরিখার সুস্পষ্ট নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। উহার অনেক স্থান ভরাট হইয়া গেলেও তলদেশ এখনও অতি নিম্ন। গ্রামটির চতুর্দিকেই জলাভূমি; স্থলসৈন্তের পক্ষে দুর্গম। নব রাজধানীর পশ্চিম প্রান্তে বহির্কোণী (সভা-গৃহ) ও প্রকাণ্ড বিপণিক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছিল।*

রাজা দামোদর হইতে একাদশ অশ্বস্তন রাজা শিবচন্দ্র রায় অতি বিজ্ঞোৎসাহী ও ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ ইহার সময় হইতেই রাজবংশ শক্তিমত্তে দীক্ষিত হন। ইনি ব্রহ্মচারী বেশে ভারতের বহু তীর্থ পর্য্যটন করেন, এবং কতিপয় বৎসর ৬পুরীধামে অবস্থিতি করিয়া তথায় একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। রাজা শিবচন্দ্রের সময়ে কোটবাড়ী ও গান্ধারপুর এই দুইটি দুর্গ রাজবংশের অধিকৃত ছিল।

রাজা হরিশ্চন্দ্র হইতে দ্বাদশ অশ্বস্তন শিবচন্দ্র সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বল্লালসেন কিম্বা তৎপিতা বিজয়সেনের সম-সাময়িক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। শিবচন্দ্রের পর হইতেই তদীয় বংশধরগণের অবস্থা ক্রমেই অবনত হইতে

* রাজকুণ্ডার দক্ষিণ হইতেই নিম্ন ভূমি আরম্ভ হইয়াছে। এই নিম্ন ভূমি বৎসরে প্রায় সাত মাস জলে পরিপূর্ণ থাকে। কতিপয় বৎসর পূর্বে এই সমুদয় নিম্ন ভূমি নল, খাগড়া প্রভৃতি জলজ ভূগাদি পরিপূর্ণ ও হিংস্র জন্তুনিচয়ের আবাসভূমি ছিল। সম্ভ্রুতি উহা আবাদ হইয়া গিয়াছে। এই নিম্ন ভূমি দক্ষিণে বুড়ীগঙ্গার তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ধাকে। সেন রাজত্বের শেষ সময়ে ইহার কার্য্যতঃ একটি প্রাচীন ভূম্যধিকারী-বংশে পরিণত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

ইহার দুই তিন শত বৎসর পরে এই বংশে মুসলমান রাজত্বকালে কতিপয় মহাপুরুষ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা বারাস্তরে তাঁহাদের কীর্ত্তি-কলাপ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধিতে অল্প এখানেই আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

পরিশেষে আর একটি কথা বক্তব্য এই যে, সর্ব্বোত্তমের রাজকীর্ত্তিনিচয় সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কতিপয় কৃতবিদ্য লেখক স্বল্প বিশ্বর আলোচনা করিয়াছেন। ঢাকার খ্যাতনামা ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় ব্রজমুন্দের মিত্র মহাশয় এবং বিক্রমপুর নিবাসী পরলোকগত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট গঙ্গামোহন লঙ্কর মহাশয় একাদিক্রমে সাতার, ফুলবাড়িয়া, গাঙ্গারিয়া প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া রাজবংশ-ধরগণের নিকট পূর্ব্ববিবরণ চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষানুগত সংস্কার ও সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া উহারা তৎকালে বিশেষ কোনও বিবরণ প্রদান করিতে অস্বীকৃত হয়। ৮গঙ্গামোহন লঙ্কর মহাশয় এতদর্থে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিয়াও রাজকীর্ত্তি নিচয়ের যৎসামান্য পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই উদ্ধার করিতে পারেন নাই। বঙ্গীয় ঐতিহাসিক মাড্রেই অবগত আছেন যে, বুদ্ধদিগের নিকট প্রাচীন পুঁথি বা কাগজপত্র দেখিতে চাহিলে তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই অস্বীকৃত হন এবং অহুসঙ্কিত্তর প্রতি সন্দিগ্ধনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। আমরা অনেক স্থলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাহা হউক যে সমুদয় বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহারই স্থূল মর্ম্ম প্রকাশিত হইল। এতদ্ব্যতীত আরও যে সমুদয় কীর্ত্তির নিদর্শন বিদ্যমান ও প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে একে একে তৎসম্বন্ধে আলোচনার বাসনা রহিল। সর্ব্বোত্তমের চতুঃপার্শ্ব বিজ্ঞান অরণ্যে পরিণত হওয়াতে এক দিকে যেমন অনেক স্থানই হুর্গম ও অপ্রকাশিত

রহিয়াছে অল্প দিকে তেমনই ধ্বংসাবশেষ নিচয়ের চিহ্ন সমূহ অতি সূক্ষ্ম বিদ্যমান। তথাপি বর্ত্তমান বংশধরগণের সাহায্য ব্যতিরেকে অনেক কীর্ত্তিরই মূল আবিষ্কার কষ্টকর হইয়া পড়িত। আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে যে বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। প্রবাদ চিরকালই প্রবাদ। উহার উপর ইতিহাস দণ্ডায়মান হইতে পারে না। তবে প্রবাদের বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া অগ্রসর হইলে বিলুপ্ত ঐতিহ্য তব সংগৃহীত হইতে পারে। ইহা ভাবিয়াই আমরা সমগ্র বিষয়টি স্মরীবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম। তরসা করি কৃতবিদ্যব্যক্তিগণ এবিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অহুসঙ্কান করিয়া প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলনে প্রয়াসী হইবেন।

শ্রীবিজয় কুমার রায়।

বাগ্মা

নির্ঝড় মেঘেতে ঘেরা সঙ্গীহীন সাঁঝে
গ্রহগুলি দূরে রেখে রুদ্ধ কক্ষ মাঝে
ছিহ্ন একা চিন্তামগ্ন ; থাকিয়া থাকিয়া
ক্রুদ্ধ ঝঞ্ঝা বসুধার বন্ধ আলোড়িয়া
অধীরে বহিতেছিল করিতে প্রকাশ
বিরাত বিশ্বের কোন্ অতৃপ্ত উচ্ছ্বাস !
যেন সতীদেহত্যাগে ক্ষিপ্ত রুদ্ধ দূত
আক্ষালিয়া দক্ষপূরে তাণ্ডব অদ্বুত

বিগত আবারের প্রবাসী পত্রিকায় ঐযুক্ত নীনশচন্দ্র সেন মহাশয় হরিশচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথার অবতারণা করিয়াছেন। আমাদের এই প্রবন্ধ পূর্বেই লিখিত হওয়ায় তৎসম্বন্ধে এবার আলোচনার অবকাশ হইল না। বারাস্তরে হরিশচন্দ্রের অন্তরে কীর্ত্তিকলাপসহ ঐযুক্ত নীনেশ বাবুর প্রবন্ধের সমালোচনা করিবার বাসনা রহিল।

লেখক।

নিবেদিতে ভূতনাথে শোক-সম্ভাচার
কৈলাসে ছুটিতেছিল করি হাহাকার!—
ভাবিতে লাগিছে সেই বিদায়ের কথা,
শৈলশৃঙ্গে শৈলসুতা, সৌদামিনী যথা,
প্রণমিয়া ধ্যানমগ্ন ধূজটির পায়
দক্ষযজ্ঞে যেতে যবে মাগিলা বিদায়!
আগীর্ষাদী জবা ছুটি কর্ণমূলে দিয়া
ভোলায় মঙ্গল হস্ত উঠিল কাঁপিয়া!
হায় মা সে জবা ছুটি নিয়ে কর্ণমূলে
আর না আইল ফিরে মহেশ্বরের কোলে!
তখন যেমিয়া জিহবা ক্রুদ্ধ ক্রুদ্ধ নাগ
গর্জিয়া ঘোষিল যেই ভৈরবের রাগ,
আজিও গবাক্ষ-রন্ধ্রে বুধি সে রসনা
ঝলসিছে বোম্বে করি বিজলী রচনা!
ক্রুদ্ধ কন্ধে ক্রুদ্ধ দীপ জলিতেছে ক্ষীণ
আমি বসে' শয্যাপার্শ্বে হেন চিন্তালীন;—
সহসা খুলিল দ্বার, একটি উজ্জ্বল
উন্নত বস্তার জ্বায় করি অট্টহাস
মুহূর্ত্তে সে ক্ষীণ দীপ করিয়া নির্মাণ
শত রন্ধ্রে অন্ধবেগে করিল প্রস্থান!—
হারে মূঢ় অন্ধ ঝঙ্কা! কে তুই কোতুকী
ফিরিস্ সতত বিশ্ব-রন্ধ্রে দিয়ে উঁকি?
কে তুই সৃষ্টির শাস্তি করে' সদা গ্রাস
ধ্বংসের আনন্দ নিয়ে করিস্ উল্লাস?
ক্রুদ্ধ কীট তন্তুজালে ব্রহ্মের কোটরে
রচি যেই ক্রুদ্ধ গৃহ নীরবে বিহরে,
দুৎকারে যেমন তাহে দিস্ উড়াইয়া
তেমতি 'আবার চণ্ড উজ্জ্বল' বহিয়া
কন্ধ-চ্যুত করে' দিস্ গ্রহ উপগ্রহ,
ধ্বংস নিয়ে একি তোর খেলা অহরহ!

সৃষ্টির হৃ'কূলে বসি জীবন-মরণ,—
তুই কিরে সে দূরত্ব করিতে হরণ

ধূজিয়া বেড়াস্ বিশ্ব! যেথা আলো হাসে,
মুছে ফেনে' তোর দৃষ্ট উদ্ভাস উজ্জ্বল
বিশ্বেরে ঠেলিস্ যেন নিতে অনিবার
ঘনীভূত রহে যথা মৃত্যুর আঁধার!
আঁধার-কন্ধের মম মুক্ত দ্বার দিয়া
যে অন্ধ আবেগ তুই যাইছে ছুটিয়া,
তার মধ্যে তুই কিরে হাহা হাহা করি
হাসিছিস্ ব্যঙ্গ-হাস্ত জয়-গর্ক স্বরি!
চিরস্থির অন্ধকার মৃত্যুর যে স্থান,
তুই কিরে সেথা মোরে করিস্ আহ্বান!
কোথা নিয়ে যেতে চাস্! শূন্যে তারা নাই,
নিয়ে জড় জীব কিছু দেখিতে না পাই,
শুধু তুই, আর আমি! যে অজানা দেশে
যাত্রী করে' নিতে মোরে এলি সাধী বেশে,
কত দূরে সেই দেশ! অজুলি ধরিয়া
নিয়ে যবে যাবি মোরে অন্ধকার দিয়া,
মোর যদি মনে হয়, বিশ্বভূমণ্ডল
হারা'য়ে অতীতে কোন্ নিগূঢ় মঙ্গল,
সতীহারা শিব সম, মথিয়া আকাশ
করিছে সতত হেন আকুল উজ্জ্বল।
ক্রুদ্ধ কঠে নাগ সম তুই ঝঙ্কা তার
করিস্ সে শুভ তরে সদা হাহাকার,—
তোর সনে সে মঙ্গল আমি যদি চাই,
তুই কি কহিবি শুধু, নাই, নাই, নাই!

ত্রিযশোদালাল বণিক।

সাধক মৃত্যুঞ্জয়

সোনার বাংলার নির্জন পল্লীতে বিভিন্ন সময়ে কত
কণজন্মা মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া
ভূমিকা।
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম-বলে দেশের মুখ
উজ্জল করিয়াছেন তাহার একটা

ধারাবাহিক ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই,—বর্তমান যুগে নবীন ঐতিহাসিকগণ ধ্বংস-স্তূপ, শিলালিপি, তাম্র-শাসন হইতে প্রকৃত ঘটনার ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধারে যেরূপ বিপুল শক্তি, প্রবল অনুসন্ধিৎসা ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতেছেন তাহাতে মনে হয় তাঁহারা এদিকের লুপ্ত-প্রায় ইতিহাস ও জীবনচরিতের উদ্ধার সাধনে ত্রুটি হইয়া দেশবাসীকে বিপুল ঋণে আবদ্ধ করিবেন। ইহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে ধর্ম ও কর্ম-বীরদের পুণ্য কাহিনীর উদ্ধার সাধন হইলে বঙ্গদেশ ধন্য হইবে, বাংলার জীবন কল্যাণ ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

প্রায় অশীতি বৎসর পূর্বে বিক্রমপুরের অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অধীন দেবভোগ বালক মৃত্যুঞ্জয়। নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে “বারুই” বংশে মৃত্যুঞ্জয় দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন।

ইহারা বারুই, পানের রুবি ও পান বিক্রয় ইহাদিগের ব্যবসায়। মৃত্যুঞ্জয় দত্তের পিতার আর্থিক অবস্থা বড় সম্বল ছিল না। কাজেই ইহার লেখাপড়ার কোন ভাল বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। মৃত্যুঞ্জয়ের মাসি আদর—যত্নে ইহাকে লালন-পালন করিতেন। অর্থকরী বিজ্ঞান সুশিক্ষিত না হইলেও মৃত্যুঞ্জয় সংঘমী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁহার উন্নত ললাট ও প্রতিভাব্যঞ্জক চক্ষু দেখিয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে হইত। গ্রামের লোক তখনও মৃত্যুঞ্জয়কে জানিত না। গর্জিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজ সরল-প্রাণ সাধকের কোনও সংবাদ রাখিত না। এক দিন প্রভাতে মাসী-বাড়ীর সংলগ্ন পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ ভিটায় এমন এক দৈব ঘটনা ঘটিল যে, সেই হইতে নিরঙ্কর মৃত্যুঞ্জয় ‘সাধক মৃত্যুঞ্জয়’ নামে বিক্রমপুরের সর্বত্র বিশেষতঃ বারুই সমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন।

ভোর হইয়াছে। প্রভাতারুণ বাগানের গাছের পাতার ফাঁক দিয়া মাটিতে লুটা-সত্যশ্রু প্রাপ্তি। ইয়া পড়িতেছে। বালক মৃত্যুঞ্জয় মাসির গৃহ হইতে একটু দূরে

পরিত্যক্ত ভিটার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে কোথা হইতে মুখ ব্যাদান করিয়া একটা ব্যাঘ্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখে মানুষ দেখিয়া ব্যাঘ্রের সর্বদেহ ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল, ক্রোধে তাহার দুইটি চক্ষুর তারা হইতে অগ্নি ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সে বিস্কন্ধ মহাসাগরের তায় অক্ষুট গর্জন করিতেই মৃত্যুঞ্জয়ের অঙ্গুলি সঞ্চালনে

‘নিরুদ্ভাষ অমনি বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,
নীরব বিহঙ্গকুল, শান্ত বনচর,
বলি হারি প্রহরীর এমনি শাসন,
চিত্রলেখা সম ভাব সমস্ত কানন!’ *

সহসা সমুজ্জ্বল আলোর বগায় সেই তিমিরাবৃত বন-ভূমি ভাসিয়া গেল—মায়ারূপী ব্যাঘ্র নিজ সৌম্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের কানে মন্ত্র দিয়া চলিয়া গেল। বাল-যোগীর স্কন্ধারবিন্দ তুলা দুই নেত্র নিম্নীলিত হইল এবং তাহার দেহের চতুর্দিকে একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল। মৃত্যুঞ্জয় “যোগানন্দে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মাসি খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন,—মৃত্যুঞ্জয়ের সেই অপূর্ণ মূর্তি দেখিয়া মনে হইল সংসারের সঙ্গে তখন তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। কিছুক্ষণ পর মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধি ভঙ্গ হইল, তখন তাঁহার রসনা হইতে ‘সত্য-গুরু’ এই বাক্য বাহির হইল। মাসি অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—

“বাবা, আজ তোমাকে যেন কেমন দেখাইতেছে। তোমার মুখশ্রী ও চক্ষু দেখিয়া মনে হয় তোমার প্রাণের ভিতর কি একটা নূতন ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। তোমার শরীর ভাল ত?”

মৃত্যুঞ্জয় কিছু বলিলেন না, একটু হাসিলেন। যোগাসন হইতে উঠিয়া তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে একটা বড় গাছ ছিল। সেই গাছের
নীচে তিনি যোগাসন করিয়া
বিরুদ্ধবাদী। বসিলেন। ইতিমধ্যে চারিদিকে

রাষ্ট্র হইল মৃত্যুঞ্জয় ‘শুরু-সত্য’
(সাধারণ লোকে ‘শুরুসত্য’ই বলিত) পাইয়াছে। সহস্র
সহস্র লোক (স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক) তাঁহাকে
দেখিতে আসিয়া তাঁহার পায়ে মাথা লুটাইয়া পড়িল।
বিরুদ্ধবাদীরা বলিল,—“এ কিছু নয়, মৃত্যুঞ্জয়ের ইহা
বুজুকি। এ ভেদী কয় দিন থাকিবে?” কত লোকে
কত কথা বলিতে লাগিল। চারিদিকে এত যে কথাবার্তা
হইতেছিল তাহা মৃত্যুঞ্জয়ের কর্ণগোচর হইল না। তিনি
পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন—তাঁহার মুখশ্রীতে কেমন
একটা স্বর্গীয় প্রভা ফুটিয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময় সাধকের
ধ্যানভঙ্গ হইল,—তিনি চক্ষু মেলিলেন। তাঁহার মুখ
হইতে ‘সত্যশুরু’ এই অমৃত বাক্য বাহির হইল। সমাগত
জনমণ্ডলী ‘সত্যশুরুজীকি’ জয় বলিয়া চারিদিক নিনাদিত
করিয়া তুলিল। সেই দিন হইতে যে সর্বদিনব্যাপী
নাম-সংকীৰ্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা তাঁহার তিরো-
ধানের দিন পর্য্যন্ত সমভাবে চলিয়াছিল।

সত্যশুরুর রূপায় সাধক বাক্‌সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।
ব্যক্তি-বিশেষের ভবিষ্যজীবনী তিনি
বাক্‌সিদ্ধি। এমন ভাবে বলিতেন যে, তাহা বর্ণে
বর্ণে সত্য হইত। কোন ভ্রুটি
বিষয়ের সমাধান করিতে গেলে তিনি প্রশ্ন শুনিয়াই উত্তর
দিতেন না। তিনি সমাধি-গৃহে অনেককণ মৌনাবলম্বন
করিয়া কি ভাবিতেন, পরে বাহিরে আসিয়া
সমাগত ব্যক্তিবর্গের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেন। এক
বার আমাদের পরিবারে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক
দিন আমার এক পিসার কোনই সংবাদ না
পাইয়া আমার ঠাকুর-মা স্বয়ং ‘সত্য-শুরু’ আশ্রমে
আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি কখন বাহিরে আসিতেন
না। কন্ডার ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ইঁহার প্রাণ কাপিয়া
উঠে। ঠাকুর-মাকে আশ্রমে উপস্থিত দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয়

বিস্মিত হইলেন, তিনি ভাবিলেন নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল
ঘটিয়াছে, তাহা না হইলে তিনি এখানে আসিবেন কেন?
সাধক ঠাকুর-মাকে বলিলেন,

“মা, আপনি কেন এখানে আসিয়াছেন? আপনার
দেবর ইহা শুনিবে যে অসন্তুষ্ট হইবেন। আপনার অভি-
প্রায় আমি বুঝিয়াছি।” এই বলিয়া তিনি সমাধি-গৃহে
প্রবেশ করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর বাহিরে আসিয়া
ঠাকুর-মাকে তিনি বলিলেন,—“মা, সংবাদ ভাল নয়।
আপনার ছোট জামাতাটিকে সর্পে দংশন করিয়াছে।
বাঁচিবার আশা কম। দুই এক দিনের মধ্যেই এবিষয়ে
চিঠি পাইবেন।”

এই ঘটনার দুই দিন পর আমার পিসার সর্পাঘাতে
মৃত্যু-সংবাদে চিঠি আসিয়াছিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপচাঁদকে শ্বশুরালয়ের পথে
শৃগালে দংশন করিয়াছিল। দেড় বৎসর পর এক দিন
ভোরের বেলা সে শ্বশুরগৃহে চলিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয়
গমনোন্মুখ পুত্রকে বলিলেন,—“বাবা, তুমি শ্বশুরালয়ে
চলিয়াছ, বেশ, কিন্তু আজ আমি তোমার জীবনে বড়ই
অশুভ দেখিতেছি।” অদৃষ্টের নিয়ম কে লঙ্ঘন করে?
দুপুর বেলা সংবাদ আসিল, হঠাৎ রূপচাঁদের পূর্ব ব্যাধি
জ্বলাতন দেখা দিয়াছে, তাহার জীবনের আশা নাই
বলিলেই হয়। তখন বহু লোক রূপচাঁদকে গৃহে
লইয়া আসিবার জ্ঞা ছুটিল। সন্ধ্যার পূর্বে রূপচাঁদের
মৃতদেহ পুণ্যাশ্রমে আনা হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাণশূন্য
দেহ দেখিয়া সাধকের প্রাণ একটুও বিচলিত হইল না।
তখন সাধক

“সত্য শুরু ধ্যানে হ’ল আপনি মগন

মুখে নাহি কথা সরে—ঝরে না নয়ন।”

মৃত্যুঞ্জয়ের বাক্‌সিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা
প্রত হওয়া যায়। বাহ্যাবোধে আমরা সেইসব এখানে
লিপিবদ্ধ করিলাম না।

মৃত্যুঞ্জয়ের সহধর্মিণী স্বামীর মতই ধর্মশীলা ছিলেন। রত্ননশালায় তিনি মৃষ্টিমতী অন্নপূর্ণা মৃত্যুঞ্জয়-গৃহিণী। ছিলেন। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে সত্য গুরুর আশ্রমে সমাগত বহু শিষ্য ও ভক্তের আহ্বারের বন্দোবস্ত থাকিত। ‘দীর্ঘতাং ভূজ্যতাং’ ‘সত্য-গুরুজীকি জয়’ ধ্বনি শতকণ্ঠ হইতে আকাশ ভেদ করিয়া উর্ধ্বে উঠিত। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত এই সাক্ষী জীবকে অন্ন দান করিয়া স্বামীর সাধনার পথে পুষ্পপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার মুখশ্রী নিয়ত স্নমধুর হাসিতে অল্পরঞ্জিত থাকিত। পতিব্রতীর মৃত্যু সময়ে সাধক মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—তাঁহার আনন্দময়ী তপস্বিনী মহাপ্রয়াণের জন্ত প্রস্তুত; তিনি ধীরে ধীরে অনন্তের দিকে বাহ মেলিতেছেন, তাঁহার বিশ্বাসের গুহ্র হাসি, ক্রতজ্ঞতার নলিন-নেত্র অশ্রুপূর্ণ। সাধক দেখিলেন মৃত্যুর নিবিড় ধূমরাশি বিদীর্ণ করিয়া প্রেরণসীর আত্মা সত্যগুরুর অমল জ্যোতিতে মিশিয়া যাইতেছে। দেবী যোগবলে দেহ ত্যাগ করিলেন। নির্ঝাণপ্রায় দীপশিখার ত্রায় তপস্বিনীর সোনার অঙ্গ অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে কল্যাণীর প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সাধক মৃত্যুঞ্জয় পত্নী-বিরোগে বিচলিত হইলেন না, প্রসন্ন মুখে ‘সত্যগুরু’ বলিতে বলিতে সমাধি-গৃহে প্রবেশ করিলেন। এদিকে শিষ্য-মণ্ডলী দেবীর মৃতদেহ সংস্কারের জন্ত নদী-তীরে লইয়া গেল। সতীর মৃত্যুতে চতুর্দিকে হাহাকার রব উখিত হইল। শিষ্যমণ্ডলীর মুখে ‘মা—মা’ ধ্বনি নদীতীরে প্রতিধ্বনিত করিয়া ফেলিল। কাটাখালি কুলকুল স্বরে বিবাদের গান গাহিয়া উভয় তীর মুখরিত করিয়া ছুটিতে লাগিল। অগ্নিসংযোগে সতীর মাটির দেহ ভস্মসাৎ হইল।

কথিত আছে, মৃত্যুর পরদিন সতীর দেহ ভাসিতে ভাসিতে আশ্রমের ঘাটে আসিয়াছিল। শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। কিছুকাল সেই শব ঘাটে থাকিয়া কোথায় যে ভাসিয়া গেল, তাহা কেহই বলিতে পারিত না।

বিক্রমপুরের বারুইসমাজ এক দিন সত্য-গুরুর নব-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া আত্মগৌরব বোধ সত্য-গুরু কি। করিয়াছিলেন। আজিও তাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিষ্ঠিত সত্য-গুরু-কথা সর্বত্র প্রচার করেন। সত্যগুরু কি? ভগবান গুরুরূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে আছেন। তিনিই মানবের একমাত্র ধর্ম-পথ-প্রদর্শক। ‘অথগু মণ্ডলাকার ব্যাপ্তং যেন চরাচরং’ সেই পূর্ণ ব্রহ্মের সহিত যোগই সত্যগুরু সম্প্রদায়ের ধর্ম-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সত্য-গুরু সম্প্রদায় রোগের সময় কখনও ঔষধ ব্যবহার করিতেন না, তিন বেলা স্নান ও গুরু নাম জপ করিয়াই ইহার রোগ-মুক্ত হইতেন। বিশ্বাসে ব্যাধিমুক্তি (Faith cure) এই কথাটা ইহার অঙ্করে অঙ্করে মানিয়া থাকেন। মৃত্যুঞ্জয়ের ধর্মমত খুব সরল ছিল। তাঁহার সত্যগুরু সকলের জন্ত, বিশ্ব-মানবের হৃৎপিণ্ড নিবারণের জন্ত, তিনি এই নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতেন; মনকে সমাহিত করিবে, সংকীর্ণন দ্বারা সত্যগুরুর মহিমা প্রচার করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার উপদেশ। সংকর্ণের দ্বারা, সংঘম ও সত্যের দ্বারা বাহাতে বিশ্ব সংসার, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উপরুত হয়, এই উদ্দেশ্যেই তিনি সংকীর্ণন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি সকলকেই বলিতেন, ‘সত্যগুরুকে আশ্রয় করিয়া নাম কীর্তনের দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে অচঞ্চল করিয়া লও। সত্যগুরুতে জীবাত্মার পুনঃ প্রবেশই মুক্তি। এই পুনঃ প্রবেশের জন্ত জীবকে সদাচারী হইতে হয়। অধর্ম্মাচরণ দ্বারা জীবাত্মাকে কখনও পাপ-পথে টানিয়া লইও না। সদাচারী হইলে মাতৃস্বের উচ্চ-নীচ ভেদ-জ্ঞান থাকিতে পারে না। ভবের হাটে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও নিরক্ষর ডোম-চণ্ডাল সকলেই সমান। সেখানে বিজ্ঞার পরীক্ষা নাই, কেবল মাত্র ঋটি মন দেখিয়াই পাপ-পুণ্যের বিচার হয়। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ অসদাচারী হইলে সত্য গুরুর নিকট কখনই উপস্থিত হইতে পারেন না। সদাচারী ডোমকেও তিনি কোলে তুলিয়া লন। সত্য গুরুর মত দয়াল কে? তিনি স্বয়ং যোগে বসিয়া

সত্য গুরুর ঔ-কার শক্তির উপাসনা করিতেন। তাঁহার মতে সত্য গুরুর নাম-কীর্তন অপেক্ষা হুঃখ-নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় আর কিছুই ছিল না।

মৃত্যুঞ্জয়ের মহাপ্রস্থানের সময়ে তাঁহার ইঞ্জিয়-গুলি সতেজ ছিল। তিনি দিব্য-বুদ্ধি। জানে সমাধিযোগে পদ্মাসনে ধ্যানের ভঙ্গীতে হৃদয়মধ্যস্থ প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করেন। শেষ মুহূর্তে তিনি শিষ্যমণ্ডলীকে ‘সত্য গুরু’ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃতদেহ কেবল দ্ব্যত ও চন্দন কাঠে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। কাহারও মতে মৃত্যুঞ্জয়ের দেহ ভস্মীভূত করা হয় নাই, বরং একটি কাঠের সিলুকে তাঁহার সমাধি-মগ্ন দেহ স্থাপিত করিয়া উহা গৃহমধ্যে ভূপ্রোথিত করা হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে মতবৈধ আছে বলিয়া উহার কোনটি সত্য নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে কতকগুলি কারণে আমাদের মনে হয় তাঁহার দেহ বৈষ্ণব সাধুদের অনুরোধে ভূপ্রোথিতই কবা হইয়াছিল।

সত্য-গুরুপন্থী সামান্য বারুই ধর্মজগতে যে অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব করিবার বিশেষ অধিকার আছে, ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। আজিও বিক্রমপুরের বারুই সমাজ সাধক মৃত্যুঞ্জয়ের পুণ্য নাম প্রত্যহ প্রভাতে স্মরণ করা পুণ্যস্থচক মনে করেন এবং তীর্থস্বরূপ তাঁহার সমাধি-স্থান দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নামিকো

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্যামাকির ভোজ।

বিবায় হোজো গ্যামাকির যে কুসম্পত্তি, তা খুব বেশী না হইলেও উহা নিশিনোকুবো পাহাড়ের কতকটা অংশ অধিকার করিয়াছিল। সাকুরাগাওয়ার রাস্তার খানিকটা অংশ ইহার এক ধারের সীমানা। বাগানে একটা পুকুরিনী। অনেকগুলি স্বাভাবিক পাহাড় স্থানটিকে বনজী প্রদান করিয়াছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে সরু পথ; পুকুরিণীর যে অংশগুলি অপ্রশস্ত সেখানে ছোট ছোট পুল। মেপল, চেরি, দেবদারু আর বাশের ঝাড় স্থানটির সৌন্দর্য বাড়াইয়াছে। এ সবার মাঝে একটা প্রকাণ্ড পাথরের ল্যাম্প পোষ্ট ও একটি অদ্ভুত রকমের ইনারি মন্দির কেমন একটা বৈসাদৃশ্য সৃজন করিয়াছে। রাস্তা হইতে অনেক দূরে একটি গ্রীষ্মবাটিকা যেন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া আগন্তকের বিষয়বর্ধনের জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। একটা সাধারণ গোছের জমির মধ্যে এমন সুন্দর বাগান, আশ্চর্যের কথা বটে; কিন্তু ইহাই গ্যামাকির বাতাসের উপর কেমন! ইহা তাহার অসম্ভব কল্পনা নয়; এই বাস্তব পদার্থটি তৈয়ার করিতে তাহার অত্যাশ্রয় অনেক সহস্র টাকা খরচ হইয়াছে।

বৈকাল বেলা। চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। দূরে ও নিকটে কাকেরা কোলাহল করিতেছে। বাগানের মধ্যে একটি পাহাড় অন্তর্মান সূর্যের আলোকে ঈষৎ উদ্ভাসিত। সেই পাহাড় বহিয়া দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত একটি লোক উপরে উঠিতেছিল।

সে তাকেও; মাতার অনুরোধ অবহেলা করিতে না পারিয়া গ্যামাকির ভোজে আসিয়াছিল। কতকগুলো অজানা লোকের সঙ্গে বসিয়া বিবাদ ‘সাকে’ পান করার সে কোনো আনন্দ পাইল না। আমাদের আগোজন

কার্তিক ১৩১৯

নানা রকমের ছিল; শেষ পেশাদার নর্তকীর নাচ ও সমবেত সকলের বিকট হস্ম। এই সব অসভ্যতা দেখিয়া বহুপূর্বেই সে ফিরিয়া যাইবে মনস্থ করিয়াছিল; কিন্তু র্যামাকি বার বার শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া বাইবার জন্ত অস্ব-
রোধ করিতে লাগিল। চিজিওয়ার সঙ্গে দেখা করাটাও নিতান্ত প্রয়োজন, সে তখনও আসে নাই। তাই সে কিছুক্ষণের জন্ত বাহির হইয়া বেড়াইতেছে, উষ্ণ মুখ সে সন্ধ্যার শীতল বাতাসে জুড়াইতে চায়।

খণ্ডর মহাশয়ের নিকট চিজিওয়ার কীর্ত্তিকাহিনী শুনিবার কয়েক দিন পরে, কুমীরের চামড়ার একটি মনিব্যাগ হাতে একটি অজানা লোক তাকেওকে একখানা হ্যাণ্ডনোট দেখাইয়া তিন হাজার টাকার দাবি করিল। নোটখানি তাকেও কখনও চক্ষে দেখে নাই। উহার উপর র্যান্সমহিকে। চিজিওয়ার স্বহস্ত লিখিত সহি। আর, কি আশ্চর্য্য! নোটখানি দিয়াছে তাকেও; তাহার নামের মোহরের ছাপ পর্য্যন্ত রহিয়াছে। লোকটি বলিল, নোটে লিখিত সময় অনেক দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কর্ত্তব্যকারী ইহা ফেরত লইবার কোনো চেষ্টাও করে নাই, হঠাৎ কোথায় উঠিয়া পিয়াছে, তাহার দেখা নাই। সেই জন্ত সে টাকা দাবি করিতে আসিয়াছে। চিজিওয়ার আপিসেও তাহার দেখা পায় নাই। নোট খানি বোধ হইল আইনতঃ নিভুল, নিঃসন্দেহ চিজিওয়ার লেখা। এই ঘটনায় আশ্চর্য্য হইয়া তাকেও তৎক্ষণাৎ ধোঁজখবর আরম্ভ করিল। মাতা ও ভাগ্যুরী তাকাকি উভয়েই বলিলেন, তাহারা এ বিষয়ে কিছুই জানেন না, তাকেওর নামের মোহরও তাহারা কখনো চিজিওয়াকে ব্যবহার করিতে দেন নাই। চিজিওয়া সন্দেহে সম্প্রতি যে সব গুজব রটিয়াছে, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিয়া, ব্যাপারটা যে কি, তা বুঝিতে তাকেওর বিলম্ব হইল না। সেই দিনই সে চিজিওয়ার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিল; কিন্তু চিজিওয়ার পত্র আসিল; পরদিন র্যামাকির বাড়ীতে দেখা করিতে লিখিয়াছে।

তাহার সহিত সাক্ষাৎ মাত্র ব্যাপারটা কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিবে, স্পষ্ট কথায় চটপট তাহার সম্বন্ধে নিজের অভিমতটা শুনাইয়া দিয়া, ব্যাস! চলিয়া যাইবে— ইহাই তাকেও স্থির করিয়াছিল। কিন্তু চিজিওয়ার দেখা নাই। রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে সন্ধ্যা বাশের ঝোপের ধার দিয়া পাহাড়ে পথ দিয়া তাকেও উঠিতে লাগিল। আইতি লতায় ঘেরা গ্রীষ্মবাটিকায় কিছুক্ষণ মাত্র বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় সে নিকটস্থ পথে কাষ্ঠপাছকার মুহু শব্দ শুনিতে পাইল, হঠাৎ তাহার সামনে তোয়ো আসিয়া হাজির। মাথায় উঁচু শিমদো ধোঁপা, পরণে তিন থাক ক্রেপের বসন, তাহার জম-
কালো পোশাক ও ধারাপ চেহারার মধ্যে কী অসামঞ্জস্য! কাণ্ডের মত সন্ধ্যা চোখ আরো সন্ধ্যা করিয়া সে কহিল, “তুমি তা হলে এখানে!”

কামানের প্রচণ্ড গোলায় মুখে যে কখনো ভয় পায় নাই, সে এই অপ্রত্যাশিত শত্রুর আক্রমণে অভিভূত হইয়া পড়িল। পিছন ফিরিয়া একেবারে চম্পট দিবার উপক্রম করিল। ব্যাপার দেখিয়া ভীত হইয়া মেয়েটি ‘তাকেও সান’ ‘তাকেও সান’ বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহার অনুগমন করিতে লাগিল।

“কেন?”

“বাবা আমাকে তোমায় বাগানটা দেখাবার জন্তে বললেন।”

“তোমাকে দেখাতে বলেন? আমাকে দেখাবার কিছু দরকার নেই।”

“কিন্তু—”

“আমার ইচ্ছামত করতে দাও। আমি তাই ভাল-
বাসি।” আর কেহ হইলে এরূপ কঠিন প্রত্যাখ্যানে দমিয়া যাইত। কিন্তু সে দমিবার পাত্র নয়।

“আমার কাছ থেকে পালাতে চাচ্ছ কেন বলতে পার?”

তাকেও ধামিল।

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে তাকেওর পিতা একটি জেলার

শাসনকর্তা ছিলেন। তোরোর পিতা তাঁহার অধীনে কার্য্য করিত। সেই সময় তাকেওর সহিত তোরোর প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। তখন তাকেও বালকমাত্র। মেয়েটিকে সে আলাতন করিত কখনো কখনো কাঁদাইতেও ছাড়িত না, কিন্তু এসব সবেও তাকেও তাহার ব্লেহলাভে বঞ্চিত ছিল না। আজ কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কত পরিবর্তন ঘটয়াছে, শিশু যুবক হইয়া উঠিয়াছে ; চুই বালক তাকেও এখন যুবক ব্যারণ কাওয়াষিমা, তাঁহার পরী যুবতী ! কিন্তু তোরো এখনো তাহাকে ভালবাসে ! সাদাসিধে ধরণের হইলেও তাকেও তাহার মনের ভাব কিছু কিছু বৃত্তিত, তাই কালেভদ্রে যখনি য়ামাকির নিকট আসিত, তখনই খুব সাবধানে থাকিত। আজ অসতর্ক অবস্থায় ধরা পড়িয়া গিয়াছে !

“পালাবো ? পালাবো কেন ? আমার ইচ্ছামত আমি ঘুরে বেড়াই।”

“তুমি বড় নিষ্ঠুরের মত কথা কইচ।”

তাকেওর বিরক্তি বোধ হইতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল ফিরিয়া চলিয়া যায় ; কিন্তু কেমনধারা বোকা বনিয়া গিয়া ন যথো ন তথ্যো অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। বাগানের এই নির্জন অংশটায় মেয়েটির হাত হইতে আর নিক্তার নাই ! অবশেষে তাকেওর মাথায় একটা মতলব আসিল।

“চিজিওয়া এসেচে নাকি ? ওতোয়ো সান্, লক্ষীটি গিয়ে দেখনা এক বার।”

“সন্ধ্যার আগে চিজিওয়া আসবে না।”

“সে এখানে সর্বদা আসে না কি ?”

“আসে বই কি। কাল অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত বাবার সঙ্গে কথা কইছিল।”

“তাই নাকি ? কিন্তু এতক্ষণ সে এসেচে বোধ হয়।

লক্ষীটি এক বার দেখ না।”

“না আমি যাব না।”

“কেন ?”

“তুমি তা হলে নিশ্চয় পালাবে। তুমি আমার ভালো

না বাসতে পার, নামিকো-সানকে খুব সুন্দর ভাবতে পার, কিন্তু আমার এমন করে ভাড়িয়ে দেওয়াটা কি ভাল ?”

তাহার সহিত তর্ক করিবার প্রবৃত্তি হইল না, তাকেও চলিতে লাগিল। এমন সময় শুনিতে পাইল কে যেন তোরোকে ডাকিতেছে। পরিচারিকা আসিয়া তাহাকে কি বলিতে লাগিল। অবসর পাইয়া তাকেও বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে একেবারে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, এখানে আর আক্রমণের ভয় নাই !

সূর্য্য ডুবিয়াছে ; অভ্যাগতেরা বিদায় হইয়াছে ; দিবসের কোলাহলটা এখন রক্তনশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। উপরকার জোন্সামাক্সা পোশাক খুলিয়া গৃহস্থামী য়ামাকি টলিতে টলিতে বাড়ীর পিছনের একটা ছোট ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাতে এক খানা চুরটের রেকাবি। ঘরে ঢুকিয়াই সে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল, ল্যাম্পের উজ্জল আলোকে তাহার রক্তবর্ণ কপাল চক্ চক্ করিতেছিল।

“মাপ করবেন, আপনাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। যাহ’ক আজ খুব আনন্দ করা গেছে।” সে হাসিল। “ব্যারণ, আপনি ত নাবিকের মত পান করতে পারেন না। আপনার বাবা বোতলের পর বোতল ওড়াতে। বুড়ো হলেও আমি হ্যোজো য়ামাকি—আধ গ্যালন্ ধানেক পার করতে আমি সহজেই পারি।”

চিজিওয়া য়ামাকির উপর গাঢ়-কৃষ্ণ চক্ষু ফিরাইল।

“ফুস্তি যে আর ধরে না, য়ামাকি সান্ ! খুব পয়সা করুচ বুঝি ?”

“তা নয় ত কি। তা যদি বললে তবে”—অনেকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে সে পাইপটি ধরাইতে সমর্থ হইল। পাইপে একটা টান দিয়া বলিল,

“সেইটে—কি বলচি বুঝ্চ বোধ হয়—এখন বাজারে। আমি ভেতর ভেতর খবর নিয়েছি। অবস্থা তাদের সঙ্গীন। আমরা সন্ধ্যা খুব দাঁও মারতে পারি। কাজটার খুব লাভ ; আর বিদেশীরা যখন দেশের ভেতরে থাকবার

অল্পমতি পেয়েচে, তখন ত কথাই নেই, একেবারে পোয়া বারো। ব্যারণ আপনি কেন বিশ কি ত্রিশ হাজার টাকা তাকাকি কুনের নামে খাটান না, নিশ্চয় লাভ করবেন।”

মাতালের কথা শ্রোতের মত হ হ করিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাকেও চুপ করিয়া গভীর হইয়া বসিয়াছিল, চিজিওয়া একবার তাহার দিকে আড় চোখে চাহিয়া বলিতে লাগিল।

“ঐ আওমোনো ষ্ট্রীটের ওরা ত? ওদের এক বার খুব ভালো কাজ হয়েছিল না?”

“হ্যাঁ, কিন্তু চালাবার দোষে সব মাটি করে ফেলে। ঠিক করে চালানো যদি যায় তাহলে এটা একটা ‘সোনার খনি’ হয়ে দাঁড়াবে!”

“আহা, কি সুযোগটাই ছিল! কিন্তু আমার মত গরীবের ত আর কর্ম নয়। তাকেও-কুন্ তোমার চেষ্টা করা উচিত।”

এ পর্যন্ত তাকেও একটিও কথা কহে নাই। অসন্তোষের কালো ছায়া তাহার ক্রুর মধ্যে পতিত হইয়া উহাদিগকে কুক্ষিত করিয়া আনিয়াছিল। তাহাদের উভয়ের উপর একটা সরোষ কটাক্ষপাত করিয়া সে বলিতে লাগিল, “তোমার ধন্যবাদ। আমি যে কাজে রয়েচি, তাতে কবে যেমাছের পেটে যাব বা গোলার ঝায়ে মরব, তার কিছু স্থিরতা নাই। আমাদের টাকা করবার কি দরকার তা ত বুঝি না। আমার যদি টাকা থাকত, আমি তা হলে ত্রিশ হাজার টাকা তোমাদের এই কাজে না খাটিয়ে নাবিকদের শিক্ষার জন্তে দিতুম!”

চিজিওয়া চট করিয়া তাকেওর মুখখানি দেখিয়া লইল ও গ্যামাকির দিকে ফিরিয়া চোখ টিপিল।

সে বলিল, “গ্যামাকি সান্ ভূমি আমাকে স্বার্থপর ভাবতে পার, কিন্তু তোমার একটু সবুর করতে হবে, আগে আমার কাজটা হয়ে থাক। ব্যারণ কাওয়াবিমা দয়া করে আমার অনুরোধ শুনেচেন, তোমার যা করতে হবে বলেছিলুম তাই কর। তোমার নামের মোহরটা সঙ্গে আছে ত?”

প্রমিসারি নোটের মত কি এক খানা বাহির করিয়া সে গ্যামাকির সামনে রাখিল।

চিজিওয়াকে যে লোকে সন্দেহ করিত, তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। গত বৎসর সে গ্যামাকির পরামর্শদাতা ও গুপ্তচরের কাজ করিয়া তাহার লাভের অংশীদার হইয়াছে; শুধু তাহাই নয়, সরকারি টাকা লইয়া ঠেকের বাজারে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে গিয়া ফলে পাঁচ হাজার টাকার উপর লোকশান দিয়াছে। গ্যামাকির নিকট হইতেও নিজের পকেট কাঁটাইয়া সে কষ্টেখুটে ছুই হাজার টাকা জোগাড় করিল, কিন্তু এখনও তিন হাজার টাকা বাকি। তাহার একমাত্র কুটুখ কাওয়াবিমা ধনী এবং বুড়ীর সে বিশেষ প্রিয়পাত্র। কিন্তু বুড়ীর মুটোর ভিতর দিয়া জল গলে না, তাহার নিকট ধার চাওয়া যায় কেমন করিয়া! টাকাটাও না হইলে নয়। তাই সে তাকেওর মোহর জাল করিয়াছে এবং অতিরিক্ত সুদে কর্জ করিয়াছে! ধার শোধ করিবার সময় শীঘ্রই উত্তীর্ণ হইল এবং পাওনাদারটা এমন অসহিষ্ণু যে তাহার আপিসে এক নোটস জারি করিয়াছে! তাকেও সেইমাত্র গৃহে ফিরিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া সে তাকেওর নিকট তিন সহস্র টাকা কর্জ লইবার চেষ্টা করিতেছিল। তাকেওর অর্থে তাকেওর মান রক্ষার চেষ্টা হইতেছে! সে দিন তাকেওর বাড়ী গিয়াছিল, দেখা হয় নাই। তারপর সরকারি কাজে কয়েকদিনের জন্ত সহরের বাহিরে যাইতে হইয়াছিল, ইতিমধ্যে পাওনাদারটা যে কাওয়াবিমার বাড়ী গিয়াছে সে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানে না।

গ্যামাকি ষাড় নাড়িল। ষষ্ঠী বাজাইয়া ভৃত্যকে লাল কালির প্যাড আনিতে বলিল, তারপর তাড়াতাড়ি একবার নোটের উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া শীল মোহরটি বাহির করিল ও নিজ নামের নীচে জামিন স্বরূপ একটি ছাপ দিল।

চিজিওয়া নোটখানি উঠাইয়া লইয়া তাকেওর সামনে রাখিয়া কহিল—“এই ত নোট ভৈরি। টাকাটা কখন পাওয়া যাবে?”

“সঙ্গেই আছে।”

“তোমার সঙ্গে ? ঠাট্টা করচ !”

“হ্যাঁ আমারই সঙ্গে। এই নাও—তিন হাজার টাকা।

“ঠিক আছে ত ?”

পকেটের মধ্য হইতে কাগজে মোড়া কি একটা বাহির করিয়া সে চিজিওয়ার দিকে ছুড়িয়া দিল।”

সে উহা তুলিয়া লইয়া খুলিল—হঠাৎ তাহার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই ভয়ানক ক্রোধে তাহার দাঁত কড়মড় করিতে লাগিল। যে নোট সে ভাবিতেছিল এখনো সন্দেহেরটার হাতে, এ যে সেই নোট! সবিশেষ অনুসন্ধানের পর তাকেও ইতিপূর্বেই গোপনে দেনা চুকাইয়া দিয়াছে। “কেন, এটা ত—”

“চিন্তে পারচ না যেন! যাবুকের মত এই বার দোষ স্বীকার কর।”

যে তাকেওকে এই যুহূর্ত পর্যন্ত সে বালক বলিয়া উপহাস করিয়া আসিয়াছে তাহার নিকট এই পরাজয়! ক্রোধে চিজিওয়ার গা জ্বলিতে লাগিল।

গ্যামাকি হতভম্বের মত বসিয়া লম্বা ধূমপানের নলটি উন্টা দিকে ধরিয়া উভয়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল।

তাকেও কহিল—“চিজিওয়া, এ বিষয়ে আমি আর কিছু বলিতে চাই না। আমাদের মধ্যে ভায়ের সম্বন্ধ, মোহর জাল করার জন্তে কখনো নালিশ করব না। আমি তিন হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছি, আর তোমার আপিসে তার তাগাদা যাবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত থেকে।”

অপ্রতিভের একশেষ হইয়াও, যেন বিচলিত হয় নাই, এরূপ ভাব দেখাইবার জন্ত চিজিওয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাকেওর উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার টুটি চাপিতে পারিলে তবে তাহার কোত যাইত; কিন্তু সে বুঝিতে পারিল, ব্যাপার এখন অনেক

দূর গড়াইয়াছে; তাই চট্ করিয়া ভাব কিরাইয়া ফেলিল।

“তোমার কথা শুনে তাই আমার লজ্জা হচ্ছে। কি করব বল, বাধ্য হচ্ছে—”

“বাধ্য হয়ে ? সামাজিক ও নৈতিক নিয়ম ভেঙে টাকা ধার করতে বাধ্য হয়েছিলে ?”

“আরে আমার কথাটা শোন। ব্যাপারটা কি হয়েছিল জান, আমার টাকার ভারি দরকার পড়েছিল কোথায় পাই তার ঠিক ছিল না। ভূমি বাড়ী থাকলে তোমাকে গিয়ে বলতুম, মাসীমাকে ত আর বলতে পারি না। টাকাটা না পেলেই নয়, গত মাসে কিছু পাবার আশা ছিল তার উপর নির্ভর করে আমি—কাজটা বড়ই অগ্নায় হচ্ছে বুঝেছিলুম কিন্তু সব ঠিক হয়ে গেলে তোমার কাছে স্বীকার করব ঠিক করেছিলুম।”

“ও সব বাজে কথা। দোষ স্বীকার করবার বার ইচ্ছে ছিল, সে কি কখন আরো তিন হাজার টাকা বিনা যাক্য ব্যয়ে ধার করতে চায়!”

তাকেওর ক্রোধ দেখিয়া গ্যামাকি চিন্তিত হইয়া পড়িল, যদি সে চিজিওয়াকে আক্রমণ করে! তাই বলিল, “ব্যারণ থামো। রেগো না। আমি এ বিষয় কিছুই জানি না, কিন্তু উনি তোমার তাই, তোমার একটু নরম হওয়া দরকার। হাজার হু তিন টাকা আর এমন বেশী কি? চিজিওয়ার দোষ হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কথাটা যদি জানাজানি হয় ত ওর চাকরি যাবে। তাই ব্যারণ মিনতি করচি—”

“আমি ত বলেছি সেই জন্তেই আমি ধার শোধ করেছি, নালিশও করব না। গ্যামাকি ভূমি চূপ কর, তোমার ত আর কিছু হয় নি।” চিজিওয়ার দিকে ফিরিয়া সে কহিল, “না, তা আমি করব না, কিন্তু তোমার সঙ্গে আত্মীয়তা এই যুহূর্ত থেকে ভেঙে দিতে চাই।”

ব্যাপারটা যখন এতদূর গড়াইয়েছে তখন আর ভয় করিবার প্রয়োজন নাই; চিজিওয়া বিজ্ঞপের স্বরে বলিতে

লাগিল, “ভেঙে দেবে? আমার তাতে বিশেষ দুঃখ নেই, কিন্তু—”

তাকেওর চক্ষু হইতে যেন আশ্রন বাহির হইতেছিল।
“হ্যা, এখন টাকা পেয়েছ, এখন আর বন্ধুকে দরকার কি? চোর কোথাকার!”

গ্যামাকি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, সে বলিতে লাগিল “ব্যারণ—চিজিওয়া সান্—শোন,—একটু—একটু স্থির হও। ও রকম করে ত মীমাংসা হবে না। বলি শোন—বুঝচ।” এধার ওধার চাহিয়া সে বলিতে লাগিল, “শোন, শোন!”

তাহারা স্থির হইল। কিছুক্ষণ পরে চিজিওয়ার উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া নিশ্চিন্ততা ভঙ্গ করিয়া তাকেও কহিতে লাগিল, “চিজিওয়া, আর আমার বলবার কিছু নেই; ছেলেবেলা থেকে আমরা সহোদরের মত বেড়ে উঠেছি। বাস্তবিক বলতে কি বয়স ও বুদ্ধিতে তুমি আমার চেয়ে বড় এই রকমই ভেবে এসেছি। ভেবেছিলুম দুজনে দুজনকে সাহায্য করব। যতদিন সম্ভব আমার বখাসাধ্য তোমার জন্তে করব স্থির করেছিলুম। এই সে দিন পর্যন্ত তোমার বিরুদ্ধে কোন কথা আমি শুনতে চাই নি। কিন্তু তুমি আমার বিশ্বাস ভেঙে দিয়েচ। আমাকে ঠকানো, সেটাই ব্যক্তিগত ব্যাপার; কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভূমি—বাক্ বলব না। তিন হাজার টাকা কি করে খরচ করলে সে কথা আমি শুনতে চাই না। কিন্তু একটা কথা বলতে চাই। লোকের চোখ কান কত তীক্ষ্ণ তুমি হয় ত জান না, কিন্তু আমার কথা শোন, তোমায় এখন সন্দেহ করচে অনেকে। সাবধান হও, যেন সৈনিকের সন্ধান হারিও না। তোমার কাছে অর্থের বাড়ি আর কিছু নেই; বেশি বলার কোন লাভ নেই, কিন্তু লজ্জাটা কি তা একবার ভেবে দেখ। ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে কখনো দেখা করব না। এইবার তোমায় দস্তরমাফিক তিন হাজার টাকা দিই।”

গভীরভাবে এইরূপ কহিয়া তাকেও সম্মুখস্থিত মোটরখামি ডুলিয়া লইয়া টুকরা টুকর করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

তারপর হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সে বেগে পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিল, গ্যামাকির কথা ভোয়ো সেখানে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। তাহার সহিত ধাকা লাগাতে সে পড়িয়া গেল। তাহার ক্রন্দনের প্রতি ক্রন্দেপ না করিয়া তাকেও ফটকের দিকে চলিয়া গেল।

চিজিওয়া সেই মাত্র গ্যামাকির দিকে চোখ তুলিয়াছে। হতভম্ব গ্যামাকি তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, “কি—ছেলেমানুষ! কিন্তু চিজিওয়া সান্, আত্মীয়তা ভাঙার জন্ত তিন হাজার টাকা, নেহাৎ মন্দ নয়, কি বল?”

ইতস্ততঃ বিক্লিষ্ট নোটের টুকরার উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া চিজিওয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শ্রীহেমলিনী রায়।

সংসার অসার

অশেষ অলজ্য্য তব স্নেহের বিধান
কঠিন বলিয়া ভাবি করুণা-নিদান,
অবোধ মানব মোরা পারি না বুঝিতে
ভাল মন্দ শুভাশুভ। চাহি যে খুঁজিতে
আপন ক্ষুদ্রতা মাঝে অসীমের সীমা,
নিমেষে ভাগিয়া যায় জটিল গরিমা;
মোহের রঞ্জন জালে জড়িত হইয়া
অকুল পাথারে বাই ভাসিয়া ভাসিয়া।
তখন হারায় প্রভু হৃদয়ের বল,
অবিশ্বাস হয়ে উঠে সকল সম্বল,
পলে পলে বেঁড়ে যায় জীবনের ভার,—
তখনি হৃদয়ে জাগে “সংসার অসার”।

শ্রীসুরমাশঙ্করী ঘোষ।

একাচোরা ব্রত

আমাদের দেশের রমণী সমাজে একটা প্রবাদ আছে যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার আঠার মাস মধ্যে সেই শিশুর মৃত্যু হইলে তাহার মায়ের একটা “মল্লি” দোব খটিয়া বার অর্ধাৎ ক্রমাবধে এইরূপে সন্তান মরিতে থাকে। সচরা-চর এইরূপ খটিতেও দেখা যায়। এই আঠার মাস পরে শিশু মরিলে আর সেরূপ কোন দোব হয় না। প্রাচীনাগণ, এষ্ট দোব হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এই একাচোরা ব্রত করিয়া থাকেন। এষ্ট জন্ম বনভূগী, হুম্মাই প্রভৃতি দেবতার পূজাও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সকল মানত ব্রত প্রায়ই অন্নরন্তে চূড়াকরণে ও বিবাহের সময় অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রতের নিয়ম—শনিবাবে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একটি কলার আগপাতে নয়টি দুর্কা, নয়টি তুলসী পাতা, রাখিতে হয়। তাহার নিয়ে অল্প একটি আগপাতে ভাজা চাউলের গুঁড়া, কলা, চিনি প্রভৃতি দ্বারা ভোগ দিতে হয়। পুরোহিত আসিয়া পূজা করিয়া থাকেন। ব্রতান্তে এই ব্রত কথা বলিতে হয়।

ব্রত কথা—এক দরিদ্র গৃহস্থ দিন আনে দিন খায়—কোন রকম কার্যক্লেপে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া আছে; কিন্তু দুঃখের উপর আরও দুঃখ—তাহার জীব সন্তান হইয়া বাঁচে না, কোনটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া এক দিন, কোনটি দুই দিন কোনটি তিন দিনের হইতে না হইতেই মরিয়া যায়। এইরূপে একুশটি সন্তান মারা গেল। একে দারিদ্র্যদুঃখ তাতে আবার পুত্রশোক। গৃহস্থ ও গৃহস্থ-পত্নী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। দিন বাইতে লাগিল। এক দিন গৃহস্থ-পত্নী অন্নজল ভাগ করিয়া প্রাণ বিসর্জনের উদ্দেশ্যে ‘হত্যা’ দিয়া পড়িয়া রহিলেন। ক্রমে এক দিন দুই দিন করিয়া তিন দিন

চলিয়া গেল। গৃহস্থ-পত্নী বল ও গ্রহণ করিলেন না।

ভগবানের একটু দয়া হইল। তিনি এক ভিখারী ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত। লোকজন কেহ নাই, গৃহিণী শয্যাগত, উত্থানশক্তি রহিত। ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণীর নিকটবর্তী হইয়া বলিলেন, “মা তোমার কি হইয়াছে, আমার বল; আমি ভিক্ষুক তোমার দ্বারে উপস্থিত।” গৃহিণী সহসা এই মা সম্বোধন শুনিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, সম্মুখে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; তিনি করযোড়ে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিল,—“মা গাত্ৰোত্থান কর, এবং আমার বল তোমার কি হইয়াছে।” গৃহস্থ-পত্নী তখন বলিলেন—“আর উঠিয়া কি হইবে, এ প্রাণ আর রাখিব না।”

ব্রাহ্মণ দেখিলেন বড় বিপদ। তাই বলিলেন—“মা আমি ব্রাহ্মণ আমার কথা শুন, তুমি উঠ এবং আমার নিকট তোমার মনের কষ্টের কারণ খুলিয়া বল।” তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং ব্রাহ্মণের নিকট আপন দুঃখদারিত্বের কথা খুলিয়া বলিলেন। ব্রাহ্মণের মন ভিজিল, তিনি বলিলেন—“মা তুমি একা চোরা ব্রত কর, তোমার মঙ্গল হইবে। তোমার সন্তানের কোন অমঙ্গল হইবে না।” গৃহস্থ-পত্নী বিজ্ঞাসা করিল, “প্রভু, ব্রতের নিয়ম কি?”

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, “মা তুমি দরিদ্রা, কোন প্রকারে ভক্তিভাবে একাচোরা ঠাকুরকে পূজা কর, তোমার মনো-বাসনা সিদ্ধ হইবে। এষ্ট ব্রতে চাউলের গুঁড়া লাগিবে। তুমি আতপ চাউল সংগ্রহ করিতে পারিবে কি? না পার সিদ্ধ চাউল ব্যবহার করিও, তাতে বাধা নাই। কলার পাতে চাউলের গুঁড়া দিয়া ভোগ দিও; পারিলে দধি-দুগ্ধ দিও, না পারিলে দিও না। সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ব্রতিনীকে সে দিন থাকিতে হইবে জানিও।” ভিখারী ব্রতের নিয়মগুলি বলিয়াই অদৃষ্ট হইলেন।

গৃহিণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া শুদ্ধ ভাবে দান আহিক করিয়া ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। প্রতিমাসে নিয়মিত রূপে ব্রত করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তাহার

গর্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে একটি ছেলে হইল। গৃহস্থ ও তাহার পত্নী আনন্দে আটখান। হইয়া গেল।

ছেলে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। গৃহস্থের অবস্থা এখন বেশ স্বচ্ছল। অতাবে পড়িলেই দেবতার আদর হয়, সুতরাং এখন আর গৃহস্থপত্নী সেই একাচোরা ব্রত প্রাতিমাসে না করিয়া তিন মাস পরে করিয়া থাকেন। না ছয় মাস চলিয়া গেল।

আজ ছেলের অন্ন রস্তু। দেবদেবীর পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন কাদালী বিদায়ের মহা ঘট।; কিন্তু একাচোরা ব্রতের কোন আয়োজন নাই, গৃহিণী ভুলিয়া গিয়াছেন। এমন সময় এক ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ক্রমে ব্রাহ্মণ ভিতরে গিয়া বাড়ীর দাসীকে বলিল—“কি, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে আমাকে চারটি চাউলের গুঁড়া আর একটি বীচিকলা দিতে পার ? তাহা হইলে আমার ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারি।”

কি বাড়ীর ভিতরে গৃহিণীকে ব্রাহ্মণের কাতর প্রার্থনা জানাইল। গৃহিণী শুনিয়া চটিয়া উঠিলেন। “আমার বাড়ীতে আজ রাজভোগ, তোর কাছে চাউলের গুঁড়া, কলা চাহিল কে ? এখানে এসব কিছুই মিলিবে না।”

কি গৃহিণীর কথা গিয়া ব্রাহ্মণকে বলিল ব্রাহ্মণ দাসীর কথা শুনিয়া চটিয়া গেল এবং বলিল—“শুন কি ! তোমার কত্রীর বড় অহঙ্কার হইয়াছে, আচ্ছা !” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিল, কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে বালক ঘুমাইতেছিল, কেহ আর তাহার খবর লইতেছে না। কিছুকাল পরে যখন তাহার কান পড়িল তখন বালককে জাগাইতে যাইয়া দেখে, সর্কনাশ ! বালক জীবিত নাই ! তাহার সর্কনাশ শীতল। বাড়ীতে

কামার রোল পড়িয়া গেল। আমোদ-প্রমোদ থাকিয়া গেল। বাস্তবতাও সব বিদায়। গৃহিণী মাথার হাত দিয়া কাঁদিতেছেন।

সহসা গৃহিণীর মনে পড়িল, তিনি যে দেবতার বরে ছেলে পাইয়াছিলেন, সেই পরম দেবতা একাচোরার ব্রতেরই কোন আয়োজন নাই। তখন তাহার মনে জাগিল—দাসীর কাছে যিনি চাউলের গুঁড়া চাহিয়া ছিলেন তিনিই সেই ছদ্মবেশী একাচোরা ঠাকুর। তাড়া-তাড়ি গৃহিণী একাচোরা পূজার “আগ” রাখিয়া ঝিকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর উদ্দেশে বাহির হইলেন। পথে তাহাদের সঙ্গে সেই ঠাকুরের সাক্ষাৎ হইল। গৃহস্থ-পত্নী ব্রাহ্মণের পা জড়াইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, “ঠাকুর দোহাই তোমার, আমার ছেলেকে বাঁচাও। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।” ব্রাহ্মণ বাগলেন, “তোমার বড় অহঙ্কার হইয়াছে ! তুমি আমার বরে সন্তান লাভ করিয়াছ, আর এখন আমাকে তুচ্ছ করিতেছ। এক মুষ্টি চাউলের গুঁড়া দিতে যার এত শৈথিল্য তার সন্তানের আবশ্যকতা কি ? তুমি যেমন অলক্ষ্মী তেমনই থাক।” তোমার সন্তানের প্রয়োজন নাই।” গৃহস্থপত্নী বড় কাদাকাটি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাহার আবদার ছাড়াইতে পারিলেন না। তাহার মন ভিজিয়া গেল। তিনি ছেলেকে বাঁচাইয়া দিলেন আর বলিলেন, “একাচোরা ব্রত কখনও ভুলিও না। ভুলিলে তোমার সর্কনাশ হইবে।”

গৃহস্থ পত্নী এখন হইতে কায়মনে আবার ব্রত আরম্ভ করিলেন। তাহার সংসার সুখের হইল। সেই অবধি ওগতে একাচোরা ব্রত প্রচলিত হইল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

অলিরাজ

বা

হলুদে পাখী (২) *

পাখীটির পুরুত্ব নাম আমি জানতে পারি নাই। দুই ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি। এই পাখীর নাম অলিরাজ। অল্প মত সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত আমরা ইহাকে অলিরাজ নামে অভিহিত করিব। তবে বিশেষ পরিচয়ের জ্ঞান হইলে হলুদে পাখী বলিয়া পরিচিত করিয়া রাখিলাম।

“অলিরাজ” বাবুইর মত বড় পাখী। ডানা দুইটি এবং লেজ বাতীত সর্বাঙ্গ ফিকে হলুদে রঞ্জের পালধে আবৃত। পালধ গুলির উপরিভাগ একটু ঘন হলুদে রঞ্জেরই ছিল, কিন্তু অপর পৃষ্ঠা মেটে ধূসর বর্ণের বলিয়া ইহাদিগকে ফিকে হলুদে দেখা যায়। মাথার উপরের দিকের পালকের হরিদ্রাভা একটু বেশীপরিমাণে ধূসর মিশ্রিত। ইহাদের লেজে পঁচিশ হইতে আটশটি খুব পাতলা এবং মৃদু কাগজের মত পালধ আছে। পালধের মধ্যে যে দাঁড়া (quill) আছে, তাহার দুই পাশের লোম বা পাখগুলির এক দিক ঈষৎ কালো, অপর দিক ঈষৎ হলুদে। যখন অলিরাজ এক গাছ হইতে উড়িয়া অল্প গাছে যায় তখন লেজের হলুদে রঙ্গটা চক্ষে পড়ে; নতুবা লেজটি ফিকে কালোই দেখায়। ডানা দুইটি সরু এবং শক্ত। লেজের পালধের সহিত ডানার পালধের কতক সাদৃশ্য আছে। তবে ডানার পালধের নিম্নভাগ মেটে সাদা পালধে আবৃত। অলিরাজ যখন বসিয়া থাকে, তখন তাহার ডানা দুটিও লেজ একরূপই দেখায়। ঠোঁট অত্যন্ত চোখা এবং ঠোঁটের পার্শ্বধারাল। ঠোঁটের অগ্রভাগ সাদার উপর পাতলা কালো বর্ণে মিশ্রান কতকটা ছাইয়ের মত সাদা। তৎপরে উপরের দিকে ক্রমে কালো। চক্ষু দুটি অতিশয় উজ্জ্বল। পা সরু এবং কালো। নখগুলি বীকা এবং তীক্ষ্ণ।

পায়ক পাখী।

অলিরাজ অতি মৃদু শিশু দেয়। বেশ একটু চড়া রাগিনীতে অ—বলিয়া অপেক্ষাকৃত মোটা আওয়াজে —লি—বলিয়া শিশু সমাপ্ত করে। এই অ—লি—হইতেই সম্ভবতঃ ইহার নাম অলিরাজ হইয়াছে। ইহারা কেবল ঐ গান করিতেই দক্ষ তাহা নহে, গান করিতে করিতে ইহারা ডালে ডালে নাচিয়া বেড়ায় এবং একটু ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেই মুহূর্তমধ্যে উড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। স্থানান্তরে বাইবার সময় ইহারা এমন একটা অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করে, তাহা শুনিয়াই তাহার সঙ্গিনী পক্ষিনীও তৎক্ষণাৎ তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। অলিরাজের পুরুষ ও স্ত্রীজাতির পার্থক্য অতি সামান্য। পক্ষিনী অপেক্ষা পক্ষীর হং একটু বেশী উজ্জ্বল।

অলিরাজ গাছে গাছে ঘুরিয়া ডালার বা পাতার যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা বা পীপিলিকা পায়, তাহা ভক্ষণ করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করে। কখন কখন আকাশে উড্ডীন ক্ষুদ্র পতঙ্গের উপর পড়িয়া তাহাকে উদরসাৎ করিয়া থাকে।

অলিরাজ বারমাসই আমাদের দেশে দেখা যায়, তবে গীতকালে ততবেশী দৃষ্ট হয় না। ফাল্গুন মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত অলিরাজের মধুর শিশু শ্রায় সর্বদাই শোনা যায়। বর্ষারম্ভ হইলেই ইহারা একটু আশ্রয়গোপন করে। বৃষ্টি পতনের পর রোজ উঠিলে আবার ইহারা শিশু দিতে আরম্ভ করে।

অলিরাজ মধুর প্রভুতির মত বাসা নির্মাণ করে। ডিমগুলি সবুজ তাহাতে সাদা রেখাও আছে। ইহারা এককালে ২ হইতে ৪টি ডিম প্রসব করিয়া থাকে। ডিমগুলি বাবুইরই ডিমের মত বড় হয়। বাসার অতি নিকটে গেলেও ইহারা শব্দ করে না, যেন এখানে তাহাদের ক্ষতির কোনও কারণই নাই। কিন্তু বাসা স্পর্শ করা মাত্রই বিকট স্বরে চ্যা চ্যা করিয়া চীৎকার করতঃ এদিক সেদিক ছুটাইয়া দিতে থাকে।

ডিম হইতে ছানা বাহির হইলে অলিরাজ পরিত্যক্ত খোসা ঠোটে করিয়া বহু দূরে নিয়া ফেলিয়া দেয়। কাক

চিল, বাজ প্রভৃতি ইহাদের শত্রু। ইহাদের বাসার সন্ধান পাইলে ডিম বা শাবক ঐ শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

অলিরাজ ফাস্তন মাসের মাঝামাঝি ডিম পারে এবং ঠেঙে মাসে ছানা হয়। ছানাগুলি সম্যকরূপে উড়িয়া আশ্রয়কার সমর্থনা হওয়া পর্যন্ত মাতাপিতা ইহাদিগকে লইয়া নিরিঙ জললে গাছে গাছে উড়িয়া বেড়ায়।

অলিরাজ কাহাকেও পুৰিতে দেখি নাই। ইহাদিগকে ধরিবার সহজ উপায় আছে। একই গাছের ডালে প্রায় প্রত্যহই ইহারা যাতায়াত করে। ঐ গাছের যে সকল ডালে ইহাদিকে উড়িতে বসিতে দেখা যায় ঐ ডালের উপর ডালের আঁশ বা শণের কিছা হুতার জাল পাতিয়া রাখিতে হয়। ঐ জালে পানিলেই, পাখী জালে জড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। অলিরাজকে ধরিয়া রাখিলে সে এমন নিরীহ ভাব অবলম্বন করে, যেন পলাইবার তাহার কোন আকাঙ্ক্ষাই নাই। কিন্তু একটু অসতর্ক হইলেই সে এক ছুটে অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

অলিরাজ লোকালয়ের নিকটে যাতায়াত করে, কিন্তু ইহাদিগকে কখনও ঘরের চালে বা উঠানে বসিতে দেখা যায় না।

ত্রিপুরা চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গর্ভিণীর স্বাস্থ্য

গর্ভস্থ শিশুর ভাল মন্দ সকল বিষয়েই গর্ভিণীর নিজের বাহ্যের উপর নির্ভর করে। এই কারণে এ সময় শরীর ও মন, উভয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক। শরীরটি বাহাতে নীরোগ ও সবল থাকে, আর মনটি বাহাতে শান্ত, পবিত্র, প্রসন্ন এবং ক্রোধ, শোক, অহুয়া, ভয়, ত্রাণ প্রভৃতি শূন্য হয়, সদাসর্বদা তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য। মহাত্মা চরক কহিয়াছেন, “গর্ভিণী

সদা শোকার্ত থাকিলে ভীত ক্রীণ বা অন্নায়ু সন্তান প্রসূব করিয়া থাকেন।” আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও ইহার অনুমোদন করিয়া থাকেন। প্রসব কাল যতই নিকট বর্তী হইতে থাকিলেক, স্বস্থ্যের প্রতি ততই মন-যোগী হওয়া আবশ্যিক। যে সকল নিয়মাদি পালন করিলে গর্ভিণীর স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হইতে পারে, আমরা একে একে সেগুলির বর্ণনা করিব।

বসনভূষণ—সুশ্রুত গর্ভিণীকে গুরু বসন ও দিব্য অলঙ্কার ধারণ করিতে বলিয়াছেন। আমাদের নিকট ইহা অলৌকিক বলিয়া বোধ হয় না। উত্তম বেশ ভূষার চিন্তের আনন্দ ও প্রফুল্লতা এন্মায় তাহাতে গর্ভিণীর নিজের ও তাহার গর্ভস্থ সন্তানের বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভব। গর্ভিণীর বসনভূষণগুলি যেন বেশী আঁটা না হয়। আঁটা কাপড়চোপড়ে তাহার বুকে ও পেটে চাপ পড়ায় সম্ভব। বুকের উপর অস্ত্রায় চাপ পড়িলে, স্তন দুইটি উপযুক্ত ভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে না, এবং তাহাদের বোঁটা দুইটি বসিয়া যায়; তাহার ফল এই হয় যে, প্রসবের পর প্রসূতী সন্তানকে স্তন্য দান করিতে পারে না; আবার আঁটা কাপড়ে কোমরে ও পেটে এত অধিক চাপ পড়িতে পারে বাহাতে গর্ভপাত হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। গর্ভিণীর বস্ত্রাদি খুবই ঢিলা ঢালা ও আলুগা হওয়া আবশ্যিক।

স্নান—গর্ভিণীর পক্ষে প্রতিদিন শীতল জলে স্নান করা ভাল; শীতল জল সহ না হইলে, অল্প উষ্ণ জল ব্যবহার করিতে পারেন। খুব গরম জলে স্নান করা কোনমতেই উচিত নহে; তাহাতে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এদেগে স্নানের পূর্বে সর্ব গাত্রে তৈলমর্দন বিধি প্রচলিত আছে। গর্ভাবস্থায় তৈলমর্দন কালে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যিক। এসময় উদরদেশে বল প্রয়োগ করা কিছা টেপাটিপী ভাল নহে। নব্য চিকিৎসক দিগের ত কথাই নাই, প্রাচীন চিকিৎসকগণও এ বিষয়ে গর্ভিণীকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিয়াছেন। চরক ও সুশ্রুত উভয়েরই মতে “গর্ভ সংপীড়ন” (টেপা-

টেনী) এবং তৈলাভ্যঙ্গ (আভাং করিয়া তৈল মাখা) গভিগীর পক্ষে নিরাপদ নহে। ইহাতে গর্ভপাতের সম্ভাবনা আছে।

কাজ কর্ম প্রভৃতি—গভিগীর পক্ষে অতিরিক্ত শ্রম করা অথবা দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করা কোনমতেই ভাল নহে। তাই বলিয়া দিন রাত্ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অথবা শুইয়া থাকাও উচিত নহে। সম্ভব মত কাজ কর্ম করা ও ভ্রমণ করা তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। দিনের বেলায় যত অধিক সময় তিনি ঘরের বাহিরে কাটাইতে পারেন, তাহার পক্ষে ততই মঙ্গল। বিগ্ৰহ বায়ু সেবন না করিলে এবং সাধ্যমত শ্রম না করিলে কোন মতেই স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে না; গর্ভাবস্থায় প্রায় সকলেরই কেমন এক রকম মুচ্ছা-ভাব এবং শরীর ও মনের অবসাদ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। যে সকল স্ত্রীলোক কাজকর্ম করেন না তাহাদের মধ্যে উহা আবার খুব অধিক পরিমাণে ঘটিতে দেখা যায়। বিগ্ৰহ বায়ু সেবন এবং সম্ভব মত পরিশ্রম করিলে কেবল যে স্বাস্থ্যেরই উন্নতি হয়, তাহা নহে; প্রসব সময়েও বিশেষ সুবিধা হইতে দেখা যায়। আলস্তপরায়ণা শ্রমভীতা স্ত্রীলোকদিগের বেলায়, প্রসব কালে একটা না একটা গোলযোগ প্রায়ই উপস্থিত হইতে দেখা যায়। মোটের উপর ইহাদের “খালাস” হইতে অযথা অধিক সময় লাগে এবং সে সময় যন্ত্রণাও খুব বেশী হয়। এবিষয়ে ভদ্র ঘরের মেয়েদের অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের খুব ভাগ্য বলিতে হইবে। ইহাদের দিবা রাত্রি শুইয়া বসিয়া কাটাইবার উপায় নাই। কাজ না করিলে ইহাদের কিছুতেই চলিতে পারে না; তাহার ফলে প্রসব ব্যাপারটি তাহাদের নিকট নিদারুণ সঙ্কট কাল রূপে প্রতীয়মান না হইয়া নিতান্তই সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এবিষয়ে অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদের তাহাদের দরিদ্রা ভগ্নীগণের নিকট বিস্তর শিখিবার আছে বলিয়াই মনে হয়। গভিগীর পক্ষে কাজকর্ম করা খাটা খুঁটা একান্ত আবশ্যক; তাহা বলিয়া তাহাদের যে সে কাজ করিতে যাওয়া উচিত নহে। যে সকল কাজে অতিশয়

পরিশ্রম অথবা বল প্রয়োগের আবশ্যক, সেসকল কাজে তাহাদের কদাপি অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। গভিগীকে কোনরূপ ভারি জিনিষ তুলিতে দিতে নাই। কুয়া হইতে জল তোলা কি উনান হইতে ভাতের হাঁড়ি নামান প্রভৃতি কাজ গভিগীর পক্ষে নিরাপদ নহে। বার বার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপর নীচু করাও ভাল নহে। আবার যে সকল কাজে অতিশয় ক্ষিপ্ততা ও ব্যস্ততার আবশ্যক, সেসকল কাজ করাও গভিগীর পক্ষে বুদ্ধিবৃত্ত নহে। উহুনে কুঁপাড়া কি দোড় ধাপ করা প্রভৃতিও তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে। অশ্রুত গভিগীকে খুব জোরে কথা কহিতেও নিবেদন করিয়াছেন: ইচ্ছা করিলে তিনি একটু আধটু রাগা বারার কাজ না করিতে পারেন এমন নয়। কাজ কর্ম করিতে করিতে শ্রান্তি বোধ হইলে, কিছুকালের অল্প শয়ন করিয়া বিশ্রাম করা কঠব্য। আমাদের দেশে অনেকেই গর্ভকালটাকে পীড়ার হিসাবে দেখিয়া থাকেন, তাই অল্প তাহার গভিগীকে বড় একটা খাটিতে খুঁটিতে দিতে চাহেন না; দিন রাত শুইয়া থাকিতে বাধ্য করেন। বলা বাহুল্য ইহা অতীব অন্তায়। গভিগীকে কাজ কর্ম না দিয়া দিন রাত শুইয়া বসিয়া থাকিতে দিলে তাহার শরীর ও মন উভয়েরই স্বচ্ছন্দতা বিনষ্ট হয়; আর প্রসবের সময় তাহাকে অকারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আলস্তপরায়ণা রমণী যে সকল সম্ভান প্রসব করিয়া থাকেন তাহাদের কদাচিৎ সুস্থ সবল ও দীর্ঘায়ু হইতে দেখা যায়। মানুষের মত কিছু হুণে কষ্ট অতাব যন্ত্রণা তাহার প্রধান কারণ আলস্ত ভিন্ন আর কিছুই নয়। সামর্থ্য সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কাজ করে না তাহার শরীর ও মন উভয়েরই দুর্গতির সীমা থাকে না। আলস্ত অপেক্ষা মানুষের বোরতর শত্রু আর কিছুই থাকিতে পারে না; হুণের বিষয় এই যে, ভদ্র সমাজের কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই মধ্যে শারীরিক শ্রম না করা, আজ কাল যেন গোবাক পরিচ্ছদের সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইহাদের মধ্যে যে সকল পুরুষ আপনাদের হাতে শয্যা রটনা করেন

কার্তিক ১৩১১

কিন্তু বস্ত্রাদি কাচেন কি এইরূপ কাজ কর্ষ করেন লোকে আর তাহাদিগকে তত্ত্ব মনে করিবে না, সামান্য লোকের মধ্যে গণ্য করিয়া বসিবে এই কারণে ভদ্র সমাজে অনেক কাজ দাস দাসীর উপর স্তম্ভ হয়। ইহার ফলে উক্ত সমাজের নর-নারীর স্বাস্থ্যের দিন দিনই অবনতি সাধিত হইতেছে। দরিদ্র গৃহে সহস্র অভাবের মধ্যে প্রত্যেকের হৃদয়ে যে শান্তি যে আনন্দ থাকিতে দেখা যায় ধনীরা অট্টালিকার প্রাচুর্যের মধ্যে, কদাপি তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। শারীরিক শ্রম উপেক্ষা করাতেই ত আজকাল শিক্ষিত মহিলাদিগের মধ্যে হিষ্টিরিয়া মৃগী, প্রভৃতি বিবিধ জায়বীয় রোগের এত প্রাদুর্ভাব হইতেছে। মনুষ্য যতক্ষণ না নিদ্রিত হয় জাগিয়া থাকে ততক্ষণ তাহার আর মনের বিশ্রাম থাকে না, একটা চিন্তা মনের মধ্যে উদ্ভিত হইতে থাকিবেই। অলস ব্যক্তির হৃদয়ে এ অবস্থায় নিয়ত বিবিধ রূপ কু-বাসনা কু-অভিপ্রায় প্রভৃতির যে উদয় হইতে থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে। এই সকল কারণে নর-নারী কাহারও কোন কালে কোন অবস্থায় সামান্য শক্তি সবে আনন্দ করা উচিত নয়।

গর্ভিণীর বাসের ঘর—গর্ভিণী যে ঘরেতে বসবাস করিবেন, সেটি যেন বেশ প্রশস্ত হয়; উহার মধ্যে যেন অবোধে বায়ু চলাচল ও আলোক প্রবেশ করিতে পারে। স্বর্ঘ্যালোকে ও বায়ু দ্বারা বাসভবন যেরূপ বিশুদ্ধ ও নির্মল হয় এমন আর কিছুতে নহে। যে ঘরে ভালরূপ আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ অন্ধকার ঘরেই যত প্রকার সংক্রামক রোগের জন্মভূমি বলিয়া মনে হয়। রোগবীজ সকল এই সকল স্থলে যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এমন আর অল্প কোন স্থলে নহে। গর্ভিণী যত সহজে রোগাক্রান্ত হন সাধারণ ব্যক্তি এত সহজে হয় না; এই কারণে তাঁহার বাসগৃহটি খুব ভাল হওয়া চাই। ইহার নিকট পায়খানা বা ময়লা ভল নিকাসের নর্দমা প্রভৃতি না থাকাই উচিত। যদি একান্তই থাকে, তাহা হইলে তাহাদের বেশ পরিষ্কার

পরিষ্কার রাখা উচিত। তাহার ঘরে, কোনরূপ চূর্ণ দ্রব্য বাহাতে প্রবেশ না করিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। দিবসে ঘরটির সমস্ত দ্বার জানলা খুলিয়া রাখা উচিত। কষ্টকল্পলি অবাবশ্যক বায়ু পেটারা খাট গোঁকী দ্বারা ঘরটির স্থান জুড়িয়া রাখা উচিত নয়।

দিবানিদ্ৰা—গর্ভিণীর পক্ষে দিনের বেলায় মধ্যে মধ্যে একটু আধটু নিদ্ৰা যাওয়া মন্দ নহে। এক এক বারে কিন্তু অল্প ঘণ্টার অধিক শুইয়া থাকা উচিত নয়। এইরূপে সারাদিনে মোটের উপর ৬ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিলেই যথেষ্ট বিশ্রাম করা হয়।

গর্ভিণীর খাদ্য—যে সকল খাদ্য বেশী উত্তেজক অথবা সহজে জীর্ণ হয় না, গর্ভিণীর পক্ষে সে সকল খাদ্য না খাওয়াই উচিত। তাহার পক্ষে ঘন ঘন নিঃস্রবণ খাওয়া ভাল নহে। গর্ভের প্রথম ৩৪ মাস গর্ভিণীর পাকস্থলী ও অন্ত্র পরিপাক যন্ত্র সমূহের একটা অংশ হয় বাহাতে তাঁহার পক্ষে অধিক খাদ্য জীর্ণ করা কঠিন হইয়া পড়ে; এই কারণে সে সময় তাহার খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করিতে নাই; করিলে, তাহার বিশেষ অসুবিধা হয়। কিন্তু যে সময় হইতে জগটি পেটের মধ্যে নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করে, সেই সময় হইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গর্ভিণীর অবস্থার একটা পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। তখন হইতে তাহার ক্ষুধা ও জীর্ণ শক্তি উভয়ই বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। তখন হইতে তাঁহার খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিলে তাহা সহজেই জীর্ণ হয় এবং তাহাতে তাঁহার কোনই অসুবিধা হয় না। এ সময় তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় যতটা খাদ্য খাইতেন ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য দিলে চলিতে পারে না, কেন না এসময় হইতে জগ-দেহের নীচ নীচ খুব বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। গর্ভিণীকে যদি যথেষ্ট খাদ্য দেওয়া না হয় তাহা হইলে তাঁহার গর্ভস্থ শিশুর দেহ-পুষ্টি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আবার বেশী খাদ্যের আবশ্যক বলিয়া যা তা খাইতে

দিলে চলিবে না।

যে সকল খাণ্ড বেশ পুষ্টিকর অথচ দুপাচ্য নহে সেইরূপ খাণ্ডই ব্যবস্থা করিতে হয়। ভাত, দাইল, দধি, দই, কুটি, লুচি, মংস্ত প্রভৃতি খাণ্ড বেশ পুষ্টিকর। গভিগীর পক্ষে অধিক মাংস খাওয়া ভাল নহে। গর্ভাবস্থায় দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত। যাহাদের দুগ্ধ ভাল সহ হয় না দধি খাইয়া সেই সম্ভাব পূরণ করিবা লওয়া উচিত। তাঁহার সাধারণ অবিতরকারী ও কলা, পেপে প্রভৃতি ফল মূল্যাদিও প্রতিদিন কিছু কিছু কবিয়া আহার করা উচিত। ইহাদের দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। গভিগীর প্রতিদিন নিয়ম মত কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া একটা আবশ্যক। যে সকল স্ত্রী নড়া চড়া করেন না কেবল শুইয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেই কোষ্ঠবদ্ধতা প্রাপ্তি পাটয়া থাকেন। অধিক স্বত-মশলাসংযুক্ত খাদ্যে গভিগীর বিশেষ অনিষ্ট হয়।

গভিগীর চিত্ত বিনোদন—গভিগীর মন যাহাতে সর্বদা প্রফুল্ল থাকে গভিগীর নিজের এবং তাব আত্মাষ স্বজন সকলেরই এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। যে সকল বিষয়ে অতি সংকোচ মানসিক উত্তেজনার সম্ভাবনা নহে। যে মধ্যে তাহার না যাওয়াই উচিত। গভিগীর পক্ষে ক্রোধ বড় নষ্ট-নাশকবে। গল্প শুভব এবং সংগ্রহাদ পাঠে চিত্ত বিনোদন সম্ভব। এত কাবণে এ সকল করিতে তাহার কোন বাধা থাকিতে পাবে না। গভিগীর নিকট কোনরূপ পানবানন্দকর শোকারহ কিম্বা লোমহর্ষণ ঘটনাব উল্লেখ করিতে নাই।

নিদ্রা—রাত্রি ভাগরণে গভিগীর বিশেষ অনিষ্ট হয়। দশটা বাজিতে না বাজিতে তাহার শয্যা আশ্রয় গ্রহণ করা আর ছয়টা বাজিবার পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করা উচিত। গভিগীর শয়ন ঘরটিতে কতকগুলি অনাবশ্যক সামগ্র্য, বাস্তব তোরঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা ‘দবড় জঙ্গ’ করিয়া রাখা কর্তব্য নহে। ঘরটি বাহ্যতে অধিক গরম না হয় সোদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। বিশেষ প্রতিবন্ধক না ঘটিলে ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া রাখা ভাল। অনেক সময় গভিগীর ঘাত্রে ভাল নিদ্রা হয় না। তাঁহার শরীরের ভিতর কেমন

এক রকম গরম বোধ হয়। বেশী পুষ্ক বিছানার শয়ন করিলে, তুলাব গরমে ওরূপ হইতে পারে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলেও এমন হইতে পাবে। আহারের দ্বন্দ্বোবে কিম্বা দৈনিক স্নান বাদ থাকিলেও ওরূপ না হয় এমন নয়। কাজকর্ম না করিয়া দিন বাত শুইয়া থাকিলেও অনিদ্রা ভয়াইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচি

গ্রন্থ সমালোচনা

২৮। **সচিব সম্প্রদায় রাজস্থান**—
শ্রী বসিনবিহাবা নন্দী প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ২৮ টাকা—
অ কাব ডবল ক্রাউন, অষ্টাংশত সুন্দর বাধাই, সোনার জপে নামলেখ। এই গ্রন্থ মহাত্মা কর্ণেল টডের রচিত রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ। ইতি পূর্বে টডের সুবিখ্যাত গ্রন্থ বাঙ্গালা গণ্ডে অনুদিত হইয়াছে কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার উক্ত গ্রন্থরপন্যানুবাদ বোধ হয় এই প্রথম। শিবাব, অম্বর, মংবাব প্রভৃতি রাজস্থানের সপ্ত জনপদে কাহিনী সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থকার পবারাদি ছন্দে ৩২২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই সুবহু গুরু বচন। কাব্যরচনা।

রাজস্থান ভাবতবর্ষের এক মহা তীর্থক্ষেত্র। উহার প্রত্যেক মূলিকণাব সহিত অলৌকিক শৌর্য ও সত্যের গৌরব স্মৃতি ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। এই পুণ্ড্রভূমির বিচর কাহিনী ধারাবাহিকরূপে নিবন্ধ করিয়া কর্ণেল টড তাঁহার আত্ম জীবনে যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন তাহাকে অস্বাকার করিবে? রাজস্থানের ইতিহাস এক মহাকাব্য। এরূপ অমূল্য গ্রন্থ অনুবাদ সাহায্যে যত অধিক প্রচারিত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। এই কারণেই আমরা এই গ্রন্থের পঞ্চানুবাদ দেখিয়া সুখী হইয়াছি।

এই গ্রন্থ রচনায় গ্রন্থকার যে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ বিদ্যুৎ

এই আকারে কবিতার রচনা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। গ্রন্থকারের অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় স্থানে স্থানে একাধিক বার পাঠ না করিলে অর্থ গ্রহ হয় না। এরূপ বৃহৎ কাহিনীর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হওয়াই আবশ্যিক, সন্দেহ নাই। অত্যাধিক রচনা আরও কয়েকগ্রন্থ হইলে অধিকতর সুখী হইতাম। এই সমস্ত সত্ত্বেও এই গ্রন্থখানি আমাদের নিকট মোটের উপর ভালই লাগিয়াছে।

আর একটি বিষয়েও গ্রন্থকার প্রশংসার যোগ্য। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রের কোন ব্যতিক্রম করেন নাই। ঐতিহাসিক চিত্রের বৈষম্য ঘটাইলে গ্রন্থ কাব্যার্থে উৎকৃষ্টতর হইতে পারিত; কিন্তু বৈচিত্র্যেই এই লিখিত হইয়াছে তাহা সাদৃশ্য হইত না। রাজসভার ইতিহাস চিত্রাকর্ষক রূপে বাঙ্গালার নরনারীর নিকট উপস্থিত করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যই পরিপূর্ণে সিদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজিত দেখিলে সুখী হইব।

উপেন্দ্র

২৭। প্রজ্ঞানন্দ,—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, ত্রিপুরার বন, বি, এ, কর্তৃক ঢাকা পুস্তাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, ৭৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১/০ আনা। এই পৌরাণিক কাহিনী বালক বালিকাগণের উপযোগী করিয়া সরল, ভাব্য লিখিত হইয়াছে; এবং ইহাদের চিত্ত-রঞ্জনের কোন ব্যবহারই ক্রটি হয় নাই। এষ্টিক কাগজে ব্রহ্ম-রূপ কালীর ছাপা; প্রতি পৃষ্ঠা লাল বর্ডারে রঞ্জিত ও পুস্তকটি ছরখানি হাকটোন ছবিতে শোভিত।

২৮। হান্সান্দি,—শ্রীশুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত, কলিকাতা ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস (২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট) হইতে প্রকাশিত, রয়েল বোডিশানিত, ১০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা মাত্র। উৎকৃষ্ট এষ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা, প্রচ্ছদপটে লাপানী রঙে সজ্জা দেখা।

এটি লাপানী গল্পের বই—আটটি গল্পের সমষ্টি—গল্পগুলি গ্রন্থ সমস্তই পূর্বে কৌশল না কোন এসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। রচনাকৌশলে, ভাষা মাধুর্য্যে প্রত্যেকটি গল্পই রমণীয়—পড়িতে পড়িতে যেন এক নূতন রাজ্যের কৌমল্য সৌন্দর্য্যের একটি অভাবনীয় ছায়া-চিত্র হৃদয়ে জাগিয়া উঠে—বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ গল্প সম্পূর্ণ নূতন।

শ্রীজ্ঞানশরণ।

২৯। ছোটী রান্নাশিল্প—শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত, ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্তৃক কলিকাতা ২৩ নং সুকিয়া স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত; আকার—রয়েল বাদশাফ্রোঁত, এষ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা। মোটী কাগজের রঞ্জিত প্রচ্ছদপট, ৮৯ পৃষ্ঠা, মূল্য লেখা নাই। সরল পদ্ধতি মহাক-বিকৃত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সুন্দর হইয়াছে; ভাষা, ঘটনা নির্মাচন ও সমাবেশ সমস্তই কোমলমতি বালক বালিকাগণের উপযোগী, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলি কীবন্ত-ভাবে তাহাদের চিত্তরঞ্জন, উপদেশ ও শিক্ষার কার্য্য করিবে। একাধারে আমোদ ও উপদেশের সমস্ত সমাবেশ! আশ্রয় বালক বালিকাগণকে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—

এ বই সুন্দর কথা পড় দিয়া যন।

৩০। পদ্মের বই,—শ্রীসুখলতা রায় প্রণীত, কলিকাতা ২২ নং সুকিয়া স্ট্রীট হইতে ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত; আকার ডবল ক্রাউন—১৬ পেজী, ১৪৮ পৃষ্ঠা, দাম মাত্র ১০ আনা। কাগজ বেশ, ছাপা পরিষ্কার ও সুন্দর। মোটমোট কুড়িটি গল্প আছে—বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বই।

যিনি বইখানি লিখিয়াছেন তিনি রমণী—সুতরাং রমণীসুলভ কোমলতা লইয়া তিনি কুশল হস্তে কলমের ব্যবহার করিয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ হস্তে তুলিকা পাত করিয়া গল্পগুলি সার্থক করিয়াছেন। তাহাতেই উপকথাগুলি এত উপদেশ ও হেলেনের এত উপযোগী হইয়াছে। লেখিকা উপাখ্যান রচনায় যেমন সিদ্ধহস্ত চিত্রশিল্পেও তেমনই অস্তিত্ব। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত রূপ কথার মর্ম্মাচ্ছাদন হইলেও রচনাকৌশলে আধ্যাত্মিক-গুলি বাঙ্গালার নিজস্ব হইয়া গিয়াছে। আশ্রয় মুক্তকণ্ঠে বলিষ্ঠ পারিবারিক বালিকার বন ভূদাম পুস্তকের জালিকার আলোচ্য পুথিখানায় স্থান অতি উচ্চ।

শ্রীজ্ঞানশরণ।





প্রতিভা

২য় বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩১৯ চন্দ্র সংখ্যা

সংস্কৃত সাহিত্যে নবজীবন *

বুদ্ধদেবের 'মহাভাষ্য' আদর্শের সঙ্গম-ফলে পৌরাণিক সাহিত্যে এক নূতন শ্রোত দেখা দিয়াছিল, পূর্বপ্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এখন, প্রকারান্তরে এই মহাভাষ্য আদর্শের নাম সরলতা। প্রাচীন মহাভাষ্যমাজের ইতিহাস বিচার করিলেই দেখিবেন, মহাভাষ্যের পক্ষে ধর্ম, কর্ম, কথায় এবং চিন্তায় সরল হওয়া ব্যাপারটা কত শক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখনও এই পদার্থটাই বিশেষ মহার্ঘ বলিতে হইবে। মানুষ প্রতিনিয়ত নিজের জ্ঞানকৃত কর্মগতিকে জীবনের মধ্যে এতই জঞ্জালের সৃষ্টি করিতেছে যে, এবং পদে পদে তাহার দ্বারা জড়িত বিজড়িত হইয়াই পাপ ভোগ করিতেছে যে, মহাভাষ্যের সমাজে, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পে এইরূপে "স্বধাদ সলিলে" ডুবিয়া মরার আশঙ্কাটাই সর্বাপেক্ষা অধিক। মানুষ কালেকালে যুগেযুগে এক এক বার এই সরলতা লাভ করিবার জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। মহাভাষ্য-সভ্যতার সমস্ত বিভাগেই এই অপক্লপ সত্য ঘটনা

লক্ষ্য করিবেন। মানুষ চিরকাল জ্ঞানের জ্ঞান, সত্যের জ্ঞান লালায়িত। উহার গতিকে যৎসামান্য বাহ্য প্রাপ্তি হয়, অতর্কিতে অনন্ত উপসর্গ উপজাত হইয়া উহাকে পদে পদে খণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে; এবং মানুষ এক এক বার উন্নত ভাবে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া আর এক "ধাক" অগ্রগামী হইতে চেষ্টা করে। ইহাই মহাভাষ্যের সভ্যতার গতি; এবং সকল বিভাগেই ইহার দৃষ্টান্ত আছে। মানুষ সজ্ঞধর্মী বলিয়া, এবং দলবদ্ধ হইয়াই চলে বলিয়া, সমগ্র জাতিটাই সমূহভাবে নব নবতর সোপানে আরোহণ করিতে চেষ্টা করে বলিয়া, এই ঘটনা যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তেমন জাতিগত জীবনেও প্রত্যক্ষ হইতেছে। গীতাকার অবতার পুরুষের মুখে "ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" কথাটার মধ্যে মানব সভ্যতার অন্তরতম তত্ত্বেরই খ্যাপন করিয়াছেন। 'ধর্ম' সংজ্ঞাকে ঋষি দার্শনিকগণের মতসঙ্গতে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিলে, মহাভাষ্যসভ্যতার যাবতীয় বিভাগের অন্তরধর্ম বলিয়া বুঝিয়া লইলে, এই কথাটার মধ্যে একটা পরম সূক্ষ্ম তত্ত্বের আভাস লাভ করিব। আবার, ধর্ম সংস্থাপন কি? এই 'ধর্ম' একটা অনাদি, অনন্ত অখণ্ড নিত্য অভিব্যক্তিশীল স্থিরতার তত্ত্ব বই নহে।

উহারই অন্য নাম এই সরলতা; সোজামুজি ভাবে আপনার চিরন্তন তত্ত্বটাকে প্রাপ্তি; জগতের গতি-বশে, মহাভাষ্যমাজের গতি-বশে ওই স্থিরপদার্থ চিরকাল আব-

* এই প্রসঙ্গ 'বাণী পহার' 'সাহিত্য-আজ্ঞার অভিব্যক্তি' নামক অধ্যায়ের অন্তর্গত ও 'ভারতীয় সাহিত্যে বৌদ্ধ প্রভাব' নামক পূর্বপ্রবন্ধের সহিত সঙ্গত। —লেখক।

অগ্রহায়ণ ১৩১৯

রিত হইয়া দূর দূরান্তরবর্তী হইবার উপাধি অবলম্বন করিতেছে। মানবজাতির 'বিরাট পুরুষ' এক এক বার একই আঘাতে ওই অবিজ্ঞাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সরলতার আদর্শে স্থির হইবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে ওই চিরন্তন 'ধর্ম'—মানবধর্ম, সরলতার ধর্ম এতই অপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল যে, পৌরাণিক ধর্ম-ভাবুকতা এবং নানা অপধর্মের জঞ্জাল দ্বারা এতই আবিল্ট হইয়াছিল যে, তাহার বিরাটপুরুষ শূদ্রক এবং বিষ্ণুশর্ম্ম প্রভৃতিকে মুখপাত্র করিয়া এই এক বার আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া দাঁড়াইলেন। চিন্তা করিয়া দেখুন, এক দিকে উহা কত সোজা কথা! মনুষ্যই মানুষের অন্তর্নিহিত স্থির তত্ত্ব বলিয়াই উহা এত সোজা! অল্প দিকে, উহা কত কঠিন, বিপুল পৌরাণিক সাহিত্য তাহার পর্ততপ্রমাণ দৃষ্টান্তরূপেই দাঁড়াইয়া আছে! গীতার "ধর্ম" কথাটাই বা কত সোজা!—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

একের শরণ লওয়া! প্রীতিভক্তিরসার্পী হইয়া শরণ লওয়া! ইহা কত সরল সহজ কথা! দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক অল্পপল বিপলের যজ্ঞতন্ত্রজটিল এবং ভয়-ভীতি-সমাকুল বহুদেবনিষ্ঠা এবং অশেষ জিয়াগহনতা ইহার ভিতর নাই! সংসারের 'মোহবন্ধ' ছিন্ন করিবার জন্ত অশেষ বিশেষ কর্ম্মচেষ্টা, চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে শতসহস্র প্রকারের রাজ-হঠ-মন্ত্রের উপায় কোশল, সমস্তই যেন নিমেষে তুলাধুনী হইয়া উড়িয়া গেল! কত সোজা কথা, অথচ মানুষের পক্ষে ওই কথাটার সাম্যনাসাম্যনি উপস্থিত হওয়াটাই কত কঠিন হইয়াছে! কত কাল কত যুগযুগান্তের বহু সাধনা-ব্যাপার আবশ্যক হইয়াছে! দেশ বিদেশের মনুষ্যসমাজের ধর্ম্ম-ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিবেন, এই একের তত্ত্ব, একের প্রতি প্রেম তত্ত্ব, মনুষ্যের নেত্র সমক্ষে প্রকট হইবার পক্ষে কত কাল, কত বিড়ম্বনা, কত অশ্রাবনীর অনিষ্ট ঘটনা ঘটয়া আসিয়াছে! এখনও—এত কাল

পরেও, ওই সোজা কথাটার অমুভবতা হওয়া দূরে থাকুক, উহা বুঝিয়া লওয়ার পক্ষেও আমাদের অজ্ঞগতে এবং বহির্জগতে কত দিক হইতে কত প্রকারের নিষেধ এবং অন্তরায়! সরল এবং মানুষ হওয়াটাই মনুষ্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কঠিন! সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কি তাহাই নহে? আধুনিক বিজ্ঞান যেমন মানুষের জ্ঞানকর্ম্মের সমক্ষ-স্থান হইতে মনুষ্য-অদৃষ্টের এই জালজঞ্জাল অপসারিত করিতে চেষ্টিত আছে, আধুনিক সাহিত্যও সকল দিকে মুখ্যভাবে এই সরলতা এবং অনার্জবই লক্ষ্য করিতেছে!

যাহা হউক, ভারতের সাহিত্যহৃদয় এই এক বার সরলতা এবং মনুষ্যহৃনিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার ফল যে নিরতিশয় মহার্ঘরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই আমরা দেখিব।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সরলতা এবং মনুষ্যহৃনিষ্ঠাই কবির নিজের সাপক্ষে আসিয়া স্বাধীনতা রূপে উপস্থিত হয়। আমাদের ভাষার এই শব্দটা ইংরাজী 'লিবারটি' বা 'ফ্রীডম্' হইতে অনেক বৃহৎ এবং ব্যাপক অর্থের সম্মত করিতেছে। অন্তর্জগতে এবং বহির্জগতে উভয় দিকেই উহার অধিকার। এই স্বাধীনতা 'স্বাতন্ত্র্য বা আত্মাধীনতা' ইহা পূর্বোক্ত মনুষ্যহৃনিষ্ঠা বা সরলতার আত্মজ্ঞা বই নহে। সকল দিকেই, মনুষ্যের ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য এবং শিল্পের রক্ষয়িত্রী রূপে, এক কথায় মনুষ্যসভ্যতার স্থিতি-স্থিতি-প্রলয়ক্ষরী পরমদেবতা রূপে, এই স্বাধীনতাকেই নির্দেশ করিতে পারি! ধর্ম্মের ক্ষেত্রে যেমন আত্মজ্ঞানই চরম কথা, শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির জীবনে বা জাতীয় জীবনে, তেমনই এই স্বাধীনতা! কবি কাব্যরচনা করেন, স্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভর করিয়া, এবং স্বাধীনতাকেই উদ্দেশ্য করিয়া! পাঠক উহা অধ্যয়ন করে, নিজের পরিব্যাপক আত্মতত্ত্বকে লাভ করিবার জন্ত! আপনার অহংতত্ত্বকে সম্প্রসারিত করিবার জন্ত! নব নব রসলোকে উল্লসিত হইয়া নিজের আনন্দময় তত্ত্বকে ঘনিষ্ঠতরভাবে উপলব্ধি করার জন্ত! মনুষ্যের শিক্ষা, দীক্ষা

বা জ্ঞানকর্ষের ব্যাপার যাইই স্বকীয় তত্ত্বকে অবিজ্ঞাত আত্মতত্ত্বকে লাভ করিবার জ্ঞান বই আর কিছুই নহে। এই কারণে অনন্তের সম্ভান মনুষ্যকে যেই কবি ভাবতত্ত্ব অথবা বস্তুর পন্থায় যতদূর আত্মজ্ঞানী করিয়া তুলিতে পারেন, সপক্ষে বা পরোক্ষে গোণ বা মুখ্যভাবে যিনিই মনুষ্যকে এই স্বাধীনতার তত্ত্ব যতই উপনীত করিতে পারেন, তিনিই তত সখা, মিত্র, বন্ধু বা গুরুর পদবী অধিকার করিতে সক্ষম হন। জগৎতত্ত্বের মধ্যেও এই স্বাধীনতাই পরা প্রকৃতি! ভারতীয় দার্শনিকের চক্ষে, শব্দরূপী পর-মাছার বক্ষঃস্থলে অনন্তলীলাময়ী মহাকালী! চতুর্ভুজার দুই করে অসি-ধর্ম্মর, এবং অপর দুই করে বরাভয়! ইনি গলদ্রক্তরসনা এবং ইহার গলদেশে শৃঙখালা! মহাকাল-রূপিনী করালী, অথচ ভক্ত মনুষ্য-হৃদয়ের জ্ঞান চিরন্তনো এবং করুণাময়ী মাতৃমূর্তি! পৌরাণিক ঋষি প্রাচীন সাংখ্য-বেদান্তের আত্মগত্য রক্ষা পূর্বক অল্পপমভাবে বিশ্বপ্রকৃতির এবং সমগ্র মনুষ্য-সভ্যতার অন্তরস্থা এই বিশ্বভয়ঙ্করী অথচ সুগপং করুণারসার্দ্দা এই মাতৃকামূর্তি দর্শন করিয়াছেন! সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতাই সংযমনিষ্ঠ ভক্তগণের জ্ঞান অমৃত অমরতা এবং অভয়বর লইয়াই সর্বত্র স্থির হইয়া আছেন; আবার অনাস্থিকগণের শৃঙখালা গলে পরিয়াই নৃত্য করিতেছেন! পৌরাণিক ঋষির এই ভাব-গত মূর্তিটাকে আধুনিকের চক্ষু লইয়া এই ভাবে দৃষ্টি করিলে, সাহিত্য-লোকের একটা পরম রহস্য-তত্ত্বের সম্মুখীন হইতে পারি! কবিগণের আত্মনিষ্ঠা এবং উহার স্মৃ-কৃ ব্যবহারই চিরকাল সাহিত্যের স্থিতিস্থিতি এবং বিলয় সংঘটন করিয়া আসিতেছে! শিল্পকলার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই মূর্তিটাকে আরও একটু বিশেষ ভাবে এবং অভিনিবিষ্ট ভাবে দর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

নবজীবিত সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষ ভাবে এই মনুষ্যাত্ম সরলতা এবং স্বাধীনতাকেই সম্মুখে রাখিয়াছিল। নব-জাগ্রত মনুষ্যমন নানা জঞ্জালের মধ্যে নিষ্কণ্টক থাকিয়াও এই লোক-পাবনী, 'তিনে এক' এবং 'একে তিন' মূর্তির দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়াই উহার পূজা করিয়াছিল! উহার

ফলেই ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য! পূর্বাণের মনুষ্যের সকল উন্নত সাহিত্যের ইতিহাসেই এই ইচ্ছাময়ী মহাদেবতার সাধন প্রকার, তাঁহার বহুযুগী আরাধনাই পরিদৃষ্ট হইবে। সাহিত্য মধ্যে ভাল মন্দ জীবন বা মৃত্যু যখন যাহা আসন্ন হইয়াছে, সমস্তই দেবতার তুষ্টি, পরিতোষ, অশ্রীতি কিংবা অসন্তোষ দাতিত বলিয়া দর্শন করিব। মনুষ্যের হৃদয়-কালীদহ মধ্যে কমলকামিনী এই দেবী! কত নিকটে, অগচ্চ কত দূরে! শত সহস্রের মধ্যে কেবল শ্রীমদ্ভগবৎ ইহার দর্শন লাভ করেন, সাহিত্যের চৌতিশার মধ্যে ইহার ভুবনমোহিনী মূর্তির ধারণা করিতে পারেন, নিজের সাধনভঞ্জন এবং যোগ্যতা গুণে জগতের মশান মধ্যে, বীভৎস দ্রুতসমুদ্রের বক্ষঃস্থলেও, এই ইচ্ছাময়ীর নব নব আবির্ভাব আকর্ষণ করিয়া, তাহাকে সংশয়ীর চক্ষু সমক্ষেও মূর্তিমতী করিয়া যান; নিজের জীবনকে এবং সংসর্গী পাঠকগণকেও ধ্বংসাশ্রয় প্রদান করেন।

আমরা দেখিতেছি, মূচ্ছকটিক হইতে আরম্ভ করিয়া গীত-গোবিন্দ পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের কবিগণের মধ্যে সর্বত্র এই চমৎকার-নিষ্ঠ এবং রস-নিষ্ঠ মনুষ্যত্বের আদর্শ, সরলতা এবং স্বাধীনতাই ক্রিয়াগতি কার্য করিয়া আসি-য়াছে। মনুষ্যহৃদয়ের চিরপরিচিত অথচ চিরনূতন সুর আলাপ করিয়াই, এই সমস্ত কবি সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; অযোগ্যগণ পরাস্ত হইয়া নীরবে বিস্মৃতিজলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন। পুরাণের সাম্প্রদায়িক আদর্শ ইহাদের নেত্র সমক্ষ হইতে অপসারিত! মনুষ্যের হৃদয়-নীতি এবং বুদ্ধির জগতে এক নূতন আশা এবং আদর্শের বাতাস বহিতেছে! সাহিত্য শাস্ত্রের চক্ষে হৃদয়ত যাহা নিতান্তই বিগর্হিত, এই সকল ব্রাহ্মণ অনেকে তাহাই পরম বীরবে উচ্চক্ষেপে প্রচার করিতে আরম্ভ করি-য়াছেন! মনুষ্য হৃদয়ের মূলভাব বা passion গুলি আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে! ইহার একান্ত মনে ওই স্থায়ীভাবগুলিকে রসাত্মক বাক্যে আচ্ছাদিত করিতে, কামকোষাদি রিপু-গুলিকেই ভাল-মন্দ স্বরূপ দান করিতে একাগ্র হইয়া গিয়াছেন। অতীত কোন অভিসন্ধি প্রবল নাই! কেবল

মুখ্যমন্ত্রণ ১৯১৯

মহুয়ের আত্মনিরূপণ, তাহার চিত্তবৃত্তির প্রতিকল্প গ্রহণ, তাহার ভিতর-চরিত্রের গলি-বুজিগুলি যথাযথভাবে নির্ণয়; মহুয়কে বিশেষ বিশেষ অবস্থা-ঘটনার মধ্যে ফেলিয়া তাহার মর্মের কথাগুলি, তাহার অন্তরাঙ্গার প্রীতি-শক্তির প্রকোষ্ঠ কিম্বা বোর-করণ-রোদ্র, ভয়ানক বা বীভৎস রসের কুঠরীগুলোকেও অনাবৃত করিয়া ধরাটাই যেন প্রধান উদ্দেশ্য! উহার সম্মুখে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম-উদ্দেশ্য কণ্টকিত হইয়া উঠে নাই! এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই যেন সকল ইতিহাস পুরাণ বা সংহিতাশাস্ত্র অপেক্ষা বৃহত্তর একটা কার্য্যফল লাভ করা যাইবে। সাহিত্য অধিকারের অকড়, অশোক এবং অলোক পুরীটার মাহাত্ম্য যেন সকলেই মর্মে মর্মে বুঝিয়া ফেলিয়াছেন! সাহিত্যরসের সুখ, দুঃখ, আপদ, বিপদ, সাহিত্যালোকের নর-নারী-চরিত্র, জীবনের অবস্থা এবং ভাবের বৃত্তান্ত সমস্তই মনোজগতের—মহুয়ের অধ্যাত্মজগতের সম্পত্তি। প্রাকৃত সুবহুঃখের সহিত তাহার দূরান্তরের—লোকান্তরের ব্যবধান! ইহা লোকের হাসি-অশ্রু, শোকতাপ, সমস্তই সাহিত্যালোকে আসিয়া অপরূপ আনন্দ-স্বরূপে পরিণত হইয়া যায়।

‘আনন্দোৎসব নগ্ননসলিলং যত্র নাট্যনির্মিতৈঃ।’ ভারতের জদয়ঙ্গম কবি ওই বাক্যে যেন সাহিত্যের এই অলকাপুরীর, এই অপরূপ মানসী পুরীটারই সন্ধান দিয়াছেন! নব আঘাতের নব বারিসংরম্ভ জদয়ের মেঘটাকে অল্পপম মন্দাকিনী ছন্দের তালেতালে ওই পুরীর অতি-মুখেই ছুটাইয়াছেন! বেদান্তশীর্ষ ভারতবর্ষের অভ্রভেদী হিমালয়শিখরকে ‘কৌল রক্ষু পথে’ ফাঁকি দিয়া গলিয়া পড়িয়া, এই ব্রাহ্মণ ওই দূরান্তরস্থিত অথচ অন্তরতম পুরীর ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার সঙ্কেতটাই যেন ‘বাৎ-লাইয়া’ দিয়াছেন! ওই পুরীর অভ্যন্তরে কি মহুয়া-জদয়ের চিরকালের মধু-মুষ্টি, কবিজদয়ের চিরকালের প্রিয়তমা। “জীবিতং মে দ্বিতীয়ম্” আনন্দ-রসসী রূপে অবস্থান করিতেছেন না? মেঘদূতটাকে এই ভাবে—এই নবসাহিত্যপুরীর আত্মরিক রসপরিচয় এবং সঙ্কেতবর্তী বলিয়া গ্রহণ করিব। দ্যুলোক ভুলোকের

অন্তঃসর কবি-জদয় সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র-সংহিতা অথবা বৈরাগ্য-মন্ত্র পরিহার পূর্বক, ভারতবর্ষের মাটিটাকে পরম আনন্দে এবং পবিত্র বোনে বারংবার আলিঙ্গন করিতেছে; মহুয়জদয়ের প্রীতি-রস আনন্দ-রসটাকেই সারাৎসার জ্ঞান করিয়া, উহাকে একেবারে সোজা-সুজি কৈলাসপুরীর পথ দেখাইয়া দিয়াছে! মহুয়ের সম্মুখে এই অভিনব ‘রোমান্স’—এই নবসাহিত্যদেশের সংবাদ! এই দেশ, এই নব আবিষ্কৃত নূতন মহাদেশ এত সহজ, অথচ এত কাল মহুয়ের সতর্ক-বিজ্ঞান এবং যাতায়াত হইতে এত দূরবর্তী ছিল! এই আবিষ্কারের পর হইতেই মহুয়ের সত্যতা মধ্যে এক নব অধ্যায় এবং নব যুগের আরম্ভ হইয়াছে!

সকৌপরি প্রকৃতি-নিসর্গ-প্রীতি! উহা ভারতীয় আত্মজদয়ে বেদ-দীকার উত্তর ফল বই নহে। নিসর্গকে একটা স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং চরিত্র জ্ঞান করিয়া সংস্কৃত কবিগণ কাব্যে নাটকে খণ্ড কবিতায় সর্বত্র একটা পরম পবিত্র অথচ রসমধুর উচ্ছ্বাস লাভ করিয়াছেন! উপন্যাস, উদ্ভাসন, অরণ্য, পৃথিবীর সিদ্ধ, শৈল, আকাশ, স্বাভাবিক অথবা মহুয় হস্তালঙ্কৃত সর্বপ্রকার নিসর্গ-ব্যক্তি বিষয়ে ভারতীয় মহুয়মন অপরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে। এই দেশে মহুয়জীবন, মহুয়ের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন নিসর্গের সহিত এত আত্মীয়তমভাবে স্ফুর্তি লাভ করে যে, পদে পদে এই সম্বন্ধটার মধ্যে জাগ্রত থাকাই ভারতীয় সত্যতার প্রধান লক্ষণ। তাই ভারতীয় কাব্যে নাটকাদিতে বর্ণনায় কিংবা কথাবার্তায় ভদ্র ব্যক্তিমাত্রেরই প্রতিপদে এই নিসর্গ নামক তৃতীয় ব্যক্তিতাকে যেন সর্বত্র উপস্থিত জানিয়াই চলিতে থাকেন। এই দেশের race-culture বা জাতিগত সংশিক্ষা কিংবা ভদ্রতা আদর্শের এই বিশেষ লক্ষণটুকু মনে রাখিতে না জানিলে, পাঠকমাত্রকেই কিছু না কিছু বিভ্রমনা ভোগ করিতে হয়। পদে পদে অবাস্তর বর্ণনা বা বিষয়সঙ্কেতে কাব্যের শিল্পগতি নিরন্তর ব্যাহত হইতেছে বলিয়াই মনে হইতে থাকে। ভারতীয় নিসর্গ-

প্রকৃতির এই শাস্ত্র-নৌম্য নিস্কৃত্য হৃদয়চারিত্রে সঞ্জন করাটাই নানা দিকে ভারতীয় ধর্মের এবং জাতীয় সভ্যতার চরম আদর্শ হইয়াছিল। নিসর্গের সহিত নির্ধ্বংস দাক্ষিণ্য আচরণ করিয়া, যথাসাধ্য নিসর্গ-সঙ্গত জীবন যাপন করাটাই ভারতীয় ব্রহ্মচর্যের আদর্শ! জীবনে কস্মে ভূমা এবং শাস্ত্রের শাস্ত্র এবং নিস্কৃত্যের অনুভবে সচেতন থাকিয়া সমগ্র জীবনটাকে সর্বশেষে বিশ্বস্তির অনাদ অনন্ত চরম নিস্কৃত্যের মধ্যে হারাইয়া ফেলাই ভারতীয় তপোবনের, বেদান্তের বা বৌদ্ধ নির্বাণের প্রধান লক্ষ্য! বেদাচারসঙ্গত ধর্মকর্ম মাজেরই চরম কথা “শান্তি! শান্তি! শান্তি!” এই অনন্ত অর্থময় শান্তির আদর্শ শিক্ষা দিয়াছিল তপোবন! বহিঃপ্রকৃতির মুনি-মনোরমা শান্তিই ভারতীয় আদ্যহৃদয়কে অন্তর্লোকের শাস্ত্র-পন্থা দেখাইয়া গিয়াছে! সুতরাং ভারতীয় হৃদয় নগরজনতার কলকল্লোরের মধ্যে; অবস্থান কারণেও, ত্রিসন্ধ্যা উহাকে প্রণব পথে অতিক্রম করিয়া, সমস্তের অন্তরতা এই নবিড় শান্তি-নিস্কৃত্যের সাধনাতুইই সার করিয়া আসিয়াছে! এখন, সারস্বত লোকে এই নিসর্গ দীক্ষা এবং শান্তির মাহাত্ম্য এবং উহার কার্য্যকরী শক্তি অপরিমাম! এই নিস্কৃত্যের গন্ত হইতেই, কবিহৃদয়ের শান্তিনিষ্ঠ ভাব-তন্ময়তা হইতেই, চিরকাল মহাকাব্য এবং মহাকাব্যের জন্ম হইয়া থাকে! জগতের সকল দেশের কাব্যগণ এবং বাণীপন্থীগণই এই তত্ত্বের সাক্ষ্য দান করিবেন।

অতীত দিকে, ভারতীয় নিসর্গ-প্রেমের একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহার মধ্যে আপাততঃ কোনরূপ ‘দার্শনিকতার’ নামগন্ধও নাই। সকল ‘পরমাখ’ আদর্শের ত্রায়, এই নিসর্গ প্রেম গভীর; অথচ উহা আধুনিক ইয়োরোপীয় নিসর্গ-কবিতার ত্রায় আত্ম-জাগ্রত হইয়া অহং-মুখ হইয়া ক্ষুণ্ণ লাভ করে নাই। এই সবল অথচ হিরান্য মহাযোগই সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বপ্রকাশ লাভ করিতে চাহিয়াছে। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড, মহাভারতের বনপর্ব, কালিদাসের

শকুন্তলা, মেঘদূত, বিক্রমোর্কশী বা কুমারসম্ভবে, ভবভূতির উত্তরচারত বা মালতীমাধবে, ন্যূনাধিক সর্বত্র সকল কাব্যে নাটকে এই পরম যোগনিষ্ঠ নিসর্গসহানুভূতিই অতর্কিতে হৃদয় অধিকার করিয়া উহাকে চিরকালের জন্য কিনিয়া ফেলে। বেদের সবল সরল নিসর্গ-পূজা এবং তপস্বিগণের “তপোবন” জীবন হইতেই উপনিষদ্ এবং রামায়ণ মহাভারতের তপোনিষ্ঠ হৃদয় দীক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছিল। উহাদের নিসর্গ-নিমগ্ন চিত্ত হইতে, যেন গুরুপরম্পরায় দীক্ষা সিদ্ধি করিয়াই, শূদ্রক বিখুশ্মা কালিদাস প্রভৃতির কাব্যাদি, পরবর্তী সংস্কৃতের কটমট কাব্যাদির মধ্যে পর্য্যন্ত, সর্বত্র এই মহান আদর্শই জাগরক থাকিয়া সংস্কৃত সাহিত্যকে অতুল মাহাত্ম্য দান করিয়াছে! মানব-হৃদয় প্রকৃতি ও অব্যক্ত! সংস্কৃত সাহিত্যে পরম অজুতাবে এই ত্রিপথগা বিশিষ্টতায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নব যৌবনের স্থির রস-নিষ্ঠার গতিকেই সংস্কৃত সাহিত্য কোনরূপ সতর্ক দার্শনিক উদ্বেগে কণ্টকিত না হইয়া এবং কাব্য-শিল্পের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই চলিতে পারিয়াছিল। এই লক্ষণটাকে বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বপ্রধান মাহাত্ম্যটাই চাপা পড়িয়া যাইবে।

এই মনুষ্যনিষ্ঠা, সরলতা, স্বাধীনতা, নিসর্গ-প্রীতি এবং মনুষ্য-হৃদয়ের অনার্কিব রস-নিষ্ঠা সমস্তই একটি মাত্র ধর্মের—সাহিত্য-ধর্মের নামান্তর। উহাই আধুনিক সাহিত্যে আত্মার ইতিহাস হুত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের মুখ্যতা, গুরুতা এবং অতুলনীয়তা সপ্রমাণ করিবে। আমরা দেখিব, এই বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য হেলেনিক বা রোমক সাহিত্য তাহার নিকটবর্তী হইতেও পারে নাই। গ্রীকজাতির অতুলনীয় ভাস্কর্য-আদর্শ হইতে দীক্ষা লাভ করিয়া তাহার সাহিত্যে অল্পপম রস-সংঘমের সাহায্যে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং ওই দৃঢ়তার দরুণেই আধুনিক সাহিত্য-সেবীর চক্ষে পরম আদর্শ পদবী অধিকার করিয়া আছে। গ্রীকশিল্পের অতুলনীয় সংঘত ভাব ভারতীয় কাব্যের মধ্যে নানা কারণে পরিফুট হইতে পারে নাই; রামায়ণ মহাভারতের সরল সবল তারঙ্গর কিংবা মাহাত্ম্য-সাধনাও বিকশিত হইতে

পারে নাই ; পুরাণের অপরিষ্কার দার্শনিকতা কিংবা ধর্ম-ভাবুকতাও বিলাসী হইতে পারে নাই। ভিতরে দৃষ্টি করিলেই বুঝিব, পূর্বোক্ত বৈরাগ্য-বিদ্রোহ, দৈব-দ্রোহ এবং মনুষ্য-আদর্শের দরুণেই পারে নাই। ভারতীয় সাহিত্য-মতি তাহার সর্ববিস্মারক এবং সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের বিরুদ্ধে নানা দিকে প্রতিকূলত! আচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আত্মরক্ষা করিতে গিয়াই মনুষ্য অতর্কিতে এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতেই দেখা যাইবে যে, তখনও এই জাতির মধ্যে পার্থিবতা এবং প্রাণ ছিল। তখনও এই জাতির সমাজ-পরিবেশের মধ্যে মনুষ্যকে একেবারে অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয় নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের এই আদর্শ সম্পূর্ণ আধুনিক। ইয়োরোপীয় সাহিত্য এবং ইয়োরোপীয় মনুষ্য-সভ্যতার নবজীবনযুগে বহু পরবর্তী কালে এই বিদ্রোহ এবং উদ্ধাম রস-প্রবণতাই কার্যকর হইয়া আধুনিক ‘রোমান্টিক’ আদর্শের খ্যাপন করিয়া গিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, পুরাণের রস-প্রবণতা এবং জগতের কারণ বিষয়ে একটা “সত্যশিব সুন্দর” বুদ্ধি, অধিকন্তু ভাগবতী প্রীতি-ভক্তির আদর্শ হইতেই, ভারতীয় সাহিত্য এই আধুনিক মনুষ্য-আদর্শটাকে স্বতঃসিদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পৌরাণিক আদর্শটাও স্বয়ং আধ্যাত্মবিভেদে সঞ্জলন, বুদ্ধিবিদ্রোহ এবং বুদ্ধদেবের আদর্শটাকে ব্যাপকভাবে কুঙ্কিত করিবার চেষ্টা বই নহে। বর্তমানের তীরবাসী আমরা, এই সমস্তের মধ্য হইতে অতীতের মনুষ্য-হৃদয়োথিত বিপুল সমৃদ্ধ-কল্লোল এবং উহার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসটুকুই অমুভব করিতেছি ; এবং অনাগতের মহিমাই উপলব্ধি করিতেছি।

শ্রীশশীকমোহন সেন।

শেফালিকা

(১)

ক্ষুদ্র শেফালী আমি !

শারদ নিশার স্নকুমার বুকে

কি জানি কে মোরে ফুটাল কোতুকে,

মোর হাসি-ধোলা,

জীবনের মেলা,

কেবলি একটি আমি !

ক্ষুদ্র শেফালী আমি !

(২)

নাহি মোর অবসর !

আকাশ, বাতাস, চাঁদমা, তারায়

কেন বা আকুলি ডাকিছে আমায়,

মোর ভালবাসা,

কে করিছে আশা,

কাঁদবে ক্ষণেক পর !

নাহি মোর অবসর !

(৩)

এখনি পড়িব ঝরে !

ধরা-রাণী ওই পেতেছে আঁচল,

বন-মাতা বুঝি ফেলে আঁধি-জল,

পলকের মোর

পুলক-লহর

ঘুচে যাবে চির তরে !

এখনি পড়িব ঝরে !

(৪)

তুমি এস এক বার !

ওগো অজানিত, ওগো প্রিয়তম,

তব লাগি নিশি-অভিসার মম,

নীয়ে চরণ

করিব ধারণ

হৃদি মাঝে প্রাণাধার !

তুমি এস একবার !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

যথাইয়া

“Superstition is a misdirection of religious feeling.”——Whitely.

আজ পাঠকগণকে একটি তীর্থ স্থানের পরিচয় দিব। তাহার নাম, যথাইয়া। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, আগ্রা হইতে কিছু দূরে ও মাইনপুরী জেলার সীমান্ত ভাগে এই তীর্থক্ষেত্রে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। ‘যথাইয়া’ শব্দটি উক্ত প্রদেশের গ্রাম্য ভাষায় সংস্কৃত ‘যজ্ঞ’ শব্দের অপভ্রংশ। এই যথাইয়া তীর্থের উৎপত্তির বিবরণ বড়ই রহস্যজনক।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে—এক দিন অন্ধকার রাত্রে এক জন গৃহস্থের বাটিতে তিন জন লোক আসিয়া আতিথ্য স্বীকার করে—এক জন জাতিতে ব্রাহ্মণ, অপর ব্যক্তি গোয়ালী, ও তৃতীয় ব্যক্তি জাতিতে হাড়ি। সেই রাত্রেই উক্ত গৃহস্থের বাটিতে কে আসিয়া তিন জনকেই হত্যা করে। তাহাদের সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু, এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আর কোনই বিবরণ জানা যায় না; হত্যাকারী কে তাহাও এ পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারে নাই। সে যাহা হউক, সাধারণ লোকের বিশ্বাস ঐ তিন জন হত ব্যক্তি ভূতযোনি গ্রহণ করিয়া তিন প্রকার ভূতে পরিণত হয়, ও ছ’এক দিন পরে যে গৃহস্থের বাটিতে তাহারা হত হইয়াছিল তাহার নিকটে আসিয়া এইরূপ প্রকাশ করে যে, “আমরা এখন তিন জনেই ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি, আর আমরা সম্মুখবর্তী প্রান্তরে অবস্থান করিতেছি। তুমি আমাদের তিন জনের জন্ত তিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত কর, তাহা না হইলে তুমি শীঘ্রই সৎপথে নিহত হইবে। আর, এই তিনটি মন্দির স্থাপিত করিয়া দেশ বিদেশে সকল লোককে বিজ্ঞাপিত কর যে, যাহারা মাঘ মাসে প্রতি রবিবার আমাদের পূজা দিবে তাহাদের পুত্রকন্যা চিরদিন সুস্থ ও নীরোগ থাকিবে। যদি কেহ কখনও কোন দুরারোগ্য

রোগে আক্রান্ত হয় তবে পূজান্তে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করিবে। বক্ষ্য।নারী পূজার পর অচিরে পুত্রবতী হইবে।” তিন জনের পূজা প্রকরণ কিরূপ হইবে তাহাও তাহারা বলিয়া দিল। ব্রাহ্মণ ভূত বলিল—“আমার পূজার উপকরণ তুলা ও নারিকেল;” গোয়ালী ভূত কহিল—“আমাকে দুগ্ধ ও মগ্ধ দ্বারা পূজা করিতে হইবে;” হাড়ি ভূত বলিল—“আমার সম্মুখে শূকর বলিদান দিতে হইবে।” এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাসাধ্য নগদ কিছু দেওয়ারও অবশ্য আদেশ হইয়াছিল! ভূতগণের আদেশ মত গৃহস্থ তিনটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিল ও যক্ষ তিন জনের আদেশ শীঘ্রই বিদেশে প্রচারিত হইল। সেই দিন হইতে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে চারিটি রবিবারে পূজা দিবার জন্ত কাণপুর, লক্ষৌ, ফরকাবাদ প্রভৃতি জেলা হইতে অসংখ্য লোক সমন্বিত হয়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই জীলোক। পুত্র কিংবা কন্যা জন্মবার পর অসংখ্য যুবতী রমণী আপন আত্মীয়গণ পরিবৃত হইয়া, সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই “যথাইয়া” মহাতীর্থে সমাগত হয়; এবং সকলেই তুলা, নারিকেল ও দুগ্ধ এবং মগ্ধ উৎসর্গ করিয়া ও শূকর বলিদান দিয়া ভূতত্রয়কে পূজা করে। এই অসংখ্য লোকের জন্ত অসংখ্য শূকরের প্রয়োজন। কিন্তু, পাণ্ডারা কয়েকটি মাত্র ছিন্নমুণ্ড শূকর পূজা স্থলে লইয়া আসে, ও এক একটি শূকর সহস্র সহস্র লোকের পূজা সমাপন করে। এই প্রকারে পাণ্ডারা প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে।

তীর্থটি যেমন অপরূপ, তীর্থযাত্রার সময়টিও তেমনই বিচিত্র। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে—বিশেষতঃ আগ্রার নিকটস্থ প্রদেশ-সমূহে মাঘ মাসে ভয়ঙ্কর শীতের প্রাদুর্ভাব হয়। তন্মিত্ত ঐ সময়ে প্রায়ই মূলধারে বৃষ্টি পড়ে; কিন্তু মাসুষের ধর্ম্য সম্বন্ধীয় সংস্কার—বিশেষতঃ যে সংস্কার পালন করিলে সন্তানের মঙ্গল হয়—ইহা এতদূরই বদ্ধমূল যে, সেই দারুণ শীতও কাহাকেও সেই ধর্ম্যপালনে বিরত করিতে পারে না। আমরা অনেকবার শুনিয়াছি—এই দুঃসহ শীতে, ভূষারপাতের ন্যায় বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে,

ঘোর অন্ধকার রাত্রি সিন্ধু বসনে কাঁপিতে কাঁপিতে, ক্ষুদ্র শিশু কোলে লইয়া, অসংখ্য নর-নারী পদব্রজে অথবা গো-বানে আগমন করে। এই বৃষ্টি ও শীতে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। উহাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীর লোকের সংখ্যাও বিস্তর। যখন এই সকল লোক সেই অনারুত, অশ্রয়শূন্য প্রান্তরে উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় তাহা পাঠক সহজেই কল্পনা করিতে পারেন।

এ পর্য্যন্ত কোন যাত্রীর পুত্র-কন্যা এই পূজা দিয়া ভূতজয়ের মাহাত্ম্যে কোন সংঘাতিক রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে কি না, অথবা কোন বন্ধা নারী সন্তান লাভ করিয়াছে কি না, আমরা তাহার সংবাদ পাই নাই। কিন্তু, এই ‘যথাইয়া’ তীর্থে এখন পর্য্যন্ত এই বিংশ শতাব্দীতেও অগণ্য লোকের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি এই তীর্থে থাকিবার কোন স্থান নাই, এবং নিকটবর্তী গ্রাম-সমূহেও ইহার কাহারও বাটিতে বাসস্থান পায় না। অতএব, এক রাত্রি মাত্র ঐ প্রান্তর মধ্যে অবস্থান করিয়া প্রাতে পূজা দিয়াই যাত্রিগণকে ফিরিয়া আসিতে হয়। এই এক রাত্রির মধ্যে তাহাদিগকে যে কত প্রকার বিপদে পড়িতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, হস্ত যাত্রীদিগের পুত্র কন্যা চুরি গিয়াছে, কিংবা কাহারও শিশু পুত্রের স্থানে কন্যা রাখিয়া, কে পুত্রটিকে লইয়া গিয়াছে; অথবা কন্যার স্থানে পুত্র রাখিয়া কন্যাটিকে লইয়া গিয়াছে; কেহ বা সস্ত্রীক পূজা দিতে আসিয়া-ছিলেন, প্রভাতে, উঠিয়া দেখেন যে, স্ত্রীর কোনই সন্ধান নাই। হয়ত অনেক অল্পসন্ধানের পর, অনেক দিন পরে দূর দেশে গিয়া কাহারও বাটিতে স্বীয় স্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন। স্ত্রীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্ত প্রার্থনা করায় গৃহস্থানী অতি ক্রুদ্ধ ভাবে বংশদণ্ড লইয়া তাড়না করিলেন, কিম্বা স্ত্রী স্বয়ং ফিরিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন। এইরূপ ঘটনা সম্বন্ধে ফৌজদারি আদালতে প্রতি বৎসরই মোকদ্দমার কথা শুনা যায়।

এই তীর্থস্থান যে কেবল হিন্দুদের তীর্থ তাহা

নহে,—অনেক নীচ বংশীয় মুসলমানও সেখানে পূজা দিতে যায়। অবশ্য তাহারা শূকরের পরিবর্তে শুপারী অথবা হিন্দু আচার অনুসারে অল্প কোন সামগ্রী দিয়া পূজা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য এই সময়ে তাহাদিগকেও এই সকল বিভ্রমণা সহ করিতে হয়। এই উপলক্ষে কখনও কখনও ‘মুটা’ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই অদ্ভুত মহা অনিষ্টকর তীর্থযাত্রা রহিত করিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট এ পর্য্যন্ত কোন উপায় অবধারণ করিয়াছেন এমন বোধ হয় না। তবে গবর্ণমেন্টের কৈফিয়ৎ, ধর্ম-সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা তাহাদের বিধি-বিরুদ্ধ এই মন্দিরের চতুর্পার্শ্বে বহুসংখ্যক পুলিশ কর্মচারীও কন্সটেবল উপস্থিত হয়। তাহাতে না কি যাত্রিগণের এই বিবিধ বিপদের উপর আবার একটি নূতন উপদ্রব সহ করিতে হয়।

যে গৃহস্থ তিনটি মন্দির স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাত্রিগণের উপহার সামগ্রী তাহারই প্রাপ্য। কিন্তু, এখন সে সকলের অনেক অংশীদার জুটিয়াছে। প্রত্যেক রবিবারের পূজা শেষ হইলে পুলিশের সম্মুখে অংশীদারগণ ভাগ করিয়া লন। তন্মধ্যে পুলিশকে কিছু অংশ দিতে হয় কি না তাহা আমরা জানি না। কিন্তু, এই পূজা হইতে যাহা আদায় হয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক তাহার উপরে রাজস্ব নির্ধারিত হইয়াছে। অংশীদারগণকে পুলিশের নিকট হিসাব দিয়া, নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে সরকারকে রাজস্ব দিতে হয়। এই তীর্থ উপলক্ষে কোন কোন বৎসর অনুন পোনেরো হাজার টাকা আয়দানী হয়।

যাত্রিগণকে তীর্থস্থানে যাইবার সময় কয়েকটি নিয়মের বশবর্তী হইয়া চলিতে হয়। যথা—তাহারা গৃহ হইতে যাত্রা করিবার পর পথে যেখানে দাঁড়াইবে কিংবা তাহাদের শকট থামিবে, সেইখানেই প্রত্যেক যাত্রীকে টাকা, পরস,---অন্ততঃ একটি কড়ি ফেলিয়া দিতে হইবে। পাঁচ মধ্যে যদি কেহ তাহাদের সঙ্গে কলহ করিতে আসে কিম্বা ঠাট্টা-বিক্রপ করে, এমন কি

প্রহার করে বা তাহাদের মধ্যে কোন দ্বীলোকের গাত্র-স্পর্শ করিয়া অপমানিত করে, তবুও তাহারা কোন কথা বলিতে পারিবে না। তাহা হইলে নাটক পূজা বার্ষিক হইয়া যায়! এই বিচিত্র প্রথা সুর্যোগ প্রাপ্ত হইয়া অনেক ছুশ্চরিত্র লোক দ্বীলোকদিগের উপর বহুবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে; কিন্তু, তাহারা সে অত্যাচার বিনা বাক্যব্যয়ে সহ করিয়া, মহাতীর্থে মহা-ফল-প্রাপ্তির আশায় সকল কষ্ট ও সকল অপমান সানন্দে উপেক্ষা করিয়া থাকে। আরও কত কাল এই অপূর্ণ তীর্থে প্রচলিত থাকিবে, বলিতে পারি না।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

প্রসূতি ও সূতিকাগৃহ

গর্ভের প্রথম ৩ মাস ও শেষ ৩ মাসে যত সহজে গর্ভ-পাত হইবার সম্ভাবনা এমন মধ্যকার ৩৪ মাসে নয়। এই কারণে গর্ভিণীকে স্থানান্তরিত করিতে হইলে ৪ মাস হইতে ৭ মাসের মধ্যে তাহা করা উচিত। ইহার পূর্বে বা পরে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলে গাড়ী বা পাক্কীর বুকুনিতে বিশেষ অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবনা।

ভাবী সম্ভানের জন্য প্রস্তুত হওয়া—প্রসবের সময় এবং প্রসবের পর, প্রসূতি ও সম্ভানের জন্ত যাহা যাহা আবশ্যক হইতে পারে, সে সমস্তই সম্ভানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার অন্ততঃ এক মাস পূর্বে হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। গর্ভিণী ইচ্ছা করিলে, শিশুর জামাজোড়া বিছানাপত্র প্রভৃতি স্বহস্তেই প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহাতে কিছু অর্থও বাঁচে, আর গর্ভিণীর সময় কাটাইবার একটি সুন্দর অবলম্বনও হয়। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান; এখানে খুব বেশী কাপড়চোপরের আবশ্যক হয় না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেশকাল-প্রভৃতির সম্যক বিচার না করিয়া অমেকেই শিশুর জন্ত

ইংরাজদিগের অশুকরণে পোষাকপরিচ্ছদাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা যে কেবল অনাবশ্যক বলিয়া নিন্দনীয় তাহা নহে; ইহার দ্বারা শিশুর স্বাস্থ্যেরও বিশেষ অনিষ্ট সাধন করা হয়। শীতকালের জন্ত পশমী কাপড়ের, আর গ্রীষ্মকালের জন্ত নয়ানঙকের ফ্রক প্রভৃতি প্রস্তুত করা আবশ্যক।

শিশুর কোমরে জড়াইবার জন্ত ৩৪ ডজন নেওটীও প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত। এগুলি দেখিতে রুমালের জায় হইবে। এ ছাড়া আরও সকল দ্রব্যাদির আবশ্যক হইতে পারে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।—

১। ৪ ইঞ্চি স্কোয়ার ২৪ খানি পুরাতন বস্ত্র-খণ্ড।

এগুলি অনেককণ ধরিয়া গরম জলে ফুটাইয়া পরে শুকাইয়া লইতে হয়। নাড়ী কাটা হইলে নাড়ীকে ঢাকিবার জন্ত এগুলির আবশ্যক হয়।

২। ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ ৩ ইঞ্চি প্রস্থ ‘এবসরবেণ্ট’ কটন নামক তুলার একটি পুরু গদি। নাড়ী খসিয়া পড়ার পর নাভিমূলে প্রয়োগ করিবার জন্ত ইহার আবশ্যক।

৩। কতকগুলি ছোট ছোট পরিষ্কার তাকড়ার টুকরা—এগুলি যেন বেশ নরম হয়। শিশুর মুখ পরিষ্কার করিবার জন্ত এগুলির আবশ্যক।

৪। এবসরবেণ্ট কটন নামক তুলার এক প্যাকেট

৫। স্ট্রিচ সূতা, কাঁচি প্রভৃতি।

৬। টার্কী স্পঞ্জ।

৭। এক খানি খুব ভাল সাবান। যে সকল সাবানে চর্কির ভাগ বেশী আছে, শিশুদের ব্যবহারের জন্ত সেই সকল সাবানই প্রশস্ত।

৮। ভিনোলিন টয়েলেট পাউডার।

৯। নাড়ী শুকাইবার পাউডার। এই পাউডার নিম্নবর্ণিত উপায়ে ঘরেই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারা যায়। বোরিক এসিড অর্ধ আউন্স, অক্সাইড অব জিঙ্ক অর্ধ আউন্স, ষ্টার্চ অর্ধ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। এই ৩ টি ঔষধ কোন ডাক্তারখানা হইতে আনাইতে হয়।

অগ্রহায়ণ ১৩১৩

১০। ড্রিঙ্ক্ অয়েন্টমেন্ট্ একটু বোরিক লোসন্ এবং স্লিসিরিন্ অব্ বোরাক্স্ এক আউন্স। এ তিনটি ঔষধ ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

১১। কতকগুলি সেফ্টা পীন ও শিশুর চুল আঁচ-ড়াইবার জন্ত একখানি খুব নরম বুরুষ।

১২। শিশুকে ধরিবার জন্ত এক খানি পিঁড়ি বা কাঠ ফলক।

শিশুর কাপড়চোপড় এবং অস্ত্রাস্ত্র দ্রব্যাদি একটি পৃথক বাক্সে রাখিয়া দিলে, কার্য্যকালে বিশেষ সুবিধা হয়। এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হয় না। শিশুর স্নানের জন্ত একটি গাম্বা পূর্ন হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক। শিশুর শোবার জন্ত একখানি ছোট খাটের আবশ্যক। এখানিও পূর্ন হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। খাটখানি যেন আড়াই ফুটের বেশী উচ্চ না হয়; ইহার চারিদিকে রেলিং দেওয়া আবশ্যক। শিশুর জন্ত দোলনার কোন আবশ্যক নাই। খাটের উপযুক্ত মশারি ও একখানি ম্যাকিংটস বা 'অইল ক্রথ' কিনিয়া রাখিতে হয়। একটা ছোট তোষক, কয়েকখানি কাঁধা, মাথার বালিস এবং লেপ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্যক। শিশুর বিছানার জন্ত চাদরের কোন আবশ্যক নাই। অনেক শিশু তুলার বালিস মাথায় দিতে পারে না, দিলে তাহাদের মাথা অনবরত ঘামিতে দেখা যায়। এরূপ স্থলে তুলার বদলে ঘোড়ার বালান্টির বালিসের ব্যবস্থা করিতে হয়।

শিশুর কবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভব— সাধারণতঃ শিশু ২৭৫ দিন গর্ভে থাকিয়া পরে ভূমিষ্ঠ হয়। ২৭৫ দিনে ৪০ সপ্তাহ বা ১০ চান্দ্র মাস হয়। নবম মাস পড়িতে না পড়িতে স্মৃতিকাবর প্রস্তুত করা আবশ্যক, এবং স্মৃতিকাবরে যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক হইতে পারে, সে সমস্তও সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়।

অনেক সময় গর্ভিণী ও তাহার আত্মীয়গণ যে সময় সম্ভব ভূমিষ্ঠ হইবে মনে করিয়া থাকেন, তাহার এক মাস পূর্বে কিম্বা পরে শিশুকে জন্মগ্রহণ করিতে দেখা যায়।

গর্ভকাল গণনায় ভ্রমবশতঃই ঐরূপ গোলযোগ ঘটয়া থাকে। শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার সম্ভাব্য দিন নির্ণয় করিবার একটি সঙ্কেত আছে। সে সঙ্কেতটি জানা থাকিলে পূর্নোক্ত গোলযোগের খুব অল্পই সম্ভাবনা। আমরা আবশ্যক বোধে উক্ত সঙ্কেতটি এইস্থানে উল্লেখ করিলাম।

রমণী যে দিন ঋতু স্নান করিয়া থাকেন, সেই দিন হইতে ৩ দিন গণিয়া গিয়া যে তারিখটি পাওয়া যায়, সেই তারিখ হইতে গর্ভের আরম্ভ দিন ধরিয়া ২৭৫ দিন গণিয়া গেলে যে তারিখ হয়, সেই দিন অথবা তাহার ২।৪ দিন অগ্রে কিংবা পশ্চাতে কোন এক সময়ে সম্ভাব্য ভূমিষ্ঠ হইবার খুবই সম্ভাবনা।

স্মৃতিকাগারে শিশুর মৃত্যু—বেহ যদি একটা সম্পত্তি হাতে পায়, তখন তাহার এই চিন্তা হয়, সম্পত্তিটি রক্ষা হয় কিম্বা, এবং ইহার সম্যক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিই বা কি করিয়া হয়। বাপ-মার নিকট সম্ভব অপেক্ষা বহুমূল্য সম্পত্তি আর কিছু থাকিতে পারে না। সম্ভাব্য জীবনরক্ষা এবং তাহার শরীর ও মনের পূর্ণতা সাধন করিবার জন্ত তাহারা যে দিনরাত চেষ্টিত ও চিন্তিত থাকিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে। শিশুটির লালন-পালনে এবং শিক্ষা-বিষয়ে যদি কোন ভ্রম বা ত্রুটি না ঘটে, তবেই ত পিতা-মাতার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে প্রায় সকলেই কি করিয়া ছেলে মানুষ করিতে হয় তাহা মোটেই জানেন না। এ বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার যে কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

কলিকাতা সমস্ত বাঙ্গলা দেশের শীর্ষস্থান বলিলেই হয়। এখানে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোক যতটা বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন বাঙ্গলা দেশের অত্র আশা করা যাইতে পারে না। তথাপি কলিকাতায় যতগুলি করিয়া শিশুর মৃত্যু হয়, তাহার কোন একটি বৎসরের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, এত দিনের শিক্ষা এবং জ্ঞানচর্চা কলিকাতার অধিবাসীদিগের মজাগত কুসংস্কার এবং

অজ্ঞানতার কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। আমরা এস্থলে কলিকাতায় এক বৎসরে শিশুর মৃত্যু-তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|------|-------|-----|--------|
| ইংরাজ শিশু | ... | ... | ১০০০ | মধ্যে | ৫৮ | মৃত্যু |
| ফিরিঙ্গি | .. | ... | " | " | ৩.৬ | " |
| হিন্দু | .. | ... | " | " | ৩১৫ | " |
| মুসলমান | .. | ... | " | " | ৩১৩ | " |

উক্ত তালিকা দৃষ্টে, শিশুপালন বিষয়ে আমরা যে কতটা অজ্ঞ, আমাদের দায়িত্ববোধ যে কত অল্প, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সূতিকা-ঘরের দোষে অনেক শিশু সূতিকাগারেই বিনষ্ট হয়। বিচক্ষণ চিকিৎসক ডাক্তার মেক্ লিয়ড (Dr. Mc.Leod) বলেন, এই কলিকাতা নগরে যে সকল শিশু মৃত্যুগুণে পতিত হয়, তাহাদের শতকরা ৪৩ টির মৃত্যুর কারণ ধমুঠকার ভিন্ন আর কিছু নহে। সূতিকাগারটি যথোচিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হওয়া, এবং উহার মধ্যে অবাধে বায়ু-চলাচল ও আলোক-প্রবেশের ব্যবস্থা না থাকা, এবং শিশুর নাড়ীটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখাই যে এই রোগের এত বেশী প্রতিপত্তির কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সাধারণ লোকে শিশুর এই ধমুঠকার রোগকে শিশুকে “পেঁচোয় পাওয়া” বলিয়া থাকে। এই রোগ অতিশয় প্রাণঘাতক, ইহার আক্রমণে একটি শিশুরও বাঁচিবার আশা থাকে না। এই সাংঘাতিক রোগের নিবারণের একমাত্র উপায়, সাধারণের মন হইতে কুসংস্কা দূর করা আর সূতিকাগারের সংস্কার করা। ইডেন হাসপাতালে প্রতি বৎসর অনেকগুলি করিয়া শিশুর জন্ম হয়, কই তাহাদের নিকট ত পেঁচো অগ্রসর হইতে পারে না; পেঁচোর যত কিছু বিক্রম-পরাক্রম আমাদেরই নিকট। খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার সাণ্ডার্সও (Dr. Sanders) যেক্ লিয়ডের কথা অমুমোদন করেন। তিনি বলেন, ইডেন হাসপাতালে একটি শিশুরও যে ধমুঠকার রোগ হইতে দেখা যায় না, তাহার কারণ সেখানে দিন রাত বায়ু অবাধে চলাচল করিতে পারে। শিশুকে যেখানে

রাখা হয়, সে স্থানটি সন্নিগ ও আলোক-বিরল নহে। আমাদের ঘরগুলির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, চিকিৎসা উদ্দেশ্যে ধনী নির্ধন প্রায় সকলপ্রকার ব্যক্তির বাটীতেই তাঁহাকে বাইতে হইয়াছে: এ সব বাটীতে তিনি যে সূতিকা-ঘর দেখিয়াছেন, তাহা বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানকার বায়ু এত দূষিত যে, তাহা নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণের উপযোগী বলি যায় না। অপ্রশস্ত সন্নিগ ঘরটিতে আবার একটি করিয়া রাবণের চিতা জ্বালাইয়া রাখা হয়। ইহার উপরে ঘরটির ছাদ ঘরানাপাগুলি ২৪ ঘণ্টা ধরিয়াই বন্ধ। প্রসূতি ও শিশুকে অন্ততঃ ১১ দিন ঐ ঘরেই থাকিতে হয়।

ডাক্তার সণ্ডার্স আরও বলেন যে, এদেশীয়দিগের সূতিকা ঘরে তিনি যত বারই গিয়াছেন, তত বারই তাঁহার নিশ্বাস অবরোধ হইবার মত হইয়াছিল। এই ত গেল কলিকাতার ধনকুবেরদিগের সূতিকা-ঘরের কিঞ্চিৎ মাত্র পরিচয় প্রদান।

পল্লিগ্রামের সূতিকাগারের ব্যবস্থা আরও যে কত লোমহর্ষণ তাহা বলিয়া উঠা যায় না। এখানে প্রায় বাড়ীতেই গৃহের প্রাঙ্গণে ঠিক নর্দমার নিকটে অস্থায়ী রকমের একটি কুটার প্রস্তুত করান হয়। এই কুটারের না আছে ছাদ, না আছে জানালা। প্রবেশ-নির্গমের জন্য একটিমাত্র দরজা থাকে বটে; কিন্তু তাহাও আবার দিনরাত বন্ধ রাখার ব্যবস্থা। এই কুটারের উচ্চতা এত অল্প যে, হামাগুড়ি দিয়া না গেলে, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। এই ঘরটিতে একটিমাত্র প্রাণীরই স্থান হওয়া দুর্ঘট; ধাত্রী, শিশু ও প্রসূতি এই তিন জনকেই অন্ততঃ ১১ দিন ধরিয়া ইহার মধ্যে থাকিতেই হইবে। এ ঘরের সাজসজ্জা বিছানা-পত্র প্রভৃতির যেক্রপ ব্যবস্থা, তাহার উল্লেখ না করাই ভাল। লেখক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, মাদ মাসের নীতে বাড়ীর অন্যান্য সকলে দিব্য লেপ মুড়ি দিয়া আরামে নিজা বাইতেছেন; আর সূতিকাগারে প্রসূতি ও শিশু উভয়ে দারুণ নীতে থর থর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ

৭ গ্রহায়ণ ১৩১২

করিয়াছে। লেখকের বেণ মনে আছে তিনি যখন প্রথম ডাক্তারী ব্যঙ্গা আরম্ভ করেন, সেই সময় একটি নবজাত শিশুকে দেখিবার জন্য কোন একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাহাকে আহ্বান করা হয়। ওয় হইতেই শিশুটির আর ক্রন্দনের বিরাম ছিল না। সে সময় আশাট মাস, অতিশয় গরম। লেখক দেখিলেন, যে ঘরটিতে শিশুকে রাখা হইয়াছে, সে ঘরটির ছয়টি জানালাগুলি রীতিমত বন্ধ। ঘরের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে। শিশুটির গায়ের ঘামাছি নির্গত হইয়াছে, পিপাসায় তাহার তালু বিকটপ্রায়। শিশুটি যে গরমের জন্য কাঁদিতেছে, এই সহজ কথাটি বুঝাইবার জন্য সে দিন যে পরিমাণ বেগ পাঠিতে হইয়াছিল, লেখক আজও তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

স্মৃতিকা-ঘরের রীতিমত সংস্কার এবং প্রসূতির ও শিশুর আরামের দিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। আশ্চর্য্য এই যে, স্মৃত্ত ও চরক প্রভৃতি এদেশের অতি প্রাচীন চিকিৎসকগণ স্মৃতিকা-ঘরের এবং স্মৃতিকাবস্থায় প্রসূতি ও শিশুর প্রতি যে সকল বিধি নির্দেশ করিয়াছেন, সেগুলি কোন ক্রমেই বর্তমান কালে প্রচলিত বিধিব্যবস্থার মত ভীষণ লোমহর্ষণ বলিয়া মনে হয় না। আমরা চরক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

“নবম মাসের পূর্বেই স্মৃতিকা-গৃহ নির্মাণ করা যাবে। যে স্থানে স্মৃতিকা-গৃহ নির্মিত হইবে, সে স্থানে অস্থি-শর্করা খোলা খাপরা প্রভৃতি যেন না থাকিতে পায়; সে স্থানটা যেন প্রশস্ত রূপ-রস-গন্ধবিশিষ্ট হয়। আম্বর্ষেদ-বিদ্ব ব্রাহ্মণ যে যে কাষ্ঠ প্রশস্ত বলিয়াছেন, সেই সেই কাষ্ঠ দ্বারা যেন স্মৃতিকা-গৃহ নির্মিত হয়। পিঁড়ি ষাট প্রভৃতি গৃহের চতুঃপার্শ্বের আবরণ কপাট প্রভৃতি যেন সেই সেই কাষ্ঠ দ্বারা করান হয়। অতি বিবেচনা করিয়া অগ্নি, জল মলত্যাগের স্থান, স্নানের স্থান প্রভৃতির এমন ব্যবস্থা করিবে যেন তাহা ঋতুস্থকর হয়।” স্মৃত্তের মতে “স্মৃতিকা-গৃহ ৮ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত বিস্তৃত হওয়া আব-

শুক। ইহা পূর্বদ্বার অথবা দক্ষিণদ্বার হইবে। গৃহের সাজসজ্জা যথাবিহিত স্থানে সন্নিবেশিত করিবে; উহার ভিত্তি উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে।”

স্মৃত্ত ও চড়ক স্মৃতিকা-গৃহ সম্বন্ধে যে রূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই অপ্রীতিকর বা অস্বাস্থ্যকর বলা যাইতে পারে না। স্মৃতিকা-ঘরের দূরবস্থা কবে কেমন করিয়া ঘটিল, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বর্তমান বিষয় সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে সকলেই আতুর ঘর এবং আতুর ঘর সংশ্লিষ্ট তাবৎ পদার্থকে নিতান্ত অস্পৃশ্য ও হেয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সাধারণের বিশ্বাস আতুর ঘর স্পর্শ করিলে অশুচি ও ধর্ম-বিরুদ্ধ আচরণ হয়। আতুর ঘরকে এরূপ চক্ষে দেখার একটা কারণও যে নাই তাহা নহে। আধুনিক চিকিৎসকগণের মতে, যে স্মৃতিকা-ঘর একবার ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকে পুনঃ সংস্কৃত ও পরিষ্কৃত না করিয়া ব্যবহার করিতে দিতে নাই। তাহাতে দ্বিতীয়া প্রসূতির বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এক-প্রকার জ্বর হইয়া মৃত্যু ঘটাইতেও অসম্ভব নয়। স্মৃতিকা-ঘর সম্বন্ধে যে নিয়ম, প্রসূতির শয্যাবস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। আমাদের দেশের সে কালের চিন্তাশীল তত্ত্বজ্ঞ লোকচিত্তাকাজ্ঞী ব্রাহ্মণ ব্যবস্থাপকগণও এ সকল না জানিতেন তাহা নহে। জানিতেন বলিয়াই স্মৃতিকা-ঘর ও তাহার সংশ্লিষ্ট দ্রব্যসমূহকে নিতান্তই অস্পৃশ্য, ধর্ম-হানিকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার ফল এই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, লোকে স্মৃতিকা-ঘর এবং নব প্রসূতির বিছানা প্রভৃতির এরূপ ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যাহাতে সেগুলির কার্য শেষ হইয়া গেলে ফেলিয়া দিতে বা নষ্ট করিতে কোনই কষ্ট হয় না। সেই কারণেই বোধ করি আমাদের দেশের আতুর ঘরের আজ কাল এইরূপ শোচনীয় দশা হইয়াছে।

কোন একটি বিধির প্রকৃত উদ্দেশ্যটি গোপন রাখিয়া অথ একটি কৃত্রিম উদ্দেশ্য খাড়া করিয়া জনসাধারণকে তাহা পালন করিতে বাধ্য করিলে, কালক্রমে সেই

বিধির প্রকৃত উদ্দেশ্যটি একেবারেই ব্যর্থ হইতে দেখা যায়। সকলেই জানেন, নব প্রস্থতির পক্ষে অন্ততঃ একমাস কোন কার্য্য করিতে নাই। এ সময় তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্রামের একান্ত আবশ্যক। নব্য চিকিৎসকগণ ইহা জানেন প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণও যে তাহা না জানিতেন, এমন নহে; কিন্তু নব্য চিকিৎসক ইহার প্রকৃত কারণটি বুঝাইতে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, প্রাচীনেরা তাহা করেন নাই। তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্যটি গোপন করিয়া সাধারণের হৃদয়ে এইরূপ ভাব মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যত দিন ষষ্ঠী দেবীর পূজা না হয়, তত দিন প্রস্থতি একান্ত অস্পৃশ্য, তাঁহাকে স্পর্শ করিলেও যেন পাপাচরণ করা হয়। ইহার ফলে, বিশ্রামের আবশ্যকতা তলায় পড়িয়া ষষ্ঠী পূজারই প্রাধান্য হইল।

এইরূপে আমাদের আচারে ব্যবহারে ধর্ম্মে কর্ম্মে কতরূপ কুসংস্কারই যে স্থান লাভ করিয়াছে তাহা হু' এক কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সকল কুসংস্কার দেশ হইতে দূর করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে ইহা না করিলে জাতীয় উন্নতির আর আশা নাই। কিন্তু ইহা দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায়াক? শিক্ষা ব্যতিরেকে হৃদয়ের কুসংস্কার যাইতে পারে না। সাধারণে বাহাতে সুশিক্ষা পাইতে পারে, আমাদের কায়মনোবাক্যে তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য। প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণ যে সকল বিধিব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলিকে অশুদ্ধার চক্ষে দেখিলে হইবে না। তাঁহাদের বিধিব্যবস্থাগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণকে বুঝাইতে হইবে। যেগুলি কালের উপযোগী নহে তাহাদের পরিহার করিতে হইবে, এবং কেন ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার যুক্ত প্রদর্শন করিতে হইবে। এ সকল বিষয়ে আমাদের দেশের সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ, ইচ্ছা করিলে, অনেক কাজ করিতে পারেন। জাতীয় চরিত্র গঠন অনেক সময় তাহাদেরই হস্তে অর্পিত থাকিতে দেখা যায়। ইংরাজী শিক্ষিত চিকিৎসকগণেরও এ বিষয়ে কম দায়িত্ব নাই। চিকিৎসার জন্য তাহাদের ধনীদরিদ্র ইত্তরভদ্র সকল শ্রেণীর লোকদের

সংসর্গে আসিতে হয়; সুতরাং সাধারণের হৃদয় হইতে সর্ব্ব-বিধ কুসংস্কার দূর করার পক্ষে ইহাদের যত সুযোগ আছে, এমন আর কাহারও নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের ডাক্তারগণ এই প্রধান কর্তব্যটির বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন। ডাক্তার শব্দের প্রকৃত উদ্দেশ্য আচার্য্য। আচার্য্যের প্রধান কর্তব্য, সাধারণকে হিতকর আচার সমূহ শিক্ষা দেওয়া। কবে আমাদের দেশের ডাক্তারগণ তাঁহাদের নামের সার্থকতা করিতে চেষ্টিত হইবেন?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচি।

একটি ঘড়ির কাহিনী *

সে দিন নিলামের দিন। লোন আফিসে ভয়ানক ভিড়। ছুটিতে ছুটিতে আফিসে প্রবেশ করিয়া সিলসেড একজন কর্ম্মচারীকে বলিল, “মহাশয়, আমার ঘড়িটা ছাড়িয়ে নিতে এসেছি, এখন পাব কি?” কিছুদিন হইল সে তাহার একটি ঘড়ি লোন আফিসে বন্ধক দিয়াছিল—‘সুদে আসলে’ এখন তাহাকে ১-০ ফ্রাঙ্ক দিতে হইবে। তাহার উপার্জন হইতে কিছু কিছু জমাইয়া সে প্রয়োজনীয় টাকা কয়টিও সংগ্রহ করিয়া আজ সেটি উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল।

কর্ম্মচারি খাতাপত্র উন্টাইয়া চসমার নীচের দিকে তাকাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল—“না, বড় দেৱী করে এয়েছেন! শীঘ্র নিলামঘরে যান, পোপ হয় এখন তাহা বিক্রয় হয় নাই। যান, আর দেৱী করবেন না।”

“ধন্যবাদ, তাই দেখি!” বলিয়া সিলসেড ফিরিতে-ছিল, এমন সময় একজন অশীতি পর বৃদ্ধ একথানা ছিন্নপ্রায় রসিদের ভাঁজ খুলিতে খুলিতে সেই কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল, “আর আমার ঘড়িটা।”

* করাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে।

অগ্রহায়ণ ১৩১২

“আপনারও দেয়ী হয়ে গিয়েছে; দেখুন, নিলামঘরের গিয়ে কি হয়।”

“হা, অদৃষ্ট!” বলিয়া বৃদ্ধ কম্পিত পদে নিলাম-ঘরের দিকে ছুটিল।

নিলাম-ঘরে প্রবেশ করিয়া সিলসেড বৃদ্ধটিকে দেখিবার বেশ সুযোগ পাইল। বৃদ্ধের আকৃতি নিতান্ত বিষম, দুর্বল, মস্তকটি প্রায় কেশশূন্য, বয়সের ভারে যেন নত হয়ে পড়েছে, কিন্তু মুখখানা সর্বদাই হাস্তোজ্জ্বল তার সেই সেকালের পোষাকে—বাহারে লম্বা লেজ ওয়ালা নীলবস্ত্রের উঁচু কলারওয়ালা জামা, বগলস্ ওয়ালা জুতা ইত্যাদি—সে যেন সেকালের লোকের আদর্শ ছিল।

সম্মুখে অসংখ্য জনতা! প্রাচীরের উপর দিয়া নিলামকারীর টেবিলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিয়া উঠিল “আমার শৈশবের খেলার সাথী, যৌবনের বন্ধু, বাড়টিকে কি আবার পাব?—ঐ যে দেখা যাচ্ছে, ঐ টেবিলের উপর! যাক, তা’হলে এখনো বিক্রী হয়ে যায়নি, এখনো সময় আছে; ঠিক সময়েই এসেছি।”

বলিতে বলিতে আনন্দে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল, অবলম্বনের জন্ত সে নিকটেই একটা থাম ধরিয়া ফেলিল। তাহার আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল—কীণ অস্থিময় পা দু’খানি, ভীর্ণ বক্ষঃপঞ্জর, অবনত পৃষ্ঠদেশ বিরলকেশ মস্তকটি, কম্পিত কর দু’খানি, আগতপ্রায় আনন্দের কল্লনায় কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, রক্তহীন ওষ্ঠপ্রান্তে বিমল হাস্য জাগিয়া উঠিল। আনন্দে তাহার মুখে কণা সরিল না, কিন্তু তার জলভারাক্রান্ত উজ্জ্বল চক্ষু দুটি সিলসেডের হৃদয়টিকে করিয়া তুলিল।

সিলসেড যে কার্যো আসিয়াছিল তাহা ভুলিয়া গেল—বৃদ্ধের অমায়িক, সরল, হাস্তোজ্জ্বল মুখখানিতে তাহার হৃদয় প্রতিবিস্তৃত হইতে দেখিল; যদিও উভয়ের ভিতর কোনও বাক্যবিনিময় হয় নাই, তথাপি সিলসেডের মনে হইল, তাহার উভয়ে যেন কত কালের পরিচিত।

বৃদ্ধও একটু সামলাইয়া তাহার আরও কাছে

আসিয়া আর্কোচ্চারিত কণ্ঠে বলিল, “তোমাকে আমি আমার বাড়ির কাহিনীটা বলব—ঐ যে ডেন্নের উপর রয়েছে, ঐ বাড়িটি! আশা করি, আর কিছুকণ পড়েই ওটি আজ আবার আমার হাতে পাবে! কিন্তু তোমাকে তার কাহিনীটি আগাগোড়া না বলে আমি যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না—মনে হচ্ছে যেন তোমাকে বললেই, মিলনের পূর্বে বিরহের এই শেষ মুহূর্তটুকুর উদ্বেগের অনেক লাঘব হয়ে যাবে।”

হৃদয়ের একপা উচ্ছ্বাসের উপর আর কোনও কথা বলা চলে না। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া সিলসেড-বৃদ্ধের কাছে সরিয়া গেল;—বৃদ্ধ তখন আরম্ভ করিল—

“সেটা একটা বড় সোনার বাড়ি; ডালাখানার একদিকে রাজা সলোমনের বিচার-দৃশ্য, আর দিকে একটি সুন্দর মিনে করা ফনফুলের ছবি। সেকালের সব বাড়ির মত ইটিতেও ঘণ্টা বাজিত। আমার জন্মবার ঘণ্টাটিও নিশ্চয়ই এতে বেজেছিল, কারণ বাবা যখন সন্ধ্যা প্রান্ত আমাকে আমার মায়ের কোল থেকে নিয়ে আমার কপাল-দেশে প্রথম চুম্বন-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেন, তখন তাহার বুকের পকেটে এই বাড়িটাই ছিল।

“হায় হতভাগ্য পিতা, হায় হতভাগ্য বাড়ি! পিতা আমার জীবনের প্রথম সুন্দর, আর বাড়িটি প্রথম খেলনার সামগ্রী, আমার বালক কালের প্রথম আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

“বাবা বলিতেন, তুমি যখন বড় হইবে—যখন তোমার বয়স পনেরো বৎসর হইবে, তখন তোমাকে চেনশুদ্ধ এই বাড়িটি দিব।

“কবে সেই পনেরো বৎসর আসিবে, আমি কেবল সেই কথাই ভাবতাম। বাড়িটাকে নিতান্তই নিজের করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার এত তীব্র হইয়া উঠেছিল যে এই কটা বৎসর সুদীর্ঘ বলিয়া মনে হইত, বৎসর যেন কাটিতেই চাহিত না। “মাকে মাঝে আমি দুঃখ করিয়া বলিতাম, নাঃ, এ ভায়ে আর আমি বাড়টা পাবো না।

“বাবা আমায় বড় আদর করিতেন। সেইজন্ত প্রতি রবিবারই আমাকে বাড়িটি ব্যবহার করিতে দিতেন।

সে সময় আমার মনের ভাব কি হ'ত তা তুমি সহজে বুঝতে পার; কিন্তু তবু আমি ঘড়িটিকে একান্ত ভাবে নিরুদ্বেষ করিতে চাহিতাম। তাই থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মনে হইত, পনেরো বৎসর বুঝি আর কাটবে না।

“হায়, পনের বৎসর পার হবার আগেই আমি সেটা পেয়েছিলাম; কিন্তু পিতৃদত্ত উপহার হিসাবে নয়, পিতার উত্তরাধিকারী-স্বত্বে।

“যখনকার কথা বলছি—তখন দেখে রাষ্ট্র-বিপ্লব চলিতেছে—কাহারো মানসম্মত, ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না। একদিন সন্ধ্যার পর একদল ভয়ঙ্কর-মুষ্টি লোক পিতাকে ধরিয় লইয়া গেল—পরদিন দুই তেরা আর একটি নিরপরাধীর রক্তে বধ্যভূমি কলঙ্কিত করিল! বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার পূর্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত আমাকে ও আমার মাকে মুহূর্তেক মাত্র সময় দেওয়া হইয়াছিল—ক্ষণিকের জন্ত মাত্র। হায়, সেই অল্পক্ষণের মধ্যেই কত অশ্রু ঝরিয়াছিল! বিদায়-গ্রহণের সময় পিতা আমার হাত বাড়িয়ে তার ঘড়িটি আমায় দিলেন। দেবার সময় তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বাহির হয় নাই, কিন্তু একটু স্নান হাসি দেখা দিয়েছিল। হায়, এখনও আমি সেই হাসি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

“যে গাড়ী করে তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও গেলাম; খাতকের অঙ্গে পিতার স্বন্ধ থেকে মাথা খসে পড়ল দেখলাম—পরক্ষণেই চোখ বুজে এল—সমস্ত শরীরের রক্ত যেন হৃদপিণ্ডে ফিরে আসছে বলে মনে হল, সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই পকেটস্থ ঘড়িটাকে চেপে ধরলাম।

“ঘাড়তে হাত দেবা মাত্র একটা ভাব মাথার ভিতর ঢুকলো; একদিকে আমি আমার চোখ ও হাতের মুঠা খুললাম, এবং পিতার মত হাসিবার চেষ্টা করে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, তখন ১২টা বাজতে ১০ মিনিট।

এমন সময় আবার নিগামের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল,

বুঝ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল; কিন্তু এবারও তাহার ঘড়ি নয়। তখন সে আশ্চর্য হইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল:—

“হ্যাঁ, তারপর। পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পর, মেহমতী মা আমার যে শোক সহ্য না করিতে পেরে তাঁর কাছে চলে গেলেন; আমি সংসার-সমুদ্রে একা, আপন বলিতে পৃথিবীতে আমার কেহ রহিল না। শত সুখস্বস্তি-বিজ্ঞাত সুখময় অতীতের সহিত বন্ধনকে নিত্য জাগরুক রাবিতো এক আমার এই আবাস্যকাজ্জিত ঘড়িটি ছাড়া আর কিছুই রহিল না! কি হৃদয়-বিদারক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে ঘড়িটি আমার নিজের হইয়াছিল তাহা আগেই তোমাকে বলেছি; সেইদিন থেকে সে আমার এই দুর্লভ জীবনের প্রত্যেক সুখদুঃখের ঘটনায় তার নিজের কর্তব্য ভুলে নাই এবং সেইদিন হইতে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে।

“তারপর যে দিন আমি জারট্রুডকে বিবাহ করি, সে দিন আমার সকলের চেয়ে সুখের দিন। জারট্রুড আমার কখনো আমাকে দরিদ্র বলে ঘৃণা করেনি—সেটা তাঁর নিজের গুণে! আমি এখন যা আছি, তখনও তাই ছিলাম; একজন সামান্য নকলনবীশ, কোনও রকমে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করি। আমার নিজের যদ প্রশংসনীয় কিছু থাকে, সে আমার জারট্রুডের প্রতি প্রগাঢ় অশঙ্ক ভালবাসা! এই বিশ্বসংসারে আমাকে নিঃসঙ্গ, সকলের পরিত্যক্ত দেখিয়া তাহার হৃদয় দ্রাস্থলভ, করুণা ও সহানুভূতিতে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ এই চল্লিশ বৎসর ধরিয়া সে আমাকে সর্বদাই আনন্দ সুখ ও প্রীতি প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং তাহাতে সফলকাম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই! চল্লিশ বৎসর আগেকার নব বধূ আজ এ বৃদ্ধের একমাত্র অবলম্বন, নির্ভরে যষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তবু সে আমার সেই চিরপুরাতন জারট্রুডই আছে।

“খুব চুপি চুপিই আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। এ বিবাহের উপসর্গ স্বরূপ কোন আনন্দ উৎসব, কোনও

বৃহৎ ভোজ বা 'বল' নাচের আয়োজন হয় নাই; আমরা দুইটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া গিঞ্জায়, এবং পরে, বিবাহ আইন মতে সিদ্ধ করিবার জন্ত, আদালতে গেলাম; এবং বিবাহ অঙ্কে পতিপত্নী স্বরে ফিরিলাম। এ বিবাহে আমাদের উভয়ের কেহ কোনও রূপ যৌতুক বা উপহার পাই নাই, তথাপি আমাদের দৈন্যদশা সবেও আমাদের মত সর্বপ্রকারে সুখী দম্পতী আর তখন ছিল কিনা সন্দেহ!

“দুজনে যখন এ দরিদ্রের কুঠীতে প্রবেশ করিলাম, তখন জারটুড আমাকে কটা বেঞ্চেছে জিজ্ঞাসা করিল। তার এই কপাগুলি যেন দৈব-প্রেরিত বলিয়া মনে হইল। আমিও তার প্রশ্নে উত্তরে আমার বড়িটি লইয়া তাহাকে বলিলাম, ‘জারটুড এইটি আমার উপহার, আমার হৃদয় ও মনের সঙ্গে সঙ্গে এটিকেও তোমার করে আমাদের বিবাহের উপহার-স্বরূপ অর্পণ করলাম। ইহাই আমার একমাত্র ধনসম্পত্তি, এটি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়। কেন, তা’ তুমি জান।’

‘প্রিয়তম, ধন্তবাদ’ বলিয়া জারটুড তাহার শিরীষ-কোমল অমল-ধবল হস্তখানি প্রসারিত করিলে আমি বড়িটি তাহার হাতে দিলাম, বড়িতে তখন রাত্রি ১২টা বাজিতে ১০ মিনিট।

“ওকি!” বলিয়া সহসা সে ফিরিয়া দেখিল—আবার নিলামের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। “না! ও আমার বড়ি নয়” বলিয়া একটা নিখাস ফেলিয়া বলিল, “তা হলে, আমার কাহিনীটা শেষ করে ফেলি!”

“একমাস পরে আমার জন্ম-তিথি আসিল। সে দিন জারটুড সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল, ‘প্রিয়তম, এই একটা মাত্র জিনিষ আমার আছে আজকের দিনে তোমাকে উপহার দিবার জন্ত। আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসার সহিত আমি তোমাকে ইহা দিলাম।’ এই বলিয়া সেই বড়িটি আমার হাতে দিল।

“তিন মাস পরে তাহার জন্ম-তিথি উপলক্ষে আমি আবার সেই বড়িটাই তাকে উপহার দিলাম; আবার আমার জন্ম-তিথিতে-সেটা ফিরে পেলাম। এইরূপে

পচিশ বৎসর ধরিয়া যখন যে উৎসব আসিয়াছে, তখনই এই বড়িটাই আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইয়াছে! আর, অল্প কোনও উপহারের চেয়ে আমরা এইটাকেই অধিক আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতাম; কারণ নিতান্ত আপন বলিতে এই একটীমাত্র জিনিষ আমাদের ছিল। এবং আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভ হইতে ইহার সহিত কত সুখস্বস্তি বিকল্পিত ছিল।

“সেই বড়ি আজ নিলাম-স্বরে এসেছে দেখে নিশ্চয়ই তুমি আশ্চর্য হইছ, কিন্তু তার কারণ তুমি যদি শোন, তা হলে আর তোমার সে ভাব থাকিবে না।

“একদিন সহসা জারটুড রোগে পড়িল; সে রোগ আর কিছুতেই সারে না। ঔষধ ও পথ্য আমাদের বাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহার শেষ কপদকটিও নিঃশেষ হইয়া গেল, তবু সে রোগ সারিল না। শেষে একদিন তার শয্যার পার্শ্বে বসে হতাশ হয়ে কাঁদতে লাগলাম, এমন একটি পরমা নেই যা দিয়ে ঔষধ ও পথ্য দিয়ে তাকে বাঁচাইয়া তুলি।

“চোখের সামনেই আমার বড়িটা পড়ে ছিল, সহসা মনে হল, হয়ত সেটা দিয়ে তার জীবন-রক্ষার কোনও উপায় হতে পারে! আমি আর ইতস্ততঃ করলাম না, যদিও সেটা তখন তাহার সম্পত্তি! কিন্তু লোন আফিসে ঢোকবার আগে আমি তিনবার অর্জুনে ফিরেছিলাম, এইটুকু স্বার্থত্যাগ কর্তে হৃদয় যেন আমার ভাঙ্গিয়া পড়িতে ছিল। অবশেষে আমি বড়িটি বাঁধা রেখে চল্লিশটি ফ্রাঙ্ক নিয়ে এসাম, জারটুডের রোগ আরোগ্যের উপায় হইল।

তার পর তার আরোগ্য-স্থানের পর যে দিন নানা রকম ছলনা, মিথ্যা প্রবোধ-বাক্য ও সত্যের অপসারণের পর বাধ্য হয়ে আমাকে বড়িটার বাহা স্বত্ত্ব সত্য কথা বলতে হয়েছিল, সে দিনের কথা আর কি বলব?

“ক্লেশ ও যুগায় যুগ রক্ত বর্ণ করিয়া সে বলিল, ‘এর চেয়ে আমার মরণই ভাল ছিল।’

“আমি তাকে আবেগ-ভরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, ‘কিন্তু তোমার ছেড়ে আমার কি অবস্থা হ’ত প্রিয়তমে?’

কিছুক্ষণ পর সে কান্দতে লাগল। ক্রমে ক্রমদন সংক্রামক হয়ে উঠল, আমিও আর থাকতে পারলাম না। কান্দতে লাগলাম।

ঢেলে বেলায় পিতা আমার ঘেমন করণ কর্তে সাধুনা দিতেন, তেমন ভাবে তাকে সাধুনা দিয়ে বলিলাম, 'কোনও ভয় নাই প্রিয়তমে, এখন তুমি বেশ সামলাইয়া উঠিয়াছ; এখন থেকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করে আমি নীঘই তোমার ঘড়িটি উদ্ধার করে দেব'।

'কত টাকায় সেটি বাধা দিয়েছ'?

'চল্লিশ ফ্রাঙ্ক।'

'টাকার পরিমাণ শুনিয়া জার্টুড্ একটু ভীতা হইল, কারণ সে জানিত, অতুলি টাকা বাধাইবার ওয় আমাদেব কত পরিশ্রম করিতে হইবে। তবু সে সকল স্থির করিয়া বলিল,

'হ্যাঁ, এই চল্লিশ ফ্রাঙ্ক কোনও রকমে শোধ দিতেই হইবে।'

'তোমাকে সত্য বস্তুি সে সংকল্প আমরা রেখেছিলাম। সকাল সন্ধ্যা সকল সময় আমরা খাইতাম-তবু আজও সেই ঘড়িটি এখনো এখানে পড়ে! এই সুদীর্ঘ পনেরো বৎসর ধরে যে টাকা আমি ধার করেছিলাম, তার প্রায় পাঁচ গুণ স্ৰদ্ধ দিতেছি! ওঃ! এই সকল মহাজনেরা কি নির্দয় ভাবে দরিদ্রের রক্ত শোষণ করে, তা ভাবলেও আমার অন্তরায় শিহরিয়া ওঠে। ঘড়িটি অপরকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবার আশঙ্কায় প্রতি বৎসরেই অর্থ কিছু কিছু করিয়া তাহাকে দিয়া আসিতেছি। তথাপি আজও তাকে একেবারে উদ্ধার করিতে পারিনাই। আজ উহার দাম পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক।'

'অনেক বারই আমরা নানা রকমে ব্যয় সঙ্কোচ করে প্রয়োজন মত অর্থ সংগ্রহ করেছি, কিন্তু প্রতিবারই একটি না একটি অসম্ভাবিত ঘটনাচক্রে পড়ে ঘড়িটি উদ্ধার করতে পারিনি। অসুখ, কাণ্ডকষ্টের টানাটানি বাস-পরিবর্তন, জিনিস পত্রের মহাঘণ্টা, ইত্যকম একটি না একটি ব্যাপারে পড়ে গিয়েছি। কখনও হয়ত আমাদেরও চেয়ে দুঃস্থ

কোনও পরিবার দায়ে পড়ে আমাদের নিকট হইতে টাকা ঋণ করেছে, পরে সময়ে শোধ দিতে পারে নাই। আমার মাঝে মাঝে তাদের উত্তর বড় রাগ হত। আজ কিম্ব আমি তাদের সর্বাস্তঃকরণে ক্ষমা করছি। দু' ছবার আমি আসলটি পুরা সংগ্রহ করেছিলাম, কিন্তু সূদের টাকা সংগ্রহ হয়ে উঠেনি। বিশেষতঃ গত বৎসর আমাদের অবস্থা একেবারেই স্বচ্ছল ছিল না; জার্টুড্ আমাকে বল্ল 'দেখ ক্রমেই আমাদের বয়স বৃদ্ধি হচ্ছে; কে জানে আমাদের কার কবে ডাক পড়বে, আর সে যে তোমার পিতার ঘড়িটি তার শয্যার পার্শ্বে না রেখে ঘরে যাবে, সে হ'তেই পারে না। সে হ'তে দেওয়া হবে না, সেটা বড় বেশী নিষ্ঠুরতা হবে। শুধু অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে চলবে না আজ থেকে আমার একটু একটু স্বার্থ ত্যাগও করা হবে'।

'ইতিপূর্বে আমরা একটু একটু কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলাম; কিন্তু তা সবেও আরও নূতন নূতন স্বার্থ ত্যাগের উপায় বাহির করাতে আমাদের ঘাট পোত হয় নাই।

'প্রথমে আমরা নস্য লইবার সংখ্যা কমাইয়া তিনবার করিলাম সকাল দুপুর, সন্ধ্যা। তারপর কফি পানের সংখ্যাও কমাইলাম; মাত্র সকালে একবার কফি খাইতাম সেটা বাদ দিতে পারিলাম না; আমাদের পোষা বেড়ালটারও সেটা না হলে চলিত না; রবিবার কিন্তু দুপুরে খাইতাম।

'এত দেনা সত্ত্বেও তিন মাস পরে দেখা গেল, এখনও পাঁচ ফ্রাঙ্কের প্রয়োজন। জার্টুড্ এক রকম হতাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু অগতির গতি ভগবান আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। সে দিন সহসা একটা নকল করিবার কাজ জুটিয়া গেল; গত তিন রাত্র শরিয়্য আমি সে কাজটি করিয়াছি। আজ সকালে জার্টুড্ হাসিতে হাসিতে পঞ্চাশটি ফ্রাঙ্ক গণিয়া আমার হাতে দিল।

'টাকা কয়েকটি হাতে পেয়েও আমার এখানে আসতে ভয় হজিল পাছে এসে শুনি ঘড়িটি আমার

অগ্রহায়ণ ১৩১২

বিক্রয় হয়ে গিয়াছে ; কিন্তু ভগবান মঙ্গলময়, এখনও সময় আছে। আর একটু পরেই আমি আমার সেই পুরানো ঘড়িটিকে দেখতে পাব, নিজের হাতের মুঠোর ভিতর সেটিকে অনুভব করতে পারবো, সে কি আনন্দ কি সুখ ! সেটি আমার পিতার একমাত্র স্মৃতি চিহ্ন ; উঃ আজ পনেরো বৎসর পরে তাকে বুকের কাছে রেখে না জানি সে কি সুখই হবে। আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম অবস্থায় প্রতি পদক্ষেপে সে যেমন সময় নির্দেশ করতো, আজ থেকে মৃত্যুর আহ্বান না পাওয়া পর্যন্ত সে আবার তার সেই পুরাতন কাজই করবে সেটা মনে করেও কত সুখ ! ছেলেবেলায় যখন সেই ছিলাম, তখন তার টিক টিক শব্দ আমার কর্ণে বত মিষ্ট লাগত, এই বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয়ই তেমন মধুর লাগবে।

“আর জারটুড যখন এর উদ্ধারের খবর পায় তখন সে কত সুখীই হবে। আমি যেন বলতে পারি তাকে সে গুপ্ত বেনী ক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না ; সে হয়ত এত ক্ষণ খুব কাছেই আছে। আমার পিছনে পিছনেই সে আসছিল কিন্তু সে বাহিরেই আছে—পাছে উৎকণ্ঠায় সে কাতর হয়ে পড়ে তাই তাকে ভিতরে আসতে বারণ করেছি।

ভাগ্যে ঘড়িটি বিক্রয় হয়ে যায়নি; তাহলে সে আসত আমি সহ্য করিতে পারিতাম না। যাক সে ভয় কেটে, গিয়েছে, এখন আমাদের জয় ; এত দিন পরে ঘড়িকে-বিজয়-গর্বে আমাদের করে জারটুডের আছে নিয়ে যাব, সে কি কম সুখ !”

বৃদ্ধ সবেমাত্র তাহার কাহিনীটি শেষ করিয়াছে, এমন সময় নিলামকারী একটি সোনার পুরানো ধরণের ঘড়ি বিক্রয়ের জন্ত তুলিল, বৃদ্ধ সোৎসাহে বলিল, “ঐয়ে, ঐয়ে আমার ঘড়ি !”

নিলামকারী হাঁকিল—“যার সোনার ঘড়ি—৪৩ ফ্রাঙ্ক !”

বৃদ্ধ তাহার ক্ষীণ-কণ্ঠ যথা সম্ভব উচ্চ করিয়া বলিল “৪৬ ফ্রাঙ্ক !”

কয়েক মুহূর্ত কাটিয়া গেল : বৃদ্ধের ডাকের চেয়ে আর

বেনী দর উঠিল না দেখিয়া নিলামকারী হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধকে ঘড়িটি দিতে উত্তত হইল—বৃদ্ধ আগে হইতেই হাত বাড়াইয়া ছিল।

এমন সময় আর একখানি প্রসারিত হস্ত ঘড়িটির উপর গিয়া পড়িল ; হাত খানি একজন ইহুদীর—রূপণের মত আকৃতি তার—ছোট ছোট দুটি টেরা চোখ, লম্বা ময়লা দাড়ী।

“দেখি একবার ত্রিনিবটা ; এখনও এগুলোর খুব চলন আছে, কিছু দরে এটা বিক্রী হতে পারে। আচ্ছা ৪৭ ফ্রাঙ্ক !” বলিয়া ঘড়িটি নিলামকারীকে ফিরাইয়া দিল।

বৃদ্ধ নূতন ক্রেতাটির উপর আলাময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ডাকিল “আট চল্লিশ !”

ইহুদী প্রশান্ত ভাবে ডাকিল “উন পঞ্চাশ !”

আবার হস্ত প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধ প্রাণ পণে হাঁকিল “পঞ্চাশ !”

মুহূর্তের জন্ত সকলে নীরব।

“কি ভয়ানক গোঁয়ার, কিন্তু আমি ছাড়ছি না” বলিয়া ইহুদী হাঁকিল “একান্ন !”

বৃদ্ধের সে সময়কার মুখের ভাব কথায় বর্ণনা করা যায় না। তাহার সমস্ত মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল, অতি ক্ষীণ স্বরে কাতরকণ্ঠে সে বলিল, “আমার মোট পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক আছে !”

এদিকে নিলামকারী তাদৃশ অগুনাদিক সুরে হাঁকিতে লাগিল,—যার একান্ন ফ্রাঙ্ক !—যার একান্ন ফ্রাঙ্ক !

সে ইহুদীরও দেবী সহিতোচ্ছল না, সে বলিয়া উঠিল “আর দেবী করিতেছ কেন ? দাও না শেষ খা দিয়ে আমাকে দাও !

কথাটা শুনিয়া বৃদ্ধের যেন চমক ছাঙ্গিল, পাগলের মত সে হাঁকিল—“বায়ান্ন ফ্রাঙ্ক !”

ইহুদী হাঁকিল “তিন্সান্ন !”

বৃদ্ধ সজোরে হাঁকিল “চুয়ান্ন !” পরক্ষণেই অপর দিকে তাকাইয়া বলিল “কিন্তু অত টাকা আমার নাই !”

কিছুক্ষণ সবই নীরব—আবার ইহুদী হাঁকিল “পঞ্চান্ন !”

হতাশ ও ক্রোধ পূর্ণ স্বরে বুদ্ধ বলিল, “নাঃ আর আশা নাই, বলিয়া পরক্ষণেই সে পিছন ফিরিল নিশ্চয়ই তাহার চোখের জল টুকু নুকাইবার জ্ঞা !

এমন সময় সময় একজনের নূতন কণ্ঠ স্বর শোনা গেল সেটা সিলসেড্‌ এর ! সে হাঁকিল “বাট ফ্রাঙ্ক !” তাহার স্বরে একটা কঠোরতা, একটা দৃঢ়তা ছিল !

ঘটনাটি এক্রপ অপ্রত্যাশিত পথে ফিরিতে দেখিয়া বুদ্ধ অর্ধ পথে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল । ইহা ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া ডাকিল “পঁচটি !”

“সত্তর !”

“পঁচাত্তর !” কিন্তু এবার আর ইহুদীর স্বরে সে পূর্নকার দৃঢ়তা নাই !

সিলসেড্‌ আর থাকিতে পারিল না—একেবারে কাশ শেষ করিবার জ্ঞা সে হাঁকিল নকাই ! তাহাতে সফল ফলিল সন্দেহ নাই ঘড়িটি তাহার নামেই ক্রীত হইল ।

বুদ্ধ কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া একটু ভৎসনার স্বরে বলিল এ তুমি করলে কি ! তোমার অসীম দয়া, কিন্তু তুমি আমার জ্ঞে এত পরসানষ্ট করলে কেন ? না, না এ ভারী অন্তায় হল । ভাগ্যে আমি তোমাকে আমার দুঃখের কাহিনী বলেছিলাম ! তোমার এ দয়ার কথা আমি কখনও ভুলব না, নিজের চোখে দেখলাম তাই, নতুবা আর কাহার কাছে ওনিলে বিশ্বাসই করতাম না ।

সিলসেড্‌ আর কি উত্তর দিবে ! জননী যেমন শিশুসন্তানের ছোট ছোট হাতের মুঠি খুলিয়া তাহার অপেক্ষিত খেলনা তুলিয়া দেয়, তেমনই সন্তর্পণে সে বুদ্ধের ক্রুশ হাতখানি ধরিয়া, তার চির আকাঙ্ক্ষিত ঘড়িটি দিয়া হাতটি বন্ধ করিয়া দিল ; পরক্ষণেই সে জনশ্রোতে কোণায় মিশিয়া গেল !

বুদ্ধ যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল ! যখন তাহার সহজ অবস্থা ফিরিয়া আসিল তখন সিলসেড্‌ সেখানে নাই ; সে তার সাধারণ দ্রুতপদ বিক্ষেপে কোণায় যে মিশিয়া গিয়াছে তাহা বলা শক্ত !

এদিকে সিলসেড্‌ নিলাম ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইতেই সম্মুখে এক কম্পিতপদ বুদ্ধার পাড়ে পড়িতে

পড়িতে রহিয়া গেল । সে কখনও জারটুডকে দেখে নাই, কিন্তু কি জানি কেন ইহাকে দেখিয়াই তাহার জারটুড বলিয়া মনে হইল ; কিছু দূরে একটা ধামের অন্তরালে দাঁড়াইয়া সে বুদ্ধের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, আজ আপনার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সে এই বুদ্ধ দম্পতীকে যে সুখ ও আনন্দ দান করিয়াছে তাহার প্রকাশ নিজের চোখে দেখার প্রলোভন সামলাইতে পারিল না ; আজকের এই স্বার্থ-ত্যাগে সে যে আনন্দ লাভ করিয়াছে, তাহার কাছে তাহার নিজের ঘড়িটি উদ্ধারের জ্ঞা যে ক্ষতি—তাহাকে ক্ষতি বলিয়াই বিবেচনা করিল না !

কিছুপরেই বুদ্ধ ঘড়িটি এক হাতে উচু করিয়া ধরিয়া বাহাতে তার-স্ত্রী সেটা দূর হইতে দেখিতে পায়-হাপাইতে হাপাইতে দেখা দিল । তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র জারটুড কম্পিত পদে ছুটিয়া গিয়া ঘড়িটিকে আবেগভরে দু’হাতে চাপিয়া ধরিল এবং অনতিবিলম্বে তাহার অবিরল অশ্রুধারায় সেটি সিক্ত হইয়া উঠিল !

উভয়েই কিছু শান্ত হইলে, বুদ্ধ গদগদ ভাবে নিলাম ঘরের সমস্ত ঘটনাটি জারটুডকে বলিল এবং তৎপরে উভয়ে মিলিয়া উৎকণ্ঠিত চক্ষে চারি দিকে বেষণ করিয়া খুজিয়া দেখিল যদি তাদের এই অজ্ঞাত অখ্যাত পলাতক উপকারীর সন্ধান পায় ! কিন্তু বৃথা ! হতাশ হইয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া গেল !

তাহারা চক্ষুর অন্তরাল হইলে, গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া সিলসেড্‌ ভাবিল “কি সুখী এরা আজ ! কাল সকালে উঠে তারা যখন এত দিনের হারানো জিনিষ আবার পূর্নকার মত তাদের শয্যার পার্শ্বে দেখতে পাবে, আবার কাল থেকে যখন সেটি আগেকার মত তাদের সহস্র সুখ দুঃখ, আনন্দ আশ্রমের মধ্যে জড়িত হবে, তখন না জানি তাদের কত সুখই হবে !”

শ্রীঅশ্বোরনাথ বোস ।

চুনালের স্মৃতি

যাই তবে, যাই ছেড়ে হে প্রিয় চুনার,
কে জানে কখন দেখা পাই কি না আর !
কাটাইলু কত দিন তোমার আবাসে,
উদ্ভুক্ত বাসনা লয়ে উদ্ভ্রান্ত উল্লাসে ।
হোরিয়াছি তব রূপ বিমুগ্ধ নয়নে,
ঘন নীল পৌত মিশি বিচিত্র বরণে
সুক গগনের শোভা ! ধীরে উঠি রবি
বাবলার ডালে ডালে আঁকে দীপ্ত ছবি
ছড়াইয়া স্বর্ণ-রশ্মি । উতলা বাতাসে
বাজরা : জনাব তরু কাঁপি উর্দ্ধ শ্বাসে
অদূরে বাজাতে থাকে অক্ষুট বাশরী,
নিরহিণী ব্রজনারী সর্ব্ব্ব পাসরি,
ধাইত এমনি বুঝি গুনিয়া সুস্বর—
কল্পনা খুলিয়া দিত সে মধুর স্তর ।
পরিয়া রঙ্গিন সাড়ি আঁটিয়া কাঁচুলি
লাজের ভূষণখানি শিরে লয়ে তুলি
সারি সারি নারীগণ পূর্ণ কুন্ত লয়ে
ফিরিত মন্দির পদে আপন আলয়ে,
হেরিতাম মহিষসী মহিমার ছবি ।
আবার চমকি চাহি অন্তাচল রবি
মুগ্ধ নেত্রে হেরিতাম, জাহ্নবী ওপারে
কি বিচিত্র শোভা ! দাঁড়ায়ে চণ্ডালগড়ে
ভেবেছি কি কীর্তি আছে এ ক্ষুদ্র চুনারে !
এই সে গুহকালয়, শ্রীরাম যেখানে
বহু ভাবে বহু হন সীতার সন্ধান
আসি গহন কাননে । কাহিনী এখন—
পুণ্ডিতেই আছে শুধু তার নিদর্শন—
আর কোন চিহ্ন নাই । এ চণ্ডালগড়
এবে শুধু বিজৈতার ক্ষমতা আকর ।

কি দুর্ভেদ্য, নিরলজ্য দুর্গের প্রাকার
পদতল চুমিতেছে পরিখা আবার
পাবনী জাহ্নবী । উড়েছিল বিজয়-ধ্বজ ;
কত রাজ অধিরাজ কীর্তি অগণন
নিবে গেছে একে একে—দেউটি সকল ;
মনে হয় সব যেন স্বপন বিফল ।
কি বলিতে কি বলিছে হে চুনারেশ্বরী,
যাই তবে যাই ছেড়ে ভাসাইয়া তরা,
ধুইয়া প্রাণের কালী জাহ্নবী মলিলে ;
দাবদল অন্তরের যন্ত্রণা ভুলালে ।
জ্যোৎস্না-সিক্ত রক্তাভ পথে পদচারী,
বিস্তার প্রান্তরে অই গ্রাম শম্পোপরি
মধুমল ঢাকা তব কোমল আসনে
বসি যে লভেছি শান্তি নিজীব পরাণে,
তাই আজ ছেড়ে যেতে চোখে আমি জল
কৃতজ্ঞতা-ভরে হৃদি করে টল্‌মল ।
কি বলে তোমার কাছে লইব বিদায়
স্নেহ-প্রতিদান আজি কি দিব তোমায়ে ?
এ ক্ষুদ্র কবির লও প্রাণের বন্দনা
দিও পাছে চিরকাল এমনি সাধুনা ।
শ্রীমহামানন্দরী ঘোষ ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মে ভিক্ষুব্রত

ভিক্ষু-সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকারের জন্ত ভিক্ষু-ধর্ম্মে
দীক্ষিত হইতে হয় । যাহারা ভিক্ষু হইতে চায়
তাহাদিগকে প্রথমতঃ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু
উপসম্পদা লাভ না করিলে তাহাদিগকে
ভিক্ষুব্রত ভিক্ষু বলিয়া স্বীকার করা হয় না ।
ভিক্ষু হওয়ার উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ
করিলেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করা হইল, এবং উপ-

সম্পদা লাভ করিলেই প্রকৃত পক্ষে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করা হইল।*

কিন্তু সকলেই ভিক্ষু হইতে পারে না। নরঘাতক, দস্যু, সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, ক্রৌতদাস ও মৈনিক প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারে না; এবং প্রভৃতি গ্রহণ না করিলে উপসম্পদাও লাভ করা যায় না, আর উপসম্পদা লাভ না করিলে কেহই ভিক্ষু বলিয়া গণ্য হয় না।

আবার প্রভৃতি গ্রহণ করিলেও যাহারা গুরুতর অপরাধ করে, কিংবা যাহারা পুরুষত্ব-বিহীন তাহারা ভিক্ষু হইতে পারে না। ভিক্ষুগণের ও উপসম্পদা লাভে কতিপয় বাধা আছে—এই রূপ বাধার সংখ্যা ২৪টি। আবার শ্রমণেরাও ইচ্ছা করিলেই ভিক্ষু হইতে পারে না। পিতামাতার অমুমতি না হইলে কিংবা বয়স পূর্ণ সাত বৎসর না হইলে শ্রমণেরা উপসম্পদা লাভের অধিকারী হয় না।

এখন আমরা প্রভৃতি ও উপসম্পদার প্রভেদ বুঝিতে পারি। প্রভৃতি সংসার ত্যাগ, আর উপসম্পদা

প্রভৃতিবলস্বিগণের ভিক্ষুধর্মের প্রকৃত দীক্ষা।

প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিলে জানা যায় যে, ভগবান বুদ্ধ পাঁচ জন সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধ ধর্মের দীক্ষিত করিলে পর আরও ষাট জন শিষ্য তাহার নিকট এক সঙ্গে প্রভৃতি ও উপসম্পদা লাভের প্রার্থী হইয়া সমাগত হয়। ভগবান বুদ্ধ তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। অল্প কাল পরে তাহার শিষ্যগণ প্রচার-কার্য্য হইতে ফিরিয়া আসে, এবং তাহাদের সঙ্গে কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া ভগবান বুদ্ধের নিকট হইতে এক সঙ্গে প্রভৃতি ও উপসম্পদা লাভের প্রার্থনা করে। ভগবান বুদ্ধ তখন তাহার শিষ্য-বর্গকেই প্রভৃতি ও উপসম্পদা প্রদানের ক্ষমতা দান করেন। তদনুসারে প্রার্থীগণ কয়েকটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন

* বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থ পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রভৃতি ভিক্ষুব্রত গ্রহণের সঙ্কল্পের পরিচায়ক; আর উপসম্পদা লাভ করিলেই ব্রতে দীক্ষা লাভ হয়।

করিয়া ভগবান বুদ্ধের শিষ্যগণের নিকট হইতেই প্রভৃতি ও উপসম্পদা লাভ করিত। প্রভৃতি ও উপসম্পদা প্রার্থীগণকে তখন হইতেই মন্তক মুণ্ডন করিতে হইত, ক্ষত্র ফেলিতে হইত, গৈরিক বসন পরিধান করিয়া স্বদেশে আবৃত করিতে হইত, ভিক্ষুগণের চরণে অবনত মন্তকে প্রণাম করিতে হইত, আসন করিয়া মাটিতে উপবেশন করিতে হইত, এবং করযোড়ে “আমি বুদ্ধ, সংঘ ও ধর্ম শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম” এই বাক্য তিন বার পাঠ করিতে হইত। এই বাক্য পাঠ করিলেই ভগবান বুদ্ধ প্রার্থীগণের প্রভৃতি ও উপসম্পদা সিদ্ধ হইল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেন।

শেষে কিন্তু এই নিয়মের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটে। একটা নূতন নিয়মানুষ্ঠানের প্রবর্তন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়। এই পরিবর্তিত আকারেও উপসম্পদা পবিত্র প্রভৃতি জীবন উৎসর্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মহারাজ অশোকের সময়ে এক সঙ্গে প্রভৃতি ও উপসম্পদা গ্রহণের দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বহুক প্রভৃতিও এক সময়েই প্রভৃতি ও উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনুমান ২০ বৎসর বয়স না হইলে কেহ উপসম্পদায় দীক্ষিত হইতে পারিত না; সুতরাং শ্রমণগণকে অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসর উপসম্পদা লাভের জন্ত অপেক্ষা করিতে হইত।

বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারের প্রথম ভাগে বালকদিগকে দীক্ষিত করিতেন কি না এ সম্বন্ধে ধোর সন্দেহ আছে। তবে ভগবান বুদ্ধের পুত্র রাহুল বালক বয়সেই প্রভৃতি রাহুলের প্রভৃতি গ্রহণ করিতে অমুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মচারীর শ্রমণেরা ভিক্ষু নহে,—তাহারা শ্রমণোদ্দেশক, অর্থাৎ ভবিষ্যতে তাহাদিগকে অবশ্যই ভিক্ষু হইতে হইবে। দশটি শিক্ষাপদ আয়ত্ত করাই এই সকল শ্রমণোদ্দেশকের কর্তব্য।

যে সকল সমাজে দেবদেবী পূজার পদ্ধতি আছে, সেই

অগ্রহায়ণ ১৩১২

সমাজ হইতে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিলেও এই সকল অমুষ্ঠানই সম্পন্ন করিতে হয়। তবে, ভিক্ষু হওয়ার পূর্বে ধর্মার্থীগণকে কিছু কাল শিক্ষা কার্যে ব্যয় করিতে হয়। সেই কালকে “পরিবাস” বলে। মাত্র জটিল বা অগ্নিপূজকগণ এবং শাক্যগণ “পরিবাস” না কাটাইয়াই উপসম্পদা লাভ করিত, প্রব্রজ্যার ত কথাই নাই। শাক্যগণ বুদ্ধদেবের জাতি, ছিল আর অগ্নিপূজকগণ বিশ্বাস করিত সংকল্পের অমুষ্ঠানে পাপ মোচন হয়; এই কারণেই এই দুই সম্প্রদায়ের প্রতি এই বিশেষ অমুগ্ৰহ প্রদর্শন করা হইত।

ভিক্ষুত্বতর্থা প্রথমতঃ করক এবং ভিক্ষুর পরিচ্ছদ ভিক্ষুর দীক্ষা গ্রহণ করে; এবং গুরু নির্দোষ করিয়া থাকে। অনূর্দ্ধ দশ ও অনূন পাঁচ জন ভিক্ষুর সম্মুখে ত্রতার্থীকে এই সকল কার্য করিতে হয়। পরে এই সমিতির সভাপতি ত্রতার্থী এবং তাহার গুরুর নাম জিজ্ঞাসা করেন, এবং ভিক্ষুত্ব গ্রহণে তাহার কোন বাধা আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এই সকল অমুষ্ঠানের পর ত্রতার্থী ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হওয়ার বাসনা সমিতির সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। সমিতি মৌনাবলম্বন করিয়া সম্মতি প্রকাশ করে, এবং এই রূপে সম্মতি প্রদত্ত হইলে সভাপতি ভিক্ষুর অবস্থা পালনীয় চতুর্বিধ নিয়মের উল্লেখ করেন, এবং যাহাতে ত্রতার্থী এই সকল নিয়ম কদাপি লঙ্ঘন না করে ও যাহাতে চারিটি পাপ কার্য জীবনে কদাপি অমুষ্ঠিত না হয় তজ্জন্ম তাহাকে অমুরোধ করিয়া থাকেন। আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী ব্যতীত শাক্য-বংশীয় কেহই পূর্বোন্নিখিত অবস্থা পালনীয় চারিটি পবিত্র নিয়মের একটিও পালন করে নাই, অথবা যে চারিটি পাপ কর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে সে সম্বন্ধেও তাহারা কোন নিষেধ বিধি অবলম্বন করে নাই।

কোন কোন অবস্থায় ভিক্ষু ইচ্ছা করিলে সন্ন্যাসাশ্রম ভিক্ষুর সন্ন্যাস ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু দীক্ষা-কালে আজীবন ত্রীসংসর্গ হইতে বিরত থাকিতে হইবে ভিক্ষুগণের এইরূপ প্রতিজ্ঞা

সেই সকল অবস্থায় অদ্বীভূত নহে! ত্রীসংসর্গ করিলেই ভিক্ষুকে বাধ্য হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম পরিত্যাগ করিতে হয়।

ভিক্ষুগণের দীক্ষা কার্যও উল্লিখিত নিয়মেই পরিচালিত হইয়া থাকে। মাত্র যিনি প্রস্তাব উপস্থিত করেন তাঁহাকে “পবত্তিনী” বলা হয়।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে উপসম্পদা প্রায় একই নিয়মে অমুষ্ঠিত হইত। অতি সামান্য যে পার্থক্য আছে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

ভিক্ষুগণের অঙ্গাবরণ তিন অংশে বিভক্ত; যথা, অন্তর্বাসক, উত্তরাসঙ্গ, ও সজ্বাটী। ত্রিচির বলিলে এই

ত্রিবিধ পরিচ্ছদের সমস্তগুলিকেই বুঝায়।

বর্ণানুসারে ভিক্ষুগণের পরিচ্ছদকে কাষায় ও বলা হইয়া থাকে। রক্তাভ পীত বস্ত্রের নাম কাষায়। দক্ষিণ ভারতে ভিক্ষুগণের পরিধেয় বস্ত্রের বর্ণ পীত, কিন্তু মধ্য যুগে ভিক্ষুগণ রক্তাভ বস্ত্র পরিধান করিতেন।

‘অন্তর্বাসক’ নিম্নাবরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা অনেকটা মহিলাগণের সেমিজের ত্রায় আঙুল ফলস্বী এবং “কায়বন্ধন” বা কোমরবন্ধ দ্বারা আঁটা। কেহ কেহ এই অন্তর্বাসককে “নিবাসনও” বলিয়া থাকেন। “উত্তরাসঙ্গ” বন্ধ: ও স্বল্পদেশ আবৃত করিয়া জাহ্নুদেশের কিঞ্চিৎ নিম্ন পর্য্যন্ত বুলিয়া পড়ে। হুয়েন-সাংএর মতে “উত্তরাসঙ্গ” ও “সংকক্ষিকায়” বিশেষ প্রভেদ নাই; কিন্তু “প্রতিনিবাসন” ও “উত্তরাসঙ্গ” অভিন্ন কি না এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

“সজ্বাটী” মিশ্র পরিচ্ছদ; ইহা দুই ভাঁজে বিভক্ত হইয়া স্বল্প হইতে জাহ্নু পর্য্যন্ত বুলিয়া পড়ে এবং কোমরে বাধা থাকে। মগধের ধাতুক্রেত্রে দেখিয়া আনন্দ এইরূপ পরিচ্ছদের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এজন্মই ইহা এত ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রধরে নির্মিত।

০ অত্রকর্চ্য, অদত্তাদান, বধ ও উত্তরমহুযাধর্মপ্রলাপ! প্রতি-মোক্ষেও এই চারিটি পাপ কর্মের উল্লেখ আছে—ব্রহ্মকর্চ্য, চৌর্য, হিসাং, “উত্তর মহুযা” দান।

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ সময় সময় এক প্রকার পোষাক পরিধান করে। ইহার নাম “বর্ষা-স্যাঠা” বা প্রাহুট পরিচ্ছদ।

বর্ষা-শেষে “প্রবারণাস্তে” সঙ্ঘ-সমূহে বস্ত্র বিতরিত হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানের নাম “কট্টিন,” এবং লোকের বিশ্বাস ইহাতে পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।

ভিক্ষুগণ “পরিষ্কার,” “কটিবন্ধ,” “বিসি” (ক্ষুর), সূঁচী, “পরিস্রাবণ,” “ঠবিকা,” “কস্তুর” বা “খঞ্চর,” দণ্ডকাঠ, জপমালা প্রভৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। * পাদুকা বিলাস-দ্রব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে পাদুকা-ব্যবহার নিষিদ্ধ আছে; কিন্তু খড়ম বা খড়মের আয় পাদুকা ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে। বিশেষ প্রয়োজন হইলে ছত্র ব্যবহারে নিষেধ নাই। তাল-বাজনী ও সাধারণ চামর ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত।

হিন্দুসম্প্রদায়ের অনুকরণে “বার্ষিক” বা বর্ষাকালে বিশ্রাম-প্রধার প্রবর্তন হইয়াছে। ভিক্ষুগণ বর্ষাকালে ভ্রমণে বহির্গত হইতে পারেন না, সুতরাং বাসস্থান সেই সময়ে একটা বাসোপযোগী স্থান নির্দেশ করিয়া লইতে হয়। “বর্ষোপ-নায়িকা” দুই সময়ে পালিত হইয়া থাকে। আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিতে বর্ষোপনায়িকা প্রথম আরম্ভ হয় এবং কার্তিকের পূর্ণিমা তিথিতে শেষ হইয়া থাকে। উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধগণের মতে “বর্ষোপনায়িকা” শ্রাবণের প্রথম ভাগে আরম্ভ হইয়া কার্তিকের প্রথম ভাগে শেষ হইয়া থাকে। আষাঢ়ের পূর্ণিমার এক মাস পর হইতে

কার্তিকের পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিন মাস সময়কেও “বর্ষোপনায়িকা” বলিয়া ধরা হয়।

বৌদ্ধ-যুগের প্রথম অবস্থায় ভিক্ষু ব্যতীত সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য বৌদ্ধ ভ্রাতৃগণ “বর্ষোপনায়িকাতে” কিংবা বৎসরে অন্যান্য সময়ে গৃহে অবস্থান করিতেন কি না নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। বর্তমান সময়ে সিংহলে

ভিক্ষুগণ বর্ষোপনায়িকার সময়ে অল্প কালের জন্য কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করে। কিন্তু বুদ্ধবোধের উক্তি এই প্রথার অনুমোদন করে না। তিনি বলেন বর্ষোপনায়িকার সময় ভিক্ষুগণ তাঁহাদের বিহারের তত্ত্বাবধান করিতেন, খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন এবং পবিত্র মন্দিরাদি দর্শন করতেন। “বর্ষোপনায়িকা” আরম্ভ হইলে তাঁহারা উচ্চ কণ্ঠে এই বাক্যটি আবৃত্তি করিতেন—“তিন মাসের জন্য আমরা (আমি) এই বিহারে “বস্” (বর্ষোপনায়িকা) আরম্ভ করিলাম।” সুতরাং দেখা যায় যে, এক স্থানে অবস্থানের জন্যই “বস্” প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, এবং ভিক্ষুগণ বর্ষাকালে কোনও নির্দিষ্ট আবাসে বা মঠে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অন্যান্য ঋতুতেও মঠে অবস্থান করিতে পারিতেন।

বৌদ্ধ-যুগের প্রারম্ভে ভিক্ষুগণের নির্দিষ্ট আবাস বা “শয়নাসন” ছিল না। তাঁহারা বনে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে গিরিগুহায়, আশানে, ভূণ-স্তূপে ভিক্ষুগণের আবাস কিংবা মুক্ত স্থানে বাস করিতেন।

ইহা দেখিয়া রাজগৃহের এক জন সঙ্গতিশালী বণিক ভিক্ষুগণের বাসের জন্য আবাস নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভগবান বুদ্ধও ভিক্ষুগণকে পাঁচ প্রকার আবাসে বাস করিতে অনুমতি দেন! * বুদ্ধদেবের আদেশ লাভ করিয়া সেই বণিক এক দিনেই ভিক্ষুগণের বাসের জন্য ৬০টি বাস-গৃহ নির্মাণ

* বিহার, অড়ট যোগ, প্রাসাদ, হর্ম্মা (সমতলপৃষ্ঠ প্রস্তর গৃহ) ও মঠতলস্থ গৃহ।

ভিক্ষা-পাত্রের নাম “পরিষ্কার।” “পরিস্রাবণ” ছাড়া বিশেষ। ভিক্ষাপাত্র যে থলিতে রক্ষিত হয় তাহার নাম “ঠবিকা”। সম্মাসীগণই “ঠবিকা” ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মঠবাসী ভিক্ষুগণ প্রতিপক্ষেই পরস্পরকে কৌর করিয়া থাকেন। মত্তক মুণ্ড ও দাড়ি গোঁক ফেলার জন্যই ক্ষুরের প্রয়োজন।

জপমালার ব্যবহার অনেকটা আধুনিক। বৌদ্ধ যুগের প্রবর্তন সময়ে জপমালার ব্যবহার ছিল না। কেহ কেহ মনে করেন এই জপমালার ব্যবহার বিদেশ হইতে ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে।

অগ্রহায়ণ ১৩১২

করিয়া দেন। ‘মহাবগ্গ’ ও ‘চুল্লবগ্গ’ গ্রন্থেই এই বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু যখন এই সকল পুস্তক রচিত হয়, তখনই উল্লিখিত হর্ষাদি সজ্জাবোধী ছিল। সুতরাং পূর্বোক্ত উপখ্যানটি যে সম্পূর্ণ অমূলক, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বিহার শব্দে সাধারণতঃ মন্দিরকেই বুঝায়, কিন্তু বিহার বলিলে মঠকেও বুঝাইয়া থাকে। সিংহলে অষ্টাপি পূজামন্দিরকে বিহার বলা মঠ বিহার হইয়া থাকে। সেখানে ভিক্ষুগণের

আবাসের নাম “পন্নশালা”। এক-মাত্র ‘সজ্জারাম’ শব্দেই শুধু মঠকে বুঝায়। প্রত্যেক বৃহৎ মঠের সঙ্গেই এক একটি বিহার থাকিত বলিয়াই বোধ হয় বিহার ও মঠ অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সারনাথে ও নালন্দে মঠ-সংলিষ্ট একরূপ বিহার আছে। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং বিহার ও মঠের এইরূপ বর্ণনাই করিয়াছেন।

মহারাজ অশোক এবং তাঁহার প্রপৌত্র দশরথ সজ্জ-শত্রু আজীবকগণের বাসের জগৎ পরিত্যাগে গুহা খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি ঠিক গৃহের স্থায়। বিহার প্রদেশের বরাবর ও নাগাজুর্নো গুহা এই জাতীয় গুহার মধ্যে প্রাচীনতম। সন্ন্যাসীরা অনেক সময় কুটীরে বাস করিতেন।

উপসথ ক্রিয়া যে গৃহে সম্পন্ন হয় তাহার নাম উপ-সথাগার। সিংহলে উপসথাগারকে “পত্রগা” বলে। “লোহপাসাদ” সেধানকার একটি বিখ্যাত উপসথাগার ছিল। মঠের কুঠরীগুলিকে পালিভাষায় “পরিবেণ” বলে।

চৈনিক পরিব্রাজকগণের লিখিত বিবরণ হইতে মধ্যযুগে ভারত ও সিংহলের সজ্জারাম-সজ্জারাম গুলির যথার্থ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। “আবাসিক” নামক ভিক্ষুগণ তখন মঠে অবস্থান করিতেন। রাজা ও ধার্মিক ধনিগণ তাঁহাদের ব্যয়ভার বহন করিতেন। ভিক্ষুগণ নিরুদ্বেগে মঠে

থাকিয়া ইষ্টেচ্ছায় নিরত থাকিতেন এবং ধর্ম-সূত্র আবৃত্তি করিতেন। কোনও ভিক্ষু অতিথি মঠে উপস্থিত হইলে “আবাসিক” ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্র, পরিধেয় বস্ত্র, পদ প্রক্ষালনের জল, অভ্যাঙ্গের জল তৈল এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তরিত পানীয়াদি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেন। অতিথি বিশ্রাম করিলে পর ভিক্ষুগণ আগন্তুক কত কাল যাবৎ ভিক্ষুব্রত পালন করিতেছেন প্রশ্ন করিয়া জানিতেন, এবং তদনুসারে তাঁহাকে নিজা-পরিচ্ছদ ও অগাধ আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রদান করিতেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণের অভ্যর্থনা-বিধি বিনয়গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রাখিয়াছে।

আগামিক, * প্রস্থানোদ্ধত ভিক্ষু, ভিক্ষার্থ গমনোদ্ধত ভিক্ষু, পিণ্ডচারিক, ও আরণ্যক ভিক্ষুগণের অভ্যর্থনা ও সংস্কার-বিধিও বিনয়গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

অশ্বক, পুনর্কম্বু, নন্দ, উপানন্দ, ছন্দ ও উদায়িন নামে ছয় জন দৃষ্টান্তীয় ভিক্ষু ছিল। ভগবান বুদ্ধ প্রতি পক্ষে প্রতিমোক্ষের আবৃত্তি অনুমোদন করিলে পর এই ছয় জন ভিক্ষু পাপমোচনের জগৎ পুনরায় পরম্পরের সন্নিধানে প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি করিত। বুদ্ধদেব জানিতে পারিয়া নিয়ম করিয়া দিলেন যে, স্থানীয় সমগ্র ভিক্ষু বা ভগবান সম্প্রদায়ের নিকট প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে হইবে। এই কারণে প্রত্যেক স্থানের সীমা-নির্দেশের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেব আদেশ করিলেন যে, পর্বত, প্রস্তরখণ্ড, বৃক্ষ, পথ, বন্যাক, নদী বা জলাশয়কে কোনও স্থানের সীমা নির্দেশ করিয়া এক জন সুযোগ্য ভিক্ষুর প্রস্তাবক্রমে সজ্জ উপসথানুষ্ঠানের স্থান নির্দেশ করিয়া লইবে।

সজ্জ মঠের দৈনিক কার্য সম্পন্ন করার ভার যোগ্য ভিক্ষুর উপরই সমর্পণ করিত।

ভক্তোদ্দেশক বা “সেনাসনপত্নাপক” খাণ্ড বিতরণ করিতেন এবং বাসগৃহের বন্দোবস্ত করিতেন।

* যে সকল ভিক্ষু অল্পকাল অহুপস্থিতের পর মঠে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে।

“ভাণ্ডাগারিক” ভাণ্ডার-গৃহ রক্ষা করিতেন। “চিবর পতিগ্গাহক” পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতেন; “চিবরভাজক” পরিচ্ছদ বিতরণ করিতেন, “যাণ্ডভাজক” চাউলের গুঁড়া জলে সিদ্ধ করিয়া বিতরণ করিতেন। “ফলভাজক” ফল বিতরণ করিতেন; “খাণ্ডকচারক” শক্ত খাণ্ড বিতরণ করিতেন ও “অপ্প মন্তক বিসর্জক” সামান্য দ্রব্য বিতরণ করিতেন। “শলাকাগাহাপক” ‘টিকেট’ বিতরণ করিতেন। “বর্ষাদ্যাটিগোপক” ধর্ম্মপরিচ্ছদ রক্ষা করিতেন। “পতগাহাপক” ভিক্ষাপাত্র রক্ষা করিতেন। “আরামিক পেশক” উদ্যান-রক্ষকগণের উপর কর্তৃত্ব করিতেন, এবং “শামনের পেশক” শ্রমগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। উত্তর ভারতে “পানীয়বারিক-গণ” পানীয় জলের কর্তা ছিলেন। “ভাজনবারিকগণের” হস্তে ভাজন বা পাত্রেয় ভার অর্পিত ছিল। “পরিষণ্ড-বারিক” মঠের চতুর্দিকস্থ বৃক্ষপঞ্জের রক্ষক ছিলেন।

“বকস্মিক” বা স্থপতির পদে কাহাকেও নিযুক্ত করা হইত না। কোনও ধর্ম্মাশ্রম বা তপস্বী কোনও নূতন অট্টালিকা নির্মাণ কালে এইরূপ লোক নির্মাণে নিযুক্ত করিয়া লইতেন।

প্রাচীন কালে উচ্চ-নীচ ভেদে ভিক্ষুগণের কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল না, কিন্তু বয়স ও জ্ঞান অনুসারে ইহাদের মধ্যে সন্মানের ভারতম্য ভিক্ষুগণের শ্রেণী বিভাগ হইত, যথা—স্ববির, দর্হ, উপাধ্যায়, সার্কবিহারী।

আচার্য্য ও অধিবাসী। সিংহলে প্রত্যেক মঠেই একজন “মহানায়ক” আছেন; কিন্তু মধ্যযুগে অন্ততঃ মহাযানী মঠে একজন কোনও অধিনায়কের নাম পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে খাদ্যের ব্যবস্থা বড় সুন্দর। এই ব্যবস্থা কঠোরব্রতী এবং সাধারণ ভিক্ষু এই দুইয়েরই উপযোগী। কোনও ভিক্ষু স্নান

খাদ্য শরীরে স্থত, মাখন, তৈল, মধু, চিনি, মৎস্য, মাংস, দধি, ও দুগ্ধ আহার করিলে তাহার “পাচিস্তিয়” পাপ হইয়া থাকে।

তবে মৎস্য ও মাংস অদৃষ্ট, অশ্রুত (?) বা অপমিষ্ট হইলে আহারে বাধা নাই। কিন্তু জালিক ও কসাইগণ কিরূপে মৎস্য-মাংসাদি আহরণ করিয়া থাকে তাহা সকলেই জানেন; সুতরাং এইরূপ বিধি যুক্তিমূলক বলিয়া বোধ হয় না। অনেকে মনে করেন, সজ্জের নিয়মপ্রণালী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ তপস্বীগণের আদর্শে প্রবর্তিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিতেন, সুধু তপস্বীগণ মধু, মাংস ভক্ষণ করিতেন না; সুতরাং ব্রাহ্মণগণের আদর্শেই বৌদ্ধ সজ্জেও মৎস্য মাংসানন বিধি একটু পরিবর্তিত আকারে স্থান পাইয়াছিল। *

ব্রহ্মচারীর জায় ভিক্ষা করিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করাই শাক্যযুগের শিষ্যবর্গের বিধি। কিন্তু তাহা হইলেও ব্রহ্মচারীর জায় তাহারা বাচনিক ভিক্ষার প্রথা পালন করেন না। বুদ্ধভক্তগণের প্রকৃতি স্থির ও গম্ভীর হইবে, ইহাই ভগবান বুদ্ধের উপদেশ। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের আচার-ব্যবহার সিংহলী বৌদ্ধগণ অনেকটা রক্ষা করিয়া চলিতেছেন।

ভিক্ষুগণ স্থত মধু, প্রভৃতি ঔষধি রূপে ব্যবহার করিতে পারেন। ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণ, ঔষধ ও অন্ন প্রয়োগ প্রভৃতির ব্যবস্থা বিনয় গ্রন্থে উদয দেধিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে আমরা তাত্‌কালিক চিকিৎসা শাস্ত্রের ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবস্থা কতকটা অবগত হইতে পারি।

শ্রীশুকবন্দু ভট্টাচার্য্য।

* কেহ কেহ মন্তব্য উল্লেখ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, কলিযুগে মৎস্য-মাংসের এইরূপ অপ্রচলনই শারীরিক অবনতির কারণ বোধহয় ও কলিযুগে প্রচলিত সামাজিক রীতিরই অন্তর্ভবন করিয়াছেন।

বান্ধলা বচন *

সম্প্রতি বান্ধলা ভাষার প্রতি দেশের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে, ইহার ফলে আমরা বান্ধলা ভাষার ব্যবহৃত বর্ণ বিশেষের প্রকৃতি বা ব্যবহার, ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার কৌতূহলোদ্দীপক নূতন নূতন তত্ত্ব অবগত হইয়া সুখী হইতেছি। এবং জ্ঞান লাভ করিতেছি। বর্তমান প্রবন্ধের নাম শুনিয়া যদি কাহারও সন্দেহ হয় যে লেখক ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বঙ্গ ভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার স্পর্শা করিতেছে, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র লেখকের প্রতি বড়ই অবিচার করা হইবে সুতরাং অগ্রেই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারী সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে যাহারা মাতৃভাষার সেবা করেন তাঁহাদের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি “বান্ধলা ভাষার ভাল ব্যাকরণ নাই”। কথাটা আপাতত প্রহেলিকার মত বোধ হয় এবং পণ্ডিতের মুখের কথা বলিয়া ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে না পারিলেও অনেকে মনে মনে নিশ্চরই এ কথা ভাবেন, “বান্ধলা ভাষার ব্যাকরণ নাই” ইহা কি রকম কথা? তবে আমরা কি পড়িয়াছি! ছেলেপিলেদের বা কি পড়াই।” কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, আমাদের বান্ধলা ভাষায় ব্যাকরণ আছে, কিন্তু বস্তুতঃই বান্ধলা ভাষার কোন ভাল ব্যাকরণ নাই। যদি কোন ভাষাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা ব্যাকরণ পাঠের উদ্দেশ্য হয়, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বান্ধলা ভাষা সম্বন্ধে অতাপি এমন একখানি ব্যাকরণ রচিত হয় নাই, শুধু যাহা পাঠ করিয়া বান্ধলা ভাষায় সম্যক ব্যুৎপত্তি

লাভ হইতে পারে। বান্ধলা আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া ব্যাকরণে এই প্রকার ক্রটি আমাদের কাছে ধরা পড়ে না, কিন্তু বান্ধলা ভাষা শিক্ষাপ্রয়াস কোন বিদেশীয় অতি সহজেই এই ক্রটি ধরিতে পারেন। তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ অল্প বান্ধলা ভাষার বচন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

বাল্যকালে ইংরাজী ব্যাকরণ পড়িবার সময় একবচনান্ত শব্দগুলিকে বহুবচনে পারবর্তন করিবার নিয়মগুলি মুখস্থ করিতে কাহাকে বেগ পাইতে না হইয়াছে? ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী হইতে প্রবেশিবার দ্বার পর্যন্ত পৌছিতে বচন সম্বন্ধীয় জটিল নিয়মগুলি বিকটমূর্তি দ্বারবানের আয় শিশুহৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বান্ধলা ব্যাকরণগুলি কিন্তু বাঙ্গলার প্রতি বড়ই সদয়। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, সকল প্রকার বান্ধলা ব্যাকরণেই বচন-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী দ্বারা ভারগ্রস্ত নহে। “বস্তু বা ব্যক্তির সংখ্যাকে বচন বলে, এক বচন দ্বারা এক সংখ্যা, এবং বহুবচন দ্বারা দুই অবাধি বহু সংখ্যার বোধ হয়”। বচন সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কোন কথা প্রায় কোন ব্যাকরণেই দৃষ্ট হয় না। শব্দের পর কোন কোন বিভক্তি যোগ করিয়া একবচনান্ত পদকে বহুবচনান্ত করা যায়, তাহা নিরূপণের ভার প্রায় সমস্ত বান্ধলা ব্যাকরণকারই শিক্ষার্থীর উপর প্রদান করিয়া নিশ্চিত্ত রাখিয়াছেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বচন-বৈচিত্র্য ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা আমাদের বান্ধলা ভাষাতে কোন অংশেই কম নহে, বরং বেশী। এই বিচিত্রতার সহিত আমরা শিশুকাল হইতেই এরূপভাবে অভ্যস্ত হইতে থাকি যে ইহা আমাদের নিকট অদৃষ্ট হইয়া যায় না। জননীর স্নেহ-সম্ভাষণ, ভ্রাতৃ-ভাগিনীদের মধুর আশ্বাস, স্নহদ্বর্গের সহিত কথোপকথন প্রভৃতি, মাতৃভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে আশৈশব সহায়তা কারয়া আসিতেছে; সুতরাং উল্লিখিত বিচিত্রতা সত্ত্বেও বান্ধলা ভাষাতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। জন্ম-ভূমির আয় ভাষা-জননীও আপনি ধরা দিয়া থাকেন, শিক্ষকের

অপেক্ষা রাখেন না। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাকরণ অসম্পূর্ণ থাকা উচিত নহে।

প্রায় অধিকাংশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে প্রথমা বিভক্তি যুক্ত এক বচনের চিহ্ন “অ” বলিয়া নির্দেশ করিয়া রাখেন; কিন্তু সমুদয় শব্দের পরিস্ফুট “অ” বিভক্তি লোপ হয়, অধিকাংশ ব্যাকরণে এই স্বত্রটী না থাকায় ভিন্ন দেশীয় শিক্ষার্থীগণকে বিশেষ গোলে পড়িতে হয়। সকলেই জানেন কেবল আকারান্ত শব্দ সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটে, অগ্রত্ব নহে, যেমন “হরি যাইতেছে” বলিতে “হরি-অ যাইতেছে” বলা চলে না! কোন কোন ব্যাকরণে প্রথমা বিভক্তিতে • শব্দ অর্থাৎ কোন চিহ্ন নাই বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কথা-ভাষাতে বঙ্গ-দেশের কোন কোন স্থানে ইহার প্রতিক্রম হইলেও লিখিত ভাষা সম্বন্ধে এনিয়ম অনেকটা মানিয়া লওয়া যায়। কিন্তু বহুবচনের চিহ্ন কেবল “রা” বা “দিগেরা” বলিয়াই যে সকল বাঙ্গালা ব্যাকরণ লেখক নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে কখনই শিক্ষার্থীদের প্রকৃত দৃষ্টান্ত বলা যায় না। নিম্নলিখিত কয়েকটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে যে অধিকাংশ স্থলেই এ নিয়মটী সম্পূর্ণরূপে খাটে না। The boys are playing এই বাক্যটির বাঙ্গালা করিতে যদি কোন ইংরাজ বাঙ্গালা ব্যাকরণ অনুযায়ী ‘বালকেরা খেলিতেছে’ লেখেন, স্বয়ং বৈয়াকরণিকও তাহাকে মার্জনা করেন না। অথচ আকারান্ত শব্দ যে বহু বচনে একারান্ত হইয়া যায় অনেকই ব্যাকরণে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক নহে করেন নাই। আবার বহুবচনে প্রথমা বিভক্তিতে “দিগেরা” এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ কি কেহ কখনও লিখিয়াছেন? বালক-দিগেরা এই রূপ লিখিলে পরীক্ষকদিগেরা তাহাদিগকে কখনই নম্বর দিবেন না। সুতরাং ব্যাকরণে প্রথমা বিভক্তির বহু বচনে “দিগেরা” প্রত্যয়ের উল্লেখ না করা হইতাল। কিন্তু আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব এক বচনে প্রথমা বিভক্তির কোন চিহ্ন নাই বহুবচনে ‘রা’ বা ‘এরা’ হয়, অনেক স্থলেই এনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটয়া থাকে।

The boy is reading ইহার অনুবাদ যদি ‘এ বালক পড়িতেছে’ বা ‘বালক পড়িতেছে’ করা যায় তাহা হইলে কোনটাই ঠাট্টা বাঙ্গালা হয় না। এস্থলে বালক শব্দের পরে ‘টা’ এই প্রত্যয়টির যোগ করিয়া বলিতে হইবে ‘বালকটা পড়িতেছে’। এই ‘টা’ই আবার ‘টা’ রূপ ধারণ করিয়া শব্দের পশ্চাতে, কখনও ২ বা আগেও, বসিয়া থাকে। কিন্তু এই রূপান্তরের মধ্যে কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই ‘টা’ কোন স্থানে ‘টা’ হয় তাহার একটা নিয়ম বাহির করা যায়।

সহানুভূতি, প্রশংসা প্রভৃতি বুঝাইতে হইলে প্রায়শঃ একবচনান্ত ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের পরে ‘টা’ প্রত্যয় বসিয়া থাকে, যেমন, ছেলেটা বেশ শান্ত, মেয়েটা শুনেছি বেশ লেখা পড়া জানে। তেমনই অবজ্ঞা বুঝাইতে ‘টা’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন, লোকটা বড় পাণ্ডী। এই টা-ই আবার কলিকাতা অঞ্চলে চেহারার বদলাইয়া ‘একটা’ ‘দুটো’ এবং তিনটে হইয়া পড়ে। এস্থলে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। সংস্কৃতে ‘নমস্’ শব্দটী যেমন কখনও ২ বিজ্ঞপ এবং অবজ্ঞা বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে টা-ও কখনও সেই রূপ অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন “লোকটা কিন্তু কম নন, বজ্ঞাতের হাঁড়ী” সেইরূপ আবার প্রশংসা বুঝাইতেও কখনও ‘টা’ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন, ‘লোকটা তেজীয়ান বটে’ এই সকল দৃষ্টান্তদ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম বাঙ্গালা ব্যাকরণে প্রথমা বিভক্তির যুক্ত একবচনান্ত শব্দের পরে যে কোন চিহ্ন নাই সর্বত্র ইহা ঠিক নহে, ইংরাজীতে যেরূপ article ব্যবহার করিতে হয় বাঙ্গালাতেও সেইরূপ টা, টা, প্রভৃতি বিভক্তির ব্যবহার নিত্য আবশ্যক। এবং এসম্বন্ধে ইংরাজীর সহিত বাঙ্গালার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজীতে যেমন Proper noun এর আগে article বসে না, বাঙ্গালাতেও সেইরূপ নাম বাচক বিশেষ্যের পরে টা, টা প্রভৃতি বসেনা। The Ram is going বলা যে রূপ ভুল ‘রামটা যাইতে’ বলাও তেমনই ভুল। টা, টা প্রভৃতি প্রত্যয় বহুবচনের সঙ্গে বসিয়া

থাকে; কিন্তু সেস্থলে উহার শব্দের আগে বসে কখনও পরে বসে না। যেমন ‘দুইটা বালক’ হয় কিন্তু ‘দুই বালকটা’ হয় না। এস্থলে টী যেন সংখ্যা বাচক শব্দের আঁচল ধরা, কদাপি উহাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহে না; এই সংখ্যা-বাচক শব্দই আবার যখন মূল বিশেষ্যের পরে বসে তখন টীরও তাহার পরে বসিতে কোন আপত্তি দেখা যায় না। যেমন, ‘বালক দুইটা’। খানি, খানা, গাছি, গাছা প্রভৃতি-জাত টী ও টার আরও কতকগুলি প্রতিবন্দী আছে। ইহার আত্মশেষ হীন, মনুষ্য দূরের কথা সজীব পদার্থের সহিতও ইহাদের বসিবার অধিকার নাই। তথাপি নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ছাত্র আপন সমাজে ইহাদের প্রতিপত্তি আছে, এমনকি অনেক স্থলে টী ও টা-রও কলিকা পাইবার জো নাই। তবে ইহার কতকটা উচ্চবংশজ বলিয়া খানা, খানি, বা গাছি প্রভৃতির সভায় যাইতে পারে বটে; কিন্তু সেস্থলে মূর্খের সভায় পণ্ডিতের ছাত্র তাহাদের মূল্য কেহই বড় একটা বুঝিতে পারে না; বরং অনেক স্থলে কতকটা হীন হইয়াই থাকিতে হয়। আমরা বলিয়া থাকি ‘বইখানা তুলিয়া রাখ’ অহা! বইটা ফেলে দিলে বলিলেও এস্থলে টার বিশেষ প্রতিপত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু ‘টা’ উদার প্রকৃতির ব্রাহ্মণের মত কোট, সার্ট প্রভৃতি বিলাত ফেরৎ দিগকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু গাছি এবং খানি বা খানার মধ্যে প্রতিবন্দীতা খুবই বেশী; যেখানে গাছি বসে সেখানে খানির ব্যবহার কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়; আমরা হতোগাছি বলি কিন্তু হতো খানা বলি না; আবার খালা খানা বলিয়া থাকি; কিন্তু খানা, গাছি কখনও বলি না; কিন্তু খটিটা বাটিটা বলিয়া থাকি। খটি খান, বাটি খানা কখনও বলি না। সুতরাং দেখা যায় অচেতন পদার্থের মধ্যে যে সকল বস্তু কঠিন এবং নিরেট তাহাদের সঙ্গে টী বা টা বসে; যেমন, গাছটা, ঘড়ীটা, কলমটা, ইত্যাদি আবার পাতলা, বিস্তৃত এবং কঠিন পদার্থের সঙ্গে খানা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, দড়ী গাছি, হতোগাছি ইত্যাদি। কাপড় হস্তাধারা নির্মিত হইলেও সম্ভবতঃ বিস্তার বেশী

বলিয়া তাহার পরে খানা বসিয়া থাকে। অতএব দেখা-গেল টী, টা, খানি, গাছা, প্রধানতঃ এই চারিটা প্রত্যয় বিশেষ্য পদের পরে বসিয়া একবচন বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু সংখ্যা বাচক শব্দের পরে বসিয়া ইহার বহুবচনও প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল চিহ্ন ব্যতিরেকেও এক বচনের বোধ হইয়া থাকে, যেমন, চোর ধরা পড়িয়াছে; শিশু ফরিং ধরিয়াছে। কিন্তু এস্থলে চোর এবং শিশু, চোরটা বা শিশুটীদ্বারা বক্তার যে মনো-ভাব বুঝাইত তাহা বুঝায় না, ইহা সহজেই অনুমেয়।

সংখ্যা বাচক শব্দের দ্বারা মনুষ্য বোধক শব্দের এক বচন ও বহু বচন করিতে হইলে সংখ্যা বাচক শব্দের শেষে ‘টা’ অথবা ‘জন’ দিতেই হইবে। যেমন পাঁচটা বালক বা পাঁচজন বালক; পাঁচ বালক এরূপ কখনও হয় না; পাঁচ ভ্রাতা, তিন পুত্র এরূপ প্রয়োগ সচরাচর দেখা গেলেও এইরূপ প্রয়োগ বিশেষ বিশেষ স্থলে সীমাবদ্ধ। সংখ্যা বাচক শব্দের পরে ‘টা’ ‘টা’ বা ‘জন’ এবং উভয় প্রত্যয় ব্যবহৃত হইলেও উহার অর্থ সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। আমরা ৬০ জন মানুষ বলি এবং ৬০টা মানুষও বলিয়া থাকি; কিন্তু এস্থলে টী যেন এই অর্থ জ্ঞাপন করে যে সে এই সংখ্যা প্রচুর নহে এবং এই জগৎ বহুত্ব জ্ঞাপক শব্দের পরে টী প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না; হইলেও তদ্বারা বহুত্ব কতকটা ধর্মীকৃত হইয়া থাকে। সংখ্যা বাচক শব্দের পরে ‘জন’ শব্দটির প্রয়োগ হইলেও ‘শত’ শব্দের পরে উহার প্রয়োগ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন, পাঁচশত জন লোক, না বলিয়া পাঁচশত লোকই বলা হয়। কিন্তু শতের পরে শতের নিম্নস্থ কোন সংখ্যা থাকিলে তাহার পরে ‘জন’ ব্যবহার করিতে হয়। যেমন, পাঁচশত কুড়িজন লোক। বহুত্ব বুঝাইলেও কখন কখন ‘টার’ ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন, “হাজারটা টাকা গণিয়া দিয়াছি”; ইহার দ্বারা বুঝা যায়, বক্তা যাহার নিকট বলিতেছেন তিনি যেন টাকার পরিমাণকে কম মনে করিয়াছিলেন। কখন কখন বিশেষণ শব্দের বিরুদ্ধি করিয়া বহুত্ব জ্ঞাপন করা হইয়া

থাকে ; যেমন বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে । পূর্বে বলা হইয়াছে কোন চিত্র ব্যতিরেকেও এক বচনের বোধ হইয়া থাকে ; যেমন, শিশু ফড়িং ধরিতেছে সেই রূপ কখন কখন বহুবচনের চিত্র যুক্ত না হইয়াও বহুত্ব জ্ঞাপন করিতে পারে ; যেমন, সে দেবতা ব্রাহ্মণকে ভক্তি করে না । কিন্তু এস্থলে ইংরেজীতে Man is mortal বলিতে যেমন মানব জাতিকেই বুঝায়, কোন নির্দিষ্ট সংখ্যাকে বুঝায় না, সেইরূপ দেবতা এবং ব্রাহ্মণ শব্দ দুইটির দ্বারা সমস্ত জাতিকে বুঝাইতেছে । অত্যাধ ভাষাতে বহুত্ব জ্ঞাপক বিশেষণের সঙ্গে থাকিলেও মূল বিশেষ্য পদে বহু বচনের চিত্রযুক্ত হইয়া থাকে ; যেমন ইংরেজীতে Five boys, সংস্কৃতে পঞ্চ বালকঃ ইত্যাদি । কিন্তু বাঙ্গলাতে পূর্বেবহুত্ব-বোধক বিশেষণ থাকিলে মূল পদটিকে বহুবচনান্ত করিতে হয় না । ‘পাঁচজন বালক’ ব্যবহৃত হয় কিন্তু পাঁচজন বালকেরা এইরূপ হয় না । বাঙ্গলা ভাষার বহুবচনবোধক ‘রা’ বিভক্তিটির একাধিপত্য দৃষ্ট হইলেও সকল সমাজের সহিত ইনি মেশেন না । কোলীজ মর্যাদা বশতঃই হউক, কি যে কারণেই হউক, অপ্রাণী বাচক শব্দের পরে কখনও ‘রা’ ব্যবহৃত হয় না ; যেমন, ‘নৌকারা নদীতে ভাসিতেছে’ এইরূপ প্রয়োগ কখনও হয় না । এস্থলে সকল, গুলি, গণ, সমূহ প্রভৃতি বহুত্ব বোধক শব্দ যোগ করিয়া বহু বচন করিতে হয় । ইহাদের মধ্যে ‘সকল’ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে কখন শব্দের আগে ও কখন পরেও বসে । যেমন, প্রাণী সকল রাত্রিতে নিদ্রা যায়, নৌকা সকল ঘাটে বাধা রহিয়াছে । এস্থলে ‘সকল’ শব্দ ‘রা’র পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে । আবার ‘সকল প্রাণীই’ মরিবে, সকল নৌকাই খালি’, এরূপ ও বলা যায় ; কিন্তু এখানে ‘সকল’ শব্দের অর্থ রা নহে । কিন্তু গণ গুলি, প্রভৃতি শব্দ, শব্দের পরেই বসে কদাচ আগে বাসে না । ইহাদের মধ্যে গুলি শব্দটি প্রায়ই ভুজার্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যেমন, ছেলেগুলি বড় দুষ্ট আবার কখন কখন সহানুভূতি বুঝাইতেও গুলির প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা, আহা ! মানুষগুলির দুর্দশা দেখিলে প্রাণ

কাঁদিয়া ওঠে । কখন কখন বা ইহা চেহারা বদলাইয়া ‘গুলি’ রূপ ধারণ করে যেমন,

কে বলে শারদ শশী সে সুখের ডুলা ।

পদ নখে পরে তার আছে কত গুলা ॥

কলিকাতা অঞ্চলে এই গুলাই আবার ‘গুলো’ হয় ; যেমন, “বই গুলো নিয়ে এস হে” ।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বহুত্ব জ্ঞাপক ‘গণ’ বিভক্তির ব্যবহারেও অনেক বৈচিত্র্য লক্ষিত হইবে । এই বিভক্তিটি প্রায়ই মনুষ্য বাচক শব্দের পরে ব্যবহৃত হয় ; যেমন, বালকগণ, ব্রাহ্মণগণ ইত্যাদি । ইতর প্রাণীর জাতিবাচক শব্দের পরে ‘গণ’ বিভক্তির ব্যবহার হইলেও কোন বিশেষ শ্রেণীর পরে ইহা বসে না ; যেমন পশুগণ, পক্ষিগণ এরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু গরুগণ, মহিষগণ হয় না । অকারান্ত শব্দের পরে ‘গণ’ বসাইতে হইলে মূল শব্দটির পরেই উহা বসাইতে হয় ; প্রথমা বিভক্তি যুক্ত করিয়া বসান ব্যাকরণ সম্মত নহে । যেমন ‘ভ্রাতৃগণ’ ইহাই বিশুদ্ধ প্রয়োগ ; ভ্রাতাগণ নহে । রাজা শব্দের পর গণ ব্যবহার করিতে হইলে রাজা শব্দটি অকারান্ত হইয়া যায় ; যেমন, রাজগণ । অপ্রাণীবাচক শব্দের পর কদাচ ‘গণ’ বসে না ; যেমন, “পুস্তকগণ” ‘নৌকাগণ’ এরূপ প্রয়োগ কখনও হয় না । ‘সকল’ শব্দের বদলে অনেক স্থলে ‘সবশব্দের’ প্রয়োগ হইয়া থাকে । কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত সচরাচর পাওই দৃষ্ট হয় । যেমন “পাখীসব করে রব রাত্তি পোহাইল” । ইংরেজীতে যেমন The এই article টীর যোগে বিশেষণ শব্দ বহুবচনান্ত বিশেষ্য পদের ভাষ্য ব্যবহৃত হয়, যেমন, The rich are happy, সেইরূপ বাঙ্গলাতেও বিশেষণ শব্দ বহুবচনান্ত বোধক রা বিভক্তির যোগে বহুবচনান্ত বিশেষ্যের ভাষ্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যেমন ধনীরা সুখী । সকল এবং সব প্রভৃতি বহুবচনবোধক বিশেষণের পরে আর ‘রা’ বসাইবার প্রয়োজন হয় না ; যেমন, সকলেই মরিবে এরূপ বলা যায়, কিন্তু সকলেরাই মরিবে, এরূপ প্রয়োগ হয় না ।

“ফেরে দূরে মণ্ড সবে উৎসব কোতুকে ।”

(যেমনাদ বধ)

এই স্থলে ‘সবে’ শব্দটি বহুবচনাত্মক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সমুদয়, সমূহ প্রভৃতি শব্দ অনেক সময় ‘সকল’ শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন শীতকালে নদী সমুদয় শুকাইয়া যায়। কখন কখন শ্রেণী শব্দটিকেও সকলের অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; যেমন, “এই যে বিটপী শ্রেণী হেরি সারি সারি” (সম্ভাবনাত্মক)। অনেক সময় বর্ণ শব্দটি বহুবচনের চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন, তাহার জাতিবর্ণ তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। বহুবচনের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাইতে হয়, ত্রয়, চতুষ্টয়, পঞ্চক, ষষ্ঠ, সপ্তক, অষ্টক প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন ত্রাতৃদয়, পুস্তকত্রয়, ত্রাঙ্গণ চতুষ্টয়, প্রবন্ধাষ্টক, ইত্যাদি।

বচন বৈচিত্র্যের এইরূপ আরও বহুসংখ্যক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা গেল না। প্রবন্ধটি যে সর্বতোভাবে ভ্রম-প্রমাদ-পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। আমার বক্তব্যগুলি সকল স্থানে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি নাই। আশা করি, বক্তব্যের সুযোগ্য সম্মানগণ বক্তব্যের একখানি সম্পূর্ণ ব্যাকরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষার উন্নতি-সাধনে যত্নবান হইবেন। ব্যাকরণের এক একটা সামান্য বিষয়েও যে বহু আলোচনা এবং গবেষণার অবসর রহিয়াছে বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই কিয়ৎ পরিমাণে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি; কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। হয় ত বিষয়ের গুরুত্ব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি! কিন্তু অল্প বুদ্ধি মজুর কর্তিত বহু বুদ্ধি স্নিগ্ধ স্বত্বের হস্তে পতিত হইয়া স্নানুগৃহসম্বন্ধায় পরিণত হয়, তাই সুধাজন-সমক্ষে বাঙ্গলা বচন সম্বন্ধে আমার সামান্য মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

ত্রিনিশিকান্ত বিশ্বাস।

মা

মায়ের—

পায়ে অলঙ্কার—লঙ্কার কমল
ফেনিল মুকুতা ঝলে বল মল
সুনীল মেথলা—বিস্ময়-নীলাচল

শোভিছে ধরে

যুগ্ম কোহিনূর, কিরীট-চূড়ায়
হিমাদ্রি যাহার কুন্তল উড়ায়
শ্রান্ত তরু যার মলয় জুড়ায়

বীজন করে’

অমৃত ক্ষরিছে মর্মে মর্মে
গোদাবরী-গঙ্গা-কাবেরী-মর্মে
প্রাণী পশ্চিমে—করাচী ব্রহ্মে

অঞ্চল উড়ে

আশ্রম মোদিত হোম গন্ধে
অরণ্য রণিত সামছন্দে
চারণভঙ্গ চরণ বন্দে

গুঞ্জন করে।

শ্রীকুলচন্দ্র দে

ভিখারীর দান

সে বৎসর আমি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার জন্ত একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলাম। কলির এ রাজস্বয় যজ্ঞে ভালরকম “ভাষ্য” করিবার জন্ত, আমি পূজার কিছু পূর্ব হইতেই আমাদের জেলা সহরে বাস করিতেছিলাম। “পরিবার” কলিকাতাতেই ছিলেন। কারণ দেশের আবহাওয়া তাঁর তত সহ্য হয় না। সহরের একপ্রান্তে আমার নিজের একখানা একতলাবাড়ী। সম্মুখে বিস্তৃত বাগান। বাড়ীতে সর্বদা বাস করা হয় না বলিয়া তখন আমার বাগানে ফুল অপেক্ষা গাছের, এবং

গাছ অপেক্ষা আগাছাই বাহার ঢের বেশী ছিল। কি উপায়ে মফঃস্বল বড় বড় মক্কেলগুলিকে পাকড়াইয়া ভোট সংগ্রহ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে একটা সম্পরামর্শ করিবার জন্ত গুটী দুই তিন উকীল বন্ধু লইয়া সেদিন একটা মজলিশ বসাইয়াছিলাম।

আমরা কখনই আমার বাড়ীর সম্মুখস্থিত উজানেই চেয়ার ফেলিয়া বসিয়া কথাবার্তা চালাইতেছিলাম। তখন ভাদ্র শেষ হইয়া গিয়া সবে সোনালি আশ্বিন পড়িয়াছে। অপরাহ্ন কাল, স্বর্ষ্য অস্ত গিয়াছে বটে, কিন্তু পশ্চিমের নীল আকাশে তখনো একখানি স্মধুর গোলাপী রেশ মাথানো। তেমন রঙীণ আকাশে আর কোনও ঋতুতে বড় দেখা যায় না। সুন্দর বাঙ্গলার জন্মের বাহিত-মিলনের প্রকল্পতার লাল আলো লাগিয়াই বুঝি এ সময়ে বাঙ্গলার আকাশ এমন স্বপ্নময় হইয়া উঠে!

বাগানের একধারের বাতাপী কুঞ্জের দিক হইতে একটা অল্পমধুর রকমের মাদক সৌরভ নীহারসিক্ত বাতাসে পথহারার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। গাছে হেলানো ডালটীর উপর একটা কোকিল বুঝি তার সঙ্গিনীর অপেক্ষায় বসিয়াছিল। কিন্তু আজ আর তার কুহবরে সে রাগিণীর ঝঙ্কার ছিল না; কারণ সে যে বসন্তের কোকিল, শরতের তো সে আর কেহ নয়!

এমন শরতের সন্ধ্যায় বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্রামল তরুলতা বেষ্টিত পল্লীজননীর ছায়াঢাকা মেহমাখা কোমল আনন্দ ভরা কোলটীর কথাই মনে পড়ে। তখন আর কায় ভাল লাগে না। কেবল আপিস আদালত, ইন্সল কলেজের জন্ত নয়, শরৎ কালটা যেন সকলেরই পূজার ছুটি! তাই আমাদের বৈঠকটায় আজ কায়ের কথা জমিয়া উঠিতে চাহিল না! এমন সময় রাত্তার দিক হইতে একটা গানের সুর, বাতাপি লেবুর ফুলের গন্ধের সহিত জড়িত হইয়া, মুহূর্ত্তে পবনের হিল্লোলে হিল্লোলে ভাসিয়া আসিয়া আমাদের রাজনীতির উত্তেজনা একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিল।

নৌকমল বাবু অদ্ভুতমনস্কভাবে হাতের আলবোলের

নলটা নিঃশব্দে ঘাসের উপর ফেলিয়া দিয়া একেবারে চুপ করিয়া গেলেন। বিধু বাবু হাতের কাছে আর কিছুই লাগিল না পাইয়া চেয়ারের হাতাটার উপরেই তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমি কবি গেটের মত দুই চোখ মুদয়া কান দিয়া সে সুরের সরবত পান করিতে লাগিলাম। চারু বাবু তো একেবারে হিপনটাইজড সম্পূর্ণ বাহুজ্ঞানশূন্য।

এমনি আশ্চর্য্য সে গান! সারং যখন ঋদে নামিয়া ঠিক পুরুষের কণ্ঠস্বরের অনুরোধে রাগিণীর আলাপ জুড়িয়া দিল, তখন একটা পুরুষ তাতে তার আপন ভাব-বিহ্বল হৃদয় ঢালিয়া দিয়া, একটা পুরাকালের রসাল পদ্য-বলী পল্লবিত করিয়া তুলিল। আর যেই রাগিণী এক সুরের দোড়ে সারঙ্গের উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়া সুধারষ্টি আরম্ভ করিয়া দিল, অমনি নারীকণ্ঠ-বিনিম্বত একখানি সাধা কোমল সুর তাতে একখানি ভাবের ঝালর গাঁথিয়া দিয়া সে শরদ সন্ধ্যার শোভার সহিত একখানি অনির্লচনীয় করুণতা মাখাইয়া দিল! জী গাহিল:—“তুয়া অমুরাগে হাম কাননে ধাই”, অমনি পুরুষ-কণ্ঠ গানে ধবাব দিল:—“তুয়া অমুরাগে হাম ধবলী চরাই।” এই ভাবে জী-পুরুষে গাহিতে লাগিল:—

জী। তুয়া অমুরাগে হাম পরি নীলসাড়ী

পুরুষ। তুয়া অমুরাগে হাম পীতাম্বর ধারী!

জী। তুয়া অমুরাগে হাম হৈলু কলঙ্কিনী—

পুরুষ। তুয়া অমুরাগে নন্দের বাধা রৈলু আমি।

জী। তুয়া অমুরাগে হাম তুলাময় দেখি

পুরুষ। তুয়া অমুরাগে মোর বাক্য হৈল আঁধি।

এ কোন চিরন্তন শুকসারীর অপক্লপ প্রেম-নিবেদন!

এ কোন স্বপ্ন-জগতের আদম প্রেমিক-প্রেমিকার অনাদি অনন্তের সুরে বাধা মুহূর্ত্ত জন-ধ্বনি! আবেশে আমার দুই মুদ্রিত চোখ দিয়া দুটা আনন্দের ধারা বহিয়া আসিতে চাহিল;—আমি বসন্ত-জড়িত কণ্ঠে আমার খানসামাকে ডাকিয়া বলিলাম:—ওরে ডাক, ডাক, দেখি কারা ঘায়

অক্টোবর ১৩১১

এমন গান গেয়ে! ডেকে নিয়ে আয় তাদের এখানে :—
আমি তাদের গান শুনবো!”

মিনিট দশ পরে নটো খানসামা এক বৈষ্ণব ভিক্ষুক আর তার সহচরীকে আমার সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল। পুরুষটি কিছু কালো, প্রকৃতিটা যেন কিছু গম্ভীর, চেহারাটাও একটু মোটামোটা রকমের! বড় বড় লম্বা লম্বা চোখ দুটিতে কেমন একটা উদাস ভাব; দেখিয়া মনে হয় তাদের দৃষ্টি যেন পৃথিবীর সুখহৃৎখের চঞ্চলতার উর্দ্ধ স্থিত শান্ত আনন্দের আভাষ পাইয়াছে। লম্বা লম্বা কৃষ্ণিত কেশের রাশি কাঁধের দিকে আসিয়া নামিয়া পড়িয়াছে। বয়স চল্লিশের উপরে নয়।

তার সঙ্গিনীর বয়স ত্রিশের নীচে হইবে। স্ত্রীলোকটির বর্ণে একসময়ে উজ্জলতা ছিল, দেহলতায় একদিন যৌবন-প্রীতি ছিল এখন, মরুভূমির হাওয়া লাগিয়া সে নিকুঞ্জ শুকাইয়া গিয়াছে। এক যৌবন ছিল নীলোৎপলের মতো তার দুটি করুণ নয়নে! সে কি চক্ষু—না প্রেমের সুধা-প্রস্রবণ?

পুরুষের হাতে সারং, নারীর হাতে মন্দিরা। পুরুষের পিঠে একটা ভিক্ষার ঝুলি, স্ত্রীলোকটির হাতে কমণ্ডলু। পুরুষের পরণে ছিন্ন গেরুয়া বসন, স্ত্রীলোকের পরণে মলিন নীলাবরী। তেমন সঙ্কায়, তাদের দেখিয়া কে বলিবে তারা শুধু ভিক্ষারী-ভিক্ষারিণী! আমার মনে হইল, আজ বুঝি বা ভিক্ষারী শিব, মা পার্শ্বতীকে ভিক্ষারিণীর বেশে সাজাইয়া সখ করিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন!

তারা দুজনে যখন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখন ধূসর সন্ধ্যা মিলাইয়া গিয়াছে। সে দিন কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। আকাশে ঠান্ড ছিল না। কিন্তু আকাশের অনন্ত নীলিমা একেবারে ভারায় তারায় ভরিয়া গিয়াছে—কোথাও একটু ফাঁক ছিল না। চারিদিক অন্ধকার কেবল আমার নীল বাগানখানি অসংখ্য তারকাগুলির মূহু দৃষ্টিধারায় নিতান্ত পাণ্ডুর দেখাইতেছিল। আমি মেয়েটির দিকে চাহিয়া সন্দেহে বলিলাম—

“তোমাকেও ভিক্ষা কত্তে রাত্তায় বেরুতে হয়েছে, বাছা?”

আমার অগোচরে আমার সে স্নেহভরা প্রশ্নের ভিতর বোধ হয় কোথাও একটা নিষ্ঠুরতার শেল লুকান ছিল—নচেৎ আমার প্রশ্নের তার চোখে জল আসিল কেন? সে কি চোখের জল,—মূহু নক্ষত্রালোকে তো তা স্বধাবিন্দুর মতই দেখাইতেছিল। তার পর সে নীরবে, জলভরা-চোখে তার সঙ্গী পুরুষটির পানে চাহিল। তাদের চোখে চোখে যে ভাষায় কথা হইল, আমি তার কি বুঝিব? নিজে হৃৎখী না হইলে কি কেউ কখনো চোখের ভাষায় মর্শ্বের কথা বুঝিতে পারে! আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম স্ত্রীলোক-টিকে, কিন্তু উত্তর করিল পুরুষটি। সে বলিল—

“আমরা ঠিক ভিক্ষুক নই, মহাশয়! আমরা কৃষ্ণনামের উদাসিন-উদাসিনী।”

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—“কৃষ্ণনামের উদাসিন-উদাসিনী! কিন্তু আর সে বৃন্দাবন কোথায়, চৈতন্যের সে নদীয়া কোথায় সে কৃষ্ণনামের মহিমাই বা কেথায়?” প্রতিধ্বনি কাঁদিয়া বলিল, কোথায়?

তখন স্ত্রীলোকটি ধীরে ধীরে সরিয়া আসিয়া তার স্বামীর আড়ালকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইল। সে যেন অতগুলি বিস্মারিত চোখের কৌতূহল-দৃষ্টি সহিতে পড়িতেছিল না। সে লাজের একখানা কোমল অন্তঃপুরে আপনাকে লুকাইবার জঙ্ঘ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল।

এবার মনে হইতে কাব্যের নেশাটা একটু কাটাওয়া দিয়া মুকুন্দরায়না সুরে বলিলাম, “এক যায়গায় বসে স্বামীসঙ্গে খেটে খাও না কেন তোমরা খেটেখেলে কি আর মুখে কৃষ্ণনামের রোস থাকে না?”

নীলকমল বাবু নলটায় হঠাৎ শুড়ু করিয়া দিয়া বলিলেন, “সে আবার বলতে! আমাদের দেশের লোকের আত্মসম্মান একেবারে গিয়েছে কিনা!”

নীলকমল বাবু জলদগম্ভীর আওয়াজ দিতেই মেয়েটি আরো একটু স্বামীর দিকে-ঘেসিয়া দাঁড়াইল। পুরুষটি চোখ নত করিয়া আরম্ভ মুখে বলিল, “সে অনেক কথা, মহাশয় আমাদের এমনি পোড়া কপাল যে আমাদের কোথাও খেটে খাবারও যো নেই!”

আমি বলিলাম, “এতো লজ্জার কথাও বটে; এমন সমর্থ জী নিরে রাস্তায় ভিক্ষা করে ফেরা!”

মেয়েটা এবার আরো সঙ্কুচিত হইয়া পুরুষটির দিকে ছায়ার মতন সরিয়া আসিল। পুরুষটি বলিল, এক সেই লজ্জা-নিবারণ ভরসা আর কি? তিনি তো জ্যোপদীর লজ্জাও রেখেছিলেন!”

কি বেদনা-কম্পিত কোমল কণ্ঠস্বর! সে কথায় কত নির্ভর! কি ভক্তির উচ্ছ্বাস! সে কথার সুরে আমার উদ্ধত কথাগুলির ফণা একেবারে পড়িয়া গেল। আমি আবার উদাসভাবে বলিলাম, “আর কথায় কাষ নেই, দু জনে এবার একটা গান গাও।”

বিধু বাবু ফরমাশ করিলেন, “ঐ গানটা একবার গাও দিকিন্, আমার ধরম করম সকলি গেল মন—গিরীশ ঘোষের গানটা—আরে ঠিয়েটারী গানটা, বাকী পদটুকু মনে আসচে না!”

নীলকমল বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, “না না, একটা গ্রামোফোনের গান জান তো গাও, ও সব বাজে গান আমার ভাল লাগে না।”

চারু বাবু তেজের সহিত হুকার করিয়া বলিলেন, “ওরা এ সব গান জানবে কেমন করে! না হে, তোমর ‘শ্রীমতীর মান’ গাও একটা।”

আদালতে বিধু বাবু চিরকালই চারু বাবুর বিপক্ষে দাঁড়ান, তাই চারু বাবুর ফরমাস বাতিল করিয়া দিয়া “তিনি বলিলেন, আরে না, না, সন্ধ্যাবেলা, পূর্নরাগটাই জমবে ভালো।”

পুরুষটি তখন বিনয়নম্র স্বরে বলিল, “আমাদের তেমন বেশী জানাশুনো নেই, যাও হু চারটা জানি, সেগুলিও বেশীর ভাগ হুংখের গান—”

আমি ভাব-জড়িত কণ্ঠে বলিলাম, “না ভায়ারা, অত ফরমাশ করে দরকার নেই, ওরা যেটা জানে, সেটাই গা'ক না! ওদের সব গেছে, গান গাওয়ার স্বাধীনতা টুকুও লোপ করে না।”

পুরুষটি শিশিরজাল-জড়িত সবুজ ঘাসের উপর বসিয়া,

স্বপ্ন-মণ্ডিত বিহ্বল চোখে আকাশের নক্ষত্র-পুঞ্জের পানে তাকাইয়া সারঙ্গধানিকে বিচিত্র গানের সুরে মণ্ডিত করিয়া তুলিল! জীলোকটা একটু সরিয়া একটা পাতা-বাহারের গাছকে আক্র করিয়া তার পিছন হইতে মন্দিরার মধুর ধ্বনি, করিয়া রাগিণীর তালে তালে রজত-পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল! আকাশভরা তারাগুলি যেন সে গান শুনিয়া অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল, আমার বাগান-ধানি সে গানে যেন বারবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এবার তারা দু জনে সমস্বরে গাহিল—

গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ কবো না!

ও দুটি চরণ, বিনা আমার মন, অত কিছু আর জানে না; তপন তনয় আমায় মন্দ কর, কি দোষে তা ত জানি না।

ভবানী বলিয়ে, ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা অকূল পাথারে ডুবাবে আমারে স্বপনেও তা জানি না।

অহর্নিশি দুর্গা নামে ভাসি তবু হুংখরাশি গেল না

এবার যদি মরি ও হরসুন্দরী—তোর দুর্গা নাম আর কেউ লবে না!”

গানের শেষ ঝঙ্কারটি যখন ধামিয়া গেল, তার মুহূর্ত-খানি তখনো আমার হৃদয়ে অম্লরণিত হইতেছিল। আমি গান শুনিতেছিলাম, কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। শেষে সুরের চমক ভাঙ্গিলে পর, পকেট হইতে দুটি টাকা তুলিয়া পুরুষটির দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলাম,

“এই নাও তোমাদের বক্শিশ। ভারি খুসী হয়েছি তোমাদের গান শুনে। আরেকদিন এ দিকে এসো।”

পুরুষটি কুণ্ঠিত ভাবে তার হাতখানি সরাইয়া লইয়া অতি বিনয়নম্র স্বরে বলিল, “মাপ করুন—আপনি অতি সহৃদয় ব্যক্তি—কিন্তু দুটি গানের জন্য দুটাকা নিতে পারবো না! গুরুর নিষেধ! চার গুণা পরমা হলোই আমাদের দুজনের পক্ষে বখেট! তাই বা আমাদের ক জন দেয়।”

আমি অবাক হইয়া বলিলাম, “আমি তো খুসী হয়ে দিচ্ছি, নাও না!”

অক্টোবর ১৩১১

‘পুরুষটী হাতযোড় করিয়া বলিল, “মাপ করুন. মহারাজ হোম্ আপনি! কিন্তু ভগবান নিজে যা হতে আশাদের বঞ্চিত করেচেন, দয়া করে আপনি আর তাঁতে আমাদের আসক্তি বাড়িয়ে দিবেন না—”

অবশেষে আমাকে একটি সিকিই দিতে হইল। কিন্তু সিকিটা তুলিয়া দিতে আমার চোখে জল আসিতে চাহিল। কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম, “তবে আজ এখানেই রাত্রের জন্তে থেকো যাও, খাওয়া দাওয়া কর, কাল তোরে চলে যেয়ো এখন।”

পুরুষটী বলিল, ‘আপনি চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাকুন। কিন্তু আমাদের অত্থানি সুখ নিয়তি কখনো সহিবে না। আর এই ধোলা আকাশের নীচে আমাদের মত হতভাষা লোকের যাত্রাগার অভাবই বা কি?’

দরিলের অভিমান, নিঃশেষ আত্মমর্যাদা-জ্ঞানদেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম—আমার মুখে আর কথ ফুটিল না। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত কতক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যখন আমার স্বপ্ন ভাঙিল, তখনা দৈবিক সে আশ্চর্য্য নরনারী রাত্রির নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে রহস্যের মত কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

(২)

রাত্রি ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। তখন আমি পাঠের জন্ত নির্দিষ্ট কামরায় একখানি চেয়ারে বসিয়া দৈনিক খবরের কাগজটার উপর চোখ বুলাইতে চেষ্টা করিতে-ছিলাম। টেবিলের উপর ঝক্‌ঝকে সামাদানের মাঝে মোমবাতি জ্বলিতেছিল। কিন্তু আমার মন খবরের কাগজের উপরে ছিল না। শারদ সন্ধ্যার সে মধুর স্বপ্ন বেন আমার চোখে তখনো লাগিয়াই আছে।

এমন সময় চাকর দৌড়িয়া আমাকে খবর দিল যোগেশ আমার সঙ্গে এখনি দেখা করিতে চায়;—ভারি জরুরী কায়। এই যোগেশ আমার দুর্বসম্পর্কীয় জাতি। ভারি গরীব সে। তাই তাকে আমার অফিসেট সেক্রেটারীর অধীনে কর্মরতগিরিতে “খাহাল” করিয়া লইয়াছিলাম। যোগেশ লোকটা ভারি লাজুক,

নিতান্ত না চেকিলে সে আমার কাছেও বড় একটা ভিড়িত না। তবুও যোগেশের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত তখন মনে মনে কোনও প্রকার উত্তেজনা অনুভব করিলাম না। কারণ, সে সময়ে আমি যে দেশে বিচরণ করিতেছিলাম, সে দেশের রাজা ঐ ভিখারী আর রাণী সেই ভিখারিণী! সাত পাঁচ ভাবিয়া অবশেষে নিতান্ত নির্জীব ভাবে চাকরকে বলিলাম, “উপরে নিয়ে আয় তারে।”

কিছুক্ষণ পরে যোগেশ আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম তার মুখ অসম্ভব রকমের সাদা। আমি ভিজ্ঞাসা করিলাম—“হয়েছে কি. যোগেশ?”

“আপনাব বাইসিকেল খানা যদি একবার পাই—”

“এত রাতে বাইসিকেল দিয়ে কি হবে?”

“ডাক্তার আনতে, খুকীর কলেরা হয়েছে!”

আমি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, “নিয়ে যাও বাইসিকেল—ঐগ্গীর ডাক্তার নিয়ে এসো!”

যোগেশ বাহির হইয়া গেল। কিন্তু আমার আর খবরের কাগজ লইয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব বোধ হইল। এবার ভিখারী-ভিখারিণীর চিন্তার সাহিত যোগেশের মোমের পুতুলটির মত মেয়েটির কাঁচ মুখখানির ছবিটী আসিয়া জুটিল। তারা তিন জনে মিলিয়া আমাকে একে-বারে পাগল করিয়া দিল; কাগজ ফেলিয়া দিয়া দিয়া ক্রমালে খানিকটা ইউকেলিপটাস্ অয়েল ঢালিয়া চটি জুতা পায়েই আমি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

আমি নিজে নিঃসন্তান, তাই যোগেশের মেয়েটাকে বড় ভালবানিতাম। মেয়েটা আমার দাদা বাবু বলিয়া ডাকিত। আজ আমার মনে হইল, চারিদিক হইতে সেই ক্রম শিশুর আর্তি স্বর আমাকে ‘দাদা বাবু’ বলিয়া ডাকিতেছে।

রাস্তায় আসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিলাম, কলিয়া রোগীর কাছে যাইব কি না। ভাবিতে ভাবিতে উর্দে আকাশের পানে চাহিয়া দেখি, আকাশের সবগুলি তারাই যেন আমার উপর রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া

রহিয়াছে। তাদের ভিরস্বার-স্বচক দৃষ্টিতে আমার সমুদয় বিধা দুব হইয়া গেল—আমি তাড়াতাড়ি যোগেশের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। আমি যে রাস্তা দিয়া চলিতেছিলাম, তার দুই পাশে বড় বড় গাছের সারি। স্থানে স্থানে যেন রাস্তার ছ্ধারের গাছগুলি শাখাবাহ মেলিয়া দিয়া হাত-ধরাধবি করিয়া রাস্তাব উপরে সবুজ তোরণ সাজাইয়া রাখিয়াছে; তার পাতার ফাঁকে ফাঁকে যেন অসংখ্য তারা স্কুটিয়া উঠিয়াছে। সে অস্পষ্ট মুহূ নক্ষত্রালোকে রাজপথখানি বেশমী ক্ষিত্য মত ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে।

যোগেশদের বাড়ীর নিকটে আসিবামাত্র একটা কক্কণ রোদনধ্বনি আমার কানে প্রবেশ করিল। সহসা আমার পা যেন জমিয়া বরফ হইয়া গেল—মনে হইল, বুঝি বা এতক্ষণে সব শেষ হইয়া গেছে! তবু বহু কষ্টে দরজার কাছে আসিয়া দরজাতে খা দিতেই দরজা খুলিয়া দিল—সেই ভিখারিণী! ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, মিটি-মিটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। ভিখারিণী তাড়াতাড়ি যোগেশের দ্বার মাথাখানি কোলের উপর তুলিয়া লইল, সে ছিন্ন লতিকার মত মেজাজে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছিল। কোণে একখান। তক্তপোসের উপর কুয়া বালিকা, আর সেই ভিখারী তাকে একখানি চামচে দিয়া একটা কি ঔষধ খাওয়াইতেছিল।

কিন্তু তখনতো আর তারা ভিখারিণীর মত দেখাইতেছিল না। ভিখারীর চোখে আর সেই স্বপ্নেব জড়তা জড়তা নাই ভিখারিণীর চোখে সুখে আর কোথাও কুণ্ঠা নাই। সে ভিখারী এখন চিকিৎসক, ভিখারিণী তার সেবাপরায়ণা সহচরী।

আমি ভিখারীর পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা কবিলাম “যোগেশ কোথা?”

ভিখারী তখন কুয়া বালিকাব নাড়ী গতি পরীক্ষা করিতেছিল, সে কোনও কথা কহিল না। ভিখারিণী ধীরে ধীরে বলিল, “ডাক্তার নিয়ে তিনি এখনো ফেরেন নি!”

নাড়ী দেখা শেষ করিয়া ভিখারী আমার

পানে চাহিল। “সে চোখে!” তখন স্নেহ ও আলী-কর্ষাদের স্বর্গীয় জ্যোতিঃস্কুটিয়া উঠিয়াছে! সে আমার বলিল “আপনি বাড়ী চলে যান, দেখছেন না কলেরা! আমরা যা হয় করবো এখন। যে অশুভটা দিয়েছে, যেন একটু কাজ কর্কে বোধ করি।”

এই কথা শুনিয়া যোগেশেব ধূলিবিমুক্তিগা বধু আবার মর্মান্তিক কাঁদিয়া উঠিল। ভিখারী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “এখন গোল করে না মা,—এই কি কাঁদবার সময়! এখন বিপদ-ভঞ্জনর নাম স্মরণ করে —একবার যাও দিকিন নেবুব রস দিয়ে একটু বালির জল নিয়ে এসো! মাগন্তী ভূমি ওর সঙ্গে যাও!”

ভিখারিণীর নাম মালতী।

এর মধ্যে, ভিখারী কয়েক মিনিটের জন্ত একবার বাহিরে গেল। পরে ফিরিয়া আসিয়া আবার কুয়ার পরিচর্যা আরম্ভ করিয়া দিল।

আমি তাহাকে বলিলাম, “এতক্ষণ ভূমি খাটচো এবার আমি একটু রোগীর কাছে বসি, ভূমি না হয় একটু বিশ্রাম করে নাও ততক্ষণ।”

ভিখারী ষাড় নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। “আমি বলিলাম, ‘তৈলে তোমারো অমুখ হয়ে পড়া আশ্চর্য্য কি!’”

ভিখারী হাসিয়া আমার স্নেহের ভিরস্বার গ্রহণ করিল। পবে বলিল “রোগীর অবস্থা এমন নয়, যে, আমি ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত এক মিনিটের জন্তও এখান থেকে সরে যেতে পারি।” কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পরে সে আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল “নারায়ণ!—এ কি দাযিহা!—এখন ডাক্তার এসে পড়লে বাচি।”

আবো! মিনিট দশেক নিঃশব্দে অতিবাহিত হইল; কিন্তু সময় যেন আর কাটিতে চায় না। ছোট একটা আলমারীর উপর একটা “বী” টাইমপিস টিক্‌ টিক্‌ করিতেছে,—শুধু তারই শব্দ শুনা যায়! কুয়া বালিকা মাঝে মাঝে আকুল কণ্ঠে মা মা বলিয়া কাঁদিয়া

উঠিতেছে।

আমি একবার জিজ্ঞাসা করিলাম—“এখন কেমন
বুঝ্‌চো?”

ভিখারী বলিল—“এখনো খুব ভরসা করি তো—
তবে কি না, সব ঠাঁর ইচ্ছা!”

এর মধ্যে যোগেশের স্ত্রী বালি লইয়া আসিল।
সে মেয়েকে চামচে দিয়া বালি খাওয়াইতে লাগিল।
ভিখারী বালিকাকে বাতাস করিতে লাগিল। ভিখারী
এই অবসরে একবার বাহিরে গিয়া আবার ফিরিয়া
আসিল।

এমন সময় ঘণ্টা ধ্বনি করিতে করিতে রাস্তার উপর
হুটী চলন্ত আলো হুটী বাইসিকলের আগমন সূচনা করিল।
তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে লইয়া যোগেশ হাঁপাইতে
হাঁপাইতে বাড়ীতে প্রবেশ করিল। যোগেশ উন্নতের
মত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—“আছে—এখনো
আছে বেঁচে?”

আমি তার কথার কোন জবাব না দিয়া ডাক্তারকে
চুপি চুপি বলিলাম—“লীগঙ্গীর আশ্রয় ভেতরে! অবস্থা
খুব খারাপ।”

রুমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াই ভিখারীকে রোগীর
পেটে ঔষধ মালিশ করিতে দেখিয়া এবং ভিখারীকে
বাতাস দিতে দেখিয়া আমার দিকে চাহিয়া ডাক্তার
বলিলেন—“এরা কারা?”

আমি বলিলাম—“ছদ্মবেশী দেবতা!”

ডাক্তার তাহাদের পানে বিশ্বাস-দৃষ্টি নিক্ষেপ
করিয়া রুমার দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর
হইলেন। ভিখারী অমনি তাড়াতাড়ি রোগীর শয্যা-
প্রান্ত ত্যাগ করিয়া বাইবার সময় পড়িয়া গিয়াছিল
আর কি। পরে দাঁড়াইয়া একটু স্থির হইয়া সে ডাক্তারকে
বলিল, “ঠিক সময়ে এসেচেন আপনি! আমি
ভগবানের অনুগ্রহে এখনো রোগিনীটিকে কোন মতে
বাঁচিয়ে রেখেছি, কিন্তু প্রতিমুহুর্তে খালি ভয় হচ্ছিল,
আর বুঝি পারলুম না।”

ডাক্তার রোগিনীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কিন্তু প্রফুল্ল
হইলেন। তারপর যোগেশের দিকে তাকাইয়া বলিলেন
—“আর কোন ভয় নেই যোগেশবাবু; ক্রাইসিস (crisis)
পার হয়ে গেছে। নাড়ী এখন ক্রমশঃ ভাল বোধ হচ্ছে।”

(৩)

আমি অনেক অশ্রু নয় বিনয় করিয়া সে রাত্রিতে সে
ভিখারী-ভিখারীণীকে আমার বাড়ীতে ফিরাইয়া লইয়া
আসিলাম। তারা শুধু হাসির ধোরে আমার অশ্রু-
রোধটাকে উড়াইয়া দিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু
আমি একেবারে নাছোড়বান্দা। কাষেই তারা দুজনে যেন
কিছু অনিচ্ছার সহিতই আমার বাড়ীতে সে রাত্রির জুড়
আতিথ্য স্বীকার করিল। কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া আসিবার
কিছুক্ষণ পরেই ভিখারীর প্রবল এসিয়াটিক কলেরার
সমৃদ্ধ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে তার নাড়ী বসিয়া গেল, চক্ষু
জ্যোতিহীন হইয়া কোটরস্থ হইয়া পড়িল। আমি
তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে এক বার আসিয়া ভিখারীকে
দেখিয়া বাইতে সংবাদ পাঠাইলাম। ডাক্তার আসিয়া
তার নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, “ব্যারাম দেখিচি অনেকক্ষণ
হয়েছে। এক্ষণ চাপা দিয়ে রেখেছিলে কেন?” ভিখারী
ডাক্তারকে কিছু না বলিয়া অন্ধকারের দিকে পাশ
ফিরিয়া শয়ন করিল। ডাক্তার দেখিলেন, ভাবিলেন,
ঔষধও দিলেন; কিন্তু হায়! রোগ যে তখন তার চিকিৎসা
শাস্ত্রের আয়ত্তের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে! ডাক্তার
ঔষধপত্র দিয়া আবার যোগেশের মেয়েকে দেখিতে
চলিয়া গেলেন। ভিখারীণীর এখন আর বাহুজ্ঞান ছিল
না। মাথায় কাপড় নাই, মাথার চুল বন্ধন-মুক্ত
হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে, সে শুধু একমনে তার
স্বামীর সেবায় নিযুক্ত ছিল। আমি কাছে বসিয়া
ছিলাম, এবং ডাক্তারের উপদেশমত রোগীকে বারবার
ঔষধ খাওয়াইতেছিলাম। রাত্রি প্রায় যখন একটা
তখন ডাক্তার আর একবার ভিখারীকে দেখিতে আসি-
লেন। নাড়ীতে হাত দিয়াই মুখ বিকৃত করিয়া আমাকে

বলিলেন :—“নাড়ী এখন আর একবারেই পাওয়া যাচ্ছে না—sinking very rapidly.”

ভিখারিণীর সেবারত হস্ত সহসা কাঁপিয়া উঠিল, মুখখানি প্রভাতের টাদের মত পাণ্ডুর রক্তহীন হইয়া গেল।

আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখন যোগেশের মেয়ে কেমন?”

ডাক্তার বলিলেন, “তার জ্ঞান আমার বেণী কিছু কতে হয় নি, ভিখারীর অমুখই তাকে এ যাত্রা বাঁচিয়ে তুলেছে!”

কথাটা বুঝি ভিখারীর কানে গিয়া পঁহছিল। সহসা তার রোগাতুর অলস চক্ষু একবার অনির্বচনীয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া আবার ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল। ভিখারিণী কাহ্নাহীন ছায়ার আয়, মূর্তিমতী সেবার আয়, অনাহারে অনিদ্ৰায় কলের পুতুলের মত কেবল তার স্বামীর সেবা করিতে লাগিল। দেহে যেন ক্লান্তির লেশ মাত্র নাই, ভিতরে যে প্রলয়ের ঝড় বহিতেছিল বাহিরে তার কোন চিহ্নমাত্র নাই! অত্যন্ত তৃষ্ণায় যখন ভিখারী বড় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, তখন তার মুখে এক টুকরা বরফ ফেলিয়া দিতে দিতে বলিলাম, “তুমি কে ভাই?”

ভিখারী চমকিয়া বলিয়া উঠিল, “ভিখারী—পণের ভিখারী, তা ছাড়া আর কেউ নই।”

আমি আরো একটু ধীরে বলিলাম, “আমি তোমার নামটা শুধু শুনে চাচ্ছি।”

সে একটু হালি হাসিয়া বলিল—“মাপ করুন মহাশয়, যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ ঐটুকু বলতে আমার আপত্তি আছে।”

আমি কথাটা ঘুরাইয়া দিয়া অপর কথা পড়িতে গিয়া বলিলাম—“আচ্ছা, তুমি যোগেশের মেয়েকে এমন চট্‌ করে সারালে কি করে?”

ভিখারী হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে আমি শিহরিয়া উঠিলাম, ভিখারিণী কাঁদিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে স্বপ্নজড়িত চক্ষে অস্পষ্ট ভাষায় বলিল, —“আমি সারালুম? আমি সারাবার কে, দয়াময়! আমি যদি সারাবার মালিক, তবে নিজকে সারাতে পারলুম কই?”

আমি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি ভিখারীর অস্বাভাবিক চক্ষে তখন যেন পৃথিবীর ছবিমান হইয়া গিয়া পরলোকের ছায়াজগৎ পরিচ্ছন্নভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে মুহূর্তে আমাদের এই ছায়াটাকা স্নেহঘেরা ফলফুল-শোভিত বহু সুখদুঃখের সুন্দর পৃথিবীর নিকট হইতে শেষ বিদায় লইবার পালা, সেই নীরব নির্মম মুহূর্ত অজ্ঞাত রহস্যের পথে ভিখারীকে অপরিচিতের দেশে আব্হান করিতেছে।

তখনো সেবার মঙ্গল হস্ত লইয়া ভিখারিণী তার ভিখারী পতিকে মৃত্যুর কবল হইতে কাড়িয়া লইবার জ্ঞান নারীর সমুদয় শক্তি লইয়া যুঝিতেছিল। তখনো ত সব শেষ হইয়া যায় নাই!—তাই তখনো তার সেবার প্রয়োজন ফুরায় নাই। তখনো ত স্বামীর কণ্ঠে প্রাণটুকু ধুক্‌ধুক করিতেছিল, তাই তখনো তার কাঁদিবার সময় আসে নাই! তার সেবার কায যতই কমিয়া আসিতেছিল, সে ততই তার সমুদয় প্রাণ চোখে ভরিয়া লইয়া তার বিদায়প্রার্থী জীবন-সঙ্গীটাকে প্রাণ ভরিয়া শেষ দেখা দেখিতেছিল! তখন ভিখারিণীর নয়ন আকুল দৃষ্টিময়; সে দৃষ্টিতে পাষণ্ড বিদৌর্য হয়, সংসারের কৰ্ম্ম-প্রবাহ সহসা থামিয়া যায়, সে দৃষ্টিতে একটা মহাপ্রলয় নিঃশব্দে সংঘটিত হইয়া যাইতে পারে!

রাত তখন পোহায় পোহায়। শেষরাত্রির ক্রীণ চক্ষু একবার দেখা দিয়া অন্ত গিয়াছে, রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নারী তার পাতের মাথাখানি আপন অঙ্গে তুলিয়া লইয়া অনিমেষ লোচনে তার ইহজীবনের দেখার সাধ পূর্ণ করিয়া লইতেছিল। বারবার বসনাঞ্চল শীতল বারিধাবায় সিক্ত করিয়া লইয়া তার স্বামীর তুষিত অধর যুগল ভিজাইয়া দিতেছিল! আর সে তুষিত

বিদায়প্রার্থী বিক্ষারিত চোখে তার সাথের ভিখারিণীর পানে বরে বার তাকাইতেছিল। তখন তার মুখের ভাবা বন্ধ হইয়া গেছে, শুধু যেন চোখের ভাষায় বলিতেছিল, “ওগো আমার ভিখারিণী, ওগো আমার রাজরাজেশ্বরী! আমার আরো কত কি কথা বলিবার ছিল—আমার কত কথা রহিয়া গেল, সে সব যে আর কিছুই বলা হ'ল না!” ভিখারিণী কল্পিত হস্তে পতির পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল। একবার প্রাণ ভরিয়া কাদিতে চাহিল, কিন্তু চোখে তার জল ছিল না, মুখে শব্দ ফুটিল না!

ধীরে ধীরে সে অনন্ত পথের ভিখারী পথিক—কৌড়াকান্ত শিশুর মত ভিখারিণীর কোলে অবসর হইয়া পড়িল। ভিখারিণী মর্ম্মভেদী স্বরে কাদিয়া ডাকিল—“স্বামিন্—বন্ধু—ভিখারিণীর শেব সম্বল।” ভিখারী আর কথা কহিল না। সে শুধু তেমনি করিয়া ভিখারিণীর মুখ-পানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তখন সে চোখে আর পলক ছিল না!

ভিখারী তখন এত যে স্থির, এমন নিশ্চল, প্রাণ যে তার আর নাই, তবু যেন সে দুটি হাসি হাসি চোখে ভিখারিণীর পানেই চাহিয়াছিল! যেন সে অর্কজাগ্রতভাবে একখানি সাথের স্বপ্ন দেখিতেছিল! কে বলিবে, সে মরিয়াছে? আর ভিখারিণী! সে ভিখারীর মুখখানি আপন স্নেহতত্ত্বকোলের উপর টানিয়া লইয়া, আলুপায়িত কুন্তলে অহল্যার পাখাণ-মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল;—কে বলিবে যে, ভিখারিণী মরে নাই, এখনো জীবিত আছে!

শ্রীমুরেশচন্দ্র সিংহ শর্মা।

পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ *

[ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত]

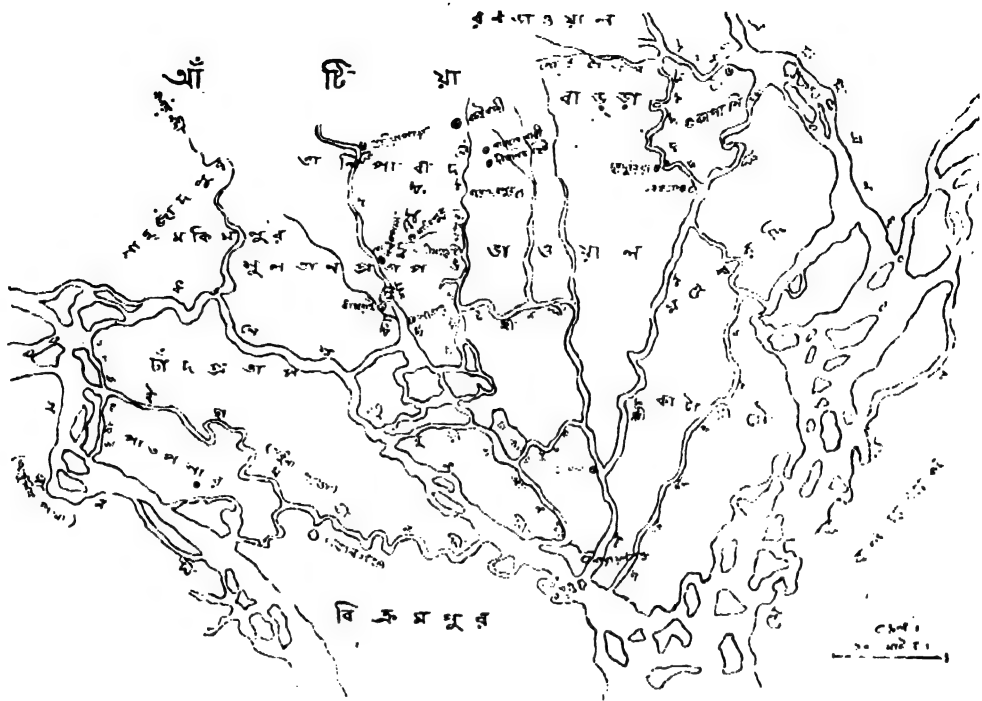
বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল, কাশীমপুর, চাঁদপ্রতাপ, সুলতান প্রতাপ এবং তালিপাবাদ এই পাঁচটি পরগণা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের কেন্দ্রস্থল। [১নং মানচিত্র দ্রষ্টব্য] ইহার অধিকাংশ স্থান এখনও নিবিড় অরণ্যে সমাকুল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় এই প্রদেশবাসিগণ এখনও অনেক পশ্চাত্তরতা। এই জন্ত অনেকে হয়ত এই বনারত প্রদেশকে একটু অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। কিন্তু এই অরণ্যের অন্তরালে প্রায় দ্বিসহস্রাধিক বৎসরের অতীত ইতিহাস লুকায়িত আছে, এবং তাহার আলোচনা ব্যতীত বঙ্গের ইতিহাসের একটা অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায় প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে।

* প্রবন্ধারম্ভেই আমি নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইহাদের সাহায্য ব্যতীত বর্তমান প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। সুতরাং ইহাদের নিকট আমি চির ঋণী।

গড়কাশীমপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় আমার ভ্রমণ কালীন সর্বপ্রকার বন্দোবস্তাদি এবং সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং উপকরণ-সংগ্রহে নানা-প্রকার সাহায্য করিয়াছেন। রোয়াইলের জমিদার শ্রীযুক্ত লাবণ্য মোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত অমলামোহন রায় এম, এ, বি, এল মহাশয়ও প্রাচীন মৃতি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কাশীমপুরের জমিদারের কর্মচারী শ্রীযুক্ত হর্গানাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, এবং শ্রীযুক্ত সারদামোহন ঘোষ মহাশয়গণও এই প্রবন্ধের উপকরণ-সংগ্রহার্থ বহু পরিশ্রম করিয়াছেন।

চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয় ভ্রমণ-কালীন সর্বদা আমার সঙ্গে থাকিয়া নানা স্থানের আলোক-চিত্র (Photograph) প্রস্তুত করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধ-সংলগ্ন সমস্ত চিত্রই তাঁহার প্রস্তুত।

সাভারের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দত্ত কবিরাজ মহাশয়, এবং শ্রীযুক্ত কালীমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ সাহা, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত যশোদালাল সাহা, এবং কতিপয় স্বর্ণকার তাঁহাদের সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রাসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন।



২নং ঢাকা জেলার উত্তরাংশ,
(রেগেলের মানচিত্রে অনুযায়ী)।



২নং, মোহাকইড়।

এই প্রদেশের প্রাচীনত্বের সর্বপ্রধান প্রমাণ ইহার অতি পুরাতন মৃত্তিকা। এই প্রদেশের মৃত্তিকা বৈষ্ণব গাঢ় রক্তবর্ণ, সেক্ষপ আর বঙ্গদেশের, অন্ততঃ পূর্ববঙ্গের, অল্প কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বর্ষাকালে যখন পূর্ববঙ্গের বহুস্থান জলে নিমজ্জিত হয়, তাওয়াল প্রভৃতি স্থান তখনও জলতল হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত থাকে। তাওয়াল হইতে আরও কিয়দূর উত্তরে ২০ হইতে ৫০ ফিট উচ্চ বহু লোহিত মৃত্তিকার টিলা দৃষ্ট হয়। এই টিলা শ্রেণী ত্রিপুরার পর্বত-মাটার সহিত সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত (১)। কবি ঐযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার ভ্রমভূমি ভাওয়ালের বর্ণনায় গাহিয়াছেন,

“রাঙ্গা মাটি পলা কান্নি খাঁটি সোণার মত।

টিলায় টিলায় ভুল হয়ে যায় মৈনাক শত শত ॥

ভূতত্ত্ববিদগণের মতে এই মৃত্তিকার অধিকাংশ লোহিত কঙ্কর, এবং তাহাতে লৌহের অংশ অত্যন্ত অধিক। (২) মৃত্তিকা কত পুরাতন হইলে এইরূপ অবস্থায় পরিণত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমের। আবুল ফজলের সময় সরকার বাজুহাতে লৌহের খনি ছিল, এবং ঐ প্রদেশ নির্বিড় অরণ্যাবৃত ছিল (৩)। ভাওয়ালের কতকাংশ বোধ হয় সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। এই প্রদেশ

স্নেহানন্দ ঐমান গ্রামাচরণ সরকার নানাবিধ প্রাচীন জব্যাদি সংগ্রহে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। ওতব্যতীত বাজুহের ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক এবং ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদক প্রভৃতির ঐযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়, এবং ইতিহাসালোচনায় প্রবৃত্ত ঢাকা সাহিত্য পরিষদের পুরাতত্ত্ব সমিতির সভ্য ঐযুক্ত বিজয়কুমার রায় বি, এ, বর্তমান প্রবন্ধ রচনার সাহায্যার্থ উপকরণ-সংগ্রহ এবং মূল্যবান উপদেশাদি প্রদানে লেখককে বাধিত করিয়াছেন।

(1) Taylor's "Topography and Statistics of Dacca"

Page 4.

(2) Ibid. page 62.

(3) "The forests of this Sircar (Bazooah) supply timbers fit for building boats and for the beams of houses, and here is an iron mine".—Ayeen Akberī, as translated by Francis Gladwin.

অমণকালে আমি কালীমপুর হইতে ৬.৭ মাইল দূরবর্তী লোহাকইড় নামক একটি স্থান দর্শন করি। স্থানটি যে অতীব পুরাতন তাহা দর্শনমাত্রই প্রতীয়মান হয়। লোহাকইড়ের কতকাংশে ২০টা প্রাচীর এবং কতগুলি ক্ষুদ্র স্তূপ বর্তমান আছে। উক্ত প্রাচীর এবং স্তূপ লৌহের দ্বারা এক প্রকার পদার্থে নির্মিত, এবং অস্ত্রাঙ্গি প্রায় ২০ হাত উচ্চ আছে। [২নং চিত্র দ্রষ্টব্য]। বিশেষজ্ঞগণের পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, উহা অপরিণত লৌহ (iron ore), —কঙ্কর এবং লৌহের মধ্যবর্তী অবস্থা। হইতে পারে, আবুল ফজলের বর্ণিত লৌহ-খনি এই স্থানেই বিস্তারিত ছিল। শুনা যায়, লোহাকইড়ে পূর্ববর্তী সময়ে লৌহ-নির্মিত অতি বৃহদাকার কটাহের ভগ্নাংশ এবং হাতুড়ী, বাটালি, প্রভৃতি যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে, এবং এখনও যায়। যাহারা স্বচক্ষে উহা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আমি এই বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি।

এতদেশীয় হিন্দু মুসলমান মাত্রেই ধারণা যে, বহু প্রাচীন স্থান এবং জব্যাদি দেবানুগৃহীত। তদনুযায়ী লোহাকইড়েও পরবর্তী কালে একটি দরগা স্থাপিত হইয়াছে। চতুর্দিকে বহু পুরাতন বৃক্ষরাজি স্মৃতিচিহ্নপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান। ঐ স্থানের বৃক্ষাদি কর্তন করা নিষিদ্ধ। কেশা পাগলা নামক কোনও ব্যক্তি নাকি ঐ স্থানের একটি সুবৃহৎ গজারী বৃক্ষ ছেদন করাতে পুত্র-পৌত্রাদি সহ অচিরে পঞ্চ প্রাপ্ত হয়। কর্তিত বৃক্ষের একটি অংশ অস্ত্রাঙ্গি ঐ স্থলে পতিত আছে, অপর তিন অংশ জল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। ঐ অংশের মধ্যস্থিত সার-ভাগ টুকু মাত্র এখনও বর্তমান; তাহা নয় হাত লম্বা, এবং উহার বেটনো প্রায় তিন হাত। কিংবদন্তী এই, যে, ভাওয়ালরাজ ঐস্থানের দৈবী শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য গজারী বৃক্ষের অবশিষ্টাংশ টুকু লইয়া আসিবার জন্য দুইটা হস্তী প্রেরণ করেন। বৃক্ষাংশ স্পর্শ করিবার অব্যবহিত পরেই হস্তীদ্বয় প্রাণ ত্যাগ করে। আলোচ্য বিষয়ের সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও স্থানের

অগ্রহায়ণ ১৩১১

প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য লোহা-কইড়ের বিবরণ বিবৃত হইল।

মৃত্তিকার প্রাচীনত্ব ব্যতীত ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানের প্রাচীনত্বের আরও বহু প্রমাণ বিদ্যমান। হিন্দুদের পুরাণ মহাভারত প্রভৃতিতে এই সমস্ত স্থানের যে উল্লেখ আছে, তাহা যথাযথরূপে নির্দেশ করা সুকঠিন, এবং তাহাতে কতক পরিমাণে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং উহার ঐতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া তাহার আলোচনায় বিরত হইলাম।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে টলেমি (Ptolemy) ভারতের যে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্মপুত্র-তীরে অবস্থিত অ্যান্টিবোল (Antibol) নামক একটী স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। ক্যাপ্টেন উইলফোর্ড (Captain Wilford) এই অ্যান্টিবোলকে আধুনিক ফিরিঙ্গি-বাজার বলিয়া নির্দেশ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাঁহার অনুমান সন্দেহ-জনক বলিয়া মনে হয়; কারণ, টলেমির বর্ণনার সহিত ফিরিঙ্গি-বাজারের কোনই সাদৃশ্য নাই। পরন্তু, ডাক্তার জেমস টেলর এই অ্যান্টিবোলকে এবং ভাওয়াল একই স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (৪)। ভাওয়ালের উত্তরস্থিত আঁটি (পরগণা) ভাওয়ালের সহিত সংযোগ করিলে, আঁটি ভাওয়াল হয়। এই আঁটি-ভাওয়াল এবং অ্যান্টিবোল একই স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। টলেমির বর্ণনা-স্বায়ী ভাওয়ালের পূর্বদিকে ব্রহ্ম-পুত্র নদ প্রবাহিত। এতদ্ব্যতীত, ভাওয়ালের সংস্কৃত নাম “অন্তমেল”। (৫) এই অন্তমেল হইতেই বোধ হয় আঁটি এবং ভাওয়াল নামের উৎপত্তি। অন্তমেল, অ্যান্টিবোল এবং আঁটি-ভাওয়াল, ইহাদের মধ্যে পরস্পর সৌসাদৃশ্য বর্তমান। সুতরাং, টলেমির সময়েও, অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, ভাওয়াল একজন বৈদেশিক ভ্রমণ-কারীর নিকটও ভারতের মধ্যে একটা উল্লেখ-যোগ্য স্থান বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ভাষা-তত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত রাম-কমল সেন মহাশয় তদ্রূপিত অভিধানের (A Dictionary from Eng. to Beng.) ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, ভাওয়ালে মহাভারত-বর্ণিত ভগদত্তের রাজধানী ছিল। এবং তাঁহার মতে “ভগালয়” হইতেই ভাওয়াল নামের উৎপত্তি।

অনেকের বিশ্বাস যোগল রাজত্ব-কালে ভাওয়াল গাজি হইতেই ভাওয়াল নামের উৎপত্তি। কিন্তু, এ বিষয়ে মতবৈধ বর্তমান। হয় ত ভাওয়াল হইতেই উক্ত গাজির নাম ভাওয়াল গাজি হইয়াছিল।

প্রাচীন কালে ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ার স্থান বহু পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল। কার্পাস হইতেই বোধ হয় কাপাসিয়া নামের উৎপত্তি। কাপাসিয়ার নির্মিত বহু স্থল বস্ত্র প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বেও বিদেশীয় বণিকগণ কর্তৃক, এমন কি রোম(Rome) প্রভৃতি স্থানেও নীত হইত। রোমান পণ্ডিত প্লিনী(Pliny) খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাপাসিয়া জাত স্থল বস্ত্রের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী রোমেও উহা ধনীর বিলাস-সামগ্রী বলিয়া আদৃত হইত। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে, দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বেও ভাওয়ালের শিল্প-কার্য্য সুবিখ্যাত ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি কামরূপ এবং সমতট রাজ্যের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় ভাওয়াল এই উভয় রাজ্যের মধ্য-বর্তী স্থলে অবস্থিত ছিল। বরাহ-মিহির আধুনিক পূর্ববঙ্গকে সমতট আখ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন। (৬)

প্রয়াগ স্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রস্তর-লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে পূর্ববঙ্গকে সমতট আখ্যায় প্রদান করা হইয়াছে। (৭) কানিংহাম সাহেব (Sir Alexander Cun-

(4) Taylor's "Topography and Statistics of Dacca." page. 111.

(5) I bid. Page 111.

(6) Dr. Kern's "Brihat Samhita" XIV. 6.

(7) Journal of the Asiatic Society of Bengal. VI. 793

ningham) নামাক্রপ প্রমাণ সহ দেখাইয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গ-কেই(Delta of the Ganges)হিউয়েন্স সাঙ্ সমতট এবং টলেমী গাঙ্গে রিজিয়া (Gange Regia) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন (৮)। হিউয়েন্স সাঙ্ এই প্রদেশে জাত পনস (কাঁঠাল) ফলের যে বর্ণনা দিয়াছেন, (৯) তাহা অতীব কোঁড়হলোদীপক; এবং উহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, হিউয়েন্স সাঙ্ ভাওয়াল-জাত পনসেরই বর্ণনা করিয়াছেন। ভাওয়ালে বেক্রপ প্রভূত পরিমাণে এবং উৎকৃষ্ট পনস জন্মে, অল্প কুত্রাপি তদ্রূপ জন্মে কি না জানি না। ভাওয়াল বোধ হয় এখনও এই জন্ত বিখ্যাত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বহু বিদেশীয় লেখক এবং পরিব্রাজক তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, দ্বিসহস্রাব্দিক বর্ষ হইতে ভাওয়াল সত্য জগতে বিদিত।

বর্তমান অবধি আমরা যে নৃপতিগণের বিবরণ পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, তাঁহারা দ্বিসহস্র না হইলেও, প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্বে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন।

ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ায় শিঙপাল, তালি-পাবাদ পরগণার অন্তর্গত মাধবপুরে (গাজী বাড়ীতে) যশোপাল, এবং কালীমপুর পরগণার অন্তর্গত সাতার

Line 19 of inscription.

(৮) Cunningham's "Ancient Geography of India." Page. 502, 3.

(৯) The panasa (pan—na—so) fruit, though plentiful, is highly esteemed. The fruit is as large as a pumpkin. When it is ripe, it is of a yellowish-red colour. When divided, it has in the middle many tens of little fruits of the size of a pigeon's egg; breaking these, there comes forth a juice of a yellowish-red colour and of delicious flavour. The fruit sometimes collects on the tree-branches, but sometimes at the tree roots as in the case of the earth growing fu-ling (the china root). Samuel Beal's "Buddhist Records of the Western world." Vol II P. 194.

কোটবাড়ীতে হরিশ্চন্দ্র পাল রাজত্ব করিতেন। পরে যথাক্রমে ইঁহাদের প্রত্যেকের বিবরণ উপস্থিত করিতেছি। এই নৃপতিগণ-সম্বন্ধে নানাক্রপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অনেকের ধারণা, ইঁহারা নীচবংশ-সম্মত এবং গোড়ের পালরাজগণের পূর্বপুরুষ, কিন্তু একরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক, তাহা আমরা পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকও পুরোক্ত প্রবাদ অবলম্বনে একরূপ ভ্রমপূর্ণ বর্ণনা স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাহারও মতে পুরোক্ত নৃপতিগণ ভূঁইঞা (১০), আবার কাহারও মতে বানিয়া (১১) ছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, একরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে। সাতারে বাহিষ্য জাতীয় কতিপয় ব্যক্তি রাজা হরিশ্চন্দ্রকে নিজেদের পূর্বপুরুষ বলিয়া প্রচার করেন। ত্রিযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কোণা নিবাসী ত্রিযুক্ত ভারতচন্দ্র রায়কে হরিশ্চন্দ্রের বংশধর বলিয়া

(১০) "The Bhuiya, or Buddhist Rajas (Founders of the Pal dynasty of Kings of Bengal) are the next rulers spoken of. Three of them took their abode in this (Dacca) District, to the north of the Buriganga and Dhaleswari, where the sites of their Capitals are still to be seen. Jas Pal resided at Madhabpur in Tali-pabad, Haris Chandra at Katibari near Sabhar, and Sisu Pal at Capasia in Bhowal"—Mr. A.L. Clay's Reports (Quoted in Hunter's Statistical account of Bengal, Dacca).

(১১) (After Bikramadit) "The next rulers we hear of belonged to the Booneahs or Buddhist Rajas, who emigrated from the western side of India to perform a religious ceremony in one of the rivers lying to the east of the Ganges and who settled in Dinajpore, Rungpore, and several of the eastern districts. The date of the arrival of these chiefs is not known, but it is said to have been at a very remote period. * * * * * These Booneahs were the ancestors of the Pal-dynasty of the Kings of Bengal. * * * * * Three of the Booneah Rajas took up their abode in this (Dacca) district and in that portion of it lying to the

উল্লেখ করিয়াছেন (১২)। ইহারা হরিশ্চন্দ্রকে আদি-পুরুষ করিয়া এক বংশাবলীও উপস্থিত করেন। বংশাবলী অনুসারে ভারতচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের অষ্টদ্বিংশ পুরুষ। ইহাদের উক্তি অনুসারেও বংশাবলীখানা একশত বৎসরের অধিক কালের লিখিত নহে। অল্প কোনরূপ বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এই বংশাবলী ঐতিহাসিক হিসাবে প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

হরিশ্চন্দ্র পালবংশীয় নৃপতি, তাহা তাঁহার সন্তঃ প্রাপ্ত ইষ্টকলিপি হইতে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইবে সুতরাং তাহার বংশধরগণ অত্মপি জীবিত থাকিলে পালের পরি-বর্তে রায় উপাধি ধারণ করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, হরিশ্চন্দ্র গোড়ের পাল নৃপতিগণের বংশধর, তাহা পরে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। গোড়ের পাল নৃপতিগণ নিশ্চয়ই মাহিষা ছিলেন না, তাহা ইতিহাস পাঠকগণ আগত আছেন। তৃতীয়তঃ, বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম অবলম্বন করিবার সময় হরিশ্চন্দ্রের বংশ-ধরগণ সমাজের নিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ অনুমান করাও বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নহে, এবং তাহা নিশ্চয়ই প্রমাণসাপেক্ষ। সমাজ বিনাদোষে রাজবংশীয়গণকে এইরূপ নিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইবে, ইহাও বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। বাহা হউক, রাজা হরিশ্চন্দ্র কোন বংশীয় ছিলেন, তাহা নিশ্চিত রূপে প্রমাণ করা এখন দুঃসাধ্য। পালবংশীয় নৃপতিগণকে আবুল ফজল “কায়েত” (কায়েত) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১৩)

north of Booriganga and Dulleswary, where the sites of their capitals are still to be seen. Jash Pal reside at Moodabpore in the pargannah of Talipabad, Haris-chandra at Catebury near Sabhar and Sisu Pal at Capasia in Bhawal” Taylor’s Topography and Statistics of Dacca. Pp. 63, 64.

(১২) প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১১।

(১৩) “The family of Bhowpaul, of the Koyth (kayeth) caste, ten princes reigned 698 years”—Ayeen Akberi as translated by Francis Gladwin. Page 314.

বাহা হউক, হরিশ্চন্দ্রের জাতি-নির্ণয়ের ভার ভবি-ষ্যতের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা এখন যথাক্রমে শিশু পাল, যশোপাল, এবং হরিশ্চন্দ্র পালের বিবরণ লিপি-বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

শিশুপাল।

ভাওয়াল পরগণার বহুস্থানে ইষ্টকস্তূপ, মৃৎ-প্রাচীর গৃহদায়তন দীর্ঘিকা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। ইহার অধিকাংশই শিশুপাল রাজার কীর্তি-চিহ্ন, দেশ-প্রচলিত প্রবাদ এইরূপ। ভাওয়াল পরগণাস্থিত কাপাসিয়ার অন্তর্গত ছুরছুরিয়া, কোট এবং দিঘলির ছিট নামক গ্রাম-সমূহেই শিশু পালের কীর্তি-চিহ্ন বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

বঙ্গের স্বাধীন নৃপতিগণের ইতিহাসে একডালা দুর্গের বহু স্থানে উল্লেখ দৃষ্ট হয়; কিন্তু একডালা গ্রামে বর্ণিত দুর্গের কিম্বা কোন রূপ প্রাচীন কীর্তির কোন রূপ চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। পরন্তু এক ডালার ৮ মাইল উত্তরে কাপাসিয়ার অন্তর্গত ছুরছুরিয়া গ্রামে উক্ত দুর্গের বহু চিহ্ন অত্মপি বর্তমান। সুতরাং মনে হয়, ঐ স্থানেই সুপ্রসিদ্ধ একডালার দুর্গ অবস্থিত ছিল।

ছুরছুরিয়া গ্রাম বানার নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। ঠিক নদীতটেই একটা দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, এবং তাহার বিপরীত দিকে একটা গড়ের বহুচিহ্ন অত্মপি বর্তমান। এই নগরী এবং দুর্গ উভয়ই শিশুপাল রাজার নিশ্চিত, এইরূপ প্রবাদ। দুর্গ-নিম্নে বানার নদী পাঁচশত হস্তেরও অধিক বিস্তৃত ও অতিশয় গভীর, এবং পার্শ্বত্যা নদীর ত্রায় ধরপ্রোতা। নদীগর্ভ হইতে তটদেশ প্রাচীরের স্মার উথিত হইয়াছে, এবং শীতকালে তটের প্রায় ৫০ ফিট নিম্নে জল থাকে। সুতরাং তটদেশের উচ্চতা সহজেই অনুমেয়। বানার নদী দুর্গটিকে প্রায় অর্ধচন্দ্রাকারে বেঁধে করিয়াছে। তটদেশে কঙ্করময় কঠিন লোহিত মৃত্তিকা। নদীতীর এবং দুর্গের চতুর্দিক সুপ্রশস্ত মৃৎ-প্রাকারে বেষ্টিত। প্রাকার এখনও প্রায় ১২।১৪ ফিট উচ্চ রহিয়াছে। পশ্চিম দিকে দুর্গ-নিম্নেই বানার

নদী, এবং অপর তিন দিকে ঠিক দুর্গ প্রাকারের অব্যবহিত নিয় দিয়া প্রায় ৩০ ফিট প্রশস্ত পরিধা। পরিধার অনেক স্থান এখন ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট রূপে বিদ্যমান। দুর্গ-প্রাচীরের দৈর্ঘ্য দুই মাইলেরও অধিক। সুতরাং, অতি বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে এই দুর্গ অবস্থিত ছিল। দুর্গপ্রাকারে পাঁচটি প্রবেশ-দ্বার দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোনটিতেই ইষ্টক বা প্রস্তর নির্মিত থাকার কোন চিহ্ন বর্তমান নাই। দুর্গটির অবস্থান এবং এইরূপ সুরক্ষিত স্থান-নির্মাণে নিৰ্মাতার-রণ কৌশলের পরিচায়ক।

দুর্গ-প্রাকার-বেষ্টিত স্থানের মধ্যে পুনরায় এক একটি স্থান প্রাচীর বেষ্টিত অবস্থায় অবস্থিত। এই প্রাচীরেরও বহু চিহ্ন বর্তমান। ইহার মধ্যে আবার একটি ইষ্টক-নির্মিত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। এই স্থানে ইষ্টক-প্রাচীরের পরিবর্তে এখন একটি লম্বা মৃৎস্তূপ এবং তদুপরি বহু ইষ্টক পতিত আছে; কোনও কোনও স্থানে ইষ্টক-প্রাচীরের ভিত্তিও দৃষ্ট হয়, প্রাচীরের চতুর্দিকে চক্রাকার আর একটি পরিধা দৃষ্ট হয়, এবং বোধ হয় উক্ত ইষ্টক প্রাচীর উহারই এক অংশ যেন বিভাগ করিয়া লইয়াছে। এই পরিধা নদীর সহিত সংযুক্ত এবং আনুমানিক প্রায় ৬০০ গজ লম্বা।

দুর্গের মধ্যে দ্বিতীয় প্রাচীর এবং পরিধাবেষ্টিত স্থানটা বোধ হয় সুরক্ষিত রাজপুরী। এই পুরীর তিনটি প্রবেশ-দ্বার দৃষ্ট হয়, এবং পুরীমধ্যে দুইটি অট্টালিকার চিহ্ন সুস্পষ্ট বিদ্যমান। দুইটি উচ্চ স্তূপ প্রায় নদীতীরে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকস্থ স্তূপোপরি প্রায় বৃত্তাকার একটি ইষ্টক-নির্মিত ভিত্তি দৃষ্ট হয়। উহা বোধ হয় পূর্বে শত্রুর আগমন পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য অত্যুচ্চ বৃক্ক (tower) ছিল। বৃক্কের চতুর্দিকে ইষ্টক প্রাচীরের চিহ্ন বর্তমান এবং প্রাচীরের চারি কোণে বোধ হয় চারিটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র 'বৃক্ক' (Bastions) ছিল। উহারও স্পষ্ট চিহ্ন আছে।

উত্তর দিকস্থ স্তূপের ভিত্তিচিহ্ন-সমূহ স্পষ্ট নহে।

দুইটি চতুষ্কোণ সমুন্নত স্থান উহাতে দৃষ্ট হয়; উহার অদূরে একটি দীর্ঘিকা বর্তমান। দীর্ঘিকা দুর্গ-পরিধার সহিত একটি অপ্রশস্ত খাল দ্বারা সংযুক্ত।

দুর্গমধ্যস্থ বিভিন্ন প্রাচীরের মধ্যস্থিত ভূভাগ-সমূহে বহু ইষ্টক এবং মৃত্তিকা-স্তূপ বর্তমান, এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘিকার চিহ্নও দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত জলাশয় কালক্রমে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুর্গমধ্যে স্তূপীকৃত এবং বিক্ষিপ্ত বহু ইষ্টক পড়িয়া আছে। নদীতীরে বহু মৃত্তিকা এবং ইষ্টক-স্তূপ দৃষ্ট হয়, এবং উহা রাজপুরীর নানা অংশ বলিয়া স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়। দুর্গ এবং রাজপুরীর অনেক অংশ নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। প্রাচীনগণের উক্তি অনুসারে, পূর্বে ঐ স্থানে নদী অত্যন্ত অপ্রশস্ত ছিল।

এই দুর্গ স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক রাণীবাড়ী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রবাদ এই, শিশুপালবংশীয়া রাণী ভবানী ঐ দুর্গে বাস করিতেন; এবং মুসলমানগণ বোধ হয় (১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে) ইহাকে পরাজিত করিয়াই শিশুপাল-রাজ্য জয় করেন। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বোধ হয় এই দুর্গেই বঙ্গের দ্বিতীয় স্বাধীন মুসলমান নৃপতি ইলিয়াস সামসুদ্দিন সম্রাট ফিরোজ সাহ দ্বারা অবরুদ্ধ হন। অবরোধ-কালে ইলিয়াস সাহ ফকিরের ছদ্মবেশে দুর্গ ত্যাগ করিয়া রাজা ভবানী নামক তখনক দেশ বিখ্যাত সাধুর মৃতদেহের সংকার কার্যের সময় উপস্থিত থাকিয়া পরে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজ দুর্গে প্রত্যাবর্তন করেন। ছদ্মবেশে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে নাই। (১৪) এই রাজা ভবানী বোধ হয় পূর্বোক্ত রাণী ভবানীর কোন বংশধর।

দুর্গ জয়ে অসমর্থ সম্রাট ফিরোজ সাহ ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। ইলিয়াস সাহের পুত্র সেকেন্দর সাহের রাজত্ব-কালে সম্রাট কর্তৃক পুনরায় এই দুর্গ আক্রান্ত হয়। এবারেও দুর্গজয়ে অসমর্থ সম্রাট

অগ্রহায়ণ ১৩১২

অবশেষে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আলাউদ্দিন হোসেন বঙ্গদেশে অবস্থানকালে এই দুর্গেই তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ফকির কুতুব আল্‌আলমের সিদ্ধ স্থান পাণ্ডুয়াতে প্রতি-বৎসর একবার পদব্রজে তীর্থ দর্শন করিতে আসিতেন।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, শিশুপাল-নির্মিত এই দুর্গ মুসলমান রাজত্বের সময়ও একডালা দুর্গ নামে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

বানার নদীর পূর্ব তীরে এই দুর্গ অবস্থিত। পশ্চিম তীরে ঠিক দুর্গের বিপরীত দিকে শিশুপাল প্রতিষ্ঠিত নগরের চিহ্নসমূহ বর্তমান। অতি বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্যাপিয়া এই নগর অবস্থিত ছিল। নদীতীরে এবং প্রাচীন নগরের সর্বত্রই বহু ইষ্টক চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। নদীতীর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে দুইটা প্রকাণ্ড এবং অতি গভীর দীর্ঘিকা বর্তমান আছে। উহারা উভয়ই শিশুপাল কর্তৃক খনিত। এইরূপ জন প্রবাদ।

নদীতীরে শিশুপালের কাচারী বাড়ী অবস্থিত। এখন শুধু সেখানে একটি ইষ্টকবহন মৃৎস্তূপ উহার অতীত জীবনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কাচারী বাড়ীর অদূরে দুর্গাবাড়ীর ভগ্নাবশেষ, এবং একটি মসজিদ দৃষ্ট হয়। মসজিদটি প্রায় প্রস্তর-নির্মিত; এবং সেখ আলাউদ্দিন নামে খ্যাত। খুব সম্ভবতঃ সুলতান আলাউদ্দিন কর্তৃক পরবর্তী কালে উক্ত মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।

হরহরিরায় (একডালা দুর্গের) পর টোকের নাম উল্লেখযোগ্য। টোকেও শিশুপালের বহু কীর্তি-চিহ্ন বর্তমান। টোক কাপাসিরায় অন্তর্গত এবং বানার ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম-স্থলের অদূরে বানার নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। টোক শিশুপালের রাজধানী (আধুনিক দীঘলির ছিট) হইতে কয়েক মাইল মাত্র দূরে। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, শিশুপালের প্রকৃত রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দীঘলির ছিট গ্রামে বিস্তারিত। হরহরিরায়

কিংবা টোকে শিশুপালের রাজধানী ছিল না; এতদন্তর স্থানেই শিশুপালের দুর্গ এবং প্রতিষ্ঠিত নগর অবস্থিত ছিল।

টলেমি বর্ণিত টুগমা (Tugma,) ষাদশ শতাব্দীতে আরব দেশীয় ভৌগোলিক অল এড্রিসি (El Edrissi) বর্ণিত টেউক (Tauke) এবং নবম শতাব্দীর মুসলমান পরিব্রাজক-গণ বর্ণিত টফেক (Tafek) এবং শিশুপালের দুর্গ টোক একই স্থান বলিয়া টেলর অনুমান করিয়াছেন। (১৫) ক্যাপটেন উইলফোর্ড এবং ড্যানডিল (D'Anville) টুগমা প্রকৃতি স্থানকে অল্প স্থানে নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু এ বিষয়ে—টেলরএর অনুমানই আমাদের নিকট যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং টোকের ঐতিহাসিকতাও বহু প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। টোকের অবস্থান অতি সুন্দর—ঠিক দুর্গের উপবোগী। এই স্থানে শিশুপালের দুর্গের বহু চিহ্নাদি অস্ত্রাপি বর্তমান, কিন্তু অতি নিবিড় বনাকীর্ণ এবং খাপদ-সম্মূল স্থান হওয়াতে সমস্ত প্রাচীন স্থানগুলি দর্শন করা সম্ভবপর নহে।

টোক হইতে কয়েক মাইল দূরে দীঘলিরায় ছিট নামক গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামেই শিশুপালের রাজধানী ছিল এইরূপ জন-প্রবাদ। গ্রামটি ভাওয়ালের উত্তর-পশ্চিমাংশ-স্থিত এবং নিবিড় অরণ্যায়ত। উহা এখন কাল-বশে খাপদসকলের আবাসভূমি হইলেও, উহার স্থানে প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, প্রাচীরাদির জীর্ণ ভগ্ন এবং ওক দীর্ঘিকা-নিচয় পূর্ব-স্থিতি জাগরিত করিয়া প্রবাদ-বাক্যের পোষকতা করিতেছে। দীঘলিরায় ছিটে কয়েকটি ইষ্টক-বহন মৃৎস্তূপ বর্তমান, এবং উহার সান্নিধ্যে একটি সুবহু গভীর দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। ঐ স্তূপগুলি রাজধানীর অট্টালিকা-সমূহের ভগ্নাবশেষ; এবং উক্ত দীর্ঘিকাটি শিশুপালের খনিত। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বিশ্বাস, যে, ঐ স্থানে প্রভূত ধনসম্পত্তি স্তূপনিরে নিহিত আছে;

কিন্তু যুদ্ধের ধন বলিয়া কেহ তাহার অঙ্গুগন্ধান করিতে সাহসী হয় না। শিশুপালের বাড়ী অতি দুশ্রবেষ্ট নির্বিড় বনাকীর্ণ; কয়েকটি বনারত বৃহৎ স্তূপ দূর হইতে দৃষ্ট হয়। দীঘলিয়ার ছিট আধুনিক নাম; রাজধানীর প্রাচীন নাম জানা যায় না।

গৌড়ের পাল রাজগণের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্বকালে কাঞ্চোজ (নেপাল) বাসী কোনও ব্যক্তি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া বিগ্রহ পালের রাজত্বের একাংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং আধুনিক দিনাজপুরে এক জয় স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া তাহাতে “কাঞ্চোজায়রাজ গৌড়পতি,” নিজের এই উপাধি উৎকীর্ণ করেন। সেই স্তম্ভলিপি এখনও বর্তমান (১৬)। পুনরায় দুর্ভাগ্যবশত দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে কৈবর্ত জাতীয় দিব্য বা দিস্কোক যুদ্ধে মহাপালকে নিহত করিয়া বঙ্গের-ভূমি অধিকার করেন, এবং দিস্কোকের ভ্রাতৃপুত্র ভীম বরেন্দ্রের রাজপদে অভিষিক্ত হন; পরে বহু চেষ্টায় মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম পাল যুদ্ধে ভীমকে পরাজিত করিয়া বিজিত রাজ্য পুনরধিকার করেন (১৭)। “ভীম রামপাল দেবের আক্রমণ বেগে প্রতিহত করিবার আশায়, বরেন্দ্র মণ্ডলের প্রান্তভাগের নানা স্থানে যে সকল মৃৎ-প্রাকার রচনা করাইয়া ছিলেন, তাহা এখনও “ভীমের ডাইক” এবং— “ভীমের কাকাল নামে কাথত হইতেছে।” (১৮)

গৌড়ের পালরাজগণের রাজত্বকালে যেরূপ নানা নিরাজাতীয় ব্যক্তির বিদ্রোহের বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই, শিশুপালের অথবা তৎবংশধরগণের রাজত্বকালেও

আমরা তদ্রূপ চণ্ডাল-বিদ্রোহের জনপ্রবাদ শুনে পাই। শিশুপাল অথবা তদীয় বংশধরগণের মধ্যে কাহারও রাজত্ব-সময়ে প্রতাপ ও প্রসন্ন নামক চণ্ডাল জাতীয় দুই ভ্রাতা একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। রাজেন্দ্র পুরের সন্নিকটে, এবং আধুনিক জয়দেবপুরের ছয় ক্রোশ উত্তর পূর্বে রাজাবাড়ী নামক স্থানে তাহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। এখনও রাজাবাড়ীতে রাজবাটীর চিহ্ন-স্বরূপ প্রাচীরাদির ভগ্নাবশেষ ও পরিখাদি দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানটী এখনও “চাড়াল রাজার বাড়ী” নামে খ্যাত। এই চণ্ডাল জাতীয় ভ্রাতৃদ্বয় গৃহবিবাদে রাজ্যচ্যুত হন।

প্রবাদ এই, তাঁহারা নীচজাতীয় বলিয়া ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিতেন না। ক্ষমত-গর্ভিত চণ্ডাল ভ্রাতৃদ্বয় বলপূর্বক ব্রাহ্মণ গণকে স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করাইতে দৃঢ় সংকল্প করিয়া রাজ্যস্থ সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করেন। ব্রাহ্মণগণ ভোজনে উপবিষ্ট হইলে প্রতাপ ও প্রসন্ন উভয় ভ্রাতার দ্বীপে পরিবেশনার্থ অন্নপাত্রহস্তে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যাশমতঃ জৈনিক ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন, আমরা রাজার অন্ন গ্রহণ করিব। উভয় ভ্রাতার মধ্যে প্রকৃত রাজ্য কে তাহা নির্ণীত হইল না, এবং এই স্বত্রেই গৃহ বিবাদ আরম্ভ হইয়া প্রতাপ ও প্রসন্ন উভয়েই রাজ্যচ্যুত হইলেন। ব্রাহ্মণগণেরও জাতি নষ্ট হইল না। যুদ্ধে উভয় ভ্রাতাই প্রাণ হারাইয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ। প্রতাপ ও প্রসন্নের মোগগী নারী এক ভগ্নী ছিলেন। তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষ এখন মোগগীর মঠ, নামে খ্যাত হইয়া চাড়াল রাজার বাড়ীর অনুরেই বর্তমান।

খাইডা ডোকা নামক এক নিরাজাতীয় রাজার নামও ভাওয়াল অঞ্চলে শ্রুত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভাটের গানও এদেশে প্রচলিত আছে। এবং তাহাতে তিনি কায়ের বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু জনশ্রুতি ও নাম পর্যালোচনায় ইনি যে বিস্মত দেশীয় ছিলেন, এইরূপই বোধ হয়। খাইডা ডোকা কায়স্থ জাতির সহিত

(১৬) “গৌড়রাজমালা” ৩৭ পৃঃ।

(১৭) সঙ্ঘ্যাকর নন্দী প্রণীত “রাম চরিতম্”। (Edited by Mahamahopadhyaya H. P. Sastri)

(১৮) “গৌড়রাজমালা” উপক্রমণিকা—ঐযুক্ত সঙ্ঘ্যাকরনামক বৈদ্যের—৮ পৃষ্ঠা।

অগ্রহায়ণ ১৩১১

মিশিয়া যাঁতে চাইয়াছিলেন, তাট পরিচয়ে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। (১০)

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় “খাইডা ডোন্কা” সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। সেন মহাশয় বোধ হয় অবগত আছেন যে, পূর্ববঙ্গের নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ বৃহৎ কাঠখণ্ডকে খাইডা এবং স্থলকারকে ডোন্কা অথবা ঢোন্কা বলিয়া থাকে। হয়ত নৃপতি অত্যন্ত স্থূলদেহ হওয়াতে লোকে বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাকে খাইডা ডোন্কা বলিত এবং ক্রমে সেই নামই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত নৃপতি তিব্বত দেশীয়, অথবা বিদেশাগত এরূপও কোন প্রবাদ নাই। সুতরাং, বিনা কারণে পূর্বোক্ত রূপ সিদ্ধান্ত করা আমরা সমীচীন বোধ করি না। তবে, খাইডা ডোন্কা নৃপতি যে নিম্নজাতীয় ছিলেন, তাহা তাঁহার ঐ অদ্ভুত নাম শ্রবণেই প্রতীয়মান হয়।

শিশুপাল অথবা তদীয় বংশধরগণের মধ্যে কাহার রাজত্বকালে এই দেশে এই সমস্ত নিম্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের প্রভাব বিস্তৃত হয়, তাহা নিরূপণ করা শূকঠিন।

পূর্বে শিশুপালের যে সমস্ত কীর্তি-চিহ্নের বিষয় উল্লিখিত হইল, তদ্ব্যতীত ভাওয়ালের আরও বহু স্থানে এই নৃপতির কীর্তি-চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়। কিন্তু, ঐ সমস্ত স্থান অধিকাংশই নিবিড় বনাগত হওয়াতে অতিশয় দুর্গম; সুতরাং সমস্ত স্থানের সন্ধান পাওয়াও দুঃসাধ্য।

যশোপাল।

যশোপাল রাজার কীর্তি-চিহ্নাদি মাধবপুর এবং তৎসন্নিহিত বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। মুসলমান রাজত্বকালে মাধবপুরের নাম গাজীবাড়ী হইয়াছে, এবং অজ্ঞাপি ঐ গ্রাম উক্ত নামেই পরিচিত। যশোপালের গৃহদেবতা মাধবের নামানুসারেই বোধ হয় যশোপালের রাজধানীর নাম মাধবপুর হইয়াছিল। এই বিগ্রহের বিবরণ পরে উক্ত হইবে।

গাজীবাড়ী গ্রাম চাঁদপ্রতাপ ও তালিপাবাদ পরগণার মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত; বোধ হয়, উহা চাঁদপ্রতাপ পরগণারই অন্তর্ভুক্ত। গাজীবাড়ী গাজীখালি নামক নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্বে উহার নাম কানাই নদী ছিল।

রেনেলের মানচিত্র, এবং টেলর সাহেবের “টপোগ্রাফি” পুস্তক সংলগ্ন মানচিত্রে উহার কানাই নামই লিখিত আছে। গাজীখালির পূর্বদিকে নদীতীর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যশোপালের বড় দীঘি ও ছোট দীঘি নামে খ্যাত দুইটা বৃহৎ দীর্ঘিকা বর্তমান (৩ ও ৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। উভয় দীর্ঘিকাই “জান” (সংবোধক পয়ঃ প্রণালী) দ্বারা একটি বিলের সহিত সংযুক্ত। শীতকালেও উভয় দীর্ঘিকাতে গভীর জল থাকে। উভয় দীর্ঘিকাই উত্তর দক্ষিণে ধোদিত ও পরস্পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত; এবং উভয়ের পরস্পর ব্যবধান বোধ হয় ৪০০ গজের অধিক হইবে না। বড় দীঘি ও ছোট দীঘি এতদুভয়ই আনুমানিক এক খাদা (১৭৫ হাত \times ২০০ হাত) পরিমাণ বিস্তৃত। বড় দীঘিতে বাঁধান ঘাটের কোন চিহ্ন বর্তমান নাই, বোধ হয় কাল-বশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ছোট দীঘির উত্তর তটে এখনও ইষ্টক-নির্মিত ঘাটের সুস্পষ্ট চিহ্ন দৃষ্ট হয়। বড় দীঘি ও ছোট দীঘি আধুনিক নাম, দীর্ঘিকা-বয়ের প্রাচীন নাম জানা যায় না।

দীর্ঘিকাঘরের উত্তর তটে এবং উহাদের মধ্যবর্তী স্থানে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত [৫নং, মানচিত্র দ্রষ্টব্য]। ৫০।৬০ বৎসর পূর্বেও বাটীর ভগ্নাবশেষ বর্তমান ছিল; গ্রামস্থ বহু প্রাচীন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। ঐ সমস্ত গ্রামে বসতি হওয়াতে গ্রামবাসিগণ ক্রমে তাহা সমতল করিয়া ফেলিয়াছে। যে স্থানে বাটী অবস্থিত ছিল, তথায় অজ্ঞাপি বহু ইষ্টক বিকিণ্ড অবস্থায় পতিত আছে। কুবজগণ বলিল যে, ইষ্টকের পরিমাণ এত অধিক যে তথায় হলচালন অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। গ্রামবাসিগণ রাজবাটীতে একটি ইষ্টকে বাঁধান বৃত্তাকার ক্ষুদ্র চৌবাচ্চা প্রদর্শন করিয়া বলিল যে, প্রায় তিন বৎসর পূর্বে কোনও ব্যক্তি মৃত্তিকা খননকালে ঐ স্থানে পাত্রপূর্ণ

বহু সুবর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। স্থানীয় জমিদারের প্রধান কর্মচারীও ঐ উক্তি সমর্থন করতে উহা বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া মনে হইল। যে ব্যক্তি ঐ গুপ্ত ধন পাইয়াছে, বহু অশুসন্ধানও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, এবং বহু পুরস্কার ঘোষণা করা সত্ত্বেও উহার একটি মুদ্রাও কেহ দিতে পারিল না। ঐ মুদ্রা পাওয়া গেলে হয় ত যশোপাল রাজার লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের অনেক সহায়তা হইত। উক্ত ইষ্টকনির্মিত চৌবাচ্চাটির ইষ্টকগুলি এত পুরাতন, যে সামান্য অঙ্গুলির চাপেই উহা একেবারে ভুঁড়া হইয়া যাইতে লাগিল।

রাজবাটীর চতুর্দিকই সুপ্রশস্ত পরিখা বেষ্টিত। বাটীর দক্ষিণ দিকে বহুমুরবাপী বিল (জলাকীর্ণ স্থান) এবং অপর তিন দিকেই পরিখার সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। বড় দীঘির অব্যবহিত পশ্চিম হইতে পরিখা আরম্ভ হইয়া বাটীর চতুর্দিক বেষ্টিত করতঃ, ছোট দীঘির অব্যবহিত পূর্ব দিক দিয়া বিলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। পরিখার অপর দিকও বিলের সহিত সংযুক্ত। পশ্চিম দিকের এবং উত্তর দিকের পরিখায় বর্ষাকালে জল থাকে। উত্তর দিকের কিয়দংশ অনেক পরিমাণে ভরিয়া গিয়া একটি ক্ষুদ্র বাইদ্ (সজল নিম্নভূমি) রূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব দিকের পরিখা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু, এখনও উহার সুস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। পরিখার পার্শ্বে স্থানে স্থানে যুগ্মপ্রাকারের চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়।

যশোপালের বাটীর পশ্চিম দিকস্থ পরিখা হইতে অশ্রুমান অর্ধমাইল পশ্চিমে গাজীখালি (কানাই) নদী প্রবাহিত। গাজীখালির পশ্চিম তীরে মাধব-চালা বা মাধব টেক অবস্থিত; মাধব চালার দক্ষিণ দিকে পূর্বোক্ত বিস্তৃত বিল। এই মাধবচালার প্রসঙ্গে এ স্থানের যশোপালের গৃহদেবতা মাধবের বিবরণ উল্লেখ করা কর্তব্য। দেশপ্রচলিত প্রবাদ এই, একদা যশোপাল নৃপতি হস্তীপৃষ্ঠে কোনও স্থানে যাইতে ছিলেন। তাঁহার রাজধানীর অদূরেই একটি স্থানে

উপস্থিত হইয়া হস্তী হঠাৎ ভয়চকিত ভাবে দগুন্নমান হইল, শত অশ্রুপ্রহারেও অগ্রসর হইল না, এবং গুণ্ড উত্তোলন করিয়া একটি স্থান পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিতে লাগিল। সুশিক্ষিত হস্তীর জেদুণ ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া রাজা ঐ স্থান খনন করিতে আদেশ দিলেন। বহুদূর খনন করিলে, একটি মন্দিরের কিয়দংশ এবং মাধবমূর্তি দৃষ্ট হয়। তখন হঠাৎ দৈববাণী হয় যে, যশোপাল মাধবকে স্থানান্তরিত করিলে তাঁহার রাজ্য এবং বংশ নষ্ট হইবে। তক্ত নৃপতি ইহাতে বিচলিত হইলেন না; পার্শ্ব সম্পদ অপেক্ষা পারলৌকিক সম্পদকেই অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া যশোপাল মাধবকে ঐ স্থান হইতে উত্তোলিত করিলেন, এবং ঐ স্থানে প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে মাধবকে স্থাপিত করিলেন। যে স্থান হইতে মাধবকে উত্তোলিত করা হয়, সেই গর্তটি এখনও বিদ্যমান, এবং মাধবের চৌবাচ্চা নামে খ্যাত [৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য]। উহা একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর আয় এবং প্রায় ২৫ হাত লম্বা ও ২০ হাত প্রশস্ত। যশোপাল যে স্থানে মাধবের মন্দির নির্মাণ করেন, সেই স্থান এখন মাধব চালা অথবা মাধব টেক নামে খ্যাত, এবং তাহারই মধ্যে মাধবের চৌবাচ্চা অবস্থিত। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখন বর্তমান নাই, কিন্তু সমস্ত টেকটিতে (উচ্চ ভূমি) বহু ইষ্টক বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত থাকিয়া অতীত কীর্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

দৈববাণী কার্যে পরিণত হইয়া যশোপাল নির্দোষ হইলেন, এবং তাঁহার রাজ্য নষ্ট হইল। তক্তের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মাধব তদবধি নিজ নামের পূর্বে তক্তের নাম সংযোগ করিয়া 'যশোমাধব' নামে খ্যাত হইলেন। যশোপালের রাজ্যবিনাশের পর তাঁহার রাজধানীও ক্রমে জনশূন্য হইয়া গেল। মাধব বোধ হয় অনাদৃত অবস্থাতেই তথায় অনির্দিষ্ট কাল অবস্থান করেন। পরে স্থানীয় জনৈক জমিদার গোবন্দ প্রসাদ রায় ওঙ্গল মধ্যে সেই মূর্তি প্রাপ্ত হইয়া শিমুলিয়া গ্রামস্থ

জনৈক ব্রাহ্মণকে উহা দান করেন। পরে সেই ব্রাহ্মণ নিজ জামাতা ধামরাইর পার্শ্ববর্তী পঞ্চাশ নামক পল্লীবাসী প্রোক্তীয় ব্রাহ্মণ রামজীবন রায় মৌলিককে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ (৭) উক্ত মূর্তি দান করেন। তদবধি মাধব, যশোমাধব নামে ধামরাই গ্রামে উক্ত মৌলিক বংশেই প্রতিষ্ঠিত আছেন [৭নং মাধব মূর্তি দ্রষ্টব্য]। মৌলিক মহাশয়দের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে :৭৭৯ বঙ্গাব্দে (খ্রীঃ ১৬০৩) মাধব মূর্তি তাঁহাদের হস্তগত হয়। (২০)

কাহারও কাহারও মতে পূর্বোক্ত মৌলিক মহাশয় স্বপ্রাদিষ্ট হইয়া বনভূমি হইতে মাধবকে তুলিয়া নিয়া স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। মাধবের নামে বহু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে; তদ্বারা প্রত্যহ মাধবের বোড়শোপচারে পূজা হয়। ধামরাইর মাধবের রথ-যাত্রা দেশ-বিধাত ঐ সময়ে ধামরাইতে প্রায় লক্ষ লোক সমবেত হয়। বিচিত্র বসনভূষণও প্রভূত স্বর্ণালঙ্কার-সজ্জিত মাধবমূর্তি বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর। এরূপ সুন্দর মূর্তি এতদেশে কত্য়পি দৃষ্ট হয় না।

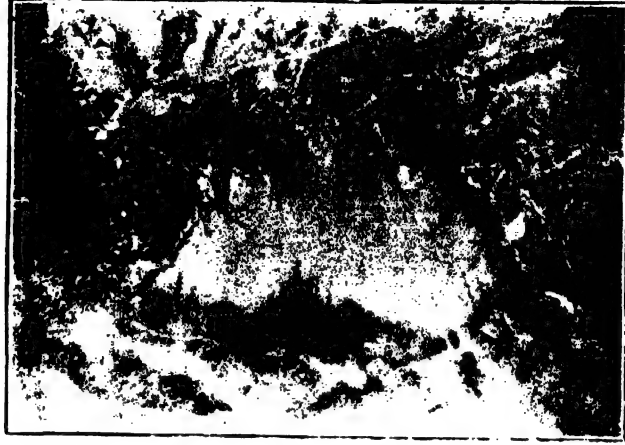
মাধব সম্বন্ধে আরও বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। মাধবমূর্তি নিম্বকাঠনির্মিত এবং নবজলধরশ্রামবর্ণ। কথিত আছে, যে কাঠখণ্ড দ্বারা ত্রীক্ষেত্রধামের জগন্নাথ মূর্তি নির্মিত হয়, তাহারই অবশিষ্টাংশ দ্বারা বিশ্বকর্মা মাধব মূর্তি নির্মাণ করেন। কালাপাহাড়ের অত্যাচারে ভীত হইয়া মাধব সত্রীক পূর্ববর্ণিত স্থানে মূর্তিকা-নির্মে অবস্থান করেন এবং তথা হইতেই যশোপাল নৃপতি তাঁহাকে উত্তোলিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, মাধব-প্রতিষ্ঠার পর যশোপালের উপর স্বপ্রাদেশ হয় যে, মাধবের জ্যৈষ্ঠ তখনও সেই গর্ভ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। যশোপালের আদেশে পুনরায় সেই গর্ভ খননকালে খননকারীদের অনবধানতা বশতঃ খনিজের আঘাতে মাধবের জ্যৈষ্ঠ নাসিকা ভগ্ন হইয়া যায়। ইহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভূপ্রোথিত হইলেন, বহু চেষ্টাতেও আর তাঁহাকে পাওয়া গেল না।

কথা প্রসঙ্গে যশোমাধবের প্রতিষ্ঠা-স্থান ধামরাই গ্রামের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে হু একটি কথা বোধ হয় এ স্থানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রোচ্য বিজ্ঞানমহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় ধামরাই সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহার সমর্থন করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

বসু মহাশয় বলিতেছেন,—“বহু দিবস হইল সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ধামরাই নামক প্রাচীন গ্রামের নাম শুনিয়া তৎকালে বলিয়াছিলাম, যেঐ স্থান ধর্মরাজিকা শব্দের অপভ্রংশ। মৌর্য সম্রাট অশোক ৮৪০০০ ধর্মরাজিকা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, এসম্বন্ধে অশোকাবদান হইতে এইরূপ প্রমাণ পাইয়াছি। ‘অশোকো নামা রাজা বভূবেতি। তেন চতুরাণীতি ধর্মরাজিকাসহস্রং প্রতিষ্ঠাপিতং। যাবৎ ভগবচ্ছাসনং প্রাপ্যতে তাবৎ তস্ম যশঃ স্থাপীৎ।’

বসু মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন একখানি প্রাচীন দলিলের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। “সম্প্রতি ধামরাই বাসী শ্রীযুক্ত কামাখ্যা প্রসাদ বসু, বি, এল্ মহাশয় একখানি ৩০০ বৎসরের প্রাচীন দলিল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় ধামরাই গ্রামের প্রাচীন নাম ধর্মরাজিই ছিল। ধর্মরাজি চলিত ভাষায় ধামরাই হইয়াছে। উক্ত অশোকাবদান হইতে জানিতে পারি যে, সম্রাট অশোক যে সকল ধর্ম-রাজিকা প্রতিষ্ঠা করেন, পুণ্ড্রিগ্র সেই সকল ধর্মস করেন। ধামরাই গ্রামে এইরূপ কোন ধর্মরাজিকা ছিল, তাহা হইতেই এই স্থানের ধর্মরাজিকা নামকরণ হইয়া থাকিবে। (২১)

যশোপালের রাজধানী মাধবপুর (গাজীবাড়ী) এবং মাধব মন্দির (আধুনিক মাধব ঢালা) হইতে কিয়দূরে বাইদগাও নামক গ্রামে জীয়াস পুষ্করিণী নামে একটি দীর্ঘিকা



৬নং, মাধবের চৌবাচ্চা।



৭নং, ধামরাইর শ্রীশ্রীগণেশমন্দির।

আছে। সাধারণের বিশ্বাস, যে গাভী অতি অল্প পরিমাণ দুগ্ধ প্রদান করে, তাহার কিঞ্চিৎ জীয়ে পুষ্করিণীতে দিলে গাভী দুগ্ধবতী হয়। উক্ত জলাশয়ের আরও বহু দৈবী ক্ষমতার নানাবিধ গল্প সাধারণে প্রচলিত আছে। জীয়ে নামধেয় বহু পুষ্করিণী বঙ্গের সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, ঐ জলাশয়-সমূহে বৌদ্ধযুগে ধর্মের কোনরূপ প্রক্রিয়াদি সাধিত হইত। (২২) এই অনুমানের কোন কারণ তিনি উল্লেখ করেন নাই। যাঁহা হউক প্রবাদ এই যে, বাইদগাও গ্রামস্থ জীয়ে পুষ্করিণী যশোপালের খনিত।

বাইদগাওর সন্নিকটে কাউইনদিয়ার দীঘি নামক আর একটি অতি বৃহৎ জলাশয় বর্তমান। কাউইনদিয়া গ্রামের নামানুসারেই উক্ত দীঘিকার নাম হইয়াছে। উহার প্রাচীন নাম জানা যায় না। এই দীঘিকাটি যশোপালের রাজধানীস্থিত বড়দীঘি ও ছোটদীঘি হইতেও বৃহত্তর, প্রায় উহাদের দ্বিগুণ হইবে। এই জলাশয়ও যশোপালের খনিত এইরূপ প্রবাদ।

মাধবপুরের সন্নিকটে গণকপাড়া গ্রাম বর্তমান। গণকপাড়া এবং গুড়িয়াপাড়া রেণেলের (Rennel) মানচিত্রে বৃহৎ এবং বিখ্যাত স্থান বলিয়া চিহ্নিত। এই গ্রামদ্বয়ে ও যশোপালের বহু কীর্তিচিহ্নাদি ছিল। নদীর গতি এই স্থানে বহু পরিবর্তিত হওয়াতে উহার প্রায় সমগ্ৰই নদাশ্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। টেলর লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়েরও কতিপয়বর্ষ পূর্বে গুড়িয়াপাড়াতে দুর্গ-প্রাকার সমূহের ভগ্নাবশেষ বর্তমান ছিল। (২৩) টেলরের সময়ের পূর্বেই তাহা নদীকবলিত হয়। প্রবাদ এই, গ্রামদ্বয়ে রাজগণকগণ বাস করিতেন, এবং এখানেও যশোপালের রাজপ্রাসাদ বর্তমান ছিল। এখনও এস্থান বহু ইষ্টকাদি এবং সময়ে সময়ে নানা কারুকার্য-

খোদিত ইষ্টকও দৃষ্ট হয়। (পরসংখ্যায় প্রকাশিতব্য সাতার হইতে সংগৃহীত ইষ্টক-সমূহের চিত্র দ্রষ্টব্য)

হিন্দু রাজত্বের অবসানের পরও এইস্থান সুবিখ্যাত ছিল। বঙ্গের পাঠান নৃপতিগণ যোগল কর্তৃক তাড়িত হইয়া এই প্রদেশেই বহুদিন লুক্কায়িত থাকেন। এবং তখন তাঁহারা গণকপাড়াতে দুর্গ এবং বাসভবনাদি নিৰ্ম্মাণ করেন। ধামরাইর নিকটে পাঠানতলি নামক গ্রাম এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কথিত আছে, ইসলাম খাঁ যখন বঙ্গের রাজধানী পূর্ববঙ্গে স্থানান্তরিত করিতে কৃতসংকল্প হন, তখন তিনি গণকপাড়াতেই বঙ্গের রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু উহা নিয়তুমি এবং অস্বাস্থ্যকর বলিয়া ঢাকাতে রাজধানী স্থাপিত হয় (২৪)। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে, ইসলাম খাঁর পূর্বেও, অর্থাৎ হিন্দু রাজত্বের সময় হইতেই গণকপাড়া সুবিখ্যাত স্থান ছিল। নচেৎ এ স্থানে সমগ্র বঙ্গদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাব হওয়া অসম্ভব।

গড় কাশীমপুর হইতে কিয়দূরে অবস্থিত জরুন এবং সুরাবাড়ী নামক পল্লীদ্বয়ে যশোপালের কীর্তি-চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়।

জরুন গ্রামে কতিপয় বর্ষ পূর্বে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একটি প্রাচীর দৃষ্ট হয়। পরে আরও বিস্তৃত ভাবে ঐ স্থান খনন করাতে বহু অট্টালিকার চিহ্নাদি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রবাদ এই, ঐ স্থানে যশোপালের বাসভবনাদি ছিল।

কালবশে উহা ভূ-প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। সুরাবাড়ী গ্রামেও ৪৫ মাস পূর্বে মৃত্তিকা খননকালে একটি অট্টালিকার ভূ-প্রোথিত ভগ্নাবশেষ বহির্গত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পূর্ববঙ্গে হরিশচন্দ্রপাল, যশোপাল, শিশুপাল, প্রভৃতি পাল রাজগণের যে সমস্ত কীর্তি-চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়, তাহার সমস্ত স্থানেরই ইষ্টক সমূহ দুর্গ প্রাকার, এবং পরিখা প্রভৃতিতে অভ্যাস্চর্য্য

(২২) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন। প্রবাসী, আষাঢ়, ১০১১।

(২৩) Taylor's Topography & Statistics of Dacca.

সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সুরাবাড়ী
সাতার প্রভৃতি সমস্ত গ্রাম, জরুন, মাধবপুর, একডালা,
সমস্ত স্থানের স্থানই আমি দর্শন করিয়াছি, এবং
কিছু কিছু ইষ্টকাদিই আমার নিকট সংগৃহীত আছে,
এইসবের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

পূর্বে যে সমস্ত স্থানের বিষয় উল্লিখিত হইল, তদ্ব্য-
তীত বড়ইবাড়ী গ্রামে যশোপালের বহু কীর্তি-চিহ্নাদি
দৃষ্ট হয়। এ স্থানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বড়ইবাড়ী
গ্রামটি ভুরাগ নদীর উপর অবস্থিত, নদীতীর হইতে
বর্তমান বড়ইবাড়ী গ্রাম প্রায় এক মাইল উত্তর দিকে।
গ্রামের উত্তরে একটি সমুদ্র ভূমিখণ্ডের উপর যশো-
পালের কীর্তি-চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়। ঢোল সমুদ্র সর্বপ্রথম
উল্লেখযোগ্য। এরূপ স্মরণীয় দীর্ঘিকা এ অঞ্চলে অল্প
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রায় তিন খাদা ভূমির উপর এই
স্মরণীয় দীর্ঘিকা বিরাজমান। ইহার গভীরতাও
সুপ্রসিদ্ধ; শীত কালেও ইহাতে প্রায় ১৫১২০ হাত জল
থাকে। কথিত আছে যে, দীর্ঘিকার নিম্ন হইতে ঢোল
বাজাইলে উপর হইতে তাহার শব্দ শুনা না যায়,
যশোপাল নৃপতি এইরূপ গভীর করিয়া এই দীর্ঘিকা
খনন করিতে আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে ইহার
নাম ঢোল সমুদ্র হইয়াছে। এই প্রবাদ-বাক্য মিথ্যা
বলিয়া মনে হয় না। কিরূপ গভীর করিয়া খনন করিলে
জীর্ণ সংস্কার ব্যতীতও, খননের প্রায় সহস্র বৎসর
পরে শীত কালে দীর্ঘিকাতে ১৫১২০ হাত জল থাকিতে
পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ঢোল সমুদ্রের উত্তর ও
পশ্চিম দিকে বাধান ঘাটের চিহ্ন অত্যাধিক বর্তমান
আছে।

ঢোল সমুদ্র হইতে অনতিদূরে কোটামণি নামক আর
একটি দীর্ঘিকা বর্তমান। ইহা ঢোল সমুদ্রের ত্রায় বৃহৎ
না হইলেও ক্ষুদ্র নহে। ইহাও প্রায় এক খাদা
ভূমির উপর খনিত। কোটামণির পশ্চিম দিকে বাধান
ঘাটের চিহ্ন বর্তমান। এই জলাশয়ের পশ্চিম তটে
রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে বহু ইষ্টক
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। যদ্যাহলে

একটি ভগ্ন স্তূপ আছে; উহার বাস প্রায় ১০।১২ হাত।
শুনা যায়, রাজবাটীর সন্নিহিত স্থলে হল-চালনা কালে
রূষকগণ প্রাচীন মুদ্রাদি, এবং ইষ্টক অথবা প্রস্তর-খোদিত
মূর্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমরা বহু অনুসন্ধানও
বড়ইবাড়ী হইতে কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

রাজবাটীর অভ্যন্তরে কোটামণি হইতে কিঞ্চিৎ দূরে
আর একটি অনতিবৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। উহা
রাজ্যান্তঃপুরান্তবর্তী ছিল, এইরূপ প্রবাদ, এতদ্ব্যতীত বড়ই-
বাড়ীতে আর একটি পুষ্করিণী বর্তমান আছে; তাহাও
বেশী বড় নহে। ঐ জলাশয়ে রাজার হস্তী স্নান করান
হইত, এইরূপ জনশ্রুতি।

বড়ইবাড়ী হইতে প্রায় চারি মাইল উত্তরে
জাটিলিয়া গ্রামে যশোপাল-খনিত আর একটি দীর্ঘিকা
দৃষ্ট হয়। উহাতেও একটি বাধান ঘাটের চিহ্ন অত্যাধিক
বর্তমান।

জাটিলিয়া হইতে কয়েক মাইল উত্তরে বজুরি নামক
গ্রাম। এখানেও যশোপালের বাটীর ভগ্নাবশেষ বর্তমান।
রাজবাটীর পূর্ব ও দক্ষিণে দুইটি দীর্ঘিকা আছে, এবং
তাহাতে বাধান ঘাটের চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়।

এ অঞ্চলে যশোপাল রাজার কীর্তি-চিহ্নাদির বিবরণ
আমি যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, উপরে তাহা
বিবৃত হইল। এতদ্ব্যতীত অরণ্যভাঙ্গরে হয় ত আরও
বহু ধ্বংস-চিহ্নাদি বর্তমান আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।

প্রকাশ্যে

[বিগত ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে, চট্টগ্রামে কর্ণফুলির সাগর-
সঙ্গমে যে জলন্ত দৃষ্ট হইয়াছিল পরীক্ষণ হইতে তদ্বর্ণনে
বিরচিত]

১

‘ওগো মেঘ, ওগো গ্রামস্থানর,
সিঞ্চ-গভীর গজ্জন,
যন চিকণ, পুঙ্কর-সুত
চিত্ত-অতল-মস্থন।
উজ্জ্বাস উঠে হৃদি অঞ্চলে
গস্তীর তব ছন্দে ;
নব-রোমাঞ্চে এতনু তরলে,
নিবেদিত হয়ে নন্দে’।
এস এস বধু, হৃদয় আসনে
বৈরাগী তব বহিয়া
উৎকস এই হিয়া-উল্লাসে
হৃদয়ে লহ গো কাঁপিয়া !’

২

নামি’ এল মেঘ কানফুলি বৃকে
মহর ধীর গরবে,
কুল কোলিঙ বৃংহিত যার
বঙ্গসাগর গরভে !
এল গর্জিত দিগ্গজ সম
আফালি’ মহা শুণ্ডে—
সাগর-বগ্নে কুর্দন-জাত
মৃত্তির ভরা ভুণ্ডে !
ভীত উৎসুক বিশ্ব-নেত্র
স্তম্ভিত রহে লক্ষি’
নদীর বকে নামিছে ও কি ও’
—কালো গজরাজ পক্ষী !

৩

ফুলিয়া উঠিল তটিনী-বক
উজ্জ্বল যন সঘনে !

ছুটে খনায়িত তড়িত-জড়িত
পিচকাই যেন গগনে !
মস্থিত বোম্বিকন্দর হতে
মন্দরে কিগো সিদ্ধ—
ফেণ-ফণাকুল লিহ লিহ করি’
উগরে অণ-বিন্দু !
পূর্বে পাহাড় পছিম সিদ্ধ
নেহারে মুঞ্চ নয়নে—
নদী উধাইছে হিয়া-উজ্জ্বাসে
প্রকণ্ডে ও কি গগনে !

৪

লক-লকি উঠে সলিল ধমনী
শুভ আকারে ছাপিয়া !
দিকে দিকে উঠে নিসর্গ মুখ
বাষ্প বসনে আঁপিয়া !
কে তুমি—কে তুমি বর্ষা বাসরে
বিরঙ্গে আজি খেলিছ ?
জল-কুণ্ডলী চুমুকে উর্কে
প্রাণ স্ফুটনে পুরিছ ?
ধরা ধমনীয়ে উর্ক আকাশে
যন চুম্বনে টানিয়া
কে লইছ তুমি ? বরষিতে পুনঃ
সলিল-সত্রে ঢালিয়া ?

৫

হ্যালোকে-ভুলোকে নেত্র সমুখে
প্রণয়ের চির কাহিনী
অ-তনু আবেগে জগতের তনু
উল্লাসে দিবা যামিনী
বিশ্ব ভুবনে প্রকাশে-গোপনে
প্রেমের প্রতিমা বারতা ;
এ’ উহারে টানে আপনার বৃকে
প্রকাশি মর্ম-মমতা’

আপনার বৃকে ডাকিয়া উর্কে
সৃষ্টি শিহরে হর্ষে ;
এক গুণে লয়ে উর্ক পুন সে
ভাঙার ভাঙি বর্ষে !

শ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন ।

নামিকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনের কথা

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারম্ভে নামির ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল । শীত্রেই সে আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু একদিন অনেক রাত পর্যন্ত ষাণ্ডড়ীর পোশাক সেলাই করিয়া আবার সে পীড়িত হইয়া পড়িল । আজ মাসের পনেরই, আজও সে শয্যাশায়িনী ।

প্রতি বৎসরই শীতের সময় লোকে বলে যে এবারকার মত শীত আর কখনো হয় নাই ; কিন্তু এ বৎসর তাহাদের মন্তব্যের বথার্থতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না ; প্রতিদিন কনকনে উত্তরে বাতাস বহিতেছিল, তুষার ও রষ্টিপাত হইতেছিল—পরিষ্কার দিনেও শীতে হাড় পর্যন্ত কম্পমান । বলিষ্ঠ লোকেরা পীড়িত হইয়া পড়িল, দুর্বলেরা মরিতে লাগিল—সংবাদ পত্রে মৃত্যুর সংবাদ যথেষ্ট বাহির হইতেছিল । নামি বলিষ্ঠ ছিল না, শীতের জ্ঞাত সে সারিয়া উঠিতে পারিতেছিল না ; বিশেষ কোনো রোগের লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও মাথা ভার, ক্ষুধার লেশমাত্র নাই, এই অবস্থায় মম্বর তাবে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল ।

ঘড়িতে সেই মাত্র দুইটা বাজিয়াছে । বাজার শব্দ মিলাইয়া গেলে কিছু কালের জন্য সমস্তই নিস্তব্ধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । ঘড়ির মৃদু টিক্ টিক্ শব্দ নিস্তব্ধতা যেন আরও বাড়াইয়া তুলিল । বড় সুন্দর ; নবীন বসন্ত

কালের নীলিমা চারিখানি কাগজের পর্দার অন্তরালে ঢাকা পড়িলেও, সূর্য্যের মৃদু আলোকে তাহাদের উপর উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছিল । নামি শুইয়া শুইয়া একটি কালো মোজা বুনিতেছিল ; তাহার চপল অঙ্গুলির চারিদিকে ও তুষার ভ্রম বালিসের উপর অঘরে ছড়ানো মশৃণ চুলের উপর কয়েকটা অদৃশ্য আলোকের রশ্মি যেন নাচিয়া বেড়াইতেছিল । বাম দিকে পর্দার উপর রঙীন পাতার ক্ষীণ ছায়া একটি পিতলের পাত্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ; দক্ষিণে একটি স্থলকাণ্ড পুরাতন গ্রাম গাছের ছায়া স্পষ্ট দেখা যায়, উহার নয় শাখাগুলি কোলাকুলি করিয়া রহিয়াছে । তাহার উপর সামান্য দুই চারিটা ফুল বসন্ত যে এখনো নিতান্ত অপরিণত তাহাই জানাইতেছিল । পর্দার মাথায় তক্তাখানির উপর রৌদ্র পোহাইতে ব্যস্ত বিড়াল শিশুর ক্ষুদ্র মন্তকের ছায়া পরিয়াছে । সূর্য্যের আলোকে আকৃষ্ট হইয়া একটি পতঙ্গ আসিয়াছিল, উহাকে ধরিবার জন্য বিড়ালটি লাফাইয়া উঠিল, ধরিতে না পারিয়া মেজের উপর চিংপাত হইয়া পড়িয়া গেল । কিন্তু তাহার যেন খেয়াল নাই, যেন সে ধাবাগুলি চাটিতে চাটিতে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতেছে । তাহার মন্তকের প্রতিবিম্বটি কেবলি নড়িতেছে । নামি কাগজের উপরকার ছায়ার সমস্ত ঘটনাটি দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিল, তার পর, চোখ টাটাইয়া উঠিয়াছিল তাই চক্ষু মুজ্রিত করিয়া স্থির হইয়া রহিল । তার পর পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া অর্ধসমাপ্ত মোজাটা এক বার ধাবড়াইয়া লইল, সূঁচ-গুলি আবার কাজ আরম্ভ করিয়া দিল ।

বারান্দার উপর গুরু পদশব্দ শুনা গেল, একটি স্থল মন্থমুণ্ডির বেঁটে ছায়া কাগজের পর্দার গায়ে গায়ে চলিতেছিল । অবিলম্বেই ছায়াটি ধামিল, কাণ্ডা-ধিমা গৃহিণী প্রকাশিত হইলেন । ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি বিছানার ধারে বসিলেন ।

“আজ কেমন আছ ?”

“অনেক ভালো, মা, উঠিতে পারি কিন্তু—”

কাজ রাখিয়া পরিধেয় বসন গুছাইয়া নামি উঠিয়া বসিতে গেল, বুদ্ধা নিবারণ করিলেন।

“না, না ও রকম করো না। আমি ত আর বারের লোক নই, আমি এলুম বলে কিছু করতে হবে না। এই যে আবার তুমি বুনছিলে! ওটাও আর করতে পারবে না। অসুখ হলে নিজের যত্ন ছাড়া আর কিছু করতে নেই। তাকেওর জন্ত এ সব ভুলে গেলে ত চলবে না, নামি। সাবধানে থেকে শীগ্গির সেরে ওঠো বাছা—”

“এই অনেক দিন থেকে বিছানায় পড়ে রয়েছি তাই—” “এমনি করে কি মার সঙ্গে কথা কয়? আমি এ রকম ভালোবাসি না। তুমি যেন তারি দূরে দূরে থাক।”

বুদ্ধার মনে যাহা ছিল সমস্ত বলিলেন না। তিনি বলিতেন আজ কালকার বধূরা খাণ্ডড়ীকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা করে না। নামির অন্তত একটি গুণ তিনি স্বীকার করিতেন তাহার এ দোষ লেশ মাত্র ছিল না। কিন্তু আজ তিনি অত কিছু ভাবিতেছিলেন; হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িয়াছে এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিলেন, “তাকেওর চিঠি পেয়েছ, না? কি লিখেছে?”

নামি বালিশের তলা হইতে একখানি চিঠি বাহির করিল, খানিকটা অংশ তাঁহাকে দেখাইয়া বলিল, “আসচে শনিবার আসবেন লিখেছেন।”

“তাই নাকি?”

চিঠিখানির উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া বুদ্ধা উহা ফেরত দিলেন। “হ্যাঁ, তোমাকে হাওয়া খেতে নিয়ে যাবে, এ সব কথা কি লিখেছে। এই শীতের সময় ঘুরে ঘুরে বেড়ালে তোমার শরীর ভালো থাকলেও অসুখ হয়ে পড়বে। চুপ করে শুয়ে থাকলে সর্দিকাশি শীগ্গিরই সেরে যায়। তাকেও ছেলেমানুষ কি না তাই একেবারে ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়ে; ডাক্তার ডাকান, হাওয়া খেতে যাওয়া এই সব কথা বলে। ছেলেবেলায় অল্পস্বল্প অসুখে আমি কখনও বিছানায় শুই নি, যখন ছেলে হলো তখনো দশ দিনের বেশ

শুই নি। তাকেওকে লেখো তোমার জন্ত যেন না ভাবে, আমি ত এখানে রয়েছি।”

বুদ্ধা হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ দেখিয়া তিনি যে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা বুঝা গেল। যখন তিনি বাহির হইয়া গেলেন নামি উঠিয়া বসিয়া বলিল, “মা প করবেন, উঠতে পারলুম না।” তারপর সে একটি নিশ্বাস ফেলিল।

মাতা যে পুত্রের পত্নীর উপর ঈর্ষান্বিতা হইতে পারে এ কথা সে কেমন করিয়া বিশ্বাস করে! কিন্তু পতির প্রত্যাবর্তনের পর সে দেখিয়াছে, তাহার ও শাণ্ডড়ীর মধ্যে কি একটা আশ্চর্য্য ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে।

সমুদ্রযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাকেও দেখিল নামির স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহার অনুপস্থিতির সময় ভাবিয়া ভাবিয়াই যে এরূপ ঘটনা ঘটেছে তাহাতে সন্দেহ নাই! পত্নীর প্রতি স্নেহ ভালবাসায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। পতির সোহাগ যত্ন নামির সুখের আর অন্ত রহিল না, কিন্তু ঋণ ঠাকুরাণী ঈর্ষান্বিতা হইতেছেন মনে করিয়া সে চিন্তিত হইয়া উঠিল। এমন স্বামিকে ভালবাসিয়া ও তাঁহার ভালবাসা পাইয়া আবার তাকেওর মাতার জায় খাণ্ডড়ীর ভূমিসাধনে যত্নবান হওয়া—এ কী বিড়ম্বনা!

“কাতো-সান আপনাকে দেখতে এসেছে।”

পরিচারিকার কথা শুনিয়া নামি চক্ষু মেলিল। অভ্যাগতকে দেখিয়া মুখখানি তার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

“এই যে ওচিজু-সান! বেশ করেচ তাই এসেচ।”

“আজকে কি একটু ভালো বোধ হচ্ছে?”

রেশমী হাত-ব্যাগ ও ক্রেপের মণ্ডকাবরণটি এক পাশে রাখিয়া শিমাদা-খোঁপা-বাধা একটি সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা নামির বিছানার দিকে অগ্রসর হইল। তাহার কৃশ তরু কালো ওভারকোট চাকা, সুগঠিত ক্রয়গুলের নাচে কালো চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সে চিজু-কাতো, নামির মাসি মা ব্যারণেশ কাতোর জ্যেষ্ঠা কন্যা।

শৈশব হইতেই, যখন তাহার। কিশোরগার্টেন পড়িত, নামি ও চিজুর মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। নামির ছোট বোন বেচারি কোমা প্রায়ই অভিযোগ করিত, তাহার একটিও খেলার সঙ্গী নাই। নামির বিবাহের পর ইস্কুলের সঙ্গীরা কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িল, রহিল কেবল চিজু। সে নামিদের বাড়ীর নিকটেই থাকিত; প্রায়ই সে নামির সহিত দেখা করিতে আসিত। তাকেওর সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি কালে দুঃখভারপীড়িত নামির নিঃসঙ্গ জীবন যখন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাকেওর প্রেমপূর্ণ পত্র ও চিজুর আগমনেই তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিত।

ঈশ্বর হস্ত করিয়া নামি কহিল, “আজ অনেকটা ভাল বোধ হচ্ছে : কিন্তু মাথাটা এখনো ভার, কাশিটাও কমচে না।”

“তাই ত! তা হলে ত ভাল নয়। বেজায় শীত পড়েচে।”

পরিচারিকার দিকে দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করিয়া তাহার প্রদত্ত আসনে সে নামির নিকটে গিয়া বসিল, হীরকাসূরীশোভিত হাত দুখানি আগুনে গরম করিয়া বার বার স্বীয় গোলাপী কপোলের উপড় চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

“মাসি-মা যেসোমশাই দু'জনেই ভালো আছেন?”

“হাঁ ভালো। তারি শীত পড়েচে, তাই তাঁরা তোমার জন্য ভাবচেন। এই কাল রাত্তিরে আমাদের কথা হচ্ছিল যে, তুমি একটু সেরে উঠলেই তোমার জুশিতে হাওয়া খেতে যাওয়া দরকার। এতে তোমার নিশ্চয়ই উপকার হবে।”

“তাই নাকি? তাকেও যোকোস্কা থেকে লিখেচে যে, আমার হাওয়া বদলানো দরকার।”

“তা হলে ত তোমার যত শীত সম্ভব যাওয়া উচিত।”

“যাই বা না যাই শীগ্গিরই ত সেরে উঠব।”

“খুব সাবধানে থাকতে হবে তোমার।”

পরিচারিকা চিজুর জন্য চা লইয়া প্রবেশ করিল।

“কানে, মা কোথায়? লোক এসেচে? কে? পাড়া গাঁ থেকে এয়েচে? ও-চিজু-সান তোমার বোধ হয় আজ খুব অবসর আছে, কেমন? কানে, ওচিজুর সঙ্গে ভালো কিছু নিয়ে এস।”

“কেন আমি ত প্রায়ই আসি। আমার সঙ্গে আবার এত আয়োজন কেন?—রোসো” (একটি ছোট বাক্স বাহির করিয়া) “তোমার খাণ্ডুড়ী ভাতের পিঠে খেতে ভালোবাসে, না? তাঁর জন্য অল্প এনেচি। লোক কেউ থাকে ত এর পরে নিয়ে যেও।”

“বেশ করেচ। তিনি খুব খুসি হবেন।”

তারপর চিজু কয়েকটি লাল কমলা লেবু বাহির করিল। “এই দেখ কেমন! এগুলি তোমার জন্যে। কিন্তু বেশী মিষ্টি নয় বোধ হয়।”

“বেশ, বেশ। আমার জন্যে একটা ছাড়াওনা ভাই?”

চিজু তাহাকে একটি ছাড়াইয়া দিল। নামি সেটি পরম তৃপ্তির সহিত খাইতে খাইতে কপোলের উপর পতিত চূর্ণ কুন্তলগুলি পিছনে ঠেলিয়া দিতে লাগিল।

“অনুবিধে হচ্ছে, না? আলুগা করে বাঁধলেই হয়। দাঁড়াও, ঠিক করে দিচ্ছি। বসতে হবে না।”

পার্শ্বের ঘর হইতে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আনিয়া সে ধীরে ধীরে নামির চুল আঁচড়াইতে লাগিল।

আমাদের কালকের সভার কথা তোমায় বলি নি, তোমার কাছেও চিঠি এসেছিল ত? খুব আনন্দ করা গেছে, সকলেই তোমায় ভালোবাসা জানিয়েছে।” একটু হাসিয়া সে বলিতে লাগিল, “এই বছর খানেক আমরা ইস্কুল ছেড়েছি কিন্তু এর মধ্যে প্রায় বারো অনার বে হয়ে গেছে। ওকুবো-সান, হোন্দা-সান, কিতাকোজি-সান—এদের যদি দেখতে! মাথায় তাদের মারুমাওে খোঁপা, কী গম্ভীর! লাগচে না ত? তারা সব নিজের কথা নিয়েই ব্যস্ত। তারপর আমাদের তর্ক হল, ছেলের বে হলে তার বাপ মার সঙ্গে থাকা উচিত কি না—এই বিষয়ে। কিতাকোজি-সান বললে উচিত, তার না কি গিন্নীপনা কিছুই জানা ছিল না, তার

খাণ্ডী ঠাকরুণ তাকে নাকি খুব সাহায্য করে। ওকুবো-
সান বললে উচিত নয়, তার খাণ্ডী—তুমি ত জানই,
বেলায় ষিট ষিটে।”

“হাসবো কত! তারপর আমিও তর্ক জুড়ে দিলাম,
তারা বলে আমার বলবার কোনো অধিকার নেই, কারণ
আমি এখনো তাদের দলের বাইরে। এখানটা বেশী
কশা হল কি?”

“না, না। কাল তা হলে খুব মজা হয়েছে বল!
যার যেমন অভিজ্ঞতা সে তেমনি বলেছে আর কি।
সব বাড়ী ত আর এক রকম নয়, একটা নিয়ম কেমন
করে হয় বল। মাসী এক বার কি বলেছিলেন তোমার
মনে পড়ে কি ওচি জু? তিনি বলেছিলেন যে, অল্প বয়সীরা
একসঙ্গে থাকলে স্বার্থপর আর কুড়ে হয়ে পড়ে। আমার
মনে হয় তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন। বয়স্কদের
অবহেলা করাটা উচিত নয়, তোমার কি মত?”

নামি মেয়েটি ছিল একটু ভাবুক ধরনের, সংসার কি
ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাহার একটা
নির্দিষ্ট ধারণা ছিল। পিতার উপদেশগুলি সে আগ্রহ-
সহকারে শুনিত, বিমাতার ধারণাধারণ তাহার পছন্দ
হইত না। বাড়ীর গৃহিণী হইয়া যে দিন নিজের অভি-
প্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে, সেই দিনের
অপেক্ষায় সে ছিল। কিন্তু কাওয়ামিমা পরিবারে আসিয়া
দেখিল সবই উল্টা—স্বপ্নেও সে এরূপ ভাবে নাই।
এখানে শাসন কার্য্যটা সমস্তই বুড়ো রাণীর হাতে, সে যেন
নামেমাত্র রাণী! কিছু কাল এই নূতন অবস্থার অসুগত
হইয়া শুভ দিনের অপেক্ষায় থাকা—ইহাই সে করিতে
ছিল। কিন্তু যখন দেখিল, সে স্বামী ও খাণ্ডীর মধ্যে
আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইচ্ছা মত পতির পরিচর্যা করিতে
পারিতেছে না, তখন সে নিজের দুর্ভাগ্য স্বরণ করিয়া
গোপনে অশ্রু বিসর্জন করিত। বিমাতা পৃথক বাসের
পক্ষপাতী ছিলেন, নামি এক দিন মনে করিয়াছিল উহা
দেশের উপযোগী নয়; কিন্তু এখন—এখন সে ভাবিত
বুঝি বা বিমাতার মতটাই ঠিক। কিন্তু বহুদিন হইতে

সবদ্রে সে যে মত পোষণ করিয়া আসিতেছিল তাহাও
হঠাৎ পরিত্যাগ করা নামির পক্ষে অসম্ভব।

চিজু নামির চুল সাদা ফিতা দিয়া বাঁধিয়া দিল।
বিমাতার অধীনে দশ বৎসর, এবং খাণ্ডীর অধীনে
প্রায় এক বৎসর যে কাটাইয়াছে সেই ভগ্নীর মনোভাব
বৃদ্ধিতে অসমর্থ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া ধীর
স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—“তিনি কি এখানো রাগারাগি
করেন না কি?”

“হ্যাঁ, কখনো কখনো, কিন্তু অসুখ হয়ে পর্য্যন্ত ভালো
ব্যাভারই করতেন। কিন্তু—তাকেওর কথা অত করে ভাবি
এটা ঠুঁর ভালো লাগে না, মুশ্কিল হয়েছে এই। তাকেও
আবার বলে এখানে মা-ই হলেন রাণী তাঁর মনস্তত্ত্বের
চেষ্টা করতে হবে আমাকে! যাক্ এ সব কথা থাক।
হ্যাঁ, আমার এখন বেশ আরাম হচ্ছে, ধন্যবাদ। মাথাটা
অনেক হালকা হয়ে এসেছে।” খোঁপায় হাত বুলাইতে
বুলাইতে নামি শ্রান্তভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

চিকুণিখানি রাখিয়া দিয়া নরম কাগজে চিজু হাত
মুছিয়া ফেলিল। ক্ষণকাল আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া
একটি ছোট বাগ্ন দেধিতে পাইল। বাগ্নটি খুলিয়া কি
একটি বাহির করিয়া বলিতে লাগিল—“কাঁ চমৎকার!
এটি দেখতে আমার এত ভালো লাগে। তাকেওর পছ-
ন্দটি খুব ভালো বলতে হবে কেমন?” (আসনে প্রত্যা-
বর্তন করিয়া) “শুজি কেবলি আমাকে ফরাসি নয় জর্মন
পড়তে বলে। সে মনে করে এর মত একটা ভাষা
রাজনীতিবিদের দ্বীর জানা দরকার। কিন্তু যে শক্ত!”
চিজুর ভাবী পতির নাম শিজু। সে বৈদেশিক বিভাগের
এক জন কর্মচারী।

নামি হাসিয়া বালিল, “তোমার মাথায় মাক্রমাণ্ডে
খোঁপা দেখতে আমার বড় ইচ্ছে হয়, কিন্তু শিমাডা
খোঁপায় তোমায় এমনি মানায়!”

“সত্যি!”

তাহার সুন্দর ক্রয়গল কুঞ্চিত হইয়া আসিল, অধর
কোণে একটু খানি হাসি বিকস্মিক করিয়া উঠিল।

“নামি-সান তোমার মনে আছে বোধ হয় হাঙি-ওয়ারা-সানকে। আমাদের এক বছর আগে যে ইস্কুল থেকে বেরিয়েছিল?”

“আছে বৈ কি, যার সঙ্গে মাৎসুদাইরার বে হয়েছিল।”

“সেই গুন্ডি কাল তাকে তার স্বামী ত্যাগ করেছে।”

“তাই না কি? কেন, কি হয়েছিল?”

“শুভ্র স্বাভূতী তাকে খুবই ভালোবাসত, কিন্তু মাৎসুদাইরার পছন্দ হল না তাকে।”

“হ্যাঁ! মাৎসুদাইরা একটা খারাপ মেয়ে মানুষের সঙ্গ নিয়ে এমন নিঃস্বর্জ ব্যভার করতে লাগল যে, হাঙিওয়ারা-সানের বাবা রেগে বল্লেন এমন লোকের সংশ্রবে মেয়েকে রাখবেন না। তিনিই মেয়েকে নিয়ে গেছেন।

আহা! কেন পছন্দ হল না? লোকটা ত ভারি নিষ্ঠুর।”

“বাস্তবিক কথাটা ভাবলে রাগ হয়। শুভ্র স্বাভূতীর ভালবাসা পেয়েও স্বামীর ভালোবাসায় বঞ্চিত হওয়া কি দুর্ভাগ্যের কথা!”

নামি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

“একই ইস্কুলে একই ঘরে যারা পড়েছিল তারা এখন কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, অদৃষ্টে বা ছিল তাই ঘটেছে। ভাবলে আমার ভারি দুখা হয়! ওচিজু, ভাই, আমরা চিরকাল বন্ধু থাকবো, কেউ কাকেও ত্যাগ করবো না, কেমন!”

“আমরাও প্রার্থনা তাই!”

অজ্ঞাতসারে তাহাদের হস্ত মিলিত হইল। কিছুক্ষণ পরে নামি জীবৎ হাসিয়া বলিল, “এখানে একলাটি যখন শুয়ে থাকি তখন কত কথাই যে ভাবি তা আর কি বলবো! একটা ভাবনার কথা তোমায় বলি, হেসো না কিন্তু। যখন অনেক বছর পর আমাদের অল্প কোনো দেশের সঙ্গে লড়াই হবে, আর জাপান জিতবে। তখন ওজি-সান বৈদেশিক ব্যাপারের মন্ত্রী হয়ে সন্ধি করতে যাবে

আর তাকেও আমাদের নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হয়ে শত্রুর বন্দরে বন্দরে জাহাজ রেখে দেবে—”

“আর আকাশাকার মেশোমশাই স্থল সৈন্তের প্রধান সেনাপতি হবেন, আর আমার বাবা, পাল'গামেটে, যুদ্ধের খরচের জন্তে কোটি কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়ে এক ‘বিল পাশ’ করাবেন।”

“আর তখন ওচিজু-সান আর আমি ‘রেড্‌ ক্রশের’ সভ্য হব।”

চিজু হাসিয়া বলিল, “কিন্তু গায়ে জোর না থাকলে ত তুমি তা করতে পারবে না।”

নামি যেই হাসিয়াছে অমনি কাশিতে লাগিল। ডান বুকের উপর সে হাত রাখিল।

“আমরা বড্ড বেশী বকেছি! ওখানে ব্যথা নাকি?” “কাশলে এই ধানটায় লাগে”, বলিয়া নামি দিবসের স্নানায়মান আলোকের দিকে চক্ষু ফিরাইল।

শ্রীহেমলিনী রায়।

ঘুঘু পাখী *

ঘুঘু পাখীকে আমাদের দেশে ঢুপী বলে। ইহার প্যারাবত জাতীয় পাখী। ইহাদের দৈহিক গঠন, ঠোঁট, পা, শব্দ, উড়িবার ভঙ্গী অনেকাংশে প্যারাবতেরই অনুরূপ।

ঢুপী দুই জাতীয়—“তিলা ঢুপী” ও নীলা ঢুপী”। তিলা ঢুপী আমরা যেখানে সেখানে দেখিতে পাই। ইহার আমাদের প্রতিবেশী। ছেলেবেলায় নীলা ঢুপী অনেক দেখিয়াছি। জঙ্গল আবাদ হওয়ায় ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, দেহে তৈলের আধিক্য এবং মাংসের স্বাদ ইহাদের বংশ ধ্বংসের সহায়তা করিতেছে। এখন ‘নীলা ঢুপী’ খুব কমই দৃষ্ট হয়। প্রাথমিক জীবনে ঢুপীর আকৃতিবিশিষ্ট লাল রঙের

পাখী দেখিয়াছি, উহা ঢুপী কি না জানি না ; উহার স্থিতি মাত্র আছে, অথ সংবাদ জানি না। এখন আর ঐ পাখী দেখা যায় না। উহা ঢুপী কি না জানি না, তবে ইহাদের গঠন ঢুপীরই অনুরূপ।

তিলা ঘুঘু।

তিলা ঢুপী আমাদের দেশে সর্বদাই দৃষ্ট হয়। ইহার লম্বায় ১০।১১ ইঞ্চি ; শরীরের বর্ণ ধূসর ও চক্চকে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পালকের অগ্রভাগ বিত্তীয়ার চন্দ্র-কলার মত ; বর্ণ মলিন গেরিমাটির মত। দূর হইতে কতকটা মাছের আঁশের মত দেখায়। ডানার বা পুচ্ছের পাখায় (quill) ঐ রূপ চন্দ্রক নাট। ডানা দৃঢ়, হালকা এবং অত্যন্ত শ্রমসহ। দেহের উপরিভাগের, বকের ও গলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালক গুলিও ধূসর এবং চক্চকে। পেটের নিম্নভাগের পালক মেটে সাদা। পুচ্ছের নিম্নভাগের কতক পালক ধূসর এবং কতক পালক মেটে সাদা। গলার চারিদিকে উজ্জল ধূসর বর্ণের উপর উজ্জল নীল ছিট তিলের মত দেখায়। এই তিলের দাগ থাকায়ই ইহার নাম তিলা ঢুপী। ইহাদের মস্তক ছোট, গলা সরু, ঠোঁট ঈর্ষ ইঞ্চি লম্বা, পাতলা ও নরম। অগ্রভাগ স্থূল ও ধারবিহীন। উপরের ঠোঁটের স্থলগ্র ঈষৎ বক্র। ঠোঁটের গোড়ায় দুই দিকে নাকের ছিদ্র এবং উহার উপরিভাগ ঈষৎ ক্ষীত। চক্ষু দুটি পাতনাই মস্তুর মত বড়, উজ্জল টল্টলে রুম্ববর্ণ ; তাহার চারিদিকে মেটে হরিদ্রাত সরু বেষ্টনী। চক্ষুর উপর অতি পাতলা ধূসর বর্ণের পরদা আছে। উহা চক্ষুর পলক ফেলিতে ব্যবহৃত হয়, এবং ঐ পরদা দ্বারা চক্ষু ঢাকিয়া নিদ্রা যায়।

ঘুঘুর পা তিন ইঞ্চি লম্বা, বর্ণ ধূসর। হাঁটু পর্যন্ত ধূসর। পালকের যে সকল স্থান সাদা তাহা পাখীটি বসিয়া থাকা অবস্থায় প্রায় দেখা যায় না, উড়িয়া চলিবার সময় মাত্র দৃষ্ট হয়।

ঘুঘু পাখী কখন কখন কয়েকটিতে দলবদ্ধ হইয়া শস্য ক্ষেত্রে পতিত হয়। ঘুঘুর দাম্পত্য প্রণয় উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রায়ই যোড়া ছাড়া হয় না। পুরুষ বা স্ত্রী ঘুঘুর মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। উভয়ে বিভিন্ন বৃক্ষশাখায় বসিয়া পালাক্রমে গান করিয়া থাকে। কখন কখন গাছে গাছে বহুসংখ্যক ঘুঘুর করুণ আর্তনাদ শোনা যায়। তাহার সঙ্গীতে যেন কি এক বিষাদ—কাহার জ্ঞাত মর্মান্বিত রোদন দিগন্ত ছাপাইয়া পড়ে। বর্ষার শেষে যখন শারদ গগন নির্মল হয় এবং বঙ্গদেশ শস্যশ্রামল হইয়া উঠে তখনই বঙ্গপল্লী সমূহে বিহঙ্গমের সুমধুর কাকলী শোনা যায় ; ঘুঘুও এই সময়েই গান করে। গান করিবার সময় ঘুঘুর গলাও পারাবতের গলার মত ক্ষীত হয়। তখন সুন্দর দেখায়। কখন কখন ঘুঘু “ঘু-ঘু-ঘু” “ঘু-ঘু-ঘু” করিয়া করিয়া মাথা কুটিতে থাকে।

ঘুঘু অতি চতুর। ইহার অত্যন্ত গোপনীয় স্থানে কয়েকখানা খড়কুটা দিয়া বাসা নির্মাণ করে ; কখন কখন একটু মজবুত রকমের বাসাও তৈয়ার করিয়া থাকে। ঘুঘু ফাল্গুন মাসে দুই তিনটি ডিম পাড়ে।

কেহ ঘুঘুর বাসার সন্ধান পাইলে, ঘুঘু তৎক্ষণাৎ সেই বাসা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। ঘুঘু এ অবস্থায় অত্যন্ত আশ্চর্য্য বুদ্ধি-কৌশলে ডিম লইয়া নূতন বাসায় গমন করে। ডিমের উপর মল ত্যাগ করিয়া একটু শুকাইয়া উহাতে নখ বিদ্ধ করিয়া লইয়া যায়। ঘুঘু সম্ভোজাত আপন শাবক পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে। কখন কখন পক্ষী ও পক্ষিনী বাসা নখে ধরিয়া লইয়া যায়, কখন বা শাবক পিঠে তুলিয়া লইয়া নূতন বাসায় প্রস্থান করে। এ অবস্থায় নূতন বাসা বেশী দূরে নির্মিত হয় না। নিকটে এবং বিশেষ গোপনীয় স্থানেই বাসা করে। মোট কথা ঘুঘু অত্যন্ত সতর্কতার সহিত আপন সম্ভানের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে।

ঘুঘুর ডিম পাতলা নীল বর্ণের। তাহাতে সাদা ছিট। ডিমগুলি পারাবতের ডিম অপেক্ষা ছোট। ঘুঘুর মাংস তৈলাক্ত, মোলায়েম এবং সুস্বাদ। ইহাদের দেহ এত

অগ্রহায়ণ ১৩১২

কোমল যে, অতি সতর্ক হস্তে ধরিলেও অনেক পালথ খসিয়া যায়।

ঘুঘু পাখী অতি দ্রুত গতি পারবর্তন করিতে পারে। লেজ প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিয়া পালকের মধ্যে বিভিন্ন দিকে উড়িয়া যায়। কখন কখন বৃক্ষ শাখা হইতে পাখীর চটাচট শব্দ করিয়া তীর বেগে উপরের দিকে অনেক দূর উঠিয়া পাখা মেলিয়া বায়ুতে ভাসিয়া বেড়ায়। ঘুঘু ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়। ইহারা “কুর্ কুর্—কুর্ কুর্—কুর্” গান করে। আমাদেয় দেশের মেয়েরা বলেন ঘুঘু পাখী বলে—“সতী কি গো পূর্ব পূর্ব পূর্ব (পূর্ণ কুর্), চোকলে বাকলে (খোঁসা সমেত) কুড়ায়ে তোলা”। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে।

“সে ছিল এক গৃহস্থের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। সে তাহার সতীন-মেয়েকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। বেচারী সতীন-মেয়ে কিন্তু সৎ মায়ের মনস্তত্ত্বের জন্য খুব চেষ্টা চরিত্র করিত। এক দিন বাড়ীতে জামাই আসিলেন; খাবার তৈয়ারের ধূম পড়িয়া গেল। গৃহস্থ-বো আপন মেয়ে ও সতীন-মেয়েকে মাপিয়া সমান সমান তিল পরিষ্কার করিতে দিল। আপন মেয়ে তিলগুলি খুইয়া আনিল। মা মাপিয়া বৃক্ষ করিয়া লইল। সতীন-মেয়ে অনেকক্ষণ পর তিলগুলি মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া আনিল। তিলের খোঁসাগুলি এক জায়গায় জমাইয়া রাখিল। সৎ-মা মাপিয়া দেখিল, তিল অনেক কম। সে বুঝিল অজাগা মেয়েটা তিলগুলি ফেলিয়া দিয়াছে। রাগে সৎ-মা সতীন মেয়ের মাথায় এক আঘাত করিল, তাহাতেই মেয়েটি মরিয়া গেল। একটু পরেই সে দেখিল মেয়ের তিলগুলি অপরিষ্কৃত আর সতীন মেয়ের তিলগুলি পরিষ্কৃত, এবং তাহার খোঁসাগুলি অশুদ্ধ রক্ষিত। সৎ-মা সেই বাকল এবং মার্জিত তিল মাপিয়া দেখিল, তাহার পরিমাণ পূর্ব (পূর্ণ) হইয়াছে। তাহার মনে সতীর অল্পতাপ হইল। সৎমেয়ের তিলগুলিই শুষ্ক ঠিক তৈয়ার হইয়াছে! আপন মেয়ের তিলগুলি পাক করি-

বার যোগ্যই হয় নাই। অল্পতাপে সৎ-মা তিলের হাঁড়ি মাথায় ভাঙ্গিয়া মরিয়া পাখী হইল এবং পূর্ব-স্বভাবশতঃ কাঁদিয়া কহিতে লাগিল, “সতী কি গো পূর্ব পূর্ব—চোকলে বাকলে কুড়ায়ে তোলা”।

ঘুঘু পাখী ধরিবার জন্য শিকারীরা ঘুঘু পোষে। একটা খাঁচার মধ্যে তাহাকে রাখা হয়। খাঁচার সম্মুখে একখানি জাল থাকে। খাঁচাটি লতাপাতায় আবৃত। খাঁচার নীচে বাঁশের একটি চোঙ্গ থাকে। উহাতে তিন চারি হাত লম্বা কয়েকখানি বাঁশ লাগান হয়। এই ভাবে খাঁচাটিকে ১১।১২ হাত উপরে পাতা ঢাকা এক শাখার নিকট রাখিয়া দেয়। পোষা ঘুঘু আপন খাঁচার বসিয়া ডাকিতে থাকে। বস্ত্র ঘুঘু যখন সঙ্গী-বিহীন ঘুঘুর ডাক শুনে, তখনই তাহাকে বিপদীক অপিচ প্রণয়-প্রতি-বন্দী মনে করিয়া আক্রমণ করে, এবং জালে আটকাইয়া শিকারীর রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে।

জাদী পাতিয়াও ঘুঘু ধরা হয়। এক গাছি সরু অথচ দৃঢ় রজ্জুতে তালের আঁশ বা ঘোড়া বা গরুর পুচ্ছ-লোম এক একটি পৃথক পৃথক আটকাইয়া ঐ আঁশ বা লোমের মধ্যে এক একটি ফস্কা গেরো দেওয়া থাকে। মূল রজ্জুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁশের কাঠি বাঁধা হয়। ঐ কাঠিগুলি মাটিতে পুতিয়া ঐ গেরোগুলির নীচে ধান, সরিষা, কলাই প্রভৃতি ফেলিয়া রাখে। আহারের লোভে আসিয়া বেচারী প্রাণ হারায়। কখন কখন জাদি ছিঁড়িয়া পলায়ন করিতে পারে। ঘুঘু এক বার জাদীর সন্ধান পাইলে আর সে দিকে পদার্পণ করে না।

বারের নিকটবর্তী স্থানে খাড়াতির আহরণে ঘুঘু আসিয়া থাকে।

নীলা ঘুঘু।

ইহাদের ঠোঁট লাল এবং আঁধ ইকি লম্বা। উপরের ঠোঁটের অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র। ঠোঁট নরম, ধারাল নহে। কপালের নিম্নে এবং ক্রমে উভয় পার্শ্বের চক্ষুর উপর পর্যন্ত বক্রভাবে ঈষৎ খোঁতা অল্প ক্ষুদ্র পালথ। বকের

এবং ডানার নিম্ন দিকের ও গলার উপরের পালথ ভাষ্মাভ, তেমন উজ্জল নহে।

চক্ষুর তারকা কৃষ্ণাভ নীল। ছোট মস্তুরী অপেক্ষাও ঈষৎ ক্ষুদ্র। তাহার চারিদিকের অন্ধি-গোলক ভাষ্মাভ কৃষ্ণ। চক্ষুর চতুঃপার্শ্বের পাতলা পরদা ঈষৎ লাল এবং সম্মুখের দিকে একটু বিস্তৃত। ডানা মজবুত। উপরের পালথ বেগুনে মিশ্রিত গাঢ় সবুজ। সবুজ পালথের একটি বিশেষত্ব এই যে, উহার যতটুকু অল্প পালথের নীচে থাকে ততটুকু পর্যন্ত ফিকে কাল। পিঠের কতক পালথ তজ্রপ এবং অবশিষ্ট কতক পালথ কৃষ্ণাভ, তৎপরে এক লাইন খেতাভ, তৎপরে অর্ধ ইঞ্চি এক লাইন কৃষ্ণাভ ও বেগুনে মিশ্রিত সবুজ। তৎপরে (অত্যন্ত অস্পষ্ট) ছাই রঙের এবং ক্রমে ধূসর বর্ণের, তৎপরে ভাষ্মাভ ফিকে কাল বর্ণের পালথ।

কিন্তু পিঠের পালথগুলি এরূপ সূক্ষ্মরূপে শ্রেণী-বদ্ধ যে, বিভিন্ন রঙের সমাবেশ থাকাতেও বিশ্রী দেখায় না। পুচ্ছের পালথ সংখ্যা (বড় পালথ) বারটি। নীচের দিকের ছোট পালথ ১২ হইতে ১৫টি। বক্ষের পালথ ভাষ্মাভ ধূসর। পায়ের হাঁটু পর্যন্ত রং ঐ রূপ। তরিল্লের সম্মুখের দিকের রং বেগুনে। পেছনের রং খেতাভ, আঙ্গুলে তিনটি পর্ল। নখ ঈষৎ বক্র এবং ধারাল। আঙ্গুলের নীচের দিকে কটা নহে। পেছনের আঙ্গুলে তিনটি, মধ্যের আঙ্গুলে নয়টি এবং তাহার দুই পার্শ্বের আঙ্গুলে আটটি করিয়া পর্ল আছে। এই জন্তাই আঙ্গুলগুলিকে নীচের দিকে সম্পূর্ণ রূপে বক্র করিতে পারে। পেটের উভয় পার্শ্বের পালথ ধূসর। ঐ সকল পালথ গুলি (quill) পরিষ্কার সাদা এবং সূক্ষ্মগ্র; তাহাদের অগ্রভাগ অতি কোমল, একটু হাড় আছে। এই অংশ অর্ধ ইঞ্চির বেশী নহে। কিন্তু পূর্বার্দ্ধ প্রায় এক ইঞ্চি। ইহাদের পালথ অতি সহজেই শরীর হইতে বিচ্যুত হয়।

শরীরের চর্ম রক্তাভ, দেহ অতি কোমল। পুচ্ছের পালথ-রাশির উভয় পার্শ্বের দুইটি পালথের দুই তৃতীয়াংশ ছাই

য়ের মত সাদা, তদগ্রে একটু কাল এবং অবশিষ্টাংশ ছাই য়ের মত। তাহার পরের দুই দিকের দুইটি পালথের এক স্থানের কতকটা পিঙ্গল। অগ্রভাগ পালথ ঈষৎ ভাষ্মাভ কৃষ্ণ। ডানার পালথের যে অংশ অল্প পালথের পরতের নীচে থাকে তাহাও পিঙ্গল। অবশিষ্টাংশ ফিকে কাল। পাখার (Quill) দাঁড়া নীচের দিকে সাদা উপরের দিকে ঈষৎ কাল।

ইহাদের সমগ্র পা প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা। ঠোট হইতে লেজের অগ্রভাগ পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি লম্বা।

নীলা ঘুঘুও বাড়ীর আশেপাশে খাদ্যসংগ্রহের জন্য আসিয়া থাকে। ইহাদের ডিম্বও ডিলা চুপির ডিম্বের প্রায় অসুন্নপ। একটু বেশী সাদা রকমের নীল। ইহাদিগকে দলবদ্ধ ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করিতে দেখা যায় না।

ত্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভাটিয়াল গান*

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৭

এ গানটিতে প্রাণের উদাস ব্যাকুলতা—সেই অজানা অনন্তের পানে একটা কেমন আকুল আকর্ষণের ভাব সুন্দর কবিত্বের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

“সাগর যেমন সদা গো টানে নদীর পরাপ”

এ টানের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সৃষ্টির প্রারম্ভ-কাল হইতে এ আকর্ষণ। কিন্তু মোহাক্ষর মানব সকল সময়ে ইহা অনুভব করিতে পারে না; জীবনের কোন কোন শুভ মুহূর্ত্তে সেই অসীমের আহ্বান অনুভূত হয় আর অমনি সংসারের কুটিলতা দূরে সরিয়া দাঁড়ায়—এক উদাস, গভীর, অমৃতময় ভাবে চিন্তা ডুবিয়া যায়।

* এ গানটি প্রামোদনে নিম্ন দাস দিয়াছেন।

গানটি এই—

ওগো দরদী—

ওগো দরদী—আমার মন কেন

উদাসী হইতে চায় !

ও তার ডাক নাহি, হাঁক নাহি গো—

আপ্নে আসি চইলে যায় ।

ধৈর্য না ধরে অন্তরে—

সদা কেঁপে ওঠে মন শিহরি.—

নয়ন ঝরে.

যেন দীরবে, সুরবে সদা—

ডাকিতেছে আয় গো আয় ।

যেন ভাটীর শ্রোতে ভাটার গড়ান,—

সাগর যেমন সদা গো টানে

নদীর পরাগ,

সে টান এতই সরল. মনেরই গরল

অমৃত হইবে যায় ।

৮

মানব সারা জীবন এই সংসারের সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া শেষ জীবনে নিজের অক্ষমতায় অসহায় ভাবে হাল ছাড়িয়া দিতেছে । এই ভাবটি নিম্নলিখিত গানটিতে অতি সরল ভাবে বলা হইয়াছে ।

আরে মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে—

আমি আর বাইতে পারলাম না ।

আমি জনম ভইরা বাইলাম বইঠা রে—

তরী ভাইটায় সয় আর উজায় না ।

ওরে জাজী রদী যতই কসি,

ওরে হাইলেতে জল মানে না ।

নায়ের তলী খসা, গুরা ভাঙ্গা রে,

নায়ে ত গাব গয়নি মানে না ।

দরদী—ব্যথার ব্যথী ।

গড়ান—শ্রোত ।

সয়—বৈ ।

জাজী—জজা ।

গয়নি—নায়ের কাঁটা যায়গায় নেকুরা দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া ।

৯

এ গানটিতে সময় থাকিতে থাকিতে ভগবানের আশ্রয় লাভ করিবার জন্ত মনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ।

ওরে দিন থাকিতে

তুমি কূলে কূলে লও কিনারা ।

(মন পাগেলা রে)

আরে বাহার্তের বচ্ছরের পাড়ি,—

বেলা আছে দণ্ড চারি রে ;

আরে অসময়ে ধরলে পাড়ি—

পাবি নি রে কূল কিনারা ।

১০

একদা গ্রাম-প্রেমে বিহ্বলা রাধিকা তাহার নবীন নাগরটিকে কাছে পাইয়া তাহাকে নিষেধ করিতেছেন যে, তুমি সময়ে অসময়ে যখন তখন বাণীর সুরে রাধা রাধা বলিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিও না । আমি “গুরু-জন্যর মাঝে” থাকিলে ঐ রূপ অংহ্বান শুনিয়া লজ্জায় মগ্নে মরিয়া যাই !

রাধিকা নিষেধ করিতেছেন বটে, কিন্তু এ নিষেধের প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার উদ্বেল প্রেমের প্রকাশ রহিয়াছে ।—

“ও পার বইসা বাজাও বাণী—

এই পার বইসা শুনি ;—

হায় রে আমি ত অবলা নারী—

সাঁতার নাহি জানি রে !”

ইহার তুলনা নাই ।

বাণী বাজান জান না ।

ওরে অসময়ে বাজাও বাণী—

কালী মন ত মানে না রে ।

যখন আমি বইসারে থাকি—

গুরুজন্যর মাঝে,

ওরে নাম ধরিয়া বাজে রে বাণী,—

গুইনা মরি লাজে রে।

ওরে রক্তনশালাতে বইসা—

যখন আমি রাঁধি,—

ওরে ভিজা কাঠ চুলায় রে দিয়া—

ধূঁয়ার ছলে কাঁদি রে।

ওপার বইসা বাজাও বাণী—

এই পার বইসা গুনি ;—

হা রে আমি ত অবলা নারী—

সাঁতার নাহি জানি রে।

যেই না ঝাড়ের বাণী রে তোমার—

লাগুর যদি পাই—

ওরে জারে মূলে উপারিয়া—

সায়রে ভাসাই রে। *

১১

আর এক দিন রাধা সখী সঙ্গে যমুনায় জল আনিতে গিয়াছেন। তখন অপরাহ্ন। জল আনিবেন কি? ঘাটে যাইয়া দেখেন, তাঁহার মদনমোহন কদম্ব-শাখায় ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়াইয়া বাণীর সুরে সুখা ঢালিয়া দিতেছেন। তখন নব অমুরাগ--রাধিকা কক্ষকে প্রাণ খুলিয়া—আখির আশ মিটাইয়া—চাহিয়া দেখিতে পারিতেছেন না—হায় লজ্জা আসিয়া বাধা দেয়। অথচ ও নয়ন-মন-মোহন রূপ না দেখিলেও ত চলিতেছে না। তাই যমুনায় নীল জলে সেই নীরদবরণের রূপছায়া নিরীক্ষণ মানসে সখীদিগকে বলিতেছেন,—

চুলায়—চুলীতে।

লাগুর—লাগল।

জর—শিকর।

সায়রে—সাগরে।

*সঙ্গীত মুক্তাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

জলে ঢেউ দিও না গো সখী —

আমি কাল রূপ—ও রূপ নিরখি।

ওগো ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না

(দিলে) তোমরা হবে পাতকী।

ঐ কদম ডালে ডেইরে কক্ষ

বাণী বাজায় বেইল ভাটি।

ওগো বাণীর স্বরে পরাণ গো হরে,

বরে ফিরে যাব কি!

১২

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার নিকট আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়া তাঁহার দর্শন মানসে উধাও ভাবে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন—আর মোহন মুরলীর সাহায্যে নাম ধরিয়া রাধাকে ডাকিতেছেন—ভক্তবাহ্যাকল্পতরু ভগবান ভক্তের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বিশ্ববিমোহন সুরে তাহাকে আকুল আহ্বান করিতেছেন, ইহাই এই গানটির ভাব।

আমি বিকাইলাম গো

রাই কমলিনী,

রাধে তোমার চরণে।

ওগো তোমার প্রেমের খাতক হয়ে গো

আম বেড়াই বনে বনে।

আপন হাতে কঙ্ক পত্র

আম লেহখে দলেম মনের মত,

মহাজন বানাইলাম গো রাধে তোমারে ;

ওগো তোমার প্রেমে কলী-গো হয়ে

(ওগো ও রাই কামলিনী)

আমি বেড়াই গহন কাননে।

লেখে দিলাম দাসধত—

এ দেহ জনমের মত,

ধরা চূড়া দিলাম গো রাধে তোমারে,

আম আর কিছু খন চাহ না গো রাধে

(ওগো ও রাই কমলিনী)

আমায় রেইখে রাঙ্গা চরণে।

বেইল ভাটি—অপরাহ্নে।

ডেইরে—দাঁড়াইয়া।

অগ্রহায়ণ ১৩১১

যখন আমি গোচারণে বাই,
কদম ভলায় বাঁগীটি বাজাই,
বাঁগীর স্বরে ডাকি গো রাধে তোমারে,
ভূমি বাহির হও গো ওগো রাধে,
(ওগো ও রাই কমলিনী)
তোমায় দেখি ছ'নয়নে।

১৩

এটি প্রেম লক্ষীত। সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত, হংস-
দূত, প্রভৃতি দেখা যায়; কিন্তু আমাদের বাঙ্গলার গ্রাম্য
কবি তাহার নায়িকাটির দ্বারা “বাঁত্রী” অর্থাৎ বাবুই
পক্ষীকেই দৌড়ে বরণ করাইয়াছেন। কারণ দাবীর পাড়ের
বাশ কাড়ে ও অস্ত্রান্ত বৃক্ষে উক্ত পক্ষী কাকে কাকে
সর্বদা আনাগোনা করে।

ও বাঁত্রী রে, ওরে কাকে ওড় কাকে রে
পড় তারে বল সাড়া,
কইও মোর বঁধুর আগে বাঁত্রী
পিরীতি জানমারা রে বাঁত্রী—
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঁত্রী রে।

ও বাঁত্রী রে, ওরে নলেও আগে নল ফুল,
ও ফুল বাঁত্রী, বাঁশের আগে টিয়া,
কইও মোর বঁধুর আগে বাঁত্রী.
না যেন করে বিরা রে বাঁত্রী,
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঁত্রী রে।

ও বাঁত্রী রে ওরে যখনে করিলাম প্রেম,
বাঁত্রী ভূমি আমি জানি,
ওরে এখন কেন সে সব কথা বাঁত্রী
লোকের মুখে শুনি রে—
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঁত্রী রে।

ও বাঁত্রী রে, যখনে করিলাম প্রেম
বাঁত্রী শানবাণী যাটে,

ঐ যে আকাশের চন্দ্র যেমুন
ভূইলা দিলা হাতে রে বাঁত্রী—
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঁত্রী রে।
ও বাঁত্রী রে, হায় রে ওপারে বুনিলান্ধ ধান
বাঁত্রী, টিয়ার কাইটো খাইল।
ঐ যে কইও মোর বঁধুর আগে
মৌবন বইয়া গেল রে,
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঁত্রী রে।
ও বাঁত্রী রে, ওপারে কদমের গাছ বাঁত্রী
বারে হালে আগা,
ওরে শিশুকালে কইরা প্রেম বাঁত্রী
মৌবন কালে দাপু
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঁত্রী রে।*

ত্রিযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

প্রবাসী

ঝুংকো লতার বেড়া দিয়ে ঘেরা
কুটারখানি তার
সুদূর প্রবাসে;
রাত্রি দিন ঘরের কথা ছাড়া
অন্ত কথা আর
যেন না আসে।
যে গানে তার আগে তোরের যবি,
সেই গানেতেই উঠে সাঁঝের তারা;
চোখের পরে ভাসে হাজার ছবি,
যুকের তলে একটি মুক্তা জলে
সকল আলো করা।

*সঙ্গীত মুক্তাবলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অলি-ভা-খা-রাঙা চরণ ছুটি
পাতার পাতার ফেলে
এল কাণ্ডন রাণী ;
হাজিরি-বার পঞ্চমেতে উঠি
গেল নেমে নেমে
পিকের গলাধানি :
কে অলঙ্কারে বাকিয়ে চাঁদের ধনু
বর্জ-করিয়ে হানুল জ্যোৎস্না-শর ।
জর্জরিয়ে দিল যে তার তনু ;
তবুও তার থামলো নাকো গান,
কাঁপল নাকো স্বর ।

দেশের যুধে ভাসিয়ে দিল তরী ।—
—দাঁড়িয়ে কে ওই সন্ধ্যা-প্রদোপ জেলে ?
মিলন সাজে, কঁাকনে কার বাজে
একতারার গেই শূরই ?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ।

গ্রন্থ সমালোচনা

বর্ষা এল-খাজিয়ে বিজয়-ঢাক
বলির তরে নিয়ে
কালো মেঘের দল ;
বিজলী ঝড়ে কোপের পর কোপে
রক্তে হ'লো গেরী
জাহ্নবীর জল ;
অমানিশার-দিগন্তরী শ্রায়া
এলিয়ে দিল বৃষ্টিধারার চুল
কঁকড়া মতো চাপল ধরার বুকে,—
তবুও তার-কাটিল নাকো তাল,
সুর হ'লো না ভুল ।

এমনি কোরে সারা প্রবাস-জীবন
একতারটি নিয়ে
গাইল একই গান ;
হঠাৎ-সে মিন এল উপর হ'তে
মঞ্জুরী সই দেওয়া
ছুটির চিঠিখান,
চমক ভেঙে একতাবাটি ফেলে

৩১। প্রথম শিক্ষা শাস্ত্রী-প্রিন্সিপাল ও
স্বাস্থ্য বিদ্যা,—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগচি এল, এম,
এস প্রসীত, বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দু নাথব মল্লিক
কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত—আকার ডবল ক্রাউন
ষোড়শাংশিত, মূল্য আট আনা, কলিকাতা, ২৪ নং
কলেজ স্ট্রীট হইতে Twentieth century Publishing Co
কর্তৃক প্রকাশিত, ছাপা ভাল, কাগজ মন্দ নহে ।

সমাজের মহৎ হিত সাধনের উদ্দেশ্যেই এই পুস্তক
খানি লিখিত হইয়াছে । শরীর-বিজ্ঞানের জ্ঞান একরূপ
একটা জটিল ও তুর্কৌণ শাস্ত্রের তত্ত্বগুলি আলোচ্য গ্রন্থের
প্রণেতা সহজ ভাষায় এত সুন্দর করিয়া লিখিয়াছেন
যে, আমাদের বালকবালিকাগণ সহজেই বুঝিতে
পারিবে । গ্রন্থ চিত্রগুলি তাহাদের বুঝিবার পক্ষে
বিশেষ সাহায্য করিবে ।

এই পুস্তকখানির প্রচার যত বেশী হইবে সমাজের
মঙ্গলও তত বেশী হইবে । এই শ্রেণীর পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে
অতি বিরল । আমরা যুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি এই
পুস্তকখানি লিখিয়া গ্রন্থকার সর্বসাধারণের যত্ববাদের
পাত্র হইয়াছেন ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ।

অগ্রহায়ণ ১৩১২

৩২। সোহহংগীতা। হিমালয়বাসী সোহহংস্বামী

প্রণীত। কাগজ পুরু, ছাপা ও বাধাই ভাল। সোহহং-
স্বামীর বিভিন্ন বয়সের তিন খানি প্রতিকৃতি দ্বারা গ্রন্থখানি
সুশোভিত হইয়াছে। বর্তমান সার্কাসমঞ্চ ভয়ঙ্কর
ব্যায়ের সহিত মল্লযুদ্ধের প্রবর্তক শার্দুলতেজা ত্রীযুক্ত
শ্রীমাকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের নাম সম্ভবতঃ কোনও শিক্ষিত
বাক্সালীই বিস্মৃত হন নাই। এই বীরবরই সন্ন্যাসাশ্রম
অবলম্বন পূর্বক সোহহংস্বামী নামে পরিচিত হইয়াছেন।
গ্রন্থকার যেমন অকুতোভয়ে বহু শার্দুলের পিঞ্জরে ক্রীড়া
প্রদর্শন করিতেন, সেইরূপ সাহসে নির্ভর করিয়াই সম্প্রতি
এই গ্রন্থে বহু দেশাচার, শাস্ত্র বিচার ও পণ্ডিতের মতকে
ভীত কশাঘাতে প্রণীড়িত করিয়াছেন। নমুনাস্বরূপ
কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল।

যথা,—

গুরুশিষ্য অধ্যায়—

“ধাস্মিক-খ্যাতি-লোলুপ শিষ্যবিত্ত অপহারী
বহু গুরু অবনী ভিতরে
না জানে গন্তব্য স্থান, নাহি চিনে সত্য পন্থা
অন্তে পথ উপদেশ করে।”

অবতার অধ্যায়ে—

“অবতাররূপে প্রভু নারায়ণ কেবল ভারতে জনম গ্রহণ
করিলেন কি কারণ
অপর প্রদেশে ছুটের দমন, সাধু-পরিজ্ঞান-ধর্ম-সংস্থাপন
ছিল না কি প্রয়োজন?”

আহার,

“বিশব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়, আহার কটাক্ষে সঙ্গটিত হয়
সেই সর্কশক্তিময়।
জীবসাধ্য কর্মসাধনের তরে, জঠর যাতনা উপভোগ করে
কিরূপে সঙ্গত হয়?”

আহার অধ্যায়ে—

“মাসোশী সিংহাদি হয় পশুপাক
তাদের সাম্রাজ্য বন
মানব সমাজে বসিতে রাজত্ব
আমিষ আহারীগণ ॥
“নিরামিষাহারী হীনবীৰ্য্য ভীকু
মৃদুল স্বভাব হয়।
ভোগ কিবা যোগ হেন পুরুষের
কদাপি আয়ত্ত নয় ॥

পরিশেষে মুমুকু লোকদিগকে সোহহংস্বামী এই উপ-
দেশ দিয়াছেন—

“জালিয়া হৃদয়ে বৈরাগ্য অনল, করি ভস্ম
রাগ ঘেব চিত্তমল
কর লয় দুঃগণ।
হ’লে বিমোচিত মন আবরণ, তুমি ভূমি—
আত্মা নিত্য নিরঞ্জন
তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥”

সোহহংগীতায় দেখিলাম—শাস্ত্র বিভিন্ন ও অবিস্থান্ত,—
কাম্য ধর্মকন্ঠে কোনও প্রয়োজন নাই,—ভক্তিমার্গ
সুপন্থা নহে, আর “জীব জন্ম পুনর্জন্ম কিছু সত্য নয়।
বৃথ। তর্কশাস্ত্রযুক্তি বৃথা বাক্যব্যয় ॥”

সোহহংগীতায় নির্ধারিত সকল সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একমত
না হইতে পারিলেও, ইহাতে উল্লিখিত বহু মন্তব্য যথাযথ
ও সময়োপযোগী হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা
বোধ করি না। বর্তমান হিন্দু সমাজের অনেক ক্ষত স্থলে
সঙ্গতভাবে অঙ্গ প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহাই এই গ্রন্থের
একটি প্রধাম বিশেষত্ব। আশা করি, গ্রন্থখানি বঙ্গীয়
পাঠকবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীভূ—

প্রতিভা

২য় বর্ষ

মৌসুম ১৩১৯

৯ম সংখ্যা

সোনা বারইর গান *

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত ভাষা, ১-১০১১)

এইটি ত্রিহট্ট জেলার পল্লী-প্রচলিত একটি গ্রাম্য সঙ্গীত, নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বহুল ভাবে গীত হইয়া থাকে। সোনা বারইর বাদশববীয়া কস্তা পিতার প্রাণ ও স্বীয় ধর্ম রক্ষার জন্য কিরূপে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়াছিল, গ্রাম্য ভাবার ইহাই এই সঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধাক্ষ-দীপ্ত কর্ণিত ম'ঠে, নিবিড় পল্লী-বোধিতে, সঙ্গীরাগীর ঐশ্বর্য্য শোভিত হরিৎ ক্ষেত্রে, এই সতীধর্মের করুণ ও পবিত্র কাহিনী নিরক্ষর গ্রামবাসীগণের মনে সত্য ও জাতি-মাহাত্ম্যের প্রতি একটা বিশিষ্ট অঙ্গুরাগ ও প্রজ্জ্বলিত সতের ও সবল করিয়া রাখে।

আমরা এই গানটিতে কয়েকটি সামাজিক ও পারিবারিক নিয়মাহুতানের উল্লেখ পাই, সুতরাং ঐতিহাসিক ভাবেও এই গ্রাম্য-গীতি বিশেষত্ববর্জিত নহে। ত্রিহট্ট জেলার আদমপুর থানার হেড়েনা পাঠশালা হইতে প্রায় ৩৭ কেরান্দা দূরে পশ্চিম দিকে সোনা বারই ও কালা বারই

নামে দুইটি দৌষি অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে; এবং সেই হেড়েনা পাঠশালা হইতে প্রায় ৪½ মাইল পূর্ব দক্ষিণ দিকে একটা প্রকাণ্ড পুণ্ডন বাড়ী আছে, ইহাকে আদম বদনহারদার বাড়ী বলে। এই বদনহারদারই (বদন সা) আলোচ্য সঙ্গীতের নায়ক, এবং সোনা বারই নায়িকা বারই-কস্তার পিতা। বদনহারদার বাড়ী একটি সুগভীর পরীখা-বেষ্টিত—ইহা প্রায় কুড়ি হাত চওড়া; সুতরাং তৎকালে বদন সা যে এক জন সঙ্গতিপন্ন, প্রতিপত্তিশালী ও প্রভাপাশ্রিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর হেড়েনা বাজারের কাছে “ফিরোজ পাঁ” দৌষিও বর্তমান রহিয়াছে; সুতরাং বারই-কস্তার পাণিপ্রার্থী ফিরোজ সা দেওয়ানের অস্তিত্বও একেবারে অবিখ্যাস করা চলে না। তবে ইহারাই এই আলোচ্য সঙ্গীতে উল্লিখিত ব্যক্তি কিনা এবং এই সঙ্গীতের কোনও ঐতিহাসিক মেরুদণ্ড আছে কিনা, তাহা চিত্তা করিবার বিষয়। আর এই পল্লী-সঙ্গীত কত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং ফিরোজ পাঁ প্রকৃতি কোন সময়ের লোক তাহা নির্ণয় করিতে হইলে এই সবকে স্থানীয় গবেষণার প্রয়োজন।

* এই গানটি সংগ্রহ ও এই প্রবন্ধ রচনার অন্ত্যস্ত সাহায্যের জন্য আমার অন্তিমণ্ডন বন্ধু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ওয়ং মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা বহু—লেখক।

† এক কেরান্দা এক বিঘার কিঞ্চিৎ কম।

“সোনা বাটের রূপা বাটের তারা দুটি ভাই
সোনা বাটের রূপে কড়া মাথোতে কমাই (ডেলাই)।”

কত্তার জন্ম-গ্রহণের পূর্বে বারই-পত্রের বর্ণনা আছে :—

“চতুর্থ মাসের কালে এই যে সিক্রীম টা খাইল রে

* * * * *

* * *

নয় মাসের কালে বাইরে স্বীয়ে সাদাসরদা(সাধ)খাইল রে”

তার পর কত্তার জন্ম, জাতক-সংস্কার ও নামকরণ ইত্যাদি :—

“নাগিত ডাকিয়া এই যে কুসাইদ করাইল রে,

ছয় দিনের কালে ঐ যে বজী পূজা করাইল রে—

বাঁছি রিছি নাম ধইল। কমাই স্মরী রে

ছয় মাসের কালে ঐ যে মদনসার জুড়নী করিল রে”

জুড়নী * প্রথা আমাদের অঞ্চলে নাই। শ্রীহট্ট অঞ্চলে

এই প্রথা বর্তমান সময়ে আছে কি না জানি না। প্রাচীন

কালে কত্তার জন্মের বর্ষ মাসে বর মনোনীত হইয়া থাকিত

এবং কত্তা বিবাহযোগ্য হইলে তাহার সহিত বিবাহ

হইত। ইহাই জুড়নী প্রথা; ‘জুড়নী’ বোধ হয় জোড়া

শব্দ হইতে আসিয়াছে; হিন্দুশাস্ত্রে “বাগ-দত্তা”

কত্তার উল্লেখ পাওয়া যায়—জুড়নী প্রথার সহিত এই

‘বাগ-দত্তা’ কত্তার কোন সংশ্লিষ্ট ছিল কি না চিত্তা করিয়া

দেখা উচিত।

* জুড়নী অর্থে জোড়া বাঁধা বা জোড়া মিলাই।

সকালের এই অংশটুকু কোন কোন স্থলে বিভিন্নরূপে গীত হইয়া থাকে—

* * * * *

রূপস ভেলাই চলি গেলা নদয়ার ছিনানে

সবীর্ণ লইয়া কইতা কই খেইড় গেলে

বউল গাছের তল বসি মদন রাজা দেখে

ধেনু ভালা দেখিল রাজা আরিয়ার চর

মাথা ভালা দেখিল রাজা ডাব নারিয়ল

চকি ভালা দেখিল রাজা হাণের দুই ভারা

ঠোই ভালা দেখিল রাজা হাটিপানের বিরা

এই সব দেখিয়া রাজা গুরা পিঠি লইলা

গাটে হাখাইয়া রাজা কবাট লাগাইলা

মাইরে জিগাইলে রাজা না দিলা উত্তর

কইতা কইতা মাইরে বনি খুসিরে না বেড় বিয়া
আল্‌পার মাঝি মাঝি বারইর বাড়ী গিয়া

“সাত দিনের কালে যে মদন সা আসিল

হাকার বাকিয়া মদন সার কত্তা তুলি ধইল।

সাত ডিঙ্গা দাড়ী মাঝি মদন সার লইলা

বার বৎসরের লাগি মদন সা বানিজ্যে চলিলা।

বার বৎসর গেলে মদন সা ঘরে ত আসিবা”

বোধ হয় তত্ত্বপোষের পরিবর্তে “হাকার” বা মাঁচার

বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু সোনা বারইর আর্থিক

অবস্থা খারাপ ছিল না, এ অবস্থার মাঁচার বন্দোবস্ত

হওয়ার কারণ বুঝা যায় না।

জুড়নী হইলে বন্যা অবরোধ-প্রথার সম্পূর্ণ অধীন

হইত, এমন কি স্নানের জন্যও বাড়ীর বাহির হইত না।

“সন শুক বাবা তুমি শুক রে বচন

তুলিল্‌ পুনি বাটিল্‌ ঘিলায় না জুড়ায় জীবন।”

জুড়নী কন্যা তোলা জলে স্নান করিত এবং ঘিলায়

চুল ও গা পরিষ্কার করিত—বলা বাহুল্য তখন দেশে

সুগন্ধি সাবানের আবির্ভাব হয় নাই।

তোলা জলে স্নান করিয়া কমাইর তুণ্ডি হইত না;

তাই বারইকে বলিল;—

“সাধ বেড়ি সানের বাঁকাইল্‌ ঘাটেতে গমন

এ কথা শুনিয়া বারৈ জুড়িল কান্দন্‌

* * *

* * *

সোনা বারই শুনিয়া উত্তর দিল—

“এখন বুঝি করিতায় কি গো জাতি ধ্বংস মোর”

পিতার উত্তরে শুধু হইয়া

‘মাও মাও ডাকেন কত্তার মাও নি আহ ঘরে রে’

মাতা উত্তর করিল—

“কিসের লাগি ডাক কত্তা সুললিত রাও রে”

মাতা পিতা কেহই কত্তাব নদী-দ্বানে সম্মতি

দিল না।

মাতা বলিল—

“মদন-সা দেওরানে তোমারে জুড়নী করিছে রে

রূরের কিয়ারী কইতা লজ্জা নাই তুর রে।

বাড়ীর নিকট বাইগো দাঁড়ি খনাই দিহু রে
চারি পারে রোপিয়া দিহু চান্দা নাগেশ্বর রে ।
কাপিলার দুকু দিয়া বাইগো দাঁড়ি ভরাই দিহু রে
তাহাতে নামিয়া বাই গো বাইছালী * খেলাও রে ।”
বারই বেশ সজ্জিতগর ছিল বোধ হয়, তাই দাঁড়ি
কামধেনুর দুধ দিয়া ভরিয়া দিতে সাহসী হইরাছিল ।
কিন্তু কত্তার সনিবন্ধ অসুযোগ এড়াইতে না পাড়িয়া
বারই গম্বী বলিল—

“বাও বাও আরে বাইগো আসিও নব্বর রে ।”
কত্তা অসুস্থতি পাইয়া বড় খুসী হইল ।
“গঙ্গার নামে লইলা কত্তার থলা খই ডিম রে
গঙ্গার নামে লইলা কত্তার তৈল সিন্দুর রে ।
লাল ধরম পায়ে দিয়া চলিলা সুন্দরী রে
আগে পাছে দশ খাই মধ্যে বাঁরের কি রে ।
নদীতে খই, ডিম ও তৈল-সিন্দুর দেওয়া আর্থ্য প্রথা
নহে । অনাধারিগের নিকট হইতে বজ্রীয় আর্থ্য সমাজে
প্রবেশ লাভ করিয়াছে । কাছাড়ী জাতি নদীকে দেবতা
জ্ঞানে পূজা করিত এবং তাহার নদীর প্রীতির জন্য
নদীতে ডিম দিত । ভক্ত সমাজে রমণীগণ খডম ব্যবহার
করেন না, পূর্বে করিতেন কি না জানি না ।

তারপর কত্তার জল-কেলির বর্ণনা আছে—
“জলেতে নামিয়া কত্তা এক শত বড় দিল রে
গঙ্গাতে নামিয়া ভইন্ আলা করিল রে ।”
আমাদের দেশে সরাসরি প্রথা অস্তাপি দেখিতে
পাওয়া যায় । মাঘমণ্ডল ত্রতের প্রতিষ্ঠার সময়
ত্রিভীকাকে সরাসরি করিতে হয় । কলিকাতা প্রভৃতি
অঞ্চলে “গঙ্গা জল” “বকুল ফুল” “দেখন হাসি” প্রভৃতি
পাঠাইবার প্রথা আছে । রবি বাবুর “চোখের বালিতে”
ইহার আভাস দেখিতে পাওয়া যায় ।

এ সময়ে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান কমাইকে দেখিয়া
তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইল—

* সোকা মোড় ।

“কার বধু কার কিউ নদী সিনান করে রে
সিনান করিয়া কেশ সিনা * দিছে রে
ইহা দেখি ফিরোজ খাঁ বাড়ী চলি গেলা রে ।”
তারপর ফিরোজ খাঁ দেওয়ান বালিকার নিকট পান
পাঠাইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন । এইরূপে ঈশ্বিতা
প্রণয়িনীর প্রেম-প্রার্থনার জন্য তাহুল প্রেরণের প্রথা
শ্রীহটে আজ কাল আছে কি না জানি না ।
“কৈ না গেগায় ছাউলিয়া মুই বলি তরে রে
পান লইয়া যাও শীঘ্র বাঁরে কত্তার আগে রে ।”
ফিরোজ খাঁর ছাওয়াল পান লইয়া বালিকার নিকট
উপস্থিত হইয়া বলিল—

“ফিরোজ খাঁ দেওয়ান তোমারে দিহইন্ খাইবার
কাছে রে”
বালিকা ক্রুদ্ধা ফণিনীর স্তায় গর্জন করিয়া দেওয়ানকে
বিস্তার গালি দিল—

“ভেচামা (এমন) ডুক কৈনে পান দিছে মোঁরে রে
বাপের কালীন নফর রৈলে ঘাটে পেঁঠা দিহু রে
মদন সার নফর রৈলে আছাড়িয়া মারিতু রে ।”
ফিরোজ-নন্দন অপমানিত হইয়া কাদিতে কাদিতে
পিতার নিকট ফিরিয়া গিয়া সমস্ত নিবেদন করিল ।
ক্রোধে অগ্নিগর্ভা হইয়া ফিরোজ স্বয়ং কমাই সুন্দরীর সম্মুখে
উপস্থিত হইলেন । ফিরোজ স্বৈচ্ছার আপন স্ববরের
পবিত্র প্রেম অঘাটতভাবে কমাইকে নিবেদন করিয়া
দিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিতে বাইতেছিলেন ।
কমাই সেই প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাকে অপ-
মানিত করিয়াছে, সুতরাং তাহার স্বর অথন প্রতি-
শোধের আকাঙ্ক্ষার বিরোধী হইয়া উঠিল । ফিরোজ
কমাইর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া—

+ “গুয়া খাইরা চালা দিল কমাই সুন্দরীর আগে রে”
কমাই নির্ভীকচিত্তে এবারও দেওয়ানকে বিস্তার
গালি দিল । সত্যের স্বর দেবতা বন দেন, কমতাখালী

* স্ত্রীমের পর জল বাড়ার জন্য কেশবাম মুক্ত করিয়া দেওয়া ।

+ চিহ্নাদ পান প্রদান অসম্ভব প্রস্তাবের পরিচায়ক ।

গোব ১৯১৯

দেওয়ানকে সে ভয় করিল না, পাগ-কলুবত-জবর
কিরোজ খাঁ দুর্বল বালিকার নিকট পরাভব স্বীকার
করিল—অনন্ত মন্তকে চলিয়া গেল।

কমাইও মলিনমুখে কাদিতে কাদিতে গৃহে ফিরিল,
বুঝা ধাইকে সাবধান করিয়া দিল যেন ঘটনা প্রকাশ
না পায়—

“এত খবর না জানাইও মা বাপের আগে গো

তেচামা তুচ্ছক মোরকড়ার আতি খাইল রে।”

মাতা বিজ্ঞাসা করিল—

“আজিকার সিনানে মা গো এতক বিলম্ব কেন গো
আজিকার সিনানে মা গো মুখ মইলান দেখি রে।”

কিরোজ খাঁ কিন্তু কমাইকে তুলিতে পারিল না,
অস্ত্র উপায়ে তাহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিল।
সোনা বারইকে—প্যাচা পাঠাইয়া তলপ করিল। সোনা
বারই দেওয়ানের সম্মুখে উপস্থিত হইল—আজ দেওয়ান
তাহাকে অসভ্যবিতরণে সম্মান করিলেন। দেওয়ান
আজ প্রথম তাহাকে সেলাম করিলেন—পরে মানা প্রকার
সম্মান দেখাইলেন। কিরোজ ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিয়া
বলিলেন—

“শুন শুন লোক লক্ষ শুন রে বচন

বারইরে বসিবারে দেও উত্তম আসন

(দেও নিয়া বাটেরে উত্তম সিংহাসন)

শুন্য হকার তামাক দেও বাটেরে খাইতে

শুন্য থালে পান দেও বাটেরে খাইতে

শুন্য কাড়িতে জল দেও পদ পাখালিতে

জল পান আনিয়া দেও বাটেরে খাইতে

দেও নিয়া বাটেরে ডালার মাপি টাকা রে”—ইত্যাদি

এই সম্মানের যোগ্য নয় বলিয়া সোনা বারই বিনীত-

ভাবে জবরত মন্তকে দেওয়ানকে সেলাম করিয়া
দাঁড়াইয়া রহিল। পরে দেওয়ান বিবাহের প্রস্তাব
করিলেন—

“কোথার ঘরে হইছে বেটা আবারে হু দিটার রে.

কোথার ঘরেই বেটা কিনি বিয়া দিবার ঘোরে রে।”

শুনিয়া বারই শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু বিব্রত-মস্তক
উত্তর করিল—

“তুমিও পান্নাই বাবা আমার কড়ার আতি রে”

দেওয়ান এখন দেখিল বারই সহজে বিবাহে সম্মতি
দিবে না। তখন উৎপীড়ন করিয়া সম্মতি লাভের চেষ্টা
করিল। হুকুম হইল—

“হাতে দেও হাত কড়য়া রে পায়ে লোহার বেড়া রে

৮০ মণ পাখর বাটের বুকের উপর দিল রে

মরু ১৫ ধুয়া দিয়া বারইরে গরু ঘরে থইবার রে

বুক ফাটিয়া রুধির পরে সোনা বাটের গায়ে রে”।

কিন্তু সচ্ছিকু, অটল, অচল সোনা বারই—

“তবে ত না কবুল করে বিবাহের কোন কথা রে”

এদিকে—

“খবর উলিয়ায়া সরা দিল কমাই সুন্দরীর আগে রে—

কি কর কঁতা তুমি কি কর বসিয়া

সোনা বাটের কষ্ট দেখি আইলাম দৌড়িয়া।”

কমাই শুনিয়া সাহসে বুক বাধিল—পিতার কষ্ট
বালিকা সহ্য করিতে পারিল না, বুকের অন্ত প্রস্ফুট হইল।
মাতা ও ধাত্মিক সঞ্চোধন করিয়া বলিল—

“শুন শুন আমারে মাইগো কইয়া বুঝাই তরে

সোনা মুখে বিদায় দিবার মাইগো লাড়াই যে করিয়ু রে

একই বেজন ভাত ছালন মাইগো একই জালে

রান্দবার রে।

কোথায় গেলা দাসী মাইগো কইয়া বুঝাই তরে রে

জন্মি করিয়া দুই মারারে সাজন করিয়া আন রে ?”

তৎক্ষণাৎ দুই মারা* মাওফা লইয়া উপস্থিত হইল।

* পাকীবাহক—বাহাতে পাকীতে সমকালে হিন্দুগণ পান
তামাক খাইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই হিন্দুভাজীর
বেহারার সৃষ্টি হইয়াছিল।

কোন কোন সঙ্গীতে এই ঘটনার বৈবক্ষ্য লক্ষিত হয়, যথা :—

“হেম কালে কিরোজ খাঁর কি না কর্য কইল রে

লাড়কাড়ের বাদা দিয়া মাওফা পাঠাইল রে।”

লাড়কাড়ের ছলি দিয়া মবেস্ত বলাইলা রে

বুসলমানী ছড়ি মাঝী পাটার পুখাইলে ছে রে,

হিন্দুমানী ছড়ি পাঠি পরিধান কর রে।”

কমাই অলকারাদি পরিধান করিয়া বাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল। মাতা, খুড়ী ও খাজীর নিকট বালিকা সাত্র নরমে বিদায় গ্রহণ করিল। বিদায়ের পূর্বে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন (পদ্মপুরাণে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের তালিকা আছে) রন্ধন করিয়া কমাই সকলকে ভোজন করাইল ও পিতার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন সমস্তে তুলিয়া রাখিল। পরে ভাতার হইতে এক বাটা পান ও একটি ঘুতের হাঁড়ি সঙ্গে লইল ও একখানা হীরার কাটারী খোঁপায় লুকাইয়া রাখিল। পরে সকলের নিকট বিদায় লইয়া বালিকা মাওকার উঠিল—

“সাকী হইও চন্দ্রখর্য সাকী হইও তোমরা রে
সাকী হইও দেবদুর্গা সাকী হইও তোমরা রে
সাকী হইও মারা তাই সাকী হইও তোমরা
আওলা আকবরে মদন সাহা স্বামী রে।”

বালিকার হৃদয়ে স্বামি ভক্তি বদ্ধমূল হইয়াছিল, সে মদন সাহাকেই আশ্রয়দান করিয়াছে—জীবনে মরণে মদন সাহা তার স্বামী; সুতরাং বিদায় কালে স্বামীর চরণ চিন্তা করিয়া লইল।

পরে,

“পুছে মেলা দিয়া লুকুন ফিরোজ খাঁর বাড়ী ঘর রে
গুয়া বাটা খাইয়া কমাই রে ছায়া বাটা কইল রে।”
ইত্যবসরে এক ভীষণ কাণ্ড হইয়া গেল—

“করের মারা উঠিয়া বলে আগার মারা তাই রে
সুয়ারির তলে দেখি রক্ত বহিয়া যায় রে।”
কিন্তু ‘আগার মারা’ এই কথা বিশ্বাস করিল না,
উত্তর করিল—

“জাত বাটের কত গুয়া খাইছে বিস্তর রে।”
কলে ফিরোজ খাঁর জাদালে উঠিয়া কত গলায়
ছুড়ি দিয়া জো-বন্দী বন্দী করিয়া সকল সমস্তার সমাধান
করিয়াছিল।

“ঘুত খানি দিয়া কত গলা মাজন করে
ফিরোজ খাঁর জাদালে গিয়া সোণার কাটাইল করে

পান যে খাইয়া কমাই রে কাটারি যে খাইল রে।”
পরে ফিরোজ খাঁর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া মাওকা
পৌঁছল—মাওকা বরাবর অন্দর মহলে নেওয়ার জন্ত
ফিরোজ খাঁ আদেশ করিলেন—

“আবের পাখা লইয়া ফিরোজ খাঁর মা আসিলা সম্মুখে
চাকুনী খসাইয়া দেখে কাটারী যে খাইছে রে।
জিজ্ঞাসে কামর দিয়া ঐ যে ফিরোজ খাঁর ম’ গেলেন
চলিয়া রে—

পটুকন খাইয়া পড়ে ঐ যে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান রে।
খাইলু না ছাইলু না বধের ভাগী হইলু রে।”

ইত্যবসরে মদন সা বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া আসিল।
শোকে ও দুঃখে একান্ত পীড়িত হইয়া মদন আহুত হইয়া
গেল—এই ভীষণ অনর্থের মূলে ফিরোজ খাঁ, এই সংবাদ
শুনিয়া তাহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিতে প্রতিজ্ঞা
করিল।

“চুল কাড়ার বারি শুনি মদন সার জিজ্ঞাসে রে
কিসের চুল কাড়ার বারি এই নগরেতে রে।
চুল কাড়ার বারি হইছে ফিরোজ খাঁর বাড়ী রে
ফিরোজ খাঁর করিত। বিয়া লোণা বারইর পুড়ি রে।
অগ্নির মধ্যে ঘুত দিলে যেমন জলি উঠে রে—
তেন মত জলে ঐ যে মদন সার অন্তরে রে।

জোড়-ঘোড়া দৌড়াইয়া গেল ঐ যে ফিরোজ খাঁর বাড়ী রে
ফিরোজ খাঁর বাড়ী ঘর পুড়িয়া ভস্ম কইল রে
ফিরোজ খাঁর পুতায় মদন সার পুর্করী লি রে।
ফিরোজ খাঁর বংশ নাশ কমাই কতায় লাগি রে।”
এইরূপে মদন সা প্রতিহিংসা সাধন করিয়া ভুগু

হইল।

উপসংহার ভাগটি কোনও কোনও সঙ্গীতে ভিন্ন রূপে
গীত হইয়া থাকে। ফিরোজ যখন বুঝিলেন তিনিই
কতায় মৃত্যুর কারণ, তখন অমৃততণ্ডুল হৃদয়ে নিজেও গলায়
ছুড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

“আমার কারণে কতক আপন কাটাইল খাইছে
আপন হস্তে কিরোজ খাঁ কাটাইল করে লইছে।
আপনার সাথে কিরোজ কাটাইল খাইছে।

* * * * *

মদন সার জুড়া কতক কিরোজ না পাইছে
নেই কতক জুড়া কিরোজ আপনি মরিছে—
মরা কিরোজ মদন সার শুলে দিয়া ধইছে।”

আজিও সেই প্রদেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে
—সেই প্রবাদের মূলে কিরোজ খাঁ—

উকীল মাইনকর হাটা হুটি
টেরা মাইনকর বিয়া।
তিন দিন রইলার রে কিরোজ
পঞ্চাড়া মাথায় দিয়া।

এই ঘটনার পরে সাত বর লোক * আদমপুরে
আসিয়া বাস করিতে থাকে, ইহাদের বংশধরগণ অতাপি
আদমপুরে বাস করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণদত্ত ভট্টাচার্য্য।

সন্তান পালন

শিশুর জন্ম হইতে ছয় মাস—শিশু ভূমিষ্ট হইলে,
তাহার নাড়ী কাটার আবশ্যক। নাতিমূল হইতে
৫.৬ অঙ্কুল পরিমিত নাড়ী বার দিয়া ছেদন
করিতে হয়। ছেদন করিবার পূর্বে ছেদ স্থানটীর
কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে ও নিম্নে সূতা দ্বারা দৃঢ়ভাবে দুইটা বন্ধন
করিতে হয়। ভূমিষ্ট হওয়ার পর হইতে শিশুর নিঃশ্বাস
প্রবাস বহিতে আরম্ভ করে। এখন আর তাহার মাতার
আহারে তাহার আহার হয় না। মাতার নিঃশ্বাস প্রবাসে

তাহার নিঃশ্বাস প্রবাসের কাজ হয় না। নাড়ীচ্ছেদ
হইলে শিশুকে কাপড়ে জড়াইয়া পিড়িতে করিয়া স্থতিকা-
গারের বে স্থানটা সর্বাঙ্গেকা নিরাপদ সেই স্থানে রাখিয়া
দিয়া প্রসূতীর স্তন্যদান দিকে মন দিতে হয়। মধ্যে
যথো অবসর বহু শিশুটির দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হয়।

সপ্ত প্রসূত শিশু—বাটিতে পড়িয়াই শিশু কাদিয়া
উঠে, ইহা খুবই অস্বাভাবিক। যে শিশু ভূমিষ্ট হইয়া
কাদে না, অনেক সময় তাহার জীবন লইয়া কাড়া-
কাড়ি পড়িয়া যায়। এরূপ স্থলে শিশুর বুক পিঠে
চাপড় মারিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে শীতল জলের
কাপটা দিতে হয়, তাহা হইলে শিশু কাদিয়া উঠে,
এবং তাহার সঙ্গ সঙ্গে, তাহার শ্বাসপ্রবাস বহিতে
আরম্ভ করে। সন্তোজাত শিশুর ওজন প্রায় সাড়ে তিন
সের। ইহা লম্বায় এক হাতের কিছু উপর। ইহার নখ-
গুলিকে প্রায় আঙ্গুলের আগা পর্যন্ত পৌঁছিতে দেখা
যায়। মাথাঙ্গুল যে কিছু না থাকে এমন নয়, কিন্তু
খুব বেগী নয়। শরীরটা বেশ দৃষ্টপুষ্ট গোলগাল।
সমস্ত শরীরে এক রকম তৈলময় লেপ লাগিয়া থাকিতে
দেখা যায়। এই সময় ইহার ইচ্ছা-শক্তির কোন পরিচয়
পাওয়া যায় না। জীবন রক্ষার জন্য সে সর্বতোভাবেই
জননী বা মাতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ভূমিষ্ট
হওয়ার কিছুকাল পরে মাতার শিশুর সর্বাঙ্গ পরিদ্রাব করা
উচিত। তাহার কোন অঙ্গের কোনরূপ বিকৃতি আছে
কি না, হস্তপদাদিতে কোনরূপ অস্বাভাবিকতা আছে
কি না, এসকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। চক্ষুর
পাতা খুলিয়া দেখা উচিত যে চোক দিয়া কিছু পড়ে
কি না। শিশু মলমূত্র ত্যাগ করিল কি না তাহারও সংবাদ
রাখা উচিত।

সন্তোজাত শিশুর স্নান—ইহার পর শিশুকে স্নান করান
আবশ্যক। অষ্ট প্রহরের ভিত্তি যে জীলোকটি থাকিবে,
যাহাকে চলিত কথায় “আটপটরে” দাই বলে—শিশুকে
স্নান করান তাহারই কাজ। স্নানের সময় ঘরের চুয়ার

* আজবদি, সেব পরাম, মদন বাড়িমদার, সেব লাখু, মাঝাবদি
মাঝাবদি, দুবার ধাঁ।

জানালাগুলি বন্ধ করা আবশ্যিক। তাহা না করিলে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া শিশুর সর্দি হইতে পারে। স্নানের গামলাটির অর্ধেক জলপূর্ণ করিবে। জল অল্প গরম হওয়া চাই। স্নানের পর শিশুর অঙ্গ যে যে দ্রব্যের আবশ্যক হইতে পারে, দান করাইবার পূর্বে সেগুলি হাতের কাছে রাখা আবশ্যিক। “আটপউয়ে” দাই, আপনার ক্রোড়ের উপর একখানি তোয়ালে বিছাইয়া তাহার উপর শিশুকে চিৎ করিয়া শোয়াইবে। তাহার পর ক্ষিপ্ততা সহকারে অথচ খুব সাবধানতার সহিত স্নান করাইতে থাকিবে। সর্বপ্রথমে কোমল টার্কি স্পঞ্জ দ্বারা, অতঃপর নরম ত্রাকড়া সাহায্যে, শিশুর মুখমণ্ডল ধৌত করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুখ মুছাইয়া দিবে। তাহার পর এক খণ্ড লিটে অথবা মোটা অথচ নরম ত্রাকড়াতে স্নানান মাখাইয়া মুখ বাদে শিশুর সর্বগাত্রে সাবান মাখাইয়া উহাকে জলপূর্ণ গামলাটির মধ্যে বসাইয়া দিবে। গলা পর্যন্ত যেন জলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। শিশুর ষাড় অভিশয় নরম। মাথাটাকে ঝাড়া করিয়া রাখিতে সে একবারেই অসমর্থ। এই কারণে স্নান করাইবার কালে ষাড়ী তাহার বাম হস্তখানি শিশুর ষাড় ও বগলের নিম্নে স্থাপন করিয়া উহার মস্তকটী যেন সোজা করিয়া রাখেন। এই সময় শিশুর মাথায় সাবান মাখাইয়া স্নান-কার্য শেষ করিবেন। শিশুর মাথায় প্রথম দিন সাবান দেওয়ার পর কয়েক দিন আর সাবান দিতে নাই। নবজাত শিশুর গাত্রে তৈলময় যে সকল পদার্থ সংলগ্ন থাকে, সেগুলিকে আলুগা করিবার উদ্দেশ্যে এ বেশের দাইয়েরা শিশুর সর্বশরীর তৈল দ্বারা ভিজাইয়া রাখে। ইহার কোন আবশ্যকতা নাই। প্রথম দিনের স্নানে না হউক, দ্বিতীয় দিনের স্নানের সময় এগুলি আপনা হইতে উঠিয়া যায়। স্নান করাইবার সময় শিশুর গারে যে যে স্থানের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া থাকে (যেমন গলদেশ বগল কুচকি প্রভৃতি) সেই সেই স্থানগুলি বিশেষ ভাবে গরমিত ও ধৌত করা আবশ্যিক। বাম হস্তের দ্বারা মাথা ও দ্বিতীয় অঙ্গুলি সাহায্যে ঐ সকল

স্থানের এক একটি ভাঁজ ঝাঁক করিবে। দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে পরিষ্কার করিবে। শিশুকে কখনও ২০ মিনিটের অধিক জলে রাখিতে নাই। ইহার পর তাহাকে জলের মধ্য হইতে উপরে তুলিবে। জল হইতে উঠাইবার সময় বাম হস্ত শিশুর ষাড়ের পিছনে ও উহার বাম বগলের নিম্নে রাখিবে এবং দক্ষিণ হস্ত উহার জাম্বুঘরের পশ্চাতে রাখিবে। এইরূপে শিশুকে জল হইতে উঠাইয়া আপনার হাটুর উপর এক খানি শুষ্ক তোয়ালিয়া বিছাইয়া তাহার উপর উহাকে উপুড় করিয়া স্থাপন করিবে, এবং অঙ্গ একখানি শুষ্ক তোয়ালিয়া দ্বারা উহার পৃষ্ঠদেশ হাত পা মাথা গলা প্রভৃতি মুছাইয়া দিবে। অতঃপর ইচ্ছা করিলে উহার গলদেশে পুটে ও হস্তপদাদিতে পাউডার মাখাইয়া দিবে। ইহার পর শিশুকে এমন কোশল সহকারে চিৎ করিবে যে চিৎ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভিজা তোয়ালিয়াখানি খেন মাটিতে পড়িয়া যায়। এখন তোয়ালিয়া দ্বারা শিশুর সম্মুখটা মুছাইয়া দিবে। ইহার গলা কান বগল কুচকি প্রভৃতিতে যেন জল না থাকিতে পার। মুখ বাদ দিয়া শিশুর দেহের অঙ্গ সকল স্থানেই পাউডার মাখাইতে পারা যায়। ইহার পর উহাকে ভাঙ্গা প্রভৃতি পরাইতে হয়।

নবজাত শিশুকে জামা পরান—নাড়ী ছেদ করার পর নাড়ীর যে অংশটুকু নাভির সহিত সংলগ্ন থাকে তাহা ৫ হইতে ১০ দিনের মধ্যে আপনা হইতে খসিয়া পড়ে। যে কয়দিন ইহা না পড়ে সে কয়দিন ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার আবশ্যিক। ইহাকে খুলিয়া রাখিতে নাই। দীর্ঘ প্রস্বে ৪ ইঞ্চি করিয়া কয়েক খণ্ড ত্রাকড়ার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, সেগুলির এখন আবশ্যিক। উহাদের এক খানি লইয়া কাঁচি দিয়া কাটিয়া মাঝামাঝি ফাক করিয়া নাড়ীর নিচে দিয়া উপরে আনিবে। তাহার পর এই বস্ত্র খণ্ডের দক্ষিণ অর্ধে ভাঁজিয়া নাড়ীর উপরে রাখিবে। সেইরূপ বাম অর্ধও করিবে। ইহাতে নাড়ীটী সম্পূর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত

পৌষ ১৩১২

হইবে। এইরূপ বজ্রাচ্ছাদিত নাড়ীটিকে তুলিয়া পেটের উপরে রাখিবে। তাহার পর একটি কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে। ব্যাণ্ডেজ করিবার সময় নাড়ীর নীচের দিকে বেশী কষিবে আর উপর দিকে ঢিলা করিয়া কষিবে। এমন না করিলে শিশুর পেটে ও বুকে অধিক চাপ পড়িয়া তাহাতে উহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ও পরিপাক ক্রিয়ার বিঘ্ন জন্মাইতে পারে। নাড়ী বেশ শুষ্ক রাখার আবশ্যক। নাড়ী শুষ্ক করার এক প্রকার চূর্ণের কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। নাড়ী বাধা শেষ হইলে শিশুকে ঋতুর উপযোগী বস্ত্র পরাইবে, ও একখানি ক্রমালের আকারের ত্রাকড়াকে কোণ-কুণি ছুঁতাজ করিয়া শিশুর কোমরে ও সম্মুখে বাধিয়া দিবে। নাড়ী যত দিন না খসিয়া পড়ে ততদিন পূর্বোক্ত ভাবে নাড়ীর যত্ন করিবে। নাড়ী খসিয়া গেলে, নাড়ীর উপর পুরু করিয়া একটা তুলার গদি দিয়া তাহার উপর ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিবে।

শিশুর চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতির যত্ন—শিশুকে জামা পরাণের পর তাহার চোক কান নাক মুখ পরিষ্কৃত করিয়া দিবে। চোক দিয়া কিছু পড়িতেছে কিনা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিবে; সকলের শেষে মুখের মধ্যটা পরিষ্কার করিয়া দিবে। ডাইন হাতে তর্জনীতে নরম ত্রাকড়া জড়াইয়া আঙ্গুলটি অগ্নোস্ক ভলে ডুবাওয়া তাহার দ্বারা মুখের মধ্য পরিষ্কার করিয়া দিবে। ইহার পর গ্লিসিরিন্ অব্ বোরাক্স নামক ঔষধ অথবা মধুতে সোহাগার ঠৈ মাড়িয়া তাহার একটু শিশুর মাড়িতে, গিল্মায় ও তালুতে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিবে।

শিশুর প্রাত্যহিক স্নান—শিশুকে প্রত্যহই একবার করিয়া স্নান করান আবশ্যক। স্নানের পর প্রতিদিনই নুতন বজ্রাদি পরাইয়া দিবে। পূর্ব দিনের ব্যবহৃত বজ্রাদি না কাচিয়া পুনরায় ব্যবহার করিতে নাই। স্নান করাইবার কালে শিশুর

হাত পা পাছা মুখ বেশ করিয়া ধোয়ানের আবশ্যক। স্নানের সময় নাড়ীটার প্রতিও লক্ষ্য করিতে হয়। স্নানের পর অনেকে একবার মাথায় বুরুষ দিয়া থাকেন। বুরুষ দিয়া চুল ঝাঁচড়াইবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়ার আবশ্যক। এ সময় শিশুর মাথার হাড় তারি নরম থাকে। মাথার একটি স্থান এত নরম থাকে যে, হাত দিলে “তুল তুল” করে। দেড় বৎসর বয়স হইলে, তবে এ স্থানটি শক্ত হয়। মাথার এই কোমল স্থানটিতে যদি সামান্যমাত্র আঘাত লাগে, তাহা হইলে মস্তিষ্কের বিশেষ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

শিশুকে খাটে শোয়ান—এদেশে শিশুকে ও প্রসূতিকে এক বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহা ভাগ নহে; শিশুকে পৃথক ভাবে তাহার নিজের কাছে শোয়াইয়া রাখা উচিত। কেবল স্তন্যদান করিবার সময় প্রসূতির নিকটে আনা উচিত। স্নানের পর শিশুকে স্তন্য পান করাইয়া তাহার নিজের খাটে শোয়াইয়া রাখিবে, কোনরূপ বিরক্ত করিতে নাই। অনেকে শিশুকে অথবা দোলাইয়া থাকেন। ইহাতে শিশুর ঘুমের পক্ষে সুবিধা না হইয়া বরঞ্চ অসুবিধা হইতে দেখা যায়। স্তন্যদান করার পর শিশু আপনা হইতেই ঘুমাইয়া পড়ে। শিশু পক্ষে প্রচুর নিদ্রা ও বিশুদ্ধ বায়ুর একান্ত আবশ্যক। তাই বলিয়া তাহার গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া না লাগিতে পারে সে দিকেও লক্ষ্য রাখার আবশ্যক।

শিশুর নেওটী ও মলমূত্র ত্যাগ—শিশু যে সময় নিদ্রিত থাকে, তাহাকে না নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত না করিয়া খাত্তী বা দাই মধ্যে মধ্যে দেখিতে থাকিবে যে সব ঠিকঠাক আছে কি না, মলমূত্র দ্বারা কাপড়চোপড় নষ্ট হইয়া গিয়াছে কি না। যদি এমন দেখা যায়, শিশু ঘুমাইতেছে না, কেবল ক্রন্দন করিতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার পার্শ্বপরিবর্তন করিবার আবশ্যক হইয়াছে, সে যে পাশে শুইয়াছিল সে পাশে

আর শুইয়া থাকিতে পারিতেছে না। পার্থ পরিবর্তন করিয়া দেওয়ার পরও যদি তাহার জন্মন না প্ৰাণে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হয়ত প্রস্রাব করার তাহার বিছানাপত্র ভিজিয়া গিয়াছে, সেই জন্য তাহার অসুবিধা হইতেছে। যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তাহা হইলে ভিজা নেওটি প্রভৃতি বদলাইয়া দিবে। শিশুর নেওটিগুলি যেন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। এগুলি মোড়া দিয়া কাচা উচিত নয়। মোড়ায় কাচা কাপড় পরাইলে, শিশুর চামড়া লাল হয়, এবং চাকা চাকা দাগ বাহির হয়। মল-মূত্রযুক্ত বস্ত্রাদি অধিক কাল শিশুর ঘরে রাখিতে নাই এবং সেগুলি ঐ ঘরের মধ্যে কাচা উচিত নয়।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে এক বার মলমূত্র ত্যাগ করিতে দেখা যায়। প্রথম ৪৫ দিন শিশু যে মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহা কতকটা কালচে গোচ এবং কতকটা আঠার মত। ইহার পর মলের রঙ ফিকে হইতে হয়। এই মলই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং শিশু সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টায় ২০ বার মল ত্যাগ করে। শিশুর মলে কোন রূপ দুর্গন্ধ থাকিতে দেখা যায় না। শৈশবে মল কতকটা নরম থাকে, এবং উহার বর্ণ ফিকে হইতে হয়। একটু বড় হইলে তবে ধাধা মল হয়। মলের মধ্যে দুধের কুচি থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, শিশুর ভাল হজম হইতেছে না। মলের রঙ যদি সবুজে গোছ হয় এবং উহার মধ্যে যদি দুধের কুচি থাকে, কিংবা মল যদি আমরক্ত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে স্নযোগ্য চিকিৎসক ডাকার আবশ্যক জানিবে।

শিশু যেমন অভ্যাসের দাস এমন আর কেহ নহে। অভ্যাস করাইলে সে নিয়ম মত সময় ভিন্ন অল্প সময় মলমূত্র ত্যাগ করে না। শিশুর নেওটি যদি প্রস্রাব লাগিয়া ভিজিয়া যায়, তাহা হইলে বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা বদলাইয়া দিবে। ভিজা নেওটি অধিক কাল থাকিতে দিলে শিশুর চর্মের প্রস্রাব অথবা সর্দি হইতে পারে। নেওটি বদলাইবার সময় শিশুর গায়ে

যেখানে যেখানে প্রস্রাব লাগিতে দেখিবে সেই সেই স্থান মুছিয়া দিয়া পাউডার মাখাইয়া দিবে। শিশু মল ত্যাগ করিলে উহার পাচটি বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া শুক বস্ত্র দ্বারা মুছাইয়া পাউডার লাগাইয়া দিবে। কেহ কেহ পাউডারের পরিবর্তে মলম ব্যবহার করিয়া থাকেন। সম ভাগ জিঙ্ক অক্সেটনেট ও অলিভ অইল মিশ্রিত করিলে, সুন্দর মলম হয় এবং ইহার দ্বারা উত্তম কাৰ্য চলিতে পারে। মল লাগিয়া লাগিয়া শিশুর পাছার চামড়া যদি লাল বর্ণ হয়, তাহা হইলে পাউডার ব্যবহার না করিয়া মলম ব্যবহার করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

শিশুর ওজন—শিশুকে প্রতি সপ্তাহে এক বার করিয়া ওজন করা মন্দ নহে। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে শিশু বাড়িতেছে কি না; সাধারণতঃ জন্মবার কালে শিশুর ওজন সাড়ে তিন সের থাকে। প্রথম সপ্তাহে তাহার ওজন বাড়ে না, বরঞ্চ কতকটা কমিতেছে দেখা যায়। ৭ হইতে ১০ দিনের মধ্যে জন্ম সময়ে তাহার যে ওজন থাকে সেই ওজনটি কিরিয়া আসে; ইহার পর হইতে ৬৭ মাস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে উহার ওজন ২৪ ছটাক করিয়া বাড়িতে থাকে। গড়ে প্রতি সপ্তাহে তাহার ওজন ৩ ছটাক হিসাবে বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। জন্ম সময়ে বাহার ওজন ৩ সের থাকে, দেড় মাস বয়সে তাহার ওজন প্রায় ৪ সের হইতে দেখা যায়। তিন মাস বয়সে পৌনে আট সের, নয় মাস বয়সে পৌনে দশ সের, এক বৎসর বয়সে ১০ সের কি ১১ সের। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে জন্ম কালে শিশুর যে ওজন থাকে ৫ মাস বয়সে তাহার বিগুন, আর ১২ মাস বয়সে তিন গুন হয়।

শিশুকে হাওয়া খাওয়াই—এ দেশে শিশুর ষত দিন ছয় মাস বয়স না হয় তত দিন উহাকে বাড়ীর বাহির করিবার নিয়ম নাই। ইহার পূর্বে বাহির করিলে যে কোন ক্ষতি হইতে পারে, আমাদের এমন মনে হয় না। দেড় মাস হই মাসের শিশুকে অবাধেই বাহির করা যাইতে পারে। বাহির করিবার কালে

উহার দেহটি বেশ করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করা আবশ্যক। ২৩ মাসের শিশুকে ক্রোড়ে করিয়াই বাহির করিতে হয়। আর একটু বড় হইলে গাড়ী করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে পারা যায়।

প্রথম প্রথম ১৫।২০ মিনিটের বেশী বাহিরে রাখিতে নাই। দিনটা যদি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা থাকে, কি বড়ো হাওয়া বহিতে থাকে তাহা হইলে শিশুকে বাহির না করাই উচিত। আবার যদি এমন দেখা যায় বাড়ীর বাহির করার শিশুর উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইতেছে; তবে বাহির না করাই ভাল। হাওয়া খাওয়াইয়া শিশুকে যখন ঘরে আনিবে তখন অতিরিক্ত বস্ত্রাদি খুলিয়া দিবে। প্রথম দিন বাহির করিয়া যদি কোন বিষ না ঘটিতে দেখা যায়, তাহা হইলে পর দিন আর একটু অধিক সময় বাহিরে রাখিবে। এই রূপে সাত দিন নিরীক্বে কাটিয়া গেলে, শিশুকে সকাল বিকাল বাহিরে অর্ধ ঘণ্টা কাল করিয়া রাখা যাইতে পারে।

শিশুর গাড়ী—শিশুর গাড়ীকে ইংরেজীতে পেরামবুলেটার কহে। শিশুর জন্ম গাড়ীর যে একান্ত আবশ্যক, ইহা যেন কেহ মনে না করিয়া বসেন। তবে বাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা যে কেন ইহা না দিবেন তাহারও কোন অর্থ নাই। গাড়ীখানি কিনিবার সময় বেশ করিয়া দেখিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহার স্প্রিংগুলি যেন বেশ ভাল হয়। চলিবার সময় যেন ইহা “হ্যাকোচ ম্যাকোচ” না করে। ইহার চাকাগুলিতে যেন রবার দেওয়া থাকে। ইচ্ছামত ওঠাতে নাশাতে পারা যায় এমন একটি ছাদ থাকারও একান্ত আবশ্যক।

শিশুর চুবী—শিশুকে কোন রূপ চুবী চোবান উচিত নহে। সাধারণতঃ শিশুকে নিজের আঙ্গুল চুষিতে দেখা যায় ইহা মন্দ নহে। মা-ই হউন, আর খাজীই হউন, ইহাদের কাহারও শিশুকে আপনার আঙ্গুল চোবান উচিতন হে।

শিশুর খেলনা—শিশুকে এক সঙ্গে একটির অধিক খেলনা দিতে নাই। এক সঙ্গে বেশী খেলনা

দিলে সে কোনটি মাইবে স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। ছোট শিশুর সঙ্গে রীষারের পুতুল উত্তম খেলনা। চরক শিশুদের যে সকল খেলনার ব্যবস্থা করিয়াছেন এহলে তাহার উল্লেখ করা গেল। “বালকের জীড়নার্থ এইরূপ দ্রব্য প্রদেয় বাহা চিত্রবিচিত্র, শব্দবিশিষ্ট, মনোরম, বাহ্যিক অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ নহে, বাহা মুখপ্রবেশযোগ্য নহে; এবং বাহা প্রাণনাশক বা ভয়োৎপাদক নহে, তাহাই বালককে খেলা করিতে দিবে। বালককে ভয় দেখান ভাল নহে, তাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে।

সুস্থ শিশুকে চিনিবার উপায়—যে শিশুর দেহ সুস্থ এবং চিত্ত প্রক্লম, তাহার প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করিলেই চিনিতে পারা যায়। ইহার গায়ের রং স্ফলিন বা লালচে হয়। হাত পা বেশ শক্ত, শরীরটি যেন হাড়ের মাংসে জড়িত, অস্ত্রার রূপ স্তূলাকার নহে। প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৩ ছটাক করিয়া তাহার ওজন বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়; দিবসে এক বার কি দু'বারের বেশী মল ত্যাগ করে না। মল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, নিয়মিত ভাবে প্রস্রাব করে; মল ত্যাগ কি প্রস্রাব করিবার সময় ক্রন্দন করে না; বেশ সুখার উদ্বেক হয়, এবং খাইতে পাইলে তৃপ্ত ও প্রক্লম হয়। স্তন টানিতে কিংবা দুগ্ধ মিলিবার কালে কোন কষ্ট হয় না, খাওয়ার পর স্বচ্ছন্দ ভাবে নিদ্রা যায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে কোনরূপ কষ্টের লক্ষণ বুঝা যায় না, স্নানের সময় অকারণ অস্ত্রার ক্রন্দন করে না, বরঞ্চ ক্ষুধার লক্ষণ প্রকাশ পায়; দিনে দিনে সপ্তাহে সপ্তাহে ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া জ্ঞান ও বুদ্ধি বিকাশের লক্ষণ টের পাওয়া যায়, আর একটু বড় হইলে উইয়া উইয়া আপন মনে হাত পা ছড়িয়া খেলা করিতে থাকে। সুস্থ শিশু বেশী কান্নাকাটি করে না। সুখার সময় জ্বর অল্প সময় ইহাদের আর কান্নিতে দেখা যায় না। সুস্থ শিশুর চোক, কান, নাক দিয়া কিছু পড়ে না। ছয় মাস বয়সে উহার মস্তকে দিব্য চুল পড়ায়, তাহার গায়ে কোন রূপ দাগ বাহির হয় না।

প্রিয়ানেন্দ্র নারায়ণ বাগচী।

প্রেমের স্মৃতি

কিশোর কালের প্রেমের স্মৃতি লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়,
ছেগে উঠে মাঝে মাঝে, হিরার মাঝে লুপ্ত রয়।

বাঁশ বনটির ফাঁকে ফাঁকে

পায়রাঙলোর বাঁকে বাঁকে,

পল্লী-পথের বাঁকে বাঁকে ফুল বাগানের মধ্যখানে
ফল পাড়া আর জল সঁচাতে সে প্রেম বুকে সংঘ আনে।

কিশোর কালের প্রেমের স্মৃতি লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়,
লতার পাতার পাড়ার পথের যথার তথার লুপ্ত রয়।

সাঁজ পূজুনির শাঁখের ডাকে,

বিকাল বেলায় কুলস কাখে,

পল্লী-বাগার উজল আঁখে, দীঘির বাঁধা ঘাটটি 'পরে
ছুটাছুটি খেলাধুলার পাঁড়ার মাঠের বাটটি ভবে'।

শিউলি ছোপা কাপড়ে আর হোলীর দিনে রাসবাড়ীতে
পাথর পুজার পোরোহিতো, শিশু পাঠের মাষ্টাবিতে।

তুলসী তলার দীপ জ্বালাতে

সাঁজের ভোরের জল ঢালাতে,

কিশোর কালের ফুল তলাতে, যে বীজ বুকে উণ্ড হয়
অঙ্কুর তার জীবন ভরে' লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়।

শ্রীকালিদাস রায়।

সি-ইউ-কি

(ওয়াটার্স-লিখিত-ইউয়ান-চ্যাং বা হিউয়েন
সাংয়ের সি-ইউ-কি'র ভূমিকা)

টমাস ওয়াটার্স ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড ইয়েলিং নগরে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যে, তাঁহার পিতৃদেব রেভারেণ্ড ওয়াটার্সের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, লণ্ডন বৎসর বয়স্ক কালে বেলক্যারের "কুইন্স কলেজ" (Queen's College) অধ্যাপনার প্রবেশ করেন। ছাত্রজীবনে ওয়াটার্স সাতিশর ধ্যানি অর্জন করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বি. এ. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইল এবং পরবর্তী সনে ল্যাটিনের সহিত এম. এ উপাধি লাভ করেন।

১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজকীয় কার্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি চীনে গমন করেন, এবং দানাবাহকে দান কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। এইরূপে দ্বাবিশ বৎসর চীনে অতিবাহিত করিয়া বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বলা বাহুল্য, রাজকীয় কাস্যেও তিনি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন। চীনে বাসকালীন তিনি চীন ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন, এবং চৈনিক দর্শন সম্বন্ধে ১৮৭০ সনে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত হন। উক্ত দর্শন বিষয়ক পুস্তক ব্যতীত তিনি "বর্তমান চীনবাসীর দৈনন্দিন ব্যবহার," "চৈনিক ভাষা" প্রভৃতি আরও তিন খানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়া গণ্য হন।

উল্লিখিত গ্রন্থ ব্যতীত, ওয়াটার্স সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং বা ইউয়ান-চ্যাং এর পথচিহ্ন কাহিনী সি-ইউ-কি'র অনুবাদ করেন। কিন্তু, তাঁহার বিষয় তাঁহার জীবিত কালে এই অমূল্য গ্রন্থ বঙ্গভূমিতে পড়েন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে সনাতনধর্ম আখ্যাপক বিস ড্যান্ডিডন্স এবং ডাক্তার ব্রুসেল এত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

[পথম প্রকাশের শ্রীযুক্ত ভারতকল্যাণ পাবিত ব্যারিষ্টার প্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ বিদ্যাক্ষরণ মহাশয় "ভাবনা" সম্পাদিকা পুজুনীবা শ্রীযুক্ত সূর্যকুমারী দেবী মহাশয়া প্রভৃতির প্ররোচনায় আমরা গত দুই বৎসরের অধিক কাল হস্তে হিউয়েন সাংয়ের অনুবাদে ব্যাপৃত আছি। এই অনুবাদ (যাহা ধানাবাহিক রূপে "ভারতীতে" প্রকাশিত হইতেছে)। হিউয়েন সাংয়ের অস্তুত অনুবাদক বিস (S. Beal) কর্তৃক অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া করা হইতেছে। আমরা ওয়াটার্সের অনুবাদেরও অনেক সাহায্য লইয়াছি। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতুনাথ সরকার মহাশয়ও আমাকে এই গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহিত করিয়াছেন। অধ্যাপক প্রবরের মতে ওয়াটার্সের অনুবাদই উৎকৃষ্ট। আমরা সেই জন্ত আমাদের প্রস্তাবিত গ্রন্থে ওয়াটার্স ও বিলের যে যে স্থলে মতভেদ দৃষ্ট হইবে তাহার উল্লেখ এবং ওয়াটার্সের টীকাগুলিরও অনুবাদ সংযোজ্য করিয়াছি। ওয়াটার্স লিখিত ভূমিকাও গ্রন্থে সংযোজিত হইবে। ওয়াটার্সের ভূমিকা এই স্থলে প্রস্তুত হইল।

হিউয়েন-সাংয়ের নামের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। জুলিয়েন করানী ভাষায় এই অমূল্য গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। ইনি হিউয়েন-অংশাং (Hiouen-Tsang) অধ্যাপক লেজ জিয়াং চোয়াং, বিল (Hiuen Tsiang), এবং জাপানে সুবিখ্যাত অধ্যাপক জুনয়ো ত্যাং হিউয়েনখান (Huen kwan) করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে প্রচলিত উচ্চারণ হিউয়েন সাং

মার্চ ১৩৯২

আমরাও আপাততঃ হিউয়েন-সাং লিখিব। এ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে বিশেষতঃ সাহিত্য পরিষৎ ও সাহিত্য সভার কৃতবিদ্যা সদস্যগণের মতামত জানিতে পারিলে বাধিত হইব।]

চীন, কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারক যে সকল অত্যাংকুই গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে সি-টউ-কি অগ্রতম। তদ্রূপ বৃহৎ মঠগুলির অনেক পুস্তকাগারেই এই গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সমস্ত সমস্ত ইহা বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করা হয়। বিক্রয়ার্থে যে সকল গ্রন্থ দেখা যায় প্রায়ই তাহা এই সকল মঠস্থিত গ্রন্থের নকল এবং সাধা-বণতঃ কোন বিদ্যোৎসাহ বা ধার্মিক ব্যক্তির প্ররো-চনায় নকল করা হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ ভ্রমপূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। একখানি গ্রন্থে সি-ইউ-কির দ্বাদশ খণ্ডের কেবল মাত্র দুই খণ্ডের নকল রহিয়াছে দেখা যায়।

এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ নাম “টা-ট্যাং সি-ইউ-কি” (Ta-Tang-Hsi-Yu-Chi), অর্থাৎ “সুবিখ্যাত ট্যাং রাজত্ব-কালীন পশ্চিমাঞ্চলের বর্ণনা” (Record of western Lands of the great Tang period)। “সুবিখ্যাত ট্যাং” এই পরিমিত কথাটি ব্যবহৃত হওয়াতে, কোন সময়ে এই গ্রন্থখানি প্রণীত হইয়াছিল তাহা নির্দেশ করা যাইতে পারে, এবং এই গ্রন্থখানিকে ঐ নামীয় অন্য গ্রন্থগুলি হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। চীন দেশীয় কোন কোন গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থখানি কেবল সি-ইউ-চুয়ান (Hsi-Yu-Chuan) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ‘সি ইউ-চুয়ান’ অর্থে ‘পশ্চিমাঞ্চলের বর্ণনা’ ধরা যাইতে পারে। কিন্তু শুধু এই নামে যে এই গ্রন্থ কোন দিন প্রকাশিত হইয়াছিল বা প্রচারিত হইয়াছিল একরূপ বোধ হয় না। গ্রন্থখানি প্রথমাবস্থায় যে রূপে লিখিত হইয়াছিল এবং বর্তমানে ইহাকে যে ভাবে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহা দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু চীনের উত্তরাঞ্চলে দশম খণ্ডে বিভক্ত একখানি একরূপ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

পুস্তকখানির ‘নীমপুত্র’ দৃষ্টে অসম্মিত হয় যে, ইহা ইউয়ান-চুয়াং কর্তৃক “অনুবাদিত” হইয়াছে; এবং ইহা পিয়েংচি দ্বারা “প্রথিত” হইয়াছে। কিন্তু অনুবাদ কথাটি সাধারণতঃ প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করা উচিত নহে। ঐ শব্দটি হইতে বড় ভ্রমের অনুমান করা যাইতে পারে যে, গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়গুলি ইউয়ান-চ্যাং বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জনৈক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ইউয়ান-চুয়াংয়ের সংগৃহীত উপাদান হইতে পিয়েংচি এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। মতান্তরে, ইউয়ান-চুয়াং সমস্ত বিশেষে গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়গুলি পিয়েংচিকে জ্ঞাত করেন, এবং পরে পিয়েংচি এই সকল একত্রে প্রথিত করিয়া একটি ধারাবাহিক বর্ণনা প্রস্তুত করিয়াছেন।

সম্রাট তৈসঙ্গ (Tai-Tsung) কর্তৃক যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি ইউয়ান-চ্যাং আনীত ভাবতবর্ষীয় পুঁথিগুলির অনুবাদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, পিয়েংচি তাঁহাদেরই অগ্রতম। অনুবাদগুলিকে শুদ্ধ ভাষায় রূপান্তরিত করাই পিয়েংচির প্রধান কর্তব্য ছিল। তিনি হই-চ্যাং মঠের অগ্রতম যক্তি ছিলেন এবং সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু পবে, তিনি সম্রাট হুইতার সহিত গুপ্ত প্রণয়ে লিপ্ত হইয়া পড়েন। ইউয়ান-চ্যাংয়ের ত্রায় ধর্মাত্মার সহিত একস্পর্কারের হৃৎকিরিত লোকের সখ্য সম্ভবপর নহে। সি-ইউ-চি সম্বন্ধে বাস্তবিক তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না সে বিষয়ে আমাদের ধোরতর সন্দেহ আছে। যদি কিছু থাকে, তবে, সম্ভবতঃ তিনি ইউয়ান-চ্যাংয়ের বর্ণনাগুলি একত্রীভূত করিয়াছিলেন এই মাত্র। অজ্ঞাত আমরা ইউয়ান-চ্যাংয়ের যে সকল রচনা দেখিতে পাই, তাহাতে তিনি এক কার্যের অজ্ঞ যে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহের হেতুই দেখা যায় না। অধিকন্তু, একখানি পুরাতন পুস্তকের তালিকায় আমরা ইউয়ান-চ্যাং লিখিত “সুবিখ্যাত ট্যাং রাজত্বকালীন পশ্চিমাঞ্চলের বর্ণনা” ও পিয়েংচি লিখিত “পশ্চিমাঞ্চলের বর্ণনা” নামক পুস্তকদ্বয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। অপিচ ট্যাং এবং ত্রায় রাজত্বকালীন বৌদ্ধধর্ম বিস্তারক পুস্তকাদিতে

হিউয়ান-চুয়াং 'সি-ইউ-চি' প্রণয়ন করিয়াছেন এমন উক্তি অনেক সময় দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ পুস্তকখানির দাদশ খণ্ডের অন্ততঃ নয়খণ্ড হিউয়ান-চুয়াং স্বয়ং প্রণয়ন করিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। হয়ত পিয়েংচি কোন কোন স্থানে পাদটীকা সংযোজিত করিয়াছিলেন। কতকগুলি পাদটীকা যে পরবর্তীকালে দেওয়া হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ববর্তী কতকগুলি পুস্তকে এইসকল টীকা পুস্তক লিখিত হইবার পরে যোজিত হইয়াছে; এবং ইহাও সম্ভবপর যে, কতকগুলি অংশ গ্রন্থকার বাতীত অনেকেই সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং সেজন্য সেগুলি সর্বথা পরিত্যজ্য।

'সি-ইউ-চি'র কয়েকটি বিভিন্ন সংস্করণ দেখা যায় এবং প্রত্যেক সংস্করণের মূল গ্রন্থে ও টীকায় যথেষ্ট প্রভেদ দৃষ্ট হয়। বর্তমান অনুবাদের জন্য চারিটি সংস্করণ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম বইখানি "হ্যাংজ্যাং-সি-ইউ-চি" নামে খ্যাত এবং মিং বংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধ মঠ সমূহে ইহার ব্যবহারের আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। লণ্ডনের "ভারত আফিসের" (India Office) পুস্তকাগারে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত জাপানী ভাষার লিখিত যে সকল পুস্তক আছে তাহার সহিত উল্লিখিত সংস্করণের কোন প্রভেদ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ "ভারত আফিসের" পুস্তকাগারের পুস্তকখানি অথবা মিং বংশের রাজত্বকালে যে পুস্তকখানি লিপিবদ্ধ হয়, তাহাই এতদিন পর্যন্ত ইউরোপবাসী পণ্ডিতগণ অবগত ছিলেন। ফুচোর নিকটবর্তী বৃহৎ বৌদ্ধ মঠের পুস্তকাগারে যে পুস্তকখানি আছে, তাহাই দ্বিতীয়। তৃতীয়খানি জাপানী, কিন্তু লিপিকরপ্রমাদ ও অন্যান্য ভ্রমে পূর্ণ, এবং অন্যান্য সংস্করণে ও ইহাতে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। চতুর্থখানিও জাপানী সংস্করণ, কিন্তু সংশোধিত। এই সংস্করণ প্রধানতঃ কোরীয়া দেশে প্রচলিত মূল পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, এবং কোরীয়ার পুস্তকে যে সকল ভ্রম রহিয়াছে তাহার অধিকাংশ এই সংস্করণে সংশোধিত হইয়াছে।

অনুবাদকগণের কথা।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশীয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার, "ট্যাং-সি-ইউ-চি"র অনুবাদ প্রকাশ করেন। দুই বৎসর পূর্বে তিনি "হিউয়ান অসঙ্গের ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের ভারত ভ্রমণ কাহিনী" * প্রকাশিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্যটক যে সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহাদের ভৌগোলিক বৃত্তান্তাদিসহ অল্প আর একখানি গ্রন্থও সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন। যদিও মনসী জুলিয়েন কর্তৃক অনুবাদ নির্ভুল বহে, তথাপি এ গ্রন্থগুলি যে যথেষ্ট মূল্যবান সেবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্য দেশীয় ইংরাজি ভাষার অন্য একটি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—উহা পরলোকগত বিল সাহেবের। এই গ্রন্থ ১৮৪৪ সনে "পশ্চিম পৃথিবীর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বিবরণ; হিউয়ান সিয়াংয়ের লিখিত চীন ভাষা হইতে অনুবাদিত" বিল সাহেব এরূপ লিখিলেও বস্তুতঃ তিনি গ্রন্থের কতকাংশ চীন কতকাংশ ফরাসি হইতে ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। জুলিয়েন কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদের অনেকগুলি ভ্রম ইহাতে সংশোধন করা হয় এবং যে সকল মূল্যবান পাদটীকা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষার্থীর প্রভূত উপকার হইবে।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সি-ইউ-চি'র ভূমিকা কতিপয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ১৮৯৪ সনের 'মিউজিয়ন' (Museum) নামক সংবাদ পত্রের নবেম্বর সংখ্যায় ফরাসী দেশীয় সমালোচক গুলু (M. Gucluy) জুলিয়েন কর্তৃক অনুবাদিত সি-ইউ-চি'র ভূমিকার সমালোচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও একটি অনুবাদ প্রদান করেন। কিন্তু গুলুর সমালোচনা ও অনুবাদের বিশেষ কিছু মূল্য নাই। এই সমালোচনা পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান

* Histoire de la Vie de Hiouen-Tsang et de Ses Voyages dans l'Inde, depuis l'an 629 jusqu'en 645.

* Buddhist Records of the Western World, Translated from the Chinese of Hiuen Tsiang (A. D. 629).

হয় যে, সমালোচকের বুদ্ধিবৃত্তি ও চীনভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা নাই।

স্বনামখ্যাত অধ্যাপক স্লিগেল সি-ইউ-চির ভূমিকার একটি অনুবাদ ও তাহার সমালোচনাও করিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে তাঁহার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই প্রবন্ধে গুলুর মন্তব্যের অসারতা সপ্রমাণ করেন। যদিও স্থানে স্থানে অধ্যাপক স্লিগেলের অনুবাদ সুলভ হয় নাই, এবং তিনি গ্রন্থকর্তার উদ্দেশ্য ধরিতে পারেন নাই তথাপি তাঁহার এই প্রবন্ধ অত্যন্ত মূল্যবান। গুলুর মন্তব্যের সমালোচনা করাতে, শেখোক্ত লেখক তাহার সমালোচনা ও অনুবাদের সাপক্ষে পুনর্বীর লেখনী ধারণ করেন, কিন্তু গুলুর শেখোক্ত এই প্রবন্ধপাঠেও কেহ তাঁহার মতের সমর্থন করিবেন না।

সি-ইউ-চির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে একটি করিয়া ভূমিকা আছে; কিন্তু চতুর্থ সংস্করণে দুইটি ভূমিকা আছে। এই দুইটি ভূমিকার শেষ ভূমিকাটি সকল সংস্করণেই বর্তমান, কিন্তু প্রথমটি কেবল এই চতুর্থ ও কোরিয়া দেশীয় সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। শেখোক্ত ভূমিকাটি এতদেশীয় এবং বৈদেশিক অনুবাদকগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল। এই ভূমিকা চ্যাং-কাওসু (Tang-kao-tsu) এবং তৈ-সাং (Tai-tsung) ভূপতিষয়ের রাজ কর্মচারী ও সুলেখক চিংপোর লিখিত। চিংপো চীন দেশীয় ইতিহাসে অভিজ্ঞ ছিলেন; এবং ইতিহাস সংক্রান্ত-বিষয়ে তাঁহার মতামত বিশেষ সম্মানিত হইত। চিংশু (Chin-shu) নামক অন্ততম সুবিখ্যাত গ্রন্থের ইনিই সংগ্রাহক। চিংপোর নাম অন্ততম ঐতিহাসিক গ্রন্থের সহিতও সংশ্লিষ্ট। বিশেষতঃ চ্যাং বংশের উদ্ভব এবং তৈসঙ্গ নরপতির রাজত্বের প্রারম্ভের যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে, উহার গহিত চিংপোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ভূমিকা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ভূমিকা-লেখক ইউয়ান চুয়াংয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তিনি ভূমিকার ইউয়ান-চুয়াংয়ের নামোল্লেখ আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ভূমিকা-লেখক চিংপোর মতে ইউয়ান-চুয়াংই সি-

ইউ-কির একমাত্র গ্রন্থকার। চিংপো লিখিয়াছেন যে, ইউয়ান-চ্যাং এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নে কিছুই ক্রেশ বোধ করেন নাই। চিংপো এই ভূমিকা ৬৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই লিখিয়াছিলেন, কারণ ঐ বৎসর তিনি রাজধানী হইতে প্রাদেশিক শাসনকর্তারূপে প্রেরিত হন, এবং পশ্চিমধ্যে প্রাপত্যাগ করেন। তিনি ইউয়ান-চুয়াং ও সত্রাটকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি উত্তরকেই ভালরূপে জানিতেন।

দ্বিতীয় ভূমিকাটি কোরিয়া দেশীয় সংস্করণ বাতীত অন্য সকল সংস্করণেই রহিয়াছে; এবং ইহা চ্যাং-ইউ (Chang-yueh) লিখিত। জুলিয়েন ইহার সুলভ অনুবাদ করিয়াছেন এবং মূল গ্রন্থ ব্যাখ্যাকল্পে অনেক-গুলি পাদটীকা যোগ করিয়াছেন। জুলিয়েন নিঃসন্দেহে গভীর মনোনিবেশ সহকারে ভূমিকা অধ্যয়ন এবং ইহার তথ্যসম্বন্ধে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তথাপি চ্যাং-ইউ কে এবং তিনি কোন সময়ে দেহত্যাগ করেন, সে সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করেন নাই।

এই চ্যাং-ইউ ৬৬৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ এবং ৭৩০ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি কাও-সাং, চ্যাং-স্যাং, জুই-স্যাং, এবং সুয়ান-স্যাং নরপতিগণের রাজত্ব কালে বর্তমান ছিলেন। তিনি গ্রন্থকার, পণ্ডিত ও রাজ কর্মচারী বলিয়া সুবিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার কবিতা ও রচনাগুলি শুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে লিখিত। ৬৮২ খৃষ্টাব্দে চ্যাং-ইউ রাজ-কার্য্যের জন্য উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হন, এবং কিয়দ্বিঘ্ন পরেই তিনি সত্রাজ্ঞী উহোর (Wu-Hou) কর্ত্রে নিযুক্ত হন। ৭০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লিংনান-টাওতে (Lingnantao) স্থানান্তরিত হন, পরে তিনি আরও উচ্চ পদে আরোহণ করিয়াছিলেন।

চ্যাং-ইউর সম্বন্ধীয় সকল বিষয় পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এই ভূমিকার লেখক হইতে পারেন না। ভূমিকা-লেখক তাঁহার ভূমিকার বলিয়াছেন যে, বর্তমান রাজ্য যখন সুব্রাজ ছিলেন, তখন তিনি সু-সেং-ছি প্রণয়ন করেন, এই সু-সেং-ছি গ্রন্থকার

কাঙ-সাং ৬৮০ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। তখন চ্যাং-ইউর বয়ঃক্রম মাত্র ষোড়শ বৎসর। অর্থাৎ জুলিয়েন, প্লিগেল প্রভৃতির মতে এই ভূমিকা ষোড়শ বৎসর বয়স্ক বালকের লেখা। আমরা ইহা আদৌ বিশ্বাস করিতে পারি না। ভূমিকা-লেখক শুধু যে কনফিউ-সিয়াসের ধর্ম সংক্রান্ত সকল বিষয় অবগত ছিলেন তাহা নহে, তিনি বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়েও অভিজ্ঞ ছিলেন। বিশেষতঃ গ্রন্থকার শুধু যে ইউয়ান-চুয়াংয়ের সমসাময়িক ছিলেন তাহা নহে, তিনি ইউয়ান-চুয়াংয়ের বন্ধুও ছিলেন। তবে এ ভূমিকালেখক কে?

প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণে চ্যাং-ইউর নাম দৃষ্ট হয় না। কথিত হয় যে, মিং রাজত্বকালে গ্রন্থের সম্পাদকগণ ইহা যোগ করিয়া দেন। প্রথমে ভূমিকার পূর্বে কেবল নাম ও গ্রন্থকর্তার পদের বিষয়ই উল্লিখিত ছিল। সুতরাং ৬৫০ হইতে ৬৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই সকল উপাধিধারী কেহ জীবিত ছিলেন কি না তাহাই দেখা যাউক। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ইউ-চি-নিং (yu-chih-ning) নামক পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞ এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। তৈসাং ইহাকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, এবং অগ্রিম হইলেও রাজনীতি কার্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তৈসঙ্গের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রও তদীয় স্থলাভিষিক্ত হইয়া ইউয়ের প্রতি আরও নানারূপ সম্মান প্রদর্শন করেন। সম্রাট ৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউ ও অন্যান্য কয়েক জন উচ্চ পদারূঢ় রাজকর্মচারীকে ইউয়ান-চুয়াংয়ের সাহায্যে নিযুক্ত করেন। ভূমিকার যে সকল উপাধি দৃষ্ট হয় ইউ সেই সকল উপাধি এই সময়ে ধারণ করিতেন।

ইউ-চি-নিংই প্রকৃত পক্ষে এই ভূমিকার-লেখক। ইউয়ান-চুয়াংয়ের জীবিত কালেই এই ভূমিকা লিখিত হইয়াছিল এবং ইউয়ান-চুয়াংয়ের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত অন্য কাহারও এরূপ ভূমিকা লেখা সম্ভবপর নহে। এই ভূমিকা হইতে সকলে অনুমান করেন যে, রাজাদেশে পর্য্যটক প্রবর ইউয়ান-চুয়াং ৬৫৭ খানি সংস্কৃত-পুস্তক

অনুবাদ করেন; অর্থাৎ যতগুলি পুস্তক আনীত হইয়াছিল, তাহার সবগুলিই অনুবাদিত হয়। কিন্তু এক জনের পক্ষে এতগুলি পুস্তকের অনুবাদ কার্য যে অসম্ভব তাহা কেহই মনে করেন না। বস্তুতঃ, ইউয়ান-চুয়াং মাত্র ৭৪ খানি পুস্তকের অনুবাদ করেন। সপ্তদশ বৎসরে ৭৪ খানি পুস্তক অনুবাদ করাও বড় কম কথা নহে।

ইউয়ান-চুয়াং কর্তৃক অনুবাদ গুলি রাজাদেশেই সম্পাদিত হইয়াছিল, নামপত্র হইতে আমরা ইহাই জানিতে পারি এবং সি-ইউ-চি যে রাজার বিশেষ আদেশে প্রণীত হইয়াছিল তাহাও দেখিতে পাই। ভূমিকা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পর্য্যটক প্রবর ৬৫৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ ও দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত ট্যা-ট্যাং-সি-ইউ-চি গ্রন্থে তিনি যে সকল অজানিত দেশ, তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য ও সামাজিক রীতি নীতি দেখিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

যে ৬৫৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থের কথা দৃষ্ট হয়, সে গ্রন্থ-গুলি কি কি বিষয়ে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু মত ভেদ আছে। তৃতীয় সংস্করণে নিম্নোক্ত তালিকা দৃষ্ট হয়। যথা—

| | |
|--------------------------|-----|
| মহাযান সূত্র | ২২৪ |
| মহাযান শাস্ত্র | ১২২ |
| হবির সূত্র ইত্যাদি | ১৪ |
| মহাপ্রজ্ঞা সূত্র | ১৫ |
| মহিম্পশক | ২২ |
| সম্মতিয়া | ১৫ |
| কান্তাপির | ১৭ |
| ধর্মশাস্ত্র | ৪২ |
| সর্বোত্তমবাদিন | ৬৭ |
| আরোপকতিবিষয়ক | ৩৬ |
| বাবের দ্ব্যুৎপত্তিবিষয়ক | ১০ |

গৌর ১৩১১

ওয়ার্টার্সের ভূমিকা এই স্থানেই শেষ হইয়াছে। মূল ভূমিকার যদিও আমরা সুন্দর রূপে অনুবাদে সক্ষম হই নাই, তজ্জাপি আশা করা যায় যে, ইহা হইতেও ওয়ার্টার্সের বিদ্যা, বিচার-শক্তি ও সমালোচনার প্রভাব বোধগম্য হইবে।

শ্রীবোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হরিশ্চন্দ্র পাল

ঢাকা নগরীর প্রায় ১৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে ধলেশ্বরী তীরে সাভার গ্রাম অবস্থিত। এই স্থানে ধলেশ্বরীর ভয়ঙ্করী মূর্তি স্বতঃই প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দেয়। সাভারের অনতিদূরে বিভিন্ন স্থানে বংশাই নদী এবং ঢাকা নগরীর নিম্ন বাহিনী বুড়িগঙ্গা নদী ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তিনটি বৃহৎ নদীর প্রায় সঙ্গম স্থলে অবস্থিত হওয়াতে, সাভার স্বভাবতঃই বাণিজ্য-প্রধান স্থানের উপযোগী, এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি মনোরম। কাশীমপুর পরগণায় প্রায় সীমান্ত ভাগে অতি উচ্চ ভূমির উপর সাভার অবস্থিত।

এই সাভারে এবং ইহার চতুঃপার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহে হরিশ্চন্দ্র রাজার বহু কীর্তি চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়। সাভার রাজা হরিশ্চন্দ্র পালের রাজধানী ছিল। ইহার প্রাচীন নাম সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

“অক্ষাং ২৩° ২৫' ৫৫" উঃ, দ্রাঘিঃ ৯০° ১৭' ১০" পূঃ। (২৫)

(২৫) বিশ্বকোষ।

“বংশাবতী পূর্ব তীরে সর্বেশ্বর নগরী,
তৈসে রাজা হরিশ্চন্দ্র জিনি সুরপুরী॥”

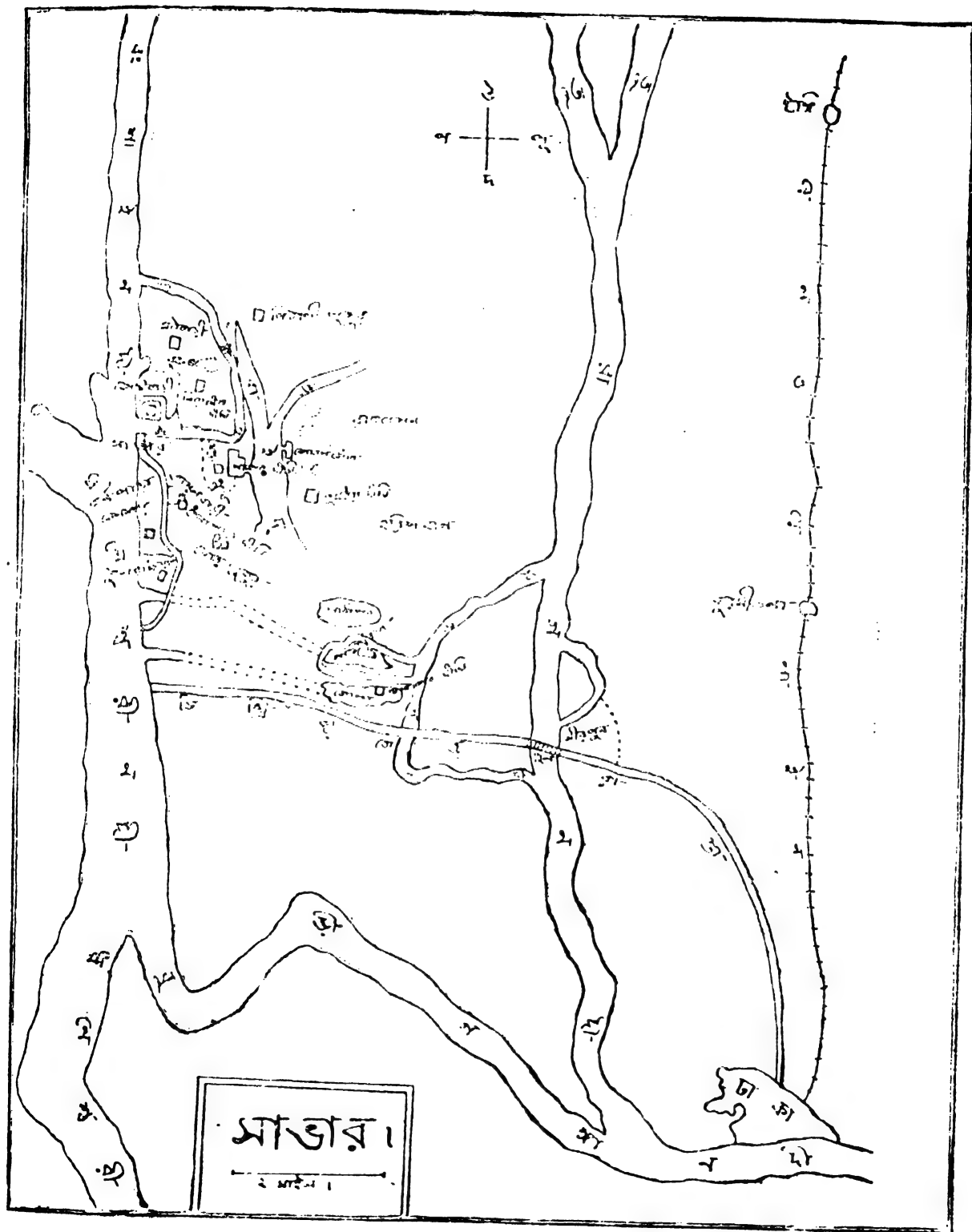
এই পদ্যটি সাভারে লোক মুখে শুনিয়াছি। ইহার উপর আস্থা স্থাপন করিলে সাভারের প্রাচীন নাম সর্বেশ্বর এইরূপ অনুমিত হয়। কিন্তু কাহারও মতে সাভারের প্রাচীন নাম সম্ভার। (২৬) আপাততঃ যে পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, তাহাতে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে।

কথিত আছে, হরিশ্চন্দ্র গোড় হইতে সসৈন্তে আগমন করিয়া সাভারে রাজ্য স্থাপন করেন। বিশ্বকোষকার অনুমান করেন যে, যে সময় সেনরাজগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে, অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি পালরাজগণ বিক্রমপুর হইতে মানিকগঞ্জের অন্তর্গত দাসোড়া পর্য্যন্ত ভূভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। (২৭) এই উক্তির কোনরূপ প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই; সুতরাং হরিশ্চন্দ্র রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধেও কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা সুকঠিন।

সাভার এবং তৎপার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহ নিম্ন হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী প্রতীতি ছিল। এই রাজধানীতে হরিশ্চন্দ্র খনিত এত দীর্ঘিকা আদ্যাপি বর্তমান যে, অস্ত্রান্ত্র অঞ্চলে একটা পরগণাতে ইহার অর্ধেক সংখ্যক জলাশয়ও দৃষ্ট হয় না। কথিত আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র তদীয় রাজধানীতে “কুড়ি বুড়ি” (৪০০ শত) দীর্ঘিকা খনন করেন, তন্মধ্যে রাজ বাটীর চতুর্দিকে ১২৥ গণ্ডা (৫০) এবং রাণী কর্ণাবতীর ভবনে (আধুনিক কর্ণ পাড়ায়) ৭৥ গণ্ডা (৩০টা) দীর্ঘিকা খনিত হয়। প্রকৃত পক্ষে সাভার অঞ্চলে এখনও এত জলাশয় দৃষ্ট হয় যে, তাহাতে পূর্বোক্ত প্রবাদ বাক্য নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

(২৬) শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার রায় বি, এ। প্রতিভা কবিত্ব, ১৩১৯।

(২৭) বিশ্বকোষ।



আমরা বহুসংখ্যক দীর্ঘিকার নাম সংগ্রহ করিয়াছি ; নিয়ে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। প্রবাদবাক্যসমূহসারে যে চারিশত দীর্ঘিকা খনিত হয়, খননের প্রায় সহস্র বৎসর পরে, অধুনা তাহার অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে, কতকগুলি “বাইদ” (নিম্ন ভূমি) এবং ধাতুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বোধ হয় সাত্তারে ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহে, অর্থাৎ প্রাচীন রাজধানীর সীমার মধ্যে অদ্যাপি প্রায় ২০০ দীর্ঘিকা বর্তমান আছে। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশেরই কোন নাম নাই, সুতরাং তাহা তালিকা-ভুক্ত করা গেল না। যেগুলির নাম আছে, তাহাদেরও প্রায় অনেক নামই আধুনিক ; হয়ত অবস্থান, প্রচলিত প্রবাদ, এবং সন্নিহিত গ্রামের নামানুসারেই পরবর্তী কালে তাহাদের নামকরণ করা হইয়াছে। নিয়ে দীর্ঘিকা-সমূহের দীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হইল; এবং অধিকাংশ নামের পার্শ্বে, ইহা যে গ্রামে অবস্থিত, তাহারও নাম লিখিত হইল।

১। সাগর দীঘি। দীর্ঘিকা-সমূহের মধ্যে ইহার নামই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ইহা অতি বৃহদায়তন এবং অদ্যাপি ইহাতে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন বর্তমান। ইহার পশ্চিম তটে রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ বর্তমান। সাগরদীঘি ‘আইচের নদী’ (মজিদপুর) গ্রামে অবস্থিত।

২। কেলি সরোবর। মজিদপুর গ্রামে সাগরদীঘির পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা অন্তঃপুরস্থিত ছিল, এবং রাজীগণ ইহাতে জলকেলি করিতেন, এইরূপ প্রবাদ। দীর্ঘিকাটি প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে।

৩। নিরামিষ দীঘি। জালেশ্বর গ্রামে সাগর দীঘি হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রবাদ এই, ইহা বিধবা রাজ-মাতার জন্ত খনিত হইয়াছিল। মৎস্ত-স্পর্শে জল অপবিত্র হইবার আশঙ্কায় ইহাতে কোন মৎস্ত থাকিতে দেওয়া হইত না। গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ বলেন যে, এই জলাশয়ের একরূপ কোন গুণ আছে, বন্দারা ইহাতে জীবিত মৎস্ত ছাড়িয়া দিলেও অচিরেই পক্ক প্রাপ্ত হয়।

৪। মঠবাড়ীর দীঘি। ভাটপাড়া গ্রামে “বুর্জের” (ইহার বিষয় পরে উক্ত হইবে) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। কথিত আছে, রাজস্থাপিত মঠ এই জলাশয়ের তীরেই স্থাপিত ছিল; তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান। এই মঠ হইতেই বোধ হয় দীর্ঘিকার নামকরণ হইয়াছে।

৫। দুই সতীনের দীঘি। মজিদপুর গ্রামে অবস্থিত। দুইটি দীর্ঘিকা এক স্থানে খনিত। রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুই মহিষা কর্ণাবতী এবং কুলবতীর স্মরণার্থই বোধ হয় ইহা খনিত হইয়াছিল।

৬। কোদাল দোয়া দীঘি। আড়াপাড়া গ্রামে অবস্থিত। কথিত আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র একদা হু-ভিক্ষ-পীড়িত প্রজার সুবিধা ও জনকষ্ট নিবারণের জন্ত এক রাজির মধ্যে বহুসংখ্যক দীর্ঘিকা খোদিত করান। খননকারিগণ এই দীর্ঘিকায় তাহাদের কর্দমাক্ত কোদাল (খনিজ) ধৌত করিয়াছিল; তাহা হইতেই এই নামের উৎপত্তি।

৭। দোয়াত দোয়া দীঘি। এই স্থানে রাজকর্ম-চারিগণ দোয়াত ধৌত করিতেন; তজ্জন্তই এই নামের উৎপত্তি। ইহা বাগুইলপুর গ্রামে অবস্থিত।

৮। ছোবানারা পুকুরিণী। জালেশ্বর গ্রামে অবস্থিত। রাজার তৈজসপত্নীদি ‘ছোবা’ সাহায্যে এই জলাশয়ে ধৌত করা হইত, এই রূপ প্রবাদ।

৯। কুমইরা পুকুরিণী। কথিত আছে, ইহাতে পূর্বে কুম্ভার ছিল। সাগর দীঘির পূর্ব দিকে অবস্থিত, মধ্যে মাত্র একটি বাইদ ব্যবধান।

১০—১৬। সাত পুকুর। জামসিন গ্রামে সাতটি পুকুর এক স্থানে অবস্থিত আছে। মধ্য স্থানের জলাশয়টি বেশ বিস্তৃত ও গভীর, অল্পগুলি প্রায় শুক হইয়া গিয়াছে।

১৭। ধোপাখোলার পুকুর। সাধাপুর গ্রামে অবস্থিত, রাজ-রজকের জন্ত খনিত।

১৮। মালী পুকুর। সাধাপুর গ্রামে অবস্থিত। মালীর ব্যবহারের জন্ত খনিত।

১৯। কুমার পুকুর। সাধাপুর গ্রামে অবস্থিত।
কুম্ভকারের সম্পত্তি।

২০। তাহুল বাড়ীর পুকুরিণী। কর্ণপাড়া গ্রামে
অবস্থিত। দোলমঞ্চ, তাহুল বাড়ী এবং রাজ-গুরু
আশ্রমের মধ্যবর্তী স্থানে বর্তমান।

২১। সেনা বাড়ীর দীঘি। কর্ণপাড়াস্থিত; প্রাচীন
সেনানিবাসের অন্তর্ভুক্ত।

২২। রাজ-গুরু পুকুরিণী। কর্ণপাড়া গ্রামে অব-
স্থিত। ইহার পশ্চিম দিকে রাজগুরু আশ্রম বর্তমান
ছিল।

২৩। ঋণান পুকুর। মাছুষপোড়া টেকের সংলগ্ন
ঋণান-সম্মিহিত।

২৪। বেল গাছ পুকুর। } সেনাপাড়ার দক্ষিণে অব-
২৫। কলা গাছ পুকুর। } স্থিত। বোধ হয় সেনা-
২৬। বট গাছ পুকুর। } গণের বাহারের জন্ত খনিত
২৭। তাল গাছ পুকুর। } হইয়াছিল। নাম শেষে
২৮। বড়ই গাছ পুকুর। } পরিবর্তিত হইয়াছে।

২৯। জীয়াস পুকুরিণী। প্রবাদ এই, ইহাতে ছুগ্ন
দিলে গাভী ছুগ্নতী হয়, ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র
সেন মহাশয় অগ্রহণ করেন, জীয়াস পুকুরিণী নামধেয়
জলাশয়গুলিতে কোনরূপ বৌদ্ধ ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইত।

৩০। চৌমাথা পুকুরিণী। ভাটপাড়ার নিকটে
রাজধানীর চারিটি মুপ্রশস্ত রাজপথের সম্মুখস্থ এই
জলাশয় খনিত, এইরূপ প্রবাদ।

৩১। কবিরাজ পুকুরিণী। সাভার।

৩২। ব্রহ্মচারীর পুকুরিণী। সাভার।

৩৩। বড় আখরার দীঘি—সাভার (পুকুর পাড়)।

৩৪। শোলার দীঘি—বলি মেহার।

৩৫। দেব পুকুরিণী—বলি মেহার।

৩৬-৩৮। তাল বাগের পুকুরিণী—(পাশাপাশি তিনটি)
বলিমেহার।

৩৯। সাত গাছ পুকুর—বলি মেহার।

৪০। লাল টেকির পুকুরিণী—বলি মেহার।

৪১। বড় ফুরার পুকুরিণী—বলি মেহার।

৪২। ছোট ফুরার পুকুরিণী—আনন্দপুর।

৪৩। বন পুকুর—বাড্ডা।

৪৪। জলরি—বাড্ডা।

৪৫। কইঠার পুকুরিণী—বাড্ডা।

৪৬। ইমাম বাড়ীর পুকুরিণী—বাড্ডা।

৪৭। ইদ বাড়ীর পুকুরিণী—বাড্ডা।

৪৮। লাল পুকুর—জালেখর।

৪৯। চট্টানার পুকুরিণী—জালেখর।

৫০। আইচের পুকুরিণী—ভাটপাড়া।

৫১। চৌধুরী বাড়ীর পুকুরিণী—ভাটপাড়া।

৫২। ঠাকুর বাড়ীর পুকুরিণী—ভাটপাড়া।

৫৩। ভাটপাড়ার দীঘি—ভাটপাড়া।

৫৪। চাইরা পুকুরিণী—ভাটপাড়া।

৫৫, ৫৬। জোড় পুকুরিণী—(পাশাপাশি দুইটি) গাঙ।

৫৭। বিরিঙ্গির পুকুরিণী—গাঙ।

৫৮। রাজা বাড়ীর পুকুরিণী—গাঙ।

৫৯। পিঠালী পুকুর—নয়া বাড়ী।

৬০। বাবার পুকুরিণী—মদনপুর।

৬১। দীঘি—রাড়ী রাড়ী।

৬২। গারাক্তেত গুখা পুকুরিণী—রাজার নদা।

৬৩। দেবপুকুর—জামসিন।

৬৪। ডাকাতনার পুকুরিণী—জামসিন।

৬৫। ছইলার পুকুরিণী—ছইলা।

৬৬। নজুমদার বাড়ীর পুকুরিণী—উলাইল।

৬৭। কানাইলালের পুকুরিণী—কাংলাপুর।

৬৮। বয়রা বাড়ীর পুকুরিণী—বয়রা বাড়ী।

৬৯। গুখা পুকুরিণী—মজিদপুর।

৭০। ইছামতী পুকুরিণী—কর্ণপাড়া।

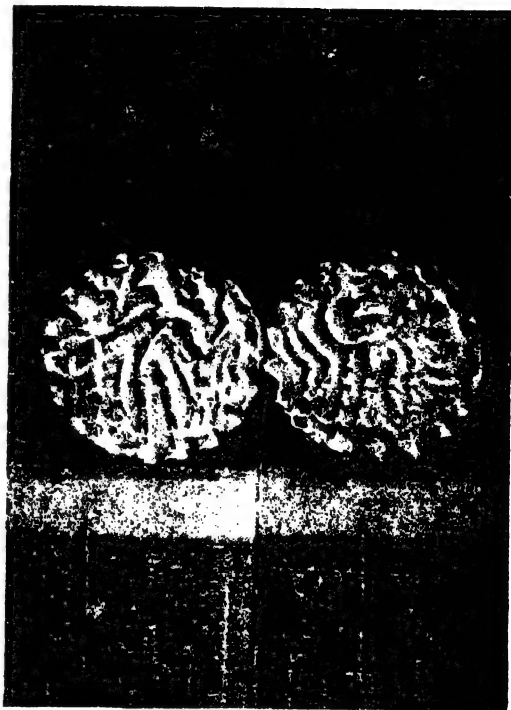
৭১। ক্ষিপ্রগতি সরোবর—ফুলবাড়িয়া।

৭২। খন্দকার পুকুর—কোণা, ইহার নামের
উৎপত্তি পরে বর্ণিত হইয়াছে।

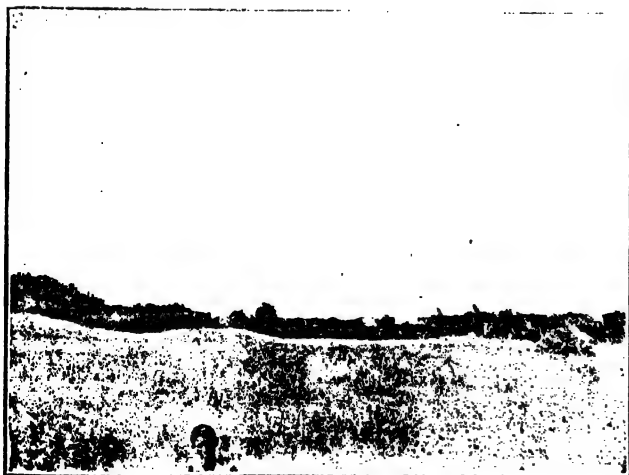
৭৩। রাজার পুকুর—বাগবাড়ী।



[১নং] সাগর দাঁঘি এবং তাহার পশ্চিম তটস্থ রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ ।



[২নং] সাতারে প্রাপ্ত প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা ।



[৩নং] হরিশ্চন্দ্রের রাজাসন ।

৭৪। স্বর্ধসাগর।

৭৫। রাজসাগর।

৭৬। ধন পুকুর।

৭৭। নির্মূলীলা পুকুর।

৭৮। পেট কাটা পুকুর।

৭৯। হাড়ি বাড়ীর পুকুরিণী।

৮০। আকার ডখা।

৮১। সলার (ঝাঁটা ধোয়া) পুকুর—কথিত আছে পুরবাসীগণের সম্মার্কনী ধোত করিবার জন্ত এই জলাশয় খনিত হয়।

৮২। চৌমাচ্চা পুকুরিণী।

৮৩। নাওগাড়া পুকুরিণী।

৮৪। বেকাই পুকুরিণী।

৮৫। কেউটার পুকুরিণী।

৮৬। সাগর ডুগী।

৮৭। সাতবোয়াইলা পুকুর।

৮৮। নালার ঘোণা।

৮৯। আকা পুকুর।

৯০। সানবাক্সা পুকুরিণী—ইহাতে সুস্পষ্ট বাঁধান ঘাটের চিত্র বর্তমান।

৯১। দাইতা বাড়ীর পুকুর।

৯২। সতুলোলোয়ানের দীঘি।

৯৩। গজারিয়ার দীঘি।

৯৪। মরা পুকুর।

দীর্ঘিকার এই সুদীর্ঘ তালিকা হইতে সহজেই অমুমিত হইবে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী কিরূপ সুশোভিত, সমৃদ্ধিশালী, এবং বহুবিস্তৃত ছিল। সাতারের চতুঃপার্শ্ববর্তী প্রায় ত্রিশ খানি গ্রাম লইয়া হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী অবস্থিত ছিল, তাহা তৎখনিত দীর্ঘিকা সমূহের অবস্থান পর্যালোচনা করিলেই প্রতীয়মান হয়।

জলাশয় ব্যতীত হরিশ্চন্দ্রের আরও বহু কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্তমান। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

সাগর দীঘি সুবিস্তীর্ণ জলাশয়, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই বৃহৎ দীর্ঘিকার পশ্চিম তটে রাজবাটা এবং রাজাষ্ট্রপুত্রের ভগ্নস্থূপাদি বর্তমান। [১নং চিত্র দ্রষ্টব্য]। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পায় ১৫২০ হাত উচ্চ কয়েকটি ইষ্টকবহুল মৃত্তিক'স্তূপ এখন সেই সুবিশাল রাজ প্রাসাদের চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। স্তূপ-গুলি এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ একরূপ নিবিড় বর্ণাকীর্ণ যে, এমন কি হস্তাঙ্ক ও তথ্য প্রবেশ লাভ বহু আয়াসসাধ্য। হস্তা-পৃষ্ঠে আমরা তাহ পরিশ্রমে এই স্থান দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছি। পরিদর্শকগণের পক্ষে এই সমস্ত স্থান দর্শন করিবার জন্ত নীতকালই উপযোগী, কারণ তখন অরণ্যানী এত নিবিড় থাকে না।

স্তূপগুলির উপরিভাগে খালের ত্রায় লম্বা ৫১৬ ফিট, প্রশস্ত, এবং সুগভীর বহু গর্ত দৃষ্ট হইল। অমুমিতান্নে জানিলাম, সাতারের অধিকাংশ ধনী ব্যবসায়ীগণই এই স্থান খনন করিয়া লক ইষ্টকসমূহ দ্বারাই স্ব স্ব বাসভবন নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। এইরূপে অতীত ইতিহাসের শেষ চিত্রসমূহও লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এই সমস্ত স্থান বিশেষজ্ঞগণের তদ্রাবধানে খোদিত হইলে, অতীতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের বহু উপকরণাদি অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া যাইত।

ঐ স্থানের নিকবর্তী বহু প্রাচীন ব্যক্তি বলিলেন যে, স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক ঐ স্তূপসমূহ খনন কালে বহু প্রস্তরমূর্ত্তি, ইষ্টকমূর্ত্তি, খোদিত ও লিখিত ইষ্টক, কয়েকখানা স্বর্ণ ও রৌপ্য নিৰ্ম্মিত থালা এবং বহু গুপ্ত ধন অনেকে প্রাপ্ত হয়। এখনও কুমকগণ হলচালনা-কালে প্রাচীন মুদ্রাদি, এবং মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু, অজ্ঞ কুবকগণ ইহার মূল্য বুঝিতে না পারিয়া ইহা রক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করে না। আমরা বহু চেষ্টার কয়েকটি প্রাচীন দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি; ক্রমে যথাস্থানে তাহা উল্লেখ করিব।

এই স্থানে আমরা সংবাদ প্রাপ্ত হই যে, রাজবাটার

পৌষ ১৩৯৯

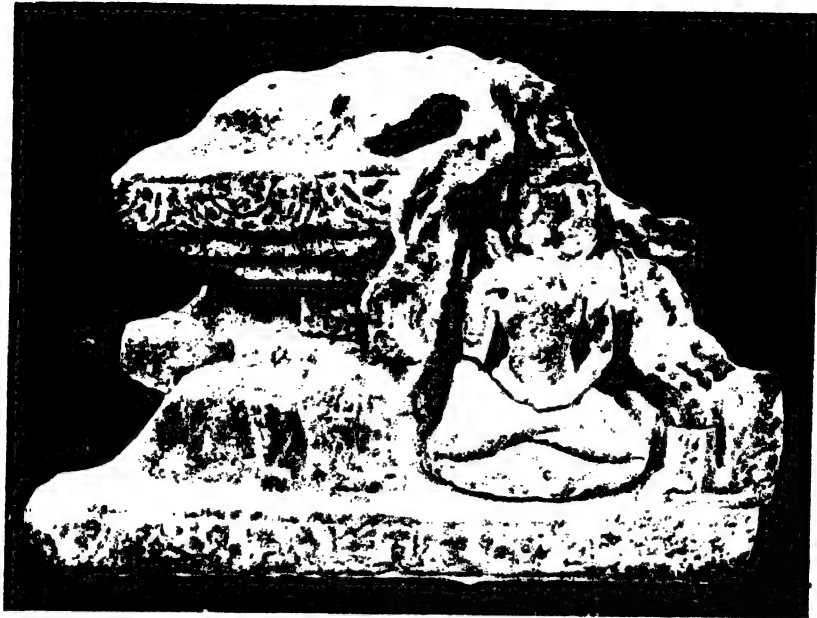
সন্নিকটস্থ একটি ক্ষেত্রে হলচালন-কালে কিয়দিন পূর্বে জনৈক মরিচ মুসলমান কৃষক ৩৪টি অতি প্রাচীন স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া উহা সাভারের জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়াছে। তদুযায়ী অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া, বহু চেষ্টায় এবং নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া উহার একটি স্বর্ণমুদ্রা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। [২নং চিত্র দ্রষ্টব্য] সাভার এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্তী বহু পল্লী হইতে আমরা বহু পরিশ্রমে এবং বহু অর্থ ব্যয়ে ৫০টি মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছি; উহার কোনটিই ৪০০ বৎসরের জুন প্রাচীন নহে, কিন্তু, পূর্বোক্ত স্বর্ণ মুদ্রাটি ভিন্ন অপর কোন মুদ্রার সহিত বর্তমান প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া বিবরণ প্রদান করা অনাবশ্যক মনে করি।

সাভারে একটি প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, হরিশ্চন্দ্র রাজা অলঙ্কারীমূর্তি-অঙ্কিত মুদ্রা তাহার রাজ্যে প্রচলিত করেন, এবং তাহাতেই তিনি নিঃশেষ হওয়াতে তাঁহার ভাগিনের দামোদর তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। সাভারের বহু ব্যক্তি আমাদের সংগৃহীত স্বর্ণ মুদ্রাটিকে হরিশ্চন্দ্রের সেই মুদ্রা বলিয়া নির্দেশ করিলেন। মুদ্রাটির উভয় দিকেই দুইটি নগ্ন মূর্তি অঙ্কিত, কিন্তু কোনরূপ লেখার চিহ্ন নাই। উহার প্রাচীনত্বের চিহ্ন ইহার অঙ্গেই বর্তমান, এবং অজ্ঞ কৃষক কষ্টক মৃত্তিকানিয়ে প্রাপ্ত হওয়াতে ইহার অকৃত্রিমতা প্রমাণিত হইতেছে। পূর্বোক্ত কিংবদন্তীতে যদি আস্তা স্থাপন করা যায়, তবে, এই মুদ্রাটি রাজা হরিশ্চন্দ্রের মুদ্রা বলিয়া অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। এ বিষয়ে আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছি না। এতৎসম্বন্ধে ভবিষ্যতে মুদ্রা-তত্ত্ববিদগণ আলোচনা করিবেন, এই আশায় আমরা মুদ্রাটির চিত্র প্রকাশিত করিলাম।

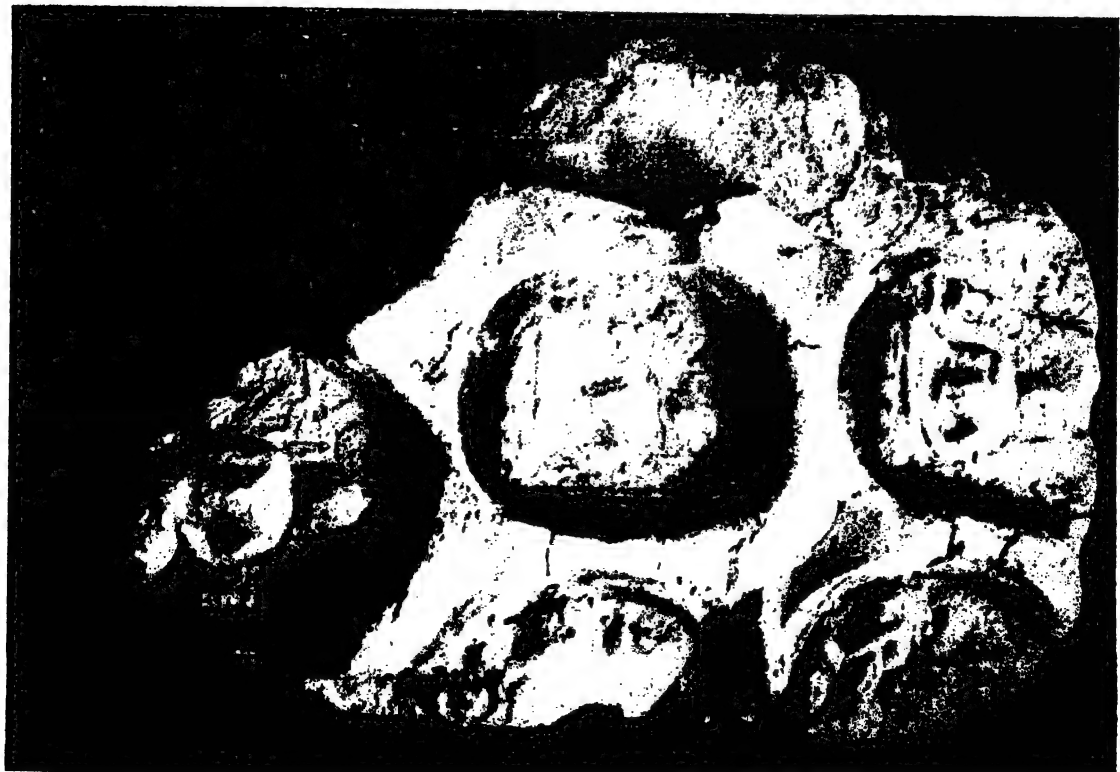
শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় তৎপ্রণীত “মুসলিমদের ইতিহাস” নামক গ্রন্থে রবিশঙ্করের একটি মুদ্রার চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। আমাদের প্রাপ্ত মুদ্রাটির সহিত

ঐ মুদ্রার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। স্থানীয় মুদ্রাতত্ত্ব-বিদগণের মতেও, ইহা পরবর্তী কালের গুপ্তরাজগণের মুদ্রা। “বিক্রমপুরের ইতিহাসে” আমাদের মুদ্রার অনুরূপ একটি মুদ্রার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাহাকে সেন-রাজগণের মুদ্রা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু, তাহার অনুমানের কোনরূপ কারণ লিখিত হয় নাই। মুদ্রাটি কোথায় এবং কিরূপে পাওয়া গিয়াছে তাহারও কোন উল্লেখ নাই।

রাজবাটা এবং রাজাভঃপুরের পূর্বদিকে সাগর দীঘি অবস্থিত; তাহার পূর্ব পারে একটি বাইদ; এবং বাইদের পূর্বদিকে রাজাসনের ভিটা অবস্থিত। এই স্থানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের (এবং তাঁহার ‘মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনের এবং উত্তরাধিকারী রাজা দামোদরের) বহির্কীর্টি ছিল। এইস্থানে রাজ সিংহাসন স্থাপিত ছিল বলিয়া ইহার নাম রাজাসন হইয়াছে। রাজাসনের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে কুমইরা দীঘি অবস্থিত। ৪।৫টি স্তূপ মাত্র এখন রাজাসনের চিহ্নস্বরূপ বর্তমান। [৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য] তন্মধ্যে দুইটি স্তূপ কৃষকগণের নির্মিত হল-চালনে ভূমির সহিত প্রায় সমতল হইয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর পরে কেবল বিক্ষিপ্ত ইষ্টক রাশি ভিন্ন এই স্তূপসমূহের কান চিহ্নই বর্তমান থাকিবে না। হল-কর্ষণ-কালে বহু প্রস্তর ও ইষ্টক মূর্তি এবং নানাবিধ কারুকার্য সমন্বিত ইষ্টক কৃষকগণ প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে প্রাপ্ত তিন খানা খোদিত ইষ্টক কর্ণ-পাড়া নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক প্রাপ্ত হন। উহার মধ্যে একখানা বুদ্ধ মূর্তি মাত্র ঢাকা সাহিত্য পরিষদে সযত্নে রক্ষিত আছে। [৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য] রাজাসনে প্রাপ্ত অপর একখানা ইষ্টক নির্মিত বুদ্ধমূর্তি রোয়াইল জমীদার বাড়ীতে রক্ষিত ছিল। জমীদার শ্রীযুক্ত লাবণ্য মোহন রায়, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত অমূল্য মোহন রায়, এম, এ, বি এল, মহাশয় দ্বয় উক্ত ইষ্টক খণ্ড লেখককে প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। [৫নং চিত্র দ্রষ্টব্য] ইষ্টক খানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত মধ্যে আটখানা বুদ্ধ মূর্তি খোদিত ছিল। পাঁচ খানা মূর্তি বেশ লম্বা আছিল।



[৪নং] সাতারে প্রাপ্ত উৎক নিশ্চিত বুদ্ধমূর্তি ।



[৫নং] সাতারের প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি খোদিত ইষ্টক ।

2.

অপর তিনখানা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষ মূর্তি ও লিপি বিভিন্ন প্রকার আসন-বন্ধ।

এতদ্ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক মূর্তি কৃষকগণের তাম্রলিপ্য বশতঃ বিনষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রাজ্যাসনে বহু খোদিত ইষ্টক পাওয়া যায়। চেষ্টা করিয়া আমরাও তাহার কয়েক খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি। [৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য]। (দক্ষিণ দিকের ক্ষুদ্র খোদিত ইষ্টকখানা পূর্ব বর্ণিত গণক-পাড়ার প্রাপ্ত ; অপর তিনখানা সাতার রাজ্যাসনে প্রাপ্ত। স্থানান্তরে মাত্র তিনখানা ইষ্টকের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল ; এরূপ বহু ইষ্টক লেখকের নিকট সংগৃহীত আছে।) এই সমস্ত কারুকার্যখোদিত ইষ্টকসমূহ হইতে রাজ্য হরিশ্চন্দ্রের সময়ের স্থাপত্যের উন্নতির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এই রাজ্যাসনে অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা দুইখানা ভগ্ন ইষ্টক-লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। আশা করি, তদ্বারা হরিশ্চন্দ্রের তমসাক্ষর ইতিহাসের কিয়দংশ উদ্ধার হইবে। যথা স্থানে তাহার বিবরণ লিখিতে হইবে।

রাজ্যাসনের পশ্চিমে ও উত্তরে দুইটি বাইদ্র দৃষ্ট হয়, এবং উহা রাজ্যাসনের অদূরেই পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে। বোধ হয়, উহা পূর্বে কোন জলাশয় ছিল। অথবা উহা রাজ-পুরীর পরিখা চিহ্নও হইতে পারে।

সাতারের উত্তর দিকে কোট বাড়ী অবস্থিত। হিন্দু রাজ্যে সাধারণতঃ দুর্গকে কোট বলা হইত। এই কোট-বাড়ী রাজ্য হরিশ্চন্দ্রের দুর্গ ছিল। [৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য]। কোট বাড়ী ৫০ বিঘারও অধিক পরিমাণ ভূমি খণ্ডের উপর স্থাপিত ; এই সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডে এখন নানা প্রকার বৃক্ষ জন্মিয়াছে, এবং ইষ্টক রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত আছে। কোট বাড়ীর চতুর্দিকে এখনও ১০।১২ হাত প্রশস্ত, এবং প্রায় ১৫ হাত উচ্চ লোহিত মৃত্তিকা-নির্মিত দুর্গ-প্রাকার দণ্ডায়মান। দুর্গ-প্রাকারের অব্যবহিত নিম্নেই পশ্চিমে বংশাই নদী, দক্ষিণে কাটাগাঙ্গ (ইহার বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে), এবং উত্তর ও

পূর্বে প্রায় ৩০ হাত প্রশস্ত পরিখা বর্তমান। দুর্গটি চতুর্দিকে, এবং চতুর্দিকে চারিটি প্রবেশ পথের চিহ্ন অত্যাধিক বর্তমান। ঐ স্থানে দুর্গ-প্রাকারে পথ পরিমিত স্থান ফাঁক আছে। দুর্গ-প্রাকারের নিম্নে বংশাই নদীতে একটি বাঁধান ঘাট ছিল। এখন তাহার কোন চিহ্নাদি দৃষ্ট হয় না, কিন্তু, প্রাচীনগণ ৪০।৫০ বৎসর পূর্বে উহার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়াছেন।

কোট বাড়ীর দক্ষিণ দিকস্থ প্রাকারের নিম্ন দেশ দিয়া বংশাই নদী হইতে কাটাগাঙ্গ আরম্ভ হইয়া রাজ্যান্তঃপুর এবং সাগর দীঘির উত্তর দিক দিয়া ঘুরিয়া, প্রায় চতুর্দিকে একটি ভূমি খণ্ডকে বেষ্টিত করতঃ, কোট বাড়ীর প্রায় দুই মাইল উত্তরে পুনরায় বংশাই নদীতে যাইয়া মিশিয়াছে। ইহা দুর্গ এবং রাজধানীর কিয়দংশের চতুর্দিকস্থ পরিখা, তদ্বিবয়ে কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে না। কাটাগাঙ্গ অত্যাধিক প্রায় ৪০ ফিট গভীর। কাটাগাঙ্গের ধারে ধারে প্রাকার বর্তমান ; কাটাগাঙ্গ খনন কালে বোধ হয় সেই মৃত্তিকা দ্বারা এই প্রাকার নির্মিত হইয়াছিল। প্রাকারের বহুস্থানে ইষ্টক রাশিও দৃষ্ট হয় ; এবং উহা ৭।৮ ফিট প্রশস্ত, এবং ৫ ফিট উচ্চ ; স্থানে স্থানে উহা কাল-বশে অনেকটা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাজ্য হরিশ্চন্দ্রের ফুলবতী এবং কর্ণাবতী নামী দুই মহিষী ছিলেন। উভয়ের পৃথক পৃথক বাস-ভবন ছিল। ফুলবতীর ভবন এখন ফুলবাড়িয়া, এবং কর্ণাবতীর ভবন কর্ণপাড়া নামে খ্যাত হইয়াছে। ফুলবাড়িয়া গ্রামে এখনও বহুলোকের বসতি হওয়াতে প্রাচীন চিহ্নাদি সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, এখনও তথায় হরিশ্চন্দ্র খনিত ২।৩টি দীর্ঘিকা বর্তমান ; এবং ফুলবাড়িয়ার পার্শ্বে যে একটি শুষ্ক খালের ত্রায় দৃষ্ট হয়, বোধ হয়, উহাই ফুলবতী-ভবনের পরিখা ছিল।

সাতার হইতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে কর্ণাবতী-ভবন (আধুনিক কর্ণপাড়া) এখনও অবস্থিত। এখানে এখনও বহু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে।

শৌখ ১৩৯৯

কর্ণাটীর-ডবনে অবস্থান কালে রাজা তাড়ুলবাড়ীতে তাড়ুল চর্কণ করিতেন, এবং বিশ্রামাদি করিতেন। একটি ভগ্নস্তূপ এখন তাড়ুলবাড়ীর ভগ্নাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

তাড়ুলবাড়ীর দক্ষিণে নদী-তট হইতে অনতিদূর দোলমঞ্চের ভগ্ন স্তূপ বর্তমান। বাসন্তী পূর্ণিমায় এই স্থানে দোলোৎসব হইত। মঞ্চের অধিকাংশ সমতল করিয়া বসতি হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ আনুমানিক প্রায় ২০ হাত লম্বা, ১৫ হাত প্রস্থ, এবং ১০ হাত উচ্চ।

দোলমঞ্চের দক্ষিণে নদী-তীরে রাজ-শূরুর আশ্রম অবস্থিত ছিল। এখন তথায় বসতি হওয়াতে তাহার চিহ্নাদি বর্তমান নাই; নিদর্শন স্বরূপ উহার পূর্ব দিকে অত্য়পি রাজ-শূরুর দীঘি বর্তমান আছে।

তাড়ুলবাড়ীর পূর্ব দিকে সেনাপাড়া নামক গ্রাম অবস্থিত। বোধ হয়, এই স্থানে সৈন্তগণের বাসস্থান ছিল, এবং ইহা হয়ত রাজধানীর পার্শ্ব রক্ষা করিবার জন্য দুর্গ ছিল। সেনাপাড়ার উত্তরে সেনাপাড়ার দীঘি অবস্থিত। সেনাপাড়ার চতুর্দিকে পরিখা ছিল, তাহার সুস্পষ্ট চিহ্নাদি অত্য়পি বর্তমান আছে।

রাজাস্ত:পুরের উত্তর দিকে মদনপুর নামক স্থান বর্তমান। এই স্থানে হাট বাজার ছিল, এইরূপ কথিত হয়।

রাজাসনের দক্ষিণপূর্বে একটি বিশাল প্রাস্তর আছে। প্রবাদ এই, এই স্থানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের গোশালা এবং গোচারণ মাঠ ছিল। যে স্থানে গোশালা ছিল, তাহা অত্য়পি গোপের বাড়ী, এবং তৎসন্নিবর্তস্থ গোচারণ মাঠ বাসমহাল নামে খ্যাত।

রাজাসনের নিকটে একটি স্থান পীলখানা নামে খ্যাত। এই স্থানে রাজার হস্তীশালা ছিল, এইরূপ প্রবাদ।

পীলখানার সন্নিবর্তে রথখোলা বর্তমান। রথ যাত্রার দিন এই স্থানে রথ টানা হইত।

রাজাসন হইতে এক মাইল দক্ষিণপূর্বে হরিশবাগ

অবস্থিত। কথিত আছে এই স্থানে রাজার উত্তান ছিল। এখন উহা নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

রাজাসন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে, এবং কুল-বাড়িয়া হইতে প্রায় এক ক্রোশ পূর্বে গাংকারিয়া গ্রাম অবস্থিত; ইহার প্রাচীন নাম গাংকার গড়। বোধ হয়, এই স্থানে পূর্বে দুর্গ ছিল। ইহা অতিশয় সুরক্ষিত; ইহার চতুর্দিকে প্রায় ২০০ হাত প্রস্থ পরিখা বর্তমান। পরিখার কোনও কোনও স্থান সুগভীর, কিন্তু, অধিকাংশ স্থানই ধাত্ত-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। পরিখা বেষ্টিত গাংকারিয়া গ্রাম প্রায় দেড় মাইল ভূমি খণ্ডের উপর অবস্থিত। গাংকারিয়ার পশ্চিমাংশে রাবণ রাজার বাড়ী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই রাবণরাজা হরিশ্চন্দ্রের ভাগিনেয় দামোদরের বংশোদ্ভূত।

রাবণ রাজার বাড়ীর পশ্চিমে ঢালিপাড়া নামক স্থানে বহু ঢালি সৈন্ত বাস করিত, এইরূপ প্রবাদ। ঢালি পাড়ার উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত বাগ বাড়ীতে রাজ-পণ্ডিত-গণ বাস করিতেন।

গাংকারিয়ার উত্তরে সাধাপুর নামক গ্রামে রজক, কুস্তকার, স্বর্ণকার, প্রভৃতি শ্রমজীবীগণ বাস করিত। তাহার নিদর্শন স্বরূপ অত্য়পি তথায় ধোপাধোপার পুকুর, মালী পুকুর, কুমার পুকুর, প্রভৃতি বর্তমান আছে।

রাবণ রাজার বাড়ীর উত্তর দিকে মাছুষপাড়ার টেক (উচ্চ স্থান) দুইটি অবস্থিত। এই স্থানে পূর্বে শ্মশান ছিল। ইহার নিকটেই শ্মশান কাঠের জন্য একটি পুকুরিণী বর্তমান।

গাংকারিয়ার দক্ষিণে রাজকোণ্ডা নামক একটি গ্রাম আছে। ইহাও পরিখা বেষ্টিত। হরিশ্চন্দ্রের উত্তরাধিকারিগণ পরবর্তী কালে এইস্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ।

কোট বাড়ী হইতে ১১০ মাইল উত্তর পূর্বে ভাটপাড়া গ্রাম। ইহার প্রাচীন নাম ভট্টপল্লী। রাজভট্টগণ এই স্থানে বাস করিতেন, এইরূপ প্রবাদ। এখানেও বহু প্রাচীন দীঘিকাদি বর্তমান। তাহাদের নাম পূর্বেই



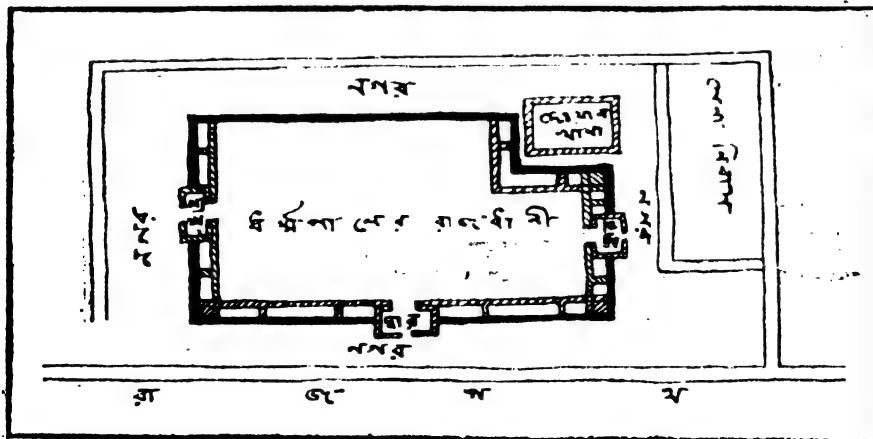
[৬নং] সাভারে প্রাপ্ত খোদিত টুকর।



[৭নং] রাজা হরিশ্চন্দ্রের কোট বাড়ীর প্রাকারের কিয়দংশ



[৮নং] বুরুজ অথবা নহবৎখানা।



[৯নং] ধর্মপালের রাজধানীর অল্পমানিক মানচিত্র।

তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এই গ্রাম হইতে আমরা প্রায় ৫০ খানা প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। (২৮) সময়ান্তরে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভাটপাড়ার উত্তর পশ্চিমে চাইরা চৌমাথা নামক স্থানে চারিটি রাজ পথের সন্মিলন স্থল ছিল। ইহার নিকটেই চাইরা পুষ্করিণী। মেরিখোলা নামক স্থানে পূর্বে হাট বাজার ছিল, এইরূপ প্রবাদ।

ভাটপাড়ার সন্নিকটে ছইলাকল্মা নামক স্থানে রাজসৈন্যদিগকে লক্ষ্য স্থির করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত এইরূপ প্রবাদ। এখন সেখানে নিবিড় গজারী বন। বনের মধ্যে স্থানে স্থানে বহু ইষ্টক স্তূপ দৃষ্ট হয়।

নিরামিষ দীঘি ও কাটাগাঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে, প্রায় এক বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া, এবং সমভূমি হইতে প্রায় ২৫৩০ হাত উচ্চ একটি প্রকাণ্ড মৃৎস্তূপ বর্তমান আছে। ইহাকে সচরাচর বুরুজ বলা হয়। [চনঃ চিত্র দ্রষ্টব্য]। স্তূপোপরি দুইটি ইষ্টকে বাঁধান কূপ দৃষ্ট হয়। একটি প্রায় ভরিয়া গিয়াছে, অপরটি এখনও ৫৫ হাত গভীর আছে। রাজপুরীর প্রহরীগণ বোধ হয় এই বুরুজের (Tower) উপর হইতে শত্রুর আগমন লক্ষ্য করিত। কেহ কেহ বলেন, ইহা নহবৎ খানা ছিল।

সাভার এবং তৎচতুঃপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীস্থিত যে সমস্ত কীর্তিচিহ্নাদি অদ্যাপি বর্তমান আছে, তাহার বিবরণ আমরা উপরে সংক্ষেপতঃ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিবিড় অরণ্য মধ্যে নানা স্থানে হরত আরও কত অনাবিষ্কৃত ভগ্নস্তূপাদি লোক চক্ষুর অন্তরালে লুকায়িত আছে।

আধুনিক রঙ্গপুর জেলার যে ধর্মপাল রাজার কীর্তি চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়, তাঁহার সহিত সাভার-রাজ হরিশ্চন্দ্র

(২৮) ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকা মোহন অধিকারী, এবং শ্রীমান শ্রীমাচরণ সরকারের চেষ্টাতেই এই গ্রন্থ সমুদ্র সংগৃহীত হইয়াছে। তজ্জন্ত তাঁহারা লেখকের আনন্দিত বন্ধুবান্ধব।

পালের বৈবাহিক সম্পর্কাদি বর্তমান ছিল, এইরূপ প্রবাদ। এইখানে বলা আবশ্যক যে, গোড়ের পাল রাজবংশের দ্বিতীয় নৃপতি ধর্মপাল, এবং নিম্ন বর্ণিত ধর্মপাল বিভিন্ন ব্যক্তি। প্রথম ধর্মপালের প্রায় দুই শত বৎসর পরে দ্বিতীয় ধর্মপালের অভ্যুদয় হয়। বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ, চতুর্ভুজ রচিত হরিচরিত কাব্য, এবং দাক্ষিণাত্য-পতি রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় গিরি লিপিতে দ্বিতীয় ধর্মপালের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নিম্নে যথাস্থানে বিশদভাবে তাহা বিবৃত হইবে।

রাজেন্দ্র চোল ১০১২ খৃষ্টাব্দে দণ্ডভুক্তি-পতি (সম্ভবতঃ গৌর মণ্ডল) ধর্মপালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। সুতরাং, ইহা প্রমাণিত হইতেছে, যে, দ্বিতীয় ধর্মপাল একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু লামা তারানাথের গ্রন্থ, এবং খালিমপুরে প্রাপ্ত প্রথম ধর্মপালের তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম ধর্মপাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং, এই উভয় ধর্মপালের মধ্যে দুই শতাব্দীর অধিক ব্যবধান বর্তমান। গোড়ের পাল রাজবংশের বংশাবলিতে দ্বিতীয় ধর্মপালের নাম দৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ হরিশ্চন্দ্র পাল প্রভৃতির জায় তিনিও পালরাজবংশের আদিশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। ব্রহ্মপুত্রনদ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধর্মপালের রাজ্য বিস্তৃত ছিল, এইরূপ অনুমিত হয়। (২৯) ধর্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, ও বহু কীর্তি চিহ্নাদি অদ্যাপি বর্তমান আছে। এই ধর্মপাল যে পালবংশীয় নৃপতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ, তাঁহার রাজধানীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত একটি বহু প্রাচীন বাহুদেব মূর্তিতে পালরাজগণের রাজচিহ্ন সিংহারূঢ় হস্তীর মূর্তি খোদিত আছে। (৩০) ঐ মূর্তি সন্নিকটস্থ এক বৈরাগীর আখড়ায় পুজিত হয়।

(২৯) Montgomery Martin's "Eastern India." Vol. III. Page 406.

(৩০) J. A. Vas's "District Gazetteer of Rangpur." Page 20.

পৌষ ১৩১৯

পটিকানগর-পতি মাণিক চন্দ্র কাহারও মতে দ্বিতীয় ধর্মপালের ভ্রাতা, (৩১) এবং কাহারও মতে ভ্রাতৃপতি (৩২) ছিলেন। মাণিকচন্দ্র মহিষী ময়নামতী, এবং ধর্মপাল মহিষী বনমালা (ধর্ম-মঙ্গল প্রণেতা মানিক গাঙ্গুলির মতে সফুল্লা বা সাফুল্লা, সীতারাম ও ঘনরামের মতে সামুলা) ভগ্নী ছিলেন। মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপী চন্দ্রের (ছত্রভ মল্লিকের গোবিন্দ চন্দ্র, এবং চৈতন্য ভাগবতের গোপীলালের) সহিত হরিশ্চন্দ্র রাজার অহুনা এবং পছনা নামী হৃদিত্বয়ের বিবাহ হয়। (৩৩) ইহার জারতবিখ্যাত স্তম্ভরী ছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, —“যে অহুনা পছনার নাম এক-সময়ে ভারত বর্ষের সর্বত্র ভাট; যোগী ও চারণগণের গাথার প্রচারিত হইত, সে দিনও কোথাই হইতে বাহাদের চিত্র রবিবর্ণা অঙ্কিত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যে যে বঙ্গীর রাজা ও তাঁহার মহিষীদের করুণ প্রসঙ্গ লইয়া এখনও অনেক নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়া থাকে, এবং উত্তর পশ্চিমে লক্ষণ দাস প্রমুখ বহু-সংখ্যক কবি বাহাদের গুণ গাথা গাহিয়াছেন, এবং বাহাদের সঞ্চরিত গীতি এক সময়ে বাঙ্গলা দেশ ও উড়িষ্যার ঘরে ঘরে প্রচলিত হইত, সেই গোপী চন্দ্র ও তাঁহার মহিষীদের প্রথম প্রেম-মিলন এই সাতারেই হইয়াছিল।” (৩৪)

ছত্রভ মল্লিক রচিত “গোপীচন্দ্র রাজার গান” নামক দেশ প্রচলিত পুঁথিতে মাণিকচন্দ্রের পিতৃ পিতামহের নাম পাওয়া যায়। অস্ত্র কোনরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাইলে উহার বাথার্থ্য সন্দেহে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। বাহা হউক, আপাততঃ আমরা উহাই সত্য বলিয়া মানিয়া

লইতেছি। পুরোক্ত পুঁথিতে দুইটি ছত্র এইরূপ পাওয়া যায়।

“স্ববর্ণ চন্দ্র মহারাজা ধারিচন্দ্র পিতা।

তার পুত্র মানিকচন্দ্র শুন তার কথা।”

এই দুই ছত্র হইতে মাণিকচন্দ্রের পিতৃপিতামহের নাম পাওয়া যাইতেছে।

মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্মপাল তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন। সুতরাং, মাণিকচন্দ্রের তেজস্বিনী পত্নী ময়নামতীর সহিত ধর্মপালের রাজ্যচ্যুত গোলাযোগ এবং মনোমালিন্ত উপস্থিত হয়। তাহার কলে উত্তর পক্ষে যুদ্ধ হয়। নাতাঁর রাজা হরিশ্চন্দ্র সৈন্তে জামাতার সাহায্যার্থ উপস্থিত হন। ত্রিশোতা অথবা ত্রিশো নদী-তীরে যুদ্ধে হরিশ্চন্দ্র বোধ হয় নিহত হন। কারণ, এইখানে এই যুদ্ধে নিহত না হইলে স্বরাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক হরিশ্চন্দ্রের এইখানে প্রাণ ত্যাগ সম্ভব পর বলিয়া বোধ হয় না। যুদ্ধস্থলের অদূরেই হরিশ্চন্দ্রের সমাধিস্থান দৃষ্ট হয়। দেওনাই নদী তীরে অবস্থিত ময়নামতীর দুর্গ এবং বাসভবন হইতে বহু দক্ষিণে, এবং রামগঞ্জের পূর্বদিকস্থ চড়চড়া গ্রামে “হরিশ্চন্দ্র পাট” নামে খ্যাত একটি প্রায় বৃত্তাকার স্তূপ দৃষ্ট হয়। ইহাই হরিশ্চন্দ্রের সমাধিস্থান, এইরূপ প্রবাদ। এই স্তূপ খনন করিতে যুক্তিকা নিম্নে একটি গৃহাংশ দৃষ্ট হয়। এখন তাহার নিম্ন ভাগ মাত্র বর্তমান। যে প্রস্তর বাঁধান গর্ত দৃষ্ট হয়, তাহার উপরিভাগ ১৩ ফিট এবং নিম্নদেশ ৮ ফিট প্রশস্ত। পার্শ্বের প্রস্তরখণ্ডগুলি একরূপ ভাবে সম্মিলিত যে, উত্তর দিকেই দুইটি সিঁড়ি নিম্নদিকে নামিয়া গিয়াছে, এইরূপ বোধ হয়। ইহা যে কাহারও সমাধিস্থান, তাহা দর্শন মাত্রেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং উহা হরিশ্চন্দ্রের সমাধি-মন্দির এইরূপ জন-প্রবাদে অবিদ্বান্ত কিছুই নাই। (৩৫)

(৩১) Montgomery Martin's "Eastern India." Vol. III. Page 407.

(৩২) ধর্মমঙ্গল, এবং মাণিকচন্দ্র রাজার গান

(৩৩) Montgomery Martin's "Eastern India." Vol. III. Page 407.

(৩৪) প্রবাসী। আষাঢ়, ১৩১৯।

(৩৫) Montgomery Martin's "Eastern India."

পূর্বপালের যুড়া অথবা পরাভবের পর গোপীচন্দ্র অথবা গোবিন্দচন্দ্র সিংহাসনারূঢ় হন। প্রবাদ এই, ইনি মাতার উপর রাজ-কর্ণের ভার দ্রুত করিয়া এক শত জীৱ সহিত বিলাসতার মগ্ন হন। কিন্তু, ইঁহার মাতৃ-শুক্র হাড়িসিদ্ধার উপদেশে শীঘ্রই ইঁহার মতি পরিবর্তিত হয়, এবং গোপীচন্দ্র উক্ত বোগীর সহিত সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, তিনি অত্মপি বনে বনে পরিত্রমণ করিতেছেন। গোপীচন্দ্রের এই অদ্ভুত জীবন কাহিনী অত্মপি রঙ্গপুর অঞ্চলে এবং এমন কি কামরূপ প্রভৃতি স্থানেও 'নিবের' গীত অথবা "মাণিক চাঁদের" গীত আখ্যায় ইতর সাধারণ কর্তৃক সোৎসাহে গীত হইয়া থাকে। গ্রীয়ারসন এছ "মাণিক চাঁদের গীত"- সংগ্রহ করিয়া, বিস্তৃত ভাবে ইহার আলোচনা করিয়াছেন, এবং এমন কি ইহাকে 'Epic of Rangpur' আখ্যা প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। (৩৭)

উক্ত গ্রাম্য গীতির আখ্যায়িক। ভাগ আমরা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদান করিতেছি।

মাণিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতী তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াদিতে অত্যন্ত পারদর্শিনী ছিলেন; তাঁহার শুক্র হাড়িসিদ্ধা প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন যোগী পুরুষ ছিলেন। মাণিকচন্দ্র বহু দিন অক্লান্ত প্রতাপে রাজ্য শাসন করেন, পবে এক জন দক্ষিণদেশী (বাঙ্গালী) দেওয়ান নিযুক্ত করাত্তে তাঁহার অত্যাচারে প্রজাগণ প্রীড়িত হইয়া বিদ্রোহী হয়; এবং এই বিদ্রোহ দমনেই মাণিকচন্দ্র প্রাণ ত্যাগ করেন। সতী-প্রথা অনুসারে ময়নামতী জ্বলন্ত চিতায় মৃত স্বামীর অঙ্গগমন করিলেন, কিন্তু অগ্নির লেলিহান জিহ্বা তাঁহার একগাছি কেশও দগ্ধ করিল না। তাঁহার যুড়া দেবগণের বাহিত নহে জানিয়া ময়না চিতা হইতে অবতরণ করিলেন। ইহার ১৮ মাস পরে তাঁহার পুত্র গোপীর জন্ম হয়; এই অস্বাভাবিক দীর্ঘ কাল গর্ভবাস পুত্রের (৩৭) The song of Manik chandra. J A. S. B.

Vol XLVII (1878), P. 135.

ভবিষ্যৎ মহেশ্বের নিবর্শন। ময়নামতী বধা সময়ে সাতারের রাজা হরিচন্দ্রের কন্যায় অহনা ও পহলার সহিত বীর পুত্রের বিবাহ দেন। কন্যায়ের সঙ্গে এক শত পারচারকা আগমন করে। ময়না আধা ক্ষুদ্র ক্ষমতার সাহায্যে জানিতে পারেন যে, অত্যাচার বর্ষ যত্নক্রমে কালে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে, পুত্র গোপীচন্দ্র অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হইবেন। মাতার চেষ্টায় পুত্র নবীন যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অরণ্যবাসী হইলেন। মাতৃশুক্র হাড়িসিদ্ধা অরণ্যে তাঁহার সহপাঠী হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে মহুমা পহলার বিলাপ এবং স্বামীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার দ্রুত 'অনুর' এবং নানাবিধ বৃক্তি প্রয়োগ গ্রাম্য গীতিতে অতি মর্মগ্রাহী ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

'মাণিক চাঁদের গান' হইতে এই অংশ নিম্নে এবং, গ্রীয়ারসন কৃত তাহার মর্মগ্রাহী ইংরেজী অনুবাদ পাদ টীকায় উদ্ধৃত হইল।

" না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর ।
কারে লাগিয়া বন্দিলাম সীতল মন্দির ঘর ॥
বন্দিলাম বঙ্গলা ঘর নাহি পাড় কালী ।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরালী ॥
নিম্নের স্বপনে রাজা হব দরিসন ।
পালকে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন ॥
দস গিরিব মা ও বইন রবে স্যামি লইবে কোলে ।
আমি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দিরে ॥
খালী ঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির বা ।
বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক রাও ।
আমাকে সঙ্গে করি লইয়া যাও ॥
জীবন জীবন ধন আমি কত সঙ্গ গেলো ।
রাধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে ॥
পিপাসার কালে দিমু পানী ।
হাসিয়া খেলিয়া পোহানু রজনী ॥
আইল পাতার দাঁত বধা বহিরা ২২ ।
গিরি লোকের বাড়ী গেলে শুক জাম বজি ॥

সিতল পাটি বিছাইয়া দিমু বালিলে হেলান পাও ।
 চাঁউস রসে যাতিমু হস্ত পাও ॥
 হাত খানি হুঃখ হইলে পাও খানি যাতিমু ।
 এ রঙ্গর কোতুকর বেগা স্মৃতি ভুলিমু এ স্মৃতি ভুলাইমু ॥
 গুঁস কালে বদনত দিমু দণ্ড পাখার বাও ।
 মাধ মাধি সিতে বেসিয়া রমু গাঁও ॥ (৩৮)

(৩৮) "Nay, nay, my king to distant lands
 thou shalt not fare

Nor desolate the life that breathes for
 thee alone.

Few are my years, no grey yet mingles
 with my hair:

Will widow me, my lord, before my bride-
 hood's done ?

"In dreams thy face will haunt me, and my
 arms close pressed will seek to hold thee.

Ev'n the poorest wife and bride upon her
 bosom bends her master's head to rest :

Shall sorrow be my mate and love unsatis-
 fied ?

"The voice of scandal ne'er hath spared a
 widow's fame ;

Therefore, beloved, if thou goest, I go
 with thee !

In hunger, and in thirst, oh king, my
 care thou 'lt claim,

The night I will beguile with song and
 poesy.

"In summer's heat, a palm-leaf fan shall
 still thy sighs.

Against thy breast I'll nestle close, when
 cold winds blow.

হৃদয় মল্লিক রচিত "গৌড়বন্দন রাক্ষস গান" হইতে
 এই অংশের বর্ণনা নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

"অভাগী উছনারে রাক্ষস সঙ্গে করি লহ ।

দেশান্তরে যাব আমি কর অহুগ্রহ ॥

তুমি যোগী হবে আমি হইব যোগিনী ।

রাক্ষিয়া বিদেশে যোগাইব অন্ন পানি ॥

বসিয়া থাকিহ তুমি বনের ভিতরে ।

আনিব মাগিয়া ভিক্ষা আমি ঘরে ঘরে ॥

নগরে নগরে জমি বসিবে যখন ।

তৃষ্ণা হলে জল আনি কে দিবে তখন ॥

বনে বনে কাঁটা ভাজি আলিখ আঙুলি ।

প্রথমে বকিব নিশি যোগীয়া যোগিনী ॥

সর্ব হুঃখ পাশরয়ে নারী যার পাশে ।

আমারে করিয়া সঙ্গে চল দেশে দেশে ॥

না ছাড়া না ছাড়া মোরে বন্ধের গোসাঞি ।

তোমা বিনে উছনা থাকিবে কোন ঠাঞি ॥

নারী পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ ।

শিব বটে যোগীয়া ভবানী তার সঙ্গ ॥"

গোপীচন্দ্রের অরণ্য- বাজার পূর্বে পুজের মঙ্গলা-
 কাজিকী ময়নামতী অধিতাপে হুস্ত তৈলপূর্ণ কটাহে
 অনায়াসে নিমজ্জিত হইয়া, অক্ষতশরীরে পুনরায় পুজের
 মঙ্গলার্থে নানাপ্রকার প্রক্রিয়াদি করেন ।

And holy Indra's joy—the lap of five score
 wives—

Alone I'll give, with thee beloved, let me
 go.

Now am I young and comely, worthy of
 a king.

Will youth and beauty stay or suffer to
 be tied

'Gainst thy return ? My banian tree, to
 thee I cling.

A helpless creeper—Bide with me, my
 husband, bide."

অরুণাচল-কালে একদা গোপীচন্দ্র গঙ্গিকা জয় করিবার জন্য হাড়িসিদ্ধাকে ১০টি কড়ি দিতে প্রতি-শ্রুত হন। প্রতিশ্রুত অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ গোপীচন্দ্র অগত্যা হীরা নারী জনৈক বারাজনার নিকট দ্বাদশ বর্ষের জন্য আশ্রয়বিক্ষেপ করেন। প্রণয়প্রার্থিনী হীরা গোপী-চন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া, প্রতিশোধ গ্রহণের অভি-প্রায়ে তাঁহার দ্বারা অতি হীন এবং কষ্টদায়ক কাগাদি করাইতে, এবং সর্বদা তাঁহাকে প্রহার করিত। অবশেষে হাড়িসিদ্ধা তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া হীর এবং তাহার পরিচারিকাকে তাহাদের দুর্দাসহারের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। হীরাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহার উদ্ধাংশ বাহুড়, এবং নিম্নাংশ মস্তুরূপে পরিণত করেন; এবং ছুশীলা পরিচারিকাকে তাহার বৃদ্ধ বয়সে এক ছবুতের নিকট বিবাহ দেন; এবং সে উহাকে প্রত্যহ নির্দিষ্ট ভাবে প্রহার করিত।

বহু কাণ পবে গোপীচন্দ্র পুনরায় রাজধানীতে, প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত রাজ্য পুনর্গ্রহণ করিয়া কর হ্রাস করিয়া প্রজাদিগকে সুখী করেন। “মাণিকচন্দ্রের গীতে” পটিকানগরে গোপীচন্দ্রের রাজধানী অবস্থিত ছিল, এইরূপ উল্লেখ আছে। ধর্মপালের রাজধানী হইতে এক কোশ পশ্চিমে অবস্থিত পটকপাড়া ও উল্লিখিত পটিকানগর অভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। (৩৯)

গোপীচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র অথবা হবচন্দ্র সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার অপর নাম উদয়-চন্দ্র হইতেই তাঁহার রাজধানীর নাম উদয়পুর হইয়াছিল। বাৎসর্য পরগণাস্থিত এই রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখন নিবিড় বনাচ্ছাদিত। বহু বর্ষ পূর্বে বুকানন এই স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্ন স্তূপ, এবং উজ্জানাত্যস্তরস পথাদির সুস্পষ্ট চিহ্নাদি দর্শন করিয়া তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধুনা একটি পথের দুই

পার্শ্বস্থিত দুই শ্রেণী দীর্ঘিকামাত্র দৃষ্ট হয়।

ভবচন্দ্র একদা কোন নির্দিষ্ট সময়ে রাজ-প্রতিষ্ঠিত দেবী-মন্দিরে গমন করিতে দেবীর অভিগায়ে তাঁহার বুদ্ধি লুপ্ত হয়, এইরূপ প্রবাদ। ভবচন্দ্রের নির্মুক্তিতা দেশবিখ্যাত। “ভবচন্দ্র (হবচন্দ্র) রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী” ছিলেন। এত-দূরত্বের নির্মুক্তিতাজ্ঞাপক পুকুর চুরি প্রভৃতি বহু কৌতুকাবহ প্রচলিত গল্প প্রত্যেক বঙ্গবাসীর নিকট সুপরিচিত। এই নির্কোষ রাজার রাজত্ব-কালেই বোধ হয় রঙ্গপুরের পাল-রাজত্বের অবনতির সূত্রপাত হয়। ভবচন্দ্রের পরেও অপর এক জন তৎসংশীয় রাজার রাজত্বের বিষয় আমরা অবগত আছি, কিন্তু তাঁহার নাম অজ্ঞাত। ক্ষেত্রবংশীয় নীলধ্বজ এই নৃপতিকেই পরাজিত করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করেন, এবং ধরলা নদীর পূর্বতীরে কোচবেহার-রাজ্যান্তর্গত কমান্দপুত্র নামক স্থানে রাজধানী নির্মাণ করেন।

অনুসন্ধানে রঙ্গপুরে আমরা পূর্বোক্ত চারি জন পাল-বংশীয় নৃপতির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি। নিয়ে ইহাদের রাজধানী, তুর্গ, এবং প্রতিষ্ঠিত নগর প্রভৃতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে ছ।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত ডিমলার কিঞ্চিৎ নিম্নে তিস্তা নদীর যে প্রকাণ্ড বাক দৃষ্ট হয়, তাহার প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে ধর্মপাল রাজার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় [২ নং চিত্র] নগরটি চতুর্কোণ, উত্তর-দক্ষিণে প্রায় এক মাইল, এবং পূর্ব-পশ্চিমে অর্ধ মাইল বিস্তৃত। নগরের বহির্ভাগে চতুর্দিকে সুবৃহৎ প্রাকার দণ্ডায়মান। প্রাকারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দেওয়ান খানার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকস্থ নগর-প্রাকারের অবাবহিত নিয়েই প্রায় ৪০ ফিট প্রশস্ত একটি পরিখা, কিন্তু নগরের পূর্ব দিকে এই পরিখা কিংবা প্রাকারের মধ্যে কোন প্রবেশ-পথ দৃষ্ট হয় না। পূর্বোক্ত তিন দিকের প্রাকার এবং পরিখার ঠিক মধ্যস্থলে প্রতিদিকে এক একটি প্রবেশ-পথ। ঐ সকল প্রবেশ-দ্বারের নিকট বহুল পরিমাণে ইষ্টক দৃষ্ট হয়, এবং উহা যে সুরক্ষিত ছিল তাহার

চিহ্নাদি সুস্পষ্ট। প্রাকারের প্রত্যেক কোণে, এবং মধ্যে ও বহু স্থানে চতুর্কোণ মিনার (bastion) ছিল, তাহার ভয়াবশেষ বর্তমান; এবং বোধ হয় ঐ মিনার-সমূহ হইতে প্রহরীগণ দূর হইতেই শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে পারিত। উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকের পরিখা হইতে প্রায় তিন শত হাত দূরে নগর-প্রাকারের সমান্তরাল ভাবে আর একটি প্রাকার এবং পরিখা দৃষ্ট হয়। নগরের বহির্ভাগে নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ বাস করিত; এবং এই বহির্ভাগস্থ নগরের চতুর্দিকেই এই প্রাকার এবং পরিখা নির্মিত হইয়াছিল। নগরের দক্ষিণদিকস্থ বহিঃ প্রাকারেরও বহির্দেশে রাজার অশালা ছিল; তাহারও চিহ্নাদি বর্তমান। নগরের পশ্চিম দিকস্থ প্রাকারের প্রায় ৩০০ হাত ব্যবধানে উহার সমান্তরাল ভাবে একটি উচ্চ এবং সুপ্রশস্ত পথ উত্তর-দক্ষিণে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বোধ হয়, উহা নগরের পশ্চিমদিকস্থ বহির্ভাগের বহিঃপ্রাকার ছিল। নগরের প্রায় ১ মাইল উত্তরপশ্চিমে ধর্মপাল-খনিজ চন্দনপাট নামক একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা বর্তমান আছে। সন্নিকটবর্তী আরও নানা স্থানে বহু দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়।

পূর্ব বর্ণিত নগরের সুরক্ষিত অবস্থিতি দর্শনে মনে হয় ঐ স্থানে ধর্মপালের দুর্গ ছিল। রাজা দুর্গ মধ্যে না থাকিয়া, ঐ স্থান হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে, এবং হন্দ্রীবোষ নামক একটি ক্ষুদ্র নদীর কিঞ্চিৎ পূর্বে অবস্থিত রাজপুত্রোতে থাকিতেন; এখন সেখানে পুত্র ভয়াবশেষ করেণ্ডি ক্ষুদ্র ইচ্ছাপূর্ণ, দীর্ঘিকা, এবং চতুর্কোণ একটি ইচ্ছাপূর্ণ বৃহৎ মৃৎদুপ মাত্র বর্তমান। শেষোক্ত মৃৎদুপটির নাম 'বর মেরু তের কাজি'; সুগম্য নদীর তীরে ২৫ জন ককিরের নামে উহা উৎসৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া উহার এরূপ নাম হইয়াছে এইরূপ প্রবাদ। স্থানের সুগম্যতা আশা সত্ত্বেও কোন সুগমনের রাজপথ অথবা দুর্গের সীমায়মা বাস করিতে সাহস করেনা; তদ্ব্যতীত সমস্ত অধিবাসীই হিন্দু।

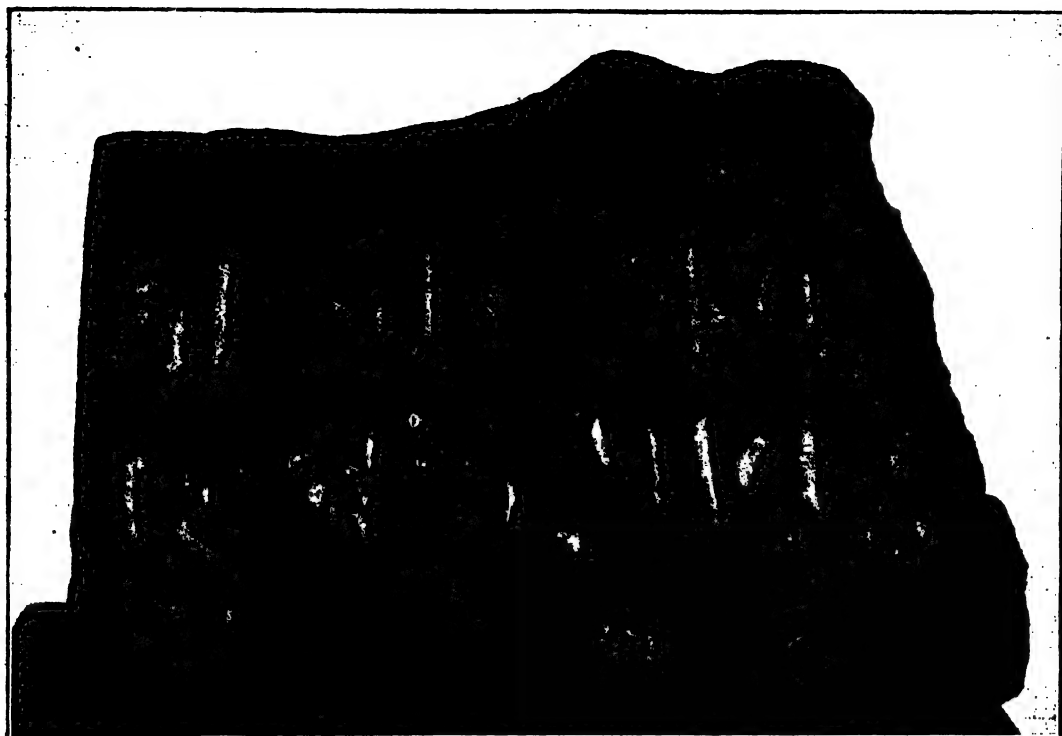
ধর্মপালের পর গোপীচন্দ্রের রাজধানী দেওনাই নদীর পশ্চিম তটে, এবং ধর্মপালের দুর্গের প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল; ময়নামতীও এই স্থানে বাস করিতেন। এই দুর্গ, প্রাসাদ প্রভৃতি ঠিক ধর্মপালের দুর্গাদির অনুরূপ। গোপীচন্দ্রের নগর আনুমানিক ৪০০ গজ লম্বা, এবং ৩০০ গজ প্রশস্ত; এবং উহা হইতে প্রায় ১০০ গজ দূরে নগরের বহিঃপ্রাকার দণ্ডায়মান। ধর্মপাল, অথবা গোপীচন্দ্র কাহারও রাজধানীতেই ইষ্টক নির্মিত গৃহের চিহ্নাদি পাওয়া যায় না। রঙ্গপুর জেলার মধ্যে এইরূপ বহু স্থানে ধর্মপাল এবং তাঁহার বংশধরগণের বহু কীৰ্ত্তি-চিহ্নাদি বর্তমান। কিন্তু এই প্রবন্ধে তাহার বিশদ বিবরণ প্রদান করিলে প্রবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাইবে, এই আশঙ্কায় তাহার অবতারণা করিলাম না।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রসঙ্গে আমরা ধর্মপাল এবং তৎসংশ্লিষ্ট গণের বিবরণও প্রদান করিয়াছি। কথঞ্চিৎ অগ্রাসঙ্গিক হইলেও আশা করি, ইহা পাঠকগণের নিকট বিরক্তিকর হইবে না। যাহা হউক আমরা পুনরায় আমাদের পূর্ব প্রসঙ্গে উপস্থিত হইতেছি।

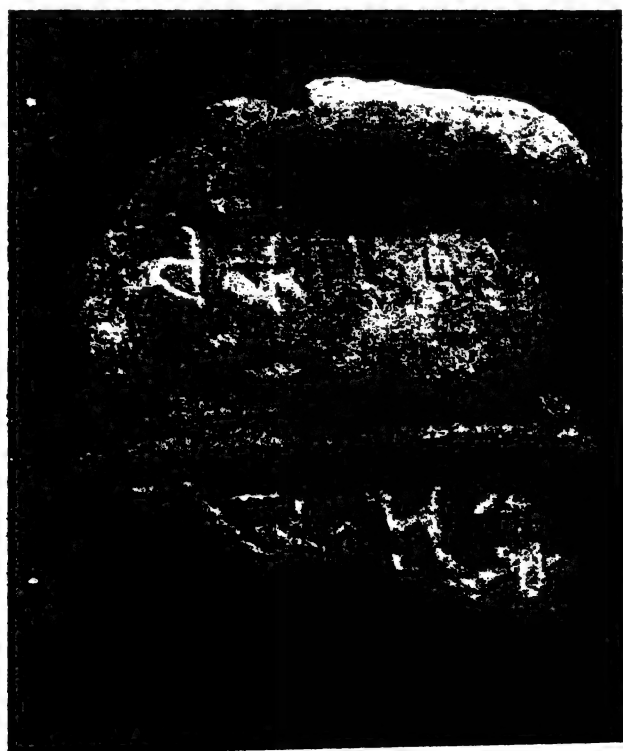
রাজা হরিশ্চন্দ্রের লিখিত বংশাবলী সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। উহার উপর বিশেষ কোন আস্থা স্থাপন করা যায় না, তাহা আমরা পরে দেখাইব। গাঙ্গারিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়ের সাহায্যে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পীযুষ কিরণ চক্রবর্তী হরিশ্চন্দ্রের বংশধর গণের যে বিবরণ আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন নিম্নে আমি তাহা যথাযথ বিবৃত করিলাম।

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর, তাঁহার কোন পুত্রসন্তান না থাকাতো, তাঁহার ভাগিনের দামোদর (দামু রাজা) রায় প্রাপ্ত হন। হনি হরিশ্চন্দ্রের ভগ্নী রাজেশ্বরী দেবীর (রাজি দেবীর) পুত্র। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব বর্ণিত রাজাসন তাঁহারই প্রাসাদের ভয়াবশেষ।

হরিশ্চন্দ্র হইতে অশ্বত্থ নগর পুত্র শিবচন্দ্র নানা ভীর্ণ দর্শন করিয়া ভারত জয় করেন। ইনি অতি বিদ্যাৎসাহী ও পরম ভক্ত ছিলেন। শিবচন্দ্রের পরে রাজ-বংশের



[১০] সাতারে গ্রাণ্ড খোদিত ইষ্টক লিপি ।



অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। বিশাল রাজধানীর অধিকাংশ পতিত ও বন্যাকীর্ণ হইয়া যাওয়াতে, রাজ-বংশীয়েরা সর্ব্বেশ্বর নগর পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী কোণা, গাঙ্গারিয়া, চান্দুলিয়া প্রভৃতি স্থানে বসতি করিতে থাকেন। শিবচন্দ্রের একাদশ অধস্তন পুরুষ তরুণরাজ খাঁ মুসলমান রাজ্যে হুগলীর ফৌজদারের সহযোগী পদে নিযুক্ত হইয়া খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। শুভরাজ, যুবরাজ বুদ্ধিমন্ত ও ভাগ্যবন্ত, তরুণরাজের এই চারি পুত্র। শুভরাজ ও যুবরাজ পিতার সহিত হুগলীতে বাস করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা সেই দেশেই থাকেন। তাঁহাদের বংশধরেরা সোণাবাড়ীর চৌধুরী উপাধি ধারণ করিয়া সোণাবাড়ীয়া গ্রামে বাস করিতেন। বুদ্ধিমন্ত রায় ও ভাগ্যবন্ত রায় নবাব-সরকাবে কার্য্য করিতেন। যবন সংশ্লেশ-দোষে জাতিপাত হওয়াতে ভাগ্যবন্ত রায় দেশ-তাগ করেন। তিনি ‘খন্দকার’ নামে পরিচিত হন, এবং তাঁহার সমাধিস্থান অত্য়পি ‘খন্দকারের দবগা’ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোণা গ্রামে তাঁহার নামানুসারে একটি পল্লীর নাম ভাগ্যবন্তপাড়া হইয়াছে। এই বংশের যশোবন্তরায় ঢাকার দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ইতিহাসে সুপরিচিত। পূর্ব্বোক্ত বংশাবলী অনুসারে শ্রীযুক্ত ভাবতচন্দ্র রায় এখন হরিশ্চন্দ্রের বংশধর।

আমরা গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯১২) ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহের চেষ্টায় যখন সাতারে ও তংপার্ববর্তী বহু স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলাম, তখন এক দিন সাতারের রাজাসন দর্শন কালে তত্ত্বাত্মক জনৈক কৃষকের নিকট হইতে একখানি খোদিত ইষ্টক-লিপি সংগ্রহ করি। [১০ নং চিত্র দ্রষ্টব্য] ইহার কয়েক দিন পরেই আমার তটনৈক প্রকল্পে বহু উক্ত রাজাসন হইতেই সংগৃহীত অপর এক খানি ইষ্টক লিপি আমাকে প্রেরণ করেন। [১১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য]। উক্ত ইষ্টক-লিপিই বাংলার অভ্যন্তরীণ দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত। এই ইষ্টক-লিপিরের সাহায্যে আশা করি, সাতারের লুপ্ত ইতিহাস কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্ধার

হইতে পারে।

প্রথমোক্ত ইষ্টকলিপিখানি অতি বৃহৎ একখানি ইষ্টকের উপর খোদিত ছিল, তাহা দর্শন মাত্রই প্রতীয়মান হয়। বোধ হয় ইহাতে ৪ পংক্তি লিপি খোদিত ছিল। কিন্তু ইহাব প্রায় অর্দ্ধাংশ ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে, প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পংক্তির শেষ অক্ষর ‘প’টি বেশ স্পষ্ট আছে। প্রথম ইষ্টক-লিপিখানার নিম্নলিখিত রূপ পাঠ্যাকার হইয়াছে।

* * * প

শ্রীশ্রীমদ্রাজ

হরিশ্চন্দ্র পাল দ * *

দ্বিতীয় পংক্তির ‘প’টি বোধ হয় “অধিপ” শব্দের শেষ অক্ষর। প্রথম দুই পংক্তিতে বোধ হয় হরিশ্চন্দ্রের বাজা এবং রাজধানীর পরিচয় ছিল।

দ্বিতীয় ইষ্টক-লিপিখানার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই লিপিখানার প্রত্যেকটি পংক্তির উপরে ও নীচে স্তম্ভের খোদিত কারুকার্য্য বর্তমান।

এই লিপিখানাতে কয় পংক্তি ছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন,—তবে ইহাতে দুইটি পংক্তির স্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। বোধ হয় ইহার উপরে ও নীচে আরও কয়েকটি পংক্তি ছিল। দ্বিতীয় ইষ্টক-লিপিখানার নিম্নলিখিত রূপ পাঠ্যাকার হইয়াছে।

* * * বত ১২৫৪

* * * পুরী

এই ‘বত’ শব্দটির পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ‘সং’ শব্দ ছিল, এবং ‘পুরী’ শব্দের পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীর নাম ছিল।

এই ইষ্টক-লিপিরের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রমাণিত হইতেছে।

রাজা হরিশ্চন্দ্র পালবংশীয় নৃপতি ছিলেন। (তৃতীয় পংক্তির ভগ্ন শব্দ অক্ষরটি নিঃসন্দেহ ‘হ’ ছিল) ‘পাল’ শব্দের পর যে সর্ব্বোত্তম ‘দ’টি দৃষ্ট হয় ইহা বোধ

গৌর ১৩১৩

হয় 'দে', এবং তাহার পর একটি 'ব' ছিল। এই 'দেব' শব্দ জাতিবাচক নহে; প্রত্যেক নৃপতির নামের পরেই এই সম্মানসূচক উপাধি সংযুক্ত থাকে। হরিশ্চন্দ্র পালবংশীয় নৃপতি, এবং কোন পালবংশীয় নৃপতিই মাহিষ্য-জাতীয় ছিলেন বলিয়া জানা যায় না, সুতরাং রাজা হরিশ্চন্দ্র পালকেও মাহিষ্যজাতীয় অনুমান করিবার কোনই কারণ নাই।

দ্বিতীয় ইষ্টকলিপিখানা হরিশ্চন্দ্রের নামযুক্ত না হইলেও, তাঁহার বাসভবনের ভগ্নাবশেষের মধ্যে পাওয়া যাওয়াতে, উহা তাঁহার কোন বংশধরের, এইরূপ অনুমানের যথেষ্ট কারণ বর্তমান আছে। এই ইষ্টক-খণ্ডে খোদিত তারিখে (১২৫৪ সংবতে) সাতারে কোন নৃপতি রাজত্ব করিতেন, তাহা নিম্নোক্তরূপে নির্দেশ করা যুক্তিহীন। এ বিষয় মীমাংসার জন্য, এবং হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব-কাল স্থির করিবার জন্য আমরা হরিশ্চন্দ্রের সম-সাময়িক অন্তান্ত ঘটনার আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে অধুনিক রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত পটিকানগরের রাজা মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র অথবা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের অজানা-পছনা নানী কন্তা দ্বয়ের বিবাহ হয়। সুতরাং ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, জামাতা গোবিন্দচন্দ্র যে সময়ে পটিকানগরে রাজত্ব করিতেন, তাহার অবাবহিত পূর্বেই হরিশ্চন্দ্র সাতারে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। জামাতার সিংহাসন লাভের জন্যই ধর্মপালের সহিত যুদ্ধে হরিশ্চন্দ্র নিহত হন, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

মাস্তাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্ভুক্ত তিরুমলুর গিরিলিপিতে তামিল ভাষার মহারাজ রাজেন্দ্র-চোল দেবের যে দিগ্বিজয় কাহিনী বর্ণিত আছে। পাদটীকায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল। (৪০)

৪০. "In the 13th year (of the reign) of King Para-Kesori Varman alias the lord Sri-Rajendra Chola Deva, who... seized by (his) great, warlike army (the following).....Odda-vishaya which was difficult to approach, (and which he subdued in) close fights, the

ইহা হইতে জানা যায় যে, রাজেন্দ্রচোল দেব গুড্ড-বিষয়, এবং কোশলনাডু দেশ যুদ্ধে অধিকার করিয়া-ছিলেন, এবং তন্তুবুত্তি অথবা তন্তুবুত্তিপতি ধর্মপাল, তঙ্কণাডম্পতি রণশূর, বঙ্গালদেশপতি গোবিন্দচন্দ্র, এবং উত্তরিলাদম্পতি মহীপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া-ছিলেন। (৪১)

good Kosalainadu, where Brahmins assembled; Tandabutti, in whose gardens bees abounded, (and which he acquired after having destroyed Dharma Pal (in) a hot battle; Takkanaladam, whose fame reached (all) directions, (and which he occupied) after having forcibly attacked Ranasura; Vangaladesa, where the rain-wind never stopped, (and from which) Govinda chandra fled, having descended from his male elephant; elephants of rare strength and treasures of women, (which he seized after having been pleased to put to flight on a hot battle-field Mahipala, decked (as he was) with ear-rings, slippers and bracelets; Uttiraladam, as rich in pearls as the ocean; and the Ganga, whose waters dashed against bathing-places covered with sand.' Hultzsch's "South Indian Indian Inscriptions" vol I.

(৪১) গুড্ডবিষয় = উড়িষ্যা (গৌড় রাজমালা, ৪০ পৃঃ)

কোশলনাডু = কোশল দেশ (?)

তন্তুবুত্তি = তন্তুবুত্তি বা বিহার, সম্ভবতঃ গৌড়মণ্ডল

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু—পুত্রপুরাণ)

বঙ্গাল দেশ = বঙ্গদেশ (শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, এবং গৌড় রাজমালা)

তঙ্কণাডম্পতি = উত্তর রাঢ় (শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু এবং গৌড় রাজমালা)। "রায় বাহাদুর বেকর এবং ডাক্তার হল্জ "তঙ্কণাডম্পতি" দক্ষিণ বিরাট বা দক্ষিণ বেরার অর্থে এবং উত্তরিলাদম্পতি উত্তর বেরার অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।"

"কিন্তু, গুড্ডবিষয় (উড়িষ্যা) বঙ্গাল দেশ (বঙ্গ) নদীর সহিত উল্লিখিত দেখিয়া "নাডু" কে রাঢ় অর্থে গ্রহণই সমীচীনতর মনে হয়।" গৌড় রাজমালা ৪০ পৃঃ, পাদ টীকা।

প্রথম রাজেন্দ্রচোল দেব ১০১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয় তাহার অনতিপরেই পূর্ব ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিরুমলয়গিরিলিপি তাঁহার রাজত্বের জন্মোদশ বর্ষে, অর্থাৎ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। রাজেন্দ্রচোল দেবের রাজত্বের নবম বর্ষে উৎকীর্ণ মেলপাড়ির চোলেখর মন্দির-লিপিতে পূর্ব ভারতের দিগ্বিজয় কাহিনীর কোন উল্লেখ নাই, অথবা পুরোক্ত নৃপতি এবং দেশসমূহেরও কোনরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। (৪২) সুতরাং ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, রাজেন্দ্রচোল দেবের রাজত্বের নবম হইতে জন্মোদশ বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ ১০২০ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি পূর্ব ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন; এবং ঐ সময়ে বিহারপতি ধর্মপাল, উত্তর রাঢ়পতি মহীপাল, দক্ষিণ রাঢ়পতি রণপুর, এবং বঙ্গদেশপতি গোবিন্দ চন্দ্র দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোলের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

তিরুমলয়গিরি লিপিতে উল্লিখিত বৎসরের যথার্থ পরীক্ষা করিবার জন্য নিয়ে আমরা আরও প্রমাণ উল্লেখ করিলাম। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে সারনাথে ভূগর্ভ হইতে একটি বুদ্ধ মূর্তির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। তাহার পাদপীঠে প্রথম মহীপালদেবের একটি প্রস্তরলিপি খোদিত আছে। তাহাতে “সংবৎ ১০৮৩ পৌষ দিনে ১১” অতি স্পষ্টাক্ষরে খোদিত। (৪৩) ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ১০৮৩ সংবতে অর্থাৎ ১০২৬ খৃষ্টাব্দে মহীপালদেব জীবিত ছিলেন। সুতরাং তিরুমলয়গিরি লিপি অনুসারে ১০২০ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজেন্দ্রচোল দেব কর্তৃক মহীপালদেবের পরাজয় বার্তার অবিদ্যস্ত কিছুই নাই।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর

(৪২) Epigraphia Indica vol. VII—appendix. List of Inscriptions of Southern India.

(৪৩) সৌক লেখমালা। প্রথম ভাগ।

ধর্মপাল তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করেন। মাণিকচন্দ্র মহিষী ময়নামতী পুত্র গোবিন্দ চন্দ্রের সিংহাসন লাভের জন্য ধর্মপালের সহিত যুদ্ধ করেন। জামাতা গোবিন্দচন্দ্রকে সাহায্য করিবার জন্য সাতার-নৃপতি হরিশ্চন্দ্র পাল দেব সেই যুদ্ধে যোগদান করেন এবং সম্ভবতঃ যুদ্ধেই নিহত হন।

সুতরাং, হরিশ্চন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পূর্বে প্রাণ ত্যাগ করেন। তিরুমলয় লিপি অনুসারে গোবিন্দচন্দ্র ১০২০ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সিংহাসনরূঢ় ছিলেন, এবং যুদ্ধে রাজেন্দ্রচোল দেবের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্বেই (একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে) হরিশ্চন্দ্র-পাল দেব সাতার-সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, রামাই পণ্ডিত রচিত “শুভ পুরাণে” বহু স্থানে হরিশ্চন্দ্র অথবা হরিশ্চন্দ্র রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

“হরিশ্চন্দ্র রাজা করে ধর্ম পূজা

ভর এ নবাহতি ঘর।”

* * * * *

হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম পূজার বর্ণনায় কবি পুনরায় গাহিয়াছেন,—

“চন্দ্র সূর্য্য আইলাক গ্রহ-তারাগণ।

ধন্য হরিশ্চন্দ্র ধন্য আমরা ভুবন ॥”

* * * * *

“হরিশ্চন্দ্র মহারাজা রাজা রাণী করে পূজা

উরিলেন ধর্ম জুগ পতি।”

* * * * *

“শুভপুত্র এ হরিশ্চন্দ্র বিসাদ তাবিআ মতি।”

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

“শুভ পুরাণে” মুখবন্ধে প্রাচ্য বিত্তা মহারাজ ত্রিযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নানাবিধ সুকৃত্তক দ্বারা, রামাই পণ্ডিতের বর্ণনামুযায়ী সামাজিক, রাজনৈতিক এবং

তৎসাময়িক ধর্মের ইতিহাস অতি বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, রামাই পণ্ডিত ধর্মপাল এবং হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক ব্যক্তি। বাহ্যিক জ্ঞানে সেই সমস্ত আলোচনার পুনরবতারণা করা হইল না। বহু মহাশয় গির্জা প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, রামাই পণ্ডিত দশম শতাব্দীর শেষ পাদে, অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং রামাই পণ্ডিতের সমসাময়িক হরিশ্চন্দ্রও ঐ সময়ে রাজত্ব করিতেন, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। পূর্বোক্ত প্রমাণ-বলে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, রামাই পণ্ডিতের আবির্ভাব বিচারেও উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে।

বহু মহাশয় মুখবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন, “রাজা হরিশ্চন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্রকেও আমরা রামাই পণ্ডিতের সমসাময়িক লোক বলিয়া মনে করি। * * কিন্তু, তিনি কোন স্থানের রাজা ছিলেন তাহা জানা যায় না।” সত্যের রাজা হরিশ্চন্দ্রের সম্বন্ধে অতি অল্প দিন হইল আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং “শূত্রপুরাণের” মুখবন্ধ লিখিবার সময় হয়ত বহু মহাশয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ অগত ছিলেন না, এবং তজ্জন্মই এইরূপ লিখিয়াছেন। “শূত্রপুরাণ” বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রই যে সত্যের হরিশ্চন্দ্র তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, ঐ সময়ে আবির্ভূত অল্প কোন হরিশ্চন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। মহর্লি সহরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়, গাহড়বাল-রাজ হরিশ্চন্দ্র দেখ ১২৫০ সংবতে, অর্থাৎ ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। (৪৪) কিন্তু সত্যের হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাব কাল একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। সুতরাং প্রায় দুই শত বৎসরের ব্যবধান থাকিতে এতদূর হরিশ্চন্দ্রের মধ্যে গোলযোগের কোন-

রূপ সম্ভাবনা নাই। এতদ্বিন্ন, রামাই পণ্ডিতের বর্ণনামুযায়ী হরিশ্চন্দ্র যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং শূত্রবাদী ছিলো, তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন অত্যাধি সত্যের পাত্রে যায়। সত্যের রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত কতিপয় বুদ্ধ মূর্তির বিবরণ ও চিত্র পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। সত্যের অমুসন্ধান কালে আমরা কয়েকখানা বহু পুরাতন হস্তলিখিত “ধর্মমঙ্গল” গ্রন্থ, এবং বোধ হয় “শূত্রপুরাণের” অতি জীর্ণ ৩।৪ খানা মাত্র পৃষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছি। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হরিশ্চন্দ্রের সময় সত্যের অঞ্চলে ধর্ম পূজার এবং শূত্রবাদের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। “শূত্র পুরাণের” মুখবন্ধে প্রাচ্য বিজ্ঞা মহার্ঘব ত্রিযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বহু মহাশয় সহদেব চক্রবর্তী রচিত- “ধর্ম মঙ্গলের” উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাহাতে “হরিশ্চন্দ্র” বা হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্ম-নিষ্ঠা, অপূত্রক হেতু মহিষী সহ রাজার বন-গমন, তাঁহার নানা দেবদেবীর উপাসনা, বন-মধ্যে রাজার পিপাসার প্রাণত্যাগ, রাণীর ধর্মস্বত্বিত্তে ধর্মের অগ্রগণ্য, রাজার প্রাণলাভ এবং পুত্রলাভ, ধর্মের ছলনার পুত্র-বলিষ্ঠা, এবং পুনরায় তাঁহার কুপার পুত্রের প্রাণ লাভ, প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণিত আছে। কিন্তু, আমাদের সংগৃহীত “ধর্মমঙ্গলে” ইহার কোনরূপ উল্লেখ নাই। অপর এক প্রবন্ধে এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বহু মহাশয়ই অপর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—পর-বর্তী ধর্মমঙ্গলকারগণ ধর্মের জন্ম হরিশ্চন্দ্রের পুত্র বলিদানের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু শূত্রপুরাণে এ প্রসঙ্গ নাই। পরবর্তী কবিগণ ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ পুত্র বলিদানের প্রসঙ্গ যোগ করিয়া থাকিবেন।

তৃতীয়তঃ, চতুর্থ রচিত “হরি চরিত কাব্য” লিখিত আছে—

“প্রানোত্তমো হত্যমলমু শুণৈক পুত্রঃ।

ক্রীমান করজ ইতি বন্দ্যতমো বরজ্যাম্।

* * * * *

কীর্ত্তিঃ প্রজাপতিভূতৈঃ পরিপূর্ণকামঃ ।

শ্রীস্বর্গরেখ ইতি বিপ্রবরো হবতীর্ত্তিঃ ॥

তং গ্রামমগ্রগণনীয়ভূতং সমগ্রং ।

অগ্রাহ শাসনবরং নৃপ ধর্মপালিত্বং ॥” (৪৫)

অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমে করঞ্জনাংমে এক শ্রেষ্ঠ গ্রাম আছে, এই গ্রামে বিপ্রপ্রবর স্বর্গরেখ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা ধর্মপালের নিকট হইতে তিনি উক্ত সমগ্র গ্রামখানি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে আমরা প্রাপ্ত হইতেছি যে, স্বর্গরেখ আমাদের বর্ণিত ধর্মপালের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং স্বর্গরেখের তারিখ স্থির করিতে পারিলে তৎসঙ্গে ধর্মপালের এবং তৎসঙ্গে তাহার সমসাময়িক (তিরুমলয় লিপি অনুসারে) গোবিন্দচন্দ্রের, এবং তৎসঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের স্বস্তর সভাপতি হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব-কালও স্থিরীকৃত হইবে। এতদ্বাচ্যে প্রাপ্ত তারিখ এবং পূর্ববর্ণিত উপায়ে প্রাপ্ত তারিখের ঐক্য হইলে, আমাদের সিদ্ধান্ত বলবত্তর হইবে।

বারেন্দ্র কুলগ্রন্থমতে, বারেন্দ্র কাশ্যপ গোত্রের বীজ-পুরুষ স্র্ষেণ আদিশুরের সভায় উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং, তিনি আদিশুরের সমকালবর্ত্তী। হরিচরিত কাব্যোন্নিখিত স্বর্গরেখ বীজ-পুরুষ স্র্ষেণ হইতে অধস্তন দশম পুরুষ। (৪৬) সুতরাং, আদিশুরের সময় নির্ণীত হইলে তৎসঙ্গে স্বর্গরেখের সময়ও নির্ণীত হইবে।

(৪৫) হরি চরিত কাব্য। ১৩শ স্বর্গ।

(৪৬) বারেন্দ্র কাশ্যপ গোত্রের বীজ-পুরুষ স্র্ষেণ, তৎপুত্র ব্রহ্মা ও তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র পীতাখর, তৎপুত্র শাক্ষু মহামুনি, তৎপুত্র জীগনি (জীকন), তৎপুত্র পীতাখর, তৎপুত্র হিরণ্যগর্ভ, তৎপুত্র বেদগর্ভ, এই বেদগর্ভের পুত্র স্বর্গরেখ। সুতরাং, স্বর্গরেখ স্র্ষেণের ১০ম পুরুষ অধস্তন হইয়াছেন।—

শ্রীনগেননাথ বসু, শূভ পুরাণ, মুদ্রবদ্ধ।

আদিশুরের সময় নির্দেশ সম্বন্ধে বহু মতামত লক্ষিত হয়। কুলার্গবের মতে ৮৫৪ শকে (“বেদবাণা-হিম শাকে”); “বারেন্দ্রকুলপঞ্জীর” মতে (“শাকে বেদ কলগঘটক বিমিতে”), এবং বাচস্পতি মিশ্রের মতে (“বেদ বাণাঙ্গ শাকে”) ৬৫৪ শকে; ভট্টগঙ্গমতে ৯৯৪ শকে “এক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ যদা। অঙ্কে অঙ্কে বামাগতি বেদবৃদ্ধে তদা ॥” কল্পা-গত তুলাঙ্গ অঙ্কে গুরুপূর্ণ দিনে।); “কিতাশ বংশাবলীর” মতে ৯৯৯ শকে (“নবনবতীর্থক নবশতী শকাদে”); “কায়স্থ কোষত” রচয়িতার মতে ৩৮০ বাংলা সনে, অর্থাৎ ৮১৪ শকে; “দত্তবংশমালায়” মতে ৮০৪ শকে (“শাকে সবেদাষ্ট শতাব্দকে”); “Indo-Aryans” গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ রাভেজ লাল মিশ্রের মতে ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ৮৮৬ শকে; “সংস্কৃত নির্ণয়ের” মতে ৯৯৯ সংবতে, অর্থাৎ ৮৬৬ শকে; “গৌড় ব্রাহ্মণ” রচয়িতার মতে ৯৫৪ শকে; (৪৭) “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” প্রণেতা প্রাচ্যবিজ্ঞানসাহাব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসুর মতে ৬৭৫ হইতে ৬৭৭ শকের মধ্যে; “গৌড়রাজমালা”র মতে অমুমানক ৯৮০ শকে (১০৬০ খৃষ্টাব্দে) আদিশুর গৌড় মণ্ডলে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই বিভিন্ন মতাবলীতে মধ্যে কোনটি প্রকৃত পক্ষে গ্রহণীয়, তাহ স্থির করিতে গেলে মন্তক বিঘূণিত হয়। বাহ্য হটক, নিম্নে আমরা এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। রাজা রাভেজ লাল মিশ্রের “Indo-Aryans” গ্রন্থে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বীর-সেন ও আদিশুরকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন।

৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশুর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করাই আমরা সমীচীন বোধ করি। কারণ, (১) প্রসিদ্ধ কুলাচাৰ্য্য বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার কুলগ্রন্থে “বেদবাণাঙ্গ শাকে” [৬৫৪ শকাদে] আদিশুর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আন- (৪৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। প্রথম ভাগ, ৯৭পৃঃ।

পৌষ ১৩১৯

মন করিয়াছিলেন, এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।
“বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা”র মতও ইহার অমূল্য।
তাহাতেও “শাকে বদকলধটক বিমিতে” [৬৫৪
শকাবে] আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন নির্দিষ্ট
হইয়াছে।

(২) প্রাচীন কুলাচার্য হরমিশ্র লিখিয়াছেন,
“পালবংশীয় রাজা দেবপালের অভ্যুদয়ের পূর্বে আদি-
শূর আবির্ভূত হইয়াছিলেন”। (৪৮) দেবপাল
৮৪৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৭৬৬ শকাবে সিংহাসনোদ্বোধন
করেন। (৪৯) সুতরাং হরমিশ্রের উক্তিও আমা-
দের মতের অমূল্য।

(৩) বারেন্দ্রগণের লাহেড়ী বংশাবলীতে লিখিত
আছে যে, পালবংশীয় দ্বিতীয় নৃপতি ধর্মপাল সু-
প্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওয়াকে ধামসার
গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

রাজা শ্রীধর্মপালঃ সুখমমরধুনী তীরদেশে বিধাতুঃ
নানাদিগাঞি বিপ্রঃ গুণবৃত্তনয়ঃ ভট্টনারায়ণস্ত।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থঃ স কনক-রজতৈর্ধাম সারাভিধানঃ
গ্রামঃ তটৈশ্চ বিচিত্রঃ স্বরপুরসদৃশঃ প্রাদদৎ
পুণ্যকামঃ” ॥ (৫০)

এই আদিগাঞি ওয়া আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের
একতম শাণ্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিত্রীশের পৌত্র। ক্ষিত্রী-
শের পুত্র ভট্টনারায়ণ। ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি-
গাঞি ওয়া।

তৎসুতশ্চ ক্ষিত্রীশঃ স আগতো গোড়মণ্ডলে।

ভট্টনারায়ণস্তাত্মং সর্কশাস্ত্রবিশারদঃ।

তৎপুত্রাঃ ভূবিবিখ্যাতাঃ সর্কশাস্ত্রেষু পণ্ডিতাঃ ॥

আত্মো বরাহ বাটুশ্চ রামো লালো নিপোস্তথা।” (৫০)

(৫৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। প্রথম খণ্ড ৯৮পৃঃ।

(৪৯) V. A. Smith—“Indian Antiquary”
Vol. XXXVIII.

(৫০) লাহেড়ী বংশাবলী।

এরূপ স্থলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে,
ধর্মপালের অন্ততঃ ৫০ বৎসর পূর্বে আদিগাঞি
ওয়াক পিতামহ ক্ষিত্রীশ কাঞ্চকুজ হইতে আদিশূর
কর্তৃক গোড়ে আনীত হইয়াছিলেন। ধর্মপাল ৭৮০
খৃষ্টাব্দে, ৭০২ শকাবে সিংহাসনোদ্বোধন করেন। (৫২)
সুতরাং ইহা হইতেও অর্থাৎ ৭০২—৫০=৬৫২ শকাব্দ
পাইতেছি, এবং এতদ্বারা আমাদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সমর্থিত
হইতেছে।

(৪) কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য ৬৯৫ হইতে ৭০২
খৃঃ [৬১৭ হইতে ৬৫৪ শকাব্দ] পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব
করিতেছেন। তাঁহার দিগ্বিজয় কালে তিনি বাইতেছে;
কাঞ্চকুজ পতি যশোধর্মকে [ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ
এই কাশ্মীরের সভা শোভিত করিয়া
ছিলেন] পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং গোড় রাজ্য
অধিকার করিয়াছিলেন। (৫৩) গোড় রাজ্যের তৎ-
কালীন নৃপতির নাম “রাজতরঙ্গিনী”তে উল্লিখিত
নাই। ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াদিত্য (জয়পীড়)
৬৬৬ হইতে ৬৯৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীর সিংহাসনে
অধিষ্ঠিত থাকেন। সিংহানারোহণের অব্যবহিত পরেই
পিতামহের জ্ঞান তিনিও দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন।
নানাদেশ জয় করার পরে রণকান্ত সৈন্ত এবং সামন্ত
নৃপতিগণকে স্বদেশ গমনে অহুমতি প্রদান করিয়া
তিনি একাকী গোড় রাজ্যে এবং ক্রমে সমুদ্রকূল
গোড় রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করেন।
গোড়ে তখন জয়ন্ত নামক জনৈক নৃপতি রাজত্ব
করিতেন। (৫৪) নানারূপ ঘটনার পর জয়পীড়

(৫১) হরমিশ্র।

(৫২) V. A. Smith Indian Antiquary
Vol. XXXVIII.

(৫৩) “রাজ তরঙ্গিনী”। চতুর্থ ভাগ।

(৫৪) গোড় রাজ্যের ৩য় জয়ন্তাখোন ভূত্বক ॥

এ বিবেশ ক্রমেণাথ নগরঃ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্।

রাজ তরঙ্গিনী। চতুর্থ ভাগ।

জয়ন্তের একমাত্র কন্যা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এবং দ্বিধিকারী জামাতা অচিরে পঞ্চগৌড়ের রাজগণকে পরাজিত করিয়া ঋগুড়কে তাঁহাদের অধীশ্বর করিলেন (৫৫) হরিমিশ্ররচিত প্রাচীন কুলাচাৰ্য্যাকারিকায় এবং অন্ত্যজ বহু কুলগ্রন্থে আদিশূর “পঞ্চগৌড়াধিপ” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীও বর্ণনার এবং প্রাচীন কুলগ্রন্থাদির বর্ণনায় ঐক্য দর্শনে, এবং প্রায় সমকালবর্তী হওয়াতে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় জয়ন্ত এবং আদিশূরকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। জামাতার সাহায্যে “পঞ্চগৌড়াধিপ” হইয়া, বোধ হয় জয়ন্ত আদিশূর উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তৎসাময়িক অল্প কোন নৃপতি “পঞ্চগৌড়াধিপ” ছিলেন বলিয়া জানা যায় না। সুতরাং রাজতরঙ্গিণীর এবং প্রাচীন কুলগ্রন্থাদির বর্ণনার পরস্পর সামঞ্জস্য করিবার জন্ত জয়ন্ত এবং আদিশূরকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করা অযৌক্তিক নহে। ৭৫৪ শকে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া, তাহার ১৩১৫ বৎসর পরে জয়ন্ত আদিশূর বৃদ্ধকালে জয়াপীড়কে কন্যাদান করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক। এই অনুমান সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে, ৬৫৪ + ১৫ = ৬৬৯ শকাব্দ প্রাপ্ত হইতেছি। এই তারিখের সহিত রাজতরঙ্গিণী বর্ণিত ঋগুড়ের দ্বিধিকারের তারিখের সম্পূর্ণ ঐক্য হওয়াতে আমাদের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে।

(৫) আদিশূর যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া ছিলেন, তাঁহাদের অধস্তন প্রায় পঞ্চদশ পুরুষগণকে আদিশূরের দৌহিত্র বংশে জাত বল্লালসেন (৫৬) কোলিত্ত প্রদান করেন। (৫৭) সুতরাং, আদিশূর বল্লাল সেন হইতে আনুমানিক ১৫ × ২৫ = ৩৭৫ বৎসর (৫৫) ৪১৮ হইতে পরবর্তী শ্লোকাবলী দ্রষ্টব্য।

রাজ তরঙ্গিণী। চতুর্থ তরঙ্গ।

(৫৬) “জাতো বল্লালসেনো গুণিগণিতশ্চ বৌদ্ধবংশে।” বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা।

(৫৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। প্রথম খণ্ড, ৯৮ পৃঃ।

পূর্বে বর্তমান ছিলেন। বল্লাল সেন ১০২১ শকে “দানসাগর” গ্রন্থ, (৫৮) এবং ১০২০ শকে “অদ্ভুত সাগর” গ্রন্থ (৫৯) রচনা করেন। “অদ্ভুত সাগরে” এক স্থানে লিখিত আছে, — “ভূজ-বসু দশ মিতে শকে শ্রীমদ্ বল্লাল সেন রাজ্যাদৌ” ইত্যাদি। ইহাতে ১০৮১ শকাব্দ বল্লাল সেনের রাজত্বের প্রথম বৎসর রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। (৬০) ১০৬০ শকের আনুমানিক ৩৭৫ বৎসর পূর্বে যদি আদিশূর বর্তমান থাকিয়া থাকেন, তবে এতদ্বারা ৭০৬ শকাব্দ তাঁহার আবির্ভাবকালরূপে নির্দিষ্ট হইতেছে। সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও, ইহা আমাদের সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। আনুমানিক গণনার মথার সময় নিকৃপণ করা স্মৃতি, এবং তাহাতে এইরূপ সামান্য ব্যবধান হওয়া স্বাভাবিক।

পূর্বোক্ত এই সকল যুক্তির বলে, ৬৫৪ শকাবেই আদিশূর কর্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের সময় নির্দিষ্ট করা আমরা সমীচীন বোধ করি। যাহা হউক, পূর্বে উক্ত হইয়াছে, যে, দ্বিতীয় ধর্মপাল স্বর্ণরেখ নামক জনৈক ব্রাহ্মকে করঞ্জ গ্রাম নান করেন; সুতরাং স্বর্ণরেখ ধর্মপালের সমসাময়িক ব্যক্তি। স্বর্ণরেখ আদিশূরানীত বারেন্দ্র কাশ্যপ গোত্রের বীজ পুরুষ সুষেণ হইতে অধস্তন দশম পুরুষ, তাহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ২৫ বৎসর এর পুরুষের আনুমানিক কাল ধরিয়া লইলে, স্বর্ণরেখ আদিশূরের সমসাময়িক সুষেণ হইতে ২৫০ বৎসর পরে বর্তমান ছিলেন। ইতিপূর্বে ৬৫৪ শকে আদিশূর ব্রাহ্মণানয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(৫৮) নিখিগ চক্রতিলক শ্রীমদবল্লাল সেনেন পূর্বে

শনি-নব-দশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ ॥
বল্লালসেন রচিত “দানসাগর”। J. A. S. B. 1896.

(৫৯) “শাকে খ-নব-খেম্বন্দে। Bhandarkar's Report on the search for Sanskrit manuscripts during 1887—88, and 1890-91

(৬০) Babu Manomohan Chakravarty: J. A. S. B. 1906.

গৌর ১০১০

সুতরাং, স্বর্ণরেখ, এবং তৎসঙ্গে দ্বিতীয় ধর্মপাল, এবং তৎসঙ্গে (তিরুমলয় লিপি অনুসারে) গোবিন্দচন্দ্র ৬৫৪ + ২৫০ = ৯০৪ শকাব্দে, অর্থাৎ, ৯৮২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের শতর সাতারপতি হরিশ্চন্দ্র পালদেব ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষপাদে বর্তমান ছিলেন, বর্তমান যুক্তিতে এইরূপই প্রতীতমান হইতেছে। ইতিপূর্বেও, নানা-প্রকার যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হরিশ্চন্দ্র খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ পাদে, অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং, এই যুক্তি তাহার পোষকতাই কাব্যেতেছে।

চতুর্থতঃ, গ্রীয়ারসন্ মাণিকচন্দ্র (গোবিন্দ চন্দ্রের পিতা এবং হরিশ্চন্দ্রের ঐকান্তিক) খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন (৬১) কিন্তু, আমরা ইতিপূর্বে যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছি, তাগাতেই গ্রীয়ারসনের অনুমান অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। মাণিকচন্দ্র যে মুসলমান রাজত্বের পূর্বে, অর্থাৎ, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ ইহাও উক্ত হইতে পারে, যে, “মাণিকচন্দ্রের গীতে” কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের কথা লিখিত আছে।

“মাণিক চাঁদ রাজা বজ্র বড় সতি।

হাল খানায় মাসড়া সাথে দেড় বুড়ি কড়ি ॥

দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজানা যোগায়।

তার বদলী ছয় মাস পাল খায় ॥”

এইরূপ কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের কথা হিন্দু-শাসন কালে প্রচলিত ছিল। সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে মাণিকচন্দ্র এবং তৎসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র মুসলমান অভ্যুদয়ের পূর্বেই বর্তমান ছিলেন।

ত্রিযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই প্রসঙ্গে পরে লিখিয়াছেন, “এই পুস্তক (“বঙ্গভাষা ও সাহিত্য”) পাঠ করিয়া যাক্তবর গ্রীয়ারসন সাহেব আমাকে লিখিয়া

(৬১) J. A. S. B Vol. XLVII. 1878

পাঠাইয়াছেন যে, এখন তিনি মাণিকচন্দ্র রাজার গান মুসলমান বিজয়ের পূর্বে বিরচিত বলিয়া মনে করেন।

যাহাহউক, বহু আলোচনার পরে আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, সাতারপতি হরিশ্চন্দ্রপালদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ পাদ, অথবা, খুব সম্ভবতঃ, একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সাতারে আগমন করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। কোন স্থান হইতে তিনি সাতার আগমন করেন, তাহা নিয়ে আলোচনা করিলে, ইহাই অনুমিত হয় যে, গোড়ের পালবংশীয় দ্বিতীয় বিগ্রহ-পালদেবের হস্ত হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে বারেন্দ্র ভূমি যখন “কাষোজানুয়জ গোড়পতির” করন্তলগত (৬৩) “অনধিকারী” কাষোজ (নেপাল) বাসীগণ কর্তৃক বিজিত দ্বিতীয় বিগ্রহপাল যখন গোড় রাষ্ট্রেব কোনও নিভৃত কোণে, মগধে অথবা মিলিয়ার লুক্কায়িত; গোড়ের এই মগধবাদের সময়ে চন্দ্র-রাজ যশোবর্মার উত্তরাধিকারী ধর্মদেব ১০০২ খৃষ্টাব্দে অঙ্গ ও রাঢ় আক্রমণ করিয়া সমগ্র দেশ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন; (৬৪) গোড়ের পালরাজবংশের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, খুব সম্ভবতঃ তখনই হরিশ্চন্দ্র গোড় ত্যাগ করিয়া সাতারে আগমন করিয়া একটি খণ্ডরাজ্য স্থাপন করেন।

পালরাজবংশ যখন ধ্বংসোন্মুখ, তখন রাজবংশধর-গণ পূর্ববঙ্গের জলবেষ্টিত সুরক্ষিত স্থানসমূহে প্রস্থান

(৬৩) দীনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাণগড় অথবা বাণনগরের বিশাল ভয়ঙ্কর হইতে সংগৃহীত, এবং দীনাজপুরের রাজবাটীর উদ্যানে পরিস্রবিত একটি প্রস্তর।

(৬৪) ষাঙ্করাহাতে প্রাপ্ত ১০০২ খৃষ্টাব্দের একখানা শিলালিপিতে বঙ্গের এই বিজয়-কাহিনী বর্ণিত আছে। Sir A. Cunningham's "Archæological Survey of India." Vol. XXI.

করেন, (৬৫) তাহা পূর্বেই উক্ত হইরাছে। হরিশ্চন্দ্র গোড় হইতে আগমন করিয়া সাতারে রাজ্য স্থাপন করেন, দেশপ্রচলিত এই প্রবল কিংবদন্তীও আমাদের উক্তির সমর্থন করিতেছে।

হরিশ্চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এই রাজ্য বোধ হয় ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ টোগলক্ কতৃক পূর্ববঙ্গ বিজয় কালে মুসলমানের করতলগত হয়।

স্তম্ভের পাদদেশে “কাথোজান্নয়ত্র গোড়পতির” শিবমন্দির উৎসর্গমূলক কয়েক পংক্তি লিপি উৎকীর্ণ আছে।—
গোড়রাজবালা। ৩৫ পৃঃ।

পরিশিষ্ট

বর্তমান প্রবন্ধ লিখিত এবং আংশিক প্রকাশিত হইবার পর বিভাগীয় পরিদর্শক শ্রীযুক্ত এচ, ই, ট্রেপল্টন্ মহোদয় গত ডিসেম্বর মাসে (১৯১২ খ্রীঃ অঃ) আমাকে সংবাদ দেন যে ভাওয়ালের অন্তর্গত শাকাগর গ্রামে একটি প্রস্তর স্তম্ভ পতিত আছে, এবং লোকে তাহাকে মাধব আখ্যা প্রদান করিয়া মধ্যে মধ্যে পূজা করিয়া থাকে। শাকাগরের এই মাধবেন বিষয় পূর্বেও শুনিয়াছিলাম, কিন্তু, আমাব সংবাদ দাতৃগণ তাহাকে বিষ্ণু মূর্তি বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছিলেন। সচরাচর যে রূপ বিষ্ণুমূর্তি দৃষ্ট হয়, ইহাও তদ্রূপই একটি, এই বিবেচনার আমি ইতি পূর্বে উহা দেখিতে যাই নাই।

শ্রীযুক্ত ট্রেপল্টন্ মহোদয়ের সংবাদ দানের অব্যবহিত পরেই আমি ঐ গ্রামে গমন করি। স্তম্ভটী এখন যেখানে পতিত আছে, তাহার সন্নিকটে বহু পুরাতন হইলী দৌধিকা দৃষ্ট হয়। শীতকাল বলিয়া উভয় দৌধিকাতেই ভলে অনতি গভীর। দৌধিকাগর্ভে বহু পুরাতন বৃক্ষাদি জন্মিয়া উহাদের প্রাচীনত্বের সম্যক পরিচয় প্রদান করিতেছে। চতুর্দিকস্থ

সমুচ্চ ভীর ভূমিও উহাদের বৃহদায়তনের পরিচায়ক। দৌধিকায় এবং স্তম্ভটি সবক্কে কোনরূপ প্রচলিত জনশ্রুতির সন্ধান পাইলাম না। অরণ্যভীত কাল হইতে স্তম্ভটিকে মাধব জ্ঞানে গ্রামবাসীগণ পার্কাদিতে টেল সিন্দূর প্রকৃতি প্রদান করিয়া থাকে।

অনিগম কতিপয় বর্ষ পূর্বে কোনও মুসলমান কবি হিন্দু পূজিত এই প্রস্তর ষণ্ডকে নিকবর্তী নদীতে নিক্ষেপ করে। হিন্দুগণও ইহাতে উত্তেজিত হইয়া ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের সাহায্যে কবীরের বিরুদ্ধে মোকদমা উপস্থিত করে। কাণ্ডটি নিতান্ত অসম্ভব হইয়াছে বিবেচনা করিয়া ঢাকার নবাব বাহাদুর খাঁর বায়ে হিন্দু দ্বারা প্রস্তরটিকে পুনরায় নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া সংস্কারাদি করাইয়া দেন। তদবধি প্রস্তরের মহিমা হিন্দু নিকট আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

প্রস্তরটি স্তম্ভের উপরিভাগ মাত্র, নিম্নভাগ হয়ত নিকটেই কোথাও ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। অস্ত্র কোনও স্থান হইতে উহা ঐস্থানে আনীত হইয়াছে এক্ষণ অসুস্থিত হয় না, কারণ, উহা এত ভারী, যে উহা স্থানান্তরিত করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। স্তম্ভটী Sandstone নির্মিত, এবং অষ্টকোণ, স্তম্ভগায়ে নানারূপ মূর্তি বর্তমান, কিন্তু কোনও লিপি দৃষ্ট হইল না। হয়ত উহার অনাবিকৃত নিম্নভাগে কোনরূপ লিপি থাকিতে পারে। শিবদেশে আট দিকে আটটি মূর্তি খোদিত আছে; মূর্তিগুলির ধ্যানাগন, মস্তকে কিরীট, পদনিম্নে পদ্ম। মূর্তিগুলির নিম্নে কিঞ্চৎ স্থান ব্যাপিয়া কারুকাণ্ড খোদিত আছে, কিন্তু, তাহার প্রত্যেকটি অংশই এক একটা নৌকার ভাঙ্গা। উহা কোন রাজ্যচিহ্ন কি না, স্থির করিতে পারিলাম না। স্তম্ভগাত্রে আরও নানা স্থানে বোধ হয় নানারূপ মূর্তি প্রকৃতি অঙ্কিত ছিল, কিন্তু, তাহা এতই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, প্রায় কিছুই দৃষ্ট হয় না। যে মূর্তিগুলি এখনও বর্তমান আছে, তাহাও Magnifying glass দ্বারা দেখিলে কিঞ্চৎ পরিষ্কৃত হয়। অত্যন্ত প্রাচীন না হইলে খোদিত মূর্তিগুলি এরূপভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইতে

শেখ ১৩৯১

পারে না। ঢাকা জেলার অধিকাংশ প্রাচীন স্থান দর্শন করিয়াছি, কিন্তু, অল্প কুজাপি প্রস্তরস্তম্ভ আছে কি না জানি না। যদিও এই স্তম্ভের সময় নির্ধারণ করা সুকঠিন, তথাপি ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা উল্লেখযোগ্য। স্তম্ভটি বৌদ্ধযুগের তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই,—খোদিত বৌদ্ধ মূর্তিসমূহ হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। পূর্বে যে গালগাজগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, হয় ত ইহা তাঁহাদেরই কাহারও কীর্তিস্তম্ভ।

ধামরাই গ্রামের সহিত অশোকের ধর্মরাজিকার কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা তদ্বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ধামরাই গ্রাম শাকাগর হইতে অধিক দূরবর্তী নহে। অশোকস্তম্ভের সহিত এই স্তম্ভের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আক্ষিপ্ত্রিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইল। আশা করি, ভবিষ্যতে ইহার নিয়তাগ আবিষ্কৃত হইলে স্তম্ভটির কাল নির্ধারণে সুবিধা হইবে।

স্তম্ভটি ভাওয়ালের প্রজাপদ কুমার বাহাদুরের জমীদারীর মধ্যে পতিত আছে; সুতরাং, উহা তাঁহার সম্পত্তি। তিনি কৃপাপূর্বক লেখককে উহা দান করিয়া উহা স্থানান্তরিত করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কর্মচারীর নিকট তদনুযায়ী আদেশ প্রদত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। স্তম্ভটি স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিলে বহু গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া তাহাদের আপত্তি জানায়। এতগুলি ধর্ম-ব্যক্তির প্রাণে আঘাত দেওয়া অস্বাভাবিক বিবেচনা করিয়া স্তম্ভটি স্থানান্তরিত করা হয় নাই। পরন্তু, উহা ঐ স্থানেই বাহাতে স্থানান্তরিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত শীঘ্রই করিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।

হাসিকান্না

(১)

একটি নাতিবৃদ্ধ কাঁচা পাকা মাথা ভদ্রলোক একরাশ লম্বা দাঁড়ি লইয়া মেসের দোতালার আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, “আপনার নামই বুঝি ললিত বাবু।” আমি “আজ্ঞা হাঁ” বলিয়া, শশব্যস্তে, উঠিয়া পড়িয়া বসিবার আসন নির্দেশ করিলাম এবং একটু থামিয়া প্রিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন বলুন দেখি।”

ভদ্রলোক “তা বাবা, তুমি ত প্রাইভেট টিউটারী খুঁজিতেছিলে, আমার বাসায় এস না, খাবে থাকবে, আহার ছেলেটিকে পড়াবে।”

নূতন রেকলেশনে ইউনিভার্সিটি সেবার বিস্তার প্রায়ডুয়েন্ট প্রসব করিয়াছিল, ফলে প্রাইভেট টিউটারের দাঙ্ক বিশ টাকা হইতে দশ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। “একটি প্রায়ডুয়েন্ট দশ টাকায় ছেলে পড়াইতে রাজি আছে” বলিয়া নীচে নাম ঠিকানা লিখিয়া কলিকাতার রাস্তার থামে থামে নোটিশ লাগাইয়া দিয়াছিলাম। জাবিলাম ভদ্রলোকটি তাহা হইতেই আমার নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। খাবার থাকবার সুবিধা হইল, তারপর যদি উপরি কয়েকটা টাকা দেয়, তবে ত কথাই নাই; আমি স্বীকৃত হইলাম। ভদ্রলোকটি আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—“চল বাবা, আমাদের বাড়ীটা দেখে এস, এই ত বীর্জাপুরের মোড়ে।”

তাঁহার সঙ্গে চলিলাম, তিনি বকিয়া, যাইতে লাগিলেন—“আমার বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গে এখন কলকাতাতেই থাকি, টাকাপয়সা হাড়ে কিছু আছে। একটা ছেলে একটা মেয়ে; মেয়েটা খেপুন কুলের ফিক্খ ক্লাসে পড়ে। পড়া, ওনার পুত্রপাল, বুদ্ধিহীন বেশ বিবাহ-বোগা

বয়স কিছু গিল্লির দোষে কিছু হবার যো নেই, এমন গোবেচারী আর দেখ নেই—ওঁর পিতার দেশের কত জানাশোনা ছেলে আছে, ওঁর এ সবকিছু কিছুমাত্র তাগিদ নেই, আমিই যেন সব, সে মেয়ে যেন একটা আমারই, ওঁর যেন নয়। ছেলেটার কিছুই আকর্ষণ নেই বাবা, একেবারে গাধা, কত মারপিট করে দেখলাম, কিছুতেই কিছু হয় না। তুমি একটু চেষ্টা বেটো করে দেখ, কিছু হয় কি না। তোমার কিছু কষ্ট হবে না বাবা, খাবার শোবার কিছুই তোমার ভাবতে হবে না—তোমাকে একটি পৃথক ঘর করে দেব। আর তোমাকে কিছু টাকা না দিলে চলবে কেন? আচ্ছা দশ টাকা? না হয় পনের টাকা করেই দেওয়া যাবে।”

আমি ত উৎফুল্ল হইয়া বাড়ী ও দোতালার আমার জন্ত নির্দিষ্ট থাকিবার ঘর দেখিলাম। ভদ্রলোকটি বলিলেন “তা এসে পড়, বাবা?” আনন্দের আতিশয্যে আমার তখনই আসিয়া, পড়িলত ইচ্ছা হইতেছিল, মুখে বলিলাম “তা হু এক দিনের মধ্যেই সব ঠিকিঁরে গাছিরে আসা যাবে।”

ভদ্রলোক—“তা আজকেই নয় কেন? এখনি নয় কেন? তুমি জিনিষপত্র সব নিয়ে এস, আমি বেহারাকে দিয়ে সব পরিষ্কার করিয়ে রাখি।”

আমি—“তবে আজকেই”—

ভদ্র—“তা তোমার যদি আজকে কোন অসুবিধা থাকে, তা হলে নাই এলে। হাঁ, অসুবিধা ত হওয়ার কথাই, সব ঠিকঠাক করে আস।”

আমি—“না, তেমন কোনো অসুবিধা নেই, ইচ্ছা করলে আজকেই—”

ভদ্র—“না বাবা, তোমার অসুবিধা, জন্মিঁরে এত শীর্ণগীর আসার কোনো দরকার নেই—আমাদের ত আর তেমন কিছুই ঠেকা নেই, পাঁচ সাত দিন পরে এলেও চলবে।”

আমি—“আচ্ছা, আজকে রবিবার, আসছে বুধবারে এখানে আসব।”

ভদ্র—“তা এত সকালে কেন? তোমার অসুবিধে মত আরো পরে এলেও পার।”

আঃ, মহা মুকিল! আমি ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িয়া মেসের খোরাকির পরসাদুলি বাঁচাব। আমি বলিলাম—“না, বুধবারেই আসতে পারব।”

ভদ্র—“আচ্ছা তাই এসো, কিন্তু দেখো তোমার নিজের কোনো অসুবিধা করে আসা না কিছু। আমি এখনি তোমার ঘরটা পরিষ্কার করে রাখছি,—বেহারী বেহারা” আমি “তবে এখন আসি” বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

প্রত্যাশিত বুধবারে দুপুরের খোরাকিটা বাঁচাইয়াও খুব সকালেই আমার জিনিষপত্র লইয়া সেখানে একেবারে আমার দোতালার রক্ষণ গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেখানে কেঁহ নাই এবং ককটিও পূর্বের মতই ধূলাবালি এবং জঞ্জালে পরিপূর্ণ। অল্প কক্ষ হইতে অল্পকক্ষ বেহারাকে ডাকিয়া আমার নাম জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া নাম এবং আজকেই আসবার কথা ছিল এই কথা বলিলাম। পৃহিনী শশব্যস্ত বলিয়া উঠিলেন, “সব ঠিকঠাক করে একে আসতে বলে দিয়েছে, অথচ তার কিছু বলা কথা নেই সব বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে আছে। বেহারী এখানে জিনিষপত্রগুলো নাবা, আর বাবুকে নীচে বৈঠকখানা ঘরে বসতে বল।” নীচে বসিয়া মিনিট পনের পরাশ্র উপরে সুপধাপ ধূপধাপ শব্দ শুনলাম, তারপর উপরে ডাক পড়িল। গিয়া দেখি সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একধারে আমার বিছানা পাতা, অল্প ধারে একটি টেবিল ও দু’টি চেয়ার আমার সব জিনিষপত্র নিপুণভাবে গোছান।

রীতিমত অধ্যাপনা কার্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া গিয়াছে। ছেলেটি সবকিছু আমার প্রথম সিদ্ধান্ত পিতা ভবতারণ বাবুর সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলিয়া গেল; মনে হইল, এমন হাবা ছেলে ত্রিসংসারে আর নাই। ছেলেটির নাম প্রবোধ, বয়স দশ এগার, পড়াইবার সময় ভাবা-চ্যাকা খাইয়া একবার আমার দিকে একবার পুস্তকের

দিকে চাহিয়া থাকে—বট শ্রেণীতে পড়ে, কিন্তু বাংলা ইংরাজী সবক্কে বর্ণজ্ঞানটাও তাহার ভাল করিয়া হইয়াছে বলিলে অত্যাধিক করা হয়। তাহাকে পড়াইবার ভেটা করিয়া আট দশ দিনেই আমি বীতশ্রদ্ধ হইয়া গেলাম, মাঠারী করিতে মোটেই ইচ্ছা হইতেন না।

কিন্তু ইতিমধ্যে পরিবারে বেশ একটু জড়িয়া গিয়াছি, গৃহিণীর সমেহ আশ্রিত ভাব এড়াইয়া চলিয়া যাইবার করণাও মনে উদিত হইয়া না।

প্রবোধের দিদি সুখার বয়স তের চৌক হইবে; এদিকে ইকুলে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, লজ্জা তাহার লেশমাত্র নাই, এষ্টা প্যামপ্যানে আশ্বারে মেরে; একেবারে কুংসিতা না হউক, সুন্দরী—মুহুর্তে মোটেই বলা যায় না; তাহার মুখে শোভন অশোভন এটা ওটা সবক্কে নানা অবাস্তব কথা লাগিয়াই আছে, আর তাহার অতি-সারল্য আমার নিকট বুদ্ধিহীনতার নানাত্বের মতই চেকিল। এই জীবটি মাঝে মাঝে আমার নিকট পড়া শিখিয়া লইতে আসিত, এবং মাঝে মাঝে আসিয়া এ-তা' করিয়া মুখ চুটাইয়া দিত, আমার অত্যন্ত কোতুক বোধ হইত।

আমার দিনগুলি ঘাইতে লাগিল মন্দ নয়। সকালে সন্ধ্যায় ছেলেটা বই খুলিয়া কিছুক্ষণ আপনাপনি বিড়-বিড় করিয়া, জানাণার ফাঁক দিয় হাঁ করিয়া চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া থাকে, এমন সময় মেরেটি হাতে বই অথবা মুখে বাক্যের ডাঙার কইরা আসির উপস্থিত হয়; দুই বেলা পরিপূর্ণ তৃপ্ত আহার, বিকালে লুচি মোহন-তোপে জলখাবার; আর মাঝে মাঝে ভোক্তাদের সময়, আমার পিতামাতা আছেন কি না, আমার বিয়ে হইয়াছে কি না, আমার বিধবা পিসীমার স্বামী কত দিন হইল কেননে মারা গিয়াছেন, ইত্যাদি সবক্কে গতিবার সমেহ প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া, এমনি ভাবে দিন ঘাইতে লাগিল।

একদিন গৃহিণী বলিলেন “বেশ বাবা, তোমাকে

আমরা তেমন আদর বহু করতে পারছি না, আমাদের অবস্থাও কলিকাতা থাকার পক্ষে খুব খারাপ, তবু এখানে কিছু দিন আরো থাকতে হচ্ছে। তুমি ত পরের-ছেলে বাবা; পরের ছেলেকেও যে এমন ভাবে নিজের ছেলের মত ভালবাসা যায় তা এই জোয়ার দিয়েই প্রথম বুঝলাম—সুখার বড় আমার আর একটি ছেলে ছিল, সে থাকলে হয় ত তোমারই মত বড় হোত।”

গৃহিণীর চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। গৃহিণীর স্নেহ আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম, আমার মাতৃহীন হৃদয়ের অপরিতৃপ্ত আকাজক্ষা এই স্নেহ ও সেবা পরায়ণা বমণীটিকে ফিঁসিয়া নানা দিকে তৃপ্ত হইবার অবসর খুঁজিতে লাগিল।

এমনি করিয়া পরিবারে বসিষ্ট হওয়ার সঙ্গে ছেলে-টাকে পড়ান ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিতে লাগিলাম। ছেলে পড়ানো সবক্কে আমার কর্তব্যের শিথিলতা লইয়া কেহ কোনো শব্দই করিল না। কিন্তু মেরে পড়ানো আরম্ভ হইয়া গেল; সেও আবার কিরূপ?

হয়ত মেরেটি দিব্য সরল ভাবে একটি চেয়ার টানিয়া আহার ক'ছে বৈ যরা বসিয়া পড়িয়া আমার খোলা পুস্তক বন্ধ করিয়া দিল, এবং আশ্বারের স্বরে বলিল, “নাটার মশর, আমার এই পরাটা কইরা জ্ঞান না।”

আমি—“কেন, কাঁপকেই ত বলে দিইছি, ক'বার বলে দিতে হয়?”

সুখা—“হ, একবার কইছেন এইগাতেরই অইল আর কি। আমি চাই: পাচ বার কইলেই শিক্ষা কালাই; তোলাটা (প্রবোধ) একশত বার কইলেও পারে না; আর মারার মশর, (উৎকল শব্দ) তোলাটার বাঁক কেমন মাত্ৰ আপনে দেখেন নাই, তবুও এইটা কেমন বোকা কিছুই শিখতে পারে নাই আপনে তোলারে পিটাইবেন খুঁ, না অইলে অর কিছুই লেখা পড়া অইব না।”

আমি—“হাঁ তা' মারব; কিন্তু তোমারও ত মার খাওয়া দরকার, নইলে পড়ানো ত তোমার কিছু মনে থাকে না দেখছি।

সুখা—হ, আমি বুঝি; আপনেন আমার লগে ঠাট্টা করতে লাগছেন। আপনেন আমারে মারতে লজ্জা পাইবেন। বুঝা দাদা (ইন্ডুলের বৃদ্ধ মাষ্টার) এক দিন আমার উপর খুব রাগ অইছিল; কইছিল, বিয়াব উপযুক্ত মাইয়া অইলি, এখন এই পরা পারছ না, এত বর অইছছ, আব-মাক্কা-অই বা কেমনে। অইছা মাষ্টার মশয়, আপনেনব বোরে পরান না। পরানের সময় মারেন নাকি?

আমি—“হাঁ, মারি বৈকি। মাব না খেলে তার আজকের কথা কালকেই মনে থাকে না; আজকে বাতে যদি তাকে বলে দিলাম, “দেখ কালকে বাতে তোমাং কটোখানা নিয়ে এসো” সে পর দিন ট্রাক খুলে সাতপবত ভাঁজ খুলে আমার নিকট এচট। চুলের দড়ি এনে হাজিব করলে। ফরমাসের সঙ্গে শক্ত রকমের একটা কিল না দিয়া দিলে তার কিছু মনে থাকে না।”

সুখা—(আশ্চর্য্য হইয়া) ওমা ট্রাকেব মধ্যে সাত পলা ভাজের ভিতরে চুলেব দড়ি থাকে না কি। আপনার বোটা ত কম কিপ্পিন্ না!

আমি—“কপণ বলতে কপণ! তারপব পেটুক। ভাত দেবার সময় বড় মাছখানা নিজেব জন্ত রেখে ছোটটি আমাকে দেয়, কখনো বা মাছ বেখে শুধু কাঁটাই দিয়ে বসে।”

সুখা—“ও, এইটা ঠাট্টা করে, আপনেন তা বুঝতে পারেন নাই—আমাগে। ফুলপুরে দেখছি, এক জামাইবে হুবার বরা দিছিল, জামাইটা কেমন আহম্মক, কচ্ কচ্ কইয়া থাইয়া ফালাইল। আর তার একটুও লজ্জা নান, আমাগে কুমকেই তার বোয়ের লগে কথা কয়। বোটাও বেলাহাজ। মুখচণ্ডিকার সময় দেখছি, কত চাও চাও, জামাইর দিগে চাইল না। আচ্ছা, মাষ্টার মশয়, আপনার বো তেমন?”

আমি—“তার কথা আর বলো না; সে বিয়েব সময়ই শুকুটী কর্ত্তে বলবার আগেই তিরের শলার মত ছটো চোক দিয়ে আমাকে তাকিয়ে দেখছিল, আর এখন ত

কথাই নেই, তার বোপুয়ারের সাম্নেই আমার সঙ্গে আলাপ করে, একদিন একটা কানমলা পর্য্যন্ত দিয়ে বসল।”

সুখা—সত্য নাকি, এমন বেলাহাজ—ওমা আমিও এমন করতে পারম না। আপনেনব বিগা কতদিন অইছে?”

আমি—“এইত ঠিক এক বৎসর হলো।”

সুখা—“আপনার পোলাপান কয়জন?”

আমি—“এই সবে, ছ’টি মাত্র। সুখা, তুমি এখন যাও ত, আগাব একটু কাজ আছে।”

সুখা—“আপনেনব কাম আপনেন করেন, আমি আপনার কি ববছি।”

আমি—(একটু রাগিয়া) “না, সুখা, যাও, তুমি থাকলে কাজের বাধা হয়।”

সুখা—(ক্রন্দনোন্মুখী হইয়া) “অইছা বাই, আমি মায়েব কাছে কই গিয়া, আপনেন আমারে দেখতে পারেন না, পবা কইয়া দেন্ না।” এই বলিয়া হয় ত সে গৃহিণীব কাছে গিয়া প্যান্‌প্যানানি আরম্ভ করিয়া দিল।

আমার মেয়ে পড়ানো অধিকাংশ সময়ই প্রায় এমনি প্রাবে চলিতে নাগিল।

৩

প্রবোধ ছেগোট এক হিসাবে তার দিদির ঠিক উল্টা। পড়াব সময় তাহার অনতিদ্রুত উচ্চারণগুলিকে সম্বন্ধতীর বিশেষ প্রেবণা বলিয়া বার দিলে, পাঁচ সাত দিন তাহার সঙ্গে থাকিয়াও তাহাকে বোবা মনে করাটা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। গৃহিণী এক দিন বলিলেন, “ভোলাটা দিন দিন এমন হয়ে বাচ্ছে কেন, আমি ত কিছুই বুঝতে পারি না; ছ’তিন বছর আগে ত ওর বুদ্ধিভক্তি বেশ ছিল, শবীরও ভাল ছিল। পড়াব সময় ছাড়াও একে সঙ্গে সঙ্গে রেখে, বেড়াবার সময় সঙ্গে নিয়ে দেখত মাঝে, একে কিছু শুধরে দিতে পার কি না।” সেই দিনই বিকালে বেড়াইতে

বাহির হইবার সময় তাহার স্নানের নির্দেশে এই বোবা ছেলোট সিঁজুগানের ভেতর মত আমার কাছে চাপিয়া বসিল। দুই এক দিন সঙ্গে নিয়া বেড়াইবার পুর দেখিতে পাইলাম যে, এটা ওটা সম্বন্ধে দুই একটা সন্দেহাত্মক প্রশ্ন সে আমাকে স্নিজাসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রভুভক্ত কুকুরের মত বাকাহীন পশ্চাদ্গমনের পল্লিবর্ত্তে সে ধীরে ধীরে মানব-সংসার মত আমার অনুলি ধারণ করিয়া আমার পার্শ্ব-দেশটি অধিকার করিয়া লইল। আমি তাহার নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়া অল্পে অল্পে সমস্ত কলিকাতার রাস্তার চারি দিকের ঘরবাড়ী, গাড়ীঘোড়া, গাছ, পাখী, আকাশ ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া তাহাকে গল্পের মত করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলাম। সে যেন বহুদিনের উপাশ ক্ষুধিত কর্ণে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সব শুনিতে লাগিল। ধীরে ধীরে দেখিলাম, তাহার বুদ্ধির দ্বার অনেক দিকে খুলিয়া গিয়াছে। আমার কৃতকার্যতার উৎকল হইয়া তাহাকে আমি আরও গভীরতর কথা মুখে মুখে শিক্ষা দিতে লাগিলাম।

আশ্চর্যের বিষয়, দু'তিন মাসেই দেখিলাম সে বেশ একটা বুদ্ধিমান ছেলে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরি মধ্যে তাহার শরীরও পূর্ণ হইতে অনেকটা ভাল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কথাবার্তা চালচলনে বেশ বুদ্ধিমান হইলেও, বই খুলিলেই তাহার পূর্ক মুক্তি আশ্রয়প্রার্থ করিয়া বসে, তখন সে যেই মুখিক ছিল সেই মুখিকই হইয়া যায়।

বহির্জগৎ সম্বন্ধে সহজ জ্ঞান ও পাঠ্যভ্যাস তাহার ভিতর এই দুটা জিনিষের সম্ভাব স্থাপনের চেষ্টাই তখন আমার একমাত্র কাজ হইয়া উঠিল। আমার মনে হইল, আমি যেন ধীরে ধীরে একটি জীবন-কাণ্ড গড়িয়া তুলিতেছি। কিন্তু আমার এই শুভ অমুঠান সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহাতে বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল।

একদিন গৃহিণী, সূখা ও প্রবোধকে নিয়া মিত্রদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছেন। বড় একা একা বোধ হইতে লাগিল, বসিয়া বেহারার সঙ্গে আলাপ জড়িয়া দিলাম। বেহারা এই পরিবারের সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে লাগিল—

কাজ লইবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়া দুই বৎসর বসিয়া বসিয়া থাইয়াছেন, ও কাজের অভাবে বুদ্ধিমান ছেলেকে মারিয়া পিটিয়া গাথা করিয়া তুলিয়াছেন; কর্তা কেমন হাবা, আর গৃহিণী কেমন স্ননিপুণ; কর্তার মুখে তাদের টাকা পরস্যা সম্বন্ধে কেমন বড় বড় কাঁকা কথা, আর গৃহিণীর হাতের তহবিল কেমন শূন্য; গৃহিণীর অমুরোধে কাজের চেষ্টার কর্তার কেমন কলিকাতার রাস্তার রাস্তার উদ্দেশ্যে বার্ষিক ভ্রমণ, আর গৃহিণী কেমন মিত্রদেরে বলিয়া কহিয়া একটি কাজের প্রায় যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন; বেহারা কেমন রীতিমত তার বেতন পর্যন্ত পাইতেছে না এবং এমন কি অর্ধ বেতনে কাজ করিতেছে, কিন্তু অনেক দিনের চাকুরী বলিয়া এবং এই পরিবারের মান্যর জন্তও সে কিছুতেই এই চাকুরী ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে না; সূখার বিবাহ লইয়া কেমন মুক্তি হইয়াছে, কিছুতেই যে উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া পাওয়া বাইতেছে না, এক শেষে যে আমাকেই পাত্ররূপে মনোনীত করিবার কিছু কিছু ইচ্ছা ওদের হইয়াছে; এই সব সম্বন্ধে বেহারা অনেক কথা বলিল।

আমি ত প্রথমটা বিস্মিত হইয়া গেলাম। আমিই সূখার পাত্র মনোনীত হইয়াছি!

সে দিন দুপুরে থাইয়া বিছানায় চোক বুজিয়া পড়িয়া আছি, ঘুম আসিতেছিল না। কর্তা সারা কলিকাতা ঘুরিয়া থাইতে আসিয়াছেন। কর্তাগৃহিণীতে আলাপ চলিতেছিল, সব কথা শুনা বাইতেছিল না,—তবে বুঝা গেল, গৃহিণী অমুচ্চকণ্ঠে কি বলিলেন, ‘বিবাহ’ ‘মাঠার’ ‘পছন্দ’ এই দুই একটি কথা আমার কানে পৌছিল; কঠাৎ সূখা উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিল—“বাবা, মাঠার মশরর বিয়া অইয়া গেছে, হুইটা”—গৃহিণী ধমক দিয়া বলিলেন, “বা এখান থেকে।”

আমার শরীর স্নানে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সেবাসরে জড়াইয়া ফেলিয়া এই অদ্ভুত জীবটির সহিত আমাকে জড়িয়া দিবার জন্য যে একটা সমতানী কপি চলিতেছে, তাহা আমি আশ্চর্য ও ভয়গণতার সহিত তখনই বুঝিয়া ফেলিলাম। এই বোধে, সূখা, বহুতারা

ঘেরেটার সঙ্গে বিবাহ। সুধাকে আমি পূর্বে কোতুক ও কপার পাত্র বলিয়াই মনে করিতাম, এখন তাহাকে সর্বাঙ্গকরণে ঘৃণা না করিয়া পারিলাম না। কিন্তু গৃহিণীর যে আনন্দের মুখ হইয়া তাহাকে ভক্তি করিতে ও জ্ঞানবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেই আদরকেই যখন স্বার্থপ্রণোদিত এবং কৃত্রিম বলিয়া মনে হইল, তখন সমস্ত বাস্তবীকৃত আমার নিকট কর্তৃক হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময় সুধা পড়িতে আসিল। রাত্রি তখন আটটা।

সুধা—“কি মাষ্টার মশয়, আপনে না বোলে বিয়া করছেন? আমার কাছে মিথ্যা কথা কইছেন কেন?”

সুধা ও রাগ আমার মুখে ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল। স্বপ্নাসম্ভব সংঘত হইয়া আমি বলিলাম—“না হয় বিয়ে করি নাই, তাতে কি হলো? তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না কি?”

সুধা—“আপনের কাছে কেটা কইল?”

আমি—“যেই বলে থাকে, তোমার কি ইচ্ছা?”

সুধা অতি সহজে পরিষ্কার কণ্ঠ বলিয়া ফেলিল—“আমার ইচ্ছা আছে, আপনার ইচ্ছা নাই?” এমন বুদ্ধি ও লজ্জাহীনতার পরিচয় সচরাচর মেলে না।

আমি বিহ্বানায় শুইয়া পড়িয়া গভীরভাবে বলিলাম—“সুধা, তুমি এখন ব্রাও ত, আমার ঘুম পাচ্ছে।”

সুধা—“এখনই কি ঘুম! যা সকালে শুইতে গেলে পকেট” আমি ভাবিলাম—একে বেশীকণ আমার নিকট রাখিবার এ আর একটা কন্দি! বলিলাম—“না, যাও বলছি, আমি ঘুমোই।”

সুধা—“না অয়, আপনে ঘুমান, আমি একটা গল্প কই।—”

“এক রাজার গোলা —”

আমি লোক দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। নীচে আসিতেই ভবভারণ বাবুকে চুকে দেখিলাম। আমি একটু চাপিয়া গিয়া সহজভাবে বলিলাম—“আপনার কাছেই আসিলাম, আপনার কাছে ছুঁতোরপাড়ার

আমার যে আত্মীয়টির কথা বলেছিলাম (পূর্বে কিন্তু আর কখনো বলি নাই) তিনি খুব ধরে বসেছেন, বলেছেন, আমাকে তার বাসার যেতে হবে।”

ভব—“ও, সেই আত্মীয়টির কথা, তিনি না কি কাজ করেন?”

আমি—“তিনি উকীল।”

কর্তার সঙ্গে উপবে উঠিলাম। গিন্নি আসিয়া সব শুনিয়া প্রথমটা যেন কিছু স্তম্ভিত হইয়া কিছু বলিতে পারিলেন না, শেষে বলিলেন—“চলে যাচ্ছ কেন বাবা, আমাদের কিছু অগ্রাধ হইয়েছে?”

আমি—“ভুঁকে আমার এই আত্মীয়ের কথা পূর্বেই বলেছিলাম, তিনি উকীল, আমার কলিকাতার অভিভাবক—ওর কথা না শুনিয়া ত পারি না।”

গিন্নি—“আমরা তঁ তোমাকে পরের মত দেখি নি, তেমন ব্যবহারও করি নি। হঠাৎ এমন চলে যেতে চাচ্ছ, এর কারণ ত কিছু বুঝি না। কোনো কারণে আমাদের পরে রাগ করেছ কি?”

আমি কোনো উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে আমার কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

পর দিন ঘুম হইতে উঠিয়াই কুলি ডাকিয়া জিনিষপত্র সব বাধিয়া যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। নীচে নামিয়া আসিবার সময় দেখিলাম, গৃহিণী দাঁড়াইয়া আছেন, তাহার চই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতেছে। সুধা পথে একা দাঁড়াইয়া ছিল—সে ধীরে ধীরে বলিল—“মাষ্টার মশয়, চইজা যাবেন কেন, আমি আর কখনো বিয়ার কথা কইম না, আপনে থাকেন।” আমি কি একটা রুঢ় কথা বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু রসনাকে অতি কষ্টে সংযত করিয়া রাখিলাম। বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলাম, একতালার ভিত্তিতে ভোলা চুপুটি করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। সে আমার সঙ্গে যে আত্মীয়তাটুকু পাতিয়া বসিয়াছিল, সে যেন হঠাৎ আজ এক মুহূর্তে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে,—সে আমার সঙ্গে একটি কথা বলিতে পর্যন্ত সাহস পাইল না, সে পুতকের ভোলা হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

পৌষ ১৩১৯

আমি তাকে দেখিয়াই আজ তাহার প্রতি একটা প্রাণের টান অনুভব করিলাম,—তাহার নীরবতার আমি তাহার অন্তর-মহন পাঠ করিলাম, তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল।

৪

সে বৎসর ছিলাম বেনেটোলার মেসেই। কিছু দিন পর্যন্ত ভোঁসাকে দেখিতে ইচ্ছা হইত, কিন্তু গৃহিণী ও সূধাকে দেখা দিবার ভয়ে আমি সে পথ আর মাড়াই নাই। তারপর বৎসর ছিলাম রাজাবাগান লেনের এক বোর্ডিং। ধীরে ধীরে এই সব কয়টি গ্রাণীই আমার মনে একই বর্ণনীয় স্মৃতিতে পর্যাবসিত হইল। তারপর বিবাহ করিলাম—বিবাহের সময় একটা কুংসিং মুখের ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি মনে আসায় রাণীর মুখটিকে আরো স্মন্দর দেখাইল।

বিবাহের পর প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কয়েক দিন হইল, অতি সাদা কথায় তাহাকে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম। সেই চিঠির উত্তর, রাণীর প্রথম চিঠি, আজ আসিয়াছে। আমি ত চিঠি পড়িয়া অবাক,—এত সুগভীর প্রেমের কথা হৃদয়ের রক্ত মাখাইয়া এমন সুন্দর ভাষায় সে প্রকাশ করিতে পারিল কি করিয়া! পাঁচ সাত বার চিঠিখানা পড়িলাম। দুই তিন জন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ডাকিয়া আনিয়া চিঠি পড়িয়া শুনাইলাম—সকলই বিদূষী স্ত্রী বলিয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া দিল। আমি বিকালে চিঠিখানা বকের পকেটে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম।

অন্তমনস্ত ভাবে মীর্জাপুরের মোড় দিয়া যাইতেছিলাম,—সেই বাড়ী! নিমেষে ভিতরকার চিত্রখানা আমার মনে উদ্ভিত হইল, বেহারী নীচে বসিয়া আছে, একটু বেশী বুড়া হইয়াছে—পাশ কাটিয়া চলিয়া গেলাম, সে আমাকে চিনিলা না। কি ভাবিয়া—আবার ফিরিয়া আসিলাম তাহার সামনে দাঁড়াইলাম। সে “মাষ্টারবাবু” বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া আমাকে উপরে আহ্বান করিল, আমি বহুচালিতের মত উপরে গেলাম। তিন বৎসর তিন মাস আসিয়া সেই বোকা ভোলা বন্ধু বসিয়া আছে, তবে

কতকটা বেশী লম্বা বটে, আর একটু বেশী কাহিল, চোখের চারি দিকে কালিমা পড়িয়াছে,—একটা বাক্যহীন নিশ্চল পাথর জানালার কাছে বসিয়া! আমাকে দেখিয়াই পাথরের নির্দোষমুখ ছুটা চোখে যেন হঠাৎ জলিয়া উঠিল, সারা অঙ্গে জীবন-লক্ষণ ফুটিয়া বাহির হইল, পাথর নড়িয়া উঠিল চীৎকার করিল—“মাষ্টার মশর! দিদি, দিদি, মাষ্টার মশর—” এই বলিতে বলিতে আমাকে টানিয়া তার দিদির কাছে উপস্থিত করিল। সে আমাদের দিকে পশ্চাৎ করিয়া চেয়ারে নিশ্চল হইয়া বসিয়া টেবিলে বই রাখিয়া পড়িতে-ছিল,—বই—রবিবাবুর “প্রেম” —খোলা পাতার তার ছটি লাইন লাল পেন্সিলে দাগান—

“তবে পরাণে ভালবাসা কেন বা দিলে

রূপ না দিলে যদি বিধি হে।”

একটু আশ্চর্য হইলাম,—স্বধা পড়ীর হইয়া বসিয়া “প্রেম” পড়িতেছে।

স্বধা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া আমাকে দেখিয়া বিস্ময়-চমকে দাঁড়াইয়া উঠিল, ক্ষণকালের জন্য তার সকৌতুক আঁখি দুটি কি একটু নীরব প্রশ্ন আমার মুখের দিকে তুলিয়া ধরিল, আবার মেঝেতে নামিয়া পড়িল। স্বধা একটু সরিয়া গিয়া ধীরে বলিল—“বহন”। আমি চেয়ারে বসিলাম, তার মুখের দিকে চাহিয়া আরো একটু বেশী আশ্চর্য হইলাম—পাণ্ডুরবর্ণ মুখ! একটা দৃষ্ট সলজ্জ দীপ্তিতে তাহা এখন বেশ সুন্দরই দেখাইতেছে! মেঝেতে চাহিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে ধা বলিল—“আপনি একদিন বেশ ভাল ছিলেন?” আমি বলিলাম—“হাঁ, ভোঁসার সব ভাল ছিলে?” স্বধা নীরব।

আমি—“তুমি কি বই পড়ছিলে?” চিলের মত হেঁ। মারিয়া স্বধা খোলা বইটি বন্ধ করিয়া দিয়া আঁচলের তক্তার লুকাইয়া ফেলিল, বলিল—“ও কিছু নয়।”

আমি—“তুমি রবি বাবুর কবিতা বুঝতে পার?”

স্বধা কোনো উত্তর না দিয়া বিজ্ঞাসা করিল—“আপনি কলিকাতার ছিলেন না?”

আমি—“হাঁ ছিলাম।”

হুই জনই অনেকক্ষণ নীরব রহিলাম, তারপর হুখা বলিল—“আপনি মায় সন্ধে হয় ত কোনো ফুল ধারণা করে হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন; কিন্তু মা বাস্তবিক আপনাকে মনে মনে খুব ভালবাসেন, মুখ ফুটে আপনাকে কিছু বলতে পারেন নি। এ তিন বছর এমন দিন যায় নি, যে দিন তিনি আপনার কথা শ্রবণ করে চোখের জল না কেলেন।”

আমার চোখ ছিল ছল ছল করিয়া আসিল! হুখা বলিতে লাগিল—“আর, একে আপনি কত আদর করতেন, এই ভোলাটার কথাও কি আপনার এক মুহূর্তের জন্ত মনে হয় নি? আপনাকে পেয়ে আপনার সঙ্গে সঙ্গে থেকে ও দু’দিনে কেমন ভাল হয়ে উঠেছিল, আপনি চলে গেলে আবার যেই সেই হয়েছেন।”

ভোলা এত ক্ষণ একবার আমার দিকে, এক বার তার দিদির দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া দেখিতেছিল, আমি তাঁহাকে স্নেহে আমার দিকে টানিয়া আনিলাম, সে আমার কোলে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিছু ক্ষণ সকলই নীরব।

খা একটু হাসিয়া বলিল—“আপনার শরীর বেশ ভাল হয়েছে দেখছি। বিয়ে করেছেন বোধ হয়।” হুখার নত চোখ দু’টি আরো নত হইয়া গেল।

আমি—“হাঁ হয়ে গেছে।”

হুখা—“বিয়ে হয়েছে কত দিন হলো?”

আমি—“এই ত ঠিক এক বৎসর হলো।” হুজনেই কি মনে করিয়া কিছু হাসিলাম।

আমি চেষ্টা করিয়া সহজে বলিলাম—“তোমার বিয়ে হয়েছে কোথায় হুখা?” হুখা মাথা নত করিয়া রাখিল কোনো উত্তর করিল না। ততক্ষণে ভোলা হঠাৎ হাসিয়া বলিয়া উঠিল—“দিদি যে বিয়ে করবে না বলেছে।” আমি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম। হুখা একটু জ্ব ক্রুদ্ধিত করিয়া বলিল—“বাঃ, মাঠার মশায়কে পেয়েই যে মুখে কথা ফুটে বেরল! লম্বিত বাবু, মা আমাকে বাসায় নেই; তাঁর

আর এই ভোলাটার জন্ত আপনি আমাদের এখানে মাঝে আসবেন ত?”

আমি—“তা নিশ্চয়ই আসব।”

গৃহিণী ফিরিয়া বেহারার নিকট পূর্বেই গুনিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং নিরতিমান স্নেহকণ্ঠে ডাকিলেন, “ললিত।” আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে বলিলাম, “না।” এই বলিয়া তাঁহাকে এমন আন্তরিকতার সহিত প্রণাম করিলাম যেমন ভাবে পূর্বে আমি আর কাহাকেও করি নাই। গৃহিণীর হৃদয়ে বহু দিনের ক্লান্ত ভাবমেষগুলি অপ্রত্যাশিত ভাবে গলিয়া আসিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তিনি সংযমের সহিত সেগুলিকে চক্ষে বহিয়া আসিতে দিলেন না। আমার হৃদয় ক্লিয়া উঠিতেছিল—এঁর সঙ্গে আমি এমন খারাপ ব্যবহার করিয়া ফুলিয়া গিয়াছিলাম! আমার প্রাণের চেয়েও বেশী টাকা এঁর মুখের গ্রাস হইতে আমি কাড়িয়া নিয়াছিলাম! গৃহিণীর দিকে চাহিয়াই আমি আর আমার হৃদয়ভাবকে ক্লান্ত করিয়া রাখিতে পারিলাম না, আমার চোখে তাহা বরিয়া আসিল। গৃহিণী তাহা দেখিয়া চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, “তুমি চলে গেছ বাবা, আর আমার হুখা দিন দিন তোমার কথা ভেবে ভেবে মরছে।” আমি চমকিয়া হুখার দিকে চাহিলাম, দেখিলাম সে যেন হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর বেদনাবাতে, এবং মায়ের প্রতি যেন একটু ক্রুদ্ধ হইয়া, মুখ ফিরাইয়া অস্ত্র কক্ষে চলিয়া গেল।

গৃহিণী বলিলেন, “মেয়েটা হাথা ছিল সত্য; কিন্তু আমি কি আর জান্তাম না যে, বিয়ে হলে তার একটা মন্ত পরিবর্তন হবে? তা না জানলে তোমার মত ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের ইচ্ছা কর্তাম!” অহুতাপে ও বেননার আমার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, আমি বলিয়া ফেলিলাম, “না, আমি হুখাকে বিয়ে করব।”

গৃহিণী গিয়া বলিলেন, “ললিত বিয়ে করতে বীকৃত আছে—”

“আমি বলি নি মা, আমি কাউকে বিয়ে করব না?”

শৌর্য ১৩১৯

বলিয়া ভূখা বাহিরে আসিয়া বলিল, “ললিত বাবু, আর আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ভাল।”

সে দিন রাত্রে মেসে ঘুমাইরা অনেক স্বপ্ন দেখিলাম। প্রভাতে উঠিয়াই রাণীকে দীর্ঘ এক চিঠি লিখিলাম, চিঠির শেষ দিরা আমার এই করুণ প্রাইভেট টিউটরীর কাহিনীটিও লিখিয়া দিলাম। শালো ও শালা-মহলে জনহব শুনিয়াছি, চিঠি পড়িয়া রাণী অন্তরের আনন্দে হাসিতে হাসিতে না কি কাঁদিয়া কেঁদিয়াছে, তাগর ঠোঁটে হাসির রেখা মিলাইতে না মিলাইতেই না কি তাহার চোখে অশ্রুরেখা দেখা দিয়াছে! ঠোঁটের হাসিটি আমি ও রাণী বাটরা লইয়াছি, চোখের অশ্রুটুকু আর একজনের নামে পবিত্র হইয়া সেখানে চিরদিন বিরাজ করুক।

শ্রীসুধরঞ্জন রায়।

যবে তুমি সখার উদ্ভানে
উপনীত হবে সমীরণ,
সখারে সে আমার সংবাদ
উপহার দিও হে তখন।

কহিও আমার নাম কেন
ভুলিবারে চাহে অকারণ,
সে সময় আসিছে আপনি
যবে আর হবে না স্মরণ।

অশ্রু-বিন্দু-শত-কণা শুধু
হে হৃদয়ে! কর গো বর্ষণ;—
হয়ত সে মিলন-বিহগ
তব জলে মানিবে বন্ধন।

শ্রী জীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

অমর প্রেমিক

“দেওয়ান হাফেজ” হইতে

পাত্র* মোর কর সমুজ্জল
হরা-দাতা* রার* প্রভার;—
গান গাও হর্ষে হে, গায়ক,
সংসারের কাজ শেষ, হার!

তুমি মোর হুরারসাবাদে
কেন নিত্য বিমুখ এমন,—
পান-পাত্রে হেরিয়াছি আমি
সখার সে কমল-আনন!

প্রেমিতে জীবিত যাত্র মন
কোন দিন মৃত্যু নাই তার;
অগভের কর্ণাম্বরে সেই
অমরত্ব অঙ্কিত আমার।

মধ্যযুগে যুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও যুরোপীয় ছাত্রজীবন

যুরোপের মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রজীবনের ইতিহাস বঙ্গবাসীদের নিকটে কিরূপ স্থান লাভ করিবে জানি না। কিন্তু আজকাল বহুদূরবর্তী বিভিন্ন দেশ সমূহের মধ্যেও যেকোন বনিষ্টতার আভাব দেখা বাইতেছে একরূপ অবস্থার উক্ত বিষয় আলোচনা করা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শিক্ষার একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন চলিয়া আসিতেছিল বলিয়া মনে হয়। প্রধানতঃ ব্রাহ্মণগণের উপরই শিক্ষার ভার স্তম্ভ ছিল। বাহ্যতে তাঁহারা নানারূপ সাংসারিক চিন্তা হইতে ঘূরে থাকিয়া এবং মাজ শিক্ষকতা কার্যেই তাঁহাদের সমস্ত শক্তি

(১) পাত্র—ভর। (২) হরা-দাতা—প্রেমদীপক ভর।
(৩) হরা—প্রেম বা মত্ততা।

নিষেধিত করিতে পারেন, প্রাচীন ভারতীয় রাজত্ববর্গ তাহার স্বাধীনতা করিতে পশ্চাদ্গত হইতেন না। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট ভাব যদিও তৎকালীন মনীষিগণের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তথাপি সেই সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহাদের ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। রাজা শ্রীহর্ষের রাজত্বকালে (৬০৭—৬৪৭) ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর না হইলেও এসিয়াখণ্ডের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ও উহার বিরাট পুস্তকাগারের খ্যাতি (১) দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পাল-রাজগণের রাজত্বকালে বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী প্রভৃতি আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার মতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার পরেই মুসলমানগণের আবির্ভাব। বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী বক্রিরারের জনৈক সেনাপতি কর্তৃক বিনষ্ট হয় ও চারি দিকে নানা পরিবর্তন সংঘটিত হইতে থাকে।

যুরোপখণ্ডেও গ্রীস ও রোমের সভ্যতাকে তদনুযায়ী রাজত্ববর্গ শিক্ষাবিস্তারে যত্নস্বরস্রণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার আন্দোলন মন্দীভূত হইতে থাকে। ভারতবর্ষে যেমন মুসলমানগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই কিছুকালের জন্ত শিক্ষার আন্দোলন চাপা পড়িয়া রহিয়াছিল, যুরোপখণ্ডেও হুন্, গথ, প্রভৃতি অসভ্যজাতির উৎপীড়নে তদ্রূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত তথার বিক্রমশীলা বা ওদন্তপুরীর ভার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ১২০০ খৃঃ অব্দের স্থাপিত প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ই যুরোপখণ্ডের মধ্যযুগের সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পূর্বে আমাদের দেশের মত যুরোপেও কেবলমাত্র ধর্মযাজকদের হস্তেই

শিক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট ছিল। এক একটি ধর্মযাজকের হস্তে ১০১২টি ছেলের ভার অর্পিত হইত। উচ্চ শিক্ষালাভার্থী যুবকদিগের বড় বড় সহরে প্রধান ধর্মযাজকের নিকট যাইয়া শিক্ষালাভ করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বাতারাভের নানারূপ অসুবিধা থাকার দরুন অতি কম লোকই উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইত।

শিক্ষার ভার কেবলমাত্র ধর্মযাজকদের উপরেই ভ্রষ্ট থাকার অতি সঙ্কীর্ণভাবে শিক্ষা প্রদান করা হইত। ধর্মযাজকগণ তাঁহাদের অভিলাষানুসারে ও বাহ্যে ছাত্রগণ পরে তাঁহাদেরই উদ্দেশ্য সাধনের উত্তম সহায় হইতে পারে, ঠিক সেইভাবে শিক্ষা দিতেন। (২) শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ৮ ভাগে বিভক্ত ছিল—৭টি সাধারণ বিষয় (seven liberal arts) ও ষিওলজি বা ধর্মতত্ত্ব। ঈটি সাধারণ বিষয় আবার দুই-ভাগে বিভক্ত ছিল—

১। ত্রৈয়িক (Trivium)

- (i) ব্যাকরণ
- (ii) অলঙ্কার (Rhetoric)
- (iii) তর্কশাস্ত্র (Logic)

২। চাতুর্বিধিক (Quadrivium)

- (i) গণিত
- (ii) জ্যামিতি
- (iii) সঙ্গীত
- (iv) জ্যোতিষ

সাহিত্য ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষিওলজিকে সর্বাঙ্গীণে উচ্চ স্থান দেওয়া হইত ও সমাজে উচ্চ বিষয়ে উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত যুরোপে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব দেখা যায় না। প্রকৃত জ্ঞানী লোকের সংখ্যা অতি অল্প থাকার তাহার

(২) Education was intended wholly for the church and most of the students became members of the Secular or Regular clergy. This determined to a very great extent the character of the teaching."

(১) ঐতিহাসিকগণের পতীর গবেষণার বলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ের অট্টালিকাটি ৯ তাল ছিল, এবং তাহার নাম "রত্নোদয়" ছিল।

নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন। মাঝে মাঝে দেখা যাইত সেই সকল মনীষিগণের জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া অনেক জ্ঞানপিপাসু ছাত্র তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যুরিরা বেড়াইত। মনীষি আবেলার্ড (Abelard) যখন ঐরূপ ভাবে যুরিরা পুনরায় নিজ মাতৃভূমি প্যারিতে পদার্পণ করিলেন, তখন দেখিলেন প্রায় শতাধিক ছাত্র তাঁহার অহুবর্তী। জ্ঞানবয়ো-বৃদ্ধ আবেলার্ড ছাত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—“যদি তোমরা প্রকৃতই জ্ঞানপিপাসু হইয়া থাক, আমি তোমাদের জ্ঞান-পিপাসা দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তোমাদের আর যুরিরা বেড়াইতে হইবে না।” সেই শতাধিক ছাত্র লইয়া আবেলার্ড প্যারি সহরে তাঁহার শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টিই যে পরে বিখ্যাত প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইবে, এবং ইহারই অধ্যাপকগণ যে এক সময়ে রোমের পোপদিগের বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য আহূত হইবেন, বৃদ্ধ আবেলার্ড তাহা বোধ হয় এক মুহূর্তের জন্যও ভাবিতে পারেন নাই।

আবেলার্ডের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যবর্গ তাহাদের গুরু পন্থানুসরণ করিয়া শিক্ষাদানে নিযুক্ত রহিলেন। ক্রমশঃই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্যারি সহরের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। রাজা ফিলিপ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকারিতা শীঘ্রই উপলব্ধি করিতে পারিলেন। ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশী ছিল। তিনি দেখিলেন, এক দিকে যেমন তাঁহার রাজ্যে ধনাগমের এক নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে, অপর দিকে তেমনই তাঁহার রাজ্যের যশ ও খ্যাতি চতুর্দিকে বিধোষিত হইতেছে (৩)। তিনি বুঝিলেন, বিদেশী শিক্ষক ও ছাত্রদ্বন্দ্বকে সম্বলিত রাখাই তাঁহার এক প্রধান কর্তব্য। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন একদিন সহরস্থ শান্তিরক্ষকদের সহিত দাঙ্গা করিতে বাইরা এটি ছেলে মুহাম্মদে পতিত হয়, ও তাহার ফলে যখন সমগ্র শিক্ষক ও ছাত্রসংগী দলবদ্ধ হইয়া প্যারি

পরিভ্রমণ করিতে বহুপরিকর হয়, রাজা ফিলিপ ছাত্রদিগের সম্পূর্ণ দোষ জানিতে পারিয়াও তাহাদের পক্ষাবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১২০০ খৃষ্টাব্দে তিনি ছাত্রদিগকে যে সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি প্রধান প্রধান সর্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল (৪)—

১। ছাত্রগণ এবং তাহাদের পয়, অর্থ, ও অন্যান্য জিনিসবাহকদিগকে কেহ অত্যাচার বা স্পর্শ করিতে পারিবে না।

২। প্রত্যেক ছাত্রকেই ধর্মযাজকের দ্বারা দেখিতে হইবে।

৩। ছাত্রগণের বিচার যের ধর্মযাজকগণ না হয় অধ্যাপকগণ করিবেন।

৪। শিক্ষক ও ছাত্রগণ তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের শিক্ষা-স্থান পরিবর্তন করিতে পারিবেন। (Right of migration).

শেষোক্ত সর্তটিই ছাত্র ও শিক্ষকগণের নিকট অধিকতর সন্মান ছিল। বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন সম্পত্তি ছিল না। সুবিধানুসারে ঘর ভাড়া করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হইত। ঐরূপ অবস্থায় রাজা-অথবা সহরস্থ অন্য কাহারও সঙ্গে একটু মতবৈধ হইলেই তাঁহারা স্থান পরিবর্তনের ভয় দেখাইয়া নানারূপ সুবিধাজনক সর্ত মঞ্জুর করাইয়া লইতে পারিতেন।

উপযুক্ত উপকরণাভাবে শিক্ষাগণ কিরূপে ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহা বিপদ ভাবে জানা যায় না। তবে যত দূর জানা যায় তাহাতে অনুমান করা যায় যে, শিক্ষকগণ প্রধানতঃ পুস্তকের নির্দিষ্ট কিয়দংশ পড়িয়া সহজ ভাষায় ছাত্রদিগের নিকট তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। ছাত্রগণ অধ্যাপকের বক্তৃতার ‘নোট’ লইতে চেষ্টা করিত। মুদ্রা-বস্ত্রের আবিস্কর্তা তখনও পৃথিবীতে দেখা দেন নাই, স্মরণ্য পুস্তকের অভাব যথেষ্টই ছিল। পুস্তকগুলি সাধারণতঃ

(৩) “The king was very glad to have the scholars on account of the added *wealth* which they brought to the capital, and decance of the *prestige* which the great school conferred upon Paris.”

(৪) “It was in the year 1200, and this may be considered the date of the official recognition of the University of Paris”

পার্চমেন্ট কাগজে লেখা হইত। এই কাগজও উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া বাইত না। বৎসরে দুই বার করিয়া পারিতে বিশ্বমেলা বসিত এবং সেখানে পার্চমেন্ট কাগজের বেচাকেনা হইত। রাজার আদেশানুসারে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের পূর্বে কেহই ঐ কাগজ কিনিতে পারিত না।

যে সকল গরিব ছাত্র অর্থাভাবে পুস্তক অথবা নোট লিখিবার কাগজ কিনিতে পারিত না, তাহারা স্বভাবতঃই ধনী ছাত্রগণের শরণাপন্ন হইত। বাহাতে হৃদশাগ্রস্ত ছাত্রগণ দুই পরশা বাঁচাইয়া চলিতে পারে, তৎপ্রতি তাহাদের যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। এমনও দেখা গিয়াছে ১৬১৭টি ছেলে একটি ক্ষুদ্র সেন্টের্বেতে ঘরে একখানি মাত্র বই কিনিয়া একটি আলোর সাহায্যে দ্রুত ছাত্রজীবন যাপন করিয়াছে। শীত কালে ঘরে আগুন জ্বলিয়া ঘরটিকে একটু উষ্ণ করিবার খরচও তাহাদের কুলাইয়া উঠিত না। সেই বরফ-পড়া ভীষণ শীতে কোন প্রকারে জড়সড় অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া তাহারা রাত্রিটা কাটাইয়া দিত।

যে দিন হইতে বিধাতা এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই বোধ হয় তিনি মানব জাতির মধ্যে দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ও সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এক সম্প্রদায় ঐশ্বর্য্যদম্পন্ন, অপেক্ষাকৃত অভাবহীন, আর এক সম্প্রদায় অভাবপরিপূর্ণ, অর্থহীন। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের নিয়ত কতই না আশ্চর্য্য পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের ক্ষয় নাই। যত দিন এ পৃথিবীর আয়ু নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এই ভীষণ বৈষম্যও বোধ হয় তত দিনই পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়া আনন্দ ও নিরানন্দকে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। বৈচিত্র্য রক্ষাই যেন বিধাতার সার খেলা।

নির্দিষ্ট পাঠ সমাপন করিতে না পারিলে ছাত্রগণকে যথোপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সুদৃশ্য বেহদণ্ডের মোটেই অভাব ছিল না।

সৌভাগ্যক্রমে কি হুর্ভাগ্যক্রমে বলিতে পারি না— তাহাদের বড় বিশেষ কিছুই পড়িতে হইত না।

১। গণিত—সাধারণ জমাখরচ রাখা শিক্ষা করিতে পারিলেই হইত।

২। সঙ্গীত—কয়েকটি ধর্মসঙ্গীত পাহিতে পারিলেই হইত।

৩। জ্যামিতি—কয়েকটি মাত্র অঙ্কশীলন করিতে হইত।

৪। জ্যোতিষ—ইষ্টারের দিন গণিতে পারিলেই হইত— ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতেই উপরোক্ত বিষয়গুলি উচ্চ ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ৭টি সাধারণ বিষয়ের যে কোনটিতে উপাধি লইতে হইলেই ৬ বৎসর পড়িতে হইত; কিন্তু খিওলরিতে উপাধি লইতে হইলে ৮ হইতে ১৪ বৎসর পড়িতে হইত। প্রত্যেক ছাত্রেরই জ্ঞানার্জনের একটা প্রবল ইচ্ছা থাকায় সকলেই সকল বিষয় পড়িতে চেষ্টা করিত। সপ্ততি বর্ষ বৃদ্ধও উপাধি পাইবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অনবরত ছাত্রদের সঙ্গে পড়িতে আসিত; কারণ তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল যে, বিদ্যালয়িকার সঙ্গে বয়সের কোনই সম্বন্ধ নাই। মানুষ যত দিনই জীবন ধারণ করুক না কেন, জীবনের শেষ স্পন্দন পর্য্যন্তও সে ছাত্র। তাহারা বুঝিয়াছিল, বিদ্যার সীমা নাই। আমেরিকাতেও আজকাল এ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—৮০ বৎসরের ক্লান্ত কলেবরা বৃদ্ধা জলন্ত উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া যুবক ছাত্রগণের সহিত দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে!

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন ঋষি আরিষ্টটলের মহামূল্য গ্রন্থ সকল টীকাটিপ্পনী সহ স্পেন দেশ হইতে পারিতে নীত হইল, তখন প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষা দূরে চলিয়া গেল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-তত্ত্ব প্রভৃতি দ্রুত তথ্য আবিষ্কারে সকলে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিল। যেন এক প্রবল বস্তা আসিয়া দার্শনিক গবেষণায় সকলকে ডুবাইয়া রাখিল। সৌভাগ্যের বিষয়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ছাত্রগণ বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের আলোচনার পুনরায় মনোনিবেশ করিতে আরম্ভ করে।

শিক্ষার ভার যখন কেবল ধর্মশাস্ত্রের উপরই স্তব্ধ

গৌর ১৩১২

ছিল তখন কাহাকেও শিক্ষাগানের প্রতিদান স্বরূপ কোনরূপ বেতন দিতে হইত না। শিক্ষকতা ব্যাপারটি নানা লোকের হস্তে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বেতন লওয়া পদ্ধতি প্রচলিত হইতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও নিয়মিতরূপে বেতন দিতে হইত। ১৪শ শতাব্দীতে আরম্ভ পর্ব্বতের উত্তরাংশে প্যারিস সহরই সর্বাপেক্ষা প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল। ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছিল। আশ্বিনীতে ৫শ শতাব্দীর পূর্বে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হয় নাই। দক্ষিণে ইটালিতে ব্লোগনা বিশ্ববিদ্যালয় আইন শিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্যারিস ও ব্লোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০০০ হইতে ৭০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে ২০০০ করিয়া ছাত্র ছিল(৫)।

বর্তমান সময়ের ত্রায় মধ্যযুগেও সমপাঠী ছাত্রগণের মধ্যে চিঠির আদানপ্রদান হইত। সময় সময় অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে নানা প্রকার সংবাদ জানিবার জন্য

সেই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকটেও চিঠি লেখা হইত(৬)। এতদ্ব্যতীত ছাত্রগণ পুস্তক ও খাওয়াখরচ প্রভৃতির ব্যয়সম্বলনের জন্য তাহাদের অভিভাবকদের নিকট প্রায়ই চিঠি লিখিত(৭)। এই সকল চিঠি হইতেই আমরা মধ্যযুগের ছাত্রজীবনের বিবরণ কতক পরিমাণে জানিতে পারি। ছাত্রগণ অভিভাবকদিগের নিকটেই অধিক চিঠি লিখিত। অভিভাবকগণ ক্রপণ হইলে নানাপ্রকার ওজুহাত দেখাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করা হইত,—এ সহ্যর সব জিনিষেরই দাম বেশী, বিশেষতঃ এবার অত্যধিক শীতে অধিকাংশ শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সহরের লোকসংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়াতে সব জিনিষই দুল্লভ হইয়াছে; বিদ্যালয়ের বেতন বাড়িয়াছে ইত্যাদি। সম্মান-বৎসল পিতামাতা একই নব্রতাবে খরচ কম করিতে উপদেশ দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত অর্থ পাঠাইয়া দিতেন।

শিক্ষকগণ মাঝে মাঝে ছাত্রের চরিত্র ও পড়াশুনা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া গোপনে অভিভাবকের নিকট চিঠি লিখিতেন। কোনও ছাত্রের বিরুদ্ধে কোনও শিক্ষক তাহার পিতার নিকট পত্র লিখিলে পিতা পুত্রকে এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন—“আমি বিশ্বস্তৃত্রে অবগত হইলাম যে, তুমি নিয়মিতরূপে পড়া চালাইতেছ না, এবং বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার অসদ্ব্যবহারের পরিচয় দিতেছ। যখন তখন নানা স্থানে খুরিয়া সময় নষ্ট করিতেছ। ইহা ছাড়া

(৫) যুরোপের মধ্যযুগের (ত্রয়োদশ শতাব্দী) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম :—

(ক) ইটালীতে—১। ব্লোগনা (Bologna)

২। পেভিয়া (Pavia)

৩। পেডুয়া (Padua)

৪। সিয়ানা (Siena)

(খ) স্পেন — ১। সেলামেনকা (Salamanca)

(গ) অষ্ট্রিয়া — ১। প্রাগ (Prague)

২। এরফার্ট (Erfurt)

(ঘ) ফ্রান্স—১। প্যারিস (Paris)

২। ওরলিয়ান (Orleans)

৩। টুলু (Toulouse)

৪। মন্টপেইয়ের (Montpellier)

(ঙ) ইংলণ্ড—১। অক্সফোর্ড (Oxford)

২। কেম্ব্রিজ (Cambridge)

(চ) জার্মানী (১৫ শতাব্দীর পরে) —

১। ভিএনা (Vienna)

২। লাইপসিক (Leipsig)

(৬) Letters to fellow-students occupy a considerable place in these collections, but they are confined to the most part to messages of condolence, introductions, request for news, protestations for friendship and similar common-places. We also find students urging friends to join them at the university, arguing to make the journey together.

(৭) The students after arriving at a university town generally wrote letters to their parents giving a general description of their town and the help they had got from the masters and the fellow-students. This follows the inevitable demand for money, this time for the purchase of a desk, ink, parchment etc."

আরও অনেক গুরুতর অস্তায় কার্য্য করিতেছে, বাহা উল্লেখ করাও আমি উচিত মনে করি না, ইত্যাদি।” তাহার পর শিক্ষকদিগকে গোপনে শাস্তির ব্যবস্থা লিখিয়া পাঠান হইত।

পথের নানাপ্রকার অসুবিধা থাকি সঙ্ঘেও ছাত্রগণ বহু দূর দেশ হইতে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়িতে আসিত। জার্মেনী হইতে বহু ছাত্র ফ্রান্স, তুবারাঙ্কর আলম্ পর্যন্ত পার হইয়া ব্লোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করিতে আসিত। জ্ঞানার্জনের প্রবল উদ্দীপনার তাড়িত ছাত্রবৃন্দের নিকটে পথের কষ্টও চোর ডাকাতের ভয় পড়তি ক্ষণিক ভীতিসমূহ কোথায় উড়িয়া যাইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসের রক্তরঞ্জিত অধ্যায়হইতে বিদায় লইয়া যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হৃদয় ইতিহাসে মনোনিবেশ করা যায়, তখন মনে কিই না এক বিমল আনন্দের উদয় হয়! এক দিকে স্বাধীন রাজ্য-লিপু রাজভক্তবর্গ খড়াহস্তে স্বীয় অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য সহায় বন্ধনে রক্তপাত করিতে প্রস্তুত; অপর দিকে কোমলমতি শিশুসন্তানগুলি পিতামাতার নেত্রজলে সিক্ত হইয়া সরস্বতী দেবীর আরাধনার জন্য বিদেশ-ব্যতীর বন্ধ-পরিকর; এক দল রক্তের নদী দ্বারা পৃথিবীকে ভাসাইতে চলিল, আর এক দল জগতে জ্ঞান-বিস্তারে প্রয়াসী হইয়া জ্ঞানার্জন করিতে চলিল।

ছাত্রগণ এক বার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারিলে সহজে আর সে স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহিত না। অনেক চিঠিতে দেখিতে পাই, যাহা যত্না শয্যায় শায়িত, পিতা জননীকে এক বার শেষ দর্শন দিবার জন্য পুত্রকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু জ্ঞানপিপাসু পুত্র সে দিকে দৃকপাতও করিতেছে না। আর একখানি চিঠিতে দেখিতে পাই— পিতা সিএনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার পুত্রের নিকট চিঠি লিখিলেন—“বৎস, তোমার বিবাহের বয়স হইয়াছে। তোমার পরিজনবর্গ এক রূপগুণবিত্তি ধনশালিনী পাড়ী ঠিক করিয়াছেন। বিলম্ব না করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই বাহাতে শিক্ষকগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া

বাড়ী পৌছিতে পার, তাহার চেষ্টা করিও।” পুত্র উত্তর দিল—“পিতা, সামান্য বিবাহের জন্য লেখাপড়া পরিত্যাগ করিতে যাওয়া আমি অতি নির্দোষের কাজ বলিয়া মনে করি। কারণ, মানুষ যখন ইচ্ছা তখনই বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানার্জনের হবিধা এক বার হারাইলে পুনরায় পাওয়া বড়ই দুষ্কর—ইত্যাদি”

শিক্ষকগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছাত্রগণের সমস্ত অভ্যাস অভিযোগ জানিয়া লইয়া তাহা পূরণ করিতে বৃত্তপন্ন হইতেন। কতিপয় চিঠিতে দেখা যায়, শিক্ষকগণ ছাত্রবৃন্দের অভিভাবকগণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন; অভিভাবকগণ তাঁহাদের সহিত ছেলের ভবিষ্য জীবনালোচনাতেই অধিকাংশ সময় কাটাইতেছেন।

মধ্যযুগে বহুগুণসম্পন্ন না হইলে কেহই উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত না (৮)। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রণিখনামা অধ্যাপক রবার্ট ডি সরবর্ন (Robert de sorborn) তাঁহার ছাত্রবৃন্দকে নিম্নলিখিত ৬টি নিয়মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিতে বলিতেন:—

- ১। বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন সময় নির্ধারণ করা।
- ২। পাঠকালে একাগ্রচিত্ত হওয়া।
- ৩। পুস্তকের উৎকৃষ্ট অংশগুলি মুখস্থ করা।
- ৪। অধ্যাপকের বক্তৃতাকালে নোট লওয়া।
- ৫। অধ্যাপক ও সমপাঠিগণের সহিত আলোচনা করা।
- ৬। উপাসনা বা সাধনা করা।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ অনেক গুণের অধিকারী হইলেও বালহুলভচপলতা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

৮। “The ideal scholar of the pulpils was a rather colourless personage, obedient, respectful, eager to learn, and keeping very much to himself..... Should be assiduous in lecture, quick at learning, and bold in debate.....”

সময় সময় তাহাদের নানা প্রকার উপজবে সহরগুরু লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত। রাজপথের উপরে ছাত্রদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি ও মারামারি হইত। অনেক সময় সামান্য মতবৈধ হেতু ছাত্রগণ অগ্নিশ্রম হুসজ্জিত হইয়া সহরবাসীদিগের আবাসসমূহের দরজা জানালা ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া জ্বীলোক ও শিশুসন্তানের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইত। সমস্ত শান্তিরক্ষক-গণও তাহাদের কার্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইত না। নিজেদের মধ্যে বিবাদের সময়ও ছাত্রগণ ছোরা প্রভৃতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ছাত্রগণের এবিধ উদ্ধত স্বভাব কেবল প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়েই দৃষ্ট হয় নাই, বেলগনা, সিয়েনা, ওরলিয়া প্রভৃতি স্থানের আদিবাসীরাও সমভাবে ছাত্রগণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইত। নিম্নলিখিত দোষগুলিও বহুপরিমাণে ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

- ১। জুয়াখেলা (এমন কি গির্জা ঘর পর্যন্ত)
- ২। নানা প্রকার মাদক দ্রব্য পান।
- ৩। মাতাল হইয়া রাজপথে বাহির হওয়া।
- ৪। কুস্থানে ভ্রমণ। ইত্যাদি।

বর্তমান সময়ের ছাত্রগণের মার্জিত আয়োদ-প্রমোদ তৎকালীন ছাত্রদিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সময় ও ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আয়োদ-প্রমোদ সকল এখন অসম্ভ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। ক্রিকেট, টেনিস, অথবা ফুটবল খেলিয়া তাহারা আয়োদ করিতে জানিত না। মত্তপানই তাহাদের প্রধান আয়োদ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণও এবিষয়ে ছাত্রদিগের সাহায্যকারী ছিলেন। মধ্যযুগের শেষ ভাগে যখন প্রধান প্রধান

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রভোগিতার ভাব প্রবেশ করিল তখন দেখিতে পাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ ছাত্রদিগকে ভুগাইয়া আনিবার জন্য বিজ্ঞাপন বিলাইয়া বেড়াইতেন। * মদ্যপান ব্যতীত আরও নানা প্রকার আয়োদ-প্রমোদে তাহারা সময় কাটাইত। সময় সময় দ্বিতল হইতে গোবর মিশ্রিত জল অথবা আলকাতরা রাজপথের লোকদের উপর নিক্ষেপ করতঃ তাহাদের অদ্ভুত ভাবভঙ্গী দর্শনে অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিত। পণ্ডিতীড়াও তাহাদের এক প্রধান আয়োদের মধ্যে গণ্য হইত।

এইরূপে অসভ্য আয়োদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া মধ্য-যুগের ছাত্রজীবনের ইতিহাসে এক দিকে যেমন অস্বস্তি রীতিনীতির প্রচলন দৃষ্ট হয় অত্র দিকে তেমনই আবার তীব্র জ্ঞানপিপাসার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থ, বিবাহ, এমন কি জননীর মৃত্যুসংবাদও ছাত্রদিগকে জ্ঞানের গভীর সাধনা হইতে টলাইতে পারে নাই। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে সমুজ্জ্বল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমন দৃশ্য করটি মিলিবে জানি না।

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

উইক্সনস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়,
মেডিসন্‌।

প্রাচীন জাপান

হইয়ান্‌ বংশের রাজত্বকাল

(খৃঃ ৭৮২—১১৫৫)

এই যুগে রাজদরবারে ফুজিওয়ারা বংশের প্রাধান্য ও অক্ষর প্রতাপ ছিল। মিচিনাগা ফুজিওয়ারার চার কন্যা সম্রাজ্ঞী ও এক কন্যা রাজপুত্র হইয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যে তাঁহার দোঁদড়িও প্রতাপ ছিল, তিনি যা' খুসি তাহাই করিতে

Here only the students can get wine and women profusely.

১। They quarrel among themselves over dogs, women, or what not, sleashing off one another's fingers with their swords or, with only knives in their hands and nothing to protect their tonsured parts, rush into the conflicts from which armed knights would hold back..... Some of the attacks are planned in advance at organized meetings of students.

পারিতেন। চার সম্রাটের এই ঠাকুরদাটি নিজ মহেশ্বর
ব্যাখ্যা করিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন।

“নিখিল ভুবন মম করতলে

(কোনো) অভাবের কথা জানি না।

বেন গগন মাঝারে পূর্ণচন্দ্র ;

(কত) কা'রো কথা আমি মানি না।”

দেশের কোথাও যুদ্ধবিগ্রহ গুণগোল না থাকায় পুরুষ-
গুলো আমোদপ্রিয় ও ভ্রষ্টচরিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। ৭৯৪
খৃষ্টাব্দে সম্রাট কাম্মু হেইয়ান বা কিত্তো সহরে রাজধানী
স্থানান্তরিত করেন। ‘য়েটোরেনসন’ পর্যন্ত পরবর্তী ১০৭৫
বৎসর এখানেই সম্রাটেরা বাস করিয়াছিলেন। নূতন
রাজধানীটি অতি স্বচাক্ষুরূপে নির্মিত হইয়াছিল। রাস্তাগুলি
পরস্পর সমকোণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিল। সহরের
উত্তরাংশে রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদটি দক্ষিণমুখে। উহার
চারি দিকে গভর্ণমেন্ট আপিস ও কর্মচারীদের থাকিবার
স্থান। সহরে সর্বত্র পায় ১২১৬টি রাস্তা ও ৩৮৯২টি
বাটী ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে সহরটি বিভক্ত,
দোকানপাশার উভয় অংশেই ছিল। মাসের প্রথমার্ধে
পূর্ব অংশে ও শেষার্ধে পশ্চিমাংশে হাট বসিত। পণের
ধারে ‘চেরি’ ও দেবদারু গাছ রোপিত হইয়াছিল। বেড়া-
ইবার জন্ত সহরে অনেক নয়নাভিরাম হ্রদের স্থান ছিল।
নানা স্থানে হ্রদের হ্রদের মন্দির, দূর দেশ হইতে পূজার্থীরা
এই সব মন্দিরে পূজা করিতে আসিতেন। রাস্তায় লোকের
তিড়, কচিং কখনো একখানা গো-শকট মুহুমন্দ গতিতে
অগ্রসর হইতেছে, কোথাও ফেরিওয়ালীরা সারি দিয়া ঝুড়ি
মাথায় চলিয়াছে। ক্রমশঃ পশ্চিমের সহরটির অবনতি এবং
পূর্বের সহরটির উন্নতি হইতে লাগিল। শাসন কার্য চারি-
দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। দেশে অরাজকতা
দেখা দিল; সীমান্তপ্রদেশগুলো হাড-হাড়া হইয়া বাইতে
লাগিল; বড় বড় ব্যাণ্ণদের সামুরাই অস্থচরেরা পদস্থ
নাগরিকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে
মদ্য ও শস্তাদির কর আদায় করিতে লাগিল। সিংধেল
চোরের প্রাচুর্য্যে নাগরিকেরা অস্থির হইয়া উঠিল, রাস্তা-

ঘাটেও চলাফেরা দায় হইল। ৮১০ খৃষ্টাব্দে নগর রক্ষার
জন্ত পুগোশের সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু তাহার বৈ কাৰ্য্য
করিতে অপারগ এক্ষণ তাহা সম্ভব হইয়া গেল। দূর
প্রদেশ হইতে রাজকোষে রাজস্ব আসা বন্ধ হইল। অর্থাভাবে
সরকারি বাটীগুলির সংস্কার হয় না। অতুচ্চ গৃহমহি
ঘটিতে লাগিল, রাজপ্রাসাদেই একাধিক বার অগ্নি সংঘট
হইল। ৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি স্থান হইতে কারাগার
তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ৮৬০ খৃষ্টাব্দে ফুজি পর্বতের
অগ্ন্যাংগাতে আবিগার পর্বত-পথ নষ্ট হইয়া গেলে পূর্ব ও
পশ্চিমের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্ত হাবোনে পার্বত্য-
পথ উন্মুক্ত হইল। একেই ত ভ্রমণে নানা অসুবিধা তাহাতে
আবার জলে স্থলে দহাব ভয়। দেশে একমাত্র সমুদ্র বন্দর
ছিল নানিওয়া বা ওসাকা। সেখানে অবিরাম লোকজনের
আনাগোনা হইত।

এ যুগে বৌদ্ধ ও শিন্তো ধর্ম উভয়ই লোকপিয় হইয়া
উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ পুরোহিতের সমস্ত-বিদ্যা শিখিতেন
ও বুদ্ধকে তাঁহার শত্রুগণ হইতে রক্ষা করিবার অছিলায়
অস্ত্রশস্ত্র বহন করিতেন। ক্রমশঃ এই পুরোহিতেরা
পোরোহিতা বিসর্জন দিয়া অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইল,
তাহাদিগকে বশে রাখা সম্রাটেরও অসাধ্য হইল।

বিবাহ ও উত্তরাধিকারের নিয়মগুলি ক্রমে শিথিল
হইয়া গেল। পিতা অস্ত্র পুত্রগণকে বাদ দিয়া শ্রিয়
পুত্রকেই সমস্ত সম্পত্তির মালিক করিতে লাগিলেন,
কখনো বা পুত্রের পরিবর্তে ভ্রাতা বা রক্ষিতার গর্ভজাত
পুত্রকে স্বীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিতে লাগিলেন।
মৃত্যুর পর আত্মার শান্তির জন্ত কেহ কেহ সমস্ত সম্পত্তি
বৌদ্ধ মন্দিরে অর্পণ করিতেন। পিতামাতার অমৃত্যু
ব্যতিরেকেই বিবাহ হইতে লাগিল।

কৃষিকার্য্যে বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ৭৯৯ খৃষ্টাব্দে
একখানি তুলা বোঝাই ভারতীয় পোত ঝটিফাবেগে
তাড়িত হইয়া মিকাওয়ার তীরে আসিয়া সংলগ্ন হয়।
ইহা হইতেই জাপানী কার্পাস চাষের উৎপত্তি। ৮১৫
খৃষ্টাব্দে ‘চা’র চাষের আরম্ভ। ৮২২ খৃষ্টাব্দে রায়ও

রোমিনিরো যোতশালিত বহু আবিষ্কার করিলেন ও ক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য উহা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট নিন্মেই প্রজাবর্গকে গোধুম, শিমু, জনার প্রভৃতির চাষ করিতে অহরোধ করিয়া এক ইস্তাহার জারি করিলেন।

বিভিন্ন শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। ওমরাহদের অবস্থা বৃদ্ধল, অর্থও অনেক, সেই হেতু নানা প্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের প্রচুর কাটতি হইত। তাহাদের বসতবাটীগুলি সুসজ্জিত করিবার জন্যও নানা প্রকার সৌখীন জব্যের একোজন এবং সেই সব সৌখীন দ্রব্য নির্মাণ করিবার জন্য হৃদয় শিল্পীর উদ্ভব হইয়াছিল। 'পরসীলেন' বা চীনা মাটির দ্রব্যাদির উপর 'এনামেল'-কোশল উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানাগুলি ইজুনি, ওয়ারি, মিকাওয়া ও বিজেন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্য ল্যাকার, বিহুক প্রভৃতি প্রসাধন-শিল্পে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত; তাহাদের দীপ্তি বাটীর অভ্যন্তরভাগ সমুচ্ছল করিয়া রাখিত। এমন কি গাড়ী, টুপি এবং উদ্রলোকদের কোর্টার হাতার উপরও কখন কখন ল্যাকারের কাজ করা থাকিত।

এই সময়ে যে সকল চিত্রকরের অভ্যাস হইয়াছিল তন্মধ্যে কুদারা কাওয়ানারি ও কোসেকানাওকা সর্বশ্রেষ্ঠ।

সম্রাট কান্মুর পরবর্তী সম্রাটগণের উৎসাহে বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছিল—ঠাহারা বাণিজ্যের স্ববিধার জন্য নূতন নূতন পল, পোত ও গাড়ী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। টাকশালে টাকা প্রস্তুত হইত এবং জনসমূহের মধ্যে উহা প্রচলিত করিবার চেষ্টাও হইত, কিন্তু তাহার টাকা ব্যবহারে অনন্ত্যন্ত থাকার উৎপন্ন শতাব্দির অংশ করূপে প্রদান করিত।

কর্তৃপক্ষের দৌর্জল্যে নানা দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছিল। পশ্চিমের প্রায়ই দহাহন্তে সর্বত্র দারাইত। ইসে প্রদেশে হুজুকা পাহাড়ে প্রায় ৭০-৮০ জন বিখ্যাত ডাকাত বাস করিত। সমুদ্রেও জলদস্যুর অভাব ছিল না, সেই হেতু দেশে বিদেশে ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিতে লাগিল।

কয়েক জন মাত্র জুসাহসিক ব্যবসায়ী কোরিয়া ও চীনে বাণিজ্যযাত্রা করিয়া সেখান হইতে নানা প্রকার বহুমূল্য পদার্থ লইয়া আসিত ও অমিতব্যয়ী অভিজাতদিগের নিকট বিক্রয় করিত। পশ্চিমে হাকাতা ও রাজধানীর অপেক্ষাকৃত সন্নিকটে নানিওয়া, কানজাকি, এডুচি, কাওয়াকিতা ও ওংহ এইগুলিই তখনকার দিনে সমৃদ্ধ বন্দর ছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম উত্তরোত্তর জনসমূহের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া নিম্ন স্তরের লোকদের মধ্যে গিয়া পৌছিল। তেঙ্কাই ও যিকোন্, এই দুই ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সাইচো ও কুকাই উভয়েই বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম ব্যক্তি এন্যাকুজি নামক বৃহৎ মঠ ও শৈবোক্ত ব্যক্তি কোক্সান্ পাহাড়ের উপরকার সুবিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পুরোহিতেরা শাস্ত্র পাঠ, শাস্ত্র নকল, নূতন মন্দির নির্মাণ ও পবিত্র মূর্তি পূজা করা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করিত না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সহস্র দিবসব্যাপী সংযমের ব্রত গ্রহণ করিত, কেহ বা ষাটশ বৎসরের জন্য গুহাবাসী হইত। কোনো ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিত!

অভিজাতগণ, বিশেষতঃ কুজিওয়ারা বংশ বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ অমুরাগী ছিলেন ও অর্থ ও ভূসম্পত্তি দানে ইহাতে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্রাট যিরাকাওয়ার বৌদ্ধ ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি ঠাহার প্রজাবর্গকে জীব-হিংসা হইতে একেবারে বিরত হইতে আদেশ দিয়া ছিলেন। তিনি ৮৮০০ জাল নষ্ট করিয়াছিলেন, সমস্ত শিকারী বাজপাখী ও অন্যান্য খাঁটার পোরা পাখী মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট হোবা আর এক জন মহাবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হুপ্রসিদ্ধ ছয়-মন্দির নির্মাণ করান। 'কুরো' বা পিতৃলোকের উদ্দেশে আহাৰ্য্য প্রদানের যজ্ঞে বহু অর্থ ব্যয়িত হইত। যে যজ্ঞে বত পুরোহিত নিযুক্ত থাকিত তাহা ততই কলোৎপাদক গিয়া বিবেচিত হইত। এক শত পুরোহিতের নিয়োগ কিছুই অসাধারণ কথা ছিল না। সম্রাট হুরাকুর এক সন্ত ও সম্রাট

মুরাকামির দশ সংস্করণ পুরোহিত ছিল! পুরোহিতেরা যে কেবল অস্ত্রোষ্টি-ক্রিয়ার বোগ দান করিত এমন নয়, পীড়িতের শয্যা-পার্শ্বেও শাস্ত্র পাঠ ও প্রার্থনা করিবার জন্ত তাহাদের তলব পড়িত। অভিনন্দন ও আনন্দ-সভাতেও তাহাদের গতিবিধি ছিল। কোনো উচ্চবংশীয় ব্যক্তির বয়স চল্লিশ হইলে চল্লিশটি মন্দিরে পূজা দেওয়া হইত, ষাট বৎসর হইলে ষাটটি মন্দিরে পূজা দেওয়া হইত! স্বকৃত পাপ কার্যের পরিণাম হইতে মুক্ত হইবার জন্ত, কখনো বা পরিবার-বর্গের মঙ্গলের জন্ত লোকে সংসার ত্যাগ করিয়া পোরোহিত্য গ্রহণ করিত। কয়েক জন সম্রাট্ এইরূপে সম্রাসী হইয়াছিলেন। ভূ-কম্প, ধুমকেতুর আবির্ভাব, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, এ রূপ কোন কিছু অসাধারণ ঘটনা ঘটিলেই পুরোহিতকে প্রার্থনার জন্ত অমুরোধ করা হইত। যুদ্ধে জয়লাভ বা বিজ্ঞোহ প্রশমিত হইলে সর্বোপায়ে পুরোহিত-দিগকে তাহাদের প্রার্থনার জন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইত; পরে ধন্যবাদ দেওয়া হইত সৈন্তগণকে,—তাহারা ত কেবল যুদ্ধ করিয়াছে মাত্র!

ভবিষ্যদ্বাচন, কুসংস্কার, সম্রোহন বিদ্যা প্রভৃতির অভাব ছিল না; তদুপরি ছিল স্বপ্ন দর্শন পূর্বক অনুমান করা। অনেক জীলোক এই ব্যবসায় অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ করিত। লোকের বিশ্বাস ছিল, অস্ত্রের নিকট রুইতে সুস্বপ্ন ক্রম করিয়া লইলে ক্রমকারীই স্বপ্নদর্শিত উপকার লাভ করে!

পূর্ববর্তী যুগে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দেখিয়াছি। এ যুগে সম্রাস্ত ব্যক্তির তাহাদের পুত্র, ভ্রাতা, ও আত্মীয়দের শিক্ষার জন্ত অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজধানীর ধ্বংসের সহিত এগুলি লোপ পাইয়াছিল।

জীলোকেরা নিভূতে বাস করিত। স্ব স্ব পরিবারের বাহিরে নিজদের কর্তব্য-স্বর ও অস্ত্রের কর্ণগোচর হওয়া তাহারা লজ্জার বিষয় মনে করিত! বাহিরে বাইবার সময় তাহারা রুদ্ধদ্বার একটে আরোহণ করিয়া বা অবগুষ্ঠণে মুখ ঢাকিয়া বাইত। কোন পুরুষের সহিত কথা কহিতে হইলে উচ্চবংশীয় জীলোকেরা পরিচারিকাকে দিয়া কথা কওয়াই-তেন। পুরুষটি পরিচিত হইলে পর্দার অন্তরালে দাঁড়াইয়া

নিজেরাই কথা কহিতেন। একাধি পুরুষটির সম্মুখে আসিতে হইলে মুখখানি পাখার ঢাকিয়া মুখ স্বরে কথা কহিতেন।

স্বরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থ সমালোচনা।

৩৩। হেরম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহোদয় কর্তৃক লিখিত সচিত্র ভূমিকা সমেত। গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যাহুশীলনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। ডিফাইন্ড পেজী, ছাপা এবং পুস্তকের বহিরাঙ্কিত মন্দ নয়। ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সমেত ৭৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। দণ্ডবিধি পুঁথিখানির অধিকারী হেরম্বরাজমন্ত্রিবংশজ শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র দেব লঙ্কর মহাশয়। ভূমিকাটি ১৩ খানি চিত্র সম্বলিত তিন ভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগে প্রাপ্ত পুঁথিখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, দ্বিতীয় অংশে হেরম্ব রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। পাঠক সাধারণের বুঝিবার জন্ত এই ঐতিহাসিক অংশটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কাছাড় প্রদেশের নাম, তাম্রধ্বজ রাজার রাজত্বের সময়, কাছাড়ী রাজগণের হিন্দুধর্ম গ্রহণের কাল, প্রভৃতি কয়েকটা ক্ষুদ্র ২ বিষয়ে গেইট সাহেব হইতে বিভিন্ন মতের পোষকতার পদ্মনাথ বাবুর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমিকার তৃতীয় অংশে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দেব লঙ্কর মহাশয়ের পরিবারের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মূল পুস্তকের সঙ্গে ভূমিকার এই অংশটির কোনও বিশেষ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হইক মোটের উপর ভূমিকাটি বেশ সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ।

মূল দণ্ডবিধি পুস্তক ৩০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা স্মৃতি ও সংহিতা গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। ব্রাহ্মণের প্রতি সামান্ত ক্রটি প্রদর্শনের জন্তও শূদ্রের প্রাণদণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা, অথচ ব্রাহ্মণের একেবারে সাত খুন মাপ! মন্তক মুণ্ডন পূর্বক নির্কাসনই ব্রাহ্মণের

চন্দ্র দত্ত। ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও বিশেষ বিধি দ্বারা সংরক্ষিত ; গোবিন্দচন্দ্রের দণ্ডবিধিতে সংস্থান প্রণালী থাকিলেও (যথা প্রতি প্রকরণের পূর্বে একটি ভূমিকা এবং সংস্কৃতির পার্শ্বেই বঙ্গভাষ্য) সংহিতার দোষগুণ সমস্তই ইহাতে বর্তমান। সংহিতার ন্যায় ইহাতেও সামান্ত বিষয় বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং অনাবশ্যক শ্রেণীকৃত করা হইয়াছে — যমন গবাদি পশুদ্বারা গুপ্ত নাশ বিষয়, অসাধু দোকানদারের বিষয় ইত্যাদি ; এবং বর্ণ সম্পর্কীয় অপরাধ ব্যতীত ও অনেক সামান্ত অপরাধে গুরুত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যথা আক্রমণ কারী কুকুরের অপ্রতিবেদ্য কারী প্রভুর প্রতি।

যদিও এই বিধি সকল প্রায়শঃ প্রাচীন স্মৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি এই দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত অপরাধের দণ্ডবিধান আলোচনা করিলে তখনকার সামাজিক অবস্থার সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা জন্মে। উত্তম পুরুষকে হরণ করিলে প্রাণদণ্ড এবং অধম পুরুষকে হরণ করিলে সত্ৰ পন (আধুনিক প্রায় ১৬ টাকা) দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। উক্ত শ্রেণীর মধ্যে মত্তপান “দুষণীয়” বলিয়া গণ্য হইত। খামী জীকে, পিতা পুত্রকে, ভ্রাতৃ ভ্রাতাকে, শারীরিক দণ্ড বিধান করিতে পারিলেও, শাস্তি গুরুতর হইলে দণ্ডনীয় হইত। পিতামাতার প্রতি পুত্রের, জীবর প্রতি স্বামীর, এবং স্বামীর প্রতি জীবর কর্তব্য অবহেলা করিলে দণ্ড হইত। গর্ভবতী জীলোকের উপর কোনও শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সমাজে জীজাতি বিশেষ অসম্মানের ভাজন ছিল না। প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে ১০০ এক শত সূবর্ণ দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। ব্যবসায়ীগণ সর্বদা সাধু ছিল না। খাজ ডব্বোর মধ্যে একমাত্র মাংস দেখা যায়। অধম ধাতুকে স্বর্ণের দ্বারা আকৃতি করিয়া প্রভারণা করার উল্লেখ দেখা যায়। সমাজে কুসংস্কারও যথেষ্ট ছিল। স্তম্ভন, বশীকরণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস ছিল এবং এই সকলের জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

গোবিন্দচন্দ্রের দণ্ডবিধি পুঁথির তাবা প্রায় আধুনিক

বঙ্গালা ভাষায়ই মত। ঐতিহাসিক হিসাবে পরিশিষ্টে প্রদত্ত পুঁথিখানির মূল্যও কম নহে। ইহাতে ক পুঁথি হইতে অতিরিক্ত যে সকল অংশ আছে, তাহার ছাপার একটু বিশেষত্ব থাকিলে পাঠকগণের পক্ষে সুবিধা হইত। দণ্ডের নথ্যে অর্থ দণ্ড, অস্ত্রদণ্ড, ও প্রাণদণ্ড ছিল, কারাদণ্ডের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৩৪। মন বুলবুল—শ্রীযুক্ত স্বামীলমণী সরকার প্রণীত। ইহা একখানি গীতিকাব্য। গ্রন্থের উৎসর্গ কবিতাটিতেই লেখিকার মাতৃহৃদয়ের করুণা-উৎস উৎসারিত দেখিতে পাই, এবং বহু কবিতার ভিতর দিয়া ভগবন্তকির একটি পবিত্র স্বর ধ্বনিত হইতেছে।

কাব্যখানি সমগ্র পাঠ করিলে কবিত্ব অপেক্ষা ইহাি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য হয় যে, কেমন করিয়া একটি রমণী-হৃদয় সংসারের অসহ্য হৃৎকষ্টের ভিতর দিয়া কেবল মাত্র ঈশ্বর-নিষ্ঠায় বলে ক্রমপ রগতিলাভ করিয়াছে।

গ্রন্থের বহু স্থলেই লেখিকার বিদ্যামাখা আত্মকাহিনী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ক্রমে এখন তিনি তাঁহার শোকসন্তপ্তহৃদয়ে শান্তির আশ্বাদ পাইয়াছেন, এবং সদগুরুর কৃপায় বুঝিতে পারিয়াছেন “অব্যক্ত অচিন্ত্য, ব্যক্ত আপন আত্মায়, কোথায় খুজিব তথা? রাস্তা হিমায়; আবরণ উন্মোচনে জীবাশ্মার ক্ষয়, পরমাত্মা নিত্যানন্দে মোক্ষ লাভ হয়।”

গ্রন্থকর্ত্রীর এই প্রথম রচনা। তাঁহার পরিপক্ব হস্তের হৃদয়তর কবিতা পাঠ করিবার জন্য ঐৎহ্যকা রহিল।

ত্রিযোঃ—

প্রতিভা

২২ নবম

মাঘ ১৩১৯

১০ম সংখ্যা

ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি

(১)

আপানের শিল্প-ঐতিহাসিক ওকাকুরা তাঁহার 'প্রাচ্য-শিল্পের আদর্শ' নামক গ্রন্থের শুরুতেই এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন যে, Asia is one. শিল্প দার্শনিক যদিও কথ্যটাকে সফল দিক হইতে বিচারপূর্বক গম্য করিতে চাহেন নাই, তথাপি, শোনানারাই প্রত্যেক এসিয়া-বাসীর হৃদয়ে এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইতে থাকে। এসিয়ার সমাজসাহিত্য এবং শিল্পের মধ্যে এমন একটা 'একতা' আছে যে, বর্তমান ইয়োরোপের সঙ্গে উহার নিদান-পার্থক্যটাও দৃষ্টিমাত্রেই উপলব্ধি হইবে। এসিয়ার তিনটি জনপদে প্রকৃত সাহিত্যের বিকাশ বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে—ভারতবর্ষ, চীন ও পারস্য। প্রাচীন এসিয়ার ককেশীয় এবং মঙ্গোলীয় সভ্যতা বেন হাতে-হাতে ধরিয়া, পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই চলিতেছিল। উত্তর সভ্যতার মধ্যে যে একটা ভাবের আদানপ্রদান ছিল; প্রাচীন পৃথিবীর আব হাওয়ার সঙ্গে উভয়েই যে সমন্বয়ে জীবন সাধনা করিয়া

অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ জন্মে না। ভারতবর্ষে একাদ্রবর্তী পরিবার, গোষ্ঠী, গ্রাম-সমাজ এবং সাম্প্রদায়িকতার আদর্শ কেমন প্রবল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। চীনবাসী মনুষ্য-সমাজেও পরিবারের অখণ্ড-স্বরূপটাই মুখ্যতা লাভ করিয়াছে। পারস্য কিংবা আরবও এই পরিবার-ধর্ম ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গতিকে এই তিন দেশের সাহিত্য সভ্যতার মধ্যেই ন্যূনাধিক সর্বত্র সম্বন্ধ পরিলক্ষিত। চীনে অতি প্রাচীন কাল হইতেই রাজ্যধীন রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে নির্দোষ-প্রথা এবং প্রতিযোগী সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার পদ্ধতি প্রবল থাকায়, তাহার সমাজ-মধ্যে ভারতবর্ষের ত্রায় জাতিভেদ পরিষ্কৃত হইতে কিংবা প্রবল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু ভারতীয় আর্ধ্য-সমূহের পিতৃ-তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ প্রথা বরং আরও অগ্রসর হইয়া পিতৃ-পূজায় পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ত্রায় জাতিভেদ কিংবা পরিবারের স্বার্থ রক্ষা-কালে, জীজাতির মুখে অবশুষ্ঠন দেওয়া হয় নাই সত্য, কিন্তু পায়ে বেড়ী জড়াইয়া তাহাদিগকে প্রকারান্তরে অকর্মণ্য করা হইয়াছে। আরব-পারস্যে এমন কি জীক জাতির মধ্যেও (পরিবার-তন্ত্রকে অটুট রাখিবার জন্তই) জীশক্তিকে সঙ্কুচিত করিবার নানা চেষ্টা চলিয়াছিল। মনুষ্যের প্রাচীন সভ্যতা পরিবারকেই সামাজিক 'ব্যক্তি' রূপে স্থির রাখিতে চাহিয়াছিল; তাই সর্বত্র জীজাতির নিয়ন্ত্রণ-ক্রমেই সাম্য

(১) এই এবং 'বাণী পহার' 'সাহিত্য-আজার অভিযান্ত্রিক' নামক বিভিন্ন অধ্যায়ের অন্তর্গত। লেখক—

রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে; ব্যক্তি স্বত্বকেও (individualism) কুতূপি প্রকাশ্য আমল দিতে চাহে নাই। এই স্থান হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন পন্থার আরম্ভ। ব্যক্তি-স্বত্ব বা সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা নামক কথাগুলি আধুনিক সমাজ-আদর্শের হৃদয়-মন্ত্র। বর্তমানের ইরোপ এই মন্ত্রের পরিপোষণ উদ্দেশ্য করিয়াই সর্বত্র প্রাচীন পরিবার, গোত্র, বা গ্রামসমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ভগ্ন করিতেছে, জাতিভেদ অপ্রতিষ্ঠ করিতেছে; ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পোষণ করিয়া জীজ্ঞাতির অবশুষ্ঠন কিংবা পারের শৃঙ্খলও উড়াইয়া দিতেছে। প্রাচীন এবং আধুনিক সমাজ-আদর্শের মূল মন্ত্র এবং ক্রিয়া-প্রণালীর পার্থক্য জ্ঞাষণ না হইলে, প্রাচীন বা আধুনিক সাহিত্য কোনটারই মূল-বর্ণটুকু হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

চীনে এই পরিবার-নীতি অবলম্বন করিয়াই বিপুল সাহিত্যের উদ্ভব। পরিবার-নীতি এবং পরিবারের স্থিতি-রক্ষাই চীনের প্রধান 'ধর্ম'। সুতরাং, চীনে ধর্ম এবং সমাজ-নীতি একরূপ অভিন্ন হইয়া, একই ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, ধর্মসাহিত্য পৌরাণিক সাহিত্য বা লোক সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল। সর্বত্র পরিবারকেই সমাজের ব্যক্তি বলিয়া আদর্শ রাখার দরুণ, চৈন সাহিত্যে যেমন প্রকৃত ব্যক্তি-চরিত্রও কোন বিশেষ জটিলতা বা প্রগাঢ়তা লাভে অভিযুক্ত হইতে পারে নাই, তেমন ঐ সাহিত্য এসিয়ার বিপুল নিসর্গ-প্রকৃতির সহানুভবী হইয়া নিসর্গ-সৌন্দর্য এবং নিসর্গগত শাস্তি সাধনার আদর্শেই সমধিক বিলসিত হইয়াছে; এই ক্ষেত্রে, সংস্কৃত সাহিত্যের সমধর্মী হইয়াছে। অন্তর্দিকে চীন সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের 'ইতিহাস' কাব্যের বা মহাকাব্যের একটা দৃষ্টান্তও নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইরূপ একটা যুগ-যুগান্তরজীবী মহাজাতির সাহিত্য-মধ্যে, ভারতীয় প্রাচীন আৰ্য সমাজের 'মহাকাব্য' বা মহাপুরুষনিষ্ঠ বিবরণ গাথার একটা দৃষ্টান্তও মিলিতেছে না।

কিন্তু নাটকের সংখ্যা অগণ্য! অতিরিক্ত পরিবার-নিষ্ঠতার দরুণই এই অভাব ঘটিয়া থাকিবে। এদিকে পারস্যেও

মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত (তাহাও দশম শতাব্দীর পরবর্তী*) তুরি তুরি; কিন্তু প্রকৃত নাটক-একটিও নাই। বুদ্ধ-পূর্ববর্তী আৰ্য্যযুগে যেমন মহাপুরুষনিষ্ঠা প্রবল থাকিয়া মহাকাব্য-গঠন সম্ভব করিয়াছিল, তেমন, বুদ্ধ-পবেত্তী সংস্কৃত সাহিত্যেও কিয়ৎকাল, ব্যক্তি-চরিত্রের বিশিষ্টতা এবং সমাজ-চরিত্রের উদ্দেশ্য রাখিয়া কয়েকখানি নাটক রচিত হইতে পারিয়াছিল। উভয়ই নানা দিকে ভারতবর্ষের পরিবার-নিষ্ঠ কিংবা গ্রাম-সমাজনিষ্ঠ ধর্ম-আদর্শের বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই ধারণা হইবে। অন্ততঃ ঐ সময়ে ভারতীয় আৰ্য্য হৃদয়ের সহজ মনুষ্যত্বগতি কোন প্রবল বুদ্ধি অধিকৃত আদর্শের দ্বারা তখনও নির্জিত হয় নাই, বলিয়াই ধারণা হইবে। ভারতের নাটকগুলি চীন-নাটকের সংখ্যার তুলনায় স্বল্প হইলেও, শির-সামর্থ্যের গরিষ্ঠতা এবং প্রগাঢ়-অর্থ উৎসাহ বিধ-বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। তথাপি, স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন কারণে ভারতীয় সমাজেও নাট্য সাহিত্য পরিব্যাপ্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

যাহা হউক, আমরা দেখিতেছি যে, এসিয়ার প্রাচীন সাহিত্য-মধ্যে, ভারতীয় সাহিত্যই মহাকাব্য, নাটকে এবং ঋণকাব্যেও সমধিক সর্বাঙ্গীনতা এবং পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। এই দেশের প্রাচীন সমাজ-বন্ধে সহজ 'হৃদয়'-আদর্শের, বিশেষতঃ বৌদ্ধ আদর্শের প্রভাব গতিকেই সাহিত্য বিকাশের এই সর্বতো-ভদ্র ভাব-গতি সম্ভব হইয়াছিল—সংখ্যায় স্বল্প হইলেও সাহিত্যের এই অতুলনীয় মাহাত্ম্য তখনও ভারতের পক্ষে সম্ভব ছিল। প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন সমাজ-গতির সহিত অপরিভাষ্যভাবে সম্বন্ধ। এসিয়ার সাহিত্য-মধ্যে ভারতীয় সাহিত্যের এই বিশেষত্বটুকু সকল সাহিত্য-চিন্তকের পক্ষেই বিস্তারিত ভাবে প্রণিধানের যোগ্য। অপিচ, এসিয়ার সমাজ সভ্যতা এবং সাহিত্যের হৃদয়গত এই একত্ব লক্ষ্য করিয়াই বলিতে পারা যায়, 'এসিয়া এক'! 'Asia is one'.

* দশম শতাব্দীর কেরদোগীই পারস্য সাহিত্যের পিতা বলিয়া উল্লিখিত। পারস্যে ইসলাম প্রভাবের পূর্ববর্তী সাহিত্যে কোন ভাবের অবহা-প্রব; উহা বেদের ভার যুক্ত বা গাথার সম্বন্ধে।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, ভারতীয় সাহিত্যে নাটক বল হইবার না উহার বিশেষ প্রােষ্ঠ না ঘটবার কারণ কি? সংস্কৃত সাহিত্যে নব জীবনের ঐ মহাহুতা তা দীর্ঘকাল এবং ব্যাপকভাবে স্থির ছিল কি? সংস্কৃত সাহিত্যে সাধীনতা বা বাক্তি-চরিত্র-চরণ প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্যের প্রশস্ত লক্ষণ-সমূহ ক্রমিক সমুজ্জ্বলতা লাভ করে নাই কেন? সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভাষা ক্রমে 'মৃত' হইয়া গেল কেন? বলা বাহুল্য, এই জাতীয় প্রশ্ন চিন্তা করিতে গেলেই আমরাদিগকে ভারতীয় সমাজের মূল প্রকৃতি এবং উহার ক্রম-বিকাশের দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ইতিপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সমন্বয়ে, সমাজগতির সমন্বয়ে, ভারতীয় সাহিত্য-গতির অনুসরণ করিলেই এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাইবে। সুতরাং বলিতে হইবে না যে, উহা ভারতীয় সমাজ এবং সাহিত্যের অধোগতির ইতিবৃত্ত। আমরা বর্তমানের হিতকল্পেই ঐ চিন্তায় অবতীত হইব।

সাহিত্যে মনুষ্য-মনকে মুক্তি দান করে। অতর্কিত জ্ঞানভাবের মানসরাজ্যে মনুষ্যের হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া, তাহার চৈতন্যব্যাপারকে অজ্ঞাত ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার জ্ঞান প্ররোচনা করিতে থাকে। এই কারণে আমরা দেখিয়াছি যে, মনুষ্যের সভ্যতাগতির অগ্রদূতগণ, অগ্রজগণ সকলেই নানাদিক কবিত্ব-শক্তি লইয়াই জন্মধারণ পূর্বক, এই সভ্যতাকে চিরকাল অগ্রিমপথে পরিচালিত করিয়া যান। এইরূপে, অজ্ঞাত ক্ষেত্রে সারস্বত পতাকা বহন করিয়া অগ্রবর্তী হওয়ার নামই সাহিত্যে কবিত্ব-শক্তি! বলা বাহুল্য, মনুষ্য এই অজ্ঞাত ভূমির কোন সীমা ঠিকানা আবিষ্কার করিতে পারে নাই, কদাচিৎ পারিবে ন। অত্ৰ দিকে মনুষ্যের ইচ্ছাশক্তি ও নবনব জ্ঞান এবং ভাব বহনকার সাধ্যোই চিরকাল সাহিত্যকে অগ্রসর করিতে থাকে। নবনব জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্য আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র মনুষ্য সাহিত্যের সাঙ্কোপাঙ্গনসহ তথায় অগ্রসর হইয়া পড়িতেছে। ইহারই নাম সাহিত্য এবং মনুষ্য-মনের পরম্পর সম্বন্ধ—বিৎ-প্রতিবিৎ সম্বন্ধ।

সংস্কৃত সাহিত্যে নবজাগ্রত ভারতীয় মনুষ্য-হৃদয়ের নবীন উৎসাহ-প্রবাহ আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। এই উৎসাহ অভিনব স্বাভাব্য-নিষ্ঠার প্রবাহিত হইয়া কিছুকাল সংস্কৃত সাহিত্যকে অতুলনীয় শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছিল; কিন্তু, এই অবস্থা দীর্ঘজীবী হইতে কিংবা ভারতের মনুষ্য-আত্মাকে স্থির সংকল্পে প্রসারিত করিতে পারে নাই। উহার উত্তর-ফল সকল দিকে প্রারম্ভের অনুরূপ হয় নাই। ভারতের মনুষ্য-মন ও তাহার সাহিত্য বিৎ-প্রতিবিৎভাবে অভ্যদয় সিদ্ধি পূর্বক ভারতের মনুষ্য-সভ্যতাকে নিজের পরমার্থে উপনীত করিতে পারে নাই। কিয়ৎকালের জীর্ণ উৎসাহ বিস্তারিত করিয়া, বিগহন নিষ্কর্ষতার অন্ধ-কারেই বিনীন হইয়াছে। কেন পারে নাই? আমরা মনে করি, ভারতের বিশেষ আদর্শ-নিষ্ঠ ধর্ম এবং সমাজ-সভ্যতার প্রবল প্রােষ্ঠাই উহার প্রধান হেতু! ভারতীয় নবসাহিত্য সভ্যতা বলীয়ান হইয়া তাহার সীমানিবদ্ধ ধর্ম কিংবা সমাজ-আদর্শের গভীরীমা অতিক্রম করিতে, স্বয়ং প্রসারিত হইতে, কিংবা এই সমস্তকেও প্রসারিত করিতে পারে নাই। তাহার সমাজ ধর্ম সাহিত্য কিংবা ভাষা সমস্তই কালে নিজের চলৎ-শক্তি এবং জীবৎ-শক্তিটাও অপরিহার্য্য ভাবে হারাইয়া স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

এই বিচারে অগ্রসর হইতে হইলে, পূর্ব পূর্ব প্রসঙ্গের বস্তুবিষয়গুলি আমরাদিগের স্মরণ করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, প্রাচীন আৰ্য্য জাতির ধর্মাদিকৃত সমাজ এবং সমাজাদিকৃত ধর্মের আদর্শ এবং উহাদের গৌণমুখ্য কল-গুলির বিষয়ে দৃষ্টি পরিচালিত করা আবশ্যক। আদিম আৰ্য্যজাতির ধর্মাদিকৃত সমাজ-আদর্শ গতিকেই, তাহার একাদিকৃত পরিবার এবং কুল-গোত্র পদ্ধতি হইতে ক্রমে ভারতবর্ষে পরম্পর হইতে স্বতন্ত্র অনন্ত জাতিভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতা উপজাত হইয়াছে। সারস্বত চর্চাও কতকগুলি বিশেষ সম্প্রদায়মধ্যে জন্মগতভাবে আবদ্ধ থাকার দরুণ, উহা সমগ্র জাতির মনোজীবন হইতে নিজের আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। দেশের সাধারণ-সমূহ বা কুলগোত্র-সমূহ হইতে বিচিত্রতার খাতি লাভ করে নাই।

এবল 'ধর্ম' আদর্শের গতিকেই চিরকাল ভিতরে ভিতরে সাহিত্য-আচারের মধ্যেও পৌরাণিকতার ঝাঁকটুকু এবল রাখিতে চাহিয়াছে, জন্মগত কজ্রিয়বৈশ্ব বা শূদ্রবোনির মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে বা পরিবার-আদর্শের বহির্ভূত ভাবে কোনরূপ স্বাতন্ত্র্যের পরিপোষণ করিতে চাহে নাই। ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য বা স্বাতন্ত্র্যকে চিরকাল চাপিয়া রাখিয়াছে, কোনরূপ কর্তৃত্ব-বুদ্ধি বা ইতিহাস-বুদ্ধিও এবল হইতে দেয় নাই। মনুষ্যজীবনকে পৌরাণিক ভাবুকতার আদর্শেই বেশীকম স্থিতিশীল রাখিতে সক্ষম হইয়াছে; সাধারণের মধ্যে উন্নত বা প্রসারিত সারস্বতশিক্ষা চিরকাল ব্যাহত রাখিয়াছে; 'সাধারণ' নামক কোন কথাকে কোন দিকে বিশেষ আমল দিতে চাহে নাই। ধর্মকেই মনুষ্যজীবনের মুখ্যপ্রাপ্তি এবং পরামর্শ ঘোষণা করিয়া, জন্মগত এবং সাম্প্রদায়িক-নির্দিষ্ট কর্তব্য-ব্যবসায়কে, অপচিৎ এইরূপ ব্যবসায়নিষ্ঠ কর্মশিক্ষাকেই প্রত্যেকের 'ধর্ম' বলিয়া খাপন করিয়াছে; এবং এইরূপ 'ধর্ম'ই প্রত্যেকের অপরিহার্য আধ্যাত্মিক পন্থা বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে। এই নির্দেশ পদে পদে সাম্প্রদায়িকগণ কর্তৃক অবহেলিত হইলেও উহার সত্যতা বা সারস্বত কোন কালে প্রকাশভাবে সংশয়াক্রান্ত হয় নাই। সমাজতন্ত্রের ব্যক্তিগত আদর্শের পোষণ করিতে গেলে, তাহার মধ্যে আপাততঃ যে বিরোধ, স্বার্থ-সংঘর্ষ এবং খেচ্ছাচারের উদ্ভব হয়, উহাতে স্থিতি-মাত্রই নিত্য নব নব ভাবে চঞ্চল হইতে থাকে, শাসক বা পরিচালক-পণের হৃদয় নিত্য নব নব সমস্যার আন্দোলিত হইতে থাকে। প্রাচীন সমাজ এই আন্দোলনটুকু সহ করিতে চিরকাল কুণ্ঠিত ছিল। তৎকালে সমাজ শাসক, রাষ্ট্রশাসক বা ধর্ম-পরিচালকের বিভিন্ন কর্তব্য এবং স্বরূপটুকু স্বতন্ত্রভাবে অভিব্যক্ত হইতে পারে নাই বলিয়াই এই কুণ্ঠা। মনুষ্য-সত্যতী ক্রমে বহুতর বিপদ-আপদ এবং কারকেশের মধ্য দিয়াই বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি

স্থিতি আদর্শের অবহেলাগতিকে অপরিহার্যভাবে অনন্ত সংকর বর্ণের উৎপত্তি হইলেও, প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমস্তকেই কোন-না-কোন প্রকারে চাহুবর্ণের আমলে আনিয়া, নানামতে জোড়াতাড়ি দিয়াই 'সনাতন স্থিতির' আদর্শ রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন।

বিতীর্ণতঃ, ভারতে সমাজাধিকৃত ধর্মের বিশেষ আদর্শ-গতিকে, জীজাতিকে চিরকাল পরিবার গোত্র এবং কুলের স্বার্থেই নিষ্পিষ্ট করা হইয়াছে। জীজাতির মধ্যেও কোনরূপ সাধারণ শিক্ষাকে, কিংবা পরিবার-স্বার্থ এবং সেবাধর্মের বহির্ভূত অন্য কোন রূপ শিক্ষাকে কোন কালে প্রকাশ্যতঃ আমল দেওয়া হয় নাই। পরিবারের এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থেই বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রচলিত করিয়া, বিধব-বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া, বৈধব্য 'ধর্ম', এমন কি সহমরণ পুণ্যস্ত সমর্থন করিয়া হইয়াছে। জীজাতির স্বাতন্ত্র্যকে খাটো করিবার উদ্দেশ্যে, পিতৃধনে এমন কি স্বামীর ধনেও তাহাকে কোন-রূপ প্রকৃত স্বাধিত্ব দেওয়া হয় নাই। বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াও পিতার বা স্বামীর সম্পত্তিতে প্রকৃত প্রভাব কেবল জীবন-স্বত্বমাত্র দেওয়া হইয়াছে। জীজাতির স্বাধীনতা বা সাধারণ শিক্ষা কোন মতে প্রবল হইলে, কেবল উন্নয়ন ফলেই যে পরিবার, গোত্র, কুলধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতা এক কালে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পড়িবে, (নানা-দিকে ষণার্থ) এই আশঙ্কার বশবর্তী হইয়াই উহার স্বাতন্ত্র্যকে এমন কি উহার 'মনুষ্যত্ব' দাবীটাকেও নানামতে নিষেধিত করার চেষ্টা হইয়াছে। জীজাতির পক্ষে সত্যত্ব এবং পাতিব্রত্যা ধর্ম, তাহার পতিসেবা এবং পরিবার-সেবারূপ ধর্মটুকু বাহাতে সর্কাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে, জীজাতির পক্ষে কোনরূপ ব্যক্তিচার বা স্বাতন্ত্র্য-কামনার বিরুদ্ধে বাহাতে সমাজমধ্যে বিজাতীয় দ্বন্দ্বা পরিপূর্ণ হইতে পারে, তাহার উদ্দেশ্যেই অসংখ্য আদর্শ-প্রতিমা এবং অনন্ত পুরাণ গাথার সৃষ্টি করিয়াছে।

সুতরাং ভারতীয় সমাজ এবং ধর্মের প্রধান লক্ষণ এক দিকে যেমন এই জাতিভেদ বা সাম্প্রদায়িকত্ব, অন্য দিকে তেমনি জীজাতির স্বাধীনতা। উভয়েই অপরূপে অস্তিত্ব

এখন একে-অন্যের হৃদয়-রক্তে অর্জিত অভিজ্ঞতা হইতেই লাভবান হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সমাজ এইরূপ অভিজ্ঞতার সন্ধানটা ঘটে নাই। কালে, ভারত-বন্ধে এই জাতিগত

জাতি মধ্যে হিন্দুদের বিশেষত্ব। উভয়েই তাহার সনাতন পরিবার এবং গোত্র প্রবীর অপরিহার্য্য ফল। এই ফল হইতেই হিন্দু সমাজের অন্য সকল বিশেষত্ব প্রসূত বলিয়া এক বাক্যে নির্দেশ করা যায়। মনে রাখিতে হইবে, উভয়ের কোনটাই প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম-আদর্শের ফল নহে; উহারা 'ধর্ম' আদর্শের সম্পর্কহীন, বরঞ্চ তদপেক্ষাও প্রাচীনতর প্রতিষ্ঠান হইতে উদ্ভূত হইয়া আসিয়াছে। হিন্দুর 'ধর্ম-কর্মের' বাবতীর বিধিনিষেধ বেদ—হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত—তাহার 'পরিবার' তত্ত্ব অপেক্ষা অধিক; বরং উহার প্রস্তাবেই কালে কালে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। সনাতন ধর্ম বলিতে ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিকতার পরিবারতত্ত্বীয় সমাজ আদর্শ বুঝাইলে ভুল হয় না। সমাজ-বিধিকেই ধর্ম নামের শীল-মুদ্রাঙ্কিত করিয়া পবিত্রতা এবং অচলতা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। গ্রাম-সমাজ তাহার সর্বাপেক্ষা বড় পাহারাদার। উহা জন্মমৃত্যু-বিবাহের সম্পর্কিত কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ বিধিনিষেধ অধিকার করিয়াই সকলকে 'মুষ্টির ভিতরে' রাখিয়াছে। গ্রামবাসী গৃহস্থের পক্ষে আত্মসমাজিক বা 'এফ ঘরে' হওয়া ঘটনাটিকে স্বীকৃতির অপেক্ষা ভয়বহ করিয়া তুলিয়াই এই পাঠ্য সমাধা করিতেছে; সুতরাং, বলিতে পারা যায়, উভয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই যেমন পুরুষজাতির, তেমন স্ত্রীজাতির অধীনত। উভয় দিক হইতেই মনুষ্যজাতি-মধ্যে এই জাতির পার্থক্য। সভ্যতাক্ষেত্রে তাহার সমস্ত দোষগুণ, স্থিতি-রীতি এবং মৃত্যু-জর্যাব্যতির নিদান! এই 'পরিবার'স্থান হইতে দৃষ্টি করিলেই ভারতবর্ষীয় সমাজ এবং ধর্মের সমস্ত বিশেষ তত্ত্বীয় প্রতিষ্ঠানের নিদান-বিষয়ে আলোকপাত হইবে। দুই দিকের কোন একটা ইট খসাইতে গেলেই হিন্দু আদর্শের সমস্ত এমারত ধূলিসাৎ হইতে পারে! আবার যেই পর্য্যন্ত এই দুই প্রতিষ্ঠান বর্তমান আছে সেই পর্য্যন্তই 'হিন্দু' অবিলম্বে আছে, অল্প কোন দিক হইতে এই প্রাচীনত্বের ছিন্ন লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। যুগযুগান্তর ধরিয়া, হিন্দু সমাজ এইরূপে স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতির অধীনতা সংঘটন করিয়া এই যে ভারতবর্ষের মাটি কামড়াইয়া কোন

মতে বাঁচিয়া আছে, অগতের গতিপ্রবাহে 'অচল' এবং 'সনাতন' হওয়াই আদর্শ করিয়াছে; তাহার সমস্ত পাপপাণ্ডা অবনতি এবং অধোগতির মূল কারণটুকুও যে এই স্থানেই নিহিত তাহা ধারণা করিতে না পারিলে, এই দেশের মনুষ্য অদৃষ্টের প্রধান তত্ত্বটাই অবজ্ঞাত থাকিবে।

এই স্থান হইতে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিব, সমাজতত্ত্ব-বিষয়ে বুদ্ধদেবের স্বাধীনতা এবং নির্দোষ আদর্শের ফলে এই সমাজের সাহিত্য-আত্মায় নব প্রাণের আবেগ ছুটিয়াছিল সভ্য, কিন্তু উহা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে কিংবা সমগ্র জাতিটাকে সাহিত্য-স্বাধীনতার আদর্শেও পরিবর্তিত ভাবে সচেতন করিতে পারে নাই। ভারতের ক্ষেত্রে সাধারণ, সাধারণ শিক্ষা, সাধারণের স্বার্থ, বা সাধারণ তত্ত্ব বলিয়া কথাগুলি কোন কালে প্রচলিত ছিল না। দেশমাতা দেশের স্বার্থ প্রতি কথায় ছিল না—থাকিতেই পারিত না। জন্মগত জাতি, গোত্র, কুল, সম্প্রদায়, গ্রাম-সমাজ এবং উহাদের রক্ষা-উদ্দিষ্ট ক্রিয়া-কর্মই প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুধর্ম। স্ত্রী-জাতিকে বাহ্যিক ভাবে ঘোমটা পরিতে হইলেও, পুরুষ মাত্রকেও অধ্যাত্মভাবে পরম্পর-সম্পর্কে ঘোমটাই পরিতে হইয়াছে। স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দেয় নাই বলিয়া উপরি উপরি দৃষ্টিতে দেখিলেই চলিবে না; তাহার পুরুষজাতির অন্তরাত্মাও যেমন পরিবারে তেমন গ্রামে এবং গ্রামের বাহিরেও অনন্ত দিক হইতেই সীমাবদ্ধ অশেষ অবগুণ্ঠনেই পরিবৃত্ত; এবং এই সীমা মানিয়া চলাটাই তাহার ধর্ম আদর্শের প্রধান নিষেধ লক্ষণ।

এই বিচারে আর একটু অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন তুলিতে পারা যায়, তবে উহার ধর্মের বিধিলক্ষণ কি? প্রকৃত্তরে এইমাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, প্রাচীন কালে ধর্ম-আদর্শের 'দশকর্ম'ই ছিল তাহার অপরিহার্য্য বিধি। এখন উহারা নানাদিকে সংক্ষিপ্ত হইয়া কেবল ত্রি-কর্ম (জন্মমৃত্যু ও বিবাহ কালীন ইষ্ট এবং পৈত্র কর্ম) পর্য্যবসিত। সুতরাং দেখা যাইবে, এই জাতির ধর্ম-আদর্শ কিম্বিবিষয়ে মনুষ্যকে নানা দিকে আপাততঃ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াও সমাজের দিক হইতে উহাকে অনন্ত নিগড়-পাশেই আবদ্ধ

রাখিয়াছে; যুগযুগান্ত কাল তাহাই প্রবল রাগিতে চাহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে এফট: পরম রহস্ত-তত্ত্বই পরিদৃষ্ট হইবে! ভারতের ধর্ম-সংস্কারক বা সমাজসংস্কারকগণ চিরকাল বিধিবিষয়েই সংস্কার লক্ষ্য করিয়াছেন। নিষেধের দিকটা আপাতদৃষ্টিতে এত অতর্কিত এবং অরক্ষিত যে, উহার দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করাটাও যেন দরকারী মনে করেন নাই। অথচ ঐ দিক হইতেই যুগযুগে সকল মহাপুরুষের সান্ত সংস্কারকার্য্য পণ্ড হইয়া গিয়াছে! জাতিভেদ বা সাম্প্রদায়িকতা বা জীজ্ঞাতির অধীনতাকে কেহই দৃষ্টত: বিবেচনাযোগ্য সংস্কার কার্য্য বলিয়া মনে করেন নাই। উহার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়াটাই যেন অসম্ভব ছিল! আমরা দেখিব, মনুষ্য-সভ্যতার প্রধান প্রাণ—‘উহার প্রধান রক্ষক নিয়ামক এবং পরিচালক—এই’ সাধারণ শিক্ষা। প্রাচীন কালে সাধারণ তত্ত্বের মাহাত্ম্য বিষয়ে মনুষ্যের দৃষ্টি সমাক্ষ পরিচালিত হওয়াই যেন অসম্ভব ছিল। অথচ, এই অরক্ষিত দিক হইতেই সনাতন গ্রাম-সমাজ এক অদৃশ্য এবং অভেদ্য পাবন-প্রাকার নির্মাণ করিয়াই সকল মহাপুরুষের সমস্ত সংস্কার-চেষ্টাই নূনান্দিক পণ্ড করিয়া আসিয়াছে। হিন্দু সমাজ সকল নূতন বিধিবাৎসর্য্যকেই সুবিধানভে ব্যাহত করিয়া, অথবা ‘রক্ষা’ করিয়া, অনন্ত সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে না হয় আর একটা সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। এই বাপার এখনও চলিতেছে।

এখন দেখিব, ভারতীয় সমাজের এই লক্ষণ এবং উহার বিশেষত্বের বর্ণ-প্রভাব হইতে ভারতীয় সাহিত্য কোন কালেই সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। বুদ্ধদেবের পর হইতে খ্রীষ্টোত্তর দশম শতাব্দী পর্য্যন্তই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃত বাহ্য-যুগ। এই সাহিত্য নাগরিকতার সম্পত্তি। ভারতবর্ষে গ্রামসমাজ হইতে কিরূপে নগর অভিব্যক্ত হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই নগর অনেক দিকে কেবল ঘনবিস্তৃত গ্রাম-সমাজ বই নহে। উজ্জয়িনী, কনোজ, কানৌর (কোশালী?) ও গৌড় ভারতের চারি দিক হইতে এই চারিটা নগরই এই কালের সংস্কৃত সাহিত্যের

প্রধান ধাত্রী; সুতরাং এই সাহিত্য আধুনিক আদর্শের কোন রূপ জাতীয়তা বা রাষ্ট্রীয় ভাব হইতে পরিপুষ্ট হয় নাই। নৃপ-বিশেষের বা রাজশক্তির অমুগ্ধহেই প্রাণ ধারণ করিয়াছে। তৎকালের উচ্চাভিলাষী মনুষ্যগণ বা বাণীপুরুষগণ সকলেই এই জাতীয় কোন-না-কোন নগর-চক্রবর্তীর অমুগ্ধ স্বীকার করিয়াই সরস্বতীর সেবা করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা স্বয়ং দেশের প্রচলিত ভাষা বা পালী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা হইতে নানাদিকে পৃথক হইয়া এবং শুচিতা লাভ করিয়া সমস্ত ভারতের পণ্ডিত-ভাষা রূপে পরিণত হইয়া যায়। এই কারণে, কবিগণও সাধারণের মর্ম্ম-সংগৃহীত হইতে জীবিত সংগ্রহ করিতে পারিতেন না বলিয়াই রাজার বশতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালিদাসের কাহিনী সর্বজনবিদিত। দক্ষিণাত্যের ভবভূতিও প্রথমত: কনোজরাজ যশোবর্ম্মার আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরে কনোজ-বিজয়ী ললিতাদিত্যের আশ্রয়ে কালাতিপাত করেন। এইরূপে সংস্কৃত ভাষা নানাদিকে কথিত ভাষা হইতে দূরবর্তী হইয়াও সমস্ত ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মস্তিষ্করূপে ভাবতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন নাগরিকতার নামই সভ্যতা বা civilisation. সংস্কৃত ভাষা এইরূপে রাজ-দরবারকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের সাহিত্য এবং সভ্যতার মধ্যে একটা একত্ব বিধান পূর্ব্বক সমাজের প্রাকৃত আত্মা হইতে নূনান্দিক দূরত্ব রক্ষা করিয়াই চলিতেছিল; প্রাকৃতকে বা দেশের সাধারণকে চিরকাল অগ্রাহ্য করিতেছিল।

সুতরাং উহা ভারতের উন্নত বর্ণের বিশেষত: ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক এবং হৃদয় প্রসূত সাহিত্য! নগরে পরিপুষ্ট বলিয়া উহার মধ্যে নাগরিকতার লক্ষণই সর্বাংশে পরিপুষ্ট। এই ক্ষেত্রেই বেদ-উপনিষদ বা রামায়ণ মহাভারত কিংবা পুরাণাদি হইতে বুদ্ধপরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের পার্থক্য! বৌদ্ধধর্ম্ম সর্বসাধারণের কিংবা ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য সংকেত করিলেও উহা কোপাণ্ড স্পষ্ট বাণ্য তাহাকে ঘোষণা করিতে চাহে নাই। রাষ্ট্রবিপ্লবের, বিজাতীয় আক্রমণের, কিংবা বিপরীত আদর্শ-সংঘাতের কোন তরঙ্গও এই সাহিত্যের

মধ্যে আপতিত হইয়া নিজের প্রভাব মুদ্রিত করিতে পারে নাই। দেশের হৃদয় উহা হইতে এক দিকে মাত্র খাণ্ড লাভ করিতে পারিত; উহা বিশেষ ভাবে কেবল জীবগত এবং প্রাকৃত জীবন দৃষ্টান্তরিত রস-সামনার দিক। ভারতীয় জাতি সমগ্রা, ধর্মরাষ্ট্র বা সমাজ সমস্যা তাহার সাহিত্য-মর্ম হইতে কোন বিশেষ আঘাত-প্রতিঘাত, সাহায্য কিম্বা অন্তরায় প্রত্যাশা করিতে পারে নাই। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে, ইয়োরোপের আধুনিক সাহিত্য-যেকোন দেশের সাধারণ ধর্ম রাষ্ট্র বা সমাজের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বর্জমান হইয়া, জাতীয় হৃদয়ের সমগ্রতার প্রতিনিধিরূপে বিচারিত হইতে পারিতেছে; ইউরোপের সাহিত্য যেইরূপ বিশ্ব-প্রতিবিশ্বভাবে তাহার সভ্যতারও পরিপূষ্টি বিধান করিতেছে, সংস্কৃত সাহিত্যে তাদৃশ ঘটনার সম্ভব হয় নাই। ইয়োরোপীয় জাতির প্রধান সমস্যা তাহার ধর্ম সমাজ এবং রাষ্ট্র আদর্শের মধ্যে, তাহার প্রাচীনতা এবং আধুনিকতার সামঞ্জস্য-চেষ্টার মধ্যেই নিহিত। প্রাচীনকালের সাহিত্য ঐ পথে কোন বিশেষ প্রেরণা বা আকুলতা লাভ করিতেপারে নাই। সাহিত্যের পক্ষে নিজের দ্ব্যতন্ত্র এবং নিষ্ঠা টুকু পরখ করিয়া, পরিচিহ্ন করিয়া লওয়ার পক্ষেই শত শত বৎসরের দরকার হইয়াছে। প্রাকৃত জীবনের, অধিকন্তু সাধারণের হৃদয় হইতে, দ্রবন্তী থাকিয়াই রসের 'সামনা' করিতে-ছিল বলিয়াই সংস্কৃত সাহিত্যের এই দূরত্ব পরিস্ফুট। অতীতকালে হয় ত এই দূরত্বের গতিকেই সংস্কৃত সাহিত্য সাধারণের চলচ্চিত্রতা এবং রুচিগত বিপ্লববিপর্যাস হইতে দূর-ক্ষেত্রে স্থিত থাকিয়া, নিজের অঙ্গ মাহাত্ম্যের অক্ষয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবার সুবিধা পাইয়াছে।

সাহিত্য-সেবকের পক্ষে সামাজিকগণের সাময়িক দাবিদাওয়া উত্তরাইয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন, এই কারণে সাহিত্যে চিরকাল দুই রকমের আদর্শ কার্য্য করিতে দেখা যায়। প্রথমতঃ, সাহিত্যে জাতির হৃদয়ের জ্ঞানকর্ম-ভাবে বর্তমান অবস্থা অল্পধারী নানাধিক উন্নতিশীল প্রতিকৃতিই ফুটিয়া উঠে। এই অবস্থার, সমাজ বাহা জানে, বাহা তাহার হৃদয়গম আদর্শের ছন্দ-অনুবর্তন করিয়াই আনন্দদান করে, কবিগণ তাহার

অবলম্বনেই রস-সিদ্ধি পথে অগ্রসর হন। সকল প্রাচীন সাহিত্যের এই লক্ষণ। দ্বিতীয় স্থলে, সাহিত্য দূর-দর্শন অথবা দূর-দর্শন অথবা অপ্রাপ্ত আদর্শ-দর্শনের প্রণালী অবলম্বন করিয়াই 'অঘটনঘটনপট্ট' বল্লনার সাহায্যে মনুষ্যজগৎকে অপূর্ণ ক্ষেত্রে, অজ্ঞাত কর্ম-ভাবের ভবিষ্যৎক্ষেত্রে পরিচালিত করিতে চাহে। এই আদর্শ আপাততঃ যশস্বর হয় না; বর্তমানের প্রকোষ্ঠ হইতে যেমন সহ্যমুত্তী বা সাধুবাদ ঘটে না, তেমন উহার ভবিষ্যৎফলও সংশয়াক্ষর থাকে; সুতরাং এই পথ সাহিত্যিকতা বলিয়া পরিগণিত। এই কারণে সাহিত্যের ভাব কিংবা বস্তুর ক্ষেত্রে, অপূর্ণপথধারীর সংখ্যা চিরকাল বিরল। ঐকান্তিক ব্যক্তি-তত্ত্বতা কিংবা স্বাধীনতার অমু-সরণেই এইরূপ দৃষ্টান্তের সম্ভব হইতে পারে। যাহা হউক, সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। সমকালীর সমাজ অবস্থার প্রতিবিশ্ববিশেষতঃ অতীত যুগের স্বপ্নই উহার মধ্যে প্রকটিত। সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপে, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টোত্তর চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারত-সমাজের উপরিস্তরের প্রতিচ্ছায়া মুদ্রিত হইয়াছে, বিশেষতঃ উহার নাট্যসাহিত্যে। মুচ্ছকটিকের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই নাটক প্রত্যেক ভারতবাসীর পাঠ করা উচিত; সুতরাং তর্কযয়ে বেশী বাক্যব্যয় করিব না। মুচ্ছকটিকে সাধারণ সমাজ-চ্ছবি ব্যতীত রাষ্ট্রীয় অবস্থার যে একটা আভাস কহে, তাহাও পরম কোতূহলপ্রদ। উহার মধ্যে ভারতে শক আক্রমণের বিশেষতঃ কণিক প্রভাবে যেন একটা স্ফোরণ পাইতেছি! (১) ঐরূপ মুদ্রারাক্ষস নাটকে অষ্টম শতাব্দীর রাজতন্ত্র এবং রাষ্ট্র অবস্থার যেন স্পষ্ট প্রতি-ভাস আছে! হর্ষচরিত, দশকুমারচরিত, মালতীমাধব প্রভৃতিও এই আদর্শে পরম কুতূহল উদ্দীপনা করিবে। মাল-

১। শকারের (শকরাজার সাহায্যকারী) সাহায্যে পরিপুষ্ট এবং প্রাচীন আদর্শ অবজ্ঞাত (ব্রাহ্মণ চারুদত্তের বখাওয়াতো) 'পালক' রাজাকে হত্যা করিয়া গোরালার পুত্রের রাজসিংহাসন লাভের মধ্যে কি কোন পোলিটিকেল উদ্দেশ্য ছিল না। মুচ্ছকটিকের প্রত্যেক অঙ্কেই প্রাচীন ভারতের সমাজ ধর্ম এবং রাষ্ট্র বিষয়ে নানা প্রশংসা-পনের অবকাশ আছে। লেখক।

বিকা রত্নাবলী কর্পূরমঞ্জুরী প্রভৃতির মধ্যে বর্ষ হইতে একাদশ-শতাব্দীর রাজত্ববনের বিলাস-ছবিটাই অপরূপভাবে মুদ্রিত ! এই সাহিত্য-দর্পণে সমকালীয় ভারতমহাজের যেই দিক প্রতিকৃত, তাহার আনন্দের সুখসৌখ্যের এবং বিলাসের যে প্রভাব আভাসিত, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় যেন অতর্কিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকে ! তৎকালের ভারতবর্ষ কত সহজ সুখবিলাসে দিন কাটাইতেছিল। সুখসন্তোগের ক্ষমতাও জাতীয় মাহাত্ম্যের প্রধান দিকটাই প্রদর্শন করে। কারণ এই, কর্মী সুখী ভোগী এবং রাগী ব্যক্তিরাই জাতি-দেহের প্রধান শক্তি ! পাপী গতিত বা হতভাগ্য ব্যক্তির প্রধান দুর্ভাগ্য এই যে, তাহার চরিত্রে কোনরূপ 'বীর্য' নাই ; তাহার যেমন কোনরূপ সন্তোগের বা গ্রহণের ক্ষমতা নাই, তেমন দানের ক্ষমতাও নাই। সুখ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্যই অধিকাংশ লোকের ঘটে না। এই কারণে যেমন ক্ষুদ্র-পরি-তৃপ্ত ক্ষুদ্রতা, তেমন বীৰ্যাহীন বিরাগ বিতৃষ্ণা, উভয়টাই জাতীয় হতভাগ্য-লক্ষণের প্রমাণ। ভারতের প্রাচীন রাষ্ট্র বা সমাজ ভঙ্গের নানা সন্ধীর্ণতাসম্পেও এই-একটি পরম বীরহীন এবং সুখসৌখ্যনিষ্ঠ মহামানব-সত্ত্বের হৃদয়-তরঙ্গিনীই সংস্কৃত ভাষার উদাত্তচ্ছন্দে প্রবাহিত হইতেছে ! এই অপরূপ সুখবিলাস এবং রস-গলসার প্রমোদউত্তান গত হইয়াও ভারতবর্ষের হৃদয় কোন দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিল ? কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া কোন কবিই তাহা বিস্মৃত হন নাই ! এবং নানা মতে তাহা শ্রোতৃবর্গের নিকট প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন ! গুণবিলাসের আনন্দ-উত্তান মধ্যে আকস্মিক মৃত্যুর আবির্ভাব, পুষ্পকাননের সুখবিলাসের মর্ম্মদেশে অকস্মাৎ সিংহ ব্যাঘ্র গজ বানর বৃন্তির আবির্ভাব, এবং প্রচণ্ড হঠ-কারিতার সহিত সমস্ত সুখ-তস্ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষকে লক্ষ্য সমস্ত মগ্ন-সম্প্রদায় হইতে আগাইয়া দিয়া অস্তর্ধান, এইরূপ চক্র সংস্কৃত নাটকমাত্রের নিত্য ঘটনা বলিলে অত্যাক্তি হয় না। ইহা ভারতীয় নাট্যকারগণের মধ্যে একটা সাধারণ 'নিয়তি-যন্ত্র' বা machinery বলিলে ভুল হয় না। ভারতীয় সাহিত্য-মতের সাধারণ উদ্দেশ্যটুকু বুঝিতে না পারিলে, এই ব্যাপারের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম

হইবে না। পৃথিবীর অল্প কোন জাতির নাট্যকারগণের মধ্যে এইরূপ একটা সাধারণ 'যন্ত্র' লক্ষ্য করি নাই ; গ্রীক নাটকের 'অদৃষ্ট' অথবা চৈনিক নাটকের 'পরিবার নীতি' কতকটা ইহার নিকটবর্তী ! ভারতীয় আর্ষ আদর্শের ভোগি গণ রাগি-গণ প্রতি-মুহূর্তে ত্যাগী হইবার ভয় তাহার 'শিরড়ে ভরঙ্গ এবং কটিবন্ধে অসি' লইয়াই পুষ্প শয্যায় আরাম ভোগ করিতেছে ! যেই মুহূর্তে কর্তব্যে হাঁকডাক পড়িলে, অথবা বমপুরীর দক্ষিণদ্বার খুলিয়া গির মহাকালের প্রলয়-বিষাগ বাজিতে থাকিলে, তখন ত উহারাই এক নিমেষে পুষ্প-শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করিয়া ছুটিয়া যাইবে ! সমগ্র 'চক্র-কৌশিক' নাটক অল্পমাত্র এই আদর্শের প্রতিমূর্তি ভাস্করের বিশেষত্বীয় 'ব্রাহ্মণকবিত্বের আদর্শ ! অনাসক্ত থাকিরাই সুখী হইবার আদর্শ !

এই কালের রমণীজাতির, মনোরমজাতির নামগুলিই চিন্তা করুন। জাতীয় রমণীগণের, বিশেষতঃ সাহিত্য-লোকের অধিবাসিনীগণের নামকরণ হইতেই অনেক সময় সমগ্র জাতিটার সভ্যতা পরিমাণ করা যায়। প্রাচীন কাব্য আদর্শের সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী অনন্যসত্যভামা বা শৈব্যা হইতে, যেমন সাগরিকা মদয়ন্তীকা বাসবদত্তা তরলিকা অবলোকিতা উল্লীনরী নিপুণিকা কর্পূরমঞ্জুরী বসন্তসেনা জয়দেনা জ্যোৎস্নিকা বিচক্ষণা প্রভৃতি সহস্র সহস্র বৎসর দূরবর্তী, তেমন এ কালের বহু প্রচলিত কামিনী নিত্যমিনী সুহাসিনী মোহাগিনী প্রভৃতি হইতেও কম দূরবর্তী নহেন। এ কালের কামিনীকুমার রমণীরঞ্জন সুন্দরী মোহন কুমুদিনী কান্ত হইতেও মলয়কেতু বলহংস জীমূতকেতু তুরিবহু দেবরাত প্রভৃতি কম দূরবর্তী কি ? এই সমস্ত গুণবাচক নাম-সংজ্ঞার ভিতর দিয়া অনেক সময় জাতীয় হৃদয়ের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত দেখিতে পারা যায়।

সেকালের উজ্জয়িনী কোশাবী কাম্বীর প্রভৃতি নগর হৃদয়মধ্যে উদাত্তমধু অধিকার বিস্তার করে ! তবে, দেখা যাইবে, এই অবস্থা দীর্ঘকালস্থায়ী কি না সমাজের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল না। মাহাত্ম্য ন্যূনাধিক কেন্দ্রগত ছিল এবং সর্ব সাধারণের কোন অংশে ব্যাপক ছিল না বলিয়াই

পর্যবেক্ষণে প্রদর্শিত বৈবিশিকের আক্রমণ সমুদ্রে ভারতবর্ষে নিরাশ্রয় থাকবে ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। এই স্থানেই প্রাচীন মহাযজ্ঞোবন এবং সভ্যতার মহারোগ! যেই অবস্থা হইতে প্রবল কেন্দ্রপ্রভাপাশিত গ্রীক বা রোমক সভ্যতা বর্ধমান জাতিসমূহের পদাশ্রিতেই বিশ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, রাজকেন্দ্রজাতী ভারতীয় সভ্যতাও সেইরূপ অবস্থা হইতেই রাজকেন্দ্রজাতির বিনাশ বা অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই অধঃপতিত হইয়াছে; উন্নত স্তরের সমুদ্র আধ্যাত্মিকতা কিম্বা সভ্য জীবন সম্বন্ধে, অসভ্যগণের সমক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই; লৌকিক তথ্য আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের স্কলটুই ও হারাইয়া বসিয়াছে। মহাযজ্ঞ-সমাজের অতীত ইতিহাসকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের শিক্ষক রূপে গ্রহণ করিয়াই মহাযজ্ঞ-সভ্যতা ক্রমবিকাশের উন্নতি-আদর্শে লাভবান হইতেছে।

শ্রীশশীকমোহন সেন।

শিশুর খাতি

নব প্রসূতির দুগ্ধ—সকল প্রসূতিরই যে সমান দুগ্ধ হয় তাহা নহে। আবার সকলেরই যে গুণ সমান গুণবিশিষ্ট তাহাও বলা বাইতে পারে না। প্রসবের পর ১২ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় প্রসূতির একটু আধটু দুগ্ধ হয় এবং সেই দুগ্ধ দ্বারা তখনকার মত শিশুর কাজ চলিতে পারে। অনেকের আবার ২৩ দিন না গেলে দুগ্ধ দেখা যায় না। প্রসবের পর ১২ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে তবে শিশুকে স্তন্য পান করাইবে। প্রথম কয়েক দিনের দুগ্ধের কতকটা বিরুদ্ধ শক্তি থাকিতে দেখা যায়। ইহা খাইয়া শিশুর বাহ্য হয়, তাহাতে উহার বেশ উপকার হয়। শিশুকে স্তন্য না দিলে স্তনে অধিক দুগ্ধ হইতে পারে না। যদি এমন দেখা যায় ৩৪ দিনের পরও মাতার স্তনে দুগ্ধ দেখা দিল না তাহা হইলে পরের দুগ্ধ খাওয়ানোর আবশ্যক হয়। এক ভাগ টাটকা দুগ্ধের সহিত তিন ভাগ পরিষ্কৃত জল মিশাইয়া

তপ্ত করিতে থাকিবে; যেই স্তূতিতে আরম্ভ করিবে, অমনি নামাইয়া ফেলিবে। এই দুগ্ধ একটু পরম থাকিতে শিশুকে খাওয়াইয়া দিবে। অধিক খাওয়াইবার আবশ্যক নাই। ৩৪ ঘণ্টা অন্তর এক বা দুই বিষ্ক করিয়া খাওয়াইতে থাকিলেই বাথষ্ট কাজ চলিতে পারিবে।

কেমন করিয়া স্তন্য পান করাইতে হয়—

শিশুকে কেমন করিয়া স্তন্য দিতে হা তাহাও জানার আবশ্যক। প্রসবের পর এক সপ্তাহকাল প্রসূতির পক্ষে ইচ্ছামত উঠিয়া বসিতে নাই। এই সময় তাঁহাকে সর্বদাই শুইয়া থাকিতে হয়। এসময় শিশুকে শয়নাবস্থাতেই স্তন্য পান করাইবার আবশ্যক। আমাদের দেশের প্রসূতিয়া এ সকল নিয়ম বড় একটা মানিতে চাহেন না; তাঁহারা প্রসবের পর হইতেই আপনার ইচ্ছা মত উঠিয়া বসেন কিম্বা চলাফেরা করিতে থাকেন। ইহার ফলে বিবিধ “স্ট্রোরোগ” দেখা দেয়। তাঁহাদের পূর্ষ স্বাস্থ্য আর কিরিয়া পান না। স্তন্যকাবস্থায় প্রসূতির যে সকল নিয়ম পালন করা কর্তব্য, এখানে তাহার বিস্তারিত উল্লেখ করিতে গেলে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িবে, তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি। এসময় প্রসূতির পক্ষে বিশ্রামের একান্ত আবশ্যক। এই কারণে প্রসবের পর অন্তত ১ মাসকাল প্রসূতিকে কোনরূপ গৃহের কাজে যোগদান করিতে দিতে নাই। এসময় তিনি একেবারেই কাজের বাহির এইরূপ মনে করিবেন। স্তন্যকাবস্থায় তাহাকে কিরূপ ভাবে বিশ্রাম করা উচিত নিয়ে তাহার উল্লেখ করা গেল।

প্রথম সপ্তাহ—এ সময় খাওয়ার সময় ও মল-মূত্র ত্যাগের সময় মাত্র উপবেশন করিতে পারেন, অন্য সময় শয়ন করিয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয় সপ্তাহ—এ সময় খাওয়ার ও মল-মূত্র ত্যাগের সময় পূরাপূরি সোজা হইয়া বসিতে পারেন; অন্য সময় শুইয়া থাকিবেন।

তৃতীয় সপ্তাহ—দিনে বেলোটা বসিয়া কাটাইতে পারেন।

চতুর্থ সপ্তাহ—ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে

পারেন। এক মাস পূর্ণ হইয়া গেলে তবে ঘরের বাহির হইতে পারেন। অবশ্য এসময়ের মধ্যে তাঁহার শরীর যদি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ না হয় তাহা হইলে আরও কিছু দিন বিশ্রাম করা আবশ্যিক।

শিশুকে স্তন্য দান— প্রসবের পর কিছু দিন ধরিয়া শিশুকে শরনাবস্থাতেই স্তন্য পান করাইবার আবশ্যক। শরনাবস্থার কি করিয়া স্তন্য পান করাইতে হয় তাহা জানিয়া রাখিতে হয়। মনে কর বাম স্তন খাওয়াইবে। শিশুকে বাম বাহুর উপর শোয়াইয়া বাম হস্ত দ্বারা তাহার মাথাটি ও দেহটা ধারণ করিবে, আর দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলির সাহায্যে স্তনের উপর চাপ প্রয়োগ করিবে। এমন না করিলে স্তনটি শিশুর নাসিকার উপর পড়িয়া তাহার নিঃশ্বাস অবরোধ করিবার উপক্রম করিতে পারে। দক্ষিণ স্তন খাওয়াইবার সময় ইহার বিপরীত করিবে, অর্থাৎ শিশুকে দক্ষিণ বাহুর উপর শোয়াইয়া বাম হস্তের মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলির সাহায্যে শিশুর নাকের নিকট হইতে স্তনটি দূরে রাখিবে। এখন কথা এই যে, এক এক বারে শিশুকে কতকগুলি স্তন্য দেওয়া যাইতে পারে? আমাদের মনে হয় এক এক বারে ১০-১৫ মিনিট কালের বেশী স্তন্য দিতে নাই। অনেক সময় আবার এমন ঘটিতে দেখা যায় শিশু স্তন মুখে দিয়া রাখে কিন্তু দুধ টানে না। এরূপ সম্ভব হইলে স্তন্য দিবার পূর্বে ও পরে শিশুকে ওজন করিবে তাহা হইলেই সে দুধ টানিতেছে কি না বুঝা যাইবে। প্রায় সকল শিশুই অতি সহজে বিনা চেষ্টার স্তন ধরিতে শিখে; কতকগুলি শিশুর বেলায় কিছু বেগ পাঠিতে হয়। ইহারা সহজে স্তন ধরিতে চাহে না; ইহাদিগকে স্তন মুখে দেওয়া অভ্যাস করাইতে হয়। স্তনের বোটাতে একটু মধু লাগাইয়া দিলে, শিশু অতি সহজেই স্তন টানিতে শিখে। এক একটি প্রসূতির স্তনের বোটা এত ছোট যে, শিশু ঠিক বাগাইয়া ধরিতে পারে না, এরূপ স্থলে স্তন্য পান করাইবার পূর্বে বোটাটি টানিয়া বড় করিয়া তবে শিশুর মুখে দিবে। স্তন্য দেওয়ার পর শিশুকে কিছুকাল

স্থিরভাবে আপনার কাছে রাখিবে, তাহার পর উহাকে নিজের খাটে শোয়াইয়া দিবে। স্তন্যদান ব্যাপার শেষ হইয়া গেলে প্রসূতির স্তনের বোটাটি বেশ করিয়া ধুইয়া শুক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেলা উচিত। স্তন্য দানের পর বোটাটি না ধুইয়া ফেলিলে, স্তনটির প্রদাহ হওয়া খুবই সম্ভব। শিশুকে এক এক বারে একটির অধিক স্তন্য দিতে নাই। মনে কর প্রথমে দক্ষিণ স্তনটি দেওয়া হইয়াছে, ইহার পর দক্ষিণটি না দিয়া বাম স্তনটি দিবে, এইরূপে পালাক্রমে দিতে থাকিবে।

২৪ ঘণ্টায় কত বার স্তন্য দেওয়া উচিত—

প্রসবের দ্বিতীয় কিবা তৃতীয় দিন হইতে শিশুকে নিয়মিত ভাবে স্তন্য দান করার আবশ্যক। স্তন্য দিবার সময় হইলে যদি এমন দেখা যায় যে, শিশু নিদ্রিত আছে, তাহা হইলে অতি ধীরে ধীরে নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তবে স্তন্য দিতে হয়। পুষ্টির অবস্থার কদাচ স্তন্য পান করাইতে নাই। কয়েক দিন চেষ্টা করিলেই শিশুর এমন অভ্যাসটি হইয়া পড়ায় যে, ঠিক খাবার সময়টি হইলেই বুম ভাজিয়া যায়; অল্প সময় নিদ্রা মগ্ন থাকে। এ অভ্যাসটি যে সকল শিশুর হয়, তাহাদের সর্বস্বাই প্রকৃত ও সুস্থ থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু দুঃখে বিষয় এই যে, আমাদের জননীগণ শিশুদের এই অভ্যাসটি জন্মাইয়া দিবার জন্য তেমন চেষ্টা করেন না। এ বিষয়ে ইহাদের বিশেষ শৈথিল্য থাকিতে দেখা যায়। তাঁহাদের কেমন অভ্যাস শিশু কাদিলেই অমনি উহার মুখের মধ্যে স্তন্য গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে চূপ করাইতে চেষ্টা করেন ইহা যে কত অস্ত্রায় কাজ তাহা আর কি বলিব। ইহাতে শিশুর পরিণাম শক্তির বিশেষ অনিষ্ট করা হয়। কত সুস্থ জঁইগুই শিশুকে এইরূপ অনিয়মিত ভাবে বধন তখন স্তন্য দেওয়ার ক্ষীণ ও রূপ হইতে দেখা গিয়াছে। শিশু যে কেবলই ক্ষুধার জন্য কাদে অল্প কোন কারণে কাদিতে পারে না ইহা যেন কেহ মনে না করেন। অনেক সময় সে বিনা কারণেই কাদিয়া থাকে। সেহলে কোলে করিয়া একটু আদর করিলেই চূপ করিয়া থাকে। আবার এমন যদি বুঝা যায় যে, কোনরূপ বস্ত্রের বা স্তন্যবিধার জন্য কান্না

করিতেছে, তাহা হইলে যন্ত্রণা বা অস্ববিধার যেটি কারণ তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে।—বীহাদের সম্ভাবন পালন বিষয়ে কিঞ্চিৎ অতিশ্রুতি আছে তাহার। শিশুর ক্রন্দন শুনিতেই, সে কেন কাঁদিতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারেন। তৃতীয় দিবস হইতে শিশুকে ২ ঘণ্টা অন্তর স্তন্য দিতে হয়। আর রাত্রিকালে দুই বার দিতে হয়। দিনের বেলায় ৫টা ৭টা, ৯টা, ১১টা, ৩টা, ৫টা ও ৭টা, রাত্রে ১০টা ও ১১টা তাহার পর ২ ঘণ্টা অন্তর না দিয়া আড়াই ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়। এরূপ না করিলে আকস্মিকের অপেক্ষা অধিক খাওয়ান হয়। তাহার ফলে শিশুর “জ্বরতোলা” রোগ দেখা দেয়। প্রসবের পর প্রসূতির স্তনে প্রথম ৭৮ মাস প্রতি মাসেই দুধের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে। পূর্বের হিসাবে শিশুকে স্তন্য দিতে থাকিলে উহা যে অধিক ভোজন হইল তাহার আর আশ্চর্য্য কি? দেড় মাস বয়স হইলে শিশুকে নিম্নের হিসাবে স্তন্য দিতে থাকিবে—৭টা, ৯টা, ১১টা, ১২টা, ২টা, ৩টা, ৫টা, ৭টা, ১০টা, ১১টা ও ১২টা অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার সর্বমোট ৯ বার স্তন্য দিবে। অধিকাংশ শিশুই ১০টার সময় যে নিদ্রা যায় ভোর ৪টা কি ৫টা না বাজিলে আর বড় একটা উঠে না, এ অভ্যাস মন্দ নহে। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে এবছার ঘুম ভাঙাইয়া স্তন্য দিতে নাই। তবে যদি এমন বুঝা যায় যে, ইহাতে শিশুর দেহের তেমন বৃদ্ধি হইতেছে না, তবেই রাত্রে ঘুম ভাঙাইয়া এক বাব স্তন্য পান করাইবার আবশ্যক, নতুবা নহে। যদি এমন দেখা যায় যে, শিশু দিন দিন বেশ বাড়িতেছে, আর রাত্রি ১০টার পর যে নিদ্রা যায় ভোর না হইলে আর উঠে না, তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টার ৯ বার স্তন্য না দিয়া ৮ বার দিলেই যথেষ্ট কাজ চলিতে পারে—বধা ৫টা, ৭টা, ১০টা, ১২টা, ৩টা, ৫টা, ৮টা, ১০টা। তিন মাস বয়স হইলে সাধারণতঃ শিশুকে ৮ বার স্তন্য দেওয়া আবশ্যক হয় বটে কিন্তু অনেক শিশু আবার ৭ বার খাইয়াই বেশ তৃপ্ত থাকে। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সকলের বেলায় ঠিক একরূপ নিয়ম থাকে না। আবার সকল প্রসূতির দুধ যে সমান বলকারক ও পরিপোষক এবং সকল প্রসূতির

দুধের পরিমাণ যে সমান এমনও নহে। ২৪ ঘণ্টার ৭বার স্তন্য দিতে হইলে নিম্নের হিসাবে দিতে হয়, ৫টা, ৭টা, ১০টা, ১টা, বৈকালে ৪টা, ৬টা, ও ১০টা। শিশুর বয়স যখন ছয় মাস হয় তখন দিনে রাত্রে ছয় বারের বেশি খাওয়াইবার আবশ্যক নাই—বধা ৭টা, ১০টা, ১টা, ৪টা, ৭টা, ১০টা। এদেশে ছয় মাস না হইলে শিশুকে বড় একটা বাড়ীর বাহির করা হয় না। শিশুর পক্ষে স্নাতক বাস আবশ্যকীয় নহে। সকালে বিকালে কিছুক্ষণের জন্য উহাকে ঘরের বাহির করা একান্ত আবশ্যক; এরূপ হলে, সকালে বিকালের খাওয়ার সময়টা একটু আধটু নড়া চড়া হইলে কোন ক্ষতি নাই।

বোতলে করিয়া দুধ খাওয়ান—শিশুকে দুধ খাওয়াইবার জন্য বাজারে একরকম বোতল কিনিতে পাওয়া যায়। ইহাকে ইংরেজীতে ফিডিং বটল কহে। স্থল বিশেষে শিশুকে ইহাতে কবিতা দুধ খাওয়ান হইয়া থাকে। মনে রাখা আবশ্যক শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম খাদ্য তাহার মাতৃস্বত। বিশেষ কোন বিষয় না থাকিলে সকল মাতারই আপনাব শিশুকে স্তন্য দান করা কর্তব্য।

কিন্তু এমন যদি ঘটতে দেখা যায় যে, মাতার স্তনে যে পরিমাণ দুধ হইতেছে তাহাতে শিশুর পেট ভরিতেছে না, কিম্বা তাহার দুধ ভাল নহে, খাইয়া শিশুর উপকার না হইয়া অপকার হইতেছে, কিম্বা তাহার স্তনে কোড়া কি প্রবাহ হইয়াছে, অথবা তাহার এমন কোন রোগ আছে যাঁহাতে শিশুকে স্তন্য দেওয়া উচিত নহে, তাহা হইলে মাতার পক্ষে স্তন্য দান করাইবার চেষ্টা না করাই উচিত। এমন ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে যে, বন্ধা রোগগ্রস্তার দুধ পান করিয়া স্তন্য শিশুকে উক্ত রোগগ্রস্ত হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু বিনা কারণে যে মাতা শিশুকে স্তন্য দান হইতে বিরত হন আমাদের মতে তিনি মাতৃ নাম ধারণের উপযুক্তই নহেন। দুধের বিষয় ইংরাজ মহিলাদিগের দেখাদেখি আমাদের সমাজে অনেকেই শিশুকে গোড়া হইতেই বোতলে করিয়া দুধ খাওয়ান অভ্যাস করাইয়া থাকেন। ইহা অতিশয় অভ্যাস বলিতে হইবে। সে বাছাই হউক এখন কোন

কোন অবস্থায় শিশুকে বোতলে করিয়া দুধ খাওয়াইতে পারা যায় তাহারই আলোচনা করা বাউক। যদি এমন দেখা যায় যে, শিশু রীতিমত মাতার স্তন্য খাইতেছে অথচ তাহাকে আশঙ্করূপ বাড়িতে দেখা যাইতেছে না, তাহা হইলে মাতার স্তন হইতে একটুখানি দুধ লইয়া ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইবার আবশ্যক। ডাক্তার বলিয়া দিবেন সন্তানের পরিপোষণোপযোগী পদার্থ উহাতে যথেষ্ট পরিমাণ আছে কি না। যে সকল ছেলের স্তন্য খাইয়া পেট ভরে না তাহার প্রায়ই খিটখিটে ও বদমেজাজী হয়, এবং সর্বদাই কাঁদিতে থাকে। শিশু-চরিত্রে বাহ্যদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে তাহারা এ ক্রন্দনের প্রকৃত অর্থ কি তাহা শুনিবা মাত্রই বুঝিতে পারেন।

—সুস্থদায়িনী ধাত্রী—অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন মাতৃ-স্তন্য পানে শিশুর বেহলে পেট ভরেন না কিবা কোন বিশেষ কারণ বশতঃ শিশুর নিজের মাতা যেখানে স্তন্য দিতে একেবারেই অসমর্থ সেক্রপ ক্ষেত্রে আর কাহারও স্তন্য দিলে কি কোন ক্ষতির সম্ভব? ইহার উত্তরে আমরা এই কথা বলি মাতা যেখানে স্তন্য দানে অসমর্থ দেখানে এক জন সুস্থ-দায়িনী ধাত্রী নিযুক্ত করিতে পারিলে সব চেয়ে ভাল হয়। কিন্তু ধাত্রীটিকে নিযুক্ত করিবার পূর্বে তাহাকে বেশ করিয়া দেখিয়া লওয়া আবশ্যক। ডাক্তার দ্বারা উহাকে এবং উহার কোড়হ শিশুকে পরীক্ষা করা উচিত। ডাক্তারের অভিমত হইলে তবেই তাহাকে নিযুক্ত করিবে। শিশুর যে বয়স ধাত্রীর শিশুটিরও সেই বয়স হইলে ভাল হয়। ধাত্রীর ছেলের ও বেশ আদর যত করা উচিত। আপনার সন্তানটিকে অনাহারী ও অস্থবী থাকতে দেখিলে কোন মাতার চিত্ত স্থির থাকিতে পারে? এ অবস্থায় তাহার স্তনে যে দুধ হয় তাহাতে দোষ বর্তায় এবং সেই দুধ খাইয়া শিশুর অনিষ্ট হওয়া একেবারেই অসম্ভব নহে। ধাত্রীটির বয়স্কর যেন একুশের নিম্নে ও পর্যজিহ্নের উর্ধ্বে না হয়। ইহার মন বাহ্যতে সর্বদা প্রকৃত থাকে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। ইহার আহার্য বাহ্যতে কোনরূপ হানি না হয় সেদিকেও সমান দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এক কথায়

গর্ভধারিণী অননী শিশুকে স্তন্য দিতে হইলে যে সকল নিয়মাদি পালন করিতেন এবং বেকরুপ ভাবে জীবন বাপন করিতেন, ধাত্রীরও ঠিক সেই সকল নিয়ম পালন এবং ঠিক সেই ভাবে জীবন বাপন করা কর্তব্য। দুশ্চরিত্রা, বদমেজাজী, উদ্ধতবভাবা ত্রীলোককে কখনও ধাত্রী নিয়োগ করিতে নাই। ধাত্রী নিয়োগ বিষয়ে আমাদের দেশের প্রাচীন চিকিৎসকগণও কম সাবধান ছিলেন না। চরক-মিশ্র-বর্ণিত গুণবিশিষ্ট ত্রীলোককে ধাত্রী নিযুক্ত করিতে বলেন—“সবানজাতীয়া যুগতা, অস্থকৃত”, রোগগ্রহিতা, সর্বসম্পূর্ণজী, (হীনাকী নহে), অব্যাসনা (কামক্রোধাদি দোষগ্রহিতা) অধিকট রূপা, অজুগুপ্তিতা (অনিদ্রিতা), স্বদেশজা, অক্ষুদ্র-স্বভাবা, অক্ষুদ্রকর্মকারিণী, সংকুল জাতা, বৎসলা, অরোগ-জীবদ্বেশা (বাদের সন্তান অরোগ ও জীবিত আছে), লেখ্যী (বাহার “হৃদ্ব স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়) অগ্রমদা, অশয়ানা (অকালে শয়নশীলা নহে), অহুচারণানা (অপরিস্রিত স্থানে শয়নশীলা নহে) ভ্রমোপচরিতা, গুচি, অগুচিবেদী, স্তন্য ও স্তনসমুৎসম্পন্ন।” এইরূপ এক জন ধাত্রী নিযুক্ত করিবে।

গরুর দুধ—শিশু যেখানে মাতার স্তন্য পায় না সেক্রপ স্থলে সাধারণতঃ গরুর দুধ খাওয়াইয়াই উহাকে মাতৃস্থ করিতে হয়। কেহ কেহ গাধার দুধ খাওয়াইয়া থাকেন, কেহ বা গরুর দুধ না দিয়া ছাগলের দুধ খাওয়াইয়া থাকেন। এক একটি শিশু গরুর দুধ সহ্য করিতে পারে না অথচ ছাগলের দুধ বেশ সহ্য করিতে পারে। অবশ্য একরূপ দৃষ্টান্ত যে খুব বেগী তাহা নহে। দুধের মধ্যে যে সকল পরিপোষক পদার্থ আছে, মোটামুটি বলিতে গেলে তাহারা এই তিন শ্রেণীর অন্তর্গত—১ম, গোটিডু; দুধে ইহা আবার ২ প্রকার আছে—(অ) কেসিন বা দুধ সার (আ) দুধ-এলুবুমেন। ২য়, ঘৃত। ৩য়, দুধ শর্করা বা মিষ্ট জগার। নিম্নের তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মাতৃস্তনে, গে-দুধে গাধার দুধে, ও ছাগ-দুধে কোন উপাদান কি পরিমাণ আছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

| | মাতৃ-দুগ্ধ | গো-দুগ্ধ | গর্দভ-দুগ্ধ | ছাগ-দুগ্ধ |
|---------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| প্রোটিন { (অ) কেসিন | ৪ | ১১ | ১ | ৩ |
| (আ) দুগ্ধ-এল-বুমেন | ১১ | ৪ | ৪ | ১৮ |
| স্বত | ৩১ | ৩১ | ১ | ৪১ |
| দুগ্ধ-শর্করা | ৭ | ৪ | ৫১ | ৪ |

উক্ত তালিকার এই দেখা বাইতেছে যে, মাতৃদুগ্ধ ও গো-দুগ্ধের পরিমাণ ঠিক সমান বটে, কিন্তু গো-দুগ্ধে শর্করার পরিমাণ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা ঢের কম; সুতরাং গো-দুগ্ধকে শিশুর উপযোগী করিতে হইলে উহার কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। আর একটি কথা এই যে, মাতৃ-দুগ্ধে যে কেসিন আছে, তাহা স্বত সহজে জীর্ণ হয়, গো-দুগ্ধের কেসিন তাহা হয় না; এই কারণে এক একটি শিশু কোন মতেই গরুর দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না।

শিশুর জন্ম দুগ্ধ—শিশুর জন্ম দুগ্ধ খুব টাটকা ও বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। যে গরুর দুগ্ধ খাওয়াইবে সেটি যেন বেশ নীরোগ ও সুস্থ হয়; তাহার থাকিবার স্থানটি যেন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, তাহাকে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে উত্তম খাদ্য খাইতে দেওয়া হয়, এবং প্রতিদিন একবার করিয়া মাঠ হইতে চরাইয়া আনা হয়। যে ব্যক্তি দুগ্ধ দোহন করিবে তাহার হাতে যেন কোনরূপ ময়লা না থাকিতে পায়। দোহন পাত্রটি বধাসম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। অনেক সময় এমন ঘটিতে দেখা যায় যে, শিশু হয় ত কোন একটি বিশেষ গাভীর দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু ৩৪ গাভীর দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দিলে অবোধে সহ্য করিতে পারে। এই কারণে শিশুকে একটি গরুর দুগ্ধ না দিয়া ৩৪টি গরুর দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান ভাল। এখন কথা এই যে, শিশুর জন্ম ২৪ ঘণ্টার উপযোগী দুগ্ধ এক বারেই প্রস্তুত করিয়া রাখা ভাল না যখন যখন আবশ্যক হইবে তখন তখন প্রস্তুত করিয়া লওয়া ভাল। আমাদের দেশ গ্রীষ্ম-প্রধান

দেশ; এখানে সকালের দুগ্ধ বিকাল পর্যন্ত ভাল থাকে না, প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়। এদেশে অন্ততঃ ২ বার দুগ্ধ প্রস্তুত করা আবশ্যক। সকালে যে দুগ্ধ তৈয়ার করা হয়, বেলা ১টা পর্যন্ত তাহার দ্বারা কাজ চলিবার সম্ভব। আর ইহার পর যে দুগ্ধ তৈয়ার হয়, তাহা রাত্রি ১০টা পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। গরুর দুগ্ধকে শিশুর উপযোগী করিতে হইলে তাহাতে জল, দুগ্ধ-শর্করা ও মাখন বা ক্রীম মিশ্রিত করিতে হয়; কি কি পরিমাণে মিশ্রিত করিতে হয় তাহা পরে কথিত হইবে। দুগ্ধের সহিত ঐ সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া গরম করিতে থাকিবে; যেই ফুটিতে আরম্ভ করিবে অমনি নামাইয়া কেলিবে। দুগ্ধ প্রস্তুত হইলে তাহা যেখানে সেখানে রাখিতে নাই। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটি সর্বাঙ্গতঃ ভাল সেই ঘরে ঠাণ্ডা যারগায় ঢাকা দিয়া রাখিতে হয়, যেন উহাতে মাছি না বসিতে পায়। উহা হইতে আবশ্যক মত ঢালিয়া লইয়া তপ্ত করিয়া ‘কিডিং বোতলে’ পুরিয়া শিশুকে খাওয়াইতে হয়। অনেক মনে করিতে পারেন, সব চেয়ে ভাল ঘরটিতে আবার দুগ্ধ রাখার আবশ্যক কি। আবশ্যক খুবই আছে, দুগ্ধ যেমন খারাপ গন্ধ টানিয়া লয়, এমন আর কিছুতেই নহে। যে ঘরে নর্দমা, পাখানা প্রভৃতির গন্ধ প্রবেশ করে, সেখানে দুগ্ধ রাখিলে ঐ সব গন্ধ দুগ্ধের মধ্যে গিয়া দুগ্ধকে দূষিত করিয়া তুলে, এবং সেই দূষিত দুগ্ধ খাইতে দিলে শিশুর নানা প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে। শিশুকে ঠাণ্ডা দুগ্ধ খাওয়াইতে নাই, উহা যেন একটু গরম হয়। এখানে এই কথা উঠিতে পারে যে, যে দুগ্ধ একবার ফুটান হইয়াছে, তাহা বার বার ফুটাইতে থাকিলে তাহা

পান করিয়া শিশুর অনিষ্ট হওয়া সম্ভব নয় কি? অবশ্যই সম্ভব। বার বার ফুটাইলে দুধ খুবই গুরুপাক হয়, শিশুর পক্ষে সেসকল দুধ জীর্ণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু না ফুটাইয়াও যে দুধ গরম না করা যায় এমন নহে। দুধপূর্ণ বোতলটি যদি কিছুক্ষণের জন্য গরম জলে বসান যায়, তাহা হইলে বোতলস্থিত দুধ গরম হয়, অথচ তাহার গুণের কোন পরিবর্তন ঘটে না। শিশুর দুধ ঐ উপায়েই গরম করিতে হয়। এক বারের অধিক ফুটাইতে নাই। দুধ খাওয়ান শেষ হইলে ফিভিং বোতলটি ঠাণ্ডা জলে কয়েকবার বেশ দোত করা উচিত। তাহার পর গরম জল ও বুরুষ দ্বারা বোতলের ভিতরটি বেশ করিয়া পরিষ্কার করা কর্তব্য। সর্বশেষে পুনরায় ২১০ বার ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া বোতলের মুখটা-নীচু করিয়া রাখিয়া দিবে।

দুধ কেন ফুটাইতে হয়—দুধের মধ্যে অনেক সময় বিবিধ রোগ-বীজ প্রচুর ভাবে অবস্থিতি করে। ফুটাইয়া লইলে ঐ সকল রোগ-বীজ বিনষ্ট হয়, সুতরাং সেই দুধ খাইয়া রোগ হওয়ার কোন ভয় থাকে না। তাই বলিয়া খুব বেশী ক্ষণ ধরিয়া ফুটাইতে নাই, তাহাতে দুধ অতিশয় গুরুপাক হইয়া পড়ে। ২১০ মিনিট ফুটাইলেই যথেষ্ট হইয়াছে মনে করিতে হইবে।

স্তনদুগ্ধবঞ্চিত শিশুকে মানুষ করা—
রোগের জন্মই হউক কিবা অন্য কোন কারণ বশতঃই

হউক, মাতা যেখানে শিশুকে শুভ্র দিতে অসমর্থ এবং যেখানে শুভ্রদারিনী দ্বারা নিরোগেরও কোন সুবিধা নাই, সেসকল স্থলে গরুর দুধ ভিন্ন শিশুকে মানুষ করার অন্য উপায় নাই বলিলেই হয়। শিশুর পক্ষে দুধ ভিন্ন অন্য কোন খাদ্য স্বাভাবিক নয়। ভূমিষ্ট হওয়ার পর হইতে যতদিন তাহার দাঁত না উঠে, তত দিন একমাত্র দুধের উপরই তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। গরুর দুধে হিসাব মত জল, দুধ-শর্করা, ক্রীম বা মাখন মিশাইলে উহা অনেকটা শুভ্র দুধেরই অমুখ্যারী হয়। কিন্তু এই দুধ ২৪ ঘণ্টার শিশুকে কত বার এবং কি পরিমাণ খাওয়ান উচিত, তাহাই ভাবিবার বিষয়। ইহা স্থির করিতে হইলে, শিশু এক এক বারে মাতার স্তন হইতে কতখানি করিয়া দুধ টানিয়া লয় তাহা জানা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে প্যারিস নগরে এক বার পরীক্ষা হইয়াছিল। সেই পরীক্ষায় স্থির হয় যে, একটি ৩ মাসের সুস্থ শিশু তাহার মাতার স্তন হইতে ফি বারের অন্ততঃ পাঁচ ছটাক দুধ টানিয়া লয়। তাহাকে যদি ২৪ ঘণ্টার অন্ততঃ পাঁচ বার শুভ্র দেওয়া হয়, তাহা হইলে, দিন রাতে সে সর্বস্বচ্ছ অন্ততঃ পাঁচ পোরা কি দেড় সেসকল দুধ খাইয়া থাকে। শিশুকে গরুর দুধ খাওয়াইয়া মানুষ করিতে হইলে, নিজের তালিকার মতে চলিলে সব দিকেই সুবিধা হওয়ার সম্ভব।

ভ্রম হইতে দশ মাস পর্য্যন্ত ।

| বয়স | ২৪ ঘণ্টার কত বার খাওয়ান আবশ্যক | প্রত্যেক বারে যতটা পরিমাণ দিবে | ২৪ ঘণ্টার সর্বমুদ্র যতটা পরিমাণ দিবে | গরুর দুধ | পরিষ্কৃত জল | দুগ্ধ-শর্করা | মাখন বা ক্রীম- ইহাতে শতকরা ৪৮ ভাগ মৃত আছে |
|-----------|--|--------------------------------------|---|----------|-------------|--------------|--|
| | | আউন্স | আউন্স | আউন্স | আউন্স | টিস্পুন | টিস্পুন |
| ৩ দিন | ১০ | ১-৬ | ৫-৭ | ১৪-১৪ | ৩৪-৫৪ | ১ | ১-২ |
| ১ সপ্তাহ | ১০ | ১ | ১০ | ৩ | ৭ | ২ | ২১ |
| ২ " | ১০ | ১১ | ১৫ | ৬ | ২ | ১৩ | ৩ |
| ৪ " | ১০ | ২১ | ২৫ | ১০ | ১৫ | ৬ | ৬ |
| ৬ " | ২ | ৩ | ২৭ | ১১ | ১৬ | ৭ | ৭ |
| ৮ " | ২ | ৩১ | ৩১ | ১৩ | ১৮ | ৮ | ৮ |
| ১০ সপ্তাহ | ৮ | ৪ | ৩২ | ১৫ | ১৭ | ৮ | ৮ |
| ৩ মাস | ৮ | ৪১ | ৩৬ | ১৮ | ১৮ | ২ | ৮ |
| ৪ মাস | ৭ | ৫১ | ৩৭ | ২০ | ১৭ | ২ | ২ |
| ৫ মাস | ৭ | ৬ | ৪২ | ২৪ | ১৭ | ২ | ২ |
| ৬ " | ৬ | ৭ | ৪২ | ৩২ | ১০ | ৮ | ৬ |
| ৭ " | ৬ | ৭১ | ৪৫ | ৩৭ | ৫ | ৭ | ৩ |
| ৮ " | ৬ | ৮ | ৪৮ | ৪৩ | ৫ | ৮ | ৩ |
| ৯ " | ৬ | ৮ | ৪৮ | ৪৩ | ৫ | ৮ | ৩ |
| ১০ " | ৬ অথবা ৫ | ৮ | ৪৮ বা ৪০ | ৪৪ বা ৩৬ | ৪ | ৮ | ৩ |

১ আউন্স = অর্ধ ছটাক ; এক টিস্পুন = ৬০ হইতে ৯০ কোটা ।

উপরের তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, গরুর দুধকে মাতৃ-দুগ্ধের তুল্য গুণশালী করিতে হইলে উহার সহিত জল দুগ্ধ-শর্করা ও মাখন বা ক্রীম মিশ্রিত করা আবশ্যক ।

বয়স হিসাবে দুগ্ধের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হয় । সেই সঙ্গে জল, দুগ্ধ-শর্করা মাখন বা ক্রীমের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা আবশ্যক হয় ।

ডীজানেজ নারায়ণ বাগচি ।

প্রবাসে

হে স্বামী তব লিপি বিনেও
দিন ত কাটে মোর,
শরৎ কালের শুভ্র আলোর
ঘনায় না ত ঘোর,
আকাশের এই আলোর পাতে
অঁক পড়ে না কালীর তাতে ;
রবি-করের অঙ্গনেতে
পর্যণ আজো তোর ।

তোমারি এই বিশ্ব-ঘরে
লোকের আনাগোনা,
হাজার কাজের হাট বসেছে
বিকার রূপা-সোনা,
লক্ষ বেচা-কেনার মিছে
চিত্ত আমার চঞ্চলিছে,
কতই টানে নিত্য টানে
যার নাকো তার গোণা ।

তোমা বিনেও পুলকে মোর
কাটছে সারা বেলা ;
চিন্ত-গগন জুড়ে আত্ম সে
রৌপ্য মেঘের খেলা ;
ভ্রামল ঘাসের যে মণ্ডলে
শিউলি ফুলের চুম্বকি জ্বলে
সেই শোভন শরন সে যে
পর্যণে মোর খেলা ।

ভালো লাগে এ বাতাস আর
এই আকাশের আলো,
নদীর বেলায় চামর ধোলে
লাগে তা মোর ভালো ;
নিম্নের পাখে কপোত দু'টি
পর্যণ আমার লটকে লুটি,
তাদের প্রেম-লীলার আমার
এ চিত্ত ঘনালো ।

সতীর বড়াই করি নাকো
নাইকো সতীর মান,
শতক টানে কিরছি, নাইকো
তোমার দিকে টান ;
তোমার ঘরের আলো-ছায়া
হিরায় আমার ঘনায় মায়া,
তোমার আপন জনার প্রাণে
বহার পুলক বান ।

জগৎ-কুটা বর্ণ-রাগে
রঙের জোয়ার খেল,
সেই ধানেতে হৃদয় আমার
দিইছি ওগো মেলে ;
সেই গোপন জ্যোতির মাঝে
তোমার চির আপন রাজে
ছড়িয়ে-পড়া মন আমার তা'
ছেড়েছে অবহেলে ।

আজ তোমারি আলো-ছায়ার
তোমার আছে ঘিরে,—
ক্ষোণার রবি, ইজ্ঞাঘ
গুধু চূর্ণ নীরে ?
ভবুও জানি গভীর প্রেমে
লিপি তোমার আসবে নেমে
কল্পণ কানন কুটবে সারা
বন্ধ আমার চিরে !

সে দিন আঁধার পর্দাখানি
নামুবে ধরনীতে,
হাজার-কাটা তিরায় টেনে
উঠবো তরনীতে !
আকাশ-বারের তরঙ্গমা
কুটাক না আজ এ ভঙ্গিমা,
কাটুক না প্রাণ হাজার রঙের
রক্ত কলনীতে ।

ঐচ্ছিকব্রহ্মচারী

পরিজ্ঞান *

সুবিশাল নদ-বকে তরলীর তরঙ্গ-বিক্ষেপে
ছল-ছল, সমুদ্রল, জলরাশি ওঠে কল-হাসি ;
পরিচিতি সে কল্লোল পলিল শ্রবণে যবে আসি'
আনন্দ-আগ্রহ-ভরে চেতনায় উঠিলাম কেঁপে !'
এই যে জননী যোর—নীলাধরে আঁখি দু'টি তুলি,
কাকন-কুন্তলরাশি হিণে কিরণে মুক্ত করি,
বিশ্রাম-আলসে আজি আছেন বসিয়া আহা মরি,—
কতই যে মেহ-ভরে !

মা আমার, কারা-বার খুলি' ।

অভাগা এসেছে তোর—শাস্তি-স্বপ্না করিবারে পান !
ওরা যোরে ধরে' রাখে বন্ধ করি' নিরঙ্ক কারায়,
আসিতে দেয় না ; তাই, আইলাম আজি মা' পালায় !
মা জননি, তোর কোলে আজি হ'ল পুণ্য পরিজ্ঞান !
শুধুই এখন ওই সোণা-গালা মেহের প্রবাহে
ভেসে' যাবে, দয়াময়ি,—আর্তি-হিয়া এই শুধু চাহে !
শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী ।

বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্রাবশেষাদি

মহারাজ অশোকের রাজত্বের পূর্বেই বুদ্ধ ভগবান
রূপে পূজিত হইতেন। কিন্তু কোন সময়ে তাঁহার
মূর্তি-পূজা প্রচলিত হয় তাহার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া
যায় না। গাঁচী প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন প্রস্তর শিল্পাদিতে
বুদ্ধদেবের মূর্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে
যে স্থলে বুদ্ধদেবের মূর্তির কল্পনার আবশ্যকতা, সে
স্থলেও বুদ্ধদেবের পদাঙ্ক, ধর্মচক্র প্রভৃতি তাঁহার মূর্তির
স্থান অধিকার করিয়াছে। বাহা হউক অর্হতের প্রস্তর
শিল্পটিতে বুদ্ধদেবের পদাঙ্কের সম্মুখে জাহ্নব উপর উপ-

বিষ্ট মহারাজ অজাতশত্রুর উৎকীর্ণ মূর্তি অঙ্কিত আছে।
ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অশোকের
পূর্বে বুদ্ধদেব ভগবান রূপে পূজিত হইলেও তাঁহার
মূর্তিপূজা প্রচলিত হয় নাই।

মথুরায় ভগবান বুদ্ধ ও মহাবীরের মূর্তির অভাব
নাই। সেই সকল মূর্তি সংশ্লিষ্ট উৎকীর্ণ লিপিকলিতে
যে তারিখের উল্লেখ আছে তাহাদিগকে শকাব্দ অনুসারে
গণনা করিলে (এবং এইরূপ গণনা করার যথেষ্ট কারণ
আছে) প্রতাপন্ন হইবে যে, মূর্তি পূজার পদ্ধতি খৃষ্টীয়
প্রথম শতাব্দীতেই প্রচলিত ছিল।

ভগবান বুদ্ধের মূর্তি কোন আদর্শে নির্মিত হইয়াছে
তাহা ঠিক বলা যায় না। ভাষাগত পদ্যাসনে উপবিষ্ট,
এবং একটি বহু প্রাচীন মূর্তির নিম্নে “ভগবতো পিতা-
মহন্ত” এই কয়েকটি কথা উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।
ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, ব্রহ্মার আদর্শেই
বুদ্ধমূর্তি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত
হওয়ার পূর্বে অরণ করা উচিত যে, বৌদ্ধ শিল্পে গ্রীক
প্রভাব বিলক্ষণ বিদ্যমান আছে। গাঙ্কারের প্রস্তর শিল্পে
গ্রীক আদর্শের স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, এবং এরূপ অনেক
কারণ আছে যাহাতে নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে
পারে যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে চতুর্থ শতাব্দী
পর্যন্ত গাঙ্কারের প্রস্তর শিল্পে গ্রীক প্রভাব বিদ্যমান
ছিল। কিন্তু ভারতীয় আদর্শে খোদিত বুদ্ধ মূর্তিতে
শাস্ত্রোক্ত মহাপুরুষের লক্ষণসকল দৃষ্ট হয়, এবং এই
আদর্শে যথেষ্ট শিল্প কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

নানা কারণে সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, বুদ্ধ মূর্তির
পূজা যুগে পূঃ প্রথম শতাব্দীতেই চলিত হইয়াছিল।
ফাহিয়ান ও হুয়েন সাং উভয়েই সাংকান্ডে ১০ হস্ত উচ্চ
একটি বুদ্ধমূর্তি দেখিয়াছিলেন। আবার হুয়েন-সাং
পেশোয়ারে কনিষ্কত্বপের সন্নিকটবর্তী ১৮ ফিট উচ্চ শ্বেত-
প্রস্তরের একটি বুদ্ধমূর্তি দেখিয়াছিলেন। এই মূর্তি
দেবভাবাপন্ন ছিল বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। ইহা
রাত্রিকালে কণির্ক শূপের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিত।

* বিখ্যাত নদী-বকে ।

সুপ্রসন্ন অপর মন্দির গুলিতেও মণিমাণিক্যখচিত এবং সুগঠিত বহু মূর্তি ছিল। এগুলি হইতে সুমধুর শব্দ ও গন্ধ নির্গত হইত। বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথ বিহারে ধর্মচক্র প্রদর্শন করিতেছে তথাগতের এরূপ একটি পিত্তল-মূর্তি ছিল। বামিয়ানে প্রায় সহস্র ফিট উন্নত একটি বুদ্ধ মূর্তি ছিল। মূর্তিটি হেলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইরূপ ভাবের মূর্তিতে বুদ্ধদেবের মহানির্মাণ লাভের অবস্থা সূচিত হয়। কুশি নগরের সন্নিকটে শালবনে এক পবিত্র স্থানে হুয়েন-সাং বুদ্ধদেবের এই রূপ নির্মাণের অবস্থানচক মূর্তি দেখিয়া ছিলেন।

মধ্য যুগে তথাগতের চিত্রও দুর্লভ ছিল না।

পেশোয়ারে কণিষ্ক-স্তূপের নিকটে

তথাগতের চিত্র হুয়েন-সাং এইরূপ একটি চিত্র দেখিয়া

মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই স্তূপের পার্শ্ব-

দেশে বোধি বৃক্ষের নিম্নে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ৪ ফিট ও ৬ ফিট উচ্চ দুটি বুদ্ধ মূর্তিও তাঁহার নয়ন-গোচর হইয়াছিল।

বুদ্ধ-শিষ্যগণ শাক্য মুনির পূর্ববর্তী তথাগতগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ঔদাসীন্য় করেন নাই। অনেক স্থলে শাক্যমুনির মূর্তির পার্শ্বে তাঁহার পূর্ববর্তী তিন বা ছয় জন তথাগতের মূর্তিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে মানবের উদ্ধারকর্তা বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় এই সকল তথাগত অপেক্ষা সমধিক সম্মানের

বোধিসত্ত্ব পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

উজ্জানের সমীপবর্তী একটি উপত্যকায়

এই বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের ৯০ হাত উচ্চ এক মূর্তি ছিল। মূর্তিটি স্বর্ণবর্ণ কাঠে নির্মিত। বোধিসত্ত্ব এখনও ভূতলে অবতীর্ণ হন নাই, সুতরাং তাঁহার মূর্তি-নির্মাণ অর্থাৎ মধ্যাষ্টকের ঋদ্ধি-বলে স্বর্গে গিয়া তাঁহার শারীরিক গঠনাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া পৃথিবীতে কিরিয়া আসেন, এবং পরে তাঁহার মূর্তি নির্মাণ করেন।

মহাবান সম্রাটের বৌদ্ধগণও অবলোকিতেশ্বর এবং মঞ্জুশ্রী নামক বোধিসত্ত্বের প্রতি মৈত্রেয়ের অপেক্ষা কম

সম্মান প্রদর্শন করে না। ফা-হিয়ানের লিখিত বিবরণ

অবলোকিতেশ্বর পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহাবান

পথাবলম্বী বৌদ্ধগণ মথুরাতে প্রজ্ঞা-

পারমিতা, মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরের পূজা করিতেন।

দুই শতাব্দী পরে অবলোকিতেশ্বরের অসংখ্য মূর্তি কপি,

উদ্যান, কান্দীর, কাণ্যকূজ, গয়া এবং

মঞ্জুশ্রী মহারাষ্ট্র দেশের কপোত মঠ প্রভৃতি স্থানে

দৃষ্ট হইয়াছিল। অবলোকিতেশ্বর সাধা-

রণতঃ সমস্তমুখ নামে পরিচিত, এবং বোধ হয় সেই

নামানুসারেই তাঁহার মূর্তিকে বহুমুখী করা হইয়াছে;

কিন্তু ফা-হিয়ানের বিবরণীতে অবলোকিতেশ্বরের বহু

মুখের উল্লেখ নাই।

মঞ্জুশ্রী মথুরাতেই সম্মানিত হইয়াছিলেন। কোন

এক মঠে তাঁহার পবিত্র দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছিল,

কিন্তু মূর্তির কোনও উল্লেখ নাই।

বর্তমান সময়ে মঞ্জুশ্রীর চতুর্ভুজ মূর্তি নির্মিত হইয়া

থাকে, কিন্তু আদিত্যবর্ণন নির্মিত যব দ্বীপের মঞ্জুশ্রী

মূর্তি চতুর্ভুজ নহে।

মহাবান পথাবলম্বী বৌদ্ধগণের মন্দিরাদিতে ধ্যানী

বুদ্ধগণের মূর্তি প্রবর্তিত হইলে পর তাঁহার সম্মানের

সহিত পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ইহাদের এবং

ইহাদের ভাগ্যগণ ও পুত্রগণের চিত্র এবং মূর্তি নেপাল,

তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া দেশে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

ধ্যানী বুদ্ধগণের মুখাবয়ব ও দৈহিক গঠন বুদ্ধ মূর্তির

অনুরূপ, এবং তাঁহাদের সকলেরই পদ্মাসন, কিন্তু বাহন

বিভিন্ন। বৈরোচনের বাহন সিংহ, অশোকেশ্বরের বাহন

হস্তী, রত্নসম্ভবের বাহন অশ্ব, অমিতাভের বাহন হংস এবং

অমোঘসিদ্ধির বাহন গরুড়। আবার এই পাঁচ জনের

মুদ্রাও ভিন্ন ভিন্ন। ইহাদিগকে চিত্রে অঙ্কিত করিতে

হইলে প্রত্যেকের জন্ত বিভিন্ন বর্ণের ব্যবহার হইয়া

থাকে। প্রত্যেক বুদ্ধের যে বর্ণ তাঁহার তারা, বোধিসত্ত্ব

এবং পুত্রগণও সেই সেই বর্ণে চিত্রিত হইয়া থাকে।

এই সকল মূর্তি দণ্ডায়মান অবস্থায়ই অঙ্কিত হইয়া থাকে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সত্ত্বকে ত্রিরস বলে। এই ত্রিরস বা রত্নত্রয় অতি পবিত্র। ত্রিরসের পরে ধাতু। ধাতু (ত্রিরস) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা, শারীরিক, উদ্দেশিক, এবং পারিভোগিক। সাধারণতঃ ধর্মাত্মাদিগের দেহাবশেষ শারীরিক এবং তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য সমাধি-স্তম্ভ বা স্তূপকেই উদ্দেশিক, এবং যে সকল পদার্থ ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছেন সে সকল পদার্থ, পবিত্র স্থান বা তীর্থ এবং পবিত্র বস্তুাদিকে পারিভোগিক ধাতু বলে। কথিত আছে ভল্লিক ও ত্রপুণ নামক দুই জন বণিক বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করিলে পর ভগবান বুদ্ধ তাহাদিগকে কয়েকটি কেশ প্রদান করেন। সেই গুলিই প্রাচীনতম শারীরিক ধাতু। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে গৌকে বলিতে লাগিল যে, সেই দুই জন বণিকই বুদ্ধদেবের নিকট হইতে তাঁহার নখ, ভিক্ষাপাত্র, যষ্টি, এবং পরিচ্ছদত্রয়ও প্রাপ্ত হইয়াছিল।

দেবশ্রেষ্ঠ সূমনাকে বুদ্ধ এক মুষ্টি কেশ প্রদান করেন। সূমনা সেই কেশগুচ্ছ একটি স্বর্ণ-কোটার রাখিয়া বণির স্তূপে প্রোথিত করিয়া রাখেন। এই পবিত্রাবশেষ অষ্টাঙ্গ সিংহলে রহিয়াছে, এবং ইহা ভগবান বুদ্ধ প্রদত্ত কেশাবশেষের ভ্রাতৃ প্রাচীন বলিয়া সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন। অথোধ্যা, কাণ্যকুজ, মথুরা, কোশালী প্রভৃতি নগরে স্তূপ-মধ্যে তথাগতের কেশ ও নখাদি প্রোথিত আছে, তন্মধ্যে কাশ্মীরের অবশেষগুলির অলৌকিক দৈব ক্ষমতা আছে বলিয়া জন সাধারণ বিশ্বাস করিত।

বৌদ্ধগণের মতে বুদ্ধদেবের একটি দন্ত স্বর্গে, একটি পাক্ষারে, একটি কলিঙ্গে এবং একটি নাগলোকে পূজিত হইয়া থাকে। দন্তপুরে (কলিঙ্গ বুদ্ধদেবের পবিত্র পতন) রক্ষিত দস্তাবশেষের ঐতি-দেহাবশেষ হাসিক বিবরণ দাঠাবংশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই দস্তাবশেষটি সিংহলের অম্বরাধাপুরে আনীত হয়।

পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়ান ইহা সেখানে দেখিয়াছিলেন। তিনি গাঙ্কার প্রদেশস্থ নগরের স্তূপে রক্ষিত একটি দস্তেরও উল্লেখ করিয়াছেন। হুয়েন-সাং এর বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার সময়ে ইহা অন্তর্গত হইয়াছিল। তিনি কাশ্মীরেও ভগবান বুদ্ধের দস্তাবশেষ দেখিয়াছেন। বামিয়ান, বল্খের সমীপবর্তী নববিহার এবং কপিথ প্রভৃতি স্থানেও বুদ্ধদেবের দস্তাবশেষ ছিল। কাবুল নদীর দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী নগর নামক স্থানে ভগবান বুদ্ধের বহু পবিত্রাবশেষ ছিল। হিন্দ নগরে একটি স্তূপে তথাগতের করদাবশেষের কিয়দংশ রক্ষিত ছিল। ইহার বাকী অংশ ও চক্ষুতারা দুটি সেই নগরেই আরও দুটি মন্দিরে বিদ্যমান ছিল।

পূর্বলিখিত দস্তাবশেষ ব্যতীত সিংহলে বুদ্ধদেবের একটি স্বক্কাস্থি তাঁহার চিতা হইতে জিনের স্বক্কাস্থি আনীত হইয়াছিল। গৌতম বুদ্ধের বহু অস্থাবশেষ কুয়ানওয়েলি স্তূপে সংরক্ষিত ছিল। মহারাষ্ট্র অশোকের সময় দক্ষিণ স্বক্কাস্থিটি শ্রামণের সূমন সিংহলে আনয়ন করেন, কিন্তু কথিত আছে যে, এই অস্থিটি তিনি স্বর্গে ইন্দ্রদেবের নিকট প্রাপ্ত হন।

গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী তথাগতগণের অস্থাবশেষ একান্ত দুর্লভ। বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, একমাত্র কাশ্মীর বুদ্ধের অস্থি খণ্ডগুলি তথাগতগণের শ্রাবস্ত্র নগরীর একটি স্তূপে রক্ষা দেহাবশেষ করা হইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবের শিষ্যবর্গ এবং অন্যান্য বৌদ্ধ মহাপুরুষগণের শরীরাবশেষ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বৈশালী নগরীর নিকটে আনন্দের দেহার্কের উপর একটি স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। অপরাধ পবিত্রাবশেষরূপে বগধে রাখিয়াছে। সারিপুত্র, মৌদগল্যানন, পূর্ণমৈত্রায়নীপুত্র, উপালি, আনন্দ এবং রাহুলের সম্মানার্থে তাঁহাদের পবিত্র দেহাবশেষের উপর মথুরা নগরীতে স্তূপ নির্মিত

হইয়াছিল। আবার বৌদ্ধশ্রেষ্ঠ উপাধ্যেয় নথ ও অশ্বারাজি এই নগরেই সম্মানের সহিত সংরক্ষিত হইয়াছিল। ককণ প্রদেশের বনভাগে ঐতবিশ্বতি-কোটির (শ্রোণকোটি বিংশ ?) অবশেষসমূহ একটি ভূপ মধ্যে নিহিত ছিল। কুকুটপাখনামক পর্বত-বিবরে ভগবান কান্তপের সমগ্র দেহ রক্ষিত আছে।

অত্যাশ্চর্যের ভায় পরিভোগ ধাতুও সম্মানিত ও পূজিত হইত; তবে কোন সময়ে ইহাদের প্রতি এই রূপ ভক্তি প্রদর্শন আরক হয় নিশ্চয় বলা যায় না। সম্ভবতঃ মধ্য যুগের প্রারম্ভেই ইহাদের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল।

ভারত ভ্রমণ কালে ফা-হিয়ান নগর নামক স্থানের নিকটে ১৬ কি ১৭ হাত লম্বা বুদ্ধদেবের চন্দন কাঠের যষ্টি দেখিয়াছিলেন। যিনি বুদ্ধদেবের যষ্টি ১৬ হাত লম্বা যষ্টি ব্যবহার করিতেন তিনি কিরূপ দীর্ঘাকার ছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আবার নগরের অনতিদূরবর্তী একটি মন্দিরে হুয়েনসাং বুদ্ধদেবের সম্মাণী ও কাব্যর দুইই দেখিয়াছিলেন। ফা-হিয়ানের ভারত-প্রবাস কালে তথাগতের ভিক্ষাপাত্র পেশোয়ারে ছিল। জন সাধারণ ভক্তি করিয়া এই ভিক্ষাপাত্রের নিকট নানা উপহার প্রদান করিত। দুই শতাব্দী পরে এই ভিক্ষাপাত্র বৈশালী হইতে পেশোয়ারে আনীত হয়। ফা-হিয়ান এই ভিক্ষাপাত্র সম্বন্ধে তৎকালে প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই

ভিক্ষাপাত্র যথাক্রমে তুর্কিস্তান, খোচান, কয়চয়, চীন, সিংহল ও ভারতবর্ষ হইয়া ভিক্ষাপাত্র শেষে স্বর্গে ফিরিয়া যাইবে। দীপ-বংশে আরও অনেক পরিভোগধাতুর উল্লেখ আছে যথা, ককুসকবুদ্ধের পানপাত্র, কোণাগমনের কটিবন্ধ, এবং কান্তপ ও গৌতমের স্নানবস্ত্র। গৌতমের কটিবন্ধ কার্যকরন চৈত্রে রক্ষিত হইয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতে ককণপুরের একটি বিহারে সিদ্ধার্থের

বৈশবকালের একটি উকীষ সপ্তম সিদ্ধার্থের উকীষ শতাব্দীতে ছিল বলিয়া জানা যায়। পরদিনে এই উকীষটি বাহির করা হইত এবং জনসাধারণ পুষ্পোপহারে ইহার পূজা করিত। বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠ সাণবাসিকের পরিচ্ছদ হুয়েন-সাং বামিয়ানে দেখিতে পান। পরিচ্ছদটি দৈর্ঘ্য রক্তাক্ত ও শাপনির্মিত ছিল। সাণবাসিক ১৫০০ বার জন্ন গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রতিবারেই এই পরিচ্ছদটি তিনি পরিধান করিয়াছেন, এবং যত দিন বৌদ্ধ ধর্ম বর্জন্যন থাকিবে তত দিন এই পরিচ্ছদের লয় হইবে না।

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে, কোন কোন স্থানে ভগবান বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের ছারামূর্তি অস্ত্রাণি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তাহাদের মতে কৌশাঘী, গল্প, ও নগর নামক স্থানে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের এই রূপ ছারামূর্তি দেখা যাইত।

কৌশাঘীর নিকটে যে গুহার এই ছারামূর্তি দৃষ্ট হইত বলিয়া কথিত হইত, হুয়েন-সাং হস্তাশেষে সেই গুহাটি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু ছারামূর্তি দেখিতে পান নাই। তিনি পরার গুহাতে এইরূপ মূর্তি দেখিয়াছিলেন। পরিত্রাজক ফা-হিয়ানও তাহার পূর্বে এই ছারামূর্তি দেখিয়া যুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩ ফিট ও দেখিতে বেশ উজ্জল বলিয়া তিনি বলিয়া গিয়াছেন। নগর নামক স্থানের ছারামূর্তিই সমধিক বিখ্যাত। এই গুহার নাগপোপাল বাস নির্মাণের অব্যবহিত পূর্বে তথায় বুদ্ধদেব তাহার এই ছারামূর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই গুহার প্রবেশ-পথে ধর্মচক্র চিহ্নিত তথাগতের পদচিহ্নযুক্ত দুইটি বর্গাকার প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হইত।

শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

রিজডেভিড্‌স্, কার্ণ, বার্গেস প্রভৃতির গ্রন্থ এবং হুয়েন সাং ও ফা-হিয়ানের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে সংগৃহীত। লেখক।

নামি-কো

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জুশি

জন্মের হিংসা লইয়া, হতমান চিঞ্জিওয়া গৃহ-প্রত্যাগত-
নের পাঁচ দিন পরেই হঠাৎ সদরের আপিস হইতে
একটা সৈন্তদলে বদলি হইয়া গেল।

জীবনে অন্ততঃ এক বার এমন সময় আসে, যখন
জামরা যে কাজে হাত দিই তাহাই নষ্ট হইয়া যায়,
অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া পড়ে,—যেন
ভগবানের শাস্তির আর বিরাম নাই।' গত বৎসর
চিঞ্জিওয়ার অবস্থা ঠিক এই রূপই হইয়াছিল, এখনো
সে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। নামিকে তাকেও
হেঁ মারিয়া লইয়া গেল; ব্যবসারে লোকসান হইল;
টাকা ধার করিতে গিয়া লাভ হইল অপমান; শেষে
কি না বাহাকে সে সামান্য ছোকরা বলিয়া অবহেলা
করিয়া আসিয়াছে সেই তাকেও তাহাকে অপদস্থ
করিল! তাহার একমাত্র আত্মীয় কাওয়ারশিমা পরিবারের
সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে। তারপর কথা নাই
বার্তা নাই, তাহার দ্রুত উন্নতির সোজা রাস্তা, সদরের
চাকুরিটি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দেওয়া হইল সৈন্ত-দলে
একটা সামান্য কাজ—যা সে এত দিন দাস-বৃত্তি বলিয়া
স্বপ্ন করিয়া আসিয়াছে!

চিঞ্জিওয়া কিন্তু বীর অপরাধের কথা ভালো রকমই
বুঝিত, তাই কোনো প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল
না। হুঁতাপ্যকে বরণ করিয়া লইয়া সে নুতন কাজে
মনঃসংযোগ করিল। এত দিন সে খুব বীর-হির গোছেয়
লোক ছিল, তাহার উপহিত বুদ্ধি কখনো লোপ পাইত
না; কিন্তু শেষোক্ত ঘটনাটি তাহাকে এমন একটা
বা দিয়া গেল যে, অপমানের কথা মনে হইলে সে
কিছুতেই হির থাকিতে পারিত না, তাহার রক্ত বেন
হুটিতে থাকিত।

সোপান শ্রেণীর ছ' এক বাগ উঠিয়াছে এমন সময়
সহসা সেখান হইতে থাকা দিয়া ফেলিয়া দিলে যেমন
হয়, চিঞ্জিওয়ার জীবনের বর্তমান অংশ অনেকটা
সেই রূপ। কিন্তু তাহাকে ফেলিয়া দিল কে? তাকেও
কথার ভঙ্গী হইতে, এবং সদরের যিনি প্রধান তাহার
সহিত লেফ্টেন্যান্ট জেনারল্ কাতাওকার খনিষ্ঠ
বন্ধুত্বের কথা শ্রবণ করিয়া চিঞ্জিওয়ার সন্দেহ হইত যে,
এবিধের কাতাওকার কিছু হাত ছিল। সে জানিত
তাকেও অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তবে তাহার
তিন হাজার টাকার লব্ধ এত রাগ কেন? সে নয়
তাহার নামের মোহরটি জাল করিয়াছে! ইহার মধ্যে
অর্থের চেয়েও গভীরতর আরও কিছু নাই ত? সেই
পুরানো প্রেম প্রার্থনার কথা—নামি তাকেওকে বলিয়া
দেয় নাই ত? বড়ই সে ভাবিতে লাগিল ততই
তাহার সন্দেহ দৃঢ় হইয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও
বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রেম-পরাণের, কার্য হইতে
বিতাড়ন প্রভৃতি তাহার মনে যে দারুণ হিংসা, ঘৃণা ও
হতাশার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা এখন জেনারল্, তাকেও
ও নামির চারি দিকে আগুনের হকার মত লাফাইয়া
উঠিল। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারে বলিয়া সে পৌরষ
করিত এবং উদ্ভেজন্যর বেশে বাহারা জ্ঞানপূত্র হয়
তাহাদের মূর্খতা দেখিয়া বিজ্ঞপ করিত। কিন্তু এখন—
বার বার ব্যর্থকাম হইয়া যেজাজ তাহার এমন
বিগড়াইয়া গিয়াছে যে, সে ক্রোধ রাধিবার আর স্থান
পাইতেছে না।

প্রতিহিংসা! বাহাদের ঘৃণা করি তাহাদের
রক্তপানে যে আনন্দ তাহার ভুলনা নাই। প্রতিহিংসা!
কিন্তু কেমন করিয়া? বিফোরক সংযোগে কেমন
করিয়া কাতাওকা ও কাওয়ারশিমা এই দুইটা ঘৃণ্য
পরিবারকে উড়াইয়া দেওয়া যায়। এই ঘৃণ্য জী-
পুরুষগুলোর পায়েয় মাংস যখন টুকরা টুকরা হইয়া
বাইতেছে, হাড়গুলো ভাঙা হইতেছে, আঘবরা
অবস্থার তাহারা যখন মরণের পথে চলিয়াছে, তখন

নিরাপদে ঘরে দাঁড়াইয়া কেমন করিয়া এই চমৎকার
বৃত্ত উপভোগ করা যায়। এই কথাই গত জাহ্নারি
যাগ হইতে দিন রাত চিজিওয়ার মনের মধ্যে
আনাগোনা করিতেছে।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি প্রায়ের ফুলগুলি যখন ফুটার
কণার মতন করিয়া পড়িতেছিল তখন চিজিওয়ার
এক বন্ধু ভোঁকিতে বদলি হইয়াছিল। তাহার
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চিজিওয়া শিন্‌বাশি
ট্রেনে গিয়াছিল। ওয়েটিং রুম হইতে বাহিরে
আসিয়াই মহিলাদের ঘরের সম্মুখে একটি দীর্ঘকারা
ক্রীলোক ও একটি তরুণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

“কেমন আছ?”

কাতাওকা-গৃহিণী ও কোমা তাহার সামনে দাঁড়াইয়া।
মুহূর্তের জন্য চিজিওয়া বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তাহাদের
মুখ দেখিয়া বুঝিল, তাহারা তাহার কার্যাবলীর কথা
অবগত নহে; তাই তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইল।
জেনারল ও নামির উপর তাহার রাগ। কাতাওকা-
গৃহিণীর সহিত শত্রুতা করিয়া কোনো লাভ নাই!
তাই সে সবিনয় নমস্কার করিয়া সহাস্রমুখে দিচ্ছাসা
করিল, “আপনারা কেমন আছেন?”

“তোমার ত আর দেখাই পাওয়া যায় না।”

“দেখা করুন করুন মনে করছিলুম, কিন্তু তারি ব্যস্ত
ছিলুম তাই পারি নি। কোথায় চলেচেন?”

“জুশি। জুশি কোথায় যাবে?”

“এই এক জন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। বেড়াতে
যাচ্চেন না কি?”

“কেন জুশি শোন নি না কি? রোগী দেখতে যাচ্ছি।”

চিজিওয়া আশ্চর্য হইয়া দিচ্ছাসা করিল, “রোগী?
কে?”

ভারকাউণ্টেস্ বলিলেন, “নামি।”

যতটা বাঞ্ছিত। আরোহীর দল বস্তার মত প্লাট-
ফর্মের কটকের দিকে ছুটিয়া চলিল। কোমা কহিল,
“কেন হইতেছে, শীগগির চল।”

ভারকাউণ্টেসের হাত হইতে থলিটি লইয়া চিজিওয়া
তাহার পাশে পাশে চলিল।

“অমুখ বেগী না কি?”

“ইয়া, বুকের অমুখ।”

“যম্মা?”

“মুখ দিবে ভয়ানক রক্ত পড়েছিল তাই সে দিন
জুশি গেছে। আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি।” ফটকের
নিকট গিয়া চিজিওয়ার হস্ত হইতে থলিটি নিয়া তাহাকে
ধন্যবাদ প্রদান করিলেন ও কহিলেন চলুন। শীগগির
ফিরুন। এসো এক দিন দেখা করতে।”

চিজিওয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, সুন্দর কাপ্তানির
শাল ও লালফিঁতা বাধা খোঁপা একখানি প্রথম শ্রেণীর
গাড়ীর মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তার পর সে ফিরিল,
মুখে তাহার প্রতিহিংসার হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নামির রোগের লক্ষণ ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।
চিকিৎসক আশঙ্কা না জাগাইয়া বধাসাধ্য করিতে
লাগিলেন। কিন্তু তৎসম্বন্ধে অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ
হইতে লাগিল। মার্চ মাসের প্রারম্ভে বেশ বুঝা গেল
যে, তাহার যম্মা রোগ হইয়াছে। এমন কি নামির
শত্রু ঠাকুরাণীর, যিনি এতাবৎকাল স্বীয় স্বাস্থ্যের পৌরব
করিয়া আসিয়াছেন ও জলহাওয়া বদলের দ্বারা রোগের
প্রতিকার হেলেমানুষের আশ্রয় কল্পনা বলিয়া বিজ্ঞপ
করিয়াছেন, তিনিও নামির রক্ত-বমন দেখিয়া চিন্তিত
হইয়া উঠিলেন। এই ভয়ানক রোগটা ছোঁয়াচে রোগ
তাহাও তিনি শুনিয়াছিলেন, তাই পরিণাম-ভয়ে ভীত
হইয়া চিকিৎসকের উপদেশ মত নামিকে উপযুক্ত সেবি-
কার সঙ্গে জুশিতে কাতাওকার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন।

রোগের প্রথম আক্রমণটা দেখিয়া নামি ত্রস্ত ও চকিত
হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল সে যেন
এক বর্ষগোমুখ বনকক মেঘান্তরণে ঢাকা জনহীন অগাধ
প্রান্তরের মধ্য দিয়া একাকিনী চলিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে
ভয়ানক শুষ্কতা ভঙ্গ হইয়াছে, নামি বজ্রবিদ্যুৎ, উদ্যম
বাতাস ও বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া; এখন সে ভাবিতেছে

বেশন করিয়া হউক বড়-বজার আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইবেই হইবে। কিন্তু তবুও যোগের সেই প্রথম আক্রমণের কথা মনে হইলে পাত্র শিহরিয়া উঠে!

সে দিন মার্চ মাসের দোসরা। নামি খুব সুস্থ বোধ করিতেছিল। সে ফুল শাজাহতেছিল। বহু দিন এ কাজ সে করে নাই। তাকেও বাড়ী ছিল, তাহাকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আনিতে বলিয়া বারান্দায় বসিয়া সে একটি সুন্দর ফুটনোমুখ লাল প্লাথ গাছ হইতে ডাল বাড়িয়া লইতেছিল। হঠাৎ তার বুকে একটা ব্যথা অনুভূত হইল, মাথা ঘুরিয়া গেল, চীৎকার করিয়া সে ঢলিয়া পড়িল। দারুণ শকার সহিত সে যে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল অবশেষে তাহা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই বার তাহার মনে হইল, সে যেন দূরে অস্পষ্ট ভাবে মৃত্যুর দ্বার দেখিতে পাইয়াছে।

হার, মৃত্যু! নামি যখন অসহায় শিশু তখন জীবনে তাহার সুখ ছিল না, মরণেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু এখন সে জীবনে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে, এখন জীবনের অবসান করনা করা কি ভয়ানক! তাই মৃত্যুর কথা মনে হইলেই সে ভাবিত, ইহার বিরুদ্ধে সে প্রাণপণ যুদ্ধ করিবে। দুর্বল চিত্ত দৃঢ় করিয়া, চিকিৎসকের বিষয় উৎপাদন করিয়া, সে বিশেষ আগ্রহ সহকারে শরীরের যত্ন করিতে লাগিল।

তাকেও সে সময়ে জুশির নিকটবর্তী য়োকোসুকা নামক নৌনিবাসে থাকিত। একটু সময় পাইলেই ছুটিয়া নামিকে দেখিতে আসিত। পিতার নিকট হইতে পত্র আসিত, মাদিমা ও চিহ্ন প্রায়ই তাহাকে দেখিতে আসিতেন। তার পর তাহার বৃদ্ধা ধাত্রী ইকু এমন মেয়ের সহিত তাহার পরিচর্যা করিতেছিল যে, নামি পীড়ার দুঃখের মধ্যেও আনন্দ অনুভব করিত। গত গ্রীষ্মকালে কাওয়ারাশিমা পরিবার হইতে বিভাদ্রিত হইয়া অবধি ইকুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই; পীড়া না হইলেও তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত না, এই কথা ভাবিয়া নামির আনন্দ হইত। আর এক জন পুরাতন

অনুরক্ত ভৃত্য তাহার সুখস্বাস্থ্যের জন্য সদাই ব্যাপৃত থাকিত। শীতের সময় সহর ছাড়িয়া নামি রৌদ্রালোকিত তটভূমির সুখোন্ম আশ্রয়ে আসিয়াছিল। উদার প্রকৃতির উষ্ণ আলোক ও মাহুয়ের প্রীতির বেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া নামি সুস্থ বোধ করিল। দুই সপ্তাহ পরে রক্ত-বমন বন্ধ হইল, কাশিও কমিয়া গেল। সপ্তাহে দুই বার তোকিও হইতে চিকিৎসক আসিতেন। রোগ না সারিলেও বৃদ্ধি পাইতেছে না দেখিয়া তিনি সুখী হইলেন, এবং নামিকে কহিলেন, সহিষ্ণুতার সহিত চিকিৎসকের শুশ্রূষাধীনে থাকিলে ও উৎসেগপূন্য হইলে তাহার সারিয়া উঠা অসম্ভব নয়।

এপ্রিল মাসের প্রথম শনিবার। রাজধানীতে চেরি ফুল ফুটিবার বিলম্ব থাকিলেও এখানে পাহাড়ের উপর বগ্ন চেরি গাছগুলিতে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে; পাহাড়ের সবুজ গায়ে মাঝে মাঝে সাদা ছাপ পড়িয়াছে। আজ কিন্তু প্রকৃতির মূর্তি বিবদ। প্রত্যুৎ হইতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল, পাত্তবর্ণ কুয়াশার পাহাড় ও সমুদ্র এক হইয়া গিয়াছিল, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। বসন্তের দীর্ঘ দিনের আর যেন অবসান হয় না। সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, বাতাস বহিতে লাগিল, দরজা জানানার মধ্য দিয়া ঝটিকা হাহা রবে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। জুড় সাগরের গর্জন শুনিয়া মনে হইতেছিল, যেন লক্ষ লক্ষ বগ্ন তরঙ্গ ছুটিয়া চলিয়াছে।

কাতাওকার বাড়ীতে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। সেখানে তাকেওর অভ্যর্থনা চলিতেছিল। তাহার সকাল সকাল আসিবার কথা ছিল কিন্তু কার্যগতিকে বিলম্ব ঘটায় ঝটিকাসঙ্কুল রাত্রের অন্ধকারের মধ্য দিয়া সে আসিয়াছে। পোষাক পরিবর্তন করিয়া সন্ধ্যার আহার সারিয়া সে এখন একটি টেবিলের উপর বসিয়া পত্রপাঠে নিমগ্ন। টেবিলের অপর দিকে নামি বসিয়া একটি সুন্দর খলি সেলাই করিতেছিল; কখন কখন সেলাই থামাইয়া পত্রের দিকে চাহিয়া

বৃহৎ হস্ত করিতেছিল। কখনো বা নীরবে বাহিরের শব্দ শুনিতেছিল। এক গুচ্ছ চেরি ফুল ও পাতা তাহার কেনে আবদ্ধ। টেবিলের উপর উত্তরের মধ্যে একটি আলোক, আবরণের মধ্য হইতে গোলাপী আভা ছড়াইতেছিল। নিকটে একটি ফুলদানিতে এক গুচ্ছ চেরি পুষ্প। ভূবারের মত ফুলগুলি অবসন্ন ভাবে ধীরে ধীরে জুইয়া পড়িতেছিল। সে দিন প্রভাতে পাহাড়ের মাথায় যে বসন্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে ফুলগুলি বোধ হয় তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছিল।

বৃষ্টির ঝাপট ও বাতাসের শব্দ শব্দ বাড়ীর চতুর্দিকে শুনা যাইতেছিল।

তাকেও চিঠিখানি মুড়িয়া কহিল, “বাবা তোমার জন্ত তারি চিন্তিত হয়েছেন। কাল আমার তোকিও যেতে হবে, আকাশাকাতেও যেতে চেষ্টা করব।” “কাল যাবে? এই বৃষ্টি বাদলায়? ও! মা তোমার জন্তে অপেক্ষা করে আছেন। তোমার সঙ্গে আমার যেতে ইচ্ছে করচে।”

“নামি-সান্। এখানে তুমি কেন এসেচ সে কথা ভুলো না। মনে কর, কিছু দিনের জন্ত তুমি বনবাসে এসেছ।”

“এ যদি বনবাস হয় ত সারা জীবন এখানেই কাটাতে ইচ্ছে করে। তুমি চুরুট খেতে পার। গুন্ছ।”

“আমাকে দেখে বোধ হচ্ছে কি আমি চুরুট খেতে চাইচি? না, এখানে চুরুট না খাওয়াই ভালো। কিন্তু এখানে আসবার এক দিন আগে আর পরে সাধারণতঃ বা খাই তার ডবল খাবো, কেমন?”

নামি হাসিয়া বলিল, “তুমি বধন এমন ভালো ছেলে তোমাকে খান কতক ভালো কেক খাওয়াই। ইকু আনবে এখন।” “ধন্যবাদ। কেকও চিজু-সান্ এনেছিল না কি? ওকি? বেশ সুন্দর ত।”

“সবর কাটাবার জন্তে যার জন্তে এটি তৈরি করচি। না, না এতে আমার কষ্ট হবে না। আন্তে আন্তে কষ্ট বই ত নয়। আজ আমার খুব ভালো

বোধ হচ্ছে। ওগো! আল আমার একটু বেনীকণ ভেঙ্গে থাকতে দাও না। আমাকে আর ব্যারামীর মত দেখায় না, দেখায় কি?”

তাকেও হাসিয়া বলিল, “ডাক্তার কাওয়ারশিমা বধন উপস্থিত তখন তোমার ভালো বোধ হওয়া খুশি উচিত। না, না, বাস্তবিক আলকাল তোমার অনেকটা ভালো দেখাচ্ছে। আর কোনো ভয় নেই।” চা ও কেক লইয়া বৃদ্ধা ইকু প্রবেশ করিল। সে কহিল, “কি ঝড়টাই বইচে। কর্তা না এলে আজ রাত্তিরে ঘুমুনা দায় হ’ত। চিজু দিদি চলে গেছেন দাইও তোকিও ফিরে গেছে। বুড়ো মোহেই থাকলেও, ওরা না থাকলে এমন একলা বোধ হয়।”

“এমন দিনে সমুদ্রে নাবিকের অবস্থা কি রকম! কিন্তু আমার মনে হয় নাবিকের জন্তে বাড়ীতে বসে যে ভাবে তার অবস্থাই আরো শোচনীয়।”

এক পেরালা চা পান করিয়া ও টপ্ টপ্ করিয়া খান তিনেক কেক খাইয়া ফেলিয়া তাকেও কহিল, “হঁ, এ আর এমন কি ঝড়! দক্ষিণ চীন সমুদ্রে যদি দিন দুই তিন একটা বড় ঝড়ের মধ্যে পড়তে ত ঝড় কা’কে বলে তা বুঝতে। চার হাজার টনের বড় জাহাজ মোচার খোলার মত টলমল কর্ত, পাহাড়ের মত ঢেউগুলো ডেক ধূয়ে দিগে যেত, জাহাজের খোলটা কাঠের বাড়ীর মত ক্যাচ ক্যাচ শব্দ কর্ত। নিশ্চয় বলতে পারি সেটা বিশেষ আরাধের হয় না।”

ঝড়ের বেগ বাড়িয়া উঠিল। একটা দম্কা বাতাস বাড়ীর গারে বৃষ্টির ঝাপট মারিল, পাথরের মুড়ির বর্ষণ হইলে যেমন শব্দ হয় তেমন শব্দ হইল। নামি চকু মুদ্রিত করিল, ইকু বাড় কাঁপাইল। তাহার কথোপ-কথন থামাইল, কিছুকণ কেবল ঝড়ের ভীষণ শব্দ শুনা যাতে লাগিল।

“নিরানন্দ বিষয়ের আলোচনা আর ক’রে কাল নেই। এমন দুর্ঘটনায় বাতির আলো উজ্জ্বল করে দিগে আনন্দের কথাবার্তা করাই ভালো। এ জারপাটা

মোকোম্বুকার চেয়েও গরম। এরি মধ্যে বুনো চেরি গাছ
গুলোতে এই রকম ফল ফুটেচে।” ফুলগুলি ফুলদানিতে
রাখিয়া নামি বলিল, “আজ সকালে মোহেই বুড়ো পাহাড়
থেকে এগুলি এনেচে। কেমন, সুন্দর নয়? বড় রুটিতে
পাহাড়ের উপরকার গাছগুলোর ভারি কতি হবে।
কিন্তু ফুলগুলি কেমন নির্ভীক! হ্যাঁ, হ্যাঁ আজই বিকেলে
রেনেংসু এই সুন্দর কবিতাটি পড়হিলুম—

“ফুটিয়া সে মনের হরনে
কুসুম করিয়া প’ড়ে যায়;
তবু তবু নাই তা’র প্রাণে
ক’রে যায় কনক-উষায়।

“কি? বীরের মত পড়ে যাচ্ছে?” আমরা ফুল
আর অগ্ন্যস্ত্র জিনিসের ক’রে পড়াটা খুব তারিফ করি।
তারিফ করাটা মন্দ নয়, কিন্তু এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি
করাটা আবার কিছু নয়। বুড়ে বা আর কোনো
কালে শীর্ষগিরি ম’রে যাওয়া মানে হেরে যাওয়া।
আমাদের লোকেদের চরিত্রের দুর্দমনীয়, একান্তই,
সহিষ্ণু দিকটার আমি তারিফ করতে চাই। শোন।
আমার গানটা হবে এই রকম। শুনতে একটু অদ্ভুত
হবে, এই আমার প্রথম চেষ্টা কি না—

“বসন্ত ফুরায়
ফুল তবু নাই ক’রে যায়।
ক’রে গিয়ে কোন ফল নাই,
ফুটে থাকা চাই!
ম’রে গিয়ে কিবা ফল বল?
বৈচে থেকে কাজ করা ভাল।”

“কেমন? রেনেংসুকে হারিয়েচি কি না বল?”
ইকু বলিল “হ্যাঁ! কর্তা দেখচি রীতিমত কবি।
কেমন নয় কি দিদি?”
তাকেও আনন্দিত হইয়া বলিল; “ইকু যখন মজুর করেছে
তখন আর কি। কে বলে আমি কবি নয়।” কণেকের
গত কথোপকথনের বিরাম হইল। বড়ের ও ডেউয়ের
মিলিত শব্দ তরঙ্গিতে শোনা গেল। ভাসাদের মনে

হইতেছিল, তাহার যেন উদ্যম সাগরবন্দে ভাসিয়া
চলিয়াছে। ইকু কেতলিতে জল আনিতে বাহির হইয়া
গেল। নামি বুকের মধ্যে হইতে খান্দিটারটি বাহির
করিয়া লইয়া আলোকে দেখিয়া স্বামীকে সানন্দে বলিল,
শরীরের তাপ সাধারণতঃ যা থাকে তার চেয়েও কম।
তারপর কিছুকণ টেবিলের উপরে ফুলগুলির দিকে
চাহিতে চাহিতে হঠাৎ অধরে একটুখানি হাসি দেখা
দিল। সে বলিল, “ঠিক এক বছর হ’ল—দিনটা
আমার বেশ মনে পড়ে, আমি গাড়ী চড়ে তখন বেকুচি,
বাড়ীর লোকেরা তুলে দিতে এসেচে। বিদায় সম্ভাষণ
করতে গেলুম, যুখে একটা কথা জোগাল না।
তামেইকের পোল যখন পার হলুম তখন সন্ধ্যা হয়ে
এসেচে, চাঁদ উঠেছে। অদূরে পাহাড়ের উপর চেরি
ফুল খুব ফুটেছিল, প্লাড়ীখানা যখন সেখান দিয়ে গেল
তখন ফুলের পাগড়িগুলো বরফের মত কিস্ কিস্ করে
ক’রে পড়চে, নাচতে নাচতে সেগুলো গাড়ীর জানালার
ভেতর দিয়ে এসে পড়তে লাগলো। একটা পাগড়ি
আমার চুলে আটকে গিয়েছিল, আমি কিছুই জানতে
পারি নি। নামবার সময় মাসিমা যখন তুলে নিলেন
তখন দেখতে পেলুম।”

তাকেও হাতের উপর মুখ রাখিয়া বলিল “বছর
খানেক সময় কী শীর্ষগিরিই কেটে যায়? বে’র সময়
ভূমি কী স্থির হয়ে ছিলে তাবলে আমার হাসি পার।
আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হ’ত কেমন করে ভূমি অত
গভীর হ’তে পেরেছিলো।”

“ভূমি যে অবাক হয়ে গিয়েছিলে তা আমি জানি।
সত্যি বলব? আমার এমন ভয় হয়েছিল যে
পেরাপাটাও ধরে রাখতে পারছিলাম না।”

ইকু হাস্যমুখে কেতলি লইয়া প্রবেশ করিল। বলিল,
“তোমাদের আমোদ দেখে এত সুখ কখনো হয় নি।
গেল বছর ‘ইকাও’এ থাকার কথা মনে হচ্ছে।”

নামি কহিল, “ইকাও! আহা, কেমন আমোদ
হয়েছিল।” তাকেও জিজ্ঞাসা করিল, “আর কার্ণ

তোলা? একটি ঘেরের কথা মনে আছে—সে এত দেরি কচ্ছিল!”

“আর তুমি আমার এমন ভাড়া দিচ্ছিলে!”

কার্ণের সময় এল ব’লে। ভাড়াভাড়া সেরে ওঠে, আমার আমার কার্ণ ভুলতে বাব।”

“হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি সেরে উঠব।”

রাত্রের কড়ের পর, পরদিন আকাশ নির্মল হইয়া দেখা দিল।

বৈকালে তাকেওকে তোকিও যাইতে হইবে। সেই উষ্ণ শান্তির প্রাতে একটু বেড়াইবার ইচ্ছা হওয়াতে সে নামিকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর পিছন হইতে একটি দেবদারু পাছে ঢাকা বালুকামর পাহাড় অতিক্রম করিয়া সমুদ্র-তীরে চলিয়া গেল।

নামি কহিল, “কি সুন্দর দিন! কাল রাত্তিরে মনে হয় নি যে আজ এত পরিষ্কার হবে।”

তাকেও উত্তর দিল, “না। দেখ ওপারের তীর কত কাছে বলে বোধ হচ্ছে। মনে হয় যেন এখান থেকে ডাকলে ওপার থেকে শোনা যায়।”

বালুকামর তীর-ভূমি ইহারি মধ্যে শুক হইয়া গিয়াছে। কয়েকটি শিশু কিছুকি কুড়াইতেছিল, জেলেরা কাল ফেলিবার উদ্দেশ্যে ব্যস্ত। উত্তরে অর্ধ চন্দ্রাকার তীর-ভূমির উপর দিয়া একটা নির্জন স্থানে আসিয়া পৌঁছিল।

হঠাৎ যেন কি একটা মনে পড়িয়াছে এমনি ভাবে নামি জিজ্ঞাসা করিল, “ওপো, চিমিওয়া আজকাল কি করচে জান কি?”

“চিমিওয়া? সেই নির্লজ্জটা! সেই অবধি আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি। কেন? তার কথা জিজ্ঞেস করচ কেন?”

নামি একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, “ওনলে তুমি হাসবে। কাল রাত্তিরে তাকে স্বপ্নে দেখেচি।”

“তাকে স্বপ্নে দেখেচ?”

“হ্যাঁ, সে আর সঙ্গে কথা কচ্ছিল।”

তাকেও হাসিয়া বলিল, “তুমি এই সব বিষয় নিয়ে বড় মাথা বামাও। সে বলছিল কি?”

“ভা আমি বলতে পারি না। কিন্তু বা অনেক বার মাথা মাড়লেন। ও-চিমিওয়ান সে দিন বলছিল যে সে, তাকে স্নায়াকির সঙ্গে বেড়াতে দেখেচে। বোধ হয় সেই জন্যই স্বপ্নটা দেখেচি। হ্যাঁগা, চিমিওয়ান আমাদের বাড়ী আসবে না ত?”

“সে কখনো আসবে না। যাও তার ওপর রেগেচেন।” নামি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

“আমি সদাই ভাবি আমার অন্তঃ হওয়াতে বা বড় ব্যাকার হয়েচেন।”

বেদনার তাকেওর অন্তর টন টন করিয়া উঠিল। সে চলিয়া আসার পর হইতে তাহার স্বপ্ন ঠাকুরানী যে তাহার উপর উত্তরোত্তর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তিনি যে পুত্রকে ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে ভূমি হইতে দূরে থাকিতে বলিয়াছেন, নামির পীড়া হওয়াতে যে সব অন্তঃবিধা ঘটয়াছে তজ্জন্ত অভিযোগ করিয়া থাকেন; এমন কি কাতাওকা পরিবারের নিন্দা করেন—এ সব কথা সে তাহার পীড়িতা পত্নীকে বলে নাই। মাতাকে বুকাইতে চেষ্টা করিলে তিনি তাকেওকে নির্কোষ বলিতেন, স্ত্রীর জন্ত সে মাতার অবাধ্য হইতেছে, এমন কথাও বলিতেন। একাধিক বার এরূপ ঘটিয়াছে।

“তুমি কেবলই ভাবো! মনের জোর করো, ভালো হয়ে ওঠো। আগচে বসন্তের জন্ত প্রস্তুত হও। মাকে নিয়ে আমরা যোশিনোতে চেরি ফুল দেখতে যাবো। তাইত, আমরা যে অনেকটা এসে পড়েচি! ক্রান্তি বোধ করচ কি? ফেরা যাবে না কি?”

বালুকামর তীরভূমি যেখানে পাথরের পাহাড় হইয়া উঠিয়াছে সেই খানে তখন উত্তরে দাঁড়াইয়া।

“কুদোর যাওয়া বাক চল। আমি একেবারেই হাঁপাই নি। মনে হচ্ছে যেন আমেরিকা পর্য্যন্ত হাঁটতে পারি।”

“ঠিক ত? তবে এই শালখানা গারে দাও। পাথর গুলো পিছল, আমার হাত ধরে চল।”

তাকেও নামিকে ধরিয়া পাহাড়ের উপর একটা লম্বা পথ দিয়া চলিতে লাগিল, রাত্তির অনেক বার ঘামিল,

অবশেষে উপর হইতে বেখানে একটি কীণ বল ধারা পড়িতেছিল সেইখানে উপস্থিত হইল। প্রপাতটির ধারে কুদোর এক মন্দির, যেন সমুদ্রের উপর কুঁকিয়া পড়িয়াছে।

একখানি পাথরের উপর হইতে ধূলা ঝাড়িয়া নামির বসিবার জন্য তাকেও শালখানি পাতিয়া দিল। তাহার পাশে বসিয়া হাঁটুর উপর হাত দুখানি রাখিয়া কহিল, “আঃ চারি দিকে কি শান্তি!”

বাতবিকই সমুদ্র বড়ই শান্ত। মধ্যাহ্নের আকাশে মেঘের কণা যাত্রা ছিল না, আকাশের অন্তরাল পর্যন্ত নীল। স্ট্রিট সমুদ্র স্তানে স্তানে খেঁত রেশমী চাদরের মত ঝিকমিক করিতেছিল। সতদূর পর্যন্ত দেখা যায় কোথাও একটি ডেউও নাই—জলঙ্গল অগ্নিবিষ্টেব মত স্থির হইয়া আছে।

নামি ডাকিল, “প্রিয়তম!”

তাকেও জিজ্ঞাসা করিল, “কেন?”

“একি ভালো হবে?”

“কি?”

“আমার অসুখ।”

“কী বল? ভালো হবে না কেন? নিশ্চয়ই ভালো হবে। আমি ভালো করব তোমার!”

সামীর সঙ্গে মাথা রাখিয়া নামি কহিল, “আমি কিন্তু অনেক সময় ভাবি যে, আমি কখনো ভালো হব না। না আমার এই ব্যারামে মরেছিলেন; আর—”

“নামি-সান্ তুমি আজ এসব কথা কেন বলচ? নিশ্চয়ই তুমি সেরে উঠবে। ডাক্তার এই কথাই বলছিলেন, শুনেচ ত? তোমার মা সেই অসুখেই হরত—কিন্তু তোমার বয়স কুড়ি বছরের নীচে, ব্যারামের এই প্রথম অবস্থা, নিশ্চয়ই তুমি ভালো হয়ে যাবে।

আমাদের আত্মীয় ওকাহারাকে জান ত? তার ডান-দিপের কুস্কুস্ সমস্তই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারেরা তার আশা ছেড়ে দিয়েছিল; কিন্তু তবুও সে পনের বছর বেঁচেছিল। তোমার মনের যদি কোর থাকে ত-

তুমি ভালো হবে। তা যদি না হয় ত বুঝব তুমি আমার ভালোবাস না! আমার ভালোবাসনে তুমি সারবেই সারবে। কেমন ভালো হবে ত?”

নামির দক্ষিণ হস্ত লইয়া তাকেও আবেগের সহিত ওঠে চাপিয়া ধরিল। তাহার আঙুলে তাকেও প্রবল হীরকাসুরী দীপ্তি পাউতেছিল।

উভয়ে ক্ষণকাল নীরবে রহিল। রেনোশিয়ার দিক হইতে একখানি সাদা পাল বাহির হইয়া অচঞ্চল সমুদ্রের উপর দিয়া ভাসিয়া বাইতে লাগিল। জেলেদের হর্ষ-সঙ্গীত দ্বির বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

নামির সজল চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, “হ্যাঁ আমি সেবে যাব। নিশ্চয়ই সারব। আচ্ছা মনন আসে কেন? আমার হৃদয় নছব বাঁচতে ইচ্ছে হয়। মরতেই যদি হয় আমরা দুজনে এক সঙ্গে মরব।” “তুমি গেলে আমিও যাব।”

“সত্যি? আহা এক সঙ্গে মরতে কত সুখ। কিন্তু তোমার মা আছেন, কর্তব্য কাজ আছে, তুমি ত তোমার ইচ্ছা মত করতে পারবে না। আমিই প্রথমে গিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। আমি চলে গেলে তুমি আমার কথা ভাববে ত? হ্যাঁ পা! ভাববে না?”

তাকেওর চক্ষু জলে তরিয়া আসিল। নামির মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, “এসব হৃৎকের কথা আর করে কাজ নেই। নামি-সান্, তুমি ভালো হয়ে ওঠো, আমরা কত বছর বেঁচে থাকবো।”

তাকেওর হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তাহার হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া নামি কাঁদিয়া বলিল, “নামি মলেও তোমারই! কেউ আমাদের পৃথক করতে পারবে না—শত্রু নয়, রোগ নয়, মরণ নয়! চিরকাল আমি তোমার—তোমারই!”

শ্রীহেমমলিনী রায়।

মৎস্ত ভক্ষণ

মৎস্তভক্ষক বাঙ্গালীকে হিন্দুহান প্রভৃতি দেশের অমৎস্তভুক্ অধিবাসীগণ নিরতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকেন, এবং বাঙ্গালী “মছলী খাওয়ার” এই চিরাভ্যস্ত ঘৃণা-ব্যঞ্জক ভাষা দ্বারা বাঙ্গালীকে আপ্যায়িত করিতেও ক্রটি করেন না। এক দেশের অধিবাসী অপর দেশের অধিবাসীর আচার ব্যবহারের সমালোচনা করিয়া থাকে ইহা এক প্রকার নৈসর্গিক রীতির মধ্যেই গণ্য, সুতরাং বাঙ্গালীগণ অমৎস্তভোজী দিগের এই এক ঘেঁরে সুরের সমালোচনা অক্ষুণ্ণ ভাবে সহ্য করিয়া আসিতেছেন।

বর্তমান সময়ে শিক্ষিত এবং ধার্মিক অনেক বাঙ্গালীও আত্মসমাজের সংস্কার কামনার বাঙ্গালীর ছুরপনের কলঙ্করূপ মৎস্ত-ভক্ষণ, অভ্যাসকে বাঙ্গালী হইতে নির্কাসিত করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং পথপ্রদর্শক হইয়া মৎস্ত-ভক্ষণ পরিত্যাগ পূর্বক পূর্বপুরুষ দিগের আচরিত এই প্রথাগ্ন দোষোদ্ঘাটনে প্রয়াসী হইতেছেন। শাস্ত্রীয় আর কোন প্রমাণ না জানিলেও “মৎস্তাংস্ত কামতো জঙ্ঘা সোপবাস স্নাৎং বসেৎ” এই বাজবল্য-বচনের সাধাৰ্য্যে মৎস্ত ভক্ষণের অশাস্ত্রীয়তা সর্বতোভাবে প্রকাশ করিয়া আত্মপক্ষের সমর্থনে বহুপরিকর হইতেছেন। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অনেকে মনে করেন, মাছ খাওয়ার ফলে বাঙ্গালার সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজই পতিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা দেব-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজগুলি করান আর সম্ভব নহে। এই রূপ মতের উপদেশ এবং তদনুযায়ী আচরণও দুই এক স্থলে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। সুতরাং যে প্রথা চির প্রসিদ্ধ, এমন কি বাহার উপর বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব নির্ভর করে, আবাদিগের পূর্বপুরুষজুট সেট প্রথম শাস্ত্রীয় কি পাতিভ্যজনক, তাহা এক বার বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে মৎস্ত মাত্রই অত্যা কি না? দ্বিতীয়তঃ মৎস্ত অত্যা হইলেও, তাহাতে বাঙ্গালীর

পাতিভ্য বটীরাছে কি না? মছ বলিয়াছেন “বে বাহার মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে তাহার মাংসভুক্ রূপে নির্দেশ করা হয়, যেমন বিড়াল মূষিকভুক্; সুতরাং মৎস্ত-ভোজীকে সর্বমাংসভুক্ বলা যায়; অতএব মৎস্ত-ভক্ষণ করিবে না।” ১

বাজবল্যের মতে ইচ্ছা পূর্বক মৎস্ত খাইলে তিন দিবস উপবাসরূপ প্রারম্ভিত করিতে হয়। ২

এই দুইটি মাত্র বচনের প্রতি দৃষ্টি করিলে আপাততঃ মৎস্ত মাত্রই অত্যা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই বচনের পরেই পুনরায় মছ বলিয়াছেন, “পাঠীন (বোয়াল), রোহিত, রাজীব (বাহার শরীরে রেখা আছে,—যেথা তিথি), সিংহভুগ (বাহার মুখ সিংহের মত) এবং বাহা দিগের শরীরে আইস আছে, সেই সকল মৎস্ত ভক্ষ্য ৩; সুতরাং দেবতার নৈবেদ্যে এবং পিতৃ লোকের শ্রাদ্ধের অন্ন প্রদেয়। এই সকল মৎস্ত যেতক্য কুম্ভক-ভট্ট স্পষ্ট ভাষায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন:—যথা, “ইক্ষানীং ভক্ষ্য মৎস্তান্ হি পাঠীন রোহিতাবিতি”। ভট্ট মহাশয় মৎস্তের ভক্ষ্যতা প্রতিপাদনের জন্য অত্যন্ত মহর্ষিদিগের যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহারাই সকলেই সমস্বরে সশঙ্ক মৎস্তের ভক্ষ্যতা বিধোষিত করিতেছে—যথা, শব্দ:

“রাজিবাঃ সিংহভুগাংস্ত, সশকাংস্ত তথৈবচ।

পাঠীন রোহিতৌ চাপি ভক্ষ্য মৎস্তেশু কীর্ত্তিতাঃ”

বাজবল্যঃ—

“ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ খাবিৎ গোথাঃ কচ্ছপশবকাঃ।

শশশ্চ মৎস্তেষু পিতৃ সিংহভুগক রোহিতাঃ।

তথা পাঠীন রাজীব সশকাংস্ত বিজাতিভিঃ।

১। যোযন্ত মাংসমহাতি সতস্বাসাদ উচ্যতে।

মৎস্তানঃ সর্বমাংসাদ ভক্ষ্যমৎস্তান্ বিসর্জয়েৎ। ৫।১০

২। মৎস্তাংস্ত কামতো জঙ্ঘা সোপবাস স্নাৎং বসেৎ।

৩। পাঠীন রোহিতাংস্তৌ নিম্বেদ্যে হব্যকব্যয়োঃ।

রাজীবান্ সিংহভুগাংস্ত সশকাংস্তৈব সর্বশাঃ। ৫।১৬

হারিতঃ—সশকান্ মৎস্তান্ ভায়োপ পেতান্ ভক্ষয়েৎ” ।

বিষ্ণু সাহিত্যের উক্ত হইয়াছে যে, শ্রাদ্ধে মৎস্তের মাংস প্রদান করিলে, তাহাতে পিতৃ লোকের দুই মাস তৃপ্তি হয়—

“প্রিয়ন্তে যৌ মাসৌ মৎস্তমাংসেন।” ৮০ অ । ২ সূ

ইহার সমানার্থ বচন বাজবল্য সাহিত্যেরও দেখিতে পাওয়া যায়—যথা,

“হবিষ্ঠায়েন বৈ মাংসং পারসেন তু বৎসরম্ ।

মাংস্ত হারিণ কৌরভশাকুনচ্ছাগ পার্ধৈতঃ ।

ঐনবৌরব বারাহ শাঠৈর্মহাংসৈর্ষথা ক্রমম্

মাংস বৃদ্ধ্যাহি তৃপ্যন্তি দৈতৈরিহ পিতামহাঃ ॥”

১ম অ ২৫৮—৫৯

এই স্থলে সামান্ততঃ মাংস্ত মাংসের বিধান হইলেও, বিজ্ঞানেবর “মিতাকরার” তাহা স্পষ্ট ভাষায় বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে,

“মৎস্তো ভক্ষ্যঃ পাণীনাদিঃ তস্তদং”

অর্থাৎ মাংস্ত পদে বিজ্ঞাতির ভক্ষ্য পাণীন প্রভৃতি মৎস্ত বুদ্ধিতে হইবে ।

মহর্ষি উপনাও এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন,

যৌ মাসৌ মাংস্ত মাংসেন

ত্রিমাংসান্ হরিণেনচ” । ৪ অ

যে বর্ণের পক্ষে বাহা ঋগ্বেদে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার দ্বারাই দেবতার এবং পিতৃলোকের অর্চনা করা বিধেয়, এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব নাই । রাম-চন্দ্র ইজুদী বৃক্কের পিতৃক এবং বদর ফল দ্বারা পিতৃ দিয়া পিতৃ দেবকে বলিয়াছিলেন, “মহারাজ ! আপনি প্রীত হইয়া ইহাই ভক্ষণ করুন, কারণ পুরুষের বাহা ঋগ্বেদ, তাহার পিতৃগণ এবং দেবগণও সেই অন্ন পাইবারই যোগ্য ।

“ইদং ভূক্ষ, মহারাজ ! প্রীতো বদননা বরম্ ।

বরমঃ পুরুষো রাজান্ তদন্নান্তস্ত দেবতাঃ” ॥

তদ্বান্ বিষ্ণু বলিয়াছেন, “অভক্ষ্য” অর্থাৎ যে জাতির বাহা অধাত, তাহা নৈবেদ্যে দেয় নহে ; ভক্ষ্য জীবের

মধ্যেও বিষ্ণুর নৈবেদ্যে ছাগীর দুগ্ধ, মহিবীর দুগ্ধ, পক-নধের, মৎস্তের এবং বরাহের মাংস দানের অযোগ্য ।”

“না ভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ।” ৬৫ অ ১২ সূ

ভক্ষ্যোষপাণী মহিবী ক্ষীরে ॥ ১৩

পকনধ-মৎস্ত-বরাহ-মাংসানিচ ॥ ১৪ ।

বিষ্ণুর নৈবেদ্যে মৎস্ত প্রভৃতি অদের হইলেও নিজের ঋগ্বেদ মৎস্ত প্রভৃতি বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া খাইতে হইবে, কারণ অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠার তুল্য এবং অন্ন যুগে তুল্য, তাহা মৎস্ত স্তূতে উক্ত হইয়াছে ।

“অনিবেদ্য ন ভোক্তব্যং মৎস্ত-মাংসক যদ্ ভবেৎ ।

অন্নং বিষ্ঠা পয়ো ব্রূং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্” ॥

অতএব বাহা কেবল নিজের খাইবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয় নাই, দেবতার উদ্দেশ্যেই প্রদেয়, সেইরূপ মৎস্ত-মাংসই বিষ্ণুর নৈবেদ্যে অদের । স্মার্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন । *

বিষ্ণু বচনে অভক্ষ্য শব্দে কি বুঝিতে হইবে, তাহাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—যথা, “যে বর্ণের পক্ষে স্বভাবতঃ যাহা অভক্ষ্য (যেমন গুণ্ডন প্রভৃতি) তাহাই অদের । রাত্রিতে দধি প্রভৃতি দানে নিষেধ নাই । †

ভাষ্যকার মেধাতিথির মতে পাণীন এবং রোহিত মৎস্ত শ্রাদ্ধাদি কার্য্যেই ঋগ্বেদ, সশক প্রভৃতি মৎস্ত শ্রাদ্ধাদি ব্যতিরিক্ত স্থলেও ঋগ্বেদ—যথা,

“পাণীন রোহিতৌ মৎস্ত জাতি বিশেষৌ তয়ো

ইব্য কব্য নিয়োগেন শ্রাদ্ধাদৌ ভক্ষ্যতা ত্যজ্ঞায়তে নহাঙ্কিকে ভোজনে রাজীব সিংহ তুও সশকানাং সর্কশঃ হব্য কব্য। ত্যামগ্ন্যাপ্য নিযুক্তি ভোজনে ।

শ্রাদ্ধাদি ব্যতিরিক্ত স্থলে পাণীন রোহিত ঋগ্বেদ নহে, এই মত কুল্লুক খণ্ডন করিয়াছেন,—যথা,

* অমেন বরং ভোজ্যমহাদি দেয়মিত্যুক্তম্

বিষ্ণু বচনেতু অনেবংবিধং নিষিদ্ধম্ ।

আকিক্তত্ব ।

† না ভক্ষ্য মিত্তি বর্ণিত বসতব্য বস্তুপতো লগুনাবিতভেদে ন দেয়ং নতু রাজৌ দধ্যাত্তপি । একাদশীতত্ত্ব ।

“এবং ভোক্তা বাভো ন কত্রাপি শ্রাদ্ধে পাসিন বোধিতো
রাজীবাত্তা তথা নেতি ব্যাখ্যান মুনি সম্বতা ॥”

গোবিন্দ রাক্ষসের মত মেধাভিধির মতের অতুলন।
তবেই দেখা যায়, যহু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, শম্ব, হারীত
প্রভৃতির মতে অধিকাংশ মন্ত্রই ষাণ্ড বলিয়া গণ্য
হইয়াছে, এবং মেধাভিধি, কুল্লুক ভট্ট, গোবিন্দ রাক্ষ,
বিজ্ঞানেশ্বর, রঘুনন্দন প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রব্যাক্যাত্ত্বগণও বিশদ
ভাবে ঋষি-মতের ব্যাখ্যা করিয়া মন্ত্রের ভক্ত্যতা প্রতি-
পাদন করিয়াছেন ; বিজ্ঞানেশ্বর মেধাভিধি ও গোবিন্দরাক্ষ
ইহারা কি বাঙ্গালী ছিলেন ? শম্ব প্রভৃতির সংহিতা কি
বাঙ্গালার লিখিত হইয়াছিল ? আরও দেখুন, যাজ্ঞবল্ক্য
প্রতিগ্রহসম্বন্ধে ব্রাহ্মণের পক্ষেও প্রতিগ্রহ পরিত্যাগে
বিশেষ ফল কীর্তন করিয়া মন্ত্র প্রভৃতি নিত্য আবশ্যক
বস্তুর প্রতিগ্রহ করিবে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—
যথা,

“প্রতিগ্রহ সমর্ধোপি না দত্তে যঃ প্রতিগ্রহম্।

যে লোকা দানশীলানাং সতানাপ্রোতি পুঙ্কলান্ ॥

কুশাঃ শাকং পরোমন্ত্রা পক্ষা পুশ্ণং দমিক্রিতিঃ

মাংস শয্যাসনং ধানঃ প্রত্যাখ্যেয়ং নবারিব ॥”

১ অ ২১০।১৪

মন্ত্র গুলি কি তাহাঙ্গা দেখিবার জন্য গ্রহণ
করিতে উপদেশ দিয়াছেন ?

ইহার সমানার্থ আরও অনেক ঋষি-বচন দেখিতে
পাওয়া যায়, অনাবশ্যক বোধে তাহা উপেক্ষিত হইল।
এই সকল প্রমাণের বলে সাহস করিয়া বলা বাইতে
পারে যে, মন্ত্র মাত্রই অতল্য নহে, প্রত্যাখ্যেয় দেব-
পিতৃ-কার্য্যে প্রদেয় বিধার মাংস যহুর প্রভৃতি দ্রব্য
হইতে উৎকৃষ্ট ষাণ্ড। যদি মন্ত্র ষাণ্ড হয়, তবে
নিবেধ এবং প্রারচিত্ত বিধান দাঁড়ার কোথায় ? তাহা
এক বার বিচার করিয়া দেখা যাউক।

আমাদের শাস্ত্রে সামান্ত বিশেষ ভাব বলিয়া একটা
কথা আছে ; অর্থাৎ সামান্ততঃ নিবেধ হইলে, বিশেষের
পক্ষে বিধান হইয়া থাকে। সুতরাং মন্ত্র সামান্ততঃ

ভক্ত্যে নিবিদ্ধ হইয়াছে, এবং বিশেষ মন্ত্র ভক্ত্য বলিয়া
পরিগণিত হইয়াছে ; অতএব প্রারচিত্ত বিধানও
নিবিদ্ধ মন্ত্রের সম্বন্ধেই বুদ্ধিতে হইবে। এই বিষয়ে
বালবলভিত্তক ভবদেবভট্ট প্রারচিত্ত কাণ্ডের অতল্য
ভক্ত্য প্রকরণে বিশেষরূপে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।
তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি ব্যাস সংহিতা
হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে “নকুল-
মূষিক-সর্প-মগ্নক” এবং বিকৃত মন্ত্র ভক্ত্যে প্রারচিত্তের
উপদেশ আছে—যথা,

“ব্যাসঃ নকুলং মূষিককৈব সর্প মগ্নক মেবচ

বিকৃতান্তেষ্টম মন্ত্রান্তচ জঘ্ন কৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ॥”

উদ্ধৃত হারীত বচনে ভক্ত্য ভক্ত্যর আম মাংস
ভক্ত্যেও ত্রিরাত্রোপবাসের বিধান দেখা যায়—

“ভক্ত্যানামপ্যাম মাংসকৃষ্ণিপ্রাশনে ত্রিরাত্রম্ ॥”

দেবলের স্তোত্রেও বিকৃত মন্ত্র ভক্ত্যেই প্রারচিত্ত।

“মন্ত্রান্তচ বিকৃতানক্রাঃ সর্পশীর্ষা বিলেশয়াঃ”

এই রূপ আরও অনেক মুনি-বচনে নিবিদ্ধ মন্ত্র-ভক্ত্যে
নানাবিধ প্রারচিত্তের যে বিধান আছে, তাহা কামতঃ,
অকামতঃ এবং অভ্যাস অর্থাৎ অনেক বার ভোজন
এইরূপ বিষয় ভেদে ব্যবস্থা করিয়া উপসংহারে
বলিয়াছেন যে, অনিবিদ্ধ মন্ত্র-মাংস ভক্ত্যে দোষ নাই,
অতএব প্রারচিত্তও করিতে হয় না—যথা,

“অনিবিদ্ধ মন্ত্র মাংস ভক্ত্যেতু দোষাতাৎ

প্রারচিত্তাতাব এব”।

যদি তাহাই হয়, তবে বুঝা মাংস-ভক্ত্যে ছাগলের
ঋষি যে প্রোক্ষ্যত প্রারচিত্তের বিধান করিয়াছেন, এবং
যাজ্ঞবল্ক্য ত্রিরাত্রোপবাসের বিধান করিয়াছেন, তাহার
বিষয় কোথায় হইবে, ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন,
এই সকল প্রারচিত্ত চতুর্দশী প্রভৃতি নিবিদ্ধ দিনে মাংস
ভক্ত্যে বুদ্ধিতে হইবে ; কারণ যদি সাধারণতঃই অযাণ্ড
হয়, তবে তিথি বিশেষে নিবেধ অসমর্থ হইয়া পড়ে।

“যত বুধা মাংসং ন ভোক্তব্যং অত্র শ্রাদ্ধ কর্ণি

অতথা ভক্ত্যনু বিপ্রঃ প্রোক্ষ্যতঃ সমাচরেদিতি ॥

ছাপলেয়েনোক্তং, যদপি মংস্তাংচ কাবচোনম্।
সোপবাস ত্র্যংং বসেদিতি বাজবক্যোনোক্তং
তৎসৰ্গং নিবিদ্ধ চতুর্দশাদি বিষয়ম্।”

আর একটি প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, যদি মংস্তাদির মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ না হয়, তবে মনু মাংসকে অন্তরায় রূপে নির্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণের অত্যাচার বলিলেন কেন? ইহার উত্তরে অবদেব বলিয়াছেন, মনুর এই বচনে আম মাংস নিষিদ্ধ হইয়াছে, কারণ অস্ত্রাশ্রয় শাস্ত্রেও আম মাংসই “অন্তরায়” রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে—যথা,

“বচ মনুনোক্তং—

“বক রক্ষঃ পিশাচানং মন্ত মাংসং সুরাসবং
ভদ্রাক্ষণৈনং ভোক্তব্যং দেবানামগ্নতা
হবিরিত্তি তদপ্যাম মাংসাভি প্রায়ৈনৈব
আমমাংসৈশ্চৈব রাক্ষসান্নয়েন নান্য—
গমেবু প্রসিদ্ধম্।”

পূর্বোক্ত হারীত-বচনেও আম মাংস ভক্ষণে ত্রিরাত্র প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে, এবং তাঁহারই বচনান্তরে যুক্তি-যুক্ত অর্থাৎ পক্ষ, শব্দক মংস্ত খাইবার উপদেশ আছে। সূতরাং শব্দরহিত, রেখারহিত, বিকৃত, এবং আম মংস্ত ভক্ষণেই নিষেধ এবং প্রায়শ্চিত্ত বুদ্ধিতে হইবে। এতদ্বিধ মংস্ত বিজ্ঞাপিত সর্বতোভাবে তক্ষ্য। বিকৃত শব্দে বোধ হয় কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা রক্ষিত লোণা ইলিশ প্রভৃতি মংস্ত বুঝাইতেছে। এখন দেখা যাউক, মংস্ত যদি সকল দেশের বিজ্ঞাপিত পক্ষেই খাদ্য হয়, তবে বৃহস্পতি পূর্বদেশবাসী অর্থাৎ বাঙ্গালীকে মংস্তাণী বলিয়া নির্দেশ করিয়া, তাঁহাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য প্রায়শ্চিত্তের এবং রাজদণ্ডের প্রসঙ্গ নাই এই কথা বলিতে গেলেন কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, “মংস্তাণিনোক্তমঃ পূর্বে ব্যাভিচার রতা ত্রিঃ অনেন কর্ণগঠনৈতে প্রায়শ্চিত্ত দমাবধাঃ” এই বচনটি বৃহস্পতির দ্বারা “ব্যবহার মনুধে” সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা মিতাক্ষরা প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই বচন গ্রন্থকারের বিবেচ-

নূলক ও উদ্ভাবিত বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, বাঙ্গালী দেশে জীলোকের ব্যাভিচার দোষাবহ রূপেই পরিগণিত হইয়া আসিতেছে, পক্ষান্তরে ভারতের কোন কোন স্থানে এই প্রথা দোষাবহ নহে। ব্যবহার মনুধে বৃহস্পতি-বচনের পরবর্তী অংশে বলা হইয়াছে, “তক্তা-চ্ছাদং প্রদায়েন্যং শেষং গৃহীত পার্শ্বিঃ।” এই সকল দুর্ভাগ্যকারীদের গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রদান করিয়া রাজা ইহাদিগের বিস্তার অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবেন। বচনের পূর্বাংশের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের এবং রাজদণ্ডের অভাব কীর্জন করিয়া শেষ ভাগের দ্বারা সর্বত্র বাঙ্গালী করিবার উপদেশ দেওয়াতে বচনটি পূর্বাপরবিকৃত, বিবেচনুলক বলিয়া বুদ্ধিতে আর বাকী থাকে না।

বচনের পূর্বভাগ মাত্র ‘গুরুনীতিসারে’ গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে ইবাহ হয় দেশান্তরপ্রসিদ্ধ লোক-পরম্পরাপ্রাপ্ত অনর্থক এই বচন গুরুনীতিসারে অবিচারিত ভাবেই গৃহীত হইয়াছে। বচনটি যদি প্রমাণ বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যায় তাহাতেও তাহা বাঙ্গালীর মংস্ত ভক্ষণের অস্বকুল ভিন্ন প্রতিফল হয় না। কিন্তু ব্যাভিচাররতা জীর এই অংশটি বাঙ্গালীর পক্ষে বুদ্ধিতে হইবে না। কারণ, বিশেষরূপে বাঙ্গালীকে মংস্তাণী বলিয়া নির্দেশ করিয়া তাহাদিগের এই প্রথা দোষাবহ নহে এই রূপ কীর্জন করাতে বুঝা যায় যে, শব্দরহিত এবং রেখারহিত যে সকল মংস্ত বিজ্ঞাপিত পক্ষে নিষিদ্ধ, তাহাও বাঙ্গালীর পক্ষে নিষিদ্ধ নহে, সুতরাং মংস্ত ভক্ষণে বাঙ্গালীর পাতিত্য দূরের কথা ইহাতে কোন রূপ দোষই হইতে পারে না। স্মৃতি শাস্ত্রের বিবি-নিষেধ ছাড়িয়া, ইতিহাস গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টপাত করিলেও দেশান্তরবাসী ষাটি বিজ্ঞাপিত মংস্ত ভক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

কবন্ধ, রামচন্দ্রকে বলিয়াছিল, “হে রাবণ! তুমি পম্পা সরোবরের রোহিত, চক্রভূক্ত, মলময়ী নামক উৎকৃষ্ট মংস্তগুলিকে বাণের দ্বারা হত্যা করিয়া লৌহ-শলাকার বলুগাইয়া ভক্ষণ করিবে। এই সকল মংস্ত

অকুণ্ঠ অর্থাৎ হঠপুঠ এবং ইহাদের একটি মাত্র কণ্টক
হয়। *

মৎস্ত অশান্ত হইলে রামের প্রতি কখনই এইরূপ
প্রলোভন প্রদর্শিত হইত না; এবং অকুণ্ঠ প্রকৃতি
শ্রেষ্ঠতা ব্যক্তক বিশেষণ সন্নিবেশেও বাস্তবিকের লেখনী
হইতে লাগি নিঃসরণ হইত না। মুচ্ছকটিকের
নারিক। বসন্তসেনা, মৎস্তাসিকা বিশেষণে ভূষিত হইলেন
কেন? (১)

শকাব্দের ভূত। আপন মনিবের প্রতি বসন্তসেনাকে
কুসলাইতে বাইরা (২) অশান্ত ধন দৌলতের উল্লেখ
না করিয়া মনিব বাড়ীর মৎস্ত মাংসের বাহ্যে কুকুরে
আর মরা খায় না। গৌরব সূচক এই কথাই বা বলিতে
পেল কেন? এক্ষেত্রে তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়
নহে? এই ঘটনার সহিত বাঙ্গালার অথবা বাঙ্গালীর
কোনই সংগ্রহ নাই। নারকনারিক। প্রকৃতি সকলই
বাঁটি অশান্ত দেশের অধিবাসী। লেখক এক জন বেদ-
বিদ্বাদ্বিগের অগ্রগণ্য তপোবন প্রবাদপুত্র অশ্বমেধকর্তা
সার্কভৌর নৃপতি।

তবে ইহা অশান্ত স্বীকার্য যে মৎস্ত খাইতেই হইবে
এমত বিধান হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতি মানুষের
অভাবসিদ্ধ, তাহাতে বিধি ষাটে না। এবং মৎস্ত খাইতে
হইলেই মৎস্তের হত্যার অশ্লীলোদয় করা হয়, তাহাতে
হিংসা অশান্ত কতক পাপ স্বীকার করিতে হয়; এই অশান্তই
মুগ্ধ বলিয়াছেন—

* মোহিতাংস্তক ভুগাংস্ত নলনীনাংস্তরাযব।

পশ্চাৎ মিত্তিভবন্তান্ তত্তরাম! বরান্ হতান্।

মিত্তক পক্ষায়ত্তত্তান্ অকুণ্ঠানেক কণ্টকান্।

রামায়ণ অরণ্য কাণ্ড ১০ সর্গ ১২।১০

১। এহা নারক মুণিকাসকিকা, মচ্ছাসিকা লাণিকা।

হু ১ অ

২। লাভেহি অলা অগ্নয়ং তো কথ্যহিষি মচ্ছবৎকব্।

এনেহিং মচ্ছবৎকেহিং তদ আ মলমং ন শেবতি।

হু ১ অ ৬

“ন মাংস ভক্ষণে দোষা ন যন্তে নচ বৈধুনৈ,

প্রযত্তিরেবা ভুতানাং নিবৃত্তিত্ব মাকলা”।

মৎস্ত মাত্রই অশান্ত্য নহে, তাহা দেখান হইল। বাহা
পবিত্র ষাণ্ড বলিয়া অনেকেই ভক্ষণ করিতেছেন, তাহাতে
কোন দোষ আছে কি না, তাহা এক বার দেখা বাড়ুক।
বাজবকোর মতে “দেবভাগ্ন, সিংহ (সামিনা) কুসর,
পায়স, অপূর্ণ (পিষ্টক), লুচী প্রভৃতি ভক্ষণে এবং মৎস্ত
ভক্ষণে ত্রিরাত্র উপবাস বিহিত হইয়াছে। * ইহার
সমানার্থ বচন প্রারম্ভিত বিবেকে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং
শূলপানি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে দেবতা পিতৃলোক
অথবা অতিথির উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয় নাই এমন পিষ্টক
প্রকৃতি ভক্ষণ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিতে হইবে।

“তেন দেব পিতৃভিঃ বজ্জং কামতঃ সন্ধু নীবাং

ভক্ষণে ত্রিরাত্রম্”

অতএব ক্রটি চর্য্যে বাহার। অশান্ত শাস্ত্রানুসারে
ভাহারাই প্রারম্ভিত করিতে বাধ্য। বাঙ্গালীর প্রতি
মৎস্ত ভক্ষণের দরুণ পাপের আরোপ অজ্ঞতানিবন্ধন।
আর্য্যযুগে আমিব ভক্ষণের বাহ্য ছিল, সর্বদেশবাসী
আর্য্য গণ মৎস্ত প্রকৃতি আনিবের দ্বারা দেব-লোকের
এবং পিতৃ-লোকের অর্চনা করিতেন এবং যজ্ঞ-শেষ
ভক্ষণ করিতেন। জৈন ধর্মের অভ্যুত্থানে অনেক দেশ
হইতে আর্য্য প্রভাব বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমিব
ভোজনও নির্বাসিত হইয়াছে। ঋষিভূট সরনির অশ্রান্ত
পথিক বাঙ্গালীগণই কেবল অজ্ঞাপি এতদ্বিষয়ে আর্য্য
শাস্ত্রানুযায়ী আচার কতক পরিমাণে রক্ষা করিতেছেন।

শ্রীপিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

* দেবভাগ্নং হবিসিকং মোহিতান্ ভ্রান্তানাং ভবা,

অল্পপাকৃত মাংসানি বিজ্ঞানি কবকামিত।

ভবা—বৃথা কুর সংখ্যা পায়সা পূর্ণ-শঙ্কলীঃ

কল বিভক্তকং কোণ্যকুরং মচ্ছবৎকব্।

মৎস্তাংস্ত কামতো অদ্বা পোণবাস ভাংসং বসেৎ।

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী

তাঁহার শ্রীপাট

(চুঁচুঁড়া সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় তাঁহার ভুবন-মঙ্গল গ্রন্থে “বিঘ্ননাশ” ও “অভীষ্ট পূরণ এর” ভক্ত—

“জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।”

শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥”

বলিয়া যে ছয় জন সৌরগতপ্রাণ ভক্তশ্রেষ্ঠ গোস্বামী পাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়াছেন, শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বাঁহার নিয়ম-নিষ্ঠা ও ভজন-সাধনরীতির কথা শ্রবণ করিলে অপূর্ণ বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে হয়, বাঁহার কঠোর বৈরাগ্য ও অলৌকিক প্রেমভক্তি দর্শনে কলিযুগপাবনাবতার স্বয়ং শ্রীমদ্ব্যগ্রভূ পর্ষাস্ত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সপ্তগ্রাম-মধ্যবর্তী কৃষ্ণপুর নামক গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি। পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদীতীরস্থ এই কৃষ্ণপুর গ্রামেই তাঁহার শ্রীপাট বর্তমান। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের মতে “চান্দপুর” বা “চাঁদপুর তাঁহার জন্মস্থান। যথা :—

হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে ।

আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে ॥

হিরণ্য গোবর্দ্ধন যুগুকের মহুমদার ।

তার পুরোহিত বলরাম নাম তার ॥

* * * *

রঘুনাথ দাস খালক করে অধ্যয়ন ।

হরিদাস ঠাকুরে নিত্য বাই করেন দর্শন ॥

৩য় পরিচ্ছেদ, অন্ত্যালীলা ।

১৪০০ শকের কিছু পূর্বে কৃষ্ণপুরে হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামে দুইজন ধনবান জমীদার বাস করিতেন। রঘুনাথ দাস কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের একমাত্র পুত্র। তাঁহার কায়স্থ পরিবার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার তাঁহাদিগকে “সংকুণীন” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ষাণ্মাসকাল হইতে রঘুনাথ ভক্তি-প্রবণ ছিলেন। তৎকালেই হরিদাস ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম মিলনে, তিনি বৈষ্ণব ধর্মের নিগূঢ় বার্তা প্রেম-ভক্তি-বৈরাগ্যের অপূর্ণ কাহিনী শুনিয়া পুলক-বিহ্বল-হৃদয়ে নবদীপচন্ড্রের শ্রীমুখ দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। “প্রভাতী তারা” দেখিয়া মানব-প্রাণ যেমন সূর্য্যোদয়ের আগমন-প্রতীকার ব্যাকুল হইয়া পড়ে, “প্রভাতী-তারা”-প্রতিমু হরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাবেও রঘুনাথ ব্যাকুলভাবে নবদীপ-সূর্য্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভক্তের বাহ্যিকমস্তক প্রেমময় দয়াল ঠাকুরের সহিত রঘুনাথের মিলন হইল। সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের হৃদয়-নিহিত ভক্তি-নদী উৎসর্গা উঠিল।

সংসারে তাঁহার অনাসক্তি ও বৈরাগ্যভাব দর্শন করিয়া গোবর্দ্ধন দাস চিন্তাবিভ হইয়াছিলেন। বলদ্বন্দ্ব জমীদার প্রথমে পুত্রের গৃহত্যাগের পথ রুদ্ধ করিবার জন্ত বহুলোক নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ভাবিলেন, এ বাধন সামান্য, তাই তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। এবং এক অনিন্দ্য-স্বন্দরী বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ পর্ষাস্ত দিলেন। মনে ভাবিলেন, মায়ার এই অপূর্ণ নিগড়ে পুত্রের বৈরাগ্য ছুটিয়া বাইবে। কিন্তু হায়! বাঁহার প্রেম-প্রবণ হৃদয় সেই অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমাঘুতে কাঁপ দিবার জন্ত উন্মাদভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোন পার্থিব বন্ধনে কি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারা যায় ?

এক রাত্রিতে স্নানোত্তর পাইয়া রঘুনাথ পলায়ন করিলেন। কিন্তু সন্ধান করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনা হইল। রঘুনাথের মাতা স্বামীকে বলিলেন,—“রথু বাতুল হইয়াছে। পায়ের দড়ি দিয়া রথুকে বাঁধিয়া রাখ ।” রঘুনাথের পিতা উত্তর করিলেন—

ইহু সম ঐবর্ষ্য, ত্রী অপ্সরা সম।

ঐ সব বাঁধিতে নারিলেক বার মন ॥

দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবে কেমনে ?

বাস্তবিকই বাঁধিয়া রাখা গেল না। কোন বিশেষ স্বযোগ পাইয়া রঘুনাথ এক রজনীশেষে সত্য সত্যই পলায়ন করিলেন। সেহেন পিতা-মাতা-পিতৃব্য, অতুল ধন-জন-পরিপূর্ণ গৃহ, বিস্তৃত ভূসম্পত্তি—সর্বোপরি অপ্সরো-বিনিমিত রূপলাবণ্যময়ী তরুণী ভার্যা—এক কথার সংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য বন্ধন ছিন্ন করিয়া রঘুনাথ গৃহত্যাগ করিলেন। এমনই ভাবে কপিলাস্থর রাজকুমার সিদ্ধার্থ এক গভীর নিশীথে সমস্ত জগতের মঙ্গলের জন্ত সর্ববিধ প্রলোভন পদদলিত, করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া-ছিলেন। আর একজন এমনই দ্বিধার যামিনীশেষে ‘সাজান সংসার’ পরিত্যাগ করিয়া, পতিভের হৃৎকণ্ড দূর করিবার জন্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই পদাঙ্কসরণে রঘুনাথ দাস সংসারের মারাপাশ ছিন্ন করিলেন।

মহাপ্রভু নীলাচলে গিয়াছেন শুনিয়া তিনি গৃহ হইতে পলায়ন পূর্বক দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া উর্দ্ধ্বাসে ছুটিলেন। শেষরাত্রে তিনি পলায়ন করেন। প্রাতে গোবর্দ্ধন দাস তাঁহার সন্ধানের জন্ত লোক পাঠাইলেন। কিন্তু তাহার তাঁহাকে খরিতে পারিল না। কৃষ্ণপুর হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা তিনি ছুটিয়াই গিয়াছিলেন।

নীলাচলে গিয়া রঘুনাথ শ্রীপ্রভুর চরণপ্রান্তে নিপতিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে নিজের দ্বিতীয় স্বরূপ দামোদরের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন—

এই রঘুনাথে আমি সঁপিছ তোমারে।

পুত্র ভৃত্যরূপে ইহা কর অঙ্গীকারে ॥

তিন রঘুনাথ নামে হয় আশা স্থানে।

স্বরূপের রঘুনাথ হইল ইহার নামে ॥

রঘুনাথের কঠোর বৈরাগ্যাচরণ ও অপূর্ণ প্রেমভক্তি সন্দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন শিলা ও শুভমাল্য প্রদান করিলেন এবং শিলায় সান্নিধ্য

পূজা করিবার জন্ত তাঁহাকে আদেশ দিলেন। অহর্নিশ তিনি শ্রীমদ্ব্যাক্রম চরণ-চিহ্নের বিস্তার থাকিতেন, আহার-নিদ্রার কথা ও তাঁহার মনে পড়িত না। তিক্কাবৃত্তি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, বলিলেই হয়। শ্রীচরিতা-মৃতকার লিখিয়াছেন—

অনন্ত শৃণু রঘুনাথের কে করিবে লেখা।

রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষণ্ডের রেখা ॥

সাড়ে সাত ব্রহ্মর বায় বাহার স্ররণে।

আহার নিদ্রা চারিদণ্ড সেও নহে কোন দিনে ॥

বৈরাগ্যের কথা তার অমৃত কথন।

আজ্ঞা না দিল জিহবার রসের স্পর্শন ॥

স্বরূপ দামোদর ও রঘুনাথ দাস গোবর্দ্ধন কৃপা ও সাহায্যে কবিরাজ গোবর্দ্ধন মহাপ্রভুর ভাব-গভীর বিরহো-দ্ভাব শ্রীচৈতন্যলীলার অন্ত্যধঃ বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রভুর শৃণু সেবা কৈল স্বরূপের সাধে ॥

যোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।

স্বরূপের অন্তর্দানে আইল বৃন্দাবন ॥

এই বৃন্দাবনে রাখাকুণ্ডের তীরে বসিয়া তিনি “নিম-সেবা” বা “নিয়ম সেবা” বলিয়া একটি সেবা-বিধি চালাইয়াছিলেন। আজ ও তাহা বাক্সালার বহু পল্লীতে অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান-একাদশী হইতে ৬ উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত একমাস কাল ইহা অমুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণবেরা প্রথমে কোন একটি মহাজনপদ গান করেন, পরে নিম্নলিখিত অংশটুকু গাইয়া এই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ দাস গোবর্দ্ধন স্বত্বি বাক্সালার ঘরে ঘরে জাগাইয়া দেন—

দাস গোঁসাই রঘুনাথ

গোঁসাই নিয়ম করে দাস গোঁসাই

রঘুনাথ দাস গোঁসাই নিয়ম করে

রাখাকুণ্ডের তীরে বসে’ নিয়ম করে

শ্রীবৃন্দাবনে রাখাকুণ্ডের তীরে বসে’ নিয়ম করে। প্রতি প্রাতে গৃহে গৃহে একমাস কাল এইরূপে নামগান করিয়া বৈষ্ণবেরা এই নিয়ম সেবার অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন। দাস

পূর্ণ হইলে তাঁহার প্রতি গৃহ হইতে গৃহবাসীর অবস্থামত চালদাল পরিপূর্ণ সিঁধা, বস্ত্র গামছা ও পরসাদি পাইয়া থাকেন। নবোৎসবের দিন গৃহস্থেরা যেমন গৃহাগত কীর্তনীয়া বৈষ্ণবের বস্ত্র, খোল ও অঙ্গে হনুদ জলের ছিটা প্রদান করিয়া থাকেন, এ দিনও সেইরূপ করেন।

এই শ্রীস্বাক্ষরেন তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য ও অপূর্ণ ভজন-সাধনের যে মহিমাময় পরিচয় আমরা পাই, তাহার কিঞ্চিৎ—

অন্নজল ভাগ কৈল অন্ন কখন।

পল হুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥

সহস্র দণ্ডবৎ করে লয়ে লক্ষ নাম।

হুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম ॥

রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণের মানসে সেবন।

প্রহরেক মহা প্রভুর চরিত্র-কথন ॥

তিন সন্ধ্যা রাধাকৃষ্ণে আপতিত নান।

ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান ॥

সার্ক সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।

চারিদণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোন দিনে ॥

তাঁহার পর একজন প্রাচীন পদকর্তার পদ হইতে কঠোর বৈরাগ্যের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার আহার পরিত্যাগের একটা ক্রমিক তালিকা পাই—

রাধাকৃষ্ণ বিরোগে, ছাড়িল সকল ভোগে

সুখ কথ অন্ন মাত্র সার।

গৌরাঙ্গের বিরোগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে

ফল গব্য করিল আহার ॥

সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে

কেবল করয়ে জলপান।

রূপের বিচ্ছেদ হবে, জল ছাড়ি দিল তবে

রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে গ্রাণ ॥

শ্রীপাটের কথা।

সপ্তগ্রামে,—হুগলীর অতীত-গৌরবের প্রাচীন নগরীর পাদকিনোভকারিনী সরস্বতী নদীর তীরে শ্রীমদাস

গোস্বামীর পাট বিরাজিত। দাস গোস্বামী কৈশোরে এইখানে কিছুদিন সাধন ভজন করেন। আজিও এই শ্রীপাটে তাঁহার পিতাপিতৃব্য-প্রতিষ্ঠিত রাধামোহন ঠাকুর বিরাজিত। সপ্তগ্রামের গৌরবমহিমার সকলই একে একে লোপ পাইয়াছে, কেবল কায়স্থকুল-ভাকুর রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও সুবর্ণবনিককুলগৌরব উদ্ধারণ দ্বারা ঠাকুরের শ্রীপাট দুইটা অতীতের চিহ্ন স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে।

ত্রিশবিধা হইতে ১। মাইল দূরে সরস্বতী নদীর তীরে এই পাট অবস্থিত। শ্রীপাটে যাইবার কোন প্রশস্ত রাস্তা নাই, আশ্রকানন বা বনমধ্যস্থ সরু পথ দিয়া শ্রীপাটে বাইতে হয়।

দেখালয়টি পূর্বদ্বারী। সমুখেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের দক্ষিণদিকে সেবারেং মহান্ত মহাশয়ের ভিটল গৃহ। পশ্চিম দিকে অভিষাগা, পূর্বে ঘোশাগা। দক্ষিণ দিকে মন্দির-গৃহ, তৎসংলগ্ন দালান এবং দুই পার্শ্বে অল্প দুইটি গৃহ। ইহার একটিতে পাক কার্খ নির্বাহিত হয় এবং অপরটিতে শ্রীমৎ দাস-গোস্বামীর ব্যবহৃত দেড়ফুট চতুর্ভুজ এক প্রস্তরখণ্ড ও তদীয় ছয় অঙ্গুলি পরিমিত কাঠ-পাছকা আছে। কথিত আছে, এই প্রস্তর-আসনে বসিয়া দাস গোস্বামী ভজন সাধন করিতেন। আজিও এই প্রস্তর-আসন ও কাঠ-পাছকা সবদেয় রক্ষিত হইয়া অনেক ভক্তের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতেছে।

পাণ্ডুরা থানার এলেকাধীন ভট্টাচার্য্য-দমদমা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাস মহাশয় শ্রীপাটের বর্তমান সেবাইত।

মন্দির-গৃহটির তিনটি দ্বার। মধ্য দ্বারের সমুখেই চতুর্দোলায় দাক্ষিণ্যে রক্ষিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ বিরাজিত। ইহাদের নাম রাধামোহন। এই বিগ্রহ দুইটি দাস গোস্বামীর পিতার আমলের। মধ্য স্থলে একটি শালগ্রাম শিলা আছে। রাধামোহন বিগ্রহের বামদিকে অপর একটি চতুর্দোলায় শ্রীগৌরনিতাই মূর্তি স্থাপিত। কথিত আছে, এই শ্রীপাটের প্রথম মহান্ত কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী কর্তৃক এই গৌরনিতাই

মাঘ, ১৩১১

মূর্তি দুইটি স্থাপিত হয়। এই মূর্তি দুইটির আশেপাশে ও কোলের কাছে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাখাক্ষ, গোপাল ও শলিগ্রাম শিলা শোভা পাইতেছে।

রঘুনাথের পিতা ও পিতৃব্যের মূর্ত্য এবং তাঁহার তিরো-
ধানের পর এই স্থানটি নবাব সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়।
প্রথম মহাস্ত কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী স্থাপাদিষ্ট হন যে,
দাস গোস্বামী আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, 'তুমি আশা-
দিগের গৃহ-দেবতার স্থান নবাবের কাছে হইতে উদ্ধারপূর্বক
আমার গুরু-পরিবার হইতে বিগ্রহ লইয়া গিয়া সেই
স্থানে প্রতিষ্ঠা কর। স্থান পরিচয়ের কষ্ট আমি নিদর্শন
দেখাইব।'

স্থাপাহারী মোহাঁত ঠাকুর নবাব-দরবারে শ্রীপাটের
স্থান কিরিয়া পাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। নবাব কোন
প্রকার নিদর্শন ও স্থানটি দেখাইয়া দিবার ক্ষমতা সঙ্গে লোক
দিলেন। নবাবের অমুচর সহিত কৃষ্ণকিশোর সরস্বতীর
তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবাব-অমুচর তাঁহাকে
স্থান-নির্দেশ করিতে এবং কোন নিদর্শন দেখাইতে বলিলে
মূর্তিকার অভ্যন্তর হইতে একখানি কর বহির্গত হইল।
অমুচর কিরিয়া গিয়া নবাবকে সমস্ত কথা নিবেদন করিল।
কৃষ্ণকিশোর ঠাকুরের স্থান এবং কিছু স্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত
হইলেন। বলরাম আচার্য্যের গৃহ হইতে বিগ্রহ লইয়া
আসিয়া একখানি কুটার, বাঁধিলেন এবং তাহাতে সেই
বিগ্রহকে সংস্থাপিত করিলেন। সেই সঙ্গে ৩৭ কর্দুক
গৌর-নিতাই এর বিগ্রহও স্থাপিত হইল।

১১০২ সাল (১৬৯৬ খ্রীঃাব্দ) এ ১লা মাঘ উত্তরারণের
দিন কৃষ্ণকিশোর এক মেলায় প্রবর্তন করেন। তিনি
তিন নোকা চাল-ডাল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া এই মেলায়
প্রথম মহোৎসব সূচসম্পন্ন করেন। তাই আজিও উৎসবের
পূর্বরাত্রিতে অর্থাৎ অধিবাসের নিশিতে উৎসব-কার্য্য সূচসম্পন্ন
করিবার ক্রম

‘রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহারাজা,

‘গোসাই কৃষ্ণকিশোর হে চাল ডাল ভেজো

বলিয়া রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও কৃষ্ণকিশোর মহাস্তকে

আহ্বান করিতে হয়। ঐ দিন প্রায় ৮১০ হাজার লোক
মেলাস্থলে সমবেত হয়। সরস্বতী নদীর তীরে ও আশ্র
কাননের মধ্যে উত্তর পাতিয়া সকলে রন্ধন করে। কারণ,
আট দশ হাজার লোককে প্রসাদ বিতরণ করা সহজ সাধ্য
ব্যাপার নহে। আমরা সম্প্রতি সেই শ্রীপাট দর্শন করিতে
গিয়াছিলাম। আশ্রকানন মধ্যে ও সরস্বতী নদীর তীরে
এখনও উত্তরের বহু চিহ্ন রহিয়াছে, দেখিলাম। শ্রীপাটে
অনেকগুলি প্রাচীন দলিল, শ্রীপাট সংক্রান্ত উইল এবং বহু
প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে। উইলগুলি পাঠ করিয়া
তাঁহাদের মধ্য হইতে মহাস্তগণের নিয়নিলিখিত ধারাবাহিক
জালিকাদি পাইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণকিশোর গোস্বামী।

শ্রীবিনোদচন্দ্র গোস্বামী।

শ্রীকমললোচন গোস্বামী।

শ্রীস্বরূপদাস গোস্বামী।

শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী।

শ্রীনবীনচন্দ্র গোস্বামী।

শ্রীবিনোদবিহারী গোস্বামী (বর্তমান মহাস্ত)।

তৃতীয় মহাস্ত কমললোচনের আমলের এক খানি উইল
ও ‘খুস্তি’ ব্যবহারের অঙ্গমতিপত্র দেখিলাম। পূর্বে শ্রীপাদ
নিত্যানন্দের বংশসম্মত গোস্বামীগণের অঙ্গমতি ব্যতীত
কেহ সংকীর্তনের সচিত্ত ‘খুস্তি’ ব্যবহার করিতে পারিত না।
ব্যবহার করিলে গোস্বামীপাদেশ দণ্ড বিধান করিতেন।
খুস্তি ব্যবহারের বা স্বীয় দেবালয়ে খুস্তি রক্ষা করিবার অঙ্গ-
মতি পাইতে হইলে তাঁহাদিগকে কিছু নজরআনা দিতে
হইত। মহাস্ত কমললোচন ১২২৩ সালের ৭ই ফাল্গুন
(১৮১৭ সালের) ষড়দশ নিবাসী নবচৈতন্য গোস্বামীর
নিকট হইতে খুস্তি রাণিবার অঙ্গমতিপত্র প্রাপ্ত হইলেন।
১২০৯ সালে (১৮০৩ খ্রঃ) তিনি পূর্বতন মহাস্ত বিনোদচন্দ্র
গোস্বামীর নিকট হইতে তদীয় উইল-স্বত্রে এই শ্রীপাটের
মহাস্ত-পদ প্রাপ্ত হন। কলিকাতাহ কলুটোঙ্গার বিখ্যাত
ধনী পরিবার শ্রীল মহাশয়দিগের কোন ধর্মপ্রাপ্ত মহিলাকর্তৃক
এই বর্তমান ‘পাকা’ মন্দিরটি নির্মিত হয়। ১২২৫ সালে

২৪শে ভাদ্র (১৮২২ খৃঃ) কলকাতার বঙ্গবাসীর নামে এই শ্রীপাট উইল করিয়া যান।

বর্তমান মহাস্থানের পূর্ব মহাস্থান নবীনচন্দ্র গোস্বামী বহু দিন এই শ্রীপাটের সেবাইত ছিলেন। তাঁহার সময়ে ১২৮০ সালে (১৮৭৭ খৃঃ) শ্রীপক্ষ্মীর রাজিতে শ্রীপাটে ডাকাতি হয়। চুর্ত্তেরা তাঁহাকে আহত করিয়া বিগ্রহের সমস্ত অলঙ্কার, টাকাকড়ি ও তৈজসপত্র হরণ করিয়া লইয়া যায়। সেই সময় হইতে পাটের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইনি ১২২০ সালে * (১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই) ৭৫ বৎসর বয়সে এক উইল করেন। সেই উইলের সত্ত্বে বর্তমান মহাস্থান এই গদি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীপাটে বহু হস্ত লিপিত প্রাচীন পুঁথি আছে। পুঁথিগুলির অবস্থা শোচনীয়। অধিকাংশ পুঁথির পাতাগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত একখানি চাটু পুষ্পাঞ্জলি এবং রাধাকৃষ্ণের দক্ষনামামৃত গ্রন্থ এতৎসঙ্গে রহিয়াছে, দেখিলাম।

মন্দিরের পশ্চিমদিকে ক্ষীণকারী সরস্বতী প্রবাহিত। ইষ্টকনির্মিত একটি ঘাট আছে। অবস্থা দেখিরা মনে হইল, ঘাটটি খুব প্রাচীন। শুনিলাম, মধ্যে একবার সংস্কার হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান অবস্থা বড় আশাশ্রদ নহে। ঘাটের পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড বহু প্রাচীন বকুল বৃক্ষ বর্তমান রহিয়াছে।

গত ১৩১৩ সালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের চেষ্টা ও উত্তম বঙ্গদেশীয় কারু সত্যর কতিপয় ধর্মপ্রাণ সভ্য শ্রীমন্দিরের সংস্কারের জন্য প্রায় ২৫০ টাকা সাহায্য প্রদান করেন। কিন্তু তদ্বারা বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। অভিধালা ও ঘাটটির সংস্কার বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

কারু-সত্যর হইয়া কারু-কুলগৌরব শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রেমভক্তির যে অপূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে ব্রাহ্মণ গোস্বামীপাণ্ডুরের মধ্যেও এক আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বাহার সাধন ভজন ও নিয়মনিষ্ঠার কথা বহু বৈষ্ণব

এহে বিশেষভাবে পরিকীর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার অনেক বাঙ্গালী দেশ ও বাঙ্গালী সমাজ যে পুত-পবিত্র ও ধর্ম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্বোপরি বাঙ্গালার কারু-সমাজ দাস গোস্বামীর আবির্ভাবে যে অপূর্ণ গৌরব ও সম্মান লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাগ অতুলনীয়। কিন্তু হায়, বাঙ্গালার আধুনিক শিক্ষিত কারু-সমাজ শ্রীমদাস গোস্বামীর এই শ্রীপাট ও তাঁহার মেলার বিশেষভাবে উন্নতিবিধান ও স্থায়িত্ববিধানে উদাসীন থাকিয়া এই মহাপুরুষের কীর্তিটিকে ধ্বংসের মুখে তুলিয়া দিতেছেন। ধর্ম-প্রাণ হিন্দুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা কলঙ্ক ও লজ্জার কথা কি আছে, জানি না।

হুগলী জেলার প্রত্যেক অধিবাসীর নিকট আমাদেরই সাহসের নিবেদন, এই প্রাচীন কীর্তি-সংরক্ষণে আপনার ব্রতবান হইয়া শ্রীপাটের সংস্কার কার্যে এবং এই মেলার উন্নতিবিধানে অগ্রসর হউন।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

শাক

সংস্কৃতে শাক শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা যে শাক (নটে, পুঁই ইত্যাদি) খাটরা থাকি, শাক এ তাহা বুঝায়, এবং আমরা আনাজ বলিগে বাহা বুঝি, তাহাও বুঝায়। 'শাকপাখিবাতিবৎ' ব্যাকরণের এই সূত্রটা অমেকেই জানেন—এখানে শাকপ্রিয় পার্শ্ব (রাজা) কেবল নটে শাক, পুঁই শাকই খাইতে ভালবাসিতেন, তাহা নহে; তৎকালের রীতানুসারে ক্ষত্রিয়েরা অত্যন্ত মাংসপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু এই রাজা মাংসটা তত ভালবাসিতেন না, (vegetables) নিরামিষ আনাজ খাইতে ভালবাসিতেন—ইহাই অর্থ। মহর্ষি চরক 'শাকবর্গ' অধ্যায়ে শাক এবং আনাজ উভয়ের গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; স্মার্ত রঘুবল্লভ আত্মিকভাবে 'শাকগুণাঃ' বলিয়া শাক আনাজ উভয়ই বিচার করিয়াছেন।

মার্চ ১৯১১

মহর্ষি চরকপ্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থ কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কলিযুগের আরম্ভ মাত্র তাহা রচিত হইয়াছিল, এরূপ আভাস গ্রন্থমধ্যেই আছে। চরকে তৎকালীন হিন্দুজাতির খাদ্যাখাদ্য ও ব্যবহার-প্রণালীর যে সকল ইঙ্গিত আছে, তাহাতে চরকসংহিতা অতি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। চরক শাকসম্বন্ধের যে প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন, এই প্রণালীতে আজও আমাদের দেশে আমরা শাক রাখিতেছি। চরক বলেন—

বিস্মং নিপীড়িতরসং স্বেহাঢ্যাক্ষ বিশিষাতে অর্থাৎ সিদ্ধ করিয়া জল ও রস নিংড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া তৈল কিম্বা ঘূতে ভাজিয়া লওয়াই বিশিষ্ট উপায়। আজকালও তাহাই করা হয়। ‘বিশিষাতে’ এই কথা বসায় নিকটপ্রণালীও তৎকালে প্রচলিত ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। দরিদ্রলোকেরা হয়তঃ তৈল কিম্বা ঘূত সংগ্রহ করিত পারিত না, অমনিই ভাজিয়া খাইত। চরকে বহুপ্রকার শাক বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকগুলিই বর্তমানকালে অপ্রচলিত অথবা অপরিচিত। পাঠ্য অর্থাৎ আকণাদি, শুবা অর্থাৎ কালকাসুন্দা, শঠী, মণ্ডুকপর্ণী (খানকুনী), বেত্রাগ্র, কর্কোটক অর্থাৎ কাকরোল, অবন্তজ (সোমরাজী), পটোল পত্র, শকুলাদনী (কটকী), বাসকপুষ্প, গোজিহ্বা (গোজিয়া) বার্ভাকুল, কুলক (উচ্ছে?), কর্কশ (কাকুড়), নিম্বপত্র, ক্ষেৎপাপড়া, বামনহাট, শন, শিমুলফুল, কাকনফুল, সুবর্চলা শিব, কুমারজীব, কুমুমফল চাকুন্দে, পদ্মমণ্ডল, হংস-স্পাদ ইহার। এক্ষণে আর শাকরূপে ব্যবহৃত হয় না। কোনকোনটা অন্তরূপে ব্যবহৃত হয়, কোনটির কোনও ব্যবহারই নাই। রাজকবক, কালশাক, কুচেল, বনভিক্কক, শর্শিষ্ঠা, কেবুক, তিলপর্ণিকা, চিল্লিক, কুচিল্লিক, পত্ন্যর, আধু-পর্ণী, লোটাক, বৃকধুমক, লক্ষণা, কুব্বেক, বাতুক, শাল-কাত্তানী, পীলুপর্ণিকা এইসকল শাক বর্তমানে অপরিচিত। পরিচিতের মধ্যে বাস্তক (বেধো) স্ননিষরক (শুণি), কাকমাচি, আমরুল, পুইশাক, কাটা নটে, নাড়ী (ডাটা শাক?) মটর, হুগাশাক (কলার), তুধক (লাউশাক) পাগড়া (পালং) কলম (কলমী) নালিকা (নালিতা)

লোণিকা (ছুরিয়া শাক?) কুম্মাওশাক, সর্ষপশাক, ইহাদের নাম চরকে পাওয়া যায়। চরকের মতে—বাস্তক—ত্রিদোষর ও বিষ্ঠাভেদক; স্ননিষরক—ত্রিদোষনাশক ও স্ফোটক; ডাটাশাক ও মটর—কফপিত্তনাশক, তিক্ত, শীতল, পাকে কটু; লাউশাক, পালং, কলমী, নালিতা, ছুরিয়া-শাক ও কুম্মাও শাক—মধুর, শীতবীৰ্য্য ও বিষ্ঠাভেদক। (কেবল সর্ষপশাক বিষ্ঠামূত্রের রোধক ও ত্রিদোষকারক)। ‘চরক কাকমাচী, আমরুল, পুই ও কাটানটের বড়ই প্রশংসা করিয়াছেন। কাকমাচী—বৃদ্ধ (বলকারক), ত্রিদোষ নাশক, রসায়ন (জরাব্যাধিনাশক) ভেদক, কুষ্ঠনাশক, বেশী গরমও নহে, বেশী ঠাণ্ডাও নহে; আমরুল—অগ্নি-দীপন, উষ্ণবীৰ্য্যসংকটক, কৃষ্ণরোগ, বায়ুরোগ, গ্রন্থী ও অর্শরোগে হিতকর; পুই—রসে ও পাকে মধুর, ভেদক, বৃদ্ধ, মিত্র, শীতল, মত্ততানাশক ও কফবর্ধক এবং কাটানটে কৃষ্ণ, মত্ততানাশক, বিষনাশক, ও রক্তপিত্ত-নাশক, রসে ও পাকে মধুর ও শীতল। হুই একটা শাকের একটু প্রশংসা করিলেও মোটের উপর শাক সম্বন্ধে বলিয়াছেন—শাকং গুরুত্ব কৃষ্ণক প্রায়ো-বিষ্ঠাকীর্ণ্যতি—শাক গুরুপাক, কৃষ্ণ এবং প্রায়ই জীর্ণ হইতে পেটে শুষ্কতা ও ভার্য বোধ জন্মায়।

দেখা যাইতেছে, চরকের সময়ে বহুপ্রকার শাক লোকে খাইত এবং মহর্ষি চরকের মতে শাক অতি নিন্দনীয় নহে (তাহা হইলে হয়তঃ হুই এক কথা নিন্দাগান করিয়াই ছাড়িয়া দিতেন, অত বিস্তারিত লিখিতে যাইতেন না)। বস্তুতঃ হুই চারিটা প্রশংসনীয়ই বটে।

পরবর্তীকালে শাক অতি হেয় পদার্থের মধ্যে পড়িয়া যায়। পণ্ডিতেরা প্রচার করিলেন—

শাকেষু সর্ষে নিবসন্তি রোগা,

রোগ হি দেহন্ত বিনাশহেতুঃ

তন্মাত্ বৃধৈঃ শাকবিবর্জিতঞ্চ কার্য্যং ;

তথ্যৈষু ত এব দোষাঃ ॥

শাকই সকল রোগের মূল এবং রোগই দেহনাশের কারণ, সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি শাক পরিত্যাগ করিবেন ; অগ্রেও এই দোষ। কবিরাভিজ্ঞা সর্বরোগের সাধারণ

বর্জনীয় করিলেন—শাক, অন্ন ও দধি। আর এক পণ্ডিত কথঞ্চিৎ সহনশীল দেখাইয়া পটোল, বেথো, কাকমাটী ও পুনর্নবা এই চারি শাকের মান রক্ষা করিয়া বাদ বাকী সবগুলিকে অধঃপাতে দিলেন—শাকং সর্বৈ অচাক্ষুযাঃ অমৈথুনঃ বজ্রাঘ্নেয়ঃ, যাতে পটোলবাস্তককাকমাটীপুনর্নবাঃ—অর্থাৎ পটোল বাস্তক কাকমাটী ও পুনর্নবা ব্যতীত সমস্ত শাক চক্ষুর অনিষ্টকারী, রতিশক্তিনাশক ও চলৎশক্তির অহিতকারী।

বাঙ্গালীভাষায়ও শাকের নিন্দা গাহিয়া দুই একটা কবিতা রচিত হইয়া গেল, যথা—

হুতে আয়ু বৃদ্ধি, দুষ্কে বৃদ্ধি বল,

মাংসে মাংস বৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল।

যদিও বাঙ্গালীরা শাকে মল বর্জন ব্যতীত অল্প গুণ দেখিতে পাইলেন না, শাক ভক্ষণ কিন্তু ছাড়িলেন না। আজও শাক বাঙ্গালীর প্রিয়, প্রাচীনকালেও তাই ছিল। কবিকঙ্কণ কালীদাস, কৃত্তিবাসের গ্রন্থ খুলিয়া দেখুন, কিছা চৈতন্ত মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থ দেখুন, যেখানেই আহারের বর্ণনা, সেখানেই “শাকস্থপ আদি করি পঞ্চাশ বাঞ্জন”। পঞ্চাশ বাঞ্জনে আহারের এত উপকরণ বর্তমানেও শাক পরিত্যক্ত হয় নাই। এখনই বা কি? সামাজিক ভোজনে শত বাঞ্জন হইলেও শাক (ও সূক্তা) উপস্থিত আছেনই আছেন।

এত নিন্দা সত্ত্বেও শাকের এত ব্যবহার কেন?

প্রচলিত শাকগুলিকে উৎপত্তিভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা পত্রশাক, কাণ্ডশাক ও ক্ষুপশাক।

১। পত্রশাক—যাহার কেবল পত্র শাকরূপে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ শাকেরই কোমল পত্রসহ কোমল কাণ্ডও ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে পত্রশাক না বলিয়া কাণ্ডশাক বলা উচিত। মূল্যশাকই বোধহয় পত্রশাকের একমাত্র উদাহরণ।

২। কাণ্ডশাক—পাটুরা, ডাটা, কচু, মেথি, ক্ষুপশাক, কুমড়া, কলসী, সরিষা, চেরি, বেথো, কাকমাটী, শুকনো,

পুনর্নবা, পুই, নানাজাতীয় নটে ইত্যাদি। ঢেঁকী ও কচু—এই দুইটির কাণ্ডই প্রশস্ত ও বিশেষরূপে ব্যবহৃত; সুতরাং এই দুইটাই যথার্থ কাণ্ডশাক।

৩। ক্ষুপশাক—যে শাকের গাছের পত্র কাণ্ড, স্বল্প মূল—সর্বদা গৃহীত হয়, যথা নটে ও মূল।

আমরা যাহা খাই, তাহার সার ভাগ জীর্ণ হইয়া রক্তের সহিত মিশিয়া যায়, অসার ভাগ মলরূপে দেক হইতে বাহির হইয়া যায়। যে খাদ্যে অসার ভাগ বেশী তাহাতেই মলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যাহাতে অসার ভাগ কম তাহাতে মল কম হয়। মাংসে অসার ভাগ কম, এই হেতু মাংসভোজী জাতি ও মাংসখী কুকুর ব্যাঘ্র প্রভৃতির মল ভাগ অতি কম। মাংসবৃষে অসার ভাগ মোটেই নাই, এইজন্য কেবল মাংসবৃষ পান করিলে মলের অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মে। আনাজে শাকে অসারভাগ বেশী, তাই শাকারভোজী বাঙ্গালী ও তৃণভোজী গো মহিষাদির মল পরিমাণে বহুল। বৃকের কাণ্ডে ও পত্রে সৌত্রিক উপাদানই বেশী; সৌত্রিক উপাদান জীর্ণ করিবার শক্তি মানুষের নাই, এইজন্যই শাক খাইলে মল বৃদ্ধি হয়। পত্রাদির ও বৃক্ষকাণ্ডের সৌত্রিক উপাদান বৃক্ষ যত বড় হয় ততই বাড়িতে থাকে। তরুণাবস্থায় কম থাকে বসিয়া তরুণ পত্র ও তরুণ কাণ্ড শাকে ব্যবহার্য। ‘শাকের ছা’ ও ‘মাছের মা’ কথাটা বহুদর্শিতারই ফল।

শাকে মলবৃদ্ধি হয় বলিয়া শাক একেবারেই অসার নহে।

আগাদের মল মূত্র ঘর্ম্মাদির সহিত রক্তের লবণভাগ অনবরত বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহাতে উপাদানহীনতা জন্মিয়া রক্তের যে বিকৃতি জন্মে, তাহাতে নানাবিধ রোগ জন্মে। তাজা আনাজ খাইতে না পাওয়ার পূর্বকালে দীর্ঘজীবন-প্রবাসে নাবিকদিগের স্বর্ভি নামক সাংঘাতিক রোগ জন্মিত; তাহাতে প্রতিবৎসর এক ইংলণ্ডেই বহুসহস্রলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। শুধু তাহা নহে, লবণের ভাগ কমিয়া গেলে রক্তের অম্লতা জন্মে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ইহা হির হইয়াছে যে, রক্ত বিশেষরূপে ক্ষারধর্মী থাকিলে সংক্রামক রোগে আক্রমণ করিতে পারে না, আক্রমণ করিলেও দীর্ঘ ও সহজে রোগ বিনষ্ট হয়, কিন্তু রক্ত অম্লধর্মী থাকিলে সংক্রামক

যোগে সহজেই আক্রমণ করে। প্রত্যহ মলমূত্রাদির সহিত রক্তহ লবণের বেকর হইতেছে, শাক আনাজ ভক্ষণ দ্বারা সেই ক্ষতি পরিপূরিত হয়। শাক ও আনাজ, বিশেষতঃ আনাজের ধোঁসাগুলি-বেগুলি আমরা অবহেলা করিয়া পরিত্যাগ করি, তাহা লবণে পরিপূর্ণ; বিবেচনাপূর্বক পাক করিয়া খাইলে ঐ সমস্ত লবণটুকু আমাদের উদরস্থ হইয়া রক্তের সহিত মিলিত হয় ও রক্তের উপানানের সমতা রক্ষণ করে এবং গোণভাবে আমাদেরকে সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে রক্ষা করে। গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে জেলখানায় কয়েদীদিগকে এই নিমিত্ত মধ্যে ২ শাক খাওয়াইতে হয়। শুধু লবণ নহে, শাকে পুষ্টিকর পদার্থেরও অভাব নাই। বিবেচনা পূর্বক পাক করিয়া খাইলে দেহের পোষণোপযোগী পদার্থ শাকে প্রচুর পাওয়া যায়। সত্য বটে, শাকে বহুল পরিমাণে জল আছে, কিন্তু জল শুকাইয়া পরে শুকশাকের পরীক্ষায় মেদময়, প্রোটীড, (মাংসপাক) কার্বহাইড্রেট (তাপজনক) ময় পদার্থ যথেষ্ট পাওয়া যায়, সঙ্গে ২ প্রচুর লবণ এবং কোনও কোনও শাকে বালুকাও পাওয়া যায়। ডেন্নো বা ডাটাশাকে প্রায় ৮০.৯০ ভাগ জল। জলহীন শাকে শতকরা প্রায় ৫ ভাগ মেদময়, ২৫ ভাগ প্রোটীড, ৩৫ ভাগ তাপজনক পদার্থ ও প্রায় ২৫ ভাগ লবণ। নটে শাকে প্রায় অর্ধেক জল। জলহীন শাকে ৩ ভাগ মেদময়, ২০ ভাগ প্রোটীড, ৩৮ ভাগ তাপজনক পদার্থ ও প্রায় ২৫ ভাগ লবণ ইত্যাদি। মোটের উপর, নির্জলা শাকের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, পুইশাক, বিটপালং ও পালকী শাকে মেদোময় পদার্থ খুব বেশী (শতে ৫ এর উপর)। পালকী ও ডেন্নো শাকে প্রোটীড খুব বেশী (শতে ২৫ এর উপর)। চাপানটে, কাটানটে, বিটপালং ও বেথো শাকে তাপজনকপদার্থ সর্বপেক্ষা বেশী। লবণ কোনটীতেই ১৬ ভাগের কম নহে, ২৮ ভাগ পর্যন্তও আছে (পুইশাক)। মেদোময় পদার্থ বেশী আছে বলিয়া পুই ও পালকী খাইতে এত স্বাদ ও রাখিতে এত কম তৈল দ্রুত লাগে। নটেশাক, বেথো ও পালংশাক তাপোৎপাদক। প্রাকৃতিক নিয়মে উহার শীতকালেই ভাল জন্মে এবং শীতকালেই খাইতে ভাল লাগে। পূর্ণবাসাকে

লবণের ভাগ অত্যন্ত বেশী, এইজন্য ইহা স্নেহকারক এবং প্রচুর মুত্র উৎপাদনের জন্য শোথরোগীর পথ্য। ইহার অপরা নাম শোথরী। কুমড়া শাকে চূর্ণের ভাগ বেশী থাকায় রক্তপিত্ত, রক্তশ্রাব ও কফরোগে হিতকর। লবণের মধ্যেও একটু বিশেষত্ব আছে। কফরী এসিড ঘটিত লবণ খাইলে মস্তিষ্কের পুষ্টিসাধন হয়, এরূপ ধারণা অনেক চিকিৎসকেরও আছে। কফরিক এসিড ঘটিত লবণ লাল ডাটাশাকে সর্বপেক্ষা বেশী, চাপানটে ও বেথোশাকে তন্নিম্ন, বিটপালং অতিকম। পূর্বে বলিয়াছি যে, কোন ২ শাকে বালু পাওয়া যায়। চাপানটে ও পুইশাকে বালু খুব বেশী; এই জন্যই আমি একটু বেলেচনা হইলে এই দুইশাক ভাল জন্মে না।

এতদ্ব্যতীত শাকের আরও বহুগুণ আছে। কচু শাক রক্ত পরিষ্কারক বলিয়া পূর্ববঙ্গে বিখ্যাত; কাণ্ডিক মানে যে বত কচু শাক ধায়, তার গায় নাকি তত বেশী রক্ত জন্মে। কাণ্ডিক মাস গ্রীষ্ম ও শীতের সন্ধিস্থল। ঋতু-সন্ধিকাল হর্ষল লোকের পক্ষে বিপদসঙ্কল কাল। হঠাৎ পরিবর্তন সহ্য করিতে না পারায় এইকালে যক্ষ্মা রোগীর মুখ দিয়া রক্ত উঠে, সাধারণ লোকের আমাশয়ের পীড়া জন্মে, হর্ষল রোগী ও বৃদ্ধের প্রাণভাগ করে। এই মাসটা কোনরূপে কাটাইয়া দিবার জন্য চাতুর্মাস্ত্রের সৃষ্টি, যিকুকে তুলসী দেওয়ার সৃষ্টি। কাণ্ডিক মাসে কচু শাক খাওয়ার বিধির মূলেও এরূপ কিছু থাকিবে। কলমী শাক তিক্ত, বলকারক, হস্ত পদের দাহ-নিবারক। শুয়া শাক খাইলে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকে। ইহা খাইলে ভাল ঘুম হয় বলিয়া পূর্ববঙ্গে ইহার একনাম নিদ্রালু; ইহা খাইতে অতি উত্তম। মূলা, সরিষা, কপি প্রভৃতি Cruciferi বর্গীয় আনাজে গন্ধকের অংশ থাকায় মূলা শাক ও সরিষা শাক কোষ্ঠপরিষ্কারক, চর্মরোগ-নাশক ও কফনাশক। আমাদের দেশে কিন্তু সরিষা শাক গ্রাম্য লোকেরই খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। চরক লিখিয়াছেন, “সর্বপাকং শাকানাং নিকৃষ্টতম ভবতি ইত্যর্থঃ”—শাকের মধ্যে সর্বপ শাক নিকৃষ্টতম।—

ভরুণং সর্বপশাকং নবোদনং পিচ্ছিলানিচ নবীনি
অন্নব্যয়েন স্তন্দরি প্রাণ্যজনো নিষ্টমস্তি ॥

ইহা একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক—“নূতন সরিষা-শাক, নূতন চাউলের ভাত ও পিচ্ছল দধি এই সব দ্বারা অন্ন পরসায়, হে স্বন্ধরি, গ্রাম্য লোকেরা একটু ভাল খাওয়া খাইয়া থাকে”। গ্রাম্য-লোকের উপভোগ্য বলিয়া সর্ষপ-শাককে বিক্রপ করা হইয়াছে। পক্ষাণ্ডের, চরক ও আমরুল শাকের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন কেন, তাহা আমাদের বোধাতীত। আমরুল শাকে প্রচুর পরিমাণে Oxalic acid থাকে; সেবনে মন্দিগ্নি লোকের Oxaluria রোগ জন্মে এবং নিয়ত সেবিত হইলে পাথুরী রোগও জন্মিতে পারে। ভাগ্যক্রমে শাকরূপে আমরুলের ব্যবহার প্রায় নাই। ছোলা ব্যতীত অন্যান্য স্থপ্যশ্যাক অর্থাৎ ডাইলের ডগালাক মিষ্ট ও মুখরোচক কিন্তু মন্থর শাকের প্রতান বা আকুশীগুলি কিছুতেই জীর্ণ বা পাকে কোমল হয় না। ছোলার ডগায় Oxalic acid থাকে সুতরাং ইহার দোষগুণ আমরুলের স্থায়।

শাক হইতে সার গ্রহণ করিতে বিবেচনা পূর্বক রন্ধন আবশ্যক। চরক লিখিয়াছেন “স্বিন্নং নিপীড়িতরসং রেহাচ্যাকং বিশিষ্যতে” আমরাও তদনুসারে শাক জলে সিদ্ধ করিয়া নিংড়াইয়া জল ফেলিয়া দেই; সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাবশ্যকীয় লবণটুকু এবং যে অভ্যন্নসারটুকু আছে তাহারও অধিকাংশ ফেলিয়া দেই। অবশিষ্ট নীরস অসার স্ত্রব্রমর যে ছিবড়াটুকু থাকে তাহাই গলাধঃকরণ ভ্রাতৃ তৈলে অথবা ঘূতে ভাজিয়া লই (নতুবা এ শুষ্ক খানবৎ পদার্থ কেহ খাইতে পারিত না)। রন্ধনের দোষে সারভাগ ফেলিয়া অসার ভাগটুকু খাইতেন বলিয়াই প্রাচীনেরা শাকের এত নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। এক বার জেলখানার শাক রাঙ্গিয়া শাকের জলটুকু জাল দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে আশ সের পরিমিত শাক হইতে, মনে হয়

যেন ২৮ গ্রেণ (১৪ রতি) লবণ পাওয়া গিয়াছিল। এজন্ত জেলখানার শাক সিদ্ধ জল ফেলিয়া দিবার রীতি নাই, শাক সিদ্ধ লবণময় জলটুকু ডাইলে দিবার নিয়ম। শাকে প্রচুর জল আছে; নিজের জলেই লাউ কুমড়ার মতন শাক সিদ্ধ হইতে পারে। কদাচিত্ একটু জল প্রয়োজন হইতে পারে। শাকের গায়ের জলই হটক কিংবা বাহিরের জলই হটক, শাকের গায়ে শুকাইয়া লইলেই হয়। তারপরে তৈলে ঘূতে ভাজিয়া লওয়া যাইতে পারে। হাড়িভরা জল দিয়া সার অংশটুকু বাহির করিয়া সেই জল সারাংশসহ ফেলিয়া দেওয়া অসুচিত। এই নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শাক রাখিয়া খাইলে আর অসন্তুষ্ট হইয়া শাকের নিন্দাবাদ করিতে হইবে না।

শ্রীভারতনাথ দেব।

যথাস্থানে সংস্কার

স্বর্গ হতে ঘুরে এসে বলে বৃষ্টি-জল
ধরা নহে বাসযোগ্য, ধলাই কেবল।
যাই হোক এ যখন জননী আমার
আমারই লইতে হয় সংস্কারের ভার।
পাছ বলে সাধু কিন্তু মাঠে যাও দাদা।
পথে ধুলো ঘেটে আর করোনাকো কাদা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

চন্দ্রসিংহ ত্রিপুর বা চন্দ্রসেন

(ঢাকা সাহিত্যপরিষদে পাঠিত—ফাল্গুন, ১৩১৯)

দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার অন্তর্গত ভাঙ্গুগাঁও পরগণার রাজা চন্দ্রসিংহ মতান্তরে চন্দ্রসেনের গড়, দীঘি, বজ্রহলী এবং ভাঙ্গুগাঁওর পূর্বদিকস্থ পাহাড়ে চন্দ্রসিংহের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। নানাবিগণেশ হইতে চন্দ্রসিংহ কর্তৃক আনীত ও বরাহো স্থাপিত ব্রাহ্মণ, কার্বয় ও নবশাখ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

* প্রবন্ধকারের মতে চরক কনিষ্কের প্রারম্ভে জ্বরগ্রহণ করেন, কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে চরক মহারাজ কনিষ্কের সমকালবর্তী ছিলেন। চীনদেশীয় গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে চরক কনিষ্কের একজন সভাসদ ছিলেন। ইতিহাস এন্টিকোয়ারি ১৯০৯ : (সিলভান লেভির প্রবন্ধ), প্র, ১।

মাস ১৩১২

বংশধরগণ মধ্যে অনেকে অদ্যাপি ভাঙ্গুগাছ অঞ্চলে বসবাস করিতেছেন।

এই স্বনাম-ধন্য নৃপতি কোন্ বংশ সম্বৃত্ত এবং তাঁহার রাজত্বকালে খ্রীষ্টের দক্ষিণাঞ্চলের অবস্থা কিরূপ ছিল এ সকল প্রশ্ন অমুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের মনে সত্যই উদ্ভিত হইবার কথা; কিন্তু হুংখের বিবরণ, উপরোক্ত প্রশ্ন সমূহের সমাধান করে এখনও যথোপযুক্ত আলোচনা হয় নাই।

চন্দ্রসিংহ সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ বিশেষ কিছুই নাই কিন্তু আশার কথা এই যে, তৎসংশ্লিষ্ট জনশ্রুতিগুলি ভাঙ্গুগাছ অঞ্চলে এখনও বিকীন হয় নাই। কাল-স্রোতে বহু ঘটনাবলীর স্মৃতি বিলুপ্ত হইলেও নানা আকারে রূপান্তরিত চন্দ্রসিংহ-সংশ্লিষ্ট কিংবদন্তীগুলি অদ্যাপি ভাঙ্গুগাছ অঞ্চলের পল্লীবৃদ্ধগণের 'মানসপটে উজ্জল।

'নক্ষত্রা জনশ্রুতি' রূপ অবলম্বন যষ্টি ঐতিহাসিকদিগের নিকট সর্বদা নির্ভরযোগ্য নহে। আনুসঙ্গিক ঐতিহাসিক প্রমাণে সমর্থিত হয় না এই রূপ শত শত জনপ্রবাদও প্রত্যেক দেশেই প্রচলিত আছে। উহাদিগকে সত্যের আসনে স্থান প্রদান করিলে সত্যের মর্যাদার লাঘব হয়। সুতরাং চন্দ্রসিংহবিষয়ক অসংলগ্ন জনপ্রবাদ হইতে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধাটনে বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ভাঙ্গুগাছের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চন্দ্রসিংহ ও তৎসম-সাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের স্মৃতিবিজড়িত কীর্তিসমূহের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আলোচনায় প্রধান অবলম্বন স্বরূপ সন্দেহ নাই।

এহলে লিখিত প্রমাণ বিশেষ কার্য্যকরী হইত কিন্তু চন্দ্রসিংহ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য লিখিত প্রমাণ বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। 'বৈদিক সংবাদিনী' গ্রন্থে "চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের" বংশানন্ত বিবরণ স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতি-রিক্ত লোক পরম্পরায় এই রূপ অবগত হওয়া যায় যে কিছু কাল পূর্বেও দক্ষিণ খ্রীষ্টের স্থান বিশেষে 'চন্দ্রসেন'-নামক একখানা (অথবা দুই) পুঁথি প্রচারিত ছিল।

শেষোক্ত গ্রন্থ বৈদিক সংবাদিনীর বিরুদ্ধ বতাবলম্বী; কিন্তু এই দুইখানা গ্রন্থেই চন্দ্রসিংহ সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। দুই গ্রন্থখানার ঐতিহাসিক মূল্য নির্দেশ করা সম্ভবপর নহে; সুতরাং বর্ণিত গ্রন্থোক্ত বিবরণ জনশ্রুতিমূলকরূপে নির্দেশ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের বিবরণগুলিও অতি সন্তর্পণে গ্রহণ করিতে হইবে, যেহেতু ব্যক্তি, স্থান অথবা সম্প্রদায় বিশেষের কীর্তি-বোষণা-উদ্দেশ্যমূলক এই শ্রেণীর বহু গ্রন্থের রূপায় অত্যাশ্রিত্যপূর্ণ অথবা কষ্ট কল্পিত অসংখ্য কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে ও করিতেছে। বাহা হউক চন্দ্রসিংহ ও তৎসমসাময়িক দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অমুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণার্থ তাহার বিষয়ে নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইল।

চন্দ্রসিংহ সম্বন্ধে পরম্পর বিরুদ্ধবাদী দুইটি মত প্রচলিত আছে—

(ক) এক মত অনুসারে তিনি বঙ্গাঙ্গ সেনের পুত্র খ্রীষ্টের রাজা গৌরগোবিন্দের জামাতা। তিনি ত্রিপুরা-রাজ্যের এক কন্যাকে অজ্ঞানিতভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত রাণীর প্রকৃত বংশ পরিচয় জাত হওয়া মাত্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন।

(খ) অপর মতে, চন্দ্রসিংহ ত্রিপুর রাজপরিবার-সংশ্লিষ্ট এক রাজ-কুমার। তিনি ত্রিপুর-রাজ্যের কন্যা বিবাহ করিয়া যৌতুক স্বরূপ এক খণ্ড ভূমি লাভ করিয়া ভাঙ্গুগাছ-রাজ্য স্থাপন করেন। অতঃপর রাজা গৌর-গোবিন্দের এক কন্যাকেও তিনি বিবাহ করেন, এবং কনিষ্ঠা রাণীর মন্ত্রনায় ভোঁটা রাণীকে নির্বাসিতা করেন।

প্রত্যেক মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত জনপ্রবাদের অভাব নাই। উহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

প্রথমোক্ত মতের পরিপোষক জনশ্রুতি সমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—

(ক) 'চন্দ্রসেন' বঙ্গাঙ্গ সেনের পুত্র।

(খ) পিতার কোন গহিত আচরণে ব্যথিত হইয়া তিনি কতিপয় অস্থির সমভিব্যাহারে পূর্বদেশে আগমন করেন।

(গ) বল্লাল সেনের ভয়ে তাঁহার সময়ে শ্রীহটে বহু ব্রাহ্মণ-ভদ্রেরও সমাগম হয়।

(ঘ) তিনি তৎকালীন শ্রীহট্টের নৃপতি গৌরগোবিন্দের কন্যা ভানুমতীকে বিবাহ করেন।

(ঙ) গৌরগোবিন্দ-প্রদত্ত যৌতুক এক ভূখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিজ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

(চ) নিজ পত্নী ভানুমতীর নামানুসারে তাঁহার রাজ্যের নাম ভানুগাছ নির্দ্ধারিত হয়।

(ছ) সুদীর্ঘ প্রবাসের পর বল্লাল সেন কর্তৃক তিনি বিক্রমপুরে নীত হন।

(জ) তিনি প্রকৃত বংশ পরিচয় অকাল না হইয়াই এক পদ্মিনী কন্যা বিবাহ করেন। কালক্রমে এই রাণী ত্রিপুর-রাজবংশীয়া বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ার পরিত্যক্তা হন।

(ঝ) ব্রহ্মপুত্র-ভয়ে তাঁহার শ্রীহটে আগমন সম্বন্ধেও জনশ্রুতি রহিয়াছে।

নিম্নে উপরোক্ত জনশ্রুতি মধো কয়েকটির বিস্তারিত বর্ণনা প্রদত্ত হইল—

১। বল্লাল সেনের ভয়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্বক পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, বল্লাল সেনের এক পত্নী স্বহস্তে ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টান্ন পরিবেশনান্তে প্রসাদ গ্রহণ করার নিমিত্ত স্বপ্নাদিষ্টা হন। বল্লাল সেন পত্নীর এই মনোভিলাষ পূরণার্থে ব্রাহ্মণদিগকে আহারের নিমিত্ত অনুমতি করেন। ইহার ফলে জাতিধ্বংস হওয়ার আশঙ্কায় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করেন এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ শ্রীহটে আগমন করেন। ইহাদের আগমন ফলে শ্রীহটে এক নব যুগের স্বত্রপাত হয়। শ্রীহট্টের অভিজাতবর্গ শাক্ত ধর্মাবলম্বী, অগচ্চ ইহাদিগের মধ্যে বল্লালের কৌলিষ্ঠ অথবা প্রচলিত নাই। বল্লাল সেনের প্রতি ইহাদের মনোভাব নিম্নোক্ত শ্রীহটে সুপরিচিত শ্লোকে ব্যক্ত হইবে—

“মহাপ্রভুশ্চৈতন্ত বল্লাল রথুনন্দন।

লোকানাং ধর্মানাশয় কলোপুত্রো চতুর্ধরঃ ॥”

২। দীর্ঘ প্রবাসের পর পিতাপুত্র পুনর্মিলন সম্বন্ধে জনপ্রবাদ এই যে, পিতৃগৃহ পরিত্যাগকালে চন্দ্রসেন স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। একদা এই বিরহ-ক্লান্ত রাজবধু নিজ অদৃষ্টকে ধিকার পূর্বক একটি ধাতু সাহায্যে গৃহ-প্রান্তরে “চৌরঃগভেন” ইত্যাদি শ্লোকটি অঙ্কিত করিয়া ভূমি অঙ্গসিক্ত করিতে ছিলেন। দৈব ক্রমে রাজা পুত্রবধুর মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করেন। পুত্র-বংশল পিতার আগ্রহে এবং দাস জাতির সহায়তার দীর্ঘ প্রবাসের পর চন্দ্রসেন ভানুগাছ হইতে বঙ্গদেশে নীত হন।

৩। ত্রিপুর-রাজ-কন্যা বিবাহ সম্বন্ধে জনপ্রবাদ এই যে, একদা মানিকভাণ্ডার অঞ্চলে ৭ দিন ৭ রাত্রি মূলধারে বৃষ্টি হয়। ফলে দেশ এক রূপ জলপ্লাবিত হয়। এই সময়ে চন্দ্রসিংহ ধলেশ্বরীর (প্রকাশিত ধলাই) স্রোতে কেনও প্রবমান কাঠপেটিকাভাস্তরে একটি পদ্মিনী কন্যা প্রাপ্ত হন। চন্দ্রসিংহ ইহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। কাল ক্রমে এই রাণী সন্তান সন্তাবিতা হইয়া অনার্য্যগণের মুখরোচক দম্ব মন্ত্র, লাখাই ধাত্তের অন্ন, দম্ব মৃত্তিকা ভক্ষণ এবং শৈশবে মাঁচানে প্রতিপালিত হওয়ার ‘টাকর’ বা উচ্চ স্থান হইতে পা দোলাইবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, রাণী ত্রিপুরা রাজবংশোদ্ভবা, সুতরাং লোকলজ্জাভয়ে চন্দ্রসিংহ কর্তৃক এই রাণী পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন।

৪। চন্দ্রসিংহ সম্বন্ধে প্রচলিত অপর একটি জনশ্রুতি এই যে, পূর্বকালে ব্রহ্মপুত্র-তীরে কোনও এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন তন্মধ্যে ছোট রাণী স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিতা ছিলেন। তিনি কোনও সন্ন্যাসী হইতে স্বামীর মন পরিবর্তনের নিমিত্ত মন্ত্রপুতঃ বশীকরণোপায় সংগ্রহ করেন, কিন্তু ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্বেই এই সিদ্ধান্তে উপনীতা হন যে মন্তিক বিকৃতি না ঘটিলে পুরুষের মনোভাব হঠাৎ এরূপ পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং বশীকরণে স্বামীর অসম্মল আশঙ্কা করিয়া তিনি উক্ত ঔষধ ব্রহ্মপুত্র-

ষাঢ় ১৩১২

গর্ভে নিক্ষেপ করেন। ব্রহ্মপুত্রের কূপার যথাসময়ে এই রাণীর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু অদৃষ্ট দোষে তিনি পুত্র সহ নির্দাসিত হন। কাল ক্রমে এই কুমার চন্দ্রসেনের ভগ্নীকে (মতান্তরে পিতৃবশাকে) বিবাহ করিবার নিমিত্ত এক প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। চন্দ্রসেনের পিতা এই প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করার ব্রহ্মপুত্র নদের ক্রোধে তাঁহার রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং এই ঘটনায় চন্দ্রসেন দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক যুগেও ব্রহ্মপুত্র নদের স্রোত বহু বার পরিবর্তিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিছু কাল পূর্বেও ব্রহ্মপুত্র-স্রোত গোয়ালপাড়ার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে প্রবাহিত হইয়া ময়মনসিংহ জিলার বংকাভেদ পূর্বক ভৈরব-বাজারের নিকটে মেঘনাদে পতিত হইত। বর্তমানে এই পুরাতন প্রবাহের গৌরব অন্তর্মিত। সম্ভবতঃ উপরোক্ত জনশ্রুতি ব্রহ্মপুত্র প্রবাহের কোনও পরিবর্তন-স্থিতি জীবিত রাখিয়াছে।

উপরোক্ত জনপ্রবাদ সমূহের ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ-করে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী জনশ্রুতি সমূহ এবং তাৎকালিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। এই উপায়ে সত্য নির্ধারণের পথ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হইবে সন্দেহ নাই।

জনশ্রুতি সমূহের আলোচনা—

বৈদিক সংবাদিনী গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে ৬০৪ খ্রিষ্টাব্দে (?) অর্থাৎ ১১২৪ খ্রিষ্টাব্দে জিপুরা রাজ সুধর্ম্মকা (?) কনোজ হইতে আগত নিধিপতি নামক জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে অরণ্যে পরিণত 'চন্দ্রসিংহ জিপুরের' রাজ্য সংযুক্ত এক খণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে ইহার নিদর্শন স্বরূপ একখানা (অধুনা লুপ্ত) তাম্রফলকের নিম্নোক্ত প্রতিলিপি স্থান পাইয়াছে—

জিপুরা পর্বতাদীশঃ শ্রী শ্রীযুক্ত সুধর্ম্মকাঃ

সমাজং দত্ত পত্রক সৈখিলার তপস্বিনে

শ্রীনিধিপতি বিগ্রায় বাংস্ত গোত্রায় ধর্ম্মিণে

প্রাচ্যঃ লংলাই কুকি-স্থানং প্রতিচ্যাম গোপলা নদী

চন্দ্রসিংহ জিপুরস্ত দক্ষিণভাগমধ্যং

কোশিরা নহাভরসাং গোপদত্ত স্থান মেবহি

এতমধ্যা সশস্ত্রা বা মহুকুল প্রদেশিনী

সোহপি প্রদত্তা তন্মৈ তৎ বৈদিকায় তপস্বিনে

তুঙ্গ পক্ষে তৃতীয়াং দিনে মেবগতে রবৌ

চতুষ্টী শতাব্দেতু ত্রৈপুরে দত্ত পত্রিকা ॥

বর্ণিত তাম্রলিপি আলোচনার দৃষ্ট হইবে যে—

১। চন্দ্রসিংহ নামধেয় একটি রাজা পূর্বকালে দক্ষিণ শ্রীহট্টের ভাঙ্গুগাছ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন।

২। কাল ক্রমে তাঁহার রাজ্য অরণ্যে পরিণত হয়।

৩। তিনি জিপুরবংশীয় ছিলেন।

৪। সুধর্ম্মকা নামে এক রাজা জিপুরায় রাজত্ব করিতেন।

৫। তৎকালে নিধি-পতিনামক এক জন ব্রাহ্মণ জিপুরায় আগমণ করেন।

৬। তিনি বাংস্ত গোত্রীয় ছিলেন।

৭। তাঁহার নিবাস কনোজ ছিল।

৮। তাঁহার সময়ে চন্দ্রসিংহ জিপুরের রাজ্য অরণ্যে পরিণত ছিল।

৯। জিপুরা-রাজ নিধিপতিকে এই ভূখণ্ড প্রদান করেন।

১০। এই ঘটনা ৬০৪ খ্রিষ্টাব্দ বা ১১২৪ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়।

১১। জিপুরায় কোনও রাজা কর্তৃক উক্ত ভূখণ্ড পূর্বেও এক বার প্রদত্ত হইয়াছিল।

বৈদিক সংবাদিনী প্রদত্ত তাম্র ফলকের প্রতিলিপি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কি না যথাস্থানে তাহার আলোচনা করা যাইবে। যাহা হউক শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সমাজের এই প্রধান সুখপত্র যে চন্দ্রসিংহকে জিপুরা আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন তাহাষের কোনও সন্দেহ নাই। প্রকৃত পক্ষে দেববিজে ভক্তিপরায়ণ চন্দ্রসিংহ বঙ্গাল-ভনয় হইলে তাঁহাকে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ-সমাজ অকারণে এ রূপ ভাবে জিপুরা আখ্যায় অভি-হিত করিতেন না।

বিশিষ্ট প্রমাণ অভাবে কেবল মাত্র তৎসংশ্লিষ্ট সেন উপাধির ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাকে বজ্রাল-তনয় অথবা বৈষ্ণব-বংশ-সম্ভূত এ রূপ স্থির করিবার কোনও কারণ নাই। ‘ভীমসেন কুলোদ্ভব’ এই কিংবদন্তীর ফলে ত্রিপুরগণের অপর শাখা, কাছাড়ীগণের রাজমালায়ও সেন উপাধির আধিক্য দৃষ্ট হয়। একাধিক কাছাড়ী রাজকুমারের ত্রিপুর-রাজ-বংশে বিবাহ ক্রমে ত্রিপুরা ভূমে রাজ্য স্থাপনের কিংবদন্তী ও প্রচারিত আছে।

এমত অবস্থায় চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের নাম সংশ্লিষ্ট সেন উপাধি, ত্রিপুরার অধিকার মধ্যে তাঁহার রাজ্য লাভ, ত্রিপুরার রাজকন্যা বিবাহ এবং রাজধানী স্থাপনের উপযুক্ত সমতল স্থান থাকিতেও ভানুগাছুর পূর্বের পাহাড়ে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করায় তাঁহাকে ত্রিপুর অথবা তদনুরূপ রাজবংশীয় কুমার রূপে নির্দেশ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হইবে না।

পক্ষান্তরে ত্রিপুরা রাণী-সংশ্লিষ্ট জল-প্রাচীন ও লাক্ষ্মী-কাঞ্চিনী, ভানুগাছ রাজ্যের উৎপত্তি ও নামকরণ এবং চন্দ্রসিংহের সহিত বজ্রাল সেন ও গৌর-গোবিন্দের উল্লেখ বড়ই সন্দেহজনক। এই সকল জনশ্রুতির মূলে চন্দ্রসিংহ ও গৌর-গোবিন্দ এতদুভয়কে সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিন্দু রূপে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টা প্রচুর রহিয়াছে কি না অনুধাবন যোগ্য।

অনার্য্য রাজগণ ব্রাহ্মণ ও ভদ্র-পরিবেষ্টিত হইলে আশ্রিতবর্ণের রূপায় তাঁহাদের প্রকৃত বংশ পরিচয়ের বিশ্লেষণসাধন এবং সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বংশাবলী প্রণয়ন ইতিহাসে বিরল নহে।

চন্দ্রসিংহ সর্বদাই ব্রাহ্মণ-ভদ্র-পরিবেষ্টিত থাকিতেন এবং সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে নিজ রাজ্যে স্থাপিত করিতেন। ইহাদের বংশধরগণ চন্দ্রসিংহকে অনার্য্য রাজা বলিয়া প্রচার করিতে গৌরব অনুভব করিবেন কিনা সন্দেহ স্থল।

চন্দ্রসেনের রাজ্যের অন্তর্গত ভূমি বর্তমানে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অধিকৃত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ তদবংশীয়

চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের অধিকৃত ভূমি উত্তরাধিকারী হইয়া হইবার নিমিত্ত ব্রিটিশ আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। সামান্য একখণ্ড ভূমি লাভের নিমিত্ত ত্রিপুরা-রাজ চন্দ্রসিংহকে নিজ বংশীয় রূপে পরিচয় প্রদান পূর্বক সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এক অভিযোগ উপস্থাপিত করিবেন এরূপ ভাবিবার কোনও কারণ নাই। বাহা হউক ত্রিপুরা-রাজ চন্দ্রসিংহকে ত্রিপুর বংশীয় রূপেই প্রচার করিতেছেন।

বৈদিক সংবাদিনী হইতে নিম্নলিখিত ও স্বধর্ম্মক বিবরণ বিবরণ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ অনুসারে নিম্নলিখিত ৫৫৩ বৎসর পূর্বের আদিধর্ম্মকা এবং পঞ্চ বৈদিক সংক্রান্ত ৫১ ত্রিপুরাকে (৬৪১ খৃঃ) প্রদত্ত, অপর একখানা তান্ত্র ফলকের নিম্নোক্ত পাঠও স্থান পাইয়াছে—

“ত্রিপুরা পর্বতাম্বীঃ শ্রীশ্রীযুক্তাধিধর্ম্মপাঃ

সমাজঃ দত্ত পত্রক লৈখিগেন্ তপস্বিবু ॥

বংশ ব্যাংস্ত ভরদ্বাজ কৃষ্ণাশ্রয় পরাশরাঃ

শ্রীনন্দানন্দ গোবিন্দ শ্রীপতি পুরুষত্তমাঃ ॥

প্রতিচামুত্তরশ্রাং বক্রগা ক্রোশিরা নদী

দক্ষিণশ্রাং পূর্বশ্রাং হাকলা কোকিকা পুরী ॥

এতদ্বাং সশস্ত্রা যা টেকরী কুকি কবিতা

প্রালভ্য দত্তা তদ্বৃমি স্তেব পঞ্চ তপস্বিবু ॥

মকরহে রবৌ শুক্রে পক্ষে পঞ্চদশী দিনে

ত্রিপুরা চন্দ্র বাণাকে প্রদত্তা দত্ত পত্রিকা” ॥

বৈদিক সংবাদিনী প্রদত্ত উক্ত পাঠ হইতে অবগত হওয়া যায় যে,

১। ৫১ ত্রিপুরাকে বা ৬৪১ খৃষ্টাব্দে কেবল মাত্র ভানুগাছ নহে, বরাক ও কুশীয়ারা নদী পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের দক্ষিণাঞ্চল ত্রিপুররাজ্যের অধিকৃত ছিল।

২। তাত্‌কালিক ত্রিপুরারাজ আদিধর্ম্মকা (?) শ্রীনন্দ, আনন্দ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণকে মিথিলা হইতে বজ্র-সম্পাদনার্থ নিজ রাজ্যে আনয়ন করেন। বৈদিক পুরাবৃত্ত নামক বৈদিক সনাজে প্রচলিত অপর এক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আদিধর্ম্মকা প্রয়াগ তীর্থে বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিহার পূর্বক ব্রাহ্মণ দিগের রূপায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ ও কত্রিয় হ লাভ

মাস ১৩১২

করেন; অতঃপর ত্রিপুরা-রাজধানীর অদূরে, জয় পূর্বতের পাশে ময়ূ নদীর তীরে তিনি বজ্র অশ্রুতান করেন।

৩। বজ্রাশ্রুতানে ত্রিপুরা-রাজ উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে ভাঙ্গু-গাছ সহ এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড প্রদান করেন।

৪। তৎকালে খ্রীষ্টের দক্ষিণাঞ্চলে ভদ্র লোকের বাসস্থান ছিল না, তথায় এক অনার্য জাতির বসবাস ছিল। ইহারা 'কচাক' এই আখ্যায় অভিহিত হইত অতঃ এই রূপ অবগত হওয়া যায়।

৫। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে বৈশিখ আনন্দ এবং ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ হইতে আগত নিধিপতি ত্রিপুরা-রাজগণ কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি লাভ করেন।

৬। তদন্তের মধ্যে ৫৫১ বৎসর ব্যবধান রহিয়াছে। বর্ণিত ভাস্কর্য্যের অশ্লিষি জনশ্রুতি মূলক এবং আংশিক ভাবে কৃত্রিম বলিয়া প্রমাণিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে ত্রিপুরা রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটি দেশব্যাপী বিশ্বাসের সমর্থন করিতেছে।

উপরোক্ত ত্রিপুরাধিকৃত স্থানে বৈদিকগণের আগমনের পরে এবং নিধিপতির খ্রীষ্টাব্দ আগমনের পূর্বে বর্তমান রাজবাড়ী (সিগেট-কুলাউরা লাইনে) ঠেঁগনের সন্নিকটে এক অজ্ঞাতকুল-শীল রাজবংশের শতাধিক বর্ষব্যাপী রাজত্ব সম্বন্ধে তদঞ্চলে কয়েকটি জনশ্রুতি প্রচলিত দেখা যায়। তদনুসারে উপ-রোক্ত রাজগণ ত্রিপুরার সামন্ত নৃপতি ছিলেন। কাল ক্রমে ইহারা ত্রিপুরার অধীনতা পাশ হ্রি করিতে সমর্থ হন। ঘটনা ক্রমে ত্রিপুরা-রাজগণের সহিত ইহাদের বিরোধ ঘনীভূত হইল। বহু যুদ্ধের পর ত্রিপুরা-রাজ অতর্কিত ভাবে রাজপুরী অবরোধ করেন। ত্রিপুরা সৈন্য কর্তৃক ধন-জন সহ রাজপুরী লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল। এইরূপে কুলীয়ারা নদী পর্য্যন্ত জনপদ পুনরায় ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত হয়। রাজবাড়ী ঠেঁগনের নিকটস্থ ভাটেরা 'টীলার' প্রাপ্ত তাম্রকলক যের * গগনস্পর্শী

শিব এবং বিষ্ণু মন্দির, বিশাল রণপোতের বহর এবং পূর্বভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের বিবরণ ও ঈশান দেব এবং কেশব দেবের কীর্ষি কাহিনী অতুল্য পূর্ণ ও অতিরঞ্জিত না হইলে ইহারা সমগ্রট রাজবংশীয় রূপে অশ্রুতান হন যাহা হউক এই রাজবংশীয় গণের ও ত্রিপুরা রাজ্য হইতে ভাঙ্গুগাছ অঞ্চল অধিকারের কোনও প্রমাণ বা কিংবদন্তী পাওয়া যায় না।

গৌরগোবিন্দের রাজ্য ও কুলীয়ারা নদীর দক্ষিণে বিস্তৃত হওয়ার কোনও প্রমাণ নাই। কুলীয়ারা নদী ও ভাটেরার বহু উত্তর পশ্চিমে ভাঙ্গুগাছ অবস্থিত। সুতরাং গৌর গোবিন্দের কন্তা বিবাহ বাণীর সম্ভবপর হইলেও এই ক্ষেত্রে চন্দ্রসিংহের রাজ্য স্থাপন বিষয়ক জনশ্রুতিগুলি কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে।

চন্দ্রসিংহবিষয়ক জনশ্রুতি গিচারে বজ্র ইতিহাসের সম্পর্কিত ঘটনাবলীর যৎসামান্য আলোচনা কার্য্যকরী হইবে সন্দেহ নাই। বজ্রাল সেন বরাধিপ বিজয় সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। সমতট বঙ্গে সেন বংশের অভ্যুদয়ের পূর্বে পরাক্রান্ত বর্ষ বংশ রাজত্ব করিতেন। বজ্রালমাতা বিলাস দেবী উক্ত বর্ষ-রাজবংশের ছহিতা। কেহ কেহ বলেন বজ্রাল সেন বিজয় সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র এবং ব্রহ্মপুত্র নদের কুপায়ই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এইরূপ উক্তি ব্যক্তি বিশেষের বজ্রালবিষয়ের পরিচায়কও হইতে পারে যাহা হউক চন্দ্রসিংহ সংক্রান্ত জন প্রবাদের গতি অন্যরূপ। বর্ষ-নিপুণ বিজয় সেন নবাবিজিত সমতট রাজ্যের রাজধানী রামপাল নগরে এক বৈদিক যজ্ঞের অশ্রুতান করেন। তিনি সেন বংশের রাজগণ-মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হওয়ার আদিশূর এই গৌরব জনক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন বিক্রমপুরে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচারিত আছে।

প্রথমতঃ বজ্রাল সেন মাতামহ রাজ্য এবং কালক্রমে সমস্ত বঙ্গদেশে নিজ অধিকার বিস্তার করেন। রাজ্য-স্থাপন হইয়া তিনি সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তিনি তান্ত্রিক হিন্দু ভাবে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধতান্ত্রিকতা এবং হীনজাতীয় খ্রী-সাধনা ও

(১) ভাটেরা মিত্র ভাটেরা তাম্র কলকের সময় ১৩শ শতাব্দী, খ্রীষ্ট মঙ্গলনাথ বহু লিপিবদ্ধ হুটে ১০শ শতাব্দী, এবং খ্রীষ্টের ইতিহাস লেখক খ্রী পূর্বাব্দ বলিয়া নির্দেশ করেন।

এক সময়ে তাঁহার জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এই রূপ অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন আভিজাত্যবর্ণ এবং শৈব প্রজাবন্দ বন্নাগের তান্ত্রিকতা ও সমাজ সংস্কার ব্যাপারে অতীব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ রাজসংসর্গ অধর্মকর ভাবিয়া দেশত্যাগী হন। এই উপলক্ষে ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে দত্ত বংশীয় জটৈনক সম্রাট ব্যক্তি সন্ন্যাসসিংহে বাস নির্বাচন করেন। খ্রীহট্টেও এট কারণে ভদ্র সমাগম হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ১১৪০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৮০ বৎসর বয়স্ক কালে বল্লাল সেনের মৃত্যু হয়। ১০২৯ খৃঃ তাহার পুত্র লক্ষণ সেন জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রসিংহ নামক তাঁহার কোন পুত্রের বিবরণ পাওয়া যায় না এবং চন্দ্র সিংহের পক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধের পর বল্লাল সেনের সহিত মিলন কাহিনী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে * খ্রীহট্টের রাজা গৌর গোবিন্দ মুসলমানদিগ কর্তৃক পরাজিত হন। ইহাদের মধ্যে যে ৩০০ বৎসর কাল বাবধান রহিয়াছে, তৎ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বল্লাল পুত্রের পক্ষে গৌর গোবিন্দ ছহিতার পাণিগ্রহণ সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। পক্ষান্তরে চন্দ্রসিংহ বল্লালের বহু পরবর্তী ভিন্ন বংশীয় রাজকুমার রূপে প্রতিপন্ন হইলে এই সুপরিচিত বিবাহ কাহিনী অপকৃত না ও হইতে পারে।

বৈদিক সংবাদিনী, বৈদিক পুরাবৃত্ত ও ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচলিত জনশ্রুতি সমূহ গৌর গোবিন্দকে ব্রাহ্মণ নৃপতিরূপে

গৌর গোবিন্দ এবং সাহজালাল এতদ্ব্যতয়ের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। 'ভোম্মারিখে জালালী' অনুসারে সাহজালালের খ্রীহট্ট বিজয় ৫৬১ হিজরা বা ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। দত্ত বংশাবলী গ্রন্থে ১১শ শতাব্দীর চক্রপাণি দত্ত গৌরগোবিন্দের চিকিৎসা করিয়াছিলেন এরূপ উক্ত হইয়াছে। ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে খ্রীহট্টের সাহজালাল ও গৌরগোবিন্দ কাহিনী, পূর্ববঙ্গে সুপরিচিত। বাবা আবদ ও দ্বিতীয় বল্লাল কাহিনীর প্রতিবিম্ব স্বরূপ। ডাক্তার হাট্টার ও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বিশিষ্ট প্রমাণ বলে সাহজালালের সময় ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দরূপে নির্দ্ধারিত করিতেছেন। এবন্ধ লেখকের মতে ইহাই সাহজালালের প্রকৃত সময়।

পরিচিত করিতেছে। চন্দ্রসিংহের বংশ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হইলে কোনও জনশ্রুতি কিম্বা লিখিত প্রমাণও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ নৃপতি রূপে পরিচিত করে না। এমতাবস্থায় হয় তৎকালে বৌদ্ধ প্রভাবে খ্রীহট্টে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল অথবা গৌরগোবিন্দ ব্রাহ্মণ নৃপতি ছিলেন না এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। শেখোক্ত সিদ্ধান্ত সত্য হইলে গৌর গোবিন্দ ও চন্দ্র সিংহকে কাছাড় রাজ গোবিন্দ নারায়ণের স্ত্রায় দেব বিজে ভক্তিশরণ্য ত্রিপুর বা তদনুগুণ বংশীয় কোনও রাজারূপে নির্দেশ করা অসম্ভব হইবে না।

চন্দ্রসিংহের বিবাহ—ত্রিপুর রাজ কস্তা বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতাবলম্বী জনশ্রুতি এই যে— চন্দ্রসিংহ, ত্রিপুর রাজপরিবার সংশ্লিষ্ট একটা বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ত্রিপুরার এক রাজকস্তা বিবাহক্রমে ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী বর্তমান ভানুগাছ অঞ্চলে এক ভূখণ্ড প্রাপ্ত হন। ত্রিপুর রাজকস্তার গর্ভে ভদ্রসেন নামে তাঁহার এক পুত্র ও একটা কস্তা জন্মগ্রহণ করে অতঃপর গৌরগোবিন্দের এক কস্তাকেও তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। কালক্রমে শেখোক্ত রাণীর গর্ভে একটা পুত্র সম্ভান জন্মগ্রহণ করে। পাছে ভদ্রসেন সিংহাসন লাভ করিবে এই ভয়ে কনিষ্ঠা রাণী অধীরা হন। তাঁহার কুপপ্রামর্শে ত্রিপুরারাজী পুত্র কস্তা সহ পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্রসিংহ সমসেরনগর রেল স্টেশনের সম্বিহিত 'ভাদাইর দেউল' ও 'সতিন বিউর গাঁও' নামে বর্তমানে পরিচিত দুইটা গ্রাম কনিষ্ঠা রাণীর স্মৃতি অনুসারে জোষ্ঠা স্ত্রী ও পুত্র কস্তার বসবাসের জন্ত নির্দ্ধারণ করেন। এই স্থানেই তাজাপুত্র ভদ্রসেন বা ভাদাই বিবিধ মল্লক্রীড়ার বালাকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

এস্থলে ব্যক্তি বিশেষের সামাজিক প্রতিপত্তি স্থাপন প্রয়াসেই ত্রিপুরা রাণীর লাজনা কাহিনী রচিত হইয়াছে কিনা অনুধাবন যোগ্য।

ভানুগাছ নামের উৎপত্তি—
"ভানুমতি বৌতুক হেতু ভানুগাছ নাম" এই প্রবাদ বচনের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে পূর্বেই যৎ কিঞ্চিৎ

আলোচিত হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্য হইতে গৌরবিন্দ কৰ্ত্তক ভাঙ্গুগাছ পূর্বে অধিকৃত না হইলে তাঁহার পক্ষে ভাঙ্গুগাছ রাজ্যের অন্তর্গত ভূমি বৌদ্ধক দেওয়া অসম্ভব। গৌর গোবিন্দের ভাঙ্গুগাছ বিজয় সম্বন্ধে জনশ্রুতি পর্য্যন্ত নীরব; বস্তুতঃ তাঁহার রাজ্য কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণে বিস্তৃত হওয়ারও কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে ত্রিপুরার অন্তর্গত গৌরগোবিন্দ কৰ্ত্তক বিজীত এক ভূখণ্ডে, চন্দ্রসিংহকে ত্রিপুরারাজ দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত নিরুপদ্রোবে রাজত্ব করিতে বিবাহিলেন একরূপ মনে করাও যুক্তি যুক্ত নহে।

ইহানিক কেহ কেহ প্রকাশ করিতেছেন যে নিধিপতি বংশীয় শুভরাজ খাঁর পুত্র ভাঙ্গুনারায়ণের নামানুসারে ভাঙ্গুগাছ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই উক্তি ভাঙ্গুগাছের অষ্টম ব্যক্তিবর্গের অজ্ঞাত। ভাঙ্গু নারায়ণের রাজ্য ইটা পরগণায়ই নিবদ্ধ ছিল ইহা দক্ষিণ শ্রীহট্টে একরূপ সর্ববাদী সম্মত।

ভাঙ্গুগাছ প্রাচীন কাল হইতে “মৈনকুল” অর্থাৎ ময়ূনদীর তীরবর্তী জনপদ এবং ভাঙ্গুকচ্চ: এই উভয় নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ভাঙ্গুকচ্চ: হইতে ইহার নাম ভাঙ্গুগাছ হইয়াছে। পুরাতন কাগজ পত্রে এবং প্রাচীন লোক মুখে এখনও ভাঙ্গুকচ্চ: নামের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এস্থলে তদ্বংশীয় বড়কাচ, সিঙ্গরকাচ, উত্তরকাচ, দক্ষিণকাচ প্রভৃতি স্থানের নামের সহিত জড়িত “কাচ” প্রভার শ্রীহট্টে কুকি কচাক প্রভৃতি জাতির পূর্ব বসবাস সূচনা করিতেছে কি না অসম্ভবন যোগ্য।

একমাত্র দক্ষিণ শ্রীহট্টেই হাঙ্কলা, লংলাই, দলই, কানী ভানাই প্রভৃতি বিভিন্ন কুকী বা কচাক দলপতিগণের অধিকৃত ছিল এবং ইহাদের নামানুসারেই হাঙ্কালুকি, লংলা, ডলা, কানীহাটা, ভাঙ্গুগাছ প্রভৃতি জনপদের নামাকরণ হইয়াছে এই সম্বন্ধে পূর্বেই আভাস প্রদত্ত হইয়াছে।

চন্দ্রসিংহের সমস্ত নিরুপদ্রোব—

১। চন্দ্রসিংহের নাম গৌর গোবিন্দের নামের সহিত জড়িত।

২। চন্দ্রসিংহ জনশ্রুতি মধ্যে মুসলমানদিগের সাম্রাজ্য উল্লেখও নাই কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই ভাঙ্গুগাছ অঞ্চলে মুসলমানদিগের প্রাভুত্ব দেখা যায়। ইহাতে তিনি গৌর গোবিন্দের সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া অসম্ভিত হন। বল্লাল সেনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপনের অব্যবহিত পরেই আলোচিত হইয়াছে।

৩। চন্দ্রসিংহের অব্যবহিত পরে ভাঙ্গুগাছ রাজ্যে বানৌপত্তি ও রঘুপত্তি নামে দুইটা ভ্রাতা জন্ম গ্রহণ করেন। বানৌ গাউ ও বানৌর দৌদি এখনও ভাঙ্গুগাছের অন্তর্গত মঙ্গলপুরের নিকট বর্তমান রহিয়াছে। উক্ত বানৌ ঠাকুর ত্রিপুরারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৪০৭—১৪২৯ খৃষ্টাব্দ) নির্দেশে বঙ্গ ভাষায় রচিত ত্রিপুর রাজ মাল্যর অন্ততম রচয়িতা এইরূপ অবগত হওয়া যায়। উপরোক্ত কারণে চন্দ্রসিংহ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাভুত্ব হইয়াছিলেন এইরূপ মনে করা অসম্ভব হইবে না।

চন্দ্রসিংহ সংশ্লিষ্ট বৈদিক সংবাদিনী বিবরণ ও জনশ্রুতি সমূহের ঐতিহাসিক মূল্য:—

১। বৈদিক সংবাদিনী অনুসারে শ্রীমদ আনন্দ প্রভৃতি হইতে নিধিপতির সময়ে ৫৫৩ বৎসর ব্যবধান রহিয়াছে।

২। নিধিপতি কনোজ হইতে কিন্তু আনন্দ মিথিলা হইতে ত্রিপুরার আগমন করেন উক্ত গ্রন্থে এইরূপও বর্ণিত হইয়াছে। গ্রাম্য গীতি ও নিধিপতিকে কনৌজী ব্রাহ্মণ রূপে নির্দেশ করিতেছে। যথা—

“কজুজ হইতে আইল দ্বিজ নাম নিধিপতি

মুখ হইতে অগ্নি আনি দিলেক আহতি ॥

নিধিপতি মহাশয়ের বংশে নাহি অন্ত

যার বংশে বেরিয়াছে পৃথিবী পর্য্যন্ত ॥

কতেক সন্ন্যাসী আর কতেক কানীবাঙ্গী

কতেক গৃহস্থ আর কতেক উদাসী ॥” গ্রাম্য গীতি।

৩। উপরোক্ত গ্রন্থের কুপার মিথিলা হইতে আনন্দের ত্রিপুরার আগমনের ৫৫৩ বৎসর পরে কনৌজাগত নিধিপতি আনন্দের বংশোৎপন্ন বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইতেছেন। বৈদিক পুরাবৃত্ত নিধিপতিকে আনন্দের অবশেষ ৭ম

পুরুষের মধ্যে নির্দেশ করিতে বিন্দুস্বায় ও কুন্তিত হন নাই!

আনন্দ ও নিধিপতি এতদ্ভয়ের মধ্যে ব্যবধান কাল বিস্তৃত হইয়াই সম্ভবতঃ নিধিপতি বংশীয়গণের উত্থান কালে এইরূপ অশ্রুত বিবরণ রচিত হইয়া থাকিবে।

৪। বৈদিক সংবাদিনী খ্রুত তাম্রফলক পাঠে ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্বেই চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের রাজ্য অরণ্যে পরিণত হওয়ার বিবরণ স্থান পাইয়াছে। চন্দ্রসিংহ চতুর্দশ শতাব্দীতে ভাঙ্গুগাছে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন ইতি পূর্বেই বণিত হইয়াছে। সুতরাং কথিত তাম্রলিপি প্রচারিত বিবরণ অশ্রুতঃ আংশিক ভাবে কৃত্রিম। এক তর্কচ্ছলে মূল তাম্রফলকের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও চন্দ্রসিংহের পুত্র ভদ্র সেনের সময়ে ভাঙ্গুগাছ রাজ্য বিধ্বস্ত ও জন মানবহীন হইবার পর বৈদিক-গ্রন্থে উহার পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত নকল স্থান লাভ করিয়াছে।

৫। ত্রিপুরা ইতিহাস হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পিতার মৃত্যুকালে ত্রিপুররাজ ধর্ম্মশালিক্য (১৪০৭—১৪৩৯ খৃঃ) বারানসীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন কালে কোতুক নামে কর্ণোজবাসী এক জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও অপর কয়েটি ব্রাহ্মণ তৎসহ ত্রিপুরায় আগমন করেন। ধর্ম্মশালিক্য উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে নিধিপতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বৈদিক গ্রন্থে নিধিপতি ত্রিপুরা-রাজ স্বধর্ম্মক হইতে এক খণ্ড ভূমি লাভ করিয়াছিলেন এই রূপ উক্ত হইয়াছে। ত্রিপুর রাজমালায় স্বধর্ম্মক নামীয় কোন রাজার নামে স্মেধ নাই। নিধিপতি বংশাবলী আলোচনায় স্বধর্ম্মক ধর্ম্মশালিক্য কি না দেখা আবশ্যক। এই আলোচনার দৃষ্ট হইবে যে, পাঠান বীর খাজে ওসমান কর্তৃক বিজিত রাজ্য সুবিদনারায়ণ, নিধিপতির পর নবম পুরুষের লোক এবং সুবিদনারায়ণের পর বর্তমানে ১০।১১ পুরুষ চলিতেছে। এতি পুরুষে ২৮ বৎসর অর্থাৎ ৩২ পুরুষে শতাব্দী গণনার (১১৯৩—১৮ × ২৮ = ১৪০৯) নিধিপতি, ধর্ম্মশালিক্যের সমসাময়িক রূপে, এবং সুবিদনারায়ণ ও খাজে ওসমান

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক রূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন। “একবাল নামা জাহাঙ্গীরই” গ্রন্থে বর্ণিত ১৬১২ খৃঃ লাঘাটা তীরে, ওসমানের পরাক্রম কাহিনী, বর্তমান আলোচনার উল্লেখ যোগ্য। ইহাতে নিধিপতি ও সুবিদনারায়ণের সময় নির্দেশে সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই।

৬। ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দ নিধিপতির প্রকৃত সময়। এই আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক গ্রন্থে বর্ণিত ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দ নির্ভর যোগ্য নহে। যাহার একাংশ নির্ভর যোগ্য নহে তাহার অপরাংশ সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং বৈদিকদিগের আগমন কাল যে ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ এবং আদি ধর্ম্মক নামক কোনও ত্রিপুরার রাজা যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ।

চন্দ্রসিংহের রাজ্য বিস্তৃতি—চন্দ্রসিংহের রাজ্য বিস্তৃতি সম্বন্ধে এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা হইতে উত্তরে মুনসীবাঙ্গারের নিকটস্থ ফরুকা নদী এবং কানিহাটা হইতে পশ্চিমে চাউতলী বাগিশিরা পাহাড় পর্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভাঙ্গুগাছস্থিত আদম পুরের পূর্বদিকস্থ পাহাড়ে বর্তমান কাঠাল কান্দি নামক স্থানে চন্দ্রসেনের রাজধানী ছিল। কথিত আছে চন্দ্রসিংহের পূর্বে তাহার রাজ্যে ভদ্রলোকের বসতি অতি অল্পই ছিল, এবং তাহার সময় ভদ্রপল্লী স্থাপিত হইতে থাকে। তাহার রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের রায় উপাধি ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যে এই উপাধির বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকিবার কথা।

চন্দ্রসিংহের শত্রু—প্রাচীন রাজগণ সুযোগ পাইলেই বিভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তৎসাহায্যে আত্মপ্রাধিকার ঘোষণা করিতেন। এই প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বকালে সর্বদাই হইত। একদা রাজ্যে অন্ন-ক্লেশ উপস্থিত হইলে

* “দক্ষিণ গ্রীহটে পাঠান বীর খাজে ওসমান” নামক অপর একই বৃদ্ধ কাহিনী বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে। লিখক।

ভানুগাছ পরগণার মঙ্গলপুর গ্রামে চন্দ্রসিংহ ও অন্নপূর্ণা নামে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞাবশেষে যজ্ঞ সম্পাদনকারী ব্রাহ্মণদিগের অধিকাংশই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করেন। যজ্ঞ সংশ্লিষ্ট অন্নপূর্ণা বা মহামায়া দীঘি এখনও বর্তমান আছে। এই দীঘির তীর হইতে যজ্ঞের দ্রুত প্রবাহিত হইবার নিমিত্ত যে নালা খনিত হয় তাহা অত্যাধি হোমের 'জান' নামে পরিচিত। যজ্ঞাবসানে চন্দ্রসিংহ এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে যেন অন্নপূর্ণা সদা বিরাজ করেন। তদবধি ত্রিহট্টের দক্ষিণাঞ্চলে "ভানুগাছ অন্নপূর্ণার দেশ" রূপে পরিচিত এবং নিম্নোক্ত প্রবাদের প্রচলন—

"চন্দ্রসেন প্রাসাদাং পুণ্যলক্ষ্মী দেবে।

ধন ধাত্তে পুত্র পৌত্রে সুখে প্রজা বৈসে।"

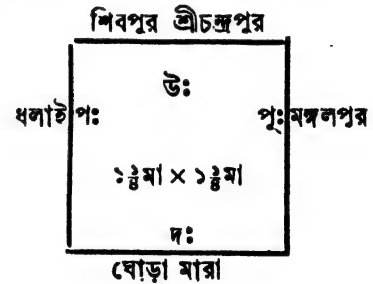
চতুর্দশ শতাব্দীতে চন্দ্রসিংহানুষ্ঠিত মঙ্গলপুরের এই যজ্ঞ কাহিনী ভানুগাছের কৃষকগণ পর্য্যন্ত অবগত আছে। কিন্তু চঃখের বিষয় উপযুক্ত অনুসন্ধান না করিয়াই বর্তমানে কেহ কেহ * উপরোক্ত যজ্ঞের সহিত ত্রিপুরা রাজধানীর নিকটে, মনুতীরে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ কাহিনী জড়িত করিয়া ফেলিয়াছেন।

চন্দ্রসিংহের মন্ত্রী হরিনারায়ণ—
চন্দ্রসিংহের মন্ত্রী হরিনারায়ণ কর মঙ্গলপুরে একটি দীঘি খনন করাইয়াছিলেন। তাহা অত্যাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দীঘি খননের সহিত এই অঞ্চলের অন্যান্য বড় দীঘির স্তার ইহাতেও একটি কালসর্প ও ওঝার কাহিনী জড়িত রহিয়াছে। হরিনারায়ণের ভগিনীপতি দাম বংশোদ্ভব জনৈক ব্যক্তি নিজ পুত্র সহ ভানুগাছে আগমন করেন। ক্রমে রাজ সত্যর তাহার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হওয়ার হরিনারায়ণ তাহার বধ সাধনার্থ এক যজ্ঞ করেন। অল্পপুটে দার ও তৎপুত্র পলায়নপর হইলে পলায়নকালে দামের অর্থ যে স্থানে পতিত হয় তাহা বর্তমানে ঘোড়ামারা ও দামপুত্রের অর্থ যে স্থানে পতিত হয় তাহা ছাও ঘোড়ামারা নামে খ্যাত লাভ করিয়াছে।

* ত্রিহট্টের ইতিবৃত্ত ৪র্থ অধ্যায় ৫৪ পৃষ্ঠা।

উদয়নারায়ণ ও ভানুনারায়ণ নামে মন্ত্রী হরিনারায়ণের দুই পুত্র জন্মে। ইহারা বর্তমান চিংলী (রামর জাঙ্গাল) নামক স্থানে বাস করিতেন। উপরোক্ত ভানুনারায়ণ মঙ্গলপুরের গণকদিগকে এক খণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন।

চন্দ্রসিংহের গড়—এই গড় রাণীর বাজার হইতে হরিনারায়ণের দীঘির পূর্বের পাড় হইয়া উত্তর দিকে রামেশ্বরপুর 'শিবপুর' শ্রীনাথপুর ও শ্রীচন্দ্রপুর হইয়া ক্রমে পশ্চিম দিকে বাণীপুর 'শ্রীচন্দ্রপুর' তিলকপুর এবং নরেন্দ্রপুর গ্রাম সমূহের সীমা অতিক্রম করার পর দক্ষিণ 'কে পুনঃ রাণীর বাজার আসিয়া মিলিত হইয়াছে। গড়ের দর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রত্যেকে ১১ সোয়া মাইল এবং উচ্চত ১৪১৫ হাত। কেহ কেহ বলেন যে, ত্রিপুরার আক্রমণ আশঙ্কায় এই গড় প্রস্তুত হইয়াছিল। অপর জনশ্রুতি এই যে, রাজা দৈবজ্ঞ সুখে ১৪ হস্ত পরিমিত এবং ৭ দিন ব্যাপী একটি জল প্লাবনের সংবাদ অবগত হইয়া প্রজাবর্গের রক্ষার্থ এই গড় প্রস্তুত করান। বর্তমানে এই গড়ের নানা স্থান কৃষি-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু গড়ের অধিকাংশ এখনও বর্ষসমুৎপন্ন সুরক্ষিত রহিয়াছে।



চন্দ্রসিংহের চলিত্র—রাজা চন্দ্রসিংহ হিন্দু ধর্মাবলম্বী, উদারচেতা নরপতি ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি লোক তাঁহার রাজ্যে বাসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বখশাছুয়ারী যাগ-যজ্ঞাদি সম্পাদন করিতে সদাই ব্যস্ত থাকিতেন। যাহাতে তাঁহার রাজ্যে প্রজাগণ সুখে বাস করিতে পারে তজ্জন্য তিনি দৈবজ্ঞগণ লাভের জন্য সতত যত্নবান থাকিতেন। তিনি বিদ্যার বখোচিত সমাদর করিতেন। প্রাচীর হস্তলিখিত এই সম্পদে ভানুগাছ এখনও ভাগ্যবান। বাকীনা পরায়ে

রচিত বহু ভুল ভিড়ির পুরাণ ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অস্বাধিক পরিমাণে তথ্য এখনও বিস্তর পাওয়া যায়।

পদ্মমঙ্গল কাহিনী—নিম্নলিখিত জনশ্রুতি হইতে তাঁহার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবগত হওয়া যায়। একদা পরমঙ্গল নামক নিজ রাজ্যস্থিত কোন বণিকের অশেষ লাভাশ্রয়ী পত্নীর সৌন্দর্য্য-কাহিনী শ্রবণে তাহার মন বিচলিত হয়। তখন দিব্যদানে অতিথি-বেশে তিনি বণিক-গৃহে উপস্থিত হন। বণিক-গৃহে চিত্রাঙ্গী নামী একটি কুকুরী ছিল। ঐ কুকুরীটি চাঁৎকার পূর্বক অতিথিকে দংশন করিতে উদ্ভূত হইলে বণিক-পত্নী কুকুরীকে সাধনা করিবার জন্ত নিম্নোক্ত শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—

“মা দংশ দংশ চিত্রাঙ্গী চন্দ্রসেনো ন তঙ্গরঃ
অমৃতং বিষমুং পরং যো রক্ষকঃ সঃ ভক্ষকঃ।”

অতঃপর বণিক-পত্নী কুকুরীকে নিরস্ত করিয়া পরম সমাদরে পাণ্ডু অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক অতিথিকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং একটি রোপ্য পাত্রে ভাঙ্গুল সজ্জিত করিয়া অতিথির সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। ঐ পাত্রের এক ধারে উৎসৃষ্ট ভাঙ্গুল ছিল। অতিথি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বণিক-পত্নী একটি শ্লোক দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, -লোক উৎসৃষ্টপ্রার্থী হইলে সামান্ত উৎসৃষ্ট ভাঙ্গুলে দ্বিধা বোধ করে না। বণিক-পত্নীর বুদ্ধি ও সৌজন্মে প্রীত হইয়া রাজা তাহাকে কত্যা সম্বোধন করতঃ চলিয়া আসিলেন। বণিক গৃহে আসিয়া সন্দেশ বশতঃ নিজ পত্নীকে পিতৃ গৃহে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর বণিকের স্বপুত্র রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া নিম্নোক্ত শ্লোক দ্বারা চন্দ্রসিংহের নিকটেই অভিযোগ উপস্থিত করিলেন—

“ক্ষেত্রমেকং ময়া দত্তং বহনার্থং নরাধিপ
অমৃত মণ্ডভং মম্বা বর্জ্জয়েৎ কেন হেতুনা।”
(দোষগুণং ন জানামি মহেশ্বঃ পরিবর্জ্জয়েৎ)

কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন।

রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ বণিক রাজ-সমীপে আনীত হইলেন। জ্ঞী-পরিভ্রাণের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বণিক রাজাকে লজ্জা করিয়া নিম্নোক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—

আগতোহং সরিত্তীয়ে তৃষ্ণাতুরো নরাধিপ
তত্র সিংহ-পদং দৃষ্ট্। ন পীতং বারি শীতলং।

রাজা ইহার উত্তর স্বরূপ নিম্নোক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন—
সত্য সিংহ-পদং দৃষ্ট্। ন পীতং বারি শীতলং
অমৃত-বচসা সিংহঃ কন্তেতি সাচ ভাবিতা
(মধুরামৃত বাক্যে সিংহঃ কন্তেতি ভাবিতা)

রাজার এবংবিধ বাক্য শ্রবণে বণিক দৃষ্ট মনে জীর্বে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। পরমঙ্গল জাতিতে বণিক ছিলেন। যদিও তাহার বংশ লোপ পাইয়াছে তথাপি তাহার ধনিত একটি দীঘি ভাঙ্গুগাছে বিদ্যমান রহিয়া চন্দ্রসিংহের অতীত স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

চন্দ্রসিংহের মৃত্যু—ভাঙ্গুগাছ রাজ্যেই বন্দারোগে চন্দ্রসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল এই রূপ বিবরণ লোক-পরম্পরায় অবগত হওয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নির্বাসিত ভদ্রসেন পিতৃরাজ্য অধিকারের নিমিত্ত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। রাজ্য মধ্যে অশান্তি উপদ্রব চলিতে লাগিল। অতঃপর ভদ্রসেন সিংহাসন লাভ করিয়াই প্রজা-পীড়নে প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘ কাল নিরুপদ্রবে রাজ্যভোগ করা তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অচিরেই ত্রিপুরার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

অরাজকতার ভদ্রসেনের সময়ে রাজ্য এক প্রকার জনশূন্য হইয়া পড়ে। তাঁহার প্রস্থানের পর বহু জন্তর উপদ্রবে রাজ্য একপ্রকার অরণ্যে পরিণত হয়। কাল ক্রমে চন্দ্রসিংহের ধনজনপূর্ণ রাস্তা “চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের অরণ্য” এই আখ্যায় অভিহিত হয়। তৎকালিক বহু জন্তর উপদ্রব ও যাদুবিদ্যার লোকের অসাধারণ বিশ্বাস সম্বন্ধে নিম্নোক্ত জনশ্রুতি প্রচলিত আছে—

চন্দ্রসিংহের পরবর্তী সময়ে ভাঙ্গুগাছে, ভোলাই কুকী ও করমোজ খাঁ নামক দুইটি ব্যক্তি গভীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। উক্ত কুকী মন্ত্র প্রভাবে বিভিন্ন প্রাণীর আকার ধারণ করিতে পারিত। মূলমানটি বন্ধুর ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ার উত্তরেই পশু-শরীর ধারণ করিতে মনস্থ

মাস ১৩১১

করে। পুনঃ মনুষ্য আকারে পরিণত হইবার নিমিত্ত তৃতীয় এক ব্যক্তির নিকট মন্ত্রপুত জল রক্ষিত হইল। তোকাই এক ভীষণ ব্যাঘ্রে ও করমোজ খাঁ এক মন্ত মাত্রে পরিণত হওয়ার মধ্যবর্তী ব্যক্তি ভয়ে মন্ত্রপুত জল ভূমিতে নিক্ষেপ পূর্বক পলায়ন করে। ইহাদের অত্যাচারে চারি দিকে এক ভীষণ আতঙ্কের আবির্ভাব হয় এবং ভানুগাছ অঞ্চল এক প্রকার পরিত্যক্ত হয়। জঙ্গলের সময়ে শ্রীহট্টে মুসলমানদিগের বিস্তৃতি হইয়াছিল এই জনশ্রুতি হইতে, ইহার একটুকু আভাস পাওয়া যাইতেছে। তৎকালে সাধারণ লোক মন্ত্র তত্ত্ব যাহুবিদ্যা প্রভৃতি নানাবিধ অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে বিধা বোধ করিত না ইহারও আভাস পাওয়া যাইতেছে।

চন্দ্রসিংহের সমসাময়িক ধর্ম্মনগর ও

শ্রীহট্টের দক্ষিণাঞ্চল।

চন্দ্রসিংহের ভানুগাছ রাজ্য স্থাপিত হইবার পূর্বেই জিপুর-রাজ যাজ্ঞরক্ষা ধর্ম্মনগর হইতে রাঙ্গামাটা নামক স্থানে জিপুর রাজধানী পরিবর্তিত করেন। এই পরিবর্তনের সহিত ধর্ম্মনগর অঞ্চল অনেকটা শ্রীহীন হইয়া পড়ে। যাহা হউক চন্দ্রসিংহের সময়েও ধর্ম্মনগর একটি সুসভ্য জনপদরূপে পরিগণিত হইত। ধর্ম্মনগর অঞ্চলে জিপুর রাজধানী থাকা কালে বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জিপুর রাজগণের আশ্রয়ে রাজধানীর চতুঃপার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ই সর্বপ্রথমে শ্রীহট্টের দক্ষিণ অঞ্চলে আর্ধ্য সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রসিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বিদ্রোহের ফলে ধর্ম্মনগর ধ্বংস হওয়ার তত্ত্ব্য অধিবাসীবর্গ কাছাড় ও শ্রীহট্টের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। কাছাড় ও শ্রীহট্টে ধর্ম্মনগর পরিত্যক্ত হওয়ার বহু জনশ্রুতি প্রচলিত দেখা যায়। ঐরোদশ শতাব্দীতে এক দিকে ধর্ম্মনগর হইতে পলায়নপর শাক্ত ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ, অপর দিকে মুসলমানদিগের বঙ্গবিজয়ের পর, বঙ্গদেশ হইতে আগত ব্যক্তিগণ শ্রীহট্টের দক্ষিণাঞ্চলে সমাজ গঠন করিতে বিশেষ সহায়তা করে।

যদিও বহু পূর্ব হইতে ধীরে ধীরে এই সমাজ গঠনের সূত্রপাত হইয়াছিল তথাপি চন্দ্রসিংহের সময়েই এই সমাজ-গঠন ব্যাপার অতি দ্রুতভাবে চলিতেছিল। জিপুর-রাজ-গণ কর্তৃক ধর্ম্মনগরে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-তত্ত্ব স্থাপিত হওয়ার পূর্বে, হাওর ও অরণ্যময় শ্রীহট্টের দক্ষিণাঞ্চলে জিপুরার আশ্রয় ব্যতিরেকে আর্ধ্যগণের বসবাস এক প্রকার অসম্ভব ছিল। উচ্চ ভূমিতে কচাক তিপরাগণের বসবাস ছিল, নিম্ন ভূমিতে কৃষি ও মৎস্যজীবী বিভিন্ন অনার্য্য ও নিম্নশ্রেণীর লোকের বসবাস ছিল। লংগা দৌলতপুর নিবাসী মৌলানা সাদেক আলী বা গোরসেন কৃত “রন্ধে কাকুর” গ্রন্থে শ্রীহট্টে মুসলমানদিগের প্রথম আগমনের সময়—

“এক হাতি পুড়া গুহ আর হাতে ভাত”

এবং “ইচরেতে পাখানা না লইতা পানী,” এইরূপ রীতিনীতিবিশিষ্ট এক শ্রেণীর লোকের কিংবদন্তীও বর্ণিত আছে। ইহাতেও কুকি, কচাকদিগের পূর্ব বসবাসের আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ চন্দ্রসিংহের সময়ে উক্ত লোকদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের তৎসমূহ দৃঢ়ীভূত হয় নাই এবং কোলিক ধর্ম্ম-ভাবের প্রভাবও অপেক্ষাকৃত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সমাজের কোন তরে কিভাবে ইহাদের বংশধরগণ বিরাজ করিতেছে কে তাহা নিরূপণ করিবে? আর নিম্ন শ্রেণীর বৈষ্ণবদিগের মধ্যে, স্থান বিশেষে মীননাথ, গুন্ডনাথ ও গোরক্ষনাথের সেবা এবং “কলির পূজা পদ্ধতি” অতীত ধর্ম্মজীবনের যে পরিবর্তন সূচনা করিতেছে তাহা চন্দ্রসিংহের সমসাময়িক নিম্ন শ্রেণীর সামাজিক অবস্থা আলোচনার উল্লেখ যোগ্য।

উপসংহারে বক্তব্য—আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চাহিয়াছি—(১) চন্দ্রসিংহ জিপুর, দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার অন্তর্গত ভানুগাছ অঞ্চলে চতুর্দশ শৃষ্টাব্দে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত ও অরণ্যে পরিণত হয়।

(২) প্রজাবংশল জিপুর আতীত চন্দ্রসিংহ, হিন্দু প্রজাবংশের হৃদয় এরূপ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, বহু জনশ্রুতি তাঁহাকে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে স্থান দিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছে।

(৩) কিংবদন্তী সাহায্যে প্রাচীন যুগের দেশের অবস্থা সবক্কে অভিজ্ঞতা অল্পে সন্দেহ নাই কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ব্যাধা কিংবদন্তী সমর্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৪) ঐতিহাসিক সম্পদে ভানুগাছ শ্রীহট্টের অপরাপর স্থান হইতে নূন নহে। দেশের ইতিহাসে ভানুগাছ বৃত্তান্তের একান্ত অভাব, ইহা পূর্ণতার পরিচায়ক নহে। বর্তমান আলোচনায় সেই অভাবের কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই উপলক্ষে শ্রীহট্টের ইতিহাসের কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘটনা ও ব্যক্তির নূতন কল্পে সময় নির্ধারণের প্রয়াস পাইয়াছি।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি, টি।

শত্ৰু ব্রত*.

জ্যৈষ্ঠের সংক্রান্তিতে শত্ৰু ব্রত হইয়া থাকে। পরিবারের প্রধানা মহিলা এই ব্রত করেন। ত্রিভিনী চিড়া খায়, এবং পরিবারের সকল লোকেই সেই দিন চিড়া খাইয়া থাকে। শত্ৰু সংক্রান্তির দিন উনোন আলা নিষিদ্ধ। এই ব্রতে কৰ্ম্মপুরুষের পূজা হইয়া থাকে।† পূজান্তে পরিবারস্থ প্রত্যেক পুরুষ তেমাখায় শাহু উড়াইয়া থাকে। এক জন পাশে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, “কি উড়াও?” যে শাহু উড়ায় সে উত্তরে বলে “শত্ৰু উড়াই।” এইরূপে বা হাতে দুই পায়ের মধ্য দিয়া তিন বার শাহু উড়াইয়া থাকে।

ব্রতের কথা

প্রথম অংশ

এক সপ্তদশকের সাত পুর; সাত পুরের সাত বৌ। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি দিন এই সাত বউ ঘর

* চলিত ভাষায় এই ব্রতকে ‘সাইত্তাই’ বা ‘হাউত্তাই’ ব্রত বলে। এই ব্রত ত্রিপুরা জেলার প্রচলিত।

† খেয়ঃ সখা। সবিত্রীবল্লভখ্যবর্তী নারায়ণঃ, সরসিঙ্গাসনসম্মিষ্টঃ, কেশবদ্বন্দ্বী, কনককুণ্ডলবান, কিরীটী, হারী, হিরণ্যবপুঃ, ধৃতশম্ভকঃ।

১ কাটি দিয়া।

বাড়ী লেগিয়া স্বান করিতে গেল। ছোট বউ ‘সিটালে’ গোবর ছটকা (ছড়া) দিয়া ও “কুরিয়া” এক হাতে একটি ঘটি ও অপর হাতে একটি “বৌখ্না” লইয়া তাহাদের পেছনে পেছনে চলিল।

পুকুরের পথে চষা জমি দিয়া যাইতে যাইতে বৌ দেখিল লাঙ্গলের খাতে দুটি সাপের “বাচ্ছা”। দেখিয়া ছটিকেই একটু অলের সঙ্গে কোষ করিয়া ঘটিতে তুলিয়া লইল। ঘাটে যাইয়া প্রথমে ‘বৌখ্নাটি’ বেশ করিয়া মাজিয়া বাচ্ছা ছটি জল দিয়া ‘বৌখ্নার’ রাখিল, পরে ঘটিট মাজিয়া স্বান করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

কৰ্ম্মপুরুষের পূজা হইল। সাত ‘জ্বালে’ তেল-সিন্দূর পরিয়া “বোন বোনারির” ব্রত করিল ও শাহু বদলাইল। ছোট বৌ বাচ্ছা ছটি একটা ‘মুছিতে’ রাখিয়া দিল। ছয় ‘জ্বাল’ দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “ওগো, তুমি সাপের ‘পোনা’ কোন খানে পাইলা?” সে সব ঘটনা বলিল; তাহার উত্তরে বলিল, “এই গুলি তোমারে খাইব —কে কবে হুন্ছে মাহুবে হাপ্ পালে!” বৌ কিন্তু সে গুলিকে পুষিবে স্থির করিল। পূজায় দেওয়া নাপের দুধ হইতে একটু দুধ লইয়া সাপগুলিকে খাইতে দিল। সাপ গুলি দুধ খাইয়া দিন দিন বড় হইতে লাগিল। প্রথম বৌ এগুলিকে ছোট হাঁড়িতে রাখিল, তার পরে একটা বড় হাঁড়িতে রাখিল, সর্বশেষে ফরমাস দিয়া একটা বড় গাম্ভা তৈয়ার করাইয়া ইহাতে রাখিল।

এক বৎসরে সাপগুলি বেশ বড় হইল। এগুলি রোজ চলিয়া চাইত, আবার দুধ খাওয়ার সময় ফিরিয়া আসিত।

আবার পর বৎসর শত্ৰু ব্রতের দিন আসিল। ব্রতের আগের দিন আতপ দুধ রাখিতে বৌ এর মনে ছিল না; সন্ধ্যা মত সাপগুলি ফোঁস ফোঁস করিয়া দুধ খাইতে আসিল। বৌ কড়া হইতে গরম দুধ একটা পাথরের বাটিতে নামাইয়া সাপগুলিকে খাইতে দিল। গরম দুধ খাইয়া সাপগুলি অস্থির হইয়া পড়িল, এবং বৌকে কানড়াইতে আসিল। বৌ বলিল, “আমারে কাইল্ খাইবি। কাইল্ হাউত্তাই বর্ত

শ্রাব ১৩১২

আছে, হাতু বদল আছে, বইন্ বইনারির বর্ত আছে— বর্তের পরে আমারে খাইছ।”

পর দিন ব্রতের কাজ করি। স্নানের পর সাত জা একটা শীতল পাটীর উপর বসিল, তেল-সিন্দূর পরিল, শাহু বদল করিল এবং বোন বোনারির ব্রত করিল। পরে ছোট বউ ছয় জা কে প্রশ্ন করিল—

“বইনারিরা গো উকুইয়ার নি আকার আছে?”

“আছে না?”

“যদি না হয় রে?”

“তবে নুনে চুপে ভয় অয়।”

“তবে ভয় অউক।”

সাপগুলি পাটীর মোড়াতে ছিল—শুনিয়া বুঝিল এই সকল কথা। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বল হইতেছে। তখন ইহাদের মনে অসুস্থতা পাইল, যে এক বৎসর এত যত্ন করিয়া ইহাদিগকে পুষিয়াছে তাহাকে কেমন করিয়া খাইবে? এই রূপ চিন্তা করিয়া ইহার মনসা দেবীর খাটের নীচে চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় দুটি সোনার কাঠি রাখিয়া গেল।

সাপগুলি আর আসে না। এক দিন ইহার মনসা দেবীকে ইহাদের অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা বলিল এবং যে মনুষ্য-কন্যা ইহাদিগকে পুষিয়াছিল তাহাকে দেব-পুরীতে আনিবার জন্য দেবীর অমুখিত প্রার্থনা করিল। অনেক অমুখের বিনয়ের পর মনসা সম্মত হইলেন এবং দুই জন লোক সঙ্গে দিয়া সওদাগরের বাড়ীতে “সোয়ারি” পাঠাইয়া দিলেন। সাপ দুটিও সঙ্গে গেল।

ছোট বউ বড় খুসী হইল। অল্প ছয় জা বলাবলি করিতে লাগিল, “এইবার হাপ পালনের রং বারইব। দেব পুরীতে লইয়া গিয়া ইডারে চাপে খাইয়া ফালাইব।” ছোট বো বলিল, “আমার দুই ভাই আড়াই, বড়াই, আমি দেব-পুরীতে যারাম্।”

এক দিন মনসা পূজা খাইতে গেলেন। যাওয়ার সময় কত্নাকে বলিয়া গেলেন, “মাগো, তোমার দুই ভাই আইলে তারারে দুধ ঢালা দিয়।” মনুষ্যের কত্না দেব-পুরীতে আঁমোদ-আহ্লাদে মগ্ন থাকিয়া দুধ জুড়াইতে ভুলিয়া গেল। যখন সাপগুলি আসিল তখন তাড়াতাড়ি সে গরম দুধ ঢালিয়া দিল। অনেক সাপ আসিয়া দুধ খাইতে লাগিল। গরম দুধ খাইয়া সাপগুলি ছট্‌কট করিতে লাগিল, বিষের আলায় মনুষ্যের কত্না মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। মর্ত্যে মনসার কাঠাম নড়িতে লাগিল। মনসা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কত্নাকে পুনর্জীবিত করিলেন, এবং হাড়াই, বড়াইকে ডাকিয়া মনুষ্য-কত্নাকে মর্ত্য-লোকে লইয়া বাইতে আদেশ

দিলেন। কত্না এক পারে একটি খাক (বালা), এক হাতে একটি শাঁখা, ও একটি বাজু পরিয়া সওদাগরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। মনসা দেবী একটি “বাইল”ও * সঙ্গে দিয়া দিলেন। সাপ দুটি কত্নাকে রাখিয়া গেল।

ছোট বউ চুল খুলিয়া ধান ঘাটিতে ছিল। ছয় জা তাহাকে বিজ্ঞপ করিয়া বলিল, “আধ অঙ্গে অলঙ্কার পই-রাই এত, হব অঙ্গে অলঙ্কার পিঁধলে না জানি আর অইত কত!”

“আড়াই, বড়াই দুই ভাই বাইচা খাক্লে, মনসার মত মা বাইচা খাক্লে, দুধরাজের মত বাপ বাইচা খাক্লে এক বার পিঁধছি আধ অঙ্গে আবার পিঁধাম্ হব অঙ্গে।”

সাপ দুটি এই কথা শুনিয়া আসিয়া মনসাকে জানাইল, আবার মনুষ্যের কত্নাকে দেব-পুরীতে লইয়া আসিতে মনসার নিকট প্রার্থনা করিল। মনসা আবার কত্নাকে লইয়া আসিলেন।

মনসা আর এক দিন পূজা খাইতে গেলেন। যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন, “মাগো, তুমি পুরীর হগল্‌দিগে যাইক কিন্তু দক্ষিণ দিগে যাইয় না।”

মনসা চলিয়া গেলেন। এই নিষেধ শুনিয়া দক্ষিণ-দিকটা দেখিবার জন্য কত্নার মনে বড় কৌতূহল হইল। সে দক্ষিণ দিকে গেল, দেখে অসংখ্য সাপ। সেখানে বাজুকী সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া নিখাস ফেলিতেছিল। এই নিখাস-বিষে মনুষ্য-কত্না আবার মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। মর্ত্যে মনসার খাট আবার নড়িতে লাগিল। মনসা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখেন মনুষ্য-কত্না অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। তৎক্ষণাৎ হাড়াই, বড়াইকে ডাকিয়া কত্নাকে পুনরায় মর্ত্য-লোকে পাঠাইয়া দিলেন। এবার আর একটি “খাক”, আর একটি শাঁখা ও আর একটা বাজু দিয়া কত্নাকে বিদায় করিলেন। আর একটা বাপিও সঙ্গে দিলেন। হাড়াই বড়াই কত্নাকে লইয়া আসিল।

পরে সাত জা মিলিয়া বৎসর বৎসর আঁমোদ-আহ্লাদে শক্ত ব্রত করিতে লাগিল, তাহাদের সংসার ধন ধাত্তে পূর্ণ হইল।

দ্বিতীয় অংশ।

এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। ব্রাহ্মণের ছোট ছেলে। এক দিন মেয়েরা বেড়াইতে গিয়া দেখিল সকলেই শাহু, চিড়া ও ঠৈ তৈয়ার করিতেছে। নিজস্বা করিয়া জানিল কর্মপুরুষের ব্রতের জন্য এগুলি তৈয়ার হইতেছে, এবং শুনিয়া কর্মপুরুষের ব্রত করিলে নির্বনের ধন হয়, পুত্রহীনের পুত্র হয়, যে বাহা চায় তাহাই পায়। ব্রাহ্মণ রোজ ভিক্ষা করে, বাহা পায় তাহাতে দিন জীবনের কোন-

রূপে দিন পাঁচ হয়। এক দিন কান্ডাদের অহরোধে ব্রাহ্মণ ধান ভিক্ষা করিতে গেল। মেয়ে দুটি ভিক্ষার ধানে কর্ণপুরুষের পূজার জন্য কিছু থৈ, চিড়া করিল।

আজ কর্ণপুরুষের পূজার দিন। মেয়েরা ভক্তির সহিত কর্ণপুরুষের পূজা দিল। দুই বোনে শাহু বদলাইল, তেল-সিল্পুর পরিল ও “বোন বোনারিয়” ব্রত করিল। ব্রাহ্মণ আজ প্রচুর ভিক্ষা পাইল এবং এক ছালা চাউল লইয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল। এদিকে কর্ণপুরুষের বরে ব্রাহ্মণের কুড়ে ঘরখানি অট্টালিকা হইয়া গেল, বিস্তর ঐশ্বর্য্য হইল এবং দাস দাসীতে বাড়ী গম্ গম্ করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখে তাহার কুটার নাই, প্রকাণ্ড অট্টালিকা। মনে করিল তাহার মেয়ে দুটিকে মারিয়া বৃষ্টি কেহ বাড়ী করিয়াছে, স্মরণ্য হুঃখিত মনে বাড়ীর দরজার একটা গাছের তলে বসিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। মেয়ে দুটি এখনও খার নাই পিতার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তাহার বিলম্ব দেখিয়া মেয়েরা বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দেখে ব্রাহ্মণ গাছতলার বসিয়া কাঁদিতেছে। তখন তাহাকে বস্ত্রের সহিত বাড়ীতে আনিয়া, স্নান করাইয়া খাওয়াইল এবং বলিল, “কর্ণপুরুষের বরে আমার ঐশ্বর্য্য অইছে ডেরাখান অট্টালিকা অইয়া গেছে।”

এ রূপে তাহারা স্তব্ধে দিন কাটাইতে লাগিল। কিছু দিন পরে মেয়ে দুটির ইচ্ছা হইল ব্রাহ্মণ আবার বিবাহ করে, কারণ মেয়েদের বিবাহ হইলে কে তাহার যত্ন করিবে! কিছু দিন পরে ব্রাহ্মণের সহিত রাজার মেয়ের বিবাহ হইল।

আবার শত্ৰু ব্রত ফিরিয়া আসিল। মেয়ে দুটি কর্ণপুরুষের পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। তাহাদের নূতন মা থৈ চিড়া দেখিয়া বলিল, “রাজ রাজার বাড়ীতে কেন গরীব হুঃখীর কারখানা?” এবং পদাঘাতে সমস্ত ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল। মেয়েরা পরে তাহাদের নূতন মা’র অসাক্ষাতে আবার থৈ, চিড়া করিতে লাগিল। ইহাতে ইহাতে তাহাদের মাতা অসন্তুষ্ট হইয়া শুইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ আসিয়া ব্রাহ্মণীর কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলিল, “সত্য কর আমি যা চাই তা তুমি করবা তা অইলে আমার হুঃখের কথা কয়াম্।” ব্রাহ্মণ সত্য করিল, এবং ব্রাহ্মণী মেয়েদের বনবাস প্রার্থনা করিল।

এক দিন সকালে ব্রাহ্মণ মেয়ে দুটিকে ডাকিয়া বলিল, “আজ তোমরাও তোমার মাসীর বাড়ীতে লইয়া যাইবু শুধু খাইয়া লও।” বড় মেয়েটি একটু নির্দোষ ছিল কিন্তু ছোট মেয়েটি ব্যাপারখানা বুঝিয়া লইল। সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যাবেলায় তাহারা এক বনে প্রবেশ

রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল, ব্রাহ্মণ রমুনা, রমুনা দুই বোনকে বনে রাখিয়া ক’রে আশুল হইতে দুই ফোটা রক্ত তাহাদের কাপড়ে ফেলিয়া অতি হুঃখিত চিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিল। দুই বোন জাগিয়া দেখে রাত্রি হইয়াছে, চাঁদের আলো বনভূমিকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। দুটি মাটির ডেলার উপর মাথা রাখিয়া তাহারা শুইয়া আছে। বড় মেয়ে রক্ত দেখিয়া মনে করিল ব্রাহ্মণকে বাধে খাইয়াছে এবং কাঁদিয়া আকুল হইল। ছোট মেয়ে তাহাকে বুঝাইয়া বলিল বাধে খাটলে সকলকেই খাইত; মায়ের পরামর্শে ব্রাহ্মণ তাহা-দিগকে বনবাস দিয়াছে। বিপন্ন হইয়া বালিকা দুটি হিংস্র জন্তু হইতে প্রাণ বাঁচাইবার উপায় দেখিতে লাগিল। সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গাছ ছিল। গাছটার কাছে গিয়া তাহারা বলিল, “মা, আইজু তুমি আমাদের আশ্রয় অভাগিনীমার প্রাণ রইকা কর।” বাধিত হইয়া গাছটা দুইয়া পড়িল; মেয়েরা তখনই গাছে উঠিল এবং গাছটা আবার আগের মত ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

এক রাজপুত্র ও এক সওদাগরের পুত্র মৃগয়া করিতে সেই বনে আসিয়াছিল। দুয়োঁগে পথ হারাইয়া তাহারাও সেই গাছটার নীচে আশ্রয় লয়। রাত্রি প্রভাতে দুই বন্ধু গৃহে ফিরিতে উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় একটা চুল সওদাগরের পুত্রের গায়ের উপর পড়িল। সওদাগর পুত্র মাপিয়া দেখিল চুলটা দুই হাত লম্বা। তাহারা এত বড় লম্বা চুল দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং চারি দিকে দেখিতে লাগিল। পরে গাছের দিকে তাকাইয়া দেখিল দুটি স্থল্মরী কান্ড আগভালে বসিয়া আছে। প্রথমতঃ ভয়ে ও বিস্ময়ে তাহারা স্তম্ভিত হইয়া রহিল পরে মেয়ে দুটিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল “তোমরা কে?” ছোট মেয়েটি বলিল, “আমরা মনুষ্য, ব্রাহ্মণের কন্যা। পিতা বিমাতার মন্ত্রণায় আমরা বনবাস দিয়া গেছে। এখনও আমাদের বিয়া অইছে না; যদি দয়া কৈরা আপনেরা আমাদের বিয়া করেন ত অইলে আমরা আপনদের লগে যাইতে পারি।” বড় মেয়েটি একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল ছোট বোন তাহাকে সাহসনা করিয়া আশ্বাস প্রদান করিল। বড় মেয়েটিকে রাজপুত্র লইয়া গেল, এবং ছোট মেয়েটি সওদাগরের পুত্রের সঙ্গে গেল।

এক বৎসর অতীত হইয়াছে, কর্ণপুরুষের ব্রতের দিন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। বড় মেয়ে রাজ-বধু হইয়া কর্ণপুরুষের কথা ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ছোট মেয়েটি কর্ণপুরুষকে ভুলে নাই। সে পূর্ব্বের মত কর্ণপুরুষের ব্রত করিল। সওদাগরের ঐশ্বর্য্য বাড়িতে লাগিল রাজার ঐশ্বর্য্য কমিতে লাগিল। রাজা সওদাগরকে ডাকাইয়া বলিলেন, “বনে কইড়া ঘর (অ) আইজা আমার হৃদয় অইছে; তুমি আবার

বাড়ী কিরিয়া সকল কথা জীর নিকট খুলিয়া বলিল। তুমি তাহার জী বলিল, “বেশ কথা, তাহা তুমি লইয়া আইয়; কিন্তু রাজ্যেরে কইয় যে, তিনি এই কইয়া আর ফিরতি পাইবেন না।” রাজা স্বীকৃত হইলেন।

ছোট বোন বড় বোনকে ভৎসনা করিল। পর বৎসর আবার হুই বোন কর্মপুরুষের ব্রত করিল। এবার রাজার ঐর্ষ্য বাড়িতে লাগিল। রাজা আবার সওদাগরকে ডাকিয়া বলিলেন, “বন্ধু বনের কইয়া আইয়া দেও।” সওদাগর জীর কাছে আবার রাজার অভিপ্রায় জানাইল। সওদাগরের জী বলিল, “আইচ্ছা ভাল কথা, কিন্তু বনের কইয়া ফিরতি পাইতে অইলে রাজ্যেরে সওদাগরের বাড়ী থাক্যা রাজ্যবাড়ী পর্যন্ত একটা কৈয়া জাঙ্গাল বাধাইয়া দিতে অইব, এবং একটা হুধের পুষ্করি কাটাইতে অইব।”

রাজা কড়ির রাস্তা প্রস্তুত বরাইলেন; এবং ঢেড়া দেওয়াইলেন যে, যাহারা দুই বুড়ি মাটি কাটিবে তাহার এক বুড়ি কড়ি পাইবে; এবং সওদাগরের জী সেই সকল লোককে কড়ি দিয়া বিদায় করিবেন।

এদিকে কর্মপুরুষের কোণে ব্রাহ্মণের আবার হ্রবস্থা হইয়াছে। আর সেই অটালিকা নাই। ভিক্ষা করিয়া কোন প্রকারে দিন পাত হয়।

ব্রাহ্মণের জী পুকুর কাটার সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণকে বলিল, “তুমি যাও, হুই ওরা মাটি কাটলে এক ওরা করি পাইবা; তা অইলে কিছু দিন সুখে কাটাইতে পাইয়াম।” ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর যত্নগার যাইতে স্বীকার করিল।

সমস্ত দিন হাটিয়া ব্রাহ্মণ রাজ বাড়ীতে উপস্থিত হইল—পা আর চলে না; অতি কষ্টে হুই বুড়ি মাটি কাটিয়া কড়ির কষ্ট ব্রাহ্মণ সওদাগরের জীর নিকট গেল। সওদাগরের জী ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিল। বসিতে একখানা চৌকি দিল, পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যাবিত হইয়া ভাবিল, “ইডা আবার কি!” কেহ ব্রাহ্মণের গায়ে তেল মাজিতে লাগিল, কেহ পা ধুইয়া দিল এবং কেহ স্নানের জল লইয়া আসিল। ব্রাহ্মণ স্নান করিল ও সোনার খালায় ভাত খাইল। পরে তাকে সুবাসিত পান ও সুগন্ধ তামাক দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণ সুস্থ হইলে হুই লোন তাহার হুই দিকে বসিয়া বলিল, “বাবা আপনে আপনের রমুনা যমুনাকে চিনতে পারেন না?” ব্রাহ্মণের সমস্ত কথা মনে হইল, চক্ষু হইতে দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ বলিল, “না, আমি আর তোমারারে ছাইয়া যাইতাম্ না।” সওদাগরের জী সওদাগরকে বলিল, “একখান পাকী আইয়া দেও; জন্মভূমিটা এক বার দেখিয়া আই।”

ব্রাহ্মণের বাড়ীতে হুইটি পাকী আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে বড় লোক। ব্রাহ্মণী ভয় পাইয়া একখানা

খানিতে ঢুকিয়া কিছুই পাইল না—এক কোণে একটা শামুকে একটু নুন ছিল; সেখান হইতে একটু নুন মুখে দিয়া আবার বাড়ীতে কিরিয়া আসিল।

সওদাগর জীকে লিজাসা করিল, “বাণের বাড়ীতে কি খাইয়া আইলা?” জী উত্তর করিল, “পিধিমীর মেওয়া খাইয়া আইছি। রাইত তোমারেও খাওয়ায়াম।”

সওদাগর পত্নী রাজে হুটি ব্যঞ্জন রাখিল। একটায় নুন দিল আর একটায় দিল না। সওদাগর যখন খাইতে বসিল তখন প্রথম তাহাকে নুন ছাড়া ব্যঞ্জনটা খাইতে দিল। সওদাগর অসন্তোষ প্রকাশ করিল। পরে নুন দেওয়া ব্যঞ্জন খাইয়া বলিল, “বাঃ? ইডা ত ভালো অইছে।”

“আমরা এই মেওয়াঅই খাইয়া আইছি।”

ব্রাহ্মণ ছোট মেয়ের বাড়ীতে রহিয়া গেল। রাজা আবার নিজের জীকে রাজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন। এখন হইতে হুই বোন বৎসর বৎসর কর্মপুরুষের ব্রত করিতে লাগিল এবং তাহাদের ঐর্ষ্য ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। এই রূপে পৃথিবীতে কর্মপুরুষের ব্রতের প্রচার হইল।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থ সমালোচনা।

সাম্রাজ্য—শ্রীবিনয় কুমার সরকার এম্ এ প্রণীত, ১১৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১ এক টাকা—ছাপা ও কাগজ উত্তম।

এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বর্তমান সময়ের কয়েকটি সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। ‘বঙ্গ নবযুগের নূতন শিক্ষা’, ‘হিন্দু ও মুসলমান’, ‘বাঙ্গালাসাহিত্য তথা হিন্দুসাহিত্য’, ‘আমাদের কর্তব্য’ প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের স্বাধীন ও সংযত আলোচনা দ্বারা গ্রন্থকার হিন্দুজাতির উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় কি তাহাই নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার মতে, হিন্দু জাতির স্বাভাব্য ও বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কাজ করিলে আমরা কখনও প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। গ্রন্থোক্ত সকল মতগুলিই সর্বসাধারণে গৃহীত না হইতে পারে, কিন্তু গ্রন্থের সর্বত্রই যে চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সর্বত্র প্রশংসার্প্য। গ্রন্থের আর একটি গুণ, গ্রন্থকারের ব্যক্তিত্বের (personality) অশ্রব্য অভিব্যক্তি। গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে এই কথাই বিশেষ করিয়া মনে হয় যে, গ্রন্থকার কেবল তর্কের খাতিরে, অথবা পাণ্ডিত্য বিকাশের জন্য কিছুই লেখেন নাই তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহার বাথার্থ্য তিনি বিশেষ ভাবে স্বীয় হৃদয়েই উপলব্ধি করিয়াছেন গ্রন্থোক্ত সত্যগুলি তাহার ঐকান্তিক সাধনার ফল। আলোচ্য পুস্তকখানি বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

প্রতিভা

২য় বর্ষ

ফাল্গুন ১৩১৯

১১শ সংখ্যা

ময়নামতির গান *

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে ডাক্তার প্রায়ারসন্ সাহেব ময়নামতি মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রবিষয়ক একটি প্রাচীন গাথা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। ময়নামতির কথা লইয়া সাধারণ্যে আলোচনার তাহাই প্রথম সূত্রপাত। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এই গাথাকে বৌদ্ধযুগের বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন এবং তদুপলক্ষে ইহার সর্বাঙ্গীন আলোচনাও করেন। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় ষষ্ঠ বর্ষের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় গুরুত্ব মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্রের গীত প্রকাশিত করেন এবং প্রায় চারি বৎসর হইয়া সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার পঞ্চদশ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ময়নামতির গান সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি রঙ্গপুর জেলার দুইটি বৃদ্ধ যোগীর আবৃত্তি অনুসারে দুইটি বিস্তৃত পাঠ সংগ্রহ করিয়া তাহাই

অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ময়নামতির গানের কোন প্রাচীন পুথি পান নাই। তিনি আরও লিখিয়াছেন— “ভুনিয়াছি, ত্রিপুরা জেলায় ও পূর্ববঙ্গে রাজা গোপীচাঁদের গাথা প্রচলিত ছিল। এখন আর তাহা শুনিতে পাওয়া যায় না।”

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও তাহার রাজমালার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে, গোপীচাঁদের গাথা তাঁহারাজেলে-বেলায় বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে ময়নামতির গানে উল্লিখিত স্থান সকলের নির্দেশ রঙ্গপুর জেলায়ই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তদিকে ত্রিপুরা জেলায়ও ময়নামতির টিলা—বাহার নাম হইতে বিখ্যাত ছিটের নাম হইয়াছে,—এবং তাহার অদূরে রাজা মাণিকচন্দ্রের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, ময়নামতি পাহাড়েরই শাখা লালমাই পাহাড়ে অতীত মুড়া ও পহুনা মুড়া নামে দুই শৃঙ্গ বর্তমান আছে; ময়নামতির পাহাড়ের সংলগ্ন ঘোষনগর গ্রামে যে প্রায় তিন শতাব্দিক ধর যোগী (?) আছে তাহাদের এবং নিকটস্থ জনসাধারণের বিশ্বাস যে, ময়নামতি, মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের কীর্তিকলাপের স্থল ময়নামতির পাহাড় এবং তাহার চতুর্দিকস্থ মেহেরকুল রাজ্য। বিবেকানন্দ বাবু না কি ময়নামতির গানের এক সংস্করণ বাহির করিতেছেন। তাহার পূর্বে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত।

* ত্রিপুরা সাহিত্য সভায় পঠিত। প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও সূত্রধর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ মহাশয় প্রবন্ধটি দেখিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এবং আমার বৈঠকী শ্রীযুক্ত শোভনগাজি আমাকে এই বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের ধন অপরিশোধ্য।—লেখক

ত্রিপুরা জেলায় অপ্রকাশিত হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির অনুসন্ধানে ময়নামতির ইতিবৃত্তমূলক একখানা প্রাচীন পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ময়নামতির নিকটস্থ হরিদ্ধরা গ্রামে শোভনগাজি নামক জনৈক শিক্ষকের নিকট পুস্তকখানা পাওয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরার অধিবাসী ও প্রবাসীদের নিকট ময়নামতি সুপরিচিত হইলেও অল্প স্থানের অনেক লোকেই ইহার বিষয় বিশেষ কিছু জানেন না। কুমিল্লা সহর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল পশ্চিমে একটি অশুষ্ক পাহাড় আছে; ইহারই দক্ষিণ অংশকে লালমাইর পাহাড় এবং উত্তর অংশকে ময়নামতির পাহাড় বলিয়া থাকে। আসাম-বঙ্গ রেলওয়ে যাত্রীগণ লালমাই স্টেশন হইতে উত্তর দিকে চাহিলেই লালমাইর পাহাড় এবং তাহার চণ্ডীমুড়া নামক শৃঙ্গের উপরিস্থিত চণ্ডীর মন্দির দেখিতে পান। ময়নামতির টিলা লালমাই স্টেশন হইতে প্রায় বার মাইল উত্তরে। প্রাচীন কমলাঙ্কের নরপতি মাণিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নার নাম অনুসারে স্থানটি ময়নামতি নামে পরিচিত হইতেছে। ময়নামতির পূর্ব প্রান্ত দিয়া গোমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। অতি প্রাচীন সময়ে ময়নামতির দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া 'কির' বা কিরুদ নামে আরও একটি নদী প্রবাহিত ছিল। কোন সময় এই নদী ভরত হইয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। মাত্র স্থলে স্থলে এই নদীর কুর (গভীর জলপূর্ণ খাত) বর্তমান থাকিয়া নদীর অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। ময়নামতির পূর্বাংশে সাগরদীঘি নামে (অপর নাম দেবদীঘি) কুমিল্লাস্থিত ধর্মসাগরের প্রায় পঞ্চাশ বৃহৎ একটি সরোবর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ময়নামতিকে পাহাড় না বলিয়া ঐ দিঘীর পাড় বলিলেই চলে। স্থানটি ভালরূপ পর্যবেক্ষণ করিলে এইরূপই প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। ময়নামতি বর্তমান সময়ে মেহারকুল পরগনার অন্তর্গত এবং ত্রিপুরা মহারাজের স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ময়নামতির প্রায় অর্ধ মাইল দক্ষিণে লালমতি বা লালমাই পাহাড় অবস্থিত। মাণিকচন্দ্রের কন্যা

লালমতির নামানুসারে এই পাহাড়ের নাম লালমতি হইয়াছে। ইহা জনশ্রুতি মাত্র। মাণিকচন্দ্রের পুত্র-বধূ অহুনা ও পহুনার নামানুসারে এই পাহাড়ের অহুনা মুড়া ও পহুনা মুড়ার নামকরণ হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে। ময়নামতির ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াও ইহা ঠিক বলিয়াই মনে হইতেছে। এই পাহাড়ের অপর এক মুড়ার চণ্ডী দেবীর মন্দির অবস্থিত আছে বলিয়া লোকে ইহাকে চণ্ডীমুড়া বলিয়া থাকে। ময়নামতি ও লালমতি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ১ মাইল। পরিমাণ ফল ৯ কি ১০ বর্গমাইল। উচ্চতা কোন স্থলেই ৫০। ৬০ ফিটের অধিক হইবে না। এই পাহাড়ের প্রায় প্রত্যেক মুড়ায় ইষ্টকালয়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পর্বতের অভ্যন্তরে নানা স্থানে বহু ছোটবড় সন্মোচনাদি বর্তমান রহিয়াছে। ইহার ২। ১ টির সঙ্গে ও কোন কোন মুড়ার সঙ্গে দুই একটি রাজার নাম জড়িত আছে। পাহাড়ের প্রান্ত ভাগে অব্যবহার্য বহুল স্তম্ভহীন দীর্ঘিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যশপুর বা কালীর বাজার ঝাঁটার ধারে একটি গিরিদুর্গ অল্প দিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। লোকে ইহাকে "কোটঘর" বলিয়া থাকে। প্রবাদ আছে এই পাহাড়ে ক্রমাগত উনশত রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। পাহাড়ের স্থানে স্থানে বহু ইষ্টকালয়ের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া এই প্রবাদ নিতান্ত অমূলক মনে হয় না। ময়নামতি টিলার পূর্ব প্রান্তে একটি সুরঙ্গ ছিল, কিছু দিন হইল তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। এই সুরঙ্গ ও সাগরদীঘি সম্বন্ধে অনেক উপকথা প্রচলিত আছে। প্রবাদ আছে যে, ময়না এই সুরঙ্গ মধ্যমই মহাপ্রস্থান করিয়াছিল। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, ময়না এখনও জীবিত আছে।

মাণিকচন্দ্র ও তাহার স্ত্রী ময়না, পুত্র গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র এবং পুত্র-বধূ অহুনা-পহুনার কথা ময়নামতি অঞ্চলে অনেকের মুখেই শুনা যায়। এই পুস্তকখানাও মাণিক চন্দ্রের মৃত্যু ঘটনা ও 'গোপীচাঁদের' লগ্ন্যাস অবলম্বনেই লিখিত হইয়াছে। মূল পুস্তকখানা বোধ হয়

‘গোপীচন্দ্র’ সন্ন্যাসের পরই লিখিত হইয়াছিল। তার পর সুদীর্ঘ বাল পর্য্যন্ত ইহার নকল চলিয়া আসিতেছে। পরবর্তী লেখকদের হস্তে পতিত হইয়া ইহাতে কয়েকটি বৈকল্পিক-ঘোষা ও বহু মুসলমানী শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন কবির লেখার সহিত অনেক স্থলেই মিশিয়া যাইতে পারে নাই। মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে প্রকৃষ্ট অংশগুলি অনায়াসেই ধরিতে পারা যায়। এই পুস্তকখানার তারিখ না থাকায় কোন সময়ে লিখিত হইয়াছে তাহা জানা যাইতেছে না। অক্ষরা দৃষ্টে প্রাচীন বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহাতে স্থানে স্থানে ভবানী দাস নামক জনৈক কবির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।

পুস্তকের মূল বিবরণ ।

মহারাজ মাণিকচন্দ্র (মাণিক চান্দ) প্রজারঞ্জন পূর্বক রাজত্ব করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। তৎপুত্র গোবিন্দ চন্দ্র (বা গোপীচন্দ্র) মৃত মহারাজের বিশাল রাজ্যের উত্তরাধিকারী। মাণিকচন্দ্রের বিধবা মহিষী ময়না (পিতৃদত্ত নাম শিশুমতি, গুরুদত্ত নাম ময়নামতি বা মএনামতি) নব নরপতি গোবিন্দচন্দ্রকে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া রাজ-কার্য্যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ করিতেছেন। রাজা “গোবিন্দাই”কে নানা ধর্ম্মোপদেশ দিয়া এবং নারী জাতির অসারতা বুঝাইয়া ময়নামতি যোগী হইতে উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাহাতে নারাজ। তিনি তাঁহার চর্য্যের মাহিষী ও সমৃদ্ধিপূর্ণ রাজ্য লইয়া পার্শ্বস্থ সুখে মত্ত। তিনি প্রজার কর বৃদ্ধি করিয়াছেন। মহারাজ মাণিকচন্দ্রের রাজত্ব-কালে প্রতিকালী ভূমিতে বার্ষিক কর ৭৭০ দেড় বুড়ি বা দেড় পরস ছিল। রাজা গোবিন্দচন্দ্র সেস্থলে ১০ এক আনা কর ধার্য্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বিধবা রাণী পুত্রের অবৈধ কার্য্যের নিন্দাবাদ করিয়া স্বামীর রাজত্বের প্রশংসাবাদ পূর্বক বলিতেছেন—

বড় পুণ্যের লাগি দিলা দীঘি আর জাঙ্গাল ।

সোণা রূপার গড়া গড়ি না ছিল কাঙ্গাল ॥

হিরামন মাণিক্য লোকে তুলিতে শুকাইত ।

কাহার পুঙ্কনীর জল কেহ না খাইত ॥

সোণার ঢেপুয়া লৈয়া বাল্লকে খেলাইত।

হাড়াইলে ঢেপুয়া পুনি না চাহিত আর ।

এমত গোঁআইল লোক হরিণ অপার ॥

(মহারকুল বেড়ি ছিল মূলি বাশের বেড়া ।

গৃহস্থের পরিদান সোণার পাছরা ॥

গরীবে চড়িয়া ফিরে খাসা তাজী ঘোড়া ।

ফকিরের গাএ দিত খাসা কাপড় জোরা ॥

তোমার বাপের কালেরা সব ছিল ধনি ।

সোনার কলসী ভরি লোকে খাইত পানী ॥

রূপার কলসী ভরি বিধবাএ জল খাইত ।

কিবা রাজা কিবা প্রজা চিনন না যাইত ॥

দুই পহর মজুরি করে গৃহস্থের ঘর ।

এক পহর দৌড়ায় ঘোড়া ময়দান পাত্যর ॥

যার যেই নিত্য কর্ম্ম এড়ান না যাএ ।

অথ আরোহিয়া সেই মজুরির কোড়ী হএ ॥

দেড় বুরি কোরি ছিল কানী ভূঞির কর ।

চৌদ্দ বুরি কোড়ী ছিল তক্তার মোকর ॥

দশ তক্তার বাড়ী খাইত দেড় বুরি দিত ।

বার মাস ভরিয়া বছরের খাজনা নিত ॥

তোমার বাপের সৈত্য ভূমি লৈলা লাড়ি ।

ভূঞি পিছে ধরি লৈলা এক পণ কোড়ী ॥

এহার কারণে রাজা বহু দুঃখ পাইবা ।

এস্থখ সম্পদ তোম্বা সব হাড়াইবা ॥

কলির প্রবেশ হৈব জানিয়া নিশ্চএ ।

এ কারণে স্বর্গে গেলা রাজা মহাশএ ॥

উদ্ধৃত কতিপয় চরণ পাঠে বুঝা যায় মহারাজ মাণিকচন্দ্রের রাজত্ব-কালে, প্রজার অবস্থা উন্নত ছিল। লোকে

পুণ্যের নিমিত্ত সরোবর ও রাজ-পথ নির্মাণ করিত। দেশে সোনা-রূপার অস্তাণ ছিল না। সাধারণ লোকে সোনার কলসীতে পানীয় জল সঞ্চিত রাখিত।

তৎকালিক নরপতিগণও বিলাসপ্রিয় ছিলেন না। ক্ষুতরাং বসন ভূষণে রাজা ও প্রজার বিভিন্নতা লক্ষিত হইত না। মজুরেরা এক বেলা মজুরি করিত। বৈকালে অখ-পুষ্টে ময়দানে ভ্রমণ করিত। প্রতিকালী ভূমির বার্ষিক কর ৭৥ দেড় পরস ছিল। তাহাও কিস্তি অগ্রসারে আদায় হইত। কড়ি দ্বারা কর আদায়ের প্রথা ছিল। মহারাজ মাণিক-চন্দ্রের নামে মুদ্রিত টাকার মূল্য ১/১০ চৌদ্দ পরস ছিল।

“কলির প্রবেশ হৈব জানিয়া নিশ্চয়”।

“এ কারণে স্বর্গে গেলা রাজা মহাশয়” ॥

ইহা কবির অভ্যুক্তি। অপেক্ষাকৃত ধারাপ সময়, এই অর্থে বোধ হয় কলি শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। অতঃপর আসন্ন কলির বিভীষিকা দেখাইয়া ময়নামতি পুত্রকে পুনর্বার যোগী হইতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

রাজা এ রকম ‘ন ছোড়বন্দ’ জননীর পাশায় পড়িয়া তাহারই নিকট কাতর হইয়া ‘আপিল’ করিতে লাগিলেন—“আমার এত সব ধন-সম্পত্তি আমি কাহাকে দিয়া যাইব ?”—

অনুনা পুত্রনা এড়ি যাইমু কার ঘর ?

* * *
এহি সন এড়ি যাইমু আপনে জানিয়া।

ন প্রস্থান পাড় এড়ি যামু উনশত বাণিয়া ॥

বাপের মিরাস এড়ি যাইমু গৌর সহর।

দাদার মিরাস যাবেক কমলাক নগর ॥

তুঙ্গি মায়ের যত বাড়ি কলিকা নগর।

আঙ্গি বাড়ি বাক্সিয়াছি মেহারকুল সহর ॥

চল্লিশ রাজাএ কর দেএ আঙ্গার গোচর।

আমা হইতে কোন জন আছএ ডাকর ॥

ময়নামতি কোথায় কি ভাবে কি “এড়িয়া” যাইতে হইবে সেই বিষয়ে পুত্রকে নিশ্চিত করিয়া বলিলেন যে, আমার সংসারের জন্ত এত মায়া ভাল নহে। তিনি

গভীর ভাবে পুত্রকে এই রোমহর্ষণকারী সংবাদ জানাইলেন যে, রাজা যখন মহিবীদের সঙ্গে ‘রজরসে’ মত্ত থাকেন তখন প্রত্যেক দিন যম তাহার খোঁজে আসে! এই পর্য্যন্ত ময়নামতি তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন কিন্তু আর বেশী দিন তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না!

রাজা ‘শুবিচন্দ্র’ এই কথা শুনিয়া বিবম ভয় পাইলেন—

রাজাএ বলে শুন মা গো মৈনামতি আই।

এক নিবেদন করি তুঙ্গি মায়ের ঠাঞি ॥

বাপের কালের আছে চৌদ্দ রাজার ধন।

তুমি মাএর জোলা আছে হিরামন রতন ॥

আঙ্গার কামাই আছে রজত কাঞ্চন।

চারি বধুর জোলা আছে চারি গোলা ধন ॥

সর্বধন দিব ভেট যমের গোচরে।

ধন পাইলে যমরাজ এড়ি যাবে মোরে ॥

ময়নামতি বলিলেন যে, ধন দিয়াই যদি যমকে ফিরান যায় তবে মহাধনী তাহার পিতা মরিলেন কেন ?

গোবিন্দচন্দ্র বলিলেন যে, তবে যমকে সৈন্ত লইয়া তাড়াইয়া দেওয়া যাইবে।

ময়নামতি বলিলেন যে, পৃথিবীতে গোবিন্দচন্দ্রের পূর্বে অনেক রাজার সৈন্তসামন্ত ছিল কিন্তু তাহারাও যমের হাতে রক্ষা পায় নাই। যম যখন “য়ন দেখা” হইয়া আসিবে তখন সৈন্তে কি করিবে ?—

তোমারে নিবারে যম নিত্য আলাপ করে।

এ কারণে আঙ্গি মাত্র বুঝাই তোমারে।

গোবিন্দচন্দ্র কাঁদিয়া পড়িলেন—

নূপে বোলে শুন মা গ মৈনামতি আই।

এক নিবেদন করি তুঙ্গি মাএর ঠাই ॥

তবে কেন বালা কালে বিভা করাইলা ॥

কিন্তু ময়নামতি তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন—

ইষ্ট মিত্র বাপ ভাই কেহ নহে কার।

পুত্র কৈজা সঙ্গে রাজা না যাবে তোমার ॥

ধন জন দেখিয়া আপনা বোল তারে ।
এ তুমি আপনা নহে লৈয়া ফির যারে ॥
কৌলি কর্ম হেতু রাজা দেহ কৈলা পাত ।
কি বলি জোণাব দিবা স্বামীর সাক্ষাৎ ॥
আসিতে লেংটা রাজা যাইতে যাইবা শৈশব ।
সঙ্গে করি লৈয়া যাইবা পাপ আর পুণ্য ॥

রাজকুমার মার মুখে এ সকল বৈরাগ্যের কথা যে কেবল নীরবে শ্রবণ করিয়াছেন তাহা নয় বরং যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সকল যুক্তি, সকল প্রতিবাদ প্রোতের মুখে তুণের জায় ভাসিয়া গিয়াছে। মার কথায় রাজা সন্ন্যাসী হইতে মনস্থ করিয়াছেন, আবার পরক্ষণেই, রাজবধূদের কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তাই মার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজবধূগণ সন্ন্যাসের কথা শ্রবণেই শুনিয়াছেন। রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ মাত্র, তাঁহারা রাজার চরণ ধরিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ স্থানের রচনা বড়ই ভাল লাগিয়াছে। তাই কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

কান্দএ অহুনা নারী কান্দএ পহুনা ।
কান্দএ রতনমালা আর কাঞ্চা-সোনা ॥
অহুনার কান্দনে গাবীর গাব ছারে ।
পহুনার কান্দনে সমুদ্র উজান ধরে ॥
রতনমালার কান্দনে প্রাণ নহে স্থির ।
পদ্মমালার কান্দনে মেদিনী যাএ চির ॥
কাঞ্চাসোনা কান্দে রাজার চরণে পরিয়া ।
মৈনামতি বোলে তুচ্ছ যাইবা যোগী হৈয়া ॥
যে দেশে যাইবা প্রিয়া সে দেশে যাইব ।
ধরিয়া যুগীর বেশ সজ্জি থাকিব ॥
তুচ্ছ সে যুগীয়া রাজা আকৃষ্ট যুগিনী ।
যরে যরে মাগিযু ভিক্ষা দিবস রঞ্জনি ॥
ভিক্ষা মাগিয়া প্রিয়া রাঙ্কি দিব তাত ।
ছাড়িয়া না দিমু তোকা শোন প্রাণনাথ ॥

এক সৈন্দা রাঙ্কি ভাত চুই সৈন্দা খাণ্ডাইমু ।
হাটিতে নারিলে রাজা কোলে করি লইমু ॥
রাজা বনের বাঘের ভয় দেখাইয়া বলিতেছেন—
“রাজা বোলে কি প্রকারে হাটিয়া যাইবা ।
সে পন্থে বাঘের ভয় দেখি ডরাইবা ॥”

রাজবধূগণ জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন। বাঘের ভয় সামান্য কথা। তাই বলিতেছেন—

খাউক বনের বাঘে তারে নাহি ডর ।
তোকা আগে মৈলে হৈব সাক্ষ্য মোহর ॥
মেদিন আছিন শিশু বাপ মাএর ঘরে ।
সে দিন না গেলা প্রিয়া দূর দেশ-স্তরে ॥
অখন যৌবন হৈল তোকা বিজ্ঞান ।
তুচ্ছ যুগী হৈলে প্রভু তাজিব জীবন ॥

* * * *

এ হেন দএয়ার বধু কি দোমে ছারিলা !
হেন প্রিয়া ছারি কেন বিদেশে চলিলা ॥
তোকার আক্ষার নষ্ট কৈল যেই জন ।
নষ্ট কউরুক তার প্রভু নিরঞ্জন ॥
আহে প্রভু গুননিধি কি বলিলা বাণী ।
শুনিতো বিদরে বুক না রহে পরাণী ॥
বনে থাকে হরিণী বনে ঘর বাড়ী ।
প্রেমের কারণে কাকে কেহ না যাএ ছারি ॥
সর্ব দিন চরা করে বনের ভিতর ।
সন্ধ্যাকালে চলি যাএ আপনা বাসর ॥
হরিনা যাএ আগে আগে হরিণী যাএ পাছে ।
সর্ব দুঃখ পাশরএ শ্রামী থাকে কাছে ॥
সেই পশুর বুদ্ধি নাই তুচ্ছ রাজার ঠাই
এত করে আমি নারী লাভ্য তোকারে বুঝাই
ইত্যাদি—

এস্থলে অহুনা-পহুনা (পদ্মমালা) প্রভৃতির নয়ন-জলে সিক্ত হইয়া কবির কবিতা বিনা অলঙ্কারেও মনোহারিণী হইয়াছে। রাজ-বধূগণের করুণ কান্দনে

রাজার অন্তরও দ্রব হইয়াছে। রাজ-বধূগণ যে কেবল করুণ রোদন ও অশ্রু ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা নহে, অহুনার পেটে সাত কাইতের বুদ্ধি।

“সাত কাইতের বুদ্ধি আমার ধড়ের তিতর”

অহুনা “রাগ লগিয়তে” রাজাকে মিঠাকড়া বেশ ছই কথা শুনাইয়াছেন।

অহুনা অভিমানের সহিত বলিতেছেন—
“তোমার মাএর কথা নির্ণয় না জানি।
হেটে গাছ কাটীয়া উপরে ঢালে পানী।
তোমার আক্ষার নষ্ট করে যেই জন।
নষ্ট কউরুক তারে প্রভু নিরঞ্জন।
বে বুদ্ধিয়া রাজার কুমার বুদ্ধি নাহি তোর।
বুদ্ধ মাএর কথা রাখ ধরের তিতর।
এহি মাএর বাক্যে রাজা রাজ্য হাড়াইবা।
হাতে ধাল করি তিক্কা মাগি খাইবা।
এহি বাক্য শুনি রাজা বোলে হাএরে হাএ
রহিতে না দিল মোরে মএনামতি মাএ।
না যাইব না যাইব প্রিয়া দেশ দেশান্তর।
সুখে রাজ্য করিব থাকিয়া নিজ ঘর।”

অহুনা পহুনা প্রভৃতির করুণ বিলাপে রাজার মন কিরিয়া গেল। রাজকুমার নিকুঞ্জ মন্দিরেই সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে মার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্বক নিবেদন করিলেন—

“রাজাএ বোলে শুন মা গ মৈনামতী আই
পুণি নিবেদন করি তুঙ্কি মাএর ঠাঞি।
আরের মাএ বেটা চাহে রাখিবারে ধরে।
তুঙ্কি মাএ কহ মোরে যুগী হইবারে।
আর মাত্র পুত্র দেখি হৃগ্ধ ভাত খাওএ।
নাতি পতি লৈয়া ধরে আনন্দে গোয়াএ।
তুঙ্কি মাএর হিয়া খানী পাত্যরে বান্দিয়া।
নিত্য প্রতি কহ মোরে যাইতে যুগী হৈয়া।

অন্ত যাইতে তুঙ্কি মোকে মানা কৈলা শুন।
পান যাইতে তুঙ্কি মোকে মানা কৈলা পুন।
শয্যাতে শুইতে তুঙ্কি যে হেন মানা কৈলা।
মাও মোর আণের বৈরী কি হেতু হৈলা।”

এই সময় ময়নামতি নিজের ‘জ্ঞান’-প্রাপ্তির বিবরণ বলিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে যোগী হইতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। রাজার সুযোগ হইল। তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার যদি ব্রহ্মজ্ঞানই লাভ হইয়াছিল তবে রাজা মাণিকচন্দ্র মরিলেন কেন? ময়নামতি বলিলেন যে, রাজাকে নিজের ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া অমর করিতে তিনি চেষ্টার ক্রটি করেন নাই কিন্তু মাণিকচন্দ্র কিছুতেই স্ত্রীর নিকট জ্ঞান লইতে স্বীকৃত হন নাই।

রাজকুমারের মত পরিবর্তন দর্শনে ময়নার রাগ চতুর্ভুজ হইল। ময়না পুত্রের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিয়া শাস্তি লাভ করিলেন। রাজকুমারের উত্তর সঙ্কট। এক দিকে মায়ের তাড়না, অপর দিকে বধূদের গঞ্জনা। এখন কোন পথ অবলম্বন করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

তাঁহার পরে ময়নামতি রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর বিবরণ বলিতে লাগিল। মহারাজ মাণিকচন্দ্র মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে গোমতী নদীর তীরে তাঁহার শবদেহ ভস্মীভূত করা হয়। তৎকালে গোমতী নদীকেই এই অঞ্চলে গঙ্গা বলা হইত। আবার মাসে মহারাজ লোকান্তরিত হন। বর্ষার জলে চতুর্দিক জলময় ছিল। মৃত দেহের সৎকার হইতে পারে এমন স্থান ছিল না। গোমতী নদীতে চর পরায় অবশেষে ঐ চরেই চিতা প্রস্তুত হইয়াছিল। মহারাজের জ্ঞাতিগোত্র, ভাট দামোদর ও দ্বিজ শম্ভির এবং সাউদ (সাধু বা সদাগর) লক্ষ্মীধর অশ্বোষ্টি-ক্রিয়ায় যোগ দান করিয়াছিল। এহলে একপ বর্ণনাত্মক আর কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

আবাচ মাসেতে মৈল মানিকচান্দ গোশাই

পৃথিবীতে জন্মএ পুরিতে স্থল নাই ॥

মৈত্যা-সুগে গঙ্গাদেবী গুমুতে আছিল।

গোমতীর কূলে বসি কান্দিতে লাগিল ॥

আমার কান্দনে গঙ্গার-স্নেহ উপজিল ॥

সমুদ্রের গঙ্গাদেবী ভাসিয়া উঠিল ॥

গঙ্গা বোলে ময়নামতি কান্দ কি কারণ।

যোর হস্তে নিবেদিল গঙ্গার সদন ॥

মেহেরকুলের রাজা ছিল মানিকচান্দ গোশাই

পৃথিবীতে জন্মএ পুরিতে স্থল নাই ॥

এত শুনি গঙ্গাদেবী হাসিতে লাগিল।

তিন পহরের পশু লই বালু চর দিল ॥

আছিল চন্দন কাষ্ঠ আনিলা কাটিয়া।

তোর বাপেরে এড়িলাম দীঘল করিয়া ॥

আমি মৈনা স্মৃতিলাম বা যক্ষ চাপিয়া।

ভারে ভারে লাকরি সব দিলেন ভুলিয়া ॥

কাচা হৈয়া পরে তহু করে ধর ধর।

উনাইয়া পরে রাজা অগ্নির ভিতর ॥

সেই সকল গাছ পুরি গ স্বর্গে উঠে ধূয়া।

সেই অগ্নিতে বহিল মুই যেন কাঞ্চা সোনা ॥

ব্রাহ্মণের* কোলে থাকি ঢালি দিলাম ঘিই।

সেই অগ্নিতে পোরা না গেল তিলকচান্দের ঝি ॥

এই বিবরণ শুনিয়া উপযুক্ত পুত্র “রাজা গোবিন্দাই”
থাকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন—

রাজা বোলে শুন-মাও মৈনামতি আই।

বাংপ সঙ্গে গেছিলা নি সাক্ষী জানাও চাই ॥

সাক্ষী চাওয়াতে ময়নামতি কিছু বিপদে পড়িলেন—

সত্য যুগে মরি গেছে মানিকচান্দ গোশাই।

এত দিনের সাক্ষী আঙ্গি কথা গেলে পাই ॥

হেন সাক্ষী দিব হেন নাহি মেহারকুল।

হাসিতে হাসিতে মৈনাএ কহিতে লাগিল ॥

সেই দিনের তিন সাক্ষী আছে হেন জানি।

তাহারে আনিয়া শুন সে সব কাহিনী ॥

এক সাক্ষী আছে মোর ভাট দামোদর।

আর আছে যে ব্রাহ্মন শব্দীহর ॥

আর সাক্ষী আছে রাজা সাউদ লক্ষীধর।

সাক্ষী আনিবারে শীঘ্র পাঠাএ অমুচর।

সাক্ষ্য প্রমাণে স্থির হইল যে, প্রকৃতই ময়নামতি
সহমরণ বাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু আশুন
তাহাকে পোড়াইতে পারেন নাই। বিবেকের বাবুর
সংগৃহীত গাথাতে এ স্থলে ময়নামতির অনেকগুলি পরীক্ষা
প্রদানের কথা আছে, কিন্তু এই পুস্তকে তাহা নাই।

অতঃপর আর ত আপত্তি টিকে না।

এক দিকে মাতৃভক্তি অপর দিকে পত্নী-প্রেম,
যাহা হউক অবশেষে মাতৃ-ভক্তিরই জয় হইল। মাতৃ-
আদেশ প্রতিপালন করিতেই সংকল্প করিলেন।
গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন, ইহাই স্থির হইল।

রাজ-বধূগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিপদ
গণিলেন। কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। বিপদে পড়িয়া
তাঁহাদেরও সাহস বাড়িয়া গেল। অসাধ্য সাধন করিতে
প্রস্তুত হইলেন। দ্বিবিধ পন্থা অবলম্বন করা হইল।
সন্ন্যাসে বিপত্তির কথা, আপনাদের সর্বনাশের কথা
বলিতে লাগিলেন ও রাজকুমার গৃহ ত্যাগ করিলে,
তাঁহারাও জলে বা অনলে দেহ ত্যাগ করিবেন বলিয়া
নারী-বধের পাপের ভয় দেখাইতে লাগিলেন; অপর
দিকে বিষ-প্রয়োগে বৃদ্ধ ময়নার প্রাণ নাশের
জন্তু গুপ্ত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। ময়না-
মতিকে মারিবার জন্ত বধূগণ নানা উপায় অবলম্বন
করিল, কিন্তু এক বারও ময়নামতি মরিল না। রাজা
গোবিন্দচন্দ্র বধূদের ষড়যন্ত্র অবগত হইয়া তরবারি লইয়া
তাহাদিগকে কাটিতে গেলেন, কিন্তু ময়নামতি বারণ
করিয়া রাখিলেন। বধূদের এই রকম হীন ব্যবহার

* বিবেকের বাবুর সংগৃহীত গাথার মধ্যে আছে “ব্রাহ্মণ”; ব্রাহ্ম
শব্দই ঠিক পাঠ, কারণ ব্রাহ্ম অগ্নি অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া
থাকে।

দেখিয়া গোবিন্দের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল এবং নাটকে জানাইলেন যে, তিনি যোগী হইতে রাজি আছেন কিন্তু তাহার পূর্বে মায়ের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে চাহেন। নানারূপ পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইলে গোবিন্দচন্দ্র মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহাকে কাহার নিকট জ্ঞান লইতে হইবে। ময়নামতি বলিলেন যে, হাড়িকার নিকট তাহাকে জ্ঞান লইতে হইবে। হাড়িকার নাম শুনিয়া রাজার শ্রদ্ধা হইল না, তাই আবার এক দফা হাড়িকার পরীক্ষা হইয়া গেল। পরীক্ষা শেষ হইলে রাজা যোগী হইতে প্রস্তুত হইলেন এবং দিন দেখা হইয়া গেল। অহুনা-পহুনা রাজাকে ঘরে রাখিতে চেঁচায় ক্রটি করিল না এবং কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল, কিন্তু রাজা যোগী হইয়া হাড়িকার পিছনে চলিলেন। ভাস্করের কড়ি কম পড়াতে হাড়িকা রাজাকে হীরা নটীর নিকট বিক্রয় করিয়া গেল। হীরা নটী রাজার দুর্দশার একশেষ করিল। হীরা নটীকে অভিশপ্ত করিয়া হাড়িকা শিষ্যকে কিছুদিন পরে মৃত্তক করিয়া আনিলেন এবং অবশেষে জ্ঞান লাভ করিয়া গোবিন্দচন্দ্র সংসারে ফিরিয়া আসিলেন।

পুস্তকের গল্পাংশ সংক্ষেপতঃ এই। বিবৃত বিবরণ দিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া যাইবে।

পুস্তকে কবিত্বের অভাব নাই, কিন্তু ইহার প্রধান মূল্য ঐতিহাসিক তথ্যদ্বাটনে। যে সমাজের চিত্র পুস্তকে পাই, তাহা বৌদ্ধ তাত্ত্বিক সমাজের চিত্র। রাজা মাণিকচন্দ্র বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়।

মহারাজ মাণিকচন্দ্র মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে, মৃত মহারাজের জাতিগোত্র একত্র হইয়া মৃত্যুর সপ্তম দিবসে তাঁহার অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

“মানিকচন্দ্রের জাতি গোত্র একত্র হইয়া।

সপ্ত দিন কাষ্ট কৈল লাড়িয়া চাড়িয়া ॥”

এই রূপ দুইটি চরণ পুস্তকের দুই অংশেই পাওয়া যাইতেছে। এহলে “সপ্ত” শব্দ “সপ্তম” অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

• প্রথমতঃ, একটি মাত্র মৃত দেহ মৃত ও কাঠের অগ্নিতে

ভস্মীভূত হইতে কখনই ক্রমাগত সাত দিন অভিযাহিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, দশ বা দশমের পর বহুতাবার পুরণ-বাচক ও সংখ্যাবাচক শব্দে কোন পার্থক্য নাই। এবং প্রাচীন পুথির আলোচনা করিলে দেখা যায় পুরণ-বাচক স্থলে সংখ্যাবাচক এবং সংখ্যাবাচক শব্দ স্থলে পুরণবাচক শব্দ প্রয়োগের অভাব নাই। অনেক স্থলে সপ্তম অর্থেই সপ্ত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় সুতরাং এস্থলে “সপ্ত” শব্দ সপ্তম অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

মৃত্যুর সপ্তম দিবসে অস্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, ইহা বৈদিক-হিন্দুর কথা নহে। বাসী মরা হিন্দু-শাস্ত্রে দোষাবহ। সপ্তম দিবসে অস্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কোন কারণও বর্তমান দেখা যায় না। এই ঘটনায় গোতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের দিনই স্মৃতি পথে উদ্ভূত হইতেছে।

“বুদ্ধদেব কুশী নগরের পথে জীবলীলা সংবরণ করিয়াছেন এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র কুশী নগরের মল্লগণ দলে দলে আসিয়া নৃত্য, গীত, বাণ, পুষ্প-মাল্য ও গন্ধ প্রভৃতি দ্রব্যে ক্রমাগত সাত দিন তাঁহার দেহ পূজা করিল। অনন্তর তাহা উদ্ধ বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও বিবিধ গন্ধ দ্রব্যে আবৃত হইয়া চন্দন কাঠের চিতায় দগ্ধ হইল।”

বর্তমান কালেও চট্টগ্রাম এবং ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধগণ এ রূপে মৃত দেহ রক্ষা করিয়া কোনও স্থলে ৩৪ দিন, উন্নত অবস্থা হইলে ৭৮ দিন বা ততোধিক কাল পর চিতা রচনা করিয়া, তদুপরি শবদেহ স্থাপন পূর্বক, বাতির অগ্নিতে দেহ নষ্ট করিয়া থাকেন। মাণিক-চন্দ্রের মৃত দেহও এরূপে মৃত্যুর সপ্তম দিবসে দগ্ধ করা হইয়াছিল। ইহাতেও তাহার বৌদ্ধত্বই সপ্রমাণ হয়।

আবার প্রাচীন পুস্তকে যেমন দেব-দেবীর অর্চনা, বন্দনা ও ভজনার কথা থাকে এ পুস্তকে তেমন কোন কথা পাওয়া যায় না। বরং অনাদি ও গঙ্গা ব্যতীত যে স্থলেই হিন্দু দেব দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া

যায়, সে স্থলেই তাঁহার লাঞ্ছিত ও অপমানিত। ইহাও বৌদ্ধের একেশ্বরবাদ বলিয়া ধরা যায়।

মাণিকচন্দ্রের জী ময়না গোরক্ষনাথের শিষ্য। গুরু গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ তান্ত্রিক বলিয়াই পরিচিত। সুতরাং ময়নাকে বৌদ্ধ না বলিয়া আর কি বলিব? মৃত্যুর সপ্তম দিবসে অষ্টোষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন, একেশ্বরবাদ ও হিন্দু দেব-দেবীর নিন্দা এবং গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ, এই তিনটি ঘটনা হইতে এই ধারণাই বলবতী হইতেছে যে, ময়না ও তাঁহার স্বামী মাণিকচন্দ্র বৌদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না।

পূর্বেই বলিয়াছি, গোবিন্দচন্দ্র গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেই সংকল্প করিয়াছিলেন। বধগণের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

গৃহ ত্যাগ করিতে হইলে রাজকুমারকে কি কি বৈভব ত্যাগ করিতে হইবে, কেই বা তাহা রক্ষা করিবে, মাতা-পুত্রের মধ্যে তাহার আলোচনা হইতেছে। এস্থলে আলোচনার শেষ অংশ উদ্ধৃত কবিতেছি—

“এহি সব এড়ি যাবে আপনে জানিয়া।
নএরান গড় এড়ি যাবে উনশত বানিয়া॥
বাপের মিরশ এড়ি বাইয়ু গোড়র সহর।
দাদার মিরশ এড়ি যাবেক কমলাক নগর॥
তুন্ধি মাএর যত বাড়ী কনিকা নগর।
আন্ধি বাড়ী বান্দিয়াছি মেহারকুল সহর॥
চলিশ রাজাএ কর দেএ আন্ধার গোচর।
আন্ধা হোতে কোন জন আছএ ডাঙ্গর॥”

“চলিশ রাজাএ কর দেএ আন্ধার গোচর”—এই চরণ পাঠে বুঝা যায়, মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের অধীনে ৪০ চলিশ জন সামন্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রকে কর প্রদান করিতেন। তৎকালীন এক জন রাজার পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। কেবল এই কথাটি হইতেই মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের রাজ-গৈভবের একটা আভাস পাওয়া যাইতেছে।

“আন্ধি বাড়ী বান্দিয়াছি মেহারকুল সহর’

এই চরণ পাঠে বুঝা যাইতেছে যে, মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র মেহারকুল সহরে নূতন বাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা মাণিকচন্দ্রও মেহারকুল সহরেই রাজধানী নির্মাণ করাষ্টয়াছিলেন।

✓“মেগারকুলের রাজা মৈল মানিকচান্দ গোসাই” এবং এ কপ আরও ২১৩ টি পদের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মহারাজ মাণিকচন্দ্রের রাজধানী মেহারকুল সহরেই অবস্থিত ছিল। কুমিল্লা হইতে যে রাস্তা দাউদকান্দি গিয়াছে, সেই রাস্তার অল্পমান ১০০ গজ উত্তরে লালমাই পাহাড়ের মধ্যে যে স্থলে লোকে মহারাজ মাণিকচন্দ্রের বাস-ভবনাবধি ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া থাকে, তাহা অতীত মেহারকুল পরগণারই অন্তর্গত। এখন সে স্থানে একটি সরোবর ও উহার চতুর্পার্শ্বে ভূপ্রাণ্ডিত সংখ্যাভীত ইষ্টকপ্রাণি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

“দাদার মিরশ এড়ি যাবেক কমলাক নগর”—

গোবিন্দচন্দ্রের এই উক্তিতে বুঝা যায় “কমলাক নগর” তাহার দাদা অর্থাৎ মহারাজ মাণিকচন্দ্রের পিতার রাজধানী ছিল, এবং গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের কালে সে স্থানে আর রাজধানী বর্তমান না থাকায় মিরশ বলা হইয়াছে। সুতরাং মহারাজ মাণিকচন্দ্রের পিতাকে ‘কমলাক’ নগরের নরপতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এস্থলে একটি অতি পুণ্যতন কথা স্মরণ হইতেছে।

এই ‘কমলাক’ নগর মহারাজ মাণিকচন্দ্রের পিতার রাজধানী; এই কথা প্রাচীন কমলাকের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে।

“কমলাক” শব্দটিকে কমলাক্ষেব সহজ শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে কি ভাষাতত্ত্ববিদ, কি প্রত্নতত্ত্ববিদ কি ঐতিহাসিক, কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তৎকৃত ‘রাজমালার’ এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন “যে সময় যি: ইলিয়ট কুমিল্লাতে জঙ্গ-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সময় এই পর্বত-মধ্যে, “রণবদ্ধ মল্ল” রাজার নামীয় একটি তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছিল। ঐ তাম্রলিপি-

খানি ১১৪১ শকে লিখিত। ইহা পাঠে অবগত হওয়া যায় “রণবন্ধ মল্ল” নামক জনৈক নরপতি কমলাক ও পাটীকারা প্রভৃতি স্থানে রাধ-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন।”

এই তাম্রলিপির উপর নির্ভর করিলে এবং “দাদার মিরাম এড়ি যাবেক ‘কমলাক’ নগর” এই চরণের “কমলাক” শব্দটি কমলাকের সহজ সংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, মহারাজ মাণিকচন্দ্রের পিতাকে নিঃসন্দেহে প্রাচীন কমলাকের শেষ নরপতি বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

“বাপের মিরাম এড়ি যাইমু গোড়র সহর”—গোবিন্দ-চন্দ্রের এই উক্তিহে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, মাণিক-চন্দ্রের সহিত প্রাচীন গোড়ের সম্বন্ধ ছিল, এবং গোবিন্দ-চন্দ্রের সময়ও সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

“বুদ্ধ রাজা পরি মৈল গোড়র গোসাই”—রাজকুমার গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের পূর্বে ‘ভিলকচান্দের’ কতা ময়নামতির এই শোকোক্তি পাঠ করিয়াও এই ধারণাই জন্মিতেছে, এবং ময়নামতির সংলগ্ন “রামপাছ” নামে বর্তমান সময়ে একটি গ্রাম আছে দেখিয়া এই ধারণা আরও বলবতী হইতেছে। তবে কি হুত্রে প্রাচীন কমলাকের সহিত গোড়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এ পুস্তকে কোনও কথা নাই। ভবিষ্যতে আরও ভাল প্রমাণ না পাইলে এ রহস্য উদ্ধার করাও সহজ হইবে না।

মহারাজ মাণিকচন্দ্রকে পূর্বে বোদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি কোন সময় রাজত্ব করিতে-ছিলেন তাহা উল্লেখ করা হয় নাই। অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রকৃত সময় নিরূপণ করিতে যাওয়া সহজ নয়। এই পুস্তকের এবং ২।১ খানা প্রস্তর-লিপির সাহায্যে তাহার কতক আভাস মাত্র দেওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞ শম্ভিহর মহারাজ মাণিকচন্দ্রের অভ্যুদয়-ক্রিয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর বার বৎসর পরে ময়নার সম্ভরণ সম্বন্ধে বিজ্ঞ শম্ভিহর পাক্য দিয়াছেন।

“বার বছর হএ মৈল মানিকচান্দ গোসাই”—ইহা বিজ্ঞ শম্ভিহরের উক্তি। ইহারও প্রায় এক বৎসর কাল পরে গোবিন্দচন্দ্র সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করেন। সুতরাং মহারাজ মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ বার বৎসর ও কতিপয় মাস অতীত হইলে পর গোবিন্দচন্দ্র গৃহ ত্যাগ করেন। গোবিন্দচন্দ্র গৃহ ত্যাগ করিয়া সরিষা নগরে ছাগল চরাইতেন। ছাগলরক্ষকের কার্যে তিনি ১২ বৎসর অতিবাহিত করেন।

“ছাগল রাখএ তেঞি এ বার বছর”—ইহা গোবিন্দ-চন্দ্রের উক্তি। এস্থলে এগার বছর অতীত হইয়া কতিপয় মাস গত একরূপ অনুমান করিলে বার বৎসর কথাটা অর্থ-শূন্য হয় না।

এই দুইটি সময় দ্বারা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর তারিখ হইতে গোবিন্দচন্দ্রের গৃহে প্রত্যাবর্তনের মোট সময় মোটামোটা অবগত হওয়া যায়। এই ভাবে সম্পূর্ণ বার বৎসর ও কতিপয় মাস যোগ করিলে মোটামোটা ২৪ বৎসর পাওয়া যায়।

আবার “তীকুমলয়ের” উৎকীর্ণ শিলা-লিপি পাঠে জানা যায়, রাজেন্দ্র চোল ১০২১ খৃঃ অব্দে ময়নামতির রাজ্য গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন। ১০২১ খৃঃ অব্দ হইতে তৎপূর্বে সম্পূর্ণ ২৪ বৎসর গণনা করিয়া ১০৭ খৃঃ অব্দ পাওয়া যায়।

আবার—“আবার মাসেতে মৈল মানিক চান্দ গোসাই”—এই চরণের অনুসরণ করিয়া ১০৭ খৃঃ অব্দের আবার মাসে মহারাজ মাণিকচন্দ্রের পরলোক গমন ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য-প্রাপ্তি হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়।

ইহার সহিত বার বৎসর কতিপয় মাস যোগ করিয়া ১০০৯ খৃঃ অব্দের শরৎ কি হেমন্ত কাল গোবিন্দ-চন্দ্রের সন্ন্যাসের সময় ধরা যায়। তৎপর আরও সম্পূর্ণ ১১ বৎসর ও কতিপয় মাস যোগ করিয়া ১০২১ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগ গোবিন্দচন্দ্রের গৃহাগমনের সময় নির্দিষ্ট হয়।

এই হিসাবে দেখা যায় গোবিন্দচন্দ্র গৃহে প্রত্যাঘর্ষন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন নাই।

এরূপ অবস্থার রাজেন্দ্র চৌলের সহিত যুদ্ধে জয় লাভের সম্ভাবনা থাকিতেই পারে না।

শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত।

আলোক ও বায়ু এবং স্বাস্থ্য

প্রথমাংশ

(দেবানন্দে পঠিত)

আলোক ও বায়ুকে আমাদের প্রাণস্বরূপ বলিলে কিছুই অত্যাঙ্গী করা হয় না। বায়ুর অভাবে আমরা অতি স্বল্প সময়ও জীবন-ধারণ করিতে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিশ্বাসের সহিত বায়ু হইতে অক্সিজেন বা বায়ু অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করিয়াই আমরা জীবনের ইন্ধন যোগাই। আলোক জগতের তেজস্বরূপ; আলোকের সাহায্যেই সৃষ্টি চলিতেছে।

বায়ু ব্যতীত যখন আমাদের প্রাণ-ধারণ অসম্ভব তখন বায়ু সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা প্রয়োজন। সকল বায়ুই কি জীবনরক্ষক? না, তাহা নহে। কেবল বিশুদ্ধ বায়ুই জীবন রক্ষা করে। বায়ু দূষিত হইলে প্রাণরক্ষা দূরে থাকুক প্রাণ নাশ হয়, বা নানাবিধ ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

বায়ু বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১০০ ভাগ বিশুদ্ধ বায়ুর মধ্যে ৭৯.০২ ভাগ নাইট্রোজেন, ২০.৯৪ ভাগ অক্সিজেন ও প্রায় ০.০৪ ভাগ কার্বনিক এসিড্ গ্যাস আছে।

তাহা ভিন্ন সামান্য জলীয় বাষ্প ও আর্গন, ক্রিপটন, নিওন,

মেটর্গন প্রভৃতি করেকটি পদার্থও আছে। সুতরাং ৫ভাগ

বাতাসের ৪ ভাগই নাইট্রো-

জেন। যদিও এই নাইট্রো-

জেনই সর্বাধিক ভাষাণি উহা

আমাদের বিশেষ কোন উপকারে

আসে না; তবে গুণের মধ্যে এই যে, উহা কোন

অপকারও করে না। উহা বায়ুমধ্যস্থিত অক্সিজেনকে

তরল (Dilute) করিয়া আমাদের নিশ্বাস গ্রহণের

উপযোগী করে এবং উহার দাহিকা শক্তির মুহূর্ত্ত সম্পাদন

করে। কেবল নাইট্রোজেন আমাদের প্রাণ রক্ষণে অসমর্থ।

বায়ুতে যদি কেবল নাইট্রোজেনই থাকিত তবে আমাদের

শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিত। বাকী ১ ভাগের প্রায় পৌনে

ষোল আনাই অক্সিজেন গ্যাস।

বায়ুর মধ্যে যত জিনিস আছে

তাহার মধ্যে ইহাই সর্বাধিক

মূল্যবান। সংসারে যত প্রাণী

আছে ইহা ভিন্ন কেহই বাঁচিতে পারে না। জগতে

যত জিনিস পোড়ে, যত আলো জলে, এক বৈজাতিক আলো

ভিন্ন ইহার অবর্ত্তমানে কিছুই ঘটে না। এই অক্সিজেনের

সাহায্যে শুধু যে কাঠ, কয়লা প্রভৃতি নানাবিধ দাহ্য পদার্থ

পোড়ে তাহা নহে; আমাদের দেহও উহা দ্বারা দ্রুত দগ্ধ

হইতেছে (oxidation). আমাদের শারীরিক উত্তাপ এই

দহন-ক্রিয়ার ফলস্বরূপ। বায়ুতে যদি অক্সিজেন ভিন্ন

অপর কোন উপাদান না থাকিত, তবে আমাদের দেহে

দহন-ক্রিয়া এত দীর্ঘ সম্পন্ন হইত যে, উহা অকালে ক্ষয়

প্রাপ্ত হইত ও আমাদের জীবন-দীপ জ্বলিয়া উঠিতে না

উঠিতেই পুড়িয়া শেষ হইত।

এই অক্সিজেন কখনও কখনও ওজোন আকারে

বায়ুতে থাকে। ওজোনকে

অক্সিজেনের রূপান্তর বলা হইতে

পারে; তিন ভাগ অক্সিজেন মিলিয়া দুই ভাগ ওজোনে

পরিণত হয়। ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র ও ইহার দাহিকা

শক্তি অক্সিজেন হইতে অনেক অধিক। ওজোন

প্রধানতঃ বায়ুতে বস্ত্র-পাতে স্থষ্ট হয়। যে সব স্থানে বায়ু খুব বিস্তৃত ইহা সেই সব স্থানে থাকে। ইহা ঘনীভূত আকারে (concentrated form) নিখাসের সহিত গৃহীত হইলে বা চক্রে লাগিলে ঐসব স্থানের শৈল্পিক ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপাদন করে, কখনও বা সর্দি হয়। অত্যন্ত ঘনীভূত আকারে ইহা গ্রহণের অল্প-বোণী ও ঐ অবস্থায় গ্রহণ করিলে বৃদ্ধাও ঘটতে পারে।

শুধু অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া মানুষ কিছু দিন বাঁচিতে পারে, তবে ক্রমে উহার তাপ হরণ করিয়া শীতল করিতে থাকিলে প্রায় ৪৫ ডিগ্রী ফারেনহেটে পৌঁছবার সময়ই মাদকতা (narcotism) ও অজ্ঞান উপসর্গ দেখা দেয় এবং ক্রমে মৃত্যু ঘটে।

সর্বস্থানের বায়ুতেই কার্বনিক এসিড গ্যাস পাওয়া যায়। ১০০০ ভাগ বায়ুর মধ্যে বায়ুদ্বারক বা কার্বনিক এসিড গ্যাস ইহা ৪ ভাগ মাত্র থাকে। অঙ্গার মাত্রই অক্সিজেনের সাহায্যে দগ্ধ হইয়া কার্বনিক এসিড গ্যাস সৃষ্টি করে। গাছপালা ও জীব জন্তুর পচনেও ইহার সৃষ্টি হয়।

আমাদের প্রাণসের সহিত ইহা নিয়তই বায়ুতে আসিতেছে। রোগে, শ্রমাস্তে, নিদ্রায়, উপবাসে ও আহারান্তে প্রাণসে কার্বনিক এসিড গ্যাসের পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়। এক জন পূর্ণবয়স্ক লোক প্রতি-ঘণ্টায় প্রায় ২০ লিটার আয়তনের কার্বনিক এসিড গ্যাস প্রাণসের সহিত ত্যাগ করে। ইহা হইতে প্রায় ১৬৩ গ্রেণ করলা পাওয়া যায়। সুতরাং প্রতিদিন এক জনের শরীর হইতে প্রাণসের সহিত প্রায় এক পোয়া (১) করলা বাহির হয়। এতটা করলা রোজ আমাদের দেহ-চুল্লীতে অক্সিজেন-সংযোগে দগ্ধ হইতেছে, এবং উহা হইতেই শরীরের যত উত্তাপ, যত তেজ, যত কার্য্যকরী শক্তি—এবং উহা দ্বারাই জীবন চলিতেছে। অধিক মাত্রায় ইহা বায়ুতে থাকিলে বায়ু দূষিত বলিয়া গণ্য হয়।

বায়ুর মধ্যে সর্বদাই কিছু জলীয় বাষ্প থাকে।

জলীয় বাষ্প সমুদ্র, হ্রদ, নদ-নদী, পুষ্করিণী, খাল-বিল, ডোবা প্রভৃতি সমস্ত

জলাশয় হইতেই অলঙ্কিত ভাবে জলীয় বাষ্প অনবরত বায়ুতে সঞ্চারিত হইতেছে। ইহা বায়ুতে ১০০ ভাগের মধ্যে ১ কি ১২ ভাগ থাকে। এই জলীয় বাষ্প না থাকিলে বায়ু গ্রহণের উপযোগী হইত না। ইহার অভাবে বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক হয়; এমন কি শৈল্পিক ঝিল্লী-সমূহের প্রদাহ উৎপাদন করে। ইহার অভাবে জীব-জন্তু, বৃক্ষ প্রভৃতি কিছুই বাঁচে না।

যদি ইহা বায়ুতে বেশী পরিমাণে থাকে তবে বায়ু অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হয়। এবং তাহা হইতে সর্দি, কালী প্রভৃতি নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়।

এই ত গেল বিস্তৃত বায়ুর কথা। আমরা সর্বদা যে বায়ু গ্রহণ করি তাহা কি বিস্তৃত? প্রায়শঃই না। বাজারের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ থাকে। তাহাদের মধ্যে এমোনিয়া, নাইট্রাস ও নাইট্রিক এসিড, দ্ব্যাক্সারক বা কার্বনিক এসিড গ্যাস, অক্সিজেন বা কার্বন মনোকসাইড গ্যাস, অঙ্গার-উদজান বা কার্বরেটেড্ হাইড্রোজেন গ্যাস, সাল্ফিউরাস এসিড, শোধক উদজান বা সাল্ফুরেটেড্ হাইড্রোজেন গ্যাস, সিউয়েজ গ্যাস (Sewage Gas), মার্শ গ্যাস বা জলাভূমির গ্যাস (Marsh Emanations) এবং নানাবিধ ভাসমান দ্রব্যাদি থাকে (Suspended matters)।

বায়ুর মধ্যে যে এই সব জিনিস থাকে তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কাহার কি প্রভাব তাহা জানিতে হইলে ইহাদের আলো-চনা আবশ্যক। সেই জন্তই এই সব কথা একটু অধিক নাড়াচাড়া করিলাম।

বায়ুর মধ্যে যে এই সব জিনিস থাকে তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কাহার কি প্রভাব তাহা জানিতে হইলে ইহাদের আলো-চনা আবশ্যক। সেই জন্তই এই সব কথা একটু অধিক নাড়াচাড়া করিলাম।

এই সকল অতি সামান্য ভাগে বায়ুতে বর্তমান থাকে। এমোনিয়া প্রায়
এমোনিয়া, নাইট্রাস ও
নাইট্রিক এসিড ১০০০০০০ ভাগের মধ্যে ৩
ভাগ মাত্র বর্তমান থাকে।

যে সব স্থানে নাইট্রোজেন যুক্ত উদ্ভিজ্জ বা জাতব পদার্থ পড়ে, সাধারণতঃ সেই সব স্থানে এই সকলের উৎপত্তি হয়। বায়ু হইতে বৃষ্টির জলের সহিত মিশিয়া ইহারা ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে এবং তথায় গাছপালার ধাতুরূপে তাহাদের পুষ্টি বর্দ্ধন করে। এই সকলের, বিশেষতঃ এমোনিয়ার গন্ধ অতিশয় তীব্র। অধিক পরিমাণে নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইলে শ্বাস-রোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। অল্প পরিমাণে গৃহীত হইলে শ্বাস-নালী ও কুসুম্বসের গ্লৈয়িক ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপাদন করে। সাধারণতঃ বায়ুতে ইহা এত কম যে, ইহাতে কোন ক্ষতি হইয় না। কর্মকার প্রভৃতি দ্বারা স্বেদা, রূপা, টিন প্রভৃতি ধাতুঘটিত জিনিসের কাজ করে, তাহারা ঐ সব গলাইবার বা পরিষ্কার করিবার দরুণ নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ারও নাইট্রিক এসিড বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক সময় অসাবধানতা বশতঃ ইহার উগ্র তেজে শ্বাস-রোধ হইয়া কাহারও বা মৃত্যু ঘটে। ইহা হইতে নির্গত ধূমে শ্বাস-নালী ও কুসুম্বসের প্রদাহ হইয়া ঐ সকলের ব্যাধিও উৎপন্ন হয়। শিরোবেদনা, সর্দি প্রভৃতি হইলে আমরা শিশির মধ্যে একরূপ সুগন্ধ উগ্র ঔষধের ভ্রাণ গ্রহণ করি (Smelling salt). উহার প্রধান উপাদানই এমোনিয়া। নানারূপ সুগন্ধ দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া স্মেলিং সল্ট নামে উহা বাজারে বিক্রীত হয়। নাসিকাগ্রভাগে ধরিলে এমোনিয়ার উগ্র গন্ধে সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির চৈতন্য সম্পাদিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, দ্ব্যন্তাকারক গ্যাস ১০০০০ ভাগের
কার্বনিক এসিড গ্যাস মধ্যে ৪ ভাগেরও কম থাকে।
উহা যদি বায়ুতে হাজার করা
১৫ ভাগ থাকে তবে তাহাতে প্রাণীর জীব মৃত্যু হয়।

হাজার করা যদি ১৫ ভাগ থাকে তবে মাথা ধরা প্রভৃতি নানারূপ শিরঃ-পীড়া হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়, এবং দৈহিক অবসাদ আনয়ন করে। খুব বেশীর ভাগ থাকিলে সংজ্ঞা লুপ্ত হয় ও শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

ইহা যদি হাজার করা ১০ ভাগের নীচে থাকে তবে খুব তাড়াতাড়ি কোন অনিষ্ট হয় না। কিন্তু হাজার করা ৬ ভাগের উপরে থাকিলেই উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। কোন জনাকীর্ণ স্থানে গেলে কিরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে যেন কষ্ট বোধ হয়, অধিক ক্ষণ থাকিলে মাথা ধরে এবং অজ্ঞাত উপসর্গ দেখা দেয়। ঐ স্থানের বায়ু পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কার্বনিক এসিড গ্যাস হাজার করা ৬ ভাগের বেশী দাঁড়াইয়াছে। এই যে কষ্ট ইহা সম্ভবতঃ কার্বনিক এসিড গ্যাসের পরিমাণ অধিক বলিয়া নহে, ইহা জৈব জেনের অতাব-জনিত ও আগাদের শরীরের চর্মা দ্বারা হইতে ধর্ম ক্রেন্দ প্রভৃতি যে সব জৈব (organic) পদার্থ বহির্গত হয় তাহার দরুণ। এই জৈব পদার্থ সম্বন্ধে এখনও কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে পৌছা যায় নাই, তবে উহা অতিশয় বিষাক্ত। ইহাতে শরীর দুর্বল, অলস এবং ক্ষুধাহীন করে ও মাথাধরা প্রভৃতি নানারূপ উপসর্গের সৃষ্টি হয়।

কলিকাতার অন্ধকূপ হত্যার বাস্তব ঘটনা বাহাই হউক, উহা অল্প স্থানে বহু লোক একত্রিত হওয়ায় শ্বাস-জনিত কার্বনিক এসিড গ্যাস ও শরীর হইতে নির্গত জৈব পদার্থ-সমূহ দ্বারা বায়ু দূষিত হইয়া সংঘটিত হইবার কথা। লণ্ডনডারী নামক একখানা জাহাজে এক বার অত্যন্ত ঝড়ের সময় প্রায় ২০০ ব্যক্তি ভয়সঙ্কুল হইয়া ১৮ ফিট লম্বা, ১১ ফিট প্রস্থ ও ৭ ফিট উচ্চ একটি কামড়ায় এক রাত্রি যাপন করে। তাহার ফলে পরদিন প্রাতে দেখা গেল যে, ইহার মধ্যে ৮ জন লোক মারা গিয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। কার্বনিক এসিড গ্যাস অল্প মাত্রায় অর্থাৎ হাজারকরা ৬ ভাগের অল্প অধিক উপরে থাকিলেই যে

কোন ক্ষতি হইবে না তাহা নহে। উহা আন্তে আন্তে জীবনী শক্তি ধ্বংস করিবে। দেহ বলহীন ও মন ক্ষুধিহীন করিয়া কর্ণে অক্ষম করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও নৈতিক অবনতিও ঘটবে। যদিও কার্বনিক এসিড গ্যাস বায়ুতে অধিক পরিমাণে থাকিলে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আমাদের প্রাণ বিরোগ হয়, তথাপি ইহাকে প্রকৃত পক্ষে বিধাত্ত বলা যাইতে পারে না। উহা অক্সিজেনের স্থান অধিকার করে বলিয়াই মৃত্যু ঘটে। যদি অধিক কার্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত অধিক পরিমাণে অক্সিজেন দেওয়া যায় তবে বিশেষ কোন কুফল ঘটে না। এ কথাটা বোঝা একান্ত আবশ্যক; কারণ বায়ু দূষিত কি না, শ্বাস-গ্রহণের যোগ্য কি না তাহা জানিতে হইলে বায়ুতে কি পরিমাণ কার্বনিক এসিড গ্যাস আছে আমরা সচরাচর ত্বাহাই দেখিয়া থাকি। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, উহাই যত অনিষ্টের মূল। কিন্তু তাহা নহে। উহার পরিমাণ সহজে লওয়া যায় বলিয়াই উহার পরীক্ষা করা হয়। উহা স্বাভাবিক হইতে বেশী হইলেই বুঝিতে হইবে যে, বায়ুতে অক্সিজেনের ভাগ অত্যন্ত কম হইয়াছে।

কার্বনিক এসিড গ্যাস বায়ু অপেক্ষা অনেক ভারী। এইজন্য ইহা নিম্ন স্থানসমূহে আবদ্ধ থাকে—পর্বতের গুহার, ধনিতে, পুরাতন কূপ প্রভৃতিতে থাকে, সুতরাং ঐ সকল স্থানে নামিবার পূর্বে সাবধানতার আবশ্যক। কার্বনিক এসিড গ্যাস নিজে দাহ্য নহে বা দহন-ক্রিয়ারও সহায়তা করে না। একটি জলন্ত বাতিকে যদি এই এসিড পরিপূর্ণ স্থানে নামাইয়া দেওয়া যায় তবে উহা তখনই নির্ভাপিত হইবে। সুতরাং ঐরূপ স্থান সমূহে যাওয়ার পূর্বে তথায় জলন্ত বাতি নামাইয়া দেখা কর্তব্য উহা জলিতে থাকে কি না। যদি নিবিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, তথায় গেলে প্রাণ-বিরোগ ঘটবে; আর যদি জলিতে থাকে, তবে জীবননাশের আশঙ্কা অনেকটা কম।

কার্বনিক এসিড গ্যাস নিশ্বাস গ্রহণের অল্পপণ্ডিত হইলেও অল্প প্রকারে আমাদের কাজে লাগে। অত্যধিক

চাপ-সংযোগে ইহা সোডা ওয়াটার, লিমনেড প্রভৃতি নানাবিধ মিত্য ব্যবহার্য্য অশেষগুণসম্পন্ন মুখরোচক পানীয় দ্রব্য প্রস্তুতে সহায়তা করে।

কয়লা প্রভৃতি অল্প বায়ু-সংযোগে পুড়িলে ইহার সৃষ্টি হয়। ইহা অত্যন্ত বিধাত্ত। অল্প-অধারক বা কার্বণ মনোক্সাইড গ্যাস হাজারকরা ৫ ভাগ যাত্র থাকিলেই ইহা প্রাণনাশের কারণ হয়। মাথাধরা, মাথাঘোরা, মস্তকের চতুর্দিকে শক্ত একটা বাননের মত, চিন্তার বিপর্য্য ও অন্তবিধ নানা উপসর্গ হয়; বেশীর ভাগ থাকিলে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

শীতকালে অনেক লোকে গৃহে কয়লার আগুন জ্বালাইয়া দরজা জানালা বন্ধ করিয়া নিত্রা যায়। রুদ্ধ গৃহে প্রচুর পরিমাণে কার্বণ মনোক্সাইড গ্যাস সৃষ্ট হইয়া নিদ্রিত ব্যক্তির শ্বাসের সহিত গৃহীত হয়, এবং এই রূপে যার বার শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে অবশেষে মৃত্যু ঘটে। সুতরাং গৃহের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া, বিশেষতঃ ঘরে কয়লা প্রভৃতি জালিয়া, কিছুতেই শয়ন কর্তব্য নহে। আমাদের দেশ অপেক্ষা ইউরোপেই এ সব ঘটনা বেশী হয়, কারণ তদ্দেশে শীতাতিশয্যের দরুণ প্রায় প্রত্যেক গৃহেই অগ্নি জ্বালাইয়া রাখা হয়। অবশ্য ইহার অধিকাংশ স্থানেই চিমনী প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে আগ্নেয় দূষিত পদার্থের বহির্গমনের ব্যবস্থা আছে—কিন্তু তথাপি অনেক সময়েই কার্বণ মনোক্সাইডে মৃত্যুর দুর্ঘটনা খবরের কাগজে পড়া যায়। কিছুদিন পূর্বে প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক জোকার এই রূপে মৃত্যু ঘটে। এ সকলই অসাবধানতার দরুণ ঘটিয়া থাকে।

আমাদের দেশেও যে এরূপ ঘটনা না ঘটে তাহা নহে। অধিকাংশ সময়ে স্ত্রীকা-গৃহেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীকাগারে রাত্রে সাধারণতঃ শীতকালে প্রায়ই কাঠ কিংবা কয়লা জ্বালান হয়, এবং প্রস্তুতি ও নবজাত সন্তানের শরীরে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ইহার ফলে যদিও সব সময়ে মৃত্যু না

ঘটক প্রায়শই জননী ও সন্তান উভয়ের স্বাস্থ্য চিরকালের
মত নষ্ট হয়—সুতরাং এবিষয়ে সকলেরই বিশেষ
সাবধানতার আবশ্যক। আমাদের দেশে শিশুর ও
প্রসূতির উভয়েরই মৃত্যুর হার অত্যধিক, সুতরাং
যাহাতে সূতিকাগারে ভালরূপে বায়ু যাতায়াতের
বন্দোবস্ত থাকে সে বিষয়ে সকলেরই যত্নবান হওয়া
আবশ্যক।

ইহাকে মিথেন বা মার্শ গ্যাসও বলা হইয়া থাকে।

অজার-উদজান বা
কার্বুরেটেড হাইড্রোজেন
গ্যাস

বায়ুতে ইহা অতি সামান্য
পরিমাণে থাকে। ইহা সাধারণতঃ
কয়লা, কেরোসিন প্রভৃতির
খনিতে থাকে—জলা স্থানে

উদ্ভিজ্জ পচিয়াও ইহার সৃষ্টি হয়। অল্প-অল্প থাকিলে
ইহাতে কোন অনিষ্ট করে না, তবে যদি হাজার করা
৩০০ ভাগের উপরে থাকে তবে প্রাণ ন্যশের আশঙ্কা হয়।

ইহা বায়ুতে অতি সামান্য পরিমাণে থাকে, যে সব

সালফিউরাস এসিড

স্থানে অত্যন্ত কয়লা পোড়ান
হয় বা আলোর জন্ত গ্যাস

(coal gas) তৈয়ারি হয় সেই সব স্থানেও পাওয়া যায়।
ইহা মানুষের বিশেষ কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু গাছ-
পালার অনিষ্ট করে।

ইহা অতি দুর্গন্ধ যুক্ত। ডিম পচিলে এই গ্যাসের

শোধক উদজান বা

সালফুরেটেড হাইড্রোজেন

সৃষ্টি হয়। গ্যাসের কারখানা,
রাসায়নিক কারখানা, ও জলা-
ভূমি প্রভৃতির নিকটেও ইহা

থাকে। সাধারণতঃ মানুষের কোন অপকার করে না।
তবে বেশীর ভাগ থাকিলে নানারূপ পীড়া জন্মে।

বিলাতের অধিকাংশ স্থানেই জলনিঃসরণের জন্ত পয়ঃ-

সিউয়েজ গ্যাস

Sewage Emanations.

প্রণালী আছে ও পায়খানার
মলমূত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করিবার
জন্ত নর্দমা আছে। আমাদের

দেশে এ সকলের প্রায়ই সুবন্দোবস্ত নাই। পাকের ঘরের
নিকটে কেন, ভাত, ডাল, তরকারী, ছাই-তাম্বা, গৃহধোত

জল প্রভৃতি কোন জিনিসই বা নিক্ষেপ করা না হয়।
ঐ সব পচিয়া যে ভীষণ দুর্গন্ধ হয় তাহা মনে হইলেও গা
বমি বমি করে।

আমাদের দেশে, বিশেষতঃ যে সব স্থানে ড্রেইনের
পাইখানা নাই সেই সব স্থানে, মল, মূত্র ও জল প্রভৃতি
নিক্ষেপের জন্ত ভিন্ন ব্যবস্থা নাই। সমস্তই এক
এক স্থানে জমা হয় ও তাহা অতি সত্তরে পচিয়া নানারূপ
দুর্গন্ধময় দূষিত গ্যাস সৃষ্টি করে। অধিকাংশ মূত্রভ্যাগের
স্থানগুলি কি দুর্গন্ধময়! আমাদের দেশের অধিকাংশ
পাইখানায়ই নাকে কাপড় দিয়া বাইতে হয়। কিন্তু এ সব
বিষয়ের প্রতিবিধান বিষয়ে অধিকাংশ লোকই
নিশ্চেষ্ট। শুধু মিউনিসিপালিটি ও গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে
সম্পূর্ণ বিধান করিতে পারেন না; আমাদের ব্যক্তিগত
ও জাতিগত চেষ্টাও একুযোগে প্রয়োজন।

এই সব নর্দমা প্রভৃতি হইতে যে সব গ্যাস উঠে,
তাহাদের মধ্যে অক্সিজেনের ভাগ কম ও কার্বনিক
এসিডের ভাগ বেশী থাকে। নানারূপ অজৈব ও
জৈব পদার্থও থাকে। এই দূষিত বায়ু হইতে প্রায়ই
শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্য, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য উদরাম্বল,
শিরঃপীড়া, গলার ভিতরে ষা প্রভৃতি হয়। অনেক সময়ই
এই রূপ স্থানে ডিপথোরিয়া বা গলফাঁস, বিস্ফটিকা বা
কলেরা এবং টাইফয়েড অর প্রভৃতির জীবাণু অতি সহজে
জন্মে এবং বাসগৃহের অতি নিকটবর্তী বলিয়া এই সব
স্থান হইতে সহজে মানুষকে আক্রমণ করে—সুতরাং
এই সব দুর্গন্ধময় পয়খানালাগুলি যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা
বলিবার নহে এবং প্রত্যেক কর্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরই
ইহার শোধন, উপযুক্তরূপে নির্মাণ ও যথারীতি পরিষ্কার
রাখা সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

মার্শ গ্যাস সম্বন্ধে ইতি পূর্বেই বলা হইয়াছে।

মার্শ গ্যাস বা জলাভূমির
গ্যাস।

জলাভূমিতে গাছপালা প্রভৃতি
উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও নানারূপ জাতক
পদার্থ পচিয়া মার্শ গ্যাস ভিন্ন

কার্বনিক এসিড গ্যাস, সালফুরেটেড হাইড্রোজেন,

প্রভৃতি আরও নানাবিধ গ্যাস জন্মে। পূর্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, এই জলাভূমির গ্যাস হইতে লোকের ম্যালেরিয়া হয় কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ঐ সব স্থান মশা প্রভৃতি জন্মিবার অতি প্রশস্ত ক্ষেত্র (মশক বংশের মধ্যে এলোকেলিস জাতীয় মশা দ্বারাই ম্যালেরিয়া বিস্তৃত হয়) বলিয়াই লোকের ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণা ছিল। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ঐ সব দূষিত গ্যাস হইতে মানুষের স্বাস্থ্যহানি হয় ও ম্যালেরিয়া ভিন্নও নানারূপ জ্বরাদি হয় যাহার তত্ত্ব আজিও সম্পূর্ণরূপে হিচরীকৃত হয় নাই। সুতরাং বাসগৃহ এবং নগর নির্মাণ করিতে হইলে এই সব জলাস্থান হইতে দূরে করা কর্তব্য।

দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়া যদি একটি স্বর্য্যরশ্মি ঘরে আসিয়া পড়ে তবে তাহার বায়ুতে ভাসমান দ্রব্যাদি। (Suspended matters) ভিতর অনেক ছোট ছোট কণিকা ভাসিতে দেখা যায়।

প্রায় সর্বস্থানের বায়ুতেই ইহা বর্তমান; তবে পর্ব্বতের শিখরদেশে বা সমুদ্রের দূরতম প্রদেশের বায়ুতে উহা দেখা যায় না। এই ভাসমান পদার্থের কতক অংশ জৈব (organic) এবং কতক অংশ অজৈব, (inorganic) অজৈব পদার্থের মধ্যে ছোট ছোট বালুকণা, ধূলি, কয়লার গুঁড়ি, চূণ, লবণ, তাম্র সীসা, কাঁসা, লৌহ, পিত্তল প্রভৃতি ধাতব রেণু, প্রস্তর জাতীয় জিনিসের গুঁড়া এবং আরও বিবিধ পদার্থ

চূর্ণাবস্থায় বায়ুমাগরে সম্ভরণ করে। এই সব জিনিস অধিক পরিমাণে বায়ুতে থাকিলে চক্ষু, নাসিকা, কণ্ঠনালী, চর্ম্ম, কুস্কুস্, ও অন্ত্র প্রভৃতির ব্যাধি হয়। উহা ঐ সকল কণিকার ঘর্ষণ হইতে হয় (mechanical irritation)। সাধারণতঃ চক্ষু লাল হইয়া

জল পড়ে সর্দি হয়, গলার ভিতরে কাটা কাটা বোধ হয় বা কুস্কুস্ কাশী হয়—নানারূপ চর্ম্মরোগ জন্মে ও ইপাশি, ব্রকাইটিস, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি কুস্কুসের ব্যাধি এবং অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি পেটের

ব্যারাম হয়। যাহারা সর্বদা টিন, পিত্তল, কাঁসা প্রভৃতির কাজ করে—চূণ বা বালুর কাজ করে, হুঁচ নির্মাণ করে, করাত দ্বারা কাঠ চিড়ে, ছুড়ি, কাঁচি শান দেয়, মাস, সিমেন্ট প্রভৃতি তৈয়ার করে তাহাদের প্রায়ই সর্দি, কাশী, ব্রকাইটিস, ইপাশী বা যক্ষ্মা হয়। অত্যন্ত ক্ষুধ চূর্ণিত পদার্থও এই সব ব্যাধি সৃষ্টি করিতে পারে। যাহারা কয়লার খনিতে কাজ করে তাহাদের যে কয়-কাশ জন্মে তাহাকে কলিয়াস থাইসিস (Colliers Phthisis) বলা হইয়া থাকে। উহা ভিন্ন এই সকল কণিকা কণ্ঠনালীর ব্যাধিও সৃষ্টি করে। অনেক সময়ে ইহাই গলার ভিতরে ক্যান্সার (Cancer) নামক ভয়ানক ব্যাধির প্রধীন কারণ।

সীসা, তামা, পিত্তল, কাঁসা প্রভৃতির চূর্ণ পেটের ভিতরে গেলে পেটেবেদনা, অজীর্ণ ও উদরাময় প্রভৃতি হয়।

সীসা হইতে পেটে যে গুরুতর বেদনা রোগের সৃষ্টি হয় তাহাকে লেড কলিক (Lead Colic) বলে। চূণ কয়লা প্রভৃতির গুঁড়া চক্ষুতে লাগিলে চক্ষুর প্রদাহ উৎপাদন করে।

জৈব ভাসমান পদার্থ দ্বারাও বহু ব্যাধির সৃষ্টি হয় এবং উহা অধিকতর অস্বাস্থ্যকর। পাট, শণ, কার্পাস, রেশম প্রভৃতি দ্বারা সর্দি, কাশী, যক্ষ্মা প্রভৃতি হয়।

ইংলণ্ডে একজাতীয় গাছের ফুলের রেণু দ্বারা হে ফিবার (Hay Fever) হয়। আমাদের দেশেও নূতন ধাতের ও আগ্নেয় মুকুলের গন্ধ দ্বারা অনেকের ইপাশি হয়। শাল বৃক্ষের ও গজারী বৃক্ষ সমুদায়ের যখন ফুল হয় তখন সেই সব স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে রোগের মধ্যে জ্বরই প্রধান।

আমাদের দেহ হইতে ক্লেদ, ঘর্ম্ম, চুল, খুঁখু, মল, মূত্র, বীজাণু প্রভৃতি কত জিনিসই প্রতিনিয়ত বাতাসে যাইতেছে। যা প্রভৃতি হইতে পুঙ্ক বা অপর দূষিত পদার্থ যাইয়া অপরের চক্ষু উঠা, ইরিসিপেলাস (Erysipelas) গ্যাংগ্রিন (Gangrene) প্রভৃতি হইতে

পারে। শরীর হইতে খোসা যাইয়া অপরের বসন্ত, জল-বসন্ত, হাঁস, পাঁচড়া, দাঁদ প্রভৃতি হইতে পারে—থুথু শুকাইয়া বা অপরিবর্তিত অবস্থায় যক্ষ্মা উৎপাদন করিতে পারে। মলাদি হইতে টাইফয়েড, কলেরা, উদরাময় প্রভৃতি হইতে পারে। বায়ুতে নানাবিধ বীজাণু থাকে এবং ইহা হইতে নানাবিধ ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

এক লিটার (Litre) বায়ুতে ২০টির বেশী জীবাণু থাকিলেই বায়ুকে দূষিত বলিতে হইবে এবং ব্যবহারের অযোগ্য মনে করিতে হইবে। বায়ু দ্বারা কত সংক্রামক ব্যাধিই না স্থানে স্থানে নীত হইতেছে!

যে সব স্থানে তামা, ক্লোর এবং অক্সিজেন রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হয় সেই সব স্থানে সালফিউরাস, সালফিউরিক ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সালফুরেটেড হাইড্রোজেন, এমোনিয়া প্রভৃতি নানাবিধ গ্যাস সৃষ্ট হইয়া সেই সব স্থানের বায়ু দূষিত করে। কল কি কারখানার রাসায়নিক ও অগ্নি বহুবিধ প্রক্রিয়ায় লোকের নানারূপে স্বাস্থ্য হানি হয়। যে সব স্থানে শব গোড় দেওয়া হয়, শব দাহ করা হয়, নানারূপ আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়, মল-মূত্র নিক্ষেপ হয় কল-কারখানার দূষিত জিনিস পরিত্যক্ত হয় সেই সব স্থানের বায়ু দূষিত ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে হানিকর।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

আমন্ত্রণ

আলোয় ভরা আকাশখানি

ছাপিয়ে, শুধু স্মৃতির বাণী

উছলে পড়ে সারা ভুবন মাঝ ;

‘ছল ছলিয়ে’ ভাবের নদী

এমনি করেই বইছে যদি,

ওরে ও মন, আর রে ধোঁয়ে আঁখি।

আয় রে তবে হৃদয় ভুলে,

সব চুকিয়ে, আপন ভুলে,

বাধন খুলে, কাঁপ দিবি তো আর!

ঢেউগুলি ওই অমন করে’

ডাকছে কারে পাগল ওরে,—

উদাস স্বরে আখির ইসারায় ?

কেমন করে’ আপন মনে

গুমিয়ে র’বে ঘরের কোণে ?

শ্রবণ ভরি’ শোনু রে এখন শোনু—

গগন ছেয়ে, ক্ষণে ক্ষণেই

কাহার লাগি’ এই বিজনেই

আসছে অধীর, আকুল আমন্ত্রণ!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

—o—

বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ *

বৌদ্ধগণের নিকট চৈতন্য পরম পবিত্র। চৈতন্য বলিলে

শুধু মন্দিরকে বুঝায় না, বুদ্ধাদি, স্মৃতি-

চৈতন্য

প্রস্তর, মূর্তি, প্রস্তরোৎকীর্ণ ধর্ম-লিপি

প্রভৃতিকেও বুঝাইয়া থাকে; স্মৃতির

যে সকল মন্দিরাদির ধর্ম-সংস্রব আছে সে গুলিই চৈতন্য।

কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, চৈতন্য মাত্রই

মন্দির নহে।

পবিত্রতায় ধর্ম-মন্দিরাদির মধ্যে বিহার ও স্তুপই

শ্রেষ্ঠ। মঠকেই সাধারণতঃ বিহার

মঠ

বলে। বুদ্ধদেব যে মঠে বাস

করিতেন, এবং যে মন্দিরে অনেক

মূর্তি থাকিত এই উভয়কেই বিহার বলা হইয়া থাকে।

নেপালে ধাতু-স্তূপের আকৃতিবিশিষ্ট আদিবুদ্ধ বা

* রিচ ডেভিড্‌স্, কার্ল বার্গেস প্রভৃতির গ্রন্থ এবং হুয়েন-সাং

ও ফা-হিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে সংগৃহীত—লেখক।

ধ্যানী বুদ্ধগণের উপাসনা-মন্দিরকে চৈত্যা বলে। কিন্তু শাক্য-মন্দির ও অপর সপ্ত মানবী বুদ্ধগণের উপাসনা-মন্দিরকে বিহার বলে।

নেপালী চৈত্যের বর্ণনা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, নেপালে যে গুলিকে চৈত্যা বলে নেপালী চৈত্যা সে গুলি প্রকৃতপক্ষে স্তূপ। স্তূপের যে অংশে পবিত্রাবশেষ রক্ষিত হয় সেই অংশের নাম “ডগোব”। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, পূর্বকালে সমাধি-স্থানের উপর যে মৃত্তিকা-স্তূপ নির্মিত হইত ইহা হইতেই স্তূপের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতেও এইরূপ স্তূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের অনেক স্থানেই স্তূপ আছে। স্তূপগুলির মূলদেশ বৃত্তাকার, এবং কোন কোন স্তূপের চতুর্দিকে সূচ্যগ্র শিকের বেড়া আছে। মূলদেশ বা ভিত্তির উপর একটি বর্তুল বা “ডোম” এবং উর্দ্ধতল ও অধঃশির একটি “পিরামিড” এই বর্তুলের সহিত সংলগ্ন। সংযোগ-স্থানটি মনুষ্যের গ্রীবার ছায়। “পিডামিড্‌টি” ও বর্তুলটি একটি কিংবা উপর্যুপরি অবস্থিত দুইটি ছাতা দ্বারা আবৃত। ছাতাগুলি মালা ও পতাকা দ্বারা ভূষিত। ডগোবগুলিও প্রায় এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট। সিংহল ও নেপালের স্তূপগুলিও এইরূপ, তবে কোন কোন সিংহলী ডগোবের “ডোম”-গুলি জল-বুধুদের আকৃতিবিশিষ্ট হওয়া উচিত এবং উপর্যুপরি তিনটি ছাতা দ্বারা ঢাকা থাকা উচিত। এই সকল “ডোমের” উপর দুই, তিন, পাঁচ, সাত, নয় এবং কখন কখন বা তেরটি ছাতা থাকে। এই সকল ছত্রচ্ছিত পিরামিডের বিভিন্ন অংশ ব্রহ্মাণ্ডের বিভাগ সূচিত করে। বৌদ্ধগণ কোন কোন স্তূপ মেরু পর্বতের অমুকৃতি বলিয়া অনুমান করিয়া থাকে।

সিংহলের মহল প্রাসাদের উপরিভাগে সোপানাবলীর দ্বারা বিভাগ দেখিয়া মনে হয় যে, ব্রহ্ম দেশের জটিল-গঠন স্তূপগুলি ডগোব এবং প্রাসাদের নির্মাণ প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে।

হুয়েন-সাংএর ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে পেশোয়ারের ২০০ গজ উচ্চ প্রকাণ্ড স্তূপ তিন বার ভাঙ্গিয়া যায়। এই স্তূপটিই সর্কাপেক্ষা জটিল-গঠন বলিয়া মনে হয়। মহারাজ কণিষ্কের সময় এই স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। হুয়েন-সাং যখন ভারতে আসেন তখন এদেশে বহুসংখ্যক স্তূপ ও ডগোব বিদ্যমান ছিল। বর্তমান সময়ে ইহাদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

পুঙ্লাবতীর নিকটে মহারাজ অশোক দুইটি স্তূপ নির্মাণ করেন। কথিত আছে সেখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং দেবরাজ ইন্দ্র মহামূল্য প্রস্তর দ্বারা আরও দুইটি স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। হুয়েন-সাং এই অলৌকিক স্তূপ-দ্বয়ের ধ্বংসাবশেষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মহারাজ অশোক ভারতের নানা স্থানে ৮৪০০০ স্তূপ বা বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন।

চৈনিক পরিব্রাজকগণ বলিয়া থাকেন অশোক ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর প্রথমতঃ যে আটটি স্তূপ নির্মিত হয় তাহার সাতটি ভাঙ্গিয়া ফেলেন ও পরে উক্ত ৮৪০০০ স্তূপ নির্মাণ করেন। তিনি একমাত্র রামগ্রামের স্তূপটিই ভাঙ্গেন নাই। পরে ইহার সন্নিকটে ধার্মিক ব্যক্তিগণ বহু স্তূপ ও মঠ নির্মাণ করেন।

স্তূপ সকল যে কেবল ধর্ম্মাচার নামে উৎসর্গীকৃত হইত এরূপ নহে; ধর্ম্ম গ্রন্থের নামেও হইত। সারিপুত্র, স্তূপ মৌদগল্যায়ন ও আনন্দের নামে এবং অভিধর্ম্ম, বিনয় ও সূত্রের নামে অনেক স্তূপ মথুরাতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

কপিলবস্ততে অনেক স্তূপ ছিল বলিয়া অনেকের ধারণা; কিন্তু ফা-হিয়ান বা হুয়েন-সাং কেহই সেই প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই দেখেন নাই। মধ্যযুগে মগধেও বহু স্তূপ বর্তমান ছিল। মহাস্তূপই সিংহলে সর্কাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা ১৫০

গজ উচ্চ এবং অনুরাধাপুরের উত্তরাংশে ভগবান বুদ্ধের চরণ-চিহ্নের উপর নির্মিত। সুবিধাত অভয়গিরি মঠ এই স্তূপের পাশেই নির্মিত হইয়াছিল। ধূপারাম, শিলাতপ প্রভৃতিও সিংহলে অতি বিখ্যাত। সিংহলে বহু প্রাসাদ ও বিহার নির্মিত হইয়াছে সত্য কিন্তু ভারতে ও অন্তর্গত যে সকল স্থানে মহাযান পন্থাবলম্বিগণ কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছে সেই সকল স্থানে স্থপতি বিস্তার বেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে সিংহলে সেরূপ হয় নাই।

বারাণসীর সমীপবর্তী সারনাথের বিহার-মন্দিরাদি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত অবিকৃত ছিল; কিন্তু বর্তমান সময়ে সে গুলি ধ্বংসস্থে পতিত হইয়াছে।

মূর্তি-পূজার পূর্বেই বোধি-বুদ্ধের পূজা প্রচলিত ছিল। এই প্রথা সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে প্রচলিত কোন অনার্য্য প্রথার অনুকরণে প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে। প্রাচীনকালে বোধিবৃক্ষগুলিকে উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করা হইত, কিন্তু বর্তমানে এগুলিকে পরিভোগ চৈতন্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়।

বর্হাটের প্রস্তরশিল্পে বিপশ্চি, কশ্শপ, কোষগমন, ককুসন্ধ, বেষভু এবং শাক্যমুনি প্রভৃতি বুদ্ধগণ যে যে বোধিবৃক্ষের নিম্নে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন সেগুলি অঙ্কিত আছে। শাক্যমুনি যে বটবৃক্ষের নিম্নে সিদ্ধি লাভ করেন সেই বৃক্ষটি এবং ইহার নিম্নস্থ বুদ্ধাসন বা বোধিমণ্ড শিলা-গাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই বৃক্ষের উপরে দুইটি ছাতা এবং শাখার অন্তরালে পতাকা দৃষ্ট হয়। বোধিমণ্ডটি বর্ণাকার প্রস্তর-বেদিকার জায়। মালা হস্তে দুটি সপক্ষ মূর্তি বেদিকার উপরে দুই কোণে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; নিম্নদেশে আরও দুইটি পুরুষ-মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে—কিন্তু এ দুইটি মূর্তি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার। এই দুইটি মূর্তির মুখেই বিশ্বয়ের ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে, এবং একটির পা-ও

মূর্তিকা স্পর্শ করিতেছে না। বৃক্ষটির কাণ্ডদেশ স্তম্ভ-বেষ্টিত, মূলদেশে আসন এবং আসনের সম্মুখে নাতিদীর্ঘ, নাতিস্থ দুইটি মন্থমূর্তি করযোড়ে জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া আছে। ইহাদের একটির পশ্চাতে একটি স্ত্রীমূর্তি ও অপরটির পশ্চাতে নাগরাজ-মূর্তি—নাগরাজের বাহুগল আড়াআড়ি ভাবে রক্ষিত। একটি বোধিবৃক্ষের নিম্নে চারিটি আসনও দেখিতে পাওয়া যায়—বোধ হয় এই চারিটি আসনই পূর্ববর্তী চারি জন বুদ্ধের।

শাক্যমুনির মূল আসন গয়ায় পিপুল বৃক্ষের নিম্নে। সেখানেই পূর্ববর্তী বুদ্ধগণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধগণের বিশ্বাস ভবিষ্যতে আর যে সকল বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিবেন তাঁহারাও এখানেই সিদ্ধিলাভ করিবেন। এই আসনকে বজ্রাসন বলে। জুয়েন-সাংএর সময়ে এই আসনটি ইটের গাঁথুনি করিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে পিপুল গাছটি ভূপৃষ্ঠের ৩০ ফিট উপরে একটি বেদির উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বেদিটির চতুর্দিকেই সিঁড়ি। বোধিমণ্ড বা নর-সিংহাসনকে পৃথিবীর কেন্দ্ররূপে গণ্য করা হয়। কথিত আছে মহারাজ অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা মূল বোধিবৃক্ষের দক্ষিণ শাখাটি সিংহলে লইয়া গিয়া মহামেঘ বনে রোপন করেন।

পূর্বেই ভগবান বুদ্ধের পদচিহ্নের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু স্মৃতি বা আদম-শৃঙ্গস্থ ত্রীপদের জায় নিখ্যাত পদ-চিহ্ন আর নাই। জনশ্রুতি আছে যে, যখন বুদ্ধ সিংহলে আসেন তখন তিনি এক পা অনুরাধাপুরে ও আর এক পা একটি পর্বত-শৃঙ্গে স্থাপন করেন। এই উভয়ের অন্তর ১৫ যোজন। ফা-হিয়ান সিংহলে আসিয়া এই জনশ্রুতি অবগত হন। এই পদচিহ্নকে স্মরণ আদিত্তেব মহেশ্বরের পদচিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করে, মুসলমানগণ আদমের পদচিহ্ন বলিয়া প্রকাশ করে, এবং বৌদ্ধগণ ইহাকেই ভগবান বুদ্ধের পদচিহ্ন বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে। পদচিহ্নটি দৈর্ঘ্যে ৫ ফিট ও প্রস্থে ২½ ফিট।

অনেক প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে এটি একটি অনতিগভীর পর্কত গহ্বর। সারনাথে পূর্ববর্তী বুদ্ধচতুষ্টয়ের পদচিহ্নই বৃহত্তম। হুয়েন-সাং স্বচক্ষে এই পদচিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহা ৫০০ ফিট দীর্ঘ ও ৭ ফিট গভীর। তিনি পাটলিপুত্রের সন্নিকট ভগবান বুদ্ধের যে পদচিহ্ন দেখেন সেটি ইহার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। এই পদচিহ্নের দৈর্ঘ্য মাত্র ১ ফুট ৮ ইঞ্চি ও বিস্তার ৬ ইঞ্চি। সোয়াত নদীর উত্তর কূলে উজ্জান নগরে একটি পদচিহ্ন ছিল। ইহার একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, দর্শকগণের মনো-ভাবানুসারে ইহা তাহাদিগের নিকট ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। ভগবান বুদ্ধ ও মঞ্জুশ্রীর পদচিহ্নকে নেপালীগণ পাছুকা বলিয়া থাকে। বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন বুদ্ধের তায় আকৃতিবিশিষ্ট ও মঞ্জুশ্রীর পদচিহ্ন বর্জমুদিত চক্ষুর আকৃতিযুক্ত। এইটুকু বোধ হয় চক্রের আকৃতি স্মরণ করে। বৌদ্ধগণের মতে পৃথিবীতে অবস্থান কালে ভগবান বুদ্ধ আনন্দের নিকট এইরূপ চারিটি পবিত্র।

পবিত্র ক্ষেত্র

পবিত্র ক্ষেত্রের নামোল্লেখ

করিয়াছিলেন। গয়ার নিকট-

বর্তী বৌদ্ধ তীর্থগুলির সুন্দর বিবরণ ফা-হিয়ান দিয়া গিয়াছেন—এবং পরে হুয়েন-সাং এই বিবরণ গুলির পূর্ণতা প্রদান করিয়াছেন। বারাণসীও গয়ার তায় একটি বৌদ্ধ তীর্থ। বারাণসীতেই বোধিসত্ত্ব ভবিষ্যতে শাক্যমুনিরূপে জন্মগ্রহণ করার দৈববাণী শ্রবণ করেন। আর একটা জনশ্রুতি আছে যে, মৈত্রেয়ও বারাণসীতে এই দৈববাণী শ্রবণ করেন। কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে মৈত্রেয় এখনও ধরাতলে অবতীর্ণ হন নাই, সুতরাং এই জনশ্রুতির মূলে কোনও সত্য নিহিত নাই। আবার কেহ বলেন গৃধ্রকূট পর্কতে শাক্যমুনি ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে মৈত্রেয় স্বর্ণকান্তি শরীর ধারণ করিয়া ধরাতলে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইবেন। পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এই দুইটি জনশ্রুতির বিষয় পড়িয়া মনে হয় যে, চৈনিক পরিব্রাজকগণই ইহাদের সম্বন্ধে

ভুল করিয়াছেন। ইহাতে যে কি গুঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাহা আজিও অবগত হওয়া যায় নাই।

বৌদ্ধগণের মতে কপিলবস্ত্র, গয়া, সারনাথ ও কুশীনগর এই চারিটি প্রসিদ্ধ তীর্থ ক্ষেত্র; ইহা ছাড়া ভগবান বুদ্ধ যে যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন সেই সেই স্থানও বুদ্ধভক্তগণ তীর্থরূপে গণ্য করিয়া থাকেন। প্রাচীন কালে যে রাজ্যতন বুদ্ধের নীচে বুদ্ধ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বুদ্ধ ও সেই আসন পরিভোগ চৈতরূপে পূজিত হইয়া থাকে।

ধর্মচক্র পবিত্রাবশেষের অন্তর্ভুক্ত নহে—এটি একটি পবিত্র চিহ্ন। বৌদ্ধগণ ইহাকে পূজা করিয়া থাকেন। পতাকা-

শোভিত ভগবান বুদ্ধের ধর্মচক্র বর্ষাটের প্রস্তর-শিল্পে প্রদর্শিত হইয়াছে। চক্রটি একটি মন্দিরে রক্ষিত এবং চক্রের উপরে একটি ছাতা। উভয় পার্শ্বে দুইটি পুরুষ মূর্তি, ইহাদের বাহু আড়াআড়িভাবে রক্ষিত। নিম্নদেশে রথাকৃৎ জটনৈক রাজার মূর্তি; রথের চারিটি ঘোড়া। এই ঐতিমূর্তির লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইনি কোশলেখর প্রসেনজিৎ। অত্যাশ্চর্য স্থানের শিলা-শিল্পে চক্রটি একটি উচ্চ স্তম্ভের উপর স্থিত দেখা যায়। সাঁচি, গয়া, ও শ্রবস্তীতে এইরূপ চক্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই চক্র পূর্বে চক্রবর্তীগণের চিহ্ন ছিল, পরে ধর্ম প্রচার কল্পে ইহা বৌদ্ধ ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে।

উপসথ প্রথা বৌদ্ধগণ অত্র সম্প্রদায় হইতে অনুকরণ করিয়াছে। প্রত্যেক পক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দশী বা অমাবস্তা

পর্ক

তিথিতে উপসথ পালনের ব্যবস্থা। সাধারণের মনস্তষ্টির জন্যই বোধ হয় বৌদ্ধ রাজগণ এই প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। সাপ্তাহিক উপসথ ভিক্ষুগণ ও সাধারণ লোক সকলেই পালন করে। প্রতিমাসের চারিটি পর্কদিনের মধ্যে ভিক্ষুগণ দুই দিন প্রতিমোক্ষ অর্জন করেন। মাঝে মাঝে ভিক্ষু সম্প্রদায়ের কোনও বিবাদের মীমাংসা হইলে ভিক্ষুগণের একটি অতিরিক্ত উৎসব হইয়া থাকে। প্রতি-

পরে অষ্টমী এবং চতুর্দশী বা অমাবস্তা সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং নেপালে বৌদ্ধ পর্ব। বোধ হয় ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যার তারতম্য বশতঃই এই পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন। অশোকের পঞ্চম স্তম্ভাঙ্কশাসনানুসারে প্রত্যেক পক্ষের চতুর্দশী এবং অমাবস্তা বা পূর্ণিমাই পর্বদিন। সিংহলে প্রচলিত বৌদ্ধ পর্বদিনগুলি ও মনুসংহিতায় উল্লিখিত পর্বদিনগুলি অভিন্ন।

উপসথ উপবাস ও বিশ্রামের দিন। সে দিন বিছা-লয়, বিচারালয় প্রভৃতি বন্ধ থাকিত। উপসথের দিন পশু ও মৎস্য-শিকার নিষিদ্ধ। পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পবিত্র মনে উপসথ পালন করাই সাধারণ লোকের কর্তব্য। শাস্ত্রোক্ত আটটি বিধি পালন করিলে পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। ধর্মপ্রচার ও ধর্মোপদেশ শ্রবণ উপসথের প্রধান অঙ্গ। প্রাচীন কালে ভিক্ষুগণ উপসথের দিন প্রতিমোক্ষ হইতে কোন কোন অধ্যায় আবৃত্তি করিতেন, কিন্তু বর্তমান সময়ে সিংহলে সাধারণ লোকেরাও গৃহে গৃহে বাইয়া মাতৃভাষায় প্রতিমোক্ষের কোন কোন অংশ আবৃত্তি করিয়া থাকে। নেপালে ভিক্ষুসম্প্রদায়ের লোপ হইয়াছে। সেখানে ধর্মযাজকদিগের নাম বজ্রাচার্য্য। বজ্রাচার্য্যেরা বিবাহিত এবং গৃহস্থধর্মাবলম্বী।

প্রাচীন কালে ধর্ম কার্য্যের জ্ঞ বৎসরকে তিন ভাগে

বার্ষিক পর্ব বিভক্ত করা হইত। প্রতি ভাগে ৪ মাস করিয়া পড়িত।

প্রথম ভাগের আষাঢ়, দ্বিতীয় ভাগের কার্তিক ও তৃতীয় ভাগের ফাল্গুনের পূর্ণিমা তিথিতে পর্কানুষ্ঠান হইত। এক মাস পরে পরে অর্থাৎ শ্রাবণ, মার্গশীর্ষ এবং চৈত্রের পূর্ণিমাও পর্করূপে গণ্য হইত। বৎসরের এই তিন পর্ব বর্ষা, শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর সূচনা করিত। বৌদ্ধগণ ধর্ম কার্য্যের জ্ঞ অজ্ঞাপি একরূপ বর্ষ-বিভাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীন কালের মত পর্কানুষ্ঠানাদি আর আজ কাল দেখা যায় না। সিংহলে প্রচলিত পঞ্জিকার মতে ফাল্গুনের পূর্ণিমায় গ্রীষ্মঋতু আরম্ভ হয়, আষাঢ়ের পূর্ণিমায় বর্ষার সূচনা হয় এবং কার্তিকী পূর্ণিমায় শীতঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে।

আষাঢ়ের পূর্ণিমায় কি শ্রাবণের পূর্ণিমায় বর্ষাবাস (বার্ষিক) বা বর্ষোপনায়িকা আরম্ভ হয়। সিংহলে “বর্ষ” তিন মাস মাত্র।

ভুরুপক্ষের চতুর্দশী কি পূর্ণিমা তিথিতে “প্রবারণা” পর্বের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই দুই দিন উপসথও পালিত হয়। প্রবারণার দিনে ভিক্ষুগণকে দান

দেওয়া হয়, ভোজন করান হয় এবং শোভাযাত্রা বাহির করা

হয়। মথুরাতে ফা-হিয়ান লিখিত প্রবারণা পর্কানুষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রবারণা ‘বর্ষ’ বা বর্ষোপনায়িকার সমাপ্তি সূচনা করে। প্রবারণাস্তে ভিক্ষুগণকে পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়। অন্ততঃ পাঁচ জন সমবেত হইয়া কোন কোন ভিক্ষুর পরিচ্ছদের প্রয়োজন তাহা স্থির করে; পরে অত্যাগ ভিক্ষুগণ সাধারণ লোকের সাহায্যে ভুঙ্গার কাপড়ে পোষাক প্রস্তুত করিয়া পীতবর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকে। এই সকল পোষাক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিতে না পারিলে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা হয়।

বর্ষোপনায়িকা ও প্রবারণা ছাড়া বৌদ্ধগণের আরও কয়েকটি পর্ব আছে। সিংহলী বৌদ্ধগণের ‘অওয়াকুদ’

অওয়াকুদ

নামে একটা পর্ব আছে। বস-স্তের প্রারম্ভে মারের স্মৃতি রক্ষার

জ্ঞ এই পর্বের অনুষ্ঠান হয়। শ্রামদেশে এই পর্বের নাম “সংক্রম” (সংক্রান্তি)। এই পর্ব হিন্দুগণের বসন্তোৎসব, কামদহন, বা হোলির নামান্তর মাত্র।

বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের জন্ম হইয়াছিল। এই তারিখে শ্রামদেশে বৈশাখী পূজা হইয়া থাকে। পূর্বে সিংহলেও হইত। বখন ছুয়েন-সাং ভারতে ছিলেন তখন গয়াতে ভগবান বুদ্ধের নির্বাণ তিথি উপসকেও এক বিশেষ পর্বের অনুষ্ঠান হইত।

আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে সিংহলে এক বিশেষ পর্ব হইত বলিয়া ফা-হিয়ান উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ে ভগবান বুদ্ধের দস্তাবশেষ প্রদর্শিত হইত: বোধ হয় বৈশাখী পূর্ণিমার পর্বই সেই সময়ে অনুষ্ঠিত হইত। এই

বৈশাখী পূর্ণিমাতোই ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়। দিব্যজ্ঞান লাভ হয় ও পরিনির্লীণ প্রাপ্তি হয়।

বৌদ্ধ যুগের গৌরবের দিনে মহাসমারোহে পঞ্চ বার্ষিক বা পঞ্চ বর্ষ-পরিষদের অনুষ্ঠান হইত। ইহার

আর এক নাম মহামোক্ষ পরি-
ষদ। দিব্যাবদান প্রভৃতি গ্রন্থে

এই উৎসবের বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ইহা অনেকটা প্রবারণা পর্বের মত। পঞ্চবার্ষিক উৎসবে দান-কার্যের বড় বাহুল্য ছিল। কাণ্যকুম্ভাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন বা শিলাদিত্য পঞ্চবার্ষিক উৎসব নিয়ম মত মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। তিনি ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণগণকে রাজ-ভাণ্ডারের ধনরত্নাদি সমস্ত দান করিয়া অয়ং ভিক্ষু-বেশে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেন। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এই কথা অবগত আছেন।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

নামিকো

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রতিহিংসা

শিন্‌বাশি টেসনে নামির পীড়ার কথা শুনিয়া চিজি-ওয়ার অধরে যে হাত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অমী-মাংশিত সমস্ত সমাধানের একটা অভাবিত পথ খুঁজিয়া পাওয়ার যে আনন্দ, তাহাই স্মৃতিত করিতেছিল। কাওয়াশিমা ও কাতাওকা, এই দুইটা ঘৃণ্য পরিবারকে সংযুক্ত করিয়াছে নামি! সেই নামির পীড়া—প্রতিশোধ লইবার এমন সুযোগ আর আসিবে না! পীড়াটা ছোঁয়াচে ও মারাত্মক, তাকেও উপস্থিত নাই—সবই তাহার মতলবের অঙ্গুলে! দিধবা ও তাঁহার পুত্রবধূর মধ্যে কেবল দুই একটা কথা বলা—বাস্! বোমা যদি তৎক্ষণাৎ ফাটে ত সে কেবল লক্ষ দিয়া পার্শ্ব সরিয়া যাইবে ও একটা নিরাপদ স্থান হইতে সমস্ত দুর্ঘটনাটা

দেখিয়া লইবে, রক্তাক্ত কলেবরে কেমন তাহার ছটফট করে! প্রতিহিংসার চিন্তা চিজিওয়ার অবসন্ন চিত্ত উৎ-সাহিত করিয়া তুলিল।

সে তাহার মাসীর স্বভাব ভালরূপেই জানিত। তাকেও তাহার উপর যতটা বিরক্ত তিনি যে ততটা নন, এবং তাকেওকে সামান্য বালক জানে তিনি যে অবজ্ঞা করেন ও তাহার উপদেশ সংসারভিত্তিক লোকের উপ-দেশ বলিয়াই গ্রহণ করেন, ইহাও তাহার জানা ছিল। সে আরও বুঝিত মাসীর আত্মীয় কেহ নাই, তরুণ দম্পতির সহিত তাঁহার মত মিলে না, এবং সেই হেতু তাঁহার যতই তেজ থাকুক না, কেহ তাঁহার পক্ষালম্বন করে ইহাই তিনি চাহেন। সেই জন্য মতলবটিকে পাকাইবার জন্য এক পর্দা অগ্রসর হইবার পূর্বেই, সে যে সফলকাম হইবে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না।

সর্বপ্রথমে চিজিওয়া কাওয়াশিমা পরিবারের অবস্থা দেখিবার জন্য ও সে-যে কতটা অন্ততস্ত সেই মিথ্যা সংবাদ রুটাইবার জন্য য্যামাকিকে মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করিত। এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে এক দিন রাত্রে সে শুনিল যে, দুই মাসের চিকিৎসার পরও নামির অবস্থা কিছুমাত্র ভাল নয় ও তাহার উপর মাসীর অসন্তোষ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে। তাকেও অসুস্থিত, কার্য্যগতিকে ভাঙারি তাজাকিও কোথায় গিয়াছিল, এই সুযোগে চিজিওয়া এক দিন কাওয়াশিমার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। বহুদিন সে এ বাড়ীতে আসে নাই। দেখিল মাসী তাকেওর একখানি পত্র হাতে লইয়া চিন্তামগ্নভাবে একাকিনী বসিয়া আছেন।

বিধবা কহিলেন, “কোনো ফল হয় নি, ডাক্তার খরচাও ত কম হ'ল না। দু মাসের ওপর হয়ে গেল কিন্তু সারবার নামটি নেই। কি যে কর'ব কিছুই ত ভেবে পাই না। এক জনের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেও হত, কিন্তু তাকেও এখনও যেন ছেলেমানুষ—”

“মাসী-মা আমি তোমার দুঃখে দুঃখী। আমার এখানে আসা উচিত নয় কিন্তু কাওয়াশিমা পরিবারের

এই মহা বিপদের সময় ত আর চুপ করে থাকি যায় না ! তুমি, তাকেও-সানু আর মেশোমশাই আমাকে কত-আদর যত্ন করেচ সে সব কথা কি আমি ভুলতে পারি ! সেই জন্তেই সাহস করে এসেচি। কি আর বলব মাসী, যন্ত্রার মত এমন ভয়ানক ব্যারাম ত আর নেই। এমন অনেক শোনা গেছে যে, জ্বর কাছে থেকে স্বামীর ব্যারাম হয়েছে, সমস্ত পরিবার লোপ পেয়েছে। তাকে-সানের জন্তে ভারি ভাবনা হয়েছে, তুমি যদি সাবধান না হও ত এ থেকে একটা বিষম কাণ্ড হবে বলে রাখচি।”

“ঠিক কথা বলেচ। আমারও ত তাই ভয়, তাকেওকে জুনি যেতে বারণ করে দিয়েচি। কিন্তু সে ত আমার কথা শুনবে না। এই দেখ না,” (হস্তান্তিত পত্রখানির দিকে দেখাইয়া) “জ্বর কথা ছাড়া আর কিছু নেই। ডাক্তার কি বললে, খাই কি করলে—খালি এই।”

ঈশৎ হাস্য করিয়া চিজিওয়া কহিল, “তা আর কি করবে বল মাসী। স্বামী জ্বীতে ভালবাসার কি কোনো সীমা আছে। পীড়িতা জ্বর প্রতি তাকেও-সানের এই যে যত্ন—এ তো খুব ভালো কথা।”

“তা নয় হ'ল। কিন্তু জ্বর অসুখের জন্তে মার অবাধ্য হওয়া এ কোন্ দেশী কথা?”

চিজিওয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

“কত রকমই দেখলুম! এই সে দিন মনে করলুম তাকেওর বিয়ে বেশ ভালোই হল, তুমিও খুসি হয়েছিলে। কিন্তু কাওয়াশিমা পরিবারে এখন এমন একটা সময় এসেচে যে, ভালো হবে কি মন্দ হবে কিছুই বলা যায় না। ওনামিসানের মা বাপ নিশ্চয়ই তোমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করতেন।”

“হ্যা তা আর করতেন না! দেমাকে গিল্লি একটা সামান্য উপহার নিয়ে দেখা করতে এসেছিলেন! কাতো হ' তিন বার এসেছিল, কিন্তু—”

চিজিওয়া আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

“এ সময়ে আমাদের ঝগড়াটা তার মা বাপের বোকা উচিত। এই রকম ব্যারামি মেয়েকে আমাদের ঘাড়ে

ফেলে দিয়ে চুপ করে থাকেই বা কি করে? জনিয়ার স্বার্থ ছাড়া আর কিছু নেই!”

“নিশ্চয়ই।”

“কিন্তু সব চেয়ে বেশী ভাবনা হচ্ছে তাকেও-সানের জন্তে। আমরা যা বেশী ভয় করচি তা যদি হয় তা হলে কাওয়াশিমা পরিবারের দফা রফা! আর তার ত এ অসুখ হলেই হল। কিন্তু তাদের যখন বিয়ে হয়েছে তখন ত আর তাদের আলাদা রাখতে পার না।”

“ঠিক, ঠিক।”

“মা বাপের কাজ হচ্ছে সব সময়ে ছেলেদের ইচ্ছামত কাজ করতে না দেওয়া। তাদের ভালোর জন্যেই মাঝে মাঝে তাদের চাবুকানো দরকার। গোড়ায় গোড়ায় হয়ত ছেলে ছোকরারা ভারি বেকে বসবে, কিন্তু কিছু দিনের পর মন তাদের আপনাই নরম হয়ে যাবে।”

“তা বটে।”

“সামান্য একটু ভালোবাসা বা দয়ার জন্তে তুমি ত আর কাওয়াশিমা পরিবারের সর্বনাশ কতে পার না।”

“নিশ্চয়ই নয়।”

“আর তার পর যদি সে গর্ভবতী হয় তা হলে—”

“ঠিক কথা।”

তাহার যুক্তিগুলি মাসীমাতার অন্তরে প্রবেশলাভ করিয়াছে বুঝিয়া চিজিওয়ার অন্তর আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ আলোচ্য বিষয়টি বদলাইয়া ফেলিল। সে তাহার মনে যে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে তাহা ত অচিরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, অধিকন্তু সে দেখিতে পাইয়াছে যে বীজ রোপিত হইয়াছে তাহা তখন আচ্ছাদিত থাকিলেও সময়ে তাহা হইতে বৃক্ষ জন্মাইয়া ফুল ও ফল ধরিবে। সে সময় আসিতে অধিক বিলম্ব নাই।

তাকেওর মাতা নিজেকে এমন মন্দ লোক ছিলেন না যে কোনো কারণে নামিকে ঘৃণা করিতে পারেন। তিনি বরং শিক্ষা ও মেজাজের এত পার্থক্য সত্ত্বেও স্বস্তির সহিত একমত হইবার চেষ্টার জন্ত নামিকে এত পছন্দ করিতেন; রুচি সম্বন্ধে কোনো বিষয়ে কখনো তাহাদের

মতের মিল হইলে আনন্দিত হইতেন, এমন কি কখনো প্রকাশ না করিলেও হৃদয়ের অন্তঃতম প্রদেশে এই চিন্তাটি উদ্ভূত হইত, তিনি বালাকালে কোন প্রকারে নামির সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু এক মাসের পীড়ার পর যখন তিনি স্বচক্ষে অসাধ্য রোগাক্রান্ত নামিকে দেখিলেন ও যথেষ্ট অর্থব্যয়ের পরও যখন তাহার স্বত্ব আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন তাঁহার মনে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইল,—তাহা নৈরাশ্র বা বিরক্তি ঠিক বোঝা গেল না। চিন্তা আসিয়া ভাব-টিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিল ও অবশেষে ঘণার প্রবল বজ্রায় তাঁহার সমস্ত সংযম ভাসিয়া গেল।

এদিকে চিজিওয়া দক্ষতার সহিত মাসীমাতার মনের অলিগলির মধ্যে প্রবেশ করিল। মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়া তাঁহাকে স্বমতে আনিবার ক্ষেত্র চেষ্টা করিতে লাগিল। তাকেওর অনুপস্থিতির সময় মাসীমাতার নিকট চিজিওয়ার ঘন ঘন যাতায়াত যখন কানাপুষা হইতে আরম্ভ হইল তখন তাহার প্রধান মতলবটি সিদ্ধ হইয়াছে ও গ্যামাকির সহিত সে ভাবী নাটক রচনার সাফল্যের জন্য এক আনন্দ-উৎসব সম্পন্ন করিয়াছে।

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মতাপূত্র

তাকেও যে যুদ্ধ-জাহাজে কার্য্য করিতেছিল তাহা যে মাসের প্রারম্ভে দক্ষিণে সাসেবো নামক নৌ-বন্দরে ঘাইবে এবং তথা হইতে উত্তরে হাকোদাতের নিকটে সংযুক্ত রণপোতবাহিনীর প্রদর্শনীতে যোগদান করিবে এইরূপ স্থির ছিল। মাসাধিক কাল সেখানে থাকিতে হইবে সেই হেতু এক দিন সন্ধ্যায় সে মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিল।

সম্প্রতি তাকেওর সহিত বিধবার একেবারেই বনিবনাও হইতেছিল না, কানের মধ্যে মক্ষিকা প্রবেশ করিলে লোকের অবস্থা যেমন হয় তাহারও তেমন। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় সে অসাধারণ সন্তোষের সহিত

সহস্রে তাকেওর পরিচর্যা করিতে লাগিল। ছোট-খাট বিষয় লক্ষ্য না করিলেও মাতার এই অস্বাভাবিক প্রীতি দেখিয়া তাকেও উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু যত ব্যঃপ্রাপ্ত হউক না কেন, মাতার ভালবাসা পাইলে যে-কোনো বালক সুখী হয়। মাতার সম্প্রতিকার রূক্ষ মেজাজের উপর এরূপ ব্যবহারে তাকেও বিশেষ করিয়া সুখী হইল। পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া স্নান করিতে করিতে যখন সে রুটির টুপটাপ শব্দ শুনিতেছিল তখন তাহার চিন্তা, গৃহে আসিবার পথে জুশিতে যাহা দেখিয়াছে তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া যখন নামি পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে, সেই সুখের সময় পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। স্নান শেষে তুণ্ডচিহ্নে একটি ডিলে পোশাক পরিয়া দক্ষিণ হস্তের তালু দিয়া কপাল ঘষিতে ঘষিতে তাকেও মাতার কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার অঙ্গুলী মধ্যে একটি জ্বলন্ত চুরট।

বিধবা তখন দীর্ঘনলে ধূম-পান করিতেছিলেন, পরিচারিকা তাঁহার স্বল্পদেশ টিপিয়া দিতেছিল। মুখ তুলিয়া তিনি কহিলেন, “এরি মধ্যে শেষ হ’ল? তোমার দেখলে তোমার বাবা যখন স্নান করে বেরুতেন সেই কথা মনে পড়ে। ঐ খেনে বস। হয়েছে মাৎসু; এখন গিয়ে চা নিয়ে এস।”

বিধবা উঠিয়া কুলঙ্গ হইতে পিষ্টকের রেকাবি-খানি পাড়িলেন। “আমাকে যে অতিথের মত অভ্যর্থনা করুন মা।” চুরট টানিতে টানিতে তাকেও ঈষৎ হাস্য করিল।

“ঠিক সময়েই ফিরেচ, তাকে। তোমার সঙ্গে কথা আছে, দেখা হওয়াটা দরকার হয়েছিল। আসবার সময় তুমি জুশিতে থেমেছিলে?”

সে সদাসর্ব্বদা জুশিতে যায় মাতা ইহা পছন্দ করিতেন না আনিলেও তাকেও তাঁহাকে প্রভারণা করিতে পারেনা।

“হ্যাঁ খানিক ক্ষণের জন্যে। সে ভালো হয়ে উঠচে বোধ হ’ল। তোমাকে ঝড়োটে ফেলেচে সেই জন্যে কত দুঃখ করছিলাম।”

“তাই নাকি?”

তিনি খুব মনোযোগের সহিত তাকেওর মুখ নিরীক্ষণ করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে চা’র সরঞ্জাম আসিয়া পৌঁছিল, বৃদ্ধা সে গুলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, “আপাতত তোমাকে দরকার নেই মাংস। দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দাও।”

নিজের ও তাকেওর জন্য চা ঢালিলেন। এক পেয়লা শেষ করিয়া দীর্ঘ নলটি তুলিয়া ভর্তি করিতে করিতে বলিলেন—

“আমার শরীরের অবস্থা ভারি খারাপ। এই গত বছরের বাতের ত এক রকম মারা যেতে বসেছিলুম। কাল তোমার বাবার সমাধি দেখতে গিয়েছিলুম, এখনো হাড়গুলো ব্যথা করুচে। মনে হয় যেন এক পা কবরে দিয়েচি। খুব সাবধান বাবা তাকে, অসুখ বিষুখ যেন না হয়।

আঙনের বাত্মের মধ্যে চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাকেও মাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। শরীর খুব মাংসল হইলেও তাঁহার কপালে অনেকগুলি রেখা ফুটিয়াছে।

“আমি প্রায় সব সময়েই বাইরে থাকি আর তুমি ছাড়া সংসার দেখবারও কেউ নেই। নামি যদি ভালো থেকে তোমায় সাহায্য করিতে পারতো! সেও সব সময়ে তাই বলে।”

“সে তা ভালো কি হবে? আমি বাপু যক্ষ্মাকে বড় ভয় করি।”

“কিন্তু এখন ত সে অনেকটা ভালো হয়ে উঠেছে। বেশ একটু গরমও পড়ে আসচে, তার বয়সও অল্প, সেয়ে উঠতে পারে।”

“তা হ’লে কি হয়, আমার কিন্তু মনে হয় না সে

শীগগির সেয়ে উঠবে। ডাক্তার বলছিলেন যে, তার মাও যক্ষ্মায় মারা গেসলেন।”

“হ্যাঁ সে আমাকে তাও বলেছে কিন্তু—”

“যক্ষ্মা তো মা বাপের হলে ছেলে পুলেরও হয়, নয় কি?”

“হ্যাঁ তাই শোনা যায় বটে। কিন্তু নামির ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে। সবই সাবধানতার উপর নির্ভর করে। লোকে বলে হোঁয়াচে রোগ—মা বাপের হলে ছেলে পুলের হয় ইত্যাদি; কিন্তু বাস্তবিক অস্ত্র কারণ আছে। তুমি ত জান নামির বাবা কেমন জোয়ান, তারপর নামির বোন ও-কোমাসান্—সেও ত যক্ষ্মার কোনো লক্ষণই দেখায় নি।” ডাক্তারেরা আমাদের যতটা দুর্বল ভাবে আমরা ততটা নই।” তাকেও হাসিল।

“হ্যাঁ, কিন্তু এটু হেসে উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয়।” হাতের উপর ধূমপানের নলটি চুকিয়া পরিষ্কার করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, “আমার মনে হয় এমন ভয়ানক রোগ আর নেই। তোমো পরিবারের কথা জান ত তুমি। যে ছেলেটির সঙ্গে তুমি ঝগড়া করুতে তার মা ২ বছর হ’ল যক্ষ্মায় মারা গেছে। আর তোমো-সান্ নিজে সেই রোগে ছ’মাস হ’ল মারা গেছে। জান ত? তারপর তার ছেলে—ঐ যে কোথাকার ইঞ্জিনিয়ার ছিল—ওনলুম সেও নাকি সম্প্রতি ঠিক ঐ রোগে মারা গেছে। এক জনের থেকে ত তাদের সবাইয়ের হ’ল। এরকম ঘটনা আমি তোমায় আরো অনেক বলতে পারি। আমাদের খুব সাবধান হতে হলে, নইলে ভয়ানক কাণ্ড হবে বলে রাখিচি।” নলটি রাখিয়া দিয়া বিধবা সম্মুখে ঝুঁকিলেন। তাকেও নীরবে শুনিতেছিল, আড়চোখে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন—“তোমায় কিছু বলতে চাই—” একটু ইতস্তত করিয়া তাকেওর উপর দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। “আমি, বুকেচ—”

“কি?” তাকেও মুখ তুলিল।

“নামিকে যদি ডাকিয়ে পাঠান যায় ত কেমন হয়?”

“ডাকিয়ে পাঠান? সে আবার কি?”

বিধবা তাকেওর মুখ হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া কহিলেন
“এই তার বাপের বাড়ীতে যদি পাঠিয়ে দেওয়া যায়।”

“বাপের বাড়ী? সেখানে তার শুশ্রূষা হোক এই
তুমি চাও?”

“হ্যাঁ, শুশ্রূষা হতে পারে; সে যাই হোক তুমি তাকে
পাঠিয়ে দাও।” “কিন্তু তার পক্ষে জুশিই সব চেয়ে
ভালো আয়গা। কাতাওকাদের বাড়ীতে ছেলেপুলে
রয়েছে—আর তার তোকিওতে ফেরাই যদি তোমার ইচ্ছে
হয় ত তার এখানে থাকাই সব চেয়ে ভালো।”

চা শীতল হইয়া গিয়াছিল। তাহা পান করিয়া
বিধবা কহিলেন—তাঁহার স্বর কাঁপিতেছিল—“তাকে
তুমি মাভাল হওনি বোধ হয়। আমার কথা না বোঝবার
ছল করুচ কেন?” তাকেওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
হানিয়া কহিলেন, “আমি বলছিলাম—নামিকে তার
বাপের বাড়ীতে ফেরত পাঠাও।”

“ফেরত? ফেরত পাঠাব? তুমি বলছো তাকে
ত্যাগ করতে?”

“আন্তে! তুমি বড় টেচিয়ে কথা কইচ তাকে!”
কম্পিত পুত্রের দিকে ফিরিয়া তিনি কহিলেন—“ত্যাগ—
হ্যাঁ তাই বটে।”

“ত্যাগ! ত্যাগ! কেন?”

“কেন ভিজেন্স করচ? আগেই ত বলুম, তার ঐ
ভয়ানক রোগের জ্ঞ।”

যজ্ঞা হয়েছে বলে তুমি নামিকে ত্যাগ করতে বলছ?”

“হ্যাঁ, ঠিক তাই—কি করব বল।”

“ত্যাগ!”

তাকেওর হস্ত হইতে চুরুটটি আগুনের মধ্যে ধসিয়া
পড়িয়া প্রচুর ধূমোদগীরণ করিতে লাগিল, হিস্ হিস্ শব্দে
দীপ জলিয়া উঠিল ও নিরাশ বৃষ্টি বাতায়নে ঝাপট
মারিতে লাগিল।

ধূমায়মান চুরুটটি ছাইএর মধ্যে প্রোথিত করিয়া
বিধবা বলিতে লাগিলেন—

“এ কথা শুনে তুমি যে অবাক হয়ে গেছ তা’তে
তোমার দোষ দিই না। কথাটা তোমার কাছে খুবই
আকস্মিক, আশ্চর্য কিন্তু অনেক দিন ধরে ভেবেছি—এই
কথা মনে রেখে শুন্তে হবে। আমি যতদূর জানি তা’তে
নামির এমন কোনো দোষ নেই যাতে আমি বিশেষ করে
অসন্তুষ্ট হতে পারি, আর তুমিও তাকে পছন্দ কর। সেই
জন্তে এমন কথা বলতে আমি মোটেই পছন্দ করি না।
কিন্তু যাই বলি আর যাই কই রোগটা যে ভয়ানক
তা’তে—”

তাকেও বাধা দিয়া কহিল, “আরে সেরে ত উঠছে
সে।” মাতার দিকে স্পর্ধিত ভাবে চাহিল।

“আমি যা বলছি শোন। এখন তার অবস্থা তত খারাপ
না হতে পারে কিন্তু ডাক্তার বলেছে এখন ভালো দেখালেও
ব্যারাম শীগ্গিরই খারাপ হয়ে দাঁড়াবে, বায়ুর অবহার
একটু বদল হলেই এরূপ ঘটবে। যজ্ঞার ব্যারাম কারুরই
একেবারে সারে না—ডাক্তার তাই বলে। আমি
এখন খুব পীড়িত না হলেও এর পরে নিশ্চয়ই
অবস্থা খারাপ হবে আর তোমাকেও ঐ রোগে ধরবে।
তোমার ছেলেপুলে হতে পারে তাদেরও ঐ রোগ হবে।
মনে কর সেই ব্যারামে কেবল আমি নয় বাড়ীর মালিক
তুমি ও তোমার উত্তরাধিকারী সকলেই মারা গেলে!
কাওয়াশিমা পরিবার একেবারে লোপ পেলে! তোমার
বাপ মাধার ঘাম পায়ে ফেলে মিকাদোর বিশেষ অঙ্গুগ্রহে যে
উন্নতি করেছিলেন—যে পরিবারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন
এক পুরুষ যেতে না যেতেই তার সব শেষ হয়ে যাবে!
নামির সঙ্গে খুব সহানুভূতি করা উচিত, তুমি তার জ্ঞ
খুব দুঃখিত, আমি খাণ্ডী হয়ে এমন কথা বলতে একে-
বারেই অনিচ্ছুক—এ সবই সত্য, কিন্তু ভেবে দেখ তার
ব্যাামোটা কী। যতই কেন দুখ্য কর না সে ত আর
বাড়ীর মালিক তুমি বা কাওয়াশিমা পরিবারের সমান
নয়। তোমার বুদ্ধিসূচি আছে, কথাটা বুঝে কর্তব্য
একেবারে ঠিক করে ফেল।”

তাকেও নীরবে শুনিতেছিল। প্রাতঃকালে বাহার

নিকট গিয়াছিল সেই পীড়িতা পত্নীর মূখ তাহার মনের মাঝে দিমের মত অম্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

সে কহিল, “আমার দ্বারা এ কাজ হবেনা, মা!”

“কেন?” তাহার স্বর কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে উঠিয়াছিল।

“এখন এ রকম করলে নামি মারা যাবে।”

“তা যদি যায় ত থাক। তোমার জন্তে, কাওয়াশিমা পরিবারের জন্তে আমার ভাবনা বেশী।”

“আমার জন্তে যদি ভাবো তা হলে আমি যেমন ভাবি তেমনি ভাবো। তোমার হয়ত আশ্চর্য্য বোধ হবে কিন্তু আমি কোনোমতে এ কাজ করতে পারি না। সে ছেলে—মাহুব, সেই জন্তে তোমার সাহায্য করতে পারে না, কিন্তু সে তোমায় আর আমায় দুজনকেই ভালোবাসে, এমন নিরীহ স্ত্রীকে কেবল তার অস্বখের জন্তে কেমন করে ত্যাগ করি? যন্ত্রা সারানো যায় না এমন কোনো কথা থাকতে পারে না। আর সে ত সেরে উঠে। আর সে যদিই মরে তাহ’লে, মা, তাকে আমার স্ত্রী থেকে মরতে দাও। এ রোগে যদি বিপদ থাকে ত আমি তার কাছে যাব না, খুব সাবধান হবো, তুমি যাই বলবে তাই করবো কিন্তু তাকে ত্যাগ করা—প্রাণ থাকতে তা পারবো না।”

“ই্যাঃ! তুমি কেবল নামির কথা বলছ কিন্তু নিজের কথা বা কাওয়াশিমা পরিবারের কথা ভাবছো না।”

“তুমি আমার জীবনের কথাই কেবল বলছ কিন্তু নিষ্ঠুর অজ্ঞায় উপায়ে বেঁচে থেকে কি লাভ? নিষ্ঠুর অজ্ঞায় কাজ করলে কোনো বংশের মঙ্গল হয় না—এতে কাওয়াশিমা বংশের মান বাড়বে না। আমি তাকে ত্যাগ করতে পারি না—কিছুতেই না।”

কোনো না কোনো প্রকার বাধার জন্ত প্রস্তুত থাকিলেও তাকেওর একওঁয়েমি দেখিয়া বিধবা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন ও উত্তেজনাক্রম তাহার মেজাজ সহজেই ভয়ানক রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কপালের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, রূপ দগ্ধ করিতে লাগিল, যে হস্তে ধূমপানের নল ধরিয়াছিলেন সে হাতটিও কাপিতেছিল। ক্রোধ

সংবরণ করিবার জন্ত তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এমন কি হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

“আ—হা! রেগো না। স্থির হয়ে ভেবে দেখ। তুমি এখনো ছেলেমানুষ, সংসারের বিষয় কিছুই জান না। জান ত কথায় আছে—ছোট জন্তকে মেরেও বড় জন্তকে বাঁচাও। নামি হচ্ছে ছোট জন্ত, আর তুমি—কাওয়াশিমা পরিবার—হলে বড় জন্ত। নামির জন্তে, তার মা বাপের জন্তে আমার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু রোগে পড়াটা কি ভাল? তারা আমাদের বিষয় যাই ভাবুক, কাওয়াশিমা বংশ লোপ হতে দেওয়া নয়। তুমি অজ্ঞায় কাজের কথা বলছ, নিষ্ঠুরতার কথা বলছ কিন্তু এরকম ব্যাপার সব জায়গাতেই ঘটবে। স্ত্রী যখন পরিবারের সম্মান বাড়ায় না তখন তাকে ত্যাগ করাই উচিত; তার গর্ভে সন্তান না জন্মিলেও তাকে ত্যাগ করা উচিত এবং তার কোন সংক্রামক ব্যাধি হইলে তাকে ত্যাগ করা উচিত। এইত হ’ল নিয়ম, তা কি তুমি জান না? বিচার বা দয়ার কথা তোলবার দরকার নেই। এরকম সময়ে তাকে ফিরিয়ে নে’বার জন্তে তার মা বাপেরই আসা উচিত ছিল কিন্তু তা যখন তারা করবে না, তখন কি করা উচিত তাদের তা বলতে দোষ কি?”

“তুমি কেবল ‘উচিত’ ‘উচিত’ বলছ কিন্তু অজ্ঞায় অজ্ঞায় করে বলে আমাদেরও অজ্ঞায় করবার কোনো অধিকার নেই। রোগের জন্তে ত্যাগ করা—সে পুরাকালের কথা, এখনো যদি সে নিয়ম থাকে ত তা ভাঙ্গা দরকার, দরকার কেন, আগরা সে নিয়ম ভেঙ্গে দেব। তুমি ভাবছো আমাদের পরিবারের কথা, কিন্তু নামির পরিবার কি ভাববে যখন, যে যেয়ের সে দিন বে’ হয়েছে তাকে কেবল রোগের জন্তে ত্যাগ করা হবে? আর নামি--সেও কি ফিরে যেতে অপমান বোধ করবে না? মনে কর আমারই যদি যন্ত্রা হ’ত, আর ব্যারামটা সংক্রামক বলে তারা নামিকে ফেরত নিতে আসত! তুমি কি তা পছন্দ করবে? কিন্তু কথা একই।”

“না, সে কথা আলাদা। মেয়ে মাহুব পুরুষের সমান নয়।”

হ্যা, সমান। অন্তত অমূল্যব করবার শক্তি হ'লনেরই সমান। কাজের কথা ধরলেও আমি সম্প্রতি ভালো আছি—উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এখন যদি তুমি এমন কর আবার ব্যারাম বেড়ে যাবে। সে মারা যাবে—নিশ্চয়ই মারা পড়বে। যাকে জানি না তার প্রতিও এমন ব্যাভার করতে পারি না। নামিকে কি মারতে বল আমাকে ?”

তাকেও কাদিতে লাগিল।

হঠাৎ পাড়াইয়া উঠিয়া বাড়ীর পবিত্র কুলঙ্গি হইতে একখানি “ইহাই” * পাড়িয়া তাকেওর সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

“শোন তাকেও। আমার কথা তুমি তাচ্ছিল্য করচ, কিন্তু তোমার বাবার সামনে বল ত যা বলছিলে। বল—তোমার পূর্বপুরুষদের আত্মা তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে। বল আবার। অবাধ্য ছেলে ?” তাকেওর প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া তিনি আগুনের বাগ্নের কানায় ধূমপানের নলটি বার বার আঘাত করিতে লাগিলেন। অবশ্যতঃ মাতার প্রতি বিনয়ী হইলেও তাকেওর মুখ কোথায় রক্তিম হইয়া উঠিল।

“অবাধ্য হ'লুম কেমন করে ?”

“কেমন করে ? কেন তুমি জিজ্ঞেস করচ ? জ্বর জ্বরে মার কথা অমান্য করা অবাধ্যতা নয় ? যে শরীর আমি লালন পালন করলুম তার কথা একটু না ভেবে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পূর্বপুরুষের বংশ উচ্ছন্ন দেওয়া অবাধ্যতা নয় ! তুমি অবাধ্য ছেলে, পুত্রের কর্তব্য তুমি কর না !

“কিন্তু মনুষ্য—”

“রাখো তোমার ও কথা। তুমি কি তোমার জীকে মা বাপের চেয়ে বেশী মনে কর ? মুখ্য কোথাকার ! কেবল জী-জী, মা বাপের কথা কি কখনো ভাবো না ?

কুলানারের মুখে আমি ছাড়া আর কথা নেই ! আমার তোমাকে ত্যাগ করব।” তাকেও অধর দংশন করিল, চক্ষু তাহার জল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

“তুমি ত বড় নিষ্ঠুর, মা !”

“নিষ্ঠুর কেন ?”

“তোমার প্রতি এমন মনের ভাব আমার কখনো হয় নি। কিন্তু তুমি আমার মন বোকা কই ?”

“তাহ'লে কেন আমার কথা মত নামিকে ত্যাগ কর না ?”

“কিন্তু—”

“না, ‘কিন্তু’ নেই। দেখ তাকেও তুমি হয় তোমার জীকে না হয় তোমার মাকে ভালোবাস। কি ? নাগি তোমার কাছে বেশী হ'ল ? মুখ্য !”

রাগত ভাবে তিনি ধূমপানের নল দিয়া আগুনের বাগ্নের উপর সজোরে আঘাত করিলেন, নলটি টুকরা টুকরা হইয়া গেল ও নলের মাথাটি ঠিকরাইয়া পর্দার উপর গিয়া পড়িল।

এই সময় পর্দার অপর দিকে কে যেন এক অর্দোচ্চারিত বিষয়-ধ্বনি চাপা দিতেছে শুনা গেল। তারপর কল্পিত কণ্ঠে কে বলিল, “ও—ওনুচেন।”

“কে ? কি চাও ?”

“এই একখানা টেলিগ্রাম”।

পর্দা টানিয়া তাকেওর টেলিগ্রাম দর্শন ও বিধবার ভীষণ দৃষ্টি দেখিয়া তন্ত্র পরিচারিকার অন্তর্দান এই দুই ঘটনার মধ্যে মাত্র দুই মিনিটের ব্যবধান ; কিন্তু এই অত্যন্ত কালের মধ্যে তাহাদের ক্রোধের কতকটা উপশম হইয়াছিল। মাতাপুত্র নির্ঝাঁক হইয়া বসিয়া রহিল।

বাহিরে বৃষ্টি নামিল, ঝম্ ঝম্ ঝম্ !

অবশেষে বিধবার মুখ ফুটিল। চক্ষু দিয়া তখনো ক্রোধের ফুলঙ্গি নির্গত হইতেছিল, কিন্তু কথা কথকিং কোমল ভাব ধারণ করিয়াছে।

“তাকে, আমি তোমার মন করবার জন্তে এমন কথা বলছি না। তুমি আমার এক ছেলে। সংসারে তুমি

* বৌদ্ধ নামাঙ্কিত কাঠকলক। মৃত ব্যক্তির আত্মার হলায়িতক।

উন্নতি কর আর একটি মোটা মোটা নাতির মুখ দেখি এই আমার একমাত্র ইচ্ছে।”

তাকেও গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। অবসর ভাবে মাথা তুলিয়া টেলিগ্রাম খানি দেখাইয়া কহিল, “আমাকে এখনি যেতে হবে, হকুম এসেচে। খুব দেরি করলেও কালকে যাত্রা করতেই হবে। ফিরতে প্রায় মাস খানেক হবে। ফেরা পর্য্যন্ত যেন কখনো এ কথার উল্লেখ কোরো না।”

পরদিন আর একবার নাতীর আখাস-বাণী শুনিয়া ও গৃহ চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নামির উপযুক্ত শুল্কবার জন্ম তাঁহাকে অকুরোধ করিয়া বৈকালের গাড়িতে তাকেও জুশি যাত্রা করিল।

যখন সে অবতরণ করিল সূর্য্য তখন অস্তাচলে ডুবিয়াছে। ঈষন্নীল পাণ্ডুরবর্ণ আকাশে কাস্তুর মত চাঁদ ঝুলিয়াছিল। ক্ষুদ্র নদীর উপরকার পুল পার হইয়া সে একটি রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। রাস্তাটি অন্ধকারময়, দেবদারু কুঞ্জের মধ্য দিয়া আঁকিয়া থাকিয়া গেছে। কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া যখন দেখিল কূপ হইতে জল তুলিবার দণ্ডটি সন্ধ্যাকাশের গায়ে কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত রহিয়াছে তখন সহসা তাহার কর্ণে অপ্রত্যাশিত বীণা-ধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

সে ভাবিল, সে-ই বাজাইতেছে! বোধ হইল যেন তাহার বুক ভাদিয়া যাইবে, তাই সে ক্ষণকাল ফটকের নিকটে দাঁড়াইয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। নামি সেদিন বিশেষ সুস্থ ছিল, পতির জন্ম হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল তাহাই সে বীণার তানে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিল।

নামি-মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিল যে, তাকেওও মনের মধ্যে কিছু একটা রহিয়াছে। তাহার প্রাণের নির্দিষ্ট কোনো উত্তর না দিয়া সে কেবল কহিল গত রাতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপিয়াছিল। সে আসিবে বলিয়া বিশেষ ভাবে আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইয়াছিল। উভয়ে আহার করিতে বসিল, কিন্তু কেহই কিছু খাইতে পারিল না।

ক্ষুদ্র অস্তঃকরণ পাছে প্রকাশ পায় সেই ভয়ে নামি অধরের কোণে একটু নিরানন্দ হাস্য জাগাইয়া পতির কোটে বোতাম আঁটিতে ও তাঁহার পোষাকগুলি সম্বন্ধে আড়িতে ব্যাপৃত হইল। ক্রমে শেষ টেনের সময় নিকটবর্তী হইল। যখন আর থাকা সম্ভব নয় তখন তাকেও যাইবার জন্ম উঠিল। তাহার বাহ ধরিয়া ঝুলিয়া নামি কহিল, “সত্যিই তুমি চলে?”

“শীগ্গিরই ফিরব। সাবধানে থেকে সেরে ওঠ।”

উভয়ের হস্ত দৃঢ়বদ্ধ। দ্বারের নিকট বৃদ্ধা ইকু জুতা আগাইয়া দিল, ভৃত্য মোহেই প্রভুর সহিত টেনে যাইবার জন্ম বাম হস্তে একটি ক্ষুদ্র পলি ও দক্ষিণ হস্তে লণ্ঠন লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

“তা হইলে ইকু তোমার জিমেয় নামিকে রেখে যাচ্ছি। নামি-সানু চলুন।”

“শীগ্গির ফিরো!”

মাথা নাড়িয়া তাকেও সন্মতি জ্ঞাপন করিল। লণ্ঠনের আলোকে দশ বার পদ অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দেখিল। শাদা শাল গায়ে দিয়া ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া নামি কুমাল নাড়িতেছিল।

“শীগ্গির ফিরে এসো!”

“হা! আসুনো। বাইরে ঠাণ্ডা লাগবে। ভেতরে যাও নামি-সানু।” কিন্তু যখন সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ফিরিয়া চাহিল তখনো দেখিল একটি অস্পষ্ট স্বেত মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। তার পর পথটা বেঁকিল, আর সে মূর্ত্তি দেখা গেল না। কেবল আর একবার শুনা গেল সেই অশ্রুসিক্ত প্রার্থনা—“শীগ্গির ফিরে এস।”

নিম্নে, বহুনিম্নে চক্রবালের নিকটে দ্রুত-নিমজ্জমান ক্ষীণ চন্দ্র তখন দেবদারু কুঞ্জের মধ্য দিয়া দেখা যাইতোছিল।

শ্রীহেমমলিনী রায়।

কবি ও ঋষি

১

খুঁজিয়াছি মধু শত ছন্দের খেলে
ভাবের বীণায় গীতি-নিকুণ মাঝে !
খুঁজিয়াছি মধু চিত্র চরিত তলে !
ছায়া ছায়া যাহা মনের নয়নে বাজে !
খুঁজিয়াছি মধু উদ্দাম রস জলে,
শ্রোত উল্লাসে দ্রুতি-দীপ্তির তলে,
আঁচে কটাক্ষে বিজলী-রভসে গলে,
তরঙ্গে ছুটি, তরলিয়া ছলছলে !

২

ভাবের স্বপ্নে এসেছি ভুবন ভ্রমি,
জনে জনে কত সাধিয়াছি পায়ের ধরে,—
গীঠ-আন্তান্য সর্ব এসেছি নমি,—
করমী মরমী স্থপতি কি ভাস্করে !
নাটকে নবেলে দর্শনে ভারতীরে
ফিরিয়া বুরিয়া পরশে এসেছি ঘিরে
জন-অরণ্যে আকুলি-বিকুলি কত !
নির্বাক সম করিয়াছি অবিরত !

৩

খুঁজিয়াছি মধু শানাই নাকড়া খোলে
ভৈরবী বেশে বাহারে সে দেশে দেশে !
টপ্পায় মজ্জি, কাঁশরে, বাঁশরে, ঢোলে
সকল তারেতে কোমল-কড়ির রেশে !
সঞ্চারী ভুলি, অস্থায়ী বিকি-‘কিনি’ ;
দুলেছি আভোগে অন্তরা নাহি চিনি ;
জন মমতায় নানামতি-মন্তরে—
প্রণবে ভুলিয়া বুণী সে ভব ঘুরে !

৪

শাস্তি কোথায়, নির্বৃতি কোথা অহো !
কিসে হই তাহা, এখনো লভিনি যাহা !

না জানি সে কিসে সকল শেষের শেষে
কল্যাণে হিয়া ধামে মূলতানে এসে !
বুঝিয়াছি মধু শুক হিয়ারি মাঝে বিজনে
শুণ্ড বিজনে রহস্ত হয়ে রাজে !
নাচনী গাহিনী হাসনী ভাবিনী হিয়া
মোনের মধু ধরিয়াছে সাপটিয়া !

শ্রীশশক মোহন সেন ।

শিশুর খাদ্যে বিশেষ ব্যবস্থা

বালি ওয়াটার চুনের জল প্রভৃতির ব্যবহার—শিশুর দুধের সহিত সময় বিশেষে বালি ওয়াটার মিশ্রিত করিবার আবশ্যক হইতে পারে। এমন অনেক সময়ে ঘটিতে দেখা যায় যে, দুধ যেই শিশুর পেটে পড়ে অমনি বড় বড় চাপে পরিণত হয়। এই সব ছানার চাপ শিশুর পক্ষে জীর্ণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে ; এগুলি অপরিবর্তিত আকারে মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এরূপ স্থলে দুধের সহিত বালি ওয়াটার মিশাইয়া দিলে পূর্বোক্তরূপ চাপ ধরিতে পারে না, সুতরাং শিশুর কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, বালিতে খেতসার আছে। দুগ্ধপায়ী শিশুর পক্ষে খেতসার উপযুক্ত খাদ্য হইতে পারে না। এই কারণে অনেক শিশুই একবারে বালি ওয়াটার সহ্য করিতে পারে না। ইহাতে উহাদের পেট কাঁপে পাওলা বাহে হয়, শুষ্কের নিকটবর্তী স্থল লালবর্ণ হয়। দুধের সহিত বালি-ওয়াটার মিশ্রিত করিলে জল মিশাইবার আর আবশ্যক নাই। দুধে যতখানি জল মিশাইবার কথা ততখানি বালি ওয়াটার মিশাইলেই কাজ চলিতে পারে। বালি-ওয়াটার কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় অনেকেই তাহা জানেন না। বাজারে দুই প্রকার বালি পাওয়া যায়—এক চূর্ণ বালি আর এক মুক্তার দানার জায় বালি, ইহাকে

পার্ল বালি কহে। এই শেখোক্ত বালিই ভাল এবং ইহাই ব্যবহার করা উচিত। ইহা নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। চা পান করিবার জন্ত যে চামচা ব্যবহার হয় তাহার দুই চামচ পরিমাণ পার্ল বালি লইয়া বেশ করিয়া কয়েক বার ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিয়া লইবে। অতঃপর আড়াই পেয়ালা ঠাণ্ডা জলে বালিগুলি দিয়া এক ঘণ্টাকাল ধরিয়া মূহু জ্বলে সিদ্ধ করিবে, তাহার পর পরিষ্কার জ্বাকড়ায় করিয়া ছাঁকিয়া উহার সহিত এতটা পরিমাণ ঠাণ্ডা জল মিশাইবে যাঁহাতে ২৥ পোয়া হইতে পারে। পার্ল বালি ব্যতীত রবিন্ সনের পেটেন্ট বালি-নামক এক প্রকার চূর্ণ বালি পাওয়া যায়, ইহা অতি শীঘ্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহাঙ্কে ২০ মিনিটের অধিক সিদ্ধ করিবার আবশ্যক কৈরে না।

চূর্ণের জল—দুধের সঙ্গে চূর্ণের জল মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলেও পেটের মধ্যে চূর্ণের বড় বড় চাপ হইতে পারে না, কিন্তু চূর্ণের জলের দোষ এই যে, ইহাতে শিশুর পেট কষিয়া যায়, কোষ্ঠ বদ্ধ হয়। দুধের সঙ্গে চূর্ণের জল মিশাইতে হইলে যতটা জল মিশাইবার আবশ্যক তাহার সিকি বা অর্ধেক পরিমাণ চূর্ণের জল বাকিটি এই জল মিশাইবে। যে সকল শিশুর হাড় মোটা হয় না তাহার পক্ষে চূর্ণের জল উপকারী।

সাইট্রেট অব্ সোডা—যে সব শিশুর কিছুতেই দুধ সহ হয় না তাহাদের দুধের সঙ্গে সাইট্রেট অব্ সোডা নামক ঔষধ মিশাইলে অনেক সময় কল পাইতে দেখা যায়। সাইট্রেট অব্ সোডা মিশ্রিত দুধ পেটে গিয়া মোটেই চাপ বাঁধে না, যদিও বাঁধে তাহা এত সামান্য যে, শিশুর তাহাতে কোনই অনিষ্ট হইতে পারে না। আধ ছটাক দুধে এক গ্রেণ্ কি দুই গ্রেণ্ সাইট্রেট অব্ সোডা দিতে হয়। ইহার অধিক দিলে অপকার হওয়ার সম্ভাবনা। সাইট্রেট অব্ সোডা প্রায় প্রত্যেক ডাক্তার খানায় পাওয়া যায় এবং ইহার দামও বেশী নয়। যে সকল শিশুর গরুর দুধ সহ হয় না তাহাদের মলে বড় বড় ছানার ডেলা

থাকিতে দেখা যায়; কিংবা তাহারা যে দুধ ভুলে তাহার মধ্যে বড় বড় দুধের চাপ থাকে। এরূপ স্থলে সাইট্রেট অব্ সোডা মিশ্রিত দুধ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

শুক দুধ—(Dried milk) **পাক্ত দুধ** (Condensed milk) — শুক দুধের ব্যবহার আমাদের দেশে এখনও প্রবর্তিত হয় নাই, কিন্তু কন্ডেন্সড্ মিল্ক বা গাঢ় দুধ অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। শুক দুধই বল, আর গাঢ় দুধই বল, কোনটাই টাটকা গরুর দুধের সমকক্ষ নহে। যেখানে টাটকা ভাল দুধ পাওয়া যায় সেখানে ইহাদের ব্যবহার না করাই উচিত। তবে যেখানে ভাল দুধ মিলে না সেখানে ইহাদের অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে। শিশুর জন্ত কি করিয়া কন্ডেন্সড্ মিল্ক প্রস্তুত করিতে হয় আমরা এস্থলে, তাহারই কথা বলিব। বাজারে দুই প্রকার কন্ডেন্সড্ মিল্ক কিনিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার দুধে খুব বেশী পরিমাণ চিনি দেওয়া থাকে, আর দ্বিতীয় প্রকার কন্ডেন্সড্ মিল্কে তত বেশী চিনি দেওয়া থাকে না। বলা বাহুল্য শিশুর পক্ষে এই শেখোক্ত প্রকার দুধই ভাল। যতটা কন্ডেন্সড্ মিল্ক লইবে তাহার চারিগুণ জল লইয়া উহার সহিত উক্ত রূপে মিশ্রিত করিবে। তাহার পর উহাতে দুধ, শর্করা ও ক্রীম বা মাখন মিশ্রিত করিবে। মনে কর আধ ছটাক কন্ডেন্সড্ মিল্ক লইয়াছ; তাহা হইলে উহাতে দুই ছটাক জল মিশ্রিত করিবে, এবং চা খাইবার চামচের এক চামচ দুধ শর্করা ও এক চামচ ক্রীম বা মাখন মিশ্রিত করিবে। এক একটি শিশু এমন থাকে যে, হয়ত তাহারা টাটকা দুধ সহ করিতে পারে না; কিন্তু কন্ডেন্সড্ মিল্ক অবাধে সহ করিতে পারে। তথাপি এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, টাটকা দুধ না দিয়া কোন শিশুকে যদি আগাগোড়া কন্ডেন্সড্ মিল্ক খাওয়াইয়া মাতুষ করা যায় তাহা হইলে কিন্তু শিশুটির অনেক রকম রোগ জন্মাইবার সম্ভাবনা।

পেটেণ্ট ফুড—পেটেণ্ট ফুড যে কত রকমের আছে তাহা সংখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলিয়া অনেকেই পেটেণ্ট ফুড ক্রয় করিয়া শিশুদের খাওয়াইয়া থাকেন বটে, কিন্তু স্তম্ভপায়ী শিশুদের পেটেণ্ট ফুড কোন মতেই উপযুক্ত খাদ্য হইতে পারে না। পেটেণ্ট ফুড দ্বারা লোকের যে কি ক্ষতি হইতেছে তাহা আর কি বলিব। ভাল টাটকা গরুর দুধের ফল খুল ভাল, পেটেণ্ট ফুডে তাহা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। ইহাদের দ্বারা অধিকাংশ স্থলেই উপকার দূরে থাকুক বিলক্ষণ অপকারই হইতে দেখা যায়। ইহাদের দ্বারা শিশুর অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ হয়। কোন কোন স্থলে পেটেণ্ট ফুড খাওয়াইয়া শিশুকে বেশ গোল গলে মোটা মোটা হইতে দেখা যায় বটে কিন্তু সে মোটা কোন কাজেরই নয়। শরীরের কতক মেদ বৃদ্ধি হয় মাত্র, মাংস কি হাড়ের কিছুই হয় না; তাই বলিয়া পেটেণ্ট ফুডের যে কোন আবশ্যক নাই আমরা এমন কথা বলিতেছি না। ৮৯ মাসের শিশুকে দুধের সঙ্গে কোমি একটি পেটেণ্ট ফুড খাইতে দিলে অনেক স্থলেই বেশ ফল পাইতে দেখা যায়, কিন্তু শিশুর ৭ মাস বয়সের পূর্বে কদাচ পেটেণ্ট ফুড খাওয়াইতে নাই। সে সময় স্তম্ভ টাটকা দুধই তাহার একমাত্র খাদ্য।

জন্ম হইতে ছয় মাস—ভূমিষ্ঠকাল হইতে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে কিরূপ ভাবে খাওয়ান উচিত, সে বিষয় ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে। কখন কখন এমন হয় যে, শিশু তাহার মাতার দুধ ঠিক সহ্য করিতে পারে না। সাধারণতঃ এরূপ অবস্থা ২৪ দিনের অধিক স্থায়ী হয় না। এসময়ে শিশুকে কতকটা রুয় দেখায় এবং তাহার স্বাভাবিক বাড় বন্ধ থাকে। মাতা যদি এমন বুঝিতে পারেন যে, শিশুর তেমন পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি হইতেছে না, তাহা হইলে তাহার সর্বপ্রথম কাজ শিশুর দেহের অবস্থাটি কিরূপ তাহা নিরূপণ করা। তাহার বমি হয় কি না, সে কিরূপ মল ত্যাগ করে—পাতলা না কঠিন সব্জের না স্বাভাবিক বর্ণ বিশিষ্ট; ইহার

গন্ধ কিরূপ—উহাতে দুধের কুচি আছে কি না—মলের সঙ্গে আম অথবা রক্ত অথবা আম রক্ত উভয়ই মিশ্রিত আছে কি না। এসকল বিষয়ই বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করা আবশ্যক। অনেক সময় পেট কাঁপিয়া শিশু যারপর নাই কষ্ট পায়। সে সময় তাহার পেটটি ফুলিয়া উঠু হয়, থাকিয়া থাকিয়া তাহার আঙ্গুল মুখ ও চোক দুটি কুঁচকাইতে থাকে। এরূপ হইতে থাকিলে শিশুর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেক সময়, এ সকল উপসর্গ তৈম্নন কিছুই নয়—আপনা হইতেই দূর হইতে দেখা যায় বটে কিন্তু স্থল বিশেষে, এগুলিকে কোন একটা ভারী কঠিন রোগের পূর্ব লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। যদি এমন বুঝা যায় যে, শিশু ঠিক মত বাড়িতেছে না, তাহা হইলে সর্বপ্রথমে দেখিতে হইবে শিশু ওঁধু স্তনে মুখ দিয়া থাকে, না রীতি মত টানিয়া খায়। যদি এমন বুঝা যায় যে, শিশুর দুধ গিলিতে কোনরূপ কষ্ট হইতেছে তাহা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসক ডাকাইয়া, উহার মুখের মধ্যটা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

আবার এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, মাতার স্তনে যতটা দুধ জন্মায়, শিশুর পক্ষে হয়ত তাহা বধেষ্ট নয়, কিংবা তাহার গুণ তেমন ভাল নয় সেই কারণে শিশুর দেহ তেমন বর্দ্ধিত হয় না। এরূপ স্থলে ডাক্তার ডাকাইয়া দুধটা পরীক্ষা করা আবশ্যক। ডাক্তার যদি এমন বুঝেন যে প্রসূতির দুধ তেমন ভাল নয়—তাহা হইলে তিনি প্রসূতিকে এমন খাদ্যের ব্যবস্থা করিবেন বাহা খাইলে দুধ নিঃসরণ বৃদ্ধি হয় এবং তাহার গুণেরও উন্নতি সাধিত হয়। প্রসূতিরা যদি অতিরিক্ত জল পান করে তাহা হইলে তাহাদের দুধ খুব বেগী সেজল হয়। সেই দুধ খাইল, শিশুর দেহের তেমন পরিপোষণ হইতে পারে না; এই কারণে প্রসূতিকে অনেক সময় জল খাওয়া একেবারেই বন্ধ করা আবশ্যক হয়। জলের পরিবর্তে তিনি দুধ খাইয়া পিপাসা মিটাইতে পারেন। শুধু দুধ যদি সহ্য না হয়, তাহা

হইলে, তাহার সহিত ভাত, কি রুটী এইরূপ কোন দ্রব্য খাইতে পারেন। কয়েক দিন এই রূপ ভাবে থাকিতে পারিলেই সমস্ত দৌর সংশোধন হইতে দেখা যায়। কোন প্রস্থতি যদি এরূপ ভাবে থাকিতে নিতান্তই অসমর্থ হন অথচ যদি তখন বুঝা যায় যে, তাহার স্তনদুগ্ধ খাইয়া শিশুর দেহের ভালরূপ পরিপোষণ হইতে পারিতেছে না, তাহা হইলে, সুবিধা হইলে, এক জন স্তনদায়িনী খাত্রী নিযুক্ত করা মন্দ নহে। তাহার অভাবে শিশুকে মাই ছাড়াইয়া গাইয়ের দুগ্ধ ধরাইলেও চলিতে পারে।

শিশুর মলে যদি ছানার কুঁচি থাকে, কিংবা ইহার বর্ণ যদি সবুজ হয় তাহা হইলে বিশেষ সাবধানি হওয়া আবশ্যক। যে সকল শিশু কেবল মাইয়ের দুগ্ধ খায়, গরুর দুগ্ধ ঘোটেই খায় না, তাহাদের মল যদি সামান্য একটু সব্জে গাঢ় হয় কিংবা উহার মধ্যে যদি ২১০ টা ছানার ডেলা থাকিতে দেখা যায়, তাহা হইলে তত ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই বটে, কিন্তু যে সকল শিশু মাতৃ-স্তনে একেবারে বঞ্চিত তাহাদের বেলায় ইহা কদাচ উপেক্ষা করিতে নাই। এরূপ স্থলে ইহার কারণ অবিলম্বে দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।

শিশুর মল যদি খুব কঠিন হয়, তাহা হইলে মলদ্বার দিয়া ২১০ ফোটা রক্ত না পড়িতে পারে এমন নয়। এরূপ স্থলে উহাকে ৩০ ফোটা ক্যাস্টর অয়েল ও ৩০ ফোটা অলিভ্ অয়েল একত্র মিশ্রিত করিয়া, একটু দুগ্ধের সহিত খাওয়াইয়া দিবে। মলের সহিত যদি অধিক পরিমাণ আম মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়, তাহা হইলে, চিকিৎসক ডাকা উচিত।

দুগ্ধ তোলা শিশুদের একটা খুবই সাধারণ রোগ বলিতে হইবে। আহ্বারের দোষই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া জানিবে। অনেকে শিশুকে এত ঘন ঘন খাওয়ান, অথবা এত বেশী খাওয়ান যে, বমি করিয়া কতকটা তুলিয়া ফেলিয়া তবে তাহার প্রাণ বাঁচে।

শিশুকে যে দুগ্ধ খাওয়ান হয়, তাহা যদি, তাহার পক্ষে

গুরুপাক হয়—তাহা হইলেও, তাহার বাহ্য হইতে পারে। এ সকল ছাড়া দুগ্ধ তোলার আরও একটি কারণ থাকিতে পারে। আমাদের দেশের জীলোকদিগের কেমন স্বভাব তাহারা শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইয়া, দোলাইতে আরম্ভ করেন; তবু পেটে বাঁকাইতে থাকিলে, বমি হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে?

মাতা যদি বিরোচক ঔষধ সেবন করেন, কিংবা এমন সব খাদ্য খান, যাহা সহজে জীর্ণ হয় না—তাহা হইলে, তাহার স্তনের দুগ্ধ খাইয়া, শিশুরও তরল ভেদ হইতে পারে। এই কারণে, মাতার পক্ষে, অধিক পরিমাণে ফলফলারী প্রভৃতি খাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে

কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া, অনেক শিশু বড় কষ্ট পায়; অনেক সময় শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করা কঠিন হইয়া পড়ে। শিশুর যদি কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে মাতাকে, বেল, পেঁপে, ডুম্বর, কলা প্রভৃতি ফলের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও যদি ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে শিশুকে প্রতিদিন একটুখানি করিয়া অলিভ্ অয়েল্ সেবন করাইবে। ১০১৫ দিনের শিশুকে ৩০৪০ ফোটা অলিভ্ অয়েল্ অবোধে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ২১৪ দিন এরূপ করার পর, যদি তাহার কোষ্ঠবদ্ধ দোষ না যায়, তাহা হইলে, ২১০ দিবস ধরিয়া, শিশুকে দিনে এক বার কি দুই বার করিয়া, এক ঝিলুক পরিমাণ ফ্লুইড ম্যাগনেসিয়া (Fluid Magnesia) নামক ঔষধ সেবন করাইয়া, দেখিতে পারা যায়। অনেক সময়, শিশুকে নিয়ম মত মল ত্যাগের অভ্যাস না করানতেই, তাহার কোষ্ঠবদ্ধ রোগ দেখা দেয়। ৭ দিবস বয়স হইতেই, শিশুকে নিয়ম মত মল ত্যাগ অভ্যাস করাইতে হয়। শিশুর মল যদি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, তাহার পেটের মধ্যে, অনিষ্টকর কোন পদার্থ প্রবেশ করিয়াছে। হয় তো তাহার চুষীতে ময়লা ছিল, নয় তো, তাহার মাতার স্তনের খোঁটাটি যথোচিত পরিষ্কার ছিল না। এত করিয়াও যদি শিশুকে তেমন বড় হইতে না দেখা

যায়, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, মাতৃ-স্তন্য তাহার ঠিক উপযোগী নয়, একরূপ স্থলে, তাহাকে মাই ছাড়াইয়া গাইয়ের দুধ ধরাইতে চেষ্টা করিবে।

উপরে যে সকল উপসর্গের কথা বলা হইল, সেগুলি গো-দুগ্ধে পালিত শিশুর পক্ষে যতটা ভয়াবহ মাতৃস্তন্যে পালিত শিশুর পক্ষে ততটা নহে। মাতৃ-দুগ্ধই শিশুর যথার্থ খাদ্য। শিশু ধেমল বড় হইতে থাকে—মাতার স্তনের দুধেরও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গুণের পরিবর্তন হইতে থাকে। গো-দুগ্ধে যত বড় বড় ছানার ডেলা হয়, মাতৃ-দুগ্ধে তাহা হইতে পায় না। এই সকল কারণে গো-দুগ্ধ খাওয়াইয়া শিশুকে মানুষ করিয়া তোলা অনেক সময় শক্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আজকাল শিশু-পালন বিজ্ঞার এতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, মাতৃ-স্তন্য না খাওয়াইয়াও শিশুকে উত্তম রূপে মানুষ করিয়া, তুলিতে পারা যায়। এ বিষয়ে, এ স্থানে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাইবে। মনে কর, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হইতে শিশুটি দেড় মাস বয়স পর্যন্ত ভালই ছিল—কোন রূপ গোলযোগ বা উপসর্গ এক দিনের জন্তও উপস্থিত হয় নাই। পরে এক দিন দেখা গেল, শিশুটির আহারে যেন তেমন রুচি নাই। সে যাহা খায় বমি করিয়া তুলিয়া ফেলে। তার বাহেটাও হয় তো তেমন সুবিধাজনক নয়; তাহাকে হয় তো কতকটা রুগও দেখাইতেছে। একরূপ স্থলে কি করা কর্তব্য। একটি কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, দেড় মাস বয়সে প্রায় সকল শিশুরই একটু আধটু পেটের গোলযোগ ঘটিতে দেখা যায়। যে সকল শিশু মাতৃ-দুগ্ধে বঞ্চিত, তাহাদের বেলায় তো কথাই নাই। মাতৃস্তন্যপায়ী কোন শিশুর যদি ঐ রূপ পেটের গোলযোগ ঘটে, তাহা হইলে তাহাকে মাই চাটিতে না দিয়া, মাই হইতে দুধ গালিয়া লইয়া, সেই দুধের সহিত জল মিশাইয়া খাইতে দিবে; অথবা অপর কোন প্রস্থতির দুধ খাওয়াইয়া দেখিবে। সময় বিশেষে মাতৃ-দুগ্ধ বন্ধ রাখিয়া, গো-দুগ্ধের সহিত ৫ গুণ জল মিশাইয়া

খাইতে দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। দুগ্ধ নিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রস্তুত করিবে। দুধের সহিত ৫ গুণ পরিষ্কার জল মিশাইয়া উহাতে ১ গ্রেণ সাইট্রেট অব সোডা (Citrate of Soda) দিবে। ইহাতে অনেক স্থলেই সুন্দর ফল পাওয়া যায়। স্থল বিশেষে সাইট্রেট অব সোডা দ্বারা কোনই ফল হইতে দেখা যায় না। শিশুর যদি অনবরত বমি হইতে থাকে, তাহা হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া, চিকিৎসক ডাকা উচিত। এ অবস্থায় অনেকেই শিশুকে, বালি-ওয়াটার (Barley water) ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, বালি-ওয়াটারে বমি বন্ধ না করিয়া বরঞ্চ বৃদ্ধিই করিয়া থাকে। সাইট্রেট অব সোডা ও জল মিশ্রিত দুগ্ধ যে সকল শিশু সহ্য করিতে পারে না তাহাদিগকে পেপ্টোনাইজড্ (Peptonised) দুগ্ধ খাওয়াইলে বিশেষ ফল হইতে দেখা যায়। ফেরার চাইল্ডস্ পেপ্টোজেনিক পাউডার (Fair child's peptogenic powder) নামক ঔষধ দ্বারা দুগ্ধকে পেপ্টো-নাইজড্ (peptonised) করিতে হয়। এ ঔষধটি প্রায় সকল ডাক্তারখানাতেই কিনিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধকে কি করিয়া পেপ্টোনাইজড্ করিতে হয় তাহা পরে বিবৃত হইবে। এইরূপে প্রস্তুত দুগ্ধ প্রায় সকল শিশুই সহ্য করিতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কাহারও একরূপ দুগ্ধও সহ্য না হয়, তাহা হইলে তাহাকে “রূপান্তরিত দুগ্ধ” (modified milk), কিংবা ছানার জল, কি এলবুমেন্ ওয়াটার (albumen water) ব্যবস্থা করিতে হয়। এলবুমেন্ ওয়াটার নিম্ন বর্ণিত ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। একটি ডিম্বের খেতাংশটুকু লইয়া এক পোয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, একটি বোতলে রাখিয়া বোতলটি ছিপিবদ্ধ করিবে; অতঃপর কয়েক মিনিট ধরিয়া উত্তম রূমে ঝাঁকাইয়া লইবে। ইহার সহিত একটু চিনি ও দারুচিনির জল মিশাইতে না পারা যায় এমন নয়। পরিবর্তিত দুগ্ধ (modified milk) সরেই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারা যায়। এক মাস অথবা দেড় মাসের শিশুর উপযোগী করিতে হইলে, উহাতে শতভাগা ১ অংশ

কেসিন (Casein) অর্থাৎ ছানার ভাগ, শতকরা ২ অংশ ল্যাক্ট এলবুমেন (lact albumen) ও শতকরা ১২ ভাগ মাখন (fat) এবং শতকরা ৬ ভাগ শর্করা (sugar of milk) থাকে আবশ্যিক। বলা বাহুল্য স্বাভাবিক দুধে ঐ সকল দুধ উপরি উক্ত পরিমাণে থাকে না। স্বাভাবিক দুধে কোন উপাদানটি কি পরিমাণে আছে, তাহা ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে। এক ছটাক পরিবর্তিত (modified) দুধের সহিত সামান্য একটু চূণের জল মিশাইয়া অগ্নিতাপে ফুটাইয়া লইলে এক মাস, দেড় মাস বয়সের শিশুর একবারেকার মত খাদ্য প্রস্তুত হয়। ইহা শিশু অতি সহজেই জীর্ণ করিতে সমর্থ হয়। ইহা খাইয়া শিশুর পেট যদি বেশ ভাল থাকে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উহাতে মাখন (fat) ও কেসিন (casein) এর মাত্রা বাড়াইতে থাকিবে। শিশুকে দিন কয়েক এই দুধ খাওয়াইয়া রাখিলে, তাহার সর্বপ্রকার পেটের দোষ সংশোধিত হইয়া যায়। ইহার পর গাইয়ের দুধ দিলে সে অবাধে তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয়। মনে কর কোন শিশুর পরিবর্তিত দুধও (modified milk) সহ্য হইতেছে না, সে স্থলে কি করা কর্তব্য। সেরূপ স্থলে দেড় ঘণ্টা অন্তর তাহাকে আধ ছটাক করিয়া ছানার জল (whey) দিয়া রাখিবে। এ কথা অবশ্য খুবই ঠিক যে, শুধু ছানার জলে শিশুর দেহের ঠিক পুষ্টি-সাধন হয় না। শুধু ছানার জল খাওয়াইয়া রাখিলে শিশুর দেহের ওজন কতকটা কমিয়া যায়। তা বলিয়া আর উপায় কি আছে? সে যে অল্প কোন খাদ্য মোটেই জীর্ণ করিতে পারে না। তাহার জীবন লইয়া যে টানাটানি পড়িবার মত হইয়াছে।

দুই চার দিন ছানার জল দিয়া রাখিলে তাহার পেট ঠিক হইয়া যায়। তাহার পর একটু একটু করিয়া খাঁটি দুধ দিলে সহজেই সহ্য হইতে দেখা যায়। ছানার জল খাওয়াইয়া শিশুর পেট ঠিক হইলে, একবারেই খাঁটি দুধ দিতে নাই। ৮-১০ দিন ধরিয়া উহাকে পেপটোনাইজড (peptonised) দুধের উপর রাখিতে হয়। দুধকে কি

করিয়া পেপটোনাইজড করিতে হয়, সে বিষয় এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম কয় দিন দুধকে অর্ধ ঘণ্টা ধরিয়া পেপটোনাইজড করিবে; পরে দিন দিন কমাইতে কমাইতে উহা ৫ মিনিটে দাড় করাইবে। তাহার পর খাঁটি দুধ ধরাইবে। দুধকে পেপটোনাইজড (peptonise) করিতে হইলে ফেয়ার চাইলড্‌স্ পেপটোজেনিক মিল্ক পাউডার (Fair child's, peptogenic milk power) নামক ঔষধটি সংগ্রহ করা আবশ্যিক। ইহা ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ যে দুধকে পেপটোনাইজ করা আবশ্যিক তাহার সহিত সমপরিমাণ জল মিশাইবার আবশ্যক হয়। কিন্তু যে স্থলে শিশুর পেটের অবস্থা খুবই খারাপ, সেখানে এক ভাগ দুধের সহিত ৩৪ ভাগ জল মিশাইতে হয়। মনে কর ৩ ছটাক দুধকে পেপটোনাইজড করিবে, তাহা হইলে ঐ দুধের সহিত অন্ততঃ পক্ষে ৭ ছটাক জল মিশাইবে এবং পেপটোজেনিক পাউডার (peptogenic powder) মাপ করিবার জন্য যে একটি করিয়া ক্ষুদ্রাকার বাটি থাকে, সেট বাটিটি পূর্ণ করিয়া এক বাটি ঔষধ চূর্ণ লইবে। এই কয়টি জিনিস একটি পরিষ্কার পাত্রে উত্তম করিয়া মিশাইতে থাকিবে। ইহার পর অগ্নিব তাপে ফুটাইতে থাকিবে এবং বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে।

শিশুর পেটের অবস্থা বুঝিয়া অর্ধ ঘণ্টা হইতে ৫ মিনিট কাল ধরিয়া এই ঔষধটি যত তাপে ফুটাইবার আবশ্যক হয়। পেপটোনাইজড মিল্ক বেশী দিন ধরিয়া খাওয়াইতে নাই তাহাতে শিশুর স্কার্ভি (scurvy) নামক রোগ দেখা দিতে পারে।

ছানার জল (whey) নানা উপায়ে প্রস্তুত হইতে পারে। ফুটন্ত দুধে লেবুর রস দিলে ছানা বাধিয়া যায়। দুই পুরু ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া লইলে, দিব্য ছানার জল প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া রেনেট হোয়ে (rennet whey) ও হোয়াইট ওয়াইন হোয়ে (white wine whey)

নামক আরও দুই প্রকার ছানার জল ডাক্তার মহাশয় গণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাদেরও প্রস্তুত প্রণালী এখানে প্রদত্ত হইল।

রেনেট হোয়ে (rennet whey) নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। দশ ছটাক খাঁটি দুধ অগ্নি-তাপে ফুটাইয়া লইয়া একবাশি এনামিলের ডিসে, অথবা মাটি কি পাথরের থালায় রাখিয়া, উহাতে এক চামচ রেনেট (rennet) নামক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া উত্তম রূপে নাড়া চাড়া করিবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত দুধ চাপ বাধিয়া জমিয়া যাইবে। চাপ বাধার পর দশ মিনিট কাল রাখিয়া দিবে; তাহার পর রূপার ছুড়ী অভাবে বাশের চটা তুলিয়া, তাহার দ্বারা বরফির আকারে কাটিতে থাকিবে। এই সব বরফির গা হইতে এক রকম পাতলা, হলুদে রঙের রস নির্গত হইতে থাকিবে। এই রসই রেনেট হোয়ে নামক ছানার জল। পরিষ্কার নয়ানশুক কাপড়ে করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া শিশুকে খাইতে দিবে। ১০ ছটাক দুধ হইতে প্রায় ছয় ছটাক ছানার জল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ইহা খাইয়া শিশুর পেটের দোষ সংশোধিত হইলে, উহার সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে খাঁটি দুধ মিশাইয়া দেখিতে পারা যায়। ছানার জলের সহিত দুধ মিশাইতে হয়; ইহা না করিলে দুধটা জমাট ধরিয়া ছানা হইয়া যায়। সর্বপ্রকার রেনেট (rennet) এর মধ্যে বেন্জার্স রেনেট (Benger's rennet) নামক রেনেটই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। ছানার জল অবশ্য দুধের মত পরিপোষক নহে। ইহাতে ল্যাক্টো এলবুমেন (lacto albumen) দুগ্ধশর্করা (sugar of milk) এবং অতি সামান্য পরিমাণে কেসিন (casein) ও মাখন (fat) বিস্তারিত থাকে। দুধের অধিকাংশ মাখন ও কেসিন ছানার মধ্যে থাকিয়া যায়। অবস্থাবিশেষে শিশুকে দুই কাছা হইতে ২ ছটাক পরিমাণে অর্ধঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে পারা যায়।

হোয়াইট ওয়াইন হোয়ে (White wine whey) নিম্নলিখিতরূপে প্রস্তুত করিতে হয়। ৫ ছটাক পরিমাণ দুধ একটি এনামেল-পাত্রে করিয়া আগুনে চড়াইয়া দিবে—ফুটিতে আরম্ভ করিলেই নামাইয়া লইয়া, উহাতে এক ছটাক দেড় ছটাক কুকিং শেরী (Cooking sherry) নামক মত্ত মিশ্রিত করিয়া পুনরায় ফুটাইয়া লইবে। তিন মিনিট রাখিয়া দিলে সমস্ত দুধটা ছানার পরিণত হইবে। অতঃপর নয়ানশুক কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলেই ছানার জল পাওয়া যাইবে। নয়ানশুক কাপড়-খানি জলে সিদ্ধ করিয়া, শুকাইয়া লওয়া আবশ্যক। এই ছানার জলটিতে কিঞ্চিৎ মত্ত থাকায়, উত্তেজক ঔষধেরও ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহা বমি হইয়া উঠিয়া যায় না। দেড় মাসের শিশুকে অবাধে দুই কাছা পরিমাণে আধ ঘণ্টা অন্তর দিবসে ৭৮ বার দিতে পারা যায়।

অনেকের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, দুধের মধ্যে কেসিন (casein) ও মাখন (fat) কমাইবার জন্য আমাদের এত কষ্ট কেন—আর দুগ্ধ-শর্করা ও ল্যাক্টো এলবুমেন (lacto albumen) কমাইবার জন্য কোনই চেষ্টা নাই কেন? তাহার এক মাত্র কারণ এই যে, দুধের মধ্যে কেসিন ও মাখনই শিশুর সহ্য হয় না। ল্যাক্টো এলবুমেন ও দুগ্ধ-শর্করা সকল অবস্থাতেই সহ্য হয়। ইহাদের দ্বারা কদাপি শিশুর পেটের গোলযোগ উপস্থিত হয় না। দুধকে পেপ্টোনাইজড (peptonised) করিলে, উহার মধ্যে ছানার পরিমাণ কমে না বটে, কিন্তু উহার অবস্থার এমন পরিবর্তন সংঘটিত হয় যে, শিশুর হৃদয়ল পাকাশয়েও উহা অনায়াসে সহ্য হয়।

ব্রীজানেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চি।

সোনাকান্দার দুর্গ

বিজিরপুরের বিখ্যাত ভূঞা ঈশা খাঁ মসনদ আলি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পূর্ববঙ্গে মগ ও আরাকান-বাসীদের দৌরাড্য নিবারণার্থ শীতললক্ষ্যা ও ধলেশ্বরীর সংযোগ স্থলে সোনাকান্দার দুর্গ (ত্রিবেণী) নির্মাণ করেন। তখন এই দুর্গের পাদদেশ ঘেঁষে করিয়া শীতললক্ষ্যা নদী প্রবাহিত হইত; কিন্তু এখন উহা বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে।*

দুর্গ এখন আর বিদ্যমান নাই, শুধু কতকগুলি ভগ্নাবশেষ ঈশা খাঁর কীর্তি—স্তম্ভের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান আছে। যে সব ইতিহাসে এই দুর্গের উল্লেখ আছে তাহাতে ইহার সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না; সূত্রান্ত ইহার সীমা ও পরিধি নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়।

এই দুর্গ সম্বন্ধে প্রচলিত জনপ্রবাদ হইতে জানা যায় যে, ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে † ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ সোনাবিবি (চাঁদ রায়-কেদার রায়ের বিধবা ভগ্নী। ডাক্তার জেমস ওয়াইজ বলেন ‘ঈশা খাঁ বল প্রয়োগে চাঁদ রায়ের একমাত্র কন্যা স্বর্ণময়ীকে লইয়া গিয়া বিবাহ করেন।’) রাজনৈতিক ব্যাপারে সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। ঈশা খাঁর বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের সহিত খুব সদ্ভাব ছিল। এক সময়ে ঈশা খাঁ কেদার রায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

* This fort is situated at the junction of the Lakhya and Dhulleswari rivers. It stands opposite Naraingunje on the east side of the Lakhya river. It is one of the 3 forts built for the purpose of repelling the invasions of the Mughls and Arakanese. It is a level quadrangular space measuring 296' x 190' surrounded by a wall of brick work 10 feet in height with inner and intermediate bastions and a raised out-work on the western face. The wall is loop-holed for 3 feet from the top, the bottom being built solid. It is only 3½ feet thick. P. 208—A list of Ancient Monuments in Bengal.

† আইন আকবরী Vol. I.—পৃ: ৩৪০।

অণ্ডত যুদ্ধে ঈশা খাঁ মিত্ররাণের বিধবা ভগ্নী সোনামনিকে দেখিতে পাইয়া তাহার রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রূপযুক্ত ঈশা খাঁ বিজিরপুরে প্রত্যাগমন করিয়া স্বর্ণময়ীকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য মিত্ররাণের নিকট দূত প্রেরণ করেন। এই অন্তর প্রস্তাব হিন্দু রাজার নিকট কি ভাবে গৃহীত হইয়াছিল তাহা বলা নিশ্চয়োক্ত। এই অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া কেদার রায় ঈশা খাঁর কলাগাহার দুর্গ আক্রমণ করেন। সম্মুখ যুদ্ধে সুবিধা না পাইয়া ঈশা খাঁ গুপ্ত উপায়ে সোনামনিকে পাইবার জন্য অগ্রসর হন। কেদার রায়ের অমাত্য বিশ্বাসঘাতক ক্রীমন্ত খাঁয়ের সহায়তায় তিনি সোনামনিকে অপহরণ করেন। অনেক দেশের ইতিহাসই বিশ্বাসঘাতকের কলঙ্ককাহিনীতে পরিপূর্ণ, ভারতবর্ষেও ইহার অত্যাধিক দৃষ্ট হয় না।

সোনামনির সহিত ঈশা খাঁর বিবাহ ব্যাপার জনশ্রুতি মাত্র। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। * ঈশা খাঁর বংশধরেরা এখনও বিদ্যমান আছেন। ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ী ও হরবৎ নগরের প্রসিদ্ধ দেওয়ান সাহেবেরাই ঈশা খাঁর বংশধর বলিয়া পরিচিত। যাহা হউক ওয়াইজ সাহেবও সোনামনির সহিত ঈশা খাঁর বিবাহ ব্যাপারের সত্যতা সম্বন্ধে জনশ্রুতি ব্যতীত অধিক কিছুই বলিতে পারেন নাই। স্বর্ণময়ী চাঁদ রায়ের কন্যা ইহাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না। পূর্ববাংলার সকলেই স্বর্ণময়ীকে প্রসিদ্ধ চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের ভগ্নী বলিয়া জানে। এই সমস্ত সমস্তাপূর্ণ ঘটনার সত্য নির্ধারণ বিষয়ে ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে নীরব, উপাদানের অভাবে আজিও কেহ এই সকল সম্বন্ধ নিরাকরণে সমর্থ হইতে পারেন নাই।

* বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার ওয়াইজ বলেন,—‘Isa Khan carried off and forcibly married Sonai (Svarnamayī), the only daughter of Chand Rai.’ বার ভূঞা মুক্তিকার অস্তিত্ব দেখিতে পাই,—‘Isa Khan is said to have married Fatimah Khatun, a cousin of his own, and grand daughter of Hossein Sha of Bengal.’

দেশাধিপতি সত্যবান্ডনিত্ত বৈরনির্ব্যাতন মানসে কেদার রায় ত্রিপুরারাজের সহিত সংমিলিত হইয়া ত্রিবেণীর দুর্গ অবরোধ করেন। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গে ভ্রাতা-ভগ্নীতে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সোনাবিবি মৃত স্বামীর গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেক দিন পর্যান্ত তিনি দুর্গ রক্ষা করেন, অবশেষে যখন দেখিলেন সমস্ত চেষ্টাই পণ্ড হইল, তখন তিনি দুর্গে অগ্নি প্রদান করিয়া দুর্গ ধ্বংস করেন, এবং নিজে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মবিসর্জন করেন। সোনাবিবির উচ্চ হৃদয় রাজপুত্র রমণীর বীরত্ব ও আত্ম-ভিমাণে পরিপূর্ণ হইল। আজিও লক্ষ্যার তীরবর্তী লোকেরা সোনাবিবির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া আত্ম-গৌরব বোধ করেন। সম্ভবতঃ সোনাবিবির পুণ্য নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই সেই স্থানের নাম ‘সোনাকান্দা’ রাখা হইয়াছে। এখানে প্রতি বৃহস্পতিবার হাট বসে। চাউল আমদানির জন্য এই হাট প্রসিদ্ধ।

ত্রিবেণী দুর্গের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই সুবর্ণগ্রামের পতন আরম্ভ হয়।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সনাতনী

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত। হিন্দুধর্মের “বেণুলি সার কথা, মজ্জার কথা, অপরিবর্তনীয়, সেইগুলিকেই সনাতনী” (১০) নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রচলিত হিন্দুধর্মের কোন কোন অংশ উহার প্রাণ, আর কোন কোন অংশ উহার বহিরবয়ব মাত্র, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হিন্দুর একটি প্রধান কর্তব্য। ইহা নির্ণয় না করিতে পারিলে, হিন্দুধর্মের সকল অংশকেই সনাতন ধর্ম মনে করিয়া হয় আমরা দত্ত বা সরকারের ধর্মব্যাখ্যাকে

অনধিকারচর্চা ও পাপ বলিয়া মনে করি, নয় ত হিন্দু ধর্মের বহিরবয়বে যুগ স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া উহাকে একেবারে পরিহার করিবার চেষ্টা পাই। পৃথিবীর সকল ধর্মই একটা না একটা বহিরাবরণ অবলম্বন করিয়া আত্মাকে প্রকাশিত করিয়াছে এবং সর্বত্রই কালক্রমে ঐ বহিরাবরণ ধর্মের প্রাণের স্থানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টার ফলে, যখন ধর্মের প্রাণ ধর্মের বহিরবয়বকে ছাড়ছাড় হইয়াছে, তখনই কোন না কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে ধর্মের এইরূপ দুর্গতি হইয়াছিল। তখন লোকে বাহ্যিক্রিয়া বা আচার পদ্ধতিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করিত। বীর, সত্যবাদী, জিতেজয়, পরমধার্মিক কুরুসুদ্ধ পিতামহ দেবব্রত ভীষ্মদেব ও ধর্মের বহিরবয়বকে উহার প্রাণ বলিয়া কখন কখন ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। তাহা না হইলে, তিনি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে বাঁধা দিতেন, তিনি কুরুপক্ষে যুদ্ধ করিতেন না। “অর্থস্ত পুরুষো দাসঃ”—মাতুষ অর্থের দাস, অর্থাৎ “স্বাধার তুন খাইয়াছ, তাঁহার পাপেরও সাহায্য করিতে হইবে।” এইরূপ সাম্প্রতিক ভ্রম আজন্মশুচি দেবব্রতেরও হইয়াছিল। ইহুদীর কারণ “কালধর্ম”। এই কালধর্মকেই বিদেশীয়েরা স্পিরিট অব্ দি টাইম বা টসাইটগাইট (Spirit of the time, zeitgeist) আখ্যা দিয়াছেন। এই কাল-প্রভাবে লোকে ধর্মের “অপরিবর্তনীয়তা” “সারকথা, মজ্জার কথা” ভুলিয়া গিয়াছিল, তাই তখন ভগবান্দ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আবার এই রূপেই নবদ্বীপে প্রেমাবতার চৈতন্যের জন্ম। এই রূপে কেবল ভারতবর্ষেই হইয়াছে, তাহা নহে। পৃথিবীর সকল দেশেই মধ্যে মধ্যে এইরূপে ধর্মের সংস্থাপন বা সংস্কার হইয়াছে: অবশ্য সরকার মহাশয় এ কথা মানিবেন না। কেননা, তাঁহার মতে, “অত্যন্ত দেশ ভোগভূমি, কেবল ভারতবর্ষই কর্মভূমি” (১০)। এ কথার অর্থ কি? কর্ম শব্দের একটি অর্থ মজুরি কর। ভারতের লোক কি কেবল মাত্র মজুরি করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেন?

কর্মভূমি হইবে কেন? চীন, জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানি, ফরাসি প্রভৃতি দেশের লোকের কি ধর্মকর্ম নাই? তাঁহাদের ইতিহাসে কি পরার্থে সর্বত্র ত্যাগের ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যায় না? ইংলণ্ডের পিউরিটানেরা যদি ধার্মিক না হন, তবে ধার্মিক কাহার? এইরূপ পরাবক্তান্ত্রিক লিখনপ্রণালী সর্বত্রা হয়। মানুষ পরকে অবজ্ঞা করিয়া বড় হয় না। ভেদ-বুদ্ধিও মহত্বের সোপান নহে। প্রেম দ্বারা বড় হয়—আত্ম-ত্যাগ দ্বারা বড় হয়। সনাতনীর মুখবন্ধে এই রূপ সনাতন ধর্মবিরুদ্ধ সর্বভূতাত্মকম্পাবিরুদ্ধ কথার সন্নিবেশ আবাদিগকে ব্যাধিত করিয়াছে। মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবচরিত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুলেখক চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কবির অনেক কৃতী সন্তান হিন্দুধর্মের “সনাতনী” বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্লেষণে ধর্মসংস্থাপন হয় না। ধর্মসংস্থাপনের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। এই যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংস ধর্মের একজন প্রকৃত সংস্থাপক বা সংস্কারক। পূর্বোন্নিখিত গ্রন্থকারগণ তাঁহার ও তৎসদৃশ অন্যান্য মহাপুরুষের কর্মের জ্ঞান ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন এবং এই জ্ঞানই তাঁহারা সমাজের প্রকৃত উপকারক ও বরণ্য।

অক্ষয়চন্দ্রের সনাতনী বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব এবং চন্দ্রনাথের অনুকরণে লিখিত। তিনিও হিন্দুধর্মের সনাতন অংশ পৃথক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তজ্জন্ম তিনি সাধুবাদার্থ। কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে যে, তিনি তাহার বিশাল মুটে এত বহুত জিনিস ধরিয়াছেন যে, তাহার ইচ্ছাধর্মচারকৃত্তের সর্ব মুখ অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিবে, এইরূপ সম্ভাবনা নাই।

গ্রন্থকার বিনয় করিয়া বলিয়াছেন—

“আমি বৃথ”। এইরূপ কৃত্রিম বিনয়-প্রদর্শন ধর্মগ্রন্থে শোভা পায় না। উহা আজকাল একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। যিনি গ্রন্থ লিখিতে যান, তাঁহার ইহা ভুল। উচিত নহে যে, প্রকাশিত গ্রন্থের প্রত্যেক ছত্র-স্তোত্র

আর অন্যান্য দেশের লোক কেবল মাত্র ভোগের জ্ঞানই জন্মেন? কর্ম অর্থ যদি ধর্ম হয়, তবে কেবল ভারতবর্ষই চাই চারি ছত্র ব্যাপ্তি বিনয়প্রকাশের প্রতিকূলে সাক্ষ্য দেয়। আমেরিকার তাপস ধোরো যথার্থই বলিয়াছেন “We commonly do not remember that it is, after all, always the first person that is speaking.”

সনাতনীতে বহু ভাল কথা এবং বহুতর মন্দ কথা আছে। সনাতনীর ভিত্তিস্থ তত্ত্বগুলি প্রায়ই সত্য। সনাতনীর ভাষা তত মন্দ নহে। ঐতিহাসিক ভুল, অনুবাদের ভুল গ্রন্থকে দুপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীযুত সরকার মহাশয়ের খুব নাম আছে। তাঁহার কাছে এমন গ্রন্থ আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

গ্রন্থকার বলিতেছেন—

“যুদী কোন্ কালে ভারতদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার উপর কত উৎপীড়ন উপদ্রব মাথায় বহিয়াছে, তবু মরে নাই; কেবল মরে নাই নহে, জগত্তের মধ্যে সুন্দর, সুশ্রী, উন্নতদেহ, দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ, প্রসন্ন, ধনশালী, কলানিপুণ জাতি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেন? তাহারা স্বধর্মপরায়ণ এবং সদাচারনিষ্ঠ বলিয়া।”

গ্রন্থকারের মত এই যে যদি আমরা “স্বধর্মপরায়ণ এবং সদাচারনিষ্ঠ” হই তবে আমরা যুদীদের মতন হইব। গ্রন্থকারের মতে বাঁচিয়া থাকাই পরম পুরুষার্থ। ধর্ম যুদীদিগকে রক্ষা করিয়াছে; কিন্তু যুদীদের মত স্বদেশ হইতে নিবাসিত হইয়া পরদেশে পরাধীন জীবন কাহারও প্ৰতীক হইবে কি? এই উপমার মধ্যে যাঁহারা সত্য দেখিতে পাইবেন, তাঁহারা তো অচিরেই সনাতন ধর্ম ত্যাগ করিতে চাহিবেন বলিয়া বোধ হয়। সনাতন ধর্মের এমন দিব্য লোভনীর ভবিষ্যৎ আর কোন কবির কল্পনাপটে চিত্রিত হয় নাই!

গ্রন্থকারের মতে যুদী বড় না ইংরাজাদি বড়? ভোগভূমি (!) বাসী ইংরাজাদি কি “সুন্দর, উন্নতদেহ,

দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ, প্রচুর, ধনশালী, কলানিপুণ" নহেন? যুগ্মানেয়া বলেন, যুদীরা যীশুখৃষ্টের প্রচারিত সত্য ধর্ম গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের এই দুর্দশা। গ্রহকার বলেন, তাঁহারা স্বধর্মপরায়ণ বলিয়াই তাহাদের এই দুর্দশা। পাঠক বিচার করিবেন।

গ্রহকার বলেন যে, যবন (Ionians) এবং রোমকেরা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে (৩ পৃ। ১৭৫ পৃ)। ভারতবাসী আজিও দাঁড়াইয়া আছে, কেন না উহাদের ধর্ম ছিল না, আমাদের আছে (১৭৫ পৃ)। প্রথমতঃ ভারতবাসী "দাঁড়াইয়া আছে" না বলিয়া "ভুইয়া আছে" বলিলে ভাল হইত। দ্বিতীয়তঃ যবন ও রোমকেরা যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন এ তত্ত্ব ইতিহাসে লিখে না। উহাদের বংশ এখনও আছে। গ্রহকার বিজ্ঞানকে শুধু শুধু বড় কটুক্তি করিয়াছেন (১৩। ১৪ পৃ)। অপর পক্ষের উকিলকে গাল দিয়া মকেলের মন পাওয়ার চেষ্টা ব্যবহারক্ষেত্রে দেখা যায়, এইরূপ ভুলিয়াছি। কিন্তু নিঃসম্পর্কীয় তৃতীয় পক্ষের গালি যে ধর্মগ্রন্থে আজিও চলে, তাহা পূর্বে ভাবি নাই। গ্রহকার বলিতেছেন—

"এক জন লোক নদীতে পড়িয়াছে, হাবুডুবু খাইতেছে। তুমি এক জন পণ্ডিত লোক, নিকটে ভীরে দাঁড়াইয়া আছ; কথাটা মনে উঠিল, উহাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে কি না? বিজ্ঞান কি পরামর্শ দেন, দেখ। বিজ্ঞান প্রথমেই বলিলেন, অগ্রে দেখ, উহাকে উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা কতটা আছে; স্রোতের বেগের সহিত তোমার শরীরের তুলনা কর; তুমি বলিলে তা'ত এখন হয়ে উঠে না। বিজ্ঞান বলিতেছে, তাহার পর দেখ, উহাকে উদ্ধার করিতে গেলে যে অতিরিক্ত বলের প্রয়োজন, তোমার দেহের বল হইতে নদীর স্রোতের বেগ বাদ দিয়া, ততটা বল তোমার আছে কি না; তাহার পর দেখ, উহাকে রক্ষা করিতে গিয়া তোমার প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা কতটুকু আছে। যদি দিকি সম্ভাবনাও থাকে, তাহা হইলে, তোমাকে আমি ঐ কার্যের জন্য অগ্রসর

হইতে বলি না, কেন না তুমি ঐ আসন্ন মৃত্যু লোক অপেক্ষা চৌকণের অধিক কৃতী।"

ইহার কি প্রতিবাদ করিব? পূর্বযুগের ইংরাজি ধর্মগ্রন্থে এমন কথা সকল থাকিত। তারই প্রতিধ্বনি বাঙ্গলায় পঁছিয়াছে। নব্য ইংরাজী ধর্মগ্রন্থে এ সব মিথ্যা কথা লেখার রীতি নাই; কিন্তু নব্য গ্রন্থ পড়েন কে? সেকেলে পুরাণ ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ দিয়া স্বধর্ম রক্ষার চেষ্টা আজকাল খুব প্রবল। নদীতে লোক পড়িলে, সেখানে বিজ্ঞানে কিছুই বক্তব্য নাই। বিজ্ঞান তোমাকে নদীতে কাঁপ দিতেও বলিবে না, এবং দাঁড়াইয়া অন্ধ কসিতেও বলিবে না। বিজ্ঞান বিধি-নিষেধের শাস্ত্র নহে। বিজ্ঞান বস্তুর স্বরূপ প্রতি-পালন করিয়া চরিতার্থ হয়। 'উচিত্যানৌচিত্য' বিচার—'কর' বা 'করিও না' বলা বিজ্ঞানের বিষয় নহে। উহার জন্ত স্বতন্ত্র বিজ্ঞা আছে। আমাদের দেশে উহার ন্যায় ধর্মশাস্ত্র, বিদেশে উহার নাম এথিক্স এবং রিলিজিয়ন। হস্তত কোন কোন এথিক্সের গ্রহকার ঐরূপ বলিতে পারেন (বস্ত্তত কেহ ঐরূপ বলেন না), কিন্তু তজ্জন্ম বিজ্ঞান দায়ী নহে।

গ্রহকারের মতে "বিবেক কষ্টিপাথর নহে" (১২-৩০ পৃঃ)। শাস্ত্র ও শিষ্টাচারই কষ্টিপাথর—উহার দ্বারাই ধর্ম নিরূপিত হয়। তবে হিন্দুর হৃদিস্থিত হৃদীকেশ কি? তিনি "নিয়োগকর্তা, ভক্ত সেই নিয়োগমতে কার্য করেন; কিন্তু এই হৃদিস্থিত উপগুরু (conscience) নিয়োগ করিতেও যেমন, নিষেধ করিতেও তেমন" (২২ পৃ), অর্থাৎ আমাদের যে হৃদিস্থিত হৃদীকেশ তিনি একটা মন্ত কিছু। কিন্তু তিনি কি তাহা গ্রহকার বুকাইয়া দেন নাই। আমরাও বুঝি নাই।

২৩ পৃষ্ঠায় গ্রহকার ধর্মের মূল, প্রমাণ ও পরিণাম বলিয়া তিনটি বিচারের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কার্যতঃ একটি বিচার বই তিনটির কোনও নামগন্ধ পাইলাম না। বস্ত্ততঃ মন্ত্রের ২য় অধ্যায়ের ধর্মমূল ও ধর্ম লক্ষণ এবং ধর্মের প্রমাণ একই কথা।

বেদোপনিষদে ধর্মমূল্য স্থিতিশীলে চ তদ্বিদাম্

আচারশ্চৈব সাধুনাং আত্মনস্তত্ত্বিরেব চ ॥ মনু ২৬।

এই শ্লোকের অর্থ করিতে গিয়া গ্রন্থকার বড় গোলে পড়িয়াছেন। এখানে প্রশ্ন ছিল যে, কি উপায়ে আমরা ধর্ম জানিতে পারি। তাহার উত্তরে মনু বলিতেছেন যে, “সমস্ত বেদ, বেদবেত্তাদিগের স্থিতি ও শীল এবং সাধুদের আচার আর আত্মার তুষ্টি ধর্মের মূল অর্থাৎ ধর্ম জানিবার উপায়।” “তদ্বিদাং স্থিতিশীলে”—বেদ-বেত্তাদিগের স্থিতি ও শীল; ইহার অর্থ কি? এখানে বেদবেত্তা অর্থ মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ধর্ম-শাস্ত্রকার এবং ব্যাস বাজ্ঞীক তাঁহাদের স্থিতি অর্থাৎ তাঁহারা যে সকল তত্ত্ব বেদে দেখিয়া, তাহা স্মরণ রাখিয়া, পশ্চাৎ গ্রন্থাকার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহারাই বেদবিদ্দিগের স্থিতি। মোটের উপর বেদ-বিদাং স্থিতিঃ—মানব ধর্মশাস্ত্র, পরাশর ধর্মশাস্ত্র, আপস্তম্ব সূত্র, বোধায়ন সূত্র প্রভৃতি, ও রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদি। এখন “বেদবিদাং শীলম্” কি দেখিতে হইবে। অবশ্য বেদবিদ্ অর্থ এখানেও মনু, বাজ্ঞীক, ব্যাস প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ কেন না, এক শব্দের যুগপৎ দুই অর্থ হয় না। তাহাদের শীল অর্থাৎ আচার ও ধর্ম নিরূপণের উপায়। তাঁহারা আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তাহারা যাহা করিয়াছেন, আমাদেরও তাহাই করা কর্তব্য। তাঁহারা কি করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় পুরাণেতিহাস। তবেই দাঁড়াইল এই যে, “বেদাবিদাং শীলম্ মন্বাদীনাং আচারঃ পুরাণেতিহাসপ্রতিপাদিতঃ”। অতএব বেদ-বিদের শীল ও সাধুর আচার এক হইল না; বেদবিদ্ প্রাচীন ঋষিরা এবং সাধু বর্তমান সাধুরা। ইহা না বুঝিয়া, “বেদবিদ্” ও “সাধু” একার্থবাচক মনে করিয়া কল্পক ভট্ট লিখিয়াছেন—শীলঃ ব্রহ্মণ্যতাদিরূপম্। তদাহ হারীতঃ ব্রহ্মণ্যত দেবপিতৃভুক্ততা সৌম্যতা অপরোপ-তাপিতা অনন্যতা বৃহতা অপারুধ্যা মৈত্রতা প্রিয়বাদিত্বং কৃতজ্ঞতা শরণ্যতা কারুণ্যং প্রশান্তিচ্ছিত্তি ত্রয়োদশ বিধং শীলম্। এইরূপ ব্যাখ্যায় বড় দোষ হয়। মনু

ধর্মনিরূপণের উপায় বলিতে গিয়া বলিলেন—বেদ পড়, স্থিতি পড়, পুরাণেতিহাস পড়, ধর্ম কি জানিতে পারিবে। বর্তমান সাধুদের আচার কি পর্যবেক্ষণ কর ধর্ম কি জানিতে পারিবে। তাহা ছাড়া, বেদবিদ্দিগের শীল কি তাহা অনুসন্ধান কর, ধর্ম কি জানিতে পারিবে। কল্পক ও অক্ষয়চন্দ্র বেদবিদাংশীলম্—ইহার অর্থ লিখিতে গিয়া বেদবিদ্ কথাটি একেবারে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তার পর কারুণ্য, অনন্যতা প্রভৃতি তেরটি বেদে স্থিতিতে ভূয়ঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। বর্তমান সাধুদের আচারেও উহাদের উপলব্ধি হয়। কাজেই পৌনরুক্ত রহিয়াই গেল। অতএব কল্পকের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য।

গ্রন্থকার বাঙ্গালীকে প্রবাসে যাইতে নিষেধ করিয়া-ছেন, কেন না “প্রবাসে বংশের অবনতি হইয়া থাকে” (১৬৩ পৃঃ)। কেন এইরূপ হয়? ইংরাজেরা তো আমেরিকায় গিয়া অধঃপতিত হয় নাই। ১৬২পৃষ্ঠায় যে উদাহরণ ও যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা অকিঞ্চিৎকর। দেশেও বাঙ্গালীরা অনেকেই তিন পুরুষের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। নাননীয় দেবপ্রসাদ সন্দ্বিধিকারী মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে, দুই পুরুষের মধ্যে জানে এবং তিন পুরুষের মধ্যে সম্পত্তিতে দাউলিয়া হওয়াটা এখন বঙ্গের নিয়ম। তার পর গ্রন্থাকারের মতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের পরস্পরের মধ্যে “এক প্রকার সৌজন্য আছে, কিন্তু সৌহার্দ একেবারেই অসম্ভব। ভূমি হয়ত দুইটি রোগী ও রোগী ছেলে, বৃদ্ধ মাতা ও যুবতী ভার্য্যা লইয়া চাকর, বামণ সম্বল করিয়া প্রবাসে পড়িয়া আছ। দেখিবে প্রবাসে বাঙ্গালীর মধ্যে সৌজন্যের অভাব নাই। প্রভাতে পরিক্রমের সময় দেখিবে দলে দলে বাঙ্গালী বাবুরা আসিয়া কেবল (kind enquiry) সৌজন্য সহ-কারে তত্ত্ব লইতেছেন, অর কত ডিগ্রী উঠিয়াছিল সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু এই যে আগুনারা আগন্তুক দম্পতী, রোগের সেবায় ক্রমাগত রাত্র জাগিয়া যারা যাইতে বসিয়াছেন, কোনরূপ সাহায্য করিয়া আপনাদের একটুক “আশান” দিবার প্রস্তাবও কেহ কখন কল্পিবেন

কি ? তাহা করিবেন না। * * * * পরস্পরের সাহায্য
মহুজ্ব। * * * * প্রবাসে * * * * মহুজ্ব ফুটে না, বরং
তুকাইয়া যায়।” (১৬৫ পৃঃ)। প্রবাসে বাঙ্গালীরা
রোগের সময়, রাত্রি জাগিয়া, রোগীর পরিচর্যা করিয়া,
পরস্পরের সাহায্য করেন না—এটা মিথ্যা অভিযোগ।
তবে বাঙ্গালীরা পর্দাভিপ্রিয় বলিয়া অনেক সময়
একের অন্তঃপুরে গিয়া অস্ত্রের পরিচর্যা করিতে একটু
সমুচিত হয় সত্য। ইহার প্রতিকার চাই—এই জ্ঞ
প্রবাস বন্ধ করিলে বাঙ্গালীর অন্নভাব বাড়িয়া যাইবে।

ইয়ুরোপের দান প্রণালীর নিন্দাছলে গ্রন্থকার
বলিতেছেন—“তথাকার নিয়ম এই রূপ—আমি মাসে
এক টাকাই দিই, আর সহস্র টাকাই দিই,—আমি সেই
টাকা পাঠাইয়া দিব, কোন আমহাউসে, কোন পুয়র
কন্ডে, কোন চ্যারিটি সোসাইটিতে—সেখানে গরীব দুঃখী
অন্ন পায়, আচ্ছাদন পায়, আশ্রয় পায়। তা বলিয়া কি
তাহারা ‘আমার বাড়ী আসিয়া আমাকে “হা অন্ন! হা
বস্ত্র!” বলিয়া বিরক্ত করিবে? তাহা হইলে ত আমার
ভোগে ব্যাঘাত হইল, আমি ভোগজীবন জীব আমার
সর্বনাশ হইল! না, তাহা হইবে না; আমি দান
করিব সত্য, তাহাতে দরিদ্রের দুঃখ দূর হইবে তাহাও
ঠিক, কিন্তু আমার ভোগে যেন বৃণাকরেও ব্যাঘাত
না হয়।” (৫৩ পৃঃ)।

গ্রন্থকার কি সত্যই মনে করেন যে, দাতার ভোগে
প্রতিবন্ধক না হয় এই উদ্দেশ্যেই সংস্থানবদ্ধ দানের
(organized charity) সৃষ্টি? আমরা ত মনে করি যে,
উহাতে সমাজের অনেক উপকার আছে—যেমন সমর্থ
লোকের ভিক্ষা নিবৃত্তি ইত্যাদি। আবার আধ্যাত্মিক
ব্যাখ্যার বলে বিলাতি দানকে দানের শ্রেষ্ঠ বলিয়া
প্রতিপাদন করাও অসম্ভব নহে। বিলাতের লোকে
এই রূপ লিখিতে পারে—“ভারতীয়েরা দুঃখীর দুঃখ
নিষারণের জ্ঞ দান করেন না। তাঁহাদের প্রধান
উদ্দেশ্য দান করিয়া উপকৃতের নিকট কৃতজ্ঞতা লাভ করা
ও উজ্জ্বল আনন্দ উপভোগ করা। কাজেই তাহারা

হাতে হাতে গরীবকে ভিক্ষা দিতে ভাল বাসেন। ইহাতে
যে ভিক্ষকের ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত সময় অনর্থক নষ্ট হয়,
তাহা ভারতীয়েরা ভাবেন না। ইত্যাদি” বস্তুতঃ
হিন্দুরা ইয়োরোপীয় দিগকে নিন্দা করেন। কেহই
পরের মধ্যে যে সত্য মঙ্গল লুকাইয়া থাকিয়া ঈশ্বরের
উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন
না। কেয়াউ পাদ্রি ধর্ম গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে
হিন্দু ধর্মের অবধা শত, শত নিন্দাবাদ আছে।

পরলোক গত দার্শনিক ডাক্তার প্রিয়নাথ সেন উহার
ভীত প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তথাপি এখনও ঐ পুস্তক
হিন্দু সন্তানের পাঠ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুর তরফ
হইতে লিখিত কোনও ধর্ম পুস্তক এখন পাঠ্য হয় না।
৬ বক্তৃতাচক্রের ধর্মতত্ত্ব বি, এ. পরীক্ষার দর্শনের পাঠ্য
পুস্তকের তালিকায় স্থান পাইবে কি? সনাতনী নাম
দেখিয়া বড় আশান্বিত হইয়া পুস্তক কিনিয়া পড়িয়া
ছিলাম—কিন্তু সনাতনী ধর্মতত্ত্ব, হিন্দুত্ব, বা আচার
প্রবন্ধের মত সূচিস্থিত নহে। সনাতনী পড়িয়া লজ্জা
হইয়াছে—আমাদের ধর্মের এইরূপ কদর্যা স্মৃতি সাধা-
রণের নিকট উপস্থিত করিয়া গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের অনিষ্ট
বই ইষ্ট করেন নাই।

৫৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার পৃষ্ঠানদিগের প্রভুর প্রার্থনারও
দোষ ধরিয়াছেন। “ভগবান্ আমার নিত্য প্রয়োজনীয়
অন্ন আমাকে দাও অর্থাৎ আমার নিত্যভোগের যেন
ব্যাঘাত না হয়”। ছি!! প্রথমতঃ প্রার্থনাটির অনুবাদে
ভুল আছে—give us this day our daily bread
হে ভগবন্, আমাদের দৈনন্দিক প্রাত্যহিক খাদ্য
দাও। প্রার্থনা হইতেছে আমাদের জন্য কেবল আমার
জ্ঞ নহে। বহু বচন—এক বচন নহে। যখন ধনী থাকিতে
বসিয়া বলে, হে ভগবন্, আমাদের দৈনন্দিক অন্ন দাও, অর্থাৎ
আমিতো তোমার প্রসাদে অন্ন পাইলাম—আমার
বে সকল ভ্রাতা (হে আমাদের, আমার নহে, বর্গীয়
গিতঃ—এই সম্বোধনে? মানুষকে তাই তাই করিয়া
দেয় নাই কি?) অন্নহীন, তাঁহাদিগকেও অন্ন দাও,

তখন কি ভগবানের সিংহাসন টলে না? যিশুপুত্র ধনৌ হইতে নিবেদন করিয়াছেন। পাপীকে শাস্তি দিতে নারণ করিয়াছেন (resist not evil). এমন তর যিশুর প্রদর্শিত প্রার্থনা পদ্ধতিকেও অবজ্ঞাত করা কি সনাতন ধর্মের অঙ্গমোদিত? দ্বিতীয়তঃ এইরূপ আগের জ্ঞাত প্রার্থনা হিন্দুরাও করেন। সরকার মহাশয় শ্রাবের যে মন্তব্য তুলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঠিক উহার পরবর্তী মন্তব্যটিই আছে অল্প না বহু ভবেৎ—অর্থাৎ আমাদের ঘরে ঘেন অন্ন বা ভাত বাড়িয়া যায়।

“শিক্ষা বিভাগে স্বভাবের সুখের ভাণ্ডার আমরা দেখিতে পাই না.....” (১৩৮ পৃঃ)। এ শিক্ষা বিভাগ অনেক দিনের—গ্রন্থকার অবশ্য সে বিষয়ে নির্দোষ। মহাভারতে আছে “সুখাদিপাদিকং দুঃখম্ জীবতে নাত্র সংশয়ঃ”।

“জগতে কষ্ট-দুঃখ থাকিতে আমাদের কত লাভ হইয়াছে। দুঃখ না থাকিলে সেবার প্রয়োজন হইত না, আমরা পরম ধর্ম হইতে বঞ্চিত হইতাম”। (১৪১ পৃঃ) আমার এক বন্ধু প্রথমে ছিলেন হিন্দু বৈরাগী, পরে হন ব্রাহ্ম, পরে এখন খৃষ্টান। তিনি এক খৃষ্টান পাদরীর জুয়াচুরিতে ঠকিয়া বলিয়াছিলেন “দেখুন, সব পুরোহিতই সমান—সব জুয়াচোর”। বস্তুতঃ তাই ঠিক, সব গোঁড়ারাই সরকার মহাশয়ের মত। খৃষ্টান পাদরীরাও বলিতেন জগতে দরিদ্র থাকিয়া ধনীর পুণ্য লাভের উপায় করিয়া দিতেছে! বা! এতএব, হে সরকার বাহাদুর, ম্যালেরিয়া নাশের চেষ্টা করিও না—আমরা রোগীর সেবা করিয়া পুণ্য করিব। হে মতিলাল ঘোষ মহাশয়, আপনি দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন না—করিলে সরকার মহাশয়ের সেবা ধর্মের অনবকাশ হইতে পারে!

১৬৯ পৃষ্ঠার গ্রন্থকার বলিয়াছেন “আমরা বলি সন্তোষ সুখের মূল। বিদেশীয়েরা বলেন, সন্তোষ সকল দুঃখের আকর। অতএব আমরা মন্ত ইত্যাদি।” কিন্তু ইহাও বড় মিথ্যা কথা। সন্তোষের প্রশংসা সকল ধর্মেরই আছে।

এক বার যিশুর পরিত উপদেশ” (Sermon on the mount) দেখুন। আবার সকল অর্থশাস্ত্রে সন্তোষের নিন্দা আছে। মহাভারতে আছে—অনন্তোষঃ প্রিয়ো মূলম্।

আর লিখিয়া গৃহ বাড়াইতে চাই না। বহু বক্তব্য এখানে আছে। এই মাত্র বলিয়া উপসংহার করিব যে, শত দোষ সত্ত্বেও একরূপ গ্রন্থ আমাদের শিক্ষিত সমাজের পড়া উচিত। কেন না, একঘেয়ে ইংরাজি পড়িয়া, বিশেষতঃ দর্শনেন্তিহাসাদিতে বিদেশীয় রূত হিন্দুর কুৎসা পড়িয়া, আমরা আমাদের সনাতন ধর্মকে কুৎসনীর মনে করিতে শিখি। কেয়ার্ডের Introduction to Religion, Sethএর Ethics, Hegelএর Philosophy of History, সব স্থানই এক কথা—তঁাহারা বড়, আমরা ছোট। আবার এত কষ্ট করিয়া এদের গ্রন্থ বুঝিতে হয় যে, এক বার বুঝিলে উহাদিগকে লাভ বলিয়া উপেক্ষা করা সহজ হয় না। কিন্তু উহারা ভ্রান্ত। ভারতের হিন্দুকে দর্শনেন্তিহাস পড়াইবার জন্য ভারতের উপযোগী গ্রন্থ কে লিখিব? না লিখিলে আমাদের মঙ্গল নাই। সনাতনী পড়িয়া শিক্ষিত সমাজের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ হইলে, সনাতনী সার্বক হইবে। আমাদের বুঝিতে হইবে—

“অমিল যেখানে গর্গ পতঞ্জলি.....

সে জাতি কখনও বৃণিত নহে।”

গ্রন্থের ভাষারও দুই একটি নমুনা দিতেছি।

“এই ধর্মের যাজনা করা সকলেরই সাধ্যমত কর্তব্য” (৯০)। যাজনা অর্থ কি? বহুস্থলে এইরূপ ‘যাজনা’ শব্দ আছে। “রক্তমাংস, অস্থিমজ্জা, শুক্রশোণিতের অপূর্ণ তেরিঙ্গ” (১১)—এটা ইংরাজির উচ্ছৃঙ্খল। তার পর এই বাক্যে রক্ত ও শোণিত দুইটি জিনিস বলিয়া ধরা হইয়াছে। শুক্রশোণিতের আর এক অর্থ আছে তাহা এখানে খাটে না। “অনন্ত উৎসে উৎসারিত” (১২) “ভবঘোর চক্রের নীল রক্তের বিষম উত্থান পতনের ভীষণ নাগরদোলা” (১২)—অর্থ কি? “কৃত্রিম শক্তি কেন্দ্রস্থিত করিয়া আমরা.....প্রতিবাদ করি”—না

ইংরাজি না সংস্কৃত।” একি খাঁটি স্বদেশী বাঙ্গালা নাকি ? “এইরূপে conscience বা সহজ জ্ঞানবাদ ইউরোপে জাহির হয়”—এটা অতদূর ভাষা হইল। “ভৃগুপ্রথিত মানবধর্ম শাস্ত্র”—প্রথিত অর্থ কি ? ছাপার ভুল ! “সদাচার ধর্মের জ্ঞান”—অর্থ কি ? ধর্মের প্রাণ ? তাহা হইলে এমন “ঘোরতর সয়তানি মত আর হয় না” (১৬ পৃ)। কোন্ কোন্ মহর্ষির স্মৃতি প্রামাণ্য—প্রামাণ্য অর্থাৎ প্রামাণিক। “ইহার মধ্যে আবার মন্তর সর্কাপেক্ষা অধিক প্রমাণ” (২৬) এখানে প্রমাণ—প্রামাণ্য। “সকল প্রকার স্তরের অন্তরে অন্তরে একটি সাধারণ স্তর আছে” (৩১) কি রূপে ? প্রথম ত্রিশ পৃষ্ঠার নমুনা দিলাম। এইরূপ বহু অপপ্রয়োগ গ্রন্থকে কলুষিত করিয়াছে। *

শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ,
কান্দীর শ্রীপ্রতাপ কালেক্সের অধ্যক্ষ।

মেঘরাজ্যের সংবাদ

সাত হাজার ফিট উঁচায় ‘চড়ে’ ঝাড়াটা কল্যাম ঝাড়া,
নীচের দিকে হেলায় চেয়ে গোঁফে দিলাম চাড়া,
ঠেকল নীচটা যতই নীচু, যতই নাকি দূর,
মনে হ’তে লাগল নিজকে ততই বাহাদুর।
বজ্রুর পথে শেষে যখন ছুটিয়ে দিলাম ঘোড়া,
মনে হ’ল সংসারটার পরোয়া রাখি ধোড়া,
“হু’দিনের বৈরাগী যেন পেরুসাদ বলেন ভাতকে,
নূতন পৈতাওয়ালা যেন ভেঙ্গান নিজের জাতকে”
এমনি যা’হয় বল’, কিম্বা হাসতে হয় হেস’,
তা’র আগে ভাই, এক বার ভূমি এই পাহাড়ে এস।

* বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যক্তিগতমতপ্রকাশক সমালোচনা-
এবং প্রতিবাদ ছাপিতে আমরা প্রস্তুত। তবে প্রতিবাদ স্বয়ং
হস্তগত হওয়া আবশ্যিক। প্র. স।

বুঝ্লে এইটি শিশুর স্বর্গ, রোগীর সজ্জ আরাহ,
যুবার যেন কল্প-কুজ, যুধের সাক্ষা বিরাম।
কথা শুনে হাস্ছ ? বল্ছ “সেইত দার্জিলিং,
নূতন রূপ ত বেরোর নি তা’র, গজায় নি ত সিং।”
আমিও ঠিক তোমার মতই গেলাম এবার হেসে,
খেলা কবুতে গিরে প্রথম, কেঁদে এলাম শেষে।
পথের শোভাও কি এক চোখে দেখলাম যেন এবার,
পুরাণ ছবি নূতন হু’য়ে দেখা দিল আবার।
উঠ্ছে ওকি বোঝাই “ট্রেন” ঘুরে ফিরে ধেয়ে,
মা বাসুকীর বংশধর চড়্ছে পাহাড় বেয়ে ?
পুরাণ বন্ধ “পাগলা কোঁরা”র সঙ্গে পথে দেখা,
হো হো হাস্তে বিজন স্থানটি মাত কর্ছিলাম একা।
ছেলে পিঠে “নেপালিনী” নামে যেমন সোজা,
ইনিও পড়েন পাহাড় থেকে ল’য়ে জলের বোঝা।
আবার বল্ছ, সাত হাজার ফিট পাহাড়টিতে চড়ে’
মনটা গেল চুরি—গেলাম বড়র প্রেমে পড়ে’।
উঁচুর দিকে চেয়ে চেয়ে নজরটাও ঠিক কেমন
উঁচু হচ্ছে ! নিজকে যেন ঠেক্ছে তাক্সা নূতন !
মেঘের রাজ্যে কল্লনাও ঠিক ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া,
রা’শটা শুধু ছাড়,—বসু—লাগবে না আর কোড়া !
হঠাৎ দেখবে সোণার ভাব সব ছাড়া মেঘের প্রায়,
আভের রাজ্যে হাওয়ায় হাওয়ায়, উড়ে উড়ে বেড়ায়।
বল্বে কি আর প্রথম দিনেই মায়া-রাজ্যে ঢুকি’
আমার দু’টি খোকা আর একটি মাত্র খুকি।
কি একরকম হু’য়ে গেল, ভাবে আর কি দেখে,
বুঝি তাদের প্রাণটা কেমন নূতনতর ঠেকে।
নীল পাহাড়ের ফ্রেমে আঁটা আভের কাছে ঢাকা
ভাবে—দেশটা ছবি একটি সোণার পটে আঁকা।
একরঙি সেই মাছুষটিও, যিনি সবায় ছোট,
শুধু ছুটি বসন্তের সে চারা ফোট-ফোট।
মায়ায় রাজ্যে পা দিয়েই তার আর এক রকম মূর্তি ;
কচি বৃকে ধরে না আর যেন নূতন কুর্তি।

ঠেলা গাড়ী নিজেই ঠেলে' পাহাড় পথ ভাঙ্গে,
যেন খুসির বান ডেকেছে, তার সে কচি গাঙ্গে।
ফুটফুটে মুখ লাল, তবু বলবে না সে "থাক্,"
ছোট্টুকুর বিক্রম দেখে' সবার লাগে তাক্।

বড় থোকাও কম নয়, সে গোড়ায় চাপে যখন,
দিদির দিকে গর্কে চেয়ে, যুচ্ছে হাসে তখন।
ভাবটা—দিদি, দেখ, আমি কেমন মস্ত সোয়ার,
তোমার মত মানুষ-গোড়ার খারি না আর দার।
দিদি বলেন,—রেখে দাও না, বোড়া, না 'ও 'টয়,'
বড় বড় বোড়া চেপেও করি নাই ত ভয়।

নেচে নেচে উঠা নামা, সে 'ভাঙি' যে মা'র,
রিকশ তবু কতক ভাল, ঘোড়াই প্রিয় আমার।
বোন-ভাইদের একটি জায়গায় ভারি কিন্ত মিল,
পাহাড়ের রূপ দেখতে সবার দিলে মিলে দিল।
পাহাড়ের পায় লুটিয়ে পড়ছে মেঘ সাদা সাদা,
পাহাড় উটায়, মেঘ নীচে ; মেঘগুলো কি গাধা!

শুনলে ভাববে-লোকটা খালি বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে,
সত্যি বলছি, ছোট্টুক যে টলে' টলে' চলে,
সেও যখন আকাশ-সরে কিরণ-কমল ফোটে
নীল শিখরের সাদা মেঘ মাথায় করে ওঠে
কাঞ্চনের এক শৃঙ্গ। তাহারই ঠিক উপর
শুক্র মেঘের থাকৃতি গিয়ে ধরে নীলাম্বর।

অম্বনি সোণা মুখে ফোটে, কত ছড়া গান,
শিশুর কাছে আগে পৌঁছে প্রকৃতির আহ্বান ;
নিসর্গের যে নিখুঁত 'ফটো' স্বচ্ছ বৃকেই উঠে,
বৃহৎ যা' তা' কচি প্রাণেই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে।
আমরা দেখি দৌলখ্যের বিচারকের চোখে,
ভাবের হাতে সওদা কর্ত্তে বিজেরা যাই ঠকে'।

মেকি নিয়ে য়াতি ; সার হয় খুঁটিনাটি ঘাটাই,
আলোচনার চোটে শেবে কলম, গলা, ফাটাই।
শিশুর সঙ্গে শিশু হয়ে কাটত আমার বেলা,
তা'রা তিনটি, আমি একটি, চার পাগলের মেলা।

এর মধ্যে কত কাণ্ড—নাশিশ, ফরেন্দ, বিচার,
এই সাজি অপরাধী, এই সালিশ আবার।

'ও আমারে চিম্টি-কাটল,' 'ও দিল কাণমলা'
'ও আমারে কালো বল লে, নিজে ভারি ধলা!

একরতিটি জাঁদরেল, সে ধারে না এর ধার,
তার কাছে সব কোর্ট মার্শাল', এক কথাতে বিচার।
কমা কর পাঠক, কথা বেড়েই শুধু যায়,
পিতা আমি—পিতা যা'রা বুঝে তা'রা আমার।

সাতটি নয়, পাঁচটি নয়, আমার তিনটি ধন,
এদের কথা বলতে বলতে হয়ে যাই যে কেমন।
বুঝি এটা দুর্কলতা, পরের এত কথা,
শুনতে কা'র বা দায় পড়েছে, এতই মাথা ব্যথা।

তবু এটা অতি সত্য, আমার গোলাপ গাছে,
তিনটি কুড়ি আলো করে', শোভা করে' আছে।
এদের নিয়ে গর্ক ভরে কাটে আমার দিন,
সাতটি নয়, পাঁচটি নয়, শুধুই তা'রা তিন।

এদের সাথে বিভোল হ'য়ে খেলছি সারা বেলা,
প্রকৃতির এই লীলা-কুঞ্জে সাধের হোরি খেলা।
পাহাড় থাকে অবাক হয়ে, মোদের পানে চেয়ে,
মেঘেরা সব কাছে আসে পাহাড়ের গা বেয়ে।

শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘুরে বেড়ায় নেপালীদের গান,
ব'য়ে আনে অনেক কালের অনেক অভিজ্ঞান।
ভুটিয়াদের নাচের চোটে পাহাড়টি গুল্জার,
হিমালয়ের ছেলে মেয়ের মেহের অত্যাচার।

বড় থোকা 'ফিলজফার', চূপটি করে আছে,
হঠাৎ ব'লে উঠল—“দিদি, ওই মেঘের পাছে—
আকাশ গিয়ে যেখানটিতে হ'য়ে গেছে শেষ,
হয়ত সেটা এর চেয়েও ঢের ভাল দেশ।”

দিদি একটু বৈজ্ঞানিক, বলে—“বাবা, থোকা,
শুনলে, বলছে কি ? ও আস্ত একটি বোকা!
আরে গাধা, এও জান না, আকাশ যে নয় কিছু,
নাই যাহা, কি আর থাকবে সেই শৃঙ্গের পিছু!”

ছোট্টটুক টেচিয়ে উঠল, “খোকা বোকা” বলে,

‘ফিলছফি’ ভেসে গেল হাসির মহারোলে।

নভের মাঠে মেঘ-দোড়, ছুটছে সে দিন মেঘ

উপর নীচ মুছে ফেলে’ করুলে যেন এক।

বেমানুষ লুকিয়ে ফেলে, ঘর বাড়ী গাছ পালা,

ঢাকল উঁচু পাহাড়ের সেই মস্ত বড় মালা।

আন্ডের আঁধার মনে হল যেন একটি সাগর,

নাই গর্জন, নাই নর্জন, পাটীর মত নিথর।

ক্ষুদ্র গৃহ কোনটি যেন ছোট্ট একটি তরী,

আমরা চারটি চড়নদার যাকছি পাড়ি ধরি।

নাই রে নাই, কুল ত নাই, নিরুদ্ধেশে কোথায়,

শ্রোতের মুখে ভেসে যাকছি ভাসানের এক নেশায়।

একরত্তিটির হাতে যেন আছে তরীর হাল,

কারণ, তারই বেশী জানা ওপারের রাসব চাল।

উঁচায় আঁধার, নীচে পাথার, হয় ত ভেসে ভেসে,

হঠাৎ গিয়ে উঠব আমরা মেঘমালার দেশে।

সাথে সাথে মনে এল মেঘমালার গান,

‘এক কন্ডের রাঁধেন বাড়েন, তিন কন্ডের খান।’

কবে হল, কেন হল, মেঘমালার দেশ ?

ছেলেবেলার এ জিজ্ঞাসার হয় নি আলও শেষ।

কেমন সে দেশ ? নাই কি সেপা রাত্রি আর দিন ?

চাঁদ নাই, পূর্ণিমা নাই, আকাশ উদাসীন ?

আর মানুষ কি পাবাগ হ’য়ে আছে অভিষাপে !

তাদের কি খাস উঠছে জলে’ নীরব পরিতাপে !

আন্ডের বালিশ শিথান দিয়ে শুয়ে প্রবাল খাটে,

কি স্বপনে তিন কন্ডার প্রহরগুলি কাটে !

কখন দেয় সুধার ছড়া আঙ্গিনার চার ধারে,

পান্নার প্রদীপ জ্বলে কখন মোতির দীপাধারে !

ছুধের সরোবরে এসে কখন নেয়ে যায়,

মণি-বেদীর উপর বসে কেশের রাশি শুকার !

মুক্তার রেণু দিয়ে কখন অঙ্গখানি মাজে,

হীরার মুকুর কাছে রেখে, কেমন বেশে সাজে !

ইন্দ্রধনু রঙের খাসা হাওয়ার শাড়ী পরে’

মেঘের রথে চড়ে’ তারা আকাশময় ঘোরে।

বিদ্যাতের চক্ৰবর্তী চুকে’ জ্বালায় নিভলে বাতি

কি রূপকথা কয়ে তারা কাটায় দীর্ঘ রাত্রি !

কখন তাদের রাত পোহায় পাখী করে গান,

কেমন করে’ সূর্য্য ডোবে, বেলার অবসান !

কিন্তু মেঘমালার দেশে নাই সন্ধ্যা প্রভাত,

আকাশ জোড়া আঁধার শুধু ফেরে সাথ সাথ !

বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, নাই কি কোন সুর ?

স্বপ্নে ছাওয়া, মায়ার নাওয়া, নিশ্চকতার পুর।

মা, সে ঝড়-বজ্র আর করকীর ঘোর গহ্বর,

কালো বরণ প্রায় আছে বেঁধে সেধায় ঘর !

আলোয়ারই আলোর মত বিদ্যুৎ-বাতি তার

অন্ধকারে ঢাকা যেন আরও অন্ধকার !

জোয়ার যখন নেবে মোদের তিন কন্ডের দেশে,

ধরার মানুষ দেশে’ তারা মিলিয়ে যাবে হেসে !

বাবুইয়ের ঝাঁক উড়ে গেল হি হি ক’রে তখন,

হুঁভাগ করে ‘দিয়ে’ গেল আমার জমাট স্বপন।

অনেক দিনে পাখী দেখে খোকা বলে—‘খাসা !’

আমি বললাম,—ওদের চেয়েও খাসা ওদের বাসা।,

খুকী বললে,—ওদের বাসা দেখব গিয়ে কাল ;’

ছোট্টটুক ‘পাখী নেব’ ধরুলে এই তাল।

কোথায় গেল তিন কন্ডে, মেঘমালার গান,

এ যে আমায় পেয়ে বসল ধরার তিনটি প্রাণ !

পাহাড়ের সার উঠল ভেসে ; আলো করি আকাশ

জল্লা রবি,—স্বপ্ন ভেঙ্গে সত্য যেন প্রকাশ।

সূর্য্য দেখে পড়ে গেল তারি কোলাহল,

মোদে বুঝি শিশু-প্রাণের ফোটে শতদল।

সারাদিন বাইরে বাইরে হৈ হৈ আর খেলা,

পদ্মের মত প্রাণগুলি, তাই লুটার সন্ধ্যা বেলা।

বাড়ীর গাছে কুটে থাকে রং বেরংএর ফুল।

পাড়া নিয়ে তিন তাই বোন বাধার হলদুল।

পাহাড়ের ফুল কাণে পরে, গৌজে পকেটটুকে,
 গর্গের হাসি খেলিয়ে যায় তা'দের চোখে মুখে।
 ফুলের মত প্রাণের কাছে ফুলের মত আদর,
 লক্ষ টাকার হোরারও নাই বুঝি তত কদর।
 ছোট্টটুকও নিজেই ছিঁড়ে ফুল দিয়ে যায় আমার,
 স্বর্গের নির্মালাটি যেন পড়ে আমার মাথায়।
 'এমনি স্বপ্নে কাটছে দিন হিমালয়ের কোলে,
 প্রকৃতি মা'র শিষ্য হ'য়ে বিশ্ব কে না ভোলে?
 হিমালয়ের সাজান বাগ, মানুষ বলে আমার,
 বুঝলাম এক দিন অনেকক্ষণ ছায়ায়, মায়ায় তার।
 এমন রূপের পাতাবাহার, কচির ফুল দল,
 হিম দেশের এতই রকম দতা পাতা ফল।
 "পাইন" একটি দেখলাম যেন হাজার ডেলে বাড়,
 আলো করে' দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার পাহাড়।
 কত জীবের ভগ্নাবশেষ দেখলাম কত সাজে,
 হিমালয়ের বার্তা যেন পেলাম তাদের মাঝে।
 প্রতিদিনই কাঞ্চন শৃঙ্গ উঠত প্রভাত-টিতে,
 যেন তিনটি কচি ভক্তের ভোরের প্রণাম নিতে।
 কখনও বা বরফ দেখতে আসত ভোরে উঠি,
 রবি শশী একই সঙ্গে, আলোর যমজ দু'টি।
 ধবল শোভা অচল হ'য়ে থাকত সারা বেলা,
 দেখত যেন তিনটি প্রাণের সারা দিনের খেলা।
 সোণা-রবির সোণার করে সাঁঝে করি স্নান,
 জানিয়ে যেত তিনটি প্রাণে বেলার অবসান।
 মেঘ সমুদ্রে সোণার পাহাড় লুকিয়ে যেত হঠাৎ,
 তিনটি কোমল প্রাণে লাগত যেন একটি আঘাত।
 দেখে দেখে আগত বন্ধে উদার বিশ্ব প্রীতি,
 মনে হ'ত প্রাণটা যেন কবিতা বা গীতি।
 শৃঙ্গে শৃঙ্গে উঠত বেজে বিশ্ববীণার তান,
 মেঘে আলোয় আরোহিয়া উর্ধ্বে ছুঁত গান।
 মেঘ দিয়ে পাহাড় বেয়ে স্বর্গ আসত নেমে,
 উচ্চ নীচ একাকার যেন পুণ্যে প্রেমে।

প্রাণের প্রাণে উঠত ফুটে নিরাকারের রূপ,
 পদে পড়ে' কোটা জগৎ আছে যেন চূপ।
 আঙ্গিনায় তুনে' এক দিন কলরব আর হাসি,
 বাহির হ'তেই থোকা ধরলে,—“বাবা” দেখই আসি’
 হাত ধরে সে টেনে এনে দেখায় অসীমে,
 আনুল দিয়ে কি এক নিধি! পাহাড়ের সেই হিমে
 দেখলাম প্রথম চন্দ্রোদয়। দিমির হাতটি ধরে’
 কি স্বপ্ন দেখে ছে'থোকা প্রাণের আঁধার ভরে’!
 ভোলা-ভাব তা'র বাড়ছে। দেখলাম একি শুধু চাঁদ,
 কোলে মায়া-মৃগ, এখে রূপের একটি ফাঁদ।
 দেখলেই মনে হয় এর হিটার মাঝে বাঁধি
 নিরঞ্জন পরাণ ভ'রে গভীর স্নেহে কাঁদি।
 খুকীও আজ গলে' গেছে থোকার মতই প্রায়,
 বিভোল হ'য়ে চেয়ে আছে, আকাশের সেই গোড়ার
 পাহাড়ের সা'র অবাধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে নীচে,
 মেঘের বহর নেমে গেছে পাহাড়ের ঠিক পিছে।
 ছোট ছোট মঠগুলি কি দেখছি গিরি চূড়ায়?
 না, 'পাইনের' সারি মাখছে চাঁদের কিরণ গায়!
 খুকী বললে—“এমন চাঁদটি উঠে না ত নীচে,
 থোকা বললে—“এই খাঁটি চাঁদ, আর যা'দেখ মিছে।”
 হিমের ভয়ে এক রঙিটি দেখলে না ত চাঁদ,
 অমন ভক্ত পেলি নে রে, চাঁদ তুই আজ কাদ।
 সানি দিয়ে জ্যাছ'না দেখে' আনন্দ কি তা'র,
 বন্ধে মেলাই আবোল, তাবোল, ফুরায় কি তা' আর!
 বোবা যেমন আবেগ ভরে বুঝায় মনের কথা,
 ভাবে—‘সবই বন্ডাম’—কোটে শুধুই ব্যাকুলতা।
 এ আবার কি! নীল সাগরে রূপার পাহাড় নাকি?
 দেখে প্রাণ যে জুড়িয়ে গেল, ফেরে না আর আঁধি।
 শত্রু হও, মিত্র হও, এক বার দেখে যাও।
 এমন দিনে ভেদাভেদ সবই ভুলে' যাও।
 কাঞ্চন শৃঙ্গে আজ যে উদয় মধুর পৌর্ণমাসী,
 শুভ্রতায় কি করছে স্নান পবিত্রতা রাশি?

শোভার আভার কোলাকুলি, পুণ্যে মিশ্ছে প্রেম,
তুবার কোলে জ্যোছনা যেন ক্ষমার বুকে ক্ষেম!
ও কি মৌন স্বর্গে আত্মান ধরার প্রান্তে প্রকাশ?
না ও একটি স্তব্ধ ক্ষান্তি, ব্যাপ্ত করে' আকাশ!
কাঞ্চনজঙ্ঘা, জ্যোছনা, আকাশ, মাঝে তিনটি প্রাণ,
এমন সময় হ'ত যদি প্রাণের অবসান!

শ্রী প্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

গ্রন্থ সমালোচনা

৩৬। ঢাকার ইতিহাস, প্রথম পণ্ড—
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত; আকার ডবল ক্রাউন
বোডশাংশিত, ৫৬০ পৃষ্ঠা; ৩. কালিমিঞের ঘাট স্ট্রীট,
কমলাপ্রিষ্টিং ওয়ার্কস্ এ মুদ্রিত, এষ্টিক কাগজে পরিষ্কার
ছাপা, অতি মনোরম বাধাই, সোনার জলে নাম লেখা।
গ্রন্থখানি 'ঢাকা সাহিত্য পরিষদের' গ্রন্থাবলী ভুক্ত। মূল্য
সাধারণের পক্ষে ৩০০ টাকা, ঢাকা সাহিত্য পরিষদের
সভ্যের পক্ষে ৩০ টাকা। পুস্তকখানির নাম ঢাকার
ইতিহাস। এই খণ্ডে প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস নহে, ঢাকার
স্ববিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ভূমিকায় ছাড়া
এই খণ্ডের কোথায়ও ঢাকার প্রাচীন বা বর্তমান
ইতিহাস সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই। কিন্তু সমালোচ্য
গ্রন্থখানি ইতিহাস না হইলেও তথ্যপূর্ণ, এবং এই হিসাবে
ইহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। ঢাকা জেলার ঝাল,
ঝিল, ঝিল, প্রসিদ্ধ বন, বন, ও লৌহখনির বিবরণ,
ঢাকার প্রাচীন কীর্তি, ঐতিহাসিক স্থান প্রসিদ্ধ দেবতা,
দেবালয় ও তীর্থস্থান এবং প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প
সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান ও জ্ঞাতব্য বিবরণ ইহাতে
সন্নিবেশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ গ্রন্থখানি ঢাকার ইতিহাসের
ভূমিকাংশ। কিন্তু গ্রন্থকার ইহাতেই যেরূপ অধ্যবসায়
ও অল্পসন্ধানশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা সর্বথা
প্রশংসনীয়। পুস্তকখানিতে ঢাকা জেলার নুতন ও

পুরাতন বিখ্যাত ৪০টি দৃশ্যের ছবি এবং পাঁচখানি
মানচিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপ পুস্তক বাংলাদেশ
প্রতিগৃহে রক্ষিত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।
ভবিষ্যতে আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শ্রীর—

৩৭। ফোফাফা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
এম. এ, প্রণীত, কলিকাতা ৬৫, কলেজ স্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড
সন্স কর্তৃক প্রকাশিত—মূল্য বার আনা, ডবল ক্রাউন
বোডশাংশিত, উত্তম ছাপা, সুন্দর পুরু কাগজের প্রচ্ছদ
পাটে রিলিফে নাম লেখা।

ফোফাফা বাস্তবিকই হাস্য-রসের ফোয়ারা। অনেক
স্থলে 'পরিহাস' বিকল্পিত' বচনের মধ্যেও 'পরমার্থের'
একটা পরোক্ষ সত্য উঁকি দেয় এবং হাস্য-রসটাকে
অলঙ্কৃত জমাইয়া তুলে; এটাই ফোফারার বিশেষত্ব।
নিম্নি এই ফোফারার রসভোগ করিবেন তিনি মেইল
গাড়ী চড়ার সুখ পাইবেন এবং গরুর গাড়ী চড়ার
আত্মসমুদ্বিগ্নতা। আবার তীর্থ দর্শনের আনন্দ ভোগ
করিয়া 'শীতলা বিহীন' প্রবাস-বাসের সুখ হৃৎকের অবস্থাটাই
উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সাহিত্য-চাটুর্নী চুটকীর
রসে তাহার রসনা টস্ টস্ করিতে থাকিবে এবং ইংরেজ
সাহিত্যিকগণের নাম-মাহাত্ম্যের রসাস্বাদে তিনি অতিশয়
প্রীত হইবেন। বোধোদয়ের বাধ্য পড়িলে আড়ষ্ট
বোধশক্তি চকল ও সজাগ হইয়া উঠিবে এবং ধীরে
ধীরে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার মুক্ত হইয়া আসিবে।
পাঠক শেষ কালে ভাষাতত্ত্বে অভিজ্ঞ হইয়া গবেষণার
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিবেন এবং গৃহে ফিরিয়া পত্নী-
তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিবেন—বুঝিবেন রন্ধন-পটুতা না
থাকিলে গৃহিণী গৃহ-লক্ষ্মী হইতে পারে না, এবং প্রিয়-
তমার স্বহস্ত-রচিত পাণ না পাইলে আহায়ে কদাচ
তৃপ্তি লাভ হয় না। এই শ্রেণীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় এইই
প্রথম।

শ্রীজ্ঞানেশ্বর।

খোকা হ'ক *

খোকা হ'ক পাখী যখন প্রতিবেশীর গৃহপ্রান্তস্থিত বৃক্ষোপরি বসিয়া প্রথমে হলুধ্বনি জুড়িয়া দেয়, তখন সত্য সত্যই ভ্রম জন্মে, বুঝি কোন প্রতিবেশিনী চাঁদপানা সম্ভান প্রসব করিয়াছেন, তাই এই আনন্দের হলুধ্বনির আবির্ভাব! খোকা হ'ক পাখীর প্রারম্ভ সঙ্গীতে আমরা বহু বার প্রতারিত হইয়া থাকি। কোন্ দিকে কোন্ বাড়ীতে 'উলু' দেয়—কাণ' পাতিয়া পাতিয়া তাহা লক্ষ্য করি। কিন্তু তাহার উলুধ্বনি শেষ হওয়ার পূর্বেই এই ভ্রান্তির নিবারণ হইয়া যায়। কারণ এই ধ্বনির শেষাংশ শ্রবণ করিলেই উহা মানব কণ্ঠজাত নহে বলিয়া সহজেই প্রতীত হয়। প্রথম ধ্বনির পরে ঐ পাখী ক্রমাগত 'খোকা হ'ক' 'খোকা হ'ক' বলিয়া আশীর্বাদ বর্ষণ করিতে থাকে। গৃহস্থ বধূর নিকট এর' চেয়ে কল্যাণপ্রদ ও আনন্দের কামনা আর কি হইতে পারে? খোকা হ'ক পাখী যখন নিরালায় বসিয়া এক মনে তাহার কল্যাণ কামনা প্রেরণ করে, তখন না জানি কত পুণ্যমুখ-দর্শন-বক্ষিতা-রমণীর হৃদয়ে অজাতসারে এক আশার কিরণ মাখিয়া দিয়া যায়।

খোকা হ'ক পাখী বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। স্বয়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি জিলার কোনও কোনও অংশে ইহা ভগদত্ত বা ভগদৎ নামে পরিচিত। 'খোকা হ'ক' ধ্বনিকে ঐ অঞ্চলের লোকেরা 'ভগদৎ' বলেন। আবার কেহ কেহ ইহাকে 'বোকা তোতা'ও বলিয়া থাকে। চেহারা দৃষ্টে 'বোকা তোতা' বলায় মান-হানিকর কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভগদত্তের সঙ্গে ইহার আদৌ কোনও সামঞ্জস্য দেখা যায় না। কোন ভগদত্ত কবে কি অপরাধে পক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন পল্লী-রমণীগণও সে ইতিহাস অবগত নহেন।

* 'পায়ক পাখীর' অন্তর্ভুক্ত

খোকা হ'ক পাখিয়ার মতই বড় পাখী। তবে ইহার শরীর আর একটু বেশী মোটা এবং কিঞ্চিৎ নাড়স্ নাড়স্ গোছের। লেজ বেটে—এ জন্তও ইহার সৌন্দর্য্যের হানি ঘটিয়াছে। পালধের বর্ণ শেওলার মত নীল। এই শেওলা রঙ্গের অস্তরণ হইতে মেটে সাদা যেন স্থানে স্থানে প্রকাশিত হইতে চাহে। পেটের নীচের রঙ্গ মেটে নীল। ডানা ছুটি পুরু এবং কম মজবুত। ডানার নীচেকার রংও মেটে নীল। গলা মোটা। মাথার উপর হইতে গলার চারি দিক দিয়া সিংহের কেশরের মত খেঁতাভ পদ্ম রঙ্গের চোমাবলী বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। চক্ষু ছুটি ডাগর এবং ইহাদের চতুর্দিকে কৃষ্ণাভ বেষ্টিত আছে। ঠোঁট মোটা পুরু এবং প্রায় ১½ ইঞ্চি লম্বা। ঠোঁটের রংও গলার রঙ্গের মত। ঠোঁট এত নরম যে, টিপ দিলেই চাপিয়া যায়। ঠোঁটের উভয় পার্শ্বে নাসা-রন্ধ আছে, ইহারা এক বাহে দুইটি ডিম প্রসব করে। ডিমগুলি নীলাভ সাদা এবং প্রায় জলপাইর মত বড়। খোকা হ'ক বাঁশ-ঝোপে বা বেতস-কুঞ্জে কিংবা দুর্গম জঙ্গলে আপন বাসা নিৰ্ম্মাণ করে। কেহ কেহ বলেন ইহারা কায়দা পাইলে 'ছাটারিয়া' বা 'সাতভাই' পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে।

খোকা হ'ক পাখীর পা ছুটি ৩ ইঞ্চি লম্বা। ছাটু পর্য্যন্ত পালকে আবৃত। নখ মোটা এবং নরম। পায়ের রঙ্গও গলার রঙ্গেরই মত বলা যাইতে পারে। ইহারা অধিকাংশ সময়ট জোড়া বাঁধিয়া বিচরণ করে না—একাকী থাকে।

শীত কালের মাঝামাঝি খোকা হ'ক পাখী ডাকিতে আরম্ভ করে। মাদী পাখী খো—কা, খো—কা বলিয়া সাড়া দেয়; এই সাড়ার সহিত আসঙ্গ লিপ্সার সম্বন্ধ প্রচুর বিদ্যমান। বসন্তের আগমনের পূর্বেই ইহারা গর্ত খারণ করে। তবে কখন কখন চৈত্র মাস পর্য্যন্তও ইহারা ডিম পাড়িয়া থাকে।

এই পাখীরও জ্ঞী-জাতি কোকিলের মত পুরুবগুলিকে একটু হয়রান করিয়া থাকে। পক্ষিগীর ডাক শুনিয়া

খোকা হ'ক তাহার নিকটে যায়, পক্ষিণী বৃক্ষান্তরে গমন
করিয়া আবার তাহাকে ইঙ্গিত করে।

বর্ষা কাল পর্য্যন্ত খোকা হ'ক পাখীর ডাক শোনা যায়।
অতঃপর কদাচিৎ ইহাদের আশীর্ষাণী শ্রুত হইয়া
থাকে, যেন সে সময় দেশে খোকাকার আবির্ভাব হইতে
নাই।

আমাদের দেশে আপামর সকলেরই একটা সংস্কার
আছে “তুলাপাইজ,” “নিহালিয়া” “আঁটিয়া” “ভুতিয়া”
প্রভৃতি জাতীয় কলা খোকা হ'ক পাখী না খাইলে
পাড়িতে নাই। পাড়িলেও তাহা কদাচ পাকিবে না।”
ঐ সকল কলা পাকিবার উপযুক্ত হইলেই খোকা হ'ক
আসিয়া খাইতে আরম্ভ করে এবং কেহ সন্ধান না
করিলে কাদির সমুদয় কলারই সদগতি বিধান করিয়া
থাকে।

খোকা হ'ক ফলাহারী হইলেও সম্পূর্ণরূপে যতি
নহে; ইহাদিগকে কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করিতেও দেখা
যায়।

খোকা হ'ক লোকালয়ের আশেপাশে বিচরণ করিতে
ভীত হয় না, তবে কখনও লোকের আশেপাশে পদার্পণ
করে না।*

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

* এই প্রবন্ধ প্রেরণ সময়ে জনৈক মহিলা বলিলেন আমাদের
দেশে সন্তান হওয়ার পর মাস-অশোচান্তে বন-দেবী বন-দুর্গার পূজা
করা হয়। খোকা হ'ক পাখী সেই বন-দেবীর আদেশ বাণী
আশীর্ষাদের মত দেশময় বর্ষণ করিয়া থাকে; বন-দেবীর এই
আশীর্ষাণী শুনিয়া না কি নিঃসন্তান রমণী গলগলীকৃতবাদা হইয়া
একান্ত চিন্তে বন-দুর্গাকে প্রণাম করিয়া সন্তান কাহনা করিয়া
থাকেন।

লেখক

কবি-কাহিনী

শ্রীযুক্ত নকড়ি বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে,—
“মহাশয় কি করেন?” তিনি সোণার বাধানো, সুরু ছড়ি
খানা হঠাৎ ব্রুাইয়া, হাসিয়া বলেন, “আমি সাহিত্যিক।
মহাশয়, অনুগ্রহ ক'রে আর আমায় কিছু জিজ্ঞাসা
করবেন না।” অর্থাৎ নকড়ি বাবুর বিশ্বাস এই যে,
দেশের যে সমুদয় ভদ্র ইতর লোকগুলির আজও
এটিকেট্ জ্ঞান হইল না, যে সকল অপদার্থগুলা এই
বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিনেও, অপরের “প্রাইবেট
অকুপেশান” হাঙড়াইয়া বেড়ায়, তাহাদের প্রতি এইরূপ
সহজ মুষ্টিযোগই ব্যবহৃত।

মোট কথাটা এই—নকড়ি বাবু অবস্থাপন্ন জমি-
দায়ের ঘরে একমাত্র উত্তরাধিকারী, সম্প্রতি আইনতঃ
নাশালক। মা ষষ্ঠীর কৃপায় জীবনের বিংশ বসন্তে
পদার্পণ করিয়াছেন। বাধাহীন আদ্যর এবং তাড়না-
মুক্ত মেহের মাঝে, এ পর্য্যন্ত বিচি-ছাড়ানো স্নমধুর
বেমানার রস পানেই বর্জিত হইয়াছেন। সম্প্রতি
ছিপ্ছিপে দেহখানি লইয়া সোণার চসমা চোখে, সবে
সংসারের পানে হাসিয়া চাহিয়াছেন,—সবুজ সংসারও
সবে তাঁর পানে হাসিয়া চাহিয়াছে। এক কথা অবশ্য
বলা বাহুল্য যে কমলার ঐশ্বর্য্য-কল্লতরুর ছায়া-তলে
বসিয়া বীণাপাণির পুস্তক-রঞ্জিত মঙ্গল-স্পর্শ-লাভটা ভাল
করিয়া তাঁর ঘটিয়া উঠে নাই।

সে বাহা হউক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা
মন্দিরে মা সরস্বতী যখন তাঁহাকে গণিত শাস্ত্রে একটি
শ্রীফল হাতে দিয়াই বিদায় করিলেন, তখন এই ভাবিলেন
যে, বিমাতার নিকট ইহার অধিক আর কি প্রত্যাশা
করা যায়!

গীতায় বারংবার ভগবান বলিয়াছেন যে সূধে
অনুবিগমনা, এবং দুঃখে বিগতস্পৃহ সে-ই হিতৈষী;
সুতরাং যে বঙ্গ সাহিত্যের জ্ঞান-মন্দিরে, কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের টিকিট না লইয়া গেলেও প্রবেশাধিকার পণ্ড হইয়া যায় না, সেই স্থানে, নকড়ি বাবু আপনার তরুণ জীবন সমর্পণ করিলেন! এই প্রকার নিকাম সাধনা-যজ্ঞ কলিতেও সম্ভবপর জানিয়া ত্রিদিব হইতে সুরাঙ্গনাগণ পুষ্প বৃষ্টি করিয়া ছিলেন কি না, ঠিক জানা যায় নাই—তবে নকড়ি বাবুর প্রমাদাকাজী উপগ্রহগুলি একেবারে ধ্বংস করিয়া উঠিল।

ঠিক কোন খুঁটান্ধে নকড়ি বাবু একটিমাত্র শ্রীফল পাঠেয় করিয়া সাহিত্যের মহারণে জ্ঞান-বৃক্ষের অমূলসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন, সাহিত্য-পরিষদ এখনও সে বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তবে এ ঘটনা যে তাহার পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ঘটিয়াছিল, এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। পিতৃ-বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের নাগ পাশ হইতে মুক্ত হইয়া নকড়ি বাবুকে কিছু দিন পৈত্রিক বাস-ভবনে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এ সংসার বড়ই বিচিত্র স্থান! দুঃসময়ে বিপদ কখনও একাকী আসে না। এ ক্ষেত্রেও তাই হইল—নকড়ি বাবু বলিলেন গ্রাম্য ম্যালেরিয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বাবুর সভাসদগুলির মধ্যে একটা শোকের রোল পড়িয়া গেল,—নকড়ি বাবুর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমলপুরের বনিয়াদী মজুমদার পরিবারের বংশপ্রদীপ বুকি বা একেবারেই নিবিয়া যায়! জেলার সাপ্তাহিক পত্র বিশেষ সংবাদ দাতার স্তম্ভে এক আশঙ্কা সূচক সংবাদ প্রকাশ করিয়া, “লিডারে” সে জন্ত প্রকাশ্য ভাবে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। গ্রামের ফেমিলি ডাক্তারের ডাক পড়িয়া গেল। তিনি অবস্থা শুনিয়া এবং ষ্টেথোস্কোপ দ্বারা বারংবার আভ্যন্তরীণ যন্ত্র সমুদয় পরীক্ষা করিয়া বলিলেন এখনও বাহ্যতঃ কোনও স্পষ্ট লক্ষণ না দেখা গেলেও, অন্তরে অন্তরে বাবুর বিষম ম্যালেরিয়া বিষ প্রবেশ করিয়াছে। রোগ ত দূরের কথা, চতুর ডাক্তার রোগের ‘ব্যাসিলি’ শুদ্ধ বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, এ সকল ব্যারামে মনকে প্রকৃত রাখাই হচ্ছে যথার্থ

ঔষধ, সঙ্গে একটা টনিকও চলিবে। নায়েব, দেওয়ান, ডাক্তার, দ্বার পণ্ডিত, এবং ছুকু খানসামার সঙ্গে বহু বাদানুবাদ ও পরামর্শ করিয়া অবশেষে স্থির হইল, বাবু পরিবর্তন ও নষ্ট স্বাস্থ্যের পঙ্কোদ্ধার উপলক্ষে বাবু কিছু কাল গাজীপুরে গিয়া বাস করিবেন।

গাজীপুর! গাজীপুর! নাম করিতেও যে চিন্তার ভিতরে গোলাপের খোসবাই আসিয়া লাগে! গাজীপুরের নামে নকড়ি বাবুর কাব্য শক্তি একেবারে শাপিত হইয়া উঠিল। চারি দিকে শ্রামল প্রকৃতি একেবারে লাল-লাল—যেন সূর্যের শাখায় শাখায় অগ্নি স্ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে দেশের গোলাপী আনন্দের মধ্যে ভালবাসা যেন পাগল হইয়া ফিরিতেছে! এ কল্পনার উৎসবের শুধু একটি জিনিষ নকড়ি বাবু দেখিতে পাইলেন না, সেটি কণ্টক!

যাহা হউক ভগ্না উৎসাহ ও আনন্দের মধ্যে যখন গাজীপুরের উদ্দেশে নকড়ি বাবুর গাঁঠুরী, ট্রাক, ব্যাগ, বিছানা সমুদয় প্যাক করা হইয়া গেল, তখন জন্মভূমির মুখের পানে চাহিয়া নকড়ি বাবুর চক্ষে জল আসিল! মাইকেল মধুসূদনও বিলাত যাইবার কালে, জন্মভূমির পানে তাকাইয়া এমনি কাঁদিয়া ছিলেন,—তাই নকড়ি বাবুর বিদেশে যাওয়ার সময়ও তেমনি কান্না আসিল! নকড়ি বাবুর হৃৎক যে কবিতায় লিপিবদ্ধ করেন নিজে তাহার একটু নমুনা প্রকাশ করা গেল—

“দিও গো চরণে স্থান,

এ মিনতি, হে জন্মদে!

করিতে কবিত্ব যোগ,

ঘটে যদি গোল যোগ,

তোমারে ডাকিব আমি,—দিও স্থান পদ-নদে!

বিদেশে গোলাপ-গন্ধে,

প্রাণে যদি নামে সন্ধো,

খেদ নাই, হায়, গেলে প্রাণ দেহ হ’তে,—

(কারণ) জন্ম-মৃত্যু অবিকল

এক বৃক্ষে (ই) দুই ফল

এক খেলে খাবে আর—অতি সুনিশ্চিত!”

যাহা হউক নকড়ি বাবু যখন সময়ে গাজীপুরের গোলাপারণ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পেয়াদা-পাইক, আমলা-মুহুরী গোমস্তা-খানসামা এক দল পঙ্গ-পালের মত গাজীপুরে আসিয়া পঁহুছিল। নকড়ি বাবুর জন্য একটি দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। কমলপুর পরিত্যাগ করিলেও, কমলপুরের উপসর্গগুলি নকড়ি বাবুর স্বল্প গাজীপুরের চারি ধারে ঘোমের মত লাগিয়া রহিল! তাই গাজীপুর বাহিরে, ভিতরে সেই কমলপুর! নকড়ি বাবুর সঙ্গে তাঁহার মাতা রাজেশ্বরী দেব্যাও গাজীপুরে আসিয়া ছিলেন।

তিনি টের পাইয়াছিলেন ব্যারামটা যেরূপ তাড়াতাড়ি বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে ছেলেকে একটু বিশেষ চক্ষে চক্ষু রাখার প্রয়োজন। সুতরাং রাজেশ্বরী দেব্যার গাজীপুরে আসাটা নকড়ি বাবুর নিকট একটা বিষয়ের মতই ঠেকিল। যাহা হউক, নকড়ি বাবু ভাবিলেন, আর দুটি বৎসর বই ত নয়! তারপর সাবালক হইলে তাঁহার ইচ্ছার মুখে কে লাগাম দিতে আসে, এক বার দেখিয়া লইবেন।

গাজীপুরে আসিয়াও নকড়ি বাবুর কবিত্বের চাষ অতি নিপুণভাবে চলিতে লাগিল। পারিষদ-মণ্ডলী জন্ত বিশেষের ত্রায় তারত্বের বলিয়া উঠিল, এতই কবিত্বের অতিব্যক্তির চরম কলি! এদিকে কিন্তু ষ্টেট ঋণ-ভারে টলমল করিয়া উঠিল। নায়েব-গোমস্তা ‘সামান, সামান’ ইঁাক ছাড়িলেন কিছুতেই আর লাটের তারিখে সদর খাজানা গুজরান হয় না; সুদের টাকা না পাইলে মহাজন আর এক পরস্যাও ধার দিবে না! তখনও পারিষদ-মণ্ডলী বাবুকে অতি-সহজে বুঝাইয়া দিলেন “বরং বনং ব্যাজ গজেন্দ্র দেবিতং” তবুও এমন উন্মুখী প্রতিভাকে অকালে কণ্ঠরোধ করা যায় না! কারণ নকড়ি বাবুর কলা চর্চার সহিত এ পরিষদের সভাগণের উদরায়িত্ব একটি অতি নিকট সম্পর্ক ছিল; বস্তুতঃ নকড়ি বাবুর কবিত্বক্ষেত্রে চাষটা এমন সুনিপুণ এবং গভীরভাবে চলিতে লাগিল যে, অবশেষে বাধ্য হইয়া গভর্ণমেন্ট ষ্টেট

কোর্ট অব্.ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে লইয়া শাসন সংরক্ষণ করার প্রস্তাব নকড়ি বাবুকে জ্ঞাপন করিলেন।

২

নকড়ি বাবু চারি দিকের কাচের সাসি দরজাগুলি খুলিয়া দিয়া তাঁহার দ্বিতল ভবনের দক্ষিণদ্বারি কামরাটিতে বসিয়া আছেন। পূর্বদিকস্থ সবুজ গাছ পালার শিরে শিরে সোণার মুকুট পরাইয়া দিয়া প্রভাতের রৌদ্র যুক্ত বাতায়ন পথে নকড়ি বাবুর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে—কামরাখানি যেন একবারে “তরল স্বর্ণ-পরিমিত”! নকড়ি বাবু একখানি ইজি চেয়ারে নিদ্রা-জড়িত চক্ষে শুইয়া আছেন। টেবিলের উপরে রেকাবের উপর অবস্থিত চা পেয়ালাটি—তাঁহার গায়ে সোণার ডালে, রঙ্গ বেরঙ্গের ফুল-পাতা লেখা রহিয়াছে। প্রভাতের রোদ লাগিয়া পরিকল্পনাটি একেবারে জরির মত ঝিক্ ঝিক্ করিয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট মাউন্টের মাঝে হুচারখানি কটো কলা চর্চার উপকরণ স্বরূপ টেবিলের উপর সাজানো—ইতস্ততঃ কয়েকটি জাপানী শব্দ হালকা শোভা বিস্তার করিয়া টেবিলের উপর পড়িয়া আছে। দেয়ালের উপরে দুইটি রাকে কতক-গুলি বক বকে বাঙ্গালা বই; এক পাশে গ্রামোফোন-বাগ্ম যন্ত্র, তাহার শুণ্ড উত্তোলন করিয়া গান গাহিয়া উঠিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে; অপর পাশে পিয়ানোটি সারা রাত্রির আর্তনাদের পর প্রভাতের শীতল স্পর্শে যেন একটু ঘুমাইতেছে। নকড়ি বাবুর হাতে “দর্পণ” নামক একখানি মাসিক পত্র। অলস ভাবে দর্পণের পাতায় চক্ষু বুলাইতে ছিলেন। এমন সময় মা রাজেশ্বরী সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। নকড়ি বাবু বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, সংসার রসাতলে যায়! এ সম্বন্ধে কথাটা ছেলের কাছে আজ নিশ্চয়ই পাড়িবে, এই তাঁর মতলব। মা-কে দেখিয়াই নকড়ি বাবু একটু বিরক্তির স্বরেই বলিয়া উঠিলেন—

“এখন সরে যাও মা; মাথায় একটা প্লট ঢুকেছে!”
রাজেশ্বরী দেব্যা সেকলে মাফুষ হইলেও বুদ্ধিমতী।

নকড়ি বাবুর কথাটার মধ্যে যেটুকু ফাইন আর্ট ছিল, সেটুকু বাদ দিয়া, নিরেট গল্পের অর্থটা চুয়াইয়া লইয়া মনে মনে বলিলেন, “ইংরেজী করে বললে কি হবে, বাপু, মাথায় যে ভূত ঢুকেছে তা’ত আমি জানি!” প্রকাশে বলিলেন—

“ও বুলিটা তো মাকাতার সময় থেকে শুনে আসছি; তবু যদি হাতে কলমে কিছু বেরুতো, তবে বুঝি বা কালীতে ভূমিকম্পই হতো!” মা আরো কি বলিতে যাইতে ছিলেন কিন্তু সেটা চাপিয়া গেলেন, কারণ হিত বচন তো তত মনোহারি হয় না! এবার কিন্তু নকড়ি বাবুর হাসি সবখানি মুখ ভরিয়া দিয়া হৃদিকে আকর্ণ বিস্তৃত হইয়া উঠিল। আনন্দে মুকুলিত চোখ দুটিতে মায়ের পানে তাকাইয়া তর্কের সুরটা অনেক নীচে নামাইয়া বলিলেন; “এবার পপে এসো মা; দেখ, সব ঠিক ঠাক্ করেছি এবার কলিকাতা গিয়েই আমার “নব কল্প” প্রেসে দোবো!” মা একটু উপহাসের ছলে বলিলেন, “ও রকম তো ঢের দিন পেকে শুনে আসছি, ও বাড়ীর মালতীর মতও যদি তোর ক্ষমতা থাকতো! এসেছিল সে দিন আমার কাছে সে; আমায় তার ছাপানো কবিতার বই দিয়ে গেছে।” মালতী! কবি চণ্ডীদাসের প্রেমের ফুল! মায়ের কথাটার মধ্যে, বিলাতের সাফ্রিগিষ্ট নারীদিগের ঔদ্ধত্যের ঝাঝ একটা শলা নিহিত ছিল বটে কিন্তু তবু কবি চণ্ডীদাসের ফুলের মাদক গন্ধে নকড়ি বাবুর লুপ্ত বিদোহ-ভাব ফণা মেলিতে পারিল না। পাশের বাড়ীর নামের মস্তগুণে, নকড়ি বাবুর কল্পনার উপর ভাবের আর একটা রক্ত শলাকা ঝিলিক দিয়া উঠিল।

কথাটা এখানে একটু খোলসা করিয়া বলা দরকার। নকড়ি বাবু গাজীপুরে যে দ্বিতল বাড়ীটি ভাড়া লইয়াছেন, তাহার লাগ দক্ষিণ ধারেই ছোট একখানি একতলা দালান। নকড়ি বাবু কবির চর্চার জন্ত যে কামরাখানি বিবিধ উপকরণে সজ্জিত হইয়াছে, তাহার দক্ষিণের জানালাটি খুলিলে, অথবা খালি কাচের সাসি বন্ধ

থাকিলেও—পাশের বাড়ীর ভিতরটা সব দেখা যাইত। সেই ছোট একতলা দালানে, রাস্তার দিকে বড় সাইন-বোর্ড খাটাইয়া ত্রীমতী মালতীবালা বস্তু বাস করেন। ইনি কলিকাতার ক্যাম্পবেল বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা লেডি-ডাক্তার; ‘মাতী’ বলিলে চটেন বলিয়া সাইন-বোর্ডেই পদবীটা বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল। চরিত্র-গুণে এবং চিকিৎসা-নৈপুণ্যে গাজীপুরে ইহার যশ এখন তুল্লবর্ণ ধারণ করিয়াছে, একথা বলা যাইতে পারে। বয়স বিংশের সেড় পার হয় নাই। লাল রেশমী ফিতায় বাঁধা, কালো চুলের তরঙ্গের মাঝে কচি চাঁদপানা একখানা মুখ ঐ বাড়ী হইতে, কত দিন হইল, নকড়ি বাবুর বিম্বল কবি প্রতিভার উপর দিয়া গোপনে দ্রুত যাওয়া আসা করিতেছিল। সে মুখ যাহার, তাহার স্তন্যে কবিত্বের অমৃত রহিয়াছে, এ নব আবিষ্কারের আনন্দ নকড়ি বাবুর পক্ষে সামলানো দায় হইল। হঠাৎ এ কি আনন্দ! নকড়ি বাবুর মস্তকের গোপন কক্ষে, আজ কিসের এ নিবিড় উৎসব। অশরীরী দেবতার ষড়যন্ত্রে আজ অকাল বসন্ত সহসা তার সমুদয় ফুলোৎসব লইয়া নকড়ি বাবুর নিকট যেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চাপরাশীর ঝায় নরম গরম ভাবে বকশিশ্ চাহিতেছে। ঠাকুর স্তনের কোঠা অতি তাড়াতাড়ি পার হইয়া অচিরে নকড়ি বাবুর মস্তিস্কের উপর তাহার তাঁবু ফেলিয়া, তাঁহার মীনধ্বজাঙ্কিত বিজয় নিশান উড়াইয়া দিলেন। স্ততরাং ততক্ষণে মালতীর আরক্তপ্রাস্ত কর্ণ-মূলের হীরকাকুরজড়িত ক্ষুদ্র ইয়ারিং দুটি উড্ডীয়মান কবির গোপন হর্ষের উপর একেবারে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে! মনের ভাব চাপা দিবার জন্ত একটা অতি নিষ্ঠুর চেষ্টার পর, কতকটা সামলাইয়া বলিলেন—

“মালতী! বেশ নামটি তো, কে সে, মা?”

মা বলিলেন—“ও পাশের বাড়ীর মেয়েটা; এখানকার হাসপাতালে মেয়ে-ডাক্তার; যেমন, নরম সরম স্তন্য তার, তেয়ি লক্ষ্মীমন্ত তার চেহারা!” বন্ধে ভিতর দিক হইতে যে একটা ভাব উঠিতেছিল,

কণ্ঠনালীর মাংসপেশীর সাহায্যে বহু কষ্টে তাহাকে বস্ত্র চাপা দিয়া নকড়ি বাবু বলিলেন—“বইখানার নাম কি মা, বলতে পার?” নামটার মধ্যে একটা বিকী কিড়িমিড়ি ছিল। তাই রাজেশ্বরী পুস্তকের নাম বলিতে পারিলেন না। তাহাদের কৰ্ত্তাদের সময় মেয়েদের লেখাপড়া জানাটা বেহায়াপণার মধ্যে গণ্য হইত। রাজেশ্বরী তাহার কামরা হইতে বইখানি আনিয়া নকড়ি বাবুর হাতে দিয়া এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলেন। পুস্তকখানির মলাটের উপরে সোণার ফলে লেখা ছিল, “কজ্জল রেখা” শ্রীমতী মালতীবালা বসু রচয়িত্রী। হঠাৎ নকড়ি বাবুর মনে পড়িয়া গেল, এইমাত্র না তিনি “দৰ্পণে” কজ্জল রেখার সমালোচনা পড়িতেছিলেন? তাড়াতাড়ি “দৰ্পণ” খুলিয়া নব কৌতুহলের সহিত দৰ্পণে কজ্জল রেখার সমালোচনা পুনরায় পড়িতে লাগিলেন—

“কজ্জল রেখা”—শ্রীমতী মালতীবালা বসু রচয়িত্রী। মূল্য সাড়ে দশ আনা, ১৪নং রেইনবো লেন হইতে অরেন্স ব্লসম প্রেসে জাপান হইতে আনীত নূতন টাইপে মুদ্রিত।

কয়েকটি উজ্জল খণ্ড কবিতার মধুর সমাবেশ। ভাবের কম্পনে কম্পনে বিরহের অশ্রু হীরার ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখিকার রুচি মার্জিত তবে বিরহটা একেবারে সজ্জ বলিয়া, দুই এক স্থলে ভাবের চাপা পড়িয়া ভাষা একটু বেসুরা বাজিয়াছে। হাত পা কিয়া আসিলেই এটুকু ফলের মুখে গুরু ফুলটির মত, আপনিই ধসিয়া যাইবে। মোটের উপর একথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা চলে যে, যে কালে নারীর জাতিগত শ্রদ্ধাবশতঃ তাহাদের যা-তা লেখা যেমন তেমন করিয়া কাগজে ছাপা হইলেই সমালোচকগণ আনন্দে ধ্ৰুবাধ্বনি করিয়া উঠিতেন—এটি সে শ্রেণীর রচনা নহে। শ্রীধাতির নাদারত।

রাজেশ্বরী গৃহকর্মে চলিয়া গেলে পর, নকড়ি বাবু মন খুলিয়া অজ্ঞমনস্ক হইতে পারিলেন। আজ আর ত মন ডালে বসিতে চায় না! মনের আশে পাশে, শিশেষতঃ দক্ষিণের জানালার পাশে, মালতী ফুলের হালকা খোসনাই হালকা হাওয়ায় বেজায় মাতামাতি

আরম্ভ করিয়াছে। অবশেষে নকড়ি বাবু যখন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া, তাহার কচি দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে অজ্ঞ মনে বলিয়া উঠিলেন—“এটো কবির যোগ্য বটে! তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, শান্ত সুদূর—”তখন শ্রীমতী মালতীবালা বসু, নকড়ি বাবুর চিন্তা-সাম্রাজ্যে নায়িকার বেশে একেবারে খাস দখল লইয়া বসিয়াছেন।

বিনা রক্তপাতে একটা ফরাসী বিপ্লব গান্ধীপুরে সংঘটিত হইয়া গেল। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অমুসারে এখন কাহার নামে অনধিকার প্রবেশের মামলা চলিবে। কে বাদী, কে প্রতিবাদী! আইনের স্বাক্ষর বিচারে যাহাই হউক না কেন, সুন্দরকে অজ্ঞের ভাবের মধ্যে গ্রহণ করিয়া কথার ছন্দে প্রকাশ করার নামই ত কাব্য! তাই যদি হয়, তবে যে কস্তুরী মৃগী আপনি আসিয়া জালে পড়িল, তাহাকে “মরালিটা”র হিসাবে না হউক, অন্ততঃ স্বাক্ষর ফাইন আর্টের খাতিরে, ভাব ও জীবনের মধ্যে গ্রহণ করিতে নকড়ি বাবু জায় ও “ইকুইটি” মধ্যে বাধ্য। বলা বাহুল্য, নকড়ি বাবুকে কখনও “লজিক্” পড়িতে হয় নাই।

বেলা ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। মালতীবালা তাহার ছোট্ট টেবিলখানার দিকে ঝুঁকিয়া ‘নোকাডুবি’ পড়িতে-ছিলেন। গ্রীষ্মের তপ্ত নিশ্বাসে তখন প্রভাতের স্নিগ্ধ শীতলতা দূর হইয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতরে, কাচের রান্না দরজা দিয়া রোদ আসিয়া মালতীর মুক্ত, ঘন তরঙ্গিত কেশ রাশির উপর একটি বিচিত্র রঙ্গের কিরণ-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। নির্মল কপোলখানি সুন্দর করতলে শিথিলভাবে গুস্ত। রোদের ছটা হাতের লাল বেলেয়ারি চুড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে কপোলের উপর একখানি রান্ধা গোলাপী স্বপ্নের আভা ছড়াইয়া দিয়াছে। মধুর প্রভাতে নির্মল রোদ করে বিহঙ্গের কাকলী ভাসিতেছে, আসবাবহীন ছোট্ট ঘরখানিতে রূপের লক্ষ্মীটির মত যখন মালতী বসিয়াছিল, তখন সৌন্দর্যের সোণার কাঠির স্পর্শে সে বুকি ছবি হইয়া গেছে—এমনি

মনে হইতেছিল। এমন সময় কি আসিয়া টেবিলের উপর একখানা চিঠি রাখিয়া গেল। নীল বড় লেপাফা, পাঠে সোণার জলে লেখা মনোগ্রাম। ভিতরে পরে এইরূপ লেখা ছিল—

“পরম প্রীতিনিগরাসু,

ভাবের মিল হইতে ভালবাসার উদ্ভব কেবল সাহিত্যিকদিগেরই সম্ভব। আপনি মা-কে উপলক্ষ করিয়া যে “কজ্জলরেখা” অধমকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে আমার বাকী নাই। কজ্জলরেখার নিবিড় প্রান্তে যে গোপন অক্ষর প্রচ্ছন্ন, আমি যদি কবি হইয়া থাকি, তবে তাহা আমি এক দিন প্রেম-ক্রমালে মুছাইব। আপনি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, কজ্জলরেখার কয়েকটি কবিতার সঙ্গে আমার রচিত কয়েকটি কবিতার অসামান্য সৌসাদৃশ্য আছে। এমন কি, ইহাও পড়িয়া এগুলিকে দুই ব্যক্তির লেখা বলিয়া ঠাওরান কঠিন।

প্রেমের রাজ্যে সাহিত্যিকদিগের প্রবেশ সাহিত্যের ভিতর হইলে বড়ই শোভন হয়।

আমি আপনার ধর্ম্মাধর্ম্ম, জাতি কুল কিছুই জানি না। প্রেমের আবার জাতি কুল কি? আমার এ প্রস্তাবে একটা কঠিন স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু প্রেমের জন্য আমি তাহা অনায়াসে করিতে পারিব। কথাটা কিছু নয়—হয়তঃ মা ইহাতে রাজি হইবে না। কাব্যে তার কোনও অধিকার নাই—স্বাভাবিক প্রেমের তার কোনও জ্ঞান নাই। সুতরাং তাহার বাধাকে আমি বাধা বলিয়াই মনে করি না। আজ শুভ দিনে এই পত্রে আমার মর্ম্মের গূঢ় ভালবাসা আপনার ত্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম। গ্রহণ করিবেন কি? আপনার নিকট হইতে প্রশ্রয় পাইলে বিবাহে আমার অথত নাই। তবে আমাদের কাব্য শাস্ত্রে এরূপ স্থলে গান্ধর্ব্ব মতই প্রশস্ত। পত্রের উত্তরের আশায় চাহিয়া রহিলাম।

আপনার সেই অমুরক্ত—

কবি নকড়ি।”

পত্র পড়িয়া মালতী বালার কপোল হইতে আরম্ভ

করিয়া একটা উচ্চতা কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তিম করিয়া দিল। সন্ধ্যাবেলা জবাব মিলিবে নিকটে দিয়া পত্র বাহকের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া মালতীবালা কলে বাহির হইয়া গেল।

৪

শুভ গোপুলি-লগ্নে একটা আশা প্রদ জবাব মিলিবার মধুর সম্ভাবনায় নকড়ি বাবুর কাব্য প্রতিভা আজ একেবারে শাখায় পত্রে বিকশিত! শেলার ভাগ্যে যে সফলতা শুধু স্বপ্নের মাঝে পর্য্যবসিত, কীটস্ বাহার পানে চাহিয়া কাদিতে কাদিতে যক্ষ্মারোগে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, কালিদাসের অদৃষ্ট-মেঘকে স্পর্শকৃত করিয়া যে সফলতা অলকার পানে ভাসিয়া গিয়াছে সে যেন আজ মটোর গাড়ীতে চাপিয়া নিত্যন্ত অবাচিত ভাবে উদীয়মান তরুণ কাবর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, নকড়ি বাবুর কতকটা এমনি মূনে হইল। তরুণ নকড়ীলোকে অমুকুল অদৃষ্টের একটি ধাক্কা মাত্র অপেক্ষা। মধ্যাহ্নের আহ্বারের পর টানিক-ভোজ টানিয়া যখন নকড়ি বাবু তাহার নির্জন কামরাটিতে আসিয়া বসিলেন, তখন “গোলাপে গোলাপময় অন্তর বাহির!” তিনি যেন সত্য সত্যই দেখিতে পাইলেন, নীল আকাশের উপর দিয়া সাতপ মেঘ গোলাপের পাপড়িতে লালে লাল হইয়া সন্ধ্যার অভিসারে ছুটিয়াছে; বিহঙ্গের কল-ঝঙ্কারের সহিত গোলাপের সৌরভের মাদক ধাক্কা লাগিয়া জলস্থল যেন গ্র্যাস্পেনের শোণিত বৃন্দুদে ভরিয়া গিয়াছে। যেন কার চরণ-পদ্যের অলক্ত-রাগের চুন্দন-আকাঙ্ক্ষায় আজ পাথরের রাস্তায় বহুমূল্য পাখীর পালথ বিছানো! ঐ যে পোষ্টো-ফিসের খোটা পিয়নটা চিঠির ব্যাগ লইয়া ঘামিতে ঘামিতে দ্বারে দ্বারে ছুটাছুটি করিতেছে আজ তার মুখ খানিও যেন কমনীয় হইয়া গিয়াছে। নকড়ি বাবুর চক্ষে আজ রাস্তার লেম্প পোষ্টবুলা শুদ্ধ সহস্র ফুলে পাতায় সজীব হইয়া উঠিল! কি সুর মিলিল! কি স্তব্ধ!—

হায়! এ সুখপূর্ণ কবিত্ব জগতে যদি ‘কিস্ত’ না থাকিত অন্ততঃ আজকার ব্যাপারে নকড়ি বাবুর জন্য যদি আজ এই কিস্তর গোলযোগটা একেবারে না থাকিত! নকড়ি

বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, এ জগতে নির-
বচ্ছিন্ন সুখ কোথায় ?

ভাবিতে ভাবিতে নকড়ি বাবু তাহার সোণার ঘড়ি
খুলিয়া দেখিলেন যে দুরন্ত “কিস্তর” লাগাল পাইয়া সন্ধ্যা
আসিতে আসিতে আজ বড় ‘লেট’ হইয়া গেছে ! পূর্য্য
ঠাকুর যেন নকড়ি বাবুর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া
কিছুতেই যেন আজ তাহার সন্ধ্যাকালের জ্বাকুসুম ধারণ
করিতে নারাজ ! “পিরোতি কণ্টক” আজ নকড়ি বাবুর
“হিয়ায়” অতি নিদ্রিত ভাবে গিয়া বিধিয়া গিয়াছে। আজ
প্রেমের টানে তিনি একেবারে ছটফট করিয়া উঠিলেন।
সিদ্ধির মুখের কাছে এতক্ষণ ধরিয়া প্রতীক্ষা করা ! ইহার
মধ্যে প্রেমের একটা অতি নিষ্ঠুর দৌরাঙ্গা আছে।
গোলাপের রজ্জু দিয়া ফাঁস দিলে কি মরণের যাতনা
ফুলের গন্ধের মধ্যে লোপ পায় ?—কখনো না ! ফুলের
অন্তরে যে ছুঁথের বসতি, তার সন্ধান শুধু প্রেমিকই
জানে।

সকালে হউক, আর দেগীতে হউক, ইচ্ছায় হউক
অনিচ্ছায় হউক, অবশেষে সন্ধ্যাকে আসিতে হইল !
পশ্চিম আকাশে রক্তের খেলা ভাঙ্গিয়া দিয়া ধূসর সন্ধ্যা
ধীরে ধীরে দুই নক্ষত্র নন্দন তুলিয়া শরণাগত কবি
নকড়ি বাবুর পানে চাহিলেন। নকড়ি বাবু তখন রবি
বাবুর কাব্যগ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগের ৩৪ পৃষ্ঠার সন্ধ্যা
কবিতাটির ভাবে নিজকে প্রণোদিত করিয়া, ভাবে
মাতোয়ারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

“কাস্ত হও, ধীরে কও কথা, ওরে মন,
নত কর শির, দিবা হল সন্ধ্যাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী ; তিমিরের তীরে,
অসংখ্য প্রদীপ জ্বালা এ বিশ্ব-মন্দিরে
এল আরতির বেলা !”

অভ্যাস মত সায়াহ্নের ভোজটি পেটে পড়া মাত্র নকড়ি
বাবুর কবিত্বের আবেশটি বেশ ভালো করিয়া জমিয়া
উঠিল। কাজল ঢালা আকাশখানিকে তারায় তারায়
খচিত করিয়া দিয়া, নকড়ি বাবুর অলঙ্কিতে, গোখুল-লগ্ন

যে কখন পার হইয়া গেছে, তখন আর তার খবর কে
রাখে ! যখন এক দুই করিয়া চটা বাজিয়া গেল, তখন
নকড়ি বাবুর হৃদয়ের তরল কাব্য-স্রোতে একটা নীরস
গগ্ন আশঙ্কার দানা দুই একটা করিয়া বাধিয়া উঠিল।
তবু বন্ধোলায় ভরসাকে একেবারে ফেলিয়া দেওয়া যায় না।
কারণ বিরহের export কালিদাসের বিরহী যক্ষ নিজেই
বলিয়াছেন আশাই “সম্ভঃ পাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে
রুণঙ্কি।” কিন্তু কিছুতেই ত আর কিস্তর গোলযোগ
থামাইয়া রাখা যায় না ! এইভাবে চিন্তার গোলযোগের
মধ্যে ঢং ঢং করিয়া গীর্জার ঘড়িতে ৯টার বজ্রধ্বনি বাজিয়া
গেল তখন আশার শেষ রেখাটি অন্ধকারে বিলীন হইয়া
গিয়াছে। •

নকড়ি বাবু তখন জলন্ত কৈরাসিনের লেম্পটাকে তাহার
মস্ত বদনা কবি চণ্ডীদাসের ভাষায় বলিতে লাগিলেন
“ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা, শেজ বিছাইল ফুলে !
সব হইল বাসি—আর কেন সহ—ভাঙ্গা গো যবুনা-জলে !”
এমন সময় কালিন্দীবরণ ভজু সিং নীচের তলা
হইতে হাঁকিল, “কোন হায় বাবুকা চিঠি লে যাও
উপর।” তখন সহসা নকড়ি বাবুর ছুঁথের রাগিনীর
মাঝে বড় মধুর একটা মীর বাজিয়া গেল ! নারী !
তোমরা কি প্রেম-চক্ষে হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে
পাও ? কম্পিত-হস্তে, তাড়াতাড়ি চিঠি খানি লেপাফা
হইতে বাহির করিবার সময় পত্রের একাংশ ছিঁড়িয়া গেল।

যাহা হউক জোড়াতালি দিয়া পত্রখানি নকড়ি বাবু
পড়িলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল—

“যথাবিহিত নিবেদনযেতং—

শ্রীমতী মালতীবালার পক্ষে আমি বিশেষ অনুরুদ্ধ
হইয়া আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনার পত্র যথা
সময়ে তাহার হস্তগত হইয়াছে। আপনার প্রেরিত
“অন্তরের গূঢ় ভালবাসা” নামক কোন পদার্থ লেপাফা
খুলিয়া পাওয়া যায় নাই, অতি ছুঁথের সহিত এ কথা
আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইলাম। ভবিষ্যতে এ প্রকার
মূল্যবান জিনিষ কোথাও প্রেরণ করিতে হইলে, সাধারণ

লোকের হাতে না পাঠাইয়া পোষ্টাফিস যোগে ইনসিওর করিয়া পাঠাইবেন।

আপনি শৈলী, প্লেটো প্রভৃতি মনস্বিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনার হৃদয়ের স্বাভাবিক “গার্লস্” প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মালতীবালায় ত্রায় সামান্য মানস্তুরী তাহার যোগ্য নয়। বাড়াবাড়ি করিলে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের প্যাঁচে পড়াও অসম্ভব নয়।

আমি শ্রীশাস্ত্রিরঞ্জন বসু আজ পাঁচ বৎসর হইল তাহাকে বিবাহ করিয়াছি; আমি গভর্ণমেন্ট স্কুলের শিক্ষক। বদলি উপলক্ষে ইঁহাকে “বিশেষ ভাবে বহন” করিয়া বিবাহের ব্যাপ্তিগত উদ্দেশ্য মূখ্য ভাবে পালন করিয়া আসিতেছি।

অল্প বেতনভোগী শিক্ষকের পক্ষে বিবাহের শাদ্ৰ্গত অর্থ সব সময় মানিয়া চলা ব্যয়সাপেক্ষ মনে করিয়া আমি ইঁহাকে গাজীপুরে স্থাপন করিয়াছি। স্থানীয় হাসপাতালে ইনি লেডি-ডাক্তারের কার্যে নিযুক্ত আছেন।

আমি গাজীপুরের নিকটবর্তী বেডৌলি স্টেশনের সরকারী স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করি। মাসে ২১ বার গাজীপুরে যাইয়া থাকি।

আর একটা কথা বলিয়াই আমার পত্র শেষ করিতে ইচ্ছা করি। প্রেম রাজ্যে-সাধারণ অপেক্ষা কবিদের স্বাধীনতা কিছু বেশী সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিরাজ সমাজের গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রেমের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিলে, ভবিষ্যতে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইবেন না। তারপর, শ্রীমতী মালতীবালায় নিকট এ প্রস্তাব করিবার পূর্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে কি না, এবিষয়ে একটু অনুসন্ধান করাটুকি স্মৃতি সঙ্গত হইত না? কাব্য চর্চায় আর প্রয়োগের দোহাই দিয়া মস্তিষ্ক নামক পদার্থটাকে একেবারে বাদ দিয়া লইলে বাণী-পন্থা সব সময় একেবারে নিরুৎসাহ হইবে না, আশা করি, ভবিষ্যতে এ কথাটা একেবারে ভুলিবেন না।

ভবদীয় শ্রদ্ধাকামী,
শ্রীশাস্ত্রিরঞ্জন বসু।”

যখন “কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল,” তখন নকড়ি বাবুর প্রেমের ব্যারোমিটার বহু দূরে নামিয়া পড়িয়াছে! স্বর্গ হইতে একদম নরকে পতিত হইবার সময় মিলটনের সময়তানও বুঝি এত ডাঁটু হইতে এত নীচে পতিত হয় নাহ!।

প্রথমতঃ নকড়ি বাবু মনে করিলেন, “ভাল বাসিলাম যদি তবে মরিলাম না কেন! মরিলাম না যদি, তবে খালি কাদিলাম কেন!” শেষে অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন রাতা রাতি এ প্রয়োজন-হীন প্রাণ ত্যাগ করিবেন। কিন্তু হৃৎকের ভিতর হইতে পালাইয়া যাওয়ার চেষ্টা ভয়ঙ্কর কাপুরুষতা তাই ভীত প্রেমিক সম্প্রদায়ের মত অহিফেন বা আর্সেনিকের কথা তাঁহার মনে পড়িল না। এই ক্ষেত্রে বানপ্রস্থের বন্দোবস্তই উত্তম। কিন্তু তাহাতেও দুইটি বিপ্ল! গার্হস্থ্য ধর্ম গ্রহণ না করিয়া বানপ্রস্থ গ্রহণ অশাস্ত্রীয় এবং সংসারের হৃৎক দেখিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করাও ভীকৃতারই লক্ষণ। কাজে কাজেই হৃৎকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে স্থির করিয়া সন্ন্যাসীও হইতে পারিলেন না। এমন বিপাকের মধ্যে নকড়ি বাবুর মনে হইল আহত প্রেমের গোপন-অগ্র-কণার মধ্যেই কবির স্বর্গ নিহিত—সেই স্বর্গের নিহৃত কোণে নকড়ি বাবু নিজ বাসস্থান স্থির করিয়া লইলেন—এ হৃৎকের কাহিনী আমি বীরের মত সহ্য করিব, কাহাকেও আর একথা বলা হইবে না। আটকে গোপন করাই আসল আট! রাত্রিতে আহার করার সময় নকড়ি বাবু মাকে কতকটা অত্মমনস্ক ভাবে বলিলেন—

“কালই দেশে যাবো মা, এই বেলা সব গোছাও!”

গাজীপুরের ব্যয় বাহুল্য, দেনার বৃদ্ধি, এবং গভর্ণ-মেণ্টের চিঠির কথা যথা সময়ে রাজেশ্বরী দেব্যাাকে নায়েব বলিয়া ছিলেন। এই সমুদয় দুর্ঘটনায় রাজেশ্বরীর মন যখন ভয়ানক উদ্বেগের মাঝে হাবুডুবু খাইতেছিল এখন পুত্রের মুখে এমন অপ্রত্যাশিত শুভ সংবাদ শুনিয়া মা আর মুহূর্তকাল বিলম্ব করিলেন না। পরের দিন

দেখা গেল, কবি সদলবলে কমলপুরের টিকিট করিয়া আটটার প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে চাপিয়াছেন।

নকড়ি বাবুর স্বাস্থ্য গাজীপুরী চিকিৎসায় আশ্চর্য-রকমে শোধরাইয়া গিয়াছে। এ বার তিনি কমলপুরে আসিয়া অনেকটা প্রকৃতিস্থ! এখন নিজের জমিদারী তিনি নিজেই দেখিতেছেন।

মাগের অমুরোধে নিতান্ত গম্ভীর প্রথায় একটি বিবাহ করিয়াছেন। এ বিবাহ প্রেমের স্বাভাবিক নিয়মে সংঘটিত হয় নাই। নিতান্ত কর্তব্যের দায়ে ঠেকিয়া করিতে হইয়াছে। তবে কিন্তু সম্প্রতি একটি কল্যাণ বত্সর লাভ হওয়াতে কর্তব্যটা এখন অনেকটা মধুর ভাব ধারণ করিয়াছে! সাহিত্যের সঙ্গে পুরাতন খাতিরটা এখন একেবারে লোপ না পাইলেও তাহাতে মর্মে ধরিয়াছে। কারণ সত্য কথা বলিতে কি কাব্য-রসের অপেক্ষা আমদানীর কিস্তিতে রঙ-টংকারটাই এখন যেন মধুরতর বোধ হয়।

শ্রীশুরেশচন্দ্র সিংহ শর্মা।

পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ

প্রতিবাদ *

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের “প্রতিভা” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিত এই প্রবন্ধের আংশিক প্রতিবাদ করিতে আমরা বাধ্য হইলাম।

সাভারের কতিপয় মাহিষ্য জাতীয় ব্যক্তি রাজা হরিশ্চন্দ্রকে আপনাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া কুর্শিনামা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই কুর্শিনামা শত বৎসর পূর্বে লিখিত বলিয়া অবিস্থাসের কোন কারণ দেখা যায় না। শত বৎসর পূর্বে লিখিত হইলেও কুর্শিনামার

* প্রতিবাদের পোড়ায় ও শেষে কতকাংশ বাদ দেওয়া হইল, কারণ তাহাতে প্রতিবাদ সম্পর্কীয় কোন তথ্য নাই। এ সম্বন্ধে আর কোন প্রতিবাদ প্রত্যাখ্য করিতে আমরা অসমর্থ—এ, স।

উপাদান বহু পূর্বে হইতে সংগৃহীত ছিল। শত বৎসর পূর্বে কেবল সুশৃঙ্খল ভাবে বংশাবলী পুনর্লিখিত হয় মাত্র। যাবৎ ইহার বিরুদ্ধে কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ উপস্থিত করা না যাইতেছে তাবৎ এই কুর্শিনামার সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে। দীনেশ বাবু উচ্চ অঙ্গের প্রত্নতত্ত্ববিৎ সাহিত্যিক। তিনি বিনা প্রমাণে যে সে কথা শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকার ঐতিহাসিক প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার লোক নহেন। তাঁহার গবেষণার পরিচয় “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” পুস্তকে দেদীপ্যমান আছে।

বংশাবলীর প্রথমে রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম আছে। তিনি অপুত্রক পরলোক গমন করেন। তাঁহার ভাগিনেয় দামোদর রায় ডাক নাম দামুরায় রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া সিংহাসন লাভ করেন। সেই হইতে ধারাবাহিক বংশাবলী চলিয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের পাল উপাধি থাকিয়া তাঁহার অগ্নিনেয়ের বংশের ঐশ্বর্য্য বাচক রায় উপাধি থাকা অসম্ভব ও আশ্চর্য্য-জনক কি? বিশেষতঃ আধুনিক কালে কুন্তকার জাতির সাধারণ উপাধি পাল। এই উপাধি নীচতা-সূচক বলিয়া অনেকে ইহা পছন্দ করেন না। এ কারণেও ঐ উপাধি দৌহিত্র বংশে অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হইতে পারে।

“পাল রাজগণ নিশ্চয়ই মাহিষ্য ছিলেন না” কোন ইতিহাস পাঠক তাহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন? বরং পাল রাজগণ যে মাহিষ্য ছিলেন তাহার প্রমাণ সমস্ত রক্ষিত বংশাবলী, জনশ্রুতি ও লৌকিক ব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছে। পালরাজগণ জাতিতে মাহিষ্য, ধর্ম্মে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম উভয়েই বিশ্বাসবান। মধ্যযুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের এইরূপ মাধ্যমাধি ছিল। বর্তমান সময়ে যেমন একই বংশে শাক্ত ও বৈষ্ণব দেখিতে পাওয়া যায় এবং শাক্ত বৈষ্ণবে যৌন-সম্বন্ধ সংস্থাপনে বাধ্য নাই পূর্বকালে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু-গণের সেই ভাব ছিল। ইহার বহুল প্রমাণ বিদ্যমান আছে। আবাস্তর ভাবে সেই সকল প্রমাণ উপস্থিত নিম্নরোজন।

বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত করিয়া লওয়াতেই বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের সম্মিলনে সুবিধা হইয়াছিল। সুতরাং গোড়ের পালরাজগণ ধর্ম বৌদ্ধ হইলেও জাতিতে মাহিষ্য থাকার বাধা হয় নাই। সাতারের রাজগণ যে মাহিষ্য তাহা মাহিষ্য জাতির চিরন্তন বংশ মর্যাদাতেও জানিতে পারা যায়। মাহিষ্য জাতির চাঁদ প্রতাপ-সমাজ-ভাকুর্ভার রায়গণের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন। ভাকুর্ভার রায়গণ হরিশ্চন্দ্রের শেষ বংশধর। ইহাদেরই কেহ কেহ কোঙা গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাদিগকে সমাজের লোক রাজবংশীয় বলিয়া চিরকাল উচ্চ আসন দিয়া আসিতেছেন এবং কুলীন বলিয়া মহাসম্মান করিয়া আসিতেছেন। এ অবস্থায় ইহাদিগকে আমরা পৈত্রিক সম্মান হইতে বঞ্চিত করিতে পারি না।

রামচরিত কাব্য অনুশীলন করিলেও গোড়ের পাল-রাজগণ যে মাহিষ্য তাহা প্রতিপন্ন হইবে। রামচরিত কাব্যে লিখিত আছে পালগণ “ত্ৰীপতি নাতি-সত্ত্বতঃ”; গ্রন্থকারই টীকাকার; তিনি লিখিয়াছেন—“ত্ৰীপতিঃ পার্ধিবঃ নাতিঃ ক্ষত্রিয়ঃ তস্মাৎ সত্ত্বতঃ উৎপন্নঃ” অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের বীর্যজাত, ক্ষত্রিয় নহে ক্ষত্রিয়-সত্ত্বত। ঠিক ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ক্ষত্র বীর্যোণ বৈশ্রায়াং কৈবর্তঃ পরিকীর্তিতঃ শ্লোক স্মরণ করায়।

* * * *

আইন আকবরী রচয়িতা পাল রাজগণকে Koyth জাতি বলিয়াছেন। অতাপি দিনাজ পুরের উত্তরে আটোয়ারী থানায় এবং পূর্বিয়া জেলায় কৈবর্ত জাতিকে “কোবৎ” বলে। অন্তস্থ ব-কারের উচ্চারণ “ওয়া”বৎ। সুতরাং Koyth শব্দ ঠিক কোবৎ শব্দের প্রতিকল্প। পঞ্চাস্তরে কৈবর্ত শব্দের পালী অপভ্রংশে কেবট্ট হয়। কেবট্ট হইতে কেবট বা কেওট্ট হয়। কেওট বা কেওট্ট হইতে Koyth শব্দ নিকটবর্তী, কায়স্থ শব্দ হইতে অধিকতর দূরবর্তী। একারণ কায়স্থ শব্দ হইতে Koyth হওয়া সম্ভব বলিয়া বিবেচনা হয় না। বিশেষতঃ আবুল ফজল আকবরের সভাসদ ছিলেন।

তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে আইন আকবরী লিখিয়াছেন। তাঁহার বহু পূর্বে পাল-রাজগণের রাজ্য নষ্ট হওয়ার রাজ-বংশধরগণ ঐতিহাসিকের অপরিচিত হইয়া উঠিয়া ছিলেন, সেই সময়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তত আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না।

বীরেন্দ্র বাবুর তৃতীয় যুক্তি হরিশ্চন্দ্রের বংশধরগণ হিন্দু হইবার সময় সমাজের নিম্ন স্তরে (মাহিষ্য-স্তরে) যাইতে পারে না। সমাজ বিনা দোষে রাজ-বংশধর-দিগকে এই রূপ নিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইতে পারেন না। মাহিষ্য জাতি সমাজের নিম্ন স্তর কিরূপে হইল? ক্ষত্রিয় পিতার গুণসে বিবাহিতা বৈশ্য কন্যার গর্ভে বাহার উৎপত্তি সে কি নিম্ন জাতি? ব্রাহ্মণ, যুদ্ধাভিষিক্ত, ক্ষত্রিয়, অশ্বত্থ, মাহিষ্য, বৈশ্য এই ছয় জাতি দ্বিজধর্মী। দ্বিজধর্মী মাহিষ্য সমাজের নিম্ন স্তর নহে। মেদিনীপুর অঞ্চলে এই জাতিই সমাজের উচ্চতম স্তরের লোক। নদীয়া অঞ্চলে কায়স্থের তুল্য। ঢাকা অঞ্চলে ইহাদের সম্মানের কতকটা হানি সংখ্যার অল্পতা ও কায়স্থ জাতির প্রাবল্য বশতঃ হইয়াছে। এই জাতি সমাজে কিরূপ আসন গ্রহণ করেন, আমরা নিজে তাহা বলিতে চাহি না। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, নবদ্বীপ বিবুধজননী সভার সভাপতি স্বর্গীয় যোগেন্দ্র নাথ স্মার্তশিরোমণি মহাশয়ের “হিন্দু কাষ্টস্ এণ্ড সেক্টস্” পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

“চাষি-দাসগণ বিস্তৃত জলাচার জাতি। ইহারা ক্রান্ত-জীবী, গ্রামবাসী লোক মধ্যে একটি গরিষ্ঠ সম্প্রদায়। মেদিনীপুর জেলায় ইহারা স্থানীয় “এরিষ্টক্রেসী,” উচ্চতম স্তরের সমাজনেতা সম্ভ্রান্ত বুনিয়াদি বড়লোক সম্প্রদায় বটে। তন্নিম্ন অপরাপর জেলায় যে যে স্থানে ইহাদিগকে দেখা যায়, ততঃ স্থানে ইহাদের পদ ও মর্যাদা কেবল কায়স্থ জাতিরই অব্যবহিত নিম্নে অবস্থিত (অথ কোন শূদ্র জাতির নিম্নে নহে)। তন্মূলক এবং কাণ্টাই অঞ্চলের সমাজে ইহারা উচ্চতম স্তরের সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য। সে স্থানে ইহাদের মধ্যে

বহুতর লোকই জমিদার ও আয়বান ভূম্যধিকারী।
অল্পকাল পূর্বেই ইহাদের অবস্থা অতি সুখের ছিল।” (১)

শ্রীমুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস।

পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ

প্রতিবাদের উত্তর

শ্রীযুক্ত মুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস বর্তমান বর্ষের অগ্রহায়ণ “প্রতিভাতে” প্রকাশিত মল্লিখিত ‘পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ’ শীর্ষক প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ পত্র “প্রতিভা” সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় এবিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করায়, নিম্নে শ্রীযুক্ত বিশ্বাস মহাশয়ের এবং পাঠকগণের ‘অবগতির জ্ঞাত অতি সংক্ষেপে কয়েকটি মাত্র কথা নিবেদন করিতেছি।

মদীয় প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম—“নৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম অবলম্বন করিবার সময় হরিশ্চন্দ্রের বংশধরগণ সমাজের নিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এই রূপ অনুমান করাও বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নহে, এবং তাহা নিশ্চয়ই প্রমাণ-সাপেক্ষ! এই “নিম্ন স্তরে” শব্দটি পাঠ করিয়াই বোধ হয় প্রতিবাদকারী মহাশয় প্রতি-

(১) “The clean agriculturist castes :—

The agriculturist Kaibartas of Bengali :—The chaste Kaibartas of Bengal form an important section of its rural population. In the District of Midnapore, they may be reckoned among the local aristocracy. In the other districts, where they are found, their position is only next to that of the Kayasthas.”

“In the Tumuk and the Contai Subdivision of the Midnapore District.....The Kaibartas may be said to form the upper layer of the local population. A great many of them are Zamindars and holders of substantial tenures. They were a very well-to-do class until recently.”

J. N. Smartha Seromeny M. A., D. L. S. Hindu castes & Sects. P. 270 & 279.

বাদের শেষ চতুর্থাংশে লেখকের উপর অল্পস্র পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, আমি যুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, প্রবন্ধ লিখিবার সময় কোনও জাতির উপর কটাক্ষ পাঠ করা আমার অধিগ্রায় ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির তুলনাতাই আমি ঐ “নিম্ন স্তরে” শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তাহাতে যদি কেহ দোষ গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে সানন্দচিত্তে আমি ঐ শব্দটি প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত আছি। জাতিতত্ত্ব আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; তবে, ঐতিহাসিক আলোচনায় আলোচিত নৃপতির জাতি সম্বন্ধেও উল্লেখ থাকা আবশ্যক জানে প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে তাহা বিরত করিয়াছি। মাহিষ্য কিংবা অপার কোন জাতির প্রতি নীচ জানে অশ্রদ্ধা কিংবা বিদ্বেষের ভাব কোন দিনই আমার হৃদয়ে পোষণ করি নাই। সুতরাং, আমাদের প্রতি বিশ্বাস মহাশয়ের অযথা দোষারোপে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি।

প্রতিবাদকারী সাভারের হরিশ্চন্দ্র পালকে মাহিষ্য বংশীয় প্রমাণিত করিবার জন্য সে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার একটিও আমাদের নিকট সারবান্ বলিয়া বোধ হইল না।

শ্রদ্ধাষ্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় “প্রবাসীতে” প্রকাশিত তাঁহার একটি প্রবন্ধে সাভারের মাহিষ্য জাতীয় জনৈক ব্যক্তিকে হরিশ্চন্দ্রের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু, তাহার সপক্ষে কোন রূপ যুক্তি, এমন কি দ্বিতীয় বাক্য পর্য্যাপ্ত প্রয়োগ করেন নাই। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ রূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি না জানি না। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের প্রতি আমরা প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইলেও তাঁহার উক্তি মাত্রই অস্বাস্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম।

আধুনিক কালে কুস্তকার এবং তৈলব্যবসায়ীগণও পাল উপাধি ধারণ করেন, হয়ত মাহিষ্যগণও পূর্বে পাল ছিলেন, কিন্তু, এখন তাহা “পছন্দ” না করায় রায় উপাধি ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং, কুস্তকার পাল, তৈল ব্যবসায়ী পাল, মাহিষ্য পাল প্রভৃতি যে কেহ পাল

রাজবংশের উত্তর পুরুষ, প্রতিবাদকারী এই রূপ যুক্তি নিতান্তই হাত্তোদীপক সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিবাদ করার আবশ্যকতা বোধ করি না। পাঠক মহাশয়গণ ইহার সারবত্তা অনুভব করুন।

মল্লিখিত প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম,—“গৌড়ের পালরাজগণ নিশ্চয়ই মাহিষ্ঠ ছিলেন না।” বিশ্বাস মহাশয় নানাবিধ শ্লেষোক্তির সহিত তাহার অর্থশূন্য প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রবন্ধে আমি আমার উক্তির বিশেষ কোন প্রমাণ উল্লেখ করি নাই, কারণ, আমার ধারণা ছিল যে, উহা সর্বদা সত্য। কমোলিতে প্রাপ্ত বৈষ্ণবদেবের তাম্রশাসনে পালরাজগণকে স্পষ্টাক্ষরে “স্বর্গ্যবংশ সন্তত” বলিয়াই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।

“এতদ্দক্ষিণদৃশো বংশে মিহিরস্ত জাতবান্ পূর্নঃ।” সন্ধ্যাকর নন্দ-বিরচিত “রাম চরিত” কাব্যে পাল-রাজগণ “সিদ্ধকুলোদ্ভূত” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সিংহগিরি রচিত “বাস পুরাণে” পালনৃপতিগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। গহ্বকার তাঁহাদিগকে নিম্ন স্তরের ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু, তিনি সেন-রাজগণের আশ্রিত ছিলেন, সুতরাং, তাহার প্রভু-বংশের প্রতিবোগী রাজবংশের বিরুদ্ধে ঐরূপ উক্তি করা তাঁহার পক্ষে সামান্যিক। এতদ্ভিন্ন পালরাজগণ সর্বদাই ক্ষত্রিয় কণ্ঠাগণের পাণিগ্রহণ করিতেন, তাহা বহু তাম্র-লিপি প্রতীতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। দম্বপাল রাষ্ট্রকূটপতি পরবলের কণ্ঠা রক্ষা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। যুদ্ধেরে প্রাপ্ত দেবপাল দেবের তাম্র শাসনে লিখিত আছে,—

“শ্রীপরবলস্ত হৃহিতুঃ ক্ষিতিপতিনা রাষ্ট্রকূটতিলকস্ত।

রক্ষা দেব্যাঃ পাণির্জগৃহে গৃহমেদিনা তেন ॥”

বিগ্রহ পাল হৈহয় রাজবংশ সন্ততা লজ্জা দেবীর সহিত পরিণীত হন। ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণ পাল-দেবের তাম্র শাসনে এ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

“লজ্জতি তস্ত জলধেরিব ওজুঃ কণ্ঠা।

পত্নী বভূব কৃত-হৈহয়-বংশভূষা।”

রাজাপাল রাষ্ট্রকূটপতি তুঙ্গদেবের হৃহিতা ভাগ্য-দেবীকে বিবাহ করেন। যথা—

“রাষ্ট্রকটায়েন্দোদ্বজ্ঞোজুঃ মৌলে হৃহিতরি তনয়ো ভাগ্য দেব্যাং প্রসূতঃ।”—প্রথম মহীপালদেবের বাণগড় লিপি।

তৃতীয় বিগ্রহপাল দাহলাদিপতি কর্ণের কণ্ঠা যৌবনশ্রী, চেদৌর রাজকণ্ঠা, এবং রাষ্ট্রকূট রাজকণ্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। ইতিহাস আলোচনা করিলে এই রূপ বহু দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং, ইহা হইতে সুস্পষ্ট রূপেই প্রমাণিত হইতেছে যে, পালনৃপতিগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন—মাহিষ্ঠ ছিলেন না।

অতঃপর প্রতিবাদকারী যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাও ভ্রমাত্মক। “রামচরিত” কাব্য হইতে যে পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি পালরাজগণকে মাহিষ্ঠ-বংশীয় প্রমাণিত করিতে ইচ্ছক, দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক সেই পংক্তিটিই তাহার মতের বিরোধী। রামপালকে কবি “শ্রীপতিনাভিসম্ভূতঃ” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবির মল্লিখিত টীকা হইতে মাত্র একটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহার বিকৃত ও কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিবাদকারী তাহার সমতের পোষকতা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঠিক তাহার পর পংক্তিটিও তৎসঙ্গে উদ্ধৃত করিলে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট হইত, এবং তৎকৃত বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টাও বার্ষ হইত। ইচ্ছাপূর্বক অসমাপ্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বাক্যের প্রকৃত অর্থ বিকৃত করিবার চেষ্টা করা মতের অপলাপ মাত্র। “শ্রীপতিনাভিসম্ভূতঃ” শব্দের টীকায় লিখিত আছে—“শ্রীপতিঃ পাণিবো যো নাত্তি ক্ষত্রিয়স্তম্ভাং সন্ততঃ বিধিরিবেতি শ্লেষোপমা। অত্র শ্রীপতেবাসুদেবস্ত নাত্তিতোহবয়বানুদ্ভূতঃ। শেষঃ সুগমঃ” টীকা হইতে উদ্ধৃত প্রথম বাক্যটির এই রূপ অর্থ করা হইয়াছে যে শ্রীপতির নাভি হইতে উদ্ভূত ক্ষত্রিয়, এবং সেই ক্ষত্রিয় হইতে উদ্ভূত (মাহিষ্ঠ)। প্রকৃতপক্ষে বাক্যটির যে সে রূপ অর্থ নহে, তাহা সংস্কৃতজ্ঞ, যাহার

বুঝিতে পারিবেন। যজ্ঞি প্রথম বাক্যটিতে ঐ রূপ সন্দেহ মনে উঠিতে পারে, তথাপি, তৎপরবর্তী বাক্যটি দ্বারা অতি সহজেই তাহা নিরাকৃত হইয়াছে। টীকাকার স্বয়ংও বলিয়াছেন—“শেষঃ স্মরণং।” ইহা সবেও প্রতিবাদকারী শেষোক্ত বাক্যটি লোপ করিয়া প্রথমটি মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং তাহা হইতে পূর্বোক্ত রূপ বিকৃত ব্যাখ্যা বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আইন—ই—আকবরী গ্রন্থে পালরাজগণকে “কায়েথ” বলা হইয়াছে। পারস্য গ্রন্থে ঠিক “কায়েথই” লিখিত আছে। সাধারণতঃ কায়স্থগণকে কায়েথ বলা হয়। স্মরণ্য, ইহাব অল্প রূপ অর্থ করা সমীচীন নহে। হয়তঃ আইন-ই-আকবরীর কোনও ইংরেজী অনুবাদে “কায়েথ”কে বিকৃত করিয়া Koyth লেখা হইয়াছে। প্রতিবাদকারী তদবলম্বনে নানা অদ্ভুত তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন। তিনি কৈবর্তের সহিত যে কোন প্রকারে হউক এই Koyth শব্দের সাদৃশ্য দেখাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার মতে কৈবর্ত হইতে ‘কোবৎ’, এবং ‘কোবৎ’ হইতে Koyth উৎপন্ন হইয়াছে। পক্ষান্তরে, কৈবর্ত শব্দের পালী অপভ্রংশ ‘কেবট্ট’, ‘কেবট্ট’ হইতে ‘কেবট্’ বা ‘কেওট্’, ‘কেওট্’ হইতে ‘কেওং’, এবং ‘কেওং’ হইতে ‘Koyth’ শব্দের উৎপত্তি। কায়স্থকে সচরাচর কায়েথ বলা হয়, এই শব্দা কথটি ভুলিয়া গিয়া নানা অদ্ভুত আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়া কৈবর্তকে Koyth অথবা কায়েথ করিবার তাৎপর্য্য কি বুঝিতে পারিলাম না। কৈবর্ত শব্দটির এই দেহান্তর প্রাপ্তি বড়ই আশ্চর্যজনক সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, হরিশ্চন্দ্র পাল কোন জাতীয় ছিলেন, তাহা স্থির করিতে নানা রূপ যুক্তি-তর্কের আভ্যাস করা হইল। ঐতিহাসিক আলোচনায় তাহা করিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু তিনি যে জাতীয়ই হউন, কোন জাতির উপরই সম্মানলাভবার্ণ বিবেচনামূলক কটাক্ষপাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, পরিশেষে পুনরায় ইহা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।

পল্লীগামে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি

পৌষ মাসের ১৫ই ১০ই তারিখ হইতে দিনমানের বৃদ্ধি আরম্ভ। সেই সময় হইতে উত্তরায়ণ ধরা যায়। হিন্দু শাস্ত্রকারগণের মতে এই সময় হইতে দেব-নিদ্রার অবসান। কাজেই ইহা যাগ যজ্ঞাদির প্রকৃষ্ট সময়। অতএব ইহা অতি পবিত্র সময়। এই সময় প্রাণ পরিত্যাগ করিলে অক্ষয় স্বর্গ-লাভ। গঙ্গানানে একবিংশ কুল উদ্ধার। এই উত্তরায়ণে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার জ্ঞাত কুরুকুলভিলক সত্যব্রত মহামতি ইচ্ছামরণ ভীষ্মদেব শরশযায় শয়ন করিয়া প্রাণান্তকর যজ্ঞা সহ করিয়াও উত্তরায়ণের অপেক্ষায় নিজ মূর্খ জীবনকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে অনেক স্থানে উত্তরায়ণ বা পৌষ সংক্রান্তিকে তিলাসংক্রান্তিও বলিয়া থাকে। জানি না, কেন যে এই নাম হইল। তবে তিলার সঙ্গে এই সংক্রান্তির বিশেষ সম্বন্ধ এই যে, এই সময় দেশে প্রচুর পরিমাণ তিলার আবাদানী হইয়া থাকে। সাধারণ গৃহস্থগণ এই সংক্রান্তিকে বিশেষ একটা পূর্ব মনে করিয়া থাকে এবং এই সংক্রান্তি উপলক্ষেই তাহারা প্রথম তিলা খাইয়া থাকে। বোধ করি এই জন্তই এই বিচিত্র নাম হইয়া থাকিবে।

রাত্রি প্রভাত না হইতেই পৌষের দারুণ নীচকে উপেক্ষা করিয়া পল্লীবাগি গৃহস্থ বালকগণ দলেদলে খালে, নিলে, পুকুরে, নদীতে স্নান করে। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, কৃষকবালকগণের মধ্যেই এই প্রথাটা বোল আনা রকম এখনও বিদ্যমান। সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নানাদি শেষ করিতে হইবে। কারণ সূর্যোদয়ের পূর্বে সূর্য্যকে পিঠা দিতে হইবে। তৎপর গরুকে পিঠা দিতে হইবে। গরুকে পিঠা দেওয়ার কথা শুনিয়া হয় ত অনেকে হাসিতে পারেন। কিন্তু যে দেশে গো দেবতা জানে পূজিত, যে দেশে গাভী সপ্ত মাতার মধ্যে এক মাতা; সে দেশের পক্ষে গরুকে পিঠা দেওয়া হাত্তজনক নহে। পল্লীগামে আজও এমন অনেক হিন্দু বর্তমান আছেন যে

তাহারা স্নানান্তে গোপদে জল দান ও গোকৈ বাস প্রদান না করিয়া জল গ্রহণ করেন না।

সরল প্রাণ পল্লী-বালকগণ স্নানান্তে ঢেঁকিতে কিস্বা মূষল দ্বারা লোটে (উত্থলে) আতপ চাউলের গুড়া প্রস্তুত করে। সেই গুড়া জলে মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে নূতন কল্কির মৃৎ ভিজাইয়া প্রথমতঃ সূর্য্যদেবের উদ্দেশে উঠানের মধ্যস্থল লেপিয়া সেই স্থানে ৫ টি কিংবা ৭ টি ছাপ দেয়। তৎপর ধরের দেওয়ালে ছাপ দিয়া গরুকেও ছাপ দেয়। গর্ভবতী গাভীগুলিকে কল্কি দ্বারা ছাপ না দিয়া হাতে ছিটাইয়া দেয়। ইহার কারণ যতদূর অনুমান করিতে পারা যায়, ইহাতে এই উপলব্ধি হয় যে, কল্কির আঘাতে গর্ভস্থ প্রাণীর কোনও অনিষ্ট সংসাধিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় প্রথমতঃ এই প্রকার বিধান প্রচলিত হয়। কালে ইহা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কাহার গরু কেমন সুন্দর দেখা যায় ইহা নিয়া গ্রামাল মহালে মহাহনস্থল বাঁধিয়া যায়।

পল্লীগ্রামের আর একটি আমোদও সে দিন বিশেষ উৎসবের মধ্যে ধরা যায়। সেইটি বাস্তব পূজা। যাহার উপর আমরা প্রতিনিয়ত স্নেহ অবস্থান করিতেছি হিন্দুর মতে তিনিও মহতী দেবতা। কাজেই বাস্তবভূমিও হিন্দুর অবশ্য পূজনীয়। ভেড়া এই পূজার একটা বিশেষ উপকরণ। অনেক স্থলে কচ্ছপ বলি হইতেও দেখিয়াছি। আমাদের দেশে এক জনকে অর্জু জন্ত গালি দিবার সময় “দূর হ বাস্তব পূজার ভেড়া” বলিয়া থাকে। অনেকে এই পূজা বাড়ীতে করেন। কেহ কেহ নিজ এলাকাধীন মাঠে করিয়া থাকেন। পল্লীবাসী বালকগণ পূজার চক্র প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া দলে দলে মাঠে ভ্রমণ করিতে থাকে।

মেয়ে মহলে আর একটি পূজা প্রচলিত আছে। তাহাও এই দিনই হইয়া থাকে। ইহার নাম বুড়া-বুড়ীর পূজা। নামটা নেহাত গ্রাম্য, কিন্তু ইহার বিষয় আলোচনা করিলে আমরা এই বুঝিতে পারি যে, এই পূজাটা অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রচলিত। দেবাদিদেব মহাদেব অতি প্রাচীন। তাহার বামদ-শোভিনী পরমা প্রকৃতি ভগবতী অতি প্রাচীনা। সেই প্রাচীন-প্রাচীনাই গ্রাম্য ভাষায় বুড়াবুড়ী বলিয়া আখ্যাত। এই পূজার উপকরণ হাঁসের ডিম ও শূকর। নীচ শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই এই পূজার প্রচলন বেশী। কাজেই তাহাদের ঋণ দ্রব্য দ্বারা অশীষ্ট দেবকে পূজা করিয়া সমুপেক্ষ হইয়া থাকে।

এই ত গেল পূজার কথা। তারপর ঋতুদিগও সে দিন বিশেষ সমারোহ। যাহারা গ্রাম ছাড়িয়া নগরে বাস করেন তাহারা চর্কা, চোখ, লেহা, পেয় চতুর্বিধ ঋতুদ্বারা রসনার পরিতৃপ্তি করেন। তাহাদের অনেকেই গ্রাম্য পিঠা পুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন। সে দিন পল্লীগ্রামে পিঠা পুলির বড় ধুম। যে যেমন পারে তাহা দ্বারা নিজ ও নিজের আত্মীয়স্বজনের মনস্তৃষ্টি সাধন করে। পল্লীগ্রামে যতটুকু ধর্ম্মপ্রাণতা আজও রহিয়াছে, যতটুকু সরলতা আজও দেখিতে পাওয়া যায় আর কোথাও সেই প্রকার পরিদৃষ্ট হয় না। বঙ্গের অমর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যথার্থই বলিয়াছেন—

“ধোর জাঁক বাজে শাঁক যত সব বাসা।

কুটিছে ততুল স্নেহে কত ধামা ধামা ॥

উননে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া।

চাউনি কর্তার পানে কতই হাঁসিয়া ॥”

শ্রীমহিমচন্দ্র নন্দী

প্রাপ্তিস্বীকার

সমালোচনার্থ প্রেরিত নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ
আমাদের হস্তগত হইয়াছে—

সুসঙ্গ ও মর্ত্ত (প্রেমগাথা) শ্রীশশীকমোহন
সেন প্রণীত, কলিকাতা ২১১৫ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট,
নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত, চট্টগ্রাম সদরঘাট হইতে
শ্রীমহেন্দ্রমোহন সেন কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১ টাকা।
কাগজের মলাট সহ ১ টাকা; বাধাই ১৮০

মনুসংহিতা, শ্রীরামলাল বেদান্ততীর্থ বিজ্ঞানরত্ন,
এম, এ প্রণীত, কলিকাতা ৬৫ কলেজ স্ট্রিট ভট্টাচার্য এণ্ড
সন্স কর্তৃক প্রকাশিত সুন্দর বাধাই, মূল্য ১০

অঙ্গীর্ণতা, ডাক্তার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র
প্রণীত সুন্দর বাধাই—মূল্য ১০—৮৪,০ বলরাম দে স্ট্রিট,
কলিকাতা মৈত্র এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত।

মহাশয়সিংহের বারেন্দ্র প্রামাণ্য
জমিদার—কুমার শ্রীমোহন কিশোর রায় চৌধুরী
প্রণীত, চমৎকার বাধাই—মূল্যের উল্লেখ নাই।

পালিভাষা—গীতিকাব্য—সেখ হাবিবুর রহমান
প্রণীত যশোহর, খুলনা, সিদ্ধিকিয়া সাহিত্য সমিতি
হইতে প্রকাশিত—মূল্য ৮০

পুস্তকপাঠ, (সামাজিক উপগাস)—শ্রীক্ষীরোদ
প্রসাদ বিজ্ঞানবিনোদ, এম, এ, প্রণীত, ২০১ কর্ণওয়ালিস
স্ট্রিট শ্রীশুরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত—অতি
সুন্দর বাধাই সোণার জলে নাম লেখা—মূল্য ১০

আর্য্যোক্ত পঞ্চাঙ্গ (বাস্তবতার ধর্ম ও সামাজিক
ইতিহাসের এক অধ্যায়)—শ্রীহরিদাস পালিত প্রণীত,
১৫ কলেজ স্কয়ার চক্রবর্তী চার্চার্জ এণ্ড কোং—এজেন্টস;
চমৎকার বাধাই, সোণার জলে নাম লেখা—মূল্য ২৮
দুই টাকা।

ফুলশয্যা

আজি সখি আমাদের কুসুম শয়ন।
মধুগন্ধে ভরপুর বায়ু বহে ফুরফুর,
হিয়া দুটি হ্রহ্র অলস নয়ন;
আজি সখি আমাদের কুসুম শয়ন ॥
আজি সর্ব বিশ্ব ছাড়া, সর্ব বাধাবন্ধ হারা,
আবেশে মাতাল পারা, এলায়িত তরু,
সংসারের কালাপালা; ভুলে সর্ব হুখজালা,
সুখরসে পরিপূর কর প্রতি অণু।
কাটা যদি রহে ফুলে তার ব্যথা যাও ভুলে,
কাননে কাঙাল করি করে চয়ন।
আজি সখি আমাদের কুসুম শয়ন ॥
কোটা প্রজাপতি পরে রঙ্গীন পাখার ভরে,
এলাইয়া দাও তরু জোছনার ফেনে,
স্বপনপুরীর দেশে চল সখি চল ভেসে,
জীবন্য লহরীগুলি নিয়ে যাও টেনে।
পেয়ে অপসরীর চুম আসুক মায়ায় ঘুম,
পরীর পাখার বায়ু উড়াবে অলক,
নন্দনের গন্ধভারে তিতাবে চন্দনাসারে
পুলকে দোলনা সম হুগাবে ছালোক।
বকুল মালিকা টুটি, চুলে রবে শির দুটি
কদম্বের উপাধান করিবে বহন।
আজি সখি আমাদের কুসুম শয়ন ॥
মরকত তট ছাড়ি, পিয়ে মৃগমদবারি,
আকর্ষণে ডুবিয়া রবো অমিয়া সাগরে।
কলরবে মাতামাতি করিয়া কাটিবে রাত
মুখর পাপীয়া পিক উতলা বাসরে।
হেসে হেসে কুটিকুটি পুলকেতে লুটোপুটি
ইন্দ্রধনু গায়ে মৌরা পড়িব গড়ায়ে
কাদম্বরী কেনময় হবে পাত্রবিনিময়,
নিঙাড়ি নিঙাড়ি দিব মহরা ছড়ায়ে।
তাজি পৃথিবীর সাজ এস সখি এস আজ
আলোর বসন দিব করিয়া বসন।
আজি সখি আমাদের কুসুম শয়ন ॥

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রতিভা

২য় বর্ষ

চৈত্র ১৩১৯

১১ শ সংখ্যা

পৃথিবী ও সৌর রাস

[বিগত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেব সত্তর বৎসর বয়সে ধ্যানোপরিষ্ট অবস্থায় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। পরিচিত মহলে কবি, দার্শনিক, এবং পরম ভক্ত বন্দিয়া তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার অনেকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা আছে। কয়েকটি প্রতিভার প্রকাশিত হইতেছে, পরে সমগ্রই 'স্মৃতি গ্রন্থ' আকারে মুদ্রিত হইবে। কবিতাগুলি অন্ততঃ ৩৭ বৎসর পূর্বে বিরচিত।

শ্রীশশীকুমোহন সেন।]

১

দেশ, মহাদেশ, মরু, পর্বত, পাহাড়,
দ্বীপ, উপদ্বীপ, হ্রদ, নদী, পারাবার
পৃষ্ঠদেশে নিয়া তোর
কেন পাড়িয়াছ দৌড়
শূন্নে শূন্নে—মহাশূন্নে, ওরে পাগলিনি!
ক্ষণমাত্র স্থির নাই,
কেবলই ধাওয়া ধাই,
সঙ্গে সঙ্গে ধার তোর অসংখ্য ভাগিনী!
কারো এক, কারো দুই, অষ্ট সহচরী—
অথরে অথরে কেন মর ঘুরি ঘুরি!

২

কাহার অনন্ত প্রেমে হইয়া মগন
সম বেগে অনিবার করিছ ভ্রমণ!
কাহার হাসিতে হাস,
কেবা সেই স্বপ্রকাশ
অনন্ত হাসিতে তরা মোহন প্রায়ল!
উজ্জ্বল আলোকে যার
ভরে ধায় অন্ধকার
গগনের দূরবর্তী গন্তরে অতল।
জগতের এক চক্ষু কেবা সেই জন,
যাহারে অনন্ত প্রেমে করিছ বেঁধন?

৩

এই কি সে রাসেশ্বর ব্রজের শ্রীহরি?
প্রেমেতে বিভোর তোরা গোপিকা স্তম্ভরী?
অক্ষরূপ মঞ্চে চড়ি'
নভোবন্দাবন' পরি
অনন্ত রাসেতে সবে হয়েছ মগন।
প্রেমের আলোক-রাশি
পান করি হাসি হাসি
রাসেশ্বরে প্রেমানন্দে করিছ বেঁধন!
বন্দাবন রাসলীলা আজি অবসান—
তোদের এ সৌর রাস নহে সমাধান?

৪

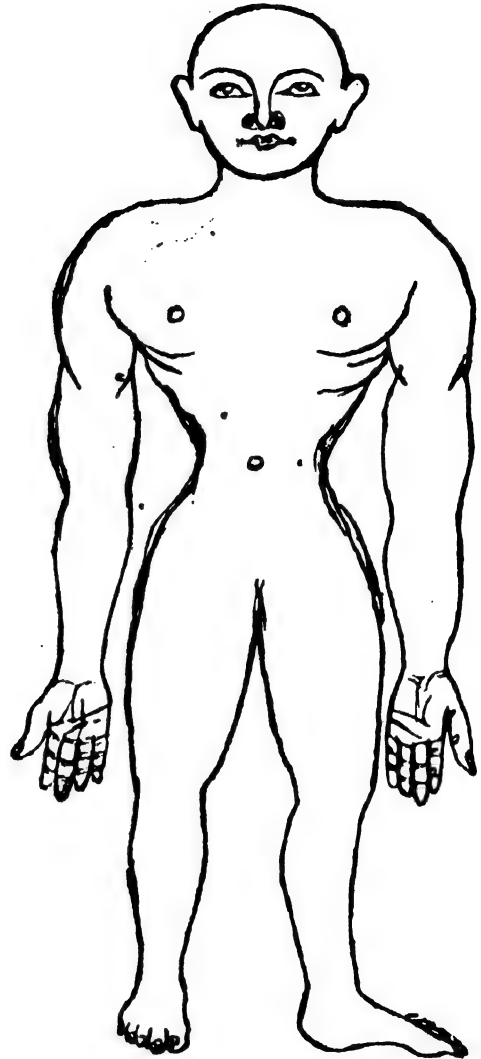
দীর্ঘায়ুস্তম্ভ *

কেন্দ্র-বিপরীত গতি হইলে বারণ
কেন্দ্র-অভিমুখ শক্তি হইলে চালন,
পুনঃ অক্ষ-মঞ্চ ছেড়ে
সবে ছুটাছুটি করে
প্রেমেশ্বর রাসেশ্বরে করিবে রমণ !
পূরণ হইবে আশ -
অর্দ্ধ হাস—পূর্ণ হাস !
প্রেমরাস সাক্ষে হবে শাস্তি সম্মিলন !
এ বিচিত্র এ বহুত্ব হইবে বারণ,
একত্বের পারাবারে হইবে মগন !

৫

আমার সে রাসেশ্বরের পূর্ণজ্যোতি হরি
কোণায় রহিল, বল প্রামাণ্যী হৃদয়ী ?
মায়া মোরে ঘুরাইল
বিপর্যয় গতি দিল,
জীবনের কক্ষে মোরে করিল চালন —
জঠরে জঠরে বুরি,
হামাগুড়ি—হামাগুড়ি !
চৌরাশী লক্ষেও তার হলো না বারণ !
ভায়, কবে অভিমুখ গতিটি পাইব ?
কক্ষ ছেড়ে জীবনের জীবনে পশিব !

৮ ব্রজকুমার সেন ।



দীর্ঘায়ু মনুষ্যের প্রতিকৃতি ।

পঞ্জিকার মতে কলির আয়ুষ্কাল ১২০ বৎসর । বৈদিক সাহিত্যে “শতায়ুর্নৈ পুরুষ” ইত্যাদি কথা আছে । আয়ু-কেন্দ্রীয় নানা গ্রন্থে শতায়ুর প্রশংসাসূচক শ্লোকের সঙ্গতি

* চুঁচুড়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চমাধিবেশনে পঠিত ।

কতকগুলি ঔষধের ফলশ্রুতিতে অমৃতায়ু, অমিতায়ু প্রভৃতির প্রশংসা দেপিতে পাওয়া যায়। অধুনা এ সকল কথা গল্পের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। মানুষ রেল গাড়ী, মটর গাড়ী প্রভৃতি চড়িয়া কার্খা-কালকে যত সংক্ষিপ্ত করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আয়ুর্কালও তেমনই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। “দশমীং গতঃ” মানুষের অভাব নাই। উহা তাহাদের বয়সের পরিণতিতে নহে, রোগের পরিণতি তাহাদিগকে এই অবস্থায় আনিতেছে।

যত বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে মানুষের রোগ তত অধিক ও নূতন আকারে দেখা দিতেছে। দেশে এ অবস্থা নূতন নহে। চরক আয়ুর্কোদোৎপত্তির ইতিহাসে এই রূপ ছুরবস্তার কথা বলিয়া গিয়াছেন। তখন হিমালয়ের পার্শ্বে ঋষি-সভে (১) এই বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। আজ সর্বপাপবিনাশিনী, সর্বরোগহন্ত্রী ও সর্বদুঃখনিবারিণী ভগবতী গঙ্গার পবিত্র তীরে মনীষি-সভে এ বিষয় আলোচিত হইতেছে। এই আলোচনা—এই একাগ্রতাও যে সেই ঋষি-সভেবর ধানের ফল প্রসব করিবে তাহা আশা করিতে পারি।

এই দেহকে কেহ গেহ, কেহ পিঞ্জর, কেহ বা বসনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সুশ্রুতে ইহার একটি নাম ত্রিস্থল। শ্রীমদ্ভাগবতে “ভবাটবীর” “পুরঞ্জনপুর” এই দেহ। ইহা ভাবকের ভাব হইলেও ইহার উন্নতি ও সংস্কার-সাধনের পরামর্শে অনভিন্নত কচিং দৃষ্ট হয়।

দেহ কি রূপ হইলে ভোগবিলাসের অধিকারী হয়, দেহের গঠনোন্নতি দ্বারা কি রূপে মনঃ-শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, কি রূপে দেহ সুদীর্ঘ সুখায়ুঃ ও হিতায়ুর আধার হইতে পারে, তাহার বর্ণনা আয়ুর্কোদেবের বহু গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমি আজ চরক হইতে একটি অংশ মাত্র দেখাইব।*

(১) চরক প্রথম অধ্যায় সূত্রস্থান।

* প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়টি অতি বিস্তৃত। আয়ুর্কোদে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। বাঁহারা এই বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রবন্ধ-লেখকের এই প্রয়াস। —লেখক।

চরকের মতে দেহের আয়াম অর্থাৎ উচ্চতা শরীর অঙ্গুলিমাতে চতুরশীতি অঙ্গুল, অর্থাৎ সাড়ে তিন হাত। (১) এই সার্ক হস্ত-ত্রয় পরিমিত দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহ স্ব স্ব প্রমাণ অনুসারে সৃষ্টি হইলে, মানব দীর্ঘায়ুঃ, বলবান্ ও সুখী হইয়া থাকে। (২)

দেহ ছয় ভাগে বিভক্ত, যথা—উত্তমাক্ষ, অন্তরাধি, বাহুদ্বয় ও সন্ধিপদ্বয়; এইগুলির নাম অঙ্গ এই জন্ত দেহের নামান্তর যড়ঙ্গ।

চরকের মতে অঙ্গাবয়ব-সমূহের স্বাভাবিক প্রমাণ এইরূপ, যথা—

| অঙ্গ | উপাঙ্গ | উৎপেষ | আয়াম | বিস্তার | পরিণাহ |
|----------|--------------|-------|-------|---------|--------|
| সন্ধি | পাদ | ৪ | ১৪ | ৬ | — |
| | জঙ্ঘা | ১৮ | — | — | ১৬ |
| | জাহ্নু | ৪ | — | — | ১৬ |
| | উরু | ১৬ | — | — | ৩০ |
| অন্তরাধি | ... | ... | ... | ... | ... |
| | বৃষণ | — | ৬ | — | ৮ |
| | শেফঃ | — | ৬ | — | ৫ |
| | ভগ | — | ১২ | — | — |
| | কটী | — | — | ১৬ | — |
| | বস্ত্রিশিরঃ | ১০ | — | — | — |
| | উদর | ১২ | — | ১০ | — |
| | পাখ | — | ১২ | ১০ | — |
| | স্তনাস্তর | — | — | ১২ | — |
| | স্তনপর্যাস্ত | — | — | ২ | — |
| | উরঃ | ১২ | — | ২৪ | — |

(১) (ক) কেবলঃ পুনঃ পরীক্ষয়ন্তী পর্কপি চতুরশীতিঃ।

চরক বিমান ৮

(খ) স্বঃ স্বঃ হস্তত্রয়ঃ সার্কং বপুঃ। বাস্তট পরীর ৩

(২) তত্রায়ুর্দলমোজঃ সূপৈবধ্যঃ বিস্তৃমিষ্টাণ্ড পরে ভাবা ভবতি

আয়ত্তা প্রমাণবতি পরীরে। চরক বিমান ৮

(৩) ওজারঃ শরীরস্তাক্রবিভাগঃ। ওৎ বণা যৌ রাহঃ, যে

সন্ধিনি, শিরোগ্রীবমস্তরাধিরিতি যড়ঙ্গমঙ্গ। চরক পরীর ৭

চৈত্র ১৩১৯

| অঙ্গ | উপাঙ্গ | উৎসেধ | আয়াম | বিস্তার | পরিণাহ |
|------|--------|-------|-------|---------|--------|
| | কদম্ব | — | — | ২ | — |
| | কক্ক | — | ৮ | — | — |
| | অংস | — | ৬ | — | — |
| | কক্ক | ৮ | — | — | — |
| | ত্রিক | ১২ | — | — | — |
| | পৃষ্ঠ | ১৮ | — | — | — |

| বাছ | ... | ... | ... | ... | ... |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
| | প্রবাহ | — | ১৬ | — | — |
| | প্রপানি | — | ১৫ | — | — |
| | হস্ত | — | ১০ | — | — |

উত্তমার্গ—

| | | | | |
|-----------|----|---|---|----|
| গ্রীবা | ৪ | — | — | ৩২ |
| আনন | ১২ | — | — | ২৪ |
| আস্ত | — | ৫ | — | — |
| চিবুক | ৪ | — | — | — |
| ওষ্ঠ | — | ৪ | — | — |
| কর্ণ | — | ৪ | — | — |
| অক্ষিমধ্য | — | — | ৪ | — |
| নাসিকা | ৪ | — | — | — |
| ললাট | ৪ | — | — | — |
| শিরঃ | ১৬ | — | — | ৩২ |

(১)

মানব-দেহের যে প্রমাণ নিদ্রিষ্ট হইল (২) তাহাতেই দীর্ঘায়ুর পরিচয় পাওয়া গেলেও কখন কখন ইহার শুক্ল-লাঘব দৃষ্ট হয় এবং এই প্রমাণ গৌরবানুসারে আয়ুকালের পরিমাণেও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। মস্তক, হস্ত, পৃষ্ঠ, স্তন্যগ্র, দশন, বদন, কক্ক ও ললাট প্রমাণাতিরিক্ত বড়; অঙ্গুলিপর্ক, সন্ধি, জিহবা, বাহ ও চক্ষু অতিরিক্ত দীর্ঘ;

(১) চরক বিমান, ৮ম অধ্যায়।

(২) হৃৎকতের সহিত এখানে বিরোধ দৃষ্ট হয়। বিরোধের সীমাসী আছে। অতি বিস্তৃত বলিয়া তাহা পরিহার করা হইল।

লেখক।

ললাট, কর্ণপীঠ, ক্র, স্তন্যগ্র ও বক্ষঃস্থল প্রমাণাতিরিক্ত বিস্তীর্ণ; জজ্বা, মেঢ় ও গ্রীবা হৃৎকত; নাভি গভীর; স্তন্যগ্র কিঞ্চিৎদূরত ও নিবিড়; কর্ণ মাংসল, বিস্তীর্ণ ও রোমশ; মস্তক পশ্চাদ্ভাগে বিস্তীর্ণ; উরুদ্বয়, ফিক্, কটী, বক্ষঃ, গ্রীবা ও তালু উপচয়সম্পন্ন; এবং পানি, পাদ, ললাট, কর্ণ ও চক্ষু প্রমাণাতিরিক্ত বড় ও উপচয়সম্পন্ন হইলে তাহা দীর্ঘায়ুর লক্ষণ।

শরীরে অস্থি-সমূহ সম-স্থিতি, সন্ধি-সমূহ গূঢ় ও স্থনিবদ্ধ, পেশী-সমূহ স্থনিবিষ্ট, রক্ত সুসংস্থিত, শিরা-নায়ু-সমূহ গূঢ় সংস্থিত, এবং ইন্দ্রিয়-সমূহ স্বকর্ষাকুল হইলে তাহাও দীর্ঘায়ুর লক্ষণ।

পদ হইতে মস্তক পর্যন্ত শরীর-ক্ষেত্র উত্তরোত্তর স্ফুটিত হইলে তাহা দীর্ঘায়ুর লক্ষণ। (১)।

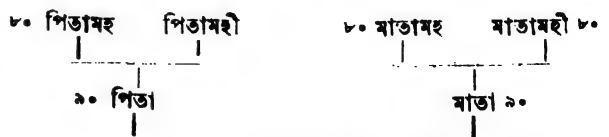
দীর্ঘায়ুস্তম্ভ অতি বিস্তৃত। বাহারা এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন, আমি তাহাদিগকে আয়ুর্বেদ আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীহর্গনারায়ণ সেন।

ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি (২)

যেই কারণে ভারতীয় সাহিত্য জনসাধারণের শক্তি-পরিচর্যা লাভ করে নাই, ইতিপূর্বে তাহার আভাস দিয়াছি। ব্রাহ্মণাচার বা উন্নত বর্ণের সভ্যতাও সমাজে ব্যাপক হইতে

(১) হৃৎকত হৃৎস্থান। হৃৎকতের এই প্রেক্ষিত ব্যাখ্যা কেহ কেহ অন্তরূপ করেন। যে ব্যক্তির ক্ষেত্র (কুল) উত্তরোত্তর দীর্ঘায়ু পুরুষ দ্বারা অলঙ্কৃত তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। এইটাই এইরূপ হইতে পারে :-



হরিদাসের আয়ু কি রূপ হইতে পারে এই রূপ বিচারে পূর্বোক্ত মতে হরিদাসের আয়ুকাল ২০ অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত।

পারে নাই। এই জাতির ধর্ম-আদর্শ তাহার সমাজ-আদর্শকে সর্বতোভাবে কবলিত করিয়াই দাঁড়াইয়াছিল এবং এই প্রণালী অবলম্বনেই বৌদ্ধ ধর্মকে নির্জিত করিয়াছিল। ইতিহাস ভারতীয় সাহিত্য বা সমাজের যাহা কিছু স্মরণযোগ্য বস্তু লিপি করিতেছে তাহার অধিকাংশই বৌদ্ধ প্রভাব এবং বৌদ্ধ-সম্পর্কের সম্পত্তি। বৌদ্ধ নিরাসের অবাবহিত পরকালেই ভারতে মুসলমানের আবির্ভাব : এই জাতি নিরাস ফিরাইতেও পারে নাই। বৌদ্ধ আদর্শকে নিরস্ত বা কবলিত করিতে যাইয়া, তাহার সমাজ-ধর্ম যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর জোর দিয়াছিল, উহার অনুধাবন করিলেই দেখিব, তাহার সাহিত্য বা সমাজ উভয়ের অধোগতিটাই অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এই দুই প্রতিষ্ঠানই জাতি-ভেদ এবং জাতি-জাতির অধীনতা ; এবং উহাদের হইতেই হিন্দুর অপর সমস্ত বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত ! তাহার সমাজ-ধর্মের যাবতীয় বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলি চিন্তা করিলেই দেখিব, তাহার পক্ষে আটঘাট বন্ধ করিয়া বা স্থিতিবান হইয়া আত্মরক্ষা করা যেমন অনায়াসসাধ্য, তেমন তাহার সাহিত্যের অধোগতি বা রাষ্ট্রশক্তির অধঃপতনও অপরিহার্য্য ছিল। পুরাণাদির স্থানে স্থানে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। মহা-মহা বৎসর পূর্বেই এই সমাজের প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি তাহার ভবিষ্য ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠা নিঃসংশয়ে পাঠ করিতে পারিতেন। এই সমাজ যে ক্রমে সংকর বর্ণে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, জাতি-ভেদের মনু-প্রোক্ত আধ্যাত্মিক আদর্শ এবং নির্দিষ্ট জাতি-ধর্ম সমস্তই যে (দৃষ্টান্ত : এবং অধ্যাত্মতঃ) উৎসন্ন হইয়া যাইবে, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্ত বিশেষ কারিগরীর দরকার ছিল না। গতিশীল জগৎ-তত্ত্ব, অনন্তশক্তি-মান্ এবং স্বাভাবিকবিশ্বাসী মনুষ্য-আত্মা ! এই দুই পদার্থের সমক্ষে স্থিতিবান সমাজ-আদর্শ যাত্রকেই পদে পদে লবুতা অনুভব করিতে হয় ! মহাসংহিতা, অপিচ সমস্ত সংহিতা-গ্রন্থগুলিই একটা বিশেষ স্থিতি-আদর্শে বিরচিত। এই বিশেষ তত্ত্বের বাস্তবতার নিরস্ত করিবার জন্ত ব্রাহ্মণ জাতির প্রাণপণ চেষ্টাটাই উহাদের প্রতিপত্তি আত্মপ্রকাশ করি-

তেছে ! মহাসংহিতা রচনার সময়েই ভারতীয় সমাজের স্থিতি-সমস্তা চূড়ান্তকিন্সা আকার ধারণ করিয়াই দাঁড়াইয়াছিল, দেখা যায়।

ভারতীয় সমাজের বিশেষ অবস্থার ফলেই তাহার সাহিত্য-ভাষা ক্রমে জনসাধারণের কথিত ভাষা হইতে দূর-দূরবর্তী হইয়া, 'পণ্ডিত ভাষায়' পরিণতি লাভ করে—'সংস্কৃত' অথবা লাভ করে। এই 'সংস্কৃত' আদর্শ ক্রমে তাহার সাহিত্যেও যে কি অপরূপ ফল ফল করিয়াছে, নাট্য-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই উহা প্রতীয়মান হইবে। সাধারণ বক্তৃতা, এমন কি সর্ববর্ণের স্ত্রীগণ এক ভাষায় কথা কহিতেছে, আর উন্নত বর্ণের পুরুষগণ সংস্কৃত ভাষাতেই তাহার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছেন, এই অপরূপ প্রণালী সমাজের কোন আদর্শে এবং কোন অবস্থায় অভিনবিত কিংবা সমর্পিত হইতে পারে ? কেবল এই স্থানেই শেষ নহে। উপরিস্থপণ ক্রমে এমন একটা পাতি উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। নাটকের পাত্রগণ কে কোন জাতীয় হইবে, কাহার চরিত্রে কোন লক্ষণ প্রবল করিতে হইবে, প্রকারান্তরে কে কেমন করিয়া চলিবে, বসিবে, খাইবে, ইত্যাদি সমস্তকেই শাস্ত্র-সংহিতার অষ্টপাশবদ্ধ করিবার জন্ত অক্লান্ত চেষ্টা চলিয়াছিল ! সমাজ-সমস্তা সাহিত্য-লোকেও প্রসারিত হইয়া মনুষ্যের মনটাকেও ক্রমে সবেল স্থিতিআদর্শাপন্ন করিয়াছিল। সাহিত্য শাস্ত্রকারগণের অহুজা মানিয়া চলিলে, প্রত্যেক সংস্কৃত নাটকে অন্ততঃ আটটি ভাষার কোলাহল সৃজন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পাত্রগণের কেহ মাগদী, কেহ অর্দ্ধমাগদী, কেহ শৌরসেনী ব্যবহার না করিলে রচনাটাকেই জাতিভ্রষ্ট এবং ধর্মভ্রষ্ট বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। এই রূপে জাতি-ভেদবন্ধনের আদর্শ সাহিত্যরাজ্যেও শাসিত হইতে লাগিল। স্বর্গ হইতে মর্ত্যলোক পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুবিষয়কে, দর্শন, কর্মশাস্ত্র, শরীর শাস্ত্র, সঙ্গীত-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নিসর্গ-বিজ্ঞান সমস্তকেই এই ভেদ-বাদের আমলে আনিয়াই চিন্তা করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতে মুসলমান

পরিচয়ের পূর্ববর্তী যুগে, ইহার প্রতিকূলে কোনরূপ বিশেষ বিরুদ্ধবাদ বা সংশয়-তর্ক পর্য্যন্ত উপাধিত হওয়া দৃষ্ট হয় না। সকলে যেন বিনা তর্কেই এই ভেদবাদ গ্রহণ করিয়াছে; অস্তিত্ব, সাহিত্যতটে উহার বিরুদ্ধে মনুষ্য-মনের কোন তরঙ্গ আঘাত-রেখা অঙ্কিত করিতে পারে নাই। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ এই রূপে গ্রীষ্মের জন্মের বহুপূর্বে পাণিনীর যুগে নিবদ্ধ হইয়া পড়ে; দশম শতাব্দীর পর হইতে অলংকার শাস্ত্রের নাগপাশ পূর্ণপ্রকট হইয়া মনুষ্য-মনের শেষ স্বাতন্ত্র্য-রেখা পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলে। এই শাস্ত্র-দৃষ্টান্ত এবং তাহার ফল সাহিত্য-সংসারে সকল দিকেই তুলনাহীন। ইহার পর কাব্যসাহিত্যের, বিশেষতঃ নাটকের কোন গতি হইতে পারে? ভাষার কি দশা হইতে পারে? ফলে নাট্যকলা পঞ্চদশ লাভ করে। ‘নাছোড় বান্দা’ কবিগুলা তবুও কলম ছাড়েন নাই। তাঁহারা রামায়ণ, মহাভারতের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া মহাকাব্য রচনা করিতেছিলেন। তবে, এই ক্ষেত্রেও সাহিত্যিকারের হস্তে পরিব্রাণ পান নাই। মহাকাব্য কিরূপ হইবে, তাহার মধ্যে কয়টা সর্গ-সন্ধির আবশ্যক, তাহার নায়ক-নায়িকার কোন জাতি, ব্যবসায়, বা গুণ থাকা শাস্ত্রসম্মত? বলা বাহুল্য, এই সমস্ত শাস্ত্রকে তুচ্ছ করা কাহারও ইচ্ছা কিংবা ক্ষমতায় ছিল না। কালিদাস ভবভূতিকে পর্য্যন্ত অলংকার শাস্ত্রের ফাঁফড়ে পড়িয়া নানাদিকে সঙ্কচিত ভাবে চলিতে হইয়াছে। অল্পবয়স হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাস, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভরহরি পভৃতি মহাকাব্য রচয়িতার শিল্পপ্রকৃতি চিন্তা করিলেই দেখিবেন, এই শাস্ত্রবন্ধনের যন্ত্র কিরূপ ক্রম-পরিণতি লাভ করিয়া অবশেষে কবিগণের গলা টিপিয়া দিয়াছে! কাব্য এবং কবিত্ব কিরূপ বৈচিত্র্যহীন হইয়া মৌলিকতা এবং প্রাণ-শক্তি হারাউয়া, একঘেয়ে এবং অচল হইয়া গিয়াছে? ক্রমে কেবল ভাষার দিকে, ছন্দের দিকে এবং অলংকারের কূটকাটবোয় দিকেই নিরুপায় সরস্বতীপুত্রের হৃদয় আবদ্ধ হইয়া পাব্যানে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, সমস্তের মধ্যেই ক্রমে যেন

একটা অভিশাপ-পরিণতি এবং ‘অহল্যা পাব্যঙ্গী’ জাতীয় অচল স্থিতিই লক্ষ্য করিবেন। দেশের প্রকৃত জীবনাবস্থা বা সময়-গতির দিকে ক্রমে সংস্কারের দৃষ্টিই অবষ্টক হইয়া যায়; পূর্ব-পূর্বগণের নেমিবৃত্তিটাই মাহাত্ম্যের একমাত্র লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি কিংবা সহানুভূতি রহিত হইয়া গিয়া কেবল দূরগত অতীতের বিশেষ বিশেষ আদর্শই একান্ত ভাবে পূজা লাভ করিতে থাকে! প্রাচীন নর-সমাজ কিংবা সাহিত্যমাত্রের ইহা একটা সাধারণ দোষ বলিয়া নির্দেশ করিলে ভুল হয় না যে, কেইটি প্রকৃতির প্রতি সম্মানে আত্ম প্রকাশ করিতে চাচে নাই: ‘প্রাকৃত’ শব্দটি যেন ঘৃণাবাক্য। প্রাকৃতির মধ্যে যে অপরূপ রসালতা বা আধ্যাত্মিকতা আছে, সাধারণ-তার অভ্যন্তরেই যে অসাধারণ মাহাত্ম্য-বীজ লুপ্ত রহিয়াছে তাহার সুস্পষ্ট বুদ্ধি এবং এই বুদ্ধির সতর্ক অনুসরণটুকু আধুনিক মনুষ্য-সভ্যতার একটা প্রধান প্রাপ্তি।

মনুষ্য-সমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় কথা, তাহার বিরাট পুরুষ—তাহার সহস্রশীর্ষা পুরুষ—তাহার সাধারণ। মনুষ্যের সর্বত্র এই ‘সহস্রশীর্ষা, সহস্রাঙ্গ এবং সহস্র-পাদ’ পুরুষের অচিন্ত্য শক্তি-লীলাই উপলব্ধি করিতেছি! উৎসাহে ‘বিশ্ব-মানব, সর্বপুরুষ, পুরুষোত্তম বা নারায়ণ, মাহা বলিতে হয় বলুন। ভারতীয় আধ্যাত্মিক সর্বাপেক্ষে এই বিরাট পুরুষের শক্তিতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, এবং উহা হইতে মহাপ্রাণতা সিদ্ধি করিয়াই, জগতে মহাজাতিক্রমে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ক্রমে এই বিরাট পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্রের চতুর্বিধ আদর্শের উৎপত্তি হইলেও, ভারতবর্ষ এত কাল উহার বিরুদ্ধ-নীতি-সমক্ষেও অন্তর্জাতিক জীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। সাধারণের ধর্ম-মধ্যে আধ্যাত্মিকতার উদ্ভাপ ছিল বলিয়া, সাধারণের হৃদয়-মধ্যে প্রকৃত বুদ্ধি চিরকাল প্রবল বলিয়া—উহা চিরকাল ‘প্রাকৃতিকেল’ বলিয়াই রক্ষা ছিল! উপরি-গণের কিংবা বিশেষ আদর্শবাদী পরিচালকগণের শত শত বিজ্ঞ মত কিংবা বক্তৃতা শুনিয়াও এই সাধারণ সহসা ‘গা-নাড়া’ দেয় না বলিয়াই রক্ষা! আমরা দেখিব, এই রক্ষা

গতিকেষ্ট ভারতবর্ষ প্রচুর জীবন-বিরোধী মতবাদ-সমক্ষেও জীবন রক্ষা করিয়াছে ; অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং পরীক্ষার স্থলেও জয়ী হইয়া আসিয়াছে। আরও দেখিব যে, এই রক্ষা-গতিকেষ্ট ভারতবর্ষ তাহার দম্বাধিকৃত সমাজ-আদর্শ, উহার প্রবল ভেদবাদ, বহুব্যাপক চূষণবাদ বা বৈরাগ্যবাদ সমক্ষেও প্রকৃত সমাজ-শক্তির কিংবা সাহিত্যের মাহাত্ম্যও অন্ততঃ দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত সজীব রাখিতে পারিয়াছিল। বেদ কিংবা উনিষদ্ যুগের, পৌরাণিক কিংবা বৌদ্ধ-সংঘর্ষের ভারতবর্ষ এই কারণেই (তাহার বিরাট সাধারণের সজীব সৎতা গতিকেষ্ট) জগতে নিজের মাগিয়া-মুদ্রা রাখিয়া বাইতে পারিয়াছে ; সমস্ত আসিয়া খণ্ডে এবং ভারত সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত নিজের সভ্যতা-অধিকার বিস্তার করিয়াছে। সমাজ বা ধর্ম বিষয়ে কোনরূপ একরোখা মতবাদ, 'খিওরী' কিংবা 'নিমানচারী' দার্শনিকতা এই মাহাত্ম্যের মূলে নাট। উহার প্রধান কঠী বিরাট সাধারণের জীবন-শক্তি ; তাহার সবল বলিষ্ঠ এবং জগৎ-গতি বিষয়ে অদ্রাস্ত বিশ্বাসী পদা। দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় বিরাট দৃষ্টির এই মাহাত্ম্য অটুট ছিল। উহার পর হইতেই যেন তাহার হৃদয়-শক্তির অসহায়, এবং প্রবলতর সমাজ-আদর্শ-সমক্ষে তাহার নিস্তেজ ভাব এবং পরাজয় দারণা করিতে হয়। ঐ সময় হইতে তাহার সাহিত্যেও নিষ্কীর্ণতার সূত্রপাত !

এই অধোগতির কারণ বুঝিতে হইলে আমাদের কাছে স্থির প্রাণিতে হইবে—সেই বিরাট পুরুষের একক সত্তা বা অভয় এবং অবিকল্প মুর্তিই চিরকাল মনুষ্য-সভ্যতার উপাত্ত— তাহার ধর্ম সমাজ বা সাহিত্য আদর্শের প্রধান সাধনীয় ! এই উপাসনা মধোই নর-সমাজের প্রকৃত জীবন-ওষটুকু নিহিত। মনুষ্যের অধ্যাত্মলোকে শর্যতান আছে—জীবিত এবং জাগ্রত মনুষ্যসাম্রাজ্যে—জাতিমাত্রকে এই শর্যতান মাড়াইয়া চলিতে হয় ! এই শর্যতান চিরকাল 'একত্ব' বুদ্ধিকে থণ্ড করিতে—বিচ্ছিন্ন করিতে চায় ; মনুষ্যের অহং-তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং স্বার্থকে উকাইয়া দিয়া জীবনের সকল দিকেই চিরকাল ভেদবাদ প্রবল করিতে চায়। এই

শর্যতানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অগসর হওয়াটাই জীবন—
যেমনই ব্যক্তির, তেমনই জাতির। জগতের সকল সমাজ
পাচীন কালে এই ভেদ-পরিণতি এবং উহার ফল হইতেই
নিজের পাপ এবং আম-বাতনা ভোগ করিয়া আসিয়াছে।
মনুষ্যের অন্তর্জাত এই ভেদ-বিকাশের নিরাস বা উহার
বখাষণ বাবজারই মনুষ্য-সমাজের চিরকালীয় সমস্যা। উহার
নিরাসেই একাগ্রতা হইয়া, বরঞ্চ শক্তি স্থাপন করিতে বা
উহার পরিপোষণে তৎপর হওয়াতেই ভারতীয় সমাজ কালে
সমস্ত খোয়াইয়াছে। সমাজ-দার্শনিক গণ বলবেন, মনুষ্য-
মাত্রেই সাধারণ পাপতত্ত্ব এই ভেদ-বাদ ! মানুষ অহং-মুখ
বা অহং-ভাবুক বলিয়াই এই ভেদগতি স্বাভাবিক। সমাজকে
নিরত সচেতন থাকিয়াই উহার বিরুদ্ধ ক্রিয়া অবলম্বন করিতে
হয় ; সাম-মন্ত্রকেই স্বীকার করিয়া চলিতে হয়। ভেদকে কদাচ
স্বীকার করিতে নাই—উহা মনুষ্য-সভ্যতার শর্যতান।
ক্রিয়া-মূলে এই স্বীকার বা অস্বীকারের মধোই সমস্ত সমাজের
পদান পাপ-পুণ্য নিদান নিহিত। প্রাচীনগণের সমক্ষে
এই তত্ত্ব প্রবল ভাবে পকট হইতে পারে নাই। ইসলাম-
পরিচয়ের পূর্বে ভারত-জাতির পক্ষে এই দিকে দৃষ্টি করার
খাবগুণ বা অবকাশও ঘটে নাই। তাহার সমাজ এই
বিরাটকে থণ্ড থণ্ড করিয়া দেখিল, রোগটাকেই সনাতন
তত্ত্ব বলিয়া মানিয়া বসিল, কেবল মুখটাকেই মূঢ়্যভাবে লক্ষ্য
বাগিল ! 'পুরুষ তত্ত্বের' সর্বাপেক্ষা প্রধান লক্ষণ, সর্বাপেক্ষা
অন্তরতম পদার্থ—তাহার 'একত্বের' দিকে—সাধারণের
দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে চাহে নাই। মুখ, বাহ, উদর,
জজ্বা প্রভৃতি সমস্তই দেহ পদার্থের বাঁধাক অবয়বভেদ !
অধ্যাত্ম ভাবে উহাদের ক্রিয়া কিংবা প্রকৃতি ভেদ থাকিলেও,
উহাদিগকে কদাপি 'একত্ব' হইতে স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া স্বীকার
করিতে নাই। এই ভেদকে বাহ্য আকারে নির্দিষ্ট করিতে
কিংবা জন্মজাতিগত আদর্শে স্থির পরিচিহ্নিত করিতে চাহিলে
যে ভুল হয়, সমাজের ক্ষেত্রে তদপেক্ষা ভয়াবহ আর কিছুই
হইতে পারে না। উহা প্রবল স্রোতের অধিকূলে হাল
ছাড়িয়া দেওয়া। একটুকু বিমনস্ক হইলে উহাতেই সমস্ত
জাতির রক্তাধার-মধো—পাণাধার-মধো ক্ষয় রোগ উৎপন্ন

করিয়া অনিবার্যভাবে মূড়া উপস্থিত করিতে পারে। ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল সমন্বয় থাকিতে পারে নাই—মহাসংহিতার সময়েই তাহার বিশেষ তত্ত্বীয় সমাজ-বন্ধে যক্ষা-লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। অবশ্যচক্ষে পড়িয়া তাহাকে চিরকাল ভেদ এবং বিচ্ছিন্ন-তাকেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া, উহাকেই জীবন-তত্ত্ব রূপে গ্রহণ পূর্বক চলিয়া আসিতে হইয়াছে। যে দ্বাদশি আদিকালে বিরাট পুরুষের তত্ত্ব স্বনয়ন করিয়াছিলেন, জাতীয় শক্তি-আদর্শের ‘অর্থবাদ’ স্বরূপেই পুরুষ সৃষ্টির বিখ্যাত ঋক রচনা করিয়াছিলেন, সমাজতত্ত্ব মধ্যে ভেদকে পরিপোষণের অথবা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন বলিয়া কোন মতেই মনে হয় না,—‘বিরাট পুরুষ’ শব্দই তাহার বিপরীত সংকেত করিতেছে। যাহা হউক আমরা দেখিতেছি, ভারতের জাতীয় জীবন যেমন তাহার সমাজ-তত্ত্বের ভেদবাদফলেই ক্রমে অচল এবং নিষ্কীব হইয়া গিয়াছে, তাহার সাহিত্যেও বিশেষভাবে এই ‘একতার’ তত্ত্বকে বা সাধারণের মাহাত্ম্যকে লক্ষ্যচ্যুত করিয়াই মৃত হইয়াছে। এই ভেদকে প্রাচীন কাল হইতে অধ্যাত্ম আদর্শে বা ‘পারলৌকিক ক্ষেম’ আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ‘ইহ’-পক্ষীয় যাবতীয় সংশয় জিজ্ঞাসা বা তর্কবিতর্কের কর্ত্তরোধ করিবার জন্য, অপর সমস্ত বিবেচনা বিচারকে পে ধরা কেলিবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা চলিয়াছিল। ইতিহাস সাক্ষী, এই চেষ্টাই জয়ী হইয়াছে। এখন এই দেশে এই ভেদ-বাদের বিপক্ষে কোন রূপ সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপন করাটাই মহাপাপের জায় নিশ্চিত। ‘ইহলোক’ পক্ষের যাবতীয় অস্তিত্ব, অমুবিধা কিংবা দুঃখ, সমাজ-পক্ষের যাবতীয় প্রশ্নতর্ক, সমস্তই এত অধ্যাত্ম-আদর্শ এবং পরলোক আদর্শের বোলচালেই নিষ্পিষ্ট হইতেছে। প্রাকৃত দৃষ্টিটুকু এতদূর বিপরীত হইয়া গিয়াছে, সাধারণের সহজ বুদ্ধিটাও উক্ত বিশেষ আদর্শে এতদূর নিষ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, এই ভেদবন্ধে পতিত হইয়া বাহারা সমাজ-মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক নিষ্পেবিত, তাহারাই প্রশ্নকর্ত্তার বিরুদ্ধে সর্বোগ্রহে লাঠি তুলিবে! সাম্যবাদীর মুখে তাহারাই অগ্রগামী হইয়া খুঁ খুঁ প্রবীণ করিবে! এখন দেখুন, কোন একটা বিশেষ আদর্শের কি পরিমাণ অমূল্য সমর্থনা এবং প্রবর্তনা হইতে

সাধারণ নামক প্রকাণ্ড পদার্থটি তাহার সহজ সাম্য বুদ্ধি বা প্রাকৃত বুদ্ধি বিস্মিত হইয়া অস্বপ্নমতি হইয়া পড়িতে পারে! ফলেও, বৌদ্ধ আদর্শের বিপক্ষে পৌরাণিক কিংবা নব-অভ্যুদিত হিন্দু আদর্শের বিরুদ্ধ চেষ্টা দীর্ঘকাল ধরিয়া অক্লান্ত-ভাবে এবং পরিব্যাপ্ত ভাবেই চলিয়াছিল। নগর হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম গোত্র পরিবারে এবং প্রত্যেক জনে জনে প্রভাব বিস্তার করিয়াই এই প্রকার কার্যকে জয়ী হইতে হইয়াছে। সমাজের উপরিদৃষ্টির প্রত্যেকের সামাজিক স্বার্থে ন্যূনাধিক ইচ্ছন যোগাইয়াই তাহাদের সমর্থনা লাভ করিতে হইয়াছিল। উহার ফলে হিন্দু ভারতবর্ষের নগরাদি হইতে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামেই এক শ্রেণীর বা উচ্চ উচ্চতর শ্রেণীর লোকগণ নিয় নিয়তর শ্রেণীর উপরে সমাজ এবং ধর্ম আচার বিষয়ে স্বতোনিবৃত্ত শাসক এবং পাহাড়াদার হইয়া যান। এইরূপেই ‘জাতিভেদ’ সমাজের উপরিদৃষ্টি হইতে, হয়ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি হইত এই প্রথম শক্তি-সমর্থনা লাভ করিয়া ক্রমে ভারতের ইতর সাধারণের অন্তর্ভুক্ত পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছে। রাজাধিষ্ঠিত না হইয়াও অথবা সম্পূর্ণ-রূপে অরাজকতার মধ্যেও উহা আত্মরক্ষা করিয়া বরং আত্মপ্রদার করিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। ক্ষত্রিয় রাজত্বের বা হিন্দু রাজত্বের অবসান হইলেও সেই ভেদবাদই বরং উত্তরোত্তর বলী হইয়া সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থকেই মুখা জানিয়া চলিয়া আসিয়াছে, উহার গতিকেই, দেখিবেন, অন্ততঃ নয় শত বৎসর পূর্বে হিন্দু ভারতবর্ষে বৌদ্ধ আদর্শ নিরূপিত, ধর্ম সমাজে রাষ্ট্রে সাহিত্যে ‘সাধারণ’ নামক আদর্শতত্ত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে নিরূপিত! সমস্তই একটা ভেদ আদর্শে কেবল “নিষেধ” আদর্শেই নিরূপিত!

প্রাচীন তত্ত্বের আদ্য আদর্শের সহিত বৌদ্ধ আদর্শের পার্থক্য স্থানে স্থানে চিন্তা করিয়া আসিয়াছি, এই স্থলে ভারতীয় সমাজ ও ধর্মবিষয়ে বৌদ্ধ আদর্শের ঘনকল মোটা-মুটি ধারণা করিব। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বৌদ্ধ আদর্শের ঘন কল, ইষ্ট অথবা পৈত্রা অমুষ্ঠান সম্পর্কে দেব-পূজা কিংবা যাগযজ্ঞাদির তাবৎ কলবস্তার অস্বীকার; নীতি কেই ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং উপায়-সাধন বলিয়া বরণ।

সমাজ জন্ম বিষয়ে বৌদ্ধ আদর্শের ঘনফল, উপাসকগণের মধ্যে স্বয়ং স্বার্থ বিষয়ে অভেদবাদ; পৌরোহিত্য সম্পর্কেও জন্মজাতিগত ভেদ আদর্শের সম্পূর্ণ পরিহার; ফলতঃ নির্বীচন প্রধার প্রবর্তন। এই সমস্তই মূল বৈদিক আদর্শের—উহার সম্প্রদায় ভেদের কিংবা ভেদনীতির পরম-বিপরীতপন্থী বলিয়াই ধারণা হইবে; ফলতঃ, এই দুই আদর্শই প্রবল থাকিয়া হাজার বৎসর পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ সমাজের মধ্যে উহার স্বাভাৱ্য এবং সমতা রক্ষা করিয়াছিল। মুসলমান আক্রমণের পূর্ববর্তী ভারত-জাতির প্রধান মাহাত্ম্যটাই এইখানে। এই আদর্শবাদের সজীব সংঘর্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিয়ার গতিকেই সে কালের ভারতবর্ষ কোন দিকে অতিরিক্ততার বশবর্তী হইতে অথবা চরমপন্থী হইতে পারে নাই। সমগ্রজাতির আত্মিক শক্তি-সামর্থ্য কিংবা সাধারণের অগ্রগতি কোন দিকে একরোখা হইতে কিংবা কলুষিত হইতে পারে নাই।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ আদর্শের ঘনফল যে সর্বত্র অতিনৈতিক বা পৌরাণিক আদর্শের পরিহার পূর্বক যথা-সম্ভব 'মহুয্য' আদর্শের অনুসরণেই পরিশিষ্ট হইয়াছিল, ভারতীয় সাহিত্যে অতুলনীয় ভাবে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়াছিল, ভাষার বিষয়েও 'সংস্কৃত' আদর্শের পরিহারে সম্পূর্ণ প্রাকৃতের অনুসরণই দেশের হৃদয় দখল করিয়া বসিয়াছিল পূর্ব পূর্ব প্রসঙ্গে তাহা মোটামুটি চিহ্নিত হইয়াছে।

এখন, বৌদ্ধ আদর্শ বলিতে, কেবল জীষ্ট পূর্ব পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর শাক্যকেশরী কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত প্রবল বেদ-দোহ বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে। এই বৌদ্ধ আদর্শ ভারতের মৃত্তিকায় বৈদিক আদর্শের মতনই 'অনাদি'। বেদেও যে স্থলে বৌদ্ধের উল্লেখ আছে, যাহারা বেদের অপৌরুষেয় মাহাত্ম্য মানিতেন না, প্রাচীন আৰ্য্যসমাজের দেব-পিতৃ-পূজা কিংবা বেদাচার পদ্ধতির প্রতি আস্থা প্রকাশ করিতেন না, বরঞ্চ বুদ্ধি, বুদ্ধি, তর্ক এবং সংশয়ের আশ্রয় করিয়াই চলিতেন, তাহারা তৎকালে বুদ্ধি-বাদী বা বৌদ্ধ বলিয়া নির্দিষ্ট। সুতরাং বৌদ্ধ আদর্শ এক দিকে যেমন প্রাকৃত-বাদ বা সাধারণবাদ বহি নহে, তেমনি অত্মদিকে

উহা মহুয্য-মানে প্রথম 'বিজ্ঞান' আদর্শের সূত্রপাত। ভারতবর্ষে বেদ মহুয্যগণের এবং তাহার ধর্ম্যভাবে প্রথম জাগরণ হইতে বরণ উপলব্ধির ইতিবৃত্ত পর্য্যন্তই ধারণ করিতেছে। আদিম ভয়বিষয়ের উচ্ছ্বাস হইতে পূজা-প্রার্থনা, উপাসনা, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, কর্মকাণ্ড জ্ঞান-কাণ্ডের সকল ক্রম-পদবী উহার মধ্যে পরম সতর্কভাবে রক্ষিত। মহুয্য-সদয়ের আদিম বিজ্ঞান জাগরণ হইতেই ভারতে জ্ঞানকাণ্ডের, উপনিষদের তথা বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাত। শাক্যসিংহ স্বয়ং এই প্রাচীন বিজ্ঞান-গতির ঘনফল বহি নহেন। প্রাচীন বৈদিক আদর্শ এই বৌদ্ধকে নিন্দা না করিয়া পারিত না, তেমন বৌদ্ধেরাও বৈদিক দেব-কৃত কর্মের বিপক্ষবাদী না হইয়া পারেন নাই। সত্যজিজ্ঞাসু প্রাকৃত-পিপাসু মহুয্য-হৃদয় ক্রমবিকাশে জাগরিত হইয়াই পূর্ব-পরম্পর, প্রাচীনতম সেই ইষ্ট তত্ত্বের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ আদর্শের বিরোধ উত্থাপিত করিয়াছিল। বৌদ্ধ আদর্শের মূলভিত্তি নিতান্ত প্রাকৃত, নিতান্ত লোকায়ত, উহার মধ্যে হয়ত কিছুমাত্র ভাবুকতা নাই; উহা হয়ত নিতান্ত জড়বাদী, স্থলমতি, উহা অত্যন্ত সাধারণ; অত্মদিকে উহা হইতেই ভারতীয় মৃত্তিকায় যাবতীয় বিজ্ঞান দর্শনের উন্নতি। আবার, উহার বিকাশ হইতেই যে ভারতে মূর্ত্তিপূজা, অবতারবাদ, দ্বৈতবাদ, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি প্রবল সমর্থনা লাভ করিয়াছে, প্রাচীন চতুরাশ্রম আদর্শকে অবসর করিয়া একান্ত সম্মান আরণ্যকজীবনী এবং জ্ঞান-মার্গের আদর্শই সাধারণের চক্ষে পূজ্যতা অর্জন করিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ হয় না। এই বৌদ্ধ আদর্শের বিজয় বা নিরসন হইতে বা উহার সহিত বেমানান রক্ষারফি হইতেই ভারতের ধর্ম, সমাজে যাবতীয় বিশেষত্বতা জাতিভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতা এবং নানা 'বিরুদ্ধ' সেবা অত্যাহিত হইয়া পরকালে 'সাধারণ' শক্তির বা জাতীয় শক্তির মধ্যস্থিত অধঃপাত সাধনে মুসলমান বিজয়টা পর্য্যন্ত অপরিহার্য্য করিয়া গিয়াছে; এই সিদ্ধান্ত জোরের সহিত নির্দেশ করিলেও ভুল হইবে না।

যাহা হউক, এই বৌদ্ধ-নামক আদর্শের প্রবল প্রাকৃত ভাব এবং সংশয় পরিচালিত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি হইতেই

চৈত্র ১৩১৯

ভারতীয় সাহিত্যের, সমাজের এবং বিজ্ঞান দর্শনের বাস্তবীয় উন্নতি! স্মরণাতীত কালের কৃষ্ণ-গহ্বর হইতেই এই উন্নতিসূত্র অমূল্যরূপে করিতে পারি। বলা বাহুল্য, 'বৌদ্ধ' বলিতে প্রাচীন ঋষি উপাধির অনেকানেক ব্যক্তিও আসিয়া পড়েন; উপনিষদ বা আরণ্যকতন্ত্রের অনেক নামনির্দেশনাই ঋষি বেদের কর্মকাণ্ড বিরোধী ঋষি (১) এবং স্বয়ং কপিল, কণাদ এবং গৌতম প্রভৃতি নানাদিক হইতে এই শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। বৃহস্পতি বা চার্বাকের ত কথাই নাই (২)। মহাত্ম্যরূপে চার্বাক রাক্ষস বলিয়া নির্দিষ্ট; এবং চার্বাক মতাবলম্বী কোন সাহসী পুরুষ বুদ্ধিতির সম্ভার ব্রাহ্মণগণের নেত্রোপে দৃষ্ট হইরাছেন। প্রকৃত চার্বাক-দর্শন লুপ্ত; ব্রাহ্মণ্য আদর্শ বঙ্গীয় পক্ষ হইতে চার্বাক দর্শনের যে সংক্ষিপ্ত মর্ম আমাদের হাতে আসিয়াছে, উহার সাহায্যে চার্বাককে কেবল প্রত্যক্ষ বুদ্ধিবাদী বলিয়াই বুঝিতে পারি। চার্বাককে একরূপ দুর্নীতিপরায়ণ করিয়াই উপস্থিত করা হইরাছে; অধিকন্তু, এই চার্বাক-মতই সবিশেষে লোকায়ত মত বলিয়া নির্দিষ্ট। 'লোকায়ত' কথার দ্বারাই বুঝিতে পারি, এক কালে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের মধ্যে, তাহার সাধারণের মধ্যে এই মত পরিব্যাপ্ত ভাবেই প্রচলিত ছিল। হঠরায়ই কথা; উহা প্রাকৃত মত কেবল "প্রাকৃটিকেল।" উহার মধ্যে কোন বিশেষত্ববিশিষ্ট অধ্যাত্ম আদর্শ নাই; উহা বৈদিক আদর্শের ঋষি, পৌরোহিত্য, দেব-পিতৃ-পূজা কিংবা আচার অনুষ্ঠানের প্রবল বিরোধী পক্ষ! এই সাধারণকে পথে আনিতে গিয়া চিরকাল বেদ-বাদীগণকে বিশেষ বেগ পাইতে হইরাছে! শিক্ষা, দীক্ষা, প্রচার বৃত্তি-প্রয়োগ এবং বল-প্রয়োগ, কোনটাই উপেক্ষিত হয় নাই! বজ্র-হিংসকগণের প্রতি বিজাতীয় দৃষ্টি বেদের সর্বত্র লক্ষিত হইবে! এই শ্রেণীর মধ্যে যেমন আদিম 'আবুর', অনার্য বা জাতিহীন জাতি, তেমন বৌদ্ধগণও আছেন! এমন কি শাক্ত কিংবা বৈষ্ণব পুরাণের অনেক 'দেব-বুদ্ধ' পরিচ্ছন্নভাবে

বৌদ্ধগণকেই লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া ধারণা হইতে থাকে! বেদের এই পৌরোহিত্য-নিষ্ঠ 'কর্ম'-ধর্ম পদ্ধতি আদিম আর্ধ্য জাতির বিশেষ আদর্শীয় পৈত্রাতন্ত্র গোত্র-প্রথা এবং গ্রাম-সমাজের প্রকৃতি হইতেই সমুদ্ভূত হইরাছিল! ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে উহা একদিকে যেমন অনার্য-সংঘ হইতে অস্ত্রদিকে তেমনই 'ঘরের ঢৌক' হইতেও চিরকাল উদ্বেগ ভোগ করিয়া আসিয়াছে। উহার প্রতি আত্মবান হইতে গেলে একটা বিশেষ শিক্ষা-সভ্যতা, ভাবুকতা এবং নির্ভরের আবশ্যক ছিল।

এই প্রাচীন বৌদ্ধ-সম্প্রতি সূত্রেই ক্ষত্রিয় ঋষি গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব; এবং এই আবির্ভাবের প্রকট ফলই আমরা ইতিপূর্বে নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আদিম বৌদ্ধ আদর্শের এই প্রাকৃত বুদ্ধিকে দেশ, কাল, পরিবেশের স্ফিটার পূর্বক দুর্নীতি হইতে সংযত করিয়া উন্নত অধ্যাত্ম আদর্শে পরিচালিত করাই দেশে দেশে মনুষ্যসভ্যতার ভিত্তি। বলিতে গেলে, মনুষ্যের পক্ষে কোন দিকে দীর্ঘকাল সমুচিত ভাবে রান টানাই সর্বাঙ্গের কঠিন; উহাই আত্মকাণ্ডারী মনুষ্যের সর্বপ্রধান সমস্যা। কারণ অধ্যাত্ম আদর্শ অতিরিক্ত হইয়াও গর্হিত হইতে পারে; মানুষ উহার কেরে পড়িয়া চরমপন্থিতার বশে মানব-জীবনের সাক্ষা জড়-ভিত্তিটুকুই বিস্মৃত হইয়া 'মত্যাচারী' হইতে পারে; পদে পদে আত্ম-বঞ্চক এবং মিথ্যাচার হইয়া, শুণ্ডতা বঞ্চনিতা এবং "লেকাপা হরস্ত" রাখার আদর্শেই অত্যধিক মজিতে পারে। অস্ত্রদিকে প্রাকৃত আদর্শও অতিরিক্ত হইয়া মনুষ্যকে পশুত্ব বিপরিণত করিতে পারে; জাপ, বর্ষের কিংবা ফিলিস্টাইন করিয়াও তুলিতে পারে। "সর্ব মতাস্ত গর্হিতং" ইহা দার্শনিকের উক্তি। অতিপ্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতের মধ্যপথে প্রকৃত নামক পদার্থটাকে আগলাইয়া ধরাটাই শক্ত। বৌদ্ধ মত যেমন ভারতের স্বাভাৱ্য রক্ষা করিতেছিল; তেমন এই বৌদ্ধ ধর্মই ক্রমে বৌদ্ধসংঘের শত সত্যকতা সত্ত্বেও—পৌরাণিকতা এবং তান্ত্রিকতার বশবর্তী হইয়া ব্রাহ্মণের মধ্যে আত্মহার্য হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। শুণ্ডধর্মী, শুণ্ড আদর্শবাদী এবং শুণ্ডআচারী হইয়া অসামাজিক এবং অকর্মণ্য হইয়া

(১) বাহ্যিক কর্মকাণ্ডকে 'অপরা' বিভ্রা বলিয়া খ্যাপন করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

(২) অনেকের মত হরভক বৃহস্পতিই চার্বাক দর্শনের প্রণেতা।

পড়িয়াছিল; মায়াবাদ এবং শূন্যবাদ প্রভৃতির বাধা হইয়া ক্রমে মুক্তির উদ্দেশ্যে নানারূপ কৌশলের আশ্রয় করিতেছিল। বলা বাহুল্য বেদের কর্মকাণ্ড কিংবা আরণ্যকাদির জ্ঞানকাণ্ড, উভয় পক্ষই অধিকাংশ স্থলে একটা বিশেষ-তত্ত্বীয় অধ্যাত্ম আদর্শে পরিচালিত; উভয়ের মূলেই হুঃখ-বাদ বা জাগতিক অন্তত্ববাদ এবং অবিস্তার প্রবণতাই প্রবল। বৌদ্ধ-ধর্ম সহজ জ্ঞানবাদী হইলেও বোধ হয় ভারতীয় দার্শনিক হাওয়ার বশবর্তী হইয়া—উহার মূলেও এই হুঃখবাদ। প্রকৃত ভাগবত আদর্শ, নারদ—শাণ্ডিল্যাদি ব্রহ্ম-নির্ভর ভক্তিনিষ্ঠা, গীতার ভগবদ্ভক্তি সূত্র কর্তব্যবাদ, প্রজাপতি ঋষি হঠাতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিরা, বিশ্বামিত্র, নাটিকেতাঙ্ক কৃষ্ণদৈবায়ন এবং বাদরায়ণ প্রভৃতির মহান্ ব্রহ্মবাদ, এই সমস্ত প্রাচীন ঐষ্টপৈশ্বাত্যীয় এবং মুক্তি-কৌশলপ্রিয় আর্ধ্য সমাজে সবিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। বরঞ্চ পরবর্তী কালের বুদ্ধপূজার দৃষ্টান্ত হইতে, এমন কি বৌদ্ধতন্ত্রীয় মায়াবাদ শূন্যবাদ এবং নিরঞ্জন নিরীশ্বর মুক্তি-আদর্শের সহিত সংগ্রাম হইতেই ভারতে ব্যক্তিগত ঈশ্বর উপাসনার প্রতিষ্ঠা বর্ধিত হইয়াছে; শৈব, বৈষ্ণব এবং শাক্ত পূজা-পদ্ধতি ও ‘মহাবান’ বৌদ্ধ তন্ত্র হঠাতে পরিপূর্ণ সহায়তা লাভ করিয়াছে। বলিতে কি বৌদ্ধ দার্শনিকগণের চরমপন্থী ‘অহিংসা’ আদর্শের পরম প্রতিবাদ স্বরূপেই ভারতের মুক্তিকার মন্ত-মাংসের অহিংসক শাক্ত সম্প্রদায় বিশেষের সৃষ্টি বলিয়া ধারণা হইবে। ভারতীয় আর্ধ্য সমাজের আদিম পরিবার এবং সম্প্রদায় আদর্শ গতিকে এই দেশে ধর্মমত মাত্রই ক্রমে একান্ত হইয়া পড়া নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল। জীনযান মার্গই প্রকৃত এবং আদিম বৌদ্ধ পন্থা। এই বৌদ্ধ আদর্শও ক্রমে পৌরাণিকতার বশবর্তী হইয়া উহার সহিত একাকার এবং একাচার হইয়া গিয়াছে; স্বয়ং উন্মূখ হইয়া নিজের মস্তকটি হিন্দু আদর্শ কর্তৃক কবলিত হইবার জন্য অগ্রগামী করিয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য প্রাকৃত ব্যক্তি অপেক্ষা বহু অধ্যাত্মবাদীগণের পক্ষেই একান্ত হইবার সম্ভাবনাটো বেশী। এই অধ্যাত্মবাদীগণই ক্রমে আলোচনা-ভীত এবং আলোক-ভীত হইয়া, তর্ক-মুক্তি এবং সংশয়-প্রশ্ন বিষয়ে

অসম্মু হইয়া, একেবারে আলোক-দ্রোহী হইয়া দাঁড়াইতে পারেন; সমগ্র সমাজকে অপরিহার্য অধঃপাতের দিকেই বেগবান করিতে পারেন। সাধারণের ভুল-ভ্রান্তি, পাপ কিংবা বিদ্রোহ সহজেই ধরা পড়ে, এবং চিরকাল স্থগা লাভ করিতে থাকে; কিন্তু অধ্যাত্ম-বাদীর সুপরিচ্ছন্ন পাপমতি লোক-লোচন সমক্ষে পরম পূজা আকারে উপস্থিত থাকিয়া সমগ্র সমাজের মনোবৃত্তিকে, সুতরাং তাহার মানস-পুত্র সাহিত্যকেও অপ্রতিবিধের মূগার দিকেই অগ্রসর করিতে থাকে।

এই বৌদ্ধ মত ভারতে প্রাচীনতম কাল ৬ই-৫ই ছিল বলিয়াই তাহার অর্থ এই যে, আর্ধ্যসমাজ মধ্যে তখনও অনেক সম্প্রদায়গত বেদাচার মাত্রকেই মন্তভাবে গ্রহণ করেন নাই। বেদ এত প্রাচীন যে, উহা রামায়ণ, মহাভারতের সময়েই প্রতিবেদ্য পর্য্যবসিত হইয়াছিল। অধিকন্তু উপনয়নাদি বেদাচার সম্বন্ধেও প্রাচীন আর্ধ্য সমাজের অনেকেই ‘বাত্য’ ছিলেন। মহাভারতে বৃষ্ণি এবং অন্ধক প্রভৃতির কুল-ব্রাতা পাকার উল্লেখ আছে। মহাভারতের সময়েই ভারতের প্রায় সর্বত্র আর্ধ্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণও যে বেদাচার সকল দিকে মানিয়া চলে নাই, তাহা প্রতীয়মান। মনুসংহিতার উল্লেখ আছে সরস্বতী ও দৃশবতীর মধ্যবর্তী স্বল্প পরিমাণ স্থানই প্রকৃত ব্রাহ্মবর্ত বা আর্ধ্যস্থান। এই দেশীয় ব্রাহ্মণের আচার ধর্মই অল্প তাবৎ দেশের আর্ধ্যগণ অনুসরণ করিবেন! এই নির্দেশ যে সে কালেও সবিশেষ অনুমত হইতে পারে নাই, অধিকাংশ লোকে যে বৌদ্ধ আদর্শে প্রাচীন কার্য কর্ম এবং আচার আদর্শ পরিহার পূর্বক স্বাধীনভাবে চলিতেছিল তাহাতে সন্দেহ হয় না। এই বৌদ্ধ আদর্শের ফলেই দেশে বেদের বহুদেব পূজা, ভিন্ন ভিন্ন ঈষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন উপায় এবং কৌশল মূলক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অপ্রতিষ্ঠ হইয়া যায়। বরং নানাসম্প্রদায় স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র ঈশ্বর উপাসনার বশবর্তী হইয়া চলিতে থাকেন; সকল কার্য-ক্ৰমে একের পূজাই বরং প্রচলিত হইয়া পড়ে। এখন এই

একের প্রতি ভক্তি বা পূজা, ইহা বৈদিক কৰ্ম-কাণ্ডের এবং পৌরোহিত্যতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী; নিরীশ্বর 'মুক্তি'-আদর্শ, অবিদ্যা-বাদ কিংবা সোহংবাদেরও বিরোধী। এই একেশ্বর পূজাই ভাগবত আদর্শ, উহার ফলে যেমন পৈতৃতন্ত্র, তেমন ইজাদি দেবতার পূজাও ক্রমে সাধারণের আন্তরিক শ্রদ্ধা হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়ে। উহার প্রভাবে, বৌদ্ধ ব্যতিরিক্ত আৰ্য্য সমাজের মধ্যেও বেদের মূল প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়া শৈব, শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি ঈশ্বর-পূজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ঘটিয়া যায়। বৌদ্ধযুগের হিন্দু-সমাজ-ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সত্য সর্বত্রই হৃদয় অধিকার করে। 'শঙ্কর-বিজয়' গ্রন্থ-প্রণেতা সে কালের আৰ্য্য-সমাজের যে প্রতিষ্ঠিত ধরিয়াছেন উহা অত্যন্ত কুতূহলজনক। উহার মধ্যে কাব্য-অধিকারের অতিশয়োক্তি অনেক আছে, সন্দেহ নাই! কিন্তু তখন যে ব্যাপকভাবে বৈদিক স্বাধা-স্বধা (বা ইষ্ট-পৈতৃতন্ত্র) অপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ হয় না। সমাজের লোক তখন আর দেব-পিতৃ উদ্দেশে স্বাধা-স্বধা অর্পণ করিত না, কাম উদ্দেশে বাজ-পেয়াদি যাগযজ্ঞ করিত না। কেহ বলিত "আমি বিষ্ণু-দাস" কেহ বলিত আমি ঈশানোপাসক ইত্যাদি। সমাজের এই আদর্শ যে শ্রীমৎ কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্করাচার্য্য প্রমুখের চক্ষে নিতান্ত ভয়াবহ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, সন্দেহ কি? উহা লৌকিক ভাবেও কত ভয়াবহ! সমস্ত সমাজ অগণ্য বেচ্ছানুসারী সম্প্রদায় মধ্যে বিভ্রষ্ট এবং ব্যবহিষ্ট হইয়া থাকিবে, উহার মধ্যে কোনরূপ সাধারণতা বা জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না! সুতরাং, কেবল তাঁহারা কেন, অন্ততঃ চতুর্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের সকল ব্রাহ্মণ্য আদর্শবাদী ধর্মবক্তা স্মার্ত্ত এবং টীকাটিপ্পনীকারের চক্ষেও দুইটি শক্ত সমস্তা উপস্থিত ছিল। প্রথম, বৌদ্ধ আদর্শের বা বেদবিদ্বেষী আদর্শের নিরাস বা সমন্বয়; বৌদ্ধ মায়-বাদ, শূন্যবাদ, একান্ত বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস আদর্শকে অদ্বৈত-বাদের কুক্কিগত করা; প্রাচীন কৰ্মকাণ্ড এবং দার্শনিক আদর্শের জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে প্রকৃত সমন্বয় অসম্ভব হইলেও, অন্ততঃ একটা জোড়া-তাকড়া গোছের এবং চোখ বুজিয়া

চলা গোছের সম্মিলন ঘটনা। দ্বিতীয়, সমস্ত ভেদবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও, সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা সাধারণ আচার আদর্শের বা "ধর্ম-কর্মে" প্রবর্তন।

এখন, বর্তমান অবস্থাই তাহার প্রমাণ যে, উক্ত উভয়-দিকেই নব্য উত্থানকারীগণের চেষ্টা সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধ আদর্শ স্বয়ং কবলিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াই হউক, হিন্দু রাজত্বের প্রাধান্য লাভেই হউক, কিংবা ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব প্রজ্বলিত করিয়াই হউক, এই সমুখান জয়ী হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে সকল কথার শেষ কথা এই যে, এই বিজয়-বাপারে প্রধান অস্ত্র ছিল সাহিত্য—সারস্বত-বস্ত্র! ভারতের ব্রাহ্মণ্য অনন্ত পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতার সৃষ্টি করিয়া অথবা প্রাচীন আৰ্য-গ্রন্থাদির সংশোধন এবং পরিবর্তন করিয়া উহাদের অর্থ-মর্ম্ম সমস্ত সমাজের মধ্যে পরিচালিত করিয়াই এই ব্যাপার সমাধা করিয়াছে। উহার ফলে, দশ-নামী সন্ন্যাসীর মধ্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাস কবলিত; শুদ্ধ অদ্বৈত-বক্তাদের মধ্যে বৌদ্ধ দর্শন আচ্ছাদিত! 'নিরঞ্জনী' এবং ত্রির্লোচীগণও 'হিন্দু' গভীর ভিতরে আসিয়া গিয়াছে; বুদ্ধদেব স্বয়ং অবতারত্ব লাভ করিয়া নিজের উপাসকগণকে শৈব বৈষ্ণব এবং শাক্ত সম্প্রদায় মধ্যে 'হারাইয়া' ফেলিয়াছে। সকল ঋষি-বাক্যই শাস্ত্র, সকল মুন-মতই পূজা, সকল সাম্প্রদায়িকতা এবং ভেদ মাত্রেই রঞ্জনীয়, সকল দেব-দেবতাই পূজনীয়! যে বত দেবদেবতা, পূজাবিধি এবং মূনির রচনা আবিষ্কার করিতে পারেন আমরা সমস্তই বিনা তর্কে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত! বেদের তেজিশ দেবতার স্থলে তেজিশ কোটা দেবতা হইলেও ক্ষতি নাই, পুরোহিতগণ যজ্ঞমানের হিতার্থে সমস্তের পূজা নির্বাহ করিতে প্রস্তুত। এইরূপ একটা আগ্রহ এবং গ্রাসের ভাবই এ কালের সারস্বত চেষ্টার প্রধান লক্ষণ বলিয়া প্রতীত হইবে! এইরূপে সকল পৃথক পৃথক সম্প্রদায়, স্বয়ং-পূজকগণ, বিষ্ণুদাস এবং ঈশানো-পাসকগণ কারে প্রকারে প্রাচীন মধ্যবর্তীতন্ত্র এবং পৌরোহিত্যের অধিকার-ভুক্ত হইল! বলা বাহুল্য, এই নব্য-অত্যাখ্যান প্রাচীন ধর্মতন্ত্রের (Theocracy) মূল প্রকৃতি পরিহার করে নাই। প্রাচীন সমাজে বহু-পূজা, হোতৃব,

এবং মন্ত্র-মুদ্রার প্রভুত্ব পূর্ণ মাত্রায় ছিল ; নানাদিকে উহার সংখ্যা মাত্র বৃদ্ধি পাইল বই নহে । নব আবিষ্কৃত দেব পূজার মধ্যেও বজ্র-তন্ত্র প্রবেশ লাভ করিয়া পৌরোহিত্যকে অপরি-হার্য্য করিয়া তুলিল । এইরূপে সমাজের সকল দেব পূজার মধ্যেই বিশেষ বিশেষ মন্ত্র মাহাত্ম্য স্বীকারিত হইয়া সমস্তের স্বাক্ষর্য্য অধীনতা প্রবর্তিত করিল, এই আদিম বৈদিক প্রকৃতিটুকুই—পৌরোহিত্যই একদিকে সমাজের অন্তর্গত সাধারণতত্ত্ব । অন্যদিকে, প্রাচীন স্বাহা-স্বধার পুনঃপ্রবর্তন পূর্ব্বক সকল বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়কে ঐতিগত আদর্শের আমলে আনিয়া ‘হিন্দু’-সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হইল, স্বাহা-স্বধার মাহাত্ম্য দেশের অন্তর্গত স্বাধীনতা^১ প্রাপ্ত হইলেও, উহাই প্রাচীন পৌরোহিত্য তন্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ হইয়া সমগ্র হিন্দু সমাজের অনন্ত ভেদবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেও যৎকিঞ্চিৎ উপাধি-সাম্য আনয়ন করিয়াছে । ঈশ্বরবাদী হউক বা না হউক, যাহা কিছু পূজ্য করুক বা না করুক, স্বাহা-স্বধা এবং ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য মানিয়া চলিলে সকলেই হিন্দু !

উহাই বৌদ্ধবিজয়া এবং নব-প্রতিষ্ঠাপিত হিন্দু-আদর্শের প্রধান লক্ষণ ; এবং এই আদর্শ এখন বাবৎ চলিতেছে ।

এখন, গৃহস্থত্বাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মনুসংহিতা এবং যাবতীয় সংহিতা গ্রন্থগুলি ‘হিন্দু’-আচারমূলক সভ্যতার বিরোধ নির্দেশ করিতেছে । সমস্তই একটা বিশেষ তত্ত্বীয় ধর্ম্ম এবং সমাজের তত্ত্বপ্রোত আদর্শই বিজ্ঞাপিত করে । বেদের দেব-পিতৃ পূজার পদ্ধতি সমস্তের মূলে রহিয়াছে ; বেদের সাম্প্রদায়িকতা অনন্ত ভেদ-বাদের জনক হইয়া দার্শনিক তর্ক বৃক্তির উপস্থাপনে নিজের সমর্থন করিয়াছে, ভ্রুংপ-বাদ মূলক দার্শনিক আদর্শে পার্শ্বিক জীবনটাকে মহা ভ্রুংপাবহ মোহ এবং অধঃপাত জনিত মনে করিয়াছে ; উহার মধ্যে প্রতিনিয়ত নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া ত্রিতিক্ষামাত্র সার করিয়া চলাটাই আদর্শ স্থির করিয়াছে । এই লক্ষণ এত ব্যাপক যে, উহাকে প্রাচীন কালের অগ্নি-প্রবেশ, রামায়ণ মহাকাব্যের সন্ন্যাস-নিষ্পত্তি এবং মহাপ্রস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সবস্ত-ভারতীয় আদি সভ্যতার ধর্ম্ম এবং সমাজ-তন্ত্রের

প্রধান বর্ণ বলিয়া অনুসরণ করিতে পারা যায় । উহা না হওয়াটাই যেন অসম্ভব ছিল ! অত্বেদিকে, ভেদ-বাদের চক্ষে প্রসার বলিয়া কথাটা কখনও আমল পাইতে পারে না । আমরা দেখিয়াছি প্রসার-আদর্শের অর্থই অনুশীলন ; এবং উহাই প্রকারান্তরে ‘প্রবৃত্তি’-আদর্শ বলিয়া প্রাচীন কাল হইতেই নিশ্চিত হইয়াছে । মনুসংহিতা গণ্যতার ‘ধর্ম্ম’^(১) আদর্শ পরম-গর্বিষ্ঠ এবং মহীয়ান বলিয়া মনে করি । উহা সকল ধর্ম্মের অন্তস্তত্ত্বের খ্যাপন করিতেছে—উহা মনুষ্যাত্মার নিরোধের—উর্দ্ধ-প্রয়াণের পন্থা ! ধর্ম্মের উহা নীতিমূলক আদর্শ ! সুতরাং উহার মধ্যে প্রাচীন বৌদ্ধ আদর্শের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে । এই নীতিমূলক আদর্শই মানব-ধর্ম্মের মূলতত্ত্বকে সকল সাম্প্রদায়িক মতবাদ (Dogma ও doctrine) হইতে স্বাধীন করিয়া দিয়াছে । উহা লক্ষ্যে রাখিয়া যে-কোন জাতির যে-কোন ধর্ম্মের এবং যে-কোন সমাজসীমার লোকেই স্বাধীন অধ্যাত্ম-পন্থায় নিজের ‘পরমা গতি’ লাভ করিতে পারেন ! কিন্তু, এই মূল-মন্ত্র সত্ত্বেও মনুকে কার্য্যতঃ ধর্ম্মের নীতি-আদর্শ পরিহার করিতে হইয়াছে । সমাজাধিকৃত ধর্ম্ম-আদর্শের বাধা হইয়া, প্রাচীন ধর্ম্ম-ধর্ম্ম এবং আচার-আদর্শের বাধা হইয়াই, সংহিতাকারকে কেবল নির্দিষ্ট-‘আচারের’ মধ্যেই ঐ মহান আদর্শকে নিরূপিত এবং সীমাবদ্ধ করিতে হইয়াছিল । ভেদকেট সনাতন তত্ত্ব বলিয়া মানিয়া লইয়া উহার সহিত নির্নির্মাণে আপোষ করিয়া, প্রত্যেক বিভিন্নের জন্ত দেশকালের প্রত্যেক বিভিন্নতা এবং সাম্প্রদায়িকতার জন্তই যেন পন্থা নির্দেশ করিতে হইয়াছিল ! উহার গতিকে সমাজের সংহিতা বা ‘ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি’ কেবল কতক-গুলি আচার কার্য্য-বিধির বিস্তারিত সংগ্রহ-পুস্তক ব্যতীত আর কিছুই নহে ! ধর্ম্মের মূলমন্ত্র হই কথায় সারা হইয়া আচার নিরূপণের জন্ত স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে ; এইরূপে হিন্দুর ধর্ম্ম এবং সমাজ আদর্শ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার আচার-পদ্ধতি এবং সমাজনীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া

(১) ধর্ম্ম: কমা দমো হস্তেরঃ শৌচবিজির নিগ্রহঃ
দীর্ঘিভা সত্যমক্ৰোধো ধর্ম্মকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ।

গিয়াছে; মনুষ্যজাতির অগ্র ভাবং ধর্মপদ্ধতি হইতে নানাদিকে বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে; অতীত দেশ-কালের সীমা-নির্যত নিরূপণও নাই 'সনাতন' সংজ্ঞা লাভ করিয়া, অবিচল এবং অমূল্য হইয়া, ব্রাহ্মণ-মুণ্ড বা পুরোহিতের অধিনায়কতায় এই সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ফলতঃ, এই সমাজের মনোগতি এবং বিশ্বাস বুদ্ধি পর্য্যন্ত এই আদর্শে আকারিত না হইয়া পারে নাই। আমরা অনাত্ম ভগবান মনুকে ভারতীয় সমাজতন্ত্রে এক জন সংস্কারেচ্ছ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি প্রাচীন আর্ষ্য-সমাজের স্বভাবগত অনন্ত সাম্প্রদায়িকতা এবং ভেদপ্রবণতাকে চাতুর্য্যে বিভক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শও নামমাত্রে পর্য্যবসিত। হিন্দু সমাজের লোকসকল পরস্পর স্পর্শে বিদ্বেষী থাকিয়া অনন্ত সম্প্রদায়ে বিভক্ত রহিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি সংজ্ঞাশব্দের অভ্যন্তরে যেটুকু সাধারণ লক্ষণ বা সাম্যভাব নিহিত আছে, উহা কদাপি গোষ্ঠী-গোত্র এবং সম্প্রদায়গত বিভিন্নতার অন্ধ স্পর্শ করিতে পারে নাই; প্রকৃত একত্ব-ঘটনা কিংবা জাতীয়তার ক্রিয়াক্রান্তি হইতে বিচ্যুত থাকিয়া বহির্ভাগে কেবল ভাবমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া, জ্যামিতি শাস্ত্রের দেহবিস্তারবিহীন বৃত্ত-রেখার মতনই অবস্থান করিতেছে। ইহার ফল কিরূপে ভারবর্ষের সাহিত্যে সমাজে ধর্ম সকল দিকে কার্য্য করিয়া চিরকাল উহার ভাগ্যনেমি আবর্তিত করিয়াছে, এক কথায়, ভারতীয় মনুষ্য সমাজকে জাগতিক মনুষ্য সমাজের সাধারণ নিয়তি হইতে কত দিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, এই চিন্তা হইতে এ-দেশের কোন বিভাগের আলোচনাই স্বাধীন হইতে পারিতেছে না। সাহিত্য-চিন্তকের পক্ষে ত গত্যন্তরই নাই! কেন না সাহিত্য, সমাজবদ্ধ মনুষ্যের মানস পুত্র বটে নহে।

বিপ্লবের পৌরোহিত্য এবং দল-কর্মাদি অমূল্যতাই ভারতীয় সমাজে যৎকিঞ্চিৎ সাধারণতার ভিত্তি—অনন্ত ভেদবাদের মধ্যে উহাই যৎকিঞ্চিৎ একতা! এই বিশেষত্বের সমস্ত গুণ-দোষ এই মূল লক্ষণের সমস্ত উদয়-কল, বর্তমান মনুষ্য সভ্যতা এবং সমাজের গতিমধ্যে উহার সাহিত্যের অভিব্যক্তি-

মধ্যে হিন্দুজাতিকো কোথায় লইয়া গিয়াছে, উহা আলোচনার প্রতিপদে অনুভব করিতে থাকিব!

সমাজের সমস্ত স্বত্ব বা বড় বড় স্বার্থগুলি সকলের চেষ্টা-অধিকারের মধ্যে থাকাটাই সমাজের সর্বপ্রধান শক্তি—উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণত্ব। যে সমাজের প্রত্যেক স্বত্ব সাধারণ যতই সমতা অনুভব করিতে পারে, তাহার শক্তিও ততই বর্দ্ধিত হয়; সমাজ-বিষয়ে তাহা গোড়ার কথা; উহা হইতেই আধুনিক 'জাতীয়তা' কিংবা 'রাষ্ট্রীয়তার' প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই 'সাধারণ' পদার্থকে জন্মজাতিগত আদর্শে খণ্ড খণ্ড করিয়া সীমাবদ্ধ করাই সাম্প্রদায়িকতার প্রধান লক্ষণ। আমরা দেখিতেছি, 'হিন্দু' আদর্শ যেমন চিরকাল সাম্প্রদায়িকতার দিকে টানিতেছিল, বৌদ্ধ আদর্শ তেমন চিরকাল সাধারণতার দিকেই টানিয়াছে। দেশমধ্যে উভয়ের প্রাবল্য থাকার গতিতেই বৌদ্ধ প্রভাবের ভারতবর্ষে মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মকে নির্জিত করার অর্থই হইতেছে সাম্প্রদায়িকতার জন্মগত পৌরোহিত্য এবং ভেদপ্রবণতার প্রসার, এবং 'সাধারণবাদের' অবনতি! নির্দোষ প্রথা, যাহার মধ্যে মনুষ্যসভ্যতার সকল উন্নতির মূল, তাহার নামগন্ধও ক্রমে অন্তর্হিত! উহার ফলে, এই সমাজ সাহিত্যশিল্প প্রভৃতিকে সাধারণের চেষ্টা-লক্ষ্য হইতে দূরবর্তী করিয়া বিশেষ বিশেষ জন-সংঘে আবদ্ধ করিয়াছিল; অত্র দিকে সমাজস্থ মনুষ্যের শিক্ষা-দীক্ষা চেষ্টা-চরিত্র এবং চিন্তা পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া প্রকারান্তরে মনুষ্যের প্রধান স্বত্ব—তাহার মনের স্বাধীনতাকে পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লইয়াছিল। এই 'হিন্দু' আদর্শে (কেবল হিন্দু কেন সকল প্রাচীন আদর্শেই) স্বাধীনতা, গতি, উন্নতি বা বৈচিত্র্য প্রভৃতি কথা নিদারুণ স্ফাবহ না হইয়া পারে না! উহার আধিপত্য প্রবল হইলে, মনুষ্যের মানস-পুত্র সাহিত্য কিংবা শিল্পের কি দশা হইতে পারে? উহার প্রভাবে মনুষ্যের সমগ্র জীবন ক্রমে সকল বিভাগেই স্বাভাবিক হইয়া, একঘেঁয়ে এবং অবিচল হইয়া, মৃত্যুর

দিকে অগ্রসর হইতে পারে। উহার গতিকে ভারতের মনুষ্য-জীবনটাই এককালে জয়াগ্রহ হইয়া, মধ্য এশিয়া হইতে ক্ষুদ্র গিরিরূপে প্রবাহিত হিম বায়ু সমক্ষে জীর্ণ বটপত্রের ভায় কাঁপিয়াছিল। নিজের অধ্যাত্ম-নিয়তি বশেই ধূলি বিলুপ্তি হইয়াছিল! আমরা জানি এইরূপ অবস্থা সবেও ভারতের মনুষ্যগণ নানাদিকে প্রভূত উন্নতি করিয়াছিল। কিন্তু, কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগত এবং প্রতিভানিষ্ঠ উন্নতি; একক মনুষ্যের কোন প্রাপ্তিই সমাজে ব্যাপক হইতে পারে নাই। সমস্ত সমাজ কেবল একটা বিশেষ আচার আদর্শেই নানাদিক স্থির থাকিতে পারিয়াছে; এক একটা আচার কালবশে নিজের উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা হারািয়া ফেলিলেও হাজার-হাজার বৎসর প্রবল আছে! এই সমাজের শাস্তাগণ এই জাতিভেদ এবং আচার বিশিষ্টতা রক্ষার উদ্দেশ্যে মনুষ্যের সদয়-রক্ত এবং প্রত্যেক অস্ত-তস্ত মধ্যোই জন্মান্তরীয় অদৃষ্টবাদ সংক্রামিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন; উহার গতিকে হিতোপদেশ প্রভৃতির 'পুরুষকার' এবং এই জাতীয় অস্বাভাবিক কথা-প্রবন্ধ এই সমাজের মর্ম্মদেশে চিরকাল নিদারুণভাবে নিক্ষল হইয়া আসিয়াছে। উহার গতিকে এই সমাজ জগতের গতি-প্রবাহে বিশেষভাবে স্থিতিশীল শাস্তিপ্রিয় এবং 'সোয়াস্তিপ্রিয়' হইয়া অবস্থান করিতেছে সত্য; আচার-মূলক আদর্শগতিকে একটা শাস্তিশীল সভ্যতার আদর্শও সিদ্ধি করিতে পারিয়াছে। কিন্তু অল্প কোন বিষয়ে, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি কোন বিষয়েই বাষ্টি-ত উপার্জনের প্রকৃত অমৃতটুকু সমষ্টিদেহে পরিচালিত করিবার জন্ত তাহার কিছুবাড় শক্তি নাই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে উজ্জ্বল পরিস্ফুট স্বর্য়ালোক এবং অমার-রক্তনীর ঘন অন্ধকার পাশাপাশি থাকিয়া আসিয়াছে; সমস্ত প্রাপ্তিই নিম্নেন-পক্ষে বিশেষ বিশেষ সাম্প্রদায়িক মধ্যো শিল্পীভূত হইয়া অবস্থান করিয়াছে; এবং ঘটনাক্রমে, বিশিষ্টের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তের অধঃপাত অনিবার্য হইয়াছে। এই বিশিষ্টের স্বতি পর্ব্বত বিলুপ্ত করিয়া গিয়াছে। ক্রমে এখন এমন

অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, ভারতবর্ষ বিশেষ বিশেষ বিভাগে এত উন্নতি কি করিয়া সম্পন্ন করিল, প্রকৃত অবস্থানভিত্তিক বিচারকের চক্ষে তাহাই সর্ব-প্রধান সমস্ত-আকারে উপস্থিত হয়! কিন্তু উহার সমস্ত দোষগুণ বিশেষ-তত্ত্বের মধ্যে, ভেদতত্ত্বের মধ্যে প্রবল সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে এবং সাধারণতার অভাবের মধ্যেই লুক্কায়িত! দেশ-বিদেশের সকল প্রাচীন সমাজ-মধ্যেই এই লক্ষণ নানাদিক লক্ষ্য করিব। এই 'সাধারণবাদ' আধুনিক মনুষ্য সভ্যতার এবং ইতিহাস-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার সম্পত্তি। উহা বহুতর কষ্টকল্প, হৃদৈব হৃদশা এবং বিপত্তি-সম্প্রাপ্তের শেষ-উপার্জনরূপে মনুষ্য সমাজের নেত্র সমক্ষে প্রকটিত হইয়া ক্রমে মুক্তিমান হইতেছে!

শ্রীশশীকমোহন সেন।

পাহাড়িয়া

ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া,

হেথায় গৃহের কুঞ্জে, তোমার
কি দিবে তৃষিব হিয়া?
কোথায় তমাল পিয়াল, সর্ষ্প
অশোক বকুল নীপ?

মহল গাছের ললাটের পরে
কোথা সে চাঁদের টিপ?

শিরীষ কুলের কেশর শিহরি
পবন হেথা না ফুরে,
মহুয়ার বনে মাতাল হইয়া
মোমাছি নাহি ঘুরে।

বনদেবী হেথা শৈল সোপানে
এলায় না তার বেণী।

কোথা দিগন্তে কাজল বরণ
শিরি'প'র গিরি-শ্রেণী।

গায়াণ বক্ষ বিদারি হেথার

বহে না বিমল বারি ।
সিকতা হৃদয় চিরিয়া হেথায়
ভরে নাকো কেহ বারি ।

কোথায় উদার মুক্ত জীবন
শৈলের পাদ-মূলে ?

চপল চরণে কোথা ছুটাই

গিরি নদী-কূলে কূলে ?

ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া,

হেথায় গৃহের কুঞ্জে, তোমার
কি দিয়ে তুষিবে হিয়া ?

ওগো পাহাড়িয়া বালা,
লায়ে এস করে লতার বলয়
গলে বন-কুল-মালা ।

প্রকৃতি হেথায় কল্যাণীরূপে •

বেঁধেছে কুটীরখানি,

আলিপনা ভরা আঙিনার তলে

এস এস বন রাশি ।

হেথায় জড়াবে শতেক বন্ধ

গৃহ-কাজ হেথা শত ।

মানবের পুত যদি ছায়াতলে

ভ্রুপি লভিবে কত ?

কুল-পল্লব-ভূষণ তেরাগি

গৃহের ভূষণ পর ।

লহ সৌমন্তে সিঁদুর বিন্দু

শঙ্খ-বলয় ধর ।

টানো শির 'পরে লাজ গুণ্ডন

বাঁধ কুন্তল রাশি,

হোক অচপল চরণ বৃগল,

সংযত হোক হাসি ।

পিঞ্জরে আজি পড়িয়াছে বাঁধা,

মুক্ত স্বাধীন পাখী ।

ইরিণ নয়নে ঘেরিয়া দাঁড়াল

শতেক মানব আঁখি ।

ওগো পাহাড়িয়া বধু,

তার মাঝে আলো প্রকৃতি ফুল

অস্তর-কুল-মধু ॥

ত্রিকালিদাস রায় ।

দ্বিজ রামপ্রসাদ

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

রামপ্রসাদ বাঙ্গালীর পৌরব । কাব্য ও সাহিত্য সেমন
ভাষার পরিপুষ্টি ও সৌষ্ঠব সংসাধনের উপাদান, সঙ্গীত ও
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভাষার অঙ্গরূপে সহায়তা করিয়া
পাকে । কাব্য ও সাহিত্যের প্রভাব সুশিক্ষিতের উপরই
বিস্তৃতি লাভ করে । সঙ্গীত রাজাধিরাজের বিলাস-ভবনে,
বাণীক কুঞ্জ কাননে, রাণ্যের গোচারণের মাঠে, কুবকের
ক্ষেত্রে, মাঝিমাঝার নৌকার এবং অবগুণ্ঠনবতী রমণীর
অবলোকে পর্য্যন্ত অবাদে আপন অধিকারের সীমা নির্দেশ
করিয়াছে; সুতরাং সাহিত্যের উপর সঙ্গীতের প্রভাব অস্বীকার
করিলে চলিবে না ।

রামপ্রসাদের প্রেম-বিগলিত হৃদয়ের মন্ডাকিনী ধারারূপে
যে সঙ্গীত-তরঙ্গিনী বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে
কত হৃদয় আশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, কে তাহার সংখ্যা
করিবে ? রামপ্রসাদের পদাবলী শিক্ষিত অশিক্ষিত, স্ত্রী,
পুরুষ, বাণক ব্রহ্ম নির্বিশেষে সর্বত্র একাধিপত্য বিস্তার
করিয়া রহিয়াছে । বঙ্গের এক প্রান্ত চইতে অপর প্রান্ত
পর্য্যন্ত এই সঙ্গীত-সুধার ধারা শারদ-জ্যোৎস্নার ত্রায়
সর্বত্র সম্প্রসারিত ।

কলিকাতার ইংরেজ রাজের রাজধানী স্থাপিত হওয়ার
তৎপার্বণ্যে হান সমূহে জ্ঞান বিস্তারের যথেষ্ট সুবিধা হইয়া-
ছিল । তাহার ফলে তত্ত্বতা বহু লুপ্তপ্রায় রত্ন আবিষ্কৃত
হইয়া লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছে । সাধক কবি রাম-
প্রসাদের গান, কবিতা ও জীবনী সংগ্রহও সেই জ্ঞানের
একতম অমৃত ফল । রামপ্রসাদের শিব-সঙ্গীত, কৃষ্ণবিবরণ

গীত বা বিজ্ঞানস্বরূপ প্রভৃতি বাঙ্গালীর সমাজে অপরিচিত বলিলেও অত্যয় হয় না। তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন—

“গ্রন্থ বাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত।”

তাঁহার গান আশীর্বাদেব মত সমুদয় বঙ্গদেশে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

স্বর্গীয় দয়ালচন্দ্র বোষ, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ এক্স বঙ্গবাসী আফিস রামপ্রসাদের সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। এ কার্যে দয়াল বাবুই অগ্রণী। তিনি প্রভূত পরিশ্রম, অতুল অধ্যবসায় ও যত্নে প্রসাদের সঙ্গীত, জীবনী, জন্মস্থান প্রভৃতির বিবরণী আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন।

রামপ্রসাদের পদাবলী আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, ইহাতে একাধিক ব্যক্তির রচনা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থকারের লিখিত পাণ্ডুলিপি ইহাতে যথা সংগৃহীত হয়, তাঁহার স্বত্ব সাধ্যান্ত করিবার জন্ত কোনও প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না, কিন্তু লোকমুখে শ্রুত অতীত কাহিনীর মধ্যে একই ব্যক্তির রচনা নির্ভুলরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। প্রসাদ-পদাবলী ও এই সত্যের সীমা-রেখা অতিক্রম করিতে পারে নাই। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনকে স্পষ্ট-রূপে পরিচয় করিয়া লওয়ার এক উপায় আছে। তাঁহার পরিচয়ে দেখা যায়

“ধরাভলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম

তত্র মধ্যে সিদ্ধ পিঠ রামকৃষ্ণ-ধাম।”

এই কুমারহট্টই হালিসহরের “কুমারহাটা গ্রাম,” দয়াল বাবু এরূপ স্থির করিয়াছেন। অপর রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কেহ এ পর্য্যন্ত কোনও উচ্চ বাত্যা করে নাই। আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা দ্বিতীয় রামপ্রসাদের সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব।

“প্রসাদ-লেখক” দয়াল বাবু লিখিয়াছেন—

“যদিও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ভিন্ন দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে দ্বিধা সীমাংসার উপনীত হইতে পারি না, তথাপি পশ্চিম বাঙ্গালার সেন রামপ্রসাদ ভিন্ন পূর্ববাঙ্গালার এক জন ‘দ্বিজ রামপ্রসাদ’ ছিলেন, আমরা এই সংস্কার দূর হইল না।”

দ্বিজ রামপ্রসাদ পূর্ববঙ্গবাসী এই সংস্কার দয়াল বাবুর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবার প্রধান কারণ, প্রসাদী সঙ্গীতের মধ্যে কোনও কোনও পদে পূর্ববঙ্গের ভাষা অত্যন্ত পরিষ্কৃত দৃষ্ট হয়, এবং রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান কালেও তিনি পূর্ব-বঙ্গে এক রামপ্রসাদের প্রমাণ পাইয়াছিলেন। প্রসাদী সঙ্গীত পূর্ববঙ্গের গৃহে গৃহে বহুকাল হইতেই প্রচলিত। যে সকল গ্রাম শিক্ষিত সমাজ হইতে পূর্বাধিষ্ট দূরে রহিয়াছে, সেই সকল গ্রামেও প্রসাদী সঙ্গীত স্রবণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ববঙ্গে জনৈক রাম-প্রসাদের আন্তঃ প্রমাণের পক্ষে এই যুক্তিও নিতান্তই উপেক্ষনীয় নহে। দয়াল বাবু কুমারহট্টের সন্ধান করিতে ঐ স্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব-বঙ্গের রামপ্রসাদের জন্ত একটুও শ্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। ১৮৮২ সনের ২৫শে বৈশাখ তাঁহার “প্রসাদ প্রসঙ্গ” প্রচারিত হয়। ইহারও তিন বৎসর পূর্বে তিনি এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই চল্লিশ বৎসর পূর্বে যদি দয়াল বাবু পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদের অনুসন্ধান করিতেন, তবে তাঁহার সফলতা আজ আমাদের পক্ষে গৌরবান্বিত করিত। হৃভাগ্য বশতঃ দয়াল বাবুর হৃদয় সে দিকে আকৃষ্ট হয় নাই। তিনি কুমারহট্টের সন্ধান গমন করিয়াছেন, কিন্তু বদ্ধমূল সংস্কার লইয়াও তিনি পূর্ববঙ্গের প্রসাদের দিকে নেত্রপাত করেন নাই। রামপ্রসাদ ১৬৪০-৪৬ শকাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান ১৩০—৪০ বৎসর পূর্বে রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে, রাম-প্রসাদের মৃত্যুর এক শতাব্দীর পরে দয়াল বাবু অনুসন্ধান ব্রতী হইয়াছিলেন।

তাৎকালিক ইংরেজী শিক্ষিত পশ্চিম বঙ্গ সে অঞ্চলের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্ত যে প্রয়াস পাইয়াছেন, পূর্ব-বঙ্গে সে চেষ্টার যে ক্ষীণালোক আমরা বর্তমানে দেখিতেছি, ইহা আরও কিছুকাল পূর্বে দেখিতে পাইলে পূর্ববঙ্গের বহু গৌরব-মণ্ডিত রত্ন এত কালে আপন প্রভাব বিস্তার করিত।

দয়াল বাবুর দৃঢ় ধারণা ছিল, পূর্ববঙ্গে এক রামপ্রসাদ ছিলেন। আমরা দীনেশ বাবুর “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” এই ‘রামপ্রসাদের’ কোনও সন্ধান প্রাপ্ত হই নাই। কোনও কোনও পূর্ববঙ্গবাসী অল্পসন্ধানের কষ্ট স্বীকার না করিয়া গোলে হরিবোল দিয়া কবিরঞ্জন রামপ্রসাদকেই দ্বিজ প্রদান করিয়াছেন। দয়াল বাবু নিজ বঙ্গমূল সংস্কারের উপরেও একটা সন্দেহের ছায়া পাত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—“পূর্ববাঙ্গলায় অনেকেরই একরূপ অবগতি, সুতরাং সর্বপ্রথমে আমারও একরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, রামপ্রসাদ দ্বিজ ছিলেন। কিন্তু কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ইহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। দ্বিজ শব্দের রূঢ়ার্থ পরিত্যাগ করিয়’ মূল অর্থে কবিরঞ্জনকেও অবশ্য দ্বিজ বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক মানবাত্মাকে মুক্তির পূর্বে দ্বিজ হইতে হইবে। মানবাত্মা সেই পর্য্যন্ত মৃত, যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরেতে পুনর্জীবিত হইয়া ‘দ্বিজ’ হয়। এই মূল অর্থে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদই কোন কোন সঙ্গীতে দ্বিজ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন কি না, ইহা একটি গুরুতর প্রশ্ন। কারণ যে সকল সঙ্গীতে ‘দ্বিজ’ ভণিতা আছে, সে সকল অপেক্ষাকৃত লঘুভাবাত্মক। কিন্তু কবি রামপ্রসাদের সঙ্গীত সকল অতীব গভীর ভাবাত্মক। * * * * * বৈষ্ণব ও উপনয়ন ও গায়ত্রীতে অধিকার আছে। কবিরঞ্জন তাহা হইতেই আপনাকে ‘দ্বিজ’ বলিয়াছেন। তরুণ যৌবনের ঔৎসাহ্য বশে হয়ত প্রসাদ এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিতে পারেন।”

দয়াল বাবুর এই সকল যুক্তি খণ্ডন করা শক্ত নহে। যদি দয়াল বাবুর মতে “মানবাত্মাকে মুক্তির পূর্বে দ্বিজ” হইতে হয়, তবে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, ‘দ্বিজ’ ভণিতা যুক্ত সঙ্গীতগুলি প্রসাদের সিদ্ধ অবস্থায়—সুতরাং জীবনের শেষ ভাগে রচিত। মানবাত্মা মুক্তির পূর্বে দ্বিজ হয়, দয়াল বাবু কোন্ শাস্ত্রীয় প্রমাণের ভিত্তির উপর এই কথা লিখিয়াছেন? তিনি স্বাভাবিক লিখিয়াছেন, “দ্বিজভণিতাযুক্ত সঙ্গীতগুলি অপেক্ষাকৃত লঘুভাবাত্মক”, এ হলেও তাঁহার পূর্বাপর

সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। প্রথম রচিত সঙ্গীত অপেক্ষা পরবর্তী সঙ্গীত লঘুভাবাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? অবশেষে ‘দ্বিজ’ ভণিতাকে ‘তরুণ যৌবনের ঔৎসাহ্য’ বলিয়া তাঁহার প্রথম সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ করতঃ এই ভাবে দয়াল বাবু তাঁহার নিজের প্রতিবাদ নিজেই করিয়াছেন। এই সকল পক্ষ যুক্তির অত্যন্ত স্পষ্ট অসামঞ্জস্য ছুই রামপ্রসাদের ব্যবধান সম্বন্ধে রক্ষা করিতেছে।

১৩০২ সনের শ্রাবণ সংখ্যা নব্যভারতের ১৭২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় রামপ্রসাদের কায়স্থত্ব প্রমাণ করিতে বাইয়া লিখিয়াছেন—“কোন কোন গানের ভণিতায় দ্বিজ রামপ্রসাদ থাকাতো রামপ্রসাদকে ব্রাহ্মণ মনে করা যাইতে পারে। তৎসম্বন্ধে কথা এই যে, রাম প্রসাদ দ্বিজ শব্দ প্রয়োগ না করিলেও শ্রী, কবি, তারা, মা গো, ও মা, ঐ যে, এইরূপ অসংখ্য শব্দের পরিবর্তে পরবর্তী গায়কগণ দ্বিজ শব্দের প্রয়োগ করিয়া লইতে পারেন। অনেক গানে তাহাই হইয়াছে। আর কতকগুলিতে বোধ হয় রামপ্রসাদই দ্বিজ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যখন তিনি সাধনার সিদ্ধ হইয়াছেন, জগজ্জননীর সহিত তাঁহার মাতা-পুত্র সম্বন্ধ একেবারে পাকা হইয়া গিয়াছে,.....তখন যে রামপ্রসাদ আপনাকে দ্বিজ বলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ...সুতরাং সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া পরিচয়াকাজী অভিমানী রামপ্রসাদ যে সে সময়ে আপনাকে দ্বিজ বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই।.....পূর্ববাঙ্গলায় দ্বিজ রামপ্রসাদ কথার যে কোনও মূল্য আছে, মনে করি না।” রসিক বাবু রামপ্রসাদকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। ভাবের মুখে কায়স্থকেই দ্বিজ প্রদান করিতে ও তাঁহার আটকায় নাই। রসিক বাবুর করণা অতি-সহজেই শ্রী, কবি, তারা, মা গো প্রভৃতির পরিবর্তে পরবর্তী গায়কগণকে “দ্বিজ” শব্দ সন্নিবেশ-কারক বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন, এবং “অনেক গানে তাহাই হইয়াছে” বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন। রসিক বাবু “বোধ হয়” বলিয়া বাহার আরম্ভ এবং “সন্দেহ নাই” বলিয়া বাহার

নীমাংগা করিয়াছেন, তাহার মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর, তাহা কেবল স্বকীয় মতের সমর্থন মাত্র। রসিক বাবুর উদ্ধৃত করেকটি কথাতে তাঁহার দৌর্ভাগ্যের পরিচয় অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে তাঁহাকে উপহাস করিতেছে। তিনি রামপ্রসাদকে “সিদ্ধ পুরুষ” বলিয়া “পরিচয়াকাজ্ঞী অভিমানী” বলাতে অপরাধী হইয়াছেন। কেবল কল্পনার লীলাতরঙ্গে ভাসিয়া রসিক বাবু কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও দ্বিজ রামপ্রসাদকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করিয়াছেন এবং প্রসাদকে কায়স্থ বলিয়া আপন সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য বার্থ প্রয়াস করিয়াছেন। ঐ সনের পৌষ সংখ্যায় নবভারতে প্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন সেনগুপ্ত রসিক বাবুর এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

“প্রসাদপদাবলী”—লেখক আর এক ডিগ্রি প্রমোশন দিয়া দ্বিজ রামপ্রসাদকে একেবারে নীলুর পাঁচালীর দলে নামাইয়া ছাড়িয়াছেন। তিনি তাঁহাকে

“তেমনি আজ নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন” বলিয়া সাফ ইংরেজ রাজত্বের মাঝামাঝি লইয়া আসিয়াছেন। উধাও কল্পনার তাড়নে লেখকগণ সুধু রামপ্রসাদ কেন অনেক মহাকাব্যকেই এই ভাবে নাস্তনাবুদ করিয়া বাহাদুরী লইতে চেষ্টা করেন।

রামপ্রসাদ বাঙ্গালার আবার বুদ্ধ বনিতার পরিচিত এবং প্রিয়। সর্বত্র রামপ্রসাদের অপ্রতিহত প্রভাব। এই কীর্ত্তিমান পুরুষদ্বয়কে পৃথক করিলে সম্ভবতঃ কবিরঞ্জনের গৌরব বিলুপ্ত হইবে না। যদি দ্বিজ রামপ্রসাদের গৌরবের যোগা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই লাভ। কবিরঞ্জন আপন অধিকারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন—তাঁহার সীমানার বাহিরে আর এক জনের অন্ততঃ একটা পর্ণ-কুটির নিশ্চিত হওয়ার দোষের বিষয় কি আছে?

শৈশবে পিতামহী ঠাকুরাণীর নিকট প্রায়ই একটি রামপ্রসাদী গান শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। দ্বাগত বংশীধ্বনি যেমন সমীর-তরঙ্গে রহিয়া রহিয়া কর্ণকুহরে গম্বিষ্ট হয়, সেই মধুর সঙ্গীতের দুই একটি পদ তেমন ভাবে আমার স্মৃতির কুহেলী-অন্ধকারে মধ্যে মধ্যে উঁকি মারিয়া

আত্মপ্রকাশ করে। এই সঙ্গীতটির জন্ম এখন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া দেখিয়াছি—কোথাও তাহার উচ্চার সাধনের সূত্র পাওয়া গেল না। সে কালের নারীগণ ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া প্রসাদ পদাবলী গাইতেন; কিন্তু প্রসাদের সেই মধুর সঙ্গীতটি বর্তমান সময়ে ‘খনির তিমির-গর্ভ’ হইতে উচ্চার করা আমার ভাগ্যে ঘটয়া উঠে নাই। ঐ গানটার মধ্যে আছে,

“জংলার মধ্যে ভাঙ্গা ঘরে, একলা গো মা থাকি পড়ে”,
অন্যত্র—“চমকে উঠি বাঘের ডাকে।”

অন্যত্র—“তুমি যা কর মা তারা।”

ঠিক একটি গানের মধ্যেই এই পদগুলি ছিল কি না, তাহা বলিতে পারি না। কতকাংশে ঐ রূপ আর একটি সঙ্গীত প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

এই পদ হইতে আমরা অন্ততঃ এইটুকু প্রাপ্ত হই যে, রামপ্রসাদ কোনও অরণ্যে বা অরণ্যপ্রান্তে ভগ্ন কুটীরে একাকী বাস করিতেন। সেখানে বাঘের ভয় ছিল। তথাপি মাঘের উপর নির্ভর করিয়া প্রসাদ সেই ভাঙ্গা ঘরে পড়িয়া থাকিতেন।

তাঁহার নিবাস যে পূর্ববঙ্গে ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ দুই একটি গান উদ্ধৃত করা যাইতে পারে”—

কে বা বুকের কে রা পিঠের, বদ্বনিয়তিয়া কালীর কালী।
কেহ সারা দিনে পায় না খাতিতে হে দে গো করুণাময়ী ॥
কেহ হুখে খায় সাচি চিনি—

কেহ শুতে ওতালাতে, পালঙ্কেতে মশৈর টানি,
আমরা মরি ‘পুড়পুড়ায়’ (হে দে গো করুণাময়ী)
ভাঙ্গা ঘরে নাই কো ছানি ॥

কেহ পরে শাল ছশালা, কেহ পায় না ভাঙ্গা ছালা
অনুভাবে বুঝি তারা (হে দে গো করুণাময়ী)
তেলা মাথায় তেল ঢালানী ॥

বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের উচ্চারণের বৈষম্যে অনেক শব্দের উপর অবাধ অত্যাচার হয় বটে, কিন্তু উক্ত সঙ্গীতে সে আশঙ্কা নাই বলিলেও চলে। বদ্বনিয়তিয়া অর্থাৎ বাহার

চৈত্র ১৩১২

উদ্দেশ্য খারাপ, কাণী অর্থে এক চোখা, যে পক্ষপাত দৃষ্টিতে দেখে; অমুভাবে (অমুমান করিয়া); শুতে (শোয়, শয়ন করে); মশের (মশারী); পুড়পুড়ায় (জলে পুড়ে বা ছটকটায়); মশারীর পরে ‘পুড়পুড়ায়’ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় রামপ্রসাদ মশকদংশন-যন্ত্রণাও ভোগ করিয়াছেন। ভাঙ্গা ছালা (ছেঁড়া ছালা, ছেঁড়া ছালাকে ভাঙ্গা ছালা বলিতে অনেক সময় শোনা যায়), এই গানের ভাষা পূর্ববঙ্গের নিজস্ব।

আর একটি সঙ্গীতে আছে—

“থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে,
ভয় ‘পাইয়া’ মা ডাকি তোরে,

ইয়লে হালিয়া পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে।
রাত্রে আইসা ছয়টা চোরে, ভাঙ্গা বেড়া ডেঁটয়া পড়ে।
চম্‌কি উঠি বাথের ডাকে, পাকি (মায়ের) নামটি ভরসা করে।”

এই সঙ্গীতের ইয়ল শব্দের অর্থ শিশির-পাত। সম্ভবতঃ হিম হইতে ইম্ এবং শেষ ইয়ল হইয়াছে। ইয়ল ব্যবহার এখনও শোনা যায়। এই গানটির ‘ইয়লে’ স্থলে দয়াল বাবুর সংগ্রহে আছে ‘হিল্লোলে’। ডেঁটয়া অর্থাৎ ডিঙ্গাইয়া। সাধক রামপ্রসাদ জঙ্গলের বাথকে ভয় করুন আর নাট করুন তিনি ভাঙ্গা ঘরে থাকিয়া ষড় রিপূর ভয় করিতেন এবং মায়ের নামে তাহাদিগকে দমন করিতেন।

আর একটি গান—

“দেখি মা কেমন ক’রে আমারে ছাড়ারে যাবা।
ছেলের হাতের কলা নয় মা ফাঁকি দিয়া কেড়ে খাবা।
এমন “ছাপান ছাপাইব” (মাগো) খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা।
বৎস পাছে গাভী যেমন তেন্নি পাছে পাছে খাবা।
প্রসাদ বলে “ফাঁকি বুঁকি” (মাগো) দিতে পার পেলো হাবা।

আমায় যদি না তরাও মা শিব হবে তোমার বাবা।”

যাবা, খাবা, পাবা প্রভৃতি পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয়। “এমন

ছাপান ছাপাইব” ছাপান অর্থ লুকাইয়া থাকা। লুকাইয়া আয় গোপন করা।

আর অধিকসংখ্যক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের ধৈর্য্য আক্লান্ত করা সম্ভব মনে করি না। কয়েকটি গানের দুই একটি পদ মাত্র উপস্থিত করিব। তাহাতেও পূর্ববঙ্গের পরিচয় প্রকাশিত।

“প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, বোঝা নামাও খানিক জিরাই।
জিরাই—বিশ্রাম করি।”

“চুরিদারী করলে পরে উচিত মত সাজা পাব।”
‘চুরিদারী’, ‘ফাঁকি বুঁকি’ পূর্ববঙ্গেরই কথা।

“বাই পড়াই তা পড় মন, পড়লে শুনলে হুঁহুভাতি,
জান না কি ডাকের কথা না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি ॥
এই প্রবচনটি আমরা শৈশবাবধি শুনিয়া আসিতেছি।
‘ঠেঙ্গার গুঁতি’ পূর্ববঙ্গের একচেটিয়া কি পশ্চিমবঙ্গেও ব্যবহার আছে জানি না।

“কেহ গায় দেয় শাল ছালা কেহ পায় না ছিঁড়া তেনা”
তেনা অর্থ ত্রাকড়া। পশ্চিমবঙ্গে ‘তেনা’ বলে কি না বলিতে পারি না, এ দেশের বহু লোক তেনা পরিয়া দিন গুজরান করে। পশ্চিম বাঙ্গালায় ত্রাকড়া বলে।

“সে যে সময়সির নাড়িতে নারে।”
‘সময়সির’ (সময় মত) ইহাও সম্ভবতঃ আমাদের সম্পত্তি। এই সকল সঙ্গীতের রচয়িতাকে পূর্ববঙ্গবাসী বলিতে দ্বিধা করিবার কোনও কারণ নাই।

দ্বিজ রামপ্রসাদের সঙ্গীত ক্রমে উন্নত ভাব ও ভাষায় রচিত হইয়াছিল, যথা—

মন কেন রে ভাবিস্ এত; যেমন মাতৃহীন বাগকের মত।
ভবে এসে ভাবছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভাঁত।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত ॥
ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এবে বড় অদ্ভুত,
ওরে তুই করিস্ কি কাণেয় ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ীর স্তুত।
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলি রে পাগলের মত।
ওরে মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত।
মিছা কেন ভাব হুঃখ, দুর্গা বল অবিরত।

যেমন 'জাগরণে ভয়ং নাস্তি' হবে রে তোর তেজি মত।

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মন কর রে মনের মত।

ও মন গুরুদত্ত তত্ত্ব কর কি করিবে রবি-মুত ॥

এই আত্মনির্ভরতাপূর্ণ সঙ্গীত অপেক্ষাকৃত গভীর ভাবাত্মক।
তাহার পরে—

“মা হওয়া কি মুখের কথা,

কেবল প্রসব কর্লে হয় না মাতা।”

এই সঙ্গীতটিও দ্বিজ রামপ্রসাদের রচনা। ইনি সরল ভাষায় সরল ভাবে প্রাণের কথা মায়ের নিকট নিবেদন করিয়াছেন।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ প্রথমেই “দে মা আমার তবিলদারী, আমি নেমকহারাম নই শঙ্করী” বলিয়া তবিলদারীর আরজী পেশ করিয়াছেন। ফলে তিনি মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া সাংসারিক চিন্তার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। দুই শত বৎসর পূর্বে মিতবায়ী বাঙ্গালীর পক্ষে মাসিক ৩০ টাকা যথেষ্ট ছিল বলিয়া বোধ হয়। অতঃপর মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের অগ্রগ্রহে তিনি ১০০ বিঘা নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হন। “গর আবাদি ঞ্জল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক” বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকে এক সনন্দ প্রদান করেন। রাজকিশোর নামক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। “শ্রীনাথ” নামক কোনও ব্যক্তি প্রসাদের চিকিৎসক ও অন্তরঙ্গ ছিলেন এ রূপ সন্দেহ হয়। এই রূপে রামপ্রসাদ পরম নিশ্চিন্ত মনে সংসারে থাকিয়া মায়ের নামে বিভোর থাকিতেন। “ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব” বলিয়া তিনি আপন গৃহের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি তাহার সংসারবাসের নিদর্শন।

“যত ধন উপার্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে” ইত্যাদি বোধ হয় তিনি অর্থোপার্জন জন্ত দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং আজু গোসাঁই “তুমি ইচ্ছা হুখে ফেলে পাশা কাঁচারেছ পাকা গুটি” বলিয়া প্রসাদের বুদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের সংবাদ প্রচার করিয়াছেন। ‘প্রসাদ প্রসঙ্গ’-কার বলিয়াছেন, “রামপ্রসাদ বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও হিন্দি

ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন; তিনি বত্রিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। যৌবনের প্রাবৃত্তে তাঁহার উপর সংসারের ভার ব্রত হইয়া।”

“রামপ্রসাদ রিপুরুষ কুস্তীরাদির ভয়ে বিবেক হ্রদী গায় মাণিয়া” রাজর্ষি জনকের অনুকরণে সংসারে বাস করিতেন। রামপ্রসাদ দানশীল ও দয়াবস্তুর বংশধর। কিন্তু রামপ্রসাদের পিতা বড় সম্পত্তিশালী ছিলেন এমন বোধ হয় না। (প্রসাদ-প্রসঙ্গ)

আবার একটি সঙ্গীতে আছে—

“শিশু-কালে পিতা মৈল, রাজ্য নিল চোরে।”

এই রামপ্রসাদ তবে কে? এই ব্যক্তি কি তবে দ্বিজ রাম প্রসাদ। তিনি গৃহী ছিলেন, পরে মায়ের নামে পাগল হইয়া গৃহত্যাগী হইলেন। তাঁহার জমিদারী ছিল কি না, কে বলিবে? তিনি অধু আপন গৃহের সংবাদ দিয়াছেন—

মা না বলে আর ডাকব না।

ওমা, দিয়াছ দিতেছ কত যন্ত্রণা ॥

ছিলেম গৃহবাসী, বানাইলে সন্ন্যাসী

আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী

না হয় দ্বারে দ্বারে যাব, শিক্ষা মেগে খাব

মা ম'লে কি তার ছেলে বাচে না।

অগ্রা—

“আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্বনাশী আমার
সন্ন্যাসী করেছে।”

কবিরঞ্জনকে কখনও গৃহত্যাগী হইতে হয় নাই; দ্বিজ রামপ্রসাদ কালীর নামে গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন; কে জানে তিনি ধনীর সন্তান কি না? তিনি মায়ের নিকট বলিতেছেন

“কারো হৃদয়ে বাতাসা,

আমার শাকে অন্ন মিলে কৈ?”

কবিরঞ্জনের এ অভাব ছিল না। কবিরঞ্জন “কাজ কি মন ঘেয়ে কাশী” বলিয়া ঘরে বসিয়া মায়ের নাম গান করিলেও অবশেষে তিনি কালীধামে গিয়া অন্নপূর্ণা দর্শন করতঃ বৃন্দাবনে গেলেন।

সেখানে গিয়া গারিলেন—

“নটবর বেশে বৃন্দাবনে এসে

কালী হলি রাসবিহারী।”

আর দ্বিজ রামপ্রসাদ

“তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো না ধে।”

অন্তঃ—

“এ ভব সংসারে আমি না করিলাম গয়া-কাশী,

যখন শমন ধরবে আসি, ডাকব কালী কালী বলে।”

কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ “পাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ডিক্রীজারী” হইতে আপনার পক্ষ সমর্থন করিতে “লাখ উকিল খাড়া” করিয়াছেন ; তিনি হিসাব নিকাশ, দরবার প্রভৃতির কায়দা কানুন জানেন ; তিনি “সংসারী” বলিয়া মায়ের নিকট “অভিমান”-বেশে “অর্থ” প্রার্থনা করিতেছেন ; অর্থে তাহার প্রয়োজন আছে, কারণ তিনি “জননী, তনয়া, জামা, নহোদয়া লইয়া ঘর গৃহস্থী পত্তন করিয়াছেন। আর দ্বিজ রাম প্রসাদ,

মায়ের নাম ভরসা করিয়া একখানা ভাপা ঘরে পড়িয়া থাকেন। তিনি উচ্চ গ্রামে হৃদয়ের তার বাঁধিয়া গাইয়া উঠিলেন—

“আনি কি হৃৎথেরে ডরাই ?

ভবে দেও হৃৎথ মা আর কত তাই ॥

আগে পাছে হৃৎথ চলে মা, যদি কোন খানেতে যাই,

তখন হৃৎথের বোঝা মাথার নিয়ে হৃৎথ দিয়ে মা বাজার
মিলাই ॥

বিষের কুমি বিবে থাকি মা, বিবোধ প্রাণ রাখি সদাই
আমি এমন বিষের কুমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে
বেড়াই।”

এ ভাবের মূল্য কে কত বলিবে ? হৃৎথকে বরণ করিয়া
লইয়াও দ্বিজ রামপ্রসাদ স্থখী।

কবিরঞ্জন বলিতেছেন,

“দেখেরে সব মাগীর মেলা।”

অন্তঃ—

“স্নানী-বচনে স্থখা, স্থখা নয় সে বিষের বাটা—

আগে ইচ্ছা স্থখে পান করিলে, বিষের জালায় হুটফুটি।”

তথাপি তিনি সংসারে মায়ের নামে বিতোর। পুত্র-কন্তার
মায়া এড়াইতে না পাড়িয়া তিনি “ধোকার টাটী সংসারে”
রহিলেন। দ্বিজ রামপ্রসাদের উপদেশ এই—

“মিছে কেন দারা-সুতের বেগার খেটে মর”

তঁাহার হৃদয়ের বল আছে, তিনি

“ভক্তিতে কিনিতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী”

বলিয়া সংসারের ধন ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়াছেন। তিনি

“হৃৎথের নীরে স্রোতের শেওলার মত”

ভাসিতেছেন, কিন্তু তাহাতে তিনি অন্তরে হৃৎথী নছেন।
এই হৃৎথ দূর করিবার কোনও প্রয়াস তঁাহার দেখা যায় না,
তিনি সগর্বে বলিতেছেন—

“আমি কি হৃৎথকে ডরাই ?

স্থখ পেয়ে লোক গর্ষ করে, আমি করি হৃৎথের বড়াই”।
এমন কথা কয় জন বলিতে পারে ? তঁাহার হৃদয়ে
“ব্রহ্মময়ীর জমিদারী” কিনিবার মত ভরসা রহিয়াছে।
হৃৎথ তঁাহাকে কি করিবে ? তিনি চিদানন্দময়ীকে আত্ম-
নিবেদন করিয়া নিবেদ অবলম্বন করিয়াছেন। “না একবার
দ্বিজ-বন্দিরে দাঁড়াও—তোমায় দেখে লই”—এই পর্য্যন্ত।

উভয় রাম প্রসাদের মধ্যে এই প্রভেদ থাকিলেও
দ্বিজ রামপ্রসাদের কোন খোঁজ খবর নাই কেন ? কবি
রঞ্জনর এত নাম ডাক কেন ? তাহার কারণ আছে।
কবিরঞ্জনর আংশিক পরিচয় তঁাহার কবিতাবলিতে আছে।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজকিশোর প্রভৃতির সহিত তঁাহার নাম-
যুক্ত। তঁাহার বাসস্থান কুমারহাট। সুতরাং খুঁজিয়া
বাহির করা হৃৎসাধ্য নহে। তিনি রাজার অল্পগ্রহ লাভ
করিয়াছিলেন। রাজা রাজার অল্পগ্রহীত ব্যক্তি জন-গম্যজে
অপরিচিত থাকেন না ; বিশেষতঃ প্রসাদ মহাসাধক—
তঁাহার পঞ্চমুণ্ড আসন ছিল—সর্বোপরি তঁাহার ভক্তি-
প্রেম-ধারায় অতিসিক্ত মধুর পদাবলী সকলকেই মুগ্ধ করিয়া
ফেলিত। তিনি দেশ বিদেশে কিছু কিছু ভ্রমণও
করিয়াছেন ; এই সমুদয় কারণে তঁাহার সঙ্গীত বেশী
প্রচারিত হইয়াছিল। আর দ্বিজ রামপ্রসাদ গৃহত্যাগী
সন্ন্যাসী। এক অপরিচিত দূর বনপ্রান্তের প্রান্তে, ব্যাভাষি

স্বাপদ-সম্বল অরণ্যের সমীপে 'ছেড়া তেনা' সম্বল করিয়া 'ছানি'-বিহীন 'ভাঙ্গা ঘুরে' পড়িয়া মায়ের নাম গান করিয়াছেন ; এবং "অনায়াসে রণ-জয় জীবনে মরণে রণে" বলিয়া আত্মানন্দ উপভোগ করিতেছেন। পরের জন্ম তাঁহার বিশেষ কর্তব্য আছে, এমন বুঝা যায় না। তিনি 'কালী, গয়া' পর্য্যন্ত যাইতে চাহেন না, তাঁহার ভাঙ্গা কুটীরই সর্বস্ব।

'প্রসাদ-প্রসঙ্গ'কার লিখিয়াছেন, "যে সকল সঙ্গীত রামপ্রসাদের বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারও কোন কোনটি দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। এমন কি কবিরঞ্জনর জীবন সম্বন্ধে যে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে, সেই কয়েকটিই দ্বিজ রাম-প্রসাদের জীবনের ঘটনা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।" যিনি তিন বৎসরের চেষ্টার কবিরঞ্জনর সঙ্গীত এবং জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার সংগৃহীত মন্তব্যে আমরা অনায়াস প্রদর্শন করিতে পারি না। আমরা দ্বিজ রামপ্রসাদের চাই একটি অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি ; সমসাময়িকের অল্প সুবিধার সে সকলের পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল।

এই পূর্ববঙ্গবাসী দ্বিজ রামপ্রসাদ ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণায় "চিনিষপুর" গ্রামে বাস করিতেন। তিনি এতদ্দেশে ব্রহ্মচারী রামপ্রসাদ বা রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী নামে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নিকট পর্য্যন্ত পরিচিত। 'চিনিষ-পুর' ঢাকা সহর হইতে অনধিক ২২ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত। 'ডাঙ্গা' বা 'নরসিংদী' ষ্ট্রামার ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া চিনিষপুর যাওয়া যায়। ঐ সকল ষ্টেশন হইতে চিনিষপুর ৪।৫ মাইল ব্যবধান। ঐ রাস্তা পদব্রজে যাইতে হয়। ঢাকা অপেক্ষা বহুদূরবর্তী না হইলেও চিনিষপুরে যাতায়াত তত সহজসাধ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, চিনিষপুর শিক্ষা-দীক্ষায় বা খনাটোর কীষ্টিমালায় সুশোভিত নহে। সেখানে এখন আর উল্লেখ যোগ্য কি আছে ? তবে চিনিষপুরের কালীবাড়ী এখনও মহেশ্বরদী পরগণায় এবং পূর্ব-দক্ষিণ ময়মনসিংহে অত্যন্ত পরিচিত। ঢাকা জেলার অন্ত্যস্ত স্থানে, কুমিল্লায় এবং ময়মনসিংহেও চিনিষপুর নিত্য

অপরিচিত নহে। তাহার কারণ কেবলমাত্র দ্বিজ রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী এই স্থানে সাধনার সিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। তারপর ঐ স্থান যে তিমিরে সে তিমিরে আবৃত হইয়াছে। তাঁহারও পঞ্চমুণ্ডী আসন ছিল। কাল প্রভাবে রামপ্রসাদের কীষ্টি মলিন হইয়া পড়িতেছে। আজিও "রামপ্রসাদের মালসী" বলিলে প্রাচীন ও প্রাচীনাগণ চিনিষপুরকে লক্ষ্য করেন, এবং ঐ পরম পবিত্র তীর্থস্থান লক্ষ্য করিয়া সমস্ত্রমে অভিবাদন করিয়া থাকেন।

দ্বিজ রামপ্রসাদ সাধক নামে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিতেন না এবং শিষ্য সংগ্রহ করিয়া সাধন-পীঠের নির্জনতা ভঙ্গের প্রয়াসী ছিলেন না। কেবল মাত্র মায়ের রূপাকণা লাভই তাঁহার লক্ষ্য ছিল।

চিনিষপুরের কালীবাড়ী বা রামপ্রসাদের সিদ্ধপীঠ কত কালের তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে পারি নাই। মেহারের কালীবাড়ী সম্বন্ধে যেমন অনেক অসাধারণ ঘটনা শোনা যায়, চিনিষপুর সম্বন্ধেও সেইরূপ অনেক কাহিনী প্রাচীনদিগের নিকট শুনিয়াছি। ভবিষ্যতে সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। চিনিষপুর বঙ্গের অন্ততঃ পূর্ববঙ্গের গৌরবময় মহাতীর্থ। ঢাকার সাহিত্য পরিষদ এই তীর্থ সংস্কারে মনোযোগী হইলে যে অক্ষয়কীষ্টি ও পুণ্য সঞ্চয় করিবেন, তাহার তুলনা নাই। চিনিষপুরের কালীবাড়ী এবং দ্বিজ রামপ্রসাদ আমাদের গৌরবের বস্তু। ইহা কল্পনার কথাও নহে বা অতিরঞ্জিত ঘটনাও নহে। রামপ্রসাদের সঙ্গীত পৃথক করিয়া কবিরঞ্জন বা দ্বিজ রামপ্রসাদকে বাটিয়া দেওয়া সহজসাধ্য মালিসী নহে। উপযুক্ত সময়ে যোগ্যতর ব্যক্তি রামপ্রসাদের ধ্বংসপ্রায় কীষ্টি-সৌধের পুনর্গঠন করিবেন, আমি আশার কুহকে এই স্বপ্ন দেখিয়াছি।

প্রসাদপ্রসঙ্গকারও রামপ্রসাদের অল্পসন্ধান সময়ে কাহারও নিকট রামপ্রসাদের সিদ্ধি স্থান মহেশ্বরদী পরগণায়, কাহারও নিকট পদ্মার পাড়ে ও কাহারও নিকট তিনি ব্রাহ্মণ, কাহারও নিকট বৈদ্য বলিয়া জানিয়া ছিলেন। কেহ বলিয়াছে প্রসাদ কর্তৃক মাত্রই করেন না, কেবল মায়ের

নামে বিভোর, কেহ বলিয়াছেন তিনি মোক্তারী করেন
ইত্যাদি। এ সকল কথার মধ্যেও আমাদের পরিপোষ-
কতার স্পষ্ট আভাস রহিয়াছে।

উপসংহারে আমি বিজ্ঞ রামপ্রসাদের একটি মধুর সঙ্গী-
তের উল্লেখ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

“গিরি, এ বার আমার উমা এলে

আর উমা পাঠাব না।

বলে বলবে লোকে মন্দ

কারো কথা শুনবে না।

যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,

এবার মায়ে বিয়ে করবে ঝগড়া ;

জামাই বলে মানবে না ॥

বিজ্ঞ রামপ্রসাদে কয়, এ তথ্য ক্তি প্রাণে সয়,

শিব শ্মশানে মশানে ফিরে,

ঘরের ভাবনা ভাবে না।”

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কে তুমি ?

কে তুমি,

মোহন-পনের ঘোরে ছিন্ন বুমাইয়া ;

সহসা পরশ করি

বুমটুকু নিলে হরি

নবীন আশায় চিত্ত উঠিল জাগিয়া।

কি অজ্ঞাত ভাবে হৃদি উঠিল শিহরি,

প্রাণ ভরা ভালবাসা

ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, আশা

জীবনের তরে দিহু নিবেদন করি।

কে তুমি,

সকল কাড়িয়া নিয়া তবু কি তোমার

হাসাবার কাদাবার

সাধ পূরিল না আর ?

কে তুমি আরাধ্য দেব প্রাণে বলিকার ?

বুঝিলে না বুঝিলে না বাণিকার প্রাণ ;

কি গভীর ভালবাসা,

কি বিশ্বাস কত আশা,

তোমার চরণ-তলে করিয়াছে দান !

বুঝিলে না তার গুটি পিপাসিত আপি,

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণে

চেয়ে থাকে তোমা পানে

কি যে করে প্রাণ তার তুমি বুঝিলে কি ?

বুঝিলে না এই ক্ষুদ্র বাণিকার প্রাণ ;

তোমার ঈশ্বর তরে

এই ক্ষণে অকাতরে

হাসিতে হাসিতে পারে করিবারে দান।

বুঝিলে না একটুকু ভালবাসা তরে

ক্ষুদ্র সে হৃদয়খানি

লাগায়িত দিবা রাত্নী

আকুল পরাণ তার কি আকাঙ্ক্ষা তরে।

বুঝিবার বুঝিবার ভাষা নাহি তার

নারেতে নিতি নিতি

চাঞ্চল্য দিতেছে প্রীতি

নিরব এ ভালবাসা নহে বুঝিবার।

কি আছে শক্তি তার বুঝিতে তোমার,

কেন এই ব্যাকুলতা

এ উন্নত অধীরতা

কেন সে বিভোর সদা তোমার চিন্তায় !

ক্ষুদ্র হৃদি মাঝে একি বিপ্লব তুলিলে ?

ছিল না চিন্তার চিন্,

ছিহু মুক্ত বাধা হীন

মূহুর্তে কি বাধে তুমি বাধিয়া ফেলিলে ?

সোনার শিকল এ যে ছিঁড়িবার নয়

যত দিন দেহ মন

রহিবেক সচেতন

কি সাধ্য ভুলিব তোমা মূহুর্ত সময় !

এ স্বপ্ন-স্বপন মোর ভাবিবে যখন

রবি কাল-সন্ধি-নীরে

ডুবে যাবে ধীরে ধীরে,

অরিয়া বাঞ্ছিত মুক্তি মুদ্রিবে নয়ন।

শ্রীচাকবালা গুপ্ত।

দামোদর নদের কিছু দক্ষিণ দিকে ওকত নদী প্রবাহিত ; দামোদরের উত্তর দিকে সোনারেখ নদী ও এতদ্ব্যতয়ের মধ্যস্থলে ত্রিবেণী নদী প্রবাহিত । সোনারেখ, দামোদর ও ত্রিবেণী জুনাগড়ের সন্নিকটে সন্মিলিত হইয়া ত্রিবেণী তীর্থ হইয়াছে । এই ত্রিবেণী অঙ্গমা নদী কিয়দূরে ওকত নদীর সহিত সন্মিলিত হইয়া সমুদ্রে যাইয়া আত্ম বিসর্জন করিয়াছে ।

শৈলে পরি আত্মাজী মন্দির । আত্মাজী এ দেশে ব্যাঘ্রবাহিনী দুর্গার প্রতিমূর্তি বা রণচণ্ডী মা ।

এই স্থান হঠতে সোপানাবলী পরিমণ্ডিত ও মেতৃ আকারের একটি পথ গোরক্ষনাথ পর্বত পর্য্যন্ত গিয়াছে ।

ঐ পর্বতে পৌঁছিলেই প্রথমে গোরক্ষনাথের পদ-চিহ্ন অঙ্কিত একটি প্রস্তর দৃষ্টি গোচর হয় । গোরক্ষনাথ পর্বতের শৃঙ্গ-দেশ ও আত্মাজী শিখরের জায় স্বল্প পরিমিত ।

দত্তাত্রেয়ের স্বল্প পরিমিত শৃঙ্গ দেশে দত্তাত্রেয় আশ্রম আশ্রম ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি ।

শ্রীরণীন্দ্রনাথ সেন ।

বর্ষ বিদায়

কবে এসেছিলে—

তরুণী উষার সাগ্রে অরুণ-অলোক রথে

ওগো পুরাতন !

সময় ফুরায়ে এল এসেছে আহ্বান তব

বিদায় এখন ।

কত কিছু এনেছিলে, কত সাধ কত আশা,

কত না উৎসাহ,

প্রসন্ন প্রভাত কত, শ্রান্তি ভরা কর্মভণ্ড

মধ্যাহ্নের দাহ ।

স্তব্ধ, শান্ত, মৌন সন্ধ্যা, কত না নির্মল

পূর্ণিমার নিশি,

আজি এ বিদায়-ক্ষেণে প্রাণে ওঠে ক্ষেণে
এক সাধে মিশি ।

উত্তপ্ত নিদ্রা শেষে স্নিগ্ধ বারি-ধারা
স্নান বরষার,

শরতের মেঘযুক্ত গগনে দিয়েছ খুলে
আনন্দের দ্বার ।

শিশির মুকুতাজালে হেমস্তের পূর্ণ শোভা
দেখিয়েছ আনি,

কুয়াশা-ধূসর-বাসে হিমালীর শুভ্র মুখে
আবরণ টানি ।

সব খোভা, সব আলো, সকল সঙ্গীত আজি
নিঃশেষিত করে,

সাক্ষারে দিয়েছ শেষ বসন্তের পরিপূর্ণ
তরুণানি ভরে ।

সকল সৌন্দর্য্য আজি ফুটায় তুলেছ
বিদায়ের ক্ষণে,

আনন্দ আলোক ওঠে দিকে দিকে অভিনব
সঙ্গীতের সনে ।

কত তৃপ্তি, কত দ্রুত, কত স্বপ্নময়
বিরহ মিলন,

অজান! কত না প্রীতি এনেছিলে তুমি
করিয়া বহন ।

অনন্ত কালের স্রোতে চির তরে তুমি
যেতেছ চলিয়া,

অনপেক্ষ উদাসীন এসেছ যেতেছ
আদেশ পালিয়া ।

শেষ বিদায়ের ক্ষণে লহ তুমি ওগো
শেষ নমস্কার,

জীবন জড়িয়ে যেন থাকে তুমি গেলে
স্বতিটি তোমার ।

শ্রীচাক্রহাসিনী দেবী ।

জুনাগড় হইতে পূর্বদিকে কিয়দূর অগ্রসর হইলেই সুপ্রসিদ্ধ অশোক শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়; শিলালিপিটি প্রায় গোলাকার, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩০' x ২০' ফিট। এই সুবৃহৎ শিলাখণ্ডের চতুর্দিকে প্রাচীর ভুলিয়া একটি কক্ষ জুনাগড়ের বর্তমান নগর নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সে স্থান হইতে কিয়দূর অগ্রসর হইলে দামোদর নদের পোল পার হইয়া দামোদর কুণ্ড ও তবনাথের মন্দির ভীষ্মযাত্রীদের দর্শনীয়।

গিরনার পর্বত-পাদমূলস্থ ফটক হইতে সমস্ত চড়াইর পথ কয়েক সহস্র সোপানাবলী দ্বারা পরিবদ্ধ। ফটকে নবাবের এক জন কর্মচারী বাস করে; সে প্রতি যাত্রীর নিকট হইতে কিছু শুক আদায় করে।

সোপানাবলী দ্বারা পর্বতে উঠিতেই প্রথমে পথ-পার্শ্বে 'পঞ্চ পাণ্ডবের ডেরী' নামক পাঁচটি তথ্য প্রস্তর-স্থূহ পরিদৃষ্ট হয়। প্রবাদ যে, পঞ্চ পাণ্ডব তাহাদের বনবাস কালে এই স্থানে অবস্থান করিতেন।

প্রায় এক মাইল উঠিলে ভর্তৃহরি গুহার পোছান যায়; পথের পার্শ্বেই ইহা অবস্থিত। বিক্রমাদিক্যের অগ্রজ ভর্তৃহরি রাজা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। গুহাটি বিস্তৃত ও দুই খণ্ডে বিভক্ত, ইহাতে ভর্তৃহরি রাজার ও অস্ত্রাণ দেবমূর্তি আছে।

জৈনগণের বিশাল মন্দির প্রাক্কনের কিছু নিম্নভাগে পঞ্চেশ্বর মহাদেব ও ঝরনা দর্শনীয়।

জৈন মন্দির-বহুল স্থানটির নাম দেবকোঠা, ইহার দক্ষিণ দিকে ভোজরাজের মন্দির ও মান মন্দির। মান মন্দিরে পূর্বতন জ্যোতিষ গণনার যন্ত্রাদি কিছুই নাই; কেবল মাত্র জ্যোতিষ যন্ত্র পরিষ্কারপনের চক্র, বৃত্ত, কক্ষাদির পীঠ অত্যন্ত অবস্থায় রহিয়াছে।

দেবকোঠার ১৬টি জৈন মন্দির আছে; সর্ব-প্রধানটি নমিনাথের মন্দির, ইহার দুইটি মণ্ডপ আছে; স্বর্ণলঙ্কার ভূষিত নমিনাথের কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের বিগ্রহটি মনোরম। এতদ্ব্যতীত জৈনরাজ কুমার পালের মন্দির

ও ভোজপাল, বসুপাল ভ্রাতৃদ্বয়ের একত্র সংলগ্ন মন্দির ত্রয় দেখিতে অতি সুন্দর; মন্দিরের ভিত্তিতল খেত-কৃষ্ণ প্রস্তর বিনির্মিত। ইহার উত্তরে অশোকের পৌত্র সম্পতি রাজার মন্দির।

সম্পতি রাজার মন্দির, ভোজরাজ নির্মিত মন্দির ও মান মন্দিরের গঠন নৈপুণ্য অতি চমৎকার।

এই সকল মন্দিরের উত্তর পূর্বভাগে সৌরাষ্ট্ররাজ 'রাথেন্দ্রারের' প্রাসাদ; ইহার সম্মুখবর্তী নিয়াতিমুণী রাস্তা দিয়া নিম্ন প্রকোষ্ঠে গেলে ভীম কুণ্ডে উপনীত হওয়া যায়। ভীম কুণ্ডের চতুর্দিকে পুরাতন দুর্গ প্রাচীরের বেটন। ভীমকুণ্ডে বাইবার পথে বাম পার্শ্বে পুরাতন দুর্গ-ফটক। এই দ্বার পথে সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দেব বিশ্বাসঘাতক দেশলের সহায়তায় দুর্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সিদ্ধরাজ যখন রাণীক দেবীকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, তখন যুদ্ধে আহত ও মৃত স্বামীকে দেখিয়া রাণীক দেবী উৎসাহ বাক্যে বলিয়াছিলেন—

স্বামী উঠো সৈন্য লই, ধরো খড়্গ খেদার

ছত্র পতিএ ছাইও গড় জুনো গিরনার।

ভীমকুণ্ডের একপার্শ্বে পুরাতন বাউ বা ইন্দিরা। তাহার সন্নিকটে ভূতলগামী একটি পুরাতন সুরঙ দৃষ্ট হয়।

এই সকল মন্দির হইতে ২০০ ফিট উর্দ্ধে উঠিলে গোমুখীতে পোছান যায়; এখানে একটি সুনির্মল ঝরণার জল একটি কুণ্ডে সঞ্চিত হয়।

গোমুখী হইতে উত্তর দিকে কিয়দূর অগ্রসর হইলে 'ভৈরব কাম্প' পোছান যায়। পূর্বে এই স্থান হইতে যাত্রীরা কাম্প প্রদান করিয়া বিচূর্ণ অস্থি পত্রর পর্বত শিলাতলে বিসর্জন করিত।

সেই স্থান হইতে উত্তরদিকে পর্বত-প্রান্ত-সীমায় বিস্তৃত অঙ্গনযুক্ত একটি মন্দির আছে। তথা হইতে একটু নিম্নদিকে পূর্বাভিমুখে গেলে পর্বত-প্রান্তে-পাথর চটি নামক আশ্রমে উপনীত হওয়া যায়।

পাথরচটি গিরনার পর্বতের শেষ উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। পর্বত-পাদমূলে দামোদর নদ প্রবাহিত;

তখন স্থানে স্থানে নিম্গু হইয়া গেছে! আর মঞ্জুলা মর্ম্মর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া অরুণের দিকে স্থির অচঞ্চল পলকবিহীন চোখে চাহিয়াছিল! অরুণের স্নেহময় দীর্ঘ দৃষ্টি তখন নীরব বেদনার ভাবভরা কথায় তার চিত্রের নায়িকার নিকট শেখ বিদায় চাহিতে চাহিতে যেন মুহমূহ স্নান হইয়া যাইতেছিল। মঞ্জুলা অফুট চীৎকার করিয়া চিত্রের পদতলে ছিন্ন লতিকার মত লুপ্তিত হইয়া পড়িল।

চীৎকার শুনিয়া সতীশ পাশের কামরা হইতে ছুটিয়া আসিয়া দেখে—মঞ্জুলা তারই ছবির পদতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে।

সতীশ যখন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, ছবির উপরকার স্থানে স্থানে তুলির কাচা রং তখনো ভাল করিয়া শুকায় নাই!

শ্রীমুরেশচন্দ্র সিংহশর্মা।

রৈবতক পর্ব্বত

রৈবতকের বর্ত্তমান নাম গিরুনার পর্ব্বত, সোমনাথ পাটনের সমুদ্র উপকূল হইতে ইহা ৮১ মাইল দূরে অবস্থিত; বর্ত্তমান জুনাগড় হইতে ইহার ব্যবধান মাত্র ৩ মাইল। রাজকোট হইতে জুনাগড় রেল ৪ ঘণ্টার পথ। জুনাগড়ে এক জন নবাব আছেন, তিনিই এই সুন্দর সমতল প্রদেশ শাসন করেন।

রৈবতক পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণ বলরাম লীলার একটি প্রধান অঙ্গন; মহাভারতের বিরাট এগী শক্তির করাঙ্গুলী-সঞ্চালন এই স্থান হইতেই হইয়াছিল। কথিত আছে গৈলন তীর্থঙ্কর আদিনাথ দেব এই স্থানে বসিয়া তপস্যা করেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এই স্থানে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন! গিরুনার বহু অবিজ্ঞান সেবিত স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহার দুইটি শৃঙ্গে অধি গোরক্ষনাথ ও অধি-কৃষ্ণায়ের আশ্রম ও পদচিহ্ন আছে।

জুনাগড় যে খুব পুরাতন দুর্গ আপারকোটে গেলে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। আপারকোটে জুনাগড় সহরের প্রান্তবর্তী অক্ষুত শৈল স্থানের উপর একটি অতি পুরাতন দুর্গ। বহু পূর্বে জুনাগড় বলিতে আপারকোটকেই বুঝাইত, আপারকোট ধ্বংস হইবার পর তন্নিম্নেই জুনাগড় নামে নূতন সহর বসিয়াছে, এবং পূর্ব্বের জুনাগড়ের আপারকোট নামকরণ হইয়াছে।

অনঙ্কিতবার পাটনের সিংহ পরাক্রমী সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দেব আপারকোট ধ্বংস করেন। আপারকোটের নরপতি বীৰ্য্যবান ‘রাধেন্দ্র’ গিরুনার গিরি দুর্গে অবস্থান করেন, তথায় বিশ্বাসঘাতক দেশল ও বিশলের সাহায্যে সিদ্ধরাজ গিরি দুর্গে আরোহণ পূর্ব্বক রাধেন্দ্রকে বিনাশ করিয়া রাণীক দেবীকে অপহরণ করেন।

রাধেন্দ্রারের বীরত্ব ও রাণীক দেবীর সতীত্ব মহিমার কল্পন কাহিনী ভাঙের বহু গানে, বৃক্ষতলে বা মন্দির-প্রাঙ্গনে, গ্রাম্য লোকের সম্ভাষণে প্রতঃ প্রতঃ হয়।

আপারকোটে প্রবেশের দুর্ভেদ্য বাগেখরী ফটক নানা কারুকার্য সম্বিত। আপারকোটের মধ্যে ‘রাণীক দেবীর মেল’ নামক একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে, এই স্থানে রাণীক দেবী অবস্থান করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই দুর্গের অভ্যন্তরে একটি প্রকাণ্ড বাউ (বাপী বা ইন্দিরা) পরিদৃষ্ট হয়। পাহাড় খুঁদিয়া এই প্রকাণ্ড কুপটি দুর্গ মধ্যে জল সংস্থানের জন্য রাধেন্দ্রারের পিতা রাজা নবদ্বন্দ্ব নিৰ্ম্মাণ করান।

গুজরাতি সাহিত্যের আদি কবি নরসিংহ মেহেতার বাসস্থান জুনাগড়ে ছিল। গুজরাতি নরনারী এই স্থানের প্রতি অতি ভক্তিমান।

যদিও নরসিংহ মেহেতার প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি। তত্ত্ব কবির শিষ্যেরা নরসিংহ মেহেতারও একটি মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির পার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছে।

নরসিংহ মেহেতা আমাদের জয়দেব বিভাপতি ও চণ্ডীদাসের মত শ্রীকৃষ্ণ রস প্রেমিক ছিলেন।

অতঃপর আশ্রমে তার স্বামীর মাথার কীর্ণ দোরত উথলিত ঝালর দেওয়া বালিশটি বুকে ঝাঁকড়াইয়া সহকার-ছিন্ন মাধবী লতাটির মত লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল। কোনও কথা কহিল না। সতীশ আর দ্বিতীয় বার সে কথা তুলিতে ভরসা পাইল না। সে পাশের কামরায় গিয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া মাটির উপর শুইয়া খোলা জানালা দিয়া বাহিরের অনন্ত শূন্যের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

মঞ্জুলা মুচ্ছা ও চৈতন্যের সীমান্ত দেশে শোকদগ্ধ অবশ ছন্দ লইয়া পড়িয়া রহিল। তজ্জায়, জাগরণে, স্বপ্নে বার বার করিয়া অরুণের বিদায়ের শেষ পালাখানি তার চোখের উপর অতিনীত হইতেছিল। কি জানি কি ভাবিয়া মঞ্জুলা গভীর রাতে আলুলায়িতকুঙ্কলা বনং তপস্বিনীর মত সহসা ভূমি-শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপ-পাতিয়া গুলিল,—কে যেন তাকে ডাকিতেছে। সে ডাকে তার মনে হইল যেন সে স্মর তার জন্ম জন্মান্তরের পরিচিত—তার ইহকাল পরকালের একান্ত আপনার জিম্বিষ। তাই সে উঠিল—উঠিয়া ধীরে ধীরে মোম বাতিটি ধরাইয়া লইল। তার পর কে যেন তাকে ঘরের বাহিরের দিকে অতি মধুর স্পর্শে পরম স্নেহে আকর্ষণ করিল। যে স্নেহের স্পর্শে পূর্ণিমার রাতে নীল জলধি আকাশের পানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এ স্পর্শ যেন তারই অমিয়, শীতল মাখানো। কোণায় যাইতে হইবে তা সে ভাল করিয়া বুঝিল না—শুধু বুঝিল তাকে যাইতে হইবে—তাই যেন সে চলিল।

তারপর কম্পিত হাতে চকল দীপটি লইয়া সে ধীরে ধীরে অরুণের নীরব চিত্রশালায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে চিত্রশালা-আলও অরুণের ছন্দয়ের সৌন্দর্য্য রাশি বুকে লইয়া তেমনি যেন হাসিতেছিল।

অরুণের অন্তরের বাড়াবাড়ি হইলে মঞ্জুলাই তাকে হাত ধরিয়া চিত্রশালা হইতে টানিয়া লইয়া বিছানায় আনিয়া পোয়াইয়াছিল—সে বিছানা হইতে অরুণ আর

উঠে নাই। তারপর আর মঞ্জুলা এ ঘরের দিকে আসে নাই। মঞ্জুলার চিত্রপটখানি তেমনি ভাবে কাঠ-ফলকের উপর রাখা—রংএর বাতিগুলি, সরু মোটা তুলি গুলি তেমনি ভাবে ছবির চারি ধারে ছড়ানো। ছবির উপরকার রেশমী পরদাখানি এই যেন তুলিয়া রাখিয়া অরুণ কোথাও গিয়াছে,—এখনি আবার আসিবে—কে বলিবে সে মরিয়াছে।

মঞ্জুলা একবার সেই ছবির কাছে আসিয়া নিজের ছবিখানির মুখের পানে চাহিল। ছবির হস্তমুখী মঞ্জুলা যে তার স্বামীর হাত ধরিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। যে মঞ্জুলা এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে, সে তার দাসী হইবারও যোগ্য নয়। মঞ্জুলা বিশ্বয়-বিশ্কারিত চোখে দেখিল যে একটা উচ্ছল কুজ্জটিকা ভাঙ্গিয়া গড়িয়া অরুণের অবিকল মূর্তি আপনা আপনি গঠিত হইয়া গেল। সে ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে একটি তুলি আলগোছে তুলিয়া লইয়া চিত্রের সম্মুখে বসিয়া অতি তদাতচিত্তে নিপুণভাবে ছবির উপর বুলাইতে লাগিল। মঞ্জুলার মনে হইল অরুণ যেন সত্য সত্যই মরে নাই—তাই সে পূর্বের মত তার স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, যেন আসিবার সময় তার মাড়ির আঁচলখানি অরুণকে ছুঁইয়া গেল।

অরুণ তুলির মুখে তার ছন্দয়ের বিচিত্র স্বর্ণরাগ মাখাইয়া তুলিকার প্রতি রেখায় রেখায় ধীরে ধীরে মঞ্জুলাকে অপকৃপ সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিতে লাগিল। মুখে চিত্র শিল্পীর সরস নিপুণতা, চোখে রূপমুগ্ধের তরুণ বিশ্বয়, আর হৃদয়ে প্রেমমুগ্ধের মদির ভাবোচ্ছ্বাস! ছবি যেন তার তুলির মোহন স্পর্শে স্পর্শে প্রাণ পাইয়া সজীব হইয়া উঠিতেছিল—আর জীবন্ত মঞ্জুলা যেন চিত্রকরের বামে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ছবি হইয়া যাইতেছিল।

অবশেষে যখন প্রদোষের আলো চিত্রশালায় ফুটিয়া উঠিল, তখন অরুণের ছবির কাজ শেষ হইয়া গেছে। দিনের অশ্রুট আলোর রেখা পড়িয়া অরুণের ছায়াদেহ

তারপর মঞ্জুলাকে কাঁদিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

“এখন শুধু কাঁদলে চলবে না বৌদিদি, এক হাতে চোখ মুচবে, আর এক হাতে সেবা করবে। যতক্ষণ খাস ততক্ষণ ভরসা। তারপর তারা দুই জনে অরুণের সেবার লাগিয়া গেল। রাত্রি অনেক হইলে পরে মঞ্জুলা চামচে দিয়া অরুণকে বেদানার রস খাওয়াইতেছিল। সতীশ বার বার তার তপ্ত কপালখানি লেবেণ্ডার জ্বলে ভিজানো ঝাকড়া দিয়া সিক্ত করিয়া দিতেছিল। তখন অরুণ অতি ক্ষীণ ভাবে সতীশকে বলিল, “বড্ডো কাহিল ঠেক্চে সতীশ! নৈলে এখনি উঠে ছবিটা শেষ করে ফেলতুম!”

সতীশ ভালবাসার সুধা রসে তিরস্কারটি মধুর করিয়া লইয়া বলিল—“ছবি ছবি করেই তো ব্যারাম এদুর বাড়িয়ে তুলেছ অরুণ! ছবি তো আর শরীরের চাইতে বেশী নয়।

অরুণ একটু স্নান হাসি হাসিয়া বলিল—“ওটা তোমার বৌদির একটা মনের ভুল মাত্র।” তারপর আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চোখের আরক্ত পল্লব দুটি আবার ধীরে ধীরে মুদিত করিয়া শিশুর গুম পাড়ানো মুহূর্ত্তে অরুণ বলিল—“সে হচ্ছে না ভাই, ছবি শেষ না করে বসে থাকা হবে না। সেরে উঠেই আমার দকল কাজের আগের কাজ ছবিটি শেষ করা। সতীশ মেজার মাসে করিয়া অরুণকে এক দাগ ঔষধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিল—

“আগে সেরে উঠে নাও—তারপরে সে সগ বন্দোবস্ত হবে এখন।”

ছায়ালোকের বৃকের উপর দিয়া যে রহস্যের রাজপথ-খানি বরাবর সমুদ্রের দিক দিয়া অনন্তের পানে চলিয়া গিয়াছে অরুণ আজ ভোরবেলা সে পথে রিক্ত হস্তে অদৃশ্য হইয়া গেছে। সে নিশ্চয় ক্ষণে মঞ্জুলা যে সূচ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল, সেটা তার সৌভাগ্যই বলিতে হইবে, নচেৎ সে অনন্ত বিচ্ছেদের সত্ত্ব শোক-বেগ সে সহ করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

দুর্ঘটনার পরে যখন মঞ্জুলা প্রথম সংজ্ঞা লাভ করিল, তখন সন্ধ্যা মিলাইয়া গিয়াছে। এক পশলা বৃষ্টির পর, পৃথিবীর নীলাম্রমান ভিজা বৃকের উপর জ্যোৎস্না যেন আজ ছল ছল চোখে নীরবে কাঁদিতেছিল।

সংজ্ঞা লাভ করিবার পর মঞ্জুলা ভিজা মুখে একবার বাহিরের পানে চাহিল। বাহিরে সেই তরুলতা পূর্ণ আমাদের স্বপ্ন ভূষণের পুরাতন পৃথিবী; ভিতরে সেই নব যৌবনের ফুল ফুটানো প্রেমের জগৎ—তবু যেন আজ শুধু একটা অব্যক্ত অভাব একটা নিবিড় কালিমার ছায়া মঞ্জুলার চোখে দুই জগতেরই আলো নিভাইয়া দিয়াছে। যে ভীষণ ঘটনা ঘটয়া গিয়াছে, সে তার কথা এলোমেলো মনে ভাবিতে চেষ্টা করিল কিন্তু না। সত্ত্ব বিরহের মুখে যাহা কিছুতেই বুঝিবার নয়, তা বুঝিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ছিন্ন স্মৃতির মধ্যে মঞ্জুলার ক্ষীণ চেষ্টা শিশুর মত বার বার ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল।

সতীশ অরুণের অবস্থা দেখিয়াই মঞ্জুলার পিতাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তিনি এলাহাবাদ হইতে তখনো আসিয়া পঁতছান নাই। সুতরাং সে ভয়ঙ্কর রাত্রে মঞ্জুলাকে একলা ফেলিয়া চলিয়া যাওয়াটা সে ভাল মনে করে নাই। মঞ্জুলা অরুণের ছোট বড় সমুদয় সখের সরঞ্জামগুলি আপনার চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া মেঝের ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতেছিল। সে ছোট খাট খুঁটি নাটি স্নেহের জিনিষ-গুলির সঙ্গে আজ কত মধুর স্মৃতি, কত সুন্দর কার্য্য কাহিনী, মঞ্জুলার মনে পড়িতে লাগিল, যা এত দিন তার নিজের নিকটেও কত তুচ্ছ ঠেকিয়াছিল। সতীশ আর তার কাছে আসিয়া একটিও সাস্থনার কথা বলে নাই। বলিবার মত কথাই সতীশের বা কি ছিল। এমন শোকের মুখে যারা মানুষকে সাধুনা দিতে আসে, তারা শোকের গাভীর্য্যকে উপহাস করে। সে শুধু এক বার মঞ্জুলাকে তাদের বাড়ীতে তার মার কাছে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, মঞ্জুলা তখনও ভেমন

রেখার পানে তাকায় তেমনি ভাবে মঞ্জুলা সতীশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে লজ্জা ছিল না, তার মাথায় এলান চুলের উপরকার কাপড় তখন খসিয়া গিয়াছিল। সে দিন সতীশকে দেখিয়া বার দেহলতাপানি লাজের সঙ্কোচের মাঝে লজ্জাবতী লতাটির মত জুড়াইয়া গিয়াছিল আজ সেই বালিকা বাণবিন্দু বনের হরিণীর মত আকুল ব্যথা পূর্ণ চোখে সতীশের পানে চাহিয়া থাকিল। তেমন সক্রিয় অথচ স্থির, তেমন বিষম অথচ সুন্দর মুখ সতীশ জীবনে আর কখনো দেখে নাই। সে মুখের ছবি দেখিয়া আজ সতীশ বুঝিতে পারিল এত দিনে বুঝি অরুণের অসম্পূর্ণ চিত্র সম্পূর্ণ হইয়া গেছে—আজ বুঝি মঞ্জুলার ব্যাখ্যিত মুখে চোখে আলো-ছায়ার কোমল রেখা-পাতের সমন্বয় ঘটিয়াছে—নচেৎ মানুষের লেখা ছবিতে তার আভাস দেওয়া অসম্ভব! সতীশ অনেকক্ষণ মুচের মত চূপ করিয়া থাকিয়া পরে মঞ্জুলাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—“অবস্থা এখন কেমন মনে হচ্ছে? ডাক্তারেরা কি বলেছে?”

সতীশের রেহতরা কথায় আজ যেন মঞ্জুলার রক্ত ব্যথা কুণ্ঠাবিনী নদীর মত জননভটে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছিল! বড় কষ্টে সে তাকে আজ ধামাইল। কেবল একখানি জলভরা ব্যথার ছবি সত্ত্ব অপরাধিতার মত তার নীল বকু ছটির উপর ছল ছল টল্ মল্ করিয়া উঠিল! কিন্তু তবু সে আজ কাঁদিল না! কারণ তখনো তার হৃৎকের উপর বৈর্য ছিল, বেদনার উপর সংঘম ছিল, প্রেমের অথও ঐক্য শক্তির উপর তখনো আস্থা ছিল!

মঞ্জুলা তার অশ্রুবিগার একটা কোমল স্বাক্ষর তুলিয়া বলিল—“ও! ডাক্তারদের কথা! তারা কত কি বলে! তাদের কথা একটুকুও বিশ্বাস করি না আমি! আপনি এক বার দেখুন—সতীশ বাবু এক বার ভাল করে দেখে বলুন।”

সতীশ ধীরে ধীরে অরুণের কাছে আসিয়া বসিল,

তার সারা অঙ্গের উপর তার মেহের পরশ থানি বুলাইয়া দিয়া অরুণের দেহ হইতে রোগের সমুদয় জ্বালা জুড়াইয়া দিতে চাহিল। টাইফয়েড জ্বরের সমুদয় লক্ষণ! ডাক্তারের বেনী রোগের সে কি বুঝবে! তবু সে বার বার অরুণের মুখ চোখ ভাল করিয়া দেখিল। শেষ কালে অরুণের মাথায় গোলাপ জল দিতে দিতে মঞ্জুলাকে শুককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “অমুখ আজ কদিন থেকে বৌদিদি?”

“আজ তেরো দিন।”

“আজ তেরো দিন!”

“তেরো দিন হলো বাড়াবাড়ি হয়েছে। তারো আগে ঘুমঘুমি জ্বর হচ্ছিলই, তবু ঐ পোড়া ছবিটা নিয়ে দিন রাত খাটছিল।”

“তবে আমার এতদিন খবর দাওনি কেন বৌদিদি। আমি আগে জানলে ওকে কখনো এমন পাগলামি কত্তে দিতাম না।”

মঞ্জুলা কতকটা অপরাধিনীর মত বলিল—“আমি কত বারণ করেছি সে সব কথা হেসেই উড়িয়ে দিত। আপনাকে ডেকে পাঠাই বলে হেসে বলতো ওকে এখন ডেকে পাঠাও না, ও এলে আমার মন আর কাজে থাকে না। তবু আমার ডাকা উচিত ছিল। কপাল মন্দ তাই আমাদের ভুল হয়ে গেছে; এত বাড়াবাড়ি যে হবে তা আগে বুঝতে ত পারি নি আমি।”

এমন সময় অরুণ একবার সতীশের মুখপানে চোখ তুলিয়া চাহিল! সে চোখে যেন অশ্রু-হাসির মায়া এক সঙ্গে মাথানো! সতীশ গাঢ় মেহের কণ্ঠে বলিল—

“শরীরটা আগের চাইতে এখন একটু ভাল লাগচে অরুণ!”

অরুণ থালি তার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে স্নান ভাবে একটু হাসিতে চেষ্টা করিল বরং কাঁদা সহ হয় তবু সে হাসি সহ্য করা যায় না, এমননি মর্শ্বাতিক সে হাসি! সে হাসি দেখিয়া অরুণ আর পুনরায় প্রশ্ন করিতে সাহস পাইল না। চূপ করিয়া বসিয়া থাকিল।

যখন দুই বন্ধু বহুদিন পরে হাত ধরাধরি করিয়া আবার হাসিতে হাসিতে তাদের মিলন স্মৃতি জড়ানো ছবিখেরা চিত্রশালায় প্রবেশ করিল তখন দূর সন্ধ্যা মিলাইয়া গিয়াছে। সাটিনের ঢাকনি পরানো ঝুলানো ল্যাম্পের আলো-ছায়া পড়িয়া ঘরের চারি ধারটা যেন বিচিত্র স্বপ্নময় হইয়া উঠিয়াছে। মন্দ হাওয়ায় আলোটি জ্বলিতেছিল আর তার স্বর্ণোজ্জ্বল কিরণগুলি যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার দেয়ালে ঝুলানো সুন্দর ছবিগুলিকে স্নেহে চুষন করিয়া ফিরিতেছিল।

অরুণ যখনে সতীশকে ঝড়ের মত টানিয়া লইয়া আসিল সেখানে ঘরের মেঝেতে কয়েকটি টবের উপর এক টুকরা ফুল পাতার বাগান সাজানো! নিকটে একটি চিত্রাঙ্কনের কাঠফলকের উপর একখানি ক্যানভাস, তার উপর একখানি আসমান রঙেরু মিহি রেশমের পরদা। সেই কাঠফলকের কাছে আসিয়া অরুণ স্বপ্নাবিষ্টের মত ধীরে ধীরে সতীশের হাতখানি ছাড়িয়া দিল। চোখে মুখে তার রূপমুগ্ধের তরুণ বিষয়। তার-পর ধীরে ধীরে—অতি ধীরে যেমন করিয়া পুত্রের জননী নববধূদের মুখের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া দেন—যেমন করিয়া বসন্তের হাওয়া বাঁকা চাঁদের উপর হইতে লঘু মেঘের শ্রামল ছায়াখানি সরাইয়া দেয়, তেমনি ধীরে, বিষয়ে, ভাবমুগ্ধ অরুণ সতীশের কোতুলোজ্জ্বল চোখের সম্মুখে, তার অসম্পূর্ণ চিত্র হইতে রহস্যের যবনিকা তুলিয়া ধরিল। সতীশ দেখিল ছবির ভিতরে মঞ্জুলার রূপ চিত্রকরের হৃদয়ের নানা রঙের আলো লাগিয়া আরো অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সতীশ কবির চক্ষু লইয়া এমন ভাবের পদ্মাসনে বসাইয়া মঞ্জুলাকে আগে কখনো দেখে নাই। আজ ছবির জগতে আনন্দ রাজ্যের মুক্তাবনে তাকে লাগল পাইয়া মঞ্জুলাকে আর সতীশের চোখে নারী বলিয়া মনে হইল না। তার মনে হইল এ যেন বিশ্ব কবিতার মনন করা ভাবখানি, যেন আনন্দ-শ্রামল সৌন্দর্য-জগতের প্রাণটুকু। আজ চিত্রকরের হৃদয় রাজ্যের ভিতরকার মঞ্জুলাকে নতুন করিয়া দেখিয়া তার

সদৃশ সতীশের নিজের মতামত অনেকটা শোধরাইয়া লইল।

সতীশ যখন তন্ময়ভাবে ছবিখানা দেখিতেছিল তখন অরুণ তার মুখের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিয়া বলিল—

“চুপ করে রইলে যে! বড় পছন্দ হলো না বুঝি?”
সতীশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—“চমৎকার! বল কি অরুণ! খালি ছবির হিসাবে নয় ভাবের হিসাবেও এমন ছবি অনেক দিন আমার চোখে পরে নি।”

অরুণ সতীশকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল—“আর বকো না যাও।” সতীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল—
“খোশামুদী নয় অরুণ। এতো ছবি নয়, যেন ছবির ভিতরে বৌদি মাছুষ হয়ে উঠচে, নয় তো বৌদি আস্তে আস্তে ছবি হয়ে যাচ্ছে।”

(৩)

হঠাৎ দুপুরবেলা মঞ্জুলার নিজের হাতে লেখা জরুরী চিঠি পাইয়া সতীশ বাইসাইকেলে চড়িয়া নক্ষত্রবেগে অরুণের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল তার স্নেহের অরুণ বসন্তের পুষ্পগুচ্ছের জায় মুহূর্তে শুকাইয়া উঠিয়া যেন বিছানার সঙ্গে মিশাইয়া যাইতেছে। মুখখানি কাগজের মত শাদা ও রক্তহীন। সে মঞ্জুলার কোলে জরতপ্ত মাথাখানি রাখিয়া দিয়া নিরুপায় শিশুর মত চোখদুটি মুদিয়া নীরবে রোগের যাতনা সহিতেছিল। আর মঞ্জুলা? সে একাকিনী তার সমুদয় স্নেহ, মমতা, আগ্রহ, ব্যাকুলতা তার ক্লিষ্ট স্বামীর রোগ পাণ্ডুর মুখখানির উপর কল্যাণের সহস্র ধারা প্রসবনের মত উৎসারিত করিয়া দিয়া র‍্যাফেলের চিত্রার্পিত মাতৃ-মূর্তির মত বসিয়া ছিল। সে বার বার যেন ব্যাকুল হইয়া স্বামীর মুখে, জনশ্রুত গৃহে সুবিশাল পৃথিবীতে একটু অভয় খুঁজিয়া সারা হইতেছিল কিন্তু কোথাও একটি আশার কীণতম আলোর রেখাও দেখা যাইতে ছিল না। এমন সময় সতীশ যখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরে ঢুকিল, তখন মঞ্জুলা যেন একটু তরঙ্গা পাইল। তরঙ্গ-স্কন্ধ সাগরের জলে নিমজ্জনশীল মাছুষ যে চোখে দূরের শ্রামল তট-

তাকে ছোটো কুইনিনের পিল ধার দিয়াও তো সাহায্য করিতে পারিবে না। তারপর অরুণের মত গরীবের বিবাহ করাটাই একটা মন্ত গ্রহ; তার উপর ছেলে মেয়ের বেশ অনেকগুলি ছোট বড় উপগ্রহ জুটিয়া অতি শীঘ্রই যে অরুণের অনাটন সংসার আরো অসচ্ছল করিয়া তুলিবে তাতে কি আর সন্দেহ আছে! তারপর মঞ্জুলা! সে তো হাল ফ্যাশনের কাপড় পরাণো একখানি ছবি! অরুণের চিত্রশালায় তো কাচ ঢাকা ছবির অপ্রভুল ছিল না—বিবাহ করিয়া এমন একখানি ছবি ঘরে আনিবার কি প্রয়োজন ছিল! খালি নীলোৎপলের মত চক্কু, পায়ের নালের মত ক্রীণ তস্কর দেহ-লতা, কাজল-কালো ঘন কেশরাশি,—এ সব নিয়া কাব্য লেখা যায়, ছবি আঁকা যায়, কিন্তু ঘর করা সহজ নয়। যদি তাই সম্ভব হইত তবে এত দিন বাঙ্গালী কুলবায়ুয়া মানুষ ছাড়িয়া দিয়া রবিবর্মার ছবি বিবাহ করিয়া উজার করিয়া দিত! বিশেষতঃ এমন একটা গুরুতব কাজ করিয়া ফেলিল, অরুণ একবার সতীশকে জিজ্ঞাসাও করিল না, ভালবাসা এমনি অন্ধ! তাই সতীশ এই না-বুঝ দম্পত্যকে বিবাহের পর আশীর্বাদ করিয়াই একদম পালাইয়াছিল, আর এদিকে ভিঁড়ে নাই। তার পর দেড় মাস কাটিয়া গিয়াছে। ভালবাসার নিকট দান করা চলে, মান করা চলে, হাসি কান্নার অভিনয় করা চলে, কিন্তু তার সঙ্গে জোর করা চলে না। তাই কে যেন সতীশকে আজ চাবুক মারিয়া এমন অসময়ে অরুণের কাছে পলাতক আসামীর মত ধরিয়া হাজির করিয়া দিয়াছে। সতীশ একটুকু চুপ করিয়া থাকিয়া অরুণের কথার জবাব দিয়া বলিল—“যাত্রার ফলাফল পাঁজি দেখে ঠিক করে নেবো এখন! সে চুলোয় যাক, তোমার কাজ চলচে কেমন আগে তাই বল শুনি।”

অরুণ হাসিয়া বলিল—“না তাই কাজ আর তেমন এগুচ্ছে কই। বিয়ে করে ভারি ছেলে মানুষ হয়ে গেচি সতীশ। কথাটা বলিয়া নিতান্ত ছেলে মানুষের মত অরুণ হাসিয়া উঠিল। মঞ্জুলা কিছুতে হাসিটা চাপিয়া

রাখিতে পারিল না। তাদের ছোঁয়াচে হাসির ঢেউ লাগাতে সতীশকেও হাসিয়া উঠিতে হইল। চারিদিক হইতে হাসির রূপালি আলো লাগিয়া সতীশের মনের মেঘটাও অনেকটা কাটিয়া গেল। সে মনে মনে খুসী হইয়া ভাবিল—“আমি এমনি ছুটি ছেলে মানুষের উপর রাগ করেছিলাম! অতি ছেলে মানুষ এরা যে! ভবিষ্যটকে শুধু হাসির জোরে পেছনে ঠেলে রাখতে চায়!” সতীশ যখন এমনি ভাবে ক্ষমা, রেহ ও অভিমানের মধ্যে নিতান্তই নাকাল হইয়া ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছিল তখন অরুণ হঠাৎ চেয়ার হইতে এক লাফে উঠিয়া পড়িয়া সতীশের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—“ভাল কথা সতীশ আসল ছবিখানাই তোমায় দেখাতে ভুলে গেছি দেখবে—এসো!” এই বলিয়া অরুণ সতীশের আর কোনও মতামতের অপেক্ষা না করিয়া তাকে এক রকম জ্বরদস্তি করিয়াই চিত্রশালার দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। চলিতে চলিতে সতীশকে অরুণ বলিল—এখনো ছবিটি শেষ কত্তে পারি নি কিন্তু! আলো-ছায়াটা ভাল করে মুখে ফুটিয়ে তুলতে যদি পারি তবে ছবিটি যে কি চমৎকারই হবে, সে আর তোমায় কি বলবো!” সতীশ দেখিল অরুণ ফেনিল ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যে বিষয়টাকে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাই সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—“ক’র ছবি তাই?”

“তোমার বৌদির!” সতীশ বুঝিয়াও না বুঝার ভাণ করিয়া বলিল—“আমার বৌদির?”

আহা মঞ্জুলার আর কি! বৌদি বহুম আগে বিয়ে করার সম্পর্কে। মেটাও তুমি মানতে চাও না না কি?

সম্বন্ধটা অগত্যা মানিয়া লইয়া সতীশ বলিল—“ছবি দেখে বৌদির অভিসম্পাতের ভাগী হবো না তো?”

অরুণ মধুর উত্তেজনার সহিত বলিল—“আসলটার উপর না হয়, তার সাড়ে ষোল আনা দাবী থাকতে পারে সে সম্বন্ধেও শাস্ত্র মতে সত্বের তর্ক যথেষ্ট। কিন্তু নকল ছবিটা সম্পূর্ণ আমারই! তার কপিরাইটের ভাগ কাউকে দেই নি আমি।”

তাকে খানিকটা শক্ত সমর্থ না হইলে চলিবে কেন? দৃষ্টি তার উজ্জ্বল প্রভাময়, যেন সে চোখ হতে ছনিয়ার ছোট বড় কিছুরই সহজে এড়াইয়া বাইবার যো ছিল না।

(২)

সে দিন বিকাল বেলা অরুণ তাদের বাড়ীর ভিতর দিককার বারান্দায় একখানি ইজি চেয়ার টানিয়া লইয়া শুইয়াছিল। আর তার কাঁধের উপর হাত দুখানি রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল তার নবপরিণীতা স্ত্রী মঞ্জুলা। লতার কঁাকে কঁাকে রাজা কুঁড়র অঙ্গুট মাথুরী জড়ানো গোলাপের শাখা লতার মত তার হাত দুখানি। আর সেই হাত দুখানির উপর আসিয়া মুক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে তার যৌবন-প্রস্ফুটিত দেহলতার সমুদয় লাবণ্য-রাশি! তখন দিনের শেষ আলো ঘরের সাসিতে সাসিতে ধূসর শুভ্র পাথুর শোভাটিকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বিদায়ের শেষ মুহূর্তটিকে অতি সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। সন্ধ্যার ফিকে গোলাপী আকাশে এক কঁাক পাখী উড়িয়া যাইতেছিল, সেগুলিকে এক সারি কৃষ্ণ বিন্দুর মত দেখাইতেছিল। যে চারিটি তারা তখন উকিরুঁকি দিতেছিল তাদের মধ্যে যেন তারি একটা চোখাচোখির ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। মঞ্জুলা মুগ্ধ ভাবে একদৃষ্টে তাই যেন দেখিতেছিল! কখন যে তার মাথার উপর হইতে সাড়ির আঁচল খানি খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল সে খবর সে নিজেই বড় একটা রাখে নাই। এমন সময় সে মুগ্ধ দম্পতীর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া মটোর গাড়ীর মত হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল সতীশ! তখন সহসা মঞ্জুলার ভাবের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তার হাতের সোণার চুড়িগুলি ও আঁচলে বাঁধা চাবির গোছাটা একতালে বাজিয়া উঠিয়া কাব্যের দেশ হইতে তার লাজের দেশে ফিরিয়া আসার যত্নাটিকে মধুর করিয়া তুলিল। সে মাথার উপর সাড়ির প্রান্তখানি টানিয়া দিতে দিতে দূরে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অরুণ যেন ধরাপড়ার লজ্জটা তাড়াতাড়ি সামলাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল উঠিল—“বাঃ সতীশ যে! হঠাৎ কোথেকে? পথ

ভুলে নয় তো?” সতীশ হাসিয়া বলিল—“না হে ভায়া, তা মনে করো না। এদিন যে আসতে পারি নি তার কারণ হচ্ছে, নিজের বিয়ের মতলবে একটা কন্টিনেনটাল টুর দিয়ে আসতে হলো কি না!” অরুণের মুখ আরো লাল হইয়া উঠিল, রাজা গোলাপের উপর যেন আবির্ভাবের পিচ্কারী! তার সে সলজ্জ মুখের হাসির ভিতর দিয়া তার প্রেম অগতের জয়পরাজয় লজ্জা ও সুখ দুইই রৌদ-বৃষ্টির মত পাশাপাশি হইয়া একসঙ্গে অতি মধুর ছন্দে ফুটিয়া উঠিতেছিল! তারপর বার কয়েক কাশিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া অরুণ বলিল—“None but the brave deserves the fair!” এক যাত্রায় সব সময় স্থান ফল ফলে না, তা জান সতীশ!”

দুই বন্ধুর মধ্যে এই রহস্য পরিহাসটুকু মঞ্জুলা বেচারীকে লইয়া। এ কথাটা এখানে একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। অরুণ মাস দেড়েক হয় এক বার এক সপ্তাহের অল্প এলাহাবাদ গিয়াছিল। এলাহাবাদে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে সব পোষ্ট মা ১৪ সদানন্দ বাবুর স্নানার্থিনী কণ্ঠা মঞ্জুলাকে প্রথম দর্শন করিয়াই কবিকুলেশ্বর চিরন্তন প্রথা মতে সে প্রেম-বিদ্ধ হয়। তারপর মঞ্জুলাকে একেবারে বিবাহ করিয়া তবে সঙ্গীক ঘরে ফিরিয়া আসে। সতীশ অরুণের এই নভেলী ধরণের বিবাহ ব্যাপার লইয়াই পরিহাস করিতেছিল। সতীশের বিশ্বাস অরুণ এ বিবাহ ব্যাপারে ভারি একটা ছেলের কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে। বিবাহ জিনিষটা এমন একটা ছেলে খেলা নয় যে, এমন চট্ করিয়া রাতারাতি সারিয়া ফেলিতে হয়। একটু দোঁধিতে গুনিতে হয়, একটু তাবিতে চিন্তিতে হয়, তা নয়, প্রথম মদের মুখেই “উঠ ছুঁড়ি তোর বে!”

চিত্রশালার কলা-লক্ষী অরুণকে কুপার চকে দেখিতেন সেই জন্তই বোধ হয় ধন দৌলতের লক্ষী তাকে অতিরিক্ত মেহ দেখানটা কখনই আবশ্যক বোধ করেন নাই। এমন অবস্থায় তার পক্ষে গরীব পোষ্টমাষ্টারের মেয়েকে বিবাহ করাটা নিতান্তই অসম্ভব হইয়াছে। কারণ বিপদের সময় তার খত্তর

চক্ষে রেখেছ চরণ-নখে ছন্দে রেখেছ পায়,
কটাক্ষে তব বিজলী অলে নিখাসে মলয় ধার।
উবারে দিলে সৌখিন ভূষা শিশিরে আখির জল,
নিশীথে শিখালে নীরব ভাষা কোকিলে কাকলী কল।

তব অন্তরতলে উছলে ফন্ত শান্তি শীতল বরা
অব গুণন মাঝে শ্রীমুখ রাখে রাস্তিকনু হরা !
সুখীয়ে কুটীরে সুটিছ নিত্য গুণ রজনীগন্ধা,
আর্ন্ত-শিয়রে অমিয় ভাণ্ড মর্ন্তে অলকনন্দা !
স্বর্ণ-ভনিমা শীর্ণ মা তোর অর্ক আতুরে সেবি
তুমি যে রমণী জগত ধাত্রী মাতৃরূপিণী দেবী।
শ্রীকুলচন্দ্র দে।

চিত্রাপিতা

(১)

অরুণ সতীশের অন্তরক বন্ধু। আজকালকার বহি-
রুখী সভ্যতার দিনে 'বন্ধু' বলিতে আমাদের যে অস্বাভা-
বীন শিষ্টাচারের লৌকিক সম্পর্কটা মনে পড়ে-অরুণ
সতীশের ভেমনতর বন্ধু নয়। সে তার সত্য সত্যই
অভ্যাগ-সহনো বন্ধু, সমপ্রাণ সখা! যে বন্ধুত্ব তরুলতা
ঘেরা পল্লীর শিশিরশিক্ত প্রান্তরের মুক্ত আনন্দরাশির
মাঝে অছুরিত, কৈশোরের অকপট শ্রীতি-রমে পরাবিত
হইয়া এত দিনে নব যৌবনের বসন্ত পবনে লীলায়িত
হইয়া উঠিয়াছে। ভেমন বন্ধু, কারো কারো জীবনে
কচিং এক আধটি মিলে অনেকের ভাগ্যে একেবারেই
মিলে না।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া অরুণ গেল ডাক্তারী
পড়িতে। আর সতীশ ঢুকিল কলেজে। কিন্তু মনুষ্য-
কালদের নীরব সত্যগৃহে কিছুতেই অরুণের মন টিকিতে
চাহিল না, এবং শবব্যবচ্ছেদ গৃহের বিকট দুর্গন্ধে তার
সদৃশ উৎসাহ দূর হইয়া যাইতেও বড় বেগী সময় লাগিল
না। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমান সতীশচন্দ্র অকস্মাতরূপ

'দুস্তর বারিরাশি' দর্শন করিয়া মনে করিল তার চেয়ে
বাকি জীবনটা নেহাৎ অজ্ঞাত বনবাসে যাপন করাও
অনেক পরিমাণে সুখকর।

তারপর তাদের পল্লীগ্রামের বনমালতীর ফুল ছড়ানো
ছায়াতলে, পাহাড়তলীর উপল-গড়া ঝড়না তলার পল্লী-
গ্রামের মন ভুলানো রাজা মাটির সরু পথে বেড়াইতে
বেড়াইতে তারা দুজনে ভবিষ্যতের দিক নির্ণয় করিবার
অন্ত অনেক আলোচনা আন্দোলন, অনেক তর্কবিতর্ক
করিয়া কাটাঠিয়াছে। অনেক ভাবনা চিন্তার পর শেষে
তারা ঠিক করিয়াছে বাকী জীবনটা সৌন্দর্য্যের ধ্যানে
কাটাঠিয়া দিতে পারিলেই হইল। আনন্দের গভীর
নীল জলে যার পদ্মাসন, রসের মাধুরী লাগিয়া যার স্বর্ণ
পদ্মের রাজা পাপড়িগুলি আপনা আপনি খুলিয়া যার
তারা সেই সৌন্দর্য্যরাস্তার, সেই আনন্দ-দেবতার জন্ম
জন্মাস্তরের পূজারী। অরুণ বলিল, আমার হৃদয়ের
আলো লাগিয়া আকাশের তারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে,
আমার ভাবের স্বপ্ন লাগিয়া প্রান্তরের বনফুল নীহার-
শিক্ত হইয়া উঠিবে। আমার তুলিকায় সত্য স্বপ্ন হইবে,
স্বপ্ন সত্য হইবে, ফুল ফুটিয়া ঝরিবে, ঝরিয়া ফুটিবে।
আর সতীশ বলিল, আমাকে পাষণ্ডের মুর্ছা ভাঙ্গিয়া
দিয়া ভাবময়ী কল্যাণ স্বরূপাকে শাপযুক্ত করিয়া দিতে
হইবে। কঠিনের ভিতরে যে কুচ্ছ-সাধন তাপস-মূর্তি
বিগাহমান তার তপ ভঙ্গ করিয়া দিয়া কোমলের স্তরল
ছন্দখানি তার চারি দিকে মর্শ্বিত করিয়া দিতে হইবে।
তবে তো আমার সাধনা সফল হইবে। তাই অরুণ হইল
চিত্রকর, আর সতীশ হইল ভাস্কর শিল্পী।

অরুণের চেহারাটা যেমন দুর্বল মনটা ততোধিক
ভঙ্গপ্রবণ; লম্বা ছিপ্‌ছিপে দেহখানি। ডাগর ডাগর
চোখছটি সুন্দর—অতি নিক্রমমভাবে সুন্দর। তবু
যেন কেন সে হাসি হাসি মুখ দেখিয়া চোখের জলের
কথাই মনে পড়ে। সতীশ কিন্তু অল্প ধরণের মানুষ।
সে অনেকটা চটপটে কাজের লোক। শান্তি বন্ধে
পাথর কাটিয়া তবে তাতে তার ভাব ফুটাইতে হয়,

যায়। পেট যদি অত্যন্ত কাঁপিয়া উঠে তাহা হইলে পিচ্কারী করিয়া কতকটা অন্ন গরম জল, ইহার গুহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাতে কতকটা বায়ু নির্গত হইয়া যায়, তাহার জন্ত শিশুর কষ্টের অনেকটা লাঘব হয়। শিশুর যদি প্রতিদিন পেট কাঁপিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহার খাওয়া দাওয়ার গোলমাল হইতেছে; এক্ষণে স্থলে ও গ্রোণ বাই কার্বনেটে অব্ সোডা (bi-carbonate of soda) একটু ডিল ওয়াটার (dill Water) এর সঙ্গে দিবসে ৩।৪ বার খাওয়াইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহার সহিত ৩ কোঁটা ব্রান্ডি (brandy) ও আবশ্যিক বুঝিয়া যোগ করা যাইতে পারে। যদি এমন দেখা যায় যে, শিশু চোখ ঘুরাইতেছে আর তাহার চোখ মুখের চামরা কুঁচ-কাইতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ইহার পাকস্থলীতে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে এক্ষণে হইলে এক বিম্বক ডিল ওয়াটার (dill water) কি মহরী ভিজার জল খাওয়াইয়া দিলে ফল পাওয়া যায়।

বমি—নানা কারণে শিশুর বমি হইতে পারে। বমি আরের একটা বিশেষ উপসর্গ। অধিক ভোজন হইলেও বমি হইতে পারে। দূষিত খাদ্য দ্রব্য দ্বারাও বমি হয়। দুধ খাওয়াইয়া শিশুকে কাঁকা দিলে, কিংবা ছুলাইতে থাকিলেও বমি হইতে দেখা যায়। খাওয়ার দোষে হইলে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দুধের সঙ্গে জলের ভাগ বাড়াইয়া দিবে। খুব খন খন, না খাওয়াইয়া দেয়ী করিয়া খাওয়াইতে থাকিবে। দুধ খাওয়ার বোতলটি অপরিষ্কার থাকিলে, তাহাকে উত্তম রূপে পরিষ্কার করিয়া লইবে। বমি যদি সহজে না বন্ধ হয়, তাহা হইলে ডাক্তার ডাকা উচিত।

হিকা—প্রায় সব শিশুই অনেক সময় হিকা তুলিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। এক বিম্বক মহরী ভিজা জল খাওয়াইলে অনেক সময় তৎক্ষণাতঃ ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

শিশুর ব্যায়াম বা অঙ্গচালনা—কেহ কেহ শিশু কিছুতেই কোল ছাড়া করে না, সর্বদা দাই ক্রোড়ে করিয়া রাখে। ইহা ভাল নহে। এক্ষণে করিলে, শিশু আপনার হাত পা নাড়িতে পারেন না। ইহার জন্ত তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ় ও সুপরিণত হইতে পারে না। শিশু যত হাত পা ছুড়িবে, তাহার পক্ষে ততই মঙ্গল জানিবে। শিশুর চোখের সম্মুখে কোন একটা জিনিস ধরিলে, সে হাত বাড়াইয়া তাহা ধরিতে চেষ্টা করে, ইহাতে তাহার মাংসপেশীর বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। স্নানের পূর্বে যখন তাহাকে তেল মাখান হয় সে সময় সে আপন মনে হাত ছুড়িতে থাকে, ইহাতে বাধা দিতে নাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগ্‌চি।

মাতৃমূর্তি

দেবি !

নাহিক আমার পূজার অর্ঘ্য, এসে শুধু মকুভূমি।
বিশ্বভাণ্ডার উজ্জার করিয়া সকল নিয়াছ ভূমি।
দন্তে রেখেছ কন্দ-কলিকা গণ্ডে গোলাপ গুল-
অধরে ধরেছ পকু দিগ্‌ আঙুলে চম্পক সুল;
শ্রীপদে কত রক্ত কমল আশ্রয়ে বিমল বিভা,
হাস্তে কুটাও কাশ কুসুমের পরশে জাগাও দিবা!
খগ্ননে শিখাও চটুল নৃত্য ভ্রমরে গুঞ্জন গীতি,
কুরঙ্গ দিলে নয়ন-ভঙ্গী মাতঙ্গে মহর গতি।
পুণ্য বক্ষে শুভানিধির কক্ষে কুমারে বহ
সিক্ত লোচনে শোচনা হর যত্নে যতনা সহ।
বাহতে বেঁধেছ ললিত বস্ত্রী কটিতে কেশরীরাজ
কিশোর কণ্ঠে কঠিন কষু কোমলে কড়ির সাজ!
চাক্র ভ্র-ভঙ্গে গগন-অঙ্গে রাঙিলে মোহন ধনু,
উজল আঁধি কাকলে আঁকি সাজালে জলদ-তনু।

সাবধানে রাখিতে হয়। সেখানে ঘাহাতে জল স্পর্শ না করে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। টীকা দেওয়ার পর ৫ দিন হইতে ১৫ দিন পর্যন্ত শিশুর মেজাজটা বড় খিটখিটে হয়। তিন দিনের দিন হইতে টীকা উঠিতে আরম্ভ করে। ৫ দিনে ফোঁদার পরিণত হয়। তাহার পর ফোঁদাটি পাকিতে আরম্ভ করে এবং যা হয় এবং চটা পড়ে, ১৫ দিন হইতে ২১ দিনের মধ্যে চটাটা শুকাইয়া উঠিয়া যায়। সেখানে একটা লাল দাগ থাকে, কালক্রমে দাগটা সাদা হইয়া যায়। টীকা দেওয়ার তৃতীয় দিনে শিশুকে একটু ক্যাস্টর অইল (Castor Oil) খাওয়ান ভাল। প্রথম সপ্তাহের শেষাংশেই সময়ে, যে স্থানটিতে টীকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার চারি পার্শ্বে খানিকটা স্থান ব্যাপিয়া খুবই লাল হয়। ইহাতে ভয় পাইবার কি বাস্তব হইবার কোন কারণ নাই। ইহা আপনা হইতেই সারিয়া যায়।

মুখের মারি লাল হওয়া—শিশুর পেটের গোল-যোগ ঘটিলে, এবং তাহার দাঁত উঠিবার সময় হইলে, তাহার সর্সগাত্রে বিশেষতঃ মুখের মধ্যে একরূপ লাল লাল দাগ নির্গত হয়। ইহাতে বাস্তব হইবার কোন আবশ্যক নাই। ৬০ ফোঁটা ফ্লুইড্‌ ম্যাগনেসিয়া (Fluid Magnesia) সকালে এক বার সন্ধ্যায় এক বার খাওয়াইয়া দিলেই সকল ঠিক হইয়া যায়।

শিশুর মুখের মধ্যকার ঘা—শিশুর মুখের মধ্যে সাদা সাদা এক রকম দাগ বাহির হইতে দেখা যায়। মাতার স্তনের বোটা, কিংবা তাহাকে যে বোতলে করিয়া গরুর দুধ খাওয়ান যায়, সেই বোতল অথবা দুধটা অপরিষ্কার হইলে এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব। শিশুকে দুধ খাওয়াইয়া এক টুকরা পরিষ্কার নরম ত্বাকড়া গরম জলে ভিজাইয়া তাহার দ্বারা উহার মুখের মধ্যটা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। ইহার পর গ্রাসিরিন্‌ অথবা বোরাক্স (Glycerine of borax) নামক ঔষধ অথবা সোহাগার খই মধুতে মাড়িয়া মুখের মধ্যে লাগাইয়া দিবে। এই ত্বাকড়া দ্বিতীয় বার ব্যবহার করা

উচিত নয়। দ্বিতীয় বার দুধ খাওয়ানোর সময় নূতন ত্বাকড়া ব্যবহার করা উচিত। শিশুর মুখে যা হইলে তাহাকে সর্সবিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিবে। তাহার পেটটি ঘাহাতে ভাল পাকে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। তাহাকে প্রশস্ত ঘরে রাখা উচিত। তাহাকে যে দুধ খাওয়াইবে, তাহা যেন টাটকা হয় এবং তাহার ঘেন কোন দোষ না থাকে।

শিশুর মাথার কাউর ঘা (eczema of the scalp) শিশুর মাথায় চটা বিশিষ্ট একরূপ ঘা হয়। এই ঘা মাথা হইতে কান, কান হইতে সর্স দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে পারে। এ ঘা অতি সহজেই আরোগ্য করিতে পারা যায়। এরূপ হইলে, শিশুর মাথায় সাবান জল দিতে নাই। নারিকেল তৈল কিংবা অলিভ অইল (olive oil) গরম করিয়া তাহার দ্বারা মাথাটা ভিজাইয়া রাখিবে। তাহার পর নরম ত্বাকড়া দিয়া তৈলগুলি মুছিয়া ফেলিয়া নিম্নের মলমলি লাগাইয়া দিবে—প্রেসিপিটেটেড সালফার (precipitated sulphur) ১০ গ্রেণ; অকসাইড অক্সিজিনিক (oxide of zinc) ২০ গ্রেণ; অলিভ অইল (olive oil) অর্ধ আউন্স; ভেসেলিন (vaseline) অর্ধ আউন্স মিশ্রিত কর।

শিশুর পেট ফাঁপা—শিশুর পেটে হাওয়া জমিয়া বিশেষ কষ্ট দিতে পারে। পেটে হাওয়া জমিলে, শিশুর বমি হইতে পারে এবং পেট কামড়াইতে পারে। শিশুর পেট কামড়াইতে থাকিলে, সে কাঁদিতে থাকে এবং পা দুখানি পেটের দিকে জড় করিয়া রাখে। পেট কামড়ানি যদি খুব বেশী হয়, তাহা হইলে তাহার চোখ মুখ প্রভৃতি নীলবর্ণ ধারণ করিতে পারে। এক টুকরা ক্র্যানেল্‌ গরম জলে ডুবাইয়া বেশ করিয়া নিঙ্গড়াইয়া লইয়া, তাহার দ্বারা উহার পেটে স্বেদ দিবে। একটুখানি ক্যাস্টর অইল (castor oil) খাওয়াইয়া দিবে। উহার মলে খুব অসম্ভব সবুজ বর্ণের ডেলা সমূহ দৃষ্ট হইবে। গরম জলে স্নান করাইলে অনেক সময় পেট কামড়ানি কমিতে দেখা

৭।৮ মাসে গর্ভে থাকিয়া যে সকল শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, চেষ্টা করিলে তাহাদের যে না বাঁচাইতে পারা যায় এমন নহে। কিন্তু ইহার পূর্বে হইলে, কিছুতেই বাঁচাইতে পারা যায় না। অকালজাত শিশুকে বাঁচাইতে হইলে বিশেষ যত্নের আবশ্যক করে। ইহাদিগকে সাধারণ শিশুর মত রাখিলে চলিবে না। জন্ম গ্রহণের পর প্রায় ২।১ মাস ইহাদিগকে ইনকিউবেটোর্ (incubator) নামক বিশেষ এক প্রকার খাটের মধ্যে রাখিতে হয়। ইহাদের হাত পা তুলা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখা উচিত। ইনকিউবেটোর্ (incubator) এর মধ্যে রাখার সুবিধা না ঘটিলে, শিশুটিকে তুলা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। অকালজাত শিশুকে যত অল্প নাড়াচাড়া করা যায়, ততই ভাল। ইহাকে প্রতিদিন স্নান করাইবার আবশ্যক নাই। সপ্তাহে একবার করাষ্টলেই চলিতে পারে। স্নানটা শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিবে। ইহার গা বেশীকণ আর্দ্র রাখিতে নাই। অকালজাত শিশুদিগকে স্তন্য দেওয়া মাতার পক্ষে অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই কারণে ইহাদিগকে পেপটোনাইজড্‌ দুধ খাওয়াইয়া মানুষ করিবার আবশ্যক হয়। দুধ এক ভাগ ; পরিষ্কার জল ৩ ভাগ ; ফেরারচাইল্ড্‌স্‌ পেপটোজেনিক পাউডার (fairchild's peptogenic powder) অর্ধেক মাত্রা ১৫-২০ মিনিট ধরিয়া অগ্নি-তাপে ফুটাইয়া গালাইয়া ফেলিবে। ইহাদিগকে অল্প শিশুদের তুলনায় অল্প খাদ্য দিতে হইবে। দীর্ঘতা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে যত্ন গ্রহণ করিলে, তবেই এসব শিশুর প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, অল্পখা মুখ্য স্থির নিশ্চয় বলিয়া মনে করিবে। এই সকল শিশু সাধারণতঃ এমন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে যে, মাতার স্তন হইতে দুধটুকু চুষিয়া খাওয়ারও তাহাদের শক্তি থাকে না। এক্ষণ স্থলে মাতার স্তন হইতে কতকটা দুধ গালিয়া ফেলিয়া, পরে স্তন্য দিলে, কি হয় না হয়, ঠিক বলি যায় না। ইহাদের দাত কিছু বিলম্বে উঠিতে

দেখা যায়। ইহারা হাটিতে ও কিছু বিলম্বে শিকার করিয়া থাকে। ইহাদের যে সাধারণতঃ কম বুদ্ধি হয় এমন মনে করার কোন কারণ নাই। সার্ আইজ্যাক্ (Sir Isaac Newton) ও ৭ মাসের ছেলে ; তাঁর মত বুদ্ধি ক'জনের হয় ?

বয়স্ক সন্তান—বয়স্ক সন্তানদের মধ্যে সাধারণতঃ দুটিকেই ঠিক গমান হইতে দেখা যায় না। একটি কিছু বড় ও বলবান দেখায় অপরটিকে কিছু ছোট ও দুর্বল দেখায়। ইহাদেরও বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। দুটি শিশুর উপযোগী দুই অনেক মাতার স্তনেই জন্মাইতে দেখা যায় না। এক্ষণ স্থলে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিশুটিকে মাতৃস্তন্য দ্বারা ও অপরটিকে পেপটোনাইজড্‌ দুধ (Peptonized Milk) দ্বারা মানুষ করাই যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বিবেচনা হয়। যে সকল শিশু স্তন টানিতে পারে না, তাহাদিগকে স্তন হইতে দুধ লইয়া, কিছুকি করিয়া খাওয়াইতে চেষ্টা করিবে। অতটুকু শিশুকে কিছুকি চামচে করিয়া দুধ খাওয়ান খুবই কঠিন ব্যাপার, কিন্তু তা বলিয়া আর উপায় কি আছে ?

টীকা দেওয়া—অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন সকল শিশুকেই কি টীকা দেওয়া আবশ্যক ? উত্তর—নিশ্চয়। যদি সকলকেই ৩ মাস বয়সে আর ১২ ও ২৪ বৎসর বয়সে এক বার করিয়া টীকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে বসন্ত রোগ বোধ হয়, দুদিনেই পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। যাহাদের টীকা দেওয়া হয় নাই, তাহাদের মধ্যে যত বসন্ত রোগ হয়, যাহাদের টীকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন নয়। হইলেও তেমন মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায় না। শিশুর ৩ মাস বয়স হইলে, টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। টীকা দেওয়ার পূর্বে, তাহার স্বাস্থ্য কেমন, আহারে রুচি কেমন, পেটের কোন গোলযোগ আছে কি না—এ সকল বিষয় জানা একান্ত আবশ্যক। রুগ শিশুকে অথবা যাহার পেটের গোলযোগ আছে, তাহাকে তখন টীকা দিতে নাই। হাতের যেখানে টীকা দেওয়া হয়, সে স্থানটিকে খুব

দিয়া আসিল। পূজার পর চুপে চুপে জুয়ের চাউলের ভাত আলাদা করিয়া রাঁগিয়া রাখিল। সওদাগরের খাওয়া হইলে পর বৌকে ডাকিয়া বলিল, “মা, তুমি আমার পাত্(অ) খাও।” বৌ খালাটি লইয়া গিয়া রাখিয়া দিল, এবং জুয়ের চাউলের ভাত ও কচুর শাক খাইয়া রহিল।

বৈকালে সওদাগরের পুত্র বিবাহের জবাতি আনিয়া, এবং ভোজের আয়োজন করিল। সন্ধ্যা বেলা বৌ ঘরের কোণে ও নানা গুপ্ত স্থানে আলো দিল, কেহই দেখিতে পাইল না।

ভোজের রান্না হইতেছে। বৌ মাছ ভাজিতেছে। এদিকে অলক্ষী কন্ডাটা মাছের গন্ধে আর তেঁতুল গাছে থাকিতে না পারিয়া সওদাগরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বৌর কাছে এক টুকরা ভাজা মাছ চাহিল। বৌ ব্যাপারটা বুঝিল এবং অলক্ষী কন্ডাটাকে বলিল, “একটু খাড়াও, তোমারে আগে মাছ দিলে কে কি কইব; আমি চুপে চুপে তোমারে দেব।” বলিয়া বৌ একটা হাতা খুব লাল করিয়া গোড়াইল এবং অলক্ষী কন্ডাটাকে বলিল, “অধন তুমি আক কর আমি মাছটা তোমার নার(অ) ফালাইয়া দেই।” কন্ডাটা তাহাই করিল। বৌ সেই অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত হাতাটা কন্ডাটার মুখে চাপিয়া ধরিল। অলক্ষী কন্ডাটা তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া বাড়ীর বাহিরে গিয়া তে-মাধার পড়িয়া হাত পা ছড়াইয়া মরিয়া গেল।

রাত্রে লোকজন আসিল, বাজকর আসিল, পাঙ্গী আসিল। কন্ডাকে আনিতে যাইতে হইবে। সওদাগর বলিল, “আমি নিজে বায়াম্।” তেঁতুল গাছের নীচে গিয়া দেখিল কন্ডা সেখানে নাই। ফিরিয়া আসিয়া বৌকে বলিল, “মা, খাইয়া পাইলাম্ না।” বৌ খণ্ডরকে তে-মাধার লইয়া গিয়া অলক্ষী কন্ডাকে দেখাইল, এবং সকল কথা তাহাকে বলিল, বাড়ীর সমস্ত লোকজন রাত্তার জড় হইল। সওদাগর সকলের সম্মুখে পুত্র-বধূকে প্রবংসা করিয়া বলিল, “আমার সংসারে অলক্ষী

আইত্(অ) লইছিল্; লক্ষী বৌ আমার সংসার রইকা করছে। আমি আর কোন দিন বিয়ার কথা মুখ্(অ) আনতাম না। বৌ আমার সংসারের লক্ষী।”

সওদাগরের সংসার আরও সুখের হইল, এবং এই রূপে গাড়ে ব্রত সংসারে প্রচলিত হইল।

গাড়ে সংক্রান্তির পরদিন আকাশে প্রথম প্রদীপ দেওয়া হয় এবং এক মাস এইরূপ আকাশে দীপ দেওয়া হইয়া থাকে। দীপাধিতার মত গাড়ে দিন সন্ধ্যা বেলায়ও ঘর বাড়ী আলোকিত করার নিয়ম আছে। তুলা রাশিতে রবি প্রবেশ করা পর্যন্ত আকাশে দীপ দান করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়—

দীপ দানেন বিপ্রেক্ষ, ন পুনর্জায়তে ভূবি।

রবিগ্রাহে কুরুক্ষেত্রে নর্যদায়াং শশিগ্রাহে,

তৎফলং কোটিগুণিতং দীপ-দানেন কার্তিকে।

দ্ব্যতেন দীপকো যন্ত তিল-তৈলেন বা পুনঃ

জলতে মুনি-শার্দূল, অথমেধেন তন্ত কিম্ ?

উচৈঃ প্রদীপমাকাশে যো দত্তাৎ কার্তিকে নরঃ

সর্গঃ কুলং সমুদ্ভূত্যা বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।

বিষ্ণু কেশবমুদ্ভিজ্জ দীপং দত্তাতু কার্তিকে ;

আকাশস্থং জলহৃৎ শৃণু তন্তাপি বৎ ফল—

ধনধান্ত সমৃদ্ধশ্চ পুত্রবানৌষরো গৃহে

লোচনে চ শুভে তন্ত বিধানপি চ জায়তে।

নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া আকাশে দীপ দিতে হয়—

দামোদরায় নমসি তুলায়াং লোলয়া সহ।

প্রদীপন্তে প্রবচ্ছামি নমোহনন্তায় বেধসে ॥

শ্রীগুরুবজ্র তট্টাচার্য্য।

শিশু চিকিৎসা

অকালজাত শিশু (Premature children) —

সাধারণতঃ শিশু পূর্ণ নয় মাস মাতৃ-গর্ভে থাকিয়া পরে জন্মিত হয়। যে সকল শিশু সময় হইবার পূর্বে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অকালজাত শিশু কহে।

হইবে। স্থানে স্থানে উন্মুক্ত জায়গা রাখিতে হইবে (Parks)। সমস্ত সহরটিকে একটি বাগানের আকারে গড়িয়া তুলিতে হইবে। যখন সেদিন আসিবে তখন ব্যাধি অধিক থাকিবে না। সকলের হস্ত মুখরিত দীপ্ত বদনমণ্ডল দেখিয়া হৃদয় উন্নীত নাচিয়া উঠিবে। জগতে আবার ঐক্যের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী।

গাড়ে ব্রত

যে সকল স্ত্রীলোকের খাণ্ডী নাই তাহারাই 'আশ্বিনের' সংক্রান্তি দিন এই ব্রত করিয়া থাকে। ত্রিভীণ্য ব্রতের দিন হালের উৎপন্ন দ্রব্য, জালের মাছ ও গরুর ছূধ খাইতে পারে না; মাথায় তেল ব্যবহার করিতে পারে না, ও ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া সম্বরণ দেয় না। সে দিনের একমাত্র খাদ্য কচুর শাক, নারিকেল ও কলা; বিধবাগণ বীচি কলা, শিমের সাতু ও নারিকেল প্রভৃতি খাইয়া থাকেন। জাল ছাড়া অল্প রকমে ধরা মাছ সম্বাগণ খাইতে পারে।

ব্রতের দিন সকাল দেলা পুকুরের আকৃতি বিশিষ্ট একটি অগভীর ছোট গর্ত করা হয় এবং ইহার পাড়ে কুল গাছ, আম, কাঠাল, আদা, হলুদ, মানকচু ও কলা গাছ বুনিয়া দেয়, এবং পুকুরটার একটা 'জান' বা জল নিকাশের বন্দোবস্ত রাখে। পাশে মানকচু পাতার উপর মাটি দিয়া শোয়া অবস্থায় একটা স্ত্রী-মুষ্টি তৈয়ার করে এবং ইহার নিকটে ব্রতের পূজা হইয়া থাকে। এই পূজার উপকরণ অত্যন্ত পূজার উপকরণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 'জুয়ের' উৎপন্ন চাউল, বীচি কলা, সাপলা, ডেট, কাঁচা তেঁতুল, খেসারি ডাল ও নারিকেল দিয়া পূজার নৈবেদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, অর্থাৎ, হালের উৎপন্ন দ্রব্যাদি পূজায় দেওয়া হয় না। এই ব্রতে যমের

পূজা হয়, * এবং পুকুরটাকে যম পুকুর বলে। পূজার অন্ত্রে ত্রিভীণ্য আপন আপন খাণ্ডীর তৃষ্ণার জন্ত খটিতে করিয়া যম পুকুরে জল ঢালিয়া দেয়। সে সময় পুকুরটাতে দুই একটা পানা ও ছাডিয়া দিয়া থাকে। জল ঢালা শেষ হইলে কচু পাতার উপর যে মুষ্টিটা তৈয়ার করা হয় সেইটার দিকে পেছন করিয়া এক জন স্ত্রীলোক বা হাতে দুই পায়ের মধ্য দিয়া দাঁয়ের তিন আঘাতে মুষ্টিটাকে কাটিয়া ফেলে।

ব্রতের কথা।

এক সওদাগরের এক পুত্র। অনেক দিন সওদাগরের স্ত্রী মারা গিয়াছে। পুত্র-বধূ গাড়ে ব্রত করে। ব্রতের দিন ঘর বাড়ী ধোয়, পরিষ্কার করে, সমস্ত বাড়ীতে গোবর ছড়া দেয়, নিয়ম মত ব্রতের পূজা দেয়, হালের কোন জিনিষ ও জালের ধরা মাছ খায় না।

এক দিন একটা তেঁতুল গাছের উপর হইতে নানা অলঙ্কার পরা একটা সুন্দরী কন্যা সওদাগরকে ডাকিয়া বলিল, "সওদাগর তুমি আমাকে বিয়া কর।"

বাড়ী আসিয়া সওদাগর পুত্র-বধূকে বলিল, "আমি কাইল আই বিয়া কইরাম। যাইয়া আমি নিজে দেখছি। কাইল আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি। কিন্তু তোমার একটা কাজ করতে আইব। কাইল তুমি ঘর বাড়ী কোর্তা পার্তা না, গোবর ছিড়া দিতা পার্তা না, জালের জিনিষ ও জালের মাছ খাইবা।" পুত্রবধূ বুঝিল অলঙ্কার কটারই এই কাজ, কিন্তু প্রকাশে বলিল, "আইজা।"

পরদিন সওদাগর জালে ধরা একটা প্রকাণ্ড রুই মাছ আনিয়া বলিল, "মা, তোমার কিন্তু আমার পাত (অ) বৈয়া খাইতে আইব।" এদিকে বোঁ খুব সকালে উঠিয়া ঘর বাড়ী পরিষ্কার করিল, গোবর ছড়া দিল, ঘরের এক কোণে ধূপ ও প্রদীপ জালাইল। পরে সময় মত অল্প এক বাড়ীতে গাড়ে ব্রতের পূজার দ্রব্যাদি

* যম ককবর্ণ বিজ্ঞান মহিষোপরি সংস্থাপিত চর্ক-চাপ-দণ্ডধরং অভয়ং ভক্তবৎসলং।

অধিক সাবধানতার আবশ্যক। এই সব সময়ে মস্তকে ঠাণ্ডা লাগাইলে ভাল হয়। সূর্যের আলোক ব্যতীত বৈজ্যতিক আলোও উহারই প্রকার ভেদে রঙ্গন আলো প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ ব্যাধিতে নানারূপ প্রয়োগে বিবিধ চিকিৎসা হইয়া থাকে। উহার বিস্তৃত আলোচনার সময় আজ হইবে না।

সূর্যাকিরণ স্নায়ুগুলীকে উত্তেজিত করে, এবং ইহা স্নায়ুর বলকারক। সৌরস্নান স্নায়বিক ব্যাধিতে উপকার করে। যে সমুদায় স্থানে আলোক ও বায়ু প্রবেশ করে, সে সব স্থানে মশার উপজব অতিশয় কম, সুতরাং আজ-কালকার ধারণা অনুসারে ম্যালেরিয়া হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

উপরোক্ত সমুদায় কারণ হইতে দেখা যাইতেছে, বায়ু ও আলোক আমাদের কিরূপ উপকারী! যাহাতে আমরা উহা অপর্ণাঙ্গ পরিমাণে পাই, সর্বদা তাহার চেষ্টা করা উচিত। রাত্রে কখনও সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করা উচিত নহে; অন্ততঃ পক্ষে ২১টিও খোলা রাখা সম্ভব।

যে দিন সন্ধ্যার পূর্বে বাহির না হওয়া যায়, সে দিনটা কি বিশ্রী লাগে, সন্ধ্যা কালে এক বার বায়ু সেকন করিয়া আসিলে মনটা কি প্রসন্ন হয়, প্রভাত ও সন্ধ্যা সমীরণ অতি পবিত্র। সব স্থানের সব হাওয়া সব সময়ে ভাল নহে কলিকাতার বসন্ত কালের দক্ষিণ হাওয়া অতি মধুর ও সুখস্পর্শ, কিন্তু শীতকালের উত্তরে হাওয়া কি কনকনে ও ব্যাধি-উৎপাদক। মধুপুর, গিরিধি, বৈষ্ণবনাথ প্রভৃতি স্থানের পশ্চিমে হাওয়া ফাঙ্কন মাসে অতি স্বাস্থ্যকর। অনেক স্থানের প্রবল হাওয়া ধারাপ। এইরূপ স্থান-বিশেষে ও ঋতুভেদে বায়ুর গুণের প্রভেদ হয়। খুব বেশী জোরে যে হাওয়া দেয়, তাহা ভাল নয়, জোয়ারে হাওয়াগুলি অত্যন্ত ধারাপ,—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গরমের সময়ে ‘মু’ নামে অত্যন্ত গরম হাওয়া দেয়, তাহাতে নানারূপ ব্যাধি উৎপাদিত হয়। এই সব বিষয়ে আমাদের দেশে এখনও সম্যক অনুসন্ধান হয় নাই। নানা স্থানের

বায়ুর অবস্থা ঋতুভেদে ও গতিভেদে তাহাদের গুণাগুণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় জানা একান্ত আবশ্যক। কোথায় নিকটে গঙ্গারী ফুল ফুটিয়া বায়ু দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর করে, কোথায় চন্দনের গন্ধে দিক সকল আমোদিত হয়, কোথায় “জাইল” গাছের হাওয়ার কয় রোগীকে নবজীবন দেয়, কোথায় ইউক্যালিপ্টাস (Eucalyptus) গাছ সকল ম্যালেরিয়া বারণে সাহায্য করে (By improving drainage), এ সব বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। আপনারা সকলেই ক্ষয়রোগে স্যানাটোরিয়াম (Sanatorium) বা বায়ু সহযোগে চিকিৎসা (Open air treatment) কপা শুনিয়াছেন; বায়ু কি আশাধ্যই সাধন করিতেছে। কত যুগ্ম ব্যক্তির প্রাণ দান করিতেছে। ডাক্তারেরা নানাপ্রকার ব্যাধিতেই বায়ু পরিবর্তনের উপদেশ দিয়া থাকেন। সহরের বাহিরের বায়ু কি নিষ্ফল! যাহারা গ্রামের বিস্তৃত বায়ু সেবনে অভ্যস্ত তাহারা সহরে আসিলে ইঁপাইয়া পড়েন। এখানকার বায়ু তাহাদের নিকট যেন বিষতুল্য। আমরা সহরে জড় হইয়া শুধু সহরের রোগ বৃদ্ধি করিতেছি। বায়ু চলাচলের পথ নাই। বাড়ীর গায়ে বাড়ী, রোজ আগমনের পথ নাই। স্নাতস্নাতে ঘরের মধ্যে দিন রাত বাস; লোকে যে একবার প্রকৃতির উষ্ণ বকে দাঁড়াইয়া তাহার মোহন ছবি দেখিয়া সর্বজালা বাখ্যা দূর করিবে তাহার উপায় নাই। ইহার ফলে কি হইতেছে? আমরা বায়ুর হাত হইতে মুক্তি পাইতেছি না। সমস্ত জাতিগুহ দুর্ভাগ হইতেছি ও দিন দিন ক্রমে অক্ষয় হইতেছি। দরিদ্রতা জাতির মজ্জা মজ্জায় ঢুকিতেছে।

এখনও সাবধান হইলে উপায় আছে। সহরকে গ্রামের মত করিয়া নির্মাণ করিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহে যাহাতে আলোক ও বায়ু আসিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যেক বাড়ীতে খানিকটা খালি জায়গা রাখিতে হইবে। যাহাতে বাড়ীর গায়ে বাড়ী না উঠে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রাস্তা-ঘাটগুলিকে সোজা ও প্রশস্ত করিয়া নির্মাণ করিতে

চক্ষুর মধ্যে রেটিনা নামক একটি দ্রাব্যের আবরণ আছে। উহার উপর আলোক পতিত হইলে দর্শনশক্তির উদ্ভব হয়। সুতরাং আলোকের সাহায্য ব্যতীত আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম না।

আলোকের তিনটি প্রধান গুণ—ইহা (১) আলো দান করে (২) উত্তাপ দেয় ও (৩) ইহার পভাবে নানারূপ রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়।

আলোক জগতের আঁধার দূর করে, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি দেয় এবং প্রাণের সকল ভয় দূর করিয়া জীবকে অভয় দান করে। এই তাপ দ্বারা সৃষ্টি পালিত হয়, এই তাপের অভাব হইলে আমরা বাঁচি না, তাপই আমাদের জীবনীশক্তি। গাছ-পালাগুলি যেমন আলোক না পাইলে নির্জীব হয়, ফাফাসে হয়, বর্ধিত হয় না, আস্তে আস্তে শুকাইয়া পান পর্যন্ত যায়, আমাদের অবস্থাও তাহাই। আলোক বিহনে আমরা ক্ষুধি-হীন, হীনমূল ও নির্জীব হই, একটা অবসাদের ভাব আসে, দেহের পুষ্টি হয় না এবং ক্রমে রক্তশূন্য হইয়া প্রাণ বাহ্যিক উপক্রম হয়। গাছগুলি রোদের অভাবে বাঁচে না, কিন্তু অত্যন্ত প্রখর রোদ হইলে আবার শুকাইয়া যায়। মানুষের পক্ষেও প্রখর আলো অহিতকর। সূর্যের আলোক ও বৈজাতিক আলোক প্রায় একই উপদানে গঠিত। দুটা রক্ত মিলিয়া সূর্যের আলো শাদা হইয়াছে। হলুদের কাছাকাছিগুলিতে আলো দেয়, বেগুণীর কাছাকাছি গুলিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটায়, আর লালের কাছাকাছি গুলিতে উত্তাপ দেয়।

সূর্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর হইলে ও বেশী সময় রোদে থাকিলে মানুষের শরীরে অনেক সময়ে লাল চাকা দাগ উঠে (Erythematous rash), কখনও কখনও অনাবৃত স্থানগুলি পুড়িয়া লাল হয় (sun-burnt), যদি অত্যন্ত বেশী পোড়ে তবে কালোও হয়।

অধিক ক্ষণ সূর্যের দিকে চাহিয়া থাকিলে সহসা চোখে দেখা যায় না, চোখে ঘোলা দেখা যায়। চক্ষু রক্তবর্ণ হয় ও চক্ষু প্রদাহ হয়। কখনও কখনও সূর্যতেজের আধিক্যে লোক অন্ধ হয়। অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোক

সম্মুখেও এইরূপ। অধিকক্ষণ রোদে থাকিলে শিরঃপীড়া হয়, সর্দি-গর্শ্ব হইয়া কখনও বা কেহ মারাও যায় (sun-stroke).

আলোক বর্তমানে শরীরের দহন-ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত চলে প্রখাসের সহিত কার্বনিক এসিড, গ্যাস অধিক নির্গত হয়। এই আলোক দ্বারাই জগতের যত রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতেছে। কাঠ কয়লা প্রভৃতি জগতের যত কিছু পদার্থ, এমন কি আমাদের এই নবনীতকোমল দেহখানিও এই আলোকের দ্বারা পোড়া হইতেছে এবং ইহাই আলোকের রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

সূর্যের আলোক দেহের চর্মকে কার্যে উত্তেজিত করে। কিছুক্ষণ রোদে থাকিলে অত্যন্ত ঘর্ম হয়, লোমকূপের ছিদ্র-সমূহ প্রসারিত হয় এবং শরীর হইতে বহুবিধ দূষিত পদার্থ নির্গত হয়।

আলোক একটি প্রধান পচননিবারক (antiseptic) ইহা প্লেগ, যক্ষা প্রভৃতি বহুবিধ লোকক্ষয়কারী ভীষণ রোগের জীবাণু সমূহকে ধ্বংস করে। ইহা অনেক প্রকার দূষিত পদার্থকে দহন করিয়া (oxidation) বিশুদ্ধ অবস্থায় আনয়ন করে। বায়ুর মধ্যে যে বহুবিধ জাস্তব পদার্থ থাকে, আলোক এই উপায়েই তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়া বায়ুকে পবিত্র ও নিষ্কল করে।

সুতরাং বাহাতে বাড়ীর প্রত্যেক স্থানে সূর্যাকিরণ যায়, সে বিষয়ে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। সূর্যালোক যে আমাদের সকলকে কত ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি দেয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সৌর স্থান (Sun-bath) — আজকাল অনেক প্রকার ব্যাধিতে সৌরস্থানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। চর্ম-রোগে, দুর্বলতায়, রক্তশূন্যতায়, ক্ষয়ে এবং অত্যন্ত অনেক রোগে ইহাতে বেশ উপকার দর্শে। তবে, সাবধানতার একান্ত আবশ্যক। কোন রোগেই রোগীকে বেশীক্ষণ রোদে রাখা সঙ্গত নহে। সকাল বেলা ও অন্তিম সূর্যের কিরণই ভাল। দু'প্রহরের প্রখর রোদের সময় গাছের ছায়ায় থাকিলেই চলে। হৃদরোগের রোগীকে সৌরস্থান দিতে

নানারূপে প্রত্যাহত হয়। গৃহে, বাতীতে, বৃক্ষে, পর্দাতে, গছেরে, বায়ু নানা স্থানে বদ্ধ হইয়া সহজ ভাবে চলিতে পারে না, কিন্তু উপরে কোনও প্রতিবন্ধক নাই, কাজেই সেখানে অব্যাহত গতি। ঠাণ্ডা ও বাতাস লাগিয়া নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি হইবার অত্যন্ত ভয়, সুতরাং গরম কাপড় জামা প্রভৃতি দ্বারা সর্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া অতি সাবধানে থাকা কর্তব্য। যে সকল প্রাণী দ্বারা সংক্রামক ব্যাধি বিস্তৃত হয়, তাহাদের অধিকাংশই অতি উচ্চ প্রাণ ধারণে অক্ষম, সুতরাং উচ্চ স্থানে ব্যাধি অত্যন্ত কম।

যে সকল লোক অত্যধিক বায়ুর চাপে থাকে, তাহারা ইঠাং কম চাপের বায়ুতে আসিলে ব্যাধিগ্রস্ত হয়।

সমুদ্রের তলদেশে বা খনি প্রভৃতিতে কার্য্য করিবার জন্য বাহাদিগকে নিয়ে যাইতে হয়, তাহাদিগকে অধিকক্ষণ নীচে থাকিতে হইবে বলিয়া তাহারা বাহাতে তথায় বায়ু পাইতে পারে সেই জন্য বায়ুকে অধিক চাপে লোহার চোঙ্গে (cylinder) ভরিয়া তাহাদের সহিত নামাইয়া দেওয়া হয় তাহারা উহার ভিতরে থাকিয়া কার্য্য করে। উহার ভিতরে চারি দিকে সমান চাপ থাকতে চাপ অধিক হওয়ারও কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু যেই উপরে আসিয়া বাহিরে আসে, অমনি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। বার বার এইরূপ অধিক চাপ হইতে অল্প চাপের বায়ুতে যাতায়াত করিতে করিতে তাহাদের এক ব্যাধি হয়, বাহার লক্ষণ পেটে বেদনা, বমি, শ্বাসরোধ ও পা অবশ হইয়া যাওয়া (Paraplegia) মাথা ঘোরা ও ইঠাং অজ্ঞান হইয়া মৃত্যু। ইহাকে ডাইভারস্ পলসি (Diver's Palsy or Caisson's Disease) বলে।

বায়ুকে গরম করিয়া অনেক ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় এবং সময় সময় ইহাতে বেশ উপকারও দেখা যায়। ব্যাধি বিশেষে কখনও সর্বাঙ্গে, কখনও অংশবিশেষে, বায়ু কখনও বেশী গরম কখনও অল্প গরম ভাবে ব্যবহৃত হয়। বায়ুকে ১৪৮০ সেটিগ্রেড পর্য্যন্ত গরম করিয়া ব্যবহৃত করা হইয়াছে এবং তাহাতেও কোন কুফল হয় নাই। এইরূপ চিকিৎসার সময়ে মাথার ঠাণ্ডা দিতে হয়। দ্বারবিক ব্যাধিতেই ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আলোক

জার্মানীর সুপ্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক গেটে (Goethe) মৃত্যুর সময়েও বলিয়াছিলেন, "more light," ইহাই তাহার শেষ কথা, বাস্তবিক আলোক আকাজ্ঞার বিষয়।

আলোক মনকে অতিশয় প্রভুত্ব করে। ঘোর অন্ধকার রজনী কি ভয়ানক; ভয়ে শরীর কাঁপিয়া উঠে, মনে ক্ষুধি নাই, আর প্রভাত হইলে কি পরিবর্তন, সূর্য্য কিরণের সাথে সাথে সমস্ত জদয় নাচিয়া উঠে, সমস্ত প্রকৃতি নব বসন পরিয়া সূর্য্যের স্তুতি আরম্ভ করে। আঁধার রজনীতে একটি ক্ষুদ্র মৃৎ প্রদীপও কি হৃৎকের, জদয়ে কত বল আনে—প্রিয় জনের মুখখানি দেখিয়া কত সুখী হইতে দেয়। চন্দ্রকরদীপ্ত রজনী কি সুন্দর! আকাশে শত শত তারা ফুটিয়া রহিয়াছে—যেন রাশি রাশি মুকুতার হার, চন্দ্রের কি স্নিগ্ধ হাসি—কি ভুবন-মোহন রূপ,—কে এমন হতভাগা আছে, পূর্ণিমা নিশিগে নিশারাজের অপকূপ রূপ দেখিয়া যে মোহিত হয় না—তাহার নয়ন মন তৃপ্ত হয় না, দৌলখ্যা পিপাসা মিটে না! দিবা হু'প্রহরে যদি কচিং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, সমস্ত জগৎকে যেন বিবাদ-কালিমা ঢালিয়া দেয়, মনে একটু ক্ষুধি নাই—কোথা হইতে যেন একটা অবসাদ নামিয়া আসে—আবার সেই মেঘখানা সরিয়া যায়, আনন্দ ফিরিয়া আসে, প্রাণে নবক্ষুধি জাগরিত হয়—সত্য সত্যই আলোক জগতের আনন্দ ও তেজস্বরূপ, আলোক ভিন্ন সৃষ্টি চলে না—আলোক হইতেই আমাদের এই জগতের বিকাশ। আমরা আলোক সচরাচর সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদি হইতে পাই। ইহা ভিন্ন তড়িৎ সাহায্যেও আলোক উৎপন্ন হয়, রাসায়নিক সম্মিলনেও আলোক উৎপন্ন হয়,—যগা, কাঠ, করলা, বাতি ইত্যাদির আলো। জিনিস অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলেও আলো বিকীরণ করে, যেমন লোহাকে অধিক উত্তাপ দিলে আলো দেয়। বর্ষণ দ্বারাও আলোক উৎপন্ন হয়, যথা দুইখানি গ্রস্তরের ঘর্ষণে। ইহা ভিন্ন কতকগুলি জীব ও উদ্ভিদ স্বভাবতঃই তাহাদের শরীর হইতে আলো দেয়, যথা খড়োৎ, সঁজুজাত কোনও কোনও কীটাপু ও কোন কোন গাছ ইত্যাদি।

সঞ্চালিত হয় উহাকে কৃত্রিম উপায় বলা যাউতে পারে।

এ সম্বন্ধে আজ বিস্তারিত বলার সময় হইবে না।

বিশুদ্ধ বায়ুর লোকের স্বাভাবিক অবস্থায়ই যখন বায়ুর প্রয়োজনীয়তা এত প্রয়োজন, তখন রোগীর পক্ষে যে উহা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার মধ্যে ভুল নাই। বিশুদ্ধ বায়ুতে ধূলিকণা থাকে না, জীবাণু থাকে না ও কোনরূপ দূষিত পদার্থও থাকে না। পবিত্র বায়ু কি সুখকর! শীতল ও মধুর স্পর্শে অতি যে মুমূর্ষু ব্যক্তি, সেও যেন প্রাণ পায়। ইহা শরীরের সর্ব জালা দূর করে, স্বাভাবিক উত্তেজনা বারণ করে, সমস্ত শরীরে একটা শীতল মোহকর শান্তি ঢালিয়া দেয়। এমন বায়ুতে কাহার না বাহির হইতে ইচ্ছা হয়—এমন বায়ু সেবনে কাহার জীবন না দীর্ঘায় হয়! কবি সত্যাই বলিয়াছেন—

'Air, Air, fresh life blood, thin and searching air,
The clear dear breath of God that loveth us.'

পবিত্র বায়ু সত্যই ঈশ্বরের একটি শ্রেষ্ঠ দান তাই বাইবেলেও দেখিতে পাউ,—

And the Lord God breathed into his nostrils the breath of life (Genes. ii 7).

আমাদের দেশের মুনি ঋষিরাও তাই বায়ুকে ঈশ্বররূপে পূজা করিতেন এবং উহাকে প্রাণরূপে সন্ধান করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেন। আজকাল বিশুদ্ধ বায়ুর উপকার উপলব্ধি হইতেছে, এবং কি হৃৎ অবস্থায় কি ব্যারামে, ইহার বহু পরিমাণ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। কয় (phthisis) বলিয়া যে সাংঘাতিক ব্যাধি আছে—যাহার কবলে পড়িলে মানুষ বাচে না বলিয়া এতদিন ধারণা ছিল, আজ এই বিশুদ্ধ বায়ুর প্রভাবে অনেকেই তাহা হইতে মুক্তি পাইতেছেন। যে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি ব্যারামে পূর্বে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে কখনও দয়ঙ্গা খোলা হইত না, আজ সেই সব রোগী পূর্ণমাত্রায় বায়ু ভোগ করিয়া রোগমুক্ত হইতেছে।

বায়ু আমাদের এই ঘরের ভিতর হইতেই গৃহীত বা ১০০০০ হাজার ফিট উচ্চ স্থান হইতেই নেওয়া হউক বা মহাসমুদ্রের মধ্যপ্রদেশ হইতেই নেওয়া যাউক, সর্বস্থানেই উহার একইরূপ সংমিশ্রণ ও বিশ্লেষণে প্রায় একই প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ মাত্র। বায়ু বর্ণহীন ও গন্ধহীন। বায়ুর ওজন আছে। এই ওজনের জন্ত যে চাপ, (Pressure), পৃথিবীর নিয়মিত ও পর্বতের শিখরদেশে তাহার কিছু তারতম্য দেখা যায়। উপরের চাপ কম। আমাদের এই স্থান হইতে হঠাৎ যদি কোন লোক ১০০০০ ফিট উপরে যায় তাকে তাহার অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হইবে—কৃদা কম হইবে ও নাক 'মুখ হইতে রক্ত বাহির হইবে; ক্রমে মাথা ঘুরিতে থাকিবে মাংসপেশীসমূহ কার্যে অক্ষম হইবে। সুতরাং কাহাকেও নিম্নভূমি হইতে খুব উচ্চ ভূমিতে পাঠাইতে বিবেচনা পূর্বক পাঠান সঙ্গত। যদি অন্ন অন্ন করিয়া ক্রমে সহ্য করিয়া উপরে উঠা যায়, তবে কোন কষ্ট হয় না। যাহাদের ফুস্‌ফুস ও হৃদপিণ্ড অত্যন্ত দুর্বল, তাহারা হঠাৎ একপ উপরের ও নিম্নের বায়ুর উচ্চ স্থানে গেলে সমুদ্র বিপদের প্রভেদ সম্ভাবনা। বায়ুর উচ্চ স্তরে অক্সিজেনের ভাগ একটু কম দেখা যায় এবং সেই কারণে নিশ্বাস ঘন ঘন টানিতে হয়। নিশ্বাস ঘন ঘন টানিতে হইলেই বলবান ফুস্‌ফুসের প্রয়োজন। হৃদপিণ্ডও অত্যন্ত সবল পাকা প্রয়োজন। কারণ, নিশ্বাস ঘন ঘন টানার দরুন হৃদপিণ্ডেরও ফুস্‌ফুসে ঘন ঘন রক্ত যোগাইতে হয়। এই একই কারণ হইতেই হিসাব করিয়া ক্রমে ক্রমে উচ্চ ভূমিতে অধিরোহণ করিলে দুর্বল হৃদপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস ক্রমে সবল হইতে পারে। অধিক উচ্চ ভূমিতে গেলে নাড়ীর গতি বৃদ্ধি হয়—ফুস্‌ফুসের ক্রিয়াও বেশী হওয়াতে ভাল চলে। বায়ুর উচ্চ স্তরে অত্যন্ত শীতল, সুতরাং রক্তহীন বা অত্যন্ত দুর্বল ব্যক্তির হঠাৎ সে স্থানে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। বায়ুর গতিও নিয়মিত হইতে উচ্চ অধিক। নিম্নে বায়ু

চৈত্র ১৩১৯

জানো! তুমি হৃদয়তত্ত্বানভিজ্ঞ বলেই আমার সন্দেহ ছিল, এখন বুঝলাম তা না! এই ব্যাপার যেন তোমায় আমার বেশী নিকটস্থ করে দিল এমনি আমায় মনে হচ্ছে— আমি চিনেছি। এখন তোমায় ভালবাসা আমার পক্ষে খুব সহজ বলে মনে হচ্ছে; আমি তোমায় এখন ভালবাসতে পারি এবং আমার সে ভালবাসাকে তুমিও কিছুদিন পরে একটু প্রকার চক্ষেও দেখতে পারবে না! আমায় ভাল না বাসলেও আমার সে ভালবাসাকে—বলিতে বলিতে অস্‌রা আবার হুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন। প্রিন্স লাডউইক কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া গভীর স্বরে বলিলেন, “আমি তোমায় আজীবন চির বিখস্ততার সঙ্গে সেবা করব এবং পর জগৎ ছাড়া এ জগতের যাবতীয় জীবলোকের মধ্যে তুমিই আমার সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ এবং প্রিয়তমা হ’য়ে থাকবে।”

অনেকক্ষণ পরে অস্‌রা মুহু স্বরে বলিলেন; “এইই তবে আমার বথেষ্ট।” বলার সঙ্গে সঙ্গে সনিশ্বাসে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, প্রিন্সের হাত ধরিয়া মৃত্যুর কক্ষে গিয়া দেখিলেন লর্ড বিশপ তাহার মস্তকের নিকটে বসিয়া তখনো প্রার্থনা করিতেছেন। অস্‌রা ধীরে ধীরে সেই মৃত মুখে চুশন করিয়া বলিলেন, “হাঁ তুমি চিরদিনই আমাদের মধ্যে এই রকম ভাবে শুয়ে থাকবে।”

লাডউইক আবার সেইখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মৃত্যুর বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইলেন। অস্‌রা সেখানে হইতে সরিয়া আসিয়া দ্বারের উপর শরীরের ভর রাখিয়া অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

বাড়ব কুণ্ড *

এ নহে পর্বত গুহা—হৃদয়-কন্দর।

উৎসারিত বারি তা’র অমৃত নিব্বার!

সেই সুখা—সেই জল আবরিয়া হায়,

জলিছে প্রবল বহি প্রচণ্ড শিখায়!

* চট্টগ্রামের অন্তর্গত এসিক কুণ্ড।

মিয়ত অনল লিপ্ত উদ্বেল, অস্থির

তবু অল্পপম, দিব্য, স্নিগ্ধ সেই নীর!

—নিভৃত এ মহাতীর্থে করি’ শুভ স্নান

সমাহিত কর চিত্ত ওহে পূণ্যবান!

শ্রীঅনাথবন্ধু সেন।

আলোক ও বায়ু এবং স্বাস্থ্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের প্রাণস্বাসের দরুণ, প্রত্যেক বার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার দরুণ, ঘরে আলো জ্বালার দরুণ, শত শত কল কারখানার দ্বারা, গাছ ও নানাবিধ জীব জন্তু পচিয়া বায়ু বহু প্রকারে সর্বদাই দূষিত হইতেছে। বায়ু যদি ক্রমেই এবং বিধ প্রকারে দূষিত হইতে থাকে তবে প্রশ্ন এই যে, আমাদের উপায় কি? বায়ুর একটি ধর্ম এই যে, ঠাণ্ডা ও গরমে উহার আকর্ষণ হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। বায়ুর ধর্ম বায়ুকে যদি উত্তপ্ত করা যায় তবে উহা ক্রমেই আয়তনে বৃদ্ধি হইয়া লঘু হয় ও উপরি ভাগে উঠিয়া যায় এবং যে স্থানে ঐ উত্তপ্ত বায়ু ছিল তথায় পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে স্বাভাবিক বায়ু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। বায়ুকে ঠাণ্ডা করিয়া ও অত্যধিক চাপ দিয়া আয়তনে সঙ্কুচিত করা যায়, এমন কি উঠাকে তরল অবস্থায় পর্য্যন্ত আনা যায়। এই যে বায়ুর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন, ইহাকে বায়ু সঞ্চালন (ventilation) বলা যাইতে পারে। এই দরুন ঘরে

বায়ু আমরা অনেকটী লোক আছি আমাদের প্রাণস্বাসে সঞ্চালন বায়ু যেমন দূষিত হইতেছে উহার উষ্ণতার দরুণ সেইরূপ আয়তনে বৃদ্ধি হইয়া লঘু হইয়া পড়িতেছে এবং উপরে উঠিতেছে এবং উপরের ফাঁক প্রভৃতি দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে এবং ঐ স্থান পূরণের জন্য নিয়মিত দিয়া পুনরায় বিস্তৃত বায়ু আসিতেছে ও আমাদের জীবন রক্ষার সহায়তা করিতেছে। বায়ুর এই সংমিশ্রণ ও গমনাগমন

বা বেগ যদি না থাকিত তবে আমাদের কি দুর্দশাই না ঘটত! এই গমনাগমন বন্ধ করিলে অন্নকণের মধ্যেই আমাদের প্রাণাস জনিত দূষিত পদার্থে ঘর পরিপূর্ণ হইবে। এই বন্ধ বায়ু হইতে আমরা সকলেই প্রাণরক্ষার নিমিত্ত অক্সিজেন, নিতে থাকিব এবং আমাদের প্রাণ স্বরূপ যে অক্সিজেন তাহা ক্রমেই লোপ পাইতে থাকিবে। ওঁদিকে কার্বনিক এসিড গ্যাস বায়ুতে জমিতে থাকিবে এবং নিশ্বাসের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিয়া অক্সিজেন গ্রহণে অক্ষমতা জন্মাইবে। অন্নকণের মধ্যেই আমাদের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইবে—ঘন ঘন শ্বাস লটতে হইবে, শিরঃপীড়া হইবে, মাথা ঘুরিতে থাকিবে এবং জীবন-সংগ্রামে যাহারা দুর্বল, তাহারা ক্রমেই নিস্তেজ হইতে থাকিবেন, ক্রমে সংজ্ঞা লোপ হইবে ও অবশেষে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিবে। যাহারা বলবান অর্থাৎ যাহাদের ফুসফুসের বল অধিক—যাহাদের বায়ুগ্রহণের ক্ষমতা অধিক—তাহারা আরও কিছুকাল প্রাণ লইয়া টানাটানি করিবেন, কিন্তু উপায় নাই, তাহাদিগকেও দুর্বলদিগের অবস্থারই পড়িতে হইবে, সুতরাং মৃত্যু অনিবার্য।

বায়ু সঞ্চালনের বায়ু এই মৃত্যু হইতে আমাদের আবশ্যকতা। জীবন রক্ষা করে এবং সেই জন্তই গৃহে, স্কুলে, আফিসে, কারখানাসমূহে খনিতে, বড়তা গৃহে, রঙ্গালয়ে এবং যে সকল স্থানে বহুলোক একত্রিত হয়, তথায় বায়ু চলাচলের এত আবশ্যকতা। এই জন্তই দরজা জানালা প্রভৃতি রাখা হয় ও নানারূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে বায়ু গমনাগমনের পথ নিশ্চিত হয়। আমাদের স্কুল, কলেজগুলিতে, শিল্পশালায়, কারখানাসমূহে, আফিসে, রঙ্গালয়ে—সর্ববিধেই এ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কঠিন, নতুবা জাতি ক্রমে হীনবল ও নিষ্কর্জীব হইয়া পড়িবে।

বায়ু ভিন্ন স্থানের দূষিত পদার্থ বহন করিয়া আনিয়া যে নানারূপ ব্যাধি জন্মায়, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে; সুতরাং যে সব স্থানে সংক্রামক ব্যাধি হয়, সে সব স্থানে অত্যন্ত সাবধানে থাকা প্রয়োজন।

বায়ু দূষিত পদার্থ দ্বারা যে অপকার করে তাহা

হইতে দূষিত পদার্থকে তরল করিয়া (dilution) অধিক উপকার করে। এই মনে করুন, ঘরে একটা পচা দুর্গন্ধ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু কিছুকাল পরে তাহা আর নাই, সত্য সত্যই উহা উড়িয়া গিয়াছে—বায়ু তাহার সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া ইহাকে তাহার বিপুল বক্ষে লইয়াছে এবং এখন কোথায় যে তাহাকে লুকাইয়াছে তাহা আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং বায়ু সঞ্চালনের প্রয়োজন অত্যধিক। আমরা যে প্রতিবার শ্বাস লই ও প্রাণাস ত্যাগ করি (আমরা মিনিটে প্রায় ১৮।২০ বার নিশ্বাস লইয়া থাকি) ইহাতে কতখানি বায়ু এবং কোন কোন পদার্থ গ্রহণ করি এবং কি কি পদার্থ ত্যাগ করি, সে সমস্ত হিসাব করা হইয়াছে। ঘরে যে আলো জলে তাহাতে যে বায়ু দূষিত হয় (ইলেক্ট্রিক আলো ভিন্ন) তাহারও হিসাব করা হইয়াছে এবং সমস্ত পরিমাণ দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য ঘণ্টায় ১০০০ কিউবিক ফিট বায়ুর আবশ্যক, কিন্তু প্রত্যেকের জন্য এত স্থান পাওয়া সহজ কথা নহে। ৩৫০ কিউবিক ফিট বায়ু ঘণ্টায় তিন বার পরিবর্তিত হইলে চলিতে পারে। ৩৫০ কিউবিক ফিট বায়ুর জন্য একটা ৫'×৭'×১০' ফিট স্থানের আবশ্যক। সুতরাং স্থান যতই সঙ্কীর্ণ হইবে বায়ুও ততই বেশী বার পরিবর্তনের আবশ্যক হইবে। প্রতি সৈন্দের জন্য প্রায় ৬০০ কিউবিক ফিট বায়ু দেওয়া হয়। কারখানা সমূহে জন প্রতি সাধারণতঃ ২৫০ কিউবিক ফিট করিয়া দেওয়া হয়। হাসপাতালে রোগীর প্রাণাসজনিত দূষিত পদার্থে ও দ্রব্য প্রভৃতি চক্ষু ও বায়িক দূষিত পদার্থে বায়ু স্বভাবতঃই অধিক দূষিত; সুতরাং তথায় প্রত্যেকের জন্য প্রায় ১৫০০ কিউবিক ফিট দেওয়া হয়। যে সব স্থান সঙ্কীর্ণ তথায় স্বাভাবিক বা কৃত্রিম উপায়ে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। বাতাসের স্বভাবতঃই একটা বেগ আছে—দরজা খোলা থাকিলে বায়ু স্বাভাবিক নিয়মে পরিবর্তিত হয়—আর বৈজ্ঞানিক পাখা প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে যে বায়ু

“কুমারি, এঁর নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করবেন না! জীবনে যে দিন প্রথম ভালবাসা নাম কানে শুনেছিলাম এবং ভালবাসা কি বুঝিতে শিখেছিলাম সেই দিন হতেই আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি। এঁকে পাবার জন্য আমি জীবনের সমস্ত সম্পদ সম্মান সিংহাসন সমস্তই ত্যাগ করতে পারতাম, কিন্তু তবুও এঁকে পাবার উপায় ছিল না! যে দিন আমাদের দুজনের প্রথম পরিচয় প্রথম সাক্ষাৎ হয় ‘প্রাণাধিকা’ আমার সে কথা তোমার মনে পড়ে কি এখনো?” লাড্‌উইক বালিকার হস্তটি কোমল ভাবে এক বার নাড়িয়া দিলেন—“সেই দিন হতেই আমি জানলাম যে আমার এবং আমার সমস্ত অন্তরাব্রা তার—কিন্তু তার বেশী আর কিছু পাবনা আমরা। কুমারি, আপনি আমার এক দিন প্রশ্ন করেছিলেন ভালবাসা কাকে বলে? আজ আমি আপনার সে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি—এরই নাম ভালবাসা। তবুও আমার পিতৃ-নিদেশে বন্ধ হয়ে স্ট্রেলস্‌র আসতে হয়েছে এবং এ-ও সেই হতে ভগবানের কাছে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছে।”

অস্‌রা কোচের উপর বাহ রক্ষা করিয়া বালিকার দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া বসিলেন, মুহূর্ত্তে আবার প্রশ্ন করিলেন, “এখানে এ আজ কি করে এসেছিল তবে?”

“সে আজ এখানে”—কিন্তু সহসা প্রিন্স সবিম্বয়ে নিজের বক্তব্য অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়া বালিকার মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সেস্‌ও তাহার মস্তকের উপরে মুখ লইয়া গেলেন। যাহাকে মৃত্যুর ক্রোড়গত বলিয়াই এতক্ষণ সকলের সন্দেহ হইতেছিল সেই ব্যক্তি ধীরে ধীরে সেই বিগত নীল অধরোষ্ঠ মুহূর্ত্তে কল্পিত করিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতে লাগিল—

“উনি রাজকুমার, রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী। আমি ওর পদস্পর্শেরও উপযুক্তা নই; তাই ভগবান ওঁকে আমার দিলেন না। উনি এখানে চলে এলে আমি ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম; কিন্তু হায়, তবুও আমি তাঁর অদর্শন সহ্য করতে পারলাম না; পীড়িত হয়ে পড়লাম। আমি বরাবরই রুগ্ন ও দুর্বল

ছিলাম। আস্তে আস্তে আমি কুমারী ব্রত নিয়ে কনভেন্টে যাব স্থির ছিল কিন্তু আর একবার কুমারকে না দেখে আমি পারলাম না; সেই শেষ দেখা দেখবার জন্য আজ আমি এসেছিলাম। আমি আর এক বারও এসে দেখে-গিয়াছি, ভগবান আমার এ অপরাধ মার্জনা করুন। কিন্তু জেনো; যেচ্ছায় আমি এ পাপ করি নি! এই মৃত্যুর চেয়েও বেশী কষ্ট পেয়েছি, কিছুতেই কোন মতেই একে না দেখে থাকতে পারি নি, তাই আমি এসেছি। রাজকুমারি, আজ আপনাকে ও আপনার এই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখলাম। আপনি ভালবাসা কাকে বলে জানেন নিশ্চয়?”

অস্‌রা মুখ নত করিয়া গাঢ় কণ্ঠে বলিলেন, “না” তাঁহার হস্তখানি তাঁহার ধিক্কার হস্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বালিকা আবার মুহূর্ত্তে বলিতে লাগিল—

“ইনি আমাকে অনেক সাহস দিবে প্রকৃতিস্থ করছিলেন। যদিও আমি অন্ধমুত্রে হয়ে এসেছি তবু কিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। আমাদের চিরবিদায়ের ঠিক শেষ মুহূর্ত্তেই আপনি এসে পড়লেন! হায়, কেন? কেন আমি এসেছিলাম।” বালিকা আবার চক্ৰগাঢ়ক মুহূর্ত্তে করিল। নিজের ক্ষীণ অঙ্গুলীর দ্বারা অস্‌রার হস্ত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল “আমি যাচ্ছি! আমার একটি প্রার্থনা তোমার কাছে, কুমারকে বিয়ে ক’রো।”

“না-না-না” অস্‌রা অর্দ্ধ কণ্ঠে প্রায় কাঁদিয়া উঠিয়া বালিকার মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিলেন, “না, তুমি যাঁচো, তোমার যাঁচতেই হবে। বেঁচে কুমারকে বিয়ে ক’রে স্বামী হবে।”

অস্‌রা সেই মৃত্যু-আনীল ওষ্ঠে দু’তিনটি চুষন করিলেন। বালিকার ক্ষীণ বাহুগল অতি ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া অস্‌রার কণ্ঠ বেঁটন করিয়া ধরিল। অস্‌রা তাহার শীতল নীল কপোলে কপোল সংলগ্ন করিয়া বসিয়া তাহার ক্ষীণ কণ্ঠের কণ্ঠোচ্চারিত অস্পষ্ট মুহূর্ত্তে নীরবে শুনিতে লাগিলেন। লাড্‌উইক ও বিশপ নীরবে নত মস্তকে বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে বালিকার হস্ত দুইটি অস্ফুরার কণ্ঠ হইতে স্থানিত হইয়া পড়িল। চক্ষু দুইটি ঘুরিয়া লাডউইকের পানে নিবদ্ধ হইল; প্রিন্স জ্যেষ্ঠ বালিকার নিকটবর্তী হইলেন এবং বিশপ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অস্ফুরা ধীরে ধীরে আর এক বার তাহার ওষ্ঠে চুষন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিশপের দিকে হাত বাড়াইলেন। বিশপ তাঁহার হস্ত ধরিয়া কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন এবং একখানা চেয়ারে বসাইয়া দিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বিশপ আসিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন “ভগবান সেই হুংবী আত্মাটিকে চিরবিশ্রাম দিতে মৃত্যুর যাতনাময় দীর্ঘ পথের কষ্ট আর বেশী অনুভব করালেন না। তিনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন। অস্ফুরা দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। সব কথা যেন তিনি ভাল রূপে বুঝিতেও পারিলেন না। কতক্ষণ যে এই রূপে কাটিয়া গেল ভাড়াও তিনি জানেন না। সহসা এক সময়ে চাহিয়া দেখিলেন প্রিন্স লাডউইক তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। যদিও তাঁহার মুখ অত্যন্ত শাস্ত গম্ভীর কিন্তু তথাপি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি যেন অর্ধেক বয়স অতিক্রম করিয়াছেন এই রূপ দেখাইতেছিল। অস্ফুরা উঠিয়া দাঁড়াইলেন কম্পিত দেহে সহসা লাডউইকের পায়ে কাছ বসিয়া পড়িয়া আর্ন্তকণ্ঠে কাদিয়া উঠিলেন। “ক্ষমা কর, আমার ক্ষমা কর।”

“দোষ সম্পূর্ণ আমার। আমি কেন তোমার উদার চরিত্রের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারি নি। কেন তোমার আমি নিজের জীবনের সব কথা বিশ্বাস করে বলতে পারি নি। দোষ আমারই সব—লাডউইক অস্ফুরাকে ধরিয়া তুলিতে গেলে অস্ফুরা নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন; একটু থাকিয়া ভয় স্বরে বলিলেন, “সে চলে গেছে সত্যি?”

“হ্যাঁ, সে চলে গেছে।” অস্ফুরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কণ্ঠের পরে প্রিন্স বলিতে লাগিলেন, “তার কাছেও আমি চিরবিদায় গ্রহণ করেছি এবং কুমারি! আপনার কাছেও চির বিদায় নিতে এসেছি। আপনি আমার চক্ষু হীন, হৃদয় হীন, অন্ধ, মৃত বলেই জানতেন এত দিন, কেন না আপনার হৃদয়ের ও সৌন্দর্যের

মূল্য আমি বুঝি না আপদি এত দিন এই রকমই জেনে এসেছেন। আশা করি আমার আর বেশী কৈফিয়ৎ কিছু দিতে হবে না। আপনি সৌন্দর্য্যে তার চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ তাও আমি বেশ জানি; কিন্তু বথার্থ প্রেম সৌন্দর্য্যের উপর নির্ভর করে না, বরং সৌন্দর্য্যই প্রেমের উপর নির্ভর রাখে। প্রেমে যে সৌন্দর্য্য দান করে সে সৌন্দর্য্য-শৃঙ্খল জগতের লোহদূট বাহরও অচ্ছেদ্য! স্মারি! বিদায়!”

অস্ফুরা নিগমিত চক্ষে লাডউইকের মুখের পানে চাহিয়া ছিলেন। আজ যেন প্রিন্সকে তিনি সম্পূর্ণ নুতন দেখিতে ছিলেন। তাঁহার বিশাল চক্ষে বিশাদের সঙ্গে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য অলিতেছিল যাহা বেদনার অনুশোচনার অতীত বস্তুকেই প্রকাশ করিতেছিল। বিবর্ণ পাণ্ডু মুখের উপরেও যেন কোন্ অজানিত আনন্দের আভাস তাহার সুখ-রক্তিমাক্ত তুলি বুলাইতেছিল! মুখে চক্ষে দৃঢ়তার বীরত্ব-ব্যঞ্জক দীপ্তি! জগতের কোন বস্তুতে যেন আর তার লক্ষ্য নাই! অস্ফুরা বিহ্বল ভাবে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন “এরই নাম ভালবাসা!” প্রিন্স হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। অস্ফুরার হস্ত গ্রহণ করিয়া ধীর ভাবে চুষন করিয়া বলিলেন “কুমারি! আমি তবে বিদায় হই! আমার প্রিয়তমার দেহ আমি নিজের বাড়ী নিয়ে যাব এবং সেইখানেই তার সমাধি দিয়ে চির জীবন তার জন্ত বিলাপ করব! ট্রেলসর হতেও আমি চির বিদায় নিচ্ছি!”

অস্ফুরা আবার তাঁহার পানে স্থির দৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া মূহু কণ্ঠে বলিলেন, “সে শেষ সময়ে আমার কি অস্বীকার করিয়েছে তুমি কি শোন নি? তার শেষ ইচ্ছা তুমি জান না!”

লাডউইক শাস্ত স্বরে বলিলেন, “হ্যাঁ শুনেছি জানি!”

“তবে, তুমি কি তা পারবে না?”

“কুমারি! আমার বল ধৈর্য্য তার সঙ্গে সঙ্গে সবই গিয়েছে এখন! বিশেষ আপনি তো জানলেন আমি আপনাকে ভালবাসি না!”

মূহু হাসিয়া অস্ফুরা বলিলেন, “তা; আমি অনেক দিনই জানি।” আবার তখনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “তবুও দেখলেম তুমি ভালবাসা কি তা জান, এবং ভালবাসতেও

হইতে ছিল! ধীর খোলার শব্দে প্রিন্স সচকিত হইয়া জগতের বিকল্প দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্তই যেন বালিকাকে আরও নিবিড় ভাবে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া মাথা তুলিয়া দ্বারের পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টি লজ্জা বা আতঙ্কের চিহ্নমাত্র বর্জিত। গভীর বেদনা এবং অনেকটা বিষময়িত ভাবে তিনি অস্ৰা ও তাঁহার পার্শ্ববর্তী বিশপের পানে চাহিলেন এবং পর মুহূর্ত্তে একটা হস্ত মুক্ত করিয়া ঈঙ্গিতে তাঁহাদের স্থির হইতে বলিলেন।

অস্ৰা আরও দুই পদ অগ্রসর হইয়া প্রিন্সের পানে তীব্রোচ্ছ্বাস চক্ষে চাহিলেন,—বিশপ তাঁহার হস্ত ধরিয়া নিবৃত্ত করিতে গেলে অস্ৰা বিরক্তি-ভরে তাঁহার হাত ঠেলিয়া দিলেন।

বালিকার অনিমেয় দৃষ্টি লাডউইকের পানেই নিবদ্ধ ছিল, সহসা তাঁহার ভাবান্তরে সেও মুখ ফিরাইয়া গৃহমধ্যে চাহিয়াই তীব্র ভয়ে আতর্জনাদ করিয়া প্রিন্সের বক্ষে মুখ লুকাইল, এবং তাহার ক্ষীণ দেহ এমনি কম্পিত হইতে লাগিল যে লাডউইক দুই হস্তে অতি যত্নেও তাহা ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি তখন ধীরে ধীরে বালিকার অবশ সংজ্ঞাহীন দেহ একটা কোচের উপরে শোয়াইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবা মাত্র অস্ৰা তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, “কে এ জ্বীলোকটি রাজকুমার?—নাম বলতে পারবে কি এর?—কিংবা তত্ত্ব সমাজে যাদের নান মুখে আনতে পারা যায় না এ কি তাদের মধ্যেই এক জন?”—মুহূর্ত্তে লাডউইকের মুখমণ্ডল ক্রোধে লোহিত হইয়া উঠিল। তিনি সবেগে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া অস্ৰার ওষ্ঠোচ্চারিত শব্দকে যেন তর্জনীর আঘাতে তাঁহার ওষ্ঠের উপরেই স্তব্ধ করিয়া দিতে চাহিলেন; কিন্তু অস্ৰা অগতিহত তেজে গীবা বাকাইয়া হস্তে-জ্বিতে প্রিন্সকে লক্ষ্য করিয়া বিশপকে আদেশ করিলেন—“মার এখনি ওকে,—ওকে এখনি হত্যা কর”—তাঁহার তীব্র কণ্ঠ-ধ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই বিশপের তরবারী কোব হইতে ঝঙ্ক মুক্ত হইল।

“মহাশয়,” লাডউইকের স্থির ধীর অথচ বিষাদপূর্ণ কণ্ঠের সেই উত্তেজিত গৃহের বায়ু-মণ্ডলের উপরে শ্রুশানের বাতাসের মত ভাসিয়া চলিল—“ভগবান করুন যেন আপনার হাতেই আমার মৃত্যু হয়, এবং সে মৃত্যু আমি যেন সচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু আপনার ও আমার দুজনার পক্ষেই সেই ত্রাণ বিগর্হিত মৃত্যু দেওয়া এবং নেওয়ার পূর্বে আমার একটু সময় পাওয়ার দরকার; কেন না রাজকুমারীকে আঘাত কিছু বলবার আছে। বিশপ তখনো তরবারী হইতে হস্ত সরাইতে পারেন নাট; কেন না প্রিন্সেসের উৎখত হস্ত তখনো শান্ত হইয়া স্বস্থানে নামে নাই কিন্তু সহসা মুমূর্ষুর অব্যক্ত যন্ত্রণাসূচক শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সমাজ করিয়া তুলিল। সচকিতে চাহিয়া দেখিলেন সেই সজ্জাশূভ্রা বালিকার মস্তক এবং এক থানা হস্ত কোচের বাহিরে আসিয়া ঝুলিতেছে। আবার সে সেইরূপ শব্দ করিয়া নাকি বিশপ লাফাইয়া উঠিলেন, “কি সর্বনাশ! এ যে মৃত্যু যন্ত্রণার আতর্জনাদ! ভগবান ক্ষমা কর—আমার প্রভু” বলিতে বলিতে তিনি তরবারী ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বালিকার নিকটে গিয়া হাঁটু পাতিয়া বসিলেন। বক্ষের চেন হইতে পবিত্র ক্রশ চিহ্নটি ছিঁড়িয়া লইয়া এক হস্তে তাহার চক্ষুর নিকটে ধরিলেন এবং অল্প হস্তে তাহার মস্তকটি তুলিয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে চক্ষুরাগ্নিলন করিতে অহরোধ করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তিকে মৃত্যু সমাজের অন্তর্ভুক্ত জানিয়া তাহার বিচারের জন্তই তিনি আসিয়াছিলেন সহসা তাহাকে জগতের অপর পারে ত্রাণ অন্তায় বিচার প্রার্থনার জন্ত গমনোদ্ভূত দেখিয়া তাহারই আত্মার মঙ্গলের জন্ত বিশপকে ভগবানের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিতে হইল।

প্রিন্স অস্ৰা পুনর্বীর প্রশ্ন করিলেন, “কে এ জ্বীলোকটি?”—কেবল প্রিন্স লাডউইক বালিকার পানে চাহিয়া চাহিয়া যেন নিজ মনে বলিলেন—

“ভগবান!—এ আঘাত সত্যই কি তবে মৃৎ করিতে

পারলে না?—তাকে সত্যই মেরে ফেললে এতে?”—
প্রিন্সেস মুখ ফিরাইয়া লইলেন। এ দৃশ্যে তখনো তাঁহার
মনে করুণা সঞ্চার করিতে পারে নাই নিজের ক্রোধাধি
তখনো তাঁহার মনে জলিতেছিল। যোগিনীর স্বপ্নাশুচক
মৃদু গোষ্ঠানি শব্দ এবং বিশপের প্রার্থনা-মন্ত্র কেবল
মধ্যে মধ্যে গৃহের নিশ্চলতা ভঙ্গ করিতে লাগিল।
বালিকা সহসা তাহার সেই মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন চক্ষু উন্মিলন
করিয়া প্রিন্সের পানে চাহিয়া নীরবে তাহাকে নিকটে
আসিতে দ্বিধিত কবিলে লাডউইক কোচের নিকটে
নতজানু হইয়া বসিলেন। উভয় হস্তে বালিকার শীতল
কণিহ হস্তখানি গ্রহণ করিয়া গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া
মস্তক অবনত করিলেন।

বিশপ কহিলেন, “মহাশয়! কিছুক্ষণের জন্ত একে
আমার কাছে একলা রেখে যান, আমার কর্তব্য করতে
দেন।” প্রিন্স উঠিয়া গিয়া গবাক্ষের নিকটে দাঁড়াইলেন।
অস্ৰা এক ভাবেই গৃহ মধ্যে দাঁড়াইয়া দ্বারের পানে
চাহিয়া রহিলেন, সেই অন্ধকার পথ দিয়া মৃত্যু যেন
ধীরে ধীরে সে গৃহের নিকটস্থ হইতেছে এমনি বোধ
হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার গৃহ-মধ্যে চাহিয়া
দেখিলেন লাডউইক পুনর্বার বালিকার নিকটে গিয়া
জানু পাতিয়া বসিয়াছেন এবং বালিকা তাহার ক্ষুদ্র হস্তে
প্রিন্সের হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া আছে;
তাহার মুখ এখন সম্পূর্ণ শান্ত এবং বিগতবাধ হইয়া
কেমল কুলটির মত ফুটিয়া রহিয়াছে। বিশপ ধীরে
ধীরে অন্তিম সময়োপযোগী ব্যবস্থা করিতেছেন। অস্ৰা
একবার বলিলেন, “এখানে কি ডাক্তার পাওয়া যাবে
না?” “না,” লাডউইক উত্তর দিলেন।

বিশপ ধীরে ধীরে মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। আগত
জীবনের শান্তি, আনন্দ, পবিত্রতা ও আশার কথা শুনিতে
শুনিতে সেই মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন বিবর্ণ মুখেও স্থপের হাসি
ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে শান্ত এবং নিশ্চিন্ত ভাবে
লাডউইকের স্বল্পে মস্তক রাখিয়া তাঁহার হস্তে হস্ত
দিয়া মধ্যে মধ্যে চক্ষু মুদ্রিত করিতেছিল। অস্ৰা

নির্নিমেষ চক্ষে তাহাদের চাহিয়া দেখিতেছিলেন।
নিজেকে এবং নিজের ক্রোধ অপমানের কথা ক্রমশঃ
যেন তিনি ভুলিয়া যাইতেছিলেন। সহসা বিশপকে
তাঁহার নিকটস্থ দেখিয়া ঈষৎ সমস্ত হইয়া কণিহ হস্তে
বলিলেন, “এ তোমার কর্তব্য! আমার এক্ষেত্রে কোন
কর্তব্য নেই ত?” বিশপ মৃদু স্বরে বলিলেন বালিকাটি
বোধ হয় আর এক ঘণ্টার বেশী জীবিত থাকবে না। তার
শ্বাস আরম্ভ হয়েছে। বোধ হয় তার বুকের ব্যারাম ছিল,
এই অতর্কিত আঘাত তাই সহ্য করতে পারলে না। যদিও
আমার বিশ্বাস যে নিজের দুঃখেই অর্ধ মৃত হ’য়ে মৃত্যুর পথে
এগিয়েই ছিল এবং বেশী দিন বাঁচতও না।”

“কে সে?” মৃদু স্বরে অস্ৰা প্রশ্ন করিলেন। “এসে
দেখুন তাকে; শুনুন।” অনিচ্ছার সহিত অস্ৰা কোচের
নিকটে গিয়া দাঁড়াইলে বালিকা তাঁহার পানে চাহিল।
সেই আধিক্রিষ্ট চক্ষেও অতিমাত্র বিস্ময় এবং বিমুগ্ধ ভাব
স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিল। মূর্ত্যুর মুখে স্থপের মৃদু হাসি
খেলিয়া গেল, লাডউইকের হস্ত যুগল ঈষৎ আবেগের সহিত
স্পর্শ করিয়া মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিল, “এত সুন্দর! এত সুন্দর
উনি! তবুও আমায় ভালবাস?” সেই পাণ্ডুর মুখে প্রগাঢ়
স্থপের ছায়া অমনি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইল যে, কে বলিতে
পারে এ ব্যক্তি এখন মরিবে। ছয়টি বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি সেই
মুখে সংবদ্ধ হইয়া রহিল। “ভগবান নিশ্চয় এর অপরাধ
ক্ষমা করেছেন, নিশ্চয় এখন এর আর কোন পাপ নেই”
সহসা এই কথা উচ্চারণ করিয়া প্রিন্সস্ অস্ৰা কোচের
নিকটে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন।

বিশপ দৃঢ় কর্ণে বলিলেন, “পাপ একে কোন দিনই
স্পর্শ করিতে পারে নি। এর যা অপরাধ সে দোষ থেকে
জগতের অতি পবিত্রতম ব্যক্তিও মুক্ত নয়। ভালবাসাই এর
জীবনের একমাত্র অপরাধ। নিজের সব কথাই এ আমাকে
জানিয়েছে”।

অস্ৰা কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু তাঁহার জিজ্ঞাসু
চক্ষু লাডউইকের পানে নিবদ্ধ হইল। লাডউইক প্রশ্ন বুঝিয়া
ধীর নম্র স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হস্ত দুই-
খানি তখনো বালিকার হস্তের সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ!

কেলিয়া নিজ মনেই বলিলেন, “আমিই যাব তবে! গিয়ে জানব কেন? কি এ? কিন্তু কে আমার সঙ্গে যাবে? কা-কে নিয়ে যাই? খিষ্টান হানজের নাম মনে আসিতেই অস্রার মুখ ক্রকুটী-বদ্ধ হইয়া উঠিল। সেই ধূর্ত পরছিদা-যেয়ীকে! কখনই না! তবে!” সহসা অস্রার মুখের অন্ধকার অনেকটা তরল হইয়া আসিল—“হ্যাঁ—সে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু এবং উদার-হৃদয় মৎ লোক! তাকেই নিয়ে যাব!” তখনি ত্বরিত হস্তে বিশপ অব-মডেনষ্টিনকে এক-খানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন যেন তিনি অঝারোহণের উপযোগী বেশে তাঁহার সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ অশ্বে আরোহণ করিয়া এবং অস্ত্র-সজ্জে সুসজ্জিত হইয়া যত শীঘ্র পারেন প্রিন্সের নিকটে উপস্থিত হন।

বিশপ অব-মডেনষ্টিন অভিযাত্রায় বৃষ্ণিত ভাবে অস্রার আদেশ মত বেশে সজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে অস্রা সমস্ত ব্যাপার তাঁহাকে ভাস্কিয়া বলিলেন। যুবক বিশপ গভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “রাজাকে জানিয়ে তবে এ কাজ করা উচিত।” অস্রা অধীর কণ্ঠে বলিলেন, “আমি আর এক-ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে পারব না।”

“তা হলে আমি একা গিয়ে ব্যাপারটা দেনে আসি; আপনি যেতে পাবেন না।”

“তবে আমি একাই যাব। তোমার আমার সঙ্গী হয়ে কাজ নেই।”

অগত্যা বিশপ খিষ্টান হানজকে রাজকুমারীর ও তাঁহার অর্থ রাজ-প্রাসাদের গোপন দ্বারের নিকট রাখিতে আদেশ করিলেন, এবং একটা সুকৃষ্ণ অবশুষ্ঠনে প্রিন্সেসকে আচ্ছাদিত করিয়া লইয়া উভয়ে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার। যখন সহরের গেট অতিক্রম করিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাজকীয় আদেশমুচক অস্রার অঙ্গুরী দেখাইয়া বিশপ সহরের দ্বার মুক্ত করাইলেন। অর্থ যুগল সবেগে ছুটিয়া চলিল। অস্রা নীরবে অশ্বের উপর বসিয়া ছিলেন—বেদনা, আশঙ্কা, ক্রোধ প্রভৃতি বহুপ্রকার বিারোহী ভাবের উত্তেজনায় তাঁহার হৃদয় তখন কণে কণে

আলোড়িত হইতেছিল। অশ্বের গতি ও ক্রমঃ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। অস্রা এক বার মূহুঃ সরে বলিলেন, “জানি সে আমার ভালবাসে না! তবু বলেছিল যে, তার সমস্ত জীবনই আমার! কিন্তু এতটুকু বিশ্বাসও ত আমার দিতে পারে নি! তা হলে এ কথাটাও তার মিথ্যা! ভাল ত বাসেই না তা ছাড়া অন্য কিছুও না, সব মিথ্যা তার!” অস্রার মুখের আবরণটা সরিয়া যাওয়ার তাহার উপরে চক্রে আলোক পতিত হইয়া তাহার দীন চকু এবং বাণা-বিবর্ণ মুখকে একটা নূতন শোভায় শোভিত করিয়া তুলিতে ছিল। বিশপ সহানুভূতিমূলক দৃষ্টিতে কুমারীর পানে চাহিলেন। •

আবার তাঁহার আত্মাভিমানের আঘাত লাগিল। যাহার মুখের একটি কথা—একটি দৃষ্টির জন্য রাজস্ববর্গ লালায়িত সেই কুমারী অস্রার এত অপমান! তাহার চাতুরীতে আবদ্ধ হইয়া আজ কি না তাঁহাকে লোকের চক্ষে এই ভাবে লজ্জা পাইতে হইতেছে, এই স্বাদের অন্ধকারে পদোচিত মর্যাদা বিসর্জন দিয়া এই ভাবে ছুটিতে হইতেছে। অস্রার হৃদয় ক্রমঃ কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল।

“বদি তার ছলনার সত্যতার প্রমাণ পাই”—

“মৃত্যুই এ অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ।”

বিশপ আবার কুমারীর মুখের পানে চাহিলেন। বিশপ গভীর মুখে বলিলেন, “রাজাকে না জানিয়ে আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারি না।” অস্রা তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, “রাজা যখন এখানে উপস্থিত নেই তখন আমার আজ্ঞাই তাঁর বলে জানবে!” বিশপ নীরবে রহিলেন। অস্রা মূহুঃ কণ্ঠে বলিলেন, “তুমি কি আমার বন্ধু নও?” বিশপ সম্মানে মস্তক নত করিয়া বলিলেন, “কুমারীই তা বিশেষ রূপে জানেন।”

“জানি আমি, সেই জন্যই বলছি আমার এ অপমানের প্রতিশোধ তোমায় নিতেই হবে।” বিশপ মূহুঃ সরে বলিলেন, “কুমারী! সেই জন্যই আমি আরও তগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যেন আমার তিনি আমার পক্ষে প্রকৃতি হ রাখেন। আপনার জন্য বাধিত হচ্ছি এবং আপনার

অপমানে আমার রক্তও উষ্ণ হয়ে উঠছে বলেই আরও আমি চাচ্ছি যেন মন্দহট। ভগবান এই মিথ্যা বলেই প্রমাণ করে দেন।”

“তবে তুমি আমার বন্ধু নও।” বলিয়া অস্‌রা অশ্রুতে পুনর্বার সবেগে চালিত করিলেন।

অবশেষে তাঁহারা সেই ক্ষুদ্র গৃহের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। বৃক্ষাস্তরালস্থিত গৃহের গবাক্ষ হইতে কয়েকটি আলোক-রশ্মি বহির্গত হইতেছিল। অস্‌রা হস্তের চাবুকের অগ্রভাগ দ্বারা ঈজিত করিয়া তাহা বিশপকে দেখাইলেন। গেটের নিকটে আসিয়া উভয়ে অগ্র হইতে অবতরণ করিলে বিশপ অশ্রুদ্বয়কে গেটের পামে বাঁধিয়া রাখিলেন। অস্‌রা ভেল্টা আবার মুখের উপরে টানিয়া দিলেন। বিশপ মিনতি পূর্ণ স্বরে বলিলেন, “দয়া করে আমার আগে এক বার দেখে আসতে দেন।” “তোমার অষ্টটা আঙুল দাও ত, আমিই একা যেতে পারব।”

বিশপ অগত্যা নীরবে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। গৃহের দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন প্রিন্সের বিশস্ত অনুচর দ্বার রক্ষা করিতেছে। তাঁহাদের দেখিয়া সে সচকিতে তরবারীর কোষে হস্ত স্পর্শ করিবার মাত্র প্রিন্সেস অস্‌রা নিজের অবগুণ্ঠন টানিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বিশপ অবমুণ্ডিত হইয়া ফিপ্র বেগে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “এ ব্যাপারে তোমার মত লোকের হস্তক্ষেপ চলে না, এক পাশে সরে দাঁড়াও।” অস্‌রা মুহূর্ত্ত মাত্র আর সেখানে না দাঁড়াইয়া তড়িৎ বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, বিশপ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

স্মৃতিত আলোকে একটা সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া উভয়ে একটা সিঁড়ির নিকটে উপস্থিত হইলেন, সেখানেও এক জন পরিচারক দাঁড়াইয়াছিল; খ্রিষ্টান হান্‌জের উৎকোচে বশীভূত সেই ব্যক্তি স্মৃতিত আলোকেও অস্‌রাকে দেখিয়া মাত্র চিনিতে পারিয়া নিঃশব্দে ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ দ্বারা ঈজিত করিয়া এক দিকে সরিয়া গেল। বিশপ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া অস্‌রা লম্ফ লম্ফ বয়েকটা সোপান

অতিক্রম করিয়াই সহসা ধামিয়া গেলেন। খানিক নিস্তব্ধ থাকিয়া মূহুর্ত্তে বলিলেন “শোন—ওপরে কারা কথা কচ্ছে।” বিশপ কর্ণ পাতিয়া শুনিলেন এক জন পুরুষ এবং একটি স্ত্রীলোকের ক্ষীণ কণ্ঠ-স্বর মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে। প্রিন্সেস মূহ মূহ বলিলেন, “এ কণ্ঠ তারই! তা হ’লে—তা হ’লে সত্যি?”

ক্ষীণ স্ত্রী-কণ্ঠ কি বলিল তাহা বোঝা গেল না; কিন্তু তথাপি পুরুষোচিত গভীর কণ্ঠে উচ্চারিত হইল যেখানে যে অবস্থায় থাকি আমি তোমারই! কাছে বা দূরে একত্র বা বিচ্ছিন্ন যাই হই জীবনে মরণে আমি তোমারই!” স্ত্রী-কণ্ঠের আর কোন বাক্য উচ্চারিত হইতে শোনা গেল না, কেবল একটা গভীর ক্রন্দন—বাণবিন্দু জীবের একটা অরত্বত বহুগাঢ়ত শব্দমাত্র উভয়ের কর্ণে আসিতে লাগিল। অস্‌রা গভীর মুখে বিশপের পানে চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার চক্ষে কল্পনার সজল রেখা দেখা দিতেছে, অস্‌রার মুখ কঠিন হইতে কঠিনতর কাস্তি দারণ করিল। তিনি দস্তে দস্ত চাপিয়া বলিলেন, “এ ব্যাপারের শেষ করে ফেলাই উচিত।” বাকী সোপান কয়টা অতিক্রম করিয়া একটা দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া মাত্র আবার গৃহ মধ্য হইতে তাহার নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া অস্‌রা অধীর হইয়া উঠিলেন। মূহ অশ্রুত তীব্র কণ্ঠে বলিলেন “এই যে দ্বার—খোল লীজ খোল।” বিশপ তাহার দক্ষিণ হস্ত তরবারী-পিধানের মুষ্টির উপর রাখিয়া বাম হস্তে দ্বারের হাতল ঘুরাইয়া টানিবার মাত্র অস্‌রা বিভ্রাৎ লেখার মত তাহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেন, ত্রস্তে বিশপও তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইল।

গৃহের মধ্যে প্রিন্স গ্লোটেনবার্গ দাঁড়াইয়া আছেন এবং একটি অতি ক্ষীণকায় তরঙ্গী বালিকা তাঁহার নিবিড় বাহ-বেষ্টনে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার বক্ষের উপরে মস্তক রাখিয়া ফোঁপাইতেছে। তাহার ক্ষীণ চক্কর-লেখার মত মৃদু স্বর অস্‌রার অশ্রুত অনতিদীর্ঘ শরীর প্রিন্সের শরীরের উপরে ভার রাখিয়া ও অবিরত ক্রন্দনে কম্পিত

কি স্থানে স্থানে সে নাকি তাহারও অপেক্ষা না করিয়া শুধু নাম স্মরণ মাত্রেই প্রেমিকের অন্তরে সহসা আবির্ভূত হইয়া থাকে?—হায় প্রেম। হায় জগতের জন্মের সম-সাময়িক অনাদি কাল হইতে প্রবাহিত প্রেম-কাহিনী! তোমরা এতই মিথ্যার উপরে তোমাদের রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছ!

যখন অস্‌রা লাড্‌উইকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন তখন অত্যন্তই তাঁহার অর্ধফুট বসরা গোলাপ সদৃশ কপোল যুগল দ্বিগুণ আরক্ত হইয়া উঠিল এবং সত্ত্বফুট নীলাভ লিলির স্থায় নয়নদ্বয় স্বেৎ মুকুলিত হইয়া আসিল, কিন্তু যখন লাড্‌উইক নতজাহ্নু হইয়া বসিয়া তাঁহার গোলাপনির্মিত করতলে সক্রতজ চুষনের সহিত নিজের আন্তরিক ধন্বাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং তাহার এই দয়্যার জন্ত প্রিন্স যে নিজের চিরজীবনের পূজার দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিবেন সে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন তখন ধীরে ধীরে অস্‌রার মুখের সে অপূর্ব আলোকচ্ছটা যেন নিভিয়া আসিতে লাগিল। প্রিন্স যখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নিকটে টানিয়া লইয়া তাঁহার গণ্ড চুষন করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন তখন অস্‌রার মুখ এবং চক্ষু একেবারে মৃতের ন্যায় নিশ্চৈতন্য হইয়া গিয়াছে। প্রিন্সের শীতল ওষ্ঠস্পর্শে অস্‌রার গণ্ডের শীতলতা যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

প্রিন্স লাড্‌উইক এই বিবাহে তাহার পিতার আনন্দ এবং নিজের সম্মান সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন এবং পরদিনও এই সময়ে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আনন্দ লাভ করিবেন তাহা জানাইয়া গেলেন। অস্‌রা গবাক্ষ-পথে বহুক্ষণ অশ্রোপবিষ্ট স্তম্ভ, স্তম্ভ, স্তম্ভলিত দীর্ঘদেহ এবং চিন্তাভরে কুঞ্চিত প্রসস্ত ললাট ও নত বিষম চক্ষু সহ অবনমিত সুগঠিত মস্তক দেখা গেল চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অনিচ্ছাতেও অনাহত ভাবে কোথা হইতে একরাশি অশ্রু আসিয়া তাঁহার স্তনীল চক্ষু ভরিয়া দিল, কিন্তু তখন হস্তে তিনি তখন তাহা মুছিয়া ফেলিলেন।

পরদিন প্রভাতে প্রিন্স মোটেনবার্গের এক জন অনুচর আসিয়া অস্‌রার হস্তে একখানি পত্র দিলে অস্‌রা তাহা পাঠ করিলেন। প্রিন্স নিজের কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা এবং প্রচুর সম্মান জ্ঞাপনের পর জানাইয়াছেন যে, অত্যন্ত গুরুতর প্রয়োজনে তাঁহাকে সে দিন স্ট্রেগস'র অনুপস্থিত থাকিতে হইবে এবং অস্‌রার সঙ্গ-লাভের আনন্দও সে দিন তিনি লাভ করিতে পারিবেন না; এজন্য রাজকুমারী যেন তাঁহাকে ক্ষমা করেন। পরদিন তিনি যথাকালে কুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সম্মানিত হইবেন।

প্রিন্সের গুরুতর কার্য-ব্যাপদেশে অনুপস্থিতি সম্মতি জানাইয়া অস্‌রা অশ্রুচরের হস্তে লাড্‌উইককে একটি পত্র লিখিয়া দিলেন। রাজা ও রাণী তখন জেন্দার অরণ্যে শীকারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন। অস্‌রাকে সমস্ত দিন একাকিনী থাকিতে হইবে দেখিয়া উভয়ে তাঁহাকে তাঁহাদের সমিতিব্যাহারে অন্ততঃ কিছু দূর যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অস্‌রাও ভাবিয়া দেখিলেন এরূপ অবসাদকর ভাব লইয়া সমস্ত দিন প্রাসাদের কক্ষে বদ্ধ হইয়া থাকা অপেক্ষা অল্প কোন উপায়ে দিনটা কাটাইয়া ফেলাই ভাল।

প্রায় পনের মাইল তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া অস্‌রা প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন জন্ত অশ্রুর মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার বিধস্ত গার্ড খ্রীষ্টান হানজ ও তাঁহার অনুসরণ করিল।

অস্‌রার ভূবন ললাম সৌন্দর্যের অগণ্য নীরব ভক্তের মধ্যে বীর খিষ্টান হানজ ও এক জন। সেই বিখ্যাত হৃদাস্ত বস্ত্র দল্ল্য ও সেই অপরূপ রূপরাশির নিকটে মস্তক নত করিয়া শ্বেচ্ছায় সানন্দে তাঁহার অনুচরের পদ গ্রহণ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিত। প্রিন্স লাড্‌উইকের উপরে সে প্রথম হইতেই ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, পরে অস্‌রার প্রতি তাঁহার ঔদাসিন্য দেখিয়া সে বিশেষ গভীর ক্রোধে পরিণত হইয়াছে।

কিছু দূর নীরবে কুমারীর অনুসরণ করিয়া খিষ্টান হানজ সহসা তাহার অধকে একটু বেগের সহিত চালিত করিয়া রাজকুমারীর পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অস্ৰা প্ৰথ হস্তে অধৰ্ম্মি ধৰিয়া আপন মনে নীরবে পথ অভিযান কৰিতে ছিলেন। হান্জের চাকলো একটু সমাজ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে কি একটা নীরব ভাষা তাহার মুখে চক্ষে খেলিয়া ঘাইতেছে কিন্তু সাহস কৰিয়া ওঠে আসিতে পারিতেছে না ! কুমারী বলিলেন, “খিষ্টান্ ! তুঁকি কি আমার কিছু বলতে ইচ্ছা কর !” “হ্যাঁ কুমারী ! অনেক দিন থেকেই আপনাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি কিন্তু সাহস পাই না।” সবিস্ময়ে অস্ৰা বলিলেন, “কেন ! তুমি ত অনেক সময়ই আমার পাশে পাশে থাক।”

“হ্যাঁ, তা থাকি বটে, কিন্তু প্রিন্স গ্লোষ্টেনবার্গও সেই-রকম থাকেন। তাঁরই সম্বন্ধে কৈন কথা।” বক্তার মুখ-ভঙ্গী লক্ষ্য কৰিয়া অস্ৰা বিব্রত হইয়া উঠিলেন, “খিষ্টান ! সে কথার একমাত্র তাঁরই অধিকার ! তুমি ত প্রিন্স গ্লোষ্টেনবার্গ নও।”

“ভগবান করুন যেন আমি এই খিষ্টান্ হান্জ নামে যেখানে আছি এই খানেই চিরদিন থাকি তবু যেন প্রিন্স গ্লোষ্টেনবার্গের নামে আমার লোভ না থাকে এবং তাঁর মত মাঝে মাঝে লুকিয়ে ওখানে বাসও না করতে হয়।” বলার সঙ্গে সঙ্গে খিষ্টান বৃক্ষান্তরাল স্থিত একটি ক্ষুদ্র আবাসের দিকে অঙ্গুলি প্রসারণ করিল।

অস্ৰার সেই ক্রোধ রক্ত চক্ষের পানে চাহিয়া অল্প কেহ হইলে সে সময়ে একটি শব্দও উচ্চারণ কৰিতে পারিত না কিন্তু খিষ্টান এজন্ত প্রস্তুত হইয়াই ছিল, অস্ৰার মুখের দিকে না চাহিয়া কেবল সম্মানে সম্মুখে অবনত হইয়া বলিতে লাগিল, “আপনি প্রশ্ন কর্তে পারেন যে প্রিন্স যে ওখানে আছেন তুমি কেমন করে জানলে ! কুমারি, আপনার ত অহুচরের অর্থের অভাব নেই, এবং আপনি জানেন জগতে যার অর্থ আছে সে সব খবরই জানতে পারে। তিনি যে আজ এইখানে বাস করছেন এ খবর আমি তাঁর একটা চাকরের কাছ থেকে পক্ষাশ পাউণ্ডের বদলে সংগ্রহ করেছি।”

অস্ৰার মুখ বিশৃঙ্খল আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি সক্রোধে

“তোমার ও শেয়ালের মত ধূর্ততার গল্প আমার শুন্বার অবসর নেই এবং প্রিন্স যেখানেই থাকুন সে খবরেরও দরকার নেই” এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সবেগে অগ্নের বদ্বা আকর্ষণ করিলেন। অল্প ভীরবেগে প্রাসাদাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। খিষ্টান হান্জ যদিও অনেকটা বিকল মনোরণ হইয়া তাঁহার অনুসরণ কৰিতে লাগিল কিন্তু তথাপি সব বাপারটা বলার অপেক্ষা এই সন্দেহাত্মক আভাবই যে বেধী কাজ কৰিবে তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল।

কয়েক মাইল এই রূপে অভিযাহিত কৰিয়া প্রিন্সেণ্ড অগ্নের গতি লক্ষ্য কৰিলেন এবং খিষ্টানের পানে না চাহিয়াই বলিলেন, যে খিষ্টানের এ রূপে প্রিন্সের সন্ধান লওয়া অত্যন্ত অনায়াস এবং অসম্মানজনক কার্য হইয়াছে। প্রিন্স যে গুরুতর কার্গোর জন্য সেখানে গিয়াছেন তাহা তিনি জানেন কিন্তু খিষ্টান যেন তাহার এ শৃংখলোচিত সন্ধানের কথা বা প্রিন্সের নাম আর কাহারো সাক্ষাতে যথেষ্ট না আনে। কুমারীর আদেশ শিরোধাৰ্য্য কৰিয়া লইবার ভঙ্গিতে খিষ্টান মন্তক নত করিল বটে কিন্তু তাহার ওষ্ঠের বিক্ৰম ও সন্দেহাত্মক তীক্ষ্ণ হাস্যটু অস্ৰার দৃষ্টি এড়াইল না।

প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া অস্ৰা সবেগে নিজ কক্ষের দিকে ছুটিলেন এবং নিজের ক্রান্ত দেহ ও ব্যথিত হৃদয়কে শয্যা পাতিত কৰিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল কিন্তু হৃদয় তাঁহাকে সেই ব্যথিত প্রশ্ন হইতে নিষ্কৃতি দিল না। কেন ! এ লুকাচুরী কারণ কি ? প্রিন্স যে তাঁহাকে ভাল-বাসেন না তাহা জানিলেও তাঁহার বিশ্বস্ত চরিত্রের প্রতি অস্ৰার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, আজ এ বাপারে যে সেখানেও আবাত পড়িতেছে। তাঁহার ভাষা এ কথা জানিতে পারিলে আজ নিশ্চয়ই এ বিষয়ের সন্ধান না লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না ; কিন্তু হায় ! তিনি আজ অনেক দূরে রহিয়াছেন। অস্ৰার আজ তাঁহার কাছে উপস্থিত হওয়াও অসম্ভব ; কিন্তু এ ভাবে এ চিন্তা লইয়া তিনি আর এক ঘণ্টাও কাটাইতে পারিবেন না বুঝিতে পারিলেন। অস্ৰা ধীরে ধীরে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন। উত্তপ্ত ললাটের উপর হইতে লুপ্তিত বিশৃঙ্খল কেশগুলো পশ্চাৎ দিকে সরাইয়া

চৈত্র ১৩১৯

হাতখানি নিজ হস্তে লইয়া চুপন করিবা মাত্র অস্‌রা অধীর ভাবে নিজের হাত টানিয়া লইলেন। লাড্‌উইক নত মুখেই রহিলেন।

যথাসময়ে লাড্‌উইক নিজ নির্দিষ্ট বাসস্থানে চলিয়া গেলে অস্‌রা নিজ কক্ষে বসিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন, “এই কি ভালবাসা?” সহসা কুমারীর চক্ষে জল আসিল। “না-না! সে ভালবাসা কাকে বলে বোধ হয় জানেই না!” ভিত্তি-পাত্রস্থ দর্পণে প্রতিবিম্বিত নিজের অলৌকিক সৌন্দর্য-পূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া তিনি নিজের মুখকেই যেন সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “সে যেন জানে না, কিন্তু তুমি কেন তাকে শিখাচোনা? তুমি ও ভালবাসার দ্বার খুলে দিচ্ছ না কেন? তুমি শেখালে সেও নিশ্চয় শিখত! ক্রটি তোমারও আছে।”

আবার কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। লাড্‌উইক যথানিয়মে রাজকুমারী অস্‌রার সঙ্গে লাভের জন্য প্রতিদিনই আসিতেন। পেমের উন্নাদনাহীন এরূপ বশ্বতা এরূপ সঙ্গ অস্‌রাকে ক্রমশঃ যেন ক্লান্ত করিয়া ফেলিতে লাগিল। প্রিন্সের দিক্‌ হইতে কিছা নিজের মধ্যে সে কোন দিক্‌ হইতেই হোক, প্রেমের সেই সর্বজন অনুভাবা উত্তাপকে অনুভব করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়াই উঠিতেছিলেন। কিন্তু তাহা যদি একান্তই সম্ভব না হয় তো এরূপ ব্যাপারের একটা হেস্তনেন্ত হইয়া যাওয়াই ভাল। এরূপ শাস্ত্র বিচারের সহিত, তর্ক বিতর্কের সহিত, ভালবাসিবার চেষ্টা করা, এ যেন একটা বিড়ম্বনা মাত্র! অস্‌রা লাড্‌উইকের কায়দা-দ্রুত চাপচলন, নিয়মিত বিধিবদ্ধ কথা, সর্ববিষয়ে অধিকন্তু হীন গাভীরোর জন্য তীক্ষ্ণ ভাবের বিদ্রূপ করিতে ও ছাড়িতেন না। কিন্তু তাহাতেও প্রিন্স অবিচলিত ভাবে তাঁহার কৈফিয়ৎ দাখিল করিতেন যে, তাঁহার প্রকৃতিই তাঁহাকে সর্বসাধারণের সহিত এরূপ অসমতা দান করিয়াছে। তাঁহার নিজের এ বিষয়ে কোন হাত নাই, তাঁহার স্বভাবই এই রূপ কিন্তু এই কথাগুলার মধ্যেও অস্‌রার প্রতি তাঁহার অগাধ সম্মান এবং শ্রদ্ধা অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইত! অস্‌রার সময়ে সময়ে মনে হইত, “আমি যদি রাজকন্যা না হতাম!

এ সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তা হ’লে আমার কোন সম্বন্ধই থাকত না!”

লাড্‌উইকের দিক্‌ হইতে কোন কিছু সুস্পষ্ট না হইলেও তাঁহার নিজের দিক্‌ হইতে একটা যাহোক কিছু স্থির করিয়া ফেলার ক্রমে নিত্য প্রয়োজন হইয়া পড়িল, কেন না, রাজারাগী ও এ জন্ত তাহাকে তাগারা দিতে লাগিলেন এবং তাহাদের এরূপ দীর্ঘস্থায়তা দেখিয়া তাঁহারি যেন বিরত এবং কিছু বিরক্তও হইয়া পড়িতে ছিলেন। প্রিন্স প্লোটেনবার্গের মধ্যে এমন কোন যৎসামান্য ক্রটিও নাই, যাহার জন্ত অস্‌রা তাঁহাকে বিবাহের অনুপযুক্ত বলিতে পারেন, বরং প্রিন্সের হৃদয়ের মহত্ব যে সাধারণের অপেক্ষাও অনেক বেশী, ইহা অস্‌রাকেও মানিতে হইত। শুধু নিজের মনের একটা খেয়ালের জন্ত (খেয়াল ভিন্ন এরূপ হলে সাধারণে কি বলিতে পারে?) এরূপ সর্বজন-ঈর্ষিত বিবাহে সম্মতি দিতে ইতস্ততঃ করায় চারি দিক্‌ হইতে একটু বিদ্রূপের বাতাসও যেন ক্রমে বহিয়া উঠিতে ছিল। অগত্যা শেষে একদিন অস্‌রা তাঁহার ভ্রাতাকে জানাইলেন যে, তিনি প্রিন্স লাড্‌উইককে বিবাহ করিতে সম্মত আছেন।

রাজা এ সংবাদে এতই সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন যে, তখন তিনি নিজের লাড্‌উইককে সংবাদ দিবার জন্ত একাকী খেত প্রাসাদান্তিমুখে যাত্রা করিলেন। লাড্‌উইকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সহর্ষে বলিলেন, “ভাই! সৌন্দর্য্যে যে পৃথিবীর রাণী, তার ওপরে তোমার স্বত্ব সাব্যস্ত করে’ দেবার জন্ত সুসংবাদ নিয়েই আজ আমি নিজেই তোমার কাছে এসেছি”।

প্রিন্স এ সংবার শুনিয়া সম্মানে অবনত হইয়া রাজার হস্ত ধারণ করিলেন এবং এ বিষয়ে রাজার সম্মতি ও সাহায্যের জন্ত ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার প্রতি এই অসীম অঙ্গুগ্রহের জন্ত রাজকুমারীকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

রাজা বলিলেন, “তার সঙ্গে দেখা করবার জন্ত তুমি কি এখন আমার সঙ্গে যাবে না?” প্রিন্স নত মুখে বলিলেন,

“আমার একটা বড় দরকারী কাজ রয়েছে। কুমারীর কাছে আমার জন্ত ক্ষমা চাইবেন, আমি বৈকালে গিয়া তাঁর দর্শন লাভ ক’রে সম্মানিত হব এবং তাঁকে আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাব।”

রাজা কিয়ৎ ক্ষণ লাডুইকের পানে দৃষ্টি করিয়া ঈষৎ বিজ্রপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, “পৃথিবীতে বোধ হয় এমন লোক আর দুটি নেই যে, অস্ৰা তার জন্ত অপেক্ষা করেছে শুনেও—কৃতজ্ঞতা, দরকারী কাজ, বৈকাল—এই সব কথা মুখে আনে!”

লাডুইক রাজার বাহ ধারণ করিয়া বন্ধুর যোগা সাহসের নির্বন্ধের সহিত বলিলেন, “আমায় অকৃতজ্ঞ এবং অভদ্র ভাববেন না! ভাই, সত্যি আমি এ সংবাদে নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত এবং অশ্লীলিত বোধ করছি, কিন্তু তবু এই দরকারী কাজটা এখন কোন রকমেই ফেলে রাখবার উপায় নেই।”

রাজা একটু বিজ্রপের হাসি হাসিয়া ঈষৎ গম্ভীর মুখে নিজের প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং এ সংবাদে লাডুইক যে কিরূপ স্থখী এবং কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে তাহা সাংক্ষাৎ অস্ৰার নিকটে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। জানাইলেন, লাডুইকের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাঁধাটা সারিয়াই বৈকালে সে অস্ৰার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে। অস্ৰাও এ সংবাদে বিচলিত হইলেন না, কেন না তিনি যখন বিবাহের জন্ত মনকে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন সে ব্যক্তির কোন ত্রুটি আর ইচ্ছা সবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এ বিবাহে ভ্রাতার আন্তরিক যত্নের জন্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া নীরব হইলেন।

রাজা ভগ্নীর নিকটে বসিয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাহার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, “বোন! জগতে প্রণয়ী অনেকই পাওয়া যায়, কিন্তু স্বামী হবার উপযুক্ত গুণ সকলের থাকে না। সে গুণ লাডুইকে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, সে স্বামীত্বেরই উপযুক্ত লোক নয় কি?”

ভ্রাতার এই স্নেহ আদরে অস্ৰার অন্তরের গুপ্ত বেদনা সহসা উদ্ধৃসিত হইয়া উঠিল, তিনি যেন কতকটা

ফুঁপাইয়া কান্নার স্বরে বলিলেন, “হাঁ, তিনি স্বামীত্বেরই উপযুক্ত লোক! আর কিছু না।”

রাজা একটু চিন্তিত ভাবে ক্ষণেক অস্ত্র দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং তাঁহার মুখ হইতে অস্পষ্ট ভাবে বাহির হইল, “পৃথিবীতে বেশীর ভাগ এই রকম মিলনই ঘটে থাকে।”

ক্ষণপরে অস্ৰা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মৃদু মৃদু যেন আপনার মনে বলিলেন, “আমার ভয় করছে। ভয় করছে যদি আমি তাকে ভাল না বাসতে পারি?” রাজাও সে কথার প্রতিধ্বনির মত বলিলেন, “আমারও সেই ভয়! কিন্তু না এ রকম ভয় করা ভাল নয়, লাডুইক অত্যন্ত ভাল লোক, তার মত স্বামী জ্বীলোক নাহেরই প্রার্থনীয়! সাহস ধর, এ রকম ভয় হওয়া ঠিক নয়।” রাজা তার পরে শুভাশুভাঙ্গী ভ্রাতার হৃদয়ের আলীকাদের মত ভগ্নীর মস্তক চুম্বন করিলেন এবং গম্ভীর মুখে বলিলেন, “তার স্বভাবটাই এই রকম ঠাণ্ডা ধরণের। কোন বিষয়েই সে বেশী উত্তেজিত হয় না।”

কিন্তু অস্ৰা এ মন্তব্যে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না! প্রেমের উত্তাপহীন এ মিলনকে তিনি মনের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি উৎকর্ষার সহিত প্রিলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন কেন না বুঝিতে পারিতেছিলেন এই সাক্ষাৎ তাহাদের উভয়ের পক্ষে সমস্ত প্রিলের শেষ মীমাংসা করিয়া দিবে। অস্ৰা নিজের অনন্তসাধারণ সৌন্দর্যকে বেশ-ভূষার দ্বারা যত্নের সহিত সজ্জিত করিয়া এবং নিজকে যেন ভালবাসিবার জন্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিলেও বুঝিতে পারিতে ছিলেন যে, যদি সে তাহাকে ভালবাসে তাহা হইলে তাঁহার পক্ষেও তাহাকে ভালবাসা কিছুমাত্র কঠিন হইবে না; কিন্তু হায়, সে ভালবাসে না, বুঝি ভালবাসার নামও কখনো সে শোনে নাই—ভালবাসিতে সে জানেই না, অতএব এ আয়োজন সবই বৃথা—বৃথা! এত ভাবিয়া চিন্তিয়া এত পাত্রাপাত্র বোধের নিক্তি হাতে লইয়া চেষ্টা করিয়া ভালবাসা? শোনা যায় প্রেম না কি একবার মাত্র সাক্ষাৎ, একটি কথা, একটি স্পর্শ এমন

2

রাজকুমার ও রাজকুমারী

তখন বসন্তের সব ফুলগুলিই একে একে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চেরি, জের্মিন, ভায়োলেট, লিলি, রোজ প্রভৃতি পুষ্পের সমুদ্র ফুটিত গন্ধে ট্রেন্সের রাজ্যস্থান আমোদিত, মত্ত মধুমাহি ও প্রজাপতির আনাগোনার বিরাম নাই। অশ্রুটি গোন্ডেনকাপ্ ফুলগুলায় মাঠটা স্বর্ণময় এবং তাহার বক্ষস্থিত মন্দির রচিত শ্বেত-প্রাসাদ বসন্ত-স্বর্ষোর সুবর্ণ কিরণে হীরক-খণ্ডের তায় জ্বলিতেছে। ট্রেন্সের আদিম রাজ প্রাসাদে বসিয়া রাজকুমারী অস্‌রা দ্রুত শ্বেত প্রাসাদের পানে চাহিয়া চাহিয়া একটি মূহ অথচ দীর্ঘকালবাহী নিখাস ফেলিলেন। তাহার ভাতা ট্রেন্সের নবীন রাজা রুডল্‌ফ নিকটে বসিয়া বদ্বীক্ষামত সিংগার টানিতেছিলেন, ভগিনীকে নিখাস ফেলিতে শুনিয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া সহসা বলিলেন, “কই, লাড্‌উইক্‌ এখনি আসেনি?” “না!” রাজা এক বার আলস্য ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “তাই ত! অল্প দিন ত এত ক্ষণ আসে। শ্বেত প্রাসাদ বেশী দূরে নয় বলেই তাকে আরও এখানে বাগ করতে অনুরোধ করেছে। ছোকরা এখনো এল না কেন আজ!” অস্‌রা কোন উত্তর দিলেন না।

লাড্‌উইক্‌ প্রিন্স মোটেনবার্গের রাজকুমার। কুমারী অস্‌রার সৌন্দর্য্য ঋণাত্মক তখন ইউরোপের সমস্ত রাজবংশ তাহাকে নিজের গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত ইচ্ছুক। মোটেনবার্গের রাজা নিজ পুত্র লাড্‌উইক্‌কে সেই উদ্দেশ্যেই ট্রেন্সের অতিথি স্বরূপে পাঠাইয়াছেন। লাড্‌উইক্‌ও যে তখনকার রাজকুমারদের মধ্যে রূপ-গুণ, চরিত্র-মাধুর্য্য, বিদ্যা-বক্তা এবং অমায়িক স্বভাবে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে ট্রেন্সের রাজসভার সভ্যদের মধ্যে মতবৈধ ছিল না। এই যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলনের জন্ত রাজারাগী হইতে ট্রেন্সের আশ্রমের সাধারণ পর্য্যন্ত সমুৎসুক। মোটেনবার্গের রাজবংশও প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত। এ বিবাহ সকলের একান্ত প্রার্থনায় হইলেও বাহাদের আগ্রহই এ বিষয়ে বেশী দরকারী, তাহাদিগকে অনেকটা উদারীন দেখিয়া রাজারাগী পর্য্যন্ত অধীর হইয়া উঠিতে ছিলেন।

রুডল্‌ফ ভয়ীর মনটি একটু কোমল করিবার জন্ত বলিতে লাগিলেন, “প্রিন্স মোটেনবার্গের মত শিক্ষিত, সদালাপী, সহৃদয়—এক কথায়, সকলের মনোরঞ্জন করবার মত ক্ষমতা-পন্ন লোক আমি খুব কন দেখেছি। তোমার উপর তার অত্যন্ত শ্রদ্ধা, সে তোমার অত্যন্ত অঙ্গুত।” “কিন্তু এই কি ভালবাগা? স্বীকার করি, সে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই কি ভালবাগা? সে যখন নতজাহ্ন হয়ে বসে, আমার হাত ধরে, আমার হাতখানা সে যেন ঠিক পাথরের পুতুলের হাত বলেই মনে করে এবং আমিও তার চেয়ে আর বেশী কিছু ত গ্রহণ করি না! ভাই জিজ্ঞাসা করি, এরই নাম কি ভালবাগা?”

রুডল্‌ফ একটু হাসিয়া বলিলেন, “ভালবাসার অনেক রকম-ভেদ আছে বোন, এ জাতীয় ভালবাগা কেবল রাজকুমার ও রাজকুমারীদের জন্তই নির্দিষ্ট!” অকুণ্ঠিত করিয়া অস্‌রা বলিলেন, “তার তবে ভালবাসা নাম দিও না!”

প্রতিদিনের নিয়ম মত যখন প্রিন্স লাড্‌উইক্‌ আসিয়া বিনীত মুখে রাজকুমারীকে জানাইল যে, তার কোন সামান্য ইচ্ছা পূরণ করতে পেলেও সে অতুল আনন্দ ভোগ করবে তখন অস্‌রা আর আশ্বসংবরণ করিতে পারিলেন না। অতর্কিতে তাহার ওষ্ঠাধর হইতে নির্গত হইল, “আমার আজ্ঞা পালন করে’ আনন্দ পাওয়ার চেয়ে আমার কেবল দেখে’ যদি তুমি সেই আনন্দ পেতে, সে-ই আমি যথেষ্ট জান করতাম।” বগার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় কুমারীর মুখ ও গণ্ড লোহিত হইয়া উঠিল। ত্রুস্তে তিনি অল্প দিকে মুখ ফিরাইলেন। অস্‌রার এ কথায় লাড্‌উইক্‌ যেন কিঞ্চিৎ আহত হইলেন। একটা গভীর দীর্ঘ নিখাসের সহিত বলিলেন, “তোমার ক্ষণেকের আনন্দের জন্য আমার সমস্ত জীবনও আমি দিতে প্রস্তুত!”

অস্‌রা তাহার সেই রক্তিম মুখ রাজকুমারের দিকে ফিরাইয়া কম্পিত কর্তে বলিলেন, “কিন্তু আমার মনে হয় যেন সে আনন্দটা যদি আমার কাছ থেকে তুমি পেতে, তা হ’লেই আমি বেশী সুখী হতাম।”

লাড্‌উইক্‌ চক্ষু অবনত করিলেন, ক্ষণপরে কুমারী

